বাংলাদেশ কওমী মাদরাসার ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য লিখিত

আনওয়ারুদ দিরায়া

শরহে বেকায়া

আরবি বাংলা

১

অনুবাদক

মাওলানা ওয়াহীদুযযামান ইসহাকী

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, ঢাকা

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বাংলা শরহে বেকায়া

মূল ❖ ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (র.)

অনুবাদক ❖ মাওলানা ওয়াহীদুযযামান ইসহাকী

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা এম. এম.

শব্দ বিন্যাস ❖ আল মাহমূদ কম্পিউটার হোম
২৮/এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ❖ ৪০০.০০ টাকা মাত্র

সূচি নির্দেশিকা

বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদ।

২. সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এ ক্ষেত্রে ফাতহুল কাদীর, বাদায়েউস সানায়ে', বাহরুর রায়েক, হিদায়া, কানযুদ্দাকায়েক, আশরাফুল হিদায়া, সিকায়া, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহসহ ফিকহ ও হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৩. জটিল বাক্যগুলোর সহজ-সরল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪. مُخْتَلَفٌ فِيْهِ মাসআলাগুলোর بَيَانُ الْمَذَاهِبِ - بَيَانُ الْاَدِلَّةِ ও بَيَانُ الْاَجْوِبَةِ সহ সংক্ষেপে এক/ দুটি দলিল উল্লেখ করে বাকি দলিলের জন্য প্রামাণ্য গ্রন্থাবলির নাম ও পৃষ্ঠা নং দেওয়া হয়েছে।

৫. যথাসাধ্য উদ্ধৃতিসহ দালায়েলের বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

৬. এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। অন্য কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থের হুবহু বঙ্গানুবাদ নয়।

৭. ছাত্রের প্রয়োজনীয় কিংবা কিতাব বোঝার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের আলোচনাই এতে করা হয়েছে।

৮. সাধারণ লোকজনও এর থেকে মাসআলা-মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

৯. গ্রন্থটিকে যথাসাধ্য সংক্ষেপ করা হয়েছে। বিস্তারিত ও দীর্ঘ আলোচনা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

১০. গ্রন্থটি বেফাকের প্রশ্নোত্তরের প্রক্রিয়ায় লেখা হয়নি, কিন্তু বেফাকের প্রশ্ন সামনে রেখে এর উত্তর হল্ করে দেওয়া হয়েছে।

১১. এটি শুধু কওমী মাদরাসার ছাত্রদের জন্য খাস নয়; বরং আলিয়া ও মহিলা মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরাও এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

কিছু কথা

আল্লাহ তা'আলা আল্লামা ইসহাক ফরীদী (র.)-কে জান্নাতুল ফেরদাউসের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন। তিনি সারাক্ষণ বসে লিখতেন। আমাকে বলতেন, মাওলানা যাইনুল আবিদীন সাহেবের সাথে যোগাযোগ রেখে কিছু লেখালেখি করতে। তখন থেকেই আমি দৈনিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকায় কিছু লেখার চেষ্টা করতাম। মাওলানা যাইনুল আবিদীন সাহেবও আমাকে যথেষ্ট দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দিতেন এবং এখনো দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই চেষ্টার বদৌলতে আমাকে ঐ দূর সীমানায় এগিয়ে যাওয়ার তৌফিক দেন।

বক্ষমাণ গ্রন্থটি 'শরহে বিকায়া' গ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। 'শরহে বিকায়া' গ্রন্থটি হিজরি সপ্তম শতকের শেষার্ধে আরবি ভাষায় রচিত ফিকহে হানাফীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি মূলত শায়খ বুরহানুশ শরীআহ মাহমূদ (র.)-এর রচিত 'বিকায়া' নামক কিতাবের ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.)-এর লিখিত আরবি শরাহ। এ "শরহে বিকায়া" ছাড়াও 'বিকায়া' কিতাবের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ২০টিরও অধিক শরাহ রয়েছে। তন্মধ্যে 'শরহে বিকায়া'-ই প্রথম এবং প্রধান শরাহ। তা ছাড়া 'শরহে বিকায়া' গ্রন্থেরও বিভিন্ন ভাষায় রচিত অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টীকা রয়েছে। তন্মধ্যে মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী (র.)-এর রচিত سِعَايَة ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং عُمْدَةُ الرِّعَايَة টীকাগ্রন্থ সর্বাধিক প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য।

তবে বাংলা ভাষায় 'শরহে বিকায়া' -এর পূর্ণাঙ্গ কোনো অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়নি, যদিও আংশিক হয়েছে। অপরদিকে গ্রন্থটি যুগ যুগ ধরে দরসে নেজামীর 'শরহে বিকায়া জামাতে' তালিকাভুক্ত। তাই গ্রন্থটির সরল অনুবাদ, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ ও مُخْتَلَفْ فِيْه মাসআলার সুচারু বর্ণনা সংবলিত একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাতৃভাষায় উপস্থাপনের লক্ষ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। দীর্ঘদিনের সাধনা ও শ্রমের মাধ্যমে মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন পূরণার্থে এ গ্রন্থটি রচনা ও শিক্ষার্থীদের খেদমতে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে অফুরন্ত শোকর জ্ঞাপন করছি।

এ মুহূর্তে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি ঢাকা চৌধুরীপাড়ার ঐতিহ্যবাহী "নূর মসজিদ -মাদরাসা"-এর বর্তমান মুহতামিম আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা আবূ মূসা সাহেব [দা. বা.]-কে। তিনি তাঁর মনোজ্ঞ বাচনভঙ্গি ও সাজানো তাকরীরের মাধ্যমে আমাদেরকে 'শরহে বিকায়া' কিতাবটির দরস দিয়েছিলেন। স্মরণ করছি আমার শিক্ষাগুরু হযরত মাওলানা জামালুদ্দীন সাহেব [দা. বা.]-কে, যার নিকট আমার পড়াশোনার হাতে খড়ি। বিভিন্ন সময়ে কাজের ক্ষেত্রে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন আমার প্রিয়বন্ধু মাওলানা আতাউল্লাহ। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইহ ও পরজগতে কামিয়াব করুন।

মানুষ সীমিত জ্ঞানের অধিকারী। জ্ঞানের দুর্বলতা ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এ কিতাবে কোনো আক্ষরিক কিংবা তাত্ত্বিক ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে সহৃদয় পাঠকবৃন্দ আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র খেদমতকে কবুল করেন। –[আমীন!]

দোয়ার মুহতাজ
ওয়াহীদুয্যামান ইসহাকী
উস্তাদ : জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ফিকহ সম্পর্কিত আলোচনা

ফিকহের সংজ্ঞা ও পরিচিতি : ফিকহ শব্দটি আরবি। এটি বাবে كَرُمَ ও سَمِعَ থেকে ব্যবহৃত হয়। বাবে سَمِعَ থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে– اَلْعِلْمُ ـ اَلْفَهْمُ ـ اَلْمَعْرِفَةُ ـ اَلْاِدْرَاكُ [জানা, জ্ঞাত হওয়া বা অবহিত হওয়া ইত্যাদি]। আর যদি বাবে كَرُمَ থেকে আসে তবে এর অর্থ হবে– ফকীহ হওয়া। প্রখ্যাত অভিধান বিশারদ আল্লামা আবুল ফজল জামালুদ্দীন (র.) বলেন– اَلْفِقْهُ اَلْعِلْمُ بِالشَّيْئِ وَالْفَهْمُ لَهُ وَغَلَبَ عَلٰى عِلْمِ الدِّيْنِ لِسِيَادَتِهٖ وَشَرَفِهٖ وَفَضْلِهٖ عَلٰى سَائِرِ اَنْوَاعِ الْعِلْمِ ـ –[লিসানুল আরব]

শায়খ মুহাম্মদ আলাউদ্দীন হাসকাফী (র.) বলেন– اَلْفِقْهُ لُغَةً اَلْعِلْمُ بِالشَّيْئِ ثُمَّ خُصَّ بِعِلْمِ الشَّرِيْعَةِ وَفَقِهَ بِالْكَسْرِ فِقْهًا عَلِمَ وَفَقُهَ بِالضَّمِّ فَقَاهَةً صَارَ فَقِيْهًا ـ –[দুররুল মুখতার]

পরিভাষায় : ফিকহ কাকে বলে, এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের একাধিক অভিমত রয়েছে। 'মিফতাহুস সাআদাহ' গ্রন্থকার বলেন–

هُوَ عِلْمٌ بَاحِثٌ عَنِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِسْتِنْبَاطِهَا مِنَ الْاَدِلَّةِ التَّفْصِيْلِيَّةِ

উসূলবিদ ওলামায়ে কেরামের মতে– هُوَ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

ফিকহবিদদের মতে, حِفْظُ الْفُرُوْعِ অর্থাৎ শরিয়তের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত হুকুম-আহকামের সংরক্ষণ করাকে ফিকহ বলে।

সূফিয়ায়ে কেরামের মতে– اَلْجَمْعُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ অর্থাৎ ইলম ও আমলের সমষ্টির নামই ফিকহ। এ কারণেই হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন– اَلْفَقِيْهُ الزَّاهِدُ فِى الدُّنْيَا الرَّاغِبُ فِى الْاٰخِرَةِ الْبَصِيْرُ بِدِيْنِهٖ الْمُدَاوِمُ عَلٰى عِبَادَةِ رَبِّهٖ –[ফতোয়ায়ে শামী– খ. ১ পৃ. ১২০]

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে– اَلْفِقْهُ اَلْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا –[আল-মিফতাহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ– খ. ১ পৃ. ১৬]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে– مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا "নফস ও আত্মার জন্য যেসব বিষয় কল্যাণকর এবং যেসব বিষয় কল্যাণকর নয় তা সহ নফস সম্বন্ধে যথাযথ অবহিত হওয়াকে ফিকহ বলে।" এ সংজ্ঞায় اِعْتِقَادَاتْ তথা আকিদা-বিশ্বাস وِجْدَانِيَّاتُ তথা আখলাক ও তাসাউফ এবং عَمَلِيَّاتْ তথা নামাজ, রোজা, বেচাকেনা ইত্যাদি সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন জ্ঞানের প্রতি শাখা স্বতন্ত্ররূপ লাভ করে তখন আকাইদ সম্পর্কিত ইলমকে বলা হয় 'ইলমুল কালাম।' আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত ইলমকে বলা হয় 'ইলমুত তাসাউফ' এবং আমলী জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধানের নাম হয় 'ইলমুল ফিকহ।'

–[আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ– খ.– ১ পৃ. ১৭]

ইলমুল ফিকহের আলোচ্য বিষয় : ইলমুল ফিকহের আলোচ্য বিষয় হলো– اَفْعَالُ الْمُكَلَّفِيْنَ مِنْ حَيْثُ التَّكْلِيْفِ। অর্থাৎ শরয়ী বিধান প্রয়োগকৃত নর-নারীর কাজকর্ম। কেননা, শরয়ী বিধান প্রয়োগকৃতদের কাজকর্ম নিয়েই এ শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। যেমন– আমল শুদ্ধ হওয়া না হাওয়া, ফরজ হওয়া না হওয়া, হালাল বা হারাম হওয়া বা না হওয়া ইত্যাদি। মুকাল্লাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক। অতএব, মাতাল ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের কার্যাবলি ইলমুল ফিকহের আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত।

ইলমুল ফিকহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য : ইলমুল ফিকহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো– سَعَادَةُ الدَّارَيْنِ তথা উভয় জগতে সৌভাগ্যবান হওয়া। এভাবে যে, ফকীহ দুনিয়ায় আল্লাহর সৃষ্টির উপকার করে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন, আর পরকালে যাকে ইচ্ছা সুপারিশ করতে পারবেন এবং আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভে ধন্য হবেন। অথবা বলা যায় যে, ইলমুল ফিকহের উদ্দেশ্য হলো, শরয়ী বিধানাবলি অনুযায়ী আমল করার শক্তি ও যোগ্যতা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা।

কুরআন, হাদীস এবং ফিকহের পারস্পরিক সম্পর্ক

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, ফিকহ কুরআন ও হাদীস থেকে ভিন্ন কিছু নয়। কুরআন ও হাদীসের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে উদ্ভাবিত আমলী শরিয়তের বিধিবিধানের নামই হচ্ছে ফিকহ। পিতামাতার সাথে সন্তানের যে সম্পর্ক, কুরআন ও হাদীসের সঙ্গেও ফিকহের সেই একই সম্পর্ক। কুরআন ও হাদীস হলো শরিয়তের اَصْل বা মূল। আর ফিকহ হলো এর শাখা- প্রশাখা মাত্র। ইলাহী হেদায়েত ও নববী শরিয়তের বাস্তবরূপ হলো এই ফিকহ। ফিকহ কুরআন ও হাদীসেরই বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা। ফিকহ ব্যতিরেকে কুরআন ও হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করা এবং তা বাস্তবায়ন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। মাসায়েলে গাইরে মানসূসাহ (مَسَائِلُ غَيْر مَنْصُوْصَةٌ) তথা যেসব বিষয়ের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা নেই সে সব বিষয়ের ক্ষেত্রে ফিকহের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতিরেকে কোনো গত্যন্তর নেই। এমন কি مَسَائِلُ مَنْصُوْصَةٌ [যেসব বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা আছে] -এর মধ্যেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফিকহের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আলেমগণ ফিকহের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তাতেও এ কথার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁরা বলেছেন, শরিয়তের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী শরিয়তের বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিকহ বলে। কাজেই ফিকহকে কুরআন ও হাদীস থেকে ভিন্ন কিছু ভাবার কোনো অবকাশ নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, দুধের মাঝে যেমন মাখন মিশে থাকে তেমনি কুরআন ও হাদীসের মাঝে ফিকহ মিশে ছিল। সুনিপুণ গোয়াল যেমন তার সাধনা ও মেহনতের দ্বারা মাখন ও দুধের অস্তিত্ব সকলকে বুঝিয়ে দেয় তেমনি ফকীহগণ কুরআন ও হাদীসে যেসব বিধি বিধান অন্তর্নিহিত ছিল দীর্ঘ সাধনা ও গবেষণা করে সেগুলোকেই তাঁরা উম্মতের সামনে বিধিবদ্ধ আকারে ফিকহের নামে পেশ করেছেন। অতএব, মূলত কুরআন ও হাদীসেরই সহজ রূপায়ণ হলো এই ফিকহ। কাজেই দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, ফিকহের উপর আমল করা মানে প্রকারান্তরে কুরআন ও হাদীসের উপরই আমল করা।

ফিকহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : ইলমুল ফিকহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ.

অর্থাৎ ঈমানদারদের প্রত্যেক জনপদ থেকে এক একটি ক্ষুদ্র দল কেন দীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে না? –[সূরা তাওবা– ১২২]

অন্যত্র আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন– وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا অর্থাৎ যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে অশেষ কল্যাণ দান করা হয়। –[সূরা বাকারা– ২৬৯]

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এখানে হিকমত (حِكْمَةٌ) দ্বারা ফিকহ (فِقْه) বুঝানো হয়েছে।

ইলমুল ফিকহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন– مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ
অর্থাৎ আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে দীন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দান করেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

অন্যত্র আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন– لِكُلِّ شَيْئٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ اَلْفِقْهُ

অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুরই খুঁটি রয়েছে, আর দীন ইসলামের খুঁটি হলো ফিকহ। –[বায়হাকী]

অপর হাদীসে আছে– فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْفِقْهِ لِلْاَدْيَانِ عِلْمُ الطِّبِّ لِلْاَبْدَانِ وَمَا وَرَاءَ ذٰلِكَ مَجْلِسُ اَبْلَةَ

অর্থাৎ শিক্ষা করার উপযোগী বিদ্যা হলো দুটি– ১. ইলমুল ফিকহ, যা দীন বুঝার জন্য অপরিহার্য এবং ২. চিকিৎসা বিদ্যা, যা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অপরিহার্য। এ দুটি ব্যতীত অন্যসব বিদ্যা হলো নির্বোধদের বৈঠক তথা মূল্যহীন বিদ্যা। কোনো একজন আরবি কবি বলেছেন–

تَفَقَّهْ فَاِنَّ الْفِقْهَ اَفْضَلُ قَائِدٍ * اِلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَاَعْدَلُ قَاصِدٍ
هُوَ الْعِلْمُ الْهَادِىْ اِلٰى سُنَنِ الْهُدٰى * هُوَ الْحِصْنُ يُنْجِىْ مِنْ جَمِيْعِ الشَّدَائِدِ ـ
فَاِنَّ فَقِيْهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا * اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ـ

অর্থ– ১. তুমি ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ কর। কেননা, ফিকহ সততা ও আল্লাহভীতির প্রতি সর্বোত্তম পরিচালক এবং ন্যায়নিষ্ঠ বার্তাবাহক বা সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক।

২. তা [ফিকহ] হেদায়েতের পথসমূহের পথনির্দেশকারী ঝাণ্ডা এবং তা এমন দুর্গ, যা সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে।

৩. কারণ একজন আল্লাহভীরু ফকীহ শয়তানের বিপক্ষে [ফকীহ নয় এমন] এক হাজার আবেদ থেকে কঠিন ও শক্তিশালী।

ইলমুল ফিকহের প্রয়োজনীয়তা : ইলমুল ফিকহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কুরআন ও সুন্নাহর পরই ফিকহের স্থান। 'শামী' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ আছে– اِنَّ الْاُمَّةَ الْاِسْلَامِيَّةَ لَا حَيَاةَ لَهَا بِدُوْنِ الْفِقْهِ اِذْ هُوَ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ "ফিকহ হলো মুসলিম উম্মাহর জীবন। ফিকহ ব্যতীত এ উম্মাহর জীবন বেঁচে থাকতে পারে না। কেননা, হালাল-হারাম বর্ণনার কেন্দ্রভূমিই হলো এই ফিকহ।" –[শামী : খ. ১ পৃ. ২২]

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেছেন, "কুরআন বুঝা হাদীস বুঝার উপর নির্ভরশীল। অনুরূপ হাদীস বুঝাও ফিকহ বুঝার উপর নির্ভরশীল।" এ কারণে ওহী নাজিলের কালেই কুরআন মাজীদে ফিকহ হাসিলের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অনুরূপ হাদীসেও এর প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে। দরসগাহে নববী থেকে তালীমপ্রাপ্ত হয়ে সাহাবায়ে কেরামও ফিকহ চর্চা এবং ইজতিহাদ করেছেন। বুখারী শরীফের এক হাদীসে বিবৃত হয়েছে যে, "খন্দক যুদ্ধের দিন [যুদ্ধ সমাপ্তির পর কতিপয় সাহাবীকে লক্ষ্য করে] নবী করীম ﷺ বলেছেন– لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلَّا فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ "বনী কুরায়যার মহল্লায় না পৌঁছে তোমাদের কেউ যেন আসরের নামাজ আদায় না করে।" পথিমধ্যে আসরের নামাজের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌঁছার পূর্বে নামাজ আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখানেই নামাজ আদায় করব। কেননা, নবী করীম ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় নামাজের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি নবী ﷺ -এর দরবারে উত্থাপিত হলে তিনি কোনো দলকেই তিরস্কার করেননি।"

–[বুখারী শরীফ খ.– ২ পৃ. ৫৯১]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, একদল সাহাবী নবী করীম ﷺ -এর বাণী– لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلَّا فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ -এর শব্দের উপর আমল করেছেন, আর অপর একদল সাহাবী উক্ত হুকুম থেকে এর عِلَّةٌ বের করে এ কথা বলেছেন যে, হুজুর ﷺ -এর উক্ত নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য হলো, দ্রুত বনী কুরায়যায় পৌঁছে যাওয়া, যাতে করে সেখানে গিয়ে আসরের নামাজ আদায় করা যায়। রাসূল ﷺ -এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় যে, রাস্তায় আসরের নামাজের সময় হলেও এখানে আসরের নামাজ আদায় করা যাবে না। তাই তাঁরা রাস্তায়ই নামাজ আদায় করে নিয়েছেন।

রাসূল ﷺ যখন হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের গভর্নর করে সেখানে পাঠান তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন– بِمَا تَقْضِىْ يَا مُعَاذُ "হে মুআয! তুমি কিসের ভিত্তিতে বিবাদের ফয়সালা করবে?" জবাবে তিনি বলেছেন– بِكِتَابِ اللّٰهِ "কুরআন মাজীদের ভিত্তিতে।" অতঃপর মহানবী ﷺ বললেন– فَاِنْ لَّمْ تَجِدْ "যদি সে ফয়সালাটি কুরআন মাজীদে না পাও তাহলে?" জবাবে তিনি বললেন– بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ "তাহলে রাসূল ﷺ -এর সুন্নতের ভিত্তিতে।" নবীজী ﷺ পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন– فَاِنْ لَّمْ تَجِدْ "যদি তাতেও তা না পাও তাহলে?" জবাবে তিনি বললেন– اَجْتَهِدُ بِرَأْيِىْ "তখন আমি আমার রায় দ্বারা ইজতিহাদ করব।" এ কথা শুনে রাসূল ﷺ খুশিতে বলে উঠলেন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِهٖ بِمَا يَرْضٰى بِهٖ رَسُوْلَهٗ "সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বনের তৌফিক দান করেছেন যে ব্যাপারে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট।" –[মুসনাদে আহমাদ]

উল্লিখিত উভয় হাদীস দ্বারা ফিকহের জরুরত স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। এ জাতীয় আরো অনেক দৃষ্টান্ত হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইসলামি শরিয়তে ফিকহ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা যেমন অনস্বীকার্য তেমনিভাবে ইসলামি জীবন যাপনের জন্যও ফিকহ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দৈনন্দিন জীবনে আমলের জন্য প্রয়োজনীয় ফিকহ শিক্ষা করা ফরজে আইন এবং ইলমুল ফিকহে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা ফরজে কেফায়া।

রাসূল ﷺ -এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যেসব সাহাবী ফিকহের ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত ওমর, হযরত আয়েশা, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত মুআয ইবনে জাবাল, হযরত জায়েদ ইবনে ছাবিত, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী, হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ।

প্রকাশ থাকে যে, রাসূল ﷺ -এর যুগে ফিকহ ছিল, ফিকহের চর্চাও ছিল। কিন্তু ফিকহ শাস্ত্রের বর্তমান রূপ ছিল না। তা ছাড়া ইসলামি আহকামের প্রকারভেদ তথা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব ইত্যাদি কোনো বিষয়ে তখন কোনোরূপ বিতর্কও হতো না; বরং কোনো বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে নবী করীম ﷺ তা সমাধান করে দিতেন বা কুরআন নাজিলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তা নিরসন করে দিতেন। তাই রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণের জীবনে সুসংহত অবয়বে স্বতন্ত্রভাবে কোনো ফিকহ শাস্ত্র প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয়নি এবং প্রণীতও হয়নি। রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের পর ইসলাম যখন দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে তখন বিভিন্ন তাহযীব-তমদ্দুনের মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বহু নিত্যনতুন সমস্যা দেখা দেয়। এসব সমস্যার সমাধানকল্পে কুরআন ও হাদীসের উপর নতুন আঙ্গিকে গবেষণা করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়। সে প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে কুরআন ও হাদীস মন্থন করে আমলী শরিয়তের যেসব বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয় তা-ই হলো ফিকহ। তা ছাড়াও আরো এমন কিছু সমস্যা রয়েছে, যা ফিকহ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাকে তীব্রতর করে তুলেছে। যেমন–

১. কুরআন ও হাদীসে মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিধিবিধান এতে নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কুরআন ও হাদীসে নামাজের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যদি কারো নামাজে ভুল হয় কিংবা কোনো আমল ছুটে যায় তাহলে এ কথা বলার কোনো উপায় নেই যে, তার উক্ত আমলের পর্যায়টি কি? এবং কিভাবে এর প্রতিকার করতে হবে? এ জাতীয় বিষয়ের স্পষ্ট সমাধান কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই, অথচ এ ধরনের সমস্যার সমাধানও আবশ্যক।

২. কুরআন মাজীদে কোনো কোনো বিষয়ে বাহ্যত বিপরীতমুখী দুই রকমের আয়াত রয়েছে। যেমন সূরা বাকারায় উল্লেখ রয়েছে– وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

আবার সূরা ত্বালাকের এক আয়াতে উল্লেখ আছে– وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

উপরিউক্ত আয়াত দুটিতে বাহ্যত বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথম আয়াত থেকে বুঝা যায়, যে মহিলার স্বামী মারা যাবে তার ইদ্দতকাল হবে চারমাস দশদিন। চাই সে গর্ভবতী হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায়, গর্ভবতী মহিলার ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। ফলে উপরিউক্ত আয়াত দুটি থেকে কোনো স্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এতদুভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা একান্ত জরুরি। কেননা, আল্লাহর কালামে বৈপরীত্য থাকতে পারে না। এ জাতীয় আরো অনেক কারণ রয়েছে।

ফকীহের পরিচয় : ওলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে ফকীহের পরিচয় দিয়েছেন। তন্মধ্যে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন–

اَلْفَقِيْهُ هُوَ الزَّاهِدُ فِى الدُّنْيَا الرَّاغِبُ فِى الْاٰخِرَةِ الْبَصِيْرُ بِدِيْنِهِ الْمُدَاوِمُ عَلٰى عِبَادَةِ رَبِّهٖ ـ

কোনো কোনো আলেম বলেন–

اَلْفَقِيْهُ هُوَ الَّذِىْ لَا يَخَافُ اِلَّا مِنْ مَوْلَاهُ وَلَا يُرَاقِبُ اِلَّا اِيَّاهُ وَلَا يَلْتَفِتُ اِلٰى مَا سِوَاهُ وَلَا يَرْجُوْا الْخَيْرَ مِنَ الْغَيْرِ وَيَطِيْرُ فِىْ طَلَبِهٖ طَيْرَانَ الطَّيْرِ ـ

"ফকীহ হলেন ঐ ব্যক্তি, যিনি তাঁর প্রভুকে ছাড়া কাউকে ভয় করেন না, তিনি ছাড়া কারো ধ্যান করেন না, তিনি ছাড়া কারো দিকে নিবিষ্ট হন না, তিনি ছাড়া কারো থেকে কল্যাণ প্রত্যাশী হন না এবং কল্যাণের সন্ধানে পাখির ন্যায় উড়ে বেড়ান।"

ইলমুল ফিকহের নামকরণ : বিধিবিধানমূলক বিষয়কে ইলমুল ফিকহ্ বলা হয়, যা আল্লাহ তা'আলার বাণী– لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ এবং রাসূল ﷺ -এর বাণী –مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো বুঝা। আর দীনি বুঝাই হলো সহীহ বুঝা।

কবির ভাষ্যে–

اِذَا مَا اعْتَزَّ ذُوْ عِلْمٍ بِعِلْمٍ ٭ فَعِلْمُ الْفِقْهِ اَوْلٰى بِاعْتِزَازٍ

فَكَمْ طِيْبٍ يَفُوْحُ وَلَا كَمِسْكٍ ٭ وَكَمْ طَيْرٍ يَطِيْرُ وَلَا كَبَازٍ ـ

১. যখনই জ্ঞানী জ্ঞানের কারণে সম্মানিত হয়েছে, ইলমে ফিকহ্ অর্জন করেই সম্মানিত হওয়া উচিত।

২. অনেক সুগন্ধি সুগন্ধ ছড়ায় তবে মৃগণাভির [সুগন্ধির] মতো নয়, আর অনেক পাখিই উড়ে, কিন্তু বাজপাখির মতো নয়।

ইলমুল ফিকহের সূচনা ও ক্রমবিকাশ : ইলমুল ফিকহের মূল উৎস হলো পবিত্র কুরআন ও হাদীস। এই দুই উৎসমূলের ভিত্তিতে কালপরিক্রমায় উদ্ভাবিত সমস্যাবলির যে সমাধান ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে করা হয়েছে তাও ইসলামি আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে স্বীকৃত। প্রণিধানযোগ্য যে, ইলমুল ফিকহের সূচনা এবং ফিকহের চর্চা ওহী নাজিলের সময়কাল থেকেই শুরু হয়েছে। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে এসে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।

পরবর্তীকালেও এর ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে। যুগ-জমানার ভিত্তিতে ফিকহের এ ক্রমবিকাশের ধারাকে আমরা ৬টি যুগে ভাগ করতে পারি। যথা–

১. **প্রথম যুগ :** রাসূল ﷺ -এর মুবারক যুগ, যা তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তি থেকে দশম হিজরি সন পর্যন্ত পরিব্যপ্ত।

২. **দ্বিতীয় যুগ :** কিবারে সাহাবা (كِبَارُ الصَّحَابَةِ) -এর যুগ। এই যুগ খোলাফায়ে রাশেদীনের সমাপ্তিলগ্নে এসে শেষ হয়েছে।

৩. **তৃতীয় যুগ :** সিগারে সাহাবা (صِغَارُ الصَّحَابَةِ) ও তাবেঈনে কেরামের যুগ। এ যুগ খোলাফায়ে রাশেদীনের সমাপ্তিকালের পর থেকে শুরু হয়ে হিজরি প্রথম শতকের শেষ সময় পর্যন্ত অথবা হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

৪. **চতুর্থ যুগ :** ফিকহ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ এবং ইলমুল ফিকহ এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করার যুগ। এ যুগেই ঐ সমস্ত মহান ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছেন, যাদের অবিস্মরণীয় ও অনবদ্য কীর্তি যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে আসছে এবং থাকবে। এ যুগে তাঁদের স্বনামধন্য শিষ্যবৃন্দও এ পৃথিবীতে এসে ফিকহ জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এ যুগ হিজরি তৃতীয় শতকের শেষলগ্ন পর্যন্ত অথবা চতুর্থ শতকের অর্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

৫. **পঞ্চম যুগ :** ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতা লাভ ও তাকলীদের যুগ এবং ইলমুল ফিকহ মুনাজারার আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হওয়ার যুগ। আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কুরআন ও হাদীস মন্থন করে যেসব মাসআলা-মাসায়েল উদ্ভাবন করেছেন এ যুগে এসে সেসব মাসায়েলের তাহকীক ও তাফতীশ-এর ব্যাপারে মুনাজারা এবং বাহাছ-বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। সর্বোপরি এ যুগেই সংকলিত হয়েছিল ফিকহ শাস্ত্রের উপর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বহু গ্রন্থ। আব্বাসী খেলাফতের যবনিকাপাত হওয়া এবং বাগদাদে তাঁতারীদের লোমহর্ষক আক্রমণ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এ যুগের বিস্তৃতি। অবশ্যই এ সময়ের পরও মিসরে এ যুগের কিছুটা বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয়।

৬. **ষষ্ঠ যুগ :** খালিস তাকলীদের যুগ। সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে এ যুগের সূচনা হয়। মূলত এ যুগে ইজতিহাদ করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া থেমে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট লোক সকলেরই ইমামগণের তাকলীদ করতে হয়। এ অবস্থা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

প্রথম যুগ : রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুবারক যুগ

এ যুগের সূচনা হয় হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তপ্রাপ্তির পর থেকে। আর শেষ হয় দশম হিজরি সনে গিয়ে। তাঁর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে। এ সময়ে যাবতীয় বিষয়ই রাসূল ﷺ -এর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আইন প্রণয়ন ও উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত ফতোয়া, ফারায়েয, দীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সব ওহীর মাধ্যমে তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। সে সময় স্বতন্ত্র ফিকহ শাস্ত্র প্রণয়নের কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। এ সময় ইসলামি ফিকহের উৎস ছিল মাত্র দুটি– ১. কুরআনুল কারীম ২. রাসূল ﷺ -এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। অর্থাৎ তাঁর হাদীস। উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা রাসূল ﷺ এমন সহজ ও সরলভাবে বর্ণনা করতেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কুরআনের বিধান এবং রাসূল ﷺ-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে কোনো দ্বিমতের অবতারণা হতো না। এমনিভাবে এ নিয়ে তাঁদের মাঝে কোনো প্রকার ভুল বুঝাবুঝির এবং বিরোধের সামান্যতম সম্ভাবনাও দেখা দিত না। কুরআন মাজীদে ফিকহের যে সমাধান পেশ করা হয়েছে এর কয়েকটি তো এমন যা সমাজে অনুপ্রবিষ্ট ফাসেদ আমল এবং বাতিল চিন্তা-ভাবনা মূলোৎপাটনের নিমিত্তে নাজিল করা হয়েছে। কতেক আয়াত এমন যা কারো

প্রশ্নের জবাবে নাজিল করা হয়েছে। আবার কতেক আয়াত এমনও আছে যা কারো প্রশ্নের জবাবে নাজিল করা হয়নি, বরং এমনিই নাজিল করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সবের কিছু উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. হজ এবং ওমরার সময় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ নিয়মে দৌড়ানো [সা'য়ী] ওয়াজিব। এভাবে দৌড়ানোর নিয়ম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সময় থেকে চলে এসেছে। মুশরিকরা হজ ও ওমরার অনুষ্ঠানাদিতে শিরক ও বিদআতের প্রবর্তন করেছিল। তারা এ পাহাড়দ্বয়ে দেবমূর্তি স্থাপন করে সাঈর সময়ে এগুলোকে প্রদক্ষিণ করত। এ কারণে কোনো কোনো সাহাবী বিশেষত আনসারদের অনেকে সেখানে সাঈ করাকে গুনাহের কাজ বলে মনে করতেন। এ ভুল আকিদার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল করেন–

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ -

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কাবাগৃহের হজ কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে এ দুটির মধ্যে সা'য়ী করবে তার কোনো পাপ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ তো পুরস্কার দাতা ও সর্বজ্ঞ। –[সূরা বাকারা : ১৫৮]

২. হজের সময় আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরজ। তা সত্ত্বেও কুরাইশগণ আভিজাত্যের অন্ধ অহমিকায় মক্কার সীমার বাইরে অবস্থিত আরাফাতের ময়দানের পরিবর্তে মুজদালিফা উপত্যকায় নবম তারিখের উকূফ আদায় করত। নিম্নোক্ত আয়াতে এরূপ অহমিকা পরিহার করে সকলের সাথে আরাফায় অবস্থান করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন কর। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" –[সূরা বাকারা : ১৯৯]

৩. ইহুদিদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ ইহুদি ধর্মের কোনো কোনো কাজ পূর্ববৎ করতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ - اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা বাকারা : ২০৮]

উপরিউক্ত আয়াত তিনটিতে সমাজে অনুপ্রবিষ্ট ফাসেদ আমল এবং বাতিল আকিদার মূলোৎপাটন করে সহীহ আকিদা এবং বিশুদ্ধ আমলের তা'লীম প্রদান করা হয়েছে। এভাবে বহু আয়াতে শরিয়তের বিভিন্ন বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবেও আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন বিধিবিধান সংবলিত আয়াত নাজিল করেছেন।

দ্বিতীয় যুগ : কিবারে সাহাবায়ে কেরামের যুগ

রাসূল ﷺ -এর তিরোধানের পর একাদশ হিজরি সন থেকে এ যুগের সূচনা হয় এবং তা শেষ হয় ৪০ হিজরি সনে গিয়ে। আর এ সময়েই খেলাফতে রাশেদারও পরিসমাপ্তি ঘটে। খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগে বিভিন্ন দেশ জয় এবং নানা প্রকার সামাজিকতার সংস্পর্শে আসার কারণে মুসলিম সমাজে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে থাকে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন ও হাদীস ছাড়া আরো দুটি উপায় অবলম্বন করা হয়। যথা–

১. সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগে যদি মুসলিম সমাজে কোনো সমস্যা দেখা দিত তাহলে তা সমাধানের জন্য প্রথমে তারা কুরআন ও হাদীসের সিদ্ধান্ত তালাশ করতেন। যদি উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদীসে না পাওয়া যেত তাহলে সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শের ভিত্তিতে একমত হয়ে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। একে ইজমায়ে সাহাবা বলা হয়। এটিই হলো ইজমার গ্রহণযোগ্যতার মূল ভিত্তি। এরই ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে ইজমা ইসলামি আইনের তৃতীয় উৎস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

২. বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত অভিমত। এ যুগে উদ্ভূত যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীসে সরাসরি পাওয়া যেত না এবং যার সমাধানকল্পে সাহাবায়ে কেরামও সম্মিলিতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি, বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম এমন কিছু সমস্যার সমাধানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভিমত পেশ করেছেন। একেই কিয়াসের ভিত্তি বলা হয়। পরবর্তীতে এটাই ইসলামি আইনের চতুর্থ উৎস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

তৃতীয় যুগ : সিগারে সাহাবা ও তাবেয়ীনে কেরামের যুগ

এ যুগ খোলাফায়ে রাশেদীনের সমাপ্তিকালের পর হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর শাসনকাল তথা একচল্লিশ হিজরি সন থেকে শুরু হয়ে হিজরি প্রথম শতকের শেষ পর্যন্ত অথবা হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে শরিয়তের হুকুম-আহকাম সুবিন্যস্ত করার তথা ফিকহ শাস্ত্র সংকলন করার প্রয়োজনীয়তা চরমভাবে দেখা দেয়। এর কারণ অনেক। নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো–

১. এ সময় যে সকল সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন, তাদের অনেকেই ইসলামি খেলাফতের বিশাল সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েন। অপর দিকে এককভাবে কোনো সাহাবীর পক্ষে রাসূল ﷺ -এর সকল হাদীস জানা সম্ভব ছিল না। তাই নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তাঁরা নিজ নিজ রায় মোতাবেক দিতে বাধ্য হলেন। এভাবে সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবায়ে কেরামের রায়ও বিভিন্ন রূপ হতে থাকে।

২. রাজনৈতিক কারণে এ সময়ে যেসব চরমপন্থি ও বিপথগামী যেমন– শিয়া, খারিজী ইত্যাদি ফিরকার উদ্ভব ঘটে, তাঁরা নিজ নিজ আকিদা অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দিতে থাকার কারণেও মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দেয়।

৩. অনারব লোকদের বিপুল পরিমাণে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া এবং তাদেরও লেখাপড়া, ফতোয়া, ফারায়েযের কাজে অংশ গ্রহণ করা। এ কারণেও ফতোয়ার মাঝে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

৪. এ সময় ইসলাম বিদ্বেষী এবং স্বার্থান্বেষী লোকদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে রচিত জাল হাদীসও মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে। এসব বানোয়াট এবং জাল হাদীসের কারণেও মাসআলা-মাসায়েলের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

৫. আহলে হাদীস এবং আহলে রায় এ দুই সম্প্রদায়ের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ আহলে হাদীস সম্প্রদায় যদি কুরআন ও হাদীসে কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেতেন তখন তারা এ ব্যাপারে কিয়াস ও ইজতিহাদের আলোকে রায় প্রদান করা থেকে বিরত থাকতেন। পক্ষান্তরে আহলে রায় তথা ওলামায়ে মুজতাহিদীন যদি কুরআন ও হাদীসে কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেতেন, তখন তাঁরা কিয়াস ও ইজতিহাদের আলোকে নিজস্ব রায় অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করতেন। এতে ঐ দুই সম্প্রদায়ের মাঝে মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। উল্লিখিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে ইসলামের হেফাজতের লক্ষ্যে শরিয়তের হুকুম-আহকামকে সুবিন্যস্ত করা অর্থাৎ ফিকহ ও উসূলে ফিকহ প্রণয়ন ও সংকলন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ

তৃতীয় যুগে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন শহরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফতোয়া প্রদানের জন্য কতিপয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত কেন্দ্রসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– ১. মদিনা মুনাওয়ারা ২. মক্কা মুকাররামা ৩. কুফা ৪. বসরা ৫. শাম [সিরিয়া] ৬. মিসর ও ৭. ইয়েমেন। এই কেন্দ্রসমূহে যে সকল মুফতি ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন, পর্যায়ক্রমে তাদের আলোচনা তুলে ধরা হলো–

মদিনা শরীফ : রাসূল ﷺ -এর যুগ থেকে হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত মদিনা শরীফ ছিল মুসলিম জাহানের ফতোয়া প্রদানের বিশেষ কেন্দ্র। এ সময় আমীরুল মু'মিনীনগণ সহ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.), হযরত জায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.), হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.), হযরত ইবনে ওমর (রা.), হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.), হযরত আবূ দারদা (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত মুআবিয়া (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। ড. আল্লামা খালেদ মাহমূদ বলেন, কমবেশি সকল সাহাবীই ফকীহ ছিলেন। তবে উচ্চমানের ফকীহ তাঁদের মধ্যে ৪০/৫০ জনের অধিক ছিল না। হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (র.)-এর মতে, ফতোয়া প্রদানকারী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ১৩০ থেকে কিছু বেশি ছিল। –[আসারুল ফিকহিল ইসলামী খ.– ১ পৃ. ২০৩-২৪৪]

মদিনা শরীফে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাবেয়ীগণের মধ্যে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাদের অন্যতম হলেন হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.), হযরত ওরওয়া ইবনে জুবায়ের আসাদী (র.), হযরত আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারিছ ইবনে হিশাম মাখযূমী (র.), হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আবী তালিব হাশেমী (র.), হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ (র.), হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (র.), হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (র.), হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর (র.), হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে জুহরী (র.), আবুজ জিনাদ আব্দুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান (র.), হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী (র.) ও হযরত রাবীআ ইবনে আবী আবদির রহমান (র.) প্রমুখ তাবেয়ীনে কেরাম। –[তারীখে ফিকহে ইসলামী]

মক্কা মুকাররামা : মককা বিজয়ের পর রাসূল ﷺ কিছুদিনের জন্য হযরত মু'আয (রা.)-কে সেখানকার মুআল্লিম ও মুফতি নিয়োগ করেছিলেন। এ ছাড়াও মক্কা মুকাররামায় আরো পাঁচ মুফতি ফতোয়া প্রদানের কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মধ্যে একজন সাহাবী এবং বাকি চারজন তাবেয়ী। সাহাবী হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং তাবেয়ী হলেন হযরত মুজাহিদ ইবনে জুবায়ের (র.), হযরত ইকরামা (র.), হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.) এবং হযরত আবুয যুবায়ের মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (র.)।

কুফা [ইরাক] : দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশে ইরাক এলাকায় কুফা ও বসরা নামে দুটি নতুন শহরের গোড়াপত্তন হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত এ নতুন শহরে বসবাস আরম্ভ করলে খলিফা হযরত ওমর (রা.) ফকীহুল উম্মত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে কুফায় মুআল্লিম, মুফতি এবং প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেন। সেখানে তাঁর দশ বছর অবস্থানকালে স্থানীয় জ্ঞানপিপাসু সবাই তাঁর সান্নিধ্যে এসে জ্ঞানপিপাসা নিবারণের মহা সুযোগ লাভ করেন। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর শাসন আমলে ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল কুফা। হযরত আলী (রা.) ছিলেন রাসূল ﷺ -এর যুগ থেকে ফকীহ সাহাবীগণের মাঝে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এ দুই বরেণ্য ব্যক্তি এবং তাঁদের শিক্ষাধারার মাধ্যমে এখানে ইলমে দীনের চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ফলে কুফা ইলম নগরীর রূপ পরিগ্রহ করে। এরই ফলশ্রুতিতে এখানকার বহু মুজতাহিদ এবং তাবেয়ীনে কেরাম বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী অবদান রেখে খ্যাতির শীর্ষ চূড়ায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত আলকামা ইবনে কায়স নাখ'য়ী (র.), হযরত মাসরূক ইবনে আজদা হামদানী (র.), হযরত ওবায়দা ইবনে আমর সালমানী (র.), হযরত আসওয়াদ ইবনে

ইয়াজীদ নাখ'য়ী (র.), হযরত শুরাইহ ইবনে হারিস কিনদী (র.), হযরত ইবরাহীম ইবনে ইয়াজীদ নাখ'য়ী (র.), হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) ও হযরত আমর ইবনে শুরাহবীল শা'বী (র.) প্রমুখ।

বসরা : বসরায় অবস্থানকারী সাহাবী ও তাবেয়ীগণ ফতোয়ার কাজে বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালেক আনসারী (রা.), হযরত আবুল আলিয়া রাফি ইবনে মিহরান (র.), হযরত হাসান ইবনে আবুল হাসান সায়্যার (র.), হযরত আবুশ শা'ছা জাবের ইবনে জায়েদ (র.), হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) এবং হযরত কাতাদা ইবনে দা'আমা দূসী (র.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শাম [সিরিয়া] : দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফতকালে হযরত মু'আয, ওবাদাহ ইবনে সামিত এবং হযরত আবুদ দারদা (রা.)-কে সিরিয়ার মুআল্লিম ও মুফতি হিসেবে নিয়োগ দান করেছিলেন। পরবর্তীতে যে সকল তাবেয়ী এ দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গানাম আশ'আরী (র.), হযরত আবূ ইদরীস খাওলানী (র.), হযরত কাবীসা ইবনে যুওয়াইব (র.), হযরত মাকহুল ইবনে আবূ মুসলিম (র.), হযরত রাজা ইবনে হায়ওয়া (র.) এবং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) প্রমুখ।

মিসর : মিসরে আগত সাহাবীগণের মাঝে প্রধান ফকীহ ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)। আর তাবেয়ীদের মাঝে দু'জন সেখানে ফকীহ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁরা হলেন হযরত আবুল খায়ের মরসিদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) এবং হযরত ইয়াজীদ ইবনে আবী হাবীব (র.)।

ইয়েমেন : রাসূল ﷺ কিছুদিনের জন্য ইয়েমেনে হযরত আলী (রা.)-কে প্রশাসক হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। এরপর সেখানে আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-কে আমীর ও মুআল্লিম হিসেবে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তাবেয়ীগণের মধ্যে হযরত তাঊস ইবনে কায়সান (র.), হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) এবং হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাসীব (র.) সেখানে ফকীহ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

চতুর্থ যুগ : ফিকহ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ এবং ইলমে ফিকহ এক স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করার যুগ

এ যুগেই ঐ সকল মহান ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছেন যাঁদের অনবদ্য কীর্তি যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে আসছে ও থাকবে। এ যুগে তাঁদের স্বনামধন্য শিষ্যবৃন্দও পৃথিবীতে এসে ফিকহ জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এ যুগ হিজরি তৃতীয় শতকের শেষলগ্ন পর্যন্ত অথবা চতুর্থ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

উল্লেখ্য যে, এ যুগেই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) তাঁর সহযোগী ও শিষ্য-শাগরিদগণের সহায়তায় ফিকহের নিয়মতান্ত্রিক সংকলন শুরু করেন এবং তিনি বেঁচে থাকতেই এর সম্পাদনা পূর্ণাঙ্গ করেন। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ইমামগণও নিয়মিতভাবে ইলমে ফিকহ গ্রন্থাকারে রচনা ও প্রকাশ করেন এবং মুসলিম উম্মাহ ব্যাপকভাবে তা অনুসরণ করতে থাকে। বিচারক এবং কাজীগণ ঐ ফিকহের অনুসরণে মুকাদ্দমার ফয়সালা দিতে থাকেন। মুসলিম জনতা ইমামগণের তাকলীদ করতে থাকেন। অবশ্য ইজতিহাদ প্রক্রিয়াও তখন নিজ গতিতে চলতে থাকে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামদের শিষ্যবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ উস্তাদগণের সম্পাদিত ফিকহের প্রচার-প্রসারে ব্রতী হন। তাঁদের অভিমতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং তাদের উদ্ভাবিত মূলনীতির আলোকে নতুন নতুন মাসআলার জবাব দিতে থাকেন। উসূলে ফিকহও এ যুগে বিধিবদ্ধ হতে থাকে।

সে সময় কুফাতে হযরত সুফইয়ান সাওরী (র.), হযরত শরীফ ইবনে আব্দুল্লাহ নাখ'য়ী (র.) এবং মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা (র.)–ও কুফাতে অনেক বড় ফকীহ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ইমাম আবূ

হানীফা (র.)-এর শিষ্যরাও তখন ইজতিহাদ ও মাসায়েল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম (র.), ইমাম জুফার (র.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (র.) ও ইমাম হাসান ইবনে জিয়াদ (র.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফিকহে হানাফী ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি সম্পর্কিত হলেও বাস্তবে তা তাঁর মাধ্যমে এবং তাঁর এই চার শাগরিদের মাধ্যমেই দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই ইমাম আবূ হানীফা এবং এই চার ইমামের রায়ের সমষ্টির নামই ফিকহে হানাফী। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর আরো অগণিত শাগরিদ রয়েছেন, যারা তাঁর নীতি ও নির্দেশনা মোতাবেক কিতাব প্রণয়ন করেছেন।

চতুর্থ যুগের বড় ফকীহদের মধ্যে ইমাম মালেক (র.) ও তাঁর শিষ্য তথা আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব ইবনে মুসলিম করাশী (র.), আবূ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম আতাকী (র.), মাশহাব ইবনে আব্দুল আযীয আল কায়সী আল আমিরী আল জা'দী (র.), আবূ আব্দুল্লাহ জিয়াদ ইবনে আব্দুর রহমান কুরতুবী (র.), ঈসা ইবনে দীনার উন্দুলুসী (র.) প্রমুখ ফকীহগণ রয়েছেন।

অনুরূপ চতুর্থ যুগের বড় বড় ফকীহদের মধ্যে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর শিষ্যগণ তথা আবূ সাওব ইবরাহীম ইবনে খালিদ ইবনে ইয়ামান আল-কালবী আল-বাগদাদী (র.)।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ আজ-জাফরানী আল-বাগদাদী (র.), আবূ আলী হুসাইন ইবনে আলী আলকারাবীসী (র.), আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল আযীয আল-বাগদাদী (র.) এবং আবূ ওসমান ইবনে সাঈদ আনমাতী (র.) প্রমুখ ফকীহগণ আছেন।

চতুর্থ যুগের বড় বড় ফকীহদের মাঝে আরো রয়েছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ও তাঁর শিষ্য আবূ বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হানী ওরফে আসরম (র.), ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ওরফে ইবনে রাহওয়াইহ (র.), আহমদ ইবনে হাজ্জাজ মিরওয়াযী (র.), আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) প্রমুখ।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ চার ফকীহ ইমাম [ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)]-এর পরিচয়, ফিকহী মতাদর্শ [মাযহাব] ও এ ক্ষেত্রে তাঁদের গৃহীত নীতিমালা-এর আলোচনা মাযহাব চতুষ্টয়ের আওতায় করা হবে ইনশাআল্লাহ।

পঞ্চম যুগ : ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণতা, তাকলীদ ও ইলমে ফিকহ মুনাজারার বিষয়ে পরিণত হওয়ার যুগ

এ যুগ হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হয়ে হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে এসে সমাপ্ত হয়। এ যুগ হচ্ছে ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতার যুগ, তাকলীদের যুগ। সর্বোপরি এ যুগ হচ্ছে ইলমে ফিকহ মুনাজারার বিষয়ে পরিণত হওয়ার যুগ। এ সময়ে ব্যাপকভাবে ইজতিহাদ করা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ওলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলেই বিশিষ্ট ইমামগণের তাকলীদ করতে থাকে এবং তাঁদের ফিকহী মতাদর্শের ভিত্তিতে কিতাব লিখতে শুরু করেন। আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কুরআন ও হাদীস মন্থন করে যেসব মাসআলা-মাসায়েলে উদ্ভাবন করেছিলেন, এ সময়ে এসে সে সব মাসায়েলের তাহকীক-তাফতীশ তথা বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও সমর্থনের পক্ষে-বিপক্ষে মুনাজারা এবং বাহাছ-বিতর্কের সূচনা হয়। চার ইমাম তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালেক (র.) এবং আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর তাকলীদ করার উপর মুসলিম উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) বলেন, মাযহাব অবলম্বনের ক্ষেত্রে এ চারটির মধ্যে সীমিত থাকার উপযোগিতা ও বাস্তবতা অনস্বীকার্য। এর ব্যতিক্রম হলে সমূহ বিশৃঙ্খলা ও ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এর কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ–

১. মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে ইজমা তথা ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, শরিয়তের পরিচিতি লাভের জন্য পূর্বসূরি সালাফে সালিহীনের অনুসরণ করতে হবে। আর প্রতিষ্ঠিত এ চার মাযহাবের মধ্যে যেহেতু পূর্বসূরি মুজতাহিদীনের গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা ও অভিমত বিশুদ্ধভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, তাই এর অনুসরণ অপরিহার্য।

২. হাদীস শরীফে আছে, বৃহত্তম মুসলিম জামাতের অনুসরণ করবে। যেহেতু পূর্বেকার অন্যান্য মাযহাবের ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত হয়ে মাযহাব কেবল চারটিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং বিশ্বমুসলিম এরই অনুসরণ করেছে, তাই এখন আর এর ব্যতিক্রম করার কোনো অবকাশ নেই।

৩. খায়রুল কুরূন তথা উত্তম যুগ থেকে যেহেতু সময়ের ব্যবধান দীর্ঘতর হয়েছে, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার চরম অভাব দেখা দিয়েছে এবং কার মাঝে ইজতিহাদের শর্তাবলি বিদ্যমান আছে, তা যাচাই করে দেখাও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ এই চার মাযহাবের অনুসরণ করাই অপরিহার্য।

৬ষ্ঠ যুগ : খালিস তাকলীদের যুগ

সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে এ যুগের সূচনা হয়। মূলত এ যুগে ইজতিহাদ করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া থেমে যায়। ফলে ওলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ জনগণ সকলকেই ইমামগণের তাকলীদ করতে হয়। এমন কি মাসআলার ব্যাখ্যা এবং অনুশীলনেরও এখন খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। কেননা, চতুর্থ ও পঞ্চম যুগের ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকহ শাস্ত্র তৈরি করে গিয়েছেন যার মধ্যে মানবজীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। আমার- আপনার চোখে সমস্যা যত নতুন বলেই দৃষ্ট হোক না কেন সমস্ত সমস্যারই সমাধান ফুকাহায়ে কেরামের রচিত কিতাবে রয়েছে। সেসব কিতাবে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা উদ্ভব হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এখনো তা সংঘটিত হয়নি। তাতে এমন খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধানও রয়েছে যা এখনো অলীক এবং কল্পনা বলে মনে হয়, কিন্তু কালের বিবর্তনে হয়ত কোনো সময় সেসব সমস্যারও উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবসমূহেই পাওয়া যাবে, নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না। বস্তুত এটি হচ্ছে ইসলামের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য যা মূলত إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক] এ ঘোষণারই বাস্তব প্রতিফলন। অতএব, এখন ইজতিহাদ করার অর্থ হলো, জ্ঞাত জিনিসকে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয়, যা সমাধানের উপলক্ষ সে যুগের কিতাবসমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই, তবে অবশ্যই ইজতিহাদ করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দরজা চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। তবে তা মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতে করতে হবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই। মোদ্দাকথা, ইসলামে যেমনিভাবে ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ নয় তেমনিভাবে বল্গাহীন ইজতিহাদেরও এতে কোনো সুযোগ নেই। এ যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলেমই ইজতিহাদের দরজায় পৌঁছেছিলেন। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমার্ধের দিকে। যেমন– হানাফী মাযহাবে আল্লামা কামাল ইবনে হুমাম (র.), আল্লামা জালালুদ্দীন যায়লায়ী (র.) এবং আল্লামা কামাল ইবনে পাশা (র.) প্রমুখ। মালেকী মাযহাবে আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ (র.), শাফেয়ী মাযহাবে আল্লামা ইজ্জুদ্দীন আব্দুস সালাম (র.), শায়খ তাকীউদ্দীন সুবকী (র.), আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) ও শায়খ জালালুদ্দীন মহল্লী প্রমুখ। হাম্বলী মাযহাবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র.) প্রমুখ। তাঁরা নিজ নিজ ইমামদের মূলনীতি অনুসারে কিতাবাদি রচনা করে ফিকহের ক্রমবিকাশের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

এ যুগে পাক-ভারত উপমহাদেশেও ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশে ফুকাহায়ে কেরাম বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁরা ফিকহের দরস দিয়ে, মাসায়েলের মজলিস করে এবং এর উপর কিতাব লিখে যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তা থেকে মুসলিম সমাজ চিরকাল উপকৃত হতে থাকবে। তাঁদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন শায়খ

নিজামুদ্দীন (র.), শায়খ ইয়াহইয়া মুনীরী (র.), শায়খ ইমামুদ্দীন দেহলবী (র.), শায়খ আলম ইবনে আলায়া আন্দরপতী (র.), শায়খ আবুল ফাতাহ রোকন (র.), শায়খ ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ মুলতানী (র.), শায়খ ইফতিখার উদ্দীন গিলানী (র.), মাওলানা হাদ্দাদ জৌনপুরী (র.), হযরত শাহ বাকীবিল্লাহ (র.), হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.), হযরত মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.), বাদশাহ আলমগীর (র.), শায়খ মোল্লাজিউন (র.), মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী (র.), বাহরুল উলূম মাওঃ আব্দুল আলী ইবনে নিজামুদ্দীন ইবনে কতুবুদ্দীন (র.), ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.), শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.), কাজী সানাউল্লাহ পানীপতী (র.), মাওলানা আব্দুল হাই দেহলবী (র.), মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান ইবনে মসীহুজ্জামান দেহলবী (র.), শাহ আহলুল্লাহ দেহলবী (র.), মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (র.), মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (র.), মুফতি আযীযুর রহমান (র.), শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র.), মাওলানা ই'যায আলী (র.), মুফতি কেফায়েতুল্লাহ (র.), হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.), মুফতি মাহমূদ হাসান গাংগুহী (র.), মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.), আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (র.), মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী (র.), মাওলানা জা'ফর আহমদ ওসমানী (র.), শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র.), হাজী শরীয়তুল্লাহ (র.), মাওঃ হাফেজ আব্দুল আউয়াল জৈনপুরী (র.), মুহিউস সুন্নাহ মাওঃ মুফতি মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ (র.), মুফতি দীন মুহাম্মদ খান (র.), মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী (র.) ও মুফতি আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বরকতী (র.) প্রমুখ।

ফিকহ চতুষ্টয়ের সূচনা ও বিকাশ

প্রাককথা : রাসূল ﷺ -এর যুগেই ফিকহের সূচনা হয়। তবে ফিকহ প্রণয়ন ও সংকলনের কাজ হিজরি প্রথম শতকে শুরু হলেও তা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতকে এসে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে এবং পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। যেসব মুজতাহিদীনে কেরামের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফিকহ স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে, যাঁরা জীবনব্যাপী সাধনা করে মুসলিম জীবনের সকল দিকের জন্য ইসলামি শরিয়তের সুবিন্যস্ত আইন-কানুন ও বিধিবিধান পেশ করেন– তাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অবদান অনবদ্য ও অবিস্মরণীয়। মূলত দীনের হেফাজতের লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে এ জাতীয় অবিস্মরণীয় খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক ও যোগ্যতা দান করেছেন। ফিকহ রচনা, এর প্রচারণা এবং বিকাশে তাঁদের যে ইখলাস, লিল্লাহিয়াত ও ঐকান্তিকতা, সেগুলোর তার কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে চির অমর করে রাখার নিমিত্তে তাঁদের ফিকহ তথা মাযহাবকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কবুল করে নিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ইমাম চতুষ্টয়ের তাকলীদ করার উপর। অবশ্য মাযহাব চতুষ্টয় ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করার পূর্বে কিছুকাল পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ফকীহগণের মাযহাবও প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। যেমন– ইমাম সুফইয়ান ছাওরী (র.), ইমাম হাসান বসরী (র.) ও ইমাম আওযা'য়ী (র.)-এর মাযহাব। তৎকালীন যুগে মুসলিম জনগণ তাদেরও অনুসরণ করতেন। এ তিনটি মাযহাব হিজরি তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল। এরপর তাদের মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যায়। তা ছাড়া আবূ সাওর (র.)-এর মাযহাবও হিজরি তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত চালু থেকে পরে বন্ধ হয়ে যায়। তবে ইমাম দাঊদ জাহিরী (র.)-এর মাযহাব প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদূন (র.)-এর মতে, হিজরি ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল বলে জানা যায়। এতদ্ভিন্ন ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ (র.), সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না (র.) এবং লাইছ ইবনে সা'দ (র.)-এর মাযহাব কিছুকাল চালু ছিল। পরবর্তীতে এগুলোর চর্চা ও অনুসরণ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবই অবশিষ্ট থেকে যায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা বাকি থাকবে ইনশাআল্লাহ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমগণ উপরিউক্ত মাযহাব চতুষ্টয়ের যে কোনো একটির অনুসরণ বা তাকলীদ করাকে অপরিহার্য বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন।

–[আইম্মায়ে আরবা' : ১৯-২০] ফিকহে হানাফীর উৎপত্তি ও বিকাশের উপর যেহেতু স্বতন্ত্র শিরোনামে আলোচনা হবে তাই এখানে শুধুমাত্র ফিকহত্রয় সম্পর্কেই আলোচনা পেশ করা হলো।

ফিকহে মালেকী : ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র.) এ ফিকহের প্রবর্তক। মদিনা শরীফ থেকে এ ফিকহের সূচনা হয়। তারপর হিজাযের বিভিন্ন এলাকায় তা প্রসার লাভ করে। এরপর বসরা, মিসর, আফ্রিকা, স্পেন, সুদান, খুরাসান, কাযবীন, আযহার, ইয়েমেন, নিশাপুর, পারস্য, রোম, সিরিয়া প্রভৃতি শহরে তা বিস্তৃত হয়। ফকীহ আব্দুর রহীম ইবনে মালেক (র.) মিসরে সর্বপ্রথম ফিকহে মালেকীর প্রচলন করেন। এরপর আব্দুর রহমান ইবনে কাসিম (র.) এর ব্যাপক প্রচার করেন। সে সময় ইমাম মালেক (র.)-এর বহু শাগরিদ মিসরে বিদ্যমান থাকায় সেখানে মালেকী ফিক্‌হ যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। মালেকী ফিকহের অনুসারী আমীর এবং কাজীদের মাধ্যমেও পশ্চিম আফ্রিকায় এ মাযহাবের বিশেষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী (র.) "আল-ইকদুছ ছামীন" নামক গ্রন্থে লিখেন, নবম শতাব্দীতে পশ্চিমা দেশসমূহের অধিকাংশ মুসলমান ফিকহে মালেকীর অনুসারী ছিল। স্পেনে প্রথমে ইমাম আওযা'য়ী (র.)-এর মাযহাব প্রচলিত ছিল, কিন্তু তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর সেখানে ফিকহে মালেকীর প্রসার ঘটে। ইমাম মালেক (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ যায়েদ ইবনে আব্দুর রহমান, গাজী ইবনে কায়স, ইয়াহইয়া ইবনে কায়স, ইয়াইয়া ইবনে ইয়াহইয়া প্রমুখ ফুকাহায়ে কেরাম মদিনা থেকে স্পেনে এসে সেখানে মালেকী মাযহাবের প্রচার ও প্রসার করেন। স্পেনের বিশিষ্ট খলিফা হিশাম ইবনে আব্দুর রহমান ফিকহে মালেকীর অনুসরণ করার জন্য দেশময় নির্দেশ জারি করেন। খলিফা হিশাম ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়াকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কাজী নিয়োগ করতেন। এছাড়া অন্যান্য সরকারি পদে লোক নিয়োগের ব্যাপারেও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এসব কারণে স্পেনে ফিকহে মালেকীর সম্প্রসার ঘটে খুব বেশি।

মালেকী ফিকহ সংকলনে গৃহীত নীতিমালা : ফিকহ সংকলন ও ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে ইমাম মালেক (র.)-এর মূলনীতি ছিল, প্রথমে তিনি কুরআন মাজীদের উপর অতঃপর রাসূল ﷺ -এর সমস্ত হাদীস যেগুলোকে তিনি বিশুদ্ধ মনে করতেন সেগুলোর উপর নির্ভর করতেন। তাঁর মতে, হিজাযে প্রবীণতম ও শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসগণই ছিলেন শুদ্ধাশুদ্ধির মাপকাঠি। মদিনাবাসীদের আমল, তাঁদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক প্রথাকেও তিনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। মদিনাবাসীগণ আমল করেননি বলে তিনি অনেক বিশুদ্ধ হাদীসও গ্রহণ করেননি। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে تَعَامُلُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ অর্থাৎ মদিনাবাসীদের আমলও ফিকহ শাস্ত্রের অন্যতম উৎস। মদিনাবাসীর আমল এবং ইজমা-এর পরই কিয়াসের স্থান, কিন্তু হানাফী মাযহাবের মতো তাঁর মাযহাবে কিয়াসের তত আধিক্য নেই। অবশ্য হানাফী মাযহাবের ইস্‌তিহসান (اِسْتِحْسَانٌ) -এর মতো মালেকী মাযহাবেও مَصَالِحُ مُرْسَلَةٌ তথা ইস্তিসলাহ (اِسْتِصْلَاحٌ) -এর উপর আমল করা হয়। اِسْتِصْلَاحٌ -এর মর্ম হলো এমন মাসলাহাত [কল্যাণ], যা দ্বারা শরিয়তসম্মত এমন উদ্দেশ্যের হেফাজত করা হয় যার শরিয়তসম্মত হওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার সমষ্টিগত হুকুম দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। তবে এ ব্যাপারে সরাসরি শরিয়তে কোনো প্রমাণ নেই। যেমন এর বাতুলতার ব্যাপারেও কোনো প্রমাণ নেই; বরং কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার সমষ্টিগত হুকুম দ্বারা এর শরিয়তসম্মত হওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, এ اِسْتِصْلَاحٌ-এর উপর আমল করা জায়েজ। অবশ্য যদি কোনো জায়গায় এর বিপক্ষে শরিয়তের কোনো নস [কুরআন বা হাদীস] বা কিয়াস আছে বলে প্রমাণ হয়, তবেই এর উপর আমল করার বিষয়টি বিতর্কিত হয়ে যাবে। ইমাম গাযালী (র.) তাঁর মুস্তাসফা (مُسْتَصْفَى) নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মোদ্দাকথা হলো, ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ফিকহ শাস্ত্রের উৎস হলো কুরআন, হাদীস, মদিনাবাসীর আমল, কিয়াস ও ইসতিসলাহ (اِسْتِصْلَاحٌ) –[তারীখে ফিকহে ইসলামী– পৃ. ৩১০-৩১১]

ইমাম মালেক (র.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

জন্ম ও বংশ : ইমাম মালেক (র.) ৯৩ হিজরি সনে মদিনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ইমামু দারিল হিজরাহ। পিতার নাম আনাস এবং পিতামহের নাম মালেক। তিনি অস্বাভাবিকভাবেই দুই বছর, মতান্তরে তিন বছর মাতৃগর্ভে ছিলেন। -[আইম্মায়ে আরবা'আ : পৃ. ৯৮-১০০]

শিক্ষা : ইমাম মালেক (র.)-এর জন্মের প্রাক্কালে মদিনায় ইলমি চর্চা ছিল ব্যাপক। তাঁর পরিবার ছিল এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী। পরিবারে ইলমের পরিবেশ থাকার ফলে ইমাম মালেক বাল্যকালেই ইলম অর্জনের জন্য আগ্রহী ও উৎসাহী হন। তিনি নিজেই বলেন, আমি আমার মাকে বললাম, আমি ইলম শিক্ষার জন্য সফর করব। এতে আনন্দিত হয়ে তিনি বললেন, এসো তোমাকে শিক্ষার পোশাক পরিয়ে দেই। তাকে জামা, পায়জামা, টুপি ও পাগড়ি পরিধান করিয়ে বললেন, ইমাম রাবীআর খেদমতে যাও। ইলম শিক্ষার পূর্বে আদব শিক্ষা কর।

ইমাম মালেক (র.) ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহের ক্ষেত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাঁর উস্তাদদের কতিপয়ের নাম আমরা নিম্নে তুলে ধরছি।

আসাতিযায়ে কেরাম : আল্লামা নববী (র.) 'তাহযীবুল আসমা' নামক গ্রন্থে লিখেন, "ইমাম মালেক (র.)-এর নয়শ উস্তাদ ছিলেন। তন্মধ্যে তিনশ তাবেয়ী এবং ছয়শ তাবে তাবেয়ী ছিলেন।" -[তরজমানুস সুন্নাহ- পৃ. ২৪১] তাঁদের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন- ইলমে হাদীসে আব্দুর রহমান ইবনে হুরমূয (র.), ইমাম যুহরী (র.), ইমাম নাফি' ইবনে যাকওয়ান এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র.) প্রমুখ। ইলমে ফিকহে হযরত রাবীআতুর রায় (র.)। তাঁর অন্যান্য উস্তাদদের মধ্যে রয়েছেন- জায়েদ ইবনে আসলাম (র.), আইয়ুব সাখতিয়ানী (র.), ছাওব ইবনে জায়েদ (র.), আব্দুর রহমান ইবনে কাসিম (র.), আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার (র.) প্রমুখ। ইমাম মালেক (র.) ইলমে হাদীস ও ফিকহের ক্ষেত্রে পূর্ণ দক্ষতা লাভের পর স্বীয় আসাতিযায়ে কেরামের অনুমতিতে হাদীস রেওয়ায়েত এবং ফতোয়া প্রদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বলেন, "৭০ জন উস্তাদ আমার যোগ্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত আমি ফতোয়া প্রদানের এই আসনে উপবিষ্ট হইনি।"

ইলমি পারদর্শিতা : খালফ ইবনে ওমর বলেন, একদা আমি ইমাম মালেকের নিকট বসা ছিলাম। এ সময় মদিনার কারী ইবনে কাসীর তাঁর নিকট একটি পত্র দিলেন। তিনি পত্রটি পড়ে জায়নামাজের নীচে রেখে দিলেন। অতঃপর তিনি যখন দাঁড়ালেন আমিও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বসতে বললেন এবং পত্রটি পড়তে দিলেন। পড়ে দেখলাম, এতে এক স্বপ্নের বৃত্তান্ত লেখা আছে যে, কতিপয় লোক রাসূল ﷺ -এর চতুর্পার্শ্বে একত্রিত হয়ে তাঁর কাছে কি যেন চাচ্ছে। রাসূল ﷺ তাদেরকে বললেন, ঐ মিম্বরের নীচে রক্ষিত আছে। মালেককে তা বণ্টনের জন্য বলে দিয়েছি। তোমরা মালেকের নিকট যাও। লোকেরা আলোচনা করতে করতে দেখতে আসলেন যে, মালেক কি বণ্টন করছে? একজন বললেন, তাঁকে যখন হুকুম দেওয়া হয়েছে তখন অবশ্যই তিনি তা পালন করবেন। ইমাম মালেক এ স্বপ্ন শুনে এমনভাবে কাঁদলেন যে, আমি তাকে ক্রন্দন রত অবস্থায় রেখে এলাম। এ থেকেই ইমাম মালেক (র.)-এর ইলমি মর্যাদা যে কত ঊর্ধ্বে তা অনুমান করা যায়। -[তরজুমানুস সুন্নাহ : পৃ. ২৪১]

অধ্যাপনা : তৎকালীন মদিনা শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর ইসলামি নিকেতনে স্থলাভিষিক্ত হন হযরত নাফে' (র.)। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ইমাম মালেক (র.)। মাত্র ১৭ বছর বয়সে শিক্ষকতা শুরু করেন তিনি। আনুমানিক ৬২ বছর যাবৎ বিরতিহীনভাবে ফিকহ, ফতোয়া এবং অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন। ইমাম মালেক (র.)-এর শিক্ষা মজলিস খুব শান-শওকতের ছিল। তিনি খুব পরিপাটি পোশাক পরিধান করে, আতর-সুরমা ব্যবহার করে এবং জাঁকজমকপূর্ণ আসনে বসে শিক্ষা দান করতেন। মসজিদে নববীতে বসে তিনি শিক্ষা দান করতেন।

ছাত্রবৃন্দ : ইমাম মালেক (র.)-এর ছাত্র সংখ্যা অগণিত। ইমাম যাহাবী লিখেন, তাঁর নিকট হতে এত সংখ্যক মানুষ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সংখ্যা গণনা করা প্রায় অসম্ভব। কাজী আয়ায (র.) ইমাম মালেক (র.)-এর ছাত্র সংখ্যা ১৩০০ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কোনো কোনো উস্তাদও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন– ইমাম যুহরী (র.), আবুল আসওয়াদ (র.), আইয়ূব সাখতিয়ানী (র.) প্রমুখ। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.), লায়ছ ইবনে সা'দ (র.), সুফইয়ান সাওরী (র.), ইবনে উয়ায়না (র.), ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রচনাবলি : ইমাম মালেক (র.)-এর যুগে হাদীস ও ফিকহ সংকলন আরম্ভ হয়েছিল। তখন ওলামায়ে উম্মত ফিক্হ ও হাদীসের অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম মালেক (র.) ছিলেন তাদের মাঝে অন্যতম। তাঁর রচনাবলির মধ্যে নিম্নবর্ণিত গ্রন্থাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– ১. আল-মুয়াত্তা ২. রিসালাতুহূ ইলা ইবনে ওহাব ফিল কাদর ৩. আত-তাফসীর লি-গারীবিল কুরআন ৪. কিতাবুস সিয়ার ৫. রিসালাতুল মালেক ফিল আকযিয়াহ ইত্যাদি।

ইন্তেকাল : ইমাম মালেক (র.) ১৭৯ হিজরি সনে রবিউল আউয়াল মাসের ১১ মতান্তরে ১৪ তারিখ শনিবার ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তিনি মুহাম্মদ ও ইয়াহইয়া নামক দুই পুত্র রেখে যান। তাঁরা উভয়ে মুহাদ্দিস ছিলেন।

ফিকহে শাফেয়ী : ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী (র.) হলেন এই ফিকহের প্রবর্তক। মিসরে এই ফিকহের সূচনা হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অধিকাংশ ছাত্রই ছিলেন মিসরীয়। এরপর ইরাকেও এর বিকাশ ঘটে। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে হিজায, বাগদাদ, খোরাসান, সিরিয়া, ইয়েমেন, মাওয়ারাউন নাহার, পারস্য, ভারত, আফ্রিকা এবং স্পেন পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ে। এসব জায়গার কোথাও কোথাও ফিকহে শাফেয়ীর ব্যাপক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে গমন করেন এবং সেখানে ফিকহের দরস প্রদান করেন। তিনি যখন যেখানে গমন করেছেন তখন থেকেই সেখানে শাফেয়ী মাযহাবের বিস্তৃতি ঘটে। সিরিয়ায় প্রথমে ইমাম আওযা'য়ী (র.)-এর মাযহাব চালু ছিল, কিন্তু ইমাম আবূ যুর'আ মুহাম্মদ ইবনে ওসমান দামেস্কী (র.) যখন দামেস্কের কাজী হন তখন তিনি সেখানে ফিকহে শাফেয়ী চালু করেন। তারপর অন্যান্য কাজীগণও এ ফিকহ গ্রহণ করেন। আবূ যুর'আ দামেস্কী (র.)-এর কৌশল ছিল কোনো আলেম শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল মুখতাসার লিল মুযানী" মুখস্থ করলে তাকে এক দিনার পুরস্কার দিতেন। আল্লামা মাকদেসী (র.) লিখেন, "হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে সিরিয়ায় শাফেয়ী মাযহাব ব্যতীত কোনো মাযহাবের প্রচলন ছিল না। ইমাম সুবকী (র.) "তাবাকাতুস শাফিইয়্যা" নামক গ্রন্থে লিখেন। মাওয়ারাউন নাহার এলাকায় মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) শেখ সাদী (র.)-এর সহযোগিতায় ফিকহে শাফেয়ীর প্রচার করেন। আল্লামা মাকদেসী (র.) বলেন, প্রাচ্যের দেশ তথা কাওব, শাশ, আবলাক, তুস ও ফাসা ইত্যাদি স্থানে শাফেয়ী মাযহাবের প্রাধান্য ছিল। সারাখস, নিশাপুর ও মারু এলাকায়ও শাফেয়ী মাযহাবের প্রচলন ছিল। ইসফারাইন এলাকায় আবূ বারযা ইয়াকূব ইবনে ইসহাক নিশাপুরী (র.) শাফেয়ী মাযহাব এবং এই মাযহাবের কিতাবাদি প্রচার করেন। বাগদাদে হানাফী মাযহাবের প্রচলন ছিল। ইমাম শাফেয়ী (র.) সেখানে গিয়ে স্বীয় মাযহাবের প্রচার করেন। ইমাম সুবকী (র.) বর্ণনা করেন, আরবের তিহামা অঞ্চলে শাফেয়ী মাযহাব প্রচলিত ছিল। আল্লামা ইবনুল আছীর (র.) বলেন, আফ্রিকায় ইয়াকূব ইবনে ইউসুফ ইবনে আব্দুল মু'মিন তাঁর শাসন আমলের শেষভাগে শাফেয়ী মাযহাবের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী লোকদেরকে কাজী পদে নিয়োগ দান করেন। –[আইম্মায়ে আরবা'আ : পৃ. ২৭]

ফিকহে শাফেয়ী সংকলনের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতিমালা : ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রথমে কুরআনের জাহিরী অর্থকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন, কিন্তু যদি কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণিত হতো যে, এখানে কুরআনের জাহিরী অর্থ

উদ্দেশ্য নয়, তাহলে তিনি এটাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন না। অতঃপর তিনি হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করতেন। যে কোনো অঞ্চলের আলেমই এ হাদীস বর্ণনা করুক না কেন তিনি তাতে কোনো বাছ-বিচার করতেন না। শুধু সনদ মুত্তাসিল এবং রাবী ছিকাহ হওয়ার শর্তারোপ করতেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম মালেক (র.)-র ন্যায় হাদীসের মর্মানুযায়ী কেউ আমল করেছে বলে প্রমাণ থাকা শর্ত এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ন্যায় বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হওয়ার শর্তারোপ করেননি। তিনি কুরআন-হাদীসকে একই নজরে দেখতেন এবং উভয়ের আনুগত্যই সমভাবে وَاجِبْ মনে করতেন। হাদীসের পর তিনি ইজমার উপর আমল করতেন। কুরআন, হাদীস ও ইজমার দ্বারা কোনো মাসআলার সমাধান না হলে তিনি তা কিয়াস দ্বারা সমাধান করতেন এবং কিয়াসের জন্য তিনি এ শর্তারোপ করতেন যে, এর নির্দিষ্ট কোনো أَصْلٌ বা নীতি থাকতে হবে। তিনি হানাফীদের اِسْتِحْسَانٌ এবং মালেকীদের اِسْتِصْلَاحٌ-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবে তিনি এগুলোর কাছাকাছি দলিলের উপর আমল করতেন।

–[তারীখে ফিকহে ইসলামী– পৃ. ৩২০-৩২৪]

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : ইমাম শাফেয়ী (র.) আসকালান প্রদেশের গাযাহ নামক স্থানে ১৫০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা মারা যান। অতঃপর তাঁর মাতা তাঁকে লালন-পালন করেন। দশ বছর বয়সে তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। এরপর তিনি মক্কায় পৌঁছে সেখানকার শায়খ মুসলিম ইবনে খালিদ যানজী (র.)-এর নিকট ফিকহ শিক্ষা করেন। ১৫ বছর বয়সে তাঁর উস্তাদ শায়খ যানজী (র.) তাঁকে ফতোয়া দানের অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় উস্তাদের অনুমতিক্রমে তাঁর দেওয়া একখানা পত্র নিয়ে ইমাম মালেক (র.) এবং সেখানকার মাশায়েখে কেরামের উদ্দেশ্যে মদিনায় গমন করেন। মদিনায় পৌঁছে তিনি ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট 'মুয়াত্তা মালেক' অধ্যয়ন করেন এবং তা মুখস্থ করে শুনান। এতে ইমাম মালেক (র.) বিস্ময়াভিভূত হন এবং তাঁকে খুব কাছে টেনে নেন। এ ছাড়া আরো ৮১ জন ফকীহ ও মুহাদ্দিসের নিকট তিনি ফিকহ ও হাদীস শিক্ষা করেন। খলিফা হারুনুর রশীদের খেলাফতকালে তিনি নাজরান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। কিন্তু সৈয়দ বংশ অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-এর বংশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করে তাঁর বিরুদ্ধে খলিফার নিকট রিপোর্ট উত্থাপন করা হয়। অতঃপর রবী' ইবনে ফজল -এর সুপারিশক্রমে তিনি মুক্তি পেয়ে স্বপদে পুনর্বহাল থাকেন। কিন্তু বেশি দিন তাঁর চাকরি অব্যাহত থাকেনি। অতঃপর তিনি ইরাক চলে যান। ইরাকে গিয়ে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র.)-এর নিকট ফিকহে হানাফী শিক্ষা করেন। এভাবে তিনি বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় মক্কায় আগত মিসরীয়, স্পেনীয় ও আফ্রিকার আলেমগণের সাথেও তিনি চিন্তা ও দর্শনের আদান-প্রদান করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হাসিল করেন। অতঃপর ১৯৫ হিজরিতে পুনরায় তিনি ইরাক সফর করেন এবং দুই বছর সেখানে অবস্থান করে জ্ঞানপিপাসু লোকদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করেন। এ সময় তিনি যেসব ফতোয়া প্রদান করেছেন, সেগুলোকে তাঁর قَوْلٌ قَدِيْمٌ বলে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ইরাকে অবস্থানকালে তাঁর মাযহাব বেশ প্রসার লাভ করে। সেখানকার একদল আলেমও তাঁর মাযহাব অবলম্বন করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৮ হিজরিতে তৃতীয়বার তিনি ইরাক গমন করেন এবং সেখানে কয়েক মাস অবস্থানের পর মিসরে চলে যান। মিসরে মালেকী মাযহাবের অধিক প্রচলন ছিল। ইমাম শাফেয়ী (র.) মিসরের আলেমগণের সামনে তাঁর মাযহাব পেশ করেন। এ সময় তার ইজতিহাদ ও চিন্তাধারায় কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন তিনি পূর্বের মতামতকে কিছুটা পরিবর্তন করে নতুন আঙ্গিকে ফতোয়া প্রদান করেন এবং এ হিসেবে কিছু কিতাব রচনা করেন। একেই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর قَوْلٌ جَدِيْدٌ বলে। ইমাম শাফেয়ী (র.) নিজেই তাঁর মাযহাবের প্রচার কাজ চালিয়ে যান। পরে তাঁর ছাত্র-শিষ্যরা এ প্রচার কাজে যোগদান করেন। তবে মিসরে তাঁর মাযহাব খুবই গ্রহণীয় হয়। তিনি ১৯৮ হিজরি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ৬ বছর মিসরেই অবস্থান করেন এবং সেখানেই ২০৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ফিকহে হাম্বলী : এ ফিকহের প্রবর্তক হলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)। বাগদাদ ছিল এ ফিকহের কেন্দ্র। এ ফিকহের প্রচার উপরিউক্ত ফিকহ দুটির তুলনায় কিছুটা কম ছিল। আল্লামা ইবনে খালদুন (র.) এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন– ফিকহে হাম্বলীতে ইজতিহাদের ব্যবহার ছিল খুব কম। এ মাযহাবের মাসআলা-মাসায়েল নিরূপণে জাহিরী হাদীস এবং নুসূসের উপরই অধিকতর নির্ভর করা হতো। হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী যে সকল ফকীহ ইরাক ও সিরিয়ায় অবস্থান করতেন, তারা সকলেই হাদীস বর্ণনায় ছিলেন অগ্রগামী। হাম্বলী মাযহাব বাগদাদ অতিক্রম করে সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকায়ও সম্প্রসারিত হয়েছে। এমন কি সপ্তম শতাব্দীর পর সিরিয়ায় হাম্বলী মাযহাবেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, চতুর্থ শতাব্দীতে বাগদাদ এবং ইরাকের সীমা অতিক্রম করে অন্যান্য দেশেও হাম্বলী মাযহাব প্রসার লাভ করে। শায়খ আব্দুল গনী মাকদেসী (র.) মিসরে সর্বপ্রথম এ মাযহাব প্রচলন করেন। তিনি বলেন, চতুর্থ শতাব্দীতে বসরা, দায়লাম, বিহার, খুজিস্তান ইত্যাদি এলাকায়ও হাম্বলী মাযহাব বিদ্যমান ছিল। আল্লামা ইবনুল আছীর (র.) ৩২৩ হিজরির এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করেন যে, সে সময় বাগদাদে হাম্বলী মাযহাবের এত বেশি প্রভাব ছিল যে, এ মাযহাবের অনুসারী ফকীহ ওলামায়ে কেরাম যদি আমির-উমারাদের বাড়িতে নবীয, শরাব ইত্যাদি পেতেন তাহলে তাঁরা তা ফেলে দিতেন। নর্তকী ও গায়িকাদের প্রহার করতেন। বাদ্যযন্ত্র পেলে তা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতেন। শরিয়ত বিরোধী কাজের ব্যাপারে তাঁদের এ কঠোর নীতির ফলে রাজা, বাদশাহ এবং সাধারণ জনগণও তাঁদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে ক্ষেপে যায়। এতে ফিকহে হাম্বলী প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিরাট বাধার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কায়্যিম (র.) এ মাযহাবের বিরাট স্তম্ভ। তাঁদের মাধ্যমেই এ ফিকহের প্রসার ঘটেছে খুব বেশি।

ফিকহে হাম্বলী সংকলনের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতিমালা : ফিকহ রচনায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল। কুরআন ও সহীহ সনদের হাদীসের উপর আমল করাই ছিল তাঁর নীতি। তিনি খবরে ওয়াহিদের উপরও আমল করতেন, যদি তা সহীহ সনদে প্রমাণিত হতো। তিনি اَقْوَالُ صَحَابَةٍ -কে কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। হানাফী ও শাফেয়ী মতাবলম্বীদের ন্যায় তিনি দিরায়াত পর্যালোচনা, ভাবার্থ গ্রহণ এবং কিয়াস থেকে বিরত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। মালেকীদের মতো মদিনাবাসীদের আমলকেও তিনি প্রামাণ্য দলিল মনে করতেন না। مَرْفُوْع ও مَوْقُوْف উভয় অবস্থায়ই সহীহ হাদীসকে তিনি আমলযোগ্য মনে করতেন। এ কারণেই তাঁর মাযহাবে একই মাসআলায় একাধিক হুকুম পাওয়া যায়। একান্ত বাধ্য হলে তিনি কিয়াস দ্বারা মাসআলা সমাধান করতেন। মোটকথা হচ্ছে, ইমাম চতুষ্টয়ের সকলের নিকটই ইজমা ও কিয়াস শরিয়তের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ১৬৪ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। অতঃপর তাঁর মাতা তাঁকে লালন–পালন করেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হুশাইম এবং সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আব্দুর রাজ্জাক (র.)-এর নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) ইরাক গেলে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) তার কাছ থেকে ফিকহ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বাগদাদের ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ই তিনি ফিকহ গবেষণায় নিজস্ব ধারা প্রবর্তন করেন। যদিও ফকীহ অপেক্ষা মুহাদ্দিসগণের মধ্যে তাঁকে বেশি গণ্য করা হয়। তথাপি তিনি নিজস্ব ফিকহ মোতাবেক ফতোয়া দিতে শুরু করেন। মুসনাদে আহমাদ তার অমর কীর্তি, যাতে ৪৩ হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) : জীবন ও সাধনা

জন্ম ও বংশ : ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইবনে ছাবিত ইবনে যাওতী ইবনে মাহ (র.) হিজরি ৮০ মোতাবেক ৭০০ খ্রিষ্টাব্দে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে, তাঁর দাদা যুতা' ছিলেন কাবুলের অধিবাসী এবং বনু তাইমল্লাহ ইবনে ছালাবার ক্রীতদাস। তাঁরা তাঁকে আজাদ করার পর তাঁর পিতা ছাবিত স্বাধীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ

কেউ বলেন, তাঁর পূর্বপুরুষগণ সর্বদা আজাদই ছিলেন; কখনো ক্রীতদাস ছিলেন না। ছাবিত ছোট বেলায় হযরত আলী (রা.)-এর খেদমতে আগমন করেন। অতঃপর হযরত আলী (রা.) তাঁর এবং তাঁর বংশধরের জন্য বরকতের দোয়া করেন।

বাল্যকাল : তিনি বাল্যকাল থেকে তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন, কিন্তু প্রথমে তিনি ব্যবসার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরে একজন বিশিষ্ট আলেমের পরামর্শে জ্ঞানার্জনের উৎসাহ লাভ করেন। এক সময় মহানবী ﷺ -এর একান্ত খাদিম ও প্রসিদ্ধ একজন সাহাবী কুফায় আগমন করলে তিনি অল্প বয়সে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তৎকালীন কুফার প্রথা অনুযায়ী ২০ বছরের পূর্বে হাদীস বর্ণনার সুযোগ না থাকায় তিনি তাঁর নিকট থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করতে পারেননি। তবে তাঁকে দেখে বাল্য বয়সেই তাবেয়ী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন : তিনি ১৭ বছর বয়সে জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ইলমুল কালামে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অতঃপর পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তীক্ষ্ণ মেধার ভিত্তিতে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হন। হাদীস, তাফসীর, নাসিখ, মানসূখ ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানে পূর্ণতা লাভ করেন। তিনি হযরত হাম্মাদ (র.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সুদীর্ঘ ১০ বছর ফিকহ শাস্ত্রে গবেষণা করেন এবং ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

গুণাবলি : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, বিশিষ্ট আবিদ এবং অসাধারণ বুদ্ধিমান। তিনি একাধারে ৩০ বছর রোজা রেখেছেন এবং ৪০ বছর যাবৎ রাতে ঘুমাননি, ইবাদত-বন্দেগীতে রাত্রি কাটিয়ে গেছেন। প্রতি রমজানে ৬১ বার কুরআন খতম দিতেন। অনেক সময় এক রাকাতে কুরআন মাজীদ খতম দিতেন। তিনি ৫৫ বার হজ করেছেন। জীবনের শেষ হজের সময় কাবা শরীফে দুই রাকাত নামাজ এভাবে পড়েছেন যে, প্রথম রাকাতে এক পা উঠিয়ে কুরআনের প্রথম অর্ধাংশ তেলাওয়াত করেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে অপর পা উঠিয়ে কুরআন মাজীদের বাকি অর্ধাংশ তেলাওয়াত করেন। যে স্থানে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে সেখানে এক হাজার বার কুরআন মাজীদ খতম করেছেন। –[মিফতাহুস সাআদাহ]

তিনি ৯৯ বার আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন, অত্যন্ত পরহেজগার ও আল্লাহর ওলী ছিলেন। একদা কুফায় ছাগল চুরি হওয়ায় তিনি ৭ বছর পর্যন্ত ছাগলের গোশত ভক্ষণ করেননি। কেননা, ছাগলের বয়স্কাল সাধারণত ৭ বছর হয়ে থাকে। –[মিফতাহুস সা'আদাহ]

তাঁর ইবাদতের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তিনি ৪০ বছর যাবৎ ইশার নামাজের অজু দ্বারা ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। তিনি প্রতি মাসে ৬০ বার কুরআন খতম দিতেন।

তাঁর সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত : তাঁর সম্পর্কে মনীষীগণ বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন। যেমন–

১. হযরত ইবনে মুবারক (র.) বলেন– لَوْلَا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَغَاثَنِىْ بِاَبِىْ حَنِيْفَةَ وَسُفْيَانَ كُنْتُ كَسَائِرِ النَّاسِ
   "আল্লাহ তা'আলা যদি আবূ হানীফা ও সুফইয়ান ছাওরী দ্বারা আমাকে সহায়তা না করতেন তবে আমি অন্যান্য মানুষের মতোই থাকতাম।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, اَلنَّاسُ فِى الْفِقْهِ عِيَالُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) "ইলমে ফিকহে দুনিয়ার সকল মানুষই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পরিজনতুল্য।" –[মুকাদ্দামায়ে ই'লাউস সুনান : পৃ. ৩১৩]

৩. প্রখ্যাত হাফিজে হাদীস ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র.) বলেন–
   اَدْرَكْتُ اَلْفَ رَجُلٍ وَكَتَبْتُ عَنْ اَكْثَرِهِمْ مَا رَأَيْتُ فِيْهِمْ اَفْقَهَ وَلَا اَوْرَعَ وَلَا اَعْلَمَ مِنْ خَمْسَةٍ اَوَّلُهُمْ اَبُوْ حَنِيْفَةَ ـ
   "আমি এক হাজার মাশায়িখে হাদীসকে পেয়েছি এবং তাঁদের অধিকাংশ জন থেকে আমি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। তন্মধ্যে ৫ জনকে সবচেয়ে বড় ফকীহ, আলেম এবং মুত্তাকী হিসেবে পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে শীর্ষে ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)।" –[তাহযীবুত তাহযীব : খ. ১১, পৃ. ৩৬৬]

৪. শাকীক বলখী (র.) বলেন– كَانَ الْإِمَامُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ وَأَعْلَمِ النَّاسِ وَأَعْبَدِ النَّاسِ
"ইমাম আবূ হানীফা (র.) তৎকালীন যুগের মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় পরহেজগার, সবচেয়ে বড় আলেম এবং সর্বাধিক ইবাদতগোজার ব্যক্তি ছিলেন।" –[ই'লাউস সুনান : পৃ. ৩০৯]

৫. সুফয়ান সাওরী (র.) বলেন– كَانَ الْإِمَامُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ أَفْقَهَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ "ইমাম আবূ হানীফা (র.) পৃথিবীবাসীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিকহবিদ ছিলেন।" –[প্রাগুক্ত : পৃ. ৩০৯]

সাহাবীর দর্শন লাভ : তিনি একাধিকবার প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর সাক্ষাত লাভ করেন। হাফেজ ইবনে হাজার মাক্কী (র.), ইবনে জাওযী (র.) ও ইমাম দারাকুতনী (র.) প্রমুখের মতে, তিনি হযরত আনাস (রা.) ছাড়াও আরো কতিপয় সাহাবীর দর্শন লাভ করেন।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) تَبْيِيْضُ الصَّحِيْفَةِ নামক গ্রন্থে দলিলের ভিত্তিতে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) হযরত আনাস (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে হারিছ (রা.), ওয়াসিলা ইবনে আসকা' (রা.), হযরত আয়িশা ইবনে আজরাদ (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেছেন। উক্ত গ্রন্থে আবূ মা'শার (র.) থেকে বর্ণিত আছে–

أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, হাদীসটি সহীহ।

অধ্যাপনা : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রধানতম উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলায়মান (র.)-এর ইন্তেকালের পর ইমাম আযম (র.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করা হয়। প্রথমত তিনি স্বীয় উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে হালকায়ে দরস কায়েম করতে ইতস্তত করেছিলেন। পরে তিনি একদা স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি রাসূল ﷺ -এর কবর খনন করছেন। এতে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তারপর বসরায় গমন করে এক ব্যক্তির মাধ্যমে মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.)-এর নিকট এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, স্বপ্নদ্রষ্টা রাসূল ﷺ -এর হাদীসভাণ্ডার বিকশিত করবেন। এরপর থেকে তিনি প্রসন্ন মনে ফিকহ ও ফতোয়ার দরস দিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর দরস-তাদরীসের সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে আলেমগণ তাঁর দরসে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। মক্কা, মদিনা, দামেস্ক, বসরা, মুসেল, মিসর, ইয়েমেন, বাহরাইন, কুফা, বাগদাদ, জাযীরাহ এবং রাশিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী তাঁর দরসে অংশগ্রহণ করেন।

ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান : তিনি ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভাবক। তিনি তাঁর ৪০ জন সুযোগ্য ছাত্রের সমন্বয়ে একটি ফিকহ সম্পাদনা বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ডের মাধ্যমে দীর্ঘ ২২ বছর কঠোর পরিশ্রম করে ফিকহ শাস্ত্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে রূপ দান করেন। উক্ত বোর্ডের ৪০ জন সদস্য থেকে ১০ জন সদস্য নিয়ে একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করেন। ফিকহ শাস্ত্রের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এই বিশেষ বোর্ডের অবদান সবচেয়ে বেশি। বোর্ডের সামনে কোনো একটি মাসআলা পেশ করা হতো, অতঃপর সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা লিপিবদ্ধ করা হতো। এভাবে ৯৩ হাজার মাসআলা কুতুবে হানাফিয়াতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : তিনি ফিকহ শাস্ত্রের প্রতি অত্যধিক মনোনিবেশ করার দরুন হাদীস শাস্ত্রে তেমন অবদান রাখতে পারেননি। ইমাম যুরাকী (র.) বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যেমন– ৫০০, ৬০০, ৭০০, ১১০০। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো, মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা (র.)।

বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি : খলিফা মনসুর তাঁকে কুফা থেকে বাগদাদে ডেকে এনে ইরাকের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে প্রথমে অনুরোধ করেন। পরে চাপ প্রয়োগ করেন, কিন্তু ইমাম সাহেব তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে তাঁকে জেলখানায় নিক্ষেপ করা হয় এবং দশ দিন যাবৎ দৈনিক দশটি করে চাবুক মারা হয়।

উস্তাদবৃন্দ : তাঁর ৪ হাজারেরও অধিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন আতা ইবনে আবূ রাবাহ (র.), আসেম ইবনে আবূ নুজূদ (র.), আলকামা ইবনে মারসাদ (র.), হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলায়মান (র.), হাকাম ইবনে উতায়বা (র.), সালামা ইবনে কুহাইল (র.), আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (র.), আলী ইবনে আকরাম (র.), জিয়াদ ইবনে আলকা (র.), সাঈদ ইবনে মাসরূফ সাওফী (র.), আদী ইবনে ছাবিত আনসারী (র.), আবূ সুফয়ান সা'দী (র.) ও হিশাম ইবনে উরওয়া (র.) প্রমুখ।

ছাত্রবৃন্দ : তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রগণ হলেন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম জুফার (র.), ইমাম হাসান ইবনে জিয়াদ (র.), ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (র.), আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.), হাফস ইবনে গিয়াস (র.), জাকারিয়া ইবনে আবূ জায়িদা (র.), হাম্মাদ ইবনে আবূ হানীফা (র.), ঈসা ইবনে ইউনুস (র.), খারিজা ইবনে মুসআব (র.), মুসআব ইবনে মিকদাম ও আবূ কাসিম প্রমুখ।

রচনাবলি : তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো মুসনাদে আবী হানীফা, আল-ফিকহুল আকবার, ওয়াসিয়্যাতু আবী হানীফা ইত্যাদি। কারো কারো মতে, তিনি কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। তাঁর শিষ্যদের রচিত গ্রন্থাবলিকে তাঁর বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইন্তেকাল : তিনি হিজরি ১৫০ সন মোতাবেক ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা মনসুর কর্তৃক খাদ্যে বিষ প্রয়োগের ফলে কারাগারে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাজায় এতো লোক একত্রিত হয়েছিল যে, ৫ বার জানাজা পড়তে হয়েছিল। তাঁর জানাজায় সর্বশেষ ইমামতি করেন তাঁর পুত্র হাম্মাদ। তাঁকে গোসল দেন কুফার প্রধান কাজী হাসান ইবনে উমারা। তাঁকে খাইযারান নামক স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর কবরের পাশেই তাঁর প্রিয় শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

ফিকহে হানাফীর উৎপত্তি ও বিকাশ : ইসলামে যে চারটি মাযহাব প্রচলিত আছে এর মধ্যে হানাফী মাযহাব বা ফিকহে হানাফী সর্বশ্রেষ্ঠ। ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইবনে ছাবিত (র.) হলেন এ মাযহাবের প্রবর্তক। তাঁর নাম অনুসারে এ মাযহাবের নামকরণ করা হয় হানাফী মাযহাব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের নিকট এ মাযহাবই সর্বাধিক সমাদৃত। এ মাযহাব অধিকহারে প্রসার লাভ করার কারণ হলো, এ মাযহাবের প্রবক্তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন মুজতাহিদকুল শিরোমণি। সর্বোপরি অনেক মুজতাহিদ নিজে মাযহাব প্রবর্তন না করে ইমাম আবূ হানীফা-এর মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। এটিও এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারের অন্যতম কারণ। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও এর পূর্ববর্তী যুগে ফিকহ স্বতন্ত্র ও বিন্যস্ত শাস্ত্র ছিল না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فِى الْفِقْهِ "সমগ্র মানবজাতি ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সন্তানতুল্য।" –[আসরুল ফিকহিল ইসলামি : পৃ. ২২৩]

আল্লামা মুওয়াফফিক (র.) বলেন– اَبُوْ حَنِيْفَةَ اَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ هٰذِهِ الشَّرِيْعَةِ لَمْ يَسْبِقْهُ اَحَدٌ مِمَّنْ قَبْلَهٗ "ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ই সর্বপ্রথম এই শরিয়তের ইলম তথা ইলমে ফিকহ সংকলন করেন। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ফকীহদের কেউই তাঁকে পিছনে ফেলতে সক্ষম হননি।"

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন–

اِنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ الشَّرِيْعَةِ وَرَتَّبَهَا اَبْوَابًا ثُمَّ تَبِعَهٗ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَلَمْ يَسْبِقْ اَبَا حَنِيْفَةَ اَحَدٌ ـ

"ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ই সর্বপ্রথম এই 'ইলমে শরিয়ত' তথা ইলমে ফিকহ সংকলন এবং তা অধ্যায় হিসেবে বিন্যস্ত করেন। তারপর এ পথে তাঁর অনুসরণ করেন ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র.)। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে কেউই এ বিষয়ে পিছনে ফেলতে পারেননি।"

আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী (র.) বলেন–

إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ الْفِقْهِ وَرَتَّبَهُ أَبْوَابًا وَكَتَبَ عَلَى نَحْوِ مَا هُوَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ

"ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ই সর্বপ্রথম ইলমে ফিকহ সংকলন করেন এবং একে অধ্যায় হিসেবে বিন্যস্ত করেন। আর বর্তমানে ফিকহ যেভাবে বিদ্যমান তিনি তা এভাবে লেখার ব্যবস্থা করেন। –[মানাকিবে মুওয়াফফিক : খ. ২ পৃ. ১৩৫]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমূহ সমস্যার সমাধানকল্পে দীর্ঘ ২২ বছর পর্যন্ত এ ব্যাপারে সাধনা করেন এবং তাঁর সুযোগ্য ও বিশিষ্ট শাগরিদদের নিয়ে ৪০ সদস্যের একটি ফিকহ বোর্ড গঠন করে কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে সাহাবা, ফাতাওয়ায়ে সাহাবা এবং কিয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করে বিষয়ভিত্তিকভাবে ফিকহের এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলেন, যা ইলমে ফিকহ নামে পরিচিত।

ইমাম ত্বাহাবী মিসরী (র.) মুত্তাসিল সনদে আসাদ ইবনে ফুরাত থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ফিকহ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০। শায়খ আব্দুল কাদির কুরাশী (র.) তাঁদের নাম اَلْجَوَاهِرُ الْمُضِيَّةُ নামক গ্রন্থে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

১. ইমাম জুফার (র.) [মৃ: ১৫৮ হি:] ২. ইমাম মালেক ইবনে মিগওয়াল (র.) [মৃ: ১৫৯ হি:] ৩. ইমাম মালেক ইবনে নাযীর তাঈ (র.) [মৃ: ১৬০ হি:] ৪. ইমাম মিনদাল ইবনে আলী (র.) [মৃ: ১৬৮ হি:] ৫. ইমাম নযর ইবনে আঃ কারীফ (র.) [মৃ: ১৬৯ হি:] ৬. ইমাম আমর ইবনে মায়মূন (র.) [মৃ: ১৭১ হি:] ৭. ইমাম হিব্বান ইবনে আলী (র.) [মৃ: ১৭২ হি:] ৮. ইমাম আবূ ইমমা (র.) [মৃ: ১৭৩ হি:] ৯. ইমাম যুহায়র ইবনে মুআবিয়া (র.) [মৃ: ১৭৩ হি:] ১০. ইমাম কাসিম ইবনে মা'আন (র.) [মৃ: ১৭৫ হি:] ১১. ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবূ হানীফা (র.) [মৃ: ১৭৬ হি:] ১২. ইমাম সায়্যাজ ইবনে বিস্তাম (র.) [মৃ: ১৭৭ হি:] ১৩. ইমাম শরীফ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) [মৃ: ১৭৮ হি:] ১৪. ইমাম আফিয়া ইবনে ইয়াজীদ (র.) [মৃ: ১৮০ হি:] ১৫. ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) [মৃ: ১৮১ হি:] ১৬. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) [মৃ: ১৮২ হি:] ১৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নূহ (র.) [মৃ: ১৮৩ হি:] ১৮. ইমাম হায়সাম ইবনে বশীর (র.) [মৃ: ১৮৩ হি:] ১৯. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া (র.) [মৃ: ১৮৪ হি:] ২০. ইমাম যুফার ইবনে ইয়ায (র.) [মৃ: ১৮৭ হি:] ২১. ইমাম আজাদ ইবনে ওমর (র.) [মৃ: ১৮৮ হি:] ২২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র.) [মৃ: ১৮৯ হি:] ২৩. ইমাম আলী ইবনে মুসহির (র.) [মৃ: ১৮৯ হি:] ২৪. ইমাম ইউসুফ ইবনে খালিদ (র.) [মৃ: ১৮৯ হি:] ২৫. ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে ইদরীস (র.) [মৃ: ১৯২ হি:] ২৬. ইমাম ফজল ইবনে মূসা (র.) [মৃ: ১৯৯ হি:] ২৭. ইমাম আলী ইবনে জিবয়ান (র.) [মৃ: ১৯২ হি:] ২৮. ইমাম হাফস ইবনে গিয়াস (র.) [মৃ: ১৯৪ হি:] ২৯. ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (র.) [মৃ: ১৯৭ হি:] ৩০. হিশাম ইবনে ইউসুফ (র.) [মৃ: ১৯৭ হি:] ৩১. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাততান (র.) [মৃ: ১৯৮ হি:] ৩২. ইমাম শুআইব ইবনে ইসহাক (র.) [মৃ: ১৯৮ হি:] ৩৩. ইমাম আবূ হাফস ইবনে আব্দুর রহমান (র.) [মৃ: ১৯৯ হি:] ৩৪. ইমাম আবূ মুতী বালখী (র.) [মৃ: ১৯৯ হি:] ৩৫. ইমাম খালিদ ইবনে সুলায়মান (র.) [মৃ: ১৯৯ হি:] ৩৬. ইমাম আব্দুল হামীদ (র.) [মৃ: ২০৩ হি:] ৩৭. ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) [মৃ: ২০৪ হি:] ৩৮. ইমাম আবূ আসিম নাবীল (র.) [মৃ: ২১২ হি:] ৩৯. ইমাম হাম্মাদ ইবনে দলীল (র.) [মৃ: ২১৫ হি:] ৪০. ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (র.) [মৃ: ২১৫ হি:]।

তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম যুফার (র.), ইমাম দাঊদ তাঈ (র.), ইমাম আসাদ ইবনে ওমর (র.), ইমাম ইউসুফ ইবনে খালিদ তামিমী (র.) এবং ইমাম ইয়াহইয়া জায়েদা (র.)। লেখার দায়িত্ব ছিল হযরত ইয়াহইয়া (র.)-এর উপর। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর পর্যন্ত এ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। –[আসারুল ফিকহিল ইসলামী– পৃ. ২০৯-২১০]

এ মজলিসে সর্বসম্মতিক্রমে যা সিদ্ধান্ত হতো তা-ই লিপিবদ্ধ করা হতো। তাঁদের মধ্য থেকে একজনও যদি ভিন্ন মত পোষণ করতেন তাহলে ৩ দিন পর্যন্ত সে বিষয়ের উপর আলোচনা হতো। এরপর ঐকমত্যে পৌঁছলে তা লিপিবদ্ধ করা হতো। কাজেই বলা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতিষ্ঠিত এই ফিকহী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে যেসব ফিকহী মাসায়েল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা কারো ব্যক্তিগত মত ছিল না; বরং এ ছিল মূলত এক শূরাঈ ফিকহ [পরামর্শভিত্তিক রচিত ও সংকলিত ফিকহ]। যদিও সদরে মজলিসের দিকে সম্বোধন করে আমরা এর তাকলীদ করাকেও তাকলীদে শাখসী (تَقْلِيْد شَخْصِىْ) হিসেবে অভিহিত করে থাকি। –[সীরাতুন নু'মান : পৃ. ১৬৪]

এ সম্পর্কে সদরুল আইম্মাহ আল্লামা মুওয়াফফাক (র.) বলেন–

فَوَضَعَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) مَذْهَبَهُ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ لَمْ يَسْتَبِدَّ فِيْهِ بِنَفْسِهِ دُوْنَهُمْ اِجْتِهَادًا مِنْهُ فِى الدِّيْنِ وَمُبَالَغَةً فِى النَّصِيْحَةِ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَكَانَ يُلْقِىْ مَسْئَلَةً مَسْئَلَةً وَيَسْمَعُ مَا عِنْدَهُمْ وَيَقُوْلُ مَا عِنْدَهُ وَيُنَاظِرُهُمْ شَهْرًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ حَتّٰى يَسْتَقِرَّ اَحَدُ الْاَقْوَالِ فِيْهَا ثُمَّ يُثْبِتُهَا اَبُوْ يُوْسُفَ فِى الْاُصُوْلِ حَتّٰى اَثْبَتَ الْاُصُوْلَ كُلَّهَا ـ

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর মাযহাব তথা ফিকহী চিন্তাধারা পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন। মজলিসে শূরার সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে তিনি নিজের একান্ত মতে কিছুই করেননি। দীনি বিষয়ে ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ, রাসূল এবং মু'মিনদের কল্যাণ কামনার্থে তিনি এ নীতি অবলম্বন করেছিলেন। ফিকহী বোর্ডের সামনে তিনি একটি করে মাসআলা পেশ করতেন। সদস্যদের মতামত ও প্রমাণাদি শুনতেন এবং সবার শেষে নিজের দলিল এবং যুক্তি পেশ করতেন। এভাবে এক এক মাসআলার উপর মাসব্যাপী বা এর চেয়েও বেশি সময় পর্যন্ত তিনি বোর্ডের সদস্যদের সাথে মুনাজারা বা বাহাছ করতেন। পরিশেষে কোনো একটি অভিমতের উপর বোর্ডের সদস্যগণ একমত হলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তা কপিতে লিপিবদ্ধ করতেন। এভাবে ফিকহে হানাফী লিপিবদ্ধ হয়। –[মানাকিবে মুওয়াফফাক : খ. ২ পৃ. ১৩৩]

ফিকহে হানাফী সংকলনে অনুসৃত নীতিমালা : ফিকহে হানাফী সংকলন ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আযম (র.) গৃহীত নীতিমালা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন– اِذَا جَاءَ نَا الْحَدِيْثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَاْخُذُ بِهِ وَاِذَا جَاءَ نَا مِنَ الصَّحَابَةِ تَخَيَّرْنَا وَاِذَا جَاءَ نَا عَنِ التَّابِعِيْنَ زَاحَمْنَاهُمْ "নবী করীম ﷺ -এর কোনো হাদীস আমাদের নিকট আসলে আমরা তা গ্রহণ করে সে মোতাবেক ফয়সালা করি। আর যদি আমাদের কাছে সাহাবায়ে কেরামের রেওয়ায়েত পৌঁছে তবে আমরা সে বর্ণনাসমূহের মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করে থাকি। আর আমাদের কাছে তাবেয়ীনে কেরামের বর্ণনা পৌঁছলে আমরা এর মোকাবিলায় নিজেদের অভিমত পেশ করি। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আমরা ইজতিহাদের পথ অবলম্বন করি। –[আল ইনতিকা : পৃ. ১৪১]

তিনি আরো বলেন–

اٰخُذُ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَمَا لَمْ اَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْاٰثَارِ الصِّحَاحِ عَنْهُ الَّتِىْ فَشَتْ فِىْ اَيْدِى الثِّقَاتِ فَاِنْ لَّمْ اَجِدْ فَبِقَوْلِ اَصْحَابِهِ اٰخُذُ بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ وَاَدَعُ قَوْلَ مَنْ شِئْتُ وَاَمَّا اِذَا انْتَهَى الْاَمْرُ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِىِّ وَالْحَسَنِ وَالْعَطَاءِ فَاَجْتَهِدُ كَمَا اجْتَهَدُوْا ـ

"আমি কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন মাজীদ থেকে দলিল-প্রমাণ গ্রহণ করতাম। কুরআন মাজীদে দলিল-প্রমাণ না পেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস এবং সহীহ আছার যা নির্ভরযোগ্য রাবীসূত্রে মানুষের কাছে পৌঁছেছে, সে মোতাবেক ফয়সালা করতাম। এতেও না পেলে সাহাবীগণের যে কোনো একজনের অভিমত অনুসারে ফয়সালা করতাম।

বিষয়টি ইবরাহীম নাখ'য়ী, শা'বী, হাসান বসরী ও আতা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলে তখন তাঁরা যেমন ইজতিহাদ করেছেন আমিও তাঁদের অনুরূপ ইজতিহাদ করি।" –[আল-মানাকিব, আল্লামা যাহাবী– পৃ. ২০]

এতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর নিজের ও নিজের আসাতিযায়ে কেরামের রায়ের উপর সর্বদাই হাদীস এবং আছারে সাহাবাকে অগ্রাধিকার দিতেন। হাদীস বিদ্যমান থাকাবস্থায় দীনের কোনো বিষয়ে নিজের রায় প্রকাশ করা এবং সে মতে ফতোয়া দেওয়া তিনি জায়েজ মনে করতেন না। যেমন ইমাম আযম (র.) বলতেন– لَمْ تَزَلِ النَّاسُ فِىْ صَلَاحٍ مَادَامَ فِيْهِمْ مَنْ يَطْلُبُ الْحَدِيْثَ فَإِذَا طَلَبُوا الْعِلْمَ بِلَا حَدِيْثٍ فَسَدُوْا

"যতদিন পর্যন্ত এ উম্মতের মধ্যে হাদীস অন্বেষণকারী লোক বাকি থাকে ততদিন পর্যন্ত এ উম্মতের মধ্যে কল্যাণ অব্যাহত থাকবে। আর যখন লোকেরা হাদীসবিহীন ইলম তলবে লিপ্ত হবে তখন এ উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে।"

–[মীযানুল কুবরা, আল্লামা শা'রানী– খ. ১ পৃ. ৫১]

ইমাম আযম (র.) হাদীসের উপর কিয়াসকে অগ্রাধিকার দিতেন না : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, দুর্বল সনদেও যদি কোনো হাদীস পাওয়া যায় তবে এটিও রায়ের ভিত্তিতে ফয়সালা দেওয়া অপেক্ষা উত্তম। একদা খলিফা আবূ জা'ফর মনসুরের নিকট কোনো এক ব্যক্তি এ মর্মে অভিযোগ করল যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে হাদীসের কোনো পরোয়া করে না। খলিফা এ সম্পর্কে ইমাম আযম (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ভুল শুনেছেন। আমি কখনো এমন করি না। আমি সর্বাগ্রে কুরআনের উপর আমল করি। এরপর হাদীসের উপর আমল করি। এরপর আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ফতোয়ার উপর, এরপর অপরাপর সাহাবীগণের ফতোয়ার উপর আমল করি। যদি কোনো এক মাসআলার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের একাধিক অভিমত থাকে তবে অনন্যোপায় হয়ে এ ক্ষেত্রে আমি কিয়াস করি এবং তাঁদের কোনো একজনের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। –[মীযানুল কুবরা– খ. ১ পৃ. ৫০]

যে ব্যক্তি বলে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) কিয়াসকে হাদীসের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন, তাঁর জবাবে আল্লামা শা'রানী (র.) বলেন, এ জাতীয় কথা এমন ব্যক্তিই বলতে পারে, যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, দীনি ব্যাপারে বেপরোয়া এবং কথাবার্তায় অসতর্ক। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে অনবহিত– إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

অর্থাৎ নিশ্চয় কান, চক্ষু এবং অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটি স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

–[সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬]

এ জাতীয় সতর্কবাণী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি অন্যায় অভিযোগ করা থেকে বিরত না থাকে তবে আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, তার হৃদয়-আত্মা অন্ধ হয়ে গেছে। এ ছাড়া আর কিছু নয়। –[প্রাগুক্ত]

ফিকহে হানাফীর বৈশিষ্ট্য : ফিকহে হানাফীর বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্য হতে কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হলো– ১. হানাফী ফিকহে রেওয়ায়েতের সাথে দেরায়েত তথা বর্ণনার সাথে যুক্তির সামঞ্জস্য রয়েছে। ২. হানাফী ফিকহ অপরাপর ফিকহের তুলনায় সরল এবং সহজে পালনযোগ্য। ৩. হানাফী ফিকহে বাস্তব জীবনব্যবস্থার অংশ অত্যন্ত ব্যাপক, সুদৃঢ় এবং নিয়মতান্ত্রিক। ৪. তাহযিব-তমদ্দুন বা কৃষ্টি-কালচারের জন্য যা যা প্রয়োজন, তা অন্যান্য ফিকহের তুলনায় এতে অনেক বেশি। ৫. হানাফী ফিকহ অনুযায়ী রাষ্ট্র ও বিচারকার্জ পরিচালনা করা অত্যন্ত সহজ। কারণ, এতে প্রজাসাধারণ বিশেষত অমুসলিম প্রজাদের দাবি ও চাহিদার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ৬. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরিত মাসআলা-মাসায়েল হানাফী ফিকহে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও যুক্তিসম্মত। ৭. হানাফী ফিকহে কুরআন, হাদীস এবং একাধিক হাদীসের ক্ষেত্রে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে; যার ফলে হাদীস এবং কুরআনের কোনো আয়াতই আমলের আওতা বহির্ভূত থাকেনি। –[ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ– পৃ. ৭২]

ফিকহে হানাফীর দলিল : ফিকহে হানাফীর মূল দলিল হচ্ছে সাতটি। যথা– ১. কিতাবুল্লাহ ২. সুন্নাহ ৩. সাহাবায়ে কেরামের অভিমত ৪. ইজমা ৫. কিয়াস ৬. ইস্তিহসান ৭. উর্ফ। এসব দলিলের ভিত্তিতে ইমাম আযম (র.) মাসআলা-মাসায়েল إِسْتِنْبَاطْ [উদ্ভাবন] করতেন।

১. **কিতাবুল্লাহ :** ইসলামি ফিকহের মূল উৎসই হলো কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন মাজীদ। কুরআন ইসলামি শরিয়তের প্রদীপ –স্তম্ভ, যা কিয়ামত পর্যন্ত দীপ্তিমান থাকবে। এতে শরিয়তের সামগ্রিক বিধান কুল্লী (كُلِّىْ)-ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামি শরিয়তের অন্য যত উৎস আছে সবই এর থেকে উদগত।

২. **সুন্নাহ :** ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ তথা রাসূল ﷺ -এর হাদীস। কুরআন যেমনিভাবে শরিয়তের প্রামাণ্য দলিল, হাদীসও তেমনিভাবে শরিয়তের প্রামাণ্য দলিল। হাদীস কুরআনেরই ব্যাখ্যা। রাসূল ﷺ -এর ২৩ বছর নবুয়তের জিন্দেগীতে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যায় যেসব কথা বলেছেন এবং যেসব কাজ করেছেন মূলত সেগুলোকেই হাদীস বলা হয়। হাদীস ছাড়া কুরআন বুঝা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যারা হাদীস মানে না তারা মূলত ইসলামকেই মানে না।

৩. **আকওয়ালে সাহাবা :** ফিকহে হানাফীর তৃতীয় মূল উৎস হলো– أَقْوَال صَحَابَة তথা সাহাবায়ে কেরামের অভিমত ও তাঁদের ফতোয়া। ইমাম আবূ হানীফা (র.) মাসায়েল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব মনে করতেন। যখন তিনি কোনো বিষয়ে ইজতিহাদ করতেন এবং সে বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের কোনো বক্তব্য পেতেন তখন তিনি তাঁদের মধ্য থেকে যে কারো বক্তব্য গ্রহণ করতেন। তাঁদের বক্তব্য পেলে অন্য কারো বক্তব্য তিনি গ্রহণ করতেন না। অবশ্য সাহাবায়ে কেরামের মতামত না পেলে তিনি ইজতিহাদ করতেন; তাবেঈগণের তাকলীদ করতেন না।

৪. **ইজমা :** অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদীনে কেরামের শরিয়তের কোনো হুকুমের ব্যাপারে একমত হওয়া। ড. আবূ জুহরা ইজমার সংজ্ঞায় বলেন–

هُوَ اِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِيْنَ مِنَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِىْ عَصْرِ الْحُكْمِ فِىْ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُوْرِ

"কোনো এককালে উম্মতে ইসলামিয়ার মুজতাহিদগণের মধ্যে কোনো শরয়ী বিষয়ে ঐকমত্য হওয়ার নাম ইজমা।" –[শামী– খ. ১ পৃ. ৩৪-৩৫]

মোল্লাজিউন (র.) বলেন–

هُوَ فِى اللُّغَةِ الْاِتِّفَاقُ وَفِى الشَّرِيْعَةِ اِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِيْنَ صَالِحِيْنَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِىْ عَصْرٍ وَاحِدٍ عَلٰى أَمْرٍ قَوْلِيٍّ أَوْ فِعْلِيٍّ.

"ইজমার আভিধানিক অর্থ– একমত হওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় একই যুগের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ -এর উম্মতের নেককার মুজতাহিদগণের উক্তি বা কর্ম জাতীয় কোনো বিষয়ের উপর একমত হওয়াকে ইজমা বলে।"

–[নূরুল আনওয়ার : পৃ. ২২৩]

ইজমার উপরিউক্ত সংজ্ঞার দ্বারা বিদআতি এবং ভ্রান্ত ফিরকাসমূহের লোকদের ঐকমত্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা, হানাফী ফকীহগণের মতে, এ জাতীয় লোকদের ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়। মোটকথা, ইজমা শরিয়তের প্রামাণ্য দলিল। হানাফী মাযহাবের উসূলে ফিকহবিদগণ বলেছেন, ইজমা قَطْعِىْ বা অকাট্য দলিল হিসেবে গণ্য। আর কেউ বলেছেন, ইজমা যন্নী দলিল হিসেবে গণ্য। শায়খ ফখরুল ইসলাম বলেন–

اَلْإِجْمَاعُ ثَلَاثُ مَرَاتٍ اَعْلَاهَا اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَجُعِلَهُ كَالْحَدِيْثِ الْمُتَوَاتِرِ وَالْاَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ يُوْجِبُ قَطْعًا لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِيْنَ شَاهَدُوْا وَعَايَنُوْا وَالثَّانِىْ اِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ فِىْ فَصْلٍ غَيْرِ مُجْتَهِدٍ فِيْهِ فَيَكُوْنُ كَالْحَدِيْثِ الْمَشْهُوْرِ الْمُسْتَفِيْضِ وَالثَّالِثُ فِىْ فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيْهِ فَإِنَّهُ فِىْ هٰذِهِ الْحَالِ يَكُوْنُ كَخَبَرِ الْاَحَادِ يُعْتَبَرُ ظَنِّيًا فَقَطْ تَكُوْنُ فِيْهِ شُبْهَةٌ. (اَلْإِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ حَيَاتُهُ وَعَصْرُهُ وَآرَاءُهُ وَفِقْهُهُ)

উপরিউক্ত শ্রেণীবিন্যাস সে অবস্থাতেই প্রযোজ্য হবে, যদি ইজমা মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে আসে। যদি ইজমার বিষয়টি খবরে ওয়াহেদের ন্যায় পৌঁছে থাকে তবে এর দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা যায় না। যদিও তা সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকুক না কেন। কেননা, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা যদিও قَطْعِيٌّ বা অকাট্য দলিল, কিন্তু খবরে ওয়াহিদ পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়ার কারণে তা খবরে ওয়াহেদের ন্যায় যন্নী (ظَنِّيٌّ) হবে। উল্লেখ্য যে, ইজমা সর্বাবস্থায় কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার পাবে। ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.) বলেন–

مَنْ اَنْكَرَ الْاِجْمَاعَ فَقَدْ اَبْطَلَ دِيْنَهُ لِاَنَّ مَدَارَ اُصُوْلِ الدِّيْنِ كُلِّهَا وَمَرْجِعَهَا اِلٰى اِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ - (اَلْاِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ حَيَاتُهُ وَعَصْرُهُ وَاٰرَاءُهُ وَفِقْهُهُ)

৫. **কিয়াস :** কিয়াস ইসলামি শরিয়তের প্রামাণ্য দলিল। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সকল ইমামই কিয়াসকে ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বস্তুত কিয়াস শব্দের আভিধানিক অর্থ– অনুমান করা, সমন্বিত করা ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায়– تَقْدِيْرُ الْفَرْعِ بِالْاَصْلِ فِى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ

মূল বিষয়ের সাথে হুকুম ও عِلَّتْ -এর মধ্যে কোনো শাখা বিষয়কে তুলনা করাকে কিয়াস বলা হয়।

–[নূরুল আনওয়ার : পৃ. ২২৮]

বস্তুত যে বিষয় সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মধ্যে স্পষ্ট কোনো বিধান নেই, সে জাতীয় বিষয়কে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে বর্ণিত কোনো বিষয়ের হুকুমের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মিলিয়ে বিধান উদ্ভাবন করাকে কিয়াস বলা হয়। ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে কিয়াসের মর্যাদা কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতের পরেই।

৬. **ইস্তিহসান :** উসূলে ফিকহের পরিভাষায় ইসতিহসান (اِسْتِحْسَانٌ) শব্দটি এমন দলিলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যা কিয়াসে জলী (جَلِىٌّ) -এর মোকাবিলায় আসে। অর্থাৎ কিয়াসে জলীকে ছেড়ে কিয়াসে খফী (خَفِىٌّ) -কে অবলম্বন করাকেই اِسْتِحْسَانٌ বলা যায়। কেননা, কিয়াসে জলী অনেক সময় এমন একটি বিষয় চায় যা নস [কুরআন, হাদীস, ইজমা ও উর্‌ফ] -এর পরিপন্থি। এমতাবস্থায় উসূলবিদগণের মতে, কিয়াসে জলী (جَلِىٌّ) -কে বাদ দেওয়া পছন্দনীয়। তাই এটাকে اِسْتِحْسَانٌ বলা হয়।

উসূলে ফিকহের পরিভাষায় সাধারণত اِسْتِحْسَانٌ বলতে قِيَاس خَفِىٌّ আর কিয়াস বলতে قِيَاس جَلِىٌّ -কে বুঝানো হয়ে থাকে। মূলত اِسْتِحْسَانٌ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও উর্‌ফ বিরোধী কোনো কিছু নয়; বরং ক্ষেত্র বিশেষে কিয়াসকে পরিহার করে এ সবের উপর আমল করার নামই হলো اِسْتِحْسَانٌ

৭. **উর্‌ফ :** হানাফী ফিকহে উর্‌ফ শরিয়তের সহকারী উৎস হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা মানুষের সমস্যা সমাধান না করা গেলেই সে অবস্থায় اِسْتِحْسَانٌ অথবা উর্‌ফ দ্বারা মানুষের সমস্যা সমাধান করা হতো। এ বিষয়ে সাহল ইবনে মুজাহিম (র.) বলেন–

كَلَامُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَخْذٌ بِالثِّقَةِ وَفِرَارٌ مِنَ الْقُبْحِ وَالنَّظَرُ فِىْ مُعَامَلَاتِ النَّاسِ وَمَا اسْتَقَامُوْا عَلَيْهِ وَصَلُحَتْ عَلَيْهِ اُمُوْرُهُمْ يَمْضِى الْاُمُوْرَ عَلَى الْقِيَاسِ فَاِذَا قَبُحَ الْقِيَاسُ يَمْضِيْهَا عَلَى الْاِسْتِحْسَانِ مَادَامَ يَمْضِىْ لَهُ فَاِذَا لَمْ يَمْضِ لَهُ رَجَعَ اِلٰى مَا يَتَعَامَلُ بِهِ الْمُسْلِمُوْنَ - –[শামী : খ. ১ পৃ. ৩৫]

ফিকহে হানাফী ও হাদীস

উপরে যেসব দলিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হলো ফিকহে হানাফীর দলিল। তন্মধ্যে চারটি হলো মৌলিক দলিল, আর বাকি তিনটি হলো সহকারী দলিল। এ সবের উপর ভিত্তি করেই ফিকহে হানাফী রচিত ও সম্পাদিত হয়েছে। ফিকহে হানাফীর কোনো কথাই উপরিউক্ত দলিলসমূহের বাইরের নয়। বিশেষভাবে কুরআন ও হাদীসের

বাইরের নয়। তা সত্ত্বেও কতেক লোক এ কথা প্রমাণ করার অহেতুক চেষ্টা করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) মাসায়েল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে হাদীসের উপর খুব কমই নির্ভর করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, তিনি কিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের এ উক্তি যথার্থ কিনা? তা জানতে হলে আমাদেরকে যাচাই করে দেখতে হবে যে, আসলেই কি ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন, নাকি প্রতিকূল মনোভাব? যদি তিনি কতেক হাদীসের ব্যাপারে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করে থাকেন তাহলে তা কি কুরআন ও হাদীসে মাশহূরের দলিলের ভিত্তিতে, নাকি বিনা দলিলে? এ বিষয়গুলো জানার পরই আমরা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ভূমিকা এবং অবস্থান যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারব। বস্তুত যারা বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) কিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন তাদের এ বক্তব্য একেবারেই অবাস্তব। এ জাতীয় অহেতুক ভিত্তিহীন অভিযোগ খণ্ডন করে স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন–

كَذَبَ وَاللّٰهِ وَافْتَرٰى عَلَيْنَا مَنْ يَقُوْلُ اِنَّنَا نُقَدِّمُ الْقِيَاسَ عَلَى النَّصِّ وَهَلْ يَحْتَاجُ بَعْدَ النَّصِّ إِلَى الْقِيَاسِ ـ

–[আল মীযান– খ. ১ পৃ. ৫১]

আরো সামনে বেড়ে তিনি বলেন– نَحْنُ لَا نَقِيْسُ اِلَّا عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ الشَّدِيْدَةِ [প্রাগুক্ত]

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন–

اِنَّا نَاخُذُ اَوَّلًا بِكِتَابِ اللّٰهِ ثُمَّ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ بِاَقْضِيَةِ الصَّحَابَةِ وَنَعْمَلُ بِمَا يَتَّفِقُوْنَ عَلَيْهِ فَاِنِ اخْتَلَفُوْا قِسْنَا حُكْمًا عَلٰى حُكْمٍ بِجَامِعِ الْعِلَّةِ بَيْنَ الْمَسْئَلَتَيْنِ حَتّٰى يَتَّضِحَ الْمَعْنٰى ـ [প্রাগুক্ত]

তিনি আরো বলেন– مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ وَلَيْسَ لَنَا مُخَالَفَتُهُ ـ وَمَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِهِ تَخَيَّرْنَا وَمَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِمْ فَهُمْ رِجَالٌ نَحْنُ رِجَالٌ ـ –[প্রাগু :ক্ত পৃ. ৫২]

উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া কস্মিনকালেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নীতি হতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফা তো দূরের কথা কোনো ফকীহই এ নীতি অবলম্বন করতে পারেন না। আর এ কারণে তিনি مُتَعَارِضْ [বাহ্যত সাংঘর্ষিক] দুই হাদীসের ক্ষেত্রে تَطْبِيْق [সামস্য বিধান করা], تَرْجِيْح [অগ্রাধিকার প্রদান], نَسْخ [রহিতকরণ] বা تَسَاقُطْ [বাদ দেওয়া] নীতি অবলম্বন করেছেন। সর্বোপরি বাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদীসকে একত্রিত করে এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি মাসআলা তুলে ধরা হলো–

مَسْئَلَةُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ : তাকবীরে তাহরীমার সময় رَفْع يَدَيْن তথা উভয় হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করা সুন্নত। এতে ইমাম চতুষ্টয়ের সকলেই একমত। এ ছাড়া রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করার সময় رَفْع يَدَيْن করা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট সুন্নত নয়। এ বিষয়টি একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন–

١. عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَلَا اُصَلِّيْ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا فِيْ اَوَّلِ مَرَّةٍ ـ

–[তিরমিযী শরীফ– খ. ১ পৃ. ৩৫]

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে حَسَنْ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা আহমদ শাকের (র.) বলেন–

وَهٰذَا الْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ وَمَا قَالُوْا فِيْ تَعْلِيْلِهِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ ـ

–[শরহে তিরমিযী, আহমদ শাকের– খ. ২ পৃ. ৪১]

٢. عَنِ الْبَرَاءِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ ـ

–[আবূ দাউদ শরীফ– খ. ১ পৃ. ১০৯]

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) نَيْلُ الْفَرْقَدَيْنِ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং উক্ত হাদীসের ব্যাপারে যত ধরনের আপত্তি উত্থাপন হয়েছে, এক এক করে তিনি সবকটিরই জবাব দিয়েছেন।

–[দরসে তিরমিযী : খ. ২ পৃ. ৩২-৩৩]

৩. عَنْ عَبَّادِ بْنِ زُبَيْرٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا فِىْ شَىْءٍ حَتّٰى يَفْرُغَ۔ –[বায়হাকী শরীফ : সূত্র– নসবুর রায়া– খ. ১ পৃ. ৪০৪]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) اَلدِّرَايَةُ فِىْ تَخْرِيْجِ اَحَادِيْثِ الْهِدَايَةِ গ্রন্থে উক্ত হাদীস উল্লেখ করার পর পর বলেন– لِيَنْظُرْ فِىْ اِسْنَادِهٖ আল্লামা কাশ্মীরী (র.) বলেন, আমি হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর নির্দেশ পালনার্থে হাদীসটির সনদ তন্ন তন্ন করে যাচাই করে দেখেছি যে, এর প্রত্যেক রাবীই ছিকা ও নির্ভরযোগ্য। তবে আব্বাদ ইবনে জুবাইর হলেন তাবেয়ী। এ হিসেবে হাদীসটি মুরসাল হাদীস হিসেবে পরিগণিত হয়। আর মুরসাল হাদীস জমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে হুজ্জাত।

এভাবে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উত্তোলনকালে رَفْع يَدَيْن সুন্নত না হওয়ার ব্যাপারে আরো বহু হাদীস এবং আছারে সাহাবা রয়েছে। সর্বোপরি উপরিউক্ত অবস্থায় رَفْع يَدَيْن না করার বর্ণনাগুলো কুরআনের আয়াত وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ [আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াও] দ্বারা সমর্থিত। এমনিভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে কোনোরূপ اِضْطِرَابْ ও اِخْتِلَافْ নেই এবং এ ব্যাপারে তাঁর থেকে দুই রকমের আমলও বর্ণিত নেই। অর্থাৎ তাঁর থেকে শুধুমাত্র رَفْع يَدَيْن না করাই বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে যারা رَفْع يَدَيْن-এর রেওয়ায়েত করেছেন তাঁদের রেওয়ায়েতের মধ্যে اِخْتِلَافْ ও বৈপরীত্য রয়েছে। স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে একদিকে رَفْع يَدَيْن করার রেওয়ায়েত রয়েছে, অপর দিকে তাঁর নিজের আমল এর বিপরীত রয়েছে। অনুরূপভাবে মদিনা ও কুফাবাসী সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমলও رَفْع يَدَيْن না করার উপর। অধিকন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণিত এর বর্ণনা পরম্পরায় যে রাবীগণ রয়েছেন তাঁরা সকলেই হলেন ফকীহ। কাজেই এ হাদীসটি ঐসব বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত যাকে مُسَلْسَلٌ بِالْفُقَهَاءِ বলা হয়। অতএব, এ হাদীসটি অপরাপর হাদীসের তুলনায় অগ্রগণ্য হবে। রাবী ফিকহী ব্যুৎপত্তির ভিত্তিতে তাঁর বর্ণিত হাদীস অপরাপর বর্ণনার তুলনায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত থাকে। এ কথাটি নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়–

সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না (রা.) বলেন, একদা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আওযা'য়ী (র.) মক্কা শরীফের দারুল হায়াতীন-এর মধ্যে মিলিত হলেন। এ সময় ইমাম আওযা'য়ী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে মাথা উত্তোলনকালে رَفْع يَدَيْن করেন না? জবাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উত্তোলনকালে উভয় হাত উঠানোর বিষয়টি সহীহ সনদে রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। এ কারণে আমি তা করি না। ইমাম আওযা'য়ী (র.) বলেন, এটা কেমন করে হতে পারে? وَقَدْ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.) বললেন–

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَلَا يَعُوْدُ اِلٰى شَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ۔

তখন ইমাম আওযা'য়ী (র.) বলেন– اُحَدِّثُكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ وَتَقُوْلُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ

ইমাম আবূ হানীফা (র.) জবাবে বলেন, হাম্মাদ (র.) যুহরী (র.)-এর তুলনায় বড় ফকীহ ছিলেন। ইবরাহীম (র.) সালেম (র.)-এর তুলনায় বড় ফকীহ ছিলেন, আর আলকামা (র.) ইবনে ওমর (রা.) থেকে কোনো অংশেই কম নন। যদিও ইবনে ওমর (রা.) সাহাবী ছিলেন, আর আসওয়াদ তো অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে–

اِبْرَاهِيْمُ اَفْقَهُ مِنْ سَالِمٍ وَلَوْلَا فَضْلُ الصُّحْبَةِ لَقُلْتُ اِنَّ عَلْقَمَةَ اَفْقَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدُ اللّٰهِ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ ـ

উক্ত বর্ণনায় আব্দুল্লাহ দ্বারা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ উপরিউক্ত রাবীগণের মধ্যে কেউই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর সমকক্ষ নন। উপরিউক্ত বিতর্ক থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, দু বর্ণনার মধ্যে বিরোধকালে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) রাবীর ফিকহী জ্ঞানকে গভীরভাবে লক্ষ্য করতেন। অর্থাৎ যে রাবী ফিকহের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হতেন তাকেই প্রাধান্য দিতেন। এর কারণ ছিল হানাফী ফকীহগণের মতে, যিনি ফকীহ তার বর্ণনার সাথে যিনি ফকীহ নন তাঁর বর্ণনার মোকাবিলা হতে পারে না। কেননা, ফকীহ রাবী হিফজ ও যবতের দিক থেকে অধিকতর শক্তিমান। সুতরাং ফকীহ রাবীগণের রেওয়ায়েত অন্যান্য রাবীর রেওয়ায়েতের তুলনায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। [اَلْاِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ حَيَاتُهُ وَعَصْرُهُ وَاٰرَاءُهُ وَفِقْهُهُ পৃ. ২৪৪-২৪৫]

তাকলীদ : পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস হলো কুরআন ও হাদীস। পরবর্তীতে কুরআন-হাদীসের আলোকে সম্পূরক আরো দুটি উৎস তথা ইজমা ও কিয়াসের সংযোজন ঘটে। এ দলিল চতুষ্টয়ের ভিত্তিতে ইমাম ও মুজতাহিদগণ ইসলামি শরিয়তের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং একে বিন্যস্ত করেছেন। কুরআন-হাদীস এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং ইজতিহাদী দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দরুন মুজতাহিদ ইমামগণের সিদ্ধান্তে ভিন্নতা দেখা দেয়। এর ফলে বহু মাযহাবের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী সময়ে যে চারটির উপরে মুসলিম উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয় সে ৪টি মাযহাব হলো– ১. হানাফী ২. মালেকী ৩. শাফেয়ী ও ৪.হাম্বলী। ৪ মাযহাবের যে কোনো একটির অনুসরণ বা তাকলীদ করলেই কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ হয়ে যাবে। বস্তুত তাকলীদ (تَقْلِيْد) শব্দটি আরবি। এর অর্থ– গলার মালা বা হার পরিয়ে দেওয়া। উসূলে ফিকহ -এর ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতে তাকলীদের সংজ্ঞা হলো–
اَلْعَمَلُ بِقَوْلِ اِمَامٍ مُجْتَهِدٍ مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةِ دَلِيْلٍ –[কাওয়ায়িদুল ফিকহ : মুফতি আমীমুল ইহসান (র.)]

দলিল-প্রমাণ অন্বেষণ ব্যতীত এ কথার মানে হলো, মুকাল্লিদ (مُقَلِّدْ) তাঁর ইমামের প্রতি এরূপ আস্থা পোষণ করবে যে, অনুসরণীয় বিষয়ে আমার ইমামের নিকট প্রমাণ তো অবশ্যই আছে এবং তা সত্যও বটে। কাজেই প্রমাণ পেলে অনুসরণ করব আর প্রমাণ না পেলে অনুসরণ করব না– এরূপ দুশ্চিন্তার আমি শিকার হব না। অবশ্য কোনো ইমামের তাকলীদ করার পর প্রমাণ জানতে সচেষ্ট হওয়া তাকলীদের পরিপন্থি কাজ নয়। উল্লেখ্য যে, কুরআন-হাদীসের মর্ম দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত–

১. যেসব মর্ম অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত তা উদ্ধারে কোনোরূপ অস্পষ্টতা, সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। যেমন– নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি ফরজ হওয়া এবং চুরি, জেনা ও মদ পান ইত্যাদি হারাম হওয়া। এ সবের হুকুম-আহকাম কুরআন-হাদীস হতে সবাই উদ্ধার করতে সক্ষম। কাজেই এ শ্রেণীর আয়াত ও হাদীসের মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও তাকলীদের কোনো প্রয়োজন নেই।

২. এমন সব আয়াত ও হাদীস যার মধ্যে বাহ্যত কোনো না কোনো অস্পষ্টতা ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান রয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন– وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ

"তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন কুরু পর্যন্ত ইদ্দত পালনের জন্য অপেক্ষা করবে।" [সূরা বাকারা : ২২৮]

আয়াতে উল্লিখিত قُرُوْءٌ শব্দটি দুটি অর্থবোধক। যথা– ১. حَيْض ২. طُهْر এ আয়াতে কোন অর্থটি উদ্দেশ্য তা অস্পষ্ট। তাই আয়াতের যুক্তিযুক্ত অর্থ নিরূপণে ইজতিহাদ প্রয়োজন, যা সাধারণ মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে আছে– مَنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُوْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ "কোনো ব্যক্তি যদি مُخَابَرَة [বর্গাচাষ] পরিত্যাগ না করে তবে সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়।" –[আবূ দাউদ– পৃ. ৪৮৩]

এখানে বাহ্যত অস্পষ্টতা এই যে, مُخَابَرَة [ভূমি চাষ ব্যবস্থা] বহু প্রকারের হতে পারে। যথা– টাকার বিনিময়ে, ফসলের অংশের বিনিময়ে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানের ফসলের বিনিময়ে ইত্যাদি। এ হাদীসে কোন ধরনের مُخَابَرَة উদ্দেশ্য? তা নির্ণয় করা হয়তো সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, উক্ত আয়াত ও হাদীসে যে অস্পষ্টতা রয়েছে তা নিরসনে হয়তো প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বিবেক ও বিবেচনা অনুযায়ী আমল করবে। অথবা কোনো মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করবে। আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, এরূপ বিষয়ে সাধারণ মানুষ নিজ বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে গেলে মারাত্মক ভ্রান্তির আশঙ্কা রয়েছে। তখন যত মানুষ তত মাযহাব সৃষ্টি হবে। ফলে ইসলামের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবে। এমন কি অস্তিত্বই আর অক্ষুণ্ন থাকবে না। পক্ষান্তরে কুরআন ও হাদীস বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণে সেই আশঙ্কা নেই। এ কারণেই ইমাম চতুষ্টয়ের কোনো একজনের তাকলীদ ও অনুসরণ করাকে সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইমামের অনুসরণ করা মানে কুরআন ও হাদীসকে বাদ দেওয়া নয়; বরং কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করার জন্যই কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যাকার হিসেবে তাঁদের অনুসরণ করা। কেননা, তাঁদের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব নয়; বরং সেটা হবে নফস-পরসতী বা আত্মপূজা। পক্ষান্তরে যারা তাকলীদের বিরুদ্ধে প্রলাপোক্তি করে তারাও প্রকৃতপক্ষে কারো না কারো অবশ্যই তাকলীদ করে। যেমন– এ হাদীসটি সহীহ বা জ'য়ীফ [দুর্বল] বা মুনকার –এ কথা আমরা কিভাবে বলতে পারি? যাঁরা সারাজীবন সাধনা করে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন তাঁদের অনুসরণ করেই আমরা এ কথা বলি। আমরা বলি, এ হাদীসটি বুখারী শরীফে আছে, কাজেই এটি সহীহ। এভাবে বলে আমরা কি মূলত ইমাম বুখারী (র.)-এর অনুসরণ করছি না? এ ক্ষেত্রে যদি তাকলীদ বৈধ হয় তবে ফিকহের ক্ষেত্রে তাকলীদ বৈধ হবে না কেন? বস্তুত তাকলীদ দুই প্রকার। যথা– ১. তাকলীদে মুতলাক ২. তাকলীদে শাখসী। তাকলীদে মুতলাক মানে হলো, নির্দিষ্ট কোনো ইমামের তাকলীদ না করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইমামের মতের অনুসরণ করা। তাকলীদে শাখসী মানে হলো, শরিয়তের সামগ্রিক বিষয়ে নির্দিষ্ট একজন ইমামের অনুসরণ করা। উল্লেখ্য যে, রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাকলীদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা, তখন সরাসরি রাসূল ﷺ থেকেই সমাধান পাওয়া যেত। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর ওহীর মাধ্যমে নতুন বিষয়ে সমাধান লাভ করার ধারা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ইজতিহাদ ও তাকলীদের সূচনা হয়। তবে সাহাবীগণের মাঝে তাকলীদে মুতলাকই অধিক প্রচলিত ছিল। এ তাকলীদে মুতলাকের ধারা ক্রমান্বয়ে তাকলীদে শাখসীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। অতঃপর হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী –এ চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসরণ [তাকলীদে শাখসী]-এর উপর মুসলিম উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে তাকলীদ বলতে তাকলীদে শাখসীকেই বুঝানো হয়ে থাকে। তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতার উপর কুরআন ও হাদীসে বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু এ দাবিটি যুক্তিসঙ্গতও বটে। কেননা, কুরআন ও হাদীসের সঠিক মর্ম উদ্ধার করে এর উপর আমল করা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই শরিয়ত মোতাবেক আমল করার জন্য কোনো ইমামের অনুসরণ অপরিহার্য। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ এ আয়াতে যারা জানে না তাদেরকে আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ করা হয়েছে। এর দ্বারা তাকলীদের

আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়। তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– إِنِّيْ لَا أَدْرِيْ مَا بَقَائِيْ فِيْكُمْ فَاقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ (رض)

"আমি জানি না কতদিন পর্যন্ত তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান থাকবে। সুতরাং তোমরা আমার পরে এই দু'জনের অনুসরণ করবে। অর্থাৎ আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর অনুসরণ করবে।" –[তিরমিযী শরীফ– পৃ. ৫৬০]

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমামগণের মতভেদের কারণ : প্রিয়নবী ﷺ -এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামের যুগে মুসলমানদের বিজয় সম্প্রসারিত হয়। বহু দেশ মুসলমানদের দখলে আসে, যার ফলে এমন নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় যা সমাধানের জন্য গবেষণা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর কুরআন-হাদীসের সংক্ষিপ্ত বিধি-বিধানকে বিস্তারিত আলোচনায় সমৃদ্ধ করতে জ্ঞানপণ্ডিত সাহাবায়ে কেরাম বাধ্য হন। যেমন– কেউ ভুলক্রমে নামাজের কোনো অঙ্গহানি করলে তার নামাজের বৈধতার প্রশ্নে পর্যালোচনা শুরু হতো। এ সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পর নামাজের সকল অঙ্গকে যেহেতু ফরজ বলা যায় না সেহেতু বাধ্য হয়ে সাহাবায়ে কেরাম নামাজের অন্তর্ভুক্ত করণীয় কাজগুলোর শ্রেণীবিন্যাস করেন। অতএব কতিপয়কে ফরজ সাব্যস্ত করেন, যা বিনষ্টের দরুন নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে। কতিপয়কে ওয়াজিব নির্ধারণ করেন, যা বর্জনের দরুন নামাজ পূর্ণাঙ্গ হবে না। আর কতিপয়কে মোস্তাহাব হিসেবে নির্ধারণ করেন, যার পরিত্যাগ তেমন দোষণীয় নয়। এসব ব্যাপারে জ্ঞান রাখা একান্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপ আরো বহু সমস্যা দেখা দেয়। এরূপ ইসলামের সমুদয় নির্দেশ ও হুকুম-আহকামের পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য ফিকহবিদগণ বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করেন। ফলে সকলের একমত হওয়া কিছুতেই সম্ভব হয়নি। সুতরাং ফিকহবিদদের অভিমত বিভিন্ন হয় এবং মাসআলার সিদ্ধান্তে মতভেদ সৃষ্টি হয়। আর এমন সব ঘটনা সৃষ্টি হয়ে থাকে যার নাম–নিশানাও রাসূল ﷺ -এর যুগে ছিল না। সুতরাং ফিকহবিদগণের ইজতিহাদ ও কিয়াস পর্যালোচনার দ্বারা সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের তারতম্যের কারণেও মাসআলাসমূহে মতভেদ হয়েছে। কেননা, ইসলাম একত্রে একই মুহূর্তে পূর্ণতা লাভ করেনি। তা ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ ২৩ বছরে পূর্ণতা অর্জন করে। স্থান বিশেষে ইসলামি নির্দেশাবলি পরিবর্ধন ও রহিত হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে সর্বকাজে সর্বস্থানে সর্বদা সকল সাহাবীর রাসূল ﷺ-এর সাথে থাকাও সম্ভব ছিল না। অতএব, সকল সাহাবীর সকল মাসআলায় সমান জ্ঞান থাকা মোটেই সম্ভব ছিল না। যে যতটুকু রাসূল ﷺ -এর নিকট শুনেছেন বা রাসূল ﷺ -কে করতে দেখেছেন তিনি ঠিক ততটুকু কাজ করে যেতেন। কাজেই মতভেদ হওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব মাসআলায় মতভেদের কারণ মোট তিনটি বলা যেতে পারে। যথা– ক. কুরআন ও হাদীসের শব্দের অর্থ অনুধাবন করতে মতভেদ। খ. মাসআলার উত্তর প্রদানে সাহাবায়ে কেরামের কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের তারতম্য। গ. মাসআলা রচনা করার মূলনীতিতে মতভেদ।

উপরিউক্ত মতভেদ বর্তমান থাকাবস্থায় ফিকহবিদ সাহাবীগণ এবং তাঁদের শিষ্যগণ খেলাফতে রাশেদা ও তৎপরবর্তী যুগে বিজিত বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। প্রথম দিকে তাঁদের মধ্যকার মতানৈক্য তেমন প্রকট ছিল না, কিন্তু মতানৈক্যের যে বীজ তখন স্থাপিত হয়েছিল তা থেকে চারা গজিয়ে কালক্রমে তা বিরাট আকার ধারণ করে। যার ফলে ধারাবাহিক শ্রেণীবদ্ধ ফিকহ শাস্ত্র রচনা করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ফকীহ ও মুজতাহিদগণের শ্রেণীবিন্যাস : আল্লামা শামসুদ্দীন ইবনে কামাল পাশা (র.) বলেছেন, ফকীহ ও মুজতাহিদগণ ৭ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা–

১. مُجْتَهِدٌ فِي الشَّرْعِ
২. مُجْتَهِدٌ فِي الْمَذْهَبِ
৩. مُجْتَهِدٌ فِي الْمَسَائِلِ
৪. أَصْحَابُ التَّخْرِيْجِ
৫. أَصْحَابُ التَّرْجِيْحِ
৬. أَصْحَابُ التَّمْيِيْزِ
৭. مُقَلِّدِيْنَ مَحْض

প্রথম শ্রেণী : مُجْتَهِدٌ فِى الشَّرْعِ : তাঁরা হলেন ঐ সকল মহান ফুকাহা ও মুজতাহিদীনে কেরাম, যাঁদেরকে আল্লাহ পাক ইজতিহাদের সর্বোচ্চ যোগ্যতা দান করেছেন। তারা স্বাধীনভাবে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস থেকে ইজতিহাদ করে মাসায়েল বের করতে সক্ষম এবং উসূল (أُصُوْل) ও ফুরূ (فُرُوْع) -এর ক্ষেত্রে কারো নির্ধারিত নীতিমালার অনুসারী বা মুকাল্লিদ নন; বরং তাঁরা নিজেরাই কুরআন–হাদীস থেকে ইজতিহাদের নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তাঁদেরকে মুজতাহিদে মুতলক (مُجْتَهِدٌ مُطْلَقٌ) এবং মুজতাহিদে মুস্তাকিল (مُجْتَهِدٌ مُسْتَقِلٌّ)-ও বলা হয়। তাঁরা হলেন ৪ ইমাম তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এবং সে যুগের আরো কতিপয় ইমাম।

দ্বিতীয় শ্রেণী : مُجْتَهِدٌ فِى الْمَذْهَبِ : তাঁরা ঐ সকল ফিকহবিদ, যাঁরা مُجْتَهِد مُطْلَقٌ-এর কোনো ইমামের নির্ধারিত মূলনীতি অনুসরণ করে সে আলোকে ইজতিহাদপূর্বক কুরআন ও হাদীস থেকে মাসায়েল আহরণ করেন। এ শ্রেণীর মুজতাহিদগণকে مُجْتَهِد مُنْتَسِبْ-ও বলা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম জুফার (র.), ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.), ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) প্রমুখ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় শ্রেণী : مُجْتَهِدٌ فِى الْمَسَائِلِ : তাঁরা ঐ সকল ফিকহবিদ, যাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ইমামগণের পক্ষ থেকে যে সকল বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে ইমামের নির্ধারিত মূলনীতির অনুসরণ করে ফয়সালা দিতে এবং মাসায়েল আহরণ করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে ইমামের বর্ণিত সিদ্ধান্ত ও মতামতের বিষয়ে দ্বিমত পোষণের অধিকার এ শ্রেণীর মুজতাহিদগণের নেই। ইমাম ত্বাহাবী (র.), ইমাম কারখী (র.), ইমাম সারাখসী (র.) প্রমুখ এ শ্রেণীর ফকীহগণের অন্তর্ভুক্ত।

৪র্থ শ্রেণী : أَصْحَابُ التَّخْرِيْجِ : তাঁরা ঐ সকল ফিকহবিদ, যাঁদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা বিদ্যমান নেই। তবে উসূল ও নীতির উপর পারদর্শিতা থাকার কারণে মাযহাবের ইমামগণ থেকে বর্ণিত কোনো অস্পষ্ট বাক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং দ্ব্যর্থবোধক (ذُوالْوَجْهَيْنِ) বাক্যের কোনো একটিকে নির্ধারিত করার ব্যাপারে তাঁদের যোগ্যতা রয়েছে। ইমাম আবূ বকর রাজী (র.) এবং হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহানুদ্দীন মরগিনানী (র.) এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম শ্রেণী : أَصْحَابُ التَّرْجِيْحِ : তাঁরা ঐ সকল ফিকহবিদ যাদের কাজ হলো ইমামের পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ে বর্ণিত একাধিক মতামতের কোনো একটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। অগ্রাধিকার নির্ণয়ের সময় তাঁরা বলেন– هٰذَا أَوْلٰى . هٰذَا أَصَحُّ . هٰذَا أَوْفَقُ بِالْقِيَاسِ ইত্যাদি। ইমাম কুদূরী (র.) প্রমুখ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৬ষ্ঠ শ্রেণী : أَصْحَابُ التَّمْيِيْزِ : তাঁরা ঐ সকল ফিকহবিদ যাঁরা ইমামের মাযহাবের মুকাল্লিদ। তাঁদের কাজ হলো ইমামগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলিলের ভিত্তিতে কোনটি সবল, কোনটি দুর্বল তা নির্ণয় করা। বিকায়া, কান্‌জ, মুখতার ইত্যাদি গ্রন্থকারগণ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তম শ্রেণী : مُقَلِّدِيْن مَحْض : তাঁরা ঐ সকল ওলামায়ে কেরাম, যারা উল্লিখিত যোগ্যতাসমূহের কোনো একটির উপরও ক্ষমতা রাখে না, যারা দুর্বল ও সবলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না এবং যেখানে যে ধরনের মতামত পায় তা-ই বর্ণনা করে থাকে। এ সকল আলেমকে নিছক মুকাল্লিদ বলা হয়। তাঁদের নিজস্ব মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।
–[শামী– খ. ১ পৃ. ৭৭]

ফিকহে হানাফীর বিভিন্ন পরিভাষা : ইসলামের বিধান মতে মানুষের কাজগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। যথা– ১. مَشْرُوْع অর্থাৎ শরিয়ত সম্মত ও শরিয়ত অনুমোদিত ২. غَيْر مَشْرُوْع অর্থাৎ শরিয়ত পরিপন্থি কাজ। শরিয়তসম্মত ও শরিয়ত অনুমোদিত কার্যাবলি আবার ৭ প্রকার। যথা– ১. ফরজ ২. ওয়াজিব ৩. সুন্নত ৪. মোস্তাহাব ৫. হারাম ৬. মাকরূহে তাহরীমী ও তানযীহী এবং ৭. মুবাহ।

১. **ফরজ :** অবশ্য পালনীয়। আল্লাহ তা'আলার অলঙ্ঘনীয় আদেশ যা দলীলে কাত'য়ী তথা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ফরজকে অস্বীকারকারী কাফের এবং বর্জনকারী ফাসিক বলে

গণ্য হবে। ফরজ দুই প্রকার। যথা– ১. ফরজে আইন যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ, ২. ফরজে কিফায়া যা আদায় করা সকল মুসলমানের উপর ফরজ নয়; বরং সমাজের কিছু লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। আর কেউই যদি আদায় না করে তবে সকলেই গুনাহগার হবে।

২. **ওয়াজিব :** ওয়াজিব ও ফরজের ন্যায় অবশ্য পালনীয়। তবে আকিদাগত দিক থেকে ওয়াজিব এবং ফরজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা, ফরজ প্রমাণিত অকাট্য দলিল দ্বারা এবং ওয়াজিব প্রমাণিত দলীলে যন্নী (ظَنِّىْ) দ্বারা যাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ওয়াজিবকে অস্বীকারকারী গুনাহগার হবে, কিন্তু কাফের হবে না।

৩. **সুন্নত :** ফরজ বা ওয়াজিব ব্যতীত দীনের যে সমস্ত কাজ নবী করীম ﷺ নিজে করেছেন, করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা অনুমোদন করেছেন শরিয়তের পরিভাষায় তাকে সুন্নত বলা হয়। তা ছাড়া খোলাফায়ে রাশেদীন যে সমস্ত কাজ প্রবর্তন করেছেন সেগুলোকেও রাসূল ﷺ সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعُضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

সুন্নত আবার দুই প্রকার– ক. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা; খ. সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা।

ক. **সুন্নাতে মুয়াক্কাদা :** যেসব কাজ নবী করীম ﷺ ইবাদত হিসেবে নিয়মিতভাবে পালন করেছেন, তবে ওজরবশত কখনো ছেড়ে দিয়েছেন। আমলের দিক থেকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ওয়াজিবের কাছাকাছি। বিনা কারণে তা বর্জন করা এবং তা বর্জনের অভ্যাস করা অনুচিত ও গুনাহের কাজ।

খ. **সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা :** যেসব কাজ নবী করীম ﷺ অভ্যাসগতভাবে নিয়মিত করেছেন এবং বিনা কারণে তা কখনো ছেড়ে দিয়েছেন। এ কাজ যারা করবেন, তারা সওয়াবের অধিকারী হবেন, কিন্তু না করলে কোনো গুনাহ হবে না। –[ফাতাওয়া ও মাসায়েল– খ. ১ পৃ. ৩৩-৩৪]

৪. **মোস্তাহাব :** যেসব কাজ করার জন্য রাসূল ﷺ কখনো কখনো লোকদেরকে উৎসাহিত করেছেন। মোস্তাহাব কাজ আদায়কারী ছওয়াবের অধিকারী হবে, কিন্তু না করলে কোনো গুনাহ হবে না।

৫. **হারাম :** যেসব কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই, তাকে হারাম বলা হয়। বিনা ওজরে কেউ হারাম কাজ করলে সে ফাসিক বলে গণ্য হবে এবং কঠিন শাস্তির উপযোগী হবে, আর যদি কেউ তা অস্বীকার করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

৬. **মাকরূহ :** মাকরূহ আবার দুই প্রকার। যথা– ক. মাকরূহে তাহরীমী– যেসব কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং দলীলে যন্নী (ظَنِّىْ) দ্বারা প্রমাণিত। বিনা ওজরে এসব কাজ করা গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। খ. মাকরূহে তানযীহী– যে কাজে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি শরিয়তে দৃঢ়তার সাথে প্রমাণিত নয় এবং যা বর্জন করলে ছওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু করলে শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হবে না।

৭. **মুবাহ :** যে কাজ করাতে কোনো ছওয়াব নেই এবং না করাতে কোনো গুনাহ নেই।

–[আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ– খ. ১ পৃ. ৫২-৫৩]

শর্ত (شَرْط) : مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُوْدُ الشَّئِ وَكَانَ خَارِجًا عَنْ حَقِيْقَتِهِ

রুক্‌ন (رُكْن) : রুকন বলা হয় যা কোনো বস্তুর হাকীকতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সহীহ (صَحِيْح) : هُوَ مَا اسْتَوْفَى اَرْكَانُهُ وَشُرُوْطُهُ الشَّرْعِيَّةُ

ফাসিদ (فَاسِدْ) : যদি কোনো বস্তুর وَصْف-এর মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকে তবে একে ফাসেদ (فَاسِدْ) বলা হবে।

বাতিল (بَاطِلْ) : যদি কোনো বস্তুর মূল বিষয়ে কোনো ত্রুটি থাকে তবে একে বাতিল বলা হবে।

আদা (اَدَاء) : কোনো আমল নির্ধারিত সময়ের ভিতরে সম্পাদন করাকে আদা বলা হয়।

কাজা (قَضَاء) : কোনো আমলকে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সম্পাদন করাকে কাজা (قَضَاء) বলা হয়।

দোহরানো (اِعَادَة) : নির্ধারিত সময়ের ভিতরে পুনর্বার আদায় করাকে দোহরানো (اِعَادَة) বলা হয়। –[প্রাগুক্ত পৃ. ৫৫-৫৬]

ইলমুল ফিকহের কতিপয় পরিভাষা :

১. صَاحِبَيْن ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে একত্রে صَاحِبَيْن বলা হয়।

২. شَيْخَيْن ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-কে একত্রে شَيْخَيْن বলা হয়।

৩. طَرَفَيْن ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে একত্রে তরফাইন বলা হয়।

৪. اَئِمَّتُنَا الثَّلَاثَةُ ইমাম আবূ হানীফা (র.), আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-কে একত্রে اَئِمَّتُنَا الثَّلَاثَةُ বলা হয়।

৫. اَلْمُتَقَدِّمِيْنَ ইমাম আবূ হানীফা (র.) ফিকহ শাস্ত্র সম্পাদনার জন্য যে পরিষদ গঠন করেছিলেন, উক্ত পরিষদের সদস্যগণকে এবং তাঁদের সমসাময়িক ফিকহবিদগণকে مُتَقَدِّمِيْن বলা হয়। যেমন– চার ইমাম ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম জুফার (র.) প্রমুখ।

৬. اَلْاَكَابِرُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ মুতাকাদ্দিমীনের পরবর্তী যুগে ইমাম আবূ বকর খাস্‌সাফ (র.), কারখী (র.), হুলওয়ায়ী (র.), সারাখসী (র.), ত্বাহাবী (র.), কাযীখান ও তাঁদের সমসাময়িক ফিকহবিদগণকে اَلْاَكَابِرُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ বলা হয়।

৭. اَلْمُتَأَخِّرِيْنَ আকাবিরে মুতাকাদ্দিমীনের পরবর্তী যুগের ফিকহবিদগণকে মুতাআখখিরীন বলা হয়।

৮. اَلْاَئِمَّةُ الْاَرْبَعَةُ ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-কে একত্রে اَئِمَّة اَرْبَعَة বলা হয়।

৯. اَلْمَذَاهِبُ الْاَرْبَعَةُ বলতে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবকে বুঝানো হয়।

১০. اَلْاِمَامُ الْاَعْظَمُ বলতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে বুঝানো হয়।

১১. اَلْاَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-কে একত্রে اَلْاَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ বলা হয়।

১২. عِنْدَنَا হানাফী ইমামদের নিকট।

১৩. اِمَامُنَا ইমাম আবূ হানীফা (র.)।

১৪. اَلْعِرَاقِيُّوْنَ ইরাকবাসী হানাফী মতাবলম্বী ফিকহবিদগণকে عِرَاقِيُّوْنَ বলা হয়।

১৫. اَلْحِجَازِيُّوْنَ হিজাযবাসী শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের অনুসারী ফিকহবিদগণকে حِجَازِيُّوْنَ বলা হয়।

১৬. ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক রচিত নিম্নোক্ত ৬টি গ্রন্থে যেসব বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোকে رِوَايَةُ الظَّاهِرِ বা ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ বলা হয়। গ্রন্থ ৬টি হলো–

ক. اَلْجَامِعُ الصَّغِيْرُ খ. اَلْجَامِعُ الْكَبِيْرُ গ. اَلسِّيَرُ الْكَبِيْرُ ঘ. اَلسِّيَرُ الصَّغِيْرُ ঙ. مَبْسُوْط চ. اَلزِّيَادَاتُ

১৭. كُتُبُ النَّوَادِرِ উপরিউক্ত ৬টি গ্রন্থ ব্যতীত ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অন্যান্য গ্রন্থকে كُتُبُ النَّوَادِرِ বলা হয়।

১৮. اَلصَّدْرُ الْاَوَّلُ সাহাবী, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণকে اَلصَّدْرُ الْاَوَّلُ বলা হয়।

হানাফী মাযহাবের আলোকে রচিত কতিপয় নীতিমালা :

١. مَا ثَبَتَ بِالْيَقِيْنِ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ.

٢. اَلْأَصْلُ فِي الْاَشْيَاءِ الْاِبَاحَةُ.

٣. اَلْاَصْلُ فِي الذِّمَّةِ الْبَرَاءَةُ.

٤. اَلْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ.

٥. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْاِسْلَامِ.

٦. اَلْاُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا.

٧. لَا ثَوَابَ اِلَّا بِالنِّيَّةِ.

٨. اَلضَّرَرُ يُزَالُ.

٩. اَلضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ.

١٠. اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْاِمْكَانِ.

١١. اَلضَّرَرُ الْاَكْبَرُ يُدْفَعُ بِالضَّرَرِ الْاَخَفِّ.

١٢. دَفْعُ الْمَضَرَّةِ مُقَدَّمٌ عَلٰى جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ.

١٣. اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ.

١٤. اِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ.

١٥. اِنَّ الْمَنَافِعَ تُقَدَّمُ عَلَى الْمُقْتَضٰى عِنْدَ التَّعَارُضِ.

١٦. اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ.

١٧. لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِيْ مُقَابَلَةِ التَّصْرِيْحِ - ١٨. إِنَّ السُّكُوْتَ فِيْ مَعْرِضِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ بَيَانٌ -
١٩. إِنَّ الْكَلَامَ يَقِيْنٌ وَالسُّكُوْتُ شَكٌّ - ٢٠. اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ -
٢١. اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ - ٢٢. اَلضَّرُوْرَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا -
٢٣. اَلْاِضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ - ٢٤. اَلْحُدُوْدُ تَنْدَرِءُ بِالشُّبْهَاتِ -
٢٥. مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاءُهُ - ٢٦. عُمُوْمُ الْبَلْوٰى مَيْسَرَةٌ -

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নাম ইয়াকুব। পিতার নাম ইবরাহীম এবং দাদার নাম হাবীব। তিনি ১১৩ অথবা ১১৭ হিজরি সনে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তাঁর লেখাপড়ার প্রতি অধিক আগ্রহ ছিল। তিনি প্রথম দিকে ফিকহ পারদর্শী ইবনে আবূ লায়লা (র.)-এর নিকট ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি মদিনায় গিয়ে ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট হাদীস ও ফিকহ অধ্যয়ন করেন। পরে হাদীস ও শরিয়তের গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান সম্ভারে সুসমৃদ্ধ হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। পরিণামে তিনি ফিকহের উভয় ধারার সমন্বয়কারী হন। তিনি এ দুটি ধারাকে পরস্পরের অতি নিকটবর্তী করে দিয়েছেন।
তিনি ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অন্যতম শিষ্য, তবে অনেক মাসআলায় স্বীয় ইমামের সঙ্গেও মতবিরোধ করেছেন। ১৬৬ হিজরি সনে তিনি তৎকালীন সরকারের বিচারপতি নিযুক্ত হন। পরে তিনি বিচারপতিরূপে কাজ করেন। ১৮২ হিজরি সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী : ইমাম মুহাম্মদ (র.) ১৩৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ছাত্রদের মধ্যে দীনী জ্ঞানের মহা দিকপাল। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট বেশি দিন শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। কেননা, তাঁর শিক্ষাকালেই ইমাম সাহেবের ইন্তেকাল হয়ে যায়। তিনি ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট হাদীস ও ফিকহ অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি বিশিষ্ট ফিকহবিদ আওযা'য়ী (র.)-এর নিকট ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ফিকহের মূলনীতির ভিত্তিতে খুঁটিনাটি মাসআলা-মাসায়েল রচনা ও হানাফী মাযহাবের ফিকহ সংকলন করে তিনি হানাফী মাযহাবের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এ পর্যায়ে তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ১. আল-মাবসূত, ২. আজ জিয়াদাত ৩. আল-জামিউস সগীর ৪. আল-জামিউল কাবীর ৫. আস-সিয়ারুস সগীর ৬. আস-সিয়ারুল কাবীর– এ ৬ খানা গ্রন্থ ফিকহ শাস্ত্রের ৬টি স্তম্ভের মতো। ফিকহে হানাফীর এ মহান ব্যক্তি ১৮৯ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম যুফার (র.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল কুফী (র.) ১১০ হিজরিতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হাদীস অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শিক্ষালয়ে ভর্তি হন এবং ফিকহ অনুশীলন করে শেষ পর্যন্ত কিয়াসের ইমাম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে সারাজীবন শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদানের কাজে অতিবাহিত করেন। ১৫৮ হিজরি সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ লুলূয়ী কুফী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট ফিকহ শিক্ষা আরম্ভ করে তা সমাপ্ত করেন সাহেবাইন (র.)-এর নিকট। তিনি ফিকহে হানাফীর উপর বহু কিতাব লিখেছেন। কিয়াসে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি কিছুকাল কাজির পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ২০৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

مُتُوْن مُعْتَبَرَة [গ্রহণযোগ্য মতন গ্রন্থাবলি] : ফিকহ শাস্ত্রে যত কিতাব আমাদের দেশে প্রচলিত আছে এর কোনোটি এমন, যা অন্য কোনো মতনের শরাহ নয়। যেমন– কুদূরী ও কানজুদ্দাকায়িক। আর কোনোটি এমন, যা অন্য মতনের শরাহ। যেমন– শরহে বিকায়া ও হিদায়া। ফুকাহায়ে কেরামের নিকট তিনটি মতন কিতাব অত্যধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। তা হলো–
১. কুদূরী ২. কানযুদ্দাকায়িক ৩. বিকায়া। এগুলোকে مُتُوْن ثَلَاثَة বলা হয়। مُتَأَخِّرِيْن ওলামায়ে কেরাম এসব কিতাবের উপরই নির্ভর করেন। কোনো কোনো মুতাআখখিরীন আলেম এসবের সাথে দিরায়া (دِرَايَة) গ্রন্থকে সম্পৃক্ত করেন। কেউ মাজমাউল বাহরাইন (مَجْمَعُ الْبَحْرَيْن) -কে আবার কেউ মুখতার (مُخْتَار) গ্রন্থকে এ সবের সাথে সম্পৃক্ত করেন। এভাবে তাঁদের নিকট মতন কিতাবের সংখ্যা ৪।

শরহে বিকায়া গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম : আল্লামা দিমইয়াতী (র.) تَعَالِيْقُ الْاَنْوَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ নামক গ্রন্থে, আল্লামা কুফবী রুমী (র.) اِعْلَامُ الْاَخْيَارِ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন– "শরহে বিকায়া গ্রন্থকারের নাম ওবায়দুল্লাহ, উপাধি সাদরুশ শরী'আতুল আসগার, পিতার নাম– মাসঊদ, দাদার নাম মাহমূদ, দাদার উপাধি তাজুশ শরী'আহ। শারেহ (র.)-এর এই দাদাই মূলত وِقَايَة গ্রন্থের লেখক। শারেহ (র.) ও তাঁর পরদাদার উপাধি এক তথা صَدْرُ الشَّرِيْعَةِ তবে তাঁদের মাঝে পার্থক্য বুঝানোর জন্য শারেহ (র.)-এর ক্ষেত্রে صَدْرُ الشَّرِيْعَةِ الْاَصْغَرُ এবং তাঁর পরদাদার ক্ষেত্রে বলা হয় صَدْرُ الشَّرِيْعَةِ الْاَكْبَرُ

বংশধারা : তাঁর বংশধারা হলো–

صَدْرُ الشَّرِيْعَةِ الْاَصْغَرِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ تَاجِ الشَّرِيْعَةِ مَحْمُوْدِ بْنِ صَدْرِ الشَّرِيْعَةِ الْاَكْبَرِ اَحْمَدَ بْنِ جَمَالِ الدِّيْنِ اَبِى الْمَكَارِمِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ خَلَفِ بْنِ هَارُوْنَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوْبِ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الْاَنْصَارِيِّ الْمَحْبُوْبِيِّ (رض) . (تَعَالِيْقُ الْاَنْوَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ)

জ্ঞান অর্জন : শারেহ (র.) স্বীয় দাদা তাজুশ শরী'আহসহ বড় বড় ফকীহগণের নিকট জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর বংশমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিশেষে তার পরদাদা صَدْرُ الشَّرِيْعَةِ الْاَكْبَرُ এবং পরবর্তীতে তিনি নিজে صَدْرُ الشَّرِيْعَةِ الْاَصْغَرُ উপাধিতে ভূষিত হন।

রচনাবলি : শারেহ (র.)-এর রচনাবলির মধ্যে– ১. شَرْحُ الْوِقَايَةِ ২. اَلنِّقَايَةُ ৩. اَلتَّنْقِيْحُ ৪. اَلْمُقَدَّمَاتُ الْاَرْبَعَةُ ৫. تَعْدِيْلُ الْعُلُوْمِ ৬. شَرْحُ فُصُوْلِ الْخَمْسِيْنَ ৭. كِتَابُ الشُّرُوْطِ ৮. كِتَابُ الْمُحَاضَرَةِ ৯. وِشَاح ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

ইন্তেকাল : শারেহ (র.)-এর ইন্তেকালের সন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ১. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে, তিনি ৭৪৭ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। ২. মোল্লা আলী ক্বারী (র.)-এর মতে, ৬৮০ হিজরির কাছাকাছি সময়ে তাঁর ইন্তেকাল হয়। ৩. কাশফযযুনূন গ্রন্থের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি ৭৪৯ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তবে অধিকাংশের মতে প্রথম অভিমতটিই সঠিক।

কিভাবে বিকায়া ও শরহে বিকায়া রচিত হয় : وِقَايَة নামক গ্রন্থটি ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসঊদের দাদা تَاجُ الشَّرِيْعَةِ مَحْمُوْدٌ রচনা করেছেন। تَاجُ الشَّرِيْعَةِ مَحْمُوْدُ بْنُ صَدْرِ الشَّرِيْعَةِ الْاَكْبَرِ ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ-এর দাদা ও শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁর পৌত্র ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসঊদকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অল্প অল্প করে وِقَايَة সংকলন করতেন। আর তিনি ধারাবাহিকভাবে পাঠে পাঠে মুখস্থও করতেন। এভাবে একদিকে কিতাব প্রণয়ন শেষ হয় অপরদিকে তা মুখস্থ করার কাজও সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে এ পাণ্ডুলিপির অনুলিপি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাতে কিছু রদবদল ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটে। অতঃপর ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ চাহিদার প্রেক্ষিতে গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত মতন ঠিক রেখে এর সাথে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযোজন করেন, যা نِقَايَة নামে প্রকাশিত হয়েছে। তারপর তা পড়ে এর থেকে উপকার হাসিল করতে মানুষের শৈথিল্য প্রদর্শন করতে দেখে বিকায়ার মূল ইবারতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করত شَرْحُ الْوِقَايَةِ রচনা করেন।

শরহে বিকায়া প্রসঙ্গ : شَرْحُ الْوِقَايَةِ আরবি ভাষায় রচিত প্রাচীন, অথচ সুপ্রসিদ্ধ, সর্বজন প্রশংসিত ও সর্বমহলে সমাদৃত ফিকহের একটি অমূল্য কিতাব। মূলত তা وِقَايَة নামক আরবি গ্রন্থের আরবি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। বর্তমানে আমরা شَرْحُ الْوِقَايَةِ নামক গ্রন্থে মতন ও শরাহ একই সাথে লিখিত ও মুদ্রিত দেখতে পাচ্ছি। তাতে মূল গ্রন্থ তথা وِقَايَة -এর ইবারত বুঝার সুবিধার্থে রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপর এর শরাহ করা হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ ـ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর তা'আলার জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। পরিপূর্ণ রহমত অবতীর্ণ হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর এবং তাঁর পূত-পবিত্র পরিবারবর্গের উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَسْمَلَة ও حَمْدَلَة-এর মাধ্যমে কিতাব শুরু করার কারণ : গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থকে بَسْمَلَة ও حَمْدَلَة-এর মাধ্যমে শুরু করার কারণ কয়েকটি হতে পারে। যথা– ১. গ্রন্থকার আশরাফুল কিতাব কুরআন মাজীদের অনুসরণ করেছেন। কেননা, কুরআন শরীফও بَسْمَلَة ও حَمْدَلَة দ্বারা শুরু হয়েছে। ২. রাসূল ﷺ -এর হাদীস– كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَهُوَ اَقْطَعُ অন্য বর্ণনায় كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَهُوَ اَقْطَعُ -এর উপর আমল করত গ্রন্থকার স্বীয় কিতাবকে بَسْمَلَة ও حَمْدَلَة-এর মাধ্যমে শুরু করেছেন। ৩. আকাবির ও আসলাফের কিতাবাদির অনুসরণ করেছেন।

صَلَاة শব্দের বিশ্লেষণ : صَلَاة শব্দের আভিধানিক অর্থ– দোয়া। তাসবীহের অর্থেও ব্যবহার হয়। صَلَاة শব্দকে যদি আল্লাহর দিকে নিসবত করা হয় তবে এর অর্থ হবে রহমত। صَلَاة শব্দের অর্থ যদিও দোয়া আসে, কিন্তু এর صِلَة ـ عَلٰى আসার দ্বারা তা বদদোয়ার অর্থে ব্যবহার হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ الخ

وَبَعْدُ فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ الْمُتَوَسِّلُ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِأَقْوَى الذَّرِيْعَةِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ تَاجِ الشَّرِيْعَةِ سَعَدَ جَدُّهُ وَأَنْجَحَ جَدُّهُ هٰذَا حَلُّ الْمَوَاضِعِ الْمُغْلَقَةِ مِنْ وِقَايَةِ الرِّوَايَةِ فِيْ مَسَائِلِ الْهِدَايَةِ الَّتِيْ أَلَّفَهَا جَدِّيْ وَأُسْتَاذِيْ مَوْلَانَا الْأَعْظَمُ أُسْتَاذُ عُلَمَاءِ الْعَالَمِ بُرْهَانُ الشَّرِيْعَةِ وَالْحَقِّ وَالدِّيْنِ مَحْمُوْدُ بْنُ صَدْرِ الشَّرِيْعَةِ جَزَاهُ اللّٰهُ عَنِّيْ وَعَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرَ الْجَزَاءِ لِأَجْلِ حِفْظِيْ.

অনুবাদ : হামদ ও সালাতের পর, মজবুত অসিলার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মিনতিকারী বান্দা ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ইবনে তাজুশ শরীআহ বলেন– তাঁর দাদা সৌভাগ্যবান হোক এবং স্বীয় প্রচেষ্টায় সফল হোক। এটি বিকায়ার জটিল জায়গাগুলোর হল্ [বিশ্লেষণ], যার মধ্যে হিদায়ার মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে, যা আমার দাদা রচনা করেছেন। তিনি আমার উস্তাদ। তিনি সবচেয়ে বড় আলেম, বিশ্বের সকল আলেমদের উস্তাদ। তিনি বুরহানুশ শরী'আহ, বুরহানুল হক এবং বুরহানুদ্দীনও। তাঁর নাম মাহমূদ ইবনে সদরুশ শরী'আহ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আমার এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। কারণ, আমি তা হিফজ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِأَقْوَى الذَّرِيْعَةِ : গ্রন্থকার এখানে اَلذَّرِيْعَةُ শব্দ ব্যবহার করে سَجَع-এর দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। কেননা, সামনে এর অনুরূপ ওযনের اَلشَّرِيْعَةُ শব্দ আসছে। ذَرِيْعَة শব্দের অর্থ– অসিলা। এ অসিলা রাসূল ﷺ-ও হতে পারেন, কুরআন শরীফও হতে পারে, صَلَاةٌ عَلَى الرَّسُوْلِ-ও হতে পারে এবং عُلُوْم شَرْعِيَّة সংবলিত "ফিকহ ও উসূলে ফিকহ" -ও হতে পারে। তবে اَقْوَى الذَّرِيْعَةِ দ্বারা فِقْه ও أُصُوْلُ الْفِقْهِ উদ্দেশ্য হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা, এ গ্রন্থও ফিকহ বিষয়ক।

قَوْلُهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ الخ : এটি বিকায়ার শারেহ (র.)-এর নাম। বিকায়া গ্রন্থকারের উপাধি তাজুশ শরী'আহ। এখানে بُرْهَانُ الشَّرِيْعَةِ ـ تَاجُ الشَّرِيْعَةِ ও صَدْرُ الشَّرِيْعَةِ এই তিনটি উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে। বিকায়া গ্রন্থকার এবং বিকায়ার শারেহ উভয়ে উস্তাদ-ছাত্র এবং দাদা-নাতি। কেউ বলেন, বিকায়ার শারেহ ওবায়দুল্লাহ -এর উপাধি তাজুশ শরী'আহ। কেউ বলেন, তাজুশ শরীআহ শারেহ (র.)-এর দাদার নাম। কেউ বলেন, এই تَاجُ الشَّرِيْعَةِ-ই হলেন بُرْهَانُ الشَّرِيْعَةِ তবে এটি নিশ্চিত বিষয় যে, বিকায়া গ্রন্থকার হলেন تَاجُ الشَّرِيْعَةِ অতঃপর تَاجُ الشَّرِيْعَةِ-এর নামের ক্ষেত্রেও মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, মাহমূদ, আবার কেউ বলেন, ওমর। তবে 'মাহমূদ' নাম হওয়া উত্তম। শারেহে বিকায়ার নাম ওবায়দুল্লাহ, যিনি তাজুশ শরী'আহ এর নাতি এবং তাঁর আদর্শ ছাত্র।

قَوْلُهُ هٰذَا حَلُّ الخ : هذا-এর مُشَارٌ إِلَيْه হলো شَرْحُ الْوِقَايَةِ এতে দুই সুরত হতে পারে– ১. শারেহ (র.) প্রথমে বিকায়ার শরাহ লিখেছেন। পরবর্তীতে এই ভূমিকা (مُقَدَّمَة) লিখেছেন। তাই هٰذَا حَلُّ الْمَوَاضِعِ বলেছেন। এ সুরতে مُقَدَّمَة-কে الحاقية বলা হবে। ২. শারেহ (র.) বিকায়ার শরাহতে যা লেখার ইচ্ছা করেছেন, তা স্মৃতিপটে উপস্থিত রেখে هٰذَا حَلُّ المواضع বলেছেন। এ সুরতে مُقَدَّمَة-কে اِبْتِدَائِيَّة বলা হবে। তবে উভয় সুরতেই مُشَارٌ إِلَيْهِ হচ্ছে 'শরহে বিকায়া।'

قَوْلُهُ بُرْهَانُ الشَّرِيْعَةِ : بُرْهَان শব্দের অর্থ– দলিল ও حُجَّة অর্থাৎ কোনো مُدَّعٰى-কে যে দলিল দ্বারা প্রমাণিত করা হয় সেই দলিলকে بُرْهَان বলা হয়। এটি বিকায়ার লেখকের উপাধি, যার নাম মাহমূদ ইবনে সদরুশ শরী'আহ। আর সদরুশ শরী'আহ -এর নাম আহমদ ইবনে ওবায়দুল্লাহ। কিন্তু কেউ কেউ সদরুশ শরী'আহ -এর নাম ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাহমূদ ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন। যেরূপ অভিমত 'জামিউর রুমূয' গ্রন্থকারের। তবে মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী (র.) বলেন, এ অভিমত كُتُب مُعْتَبَرَة-এর পরিপন্থি। হাকীকত হলো, এসব اَلْقَاب-এর مُلَقَّبٌ بِه নির্ণয় করার ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে।

وَالْمَوْلَى الْمُؤَلِّفُ لَمَّا اَلَّفَهَا سَبْقًا سَبْقًا وَكُنْتُ اَجْرِيْ فِيْ مَيْدَانِ حِفْظِهٖ طَلْقًا طَلْقًا حَتّٰى اِتَّفَقَ اِتْمَامُ تَالِيْفِهٖ مَعَ اِتْمَامِ حِفْظِيْ اِنْتَشَرَ بَعْضُ النُّسَخِ فِى الْاَطْرَافِ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ وَقَعَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنَ التَّغْيِيْرَاتِ وَنَبْذٌ مِنَ الْمَحْوِ وَالْاِثْبَاتِ فَكَتَبْتُ فِيْ هٰذَا الشَّرْحِ الْعِبَارَةَ الَّتِيْ تَقَرَّرَ عَلَيْهَا الْمَتْنُ لِتَغَيُّرِ النُّسَخِ الْمَكْتُوْبَةِ اِلٰى هٰذَا النَّمَطِ وَالْعَبْدُ الضَّعِيْفُ لَمَّا شَاهَدَ فِيْ اَكْثَرِ النَّاسِ كَسْلًا عَنْ حِفْظِ الْوِقَايَةِ اِتَّخَذْتُ عَنْهَا مُخْتَصَرًا مُشْتَمِلًا عَلٰى مَا لَابُدَّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنْهُ فَافْتَحُ فِيْ هٰذَا الشَّرْحِ مُغْلَقَاتِهٖ اَيْضًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ : লেখক মহোদয় যখন এক এক সবক করে লিখতে থাকেন তখন আমিও ধীরে ধীরে তাঁর লেখার পরিমাণ মতো মুখস্থ করার চেষ্টা করতে থাকি। এমনকি তাঁর সংকলন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে আমার তা হিফজ করাও সমাপ্ত হয়ে গেছে। গ্রন্থকারের রচিত কিছু নুসখা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে গেছে। অতঃপর কিতাবের মাঝে কিছু পরিবর্তনও ঘটে গেছে। এরপর কোনো অংশকে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কোনো অংশকে আপন অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে।

অতএব, এই শরাহতে আমি মূল মতনের ঐ ইবারত লিখেছি, যা প্রথমে লেখা হয়েছে এবং কিতাবে পরিবর্তন হওয়ার পর তা বহাল আছে। এই দুর্বল বান্দা [অর্থাৎ ব্যাখ্যাকার] যখন দেখল যে, অধিকাংশ লোক বিকায়া হিফজ করতে অলসতা প্রদর্শন করে তখন আমি এই বিকায়া থেকে চয়ন করে অত্যন্ত জরুরি মাসায়েল সংবলিত, সংক্ষিপ্ত মতনে দ্বিতীয় একটি কিতাব ছাত্রদের জন্য রচনা করি [যার নাম নেকায়া]। সুতরাং আমি এই শরাহতে ঐ জটিল বিষয়াবলিকেও খুলে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ سَبْقًا سَبْقًا : এর মর্ম হলো, বিকায়া গ্রন্থকার প্রতিদিন এক এক সবক পরিমাণ রচনা করতেন। যেন তাঁর ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে তা মুখস্থ করে তাঁকে শুনাতে পারেন, যিনি পরবর্তীতে উক্ত বিকায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন।

قَوْلُهٗ اِنْتَشَرَ بَعْضُ النُّسَخِ : ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রন্থকার বিকায়া অল্প অল্প করে লিখতেন, যেন তাঁর ছাত্র তা হিফজ করতে পারে; কিন্তু এর কারণে আরেকটি সমস্যাও দেখা দেয়। তা হলো– শেষ পর্যন্ত কোনো কোনো নুসখা এদিক সেদিক ছড়িয়ে গেছে। আর এটি স্পষ্ট যে, যদি গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থকে দ্বিতীয়বার দেখে এতে সংযোজন, বিয়োজন এবং কাটছাঁট করেন, তবে এর পূর্ববর্তী ইবারতের মাঝে পরিবর্তন এসে যায়।

قَوْلُهٗ فَكَتَبْتُ فِى الخ : শারেহ (র.) বলেন, উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে শরাহ-এর মধ্যে মূল কিতাবের ইবারত সেরূপ লিখেছি, গ্রন্থকারের দ্বিতীয়বার দেখা ও সংশোধন করার পর যেরূপ হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَالْعَبْدُ الضَّعِيْفُ : শারেহ (র.) كَسْرُ النَّفْسِ -এর ভিত্তিতে নিজেকে اَلْعَبْدُ الضَّعِيْفُ বলেছেন। অতঃপর তিনি এই শরাহ -এর একটি বৈশিষ্ট্য বলেছেন যে, وِقَايَةٌ গ্রন্থের মতন সংক্ষেপ হওয়ার দরুন এর থেকে লোকদের হিম্মত খর্ব হয়ে গেছে। আর সেই مُخْتَصَرٌ -ও তাঁদের জন্য مُطَوَّلٌ হয়ে গেছে। কেননা, আমি নিজে وِقَايَةٌ থেকে চয়ন করে অত্যন্ত জরুরি মাসায়েল সংবলিত এর চেয়েও অধিক مُخْتَصَرٌ আরেকটি মতন গ্রন্থ রচনা করেছি। এখন আমি এই শরাহতে উক্ত নেকায়ার জটিল জায়গাগুলোরও বিভিন্ন স্থানে হল্ করব।

وَقَدْ كَانَ الْوَلَدُ الْاَعَزُّ مَحْمُوْدُ بَرَّدَ اللّٰهُ مَضْجَعَهٗ بَعْدَ حِفْظِ الْمُخْتَصَرِ مُبَالِغًا فِىْ تَالِيْفِ شَرْحِ الْوِقَايَةِ بِحَيْثُ تَنْحَلُّ مِنْهُ مُغْلَقَاتُ الْمُخْتَصَرِ فَشَرَعْتُ فِىْ اِسْعَافِ مَرَامِهٖ فَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ اِتْمَامِهٖ فَالْمَامُوْلُ مِنَ الْمُسْتَفِيْدِيْنَ مِنْ هٰذَا الْكِتَابِ اَنْ لَا يَنْسَوْهُ فِىْ دُعَائِهِمُ الْمُسْتَجَابِ اِنَّهٗ مُيَسِّرٌ لِلصِّعَابِ وَالْفَاتِحُ لِمُغْلَقَاتِ الْاَبْوَابِ ـ

অনুবাদ : প্রকাশ থাকে যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতামহ মাহমূদ আল্লাহ তাঁর কবরকে ঠাণ্ডা রাখেন– মুখতাসারে বিকায়া হিফজ করার পর [আমাকে] বিকায়ার এমন একটি শরাহ লেখার জন্য জোর তাকিদ করছিলেন, যার দ্বারা মুখতাসারে বিকায়ার জটিল বিষয়গুলোর হল্ হয়ে যাবে। অতএব, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী শরাহ লেখা শুরু করে দিয়েছি। কিন্তু শরাহ পূর্ণাঙ্গ করার পূর্বেই আল্লাহ তাঁর মৃত্যু দিয়ে দিয়েছেন। তাই এখন এই কিতাব থেকে উপকার হাসিলকারীদের থেকে আশা করছি যে, তারা তাদের মুস্তাজাব দোয়ায় তাঁকে ভুলবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা কাঠিন্যের সহজকারী এবং জটিল স্থানগুলো দূরীভূতকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَشَرَعْتُ فِىْ اِسْعَافِ مَرَامِهٖ : সুতরাং আমি আমার পিতার চাহিদা অনুযায়ী শরাহ লেখার কাজ শুরু করে দিলাম, কিন্তু আমি উক্ত কাজকে পূর্ণতায় পৌঁছানোর পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। এখন শরাহ লেখার কাজ পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি আর বিদ্যমান নেই, যাঁর আশা পূর্ণ করতে এই শরাহ লেখা হয়েছে। এখন তাঁর জন্য শুধু দোয়া করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। পাঠকরাও যেন তাঁর জন্য দোয়া করেন।

قَوْلُهٗ اِنَّهٗ مُيَسِّرٌ لِلصِّعَابِ : এখানে ضَمِيْر-এর مَرْجِعْ জাহিরীভাবে বুঝা যাচ্ছে মাহমূদ। কেননা, তাঁর আলোচনাই চলছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এমন নয়; বরং এর مَرْجِعْ হলেন اَللّٰهُ تَعَالٰى কেননা, তিনি ব্যতীত কেউ মুশকিলকে আসান এবং জটিলতাকে দূর করতে পারবে না।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

١. مَا الْفِقْهُ لُغَةً وَاِصْطِلَاحًا وَمَا مَوْضُوْعُهٗ وَمَا غَرْضُهٗ؟

٢. لِمَنْ مَاتِنُ كِتَابِكَ هٰذَا وَلِمَنْ شَارِحُهٗ؟ اُكْتُبْ مَعَ بَيَانِ سَبَبِ تَالِيْفِ الشَّرْحِ ـ

٣. قَوْلُهٗ "هٰذَا حَلُّ الْمَوَاضِعِ الْمُغْلَقَةِ مِنْ وِقَايَةِ الرِّوَايَةِ فِىْ مَسَائِلِ الْهِدَايَةِ الَّتِىْ اَلَّفَهَا جَدِّىْ وَاُسْتَاذِىْ مَوْلَانَا الْاَعْظَمُ اُسْتَاذُ عُلَمَاءِ الْعَالَمِ بُرْهَانُ الشَّرِيْعَةِ وَالْحَقِّ وَالدِّيْنِ مَحْمُوْدُ بْنُ صَدْرِ الشَّرِيْعَةِ جَزَاهُ اللّٰهُ عَنِّىْ وَعَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرَ الْجَزَاءِ لِاَجْلِ حِفْظِىْ وَالْمَوْلٰى الْمُؤَلِّفُ لَمَّا اَلَّفَهَا سَبَقًا سَبَقًا وَكُنْتُ اَجْرِىْ فِىْ مَيْدَانِ حِفْظِهٖ طَلْقًا طَلْقًا" تَرْجِمْهَا بَعْدَ تَعْيِيْنِ الْمُشَارِ اِلَيْهِ لِهٰذَا؟

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

اِكْتَفٰى بِلَفْظِ الْوَاحِدِ مَعَ كَثْرَةِ الطَّهَارَاتِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يُثَنّٰى وَلَا يُجْمَعُ لِكَوْنِهَا اِسْمُ جِنْسٍ يَشْمَلُ جَمِيْعَ اَنْوَاعِهَا وَأَفْرَادِهَا فَلَا حَاجَةَ إِلٰى لَفْظِ الْجَمْعِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ اَلْاٰيَةُ اِفْتَتَحَ الْكِتَابَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ تَيَمُّنًا وَلِأَنَّ الدَّلِيْلَ أَصْلٌ وَالْحُكْمُ فَرْعُهٗ وَالْأَصْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَرْعِ بِالرُّتْبَةِ.

অধ্যায় : পবিত্রতা

অনুবাদ : বেকায়া গ্রন্থকার তাহারাতের প্রকার অনেক থাকা সত্ত্বেও طَهَارَةٌ শব্দটি একবচন (وَاحِدٌ) ব্যবহার করেছেন। কেননা, طَهَارَةٌ শব্দটি مَصْدَرٌ আর মূলনীতি হলো যে, "مَصْدَرٌ [কখনো] تَثْنِيَةٌ ও جَمْع হয় না।" কারণ طَهَارَةٌ হচ্ছে مَصْدَرٌ যার মধ্যে এর সমস্ত প্রকার ও اَفْرَادٌ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। অতএব, طَهَارَةٌ শব্দটি বহুবচন اِسْمُ جِنْس (جَمْعٌ) আনার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করবে।" –[সূরা মায়িদা : ৬]

গ্রন্থকার উক্ত আয়াতের মাধ্যমে স্বীয় কিতাবের সূচনা করেছেন বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে এবং এজন্য যে, দলিল হলো أَصْلٌ [মূল] এবং হুকুম হলো فَرْعٌ [শাখা], আর أَصْلٌ মর্যাদাগতভাবে فَرْعٌ -এর আগে আসে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كِتَابُ الطَّهَارَةِ বাক্য সংশ্লিষ্ট আলোচনা :

تَرْكِيْبُ نَحْوِيْ : كِتَابُ الطَّهَارَةِ বাক্যটির تَرْكِيْبٌ তিন ধরনের হতে পারে। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন–

هٰذَا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ اَىْ هٰذَا كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ مُبْتَدَأً وَخَبَرُهٗ مَحْذُوْفٌ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ مَنْصُوْبًا بِحَذْفِ فِعْلٍ "اَقْرَأْ" اَوْ "أُخُذْ" اَوْ نَحْوُ ذٰلِكَ.

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ বাক্যটি مُبْتَدَأْ مَحْذُوْف "هٰذَا"-এর خَبْر হবে। যেমন– هٰذَا كِتَابُ الطَّهَارَةِ

২. كِتَابُ الطَّهَارَةِ বাক্যটি مُبْتَدَأْ এবং خَبَر এর مَحْذُوْف। যেমন– كِتَابُ الطَّهَارَةِ هٰذَا

৩. كِتَابُ الطَّهَارَةِ বাক্যটি أُخُذُ - أَقْرَأُ বা অনুরূপ কোনো فِعْل مَحْذُوْف এর مَفْعُوْل হবে। যেমন–

أَقْرَأُ كِتَابَ الطَّهَارَةِ أَوْ أُخُذُ كِتَابَ الطَّهَارَةِ -

❖ كِتَابٌ ,بَابٌ ও فَصْلٌ-এর অর্থ : গ্রন্থকারগণ স্বীয় কিতাবে কোনো বিষয়ের বিবরণের শুরুতে كِتَابٌ , بَابٌ ও فَصْلٌ শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আমরা উক্ত শব্দত্রয়ের পরিচয় তুলে ধরছি।

كِتَابٌ : كِتَابٌ ও كِتَابَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– লেখা, সংকলন করা ইত্যাদি। كِتَابٌ শব্দটি مَكْتُوْبٌ [লিখিত] অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন– خَلَقَ শব্দটি مَخْلُوْقٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) كِتَابٌ-এর পারিভাষিক অর্থ এভাবে লিখেছেন–

وَالْكِتَابُ قَدْ يُعْرَفُ بِأَنَّهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ اُعْتُبِرَتْ مُسْتَقِلَّةً شَمَلَتْ اَنْوَاعًا اَوْ لَمْ تَشْمُلْ .

অর্থাৎ "كِتَابٌ বলা হয় ফিকহী মাসআলার ঐ সমষ্টিকে, যা স্বতন্ত্রভাবে ধর্তব্য ও গৃহীত হয়। চাই এতে مُخْتَلِفُ النَّوْعِ তথা বিভিন্ন ধরনের মাসআলা থাকুক বা না থাকুক।" –[ফাতহুল কাদীর : খ. ১, পৃ. ৯]

بَابٌ : بَابٌ-এর আভিধানিক অর্থ– অধ্যায়। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় بَابٌ-এর পারিভাষিক অর্থ এভাবে লিখেছেন– فَاِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ اَنْوَاعٌ فَكُلُّ نَوْعٍ يُسَمّٰى بِالْبَابِ

অর্থাৎ "بَابٌ বলা হয় كِتَابٌ-এর অধীনে مُخْتَلِفُ النَّوْعِ তথা বিভিন্ন ধরনের মাসআলা থেকে প্রত্যেক نَوْعٍ-এর মাসআলাকে।" যেমন– كِتَابُ الطَّهَارَةِ-এর অধীনে بَابُ التَّيَمُّمِ وَبَابُ الْحَيْضِ ইত্যাদি।

فَصْلٌ : فَصْلٌ-এর আভিধানিক অর্থ– পৃথক করা। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় فَصْلٌ-এর পারিভাষিক অর্থ এভাবে লিখেছেন– وَالْاَشْخَاصُ الْمُنْدَرِجَةُ تَحْتَ النَّوْعِ تُسَمّٰى بِالْفُصُوْلِ অর্থাৎ "فَصْل বলা হয় بَابٌ-এর অধীনে নির্দিষ্ট বিষয়ের মাসআলাকে।"

كِتَابُ الطَّهَارَةِ **বাক্যের** اِضَافَةٌ : নাহুবিদদের নিকট اِضَافَةٌ তিন প্রকার–

১. اِضَافَةٌ لَامِيَّةٌ – যার مُضَافٌ إِلَيْهِ-এর পূর্বে حَرْفُ جَرّ "لَامْ" – مُقَدَّرٌ উহ্য থাকে।

২. اِضَافَةٌ مِيْمِيَّةٌ – যার مُضَافٌ إِلَيْهِ-এর পূর্বে حَرْفُ جَرّ "مِنْ" – مُقَدَّرٌ উহ্য থাকে।

৩. اِضَافَةٌ ظَرْفِيَّةٌ – যার مُضَافٌ إِلَيْهِ-এর পূর্বে حَرْفُ جَرّ "فِيْ" – مُقَدَّرٌ উহ্য থাকে।

❖ كِتَابُ الطَّهَارَةِ-এর মধ্যে কোন্ প্রকারের اِضَافَةٌ হয়েছে– এ সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন–

وَالْاِضَافَةُ فِيْهِ لَامِيَّةٌ أَيْ كِتَابٌ لِلطَّهَارَةِ أَوْ بِتَقْدِيْرِ "فِيْ" اَيْ كِتَابٌ فِي الطَّهَارَةِ وَمَا وَقَعَ فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ شَرْحِ كَنْزِ الدَّقَائِقِ وَاَكْثَرُ نُسَخِ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ اَنَّ الْاِضَافَةَ لَامِيَّةٌ لَا مِيْمِيَّةٌ .

অর্থাৎ كِتَابُ الطَّهَارَةِ বাক্যে اِضَافَةٌ لَامِيَّةٌ হয়েছে, যার মৌলিক রূপ হচ্ছে– كِتَابٌ لِلطَّهَارَةِ অথবা اِضَافَةٌ ظَرْفِيَّةٌ হবে, যার মৌলিক রূপ হচ্ছে– كِتَابٌ فِي الطَّهَارَةِ 'কানযুদ্দাক্কায়িক'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ اَلنَّهْرُ الْفَائِقُ এবং اَلدُّرُّ الْمُخْتَارُ-এর অধিকাংশ নুসখায় উল্লেখ রয়েছে যে, এখানে اِضَافَةٌ-টি لَامِيَّةٌ হয়েছে; مِيْمِيَّةٌ নয়।

❖ طَهَارَةٌ **শব্দের বিশ্লেষণ :** طَهَارَةٌ শব্দটি তিনভাবে পঠিত হতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) হিদায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন–

اَلطُّهَارَةُ بِالضَّمِّ اِسْمٌ لِمَا يَتَطَهَّرُ بِهِ مِنَ الْمَاءِ وَقِيْلَ هُوَ فَضْلُ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ وَبِالْكَسْرِ اٰلَةُ النَّظَافَةِ وَبِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى النَّظَافَةِ لُغَةً ـ

অর্থাৎ, ১. যদি طَاءٌ অক্ষরে পেশ দিয়ে طُهَارَةٌ পড়া হয়, তবে এর অর্থ হবে– "পবিত্রতা হাসিলের পানি"। কেউ বলেন- পবিত্রতা অর্জনের উচ্ছিষ্ট পানি।"

২. যদি طَاءٌ অক্ষরে যের দিয়ে طِهَارَةٌ পড়া হয়, তবে এর অর্থ হবে– "পবিত্রতা অর্জন করার اٰلَةٌ বা উপকরণ।"

৩. যদি طَاءٌ অক্ষরে যবর দিয়ে طَهَارَةٌ পড়া হয়, তবে এ مَصْدَرٌ -এর অর্থে হবে– তথা পবিত্রতা অর্জন করা।

আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) হিদায়া গ্রন্থের টীকায় طَهَارَةٌ -এর পারিভাষিক অর্থ এভাবে লিখেছেন–

وَاَمَّا شَرْعًا فَهِىَ النَّظَافَةُ عَنْ حَدَثٍ وَخُبْثٍ ـ وَمَا فِى الدِّرَايَةِ مِنْ اَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْعًا نَظَافَةُ الْاَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ ـ

শরিয়তের পরিভাষায়– "হদস ও জানাবাত থেকে পবিত্রতা অর্জন করাকে طَهَارَةٌ বলা হয়।" দিরায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে– "তিন অঙ্গ ধৌত করা এবং মাথা মাসেহ করাকে শরিয়তের পরিভাষায় طَهَارَةٌ বলা হয়।"

❖ **طَهَارَةٌ -এর শর্তাবলি :** طَهَارَةٌ -এর শর্ত দুই ধরনের হতে পারে। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) আল্লামা হালভী (র.)-এর সূত্রে শরহে বেকায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ সি'আয়া (اَلسِّعَايَةُ) -এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, طَهَارَةٌ -এর ক্ষেত্রে দুই ধরনের শর্ত রয়েছে– ১. شُرُوْطُ الْوُجُوْبِ ২. شُرُوْطُ الصِّحَّةِ

شُرُوْطُ الْوُجُوْبِ : অর্থাৎ যেসব শর্ত পাওয়া গেলে طَهَارَةٌ ওয়াজিব হয়। এমন শর্ত নয়টি– ১. মুসলমান হওয়া, ২. জ্ঞানবান হওয়া, ৩. বালিগ হওয়া, ৪. হদস হওয়া [চাই হদসে আসগার হোক বা হদসে আকবার হোক], ৫. সমস্ত শরীরে পাক পানি ঢেলে দেওয়া, ৬. হায়েজের অবস্থা না হওয়া, ৭. নিফাস না হওয়া, ৮. পানি বা মাটি ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া, ৯. সময়ের মধ্যে এর সুযোগ এবং অবকাশ থাকা।

شُرُوْطُ الصِّحَّةِ : অর্থাৎ طَهَارَةٌ সহীহ হওয়ার শর্ত চারটি–

১. সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো, ২. হায়েজ না হওয়া, ৩. নিফাস না হওয়া, ৪. যে ব্যক্তি মাজুর নয়, এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে طَهَارَةٌ হাসিলের সময় نَاقِضُ الطَّهَارَةِ [তাহারাত ভঙ্গকারী] কোনো বিষয় সংঘটিত না হওয়া এবং طَهَارَةٌ ওয়াজিব হওয়ার কারণ حَدَثٌ বা جَنَابَةٌ পাওয়া যাওয়া।

❖ **طَهَارَةٌ -এর رُكْن :** طَهَارَةٌ -এর رُكْن সম্পর্কে আল্লামা মুহাম্মদ আহসান সিদ্দীকী (র.) كَنْزُ الدَّقَائِقِ গ্রন্থের টীকায় লেখেন–

وَرُكْنُهَا غُسْلُ الْاَعْضَاءِ اَوِ الْمَحَلِّ

অর্থাৎ "طَهَارَةٌ -এর رُكْن হচ্ছে, অজুর অঙ্গ বা স্থানসমূহ ধৌত করা।"

❖ **طَهَارَةٌ -এর سَبَبْ :** طَهَارَةٌ -এর سَبَبْ সম্পর্কে আল্লাম ইবনে হুমাম (র.) فَتْحُ الْقَدِيْرِ গ্রন্থে উল্লেখ করেন–

وَسَبَبُهَا وُجُوْبُ الصَّلَاةِ لَا وُجُوْدُهَا

অর্থাৎ "طَهَارَةٌ -এর سَبَبْ হচ্ছে, নামাজ আবশ্যক হওয়া নামাজের وُجُوْد বা সময় নয়"। –[ফাতহুল কাদীর– খ. ১, পৃ. ৯]

❖ **طَهَارَةٌ -এর হুকুম :** طَهَارَةٌ -এর হুকুম সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) فَتْحُ الْقَدِيْرِ গ্রন্থে উল্লেখ করেন–

وَحُكْمُهَا اِبَاحَةُ الصَّلَاةِ اَوْ مَا يُضَاهِيْهَا لِمَنْ قَامَتْ بِهِ

অর্থাৎ "طَهَارَةٌ -এর হুকুম হচ্ছে, طَهَارَةٌ অর্জনকারীর জন্য নামাজ বা এ জাতীয় ইবাদত বৈধ বা মুবাহ হওয়া।"

–[ফাতহুল কাদীর– খ. ১, পৃ. ৯]

❖ كِتَابُ الطَّهَارَةِ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন এবং উত্তর :

প্রশ্ন : বেকায়া গ্রন্থকার طَهَارَةٌ শব্দটি وَاحِدٌ [একবচন] কেন ব্যবহার করলেন? অথচ طَهَارَةٌ -এর প্রকার অনেক!

উত্তর : উক্ত প্রশ্নের উত্তর শরহে বেকায়া গ্রন্থকার اِكْتَفٰى بِلَفْظِ الْوَاحِدِ فَلَا حَاجَةَ اِلٰى لَفْظِ الْجَمْعِ এ ইবারতের মাধ্যমে দিয়েছেন যে, এ স্থানে طَهَارَةٌ শব্দটি مَصْدَرٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা নিয়ম আছে যে, مَصْدَرٌ কখনো تَثْنِيَةٌ ও جَمْع হয় না। কারণ, مَصْدَرٌ হলো اِسْمُ جِنْسٍ যার মধ্যে এর সমস্ত প্রকার ও أَفْرَادٌ অন্তর্ভুক্ত হয়। অতএব, طَهَارَةٌ শব্দটি وَاحِدٌ হওয়া সত্ত্বেও এর সমস্ত প্রকারকে সে শামিল করে নিচ্ছে। ফলে এটাকে جَمْع [বহুবচন] আনার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন : গ্রন্থকার كِتَابُ الطَّهَارَةِ তথা তাহারাত অধ্যায়কে অপরাপর অধ্যায়ের উপর مُقَدَّمٌ করলেন কেন?

উত্তর : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) হিদায়া গ্রন্থের প্রান্ত-টীকায় উক্ত প্রশ্নের উত্তর এভাবে উল্লেখ করেছেন–

اَلْمَشْرُوْعَاتُ اَرْبَعَةٌ بِالْاِسْتِقْرَاءِ حُقُوْقُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَحُقُوْقُ الْعِبَادِ وَمَا اجْتَمَعَ فِيْهِ الْحَقَّانِ وَحَقُّ اللّٰهِ اَوْ حَقُّ الْعَبْدِ فِيْهِ غَالِبٌ وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ فِى الْبَيَانِ حُقُوْقَ اللّٰهِ تَعَالٰى لِعَظْمِهَا ثُمَّ قُدِّمَتِ الصَّلٰوةُ لِاَنَّهَا اَقْوٰى اَرْكَانِ الْاِسْلَامِ بَعْدَ الْاِيْمَانِ .

অর্থাৎ "শরিয়ত স্বীকৃত ও অনুমোদিত (مَشْرُوْعَاتُ) বিষয়সমূহ হচ্ছে চার প্রকার– ১. শুধু হুকূকুল্লাহ, ২. শুধু হুকূকুল ইবাদ, ৩. হুকূকুল্লাহ এবং হুকূকুল ইবাদ মিশ্রিত বিষয়, [তবে এতে হুকূকুল্লাহ প্রবল] ৪. হুকূকুল্লাহ এবং হুকূকুল্লাহ ইবাদ মিশ্রিত বিষয়। [তবে এতে হুকূকুল ইবাদত প্রবল।] এসব বিষয়াদির মধ্যে হুকূকুল্লাহ-এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি হওয়ায় গ্রন্থকার হুকূকুল্লাহ [ইবাদত]-এর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অতঃপর ইবাদতের মধ্যে নামাজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি হওয়ায় প্রথমে নামাজের আলোচনা করেছেন। কেননা, ইসলামে ঈমানের পর নামাজের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। কুরআন মাজীদের বহু স্থানে নামাজের প্রতি তাকিদ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ অর্থাৎ "তোমরা নামাজ কায়েম কর, জাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।" –[সূরা বাকারা–৪৩]

নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ مَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ .

অর্থাৎ "নামাজ দীনের স্তম্ভ। যে নামাজ কায়েম করল, সে দীন কায়েম করল। যে নামাজ কায়েম করল না, সে দীনকে ধ্বংস করল।" –[আল-হাদীস]

আর طَهَارَةٌ নামাজের জন্য পূর্বশর্ত। হাদীসে আছে– مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ [পবিত্রতা নামাজের চাবি] এবং এ মূলনীতিও সর্বজন স্বীকৃত যে, شَرْطُ الشَّيْءِ مُقَدَّمٌ عَلَى الشَّيْءِ [যেসব বিষয়াদি কোনো কাজের জন্য পূর্বশর্ত, সেসব বিষয়াদি ঐ কাজের আগে পাওয়া যাওয়া আবশ্যক।] এ কারণে গ্রন্থকার طَهَارَةٌ -এর আলোচনার দ্বারা স্বীয় কিতাব শুরু করেছেন।

قَوْلُهُ اِكْتَفٰى بِلَفْظِ الْوَاحِدِ الخ : এটি একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ -এর جَوَابٌ, যার বিবরণ দেওয়া হয়েছে প্রথম প্রশ্নের অধীনে।

قَوْلُهُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ الخ : উক্ত আয়াতে কয়েক ধরনের আলোচনা রয়েছে।

১. اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ -এর মধ্যে اِنْ শব্দ ব্যবহার না করে اِذَا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, اِذَا শব্দটি ইয়াকীনী বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং اِنْ শব্দটি সন্দেহযুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর নামাজের জন্য দাঁড়ানো মু'মিনের জন্য ইয়াকীনী বিষয়; সন্দেহযুক্ত বিষয় নয়। তাই এখানে اذا ব্যবহার করা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মাদানী। কেননা, বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) স্বীয় হার হারানোর ঘটনা বর্ণনার পর বলেছেন–

فَنَزَلَتْ "يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ .... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ" .

আর এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর হার হারানোর ঘটনা ঘটেছে বনূ মুসতালিকের যুদ্ধে, যা সংঘটিত হয়েছিল চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরিতে। অতএব, এ আয়াত মাদানী হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

উল্লেখ্য যে, এ আয়াতের মাধ্যমে তায়াম্মুম শরিয়ত স্বীকৃত (مَشْرُوْعٌ) হয়েছে– এতেও কোনো দ্বিমত নেই। তবে অজু-গোসল তখনই ফরজ করা হয়েছিল, যখন মক্কা মুকাররামায় নামাজ ফরজ করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনে এর স্পষ্ট বিধান নাজিল করা হয়নি। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) সি'আয়া (اَلسِّعَايَةُ) গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন–

وَبِهَا شُرِعَ التَّيَمُّمُ وَاَمَّا الْغُسْلُ وَالْوُضُوْءُ فَقَدْ كَانَ مَشْرُوْعًا قَبْلَ ذٰلِكَ مِنْ حِيْنِ فَرْضِيَّةِ الصَّلَاةِ لٰكِنْ لَمْ يَكُنْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِهٖ فِى الْقُرْاٰنِ صَرِيْحًا .

উক্ত আয়াত সম্পর্কিত প্রশ্ন ও উত্তর :

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, নামাজ ফরজ হওয়ার সাথে সাথে অজু শরিয়ত স্বীকৃত হলে এত পরে কেন অজুর আয়াত নাজিল করা হলো? এর মধ্যে হিকমত কি?

উত্তর : এ সম্বন্ধে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) সি'আয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে,

১. যাতে করে অজুর হুকুমটি مَتْلُوٌّ بِالْقُرْاٰنِ হয়ে যায়। এ হিকমতের দিকে লক্ষ্য করেই অজুর আয়াত নাজিল করতঃ পুনরায় বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

২. অথবা উক্ত আয়াতের প্রথমাংশ, যেখানে অজুর কথা বলা হয়েছে– তা অজু ফরজ হওয়ার সময় মক্কায়ই নাজিল করা হয়েছে। আর আয়াতের শেষাংশ যেখানে তায়াম্মুমের কথা বলা হয়েছে, তা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন : যাহিরী আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যে-কোনো ব্যক্তিই নামাজ পড়ার ইচ্ছা করবে, তাকেই অজু করতে হবে। চাই সে مُحْدِثٌ [অজুহীন] হোক বা غَيْرُ مُحْدِثٍ [অজুহীন না] হোক। অথচ غَيْرُ مُحْدِثٍ -এর নামাজের জন্য অজু করা আবশ্যক নয়।

উত্তর : أَصْحَابُ ظَوَاهِرْ আয়াতের যাহিরী অর্থকে গ্রহণ করেছে। তারা বলে, নামাজ আদায়ের জন্য অজু থাকলেও অজু করতে হবে এবং অজু না থাকলেও অজু করতে হবে। কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামে ভিন্নমত পোষণ করেন যে, অজু থাকাবস্থায় নামাজ আদায়ের জন্য পুনরায় অজু করা আবশ্যক নয়। তাঁরা বলেন যে, আয়াতের মধ্যে একটি শর্ত উহ্য আছে। তা হলো– وَاَنْتُمْ مُحْدِثُوْنَ তখন আয়াতের صُوْرَةٌ হবে– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاَنْتُمْ مُحْدِثُوْنَ অর্থ হবে, 'অজুহীন অবস্থায় যখন তোমরা নামাজ আদায়ের ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করবে।' হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত যে, অজুহীন হলেই কেবল অজু ওয়াজিব হবে, অন্যথায় নয়। উল্লিখিত আয়াতের دَلَالَةُ النَّصِّ দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়। কেননা,

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا .

এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের বিধানকে حَدَثٌ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, حَدَثٌ হওয়া তায়াম্মুম ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত। আর তায়াম্মুম হলো অজুর খলিফা বা স্থলাভিষিক্ত। আর এ কায়দাটি

সর্বজন স্বীকৃত যে, খলিফার মধ্যে যে জিনিস نَصّ হিসেবে গণ্য হয়, أَصْل -এর মধ্যেও তা نَصّ হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং حَدَثْ হওয়া অজু ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হিসেবে গণ্য হবে। যেমন– তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : বেকায়া গ্রন্থকারের كِتَابُ الطَّهَارَةِ শিরোনাম দ্বারা বুঝা যায় যে, সংশ্লিষ্ট মাসআলা বর্ণনা করা হবে। অথচ তিনি মাসআলা বর্ণনা করেননি; বরং এমন এক আয়াত নিয়ে এসেছেন, যা মাসায়েলের দলিল হয়। মাসাআলাবিহীন শুধু দলিলের বিবরণ দেওয়ার কারণ কি?

উত্তর : ওলামায়ে কেরাম এর চারটি উত্তর দেন। শরহে বেকায়া গ্রন্থকার عِبَارَةْ -এর মধ্যে দুটি উত্তর উল্লেখ করেছেন–

اِفْتَتَحَ الْكِتَابَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ تَيَمُّنًا وَلِأَنَّ الدَّلِيْلَ أَصْلٌ وَالْحُكْمَ فَرْعُهُ وَالْأَصْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَرْعِ بِالرُّتْبَةِ .

১. বেকায়া গ্রন্থকার "কুরআনের বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে" আয়াতে কুরআনীর মাধ্যমে স্বীয় কিতাবের সূচনা করেছেন।

২. মাসায়েলের দলিল হলো– أَصْل [মূল] এবং হুকুম বা মাসআলা হলো فَرْع [শাখা] আর নিয়ম আছে যে, أَصْل . فَرْع -এর অগ্রে আসে। এ হিসেবে গ্রন্থকার প্রথমে দলিলের বিবরণ নিয়ে এসেছেন।

আরো দুটি উত্তর আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করেছেন–

اِنَّهُ يَنْبَغِىْ لِلْفَقِيْهِ اَنْ يَعْتَنِىَ بِشَانِ الدَّلِيْلِ فَاِنَّ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ مَلَكَةُ الْاِسْتِنْبَاطِ مِنَ الدَّلِيْلِ لَا يُسَمّٰى فَقِيْهًا وَاَنَّ الْحُكْمَ اِنَّمَا يَكُوْنُ مَقْبُوْلًا اِذَا ثَبَتَ عَنْ دَلِيْلٍ شَرْعِىٍّ اِذْ لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْىِ فِى الْاَحْكَامِ فَالْاِبْتِدَاءُ بِالْاٰيَةِ الَّتِىْ هِىَ دَلِيْلُ مَا يُذْكَرُ بَعْدَهَا لِيَكُوْنَ الْحُكْمُ فِىْ اَوَّلِ وُرُوْدِهٖ عَلٰى ذِهْنِ الْمُتَعَلِّمِ مَقْبُوْلًا عِنْدَهٗ .

৩. গ্রন্থকার আয়াতে কুরআনীর মাধ্যমে স্বীয় কিতাবের সূচনা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ফকীহের জন্য দলিলের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কেননা, যিনি দলিল থেকে মাসআলা উদঘাটন করতে না পারেন, তাঁকে ফকীহ বলা হয় না।

৪. হুকুম বা মাসআলা তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তা শরিয়তের দালায়েল (دَلَائِلْ شَرْعِيَّةْ) -এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা, শরিয়তের বিধান বা হুকুমের ক্ষেত্রে শুধু রায় ও অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। আয়াতকে অগ্রে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, "দলিল এই এবং হুকুম এই, যেন শিক্ষার্থীর মেধা তা কবুল করে।"

আয়াতের خِطَابْ : অজুর উল্লিখিত আয়াতে "يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَقُمْتُمْ" দ্বারা নারী-পুরুষ উভয়কে সম্বোধন (خِطَابْ) করা হয়েছে। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) হিদায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন–

اِنَّ كَلِمَةَ "اٰمَنُوْا" وَ "قُمْتُمْ" وَاِنْ كَانَ صِيْغَةَ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ لٰكِنَّهَا تَتَنَاوَلُ النِّسَاءَ اَيْضًا

অর্থাৎ "اٰمَنُوْا এবং قُمْتُمْ শব্দদ্বয় যদিও جَمْعُ مُذَكَّرْ -এর সীগাহ, কিন্তু مُؤَنَّثْ [মহিলা]-ও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।"

قَوْلُهٗ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন–

اِلَى الْمَرَافِقِ الْغَايَةُ دَاخِلَةٌ فِى الْمُغَيَّا عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ .

"জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট غَايَةْ টি مُغَيَّا -এর অন্তর্ভুক্ত।" অর্থাৎ হাত কনুইসহ ধৌত করবে; কুনই পর্যন্ত নয়।

قَوْلُهٗ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ : জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট وَاَرْجُلَكُمْ -এর لَامْ যবরযুক্ত পড়া হয় এবং একে عَطْف করা হয় وُجُوْهَكُمْ -এর উপর। অর্থ হয় যে, 'পা'-কে টাখনোসহ ধৌত কর।' কেউ কেউ لَامْ -এর মধ্যে যের দিয়ে পড়েন এবং এক رُؤُوْسِكُمْ -এর উপর عَطْف করেন। অর্থ হয় যে, 'পা মাসেহ কর।' এ দুই ধরনের কেরাতের উপর ভিত্তি করে পা ধৌত করা ও মাসেহ করা নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। রাওয়াফেয (رَوَافِضْ) সম্প্রদায় যেরের কেরাতকে গ্রহণ করে বলে– পা মাসেহ করতে হবে। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত যবরের কেরাতকে গ্রহণ করে বলেন– পা ধৌত করতে হবে।

ثُمَّ لَمَّا كَانَتِ الْاٰيَةُ دَالَّةً عَلٰى فَرَائِضِ الْوُضُوْءِ اُدْخِلَ فَاءُ التَّعْقِيْبِ فِىْ قَوْلِهٖ فَفَرْضُ الْوُضُوْءِ غَسْلُ الْوَجْهِ مِنَ الشَّعْرِ اَىْ قِصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَهُوَ مُنْتَهٰى مَنْبَتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الْاُذُنِ فَيَكُوْنُ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْاُذُنِ دَاخِلًا فِى الْوَجْهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) فَيَفْرَضُ غَسْلُهٗ وَعَلَيْهِ اَكْثَرُ مَشَايِخِنَا وَذَكَرَ شَمْسُ الْاَئِمَّةِ الْحَلْوَائِىُّ يَكْفِيْهِ اَنْ يَبُلَّ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْاُذُنِ وَلَا يَجِبُ إِسَالَةُ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلٰى مَا رُوِىَ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّ الْمُصَلِّىْ إِذَا بَلَّ وَجْهَهٗ وَاَعْضَاءَ وُضُوْئِهٖ بِالْمَاءِ وَلَمْ يَسِلِ الْمَاءُ عَنِ الْعُضْوِ جَازَ لٰكِنْ قِيْلَ تَاوِيْلُهٗ اَنَّهٗ سَالَ مِنَ الْعُضْوِ قَطْرَةٌ اَوْ قَطْرَتَانِ وَلَمْ يَتَدَارَكْ وَاَسْفَلِ الذَّقَنِ فَتَمَّ حُدُوْدُ الْوَجْهِ مِنَ الْاَطْرَافِ الْاَرْبَعَةِ ـ

অনুবাদ : অতঃপর যেহেতু উক্ত আয়াত অজুর ফরজসমূহকে বুঝায়, তাই গ্রন্থকার স্বীয় আলোচনার শুরুতে فَاءْ تَعْقِيْبِيَّةً এনে অজুর ফরজসমূহের বিবরণ শুরু করেন। [এবং বলেন,] সুতরাং অজুর ফরজ হচ্ছে যে, চুল তথা মাথার চুলের গোড়া থেকে যেখানে চুল উঠা বন্ধ হয়ে যায় কান পর্যন্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা। অতএব, জুলফি এবং কানের মধ্যাংশ মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব। তাই তা ধৌত করা ফরজ। অধিকাংশ হানাফী মাশায়িখের মাযহাব এটিই।

শামসুল আইম্মাহ হালওয়ায়ী (র.) উল্লেখ করেন যে, জুলফি এবং কানের মধ্যাংশ [পানি দ্বারা] ভিজিয়ে দেওয়া যথেষ্ট হবে; পানি প্রবাহিত করা আবশ্যক নয়। এ ভিত্তিতে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে– "যদি নামাজি ব্যক্তি স্বীয় মুখমণ্ডল ও অজুর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পানি দ্বারা ভিজিয়ে নেয় এবং অঙ্গে পানি প্রবাহিত না করে, তবে [তার] অজু জায়েজ। কিন্তু [ফুকাহায়ে কেরাম] তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, এর মর্ম হচ্ছে– অজুর অঙ্গে এক ফোঁটা বা দু-ফোঁটা পানি প্রবাহিত হওয়া। যদিও পানি ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত না হয়। চিবুকের নীচ পর্যন্ত। অতএব, মুখমণ্ডলের চারদিকের পরিধি নির্ধারণ হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ عَلٰى فَرَائِضِ الْوُضُوْءِ : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের উল্লিখিত عِبَارَةٌ-এর মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুসান্নিফ (র.)-এর সামনের বক্তব্য سُنَّتُهٗ وَمُسْتَحَبَّهٗ-এর فَرْضُ الْوُضُوْءِ-এর উপর নয়। কেননা, উক্ত আয়াত অজুর সুন্নত ও মুস্তাহাবের উপর دَلَالَةٌ করে না। তাই এর উপর عَطْفٌ ও সহীহ নয়; বরং سُنَّتُهٗ وَمُسْتَحَبُّهٗ দুটি ভিন্ন এবং পূর্ণ جُمْلَةٌ অথবা এ দুই বাক্যের عَطْفٌ فَرْضُ الْوُضُوْءِ-এর উপর।

প্রশ্ন : যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, স্বয়ং গ্রন্থকার সামনে উল্লেখ করবেন, দাড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ। অথচ এর উপর উক্ত আয়াত دَلَالَةٌ করে না।

উত্তর : আয়াতে دَلَالَةٌ ব্যাপক (عَامٌ) চাই صَرَاحَةٌ হোক বা بِطَرِيْقِ اِسْتِنْبَاطٍ হোক। অথবা বলা হবে যে, আয়াতের মধ্যে অজুর সমস্ত فَرْضٌ-এর বিবরণ উল্লেখ করা হয়নি।

قَوْلُهُ فَفَرْضُ الْوُضُوْءِ : فَرْض শব্দটি কর্তন করা, নিরূপণ করা, নির্ধারণ করা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। শরিয়তের পরিভাষায় "ফরজ এমন হুকমুকে বলা হয়– যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত।" আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) হিদায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন– وَفِى الْاِصْطِلَاحِ : قِيْلَ هُوَ حُكْمٌ ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ لَا شُبْهَةَ فِيْهِ

আল্লামা মুহাম্মদ আহসান (র.) كَنْزُ الدَّقَائِقِ গ্রন্থের টীকায় লেখেন–

وَفِى الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ حُكْمٍ مُقَدَّرٍ لَا يَحْتَمِلُ زِيَادَةً وَلَا نُقْصَانَ لِاَنَّهُ ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ لَا شُبْهَةَ فِيْهِ .

❖ دَلَالَةُ النَّصِّ-এর أَقْسَام : উক্ত আয়াত তথা نَص অজুর فَرْضِيَّة-এর উপর دَلَالَة করে। এমন دَلَالَةُ النَّصِّ চার প্রকার। শায়খ ইউসুফ বিন্নুরী (র.) আল্লামা ইবনে হুমাম (র.)-এর সূত্রে مَعَارِفُ السُّنَنِ গ্রন্থে উক্ত চার প্রকার এভাবে উল্লেখ করেন–

১. قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ قَطْعِيُّ الثُّبُوْتِ যেমন– কুরআন মাজীদের আয়াত এবং ঐ সমস্ত মুতাওয়াতির হাদীস, যা স্পষ্ট এবং যাতে কোনোরূপ তাবীল (تَاوِيْل) -এর অবকাশ নেই।

২. قَطْعِيُّ الثُّبُوْتِ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ যেমন– কুরআন মাজীদের আয়াত এবং ঐ সমস্ত হাদীস, যার মধ্যে তাবীল (تَاوِيْل) -এর অবকাশ রয়েছে।

৩. ظَنِّيُّ الثُّبُوْتِ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ যেমন– ঐ সমস্ত খবরে ওয়াহিদ (خَبَرْ وَاحِدْ) যা স্পষ্ট ও صَرِيْح -

৪. ظَنِّيُّ الثُّبُوْتِ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ যেমন– ঐ সমস্ত খবরে ওয়াহিদ (خَبَرْ وَاحِدْ) যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লিখিত চার প্রকারের হুকুম সম্পর্কে শায়খ ইউসুফ বিন্নুরী (র.) লেখেন–

فَالْقِسْمُ الْاَوَّلُ مِنْهَا يُفِيْدُ اِثْبَاتَ الْفَرْضِيَّةِ فِىْ جَانِبِ الْاَمْرِ وَالْحُرْمَةِ فِىْ جَانِبِ النَّهْىِ . وَالثَّانِىْ وَالثَّالِثُ يُفِيْدُ اَنَّ الْوُجُوْبَ حِيْنًا وَالسُّنِّيَّةَ حِيْنًا فِىْ جِهَةِ الْاَمْرِ وَالْكَرَاهِيَّةَ تَحْرِيْمًا فِىْ جِهَةِ النَّهْىِ وَالرَّابِعُ يُفِيْدُ النَّدْبَ وَالْاِسْتِحْبَابَ فِى الْاَمْرِ وَالْكَرَاهِيَّةَ تَنْزِيْهًا فِى النَّهْىِ .

অর্থাৎ প্রথম প্রকারের মাধ্যমে কার্যনির্দেশের ক্ষেত্রে فَرْضِيَّة সাব্যস্ত হয় এবং নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে حُرْمَة সাব্যস্ত হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের মাধ্যমে কার্যনির্দেশের ক্ষেত্রে কখনো وُجُوْب কখনো سُنَّة সাব্যস্ত হয় এবং নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে مَكْرُوْه تَحْرِيْمِىْ সাব্যস্ত হয়।

চতুর্থ প্রকারের মাধ্যমে কার্যনির্দেশের ক্ষেত্রে মোস্তাহাব সাব্যস্ত হয় এবং নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে مَكْرُوْه تَنْزِيْهِىْ সাব্যস্ত হয়।
–[মা'আরিফুস সুনান : খ. ১, পৃ. ৫৭]

❖ **وُضُوْء শব্দের বিশ্লেষণ :** وَضُوْء শব্দটি দুভাবে পড়া যায়–

১. اَلْوَضُوْءُ بِفَتْحِ الْوَاوِ অর্থাৎ وَاوْ অক্ষর যবর দ্বারা পড়া যায়। অর্থ হয়– اَلْمَاءُ يُتَوَضَّأُ بِهِ "ঐ পানি-যার দ্বারা অজু করা হয়"।

২. اَلْوُضُوْءُ بِضَمِّ الْوَاوِ অর্থাৎ وَاوْ অক্ষর পেশ দ্বারাও পড়া যায়। অর্থ হয়–

اَلْغَسْلُ وَالْمَسْحُ عَلٰى أَعْضَاءٍ مَخْصُوْصَةٍ ، أَوْ إِيْصَالُ الْمَاءِ إِلَى الْاَعْضَاءِ الْاَرْبَعَةِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، مَعَ النِّيَّةِ .

অর্থাৎ "নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহ ধৌত ও মাসেহ করা"। অথবা "নিয়তের সাথে চার অঙ্গ তথা মাথা, মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের উপর পানি পৌঁছে দেওয়া।" –[আল-মু'জামুল ওয়াসীত : পৃ. ১০৩৮]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, বেকায়া গ্রন্থকার وَضُوْء -এর বিষয়কে গোসল ও অন্যান্য বিষয়ের অগ্রে কেন বর্ণনা করেছেন?

উত্তর : এর উত্তর কয়েকটি হতে পারে–

১. গোসল ও অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অজুর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

২. অজুর অঙ্গ (مَحَلّ) সমূহ গোসলের অঙ্গ (مَحَلّ) সমূহের جُزْء আর নিয়ম হচ্ছে, كُلْ ـ جُزْء -এর উপর مُقَدَّمْ হয় طَبْعًا, তাই وَضْعًا ও অজুর বিবরণকে গোসলের বিবরণের উপর مُقَدَّمْ করা হয়েছে।

৩. কুরআন মাজীদেও আল্লাহ তা'আলা প্রথমে অজুর কথা বর্ণনা করে বলেছেন– فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ এবং পরে গোসলের কথা উল্লেখপূর্বক বলেছেন– وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

❖ **غَسْل শব্দের বিশ্লেষণ :** غَسْل শব্দের غَيْن অক্ষরে তিন প্রকারের হরকতই পড়া যায়। এ সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) اَلْمَغْرِبْ আভিধানের বরাত দিয়ে শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন–

اَلْغَسْلُ بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى اِزَالَةِ الْوَسَخِ وَنَحْوِهِ بِاِمْرَارِ الْمَاءِ وَاَمَّا الْغُسْلُ بِالضَّمِّ فَهُمْ اِسْمٌ مِنَ الْاِغْتِسَالِ وَهُوَ غَسْلُ تَمَامِ الْجَسَدِ وَبِالْكَسْرِ اِسْمٌ لِمَا يَغْسِلُ بِهِ الرَّأسَ مِنَ الْخِطْمِىْ وَغَيْرِهِ ـ

১. غَيْن অক্ষরটি যদি যবর দ্বারা পড়া হয়, তবে অর্থ হবে– "পানি প্রবাহিত করে ময়লা দূরীভূত করা তথা ধৌত করা।"

২. غَيْن অক্ষরটি যদি পেশ দ্বারা পড়া হয়, তবে অর্থ হবে– "সমস্ত শরীর ধৌত করা।"

৩. غَيْن অক্ষরটি যদি যের দ্বারা পড়া হয়, তবে অর্থ হবে– "ঐ সমস্ত জিনিস, যার দ্বারা মাথা ধৌত করা হয়। যেমন– খিতমী ইত্যাদি।"

❖ **وُضُوْء-এর ফরজ চারটি :** বেকায়া গ্রন্থকার فَفَرْضُ الْوُضُوْءِ বলে অজুর ফরজের বিবরণ দিচ্ছেন। কিন্তু شَارِحْ-এর দীর্ঘ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের কারণে গ্রন্থকারের বর্ণনাকৃত অজুর ফরজসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমরা তালিবে ইলমদের সুবিধার্থে অজুর সমস্ত ফরজ সংক্ষিপ্তভাবে একত্রে উল্লেখ করছি। অজুর ফরজ চারটি। বেকায়া গ্রন্থকার বলেন–

غَسْلُ الْوَجْهِ مِنَ الشَّعْرِ اِلَى الْاُذُنِ وَاَسْفَلِ الذَّقَنِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ وَمَسْحِ رُبْعِ الرَّأسِ ـ

১. মাথার অগ্রভাগের চুলের গোড়া থেকে চিবুকের নীচ পর্যন্ত, এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা।

২. উভয় হস্ত কনুইসহ ধৌত করা।

৩. উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা।

৪. মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা।

قَوْلُهُ قِصَاصُ شَعْرِ الرَّأْسِ الخ : অর্থাৎ মাথার অগ্রভাগের চুলের গোড়া পর্যন্ত অথবা কপালের উপরের অংশ, যেখান থেকে মাথার চুল উঠা শুরু হয়েছে সেখান পর্যন্ত ধৌত করা ফরজ। যার মাথায় চুল নেই, তিনি সাধারণত যেখান থেকে চুল উঠে সেখান পর্যন্ত ধৌত করবে।

قَوْلُهُ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْاُذُنِ الخ : কান থেকে চেহারার দিকে সামান্য ব্যবধানে যেই দাড়ি রয়েছে, সেটাকে عِذَارْ বলে। এই عِذَارْ এবং কানের মাঝের অংশকে مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْاُذُنِ বলে। ওলামায়ে আহনাফের নিকট مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْاُذُنِ পানি প্রবাহের মাধ্যমে ধৌত করা ফরজ। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁর নিকট তা ধৌত করা ফরজ নয়; বরং পানি দ্বারা ভিজিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। শামসুল আইম্মাহ হালওয়ায়ী (র.)-এর মাযহাবও এটিই।

قَوْلُهُ شَمْسُ الْاَئِمَّةِ الْحَلْوَائِىْ : তাঁর নাম আব্দুল আযীয ইবনে আহমদ ইবনে নসর ইবনে সালেহ আল-বুখারী (র.)। তাঁর পিতা হালুয়া বিক্রেতা ছিলেন। তাই তাঁকে হালওয়ায়ী (حَلْوَائِىْ) বলা হয়। কেউ কেউ তাঁকে হুলওয়ানীও (حُلْوَانِىْ) বলে। হুলওয়ান (حُلْوَانْ) ইরাকের একটি শহরের নাম। শামসুল আইম্মাহ (র.) যেহেতু সেই শহরের অধিবাসী ছিলেন, তাই তাঁকে হুলওয়ানী (حُلْوَانِىْ) বলা যায়।

قَوْلُهُ قِيْلَ تَاوِيْلُهُ اَنَّهُ سَالَ مِنَ الْعُضْوِ الخ : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন যে, আল্লামা চালপী (র.) যখীরাতুল উকবা (ذَخِيْرَةُ الْعُقْبٰى) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত বক্তব্য "পানি দ্বারা অঙ্গ ভিজানো"-এর ব্যাখ্যা "এক ফোঁটা অথবা দুই ফোঁটা পানি প্রবহিত হওয়া"-এর দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো, শামসুল আইম্মাহ (র.)-এর মাযহাবের رَدٌّ [খণ্ডন] করা। কেননা, হালওয়ায়ী (র.)-এর মাযহাবে পানি টপকানো শর্ত নয়। আর উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট কমপক্ষে দু-এক ফোঁটা পানি টপকানো শর্ত। অতএব, এ ব্যাখ্যানুযায়ী ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাবের সাথে মিলে যাচ্ছে। যদি এর ব্যাখ্যা এমন না করা হতো, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব شَرْعًا ও لُغَةً ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাবের পরিপন্থি হতো।

ثُمَّ عَطَفَ عَلَى الْوَجْهِ قَوْلَهُ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) فَإِنَّ عِنْدَهُ لَا يَدْخُلُ الْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ فِي الْغَسْلِ لِأَنَّ الْغَايَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغْيَا وَنَحْنُ نَقُوْلُ إِنْ كَانَتِ الْغَايَةُ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ تَدْخُلْ فِيْهَا كَلِمَةُ إِلٰى لَمْ يَتَنَاوَلْهَا صَدْرُ الْكَلَامِ لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ الْمُغْيَا كَاللَّيْلِ فِي الصَّوْمِ وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ يَتَنَاوَلُهَا صَدْرُ الْكَلَامِ كَالْمُتَنَازَعِ فِيْهِ تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغْيَا بِنَاءً عَلٰى أَنَّ لِلنَّحْوِيِّيْنَ فِيْ إِلٰى أَرْبَعَةَ مَذَاهِبَ الْأَوَّلُ دُخُوْلُ مَا بَعْدَهَا فِيْ مَا قَبْلَهَا إِلَّا مَجَازًا وَالثَّانِي عَدَمُ الدُّخُوْلِ إِلَّا مَجَازًا وَالثَّالِثُ الْإِشْتِرَاكُ وَالرَّابِعُ الدُّخُوْلُ إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا وَعَدَمُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَهٰذَا الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ يُوَافِقُ مَا ذَكَرْنَا فِي اللَّيْلِ وَالْمَرَافِقِ .

অনুবাদ : বেকায়া গ্রন্থকার غَسْلُ الْوَجْهِ -এর উপর عَطْفٌ করে বলেন, কনুইসহ হস্তদ্বয় এবং টাখনুসহ পদদ্বয় ধৌত করা [ফরজ]। এতে ইমাম যুফার (র.) মতানৈক্য করেন। কেননা, তাঁর নিকট কনুই ও টাখনু অজুতে ধৌত করা ফরজ নয়। কারণ, غَايَةٌ - مُغْيَا -এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। আমরা বলি যে, غَايَةٌ যদি এমন হয়, إِلٰى শব্দটি এর মধ্যে দাখিল না হলেও صَدْرُ الْكَلَام তথা مُغْيَا - غَايَةٌ - مُغْيَا -কে শামিল রাখে না, তবে غَايَةٌ - مُغْيَا -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন- صَوْم - (غَايَةٌ) صَوْم [রোজা]-এর মধ্যে لَيْل [রাত]। [অর্থাৎ وَاَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ -এর মধ্যে (غَايَةٌ) -এর অন্তর্ভুক্ত নয়।] আর যদি غَايَةٌ -টা এমন হয় যে, صَدْرُ الْكَلَامِ (مُغْيَا) -কে শামিল রাখে- "যেমন (مُغْيَا) - আলোচিত মাসআলায়" তবে غَايَةٌ - مُغْيَا -এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, "إِلٰى" সম্পর্কে নাহুবিদদের চারটি মাযহাব রয়েছে। যথা-

১. إِلٰى -এর مَا بَعْد - مَا قَبْل -এর অন্তর্ভুক্ত হবে; কিন্তু مَجَازِىْ ভাবে [অন্তর্ভুক্ত হবে] না।

২. অন্তর্ভুক্ত হবে না, তবে مَجَازِىْ ভাবে [অন্তর্ভুক্ত] হবে।

৩. অন্তর্ভুক্ত হওয়া না হওয়া উভয়ের মধ্যে مُشْتَرِكْ -

৪. إِلٰى -এর مَا بَعْد যদি مَا قَبْل -এর جِنْس -এর হয়, তবে مَا بَعْد - مَا قَبْل -এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং إِلٰى -এর مَا بَعْد যদি مَا قَبْل -এর جِنْس -এর না হয়, তবে مَا بَعْد - مَا قَبْل -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। অতএব, لَيْل ও مَرَافِقْ সম্পর্কে আমাদের দেওয়া বিবরণের সঙ্গে চতুর্থ মাযহাবের মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ الخ :

অজুতে উভয় পা ধৌত করতে হবে, মাসেহ যথেষ্ট নয় : "পা ধৌত ও মাসেহ করার" মাসআলায় যেহেতু মতানৈক্য রয়েছে- তাই সংক্ষিপ্তভাবে এর বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- "পা ধৌত করা ফরজ। মাসেহ যথেষ্ট হবে না।"

رَوَافِضْ ও شِيْعَة إِمَامِيَّةٌ সম্প্রদায়ের মতে- "পা মাসেহ করবে। ধৌত করার প্রয়োজন নেই।"

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : উভয় মতালম্বীই নিম্নোক্ত আয়াতের দ্বারা দলিল পেশ করেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ : তবে মাযহাবদ্বয়ের اَلْاِسْتِدْلَالُ -এর ধরন ভিন্ন। আয়াতে وَاَرْجُلَكُمْ শব্দের لَامٌ -এর মধ্যে جَرٌّ ও نَصَبٌ দুই ধরনের قِرَاءَةٌ রয়েছে। যদি جَرٌّ -এর قِرَاءَةٌ হয়, তবে এর عَطْفٌ হবে رُؤُوْسِكُمْ -এর উপর। আর যদি نَصَبٌ -এর قِرَاءَةٌ হয়, তবে এর عَطْفٌ হবে وُجُوْهَكُمْ -এর উপর। شِيْعَةٌ اِمَامِيَّةٌ ও رَوَافِضٌ সম্প্রদায় جَرٌّ -এর قِرَاءَةٌ -কে গ্রহণ করে اِسْتِدْلَالٌ করেন যে, আয়াতের মধ্যে মাথা ও পা মাসেহের কথা বলা হয়েছে। অতএব, পা মাসেহ করতে হবে। ধৌত করার প্রয়োজন নেই।
পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত نَصَبٌ -এর قِرَاءَةٌ -কে গ্রহণ করে اِسْتِدْلَالٌ করেন যে, اَرْجُلَكُمْ -এর عَطْفٌ - وُجُوْهَكُمْ -এর উপর। অতএব চেহারা যেমন ধৌত করা হয় তেমনি পা-ও ধৌত করতে হবে। মাসেহ যথেষ্ট হবে না। তাছাড়াও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষের দলিল রয়েছে অসংখ্য হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের تَعَامُلٌ এবং اِجْمَاعٌ -

جَرٌّ কেরাতের খণ্ডন :

১. جَرٌّ -এর قِرَاءَةٌ - جَرْ جِوَارٌ হিসেবে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর عَطْفٌ হবে وُجُوْهَكُمْ -এর উপর।
২. اَرْجُلَكُمْ -এর عَطْفٌ - رُؤُوْسَكُمْ -এর উপরই হবে। কিন্তু مَسْحٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে غَسْلٌ خَفِيْفٌ আর مَسْحٌ - غَسْلٌ خَفِيْفٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়া আরবদের নিকট প্রসিদ্ধ বিষয়।
৩. جَرٌّ -এর قِرَاءَةٌ - حَالَةُ التَّخْفِيْفِ বা মোজা পরিহিত অবস্থার উপর مَحْمُوْلٌ এবং نَصَبٌ -এর قِرَاءَةٌ - حَالَةُ الْعَامَّةِ -এর উপর مَحْمُوْلٌ -

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– সিয়ায়াহ, ফাতহুল কাদীর : খ. ১, পৃ. ১১; ফাতহুল মুলহিম : খ. ১, পৃ. ৪০৩–৪; মা'আরিফুস সুনান : খ. ১, পৃ. ১৮৫ – ৯২; দরসে তিরমিযী : খ. ১, পৃ. ২৫১–৫৭]

❖ **অজুতে مِرْفَقٌ ও كَعْبٌ ধৌত করা ফরজ :** مِرْفَقٌ কনুই ও كَعْبٌ [টাখনু] অজুতে ধৌত করা ও না করা নিয়ে জমহুর ওলামায়ে কেরাম ও ইমাম যুফার (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম যুফার (র.) বলেন, অজুতে কনুই ও টাখনু ধৌত করা ফরজ নয়। এটি ইমাম মালেক (র.)-এর একটি رِوَايَةٌ -ও বটে। পক্ষান্তরে জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, অজুতে কনুই ও টাখনু ধৌত করা ফরজ।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হচ্ছে– لِاَنَّ الْغَايَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيَّا অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে مَرَافِقُ ও كَعْبَيْنِ শব্দ দুটি হচ্ছে غَايَةٌ আর غَايَة -টি مُطْلَقًا - مُغَيَّا -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কাজেই কনুই হাতের হুকুমের এবং টাখনু পায়ের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

জমহুর ওলামায়ে কেরামের দলিল হচ্ছে, غَايَةٌ যদি এমন হয় যে, اِلٰى শব্দটি দাখিল না হলেও مُغَيَّا - غَايَةٌ -কে শামিল রাখে না। তবে غَايَةٌ - مُغَيَّا -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন– وَاَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ আয়াতের মধ্যে اِلٰى শব্দটি যদি এখানে উল্লেখ নাও করা হতো, তবুও مُغَيَّا তথা يَوْمٌ [দিন] غَايَةٌ তথা لَيْلٌ [রাত]-কে শামিল রাখত না। আর যদি غَايَةٌ -টা এমন হয় যে, اِلٰى শব্দটি দাখিল না হলেও مُغَيَّا - غَايَةٌ -কে শামিল রাখে, তবে غَايَةٌ - مُغَيَّا -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন আলোচ্য আয়াতে হাত مِرْفَقٌ [কনুই]-কে এবং পা كَعْبٌ [টাখনু]-কে শামিল রাখে। কেননা, يَدٌ [হাত] বলতে বগল পর্যন্ত বুঝায়। অনুরূপ رِجْلٌ [পা] বলতে রান পর্যন্ত বুঝায়।

অথবা আমরা অন্যভাবে বলতে পারি যে, যদি غَايَةٌ এবং مُغَيَّا এক جِنْسٌ -এর হয়, তবে غَايَةٌ - مُغَيَّا -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন– حَفِظْتُ الْقُرْاٰنَ مِنْ اَوَّلِهٖ اِلٰى اٰخِرِهٖ -এর মধ্যে قُرْاٰنٌ -এর শেষাংশও কুরআনের جِنْسٌ -এর থেকেই। অনুরূপ اِلَى الْمَرَافِقِ وَاِلَى الْكَعْبَيْنِ -এর মধ্যে مِرْفَقٌ - يَدٌ [হাত] -এর جِنْسٌ থেকে এবং كَعْبٌ - رِجْلٌ [পা]-এর جِنْسٌ থেকে। আর যদি غَايَةٌ ও مُغَيَّا এক جِنْسٌ -এর না হয়, তবে غَايَةٌ – مُغَيَّا -এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন– وَاَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ -এর মধ্যে لَيْلٌ [রাত] এবং يَوْمٌ [দিন] দুটি ভিন্ন ভিন্ন جِنْسٌ -এর হওয়ার কারণে صَوْمٌ [রোজা]-এর মধ্যে غَايَةٌ তথা রাত শামিল নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) জমহুর ওলামায়ে কেরামের দলিলকে এভাবে উল্লেখ করেন–

وَلَنَا اَنَّ هٰذِهِ الْغَايَةَ لِاِسْقَاطِ مَا وَرَاءَهَا اِذْ لَوْلَاهَا لَاسْتَوْعَبَتِ الْوَظِيْفَةُ الْكُلَّ ـ

অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে উক্ত غَايَةٌ তৎপরবর্তী অংশকে বাদ দেওয়া (اِسْقَاطٌ)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এখানে যদি কনুই এবং টাখনুর কথা উল্লেখ না থাকত, তবে বগল পর্যন্ত হাত এবং রান পর্যন্ত পা ধৌত করা আবশ্যক হতো। –[হিদায়া : খ. ১, পৃ. ১৬–১৭]

উল্লেখ্য যে, হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণিত দলিলের সারমর্ম হচ্ছে, غَايَةٌ দু প্রকার : ১. غَايَةُ الْاِثْبَاتِ ২. غَايَةُ الْاِسْقَاطِ

غَايَةُ الْاِثْبَاتِ : مُغْيَا ـ غَايَةٌ-কে নিজের মধ্যে শামিল রাখে না। যেমন– ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ-এর মধ্যে لَيْلٌ [রাত] রোজার হুকুমের মধ্যে দাখিল নয়।

غَايَةُ الْاِسْقَاطِ : مُغْيَا ـ غَايَةٌ-কে নিজের মধ্যে শামিল রাখে। যেমন, আলোচ্য আয়াতে مَرَافِقٌ ـ اَيْدِيكُمْ-এর মধ্যে দাখিল এবং كَعْبَيْنِ ـ اَرْجُلَكُمْ-এর মধ্যে দাখিল। –[আরো জানার জন্য দেখুন– [ফাতহুল কাদীর : খণ্ড ১, পৃ. ১২–১৩]

اِلٰى শব্দের ব্যাপারে নাহুবিদদের চার مَذْهَبٌ : শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, অজুতে কনুই ও টাখনু ধৌত করার ব্যাপারে জমহুর ওলামায়ে কেরাম اِلٰى-এর غَايَةٌ ও مُغْيَا-এর দ্বারা যে যুক্তি পেশ করেছেন, তা اِلٰى-এর ব্যাপারে নাহুবিদের চার মাযহাবের একটি। চার মাযহাব নিম্নরূপ–

১. اِلٰى-এর مَا بَعْدَ ـ مُطْلَقًا ـ مَا قَبْلَ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যদি কোনো مَانِعٌ থাকে তবে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

২. اِلٰى-এর مَا بَعْدَ ـ مُطْلَقًا ـ مَا قَبْلَ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে কোনো قَرِيْنَةٌ থাকলে অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. اِلٰى-এর مَا بَعْدَ ـ مَا قَبْلَ-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া ও না হওয়ার ক্ষেত্রে مُشْتَرِكٌ তথা বরাবর।

৪. اِلٰى-এর مَا بَعْدَ যদি مَا قَبْلَ-এর جِنْس-এর হয়, তবে مَا قَبْلَ - مَا بَعْدَ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি مَا بَعْدَ مَا قَبْلَ-এর جِنْس-এর না হয়, তবে مَا بَعْدَ - مَا قَبْلَ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। এই চতুর্থতম মাযহাবের সঙ্গে জমহুরের যুক্তি মিলে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে আমরা সামনে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

فَفَرْضُ الْوُضُوْءِ غَسْلُ الْوَجْهِ - قَوْلُهُ وَالْيَدَيْنِ الخ : গ্রন্থকার এ শব্দদ্বয়ের পূর্বের عِبَارَةٌ ثُمَّ عَطْفٌ عَلَى الْوَجْهِ-এর উপর করেছেন। অর্থাৎ عِبَارَةٌ টি এরূপ "غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ" الْوَجْهُ-এর

অতঃপর গ্রন্থকার مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ-কে لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ عِبَارَةٌ এমন হবে যে, وَالْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ-এর মর্ম এই যে, অজুর ফরজসমূহের একটি তো মুখমণ্ডল ধৌত করা। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি হচ্ছে উভয় হস্ত কনুইসহ ধৌত করা এবং উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা।

قَوْلُهُ خِلَافًا لِزُفَرَ (رح) : উক্ত عِبَارَةٌ-এর দ্বারা শরহে বেকায়া গ্রন্থকার ইমাম যুফার (র.)-এর মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যার বিবরণ আমরা ইতঃপূর্বে পেশ করেছি।

قَوْلُهُ وَنَحْنُ نَقُوْلُ الخ : এ عِبَارَةٌ দ্বারা শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) চার ইমামসহ জমহুরের মাযহাবের দলিল দিচ্ছেন, যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَي اَنَّ لِلنَّحْوِيِّيْنَ الخ : এ عِبَارَةٌ দ্বারা শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) জমহুরের দলিলকে আরো মজবুত করেছেন যে, জমহুরের দলিল নিছক দাবিমূলক নয়; বরং এটি নাহুবিদদের থেকে বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক পেশ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ الْاَوَّلُ دُخُوْلُ مَا بَعْدَهَا الخ : নাহুবিদদের নিকট এ মাযহাব দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এটাকে প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, এ صُوْرَةٌ হলো وُجُوْدِيٌّ পক্ষান্তরে দ্বিতীয় صُوْرَةٌ হলো عَدَمِيٌّ। আর নিয়ম হচ্ছে– وُجُوْدِيٌّ - عَدَمِيٌّ-এর চেয়ে উত্তম (أَشْرَفُ)। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় صُوْرَةٌ টি حَقِيْقَةٌ ও مَجَازٌ-কে শামিল রাখে, তাই এ দুই صُوْرَةٌ-কে صُوْرَةٌ مُشْتَرَكٌ-এর অগ্রে আনা হয়েছে। আর চতুর্থ প্রকার যেহেতু কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস রাখে, তাই একে সর্বশেষে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالثَّانِيْ الخ : ইমাম রাযী (র.) কাফিয়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেন, এ দ্বিতীয় صُوْرَةٌ অধিকাংশ নাহুবিদদের মাযহাব। ইবনে হিশাম (র.) এটাকে صَحِيْحٌ বলেছেন।

وَاَمَّا الثَّلٰثَةُ الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ يُعَارِضُهُ الثَّانِى فَتَسَاوِيَا وَالثَّالِثُ اَوْجَبَ التَّسَاوِىَ اَيْضًا فَوَقَعَ الشَّكُّ فِىْ مَوَاقِعِ اِسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ اِلٰى فَفِىْ مِثْلِ صُوْرَةِ اللَّيْلِ فِى الصَّوْمِ اِنَّمَا وَقَعَ الشَّكُّ فِى التَّنَاوُلِ وَالدُّخُوْلِ فَلَا يَثْبُتُ التَّنَاوُلُ بِالشَّكِّ وَفِىْ مِثْلِ صُوْرَةِ النِّزَاعِ اِنَّمَا وَقَعَ الشَّكُّ فِى الْخُرُوْجِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ تَنَاوُلُ صَدْرِ الْكَلَامِ وَالدُّخُوْلُ فِيْهِ فَلَا يَخْرُجُ بِالشَّكِّ وَمَا ذَكَرُوْا اَنَّهَا غَايَةُ الْاِسْقَاطِ فَمَشْهُوْرٌ فِى الْكُتُبِ فَلَا نَذْكُرُهُ ـ

অনুবাদ : প্রথম তিন মাযহাবের অবস্থা এই যে, প্রথম ও দ্বিতীয়টি একটি অপরটির বিপরীত। ফলত উভয়টি বরাবর। [কোনোটিরই অগ্রাধিকার হবে না।] তৃতীয় মাযহাবও বরাবরি (تَسَاوِىْ)-কে আবশ্যক করে। অতএব, اِلٰى ব্যবহারে স্থান (مَوْضَعْ)-এর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই اَللَّيْلِ فِى الصَّوْم এর অনুরূপ صُوْرَةْ-এর [اَللَّيْل তথা রাত صَوْم তথা রোজা-এর মধ্যে] শামিল ও দাখিল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সন্দেহের দরুন [لَيْل - صَوْم-এর মধ্যে] শামিল বলে সাব্যস্ত হবে না। আর আলোচিত মাসআলার অনুরূপ صُوْرَةْ এ- صَدْرُ الْكَلَامْ (مُغْيَا)-কে শামিল রাখা এবং [غَايَةْ - مُغْيَا এর মধ্যে] দাখিল থাকা সাব্যস্ত হওয়ার পর مَا بَعْد (غَايَةْ)-এর خُرُوْجْ [তথা غَايَةْ টা- مُغْيَا-এর হুকুম থেকে বাহির হওয়া]-এর মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ সন্দেহের দরুন غَايَةْ-কে [غَايَةْ - مُغْيَا থেকে] خَارِجْ হবে না। আর যেহেতু উসূলবিদগণ اِلَى الْمَرَافِقِ ও اِلَى الْكَعْبَيْنِ-এর غَايَةْ-কে যে غَايَةُ الْاِسْقَاطِ উল্লেখ করেছেন, তা কিতাবসমূহে প্রসিদ্ধ (مَشْهُوْر)। তাই আমরা তা উল্লেখ করছি না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَمَّا الثَّلٰثَةُ الْاَوَّلُ الخ : শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন যে, اِلٰى সম্পর্কে বর্ণিত চার মাযহাবের চতুর্থতম মাযহাবটি আমরা গ্রহণ করেছি। বাকি তিন মাযহাবকে বর্জন করেছি। কারণ, প্রথম ও দ্বিতীয় মাযহাব একটি অপরটির বিপরীত, তাই উভয়টি বরাবর। অতএব, একটির উপরে অপরটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। ফলত উভয়টিই বর্জনীয়, তৃতীয় মাযহাব হচ্ছে, اِلٰى-এর مَا بَعْدَ-এর مَا قَبْلَ-এর মধ্যে দাখিল হওয়া ও না হওয়া বরাবর। তাই এতেও সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, غَايَةْ - مُغْيَا-এর মধ্যে শামিল আছে, নাকি নাই। অতএব, সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার দরুন এ মাযহাবও বর্জনীয়। বাকি রয়েছে চতুর্থতম মাযহাব, যা আমরা গ্রহণ করেছি।

قَوْلُهُ وَفِىْ مِثْلِ صُوْرَةِ النِّزَاعِ الخ : চতুর্থতম মাযহাব মোতাবেক সাব্যস্ত হয়েছে যে, আলোচ্য মাসআলায় غَايَةْ তথা কনুই مُغْيَا তথা হাত-এর মধ্যে শামিল এবং টাখনু পায়ের মধ্যে শামিল। কেননা, উক্ত মাসআলায় اِلٰى-এর مَا قَبْلَ ও مَا بَعْدَ এক جِنْس-এর।

قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرُوْا اَنَّهَا غَايَةُ الْاِسْقَاطِ الخ : اُصُوْلِيِّيْنَ-এর কিতাবে এ মাসআলা প্রসিদ্ধ যে, উক্ত আয়াত তথা غَسْل الْيَدَيْنِ اِلَى الْمَرَافِقِ এবং غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ-এর মধ্যে يَدْ - مِرْفَقْ-এর মধ্যে এবং رِجْل - كَعْبْ-এর মধ্যে শামিল, এটি ইমাম যুফার (র.)-এর বক্তব্যের খণ্ডন যে, مِرْفَقْ এবং كَعْبْ যে غَايَةْ হয়েছে, তা غَايَةُ الْاِسْقَاطِ যা مِرْفَقْ এবং كَعْبْ-এর পরবর্তী অংশকে অজুতে ধৌত করার হুকুম থেকে سَاقِطْ করে দিয়েছে। ফলত كَعْبْ ও مِرْفَقْ - سَاقِطُ الْغَسْلِ-এর মধ্যে পড়ে না; বরং ثَابِتُ الْغَسْلِ-এর মধ্যে পড়ে, যা আমাদের عَيْنُ الْمَذْهَبِ - অতএব, ইমাম যুফার (র.)-এর বক্তব্য আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়।

ثُمَّ الْكَعْبُ فِىْ رِوَايَةِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ الْمِفْصَلُ الَّذِىْ فِىْ وَسْطِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقَدِ الشِّرَاكِ لٰكِنَّ الْأَصَحَّ اَنَّهَا الْعَظْمُ النَّاتِىْ الَّذِىْ يَنْتَهِىْ إِلَيْهِ عَظْمُ السَّاقِ وَ ذٰلِكَ لِأَنَّهٗ تَعَالٰى اِخْتَارَ لَفْظَ الْجَمْعِ فِىْ اَعْضَاءِ الْوُضُوْءِ فَاُرِيْدَ بِمُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ اِنْقِسَامُ الْاٰحَادِ عَلَى الْاٰحَادِ وَاخْتَارَ فِى الْكَعْبِ لَفْظَ الْمُثَنّٰى فَلَمْ يُمْكِنْ اَنْ يُّرَادَ بِهٖ اِنْقِسَامَ الْاٰحَادِ عَلَى الْاٰحَادِ فَتَعَيَّنَ اَنَّ الْمُثَنّٰى مُقَابِلٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اَفْرَادِ الْجَمْعِ فَيَكُوْنُ فِىْ كُلِّ رَجُلٍ كَعْبَانِ وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِيَانِ لَا مَعْقَدَ الشِّرَاكِ فَاِنَّهٗ وَاحِدٌ فِىْ كُلِّ رَجُلٍ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে হিশাম (র.)-এর বর্ণনা মতে টাখনু (كَعْبٌ) হচ্ছে, পায়ের [পাতার] মধ্যখানে [উপরিভাগের] ঐ জোড়া হাড়-যেখানে জুতার ফিতা বাঁধা হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে টাখনু বলা হয়, [পায়ের গোড়ালির নীচের] ঐ ভাসমান হাড়কে, যেখানে এসে পায়ের গোছার হাড় সমাপ্ত হয়েছে। এটি এজন্য যে, অজুর অঙ্গগুলোর [বিবরণের] ক্ষেত্রে আল্লাহ جَمْع [বহুবচন] শব্দ চয়ন করেছেন, তাই جَمْع -এর মোকাবিলায় جَمْع দ্বারা اِنْقِسَامْ الْاٰحَادِ عَلَى الْاٰحَادِ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর كَعْبٌ [টাখনু]-এর ক্ষেত্রে تَثْنِيَةٌ [দ্বিবচন] শব্দ চয়ন করেছেন। তাই [এখানে] এর দ্বারা اِنْقِسَامُ الْاٰحَادِ عَلَى الْاٰحَادِ উদ্দেশ্য করা সম্ভব নয়। অতএব, এটি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, مُثَنّٰى [দ্বিবচন] جَمْع [বহুবচন]-এর প্রত্যেক فَرْد -এর মোকাবিলায় [এসেছে]। কারণ, প্রত্যেক পায়ে দুটি [করে] টাখনু। তা হচ্ছে, ভাসমান দুটি হাড়; জুতার ফিতা বাঁধার স্থান নয়। কেননা, তা প্রত্যেক পায়ে একটি [করে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ الْكَعْبُ فِىْ رِوَايَةِ الخ : উক্ত عِبَارَةْ -এর মাধ্যমে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) كَعْبٌ [টাখনু]-এর পরিচয় দিচ্ছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে হিশাম (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত মতানুযায়ী "كَعْبٌ [টাখনু] বলা হয়, পায়ের পাতার মধ্যখানে উপরিভাগের ভাসমান জোড়া হাড়কে, যেখানে জুতার ফিতা বাঁধা হয়।"

কিন্তু শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন যে, এটি ভুল; বরং বিশুদ্ধ মতে, كَعْبٌ বলা হয়- اَلْعَظْمُ النَّاتِىْ الَّذِىْ يَنْتَهِىْ إِلَيْهِ عَظْمُ السَّاقِ 'পায়ের গোড়ালির নীচে ভাসমান হাড়কে যেখানে এসে পায়ের গোছার হাড় সমাপ্ত হয়ে গেছে।' হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন- وَالْكَعْبُ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِىْ هُوَ الصَّحِيْحُ - اَلْكَعْبُ বলা হয়, ভাসমান বা বেরিয়ে থাকা হাড়কে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অজুর অঙ্গসমূহের বিবরণের ক্ষেত্রে جَمْع [বহুবচনের] শব্দ চয়ন করেছেন। যেমন- اَيْدِيَكُمْ ـ رُؤُوْسَكُمْ ـ اَرْجُلَكُمْ ـ مَرَافِقْ وُجُوْهَكُمْ প্রভৃতি এবং جَمْع -এর মোকাবিলায় جَمْع দ্বারা اِنْقِسَامُ الْاٰحَادِ عَلَى الْاٰحَادِ উদ্দেশ্য করা হয়, কিন্তু [শুধু] كَعْبٌ -এর ক্ষেত্রে تَثْنِيَةٌ [দ্বিবচন] শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাই مُثَنّٰى এর দ্বারা اِنْقِسَامُ الْاٰحَادِ عَلَى الْاٰحَادِ উদ্দেশ্য করা সম্ভব নয়। অতএব, جَمْع -এর প্রত্যেক فَرْد -এর মোকাবিলায়

[দ্বিবচন] উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং প্রত্যেক পায়ের দুই كَعْبٌ তথা ভাসমান দুটি হাড় উদ্দেশ্য হবে; জুতার ফিতা বাঁধার স্থান নয়। কেননা, জুতার ফিতা বাঁধার স্থানতো প্রত্যেক পায়ে একটি করে।

قَوْلُهُ فَأُرِيْدَ بِمُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ الخ : এখানে جَمْع -এর মোকাবিলায় جَمْع -এর মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আয়াতে মানবজাতিকে অজুর নির্দেশদানের ক্ষেত্রে فَاغْسِلُوْا তথা جَمْع [বহুবচন] শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং অজুর অঙ্গসমূহের ক্ষেত্রেও جَمْع [বহুবচন] শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাই এখানে جَمْع -এর মোকাবিলায় جَمْع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

আর এ جَمْع -এর মোকাবিলায় جَمْع -এর দ্বারা উদ্দেশ্য– اِنْقِسَامُ الْاٰحَادِ عَلَى الْاٰحَادِ এর মর্ম হচ্ছে, যারা নামাজ পড়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তারা প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ হাত, পা ইত্যাদি ধৌত করে। এখানে فَاغْسِلُوْا বলে যাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাদের একেকজন উদ্দেশ্য এবং وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ইত্যাদির দ্বারা ঐ একেকজনের একেক চেহারা ও একেক হাত ইত্যাদি উদ্দেশ্য। যেরূপ বলা হয়– رَكِبُوْا دَوَابَّهُمْ "তারা তাদের সওয়ারিতে আরোহণ করেছে।" অর্থাৎ তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সওয়ারিতে আরোহণ করেছে।

قَوْلُهُ فَيَكُوْنُ فِيْ كُلِّ رِجْلٍ كَعْبَانِ الخ : অর্থাৎ প্রত্যেক পায়ে দুটি كَعْب [টাখনু] থাকা আবশ্যক; একটি নয়। যাতে করে جَمْع -এর প্রত্যেক فرد তথা এক হাত, এক পা ইত্যাদির মোকাবিলায় مُثَنّٰى তথা كَعْبَيْنِ উদ্দেশ্য হতে পারে। আর হিশাম (র.)-এর বর্ণনা মোতাবেক প্রত্যেক পায়ে "জুতার ফিতা বাঁধার স্থান" থাকে একটি। অথচ কুরআনে বলা হয়েছে اَلْكَعْبَيْنِ [দ্বিবচন] শব্দ। অতএব, হিশাম (র.) থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যা কুরআনের বিপরীত হচ্ছে। ফলত এ ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ নয়।

وَمَسْحُ رُبْعِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ اَلْمَسْحُ اِصَابَةُ الْيَدِ الْمُبْتَلَّةِ الْعُضْوَ اَمَّا بَلَلًا يَأْخُذُهُ مِنَ الْاِنَاءِ أَوْ بَلَلًا بَاقِيًا فِى الْيَدِ بَعْدَ غُسْلِ عُضْوٍ مِنَ الْمَغْسُوْلَاتِ وَلَا يَكْفِى الْبَلَلُ الْبَاقِىْ فِىْ يَدِهِ بَعْدَ مَسْحِ عُضْوٍ مِنَ الْمَمْسُوْحَاتِ وَلَا بَلَلٌ يَأْخُذُهُ مِنْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذٰلِكَ الْعُضْوُ مَغْسُوْلًا أَوْ مَمْسُوْحًا وَكَذَا فِىْ مَسْحِ الْخُفِّ .

অনুবাদ : মাথা ও দাড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা। মাসেহ (مَسْح) বলা হয় ভিজা হাত অঙ্গে বুলানোকে। চাই তা পাত্রের পানি দ্বারা ভিজানো হোক বা কোনো مَغْسُوْل অঙ্গকে ধৌত করার পর এ আর্দ্রতা হাতে বাকি থাকুক। কোনো مَمْسُوْح অঙ্গ মাসেহ করার পর হাতের অবশিষ্ট আর্দ্রতা দ্বারা মাথা মাসেহ করা যথেষ্ট নয় এবং যথেষ্ট নয় কোনো অঙ্গ থেকে গৃহীত আর্দ্রতা দ্বারা মাথা মাসেহ করা, চাই উক্ত অঙ্গ مَغْسُوْل অথবা مَمْسُوْح [অঙ্গ] হোক। মোজা মাসেহের বিধানও অনুরূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَسْحُ رُبْعِ الرَّأْسِ الخ : উক্ত عِبَارَةْ -কে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) غَسْلُ الْوَجْهِ -এর উপর عَطْف করেছেন। অর্থাৎ এটি অজুর চতুর্থতম ফরজ যে, মাথার সামনের অংশের চুলের গোড়া থেকে শুরু করে পূর্ণ মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা। কুরআনে কারীমের আয়াতে মাথা মাসেহের পরিমাণ বর্ণনা করা হয়নি। এ এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী ﷺ থেকে মাথার এক-চতুর্থাংশের কমের উপর মাসেহ প্রমাণিত নেই। এ বিষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমরা তা উল্লেখ করব।

قَوْلُهُ وَاللِّحْيَةُ : দাড়ি যদি এত ঘন হয় যে, চামড়ার গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো কষ্টকর হয়, তবে তখন দাড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ। আর যদি দাড়ি ঘন না হয়, তবে চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো আবশ্যক। দাড়ি মাসেহ সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তীতে عِبَارَةْ -এর মধ্যেই আসবে।

قَوْلُهُ اَلْمَسْحُ اِصَابَةُ الْيَدِ الخ : এখানে مُطْلَقْ মাসেহের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে করে মাথা, দাড়ি, পট্টি, মোজা ইত্যাদির মাসেহও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ يَأْخُذُهُ مِنَ الْاِنَاءِ الخ : উদ্দেশ্য হলো, যদি হাত ভিজা না থাকে; বরং শুকিয়ে যায়, তবে নতুন পানি দ্বারা ভিজিয়ে নেবে। অন্যথায় মাথা মাসেহের জন্য ভিজা হাতকে নতুন পানিতে পুনরায় ভিজানোর প্রয়োজন নেই। এখানে اِنَاءْ [পাত্র] শব্দ দ্বারা যে-কোনো অজুর পাত্র, কূপ, পুকুর ও পানির কল প্রভৃতি উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِى الْبَلَلُ الخ : مَمْسُوْح অঙ্গ মাসেহ করার পর হাতের আর্দ্র পানিটা مُسْتَعْمَلْ [ব্যবহৃত] হয়ে যায়। ফলত এক অঙ্গ মাসেহের পর হাতের অবশিষ্ট আর্দ্রতা দ্বারা অন্য অঙ্গ মাসেহ করা যথেষ্ট নয়। পক্ষান্তরে مَغْسُوْل অঙ্গ ধৌত করার পর হাতের অবশিষ্ট পানি مُسْتَعْمَلْ হয় না। কেননা, ধৌত করা পানি তখনই مُسْتَعْمَلْ হয়, যখন তা অঙ্গ থেকে টপকে পড়ে। অতএব, مَغْسُوْل অঙ্গ ধৌত করার পর হাতের অবশিষ্ট আর্দ্রতা দ্বারা মাথা মাসেহ করা যথেষ্ট।

وَاعْلَمْ اَنَّ الْمَفْرُوْضَ فِىْ مَسْحِ الرَّأْسِ اَدْنٰى مَا يَطْلُقُ عَلَيْهِ اِسْمُ الْمَسْحِ وَهُوَ شَعْرَةٌ أَوْ ثَلٰثُ شَعْرَاتٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) عَمَلاً بِاِطْلَاقِ النَّصِّ وَعِنْدَ مَالِكٍ (رح) اَلْاِسْتِيْعَابُ فَرْضٌ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَعِنْدَنَا رُبْعُ الرَّأْسِ وَقَدْ ذَكَرُوْا اَنَّهٗ اِذَا قِيْلَ مَسَحْتُ الْحَائِطَ بِيَدِىْ يُرَادُ بِهٖ كُلُّهٗ وَاِذَا قِيْلَ مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ يُرَادُ بِهٖ بَعْضُهٗ لِاَنَّ اْلأَصْلَ فِى الْبَاءِ اَنْ تَدْخُلَ فِى الْوَسَائِلِ وَهِىَ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ فَلَا يَثْبُتُ اِسْتِيْعَابُهَا بَلْ يَكْفِىْ مِنْهَا مَا يَتَوَسَّلُ بِهٖ اِلَى الْمَقْصُوْدِ فَاِذَا دَخَلَ الْبَاءُ فِى الْمَحَلِّ شُبِّهَ الْمَحَلُّ بِالْوَسَائِلِ فَلَا يَثْبُتُ اِسْتِيْعَابُ الْمَحَلِّ ـ

অনুবাদ : জানা উচিত যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট মাথার ততটুকু পরিমাণ মাসেহ করা ফরজ, যতটুকুর উপর مَسْح [মাসেহ] শব্দের প্রয়োগ করা যায় এবং তা হচ্ছে, মাথার একটি বা তিনটি চুল পরিমাণ। কারণ, তিনি نَصّْ [আয়াত]-এর اِطْلَاقْ -এর উপর আমল করেছেন। ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরজ। যেমনটি আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ -এর মধ্যে [তায়াম্মুমে] পূর্ণ মুখমণ্ডল মাসেহ করা ফরজ। আমাদের নিকট মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ। ওলামায়ে আহনাফ এ কথার এ দলিল পেশ করেন যে, যদি বলা হয়– مَسَحْتُ الْحَائِطَ بِيَدِىْ [আমি হাত দ্বারা দেয়াল মুছেছি] তবে এর দ্বারা পূর্ণ দেয়াল উদ্দেশ্য হয়। আর যদি বলা হয়– مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ [আমি দেয়াল মুছেছি] তবে এর দ্বারা আংশিক দেয়াল উদ্দেশ্য হয়। কেননা, بَاءْ -এর ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, যদি بَاء - وَسَائِلْ [মাধ্যম]-এর মধ্যে দাখিল হয় এবং সে وَسَائِلْ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য না হয়, তবে এর পরিপূর্ণ অংশ প্রমাণিত হয় না; বরং এর ঐ পরিমাণ যথেষ্ট যা দ্বারা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছা যায়। সুতরাং بَاءْ যখন مَحَلْ [স্থান]-এ দাখিল হয়, তখন وَسَائِلْ [মাধ্যম]-এর সঙ্গে مَحَلْ -এর তুলনা করা হয়। অতএব, পরিপূর্ণ مَحَلْ [স্থান] প্রমাণিত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاعْلَمْ اَنَّ الْمَفْرُوْضَ الخ :

মাথা মাসেহের পরিমাণ : মাথা মাসেহ করা সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ। কেননা, মাথা মাসেহ করার বিষয়টি স্পষ্ট নস (نَصْ) তথা কুরআন মাজীদের স্পষ্ট বিধান দ্বারা প্রমাণিত। তবে মাসেহের পরিমাণ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে مُطْلَقًا মাথা মাসেহ ফরজ। অতএব, কেউ যদি এক চুল বা তিন চুল পরিমাণ মাথা মাসেহ করে, তবে ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

ইমাম মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরজ।

ওলামায়ে আহনাফের মতে– মাথার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ মাসেহ করা ফরজ। চাই তা মাথার সম্মুখভাগের এক-চতুর্থাংশ হোক বা বাম পিছনের দিকের এক-চতুর্থাংশ হোক কিংবা ডান বা দিকের এক-চতুর্থাংশ হোক।

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ : بَيَانُ الْأَدِلَّةِ ইমামগণ সকলেই وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। কিন্তু প্রত্যেকের ভিন্ন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ আয়াতটি মাসেহের পরিমাণ (مِقْدَارُ الْمَسْحِ) বর্ণনার ক্ষেত্রে مُطْلَقٌ। আর "اَلْمُطْلَقُ يَجْرِىْ عَلٰى اِطْلَاقِهٖ" -এর নিয়ম অনুসারে مُطْلَقًا মাসেহ করা ফরজ। অতএব, أَدْنٰى رَأْسٍ অর্থাৎ মাথার ন্যূনতম অংশ মাসেহ করার দ্বারাই মাসেহের দায়িত্ব (فَرْضِيَّةٌ) আদায় হয়ে যাবে। আর সে ন্যূনতম পরিমাণ হচ্ছে একটি বা তিনটি চুল। সুতরাং এ পরিমাণ মাসেহ করলেই ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

ইমাম মালেক (র.) বলেন, অজুতে মাথা মাসেহের ব্যাপারে যে নস [আয়াত] অবতীর্ণ হয়েছে, তা তায়াম্মুমের নস [আয়াত] -এর অনুরূপ। সেখানে বলা হয়েছে– فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ আর মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে– وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ উভয় স্থানে مَمْسُوْحٌ অঙ্গে بَاءٌ অক্ষরটি দাখিল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুমের মধ্যে পূর্ণ মুখমণ্ডল মাসেহ করা ফরজ। অতএব, অজুর ক্ষেত্রে মাথা মাসেহের মধ্যেও পূর্ণ মাথা মাসেহ ফরজ হবে।

কেউ কেউ ইমাম মালেক (র.)-এর اِسْتِدْلَالٌ -কে অন্যভাবে উল্লেখ করেছেন যে, بِرُؤُوْسِكُمْ শব্দের بَاءٌ অক্ষরটি অতিরিক্ত (زَائِدَةٌ) তাই وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ -এর অর্থ হবে وَامْسَحُوْا رُؤُوْسَكُمْ [তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ করবে]। আর এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মাথা (رَأْسٌ) বলতে পূর্ণ মাথাকেই বুঝায়, অংশবিশেষকে বুঝায় না। কাজেই বুঝা যায় যে, পূর্ণ মাথা মাসেহ করাই ফরজ।

শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের বর্ণনাকৃত ওলামায়ে আহনাফের اِسْتِدْلَالٌ -এর সারমর্ম হচ্ছে, بَاءٌ অক্ষরটি যদি (مَحَلٌ) مَمْسُوْحٌ -এ দাখিল হয়, তবে এর দ্বারা অংশবিশেষ উদ্দেশ্য হয়। যেমন বলা হয়– مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ এখানে مَمْسُوْحٌ মহল তথা اَلْحَائِطُ শব্দে بَاءٌ দাখিল হয়েছে। তাই এখানে দেয়ালের আংশিক উদ্দেশ্য হবে যে, 'আমি দেয়ালের কিছু অংশ মাসেহ করেছি।' অনুরূপ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ আয়াতে - بَاءٌ - مَمْسُوْحٌ মহল তথা رُؤُوْسَكُمْ শব্দে দাখিল হয়েছে। তাই এখানেও মাথার অংশবিশেষ উদ্দেশ্য হবে যে, 'তোমরা তোমাদের মাথার আংশিক মাসেহ কর।" আর যদি بَاءٌ অক্ষরটি মাধ্যম বা وَسَائِلٌ -এর মধ্যে দাখিল হয়, তবে এর দ্বারা مَمْسُوْحٌ মহলের পূর্ণ স্থান এবং وَسَائِلٌ -এর আংশিক উদ্দেশ্য হয়। যেমন বলা হয়, مَسَحْتُ الْحَائِطَ بِيَدِىْ এখানে بَاءٌ - وَسَائِلٌ তথা يَدٌ -এর মধ্যে দাখিল হয়েছে, তাই এখানে পূর্ণ حَائِطٌ এবং হাতের অংশবিশেষ উদ্দেশ্য হবে যে, 'আমি হাত দ্বারা পূর্ণ দেয়াল মাসেহ করেছি।" অতএব, بَاءٌ সম্পর্কিত উক্ত মূলনীতি মোতাবেক প্রমাণিত হচ্ছে যে, وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ আয়াতের মধ্যে মাথার কিছু অংশ মাসেহের কথা বলা হয়েছে; পূর্ণ মাথা নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ওলামায়ে আহনাফের اِسْتِدْلَالٌ -কে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে,

لِمَا رَوَى الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى نَاصِيَتِهٖ وَخُفَّيْهِ . وَالْكِتَابُ مُجْمَلٌ فَالْتَحَقَ بَيَانًا بِهٖ .

অর্থাৎ মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ। কেননা, হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী ﷺ কওমের আবর্জনা ফেলার স্থানে এসে পেশাব করে অজু করলেন, তখন তিনি মাথার সম্মুখভাগ (نَاصِيَةٌ) ও মোজার উপর

মাসেহ করলেন। যেহেতু আল-কুরআনের বক্তব্য (وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ) এখানে পরিমাণের বর্ণনায় সংক্ষিপ্ত (مُجْمَلٌ) সেহেতু আলোচ্য হাদীসটিকে এর বয়ান বা ব্যাখ্যারূপে যুক্ত করা হয়। -[হিদায়া- খ. ১, পৃ. ১৭]

সার কথা হচ্ছে, আহনাফের নিকট মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ এ কারণে যে, আয়াতটি মাথা মাসেহের পরিমাণের ক্ষেত্রে مُجْمَلٌ আর হযরত মুগীরা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত নবী ﷺ -এর উক্ত হাদীস হচ্ছে এর ব্যাখ্যা। যার মধ্যে বর্ণনা রয়েছে যে, "নবী ﷺ نَاصِيَةٌ পরিমাণ মাথা মাসেহ করেছেন। এর চেয়ে কম কখনো মাসেহ করেননি। আর এ نَاصِيَةٌ -এর পরিমাণ হলো, মাথার এক-চতুর্থাংশ।" অতএব, প্রমাণিত হলো যে, কমপক্ষে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ।

اَلرَّدُّ عَلٰى مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ [ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে জবাব] : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতামতের খণ্ডন পরবর্তী عِبَارَةٌ-এর মধ্যেই আসবে। তথাপি আমরা আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এখানেই উল্লেখ করছি। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) সূত্রে বর্ণিত نَاصِيَةٌ -এর হাদীসের দ্বারা ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাবের খণ্ডন হয়ে যায় যে, যদি পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরজ হতো, তবে শরিয়ত প্রণেতা হযরত মুহাম্মদ ﷺ মাথার এক-চতুর্থাংশ তথা نَاصِيَةٌ পরিমাণ মাসেহ করার উপর اِكْتِفَاءٌ করতেন না।

অনুরূপ উক্ত হাদীসের দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবেরও খণ্ডন হয়ে যায় যে, যদি মাথার এক-চতুর্থাংশের কম মাসেহ করা জায়েজ হতো, তবে بَيَانُ جَوَازٍ -এর জন্য হলেও কমপক্ষে একবার তিনি এর উপর অবশ্যই আমল করতেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস দ্বারাই মাথার এক-চতুর্থাংশের কম মাসেহ প্রমাণিত নেই।

অথবা শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের বক্তব্য মোতাবেক ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবের খণ্ডন এভাবে হয়েছে যে, আয়াতটি মাথা মাসেহের পরিমাণ বর্ণনার ক্ষেত্রে مُجْمَلٌ - مُطْلَقٌ নয়। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন। কেননা, শাব্দিক অর্থে مَسْحٌ বলা হয় "ভিজা হাত ঘুরানোকে।" আর এটি স্পষ্ট যে, এক বা তিন চুলকে ভিজা আঙ্গুল দ্বারা স্পর্শ করার নাম مَسْحٌ নয়। অতএব, আয়াত দ্বারা এক বা তিন চুল পরিমাণ মাথা মাসেহ উদ্দেশ্য নয়; বরং এর চেয়ে বেশি। তবে এর নির্দিষ্ট পরিমাণ জানা নেই। ফলত আয়াত মাথা মাসেহের পরিমাণ বর্ণনার ক্ষেত্রে مُجْمَلٌ তাই শরিয়ত প্রণেতার বিবরণ ছাড়া এর পরিমাণ জানা অসম্ভব। সুতরাং হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.)-এর উক্ত হাদীস হচ্ছে مُجْمَلٌ আয়াতের ব্যাখ্যা।

-[আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- ফাতহুল কাদীর : খ. ১, পৃ. ১৩-১৫]

قَوْلُهٗ كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَامْسَحُوْا الخ : প্রশ্ন : এখানে ইমাম মালেক (র.)-এর اِسْتِدْلَالٌ -এর উপর একটি প্রশ্ন করা হয় যে, অজু হলো اَصْلٌ আর তায়াম্মুম হলো فَرْعٌ অতএব, তায়াম্মুমের আয়াত فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ -এর উপর অজুর আয়াত وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ -এর قِيَاسٌ বা অনুমান সহীহ নয়।

উত্তর : এর উত্তরে ইমাম মালেক (র.)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, অজুর আয়াতের মধ্যে মাথা মাসেহের পরিমাণ অস্পষ্ট রয়েছে, তাই আমরা এর ব্যাখ্যা হিসেবে অজুর আয়াতকে তায়াম্মুমের আয়াতের উপর আরোপ করেছি। কেননা, উভয় আয়াতই طَهَارَةٌ -এর ক্ষেত্রে বরাবর। প্রকৃতপক্ষে এটি قِيَاسٌ নয়; বরং ব্যাখ্যা।

لٰكِنْ يَشْكُلُ هٰذَا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَيُمْكِنُ اَنْ يُّجَابَ عَنْهُ بِاَنَّ الْاِسْتِيْعَابَ فِى التَّيَمُّمِ لَمْ يَثْبُتْ بِالنَّصِّ بَلْ بِالْاَحَادِيْثِ الْمَشْهُوْرَةِ وَبِاَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ فِى التَّيَمُّمِ قَائِمٌ مَقَامَ غَسْلِهٖ فَحُكْمُ الْخَلَفِ فِى الْمِقْدَارِ حُكْمُ الْاَصْلِ كَمَا فِىْ مَسْحِ الْيَدَيْنِ فَلَوْ كَانَ النَّصُّ دَالًّا عَلَى الْاِسْتِيْعَابِ لَلَزِمَ مَسْحُ الْيَدَيْنِ اِلَى الْاِبْطَيْنِ فِى التَّيَمُّمِ لِاَنَّ الْغَايَةَ لَمْ تُذْكَرْ فِى التَّيَمُّمِ وَأَيْضًا اَلْحَدِيْثُ الْمَشْهُوْرُ وَهُوَ حَدِيْثُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ دَلَّ عَلٰى اَنَّ الْاِسْتِيْعَابَ غَيْرُ مُرَادٍ فَانْتَفٰى قَوْلُ مَالِكٍ ـ

অনুবাদ : কিন্তু উক্ত বক্তব্যের উপর আল্লাহ তা'আলার বাণী فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ-এর ভিত্তিতে প্রশ্ন হয় [যে, এখানে مَحَلْ - بَاءْ-এর মধ্যে দাখিল হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ মুখমণ্ডল মাসেহের হুকুম দেওয়া হয়েছে।] সম্ভবত এর উত্তর এই যে, তায়াম্মুমে পূর্ণ মুখমণ্ডল মাসেহ করার বিষয়টি নস [কুরআন] দ্বারা প্রামাণিত নয়; বরং প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহের দ্বারা প্রমাণিত। অথবা এ উত্তরও হতে পারে যে, তায়াম্মুমে মুখমণ্ডলের মাসেহ ধোয়ার স্থলাভিষিক্ত। অতএব, পরিমাণ (مِقْدَارْ)-এর ক্ষেত্রে খলিফা তথা তায়াম্মুমের হুকুম সেটাই হবে, যেটা আসল তথা ধোয়ার হুকুম হয়। যেমনটি مَسْحُ الْيَدَيْنِ [হস্তদ্বয় মাসেহ]-এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যে, যদি নস [আয়াত] পূর্ণ হস্তদ্বয় মাসেহের উপর বুঝাত, তবে তায়াম্মুমের মধ্যে বগল পর্যন্ত হস্তদ্বয় মাসেহ করা আবশ্যক হতো। কেননা, তায়াম্মুমে [এর আয়াতে] غَايَةْ উল্লেখ নেই। তা ছাড়া প্রসিদ্ধ হাদীস (حَدِيْثُ مَشْهُوْر) তথা نَاصِيَةْ পরিমাণ মাসেহের হাদীস বুঝায় যে, পূর্ণ মাথা মাসেহ উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং [এর দ্বারা] ইমাম মালেক (র.)-এর বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ لٰكِنْ يَشْكُلُ هٰذَا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى الخ : উক্ত عِبَارَةْ-এর মধ্যে ইমাম মালেক (র.)-এর পক্ষ থেকে ওলামায়ে আহনাফের اِسْتِدْلَالْ-এর উপর মন্তব্য করা হয়েছে।

❖ ওলামায়ে আহনাফের اِسْتِدْلَالْ-এর উপর ইমাম মালেক (র.)-এর প্রশ্ন ও উত্তর :

প্রশ্ন : ইমাম মালেক (র.)-এর পক্ষ থেকে ওলামায়ে আহনাফের اِسْتِدْلَالْ-এর উপর উত্থাপিত সারমর্ম হচ্ছে, ওলামায়ে আহনাফ اِسْتِدْلَالْ-এর ক্ষেত্রে বলেছেন যে, بَاءْ যদি مَحَلْ-এর মধ্যে দাখিল হয়, তবে এর দ্বারা مَحَلْ-এর অংশবিশেষ উদ্দেশ্য হয়। যেমনটি হয়ে থাকে وَسَائِلْ-এর মধ্যে بَاء দাখিল হলে। উক্ত বক্তব্য অনুযায়ী তায়াম্মুমের আয়াত فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ-এর মধ্যে مَحَلْ - بَاءْ-এ দাখিল হয়েছে। অনুরূপ অজুর আয়াত وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ-এর মধ্যে মাথা মাসেহের বর্ণনায়ও مَحَلْ - بَاءْ-এর মধ্যে দাখিল হয়েছে। উভয় আয়াতে মাসেহের পরিমাণ উল্লেখ নেই। তাই উভয় আয়াতে মাসেহের পরিমাণ বরাবর হওয়ার দরকার। অথচ ওলামায়ে আহনাফ বলেন– তায়াম্মুমে পূর্ণ মুখমণ্ডল মাসেহ করা ফরজ, আর অজুতে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ। ফলত بَاءْ সম্পর্কে তাঁদের বর্ণনাকৃত মূলনীতি ও আয়াতদ্বয়ের হুকুম বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়।

উত্তর : শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) উক্ত প্রশ্নের দুটি উত্তর উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম হচ্ছে–

১. তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে পূর্ণ মুখমণ্ডল মাসেহ করার বিষয়টি নস তথা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং তা প্রমাণিত প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহের দ্বারা। যেমন– اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
অর্থাৎ "তায়াম্মুমে দুবার হাত মাটিতে মারতে হয়। একবার মুখমণ্ডল মাসেহ করার জন্য। দ্বিতীয়বার উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করার জন্য।" উক্ত হাদীসে মুখমণ্ডল মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে। আর মুখমণ্ডল বলতে পূর্ণ মুখমণ্ডলকেই বুঝায়। অতএব, তা এ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত।

২. তায়াম্মুমে مَسْحُ الْوَجْهِ [মুখমণ্ডল মাসেহ] অজুর غَسْلُ الْوَجْهِ [মুখমণ্ডল ধৌত করা]-এর স্থলাভিষিক্ত (قَائِمٌ مَقَامَ)। অতএব, أَصْل তথা ধৌত করার ক্ষেত্রে যেমন পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা ফরজ, তেমনি خَلِيْفَةٌ তথা তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও পূর্ণ মুখমণ্ডল মাসেহ করা ফরজ। যেমনিভাবে তায়াম্মুমের مَسْحُ الْيَدَيْنِ [হস্তদ্বয় মাসেহ]-কে অজুর غَسْلُ الْيَدَيْنِ [হস্তদ্বয় ধৌত করা]-এর স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। তা এভাবে যে, তায়াম্মুমের আয়াত فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِنْهُ-এর মধ্যে غَايَةٌ তথা কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার বিষয়টি উল্লেখ নেই। ফলত এখানে বগল পর্যন্ত পূর্ণ হস্ত মাসেহ করা ফরজ হয়। তাই একে এর اَصْل তথা غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ-এর হুকুমের উপর حَمْل করা হয়েছে।
শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) ইমাম মালেক (র.)-এর পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের দুটি উত্তর পেশ করার পর ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাবের অসারতা প্রমাণের জন্য حَدِيْثُ النَّاصِيَةِ-কে পেশ করেছেন যে, حَدِيْثُ النَّاصِيَةِ টি "نَاصِيَةٌ পরিমাণ মাথা মাসেহ করা যথেষ্ট"-এর উপর বুঝায়। অতএব, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরজ নয়; বরং نَاصِيَةٌ পরিমাণ মাসেহ করাই যথেষ্ট।

قَوْلُهُ وَأَيْضًا اَلْحَدِيْثُ الْمَشْهُوْرُ الخ : উক্ত হাদীসে মাশহুর (حَدِيْث مَشْهُوْر) হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। হাদীসটির أَلْفَاظ নিম্নরূপ– إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى نَاصِيَتِهِ وَخُفَّيْهِ
হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ শরীফসহ হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে শব্দের কিছু ব্যবধানে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَأَمَّا نَفْىُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) فَمَبْنِيٌّ عَلٰى اَنَّ الْاٰيَةَ مُجْمَلَةٌ فِىْ حَقِّ الْمِقْدَارِ لَا مُطْلَقَةٌ كَمَا زَعَمَ لِاَنَّ الْمَسْحَ فِى اللُّغَةِ اِمْرَارُ الْيَدِ الْمُبْتَلَّةِ وَلَا شَكَّ اَنَّ مُمَاسَّةَ الْاَنْمِلَةِ شَعْرَةً اَوْ ثَلٰثًا لَا تُسَمّٰى مَسْحُ الرَّأْسِ وَاِمْرَارُ الْيَدِ يَكُوْنُ لَهٗ حَدٌّ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ فَيَكُوْنُ مُجْمَلًا وَلِاَنَّهٗ اِذْ قِيْلَ مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ يُرَادُ بِهِ الْبَعْضُ وَفِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ اَلْكُلُّ فَيَكُوْنُ الْاٰيَةُ فِى الْمِقْدَارِ مُجْمَلَةً فَفِعْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهٗ مَسَحَ عَلٰى نَاصِيَتِهٖ يَكُوْنُ بَيَانًا لَهٗ ـ

অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব খণ্ডনের ভিত্তি এ কথার উপর যে, অজুর আয়াত [মাথা মাসেহ করার] পরিমাণ বর্ণনার ক্ষেত্রে مُجْمَلٌ [সংক্ষিপ্ত]; مُطْلَقٌ নয়। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) ধারণা করেছেন। কারণ, مَسْح -এর শাব্দিক অর্থ– ভিজা হাত বুলানো। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, 'এক চুল বা তিন চুল স্পর্শ করা'কে ওরফ (عُرْف) এ- مَسْحُ الرَّأْسِ [মাথা মাসেহ] বলা হয় না। আর হাত বুলানোর একটি পরিমাণ রয়েছে, যা অজানা। অতএব, আয়াত مُجْمَلٌ -ই হবে। দ্বিতীয় কথা হলো, যখন বলা হয়– مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ তখন এর দ্বারা দেয়ালের অংশবিশেষ উদ্দেশ্য হয় এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী–فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ -এর মধ্যে পূর্ণ [মুখমণ্ডল] উদ্দেশ্য। তাই [অজুর] আয়াত [মাথা মাসেহ করার] পরিমাণ বর্ণনার ক্ষেত্রে مُجْمَلٌ [সংক্ষিপ্ত]। সুতরাং নবী ﷺ -এর আমল তথা اَلْمَسْحُ عَلَى النَّاصِيَةِ [نَاصِيَةٌ পরিমাণ মাথা মাসেহ] হলো উক্ত [مُجْمَلٌ আয়াতের] ব্যাখ্যা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاَمَّا نَفْىُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) الخ : ইতঃপূর্বে আমরা مَسْحُ الرَّأْسِ -এর মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব খণ্ডন করেছি। তথাপি শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) এখানে তা উল্লেখ করেছেন। তাই কিছু কথা তুলে ধরছি–

নবী ﷺ থেকে نَاصِيَةٌ পরিমাণের চেয়ে কম মাথা মাসেহ করা প্রমাণিত নেই। তাই এ ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব খণ্ডন হয়ে যায়। তবে তাঁর "কুরআনের আয়াত مُطْلَقٌ হওয়ার" দাবির খণ্ডন এবং আয়াত مُجْمَلٌ হওয়ার দলিল দুই ধরনের হতে পারে–

১. শাব্দিক অর্থে مَسْح [মাসেহ] বলা হয়– "ভিজা হাত কোনো কিছুর উপর বুলানো"কে। আর এটি স্পষ্ট যে, "ভিজা আঙ্গুল দ্বারা এক বা তিন চুল স্পর্শ করা"কে ওরফে মাসেহ বলা হয় না। অতএব, আয়াত দ্বারা শুধু একটি বা তিনটি চুল পরিমাণ মাসেহ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর চেয়েও বেশি। তাই মাথা মাসেহ করার একটি পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক, যা জানা নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আয়াত مُجْمَلٌ যা শরিয়ত প্রণেতার ব্যাখ্যা ছাড়া জানা অসম্ভব। ফলত নবী ﷺ -এর উক্ত হাদীস এর ব্যাখ্যা।

২. যদি বলা হয়– مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ তবে এর দ্বারা দেয়ালের অংশবিশেষ উদ্দেশ্য হয়। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ -এর মধ্যে পূর্ণ মুখমণ্ডল উদ্দেশ্য। অথচ উভয় স্থানে بَاءْ - مَحَلٌ -এর মধ্যে দাখিল হয়েছে। অতএব, আয়াতটি মাথা মাসেহের পরিমাণ বর্ণনার ক্ষেত্রে مُجْمَلٌ আর নবী ﷺ -এর نَاصِيَةٌ পরিমাণ মাসেহের আমল হচ্ছে এর ব্যাখ্যা।

وَأَمَّا اللِّحْيَةُ فَعِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ) مَسْحُ رُبْعِهَا فَرْضٌ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا مِنَ الْبَشْرَةِ صَارَ كَالرَّأْسِ وَعِنْدَ أَبِى يُوْسُفَ (رحـ) مَسْحُ كُلِّهَا فَرْضٌ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا مِنَ الْبَشْرَةِ أُقِيْمَ مَسْحُهَا مَقَامَ غَسْلِ مَا تَحْتَهَا فَيَفْرُضُ مَسْحُ الْكُلِّ بِخِلَافِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَارِيًا عَنِ الشَّعْرِ لَايَجِبُ غَسْلُ كُلِّهِ وَلَا مَسْحُ كُلِّهِ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّبْعِ رُبْعُ مَا يُلَاقِى بَشْرَةَ الْوَجْهِ مِنْهَا إِذْ لَا يَجِبُ إِيْصَالُ الْمَاءِ إِلَى مَا اسْتَرْسَلَ مِنَ الذَّقَنِ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رحـ) كَذَا فِى الْاِيْضَاحِ وَفِىْ أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ) مَسْحُ مَا يَسْتُرُ الْبَشْرَةَ فَرْضٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ كَذَا فِى شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ لِقَاضِى خَانْ وَإِذَا مَسَحَ الرَّأْسَ ثُمَّ حَلَقَ الشَّعْرَ لَا تَجِبُ الْاِعَادَةُ وَكَذَا إِذَا تَوَضَّأَ ثُمَّ قَصَّ الْأَظْفَارَ .

অনুবাদ : তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দাড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ। কেননা, দাড়ির ভিতরের চামড়া যখন ধৌত করা বাতিল হয়ে গেছে, তখন এটি মাথা [মাসেহ]-এর মতো হয়ে গেছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সমস্ত দাড়ি মাসেহ করা ফরজ। কেননা, দাড়ির ভিতরের চামড়া যখন ধৌত করা বাতিল হয়ে গেছে, তখন এর মাসেহকে ভিতরের অংশ ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। সুতরাং সমস্ত দাড়ি মাসেহ করা ফরজ হবে। এটি মাথা [মাসেহ]-এর পরিপন্থি। কেননা, মাথা যখন চুলশূন্য হয়, তখন পূর্ণ মাথা ধৌত করা এবং মাসেহ করা আবশ্যক হয় না। উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাড়ির এক-চতুর্থাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুখমণ্ডলের চামড়ার সঙ্গে মিলিত দাড়ির এক-চতুর্থাংশ। কেননা, চিবুক থেকে ঝুলন্ত দাড়ি পর্যন্ত পানি পৌঁছানো আবশ্যক নয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন, ঈযাহ (إِيْضَاحٌ) নামক গ্রন্থে যেরূপ উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দুই রেওয়ায়েত (رِوَايَةٌ) থেকে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত হচ্ছে, যে দাড়িয়ে চামড়া ঢেকে রাখে, তা মাসেহ করা ফরজ। এটিই বিশুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য মাযহাব। যেরূপ কাযী খান (র.)-এর [রচিত] شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। যদি মাথা মাসেহ করার পর চুল মুণ্ডায়, তবে পুনরায় তা মাসেহ করা আবশ্যক নয়। অনুরূপ যদি অজু করার পর নখ কাটে [তবে পুনরায় হাত ধৌত করা আবশ্যক নয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا اللِّحْيَةُ فَعِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) الخ :

দাড়ি মাসেহ করার পরিমাণ : ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য যে, যদি দাড়ি হালকা হয়, তবে চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো আবশ্যক। আর যদি দাড়ি এমন ঘন হয় যে, চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো অসম্ভব, তবে তা মাসেহ করতে হবে। কিন্তু দাড়ি মাসেহের পরিমাণ নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দাড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ। প্রকৃতপক্ষে এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বর্ণনা (رِوَايَةٌ) মাত্র; বরং তাঁর বিশুদ্ধ رِوَايَةٌ এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব হচ্ছে– "সমস্ত দাড়ি মাসেহ করা ফরজ।"

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর اِسْتِدْلَالٌ-এর সারমর্ম হচ্ছে, এতে সকল ইমাম ঐকমত্য যে, দাড়ি গজানোর পূর্বে চিবুকের নীচ পর্যন্ত ধৌত করা ফরজ। দাড়ি গজানোর পর ধৌত করার স্থলে মাসেহ ফরজ হয়েছে। তবে এর মাসেহ মাথা মাসেহের মতোই। অর্থাৎ মাথা যেমন এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ, তেমনি দাড়িও এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর اِسْتِدْلَالٌ-এর সারমর্ম হচ্ছে, দাড়ি গজানোর পর যখন চিবুকের নীচ পর্যন্ত ধৌত করার বিষয়টি বাতিল হয়ে গেছে, তখন এর মাসেহকে ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অতএব, أَصْل তথা ধৌত করার ক্ষেত্রে যেমন পূর্ণ চামড়া ধৌত করা ফরজ, তেমনি خَلِيْفَةٌ তথা মাসেহের ক্ষেত্রেও সমস্ত দাড়ি মাসেহ করা ফরজ।

اَلرَّدُّ عَلٰى أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) [ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিপক্ষে জবাব] :

১. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর اِسْتِدْلَالٌ-কে এভাবে খণ্ডন করেছেন যে, দাড়ির মাসেহকে মাথা মাসেহের উপর কিয়াস করা যাবে না। কারণ, দাড়ি গজানোর পূর্বে চিবুকের অংশ ধৌত করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে মাথায় চুল না গজালে মাথা ধৌত করার হুকুম দেওয়া হয় না; বরং মাসেহের হুকুমই থাকে। তাই মাথার أَصْل-ই হলো মাসেহ করা, আর দাড়ির أَصْل-ই হলো ধৌত করা। তবে যখন ধৌত করা অসম্ভব হয়, তখন মাসেহ করার হুকুম দেওয়া হয়।

২. আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন–

إِنَّ الْمَسْحَ طَهَارَةٌ غَيْرُ مَعْقُوْلَةٍ وَكَذَا تَقْدِيْرُهُ بِالرُّبُعِ فَيُقْتَصَرُ عَلٰى مَوْرِدِهِ وَلَا يَجُوْزُ تَعْدِيَتُهُ إِلٰى غَيْرِهِ وَأَيْضًا نَصُّ الْكِتَابِ حَاكِمٌ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ وَمَسْحِ الرُّبُعِ فَالْحُكْمُ بِافْتِرَاضِ مَسْحِ اللِّحْيَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الْكِتَابِ وَهِيَ لَا تَجُوْزُ بِخَبَرِ الْآحَادِ فَضْلًا عَنِ الْقِيَاسِ.

অর্থাৎ [মাথা] মাসেহ করা طَهَارَةٌ غَيْرُ مَعْقُوْلَةٍ [অযৌক্তিক তাহারাত]। অনুরূপ মাথার এক-চতুর্থাংশের মাসেহও অযৌক্তিক। তাই একে "দাড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করার" দিকে مُتَعَدِّيْ করা যাবে না।

৩. অজুর আয়াতে মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ধৌত করা ও মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করার বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। এর উপর দাড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করার বিষয়টি বাড়িয়ে দিলে কিয়াস দ্বারা কুরআনের উপর زِيَادَةٌ করা হয়, যা خَبَرُ الْوَاحِدُ দ্বারাই বৈধ নয়– কিয়াস দ্বারা তো দূরের কথা!

তবে এ তৃতীয় মন্তব্যমূলক খণ্ডনটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহবের উপরও হয়। কেননা, তিনিও "দাড়ি মাসেহ করা ফরজ" বলেন। যার বিবরণ আয়াতে নেই। তবে তাঁর মাযহাবের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু শিথিল। কারণ, তিনি একে ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত করেছেন– মাথা মাসেহের সাথে কিয়াস করেননি, যা সম্পূর্ণই অমূলক।

قَوْلُهُ اللِّحْيَةُ : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন– لِحْيَةٌ-এর لَامْ অক্ষরে যের দ্বারা পড়া হবে। এর جَمْع [বহুবচন] হচ্ছে لَامْ - لُحًى অক্ষরে পেশ দ্বারা, لَامْ - لَحًى অক্ষরে যবর দ্বারা। অর্থ– "চোয়ালের হাড়ে গজানো দাড়ি।" মূলত চোয়ালের হাড়কে لِحْيَةٌ বলা হয়। যেহেতু এ হাড়ে দাড়ি গজায়, তাই উক্ত দাড়িকে لِحْيَةٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ صَارَ كَالرَّأْسِ : এ عِبَارَةٌ-এর অধীনে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর اِسْتِدْلَالٌ-এর উপর একটি প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করেছেন। **প্রশ্ন :** প্রশ্নের সারসংক্ষেপ হচ্ছে, মাথা ধৌত করার হুকুম কখনো দেওয়া হয়নি; বরং এর মূলই হলো মাসেহ করা। আর দাড়ির মূলই হলো ধৌত করা। কিন্তু যখন ধৌত

করা কষ্ট হয়, তখন মাসেহ করার হুকুম দেওয়া হয়। তাই এর মূলই হলো ধৌত করা। অতএব, এটাকে মাথা মাসেহ করার উপর কিয়াস করা যায় না। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) কিভাবে কিয়াস করলেন? **উত্তর :** উত্তরের সারাংশ হচ্ছে, মাথার ক্ষেত্রে যদিও প্রত্যক্ষভাবে ধৌত করার বিষয়টি নেই। কিন্তু পরোক্ষভাবে এতে ধৌত করার বিষয়টি রয়েছে। কেননা, طَهَارَةٌ -এর অধ্যায়ে মৌলিক বিষয় হলো ধৌত করা। তবে যেহেতু মাথা ধৌত করার কষ্টকর, তাই মাসেহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। অতএব, যেন প্রথমে মাথা ধৌত করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং পরে মাসেহকে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَسْحُ رُبُعِهَا فَرْضٌ : ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, 'দাড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ" এটি ইমাম আ'যম (র.)-এর একটি رواية মাত্র। তাঁর দ্বিতীয় رِوَايَةٌ হচ্ছে, "সমস্ত দাড়ি মাসেহ করা ফরজ।" আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন– প্রথম رِوَايَةٌ টি ইমাম আ'যম (র.) থেকে ইমাম হাসান (র.) এবং দ্বিতীয় رواية টি বিশর (র.) বর্ণনা করেন। كَنْزُ الدَّقَائِقْ ও শরহে বেকায়া গ্রন্থকারদ্বয় প্রথম رِوَايَةٌ [তথা দাড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ] গ্রহণ করেছেন। شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ গ্রন্থকার কাযী খান (র.) দ্বিতীয় رِوَايَةٌ [তথা সমস্ত দাড়ি মাসেহ করা ফরজ] গ্রহণ করেছেন। ইমাম আ'যম (র.) এ দ্বিতীয় رِوَايَةٌ থেকে رُجُوْع করেছেন। যেমনটি "বাদায়েউস সানায়ে" (بَدَائِعُ الصَّنَائِعُ) ও ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। লক্ষ্ণৌভী (র.) লেখেন–

وَالْعَجَبُ مِنْ أَصْحَابِ الْمُتُوْنِ أَنَّهُمْ اِخْتَارُوْا الْمَرْجُوْعَ عَنْهُ وَتَرَكُوْا الْمُخْتَارَ الَّذِىْ ثَبَتَ رُجُوْعُ الْاِمَامِ اِلَيْهِ كَذَا حَقَّقَهُ فِى الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَالنَّهْرِ الْفَائِقِ شَرْحَى كَنْزِ الدَّقَائِقِ .

অর্থাৎ বাহরুর রায়েক ও নাহরুল ফায়েক গ্রন্থদ্বয়ের বিবরণ মোতাবেক বিস্ময়ের বিষয় হলো, مُتُوْن গ্রন্থকারগণ ইমাম আ'যম (র.)-এর رُجُوْع করা رِوَايَةٌ [সমস্ত দাড়ি মাসেহ করা ফরজ]-কে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তারা তাঁদের গ্রন্থে তা উল্লেখ করেননি; বরং "দাড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করার رِوَايَةٌ"-কে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَقَدْ ذُكِرَ اَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّبُعِ رُبُعُ الخ : رُبُعْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুখমণ্ডলের চামড়ার সাথে মিলিত দাড়ির এক চতুর্থাংশ। অনুরূপ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের ক্ষেত্রেও "মুখমণ্ডলের চামড়ার সাথে মিলিত সমস্ত দাড়ির মাসেহ উদ্দেশ্য। অন্যথায় ঝুলন্ত দাড়ি মাসেহ করা আহনাফের নিকট আবশ্যক নয়।

قَوْلُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) كَذَا فِى الْاِيْضَاحِ : ঈযাহ (اِيْضَاحْ) নামক গ্রন্থের বিবরণ মোতাবেক ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে জুলন্ত দাড়ি ধৌত করা ওয়াজিব। আর যদি দাড়ি পাতলা হয়, তবে ভিতরে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব এবং দাড়ি ঘন হলে বাইরের অংশ ধৌত করা আবশ্যক। এ ভিত্তিতে তাঁর মতে দাড়ি মাসেহ করার অবকাশই নেই।

قَوْلُهُ وَفِىْ اَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আ'যম (র.) থেকে প্রসিদ্ধ رِوَايَةٌ হচ্ছে, মুখমণ্ডলের চামড়ার সাথে মিলিত দাড়ির পূর্ণাংশ মাসেহ করা ফরজ। [এ সম্পর্কে আমরা শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের বক্তব্য مَسْحُ رُبُعِهَا فَرْضٌ -এর অধীনে আলোচনা করেছি।]

قَوْلُهُ وَإِذَا مَسَحَ الرَّأْسَ ثُمَّ حَلَقَ الشَّعْرَ الخ : এখানে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার দুটি নতুন মাসআলা বর্ণনা করেছেন।

১. মাথা মাসেহ করার পর যদি কেউ চুল মুণ্ডায়, তবে তার জন্য পুনরায় মাথা মাসেহ করা আবশ্যক নয়। ২. অজু করার পর যদি কেউ নখ কাটে, তবে তার জন্য পুনরায় হাত ধৌত করা আবশ্যক নয়।

وَسُنَّتُهُ لِلْمُسْتَيْقِظِ غَسْلُ يَدَيْهِ اِلَى رُسْغَيْهِ ثَلٰثًا قَبْلَ اِدْخَالِهِمَا الْاِنَاءَ هٰذَا الْغَسْلُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ سُنَّةٌ قَبْلَ الْاِسْتِنْجَاءِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ بَعْدَهُ وَعِنْدَ الْبَعْضِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ جَمِيْعًا وَكَيْفِيَّةُ الْغَسْلِ اَنَّهُ اِذَا كَانَ الْاِنَاءُ صَغِيْرًا بِحَيْثُ يُمْكِنُ رَفْعُهُ يَرْفَعُهُ بِشِمَالِهِ وَيَصُبُّهُ عَلٰى كَفِّهِ الْيُمْنٰى وَيَغْسِلُهَا ثَلٰثًا ثُمَّ يَصُبُّهُ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى كَفِّهِ الْيُسْرٰى كَمَا ذَكَرْنَا وَاِنْ كَانَ كَبِيْرًا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ فَاِنْ كَانَ مَعَهُ اِنَاءٌ صَغِيْرٌ يَرْفَعُ الْمَاءَ بِهِ وَيَغْسِلُهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ اَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرٰى مَضْمُوْمَةً فِي الْاِنَاءِ وَلَا يَدْخُلُ الْكَفُّ وَيَصُبُّ الْمَاءَ عَلٰى يَمِيْنِهِ وَيَدْلُكُ الْاَصَابِعَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ يَفْعَلُ هٰكَذَا ثَلٰثًا ثُمَّ يُدْخِلُ يُمْنَاهُ فِي الْاِنَاءِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَالنَّهْيُ فِيْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ مَحْمُوْلٌ عَلٰى مَا اِذَا كَانَ الْاِنَاءُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا وَمَعَهُ اِنَاءٌ صَغِيْرٌ اَمَّا اِذَا كَانَ الْاِنَاءُ كَبِيْرًا وَلَيْسَ مَعَهُ اِنَاءٌ صَغِيْرٌ يُحْمَلُ عَلَى الْاِدْخَالِ بِطَرِيْقِ الْمُبَالَغَةِ كُلُّ ذٰلِكَ اِذَا لَمْ يَعْلَمْ عَلٰى يَدِهِ نَجَاسَةً اَمَّا اِذَا عَلِمَ فَاِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَلٰى وَجْهٍ لَا يُفْضِيْ اِلَى تَنْجِيْسِ الْاِنَاءِ اَوْ غَيْرِهِ فَرْضٌ ـ

অনুবাদ : অজুর সুন্নত হলো, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া ব্যক্তিদের জন্য [পানির] পাত্রে হস্তদ্বয় প্রবেশ করানোর পূর্বে কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় তিনবার ধৌত করা। কতিপয় মাশায়িখের নিকট এস্তেঞ্জার পূর্বে এ [হস্তদ্বয়] ধৌত করা সুন্নত এবং কতিপয়ের নিকট পরে [সুন্নত]। কতিপয়ের নিকট এস্তেঞ্জার পূর্বাপরে [উভয় অবস্থায়] সুন্নত। ধৌত করার পদ্ধতি এই যে, যদি পানির পাত্র এমন ছোট হয় যে, [হাত দ্বারা] তা উপরে উঠানো সম্ভব হয়, তবে বাম হাত দ্বারা তা উপরে উঠাবে এবং ডান হাতের তালুতে [পানি] ঢেলে তা তিনবার ধৌত করবে। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের তালুতে [পানি] ঢালবে। যেমনটি আমরা [ডান হাতের ক্ষেত্রে] উল্লেখ করেছি। আর যদি [পানির] পাত্র এত বড় হয় যে, [হাত দ্বারা] তা উপরে উঠানো অসম্ভব, তাহলে [এর صُوْرَةٌ দুটি, এর সাথে কোনো ছোট পাত্র থাকবে অথবা থাকবে না] যদি এর সাথে কোনো ছোট পাত্র থাকে, তবে এর দ্বারা পানি উঠিয়ে উভয় হস্ত [ঐ পদ্ধতিতে] ধৌত করবে, যা আমরা [ইতঃপূর্বে] উল্লেখ করেছি। আর যদি এর সাথে কোনো ছোট পাত্র না থাকে, তবে বাম হাতের আঙ্গুলগুলো [পরস্পর] মিলিত রেখে [পানির] পাত্রে প্রবেশ করাবে, কিন্তু হাতের তালু [তাতে] ডুবাবে না। ডান হাতের উপর পানি ঢালবে এবং কতক আঙ্গুল দ্বারা কতক আঙ্গুলকে মর্দন করবে। এভাবে তিনবার করবে। অতঃপর ডান হাতকে যতটুকু ইচ্ছা পাত্রে প্রবেশ করাবে। নবী ﷺ -এর বাণী فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ [সে যেন তার হাতকে পাত্রে না ডুবায়] এর নিষেধাজ্ঞা "পানির পাত্র ছোট হওয়া" অবস্থার উপর আরোপিত অথবা "পাত্র বড়, তবে এর সাথে ছোট পাত্র থাকা" অবস্থার উপর [আরোপিত]। আর পাত্র যদি বড় হয় এবং এর সাথে ছোট পাত্র না থাকে, তবে [উক্ত নিষেধাজ্ঞা] যেভাবে

ইচ্ছা সেভাবেই হাত পাত্রে প্রবেশ না করানোর উপর আরাপিত এ সমস্ত প্রক্রিয়া তখনকার জন্য, যখন হাতে নাপাক থাকা [এর বিষয়টি] জানা যাবে না। যদি [হাতে নাপাক থাকার বিষয়টি] জানা যায়, তবে এমন পদ্ধতিতে নাপাককে দূরীভূত করা ফরজ; যেন পাত্র ইত্যাদি নাপাক না হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَسُنَّتُهُ : এ عبارة সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন–

وَسُنَّتُهُ هٰكَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا وَسُنَنُهُ بِالْجَمْعِ وَالْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ.

অর্থাৎ কোনো নোসখায় অনুরূপ وَسُنَّتُهُ [একবচন শব্দ] উল্লেখ আছে। কোনো নোসখায় وَسُنَنُهُ বহুবচন শব্দ উল্লেখ আছে। উক্ত سُنَّةٌ দ্বারা سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ উদ্দেশ্য।

❖ **سُنَّةٌ-এর অর্থ :** سُنَّةٌ-এর আভিধানিক অর্থ اَلطَّرِيْقَةُ তথা পথ-পন্থা।

শরিয়তের পরিভাষায় سُنَّةٌ ঐ আমলকে বলা হয়, যা নবী করীম ﷺ নিয়মিতভাবে পালন করেছেন, তবে মাঝে মধ্যে বর্জনও করেছেন, যাতে তা উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক না হয়ে যায়।

* আল্লাম ইবনুল হুমাম (র.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে سُنَّةٌ-এর পারিভাষিক অর্থ এভাবে লেখেন–

اَلسُّنَّةُ : مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مَعَ تَرْكِهِ أَحْيَانًا [ফাতহুল কাদীর– খ. ১ , পৃ. ১৭]

* ফাতহুল কাদীর গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ রয়েছে– اَلسُّنَّةُ هِيَ الطَّرِيْقَةُ الْمَسْلُوْكَةُ فِي الدِّيْنِ

* আল্লামা মুহাম্মদ আহসান (র.) ফাতহুল মুয়ীন (فَتْحُ الْمُعِيْنِ) গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে কানযুদ্দাক্কায়িক্ব (كَنْزُ الدَّقَائِقِ) গ্রন্থের টীকায় سُنَّةٌ-এর পারিভাষিক অর্থ লিখেন–

اَلسُّنَّةُ : مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى وَجْهِ الْعِبَادَةِ مَعَ التَّرْكِ اَحْيَانًا لِيَخْرُجَ مَا كَانَ عَلٰى وَجْهِ الْعِبَادَةِ كَالتَّيَامُنِ. –[কানযুদ্দাক্কায়িক্ব পৃ. ৪]

❖ **সুন্নত (سُنَّةٌ) -এর হুকুম :** সুন্নতের হুকুম সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন– حُكْمُهَا اَنَّهُ يُثَابُ فَاعِلُهَا وَيُلَامُ تَارِكُهَا وَيَسْتَحِقُّ اِثْمًا اِنِ اعْتَادَ تَرْكَهَا

অর্থাৎ সুন্নতের হুকুম হলো, এর উপর আমলকারী ব্যক্তি ছওয়াবের অধিকারী হবে, সুন্নত বর্জনকারী ব্যক্তি ভর্ৎসনার যোগ্য হবে এবং সুন্নতকে বর্জন করার অভ্যাস করে নিলে তার পাপ হবে। –[শরহে বেকায়া : খ. ১, পৃ. ৫৮]

* ফাতহুল কাদীর গ্রন্থের টীকায় সুন্নতের উক্ত হুকুমের কাছাকাছি হুকুম উল্লেখ রয়েছে–

وَحُكْمُهَا اَنْ يُثَابَ عَلَى الْفِعْلِ وَيَسْتَحِقُّ الْمَلَامَةَ بِالتَّرْكِ لَا غَيْرُ. [ফাতহুল কাদীর : খ. ১, পৃ. ১৬]

❖ **অজুর সুন্নতসমূহ :** অজুর সুন্নতসমূহ বেকায়া গ্রন্থকার সংক্ষিপ্তভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দরুন সুন্নতসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আমরা বেকায়া গ্রন্থকারের ধারা মোতাবেক সংক্ষিপ্তভাবে সবগুলো সুন্নত এখানে উল্লেখ করছি। বেকায়া গ্রন্থকার (র.) লেখেন–

وَسُنَّتُهُ لِلْمُسْتَيْقِظِ غَسْلُ يَدَيْهِ اِلٰى رُسْغَيْهِ ثَلَاثًا قَبْلَ اِدْخَالِهِمَا الْاِنَاءَ وَتَسْمِيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِبْتِدَاءً وَالسِّوَاكُ وَالْمَضْمَضَةُ بِمِيَاهٍ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِمِيَاهٍ وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالْاَصَابِعِ وَتَثْلِيْثُ الْغَسْلِ وَمَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ مَرَّةً وَالْاُذُنَيْنِ بِمَائِهِ وَالنِّيَّةُ وَتَرْتِيْبٌ نُصَّ عَلَيْهِ وَالْوِلَاءُ.

অর্থাৎ অজুর সুন্নত হচ্ছে–

১. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া ব্যক্তি পানির পাত্রে হস্তদ্বয় প্রবেশ করানোর পূর্বে তিনবার হস্তদ্বয় ধৌত করা।

২. অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া।

৩. মিসওয়াক করা।

৪. [তিনবার] কুলি করা।

৫. [তিনবার] নাকে পানি দেওয়া।

৬. দাড়ি খিলাল করা।

৭. আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা।

৮. প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা।

৯. পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা।

১০. মাথা মাসেহের অবশিষ্ট পানি দ্বারা কর্ণদ্বয় মাসেহ করা।

১১. নিয়ত করা।

১২. কুরআন মাজীদে বর্ণিত তারতীব [ধারাবাহিকতা] রক্ষা করা।

১৩. এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করা।

তাছাড়া অজুর আরো সুন্নত থাকতে পারে, কিন্তু এখানে মৌলিক সুন্নতগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِلْمُسْتَيْقِظِ : যে-কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হলেই তার জন্য কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় তিনবার ধৌত করা সুন্নত। চাই অজু করুক বা না করুক। কেননা, অজুকারীর জন্য ঘুমের শর্ত ছাড়াই তিনবার হস্তদ্বয় কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নত। কারণ, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِىْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে, তখন যেন সে হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ডুবায়। কেননা সে জানে না, নিদ্রিত অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিল। [অর্থাৎ কোন অঙ্গ স্পর্শ করেছিল করেছিল।]

قَوْلُهُ إِلَى رُسْغَيْهِ ثَلَاثًا : অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম তিনবার ধৌত করার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যদি তিনবারের কম ধৌত করে তবে তার সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কেননা, হাদীসের سُنَنٌ [সুনান] গ্রন্থকারগণ فَلْيَغْسِلْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا রেওয়ায়েত করেছেন, যা তিনবারের কম [তথা] দু'বারকেও বুঝায়।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الْبَعْضِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ جَمِيْعًا : অর্থাৎ এস্তেঞ্জার পূর্বেও তিনবার হস্তদ্বয় ধৌত করা সুন্নত, পরেও সুন্নত। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) আল-মুহীত (اَلْمُحِيْطُ) ও নাহরুল ফায়েক (اَلنَّهْرُ الْفَائِقُ) গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন– "এটিই অধিকাংশ ফকীহদের মাযহাব এবং বিশুদ্ধ মত।"

وَالْأَصْلُ فِيْهِ مَا رَوٰى اَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ فِىْ كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ النَّبَوِيِّ اَنَّهُ ﷺ غَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ اِدْخَالِهِمَا الْاِنَاءَ ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا التُّرَابَ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْئَهُ لِلصَّلَاةِ.

কেননা, আসহাবে সুনান (أَصْحَابُ السُّنَنِ) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ ক্ষেত্রে নবী ﷺ-এর হস্তদ্বয় ধৌত করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি পানির পাত্রে হস্তদ্বয় প্রবেশ করানোর পূর্বে হস্তদ্বয় ধৌত করেছেন। অতঃপর গুপ্তাঙ্গ ধৌত করেছেন। অতঃপর মাটি দ্বারা ঘষে হস্তদ্বয় পরিষ্কার করে ধৌত করেছেন। তারপর নামাজের জন্য অজু করেছেন। –[শরহে বেকায়া– পৃ. ৫৯]

❖ **ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া ব্যক্তির কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় ধৌত করার কারণ :** জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া ব্যক্তির কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় তিনবার ধৌত করা সুন্নত। কারণ, নবী ﷺ বলেছেন– فَإِنَّهُ لَا يَدْرِىْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

"ঐ ঘুমন্ত ব্যক্তি জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় যাপন করেছে"। অর্থাৎ সে জানে না যে, তার হস্ত গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করছে কিনা? আর এর দ্বারা তার হাতে নাপাক লাগার একটি সন্দেহ সৃষ্টি হয়। ফলত তা পানির পাত্রে প্রবেশ করানোর পূর্বে ধৌত করা সুন্নত। কিন্তু বাহরুর রায়েক (اَلْبَحْرُ الرَّائِقُ) গ্রন্থকার (র.) লেখেন–

اِنَّ الْاِبْتِدَاءَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ وَاجِبٌ اِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ مُحَقَّقَةً فِيْهِمَا .

অর্থাৎ যদি হস্তদ্বয়ে নাপাক থাকা নিশ্চিত হয়, তবে হস্তদ্বয় ধৌত করা আবশ্যক। –[বাহরুর রায়েক খ. ১, পৃ. ৩৮]

উল্লেখ্য যে, যদি কেউ কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় ধৌত করার পূর্বেই পানির পাত্রে হস্তদ্বয় প্রবেশ করিয়ে ফেলে, তবে পানির কি হুকুম? এ সম্পর্কে আল্লামা তকী ওসমানী (দা. বা.) দরসে তিরমিযী গ্রন্থে লেখেন–

* হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত যে, পাত্রের পানি مُطْلَقًا নাপাক হয়ে যাবে।
* ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) থেকে বর্ণিত যে, যদি পানি অধিক হয়, তবে নাপাক হবে না। পক্ষান্তরে যদি পানি কম হয়, তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে।
* ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত যে, পানি নাপাক হবে না, তবে পানি মাকরূহ হয়ে যাবে।
* ইমাম মালেক (র.) থেকে বর্ণিত যে, كَرَاهَةٌ ছাড়াই পানি পাক।
* আহনাফ বলেন, যদি হাতে নাপাক থাকা নিশ্চিত হয়, তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে হাতে নাপাক থাকা নিশ্চিত না হলে পানি নাপাক হবে না। সর্বোচ্চ মাকরূহ হতে পারে। –[দরসে তিরমিযী : খণ্ড– ১, পৃষ্ঠা– ২২৯]

❖ **ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তির হস্তদ্বয় ধোয়ার পদ্ধতি :** অজুর পানির পাত্রটি বড় হবে বা ছোট হবে। যদি ছোট হয়, তবে বাম হস্ত দ্বারা পাত্রটি উঠিয়ে ডান হস্তে পানি ঢেলে তিনবার ধৌত করবে। অতঃপর ডান হস্ত দ্বারা উঠিয়ে বাম হস্ত তিনবার ধৌত করবে। পক্ষান্তরে যদি পানির পাত্র বড় হয়, তবে এর সঙ্গে ছোট মগ থাকবে অথবা থাকবে না। যদি ছোট মগ থাকে তবে মগ দ্বারা পানি উঠিয়ে প্রথমে ডান হস্ত পরে বাম হস্ত তিনবার ধৌত করে নেবে। আর যদি মগ না থাকে, তবে বাম হস্তের আঙ্গুলসমূহ মিলিত রেখে তালু পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে ডান হস্তে তিনবার পানি ঢালবে এবং ধৌত করবে। অতঃপর ডান হস্তকে যে পরিমাণ ইচ্ছা পাত্রে প্রবেশ করিয়ে বাম হস্ত অনুরূপ তিনবার ধৌত করবে।

قَوْلُهُ مَضْمُوْمَةً فِى الْاِنَاءِ : এর পদ্ধতি এমন যে, বাঁ হস্তের আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলিত রেখে চামুচের ন্যায় সামান্য গোলাকার করবে। অতঃপর ঐ গোলাকার আঙ্গুলগুলোকে পানির পাত্রে কব্জি পর্যন্ত ডুবিয়ে দেবে। কব্জি ডুবাবে না। এভাবে তিনবার পানি উঠিয়ে ডান হস্ত ধৌত করবে।

قَوْلُهُ وَالنَّهْىُ فِىْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ : এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। **প্রশ্ন :** প্রশ্নটি এই যে, নবী ﷺ ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তিকে বলেছেন, সে যেন তার হস্তকে ধোয়ার পূর্বে পানির পাত্রে না ডুবায়। এ কথাটিতো কোনোভাবেই হস্ত পানিতে না ডুবানোর ক্ষেত্রে মুতলাক (مُطْلَقٌ)তাহলে কোনো কোনো অবস্থায় তালু পর্যন্ত হাতের আঙ্গুল পাত্রে ডুবানোর অনুমতি কোথায় পাওয়া গেল?

উত্তর : উক্ত প্রশ্নের উত্তরের সারমর্ম হচ্ছে, উক্ত হাদীস ঐ صُوْرَةٌ-এ প্রযোজ্য, যে صُوْرَةٌ-এ পাত্র ছোট হয়। অথবা বড় হলেও সঙ্গে একটি মগ থাকে। পক্ষান্তরে যদি পাত্রটি বড় হয় আর সঙ্গে কোনো মগ না থাকে, তবে হস্ত পানিতে প্রবেশ করানো ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় নেই। তাই তালু পর্যন্ত আঙ্গুলসমূহ পাত্রে ডুবানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যার দ্বারা পাত্রের পানি নাপাক হবে না। তথাপিও এর সঙ্গে শর্ত রয়েছে যে, হাতে নাপাক থাকা ও না থাকার নিশ্চিত কোনো জ্ঞান তার না থাকতে হবে। আর যদি সে জানে যে, তার হাতে نَجَاسَةٌ আছে, তবে কোনোভাবেই হস্ত পাত্রে ডুবানো যাবে না। অর্থাৎ তালু পর্যন্ত আঙ্গুলও ডুবানো যাবে না; বরং সে যে-কোনো উপায়ে পাত্র থেকে পানি উঠিয়ে আগে হস্তদ্বয় পরিষ্কার করতে হবে। শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) اَمَّا اِذَا عَلِمَ فَاِزَالَةُ النَّجَاسَةِ-এর দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

وَتَسْمِيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِبْتِدَاءً وَالسِّوَاكُ وَالْمَضْمَضَةُ بِمِيَاهٍ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِمِيَاهٍ وَاِنَّمَا قَالَ بِمِيَاهٍ وَلَمْ يَقُلْ ثَلْثًا لِيَدُلَّ عَلٰى اَنَّ الْمَسْنُوْنَ التَّثْلِيْثُ بِمِيَاهٍ جَدِيْدَةٍ وَاِنَّمَا كَرَّرَ قَوْلَهُ بِمِيَاهٍ لِيَدُلَّ عَلٰى تَجْدِيْدِ الْمَاءِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فَاِنَّ الْمَسْنُوْنَ عِنْدَهُ اَنْ يُمَضْمِضَ وَيَسْتَنْشِقَ بِغُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ هٰكَذَا ثُمَّ هٰكَذَا ـ

অনুবাদ : [অজুর] শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া। মিসওয়াক করা। নতুন পানি দ্বারা কুলি করা। নতুন পানি দ্বারা নাকে পানি দেওয়া। গ্রন্থকার بِمِيَاهٍ শব্দ বলেছেন, ثَلْثًا (শব্দ) বলেননি– যাতে করে নতুন নতুন পানি দ্বারা তিন তিনবার কুলি ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত বুঝায়। গ্রন্থকার بِمِيَاهٍ [নতুন পানি দ্বারা] শব্দটি দুবার উল্লেখ করেছেন, যাতে করে দুটি [কুলি ও নাকে পানি দেওয়া]-এর প্রত্যেকটির জন্য নতুন পানি নেওয়া [সুন্নত] বুঝায়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা, তাঁর নিকট এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত। অতঃপর অনুরূপ। অতঃপর অনুরূপ। [অর্থাৎ দ্বিতীয় অঞ্জলি পানি দ্বারা দ্বিতীয়বার, তৃতীয় অঞ্জলি পানি দ্বারা তৃতীয়বার কুলি ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَسْمِيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِبْتِدَاءً : **অজুতে بِسْمِ اللّٰهِ পড়া সুন্নত :** অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ (بِسْمِ اللّٰهِ) পড়া সুন্নত, মুস্তাহাব না ওয়াজিব? এ নিয়ে জমহুর ওলামায়ে কেরাম ও أَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ -এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এখানে মাসআলাটি উল্লেখ করছি–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আসহাবে যাওয়াহের (أَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ), হাসান বসরী (র.) ও একটি দুর্বল বর্ণনায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর নিকট অজুর শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ পড়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও বিশুদ্ধ বর্ণনায় ইমাম আহমদ (র.)-সহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে অজুর শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ পড়া সুন্নত।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : اَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন–

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وَضُوْءَ لَهُ وَلَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ـ

অর্থাৎ "নবী ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অজু করেনি তার নামাজ হয়নি। আর যে ব্যক্তি অজুর শুরুতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করেনি তার অজু হয়নি।" –[মুসতাদরাকে হাকিম : ১/১৪৬]

তাদের وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসে لا অক্ষরটি نَفْىُ الْجِنْسِ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যার মর্ম হচ্ছে, بِسْمِ اللّٰهِ না পড়লে অজুই হবে না।

আর জমহুরের দলিল হচ্ছে– ১. অজুর আয়াতে অজুর চারটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ার বিষয়টি নেই। অতএব, উক্ত خَبَرُ الْوَاحِدِ -এর দ্বারা قُرْاٰن -এর উপর زِيَادَةٌ [তথা بِسْمِ اللّٰهِ পড়া ওয়াজিব বলা] বৈধ নয়। অতএব, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অজুর শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ পড়া ওয়াজিব পর্যায়ের কিছুর নয়; বরং সুন্নত মাত্র।

২. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "مَنْ تَوَضَّأَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُوْرًا لِجَمِيْعِ بَدَنِهِ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ كَانَ طَهُوْرًا لِمَا اَصَابَ الْمَاءُ مِنْ بَدَنِهِ" ـ

অর্থাৎ "হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি بِسْمِ اللّٰهِ পড়ে অজু করে, তার এ অজু সমস্ত শরীরের পবিত্রকারী হয়। আর যে ব্যক্তি بِسْمِ اللّٰهِ ছাড়া অজু করে, তার এ অজু শুধু অজুর অঙ্গসমূহের পবিত্রকারী হয়।" উক্ত হাদীসের وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, নবী ﷺ বলেছেন, بِسْمِ اللّٰهِ পড়া ছাড়া অজু করলে তার অজু হয়ে যাবে; কিন্তু সমস্ত শরীরের অজু হবে না। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, অজুর শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ পড়া অজু সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত বা ওয়াজিব নয়। [তাছাড়াও জমহুরের পক্ষে আরো অনেক দলিল রয়েছে। আমরা এর চেয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাচ্ছি না।]

اَلرَّدُّ عَلٰى أَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ : আসহাবে যাওয়াহেরের اِسْتِدْلَالْ -কে বিভিন্নভাবে খণ্ডন করা হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে– তাদের হাদীস لَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ -এর মাঝে لا অক্ষরটি نَفِى الْجِنْسِ -এর জন্য আসেনি; বরং نَفِى الْفَضِيْلَةِ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যার মর্ম হচ্ছে– "অজুর শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ না বলে অজু শুরু করলে অজু হয়ে যাবে, কিন্তু অজুর ফজিলত পাওয়া যাবে না।" বাহরুর রায়েক (اَلْبَحْرُ الرَّائِقُ) গ্রন্থকার (র.) বলেন, হাদীসের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। যেমন– ক. لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ اِلَّا بِخِمَارٍ. খ. وَلَا نِكَاحَ اِلَّا بِشُهُوْدٍ. গ. لَا صَلَاةَ لِلْعَبْدِ الْاٰبِقِ. ঘ. وَلَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِى الْمَسْجِدِ. ঙ. لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

উল্লিখিত পাঁচটি হাদীসের মধ্যে لَا অক্ষরটি نَفِىُ الْكَمَالِ ও نَفِىُ الْفَضِيْلَةِ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। –[বাহরুর রায়েক : ১/৪১]

[ভিন্ন মতাবলম্বীদের দলিলের আরো অনেক খণ্ডন রয়েছে। আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– বাহরুর রায়েক ১/৩৯-৪১, বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১০৭-১০৮, ফাতহুল কাদীর : ১/১৭-২১, মা'আরিফুস সুনান : ১/১৫৪-১৫৭, দরসে তিরমিযী : ১/২৩০-২৩৪]

❖ **অজুর শুরুতে কি পড়বে?** অজুর শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ পড়বে। এর ন্যূনতম পরিমাণ হলো بِسْمِ اللّٰهِ , কিন্তু উত্তম হচ্ছে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পূর্ণ পড়া। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন– بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ দোয়াটি পড়বে। বাহরুর রায়েক গ্রন্থকার (র.) লেখেন اَلنِّهَايَةُ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, দোয়াটি اَلسَّلَفُ الصَّالِحِيْنَ -এর থেকে বর্ণিত এবং اَلْخَبَّازِيَّةُ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, দোয়াটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি আরো লেখেন وَفِى الْمُحِيْطِ : اَلسُّنَّةُ مُطْلَقُ الذِّكْرِ كَالْحَمْدِ لِلّٰهِ أَوْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ মুহীত নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, مُطْلَقًا আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা সুন্নত। যেমন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অথবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ –[বাহরুর রায়েক : ১/৩৯]

❖ **"বিসমিল্লাহ" এস্তেঞ্জার আগে নাকি পরে পড়বে :** এ ব্যাপারে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) লেখেন– وَيُسَمِّىْ قَبْلَ الْاِسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيْحُ "এস্তেঞ্জার আগে ও পরে বিসমিল্লাহ বলবে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।" –[হিদায়া : ১/১৮] কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– كُلُّ أَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِذِكْرِ اللّٰهِ فَهُوَ أَقْطَعُ "যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ আল্লাহর নামের সাথে শুরু না করা হয়, তবে তা বরকতহীন হয়ে যায়।" এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অজুর শুরুতেই 'বিসমিল্লাহ" বলা বাঞ্ছনীয়। আর এস্তেঞ্জাও যেহেতু অজুর সাথেই সংশ্লিষ্ট, তাই এস্তেঞ্জার আগে বিসমিল্লাহ বলাও মোস্তাহাব।

[বাদায়িউস সানায়ে' গ্রন্থকার লেখেন–

قَالَ بَعْضُهُمْ : قَبْلَهُ لِاَنَّهَا سُنَّةُ اِفْتِتَاحِ الْوُضُوْءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَعْدَهُ لِاَنَّ حَالَ الْاِسْتِنْجَاءِ حَالُ كَشْفِ الْعَوْرَةِ فَلَا يَكُوْنُ ذِكْرُ اسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ تِلْكَ الْحَالَةِ.

অর্থাৎ কেউ বলেন, এস্তেঞ্জার আগে বিসমিল্লাহ বলবে। কেননা, এস্তেঞ্জা করা অজুর শুরুর একটি সুন্নত। [তাই এস্তেঞ্জার আগে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে অজুরই আগে হচ্ছে।]

কেউ বলেন, এস্তেঞ্জার পরে বিসমিল্লাহ বলবে। কেননা এস্তেঞ্জার পূর্ববর্তী অবস্থা হলো كَشْفُ الْعَوْرَةِ [সতর খোলা থাকা]-এর অবস্থা। আর সে অবস্থায় আল্লাহর নাম নেওয়া সমীচীন নয়। কাজেই এস্তেঞ্জার পর "বিসমিল্লাহ" বলবে। –[বাদায়েউস সানায়ে' ১/১০৮]

قَوْلُهُ وَالسِّوَاكُ : اَلسِّوَاكُ শব্দের سِيْن অক্ষরে যের পড়া হবে। আভিধানিক অর্থ– مَا يَتَسَوَّكُ بِهِ مِنَ الْعُوْدِ 'ঐ কাঠি, যার দ্বারা মিসওয়াক করা হয়।' অর্থাৎ "মিসওয়াক।" অথবা এর অর্থ– "মিসওয়াক করা।"

আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (র.) ইমাম নববী (র.) সূত্রে মা'আরিফুস সুনান গ্রন্থে اَلسِّوَاكُ-এর পারিভাষিক অর্থ লেখেন–

اَلسِّوَاكُ هُوَ اِسْتِعْمَالُ عُوْدٍ أَوْ نَحْوِهِ فِى الْاَسْنَانِ لِتَطْيِيْبِ الْفَمِ وَتَنْظِيْفِهِ ـ

অর্থাৎ "মুখ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য কাঠি বা এ জাতীয় কিছু দাঁতে ব্যবহার করা।"

মিসওয়াক তিক্ত গাছের ডাল হলে ভালো হয়। যেমন– নিম ইত্যাদি। এর দ্বারা কফ-কাশি দূরীভূত হয়, বক্ষ পরিষ্কার হয় এবং হজমও ভালো হয়। মিসওয়াক নরম হওয়া বাঞ্ছনীয়। আঙ্গুলের সমপরিমাণ মোটা হবে। এক বিঘত পরিমাণ লম্বা হবে এবং সেটি সোজা হওয়া ভালো। –[বাহরুর রায়েক : ১/৪২]

❖ **মিসওয়াক ধরার পদ্ধতি :** ইমাম গাযনবী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে 'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থকার উল্লেখ করেন–

وَالسُّنَّةُ فِى كَيْفِيَةِ اَخْذِهٖ اَنْ تَجْعَلَ الْخِنْصَرَ مِنْ يَمِيْنِكَ اَسْفَلَ السِّوَاكِ تَحْتَهُ وَالْبِنْصَرَ وَالْوُسْطٰى وَالسَّبَابَةَ فَوْقَهُ وَاجْعَلِ الْاِبْهَامَ اَسْفَلَ رَأْسِهٖ تَحْتَهُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ـ

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা মোতাবেক মিসওয়াক ধরার সুন্নত তরিকা হলো, ডান হাতের কনিষ্ট আঙ্গুল মিসওয়াকের শেষাংশের নীচে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল মিসওয়াকের শুরু অংশের নীচে রাখা এবং অনামিক, মধ্যমা ও তর্জনিকে মিসওয়াকের উপরে রাখা। –[বাহরুর রায়েক : ১/৪২]

❖ **মিসওয়াক করার সুন্নত তরিকা :** ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য যে, দাঁতে আড়াআড়িভাবে মিসওয়াক করা সুন্নত। মুখে লম্বালম্বিভাবে মিসওয়াক করা সুন্নত। মারাসিলে আবূ দাউদ (مَرَاسِلُ اَبِىْ دَاوُدَ)- এ বর্ণিত رِوَايَةٌ দ্বারা উক্ত মতের تَائِيْد হয়। নবী ﷺ বলেছেন– اِذْ اِسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوْا عَرْضًا "যখন তোমরা মিসওয়াক করবে, তখন আড়াআড়িভাবে করবে।" –[মারাসিলে আবূ দাউদ : পৃ. ৫]

মিসওয়াক করার সূচনা হবে– সামনের উপরের দুই দাঁতের ডানদিকের দাঁত থেকে। অতঃপর বাঁদিকের দাঁত। তারপর নীচের ডানদিকের এবং বাঁদিকের দাঁত। –[বাহরুর রায়েক– ১/৪৩]

❖ **মিসওয়াক না থাকলে আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করবে :** যদি কোনো ব্যক্তির কাছে মিসওয়াক না থাকে, তবে সে আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করবে। হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে নবী ﷺ ইরশাদ করেন– يَجْزِىْ مِنَ السِّوَاكِ الْاَصَابِعُ "[মিসওয়াক না থাকাবস্থায়] আঙ্গুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে।" –[বায়হাকী শরীফ : ১/৪০]

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত তাবরানী শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ করেন– قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يَذْهَبُ فُوْهُ يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُدْخِلُ اِصْبَعَهُ فِىْ فِيْهِ ـ

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তির মুখে দাঁত নেই সেও কি মিসওয়াক করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেও করবে। আমি বললাম, কিভাবে করবে? জবাবে তিনি বললেন, মুখের মধ্যে হাতের আঙ্গুল ঢুকিয়ে তা করবে। –[ফাতহুল কাদীর– ১/২৩]

❖ **মিসওয়াক করা অজুর সুন্নত নাকি নামাজের সুন্নত? :** মিসওয়াক করা অজুর সুন্নত নাকি নামাজের সুন্নত? এ বিষয়ে তিন ধরনের অভিমত রয়েছে। আমরা সংক্ষেপে তা উল্লেখ করছি–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ১. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মিসওয়াক করা নামাজের সুন্নত (سُنَّةُ الصَّلَاةِ)। ২. ইমাম আ'যম (র.)-এর মতে মিসওয়াক করা অজুর সুন্নত (سُنَّةُ الْوُضُوْءِ)। ৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি رِوَايَةٌ-সহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের মিসওয়াক করা দীনের সুন্নত (سُنَّةُ الدِّيْنِ)। এটিই সর্বাধিক বলিষ্ঠ অভিমত।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ اَوْ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

"যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো, তবে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাজের সময় বা প্রত্যেক নামাজের সাথে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।" [হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবেই উদ্ধৃত হয়েছে।] وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ হলো, নবী ﷺ বলেছেন– "প্রত্যেক নামাজের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতেন" এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মিসওয়াক করা سُنَّةُ الصَّلَاةِ বা নামাজের সুন্নত।

পক্ষান্তরে ইমাম আ'যম (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত অপর একটি হাদীস দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেন। নবী ﷺ ইরশাদ করেন– لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ

অর্থাৎ "যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর না হতো, তবে আমি তাদেরকে প্রত্যেকবার অজু করার সময় মিসওয়াক করার হুকুম করতাম।" –[নাসায়ী শরীফ : ১/১২]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ হলো, নবী ﷺ প্রত্যেক অজুর সময় মিসওয়াক করার হুকুম দেওয়ার কথা বলেছেন। যার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মিসওয়াক করা অজুর সুন্নত বা سُنَّةُ الْوُضُوْءِ -

উল্লেখ্য যে, ইমাম আ'যম (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর اِسْتِدْلَالْ কৃত হাদীসের এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ অর্থাৎ عِنْدَ وُضُوْءِ كُلِّ صَلَاةٍ যার মর্ম হয়– "প্রত্যেক নামাজের অজুর সময়।"

আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (র.) মা'আরিফুস সুনান গ্রন্থে আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, যুগ যুগ ধরে আমাদের এবং শাফেয়ীগণের মধ্যে উক্ত মতানৈক্য শুধু কিতাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। অন্যথায় আমরাও বলি যে, যদি কোনো ব্যক্তি পুরাতন অজু দ্বারা নতুন নামাজ আদায় করতে চায়, তবে তার জন্য মিসওয়াক করা সুন্নত। -[মা'আরিফুস সুনান : ১/১৪৪]

এজন্যই শায়খ ইবনে হুমাম (র.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন–

وَيُسْتَحَبُّ فِىْ خَمْسَةِ مَوَاضِعَ : اِصْفِرَارُ السِّنِّ، وَتَغَيُّرُ الرَّائِحَةِ، وَالْقِيَامُ مِنَ النَّوْمِ، وَالْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ الْوُضُوْءِ -

অর্থাৎ "পাঁচ সময়ে মিসওয়াক করা মোস্তাহাব– ১. দাঁত হলদে বর্ণ হলে, ২. মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে, ৩. ঘুম থেকে উঠার পর, ৪. নামাজে দাঁড়ানোর পূর্বে, ৫. অজু করার সময়।" –[ফাতহুল কাদীর : ১/২৩]

তৃতীয় মাযহাবের অনুসারীগণ হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْخِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ "চারটি কাজ নবী-রাসূলগণের সুন্নত– ১. খতনা করানো, ২. আতর ব্যবহার করা, ৩. মিসওয়াক করা, ৪. বিবাহ করা।" –[তিরমিযী শরীফ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ হলো, নবী ﷺ বলেছেন, মিসওয়াক করা নবীদের সুন্নত। অতএব, তা কোনো নামাজ বা অজুর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং তা দীনের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই যে-কোনো সময় মিসওয়াক করা সুন্নত। উস্তাদে মুহতারাম মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা. বা.) তিরমিযী শরীফের দরস দানকালে বলেন– "এ তৃতীয় মাযহাবই সর্বাধিক বলিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ।"

[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– বাহরুর রায়েক : ১/৪১–৪৩, বাদায়িউস সানায়ি' ১/১০৪, ফাতহুল কাদীর : ১/২২–২৩, ফাতহুল মুলহিম : ১/৪১৫–৪১৭, মা'আরিফুস্ সুনান : ১/১৪৩-১৪৮, দরসে তিরমিযী : ১/২২২–২২৭]

قَوْلُهُ وَالْمَضْمَضَةُ بِمِيَاهٍ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِمِيَاهٍ : اَلْمَضْمَضَةُ শব্দের আভিধানিক অর্থ –تَحْرِيْكُ الْمَاءِ فِى الْفَمِ 'মুখে পানি নাড়াচাড়া করা।' اَلْاِسْتِنْشَاقُ শব্দটি اَلنَّشْقُ থেকে উদ্‌গত। অর্থ– وَهُوَ جَذْبُ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ بِرِيْحِ الْاَنْفِ إِلٰى دَاخِلِهِ "পানি বা পানি জাতীয় কোনো পদার্থকে বাতাসের মাধ্যমে নাকের ভিতরের দিকে টানা।" বাহরুর রায়েক (اَلْبَحْرُ الرَّائِقُ) গ্রন্থকার (র.) خُلَاصَةٌ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে اَلْمَضْمَضَةُ ও اَلْاِسْتِنْشَاقُ -এর পারিভাষিক অর্থ এভাবে উল্লেখ করেছেন–

اَلْمَضْمَضَةُ اِصْطِلَاحًا اِسْتِيْعَابُ الْمَاءِ جَمِيْعَ الْفَمِ "পরিভাষায় مَضْمَضَةٌ বলা হয়– "মুখের ভিতরের পূর্ণাংশে পানি পৌঁছানো।" এবং وَالْاِسْتِنْشَاقُ اِصْطِلَاحًا اِيْصَالُ الْمَاءِ اِلَى مَارِنِ الْاَنْفِ "পরিভাষায় اَلْاِسْتِنْشَاقُ বলা হয়– "নাকের ভিতরের কোমলাংশে পানি পৌঁছানো।"

❖ **কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত নাকি ওয়াজিব? :** অজু ও গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত নাকি ওয়াজিব? এ নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে।

বাদায়িউস সানায়ে' (بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ) গ্রন্থকারের বিবরণ মোতাবেক আমরা সংক্ষেপে তা উল্লেখ করছি–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : এ বিষয়ে চারটি মতামত রয়েছে– ১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) সহ আহলে হাদীসদের মতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া অজু ও গোসলে ওয়াজিব। ২. ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে উভয়টি উভয়টিতে সুন্নত। ৩. আহনাফের মতে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া অজুতে সুন্নত, গোসলে ওয়াজিব। তবে তা ফরজ গোসলে।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : আহলে হাদীস সম্প্রদায় "নবী ﷺ -এর مُوَاظَبَةٌ -এর সাথে এর উপর আমল করার দ্বারা اِسْتِدْلَالٌ করে থাকে যে, নবী ﷺ অজু ও গোসলে مُوَاظَبَةٌ -এর সাথে কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার আমল করেছেন। যদি তা ওয়াজিব না হতো, তবে তিনি مُوَاظَبَةٌ -এর সাথে এর উপর আমল করতেন না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) অজুর ক্ষেত্রে এর দ্বারা اِسْتِدْلَالٌ করেন যে, নবী ﷺ অজুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার উপর مُوَاظَبَةٌ -এর সাথে আমল করেছেন বটে কিন্তু মাঝে মাঝে বর্জনও করেছেন। তাই এর দ্বারা সুন্নতই প্রমাণিত হয়; ওয়াজিব নয়। আর গোসলের ক্ষেত্রে "ফরজ গোসলের সম্পর্ক যেহেতু শরীরের প্রকাশ্য চামড়ার সাথে এবং কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার সম্পর্ক শরীরের অভ্যন্তরের সাথে, তাই অভ্যন্তরাংশ ধোয়া ওয়াজিব হতে পারে না; বরং সুন্নত।"

আহনাফ অজুর ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর اِسْتِدْلَالٌ -এর ন্যায় اِسْتِدْلَالٌ করেন, আর গোসলের ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا দ্বারা اِسْتِدْلَالٌ করেন। وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা ফরজ গোসলের ক্ষেত্রে فَاطَّهَّرُوْا - مُبَالَغَةٌ -এর শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার মর্ম হচ্ছে, "তোমরা ভালোভাবে পবিত্র হও।" অতএব, এর দ্বারা ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় শরীরের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ঐ সমস্ত অঙ্গ, যেগুলো ধোয়া সম্ভব। আর নাকে পানি দেওয়া ও কুলি করা সম্ভব যদিও তা অপ্রকাশ্য অঙ্গ হয়, তাই গোসলে উভয়টি ওয়াজিব।

قَوْلُهُ الرَّدُّ عَلَى اَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَالشَّافِعِيِّ (رحـ) : আহলে হাদীস সম্প্রদায় কর্তৃক নবী ﷺ -এর مُوَاظَبَةٌ আমল দ্বারা ওয়াজিবের উপর اِسْتِدْلَالٌ করা সহীহ হয়নি। কারণ, হাদীসে নবী ﷺ থেকে এ দুই বিষয়ের বর্জনের আমলও পাওয়া যায়। অতএব, এর দ্বারা সুন্নতই প্রমাণিত হয়। আর গোসলের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর যুক্তির اِسْتِدْلَالٌ আমাদের স্পষ্ট আয়াতের اِسْتِدْلَالٌ -এর বিপরীতে একেবারেই দুর্বল।

–[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১১০–১১১, দরসে তিরমিযী : ১/২৩৪–২৩৮]

❖ **কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার পদ্ধতি :** আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (র.) মা'আরিফুস সুনান গ্রন্থে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার পাঁচটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন–

১. এক অঞ্জলি পানি দ্বারা প্রথমে তিনবার কুলি করা। তারপর তিনবার নাকে পানি দেওয়া।

২. এক অঞ্জলি পানি দ্বারা প্রথমে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া। তারপর আবার কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া। অনুরূপ তৃতীয়বারও করা।

৩. তিন অঞ্জলি পানির প্রত্যেক অঞ্জলি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া।

৪. দুই অঞ্জলি পানির এক অঞ্জলি দ্বারা তিনবার কুলি করা। দ্বিতীয় অঞ্জলি দ্বারা তিনবার নাকে পানি দেওয়া।

৫. ছয় অঞ্জলি পানির প্রথম তিন অঞ্জলি দ্বারা তিনবার কুলি করা এবং দ্বিতীয় তিন অঞ্জলি দ্বারা তিনবার নাকে পানি দেওয়া। −[মা'আরিফুস সুনান ১/১৬৬]

উল্লিখিত পাঁচ পদ্ধতির সবই জায়েজ, তবে উত্তম পদ্ধতি কোনটি এ নিয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহনাফের মধ্যে সামান্য মতানৈক্য রয়েছে।

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট তৃতীয় পদ্ধতি তথা এক অঞ্জলি পানি দ্বারা একবার কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া-দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোষ দ্বারাও অনুরূপ করা উত্তম। পক্ষান্তরে আহনাফের মতে ছয় অঞ্জলির তিনটি দ্বারা তিনবার কুলি করা এবং পরের তিনটি দ্বারা তিনবার নাকে পানি দেওয়া উত্তম।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) নবী ﷺ -এর একটি হাদীস দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেন যে, اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثًا নবী ﷺ এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি ও নাকে পানি দিয়েছেন। অনুরূপ তিনবার করেছেন। وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, "নবী ﷺ এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি ও নাকে পানি দিয়েছেন। অতঃপর দ্বিতীয় তৃতীয় অঞ্জলি দ্বারাও অনুরূপ করেছেন।" এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, وَصْلٌ -এর সাথে তিন অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি ও নাকে পানি দেওয়া উত্তম।

আহনাফ হযরত আলী (রা.)-এর একটি হাদীস দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেন। তিনি নবী ﷺ -এর অজুর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন−

فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ... الخ

অর্থাৎ "নবী ﷺ স্বীয় হস্তদ্বয়কে তিনবার ধৌত করেন, তিনবার কুলি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দেন।" −[মুসনাদে আহমদ : ১/ ১৮৫] وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالْ এভাবে যে, তিনি প্রথমে তিনবার কুলি করেছেন, তারপর তিনবার নাকে পানি দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনবার কুলি করা ও তিনবার নাকে পানি দেওয়ার জন্য তিন তিন অঞ্জলি পানি নিয়েছেন। অনুরূপ হযরত আবূ বকর, ওসমান, আবূ হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ প্রমুখ সাহাবী রাসূল ﷺ -এর অজুর বিবরণ দিয়েছেন। তাবরানী শরীফের এক رِوَايَةٌ -এর মধ্যে আছে যে, فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا يَأْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَاءً جَدِيْدًا, "নবী ﷺ প্রত্যেকবার কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার জন্য নতুন পানি নিয়েছেন।" তাছাড়া আহনাফের যুক্তি হলো, মুখ ও নাক দুটি ভিন্ন অঙ্গ। এর জন্য ভিন্ন পানির প্রয়োজন। যেমনটি হয়ে থাকে অন্যান্য অঙ্গের জন্য।

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) **[ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে জবাব]** : নবী ﷺ তিন অঞ্জলি পানি দ্বারা وَصْل -এর সাথে কুলি ও নাকে পানি দিয়েছেন جَوَازٌ -এর বর্ণনা দেওয়ার জন্য।

−[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন− বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১১১, ফাতহুল কাদীর : ১/২৬, বাহরুর রায়েক : ১/৪৩−৪৫, ফাতহুল মুলহিম : ১/৩৯৯−৪০০, মা'আরিফুস সুনান : ১/১৬৬−১৭১, দরসে তিরমিযী : ১/২৩৮−২৪১]

وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالْاَصَابِعِ وَتَثْلِيْثُ الْغَسْلِ وَمَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ مَرَّةً خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فَاِنَّ عِنْدَهُ تَثْلِيْثُ الْمَسْحِ سُنَّةٌ وَقَدْ اَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ فِيْ جَامِعِهِ اَنَّ عَلِيًّا (رضـ) تَوَضَّأَ فَغَسَلَ اَعْضَاءَهُ ثَلٰثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَقَالَ هٰكَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ مِثْلُ هٰذَا ـ

অনুবাদ : দাড়ি ও আঙ্গুল খিলাল করা। প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করা। পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা, তাঁর নিকট তিনবার মাথা মাসেহ করা সুন্নত। ইমাম তিরমিযী (র.) তিরমিযী শরীফে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা.) অজু করেছেন, অঙ্গসমূহকে তিনবার করে ধৌত করেছেন, মাথা একবার মাসেহ করেছেন। অতঃপর বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অজু এমনই। বুখারী শরীফের মধ্যেও এমনই বর্ণিত আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ : দাড়ি খিলাল করা সুন্নত। কেননা, হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী ﷺ -কে দাড়ি খিলাল করার নির্দেশ দিয়েছেন। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেন– لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَهُ جِبْرَئِيْلُ (ع) بِذٰلِكَ [হিদায়া– ১/১৯] তাছাড়া হযরত ওসমান (রা.) বর্ণনা করেন– اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ "রাসূলুল্লাহ ﷺ দাড়ি খিলাল করতেন।"

–[তিরমিযী শরীফ : ১/৩১, ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৪৩০]

❖ **দাড়ি খিলাল করা অজুর সুন্নত, নাকি জায়েজ? :** দাড়ি খিলাল করা অজুর সুন্নত, না-কি জায়েজ এ নিয়ে আমাদের তিন ইমামের (اَئِمَّتُنَا الثَّلَاثَةُ) মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। তা নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট দাড়ি খিলাল করা সুন্নত। পক্ষান্তরে طَرَفَيْنِ (رحـ) [আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)]-এর নিকট দাড়ি খিলাল করা জায়েজ বা অজুর আদব মাত্র। –[হিদায়া– ১/১৯]

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হযরত ওসমান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেন যে, اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ "নবী ﷺ দাড়ি খিলাল করতেন।" –[তিরমিযী শরীফ ১/৩১, ইবনে মাজাহ ৪৩০]

উক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির, হযরত আনাস ও হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখ সাহাবী বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রামণিত হয় যে, দাড়ি খিলাল করা অন্তত সুন্নত।

পক্ষান্তরে طَرَفَيْنِ ঐ সকল সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেন, যারা নবী ﷺ -এর প্র্যাকটিকল অজুর বিবরণ দিয়েছেন, তারা দাড়ি খিলাল করেননি এবং তারা এর উপর একমত। –[বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১১৭]

طَرَفَيْنِ -এর যৌক্তিক দলিল হচ্ছে– لِاَنَّ السُّنَّةَ اِكْمَالُ الْفَرْضِ فِيْ مَحَلِّهِ وَالدَّاخِلُ لَيْسَ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ "সুন্নত এমন আমলকে বলা হয়, যা ফরজকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করে। আর দাড়ির ভিতরে অংশ ফরজের স্থান নয়, তাই তা সুন্নত হতে পারে না; বরং শুধু জায়েজ।" –[হিদায়া : ১/১৯]

اَلرَّدُّ عَلَى الطَّرَفَيْنِ [তরফাইনের বিপক্ষে জবাব] : এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব উৎকৃষ্ট মনে হয়। কারণ, طَرَفَيْنِ -এর দলিল হিসেবে কোনো হাদীস নেই; বরং শুধু যুক্তি। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হচ্ছে হাদীস। তবে যেহেতু নবী ﷺ থেকে দাড়ি খিলাল বর্জনও প্রমাণিত আছে, তাই এটি ওয়াজিব নয়; সুন্নত মাত্র।

❖ **দাড়ি খিলাল করার পদ্ধতি :** দাড়ি খিলালের সুন্নত তরিকা সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, হাতের আঙ্গুলসমূহ দাড়ির নীচ দিয়ে দাড়িতে এমনভাবে প্রবেশ করাবে যে, হাতের তালু থাকবে বাইরের দিকে এবং পিঠ থাকবে অজুকারীর দিকে।

قَوْلُهُ وَالْاَصَابِعُ (اَىْ تَخْلِيْلُ الْاَصَابِعِ) : এখানে আঙ্গুল খিলাল করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, হাত ও পায়ের আঙ্গুল। আঙ্গুল খিলাল করা অজুর একটি অন্যতম সুন্নত। এর দলিল হচ্ছে, নবী ﷺ বলেছেন– خَلِّلُوْا اَصَابِعَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُخَلِّلَهَا نَارُ جَهَنَّمَ "জাহান্নামের আগুন আঙ্গুলসমূহে প্রবেশ করার পূর্বে তোমরা তোমাদের আঙ্গুলসমূহ খিলাল কর।" –[দারাকুতনী : ১/৯৫] অনুরূপ আঙ্গুল খিলাল করা প্রসঙ্গে হাদীস আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে।

উল্লেখ্য যে, যদি আঙ্গুলসমূহে পানি না পৌঁছে, তবে খিলাল করে এর মধ্যে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। আর যদি স্বাভাবিক নিয়মে পানি পৌঁছে যায়, তবে খিলাল করা সুন্নত।

❖ **হাতের আঙ্গুল খিলাল করার উত্তম পদ্ধতি :** হাতের আঙ্গুল খিলাল করার উত্তম পদ্ধতি সম্পর্কে 'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থকার লেখেন– اَنْ يَكُوْنَ تَخْلِيْلُهَا بِالتَّشْبِيْكِ "এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ভিতর ঢুকিয়ে খিলাল করা।" –[বাহরুর রায়েক : ১/৪৬]

"শরহে নিকায়া" গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হাতের আঙ্গুল খিলাল করার উত্তম পদ্ধতি হলো, ডান হাতের তালুর ভিতরের অংশ বাম হাতের তালুর উপরের অংশের উপর রেখে এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ভিতরে ঢুকিয়ে দেবে। অনুরূপ ডান হাতের আঙ্গুলও খিলাল করবে।

❖ **পায়ের আঙ্গুল খিলাল করার পদ্ধতি :** এ সম্পর্কে 'বাহরুর রায়েক" গ্রন্থকার উল্লেখ করেন–

وَصِفَتُهُ فِى الرِّجْلَيْنِ اَنْ يُخَلِّلَ بِخِنْصَرِ يَدِهِ الْيُسْرٰى خِنْصَرُ رِجْلِهِ الْيُمْنٰى وَيَخْتِمُ بِخِنْصَرِ رِجْلِهِ الْيُسْرٰى ـ

অর্থাৎ পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার পদ্ধতি হলো, বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে খিলাল শুরু করবে এবং বাম পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে গিয়ে খিলাল শেষ হবে। –[বাহরুর রায়েক : ১/৪৬]

قَوْلُهُ وَتَثْلِيْثُ الْغَسْلِ : أَعْضَاءْ مَغْسُوْلَةْ -কে তিন তিনবার করে ধৌত করাও অজুর সুন্নত। এখানে গ্রন্থকার أَعْضَاءْ مَغْسُوْلَةْ -এর কথা উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, أَعْضَاء مَمْسُوْحَة -কে তিন তিনবার করে মাসেহ করা সুন্নত নয়।

أَعْضَاء مَغْسُوْلَةْ -কে তিন তিনবার করে ধৌত করার সুন্নত সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন–

ثُمَّ قِيْلَ الْاَوَّلُ فَرِيْضَةٌ وَالثَّانِىْ سُنَّةٌ وَالثَّالِثُ اِكْمَالٌ وَقِيْلَ الثَّانِىْ وَالثَّالِثُ سُنَّةٌ وَقِيْلَ الثَّانِىْ سُنَّةٌ وَالثَّالِثُ نَفْلٌ وَقِيْلَ عَلٰى عَكْسِهِ وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِ الْاَسْكَافِ الثَّلَاثُ تَقَعُ فَرْضًا كَاِطَالَةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوْعِ وَنَحْوِهِ ـ

অর্থাৎ "কোনো কোনো ফকীহ-এর মতে একবার করে ধোয়া ফরজ, দুবার করে ধোয়া সুন্নত আর তিনবার করে ধোয়া হচ্ছে إِكْمَالٌ তথা পূর্ণতা দান করা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, দুবার এবং তিনবার করে ধোয়া সুন্নত। আবার কেউ এ কথাও বলেছেন যে, দ্বিতীয়বার ধোয়া সুন্নত এবং তৃতীয়বার ধোয়া নফল। কোনো কোনো ফকীহ-এর মতে দ্বিতীয়বার ধোয়া নফল এবং তৃতীয়বার ধোয়া সুন্নত। আবূ বকর ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনবার ধৌত করার সমষ্টির দ্বারাই ফরজ আদায় হয়। যেমন কেউ যদি নামাজে কিয়াম বা রুকু দীর্ঘ করে, তবে এ পুরাটাই ফরজ হিসেবে গণ্য হয়।" –[ফাতহুল কাদীর–১/৩১]

أَعْضَاءُ مَغْسُوْلَةٌ -কে তিনবার করে ধোয়া সুন্নত। কেননা, নবী ﷺ -এর একটি হাদীস বর্ণিত আছে–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هٰذَا وَضُوْءٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ الصَّلَاةَ اِلَّا بِهِ وَتَوَضَّاَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هٰذَا وَضُوْءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللّٰهُ لَهُ الْاَجْرَ مَرَّتَيْنِ ـ وَتَوَضَّاَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هٰذَا وَضُوْئِىْ وَوُضُوْءُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا اَوْ نَقَصَ فَقَدْ تَعَدّٰى وَظَلَمَ ـ

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ এক এক অঙ্গ একবার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন, এটা এমন অজু, যা না করলে আল্লাহ নামাজই কবুল করবেন না। আবার দুবার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন, এটা ঐ ব্যক্তির অজু, যাকে আল্লাহ দ্বিগুণ ছওয়াব দান করবেন, আবার তিনি তিনবার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন, এটা আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অজু। যে এর বেশি বা কম করল, সে সীমালঙ্ঘন করল এবং অন্যায় করল।" –[ইবনে মাজাহ : ১ / ১৪৬, দারাকুতনী :১/৭৯]

উক্ত হাদীসের সমার্থবোধক অন্য একটি হাদীস আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীসের زَادَ ও نَقَصَ শব্দের একাধিক ব্যাখ্যা করা হয়। হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত সবচেয়ে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যাটি আমরা উল্লেখ করছি। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেন, উক্ত শব্দদ্বয়ের সম্পর্ক নিয়ত ও বিশ্বাসের সাথে– যদি কারো বিশ্বাস হয় যে, কামেল সুন্নত তিনবার ধৌত করার দ্বারা আদায় হয় না। অর্থাৎ এ বিশ্বাসের সাথে যদি কমবেশি করে তবে সে تَعَدّٰى وَظَلَمَ [সীমালঙ্ঘন ও অন্যায়] করল বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি সন্দেহের অবস্থায় মনের প্রশান্তি হাসিলের জন্য তিনবারের অধিক ধৌত করে তবে সে ক্ষেত্রে সে কমবেশি করল বলে সাব্যস্ত হবে না এবং অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন করল বলেও প্রমাণিত হবে না।
–[আরো জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর : ১/৩১–৩৩, বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১১৩, বাহরুর রায়েক : ১/৪৬–৪৮]

قَوْلُهُ وَمَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ مَرَّةً : কতটুকু পরিমাণ মাথা মাসেহ করা ফরজ, এর বিবরণ অজুর ফরজের অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু কতবার মাথা মাসেহ করা সুন্নত এ নিয়ে আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাঝে সামান্য মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট পূর্ণ মাথা তিনবার মাসেহ করা সুন্নত। যেমনটি হয়ে থাকে أَعْضَاءُ مَغْسُوْلَةٌ -এর ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে আহনাফ, ইমাম আহমদ ও মালেক (র.) সহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা সুন্নত।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত ওসমান (রা.)-এর হাদীস দ্বারা اِسْتِدْلَالٌ করেন। তিনি নবী ﷺ -এর অজুর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন– فَغَسَلَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِالرَّأْسِ ثَلَاثًا "নবী ﷺ أَعْضَاءُ مَغْسُوْلَةٌ -কে তিনবার করে ধৌত করেছেন এবং মাথাও তিনবার মাসেহ করেছেন। –[আবূ দাঊদ শরীফ : ১/৭৯, দারাকুতনী : ১/৯১]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, নবী ﷺ তিনবার মাথা মাসেহ করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাথা তিনবার মাসেহ করা সুন্নত। জমহুরের একটি দলিল শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন যে,

إِنَّ عَلِيًّا (رض) تَوَضَّأَ فَغَسَلَ أَعْضَاءَهُ ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَقَالَ هٰكَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

অর্থাৎ "হযরত আলী (রা.) অজু করেছেন। তিনি তাঁর অঙ্গসমূহকে তিনবার করে ধৌত করেছেন, মাথা একবার মাসেহ করেছেন এবং বলেছেন, নবী ﷺ -এর অজু এমনই।" –[বুখারী ও তিরমিযী শরীফ]

জমহুরের আরো اِسْتِدْلَالٌ হচ্ছে, মুসলিম শরীফে [১/২১০] হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস এবং দারাকুতনী [১/৮৩]-তে হযরত ওসমান ও মা'আয (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস।

তাছাড়া জমহুরের যৌক্তিক দলিল হচ্ছে, اَلْمَسْحُ عَلَى الرَّأْسِ -কে أَعْضَاءُ مَغْسُوْلَةٌ -এর উপর কিয়াস না করা; বরং أَعْضَاءُ مَمْسُوْحَةٌ -এর উপর কিয়াস করা হবে। যেমন– اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَبِيْرَةِ অর্থাৎ "মোজা ও পট্টির উপর যেমন একবার করে মাসেহ করা হয়, তেমনি মাথাও একবার মাসেহ করা হবে।"

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) [ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে জবাব] :

১. ইমাম আবূ দাঊদ (র.) হযরত ওসমান (রা.) -এর উক্ত হাদীস সম্পর্কে লেখেন– নবী ﷺ -এর অজুর বিবরণ সংবলিত যে সমস্ত সহীহ হাদীস হযরত ওসমান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোতে শুধু "তাঁর মাথা মাসেহের কথা" উল্লেখ রয়েছে– তিনবার মাসেহের কথা উল্লেখ নেই। –[আবু দাঊদ শরীফ : ১/৭৯]

২. যদি হযরত ওসমান (রা.)-এর উক্ত হাদীস সহীহ বলেও মেনে নেওয়া হয়, তবে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) লেখেন–

وَالَّذِيْ يُرْوٰى مِنَ التَّثْلِيْثِ مَحْمُوْلٌ عَلَيْهِ بِمَاءٍ جَدِيْدٍ .

অর্থাৎ "তিনবার মাসেহ করার যে হাদীস আছে, তা মূলত একইবার হাত ভিজিয়ে তিনবার মাসেহ করার উপর আরোপিত" আর তা জমহুরের মতেও শরিয়তসম্মত। –[হিদায়া : ১/২১]

৩. আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন– উক্ত হাদীস দ্বারা جَوَازٌ -এর صُوْرَةٌ হয়; সুন্নতের নয়। –[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– হিদায়া : ১/২১–২২, ফাতহুল কাদীর : ১/৩৪, বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১১৪–১১৬, বাহরুর রায়েক : ১/৫৩, মা'আরিফুস সুনান : ১/১৭৭–১৭৮, দরসে তিরমিযী : ১/২৪৪–৪৫]

وَالْاُذُنَيْنِ بِمَائِهِ اَىْ بِمَاءِ الرَّأْسِ خِلَافًا لَهُ فَاِنَّ تَجْدِيْدَ الْمَاءِ لِمَسْحِ الْاُذُنَيْنِ سُنَّةٌ عِنْدَهُ .

অনুবাদ : এর পানি তথা মাথা মাসেহের পানি দ্বারা কর্ণদ্বয় মাসেহ করা। ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা, তাঁর মতে কর্ণদ্বয় মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়া সুন্নত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْاُذُنَيْنِ بِمَائِهِ :

কর্ণদ্বয় মাসেহ করার পদ্ধতি : কর্ণদ্বয় মাসেহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে আল্লামা হুলওয়ানী ও শায়খুল ইসলাম (র.)-এর অভিমত উল্লেখ করেছেন যে, يَدْخُلُ الْخِنْصَرُ فِىْ اُذُنَيْهِ وَيُحَرِّكُهُمَا
অর্থাৎ "দুই হস্তের দুই কনিষ্ঠ আঙ্গুল কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করাবে এবং মৃদু নাড়া দেবে।" –[ফাতহুল কাদীর– ১/২৭]
বাহরুর রায়েক গ্রন্থকার "মুজতবা" (اَلْمُجْتَبٰى) গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন– يَمْسَحُهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ دَاخِلَهُمَا وَبِالْاِبْهَامَيْنِ خَارِجَهُمَا অর্থাৎ "দুই তর্জনী দ্বারা কর্ণদ্বয়ের ভিতরের অংশ এবং দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কর্ণদ্বয়ের বাইরের অংশ মাসেহ করবে।" –[বাহরুর রায়েক– ১/৫৩]
এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর সূত্রে নবী ﷺ -এর একটি হাদীস বর্ণিত আছে–

اِنَّهُ ﷺ مَسَحَ اُذُنَيْهِ فَاَدْخَلَهُمَا السَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ اِبْهَامَيْهِ اِلٰى ظَاهِرِ اُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا .

অর্থাৎ "নবী ﷺ উভয় কান মাসেহ করেছেন এবং [মাসেহের সময়] তিনি তাঁর দুই তর্জনীকে উভয় কানের ভিতর ঢুকিয়ে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় কানের পিঠে বুলিয়েছেন। এভাবেই তিনি উভয় কানের উপরিভাগ ও ভিতরের অংশ মাসেহ করেছেন।" –[ইবনে মাজাহ, হাদীস নাম্বার : ৪৩৯]

❖ **কর্ণদ্বয় মাথা মাসেহের অবশিষ্ট পানি দ্বারাই মাসেহ করবে :** কর্ণদ্বয় মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়া হবে নাকি মাথা মাসেহের অবশিষ্ট পানি দ্বারা মাসেহ করবে এ নিয়ে اَلْاَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ও আহনাফের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। আমরা সংক্ষেপে তা এখানে তুলে ধরছি–
بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : اَلْاَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ বলেন, কর্ণদ্বয় মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নিতে হবে। পক্ষান্তরে আহনাফ বলেন, কর্ণদ্বয় মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়া যাবে না; বরং মাথা মাসেহের অবশিষ্ট পানি দ্বারাই মাসেহ করতে হবে।
بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : اَلْاَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত তাবরানী শরীফের একটি হাদীস দ্বারা اِسْتِدْلَالٌ করেন যে, তিনি নবী ﷺ -এর অজুর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, وَاَخَذَ مَاءً جَدِيْدًا لِصِمَاخَيْهِ وَمَسَحَ صِمَاخَيْهِ অর্থাৎ "নবী ﷺ কর্ণদ্বয় [মাসেহ করা]-এর জন্য নতুন পানি নিয়েছেন এবং কর্ণদ্বয় মাসেহ করেছেন।" وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, নবী ﷺ কর্ণ মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নিয়েছেন। অতএব, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কর্ণ মাসেহ করার জন্য নতুন পানির প্রয়োজন। –[মা'আরিফুস্ সুনান : ১/ ১৮২]
তাছাড়া ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যৌক্তিক দলিল হলো, মাথা আর কর্ণ দুটি ভিন্ন অঙ্গ। অতএব, দুই অঙ্গ মাসেহ করার জন্য ভিন্ন পানিরও প্রয়োজন। –[বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১১৬]
আহনাফ হযরত আলী ও আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা اِسْتِدْلَالٌ করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ "কর্ণদ্বয় মাথারই অংশবিশেষ।" –[নাসায়ী শরীফ : ১/৭৪, তিরমিযী শরীফ : ১/৩৭]
وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, নবী ﷺ উক্ত হাদীসে কানকে মাথার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই প্রতীয়মান হয় যে, কান মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নিতে হবে না; বরং মাসেহের অবশিষ্ট পানি দ্বারাই করা হবে। তাছাড়া হাদীসের কিতাবে আহনাফের আরো অনেক দলিল রয়েছে। সংক্ষেপে আমরা এটিই উল্লেখ করলাম।

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِىِّ (رحـ) **[ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে জবাব] :**

১. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর اِسْتِدْلَالٌ-কৃত হাদীসটি দুর্বল (ضَعِيْف)। কারণ, এর সনদের মধ্যে "ওমর ইবনে আবান" নামক একজন রাবী আছে, যাকে হাফিজ যাহাবী (র.) مَجْهُوْل বলেছেন। আর দুর্বল হাদীস সহীহ হাদীসের বিপরীত দলিল হতে পারে না। –[দরসে তিরমিযী : ১/২৪৯]
২. যদি উক্ত হাদীস সহীহ বলে মেনেও নেওয়া হয়, তবে একে ঐ অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে, যে অবস্থায় হাতের পানি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। এমনকি হাতে তরলতা পর্যন্ত বাকি থাকে না। –[ফাতহুল কাদীর : ১/২৮]
–[আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর : ১/২৭–২৮, বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১১৬, বাহরুর রায়েক : ১/৫৩–৫৪, মা'আরিফুস সুনান : ১/১৮১–৮৩, দরসে তিরমিযী : ১/২৪৭–৪৯]

وَالنِّيَّةُ وَتَرْتِيبُ نَصَّ عَلَيْهِ اَىِ التَّرْتِيبُ الْمَذْكُوْرُ فِىْ نَصِّ الْقُرْاٰنِ وَكِلَاهُمَا فَرْضَانِ عِنْدَهٗ اَمَّا النِّيَّةُ فَلِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَجَوابُنَا اَنَّ الثَّوَابَ مَنُوْطٌ بِالنِّيَّةِ اِتِّفَاقًا فَلَابُدَّ اَنْ يُقَدَّرَ الثَّوَابَ اَوْ يُقَدَّرَ شَىْءٌ يَشْمَلُ الثَّوَابَ نَحْوَ حُكْمُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ فَاِنْ قَدَّرَ الثَّوَابَ فَظَاهِرٌ وَاِنْ قَدَّرَ الْحُكْمَ فَهُوَ نَوْعَانِ دُنْيَوِىٌّ كَالصِّحَّةِ وَاُخْرَوِىٌّ كَالثَّوَابِ وَالْاُخْرَوِىُّ مُرَادٌ بِالْاِجْمَاعِ فَاِذَا قِيلَ حُكْمُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ وَيُرَادُ بِهِ الثَّوَابُ صُدِّقَ الْكَلَامُ فَلَا دَلَالَةَ لَهٗ عَلَى الصِّحَّةِ فَاِنْ قِيلَ مِثْلَ هٰذَا الْكَلَامِ يَتَاتّٰى فِىْ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ فَلَا دَلَالَةَ لَهٗ عَلٰى اِشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِى الْعِبَادَاتِ وَ ذٰلِكَ بَاطِلٌ فَاِنَّ الْمُتَمَسَّكَ فِىْ اِشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِى الْعِبَادَاتِ هٰذَا الْحَدِيْثُ قُلْنَا نُقَدِّرُ الثَّوَابَ لٰكِنَّ الْمَقْصُوْدَ فِى الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ الثَّوَابُ فَاِذَا خَلَتْ عَنِ الْمَقْصُوْدِ لَا يَكُوْنُ لَهَا صِحَّةٌ لِاَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ اِلَّا مَعَ كَوْنِهَا عِبَادَةً بِخِلَافِ الْوُضُوْءِ اِذْ لَيْسَ هُوَ عِبَادَةً مَقْصُوْدَةً بَلْ شُرِعَ شَرْطًا لِجَوَازِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا خَلَا عَنِ الثَّوَابِ اِنْتَفٰى كَوْنُهٗ عِبَادَةً لٰكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ هٰذَا اِنْتِفَاءُ صِحَّتِهٖ اِذْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اَنَّهٗ لَمْ يُشْرَعْ اِلَّا عِبَادَةً فَيَبْقٰى صِحَّتُهٗ بِمَعْنٰى اَنَّهٗ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ كَمَا فِىْ سَائِرِ الشَّرَائِطِ كَتَطْهِيْرِ الثَّوْبِ وَالْمَكَانِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ فَاِنَّهٗ لَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِىْ شَىْءٍ مِنْهَا ـ

অনুবাদ : নিয়ত করা, কুরআনে বর্ণিত تَرْتِيْبُ [ধারাবাহিকতা] অনুযায়ী অজু করা। অর্থাৎ ঐ তারতীব যা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। এ দুটিই [নিয়ত করা ও তারতীবে কুরআনী] ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট ফরজ। তবে নিয়ত করা ফরজ এজন্য যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ [আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।] আমাদের পক্ষ থেকে এর খণ্ডন হচ্ছে, সর্বসম্মতিক্রমে "নিয়তের ভিত্তিতে ছওয়াব ন্যস্ত হয়।" তাই [উক্ত হাদীসে اَلْأَعْمَالُ শব্দের পূর্বে] ثَوَابٌ শব্দ অথবা এমন একটি শব্দ উহ্য মানা আবশ্যক, যা ثَوَابٌ [এর মর্ম]-কে শামিল রাখে। যেমন– حُكْمُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ। যদি ثَوَابٌ শব্দ উহ্য মানা হয়, তবে তো স্পষ্ট [যে, আমাদের নিকটও আমলের ছওয়াব (ثَوَابٌ) নিয়তের উপর নির্ভরশীল]। আর যদি حُكْمٌ শব্দ উহ্য মানা হয়, তবে তা দু প্রকার– ১. দুনিয়াবি, যেমন– صِحَّةٌ [শব্দ]। ২. উখরবী [পরকালীন], যেমন– ثَوَابٌ [শব্দ]। সর্বসম্মতিক্রমে [এখানে] পরকালীন [বিষয়] উদ্দেশ্য। সুতরাং যদি বলা হয়– حُكْمُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ এবং এর দ্বারা ثَوَابٌ উদ্দেশ্য করা হয়, তবে কথা সঠিক হয় এবং উক্ত হাদীস صِحَّةٌ-এর উপর বুঝাবে না। যদি কেউ মন্তব্য করে যে, এ ধরনের কথা [যা উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে-তা] সমস্ত ইবাদতেই প্রযোজ্য, তাহলে তো উক্ত হাদীস কোনো ইবাদতেই– নিয়ত শর্ত হওয়ার উপর বুঝায় না। আর তা বাতিল। কেননা, ইবাদতে নিয়ত শর্ত হওয়ার উপর এ হাদীসই দলিল। উত্তরে আমরা বলি

যে, আমরা [হাদীসে] ثَوَابٌ শব্দই উহ্য মানি এবং খালিস ইবাদত (عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ) -এর ক্ষেত্রে ثَوَابٌ -ই- উদ্দেশ্য। অতএব, যখন সে ইবাদত উদ্দেশ্যশূন্য, তখন তা বিশুদ্ধও থাকে না। কেননা, খালিস ইবাদত [বা عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ] শুধু ইবাদত হিসেবেই শরিয়ত অনুমোদিত হয়েছে। অজু এর পরিপন্থি। কেননা, অজু মৌলিক ইবাদত (عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ) নয়; বরং তা নামাজের বৈধতার জন্য শর্ত হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। সুতরাং যখন [নিয়ত না থাকার কারণে] তা ছওয়াবশূন্য হবে তখন তা ইবাদত হিসেবেই বাকি থাকবে না। কিন্তু এ কারণে এর অশুদ্ধতাও প্রমাণিত হয় না। কেননা, অজুর ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য হয় না যে, তা শুধু ইবাদত হিসেবেই অনুমোদিত হয়েছে। অতএব, নিয়ত না থাকা সত্ত্বেও এর বিশুদ্ধতা এ অর্থে বাকি থাকে যে, এটি নামাজের চাবি। যেমনটি অন্যান্য শর্তাবলির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন– কাপড় ও জায়গা পবিত্র করা এবং সতরে আওরাত (سَتْرُ الْعَوْرَةِ)। কারণ, এগুলোর কোনোটির ক্ষেত্রেই নিয়ত শর্ত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالنِّيَّةُ وَتَرْتِيبٌ نَصَّ عَلَيْهِ : অজুতে নিয়ত করা ও কুরআনে বর্ণিত تَرْتِيبٌ [ধারাবাহিকতা] মোতাবেক অজু করা সুন্নত। تَرْتِيبٌ -এর আলোচনা আমরা পরে করব। এখানে আমরা "নিয়ত করা" সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করব ইনশাআল্লাহ। নিয়ত প্রসঙ্গে শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের বিস্তারিত বিবরণের সারসংক্ষেপ আমরা তুলে ধরছি।

❖ "نِيَّةٌ" **শব্দের অর্থ :** নিয়ত হলো, মনে মনে অজু করার সংকল্প করা অথবা নাপাকী (حَدَثٌ) দূর করার ইচ্ছা করা কিংবা এমন কোনো ইবাদতের ইচ্ছা করা যা পবিত্রতা ব্যতিরেকে সহীহ হয় না। 'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থকার (র.) লেখেন– নিয়ত (نِيَّةٌ) -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى الشَّيْءِ "কোনো কিছুর উপর অন্তরের সংকল্প।" পরিভাষায়, نِيَّةٌ বলা হয়– قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللّٰهِ فِيْ إِيْجَادِ الْفِعْلِ "আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্য লাভের আশায় আমল করা।" –[বাহরুর রায়েক–১/৪৯]

❖ **অজুতে نِيَّةٌ করা সুন্নত, ফরজ নয় :** অজুতে নিয়ত করা সুন্নত নাকি ফরজ এ নিয়ে أَحْنَافٌ ও أَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ -এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আমরা সংক্ষেপে তা তুলে ধরছি।

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : أَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ বলেন, অজুতে নিয়ত করা ফরজ। যেমনিভাবে তায়াম্মুমে নিয়ত করা ফরজ। পক্ষান্তরে أَحْنَافٌ বলেন– অজুতে নিয়ত করা সুন্নত।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমামত্রয় নবী ﷺ থেকে বর্ণিত إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হাদীস দ্বারা إِسْتِدْلَالٌ করেন। যার অর্থ– "আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" وَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, হাদীসে বলা হয়েছে আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর অজুও যেহেতু একটি আমল, তাই এটিও নিয়তের উপর নির্ভরশীল। তাঁদের দ্বিতীয় একটি দলিল হচ্ছে, অজু একটি ইবাদত। আর ইবাদত নিয়ত ব্যতীত বিশুদ্ধ হয় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ "তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে ইখলাসের সাথে তাঁর ইবাদত করতে।" –[সূরা বায়্যিনাহ : ৯৮–৫] আর ইখলাস নিয়ত ব্যতীত সম্ভব নয়। অতএব, কোনো ইবাদতই নিয়ত ব্যতীত সম্ভব নয়।

أَحْنَافٌ অজুর আয়াত– يَآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا الخ দ্বারা إِسْتِدْلَالٌ করেন। وَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে অজুকারীকে তিন অঙ্গ ধৌত করা এবং এক অঙ্গ মাসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, এ চারটি ভিন্ন কোনো ফরজ হতে পারে না। তাছাড়া আয়াতে অজুর অঙ্গসমূহ ধৌত করা ও মাসেহ করার জন্য নিয়তের শর্তের কথা বলা হয়নি। তাই যদি নিয়তকে ফরজ বলা হয় তবে আয়াতকে مُقَيَّدٌ করা আবশ্যক হয়। আর দলিল ছাড়া কুরআনের مُطْلَقٌ আয়াতকে مُقَيَّدٌ করা বৈধ নয়। –[বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১০৬]

আহনাফের দ্বিতীয় একটি দলিল হচ্ছে, নামাজের জন্য অজু হচ্ছে শর্ত। আর নামাজের অন্যান্য শর্তাবলির ক্ষেত্রে নিয়ত জরুরি নয়। যেমন– শরীর, কাপড়, নামাজের জায়গা পবিত্র হওয়া ইত্যাদি। অতএব, অজুর ক্ষেত্রেও নিয়ত ফরজ হতে পারে না।

اَلرَّدُّ عَلَى الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : ওলামায়ে কেরাম এতে ঐকমত্য যে, যে-কোনো ইবাদতে ছওয়াব হাসিলের জন্য নিয়ত আবশ্যক। চাই তা عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ হোক বা عِبَادَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ হোক। এমনকি যদি কেউ ইবাদতের নিয়ত বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত না করে, তবে তার ছওয়াব হবে না। তাই উক্ত হাদীসে اَلْأَعْمَالُ শব্দের পূর্বে ثَوَابٌ শব্দ مُقَدَّرٌ [উহ্য] মানতে হবে। তখন হাদীসের রূপ হবে- اِنَّمَا ثَوَابُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ [আমলের ছওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল]।
কিংবা اَلْاَعْمَالُ-এর পূর্বে এমন একটি শব্দ مُقَدَّرٌ মানতে হবে, যা ثَوَابٌ-এর মর্মকে শামিল রাখে। যেমন, حُكْم শব্দটি ثَوَابٌ-কে শামিল রাখে, যদি حُكْم দ্বারা حُكْم اُخْرَوِىْ উদ্দেশ্য হয়। আর صِحَّةٌ-কেও শামিল রাখবে যদি حُكْم দ্বারা حُكْم دُنْيَوِىْ উদ্দেশ্য হয়। আর আহনাফ ও ইমামত্রয়ের ঐকমত্যে উক্ত হাদীসে আমলের ছওয়াব (ثَوَابُ الْاَعْمَالِ) অথবা ثَوَابٌ দ্বারা حُكْم اُخْرَوِىْ-ই উদ্দেশ্য। তাই উক্ত হাদীস ইবাদতের বিশুদ্ধতার জন্য "نِيَّةٌ" শর্ত হওয়াকে বুঝাবে না; বরং হাসিলের জন্য নিয়ত শর্ত হওয়াকে বুঝাবে।
উল্লেখ্য যে, অজুকে তায়াম্মুমের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা, অজু করা হয় পানি দ্বারা, আর পানি بِذَاتِهٖ পবিত্রকারী জিনিস। পক্ষান্তরে তায়াম্মুম করা হয় মাটি দ্বারা। আর মাটি بِذَاتِهٖ পবিত্রকারী জিনিস নয়; বরং তা শুধু নামাজের ইচ্ছা করা অবস্থায় পবিত্রকারী হিসেবে গণ্য হয়। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাটি পবিত্রকারী বস্তু রূপে গণ্য হয় اَمْرٌ تَعَبُّدِىٌّ হিসেবে। আর اَمْرٌ تَعَبُّدِىٌّ-এর জন্য নিয়ত অপরিহার্য। অন্যদিকে পানি দ্বারা অজু اَمْرٌ تَعَبُّدِىٌّ নয়। কাজেই অজুকে তায়াম্মুমের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়।
ইমামত্রয়ের দ্বিতীয় দলিলের খণ্ডন হচ্ছে যে, ইবাদত দু প্রকার-

১. عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ যা খালিস ইবাদত হিসেবেই শরিয়ত অনুমোদিত হয়েছে এবং তা অন্য কোনো ইবাদত সহীহ হওয়ার শর্তও নয়, অছিলাও নয়।
২. عِبَادَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ যা শুধু ইবাদত হিসেবেই শরিয়ত অনুমোদিত হয়নি; বরং অন্য ইবাদতের অছিলা ও শর্ত হয়। আর যে ইবাদতের জন্য নিয়ত আবশ্যক, তা হচ্ছে عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ - এর দ্বারা ছওয়াব হাসিলের জন্য নিয়ত আবশ্যক। অন্যথায় এর صِحَّةٌ-ই বাকি থাকে না। পক্ষান্তরে عِبَادَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ-এর জন্য নিয়ত আবশ্যক নয়। হ্যাঁ ছওয়াব হাসিলের জন্য নিয়ত আবশ্যক। যেমন, অজু। অজু عِبَادَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ - এর দ্বারা ছওয়াব হাসিল করতে হলে নিয়ত করতে হবে। অন্যথায় নিয়ত ছাড়াও তা নামাজের শর্ত হতে পারবে। যেমনটি হয়ে থাকে অন্যান্য শর্তাবলির ক্ষেত্রে।
 -[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- ফাতহুল কাদীর : ১/৩৩-৩৪, বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১০৫-১০৭, বাহরুর রায়েক : ১/৪৮-৫৩]

قَوْلُهٗ فَاِنْ قِيْلَ مِثْلُ هٰذَا الْكَلَامِ الخ : উক্ত عِبَارَةٌ-এ আহনাফের পক্ষ থেকে ইমামত্রয়ের اِسْتِدْلَالُ-এর খণ্ডনে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে- এর উপর একটি মন্তব্য করা হয়। মন্তব্যের সারমর্ম এই যে, عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ-এর ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত হওয়ার উপর উক্ত হাদীসই দলিল। আপনাদের বক্তব্য মোতাবেক যদি ثَوَابٌ অথবা حُكْم শব্দটি اَلْاَعْمَالُ-এর পূর্বে مُقَدَّرٌ মানা হয় তবে উক্ত হাদীস عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ-এর ক্ষেত্রেও নিয়ত শর্ত হওয়া বুঝায় না। সুতরাং আপনাদের ব্যাখ্যা বাতিল। শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) قُلْنَا نُقَدِّرُ الخ বলে উক্ত মন্তব্যের খণ্ডন করেছেন। খণ্ডনের সারমর্ম হচ্ছে, ইবাদত দুই প্রকার-
১. عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ অন্য কথায় عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ
২. عِبَادَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ অন্য কথায় عِبَادَةٌ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ [প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।] عِبَادَةٌ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি ছওয়াব হাসিল করা, আর عِبَادَةٌ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটি-
১. ছওয়াব হাসিল করা, ২. অন্য ইবাদতের জন্য অছিলা [মাধ্যম] হওয়া। অতএব, উল্লিখিত হাদীসের আলোকে عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ যদি ثَوَابٌ থেকে খালি হয়, তবে তা صِحَّةٌ থেকেও খালি হয়ে যাবে। কারণ, صِحَّةٌ বলা হয়- اِتْيَانُ الشَّيْءِ بِحَسْبِ مَا شُرِعَ لَهٗ অর্থাৎ "কোনো জিনিস যেভাবে অনুমোদিত হয়েছে, সেভাবে তা করা।" আর তা ثَوَابٌ-এর জন্যই অনুমোদিত হয়েছে, তাই ثَوَابٌ-এর নিয়ত না থাকলে উক্ত عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ-এর صِحَّةٌ-ও বাকি থাকবে না। পক্ষান্তরে عِبَادَةٌ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ-এর ক্ষেত্রে যদি নিয়ত না থাকে, তবে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কিন্তু এর صِحَّةٌ অটল থাকবে। কারণ, তা ثَوَابٌ-এর জন্য অনুমোদিত হয়নি। অজুও عِبَادَةٌ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ-এর একটি প্রকার, যা নামাজের জন্য শর্ত হয়। এতে নিয়ত না থাকলেও তা অজুর শর্ত হবে। তবে ছওয়াব পাওয়ার জন্য নিয়ত আবশ্যক।

وَأَمَّا التَّرْتِيْبُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ فَيَفْرِضُ تَقْدِيْمُ غَسْلِ الْوَجْهِ فَيَفْرِضُ تَقْدِيْمُ الْبَاقِيْ مُرَتَّبًا لِاَنَّ تَقْدِيْمَ غَسْلِ الْوَجْهِ مَعَ عَدَمِ التَّرْتِيْبِ فِي الْبَاقِيْ خِلَافُ الْاِجْمَاعِ قُلْنَا الْمَذْكُوْرُ بَعْدَهٗ حَرْفُ الْوَاوِ فَالْمُرَادُ فَاغْسِلُوْا هٰذَا الْمَجْمُوْعَ فَلَا دَلَالَةَ لَهٗ عَلٰى تَقْدِيْمِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَاِنْ سُلِّمَ فَمَتٰى اِسْتَدَلَّ الْمُجْتَهِدُ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ لَمْ يَكُنِ الْاِجْمَاعُ مُنْعَقِدًا فَاسْتِدْلَالُهٗ بِهَا عَلٰى تَرْتِيْبِ الْبَاقِيْ اِسْتِدْلَالٌ بِلَا دَلِيْلٍ وَتَمَسُّكٌ بِمُجَرَّدِ زَعْمِهٖ لَا بِالْاِجْمَاعِ وَقَدْ رَأَيْتُ فِيْ كُتُبِهِمُ الْاِسْتِدْلَالَ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ هٰذَا وُضُوْءٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى الصَّلٰوةَ اِلَّا بِهٖ وَقَدْ كَانَ هٰذَا الْوُضُوْءُ مُرَتَّبًا فَيَفْرِضُ التَّرْتِيْبُ وَقَدْ سَنَحَ لِيْ جَوَابٌ حَسَنٌ وَهُوَ اَنَّهٗ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هٰذَا وُضُوْءٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى الصَّلٰوةَ اِلَّا بِهٖ فَهٰذَا الْقَوْلُ يَرْجِعُ اِلَى الْمَرَّةِ فَحَسْبُ لَا اِلَى الْاَشْيَاءِ الْاُخَرِ لِاَنَّ هٰذَا الْوُضُوْءَ لَا يَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ اِبْتِدَاؤُهٗ مِنَ الْيَمِيْنِ اَوِ الْيَسَارِ وَاَيْضًا اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى سَبِيْلِ الْمُوَالَاةِ اَوْ عَدَمِهَا فَقَوْلُهٗ عَلَى السَّلَامِ هٰذَا وُضُوْءٌ الخ اِنْ اُرِيْدَ بِهٖ هٰذَا الْوُضُوْءُ بِجَمِيْعِ اَوْصَافِهٖ يَلْزَمُ فَرْضِيَّةُ الْمُوَالَاةِ اَوْ ضِدِّهَا اَوِ التَّيَامُنِ اَوْ ضِدِّهٖ وَاِنْ لَمْ يُرِدْ بِجَمِيْعِ اَوْصَافِهٖ لَا يَدُلُّ عَلٰى فَرْضِيَّةِ التَّرْتِيْبِ ـ

অনুবাদ : [ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে] তারতীব ফরজ। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ [তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর।] অতএব, আগে মুখমণ্ডল ধৌত করা ফরজ এবং ধারবাহিকভাবে অন্যান্য অঙ্গকে مُقَدَّمْ [অগ্রে] করা ফরজ। কেননা, মুখমণ্ডলের ধৌত করাকে অগ্রে (مُقَدَّمْ) মেনে নিয়ে অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রে তারতীব না মানা ইজমা'র পরিপন্থি। এর উত্তরে আমরা বলি যে, أَمْر بِغَسْلِ الْوَجْهِ [মুখমণ্ডল ধোয়ার নির্দেশ]-এর পর وَاوْ উল্লেখ রয়েছে, [যা جَمْعِيَّةْ -এর উপর বুঝায়।] তাই এর [আয়াত] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তোমরা এ সমস্ত অঙ্গ ধৌত কর। সুতরাং আয়াত "মুখমণ্ডল অগ্রে ধোয়াকে" বুঝাবে না। আর যদি [তাঁর] দাবি মেনেও নেওয়া হয়, তবে মুজতাহিদ [ইমাম শাফেয়ী (র.)] যখন এ আয়াত দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেছেন, তখন ইজমা'ই সংঘটিত ছিল না। তাই উক্ত আয়াত দ্বারা অন্যান্য অঙ্গের তারতীব-এর উপর اِسْتِدْلَالْ করা দলিলবিহীন اِسْتِدْلَالْ [-এর নামান্তর] এবং শুধু ধারণামূলক দলিল; ইজমা'র দ্বারা নয়। [শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন,] আমি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের কিতাবে [তারতীব ফরজ হওয়ার ব্যাপারে] নবী ﷺ -এর বাণী هٰذَا وُضُوْءٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى الصَّلَاةَ اِلَّا بِهٖ [এটি এমন অজু, যা ছাড়া আল্লাহ নামাজ কবুল করেন না] দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করতে দেখিছি। এজন্য যে, উক্ত অজু তারতীববিশিষ্ট ছিল। তাই [অজুতে] তারতীব ফরজ। [শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন,] আমার কাছে এর একটি সুন্দর উত্তর রয়েছে। তা এভাবে যে, উক্ত [হাদীসে বর্ণিত] অজুতে তিনি প্রত্যেক অঙ্গকে একবার করে ধৌত

করেছিলেন। তাই বলেছেন, এটি এমন অজু যা ব্যতীত আল্লাহ নামাজ কবুল করেন না। সুতরাং [নবী ﷺ-এর] উক্ত বাণী– শুধু একবার করে অঙ্গ ধৌত করার দিকে ফিরবে। [অর্থাৎ একবারের কম অঙ্গ ধুয়ে অজু করলে অজু হবে না।] অন্য কিছুর দিকে ফিরবে না। কেননা, উক্ত অজু [এ কথা থেকে] মুক্ত নয় যে, হয়তো অজুর [অঙ্গ ধোয়ার] সূচনা ডানদিক থেকে হয়েছে অথবা বামদিক থেকে হয়েছে। অনুরূপ তা হয়তো [অজু] مُوَالَاةٌ [এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করা]-এর পদ্ধতিতে ছিল অথবা مُوَالَاةٌ-এর পদ্ধতিতে ছিল না। অতএব, নবী ﷺ -এর বাণী– هٰذَا وُضُوْءٌ الخ দ্বারা যদি সমস্ত গুণ সংবলিত অজু উদ্দেশ্য হয়, তবে [অজুতে] مُوَالَاةٌ বা عَدَمُ مُوَالَاةٌ অনুরূপ ডানদিক থেকে শুরু করা বা বামদিক থেকে শুরু করাও ফরজ প্রমাণিত হয়। আর যদি এর দ্বারা সমস্ত গুণ সংবলিত অজু উদ্দেশ্য না হয়, তবে তা [অজুতে] তারতীব ফরজ হওয়াকেও বুঝায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا التَّرْتِيْبُ : কুরআনে বর্ণিত তারতীব মোতাবেক অজু করা সুন্নত; কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ফরজ। শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) উক্ত মাসআলাই এখানে বর্ণনা করেছেন।

❖ **অজুতে তারতীব সুন্নত, ফরজ নয় :** অজুতে তারতীব সুন্নত নাকি ফরজ, এ নিয়ে ইমামত্রয় (أَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ) ও اَحْنَافٌ -এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আমরা সংক্ষেপে তা তুলে ধরছি।

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : اَلْاَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ [ইমামত্রয়] বলেন, অজুতে তারতীব ফরজ। পক্ষান্তরে আহনাফ বলেন, অজুতে তারতীব সুন্নত।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ। ইমামত্রয় কুরআনের আয়াত إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেন। এভাবে যে, فَاغْسِلُوْا -এর فَاءٌ অক্ষরটি تَعْقِيْبٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা তার পরবর্তী বিষয় তথা غَسْلُ الْوَجْهِ -কে পূর্ববর্তী বিষয় তথা اَلْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ -এর উপর مُرَتَّبٌ করে দেয়। অর্থাৎ নামাজে দাঁড়ানোর ইচ্ছা পোষণ করার পর غَسْلُ الْوَجْهِ [মুখমণ্ডল ধৌত করা]-কে বুঝায়। আর যেহেতু اَلْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ এবং غَسْلُ الْوَجْهِ -এর মাঝে তারতীব আবশ্যক বুঝায়, তাই অন্যান্য অঙ্গের মাঝেও তারতীব আবশ্যক বুঝাবে। কেননা, অবশিষ্ট অঙ্গসমূহ غَسْلُ الْوَجْهِ -এর উপর عَطْف হয়েছে। উসূল হচ্ছে– اَلْمَعْطُوْفُ عَلَى الْمُرَتَّبِ ও مُرَتَّبٌ হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। কাজেই অবশিষ্ট অঙ্গসমূহের মাঝেও তারতীব আবশ্যক বলে সাব্যস্ত হয়।

আহনাফও উক্ত আয়াত إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ দ্বারাই اِسْتِدْلَالْ করেন। وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, আলোচ্য আয়াতে عَطْف -এর وَاوْ অব্যয়টি جَمْع ـ مُطْلَقْ [শুধু একত্রিতকরণের অর্থ] -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যা আয়াতে উল্লিখিত চার অঙ্গ ধৌত করা ও মাসেহ করাকে বুঝায়; তারতীবকে বুঝায় না।

اَلرَّدُّ عَلَى الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : আমাদের اِسْتِدْلَالْ -এর মাধ্যমেও তাঁদের اِسْتِدْلَالْ -এর একরকম খণ্ডন করা হয়ে গেছে। তাছাড়া দ্বিতীয় খণ্ডন হচ্ছে, আয়াতে فَاءْ অব্যয়টি تَعْقِيْب -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে যদি মেনেও নেওয়া হয়, তথাপিও আমরা বলব, যেহেতু আয়াতে فَاءْ এবং وَاوْ উভয় অক্ষরই বিদ্যমান, তাই আয়াতের মর্ম হবে, اَعْضَاءُ اَرْبَعَةْ তথা অঙ্গ চতুষ্টয়ের ধৌত করার বিষয়টি اَلْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ -এর পরে সম্পন্ন হবে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, اَلْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ এবং غَسْلُ الْاَعْضَاءِ الْاَرْبَعَةِ -এর মধ্যে তারতীব রক্ষা করা জরুরি। কিন্তু এর দ্বারা অঙ্গ চতুষ্টয়ের মাঝে তারতীব জরুরি একথা সাব্যস্ত হয় না। অথচ আমাদের বক্তব্য হলো, অঙ্গ চতুষ্টয়ের তারতীব সম্পর্কে। কারণ, অঙ্গ চতুষ্টয়ের ক্ষেত্রে فَاءْ ব্যবহার করা হয়নি; বরং واو ব্যবহার করা হয়েছে, যা তারতীবের ফায়দা দেয় না।

–[আরো জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর : ১/৩৫-৩৬, বাহরুর রায়েক : ১/৫৪–৫৫]

قَوْلُهُ لِأَنَّ تَقْدِيمَ غَسْلِ الْوَجْهِ الخ : এখানে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) বিবরণ দিচ্ছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, غَسْلُ الْوَجْهِ এবং اَلْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ-এর মধ্যে যখন তারতীব প্রমাণিত হয়েছে, তখন পরবর্তী অঙ্গসমূহের মধ্যেও তা মানতে হবে। অন্যথায় غَسْلُ الْوَجْهِ-এর ক্ষেত্রে তারতীব মেনে অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রে তা অমান্য করা ইজমার পরিপন্থি।

قَوْلُهُ وَإِنْ سُلِّمَ فَمَتَى اِسْتَدَلَّ الخ : উক্ত عِبَارَةٌ দ্বারা শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) বলছেন যে, যদি ইমামত্রয়ের বক্তব্য তথা فَاءٌ অব্যয়টি تَعْقِيبٌ-এর জন্য এসেছে বলে মেনেও নেওয়া হয়, তবে তাদের দাবি "মুখমণ্ডল ধৌত করার ক্ষেত্রে তারতীবকে মেনে নিয়ে অন্যান্য অঙ্গে তারতীব না মানা ইজমা'র পরিপন্থি দাবিটি ঠিক নয়। কেননা, আমাদের এবং তাদের মাঝে ইজমাই সংঘটিত হয়নি, তাই তাদের ইজমার পরিপন্থি হওয়ার দাবি সম্পূর্ণই অমূলক বা ভিত্তিহীন।

قَوْلُهُ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي كُتُبِهِمْ الخ : উক্ত عِبَارَةٌ-এর মধ্যে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) ইমামত্রয়ের অপর একটি দলিল উল্লেখ করছেন যে, আমি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের কিতাবে পেয়েছি যে, তাঁরা অজুতে তারতীব ফরজ হওয়ার উপর নবী ﷺ-এর বাণী- هٰذَا وُضُوْءٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ-এর দ্বারা اِسْتِدْلَالٌ করেন। وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, নবী ﷺ -এর উক্ত অজু ছিল তারতীবের সাথে কৃত অজু। অতঃপর তিনি বলেছেন, 'এটি এমন অজু, যা ব্যতীত আল্লাহ নামাজ কবুল করেন না।" অতএব, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অজুতে তারতীব ফরজ।

قَوْلُهُ وَقَدْ سَنَحَ لِيْ جَوَابُ الخ : এ عِبَارَةٌ-এর মাধ্যমে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) তাঁদের পেশকৃত হাদীস দ্বারা উক্ত اِسْتِدْلَالٌ-কে খণ্ডন করেছেন যে, তিনি উক্ত অজুতে এক একবার করে অঙ্গ ধৌত করেছিলেন। তাই هٰذَا [ইসমে ইশারাহ]-এর দ্বারা এক একবার করে অঙ্গ ধোয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অন্যথায় নবী ﷺ -এর সে অজুর সূচনা হয়তো ডানদিক থেকে হয়েছে অথবা বাম দিক থেকে হয়েছে, কিংবা এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করেছেন অথবা করেননি। এখন যদি هٰذَا দ্বারা নবী ﷺ এ সমস্ত গুণবিশিষ্ট অজু উদ্দেশ্য করে থাকেন, তবে তো ডানদিক থেকে অঙ্গ ধোয়া শুরু করা বা না করা কিংবা এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বে অন্য অঙ্গ ধোয়া বা না ধোয়া এ সমস্ত বিষয়ই ফরজ হয়ে যায়। অথচ এসব কিছু তাঁদের মাযহাবেও ফরজ নয়। পক্ষান্তরে যদি هٰذَا দ্বারা এ সমস্ত গুণবিশিষ্ট অজু উদ্দেশ্য না করে থাকেন, তবে এর তারতীবও ফরজ হচ্ছে না। অতএব, তাঁদের উক্ত اِسْتِدْلَالٌ ভিত্তিহীন।

অনুরূপ আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় তাঁদের اِسْتِدْلَالٌ-এর মাঝে আরো কয়টি খণ্ডন উল্লেখ করেছেন যে, ১. উক্ত হাদীস ضَعِيْف। আর ضَعِيْف হাদীস দ্বারা কোনো আমলের فَرْضِيَّةٌ-এর উপর اِسْتِدْلَالٌ করা যায় না। ২. তাঁদের হাদীসটি হচ্ছে خَبَرْ وَاحِدْ, আর خَبَرْ وَاحِدْ দ্বারা فَرْضِيَّةٌ প্রমাণিত হয় না। ৩. উক্ত হাদীসে تَرْتِيْب -এর বিষয়টি উল্লেখ নেই। –[শরহে বেকায়া : ১/৬৩]

وَالْوِلَاءُ أَيْ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ عَلَى سَبِيْلِ التَّعَاقُبِ بِحَيْثُ لَا يَجُفُّ الْعُضْوُ الْأَوَّلُ وَعِنْدَ مَالِكٍ (رحـ) هُوَ فَرْضٌ وَالدَّلِيْلُ عَلَى لَوْنِ الْأُمُوْرِ الْمَذْكُوْرَةِ سُنَّةٌ مُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا .

অনুবাদ : বিলা (اَلْوِلَاءُ) অর্থাৎ অজুর অঙ্গসমূহ একের পর এক এমনভাবে ধৌত করা যে, [এক অঙ্গ ধোয়ার পর দ্বিতীয় অঙ্গ ধোয়ার পূর্বে যেন] প্রথম অঙ্গ শুকিয়ে না যায়। ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট 'বিলা' (اَلْوِلَاءُ) ফরজ। উল্লিখিত সমস্ত বিষয় সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে দলিল হচ্ছে, [এর উপর] নবী ﷺ -এর ধারাবাহিক (مُوَاظَبَة) আমল। কিন্তু এগুলো ফরজ হওয়ার উপর কোনো দলিল নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْوِلَاءُ : اَلْوِلَاءُ শব্দের وَاوْ অব্যয়ে যের দ্বারা পড়া হবে। اَلْوِلَاءُ তথা مُوَالَاةٌ -এর আভিধানিক অর্থ– ধারাবাহিকতা, অবিচ্ছিন্নতা।

পারিভাষায় مُوَالَاةٌ বলা হয়– غَسْلُ الْأَعْضَاءِ عَلَى سَبِيْلِ التَّعَاقُبِ بِحَيْثُ لَا يَجُفُّ الْعُضْوُ الْأَوَّلُ "অজুর অঙ্গসমূহ একের পর এক এমনভাবে ধৌত করা যে, এক অঙ্গ ধোয়ার পর দ্বিতীয় অঙ্গ ধোয়ার পূর্বে যেন প্রথম অঙ্গটি শুকিয়ে না যায়।" এ মুওয়ালাত (مُوَالَاةٌ)-এর মাধ্যমে মূলত অজুকারীকে সতর্ক করা হয়েছে যে, অজুর মধ্যখানে যেন অন্য কোনো কাজে লিপ্ত না হয়। যদি কোনো অজুকারী ধারাবাহিকভাবে অজুর অঙ্গ ধৌত করতে থাকে, মধ্যখানে অন্য কোনো কাজে লিপ্তও না হয় এবং তার পক্ষ থেকে কোনো অলসতাও না থাকে আর এমতাবস্থায় তার দ্বিতীয় অঙ্গ ধৌত করতে গিয়ে প্রথম অঙ্গ শুকিয়ে যায় তবে তার সুন্নত ছুটবে না। مُوَالَاةٌ -এর মাসআলায় ইমাম মালেক (র.) ও জমহুরের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম মালেক (র.) বলেন, অজুতে مُوَالَاةٌ তথা "প্রথম অঙ্গ শুকানোর পূর্বে অন্যান্য অঙ্গ ধৌত করা" ফরজ। পক্ষান্তরে জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, অজুতে مُوَالَاةٌ সুন্নত।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম মালেক (র.) নবী ﷺ -এর একটি হাদীস দ্বারা إِسْتِدْلَالٌ করেন যে,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّيْ وَفِيْ قَدَمِهِ لَمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلَاةَ .

অর্থাৎ "নবী ﷺ একজন ব্যক্তিকে নামাজ আদায় করতে দেখেছেন, এমতাবস্থায় তার পায়ের এক অংশ শুষ্ক রয়ে গেছে। তাই তিনি তাকে অজু এবং নামাজ দোহরানোর [পুনরায় পড়ার] নির্দেশ দেন।" –[আবূ দাউদ শরীফ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসে লোকটির পায়ের একাংশ শুষ্ক ছিল। যার দ্বারা বুঝা যায়, লোকটি পরের অঙ্গ ধৌত করার পূর্বে আগের অঙ্গ শুকিয়ে গেছে। আর এ কারণে নবী ﷺ তার অজু ও নামাজকে দোহরানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অজুতে مُوَالَاةٌ ফরজ।

জমহুর ওলামায়ে কেরাম হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি হাদীস দ্বারা إِسْتِدْلَالٌ করেন যে,

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ دُعَا بِجَنَازَةٍ يُصَلِّيْ عَلَيْهَا حِيْنَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ .

অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) অজু করেছেন। মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধৌত করেছেন। মাথা মাসেহ করেছেন। অতঃপর যখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করেছেন, তখন জানাজা আসছে। তাই তিনি মোজার উপর মাসেহ করেছেন [এবং জানাজার নামাজ পড়েছেন]। –[মুয়াত্তায়ে মালেক]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) মাথা মাসেহ করার পর পা ধৌতও করেননি কিংবা মোজার উপর মাসেহও করেননি। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করার পর যখন জানাজা আসছে, তখন তিনি মোজার উপর মাসেহ করেছেন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তাঁর মুখমণ্ডল ও হস্ত শুকিয়ে গেছে। অতএব, যদি مُوَالَاةٌ আবশ্যক [ফরজ] হতো, তবে তিনি এত দেরি করে মোজার মাসেহ করতেন না। কাজেই অজুতে مُوَالَاةٌ ফরজ নয়।

اَلرَّدُّ عَلٰى مَالِكٍ (رحـ) : ইমাম মালেক (র.) যে হাদীস দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেছেন এর খণ্ডন হচ্ছে, ১. এটি خَبَرْ وَاحِدْ আর خَبَرْ وَاحِدْ দ্বারা فَرْضِيَّةٌ প্রমাণিত হয় না। ২. উক্ত হাদীসে عَدَمُ الْمُوَالَاةِ-এর কারণে নবী ﷺ অজু ও নামাজ দোহরানোর কথা বলেছেন এ কথার উল্লেখ নেই; বরং এটাও তো হতে পারে যে, তার পায়ের উক্ত অংশে পানিই পৌছেনি, তাই তাকে অজু ও নামাজ দোহরানোর নির্দেশ দিয়েছেন। ৩. অথবা নামাজ ও অজু দোহরানোর নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, مُوَالَاةٌ অজুতে সুন্নত। আর সুন্নতেরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সেদিকে ইঙ্গিত করত অজু ও নামাজ দোহরানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

−[আরো জানার জন্য দেখুন− বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১১২−১১৩, বাহরুর রায়েক : ১/৫৫, টীকা−শরহে বেকায়া : ১ ও ২ পৃ. ৬৪]

قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ عَلٰى فَرْضِيَّتِهَا : শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লিখিত عِبَارَةٌ-এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, নবী ﷺ -এর مُوَاظَبَةٌ আমল দ্বারা সুন্নতই প্রমাণিত হয়। তবে যদি এর সাথে ওয়াজিব বা ফরজ হওয়ার মতো কোনো দলিল থাকে, তবে তা ওয়াজিব বা ফরজই হয়। এখানে উল্লিখিত সুন্নতসমূহের কোনো একটি ফরজ বা ওয়াজিব হওয়ার কোনো দলিল নেই। আর مُوَاظَبَةٌ-এর আমল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যা মাঝে মাঝে বর্জনও করেছেন।

وَمُسْتَحَبُّهُ التَّيَامُنُ اَىْ اَلْاِبْتِدَاءُ بِالْيَمِيْنِ فِىْ غَسْلِ الْاَعْضَاءِ فَاِنْ قُلْتُ لَا شَكَّ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَى التَّيَامُنِ فِى غَسْلِ الْاَعْضَاءِ وَلَمْ يَرْوِ اَحَدٌ اَنَّهُ بَدَأَ بِالشِّمَالِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ سُنَّةً قُلْتُ اَلسُّنَّةُ مَا وَاظَبَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ مَعَ التَّرْكِ اَحْيَانًا فَاِنْ كَانَتِ الْمُوَاظَبَةُ الْمَذْكُوْرَةُ عَلٰى سَبِيْلِ الْعِبَادَةِ فَسُنَنُ الْهُدٰى وَاِنْ كَانَتْ عَلٰى سَبِيْلِ الْعَادَةِ فَسُنَنُ الزَّوَائِدِ كَلُبْسِ الثِّيَابِ وَالْاَكْلِ بِالْيَمِيْنِ وَتَقْدِيْمِ الرِّجْلِ الْيُمْنٰى فِى الدُّخُوْلِ وَنَحْوُ ذٰلِكَ وَكَلَامُنَا فِى الْاَوَّلِ وَمُوَاظَبَةُ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى التَّيَامُنِ كَانَتْ مِنْ قُبَيْلِ الثَّانِىْ وَيُفْهَمُ هٰذَا مِنْ تَعْلِيْلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى التَّنَعُّلِ وَالتَّرَجُّلِ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسَحَ عَلَيْهَا ـ

অনুবাদ : অজুর মোস্তাহাব হলো তায়ামুন (اَلتَّيَامُنُ)। অর্থাৎ ডানদিক থেকে [অজুর] অঙ্গ ধোয়া শুরু করা। অতএব, যদি তুমি বল, নিশ্চয় নবী ﷺ ডানদিক থেকে [অজুর] অঙ্গ ধোয়ার উপর مُوَاظَبَةٌ করেছেন এবং কোনো একজন সাহাবী থেকেও বর্ণিত নেই যে, তিনি [নবী ﷺ] বামদিক থেকে শুরু করেছেন। তাই এ তায়ামুন [ডানদিক থেকে শুরু করা] সুন্নত হওয়া উচিত। [তবে কেন একে মোস্তাহাব বলা হয়েছে?] উত্তরে আমি বলব, সুন্নত বলা হয় ঐ আমলকে, যার উপর নবী ﷺ মাঝে মাঝে বর্জনের সাথে مُوَاظَبَةٌ করেছেন। অতঃপর যদি উল্লিখিত مُوَاظَبَةٌ ইবাদত হিসেবে হয়ে থাকে, তবে তা সুন্নতে হুদা [বা সুন্নতে মুয়াক্কাদা]। আর যদি উক্ত مُوَاظَبَةٌ অভ্যাসগত হয়ে থাকে তবে তা সুন্নতে যায়েদা [বা অতিরিক্ত সুন্নত]। যেমন– ডানদিক থেকে কাপড় পরিধান করা, ডানদিক থেকে খানা খাওয়া এবং [ঘর, মসজিদ ইত্যাদিতে] প্রবেশ করার সময় ডান পাকে আগে প্রবেশ করানো অনুরূপ আরো অন্যান্য বিষয়। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে প্রথম প্রকার [তথা ইবাদত হিসেবে مُوَاظَبَةٌ]-এর ক্ষেত্রে। আর নবী ﷺ -এর ডান থেকে শুরু করার উপর مُوَاظَبَةٌ দ্বিতীয় প্রকার [তথা অভ্যাসগত مُوَاظَبَةٌ] থেকে। নবী ﷺ -এর বাণী– "প্রত্যেক জিনিসই ডানদিক থেকে শুরু করা আল্লাহ পছন্দ করেন, এমনকি জুতো পরিধান করা ও মাথা চিরুনি করার ক্ষেত্রেও" দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকারের কারণ বর্ণনা করা থেকেও এ তায়ামুন [ডানদিক থেকে শুরু করা] মোস্তাহাব বুঝা যায়। গর্দান [গ্রীবা] মাসেহ করা। কেননা, নবী ﷺ গর্দানের উপর মাসেহ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمُسْتَحَبُّهُ التَّيَامُنُ الخ : **'মোস্তাহাব' অর্থ :** 'মোস্তাহাব' (مُسْتَحَبٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ اَلشَّىْءُ الْمَحْبُوْبُ "প্রিয় জিনিস"। ফকীহদের পরিভাষায় مُسْتَحَبٌ বলা হয়– مَا فَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَرَّةً وَتَرَكَهُ اُخْرٰى "নবী ﷺ -এর ঐ আমলকে, যা তিনি কখনো করেছেন, কখনো বর্জন করেছেন।' –[বাহরুর রায়েক : ১/৫৫]

মোস্তাহাবের হুকুম : এর হুকুম সম্পর্কে বাহরুর রায়েক গ্রন্থকার (র.) লেখেন– وَحُكْمُهُ الثَّوَابُ عَلَى الْفِعْلِ وَعَدَمُ اللَّوْمِ عَلَى التَّرْكِ "মোস্তাহাবের হুকুম হচ্ছে, মোস্তাহাব আমলকারী ছওয়াব পাবে। তবে বর্জন করার কারণে তাকে ভর্ৎসনা করা হবে না।" –[বাহরুর রায়েক– ১/৫৫]

উল্লেখ্য যে, উক্ত মুস্তাহাবকে نَفْل، اَفْضَلْ ، اَدَبْ ، مَنْدُوْبْ [নফল] -ও বলা হয়।

قَوْلُهُ فِيْ غَسْلِ الْاَعْضَاءِ : এ স্থানে غَسْل দ্বারা ব্যাপক غَسْل উদ্দেশ্য। চাই مَسْح হোক অথবা غَسْل হোক। কেননা, مَسْح -কেও حُكْمًا - غَسْل বলা হয়। কারণ, হাত এবং পা মাসেহ করার ক্ষেত্রেও ডানদিক থেকে শুরু করা (اَلتَّيَامُنُ) মোস্তাহাব। অঙ্গ ধোয়া ও মাসেহ করার ক্ষেত্রে ডানদিক থেকে শুরু করা মোস্তাহাব শুধু ঐ সমস্ত অঙ্গের ক্ষেত্রে যেগুলোতে পৃথক পৃথক ডান ও বামদিক রয়েছে। তাই মুখমণ্ডল ধোয়া, মাথা ও কান মাসেহ করার ক্ষেত্রে ডানদিক থেকে শুরু করা মোস্তাহাব নয়। কেননা, এগুলোতে ডান ও বাম দিক গণ্য করা হয় না।

قَوْلُهُ فَاِنْ قُلْتُ لَا شَكَّ الخ : শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) উক্ত عِبَارَةْ -এ তায়ামুন (اَلتَّيَامُنْ) মোস্তাহাব হওয়ার উপর একটি সম্ভাবনাময়ী প্রশ্ন উল্লেখ করেছেন। প্রশ্নের সারমর্ম হচ্ছে, নবী ﷺ مُوَاظَبَةْ -এর সাথে তায়ামুন (اَلتَّيَامُنُ) -এর আমল করেছেন। কোনো একজন সাহাবী থেকেও বর্ণিত নেই যে, তিনি বামদিক থেকে অজু শুরু করেছেন। তাই "তায়ামুন" মোস্তাহাব না হয়ে সুন্নত হওয়ার যোগ্য। তবে কেন তা মোস্তাহাবের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হলো? সামনের عِبَارَةْ -এর মধ্যে এই উত্তরের বিবরণ এসেছে।

قَوْلُهُ قُلْتُ اَلسُّنَّةُ مَا الخ : এ عِبَارَةْ দ্বারা শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) বিগত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। উত্তরের সারমর্ম হচ্ছে, সুন্নত বলা হয়– নবী ﷺ -এর ঐ আমলকে যা তিনি মাঝে মাঝে বর্জন করতঃ مُوَاظَبَةْ -এর সাথে করেছেন। অতঃপর উক্ত مُوَاظَبَةْ যদি ইবাদত হিসেবে করে থাকেন, তবে তা হয় সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ (سُنَّةْ مُؤَكَّدَةْ)। আর যদি উক্ত مُوَاظَبَةْ অভ্যাস হিসেবে করে থাকেন, তবে তা হয় সুন্নতে যায়িদাহ (سُنَّةْ زَائِدَةْ)। যা মোস্তাহাবের পর্যায়ের। যা বর্জন করার কারণে তাকে ভর্ৎসনা করা হয় না। এ তায়ামুন [ডানদিক থেকে শুরু করা] -এর আমলটি নবী ﷺ অভ্যাস হিসেবেই করেছেন। যার দ্বারা তা সর্বোচ্চ সুন্নতে যায়িদাহ (سُنَّةْ زَائِدَةْ) হয়। আর সুন্নতে যায়িদাহ এবং মোস্তাহাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

উল্লেখ্য যে, শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের উল্লিখিত সুন্নতের সংজ্ঞা শুধু سُنَّةْ فِعْلِيْ -এর উপর প্রযোজ্য। অন্যথায় নবী ﷺ -এর قَوْل ও تَقْرِيْر -কেও সুন্নত বলা হয়, যা এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই তা مُطْلَقْ সুন্নতের সংজ্ঞা হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ : অজুর মোস্তাহাবসমূহের একটি হচ্ছে, গর্দান মাসেহ করা। কারণ, নবী ﷺ ও গর্দান মাসেহ করতেন। তবে গলা মাসেহ করা বিদআত। কেউ বলেন, গর্দান মাসেহ করাও বিদআত। কিন্তু নবী ﷺ -এর একটি হাদীস দ্বারা উক্ত বক্তব্যের رد [খণ্ডন] হয়ে যায়। হাদীসটি "বাহরুর রায়েক" গ্রন্থকার "ফাতহুল কাদীর" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন–

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ ظَاهِرَ رَقَبَتِهِ مَعَ مَسْحِ الرَّأْسِ .

"নবী ﷺ মাথা মাসেহের সাথে গর্দান মাসেহ করেছেন।" –[বাহরুর রায়েক– ১/৫৬]

وَنَاقِضُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ مُعْتَادًا أَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَالدُّوْدَةِ وَالرِّيْحِ الْخَارِجَةِ مِنَ الْقُبُلِ وَالذَّكَرِ وَفِيْهِ اِخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ اِنْ كَانَ نَجَسًا سَالَ اِلَى مَا يَطْهُرُ اَىْ اِلَى مَوْضَعٍ يَجِبُ تَطْهِيْرُهُ فِى الْجُمْلَةِ اَمَّا فِى الْوُضُوْءِ اَوْ فِى الْغُسْلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) اَلْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ لَا يُنْقِضُ الْوُضُوْءَ وَقَوْلُهُ اِنْ كَانَ نَجَسًا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اَوْ مِنْ غَيْرِهِ.

অনুবাদ : অজু ভঙ্গকারী ঐ জিনিস যা পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে বের হয়। চাই ঐ জিনিস প্রকৃতিগতভাবে বের হোক অথবা অপ্রকৃতিগতভাবে বের হোক। যেমন– কীটা-[কৃমি] এবং নারী-পুরুষের সামনের রাস্তা থেকে নির্গত হাওয়া। তবে এতে মাশায়িখে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। অথবা পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া [শরীরের অন্য অংশ থেকে] যা বের হয়, তা যদি নাপাক হয় এবং প্রবাহিত হয়ে এমন স্থানে চলে যায় যা পবিত্র করা হয়। অর্থাৎ [প্রবাহিত হয়ে] এমন স্থানে [চলে যায়] যা অজু অথবা গোসলে সর্বাবস্থায় ধৌত করা আবশ্যক। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নিকট পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া [শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে] যা বের হয়, তা অজুকে ভাঙ্গবে না। গ্রন্থকারের কথা اِنْ كَانَ نَجَسًا - اَوْ مِنْ غَيْرِهِ -এর সাথে সম্পর্কিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَاقِضُهُ مَا خَرَجَ الخ : سَبِيْلَيْن তথা পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে প্রকৃতিগতভাবে ও অপ্রকৃতিগতভাবে যা কিছু বের হয়, তা অজু ভঙ্গ করে দেয়। প্রকৃতিগত বস্তু (اَلشَّيْءُ الْمُعْتَادُ) বের হয় যেমন– পেশাব ও পায়খানা। অপ্রকৃতিগত বস্তু (اَلشَّيْءُ غَيْرُ الْمُعْتَادِ) বের হয় যেমন– কৃমি ও ইস্তেহাজার রক্ত ইত্যাদি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াতে বলেছেন– أَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ "অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচ স্থান থেকে আসে।" অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি বাথরুম থেকে পেশাব ও পায়খানার হাজত সেরে আসে আর পানি না পায়, তবে সে যেন তায়াম্মুম করে নেয়। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে অজু ভেঙ্গে যায়। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা পানি না থাকাবস্থায় তায়াম্মুমের নির্দেশ দিতেন না। উক্ত আয়াত হলো প্রকৃতিগত বস্তু বের হলে তাতে অজু ভেঙ্গে যাওয়ার উপর দলিল।
سَبِيْلَيْن থেকে غَيْرُ عَادَةٍ [অপ্রকৃতিগত] কোনো কিছু বের হলেও অজু ভেঙ্গে যায়। এর দলিল হচ্ছে–
قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَمَا الْحَدَثُ قَالَ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ .

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল حَدَثٌ [অজু ভঙ্গের কারণ] কি? তিনি বললেন, পেশাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে যা বের হয়।" –[হিদায়া : ১/১২]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসে مَا শব্দটি ব্যাপক যা شَيْءٌ مُعْتَادٌ বা প্রকৃতিগত ও شَيْءٌ غَيْرُ مُعْتَادٍ বা অপ্রকৃতিগত সমস্ত বস্তুকে শামিল রাখে। অতএব, سَبِيْلَيْن থেকে যা কিছুই বের হোক, তা অজু ভঙ্গের কারণ। যদিও কেউ কেউ سَبِيْلَيْن থেকে غَيْرُ مُعْتَادٍ বস্তু বের হলে অজু ভাঙ্গবে না বলে দাবি করেন, কিন্তু এর কোনো দলিল-প্রমাণ নেই।

قَوْلُهُ كَالدُّوْدَةِ : অর্থাৎ কীটা [কৃমি] প্রকৃতিগতভাবে বের হয় না। উক্ত কীটা যদি পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে অজু ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু যদি সে কীটা পুরুষ বা মহিলার পেশাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়, তবে এতে মতানৈক্য রয়েছে। যে সকল ফকীহ মহিলার পেশাবের রাস্তা দিয়ে হাওয়া বের হওয়াকে অজু ভঙ্গের কারণ বলেন, তারা মহিলার পেশাবের

রাস্তা দিয়ে কীটা বের হওয়াকেও অজু ভঙ্গের কারণ বলেন। শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) অচিরেই উল্লেখ করবেন যে, তা অজু ভঙ্গের কারণ নয়।

খোলাসাহ (خُلَاصَةٌ) ও কাযী খান (قَاضِىْ خَانْ) গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, পুরুষ ও মহিলার পেশাবের রাস্তা দিয়ে যদি কীটা বের হয়, তবে অজু ভেঙ্গে যাবে।

قَوْلُهُ وَالرِّيْحُ الْخَارِجَةُ الخ : সকল ওলামায়ে কেরাম এতে ঐকমত্য যে, পায়খানার রাস্তা দিয়ে হাওয়া বের হলে অজু ভেঙ্গে যাবে। যদি মহিলা ও পুরুষের পেশাবের রাস্তা দিয়ে হাওয়া বের হয়, তবে এতে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন– ইমাম কুদূরী (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন যে, "এর দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাবে।" হিদায়া, মুনিয়্যাহ (مُنْيَةٌ) ও মুহীত (مُحِيْط) গ্রন্থকারগণ বলেন– "তা অজু ভঙ্গের কারণ হবে না।" কারণ, তা হাওয়া নয়; বরং তা إِخْتِلَاجٌ [অস্থিরতা]। –[শরহে বেকায়া ১/৬৫ টীকা নং ৩]

বাহরুর রায়েক গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেন, "যদি তা হাওয়া বলে মেনেও নেওয়া হয়, তবুও তা অজু ভঙ্গের কারণ নয়। কেননা, তা পেটের নাপাক স্থান থেকে নির্গত নয়।" –[বাহরুর রায়েক– ১/৫৯]

قَوْلُهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ اِنْ كَانَ نَجَسًا سَالَ الخ : غَيْرُ السَّبِيْلَيْنِ থেকে নির্গত কোনো কিছু প্রবাহিত হয়ে এমন স্থানে চলে যাওয়া, যা অজু বা গোসলে পবিত্র করা আবশ্যক, তা অজু ভঙ্গের কারণ। এ মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ওলামায়ে আহনাফের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ওলামায়ে আহনাফ বলেন– غَيْرُ سَبِيْلَيْنِ থেকে যদি কোনো কিছু বের হয়ে এমন স্থানে চলে আসে যা অজু বা গোসলে ধৌত করা আবশ্যক, তবে অজু ভেঙ্গে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, غَيْرُ سَبِيْلَيْنِ থেকে যা কিছুই বের হোক, চাই তা প্রবাহিত হোক বা না হোক তা (مُطْلَقًا) অজু ভঙ্গের কারণ।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) নবী ﷺ -এর হাদীস দ্বারা إِسْتِدْلَالْ করেন যে,

إِنَّهُ ﷺ قَاءَ فَغَسَلَ فَمَهُ فَقِيْلَ لَهُ أَلَا تَتَوَضَّأُ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ مِنَ الْقَيْئِ ـ

অর্থাৎ "নবী ﷺ বমি করেছেন। অতঃপর মুখ ধৌত করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনি কি নামাজের অজু করবেন না? তিনি বললেন, বমির কারণে এভাবেই অজু করতে হয়। [তথা শুধু মুখ ধোয়া।]" –[বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১১০]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, নবী ﷺ বমি করার পর অজু করেননি; বরং শুধু মুখ ধৌত করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বমি অজু ভঙ্গের কারণ নয়।

তাঁর দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, হযরত ওমর (রা.)-এর হাদীস যে, إِنَّهُ حِيْنَ طُعِنَ كَانَ يُصَلِّىْ وَالدَّمُ يَسِيْلُ مِنْهُ

অর্থাৎ "হযরত ওমর (রা.)-কে যখন আঘাত করা হয়েছিল, তখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন। আর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।" وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالْ এভাবে যে, হযরত ওমর (রা.)-এর দেহ মোবারক থেকে রক্ত ঝরছিল, তথাপিও তিনি নামাজ পড়ছিলেন। অতএব, যদি غَيْرُ سَبِيْلَيْنِ থেকে কোনো কিছু বের হলে অজু ভেঙ্গে যেত, তবে তিনি নামাজ ছেড়ে দিতেন।

তাঁর তৃতীয় একটি যৌক্তিক দলিল হচ্ছে–

وَلِاَنَّ خُرُوْجَ النَّجَسِ مِنَ الْبَدَنِ زَوَالُ النَّجَسِ عَنِ الْبَدَنِ وَ زَوَالُ النَّجَسِ عَنِ الْبَدَنِ كَيْفَ يُوْجِبُ تَنْجِيْسَ الْبَدَنِ ـ

অর্থাৎ "দেহ থেকে নাপাক বের হওয়া অর্থ দেহ থেকে নাপাক দূরীভূত হওয়া। আর নাপাক দূরীভূত হওয়া কিভাবে দেহকে নাপাক করতে পারে?" –[বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১১৯]

ইমাম যুফার (র.)-এর إِسْتِدْلَالْ -কে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) এভাবে উল্লেখ করেছেন যে,

وَوَجْهُهُ اَنَّ خُرُوْجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِىْ زَوَالِ الطَّهَارَةِ كَالسَّبِيْلَيْنِ ـ

আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করেন, এর وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ দুভাবে হতে পারে–

১. নাপাকী বের হওয়া তাহারাত দূরীভূত হওয়ার কারণ (عِلَّةٌ) আর যখন কারণ (عِلَّةٌ) পাওয়া যাবে, তখন مَعْلُوْلْ -ও পাওয়া যাবে। তাই যখন নাপাকী বের হবে, তখন তাহারাত দূর হয়ে যাবে। কোনো শর্ত-শারায়েতের প্রয়োজন নেই।

২. নাপাকী সামান্য হলেও তা বের হচ্ছে দেহ থেকে। আর দেহ থেকে নির্গত যে-কোনো নাপাকীই অজু ভঙ্গকারী। –[শরহে বেকায়া : ১/৬৬, টীকা : ৫]

ওলামায়ে আহনাফ-এর প্রথম দলিল হচ্ছে, নবী ﷺ বলেছেন– اَلْوُضُوْءُ مِنْ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ "সমস্ত প্রবাহিত রক্তের জন্যই অজু আবশ্যক।" –[দারাকুতনী : ১/১৫৭]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রক্ত বের হয়ে একটু প্রবাহিত হলেই অজু ভেঙ্গে যায়। অন্যথায় নবী ﷺ এ কারণে অজু করতে বলতেন না।

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, নবী ﷺ বলেছেন–

مَنْ قَاءَ أَوْ رَعُفَ فِيْ صَلَاتِهٖ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلٰى صَلَاتِهٖ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.

অর্থাৎ "নামাজে থাকাবস্থায় যদি কারো বমি হয় বা নাক থেকে রক্ত ঝরে, তবে সে যেন ফিরে গিয়ে অজু করে এবং পূর্ববর্তী নামাজের উপর বেনা (بِنَاءْ) করে যতক্ষণ কথা না বলবে।" –[ইবনে মাজাহ : ১/৩৮৫]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসে নবী ﷺ বমি বা নাক থেকে রক্ত বের হলে অজু করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বমি বা নাক থেকে রক্ত বের হলে অজু ভেঙ্গে যায়।

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) وَ زُفَرَ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রথম দলিল اَنَّهٗ ﷺ قَاءَ فَغَسَلَ فَمَهٗ الخ হাদীসটি একেবারেই দুর্বল এবং غَرِيْبٌ –[নসবুর রায়াহ : ১/৪১]

তাছাড়া হাদীসটি যদি সহীহও মেনে নেওয়া হয়, তবে এর উত্তর হচ্ছে, হতে পারে নবী ﷺ -এর বমি মুখ ভরে হয়নি। –[বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১২০]

তাঁর দ্বিতীয় দলিল দ্বারা হযরত ওমর (রা.)-এর হাদীসের খণ্ডন হচ্ছে, উক্ত হাদীসে উল্লেখ নেই যে, তিনি নতুন করে আবার অজু করেননি। হতে পারে তিনি নতুন অজু করে নিয়েছেন। –[বাদায়িউ সানায়ে' : ১/১২০]

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যৌক্তিক দলিল-এর খণ্ডন হচ্ছে, যতটুকু নাপাকীই শরীরের ভিতর থেকে বের হয়, তা দ্বারা অবশ্যই শরীরের ظَاهِرْ তথা প্রকাশ্য দেহ অপবিত্র হয়ে যায়। কেননা, দেহের যতটুকু অংশে উক্ত নাপাকী লেগেছে, ততটুকুর পবিত্রতা অবশ্যই দূর হয়ে যায়। আর نَجَاسَةٌ ও طَهَارَةٌ -এর হুকুমের ক্ষেত্রে শরীর مُتَجَزِّىْ হয় না। অর্থাৎ কোনো অংশ পবিত্র এবং কোনো অংশ অপবিত্র হতে পারে না; বরং পবিত্র হলে পূর্ণ দেহই পবিত্র এবং অপবিত্র হলে পূর্ণ দেহই অপবিত্র হবে। তাই তার পূর্ণ দেহই অপবিত্র হয়ে যায়। এখন তার গোসলের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু অজুকে গোসলের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। –[বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১২০]

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলের খণ্ডন শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেন– প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতির اِسْتِدْلَالْ -এর খণ্ডন হচ্ছে, যে নাপাকীটা শরীর থেকে বের হলো তা যদি এত কম হয়ে যে, প্রবাহিত হয় না; বরং স্বস্থানেই থেকে যায়। তা দেহ থেকে বের (خَارِجْ) হয়েছে বলা যাবে না; বরং তা প্রকাশ (ظَاهِرْ) হয়েছে বলা হবে। কেননা, এমন নাপাক দ্বারা সমস্ত দেহ পরিপূর্ণ। শরীরে চামড়ার নীচেই নাপাক রয়েছে। তাই যখন চামড়া কেটে যায় এমতাবস্থায় রক্ত প্রবাহিত হয়নি, তখন বলা হবে রক্ত প্রকাশ পেয়েছে। আর এর দ্বারা অজু ভাঙ্গতে পারে না। –[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর : ১/৩৯–৪৪, বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১১৯–১২২, হিদায়া : ১/২২–২৪, বাহরুর রায়েক : ১/৬২–৬৬, মাআরিফুস সুনান : ১/৩০৫–৩০৮, দরসে তিরমিযী : ১/৩১৬–৩২০]

قَوْلُهٗ أَمَّا فِى الْوُضُوْءِ أَوْ فِى الْغُسْلِ : غَيْرُ سَبِيْلَيْنِ থেকে কোনো কিছু বের হয়ে এমন স্থানে প্রবাহিত হয়ে যাওয়া যা অজু বা গোসলে ধৌত করা ফরজ, তা অজু ভঙ্গের কারণ। উল্লেখ্য যে, আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, শরীরের অঙ্গ তিন প্রকার–

১. যা অজু বা গোসলে ধৌত করা আবশ্যক নয়। যেমন, দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ। যেমন– অন্তর , কলিজা ইত্যাদি।
২. যা অজু ও গোসল উভয়টিতে ধোয়া আবশ্যক। যেমন, শরীরের প্রকাশ্য অংশ তথা হাত, পা ও মুখ ইত্যাদি।
৩. যা গোসলে ধৌত করা আবশ্যক, কিন্তু অজুতে আবশ্যক নয়। যেমন, নাক ও মুখের ভিতরের অংশ। কারণ, এক হিসেবে তা ভিতরের অংশ; অন্য হিসেবে তা বাহিরের [প্রকাশ্য] অংশ। এখানে শেষ দুই প্রকারের অঙ্গ উদ্দেশ্য।

وَالرِّوَايَةُ النَّجَسُ بِفَتْحِ الْجِيْمِ وَهُوَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَاَمَّا بِكَسْرِ الْجِيْمِ فَمَا لَا يَكُوْنُ طَاهِرًا هٰذَا فِىْ اِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ وَاَمَّا فِى اللُّغَةِ فَيُقَالُ نَجِسَ الشَّئُ يَنْجَسُ فَهُوَ نَجَسٌ وَنَجِسٌ وَاِنَّمَا قَالَ سَالَ لِاَنَّهٗ اِذَا لَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَخْرَجَ لَا يُنْقِضُ الْوُضُوْءَ عِنْدَنَا وَيَنْقُضُ عِنْدَ زُفَرَ (رحـ) وَكَذَا اِذَا عَصَرَ الْقَرْحَةَ فَتَجَاوَزَ وَكَانَ بِحَالٍ لَوْ لَمْ يَعْصِرْ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ وَكَذَا اِذَا عَضَّ شَيْئًا اَوْ خَلَّلَ اَسْنَانَهٗ اَوْ اَدْخَلَ اِصْبَعَهٗ فِىْ اَنْفِهٖ فَرَأٰى اَثَرَ الدَّمِ اَوِ اسْتَنْثَرَ فَخَرَجَ مِنْ اَنْفِهِ الدَّمُ عَلَقًا عَلَقًا مِثْلَ الْعَدَسِ لَا يَنْقُضُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) وَوَجْهُهٗ اَنَّ خُرُوْجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِىْ زَوَالِ الطَّهَارَةِ كَالسَّبِيْلَيْنِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ نَعَمْ لٰكِنَّ الْقَلِيْلَ بَادٍ لَا خَارِجٌ وَالنَّجَاسَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ فِىْ مَوْضِعِهَا لَا تَنْقُضُ قُلْتُ هٰذَا الدَّلِيْلُ غَيْرُ تَامٍّ لِاَنَّهٗ لَا يَشْمَلُ مَا اِذَا غُرِزَتْ اِبْرَةٌ فَارْتَقَى الدَّمُ عَلٰى رَأْسِ الْجُرْحِ لٰكِنْ لَمْ يَسِلْ فَاِنَّ الْخُرُوْجَ هُنَاكَ مَحْسُوْسٌ وَمَعَ ذٰلِكَ لَا يَنْقُضُ عِنْدَنَا ـ

অনুবাদ : [ফকীহদের থেকে] বর্ণিত আছে, نَجَسْ শব্দটি যদি بِفَتْحِ الْجِيْمِ হয়, তবে এর অর্থ– "মূল নাপাক" (عَيْنُ النَّجَاسَةِ)। যেমন– পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি। আর যদি بِكَسْرِ الْجِيْمِ হয়, তবে এর অর্থ "ঐ জিনিস যা অপবিত্র" এ পার্থক্যটি ফকীহদের পরিভাষায়। কিন্তু শাব্দিক ক্ষেত্রে [কোনো পার্থক্য নেই] বলা হয়– نَجِسَ الشَّئُ يَنْجَسُ [উদ্দেশ্য بِكَسْرِ الْجِيْمِ ও بِفَتْحِ الْجِيْمِ উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়]। فَهُوَ نَجَسٌ وَنَجِسٌ বেকায়া গ্রন্থকার (র.) سَالَ শব্দ বলেছেন। কেননা, আমাদের নিকট নির্গত বস্তু যদি তার নির্গত স্থান (مَخْرَجْ) -কে অতিক্রম না করে [প্রবাহিত না হয়] তবে অজু ভাঙ্গবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর নিকট ভেঙ্গে যাবে। অনুরূপ যদি ক্ষতস্থানে টিপ [চাপ] দেওয়া হয়, আর রক্ত বা পুঁজ সে স্থান অতিক্রম করে এ অবস্থায় যে, যদি [উক্ত ক্ষতস্থানকে] চাপ না দেওয়া হতো, তবে সে স্থান অতিক্রম করত না [তবে অজু ভাঙ্গবে না]। অনুরূপ যদি দাঁত দ্বারা কোনো জিনিস কামড়ায় অথবা দাঁত খিলাল করে কিংবা নাকে আঙ্গুল প্রবেশ করায়, অতঃপর রক্তের চিহ্ন দেখতে পায়, অথবা [যদি] নাক পরিষ্কার করে, আর নাক থেকে [কলাই বা] ডালের ন্যায় জমাট রক্ত বের হয়, তবে এ সমস্ত صُوْرَةْ -এ আমাদের নিকট অজু ভাঙ্গবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর নিকট অজু ভেঙ্গে যাবে। তাঁর দলিল হচ্ছে, [দেহ থেকে] নাপাকী বের হওয়া (خُرُوْجُ النَّجَاسَةِ) অবশ্যই তাহারাতকে দূরীভূত করে দেয়। যেমন سَبِيْلَيْنْ তথা পেশাব-পায়খানার রাস্তা [দিয়ে কোনো কিছু বের হলে তাহারাত দূরীভূত হয়ে যায়।]

আমরা বলব– হ্যাঁ, [আমরা তা মানি]! তবে কম বস্তু প্রকাশ (ظَاهِرْ) হয়, বাহির (خَارِجْ) হয় না। আর যে নাপাকীটা [শরীর থেকে নির্গত বস্তু] স্বস্থানে থেকে যায়, তা অজুকে ভঙ্গ করে না। [শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন,] আমি বলি যে, এ দলিল পূর্ণাঙ্গ নয়, কেননা তা শামিল রাখে ঐ প্রক্রিয়াকে, যখন [কোনো অঙ্গে] সুই ঢুকানো হয়, আর সে ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ে, কিন্তু তা ক্ষতস্থান থেকে প্রবাহিত হয় না। কারণ, এখানে [উক্ত প্রক্রিয়ায়] خُرُوْجْ [বের হওয়া] অনুভূত হয়। এতদসত্ত্বেও তা আমাদের নিকট অজু ভঙ্গের কারণ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالرِّوَايَةُ النَّجَسُ بِفَتْحِ الْجِيْمِ الخ :

اَلنَّجَسُ بِفَتْحِ الْجِيْمِ এবং اَلنَّجِسُ بِكَسْرِ الْجِيْمِ : এর মধ্যে পার্থক্য নَجَسٌ এবং- نَجِسٌ-এর মধ্যে শাব্দিকভাবে কোনো পার্থক্য নেই; বরং উভয়টিই "প্রকৃত নাপাকী ও অপবিত্র বস্তুর" অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ফকীহদের নিকট শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে যে, اَلنَّجَسُ بِفَتْحِ الْجِيْمِ অর্থ- মূল নাপাকী (عَيْنُ النَّجَاسَةِ) যেমন- পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি। আর اَلنَّجِسُ بِكَسْرِ الْجِيْمِ অর্থ- অপবিত্র বস্তু। তবে তা মূল নাপাকী নয়।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا عَصَرَ الْقَرْحَةَ الخ : اَلْقَرْحَةُ শব্দের ق অক্ষরে পেশ ও যবর উভয় হরকতই পড়া যায়। অর্থ- ফোড়া বা ঠোসা। এখানে বলা হয়েছে যে, যদি উক্ত ফোড়া বা ঠোসাকে হাত দ্বারা চাপ দিয়ে ভিতরের নষ্ট পানি বের করা হয়, আর ঐ ফোড়া বা ঠোসা এমন হয় যে, যদি একে হাত দ্বারা টিপ না দেওয়া হতো তবে এর থেকে পুঁজ বা দূষিত পানিটা বের হতো না, তবে এর দ্বারা অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা, তা বের করা হয়েছে; বের হয়নি। আর অজু ভঙ্গের কারণ বের হওয়া (خُرُوْجٌ), বাহির করা (اِخْرَاجٌ) নয়। উল্লিখিত বক্তব্য হিদায়া গ্রন্থকারসহ কতিপয় ফকীহের মতে। অন্যথায় বিশুদ্ধ মত হলো, টিপে বা চাপ দিয়ে পুঁজ বা রক্ত বের করলেও অজু ভেঙ্গে যাবে। مُطْلَقًا - خُرُوْجٌ [বের হওয়া] হচ্ছে অজু ভঙ্গের কারণ, তাই خُرُوْجٌ -এর মধ্যে اِخْرَاجٌ-ও শামিল।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا عَضَّ شَيْئًا الخ : দাঁত দ্বারা যদি কিছু কামড়ানো হয়, অথবা দাঁত খিলাল করা হয় এবং খিলালের মধ্যে রক্তের চিহ্ন দেখা যায়, অথবা দাঁত খিলাল করা হয় এবং খিলালের মধ্যে রক্তের চিহ্ন দেখা যায়, অথবা কর্তিত স্থানে আঙ্গুল রাখা হয় বা নাকের ভিতর আঙ্গুল প্রবেশ করানো হয় এবং আঙ্গুলের উপর রক্তের চিহ্ন দেখা যায়, কিংবা নাক পরিষ্কার করে আর নাকের ভিতর থেকে জমাট রক্তের টুকরা বের হয়, অথবা থুথুর সঙ্গে সামান্য রক্তের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, অথবা শরীরে কোনো অঙ্গে সুই প্রবেশ করানো হয় বা কাঁটা বিঁধে আর উক্ত স্থানে রক্তের চিহ্ন প্রকাশ পায়। এ সমস্ত প্রক্রিয়ায় যদি রক্ত প্রবাহিত না হয়, তবে অজু ভঙ্গ হবে না। আর যদি বুঝা যায় যে, রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তবে অজু ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র.)-এর নিকট مُطْلَقًا অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ خُرُوْجَ النَّجَاسَةِ الخ : এটি ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতঃপূর্বে পেশ করেছি।

قَوْلُهُ قُلْتُ هٰذَا الدَّلِيْلُ غَيْرُ تَامٍّ الخ : ইমাম যুফার (র.)-এর اِسْتِدْلَالٌ-এর উক্ত খণ্ডন, যা শারেহ (شَارِحٌ) (র.) আহনাফের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন যে, কম পুঁজ বা কম রক্ত, যা ক্ষতস্থানের মুখে প্রকাশ (ظَاهِرٌ) হয় বাহির (خَارِجٌ) হয় না; কিংবা যে নাপাকী স্বস্থানে স্থির থাকে, তা অজু ভঙ্গের কারণ নয়। শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) বলছেন যে, ইমাম যুফার (র.)-এর উক্ত খণ্ডন পূর্ণাঙ্গরূপে হয়নি। কেননা, তা غَيْرُ سَائِلٍ [অপ্রবাহিত] রক্তের সমস্ত প্রকারকে শামিল রাখে না। কারণ, উক্ত খণ্ডন ঐ প্রক্রিয়াকে শামিল রাখে না, যখন সুই কোনো অঙ্গে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়, আর রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হয়, প্রবাহিত হয় না। কেননা, এখানে রক্ত কমও নয় যে, তা প্রকাশ হয়েছে। আবার তা স্বস্থানে স্থিরও নয়। অথচ রক্ত তার স্থান থেকে বের (خُرُوْجٌ) হয়ে ক্ষতস্থানের মুখ পর্যন্ত চলে এসেছে। এতদসত্ত্বেও আমাদের নিকট তা অজু ভঙ্গের কারণ নয়।

শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের উক্ত বক্তব্য আমাদের বুঝে আসে না। কেননা, ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলেও ফুকাহায়ে কেরামের নিকট অজু ভেঙ্গে যাবে। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হওয়ার প্রক্রিয়ায়ও خُرُوْجٌ পাওয়া যায়। কেননা, خُرُوْجٌ বলা হয়, "ভিতরের অংশ থেকে বাহিরে আসাকে।" তিনি আরো লেখেন যে, শারেহ (র.) وَمَعَ ذٰلِكَ لَا يَنْقُضُ عِنْدَنَا বলে মূলত তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অন্যথায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও অন্যান্য ইমামদের নিকট এর দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাবে।

وَقَدْ خَطَرَ بِبَالِى وَجْهٌ حَسَنٌ وَهُوَ اَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ خُرُوْجُ النَّجَاسَةِ لِاَنَّ هٰذَا الدَّمَ غَيْرُ نَجَسٍ بَلِ النَّجَسُ هُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوْحُ وَهٰكَذَا فِى الْقَئِ الْقَلِيْلِ وَسَيَاتِى فِىْ هٰذِهِ الصَّفْحَةِ وَقَوْلُهُ إِلٰى مَا يَطْهُرُ اِحْتِرَازٌ عَمَّا اِذَا قُشِرَتْ نُقْطَةٌ فِى الْعَيْنِ فَسَالَ الصَّدِيْدُ بِحَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْعَيْنِ لَا يُنْقِضُ الْوُضُوْءَ لِاَنَّ دَاخِلَ الْعَيْنِ لَا يَجِبُ تَطْهِيْرُهُ اَصْلًا لَا فِى الْوُضُوْءِ وَلَا فِىْ الْغُسْلِ اِذْ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ ظَاهِرِ الْبَدَنِ فَالْمُعْتَبَرُ الْخُرُوْجُ اِلٰى مَا هُوَ ظَاهِرُ الْبَدَنِ شَرْعًا وَاعْلَمْ اَنَّ قَوْلَهُ اِلٰى مَا يَطْهُرُ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ مَا خَرَجَ لَا بِقَوْلِهِ سَالَ فَاِنَّهُ اِذَا فَصَدَ وَخَرَجَ دَمٌ كَثِيْرٌ وَسَالَ بِحَيْثُ لَمْ يَتَلَطَّخْ رَأْسُ الْجُرْحِ فَاِنَّهُ لَا شَكَّ فِى الْاِنْتِقَاضِ عِنْدَنَا مَعَ اَنَّهُ لَمْ يَسِلْ اِلٰى مَوْضَعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيْرِ بَلْ خَرَجَ اِلٰى مَوْضَعٍ لَا يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيْرِ ثُمَّ سَالَ فَالْعِبَارَةُ الْحَسَنَةُ اَنْ يُقَالَ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ اَوْ مِنْ غَيْرِهِ اِلٰى مَا يَطَّهَّرُ اِنْ كَانَ نَجَسًا سَالَ ـ

অনুবাদ : [শারেহ (র.) বলেন,] একটি সুন্দর কারণ আমার অন্তরে উদয় হয়েছে। তা হচ্ছে, [উক্ত সুই ঢুকানোর প্রক্রিয়ায়] নাপাকীর خُرُوْجٌ [বের হওয়া] সাব্যস্ত হয়নি। কেননা, এ রক্ত নাপাক নয়; বরং নাপাক হচ্ছে প্রবাহিত রক্ত। অনুরূপ স্বল্প বমির ক্ষেত্রেও অজু ভাঙ্গবে না, যা অচিরেই বমির [মাসআলায়] উক্ত পৃষ্ঠায় আসছে। গ্রন্থকারের কথা إِلٰى مَا يَطَّهَّرُ [এটি] ঐ صُوْرَةٌ থেকে اِحْتِرَازٌ [বিরত থাকা] যখন চোখের ভিতরে কোনো ফোসকার চামড়া ছিলে যায়, অতঃপর এর থেকে এমনভাবে পুঁজ প্রবাহিত হয় যে, চক্ষু থেকে তা বাহিরে আসে না, তবে তা অজু ভঙ্গকারী নয়। কেননা, চক্ষুর ভিতরের অংশ আদৌ পবিত্র করা আবশ্যক নয়। না অজুতে, না গোসলে। কারণ, চক্ষুর ভিতরাংশের জন্য শরীরের প্রকাশ্যাংশের হুকুম নেই। সুতরাং [অজু ভঙ্গের ক্ষেত্রে] ধর্তব্য হলো [রক্ত, পুঁজ বা পানির] ঐ অঙ্গের দিকে خُرُوْجٌ [বের] হওয়া, যা শরয়ীভাবে শরীরের প্রকাশ্যাংশ। জেনে রেখ যে, গ্রন্থকারের কথা إِلٰى مَا يَطَّهَّرُ - مَا خَرَجَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থকারের কথা سَالَ-এর সাথে নয়। কেননা, যদি কেউ শিঙ্গা লাগায় এবং অনেক রক্ত বের হয়ে এমনভাবে প্রবাহিত হয় যে, ক্ষত [স্থান] -এর মুখ রক্তাক্ত হয় না, তবে নিঃসন্দেহে আমাদের নিকট অজু ভেঙ্গে যাবে। এতদসত্ত্বেও যে, তা এমন স্থান পর্যন্ত প্রবাহিত হয়নি, যার সাথে পবিত্র করার হুকুম সম্পৃক্ত; বরং এমন স্থানে বের হয়ে গেছে, যার সাথে পবিত্র করার হুকুম সম্পৃক্ত নয়। অতঃপর তা প্রবাহিত হয়েছে। অতএব, উত্তম عِبَارَةٌ হলো, مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ اَوْ مِنْ غَيْرِهِ إِلٰى مَا يَطْهُرُ اِنْ كَانَ نَجَسًا سَالَ বলা। [অর্থাৎ سَبِيْلَيْنِ থেকে কোনো কিছু বের হওয়া অথবা غَيْرِ سَبِيْلَيْنِ থেকে কোনো কিছু বের হয়ে এমন স্থানের দিকে যাওয়া, যা পবিত্র করা হয় এবং তা নাপাক ও প্রবাহিত হয়।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجْهُ حَسَنٍ وَهُوَ اَنَّهُ الخ : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের অন্তরে উদিত وَجْهُ حَسَنٍ -এর মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. এটি শারেহ (র.) قُلْتُ هٰذَا الدَّلِيْلُ বলে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন সে প্রশ্নের উত্তর।

২. অথবা, এটি ইমাম যুফার (র.) -এর اِسْتِدْلَالْ -এর একটি পরিপূর্ণ খণ্ডন। অতঃপর এটি قُلْتُ هٰذَا الدَّلِيْلُ দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের দলিল এভাবে যে, উক্ত দলিল তথা ইমাম যুফার (র.) -এর اِسْتِدْلَالْ -এর উল্লিখিত খণ্ডন সুই বিঁধার صُوْرَةْ -কে এ কারণে শামিল রাখে না যে, এতে خُرُوْجُ النَّجَاسَةِ [নাপাকী নির্গত হওয়া] প্রমাণিত হয় না। এ কারণে নয় যে, এতে خُرُوْجْ -ই নেই। অথবা এটি ইমাম যুফার (র.)-এর اِسْتِدْلَالْ -এর একটি পরিপূর্ণ খণ্ডন এভাবে যে, خُرُوْجُ النَّجَاسَةِ [নাপাকী বের হওয়া] পবিত্রতাকে দূর করে দেয়– এ কথা অবশ্যই আমরা মানি। তবে دَمٌ غَيْرُ مَسْفُوْحٍ [অপ্রবাহিত রক্ত] চাই নির্গত হোক যেমন, সুই বিঁধানোর প্রক্রিয়ায়, অথবা [রক্ত] স্বস্থানে স্থির থাকুক, তা নাপাক নয়। কেননা, নাপাক তো হচ্ছে دَمٌ مَسْفُوْحٌ তথা প্রবাহিত রক্ত। অতএব, دَمٌ غَيْرُ مَسْفُوْحٍ যা স্বস্থানে স্থির থাকে এবং সুই বিঁধার প্রক্রিয়ার خُرُوْجُ النَّجَاسَةِ -ই প্রমাণিত হয় না।

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ اِلٰى مَا يَطَّهَّرُ اِحْتِرَازٌ عَمَّا اِذَا الخ : শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, গ্রন্থকারের বক্তব্য اِلٰى مَا يَطَّهَّرُ শর্ত (قَيْد) দ্বারা ঐ صُوْرَةْ -কে বাদ দেওয়া হয়েছে যখন চোখের ভিতরে কোনো ফোসকার চামড়া ছিলে যায় আর পুঁজ এমনভাবে প্রবাহিত হয় যে, চোখ থেকে তা বাহিরে আসে না, তবে এর দ্বারা অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা, চোখের ভিতরের অংশ অজু বা গোসলে ধৌত করা আবশ্যক নয়। কারণ, তা শরীরের বাহিরের [প্রকাশ্য] অংশ নয়।

قَوْلُهُ اِذْ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ ظَاهِرِ الْبَدَنِ : চক্ষু শরীরের প্রকাশ্য (ظَاهِرْ) অংশ নয়। কেননা, গোসলে ধোয়া আবশ্যক ঐ অঙ্গ, যা সর্বাবস্থায় শরীরের প্রকাশ্য অংশ। যেমন– হাত-মুখ ইত্যাদি। অনুরূপ ঐ অঙ্গ যা একভাবে শরীরের প্রকাশ্য অংশ এবং অন্যভাবে শরীরের ভিতরের অংশ। যেমন– মুখ ও কানের ভিতরের অংশ। আর ঐ অঙ্গ ধোয়া আবশ্যক নয়, যা সর্বাবস্থায় শরীরের ভিতরের অংশ। যেমন, চোখের ভিতরের অংশ।

قَوْلُهُ وَاعْلَمْ اَنَّ قَوْلَهُ اِلٰى مَا يَطَّهَّرُ الخ : শিক্ষার্থীর জন্য জানা উচিত যে, اِلٰى مَا يَطَّهَّرُ বাক্যটি مَا خَرَجَ -এর সাথে সম্পৃক্ত, سَالَ -এর সাথে নয়। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, এখানে اِلٰى مَا يَطَّهَّرُ বাক্যটির সম্পর্ক তিনটি শব্দের সাথে হতে পারে–

১. এটি একটি উহ্য (مَحْذُوْف) শব্দের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। তখন عِبَارَةْ হবে–

نَاقِضُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ اَوْ مِنْ غَيْرِهٖ وَاَصْلًا اِلٰى مَا يَطَّهَّرُ اِنْ كَانَ نَجِسًا ـ

২. অথবা, এটি سَالَ -এর সাথে সম্পৃক্ত হবে, যা শারেহ (র.) رَدْ [খণ্ডন] করেছেন। কেননা, যদি ফিনকি দিয়ে বা টপকিয়ে রক্ত পড়ে, যা আমাদের নিকট অজু ভঙ্গকারী। অথচ ক্ষতস্থান থেকে প্রবাহিত হয় না কিংবা রক্তাক্ত হয় না, তাই এর সম্পর্কে سَالَ -এর সাথে না হয়ে مَا خَرَجَ -এর সাথে হওয়া আবশ্যক।

৩. এটি مَا خَرَجَ -এর সাথে সম্পৃক্ত হবে, যা শারেহ (র.)-এরও অভিমত।

وَالْقَيْءُ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ مَا خَرَجَ فَاَرَادَ اَنْ يَفْصِلَ اَنْوَاعَهٗ لِاَنَّ الْحُكْمَ مُخْتَلِفٌ فِيْهَا فَقَالَ دَمًا رَقِيْقًا اِنْ سَاوَى الْبُزَاقَ حَتّٰى اِذَا كَانَ الْبُزَاقُ اَكْثَرَ لَا يَنْقُضُ وَلَمَّا ذُكِرَ حُكْمُ الْمُسَاوَاةِ عُلِمَ حُكْمُ الْغَلَبَةِ بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى فَقَالُوْا اِذَا اَصْفَرَ الْبُزَاقُ مِنَ الدَّمِ فَلَا يَجِبُ الْوُضُوْءُ وَاِنْ اَحْمَرَ يَجِبُ .

অনুবাদ : বমি [এটি] গ্রন্থকারের কথা مَا خَرَجَ -এর উপর عَطْفٌ । গ্রন্থকার বমির প্রকারসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। কেননা, এর প্রকারসমূহের হুকুম বিভিন্ন। তাই তিনি বলেছেন, হালকা [কম] রক্ত যা থুথুর বরাবর হয়, [তবে এর দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাবে।] আর যদি রক্ত থেকে থুথু অধিক হয় তবে অজু ভঙ্গ হবে না। গ্রন্থকার যখন [রক্ত ও থুথু] বরাবরের হুকুম উল্লেখ করেছেন, তখন থুথু অধিক হওয়ার হুকুম তো আরো ভালোভাবে জানা হয়ে গেছে। ফকীহগণ বলেন, রক্তের কারণে যদি থুথু হলুদ বর্ণের হয়ে যায়, তবে [এ কারণে] অজু আবশ্যক হবে না। আর যদি [রক্তের কারণে] থুথু লাল বর্ণের হয়ে যায়, তবে [এ কারণে] অজু আবশ্যক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْقَيْءُ : বমি যদি মুখ ভরে হয় তবে এর দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাবে। মুখ ভরপুর হওয়ায় বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে, তাই এখানে উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। অনুরূপ বমির প্রকারও বিভিন্ন রয়েছে। ফলত গ্রন্থকারও ধারাবাহিকভাবে এর প্রত্যেক প্রকারকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম বর্ণনা করবেন।

قَوْلُهٗ اِذَا كَانَ الْبُزَاقُ اَكْثَرَ لَا يَنْقُضُ : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, শারেহ (র.)-এর উক্ত عِبَارَةٌ -এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, পেট থেকে বের হওয়া রক্ত ও মুখ থেকে বের হওয়া রক্তের মধ্যে পার্থক্য বুঝানো। আল্লামা যায়লায়ী (র.) شَرْحُ الْكَنْزِ -এর মধ্যে লেখেন, যে রক্ত স্ববলে [قُوَّةٌ এর সাথে] বের হয় তা চাই পরিমাণে কম হোক বা বেশি হোক অজু ভঙ্গকারী হবে। এর কারণ হচ্ছে যে, তা স্ববলে বের হয়। যেমন, পেট থেকে বের হওয়া রক্ত। কেননা, তা পেট থেকে বের হয়ে আসে স্ববলে, অতঃপর তা থুথুর সঙ্গে এসে মিশে যায়। পক্ষান্তরে যে রক্ত স্ববলে বের হয় না; বরং অন্যের সাহায্যে বের হয়, যেমন– মুখ থেকে বের হওয়া রক্ত, তা স্ববলে বের হয় না; বরং থুথুর সাহায্যে বা বলে বের হয়। তাই তা ততক্ষণ পর্যন্ত অজু ভঙ্গকারী হবে না যতক্ষণ তা থুথুর সমপরিমাণ বা অধিক না হবে। আর যদি মাথা থেকে নাকের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসে তবে তা কম হোক চাই বেশি হোক ঐ স্থান পর্যন্ত যদি চলে আসে, যা অজু বা গোসলে পবিত্র করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তবে অজু ভেঙ্গে যাবে।

শারেহ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, রক্তের কারণে যদি থুথু হলুদ বর্ণের হয়ে যায়, তবে অজু করা আবশ্যক নয়। অর্থাৎ এর দ্বারা অজু ভাঙ্গবে না। আর যদি রক্তের কারণে থুথু লাল বর্ণের হয়ে যায়, তবে অজু আবশ্যক। অর্থাৎ এর দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাবে।

ثُمَّ عَطَفَ عَلٰى قَوْلِهٖ دَمًا أَوْ مِرَّةً اَوْ طَعَامًا اَوْ مَاءً او عَلَقًا اِنْ كَانَ مِلَأَ الْفَمِ لَا بَلْغَمًا اَصْلًا سَوَاءٌ كَانَ نَازِلًا مِنَ الرَّأْسِ اَوْ صَاعِدًا مِنَ الْجَوْفِ وَسَوَاءٌ كَانَ قَلِيْلًا اَوْ كَثِيْرًا لِاَنَّهٗ لِلُزُوْجَتِهٖ لَا يَتَدَاخِلُهُ النَّجَاسَةُ وَيَنْقُضُ صَاعِدُهٗ مِلْءَ الْفَمِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لٰكِنَّ النَّازِلَ مِنَ الرَّأْسِ لَايَنْقُضُ عِنْدَهٗ اَيْضًا وَهُوَ يَعْتَبِرُ الْاِتِّحَادَ فِى الْمَجْلِسِ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) فِى السَّبَبِ فَيُجْمَعُ مَا قَاءَ قَلِيْلًا قَلِيْلًا فَقَوْلُهٗ وَهُوَ يَعْتَبِرُ الضَّمِيْرَ يَرْجِعُ اِلٰى اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَهٰذَا اِبْتِدَاءُ مَسْاَلَةٍ صُوْرَتُهَا اِذَا قَاءَ قَلِيْلًا قَلِيْلًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَبْلُغُ مِلْءَ الْفَمِ فَاَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يَعْتَبِرُ اِتِّحَادَ الْمَجْلِسِ اَىْ اِذَا كَانَ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ يُجْمَعُ فَيَكُوْنُ نَاقِضًا وَمُحَمَّدٌ (رحـ) يَعْتَبِرُ اِتِّحَادَ السَّبَبِ وَهُوَ الْغَثْيَانُ فَاِنْ كَانَ بِغَثْيَانٍ وَاحِدٍ يُجْمَعُ فَيَكُوْنُ نَاقِضًا فَحَصَلَ اَرْبَعُ صُوَرٍ اِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ وَالْغَثْيَانِ فَيُجْمَعُ اِتِّفَاقًا وَاخْتِلَافُهُمَا فَلَا يُجْمَعُ اِتِّفَاقًا وَاتِّحَادُ الْمَجْلِسِ مَعَ اِخْتِلَافِ الْغَثْيَانِ فَيُجْمَعُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رحـ) وَاخْتِلَافُ الْمَجْلِسِ مَعَ اِتِّحَادِ الْغَثْيَانِ فَيُجْمَعُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) ـ

অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার পূর্বের কথা دَمًا -এর উপর عَطْف করে বলেছেন, অথবা পিত্ত, অথবা খাদ্য, অথবা পানি, কিংবা জমাট রক্ত যদি মুখ ভরে বের হয় [তবে অজু ভেঙ্গে যাবে]। কফ কোনো অবস্থায়ই [অজু ভঙ্গের কারণ] নয়। চাই উক্ত কফ মাথা থেকে নেমে আসুক কিংবা পেট থেকে উঠুক এবং চাই তা কম হোক কিংবা বেশি হোক। কেননা, কফ [স্বয়ং] আঠাযুক্ত [পিচ্ছিলা] হওয়ার কারণে এর সঙ্গে নাপাকীর মিশ্রণ হয় না। [পেট থেকে] উত্থিত কফ যদি মুখ ভরে [বের] হয় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তা অজু ভঙ্গকারী হবে। কিন্তু মাথা থেকে অবতরণকারী কফ তাঁর নিকটও অজু ভঙ্গের কারণ নয়। তিনি [ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)] إِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ [তথা এক বৈঠক]-এর إِعْتِبَارْ করেন এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) إِتِّحَادُ السَّبَبِ [বমির বেগ এক হওয়া] -এর [إعتبار করেন]। অতএব, যে বমি কম কম করে [কয়েকবার] করা হয়েছে তা একত্রিত করা হবে। গ্রন্থকারের বক্তব্য وَهُوَ يَعْتَبِرُ -এর هُوَ যমীর (ضَمِيْر) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দিকে ফিরবে। এটি একটি নতুন মাসআলা [যার পূর্বের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই]। এর صُوْرَةٌ হচ্ছে, যদি কেউ কম কম করে [কয়েকবার] এমনভাবে বমি করে যা একত্রিত করলে মুখ ভরপুর পরিমাণ হয় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এক বৈঠকের إِعْتِبَارْ করেন। অর্থাৎ একই বৈঠকের মধ্যে যদি [কয়েকবার বমি] হয় তবে তা একত্রিত করা হবে এবং [মুখ ভরপুর পরিমাণ হলে] তা অজু ভঙ্গকারী হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) কারণ (سَبَبْ) এক হওয়ার إِعْتِبَارْ করেন। আর তা হচ্ছে, বমির ভাব। অতএব, এক বমির ভাবে যদি কয়েকবার বমি হয় তবে তা একত্রিত করা হবে এবং [মুখ ভরপুর পরিমাণ হলে] তা অজু ভঙ্গকারী হবে।

অতএব, এখানে মোট চার صُوْرَةٌ বের হচ্ছে। ১. বৈঠক এক এবং বমির ভাবও এক। তবে [উভয়ের] সম্মতিক্রমে তা একত্রিত করা হবে। ২. বৈঠক বিভিন্ন এবং বমির ভাবও বিভিন্ন। তবে [উভয়ের] সম্মতিক্রমে তা একত্রিত করা হবে না। ৩. বৈঠক এক, কিন্তু বমির ভাব বিভিন্ন। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তা একত্রিত করা হবে; ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট নয়। ৪. বৈঠক বিভিন্ন; কিন্তু বমির ভাব এক। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট তা একত্রিত করা হবে; ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أَوْ طَعَامًا : খাদ্য যদি বমি করে তবে অজু ভেঙ্গে যাবে। চাই খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বমি করুক কিংবা খাওয়ার কিছু পরে করুক। হাসান (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, খানা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি বমি করে এবং খানা এখনও পরিবর্তিত না হয়, তবে তা অজু ভঙ্গকারী নয়।

তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ হচ্ছে, এর সঙ্গে নাপাকী মিশ্রিত হয়ে গেছে, তাই তা নাপাক এবং এর দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু কফ যদি মুখ ভরেও হয়, তবে এর দ্বারা অজু ভাঙ্গবে না। কারণ, তা মূলত পাক।

قَوْلُهُ أَوْ عَلَقًا : اَلْعَلَقُ অর্থ– জমাট রক্ত। যদি এ রক্ত প্রবহমান হয়, তবে তা কম হলেও অজু ভঙ্গের কারণ হবে। আর যদি তা অপ্রবহমান হয় তবে তা মুখ ভরপুর পরিমাণ হলে অজু ভঙ্গের কারণ হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, জমাট রক্তও বমিরই একটি প্রকার।

قَوْلُهُ لِلُزُوْجَتِهِ : لِزُوْجَةٍ শব্দের অর্থ– "আঠা"। কফ গাঢ় এবং আঠাযুক্ত হওয়ার কারণে তা নাপাকীর সঙ্গে মিশ্রিত হয় না।

قَوْلُهُ وَهُوَ يَعْتَبِرُ الْاِتِّحَادَ فِي الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, কম কম করে করা কয়েকবারের বমিকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে মজলিস [বৈঠক] এক হওয়া শর্ত। যেমনটি সিজদায়ে তিলাওয়াত ও বেচাকেনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং এক বৈঠকে করা কয়েকবারের বমিকে একত্রিত করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, سَبَبٌ [কারণ] হিসেবে হুকুমকে প্রয়োগ করা হয়। অতএব, কারণ এক হলে হুকুমও এক হয়; কারণ বিভিন্ন হলে হুকুমও বিভিন্ন হয়। আর বমির কারণ হচ্ছে, বমির ভাব। তাই বমির ভাব যদি এক হয়, তবে কয়েকবারের বমিকে একত্রিত করা হবে। আর বমির ভাব যদি একাধিক হয়, তবে তার একাধিক ভাবে কৃত বমিকে একত্রিত করা হবে না।

قَوْلُهُ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) يَعْتَبِرُ اِتِّحَادَ السَّبَبِ الخ : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় صَاحِبُ الْكَنْزِ (رحـ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত অধিক সহীহ। কেননা, মূলত أَسْبَابٌ হিসেবে أَحْكَامٌ বর্তায়। তবে কিছু কিছু প্রক্রিয়ায় জরুরতের কারণে سَبَبٌ-কে বর্জন করা হয়। যেমন, سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ-এর ক্ষেত্রে যদি سَبَبٌ-এর اِعْتِبَارٌ করা হয় তবে تَدَاخُلٌ সম্ভব হয় না। অনুরূপ বেচাকেনার ক্ষেত্রে إِيْجَابٌ ও قَبُوْلٌ-এর حَرَجٌ [খারাবি] -কে দূর করার জন্য مَجْلِسٌ [বৈঠক] এক হওয়ার اِعْتِبَارٌ করা হয়েছে; سَبَبٌ-এর اِعْتِبَارٌ করা হয়নি।

قَوْلُهُ فَحَصَلَ أَرْبَعُ صُوَرٍ الخ : দুই ইমাম দুই বিষয়ের اِعْتِبَارٌ করার কারণে এখানে চারটি صُوْرَةٌ বের হয়ে আসে। তন্মধ্যে দুটি مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا, আর দুটি مُخْتَلَفٌ فِيْهِمَا। প্রথম صُوْرَةٌ-এ যেহেতু مَجْلِسٌ-ও এক سَبَبٌ-ও এক, তাই উভয়ের নিকট মূল কারণ পাওয়া গেছে, ফলত তাঁদের উভয়ের মতে مُتَفَرِّقَةٌ বমিকে একত্রিত করা হবে। দ্বিতীয় صُوْرَةٌ-এ যেহেতু مَجْلِسٌ এবং سَبَبٌ উভয়টিই مُخْتَلَفٌ তাই তাঁদের কারো নিকটই মূল কারণ পাওয়া যায়নি। ফলত তাঁদের কারো মতেই مُتَفَرِّقَةٌ বমিকে একত্রিত করা হবে না। তৃতীয় صُوْرَةٌ-এ দুটির একটি পাওয়া যায় এবং অন্যটি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ مَجْلِسٌ এক হওয়াকে একত্রিত করা হবে। চতুর্থ صُوْرَةٌ টি তৃতীয় صُوْرَةٌ-এর পরিপন্থি। অর্থাৎ চতুর্থ صُوْرَةٌ-এর মধ্যেও একটি শর্ত তথা سَبَبٌ এক হওয়ার শর্ত এবং مَجْلِسٌ এক হওয়ার শর্ত পাওয়া যায় না। তাই যিনি سَبَبٌ এক হওয়ার শর্তারোপ করেন শুধু তাঁর মতে مُتَفَرِّقَةٌ বমিকে একত্রিত করা হবে।

وَمَا لَيْسَ بِحَدَثٍ لَيْسَ بِنَجَسٍ بِكَسْرِ الْجِيْمِ فَيَلْزَمُ مِنْ اِنْتِفَاءِ كَوْنِهٖ حَدَثًا اِنْتِفَاءَ كَوْنِهٖ نَجِسًا فَالدَّمُ اِذَا لَمْ يَسِلْ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ طَاهِرٌ وَكَذَا الْقَئُ الْقَلِيْلُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) فِىْ غَيْرِ رِوَايَةِ الْاُصُوْلِ اَنَّهٗ نَجِسٌ لِاَنَّهٗ لَا اَثَرَ لِلسَّيْلَانِ فِى النَّجَاسَةِ فَاِذَا كَانَ السَّائِلُ نَجِسًا فَغَيْرُ السَّائِلِ يَكُوْنُ كَذٰلِكَ وَلَنَا قَوْلُهٗ تَعَالٰى قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْمَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا اِلٰى قَوْلِهٖ اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا فَغَيْرُ الْمَسْفُوْحِ لَا يَكُوْنُ مُحَرَّمًا فَلَا يَكُوْنُ نَجِسًا وَالدَّمُ الَّذِىْ لَمْ يَسِلْ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ دَمٌ غَيْرُ مَسْفُوْحٍ فَلَا يَكُوْنُ نَجِسًا فَاِنْ قِيْلَ هٰذَا فِيْمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهٗ فَظَاهِرٌ وَاَمَّا فِيْمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهٗ كَالْاٰدَمِىِّ فَغَيْرُ الْمَسْفُوْحِ حَرَامٌ اَيْضًا فَلَا يُمْكِنُ الْاِسْتِدْلَالُ بِحِلِّهٖ عَلٰى طَهَارَتِهٖ قُلْتُ لَمَّا حَكَمَ بِحُرْمَةِ الْمَسْفُوْحِ بَقِىَ غَيْرُ الْمَسْفُوْحِ عَلٰى اَصْلِهٖ وَهُوَ الْحِلُّ وَيَلْزَمُ مِنْهُ الطَّهَارَةُ سَوَاءٌ كَانَ فِيْمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهٗ اَوْ لَا لِاِطْلَاقِ النَّصِّ ثُمَّ حُرْمَةُ غَيْرِ الْمَسْفُوْحِ فِى الْاٰدَمِىِّ بِنَاءً عَلٰى حُرْمَةِ لَحْمِهٖ وَحُرْمَةُ لَحْمِهٖ لَا تُوْجِبُ نَجَاسَتَهٗ اِذْ هٰذِهِ الْحُرْمَةُ لِلْكَرَامَةِ لَا لِلنَّجَاسَةِ فَغَيْرُ الْمَسْفُوْحِ فِى الْاٰدَمِىِّ يَكُوْنُ عَلٰى طَهَارَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ مَعَ كَوْنِهٖ مُحَرَّمًا .

অনুবাদ : যা অপবিত্র নয়, তা নাপাকও নয়। نَجِسٌ শব্দটি بِكَسْرِ الْجِيْمِ হবে। সুতরাং অপবিত্র না হওয়ার দ্বারা নাপাক না হওয়া আবশ্যক। অতএব, ঐ রক্ত যা ক্ষতস্থানের মুখ থেকে প্রবাহিত হয়নি তা পবিত্র। অনুরূপ স্বল্প বমিও [পবিত্র]। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে একটি বিরল বর্ণনা রয়েছে যে, "তা নাপাক"। কেননা, নাপাকের মধ্যে প্রবাহের কোনো প্রভাব নেই। তাই যখন প্রবাহমান [বস্তু] নাপাক তখন অপ্রবহমান [বস্তু]-ও নাপাক। আমাদের দলিল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী– قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْمَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا . اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا পর্যন্ত। [যার মর্ম, তুমি বল ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে, তাতে কোনো আহারকারীর জন্য কোনো বস্তু হারাম করা হয়েছে এমন কিছু আমি পাইনি, তবে মৃতজন্তু ও প্রবাহিত রক্ত ব্যতীত। –[সূরা আন'আম ১৪৫] তাই অপ্রবাহিত রক্ত হারাম হবে না, সুতরাং নাপাকও হবে না। ঐ রক্ত যা ক্ষতস্থানের মুখ থেকে প্রবাহিত হয় না, তা دَمٌ غَيْرُ مَسْفُوْحٍ [অপ্রবাহিত রক্ত]। অতএব, তা নাপাক নয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, উক্ত দলিল مَاكُوْلُ اللَّحْمِ [যার গোশত খাওয়া হালাল]-এর ক্ষেত্রে তো স্পষ্ট, কিন্তু غَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ [যার গোশত খাওয়া হালাল নয়]-এর ক্ষেত্রে [স্পষ্ট নয়]। যেমন, মানুষ। সুতরাং [মানুষের] অপ্রবাহিত রক্তও হারাম। তাই এখানে হালাল হওয়ার দ্বারা তাহারাত [পবিত্রতা] -এর উপর দলিল পেশ করা সম্ভব নয়। [এর উত্তরে] আমি বলব, যখন প্রবাহিত রক্তের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, তখন অপ্রবাহিত রক্ত তার أَصْلٌ [মূল] -এর উপর স্থির রয়েছে। আর সে أَصْلٌ বা মূল হচ্ছে حِلَّةٌ [হালাল হওয়া] এবং সে

হালাল-এর দ্বারা পবিত্র হওয়া আবশ্যক হয়। চাই সে অপ্রবাহিত রক্ত مَاكُوْلُ اللَّحْمِ -এর হোক কিংবা غَيْرُ مَاكُوْلُ اللَّحْم -এর হোক। কারণ, নস [আয়াত] مُطْلَقٌ । অতঃপর মানুষের অপ্রবাহিত রক্ত হারাম হওয়ার ভিত্তি তার গোশত হারাম হওয়ার উপর। আর মানুষের গোশতের حُرْمَةٌ [হারাম হওয়া] তাকে নাপাক হওয়া আবশ্যক করে না। কেননা, তার এ حُرْمَةٌ তার সম্মানার্থে, নাপাক হওয়ার কারণে নয়। অতএব, মানুষের অপ্রবাহিত রক্ত হারাম হওয়া সত্ত্বেও তা মূল পবিত্রতার উপরই থেকে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا لَيْسَ بِحَدَثٍ لَيْسَ الخ : অজু ভঙ্গের কারণসমূহের বিবরণে একটি প্রসিদ্ধ قَاعِدَةٌ [নিয়ম] হচ্ছে- مَا لَيْسَ بِحَدَثٍ كُلُّ مَا لَيْسَ "যা অজু ভঙ্গকারী নয় তা অপবিত্রও নয়।" এ স্থানে কেউ কেউ كُلٌّ শব্দ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ لَيْسَ بِنَجِسٍ কেউ শুধু مَا শব্দ উল্লেখ করেছেন। যেমনটি করেছেন বেকায়া গ্রন্থকার (র.)। উভয় عِبَارَةٌ -এর- صُوْرَةٌ بِحَدَثٍ لَيْسَ بِنَجِسٍ -এর উদ্দেশ্য একই। কেননা, مَا শব্দটি عَامٌ [ব্যাপক]। সারমর্ম হচ্ছে, যা حَدَثٌ নয় তথা অজু ভঙ্গকারী নয় তা নাপাকও নয়। অর্থাৎ যদি তা কাপড় বা শরীরে লেগে যায় তবে তা ধোয়া আবশ্যক নয়; বরং ধোয়া ছাড়াই নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا الْقَيْءُ الْقَلِيْلُ : স্বল্প বমি হলো, যা মুখ ভরপুর পরিমাণ হয় না কিংবা নাপাক হয় না। এর দ্বারা ঐ বমি বাদ হয়েছে যা স্বয়ং নাপাক। যেমন, পেশাব পায়খানার বমি। কেননা, এর মূলই নাপাক।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلسَّيَلَانِ الخ : এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) বিরল রেওয়ায়েতের স্বপক্ষে দলিল যে, যা নাপাক তা তো মূলেই নাপাক। এতে প্রবাহিত হওয়ার কোনো দখল [প্রভাব] নেই। অতএব, যেমনিভাবে প্রবাহিত হওয়ার صُوْرَةٌ -এ সর্বসম্মতিক্রমে তা নাপাক, তেমনি প্রবাহিত না হওয়ার صُوْرَةٌ [সুরতে]ও তা নাপাক। কেননা, ذَاتٌ -এর দিক থেকে কমবেশ উভয়টিই বরাবর। যদিও سَيَلَانٌ [প্রবাহ]-এর দিক থেকে তা বিভিন্ন। এর উত্তর এই যে, শরিয়ত যেখানে نَجِسٌ [নাপাকী]-কে অজু ভঙ্গের কারণ বলেছে সেখানেই উক্ত নাপাকীটা নাপাকী হওয়া হিসেবে سَيَلَانٌ [প্রবাহ]-এর اِعْتِبَارٌ করেছে। অতএব, উক্ত নাপাকীটা নাপাক হওয়ার জন্য سَيَلَانٌ শর্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالٰى قُلْ لَّا أَجِدُ الخ : এটি মূলত ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর اِسْتِدْلَالٌ -এর খণ্ডন। তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী-

قُلْ لَّا أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ .

এ আয়াত দ্বারা চার জিনিস হারাম প্রমাণিত হয়- ১. মৃত জন্তু, ২. প্রবাহিত রক্ত, ৩. শূকরের গোশত, ৪. যে প্রাণী غَيْرُ اللّٰهِ -এর নৈকট্য অর্জনের জন্য জবাই করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় অপ্রবাহিত রক্ত হারাম নয়। আর যখন তা প্রমাণিত হয়েছে তখন এটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, তা নাপাকও নয়। কেননা, যদি নাপাক হতো তবে তা হারাম হতো। কারণ, প্রত্যেক নাপাক বস্তুই হারাম হয়।

قَوْلُهُ فَاِنْ قِيْلَ هٰذَا فِيْمَا يُؤْكَلُ الخ : ইতঃপূর্বে কুরআনের আয়াত قُلْ لَّا أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا দ্বারা "دَمٌ غَيْرُ مَسْفُوْحٍ হারাম নয়, তাই তা নাপাকও নয়" -এর উপর اِسْتِدْلَالٌ করা হয়েছে। শারেহ (র.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, উক্ত আয়াত দ্বারা مَاكُوْلُ اللَّحْمِ [যার গোশত খাওয়া হালাল]-এর "دَمٌ غَيْرُ مَسْفُوْحٍ হারাম নয়, তাই তা নাপাকও নয়" -এর

উপর তো إِسْتِدْلَالْ সহীহ। কারণ, এর গোশত হালাল, তাই তা طَاهِرْ [পবিত্র]। যদি তা নাপাক হতো তবে এর গোশতও হারাম হতো। কিন্তু উক্ত আয়াত غَيْرُ مَاكُوْلُ اللَّحْمِ [যার গোশত খাওয়া হালাল নয়] -এর دَمْ غَيْرُ مَسْفُوْحٌ পবিত্র হওয়ার উপর اِسْتِدْلَالْ করা সহীহ নয়। যেমন, মানুষ। কারণ, মানুষের دَمْ غَيْرُ مَسْفُوْحٌ -ও হারাম এবং গোশতও হারাম। অথচ এখানে মানুষের শরীর থেকে নির্গত دَمْ غَيْرُ مَسْفُوْحٌ সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قُلْتُ لَمَّا حُكِمَ بِحُرْمَةِ الخ : এটি পূর্বোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর। উত্তরের সারমর্ম হচ্ছে, আয়াতে مُطْلَقًا - دَمْ غَيْرُ مَسْفُوْحٌ -কে হারাম করা হয়েছে, مَاكُوْلُ اللَّحْمِ ও غَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ -এর কোনো قَيْد [শর্ত] লাগানো হয়নি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, دَمْ غَيْرُ مَسْفُوْحٌ চাই مَاكُوْلُ اللَّحْمِ প্রাণীর হোক কিংবা غَيْرُ مَاكُوْلُ اللَّحْمِ -এর হোক সর্বাবস্থায় তা হারাম এবং এর দ্বারা তাও প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে, دَمْ غَيْرُ مَسْفُوْحٌ চাই مَاكُوْلُ اللَّحْمِ -এর হোক কিংবা غَيْرُ مَاكُوْلُ اللَّحْمِ -এর হোক مُطْلَقًا তা হালাল এবং পবিত্র।

قَوْلُهُ بَقِيَ غَيْرُ الْمَسْفُوْحِ عَلٰى أَصْلِهِ : أُصُوْلِيِّيْنَ -এর একটি মূলনীতি হচ্ছে, "কোনো একটি বিষয়কে একটি হুকুমের সঙ্গে خَاصْ করার দ্বারা এর বিপরীত বিষয় থেকে উক্ত হুকুমকে নিষিদ্ধ বা বিলুপ্ত করা হয় না।" অতএব, আয়াতে دَمْ مَسْفُوْحٌ -কে হারাম সাব্যস্ত করার দ্বারা এর বিপরীত রক্ত তথা دَمْ غَيْرُ مَسْفُوْحٌ হারাম হওয়া ও না হওয়া কোনোটিই প্রমাণিত হয় না। কারণ, হারাম হওয়ার হুকুমকে دَمْ غَيْرُ مَسْفُوْحٌ থেকে বিলুপ্ত করা হয়নি; বরং এ বিষয়ে আয়াত চুপ। তবে دَمْ غَيْرُ مَسْفُوْحٌ তার أَصْل [মূল] -এর উপর রয়ে গেছে। আর এর أَصْل [মূল] হলো হালাল। কারণ, তা হারাম হওয়ার উপর কোনো আয়াত [নস] নাজিল হয়নি। অনুরূপ সমস্ত বস্তুর أَصْل -ই হলো হালাল ও মুবাহ, যতক্ষণ পর্যন্ত তা غَيْرُ حَلَالْ ও غَيْرُ مُبَاحْ হওয়ার উপর দলিল না থাকবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ حُرْمَةُ غَيْرِ الْمَسْفُوْحِ فِى الْاٰدَمِىِّ الخ : এটি একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ [উহ্য প্রশ্ন] -এর جَوَابْ [উত্তর]। **প্রশ্ন :** প্রশ্নটি হচ্ছে যে, دَمْ مَسْفُوْحٌ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে যদিও مُطْلَقًا নস [আয়াত] রয়েছে, কিন্তু এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষের রক্ত চাই مَسْفُوْحٌ হোক কিংবা غَيْرُ مَسْفُوْحٌ হোক مُطْلَقًا তা হারাম। তাই তার دَمْ مَسْفُوْحٌ যেমন নাপাক, তেমনি دَمْ غَيْرُ مَسْفُوْحٌ ও নাপাক।

উত্তর : এর উত্তর এভাবে যে, حُرْمَةٌ [হারাম] দু প্রকার–

১. ঐ حُرْمَةٌ [হারাম] যা নাপাক (نَجَاسَةٌ) হওয়ার কারণে حُرْمَةٌ হয়। যেমন, মদ-শূকর-এর حُرْمَةٌ। [তা নাপাক হওয়ার কারণে হারাম হয়েছে।] এ প্রকার نَجَاسَةٌ [নাপাক হওয়া] -এর উপর বুঝাবে।

২. ঐ حُرْمَةٌ যা نَجَاسَةً হওয়ার কারণে হারাম হয়নি; বরং كَرَامَةٌ [সম্মান প্রদর্শন]-এর কারণে হারাম হয়। যেমন, মানুষের রক্ত হারাম হয়েছে তার সম্মানার্থে। মূলত মানুষের مَسْفُوْحٌ ও غَيْرُ مَسْفُوْحٌ রক্ত হারাম হওয়ার ভিত্তি তার গোশত হারাম হওয়ার উপর। তার গোশত নাপাক হওয়ার কারণে হারাম হয়নি। কেননা, মানুষ নাপাক হতে পারে না; বরং আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ার কারণে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা উপকার হাসিল করা شَرَافَةً ও إِحْتِرَامًا হারাম। এর দ্বারা যদি উপকার হাসিলের অনুমতি দেওয়া হতো, তবে তাকে তুচ্ছ করা হতো।

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْفُوْحِ وَغَيْرِهِ مَبْنِيٌّ عَلٰى حِكْمَةٍ غَامِضَةٍ وَهِيَ اَنَّ غَيْرَ الْمَسْفُوْحِ دَمٌ اِنْتَقَلَ عَنِ الْعُرُوْقِ وَانْفَصَلَ عَنِ النَّجَاسَاتِ وَحَصَلَ لَهٗ هَضْمٌ اُخْرٰ فِى الْاَعْضَاءِ فَصَارَ مُسْتَعِدًّا لِاَنْ يَصِيْرَ عَضْوًا فَاَخَذَ طَبِيْعَةَ الْعُضْوِ فَاَعْطَاهُ الشَّرْعُ حُكْمَهٗ بِخِلَافِ دَمِ الْعُرُوْقِ فَاِنَّهٗ اِذَا سَالَ عَنْ رَأْسِ الْجَرْحِ عُلِمَ اَنَّهٗ دَمٌ اِنْتَقَلَ مِنَ الْعُرُوْقِ فِىْ هٰذِهِ السَّاعَةِ وَهُوَ الدَّمُ النَّجَسُ اَمَّا اِذَا لَمْ يَسِلْ عُلِمَ اَنَّهٗ دَمُ الْعُضْوِ هٰذَا فِى الدَّمِ وَاَمَّا فِى الْقَئِ فَالْقَلِيْلُ هُوَ الْمَاءُ الَّذِىْ كَانَ فِىْ اَعْلَى الْمِعْدَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ فَحُكْمُهٗ حُكْمُ الرِّيْقِ ـ

অনুবাদ : প্রবাহিত [রক্ত] ও অপ্রবাহিত [রক্ত]-এর মাঝে পার্থক্য একটি সূক্ষ্ম হিকমতের উপর নির্ভরশীল। তা হচ্ছে, অপ্রবাহিত রক্ত এমন রক্ত, যা রগ থেকে বের হয়ে নাপাকী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং এর অন্যান্য অঙ্গে হজমও হাসিল হয়ে গেছে। অতএব, উক্ত রক্ত অঙ্গ হওয়ার যোগ্য হয়ে গেছে এবং অঙ্গের প্রকৃতি ধারণ করে ফেলেছে। সুতরাং শরিয়তও এটাকে অঙ্গের হুকুম দিয়েছে। পক্ষান্তরে রগের রক্ত যখন ক্ষতস্থানের মাথা থেকে বের হয়ে আসে তখন বুঝা যায় যে, তা এমন রক্ত, যা এইমাত্র রগ থেকে বের হয়ে এসেছে এবং তা নাপাক রক্ত। তবে বমির বিবরণ হচ্ছে, যদি বমি কম হয় তবে তা ঐ পানি যা পাকস্থলীর উপরাংশে থাকে, আর তা নাপাকের স্থল নয়। তাই এর হুকুম থুথুর হুকুমের ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهِيَ اَنَّ غَيْرَ الْمَسْفُوْحِ دَمٌ الخ : এখানে প্রথমে هَضْم [হজম] -এর সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। هَضْم বলা হয়, "একটি জিনিস অপর একটি জিনিসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তৃতীয় একটি জিনিস গঠিত হওয়াকে"।

উল্লেখ্য যে, ডাক্তারি পরামর্শ মোতাবেক هَضْم [হজম] পাঁচ প্রকার–

১. দাঁত দ্বারা চিবানো খাদ্য লালার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তৃতীয় একটি আকৃতি ধারণ করে।

২. দ্বিতীয় প্রকারের হজম পাকস্থলীতে হয়। যখন খাদ্য মুখ থেকে পাকস্থলীতে চলে আসে, তখন এর অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তন হয়ে যায়।

৩. তৃতীয় প্রকারের হজম এভাবে যে, যখন খাদ্য পাকস্থলীতে আসে, তখন তা পানির সঙ্গে মিশে তা পানীয় প্রকৃতির হয়ে যায়। এর একটি বিশেষ হালকা অংশ কলিজার দিকে যায়, যা পাকস্থলীর ডানদিকে থাকে। আর বাকি সমস্ত গাঢ় অংশ আঁতড়ির দিকে যায়, যা পরিশেষে-পায়খানা পেশাব হয়ে নিজ নিজ বাসস্থানে চলে যায় এবং পায়খানা-পেশাব হিসেবে সর্বশেষ বের হয়ে আসে।

৪. চতুর্থ প্রকারের হজম হচ্ছে, তৃতীয় হজমে খাদ্য চারটি خَلْطٌ [মিশ্রণ] -এ পরিণত হয়। ক. রক্ত, খ. কফ, পিত্ত, ঘ. কালো পানি। এর অধিকাংশই পেশাবের সঙ্গে বের হয়ে যায়। আর রক্ত অন্যান্য اَخْلَاطٌ [মিশ্রিত বস্তু]-এর সঙ্গে মিলে প্রয়োজন মোতাবেক রগে চলে যায়। রগে এর চতুর্থতম হজম হয়।

৫. পঞ্চম হজম হচ্ছে, তা রগে গিয়ে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়– ১. لَطِيْف [পাতলা] অংশ, ২. ثَقِيْل [গাঢ়] অংশ। لَطِيْف [পাতলা] অংশটি রগে হজম হয়ে রগ থেকে বের হয়ে চলে আসে এবং অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে মিলে যায়। সেখানে প্রত্যেক অঙ্গ নিজ নিজ অংশ নিয়ে নেয়। এখানে তা পঞ্চম হজম হয়। পরিশেষে রক্তের আকৃতি ধারণ করে অঙ্গে পরিণত হয়।

এখন জানার প্রয়োজন যে, শারেহ (র.) যে حِكْمَةً غَامِضَةً [সূক্ষ্ম হিকমত] উল্লেখ করেছেন এর সারমর্ম হচ্ছে, প্রবাহিত রক্ত (دَمٌ مَسْفُوحٌ) মূলত রগের রক্ত (دَمُ الْعُرُوْقِ)। আর তা نَجَاسَةٌ [নাপাকী]-এর সঙ্গে মিশ্রিত। তাই তা নিঃসন্দেহে নাপাক (نَجَسٌ)। পক্ষান্তরে دَمٌ غَيْرُ مَسْفُوحٍ [অপ্রবাহিত রক্ত] হচ্ছে, ঐ রক্ত যা হজম হয়েছে, রগ থেকে পৃথক হয়ে نَجَاسَةٌ [নাপাকী] থেকে দূর হয়ে গেছে এবং এর উপর এমন একটি হজম অতিবাহিত হয়েছে, যার দ্বারা তা স্বীয় আকৃতি ছেড়ে অঙ্গের আকৃতি ধারণ করে ফেলেছে। এহেন صُوْرَةٌ-এর উপরই শারেহ (র.) অঙ্গের হুকুম দিয়েছেন। অতএব, প্রবাহিত রক্ত نَجَسٌ [নাপাক] এবং অপ্রবাহিত রক্ত طَاهِرٌ [পবিত্র]।

قَوْلُهُ فَالْقَلِيْلُ هُوَ الْمَاءُ الَّذِىْ كَانَ الخ : প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, قَلِيْل [স্বল্প] শুধু পানির وَصْف নয়; বরং খানা, পিত্ত, কফ ইত্যাদির সঙ্গে قَلِيْل [স্বল্প] وَصْف হয়। তাই এখানে পানির সঙ্গে একে কেন খাস করেছেন?

উত্তর : এর উত্তরে হচ্ছে, هُوَ الْمَاءُ الَّذِىْ الخ এখানে 'কম পানি' বলার দ্বারা শুধু পানি বমির বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তা উদাহরণস্বরূপ পেশ করেছেন। অন্যথায় বমির অন্যান্য প্রকার তথা পিত্ত, খাদ্য, জমাট রক্ত, কফ ইত্যাদির সঙ্গেও قَلِيْل [স্বল্প] صِفَةٌ [সিফাত] টির প্রয়োগ হবে। অথবা এর উত্তর হচ্ছে, বমির সমস্ত প্রকারের মধ্যে পানি مُقَدَّمٌ [অগ্রে], তাই শুধু পানিকে উল্লেখ করেছেন।

কিংবা এর উত্তর হচ্ছে, হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর অভিমতকে খণ্ডন করার জন্য বিশেষভাবে পানিকে উল্লেখ করেছেন যে, পানি পান করার পর نَجَاسَةٌ [নাপাকী] -এর সঙ্গে তা মিলিত হওয়ার পূর্বে যদি [পানি] বমি করে, তবে তা অজু ভঙ্গকারী নয়। আর হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বলেন– এর দ্বারাও অজু ভেঙ্গে যাবে।

وَنَوْمُ مُضْطَجِعٍ وَمُتَّكِئٍ وَمُسْتَنِدٍ اِلٰى مَا لَوْ اُزِيْلَ لَسَقَطَ لَا غَيْرَ اَىْ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ نَوْمٌ غَيْرُ مَا ذُكِرَ وَهُوَ النَّوْمُ قَائِمًا اَوْ قَاعِدًا اَوْ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا وَالْاِغْمَاءُ وَالْجُنُوْنُ عَلٰى اَىِّ هَيْأَةٍ كَانَا وَيَدْخُلُ فِى الْاِغْمَاءِ السُّكْرُ وَحَدُّهُ هٰهُنَا اَنْ يَدْخُلَ فِىْ مَشْيِهٖ تَحَرُّكٌ وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَكَذَا فِى الْيَمِيْنِ حَتّٰى لَوْ حَلَفَ اَنَّهٗ سَكْرَانٌ يُعْتَبَرُ هٰذَا الْحَدُّ وَقَهْقَهَةُ مُصَلٍّ بَالِغٍ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ حَتّٰى لَا يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ قَهْقَهَةُ الصَّبِىِّ وَشَرْطُهٗ اَنْ يَكُوْنَ فِى الصَّلٰوةِ ذَاتِ رُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ حَتّٰى لَوْ قَهْقَهَهٗ فِىْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ اَوْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ بَلْ يَبْطُلُ مَا قَهْقَهَهٗ فِيْهِ وَاِنَّمَا شُرِطَ مَا ذُكِرَ لِاَنَّ اِنْتِقَاضَ الْوُضُوْءِ بِهَا ثَبَتَ بِالْحَدِيْثِ عَلٰى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيُقْتَصَرُ عَلٰى مَوْرِدِهٖ ثُمَّ الْقَهْقَهَةُ اِنَّمَا تَنْقُضُ الْوُضُوْءَ اِذَا كَانَ يَقْظَانَ حَتّٰى لَوْ نَامَ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى اَىِّ هَيْأَةٍ فَقَهْقَهَتُهٗ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوْءُ بِالْقَهْقَهَةِ وَحَدُّهَا اَنْ تَكُوْنَ مَسْمُوْعَةً لَهٗ وَلِجِيْرَانِهٖ وَالضِّحْكُ اَنْ يَكُوْنَ مَسْمُوْعًا لَهٗ لَا لِجِيْرَانِهٖ وَهُوَ يُبْطِلُ الصَّلٰوةَ لَا الْوُضُوْءَ وَالتَّبَسُّمُ اَنْ لَا يَكُوْنَ مَسْمُوْعًا اَصْلًا وَهُوَ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا .

অনুবাদ : [অজু ভঙ্গের কারণ,] কাত হয়ে শয়নকারীর ঘুম, হেলানদাতার [ঘুম] এবং এমন কিছুতে ঠেসদাতার [ঘুম] যা সরিয়ে দিলে সে পড়ে যাবে। অন্য প্রক্রিয়ার [ঘুম] নয়। অর্থাৎ উল্লিখিত প্রক্রিয়ার ঘুম ছাড়া অন্য কোনো প্রক্রিয়ার ঘুম অজু ভঙ্গের কারণ নয়। যেমন, দাঁড়িয়ে কিংবা বসে কিংবা রুকু অবস্থায় কিংবা সিজদা অবস্থায় ঘুমানো। আর [অজু ভঙ্গের কারণ,] সংজ্ঞাহীনতা ও উম্মত্ততা। এ দুটি যে অবস্থায়ই হোক না কেন [অজু ভঙ্গের কারণ]। সংজ্ঞাহীনতার মধ্যে নেশা দাখিল। এখানে নেশার পরিমাণ হচ্ছে, চলার সময় হেলেদুলে পড়া। এটিই বিশুদ্ধ [মত]। অনুরূপ কসমের অধ্যায়েও, যদি সে শপথ করে বলে যে, সে নেশাগ্রস্ত [মাতাল], তবে এটিই গ্রহণযোগ্য হদ্দ বা পরিমাণ। আর [অজু ভঙ্গের কারণ,] রুকু-সিজদাবিশিষ্ট নামাজে প্রাপ্তবয়স্ক নামাজির অট্টহাসি। তবে [অপ্রাপ্তবয়স্ক] বালকের অট্টহাসি অজু ভঙ্গের কারণ নয়। অট্টহাসি অজু ভঙ্গের কারণ হাওয়ার জন্য শর্ত হলো, তা রুকু-সিজদাবিশিষ্ট নামাজে হতে হবে। তাই যদি কেউ জানাজা নামাজে কিংবা সিজদায়ে তিলাওয়াতে অট্টহাসি দেয়, তবে তা অজু ভঙ্গের কারণ হবে না; বরং যে আমলে থাকাবস্থায় অট্টহাসি দিল তা বাতিল হয়ে যাবে। উল্লিখিত শর্তসমূহ আরোপ করা হয়েছে এজন্য যে, অট্টহাসি দ্বারা অজু ভঙ্গ হয়ে যাওয়া একটি কিয়াসের পরিপন্থি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, তা নিজের স্থলে সীমাবদ্ধ থাকবে। অতঃপর অট্টহাসি তখনই অজু ভঙ্গের কারণ হবে, যখন নামাজি ব্যক্তি জাগ্রত থাকবে। এমনকি যদি কেউ নামাজে যে-কোনো অবস্থায় ঘুমিয়ে অট্টহাসি দেয় তবে তা অজু ভঙ্গের কারণ হবে না। ইমাম

শাফেয়ী (র.)-এর নিকট অট্টহাসি দ্বারা অজু ভাঙ্গবে না। অট্টহাসির পরিমাণ হচ্ছে, হাসির আওয়াজ সে নিজে শুনবে এবং তার পার্শ্ববর্তী মুসল্লিও শুনবে। আর ضَحْك হচ্ছে এমন হাসি, যার আওয়াজ সে [নিজে] শুনবে এবং পার্শ্ববর্তী মুসল্লি শুনবে না। আর ضِحْك [হাসি] নামাজকে বাতিল করে দেয়; অজুকে নয়। تَبَسُّمْ [মুচকি হাসি] হচ্ছে, যার আওয়াজ মোটেও শুনা যায় না এবং তা অজু ও নামাজের কোনোটিকেই ভঙ্গ করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَوْمُ مُضْطَجِعٍ وَمُتَّكِئٍ الخ : অজু ভঙ্গের কারণসমূহের একটি হলো, অজুকারী ব্যক্তি কাত হয়ে কিংবা হেলান দিয়ে কিংবা এমন কিছুতে ঠেসদাতার ঘুম যা সরিয়ে নিলে সে পড়ে যায়।

শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) লেখেন– যদি কাত হয়ে কিংবা এক নিতম্বের উপর ঠেস দিয়ে ঘুমায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে অজু ভেঙ্গে যাবে। আর যদি এমন কিছুতে হেলান দিয়ে ঘুমায় যে, তা সরিয়ে নিলে সে পড়ে যায় তবে এর দুটো সুরত হতে পারে। ক. যদি নিতম্ব ভূমি থেকে আলাদা হয়ে যায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে অজু ভেঙ্গে যাবে। খ. আর যদি ভূমি থেকে নিতম্ব আলাদা না হয় তবে ইমাম তাহাবী (র.) ও ইমাম কুদূরী (র.) লেখেন– অজু ভেঙ্গে যাবে। কেননা, এতে তার গ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে পড়ে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা, ভূমির উপর নিতম্ব লেগে থাকা বায়ু নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

উল্লেখ্য যে, ঘুম অজু ভঙ্গের কারণ হওয়ার জন্য শর্ত হলো– اِسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ গ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে যাওয়া। সুতরাং যে ঘুমেই اِسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ-এর সম্ভাবনা থাকবে তা-ই অজু ভঙ্গের কারণ হবে। কারণ, নবী ﷺ ও ঘুম অজু ভঙ্গকারী হওয়ার জন্য اِسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ-কে শর্ত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন–

اِنَّمَا الْوَضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَاِنَّهٗ اِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهٗ.

অর্থাৎ "অজু আবশ্যক ঐ ব্যক্তির উপর যে পার্শ্বে ভর দিয়ে ঘুমায়। কেননা, পার্শ্বের উপর ভর দিয়ে ঘুমালে তার গ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে যায়।" –[বায়হাকী শরীফ : ১/১২১]

তাই কাত হয়ে কিংবা হেলান দিয়ে ঘুমানোর মাঝে اِسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ-এর সম্ভাবনা থাকে। ফলত তা অজু ভঙ্গের কারণ। অনুরূপ এমন কিছুতে ঠেস দিয়ে ঘুমানো যা সরিয়ে নিলে সে পড়ে যায়, এতেও اِسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ পাওয়া যায়। কেননা, সে ঠেস দেওয়ার দরুন পড়ে যায় না। তাই নিতম্বসহ সকল গ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে যায়। অতএব, উক্ত ঘুমও অজু ভঙ্গের কারণ। উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল مُطْلَقْ ঘুম অজু ভঙ্গের কারণ নয়; বরং যার মধ্যে اِسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ-এর সম্ভাবনা থাকে তা-ই শুধু অজু ভঙ্গের কারণ। তাছাড়া উল্লিখিত তিন প্রকারের ঘুম ছাড়া অন্য কোনো ঘুম যে অজু ভঙ্গের কারণ নয় এ ব্যাপারে নবী ﷺ ইরশাদ করেন– لَا وَضُوْءَ عَلٰى مَنْ نَامَ قَائِمًا اَوْ قَاعِدًا اَوْ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا

"যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে, বসে, রুকুতে বা সিজদাবস্থায় ঘুমায় তার উপর অজু আবশ্যক নয়।" –[বায়হাকী শরীফ : ১/১২১]

قَوْلُهُ اَوْ سَاجِدًا : সিজদা অবস্থায় ঘুম যে অজু ভঙ্গের কারণ নয় এর একটি হাদীস আমরা ইতঃপূর্বে একটি উল্লেখ করেছি। অপর একটি হাদীস হচ্ছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত–

اِنَّهٗ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتّٰى غَطَّ اَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ نِمْتَ فَقَالَ اِنَّ الْوَضُوْءَ لَا يَجِبُ اِلَّا عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا.

অর্থাৎ "তিনি [হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)] রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সিজদা অবস্থায় ঘুমাতে দেখলেন। এমনকি তাঁর নাকের শব্দ আসতে লাগল। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিতো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, অজু ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে কাত হয়ে ঘুমায়।" –[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী শরীফ]

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি সিজদা অবস্থায় ঘুমাতে ঘুমাতে শুয়ে পড়ে তবে অবশ্যই অজু ভেঙ্গে যাবে। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন– সিজদা অবস্থায় মহিলার ঘুম অজু ভঙ্গের কারণ হওয়া উচিত। কেননা, সিজদায় তারা হাত, পা ও শরীর ভূমির সঙ্গে মিলিয়ে রাখে। ফলত তাদের সিজদা অবস্থার ঘুমের মধ্যে اِسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ -এর সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে সিজদা অবস্থায় পুরুষের ঘুমে اِسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ -এর কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তবে যদি সে শুয়ে পড়ে।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, সিজদা অবস্থায় ঘুম অজু ভঙ্গের কারণ হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে পাঁচটি মত রয়েছে। ১. তা مُطْلَقًا অজু ভঙ্গের কারণ নয়। ২. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট নামাজের সিজদায় আছে তা বুঝেশুনে ঘুমালে তা অজু ভঙ্গকারী; অন্যথায় নয়। ৩. নামাজের বাইরের সিজদায় ঘুম অজু ভঙ্গকারী; নামাজের ভিতরের সিজদায় ঘুম অজু ভঙ্গকারী নয়। ৪. সুন্নত তরিকার সিজদা অবস্থায় ঘুমালে অজু ভাঙ্গবে না। অন্যথায় ভেঙ্গে যাবে। ৫. নামাজের সিজদায় مُطْلَقًا অজু ভঙ্গকারী নয়। নামাজের বাইরে যদি সুন্নত তরিকার সিজদায় না হয় তবে অজু ভেঙ্গে যাবে, আর যদি সুন্নত তরিকায় সিজদা হয় তবে ভাঙ্গবে না।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– হিদায়া : ১/২৫, ফাতহুল কাদীর : ১/৪৯–৫১, বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১৩৩–১৩৬, বাহরুর রায়েক : ১/৭২–৭৬, মা'আরিফুস সুনান : ১/২৮২–২৮৪, দরসে তিরমিযী : ১/২৯৩–২৯৫]

قَوْلُهُ وَالْاِغْمَاءُ وَالْجُنُوْنُ : اِغْمَاءٌ অর্থ– সংজ্ঞাহীনতা। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন, এটি একটি রোগবিশেষ যা বোধশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। তবে তা আকল-বুদ্ধিকে নিস্তেজ ও অকেজো করে দেয় না; বরং আকল-বুদ্ধি লোপ পায়। পক্ষান্তরে জুনূনী বা উন্মত্ততা, তা আকল-বুদ্ধিকে নিস্তেজ ও অকেজো করে দেয়। শক্তি-সামর্থ্যের ক্ষেত্রে সংজ্ঞাহীন ব্যক্তি ও উন্মাদ-পাগল ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায়; বরং ঘুমন্ত ব্যক্তির চেয়েও অধিক বোধহীন। কেননা, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগালে তার সংজ্ঞা ফিরে আসে। কিন্তু বেহুঁশ-সংজ্ঞাহীন ও উাদ-পাগল এমন নয়, তাই তাদের উভয়ের থেকে সর্বাবস্থায় অজু ভঙ্গের কারণ প্রকাশ পায়। আর ঘুমের ক্ষেত্রে শুধু اِسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ -এর صُوْرَةٌ -এ অজু ভেঙ্গে যাবে; অন্যথায় নয়।

قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِى الْاِغْمَاءِ السُّكْرُ : সংজ্ঞাহীনতার মধ্যে سُكْرٌ বা নেশাও দাখিল। سُكْر -এর ঐ অবস্থা, যা মদ অথবা নেশাজাতীয় কোনোকিছু পান করার পর পাকস্থলী থেকে মাতলামি উঠে মস্তিষ্ককে বিকৃত করে দেয়। অনুরূপ মৃগি রোগও এতে অন্তর্ভুক্ত, যা জিনের আছরে হয়ে থাকে। অতএব, মৃগি রোগী তার উক্ত অবস্থা থেকে জ্ঞান [বোধ] ফিরলে তার উপর অজু করা আবশ্যক।

❖ **হাসির তিনটি স্তর ও হুকুম :** হাসির তিনটি স্তর রয়েছে–

১. اَلْقَهْقَهَةُ বা অট্টহাসি, যা হাসিদাতা নিজে এবং পার্শ্ববর্তী মানুষ উভয়ে শুনতে পায়। চাই দাঁত বের হোক কিংবা না হোক। এর হুকুম সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। তাই তা পরে উল্লেখ করা হবে।

২. اَلضِّحْكُ বা স্বাভাবিক হাসি, যা হাসিদাতা নিজে শুনতে পায়, কিন্তু অন্যরা শুনতে পায় না।

৩. اَلتَّبَسُّمُ বা মুচকি হাসি, যা কেউই শুনতে পায় না। اَلضِّحْكُ -এর হুকুম হলো, এর দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু অজু ভাঙ্গবে না। اَلتَّبَسُّمُ -এর হুকুম হলো, এর দ্বারা অজু ও নামাজ কোনোটিই ভাঙ্গবে না।

❖ **নামাজে অট্টহাসি অজু ভঙ্গের কারণ :** রুকু-সিজদাবিশিষ্ট নামাজে প্রাপ্তবয়স্ক নামাজির قَهْقَهَة [অট্টহাসি] অজু ভঙ্গের কারণ কিনা? এ নিয়ে ইমামত্রয় ও আহনাফের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : أَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ তথা ইমামত্রয়ের মতে অট্টহাসি অজু ভঙ্গের কারণ নয়। পক্ষান্তরে আহনাফ বলেন, অট্টহাসি অজু ভঙ্গের কারণ।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমামত্রয়ের দলিল হলো, قَهْقَهَةٌ দ্বারা نَجَاسَةٌ [নাপাকী] নির্গত হয় না, অথচ نَجَاسَةٌ নির্গত হওয়াই অজু ভঙ্গের কারণ। তাইতো قَهْقَهَةٌ জানাজা নামাজ, সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং নামাজের বাইরে অজু ভঙ্গের কারণ হয় না। কিয়াসের চাহিদা এমনই।

আহনাফের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার নামাজ পড়াচ্ছিলেন– এমতাবস্থায় একজন বেদুঈন সাহাবী যাঁর দৃষ্টিশক্তি কম ছিল তিনি এসে হঠাৎ করে পড়ে যান। সাহাবায়ে কেরাম নামাজে থাকাবস্থায় হাসতে লাগলেন। নামাজান্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– مَنْ قَهْقَهَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ وَالصَّلَاةَ وَمَنْ تَبَسَّمَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ "তোমাদের মধ্যে যারা অট্টহাসি দিয়েছ তারা নামাজ ও অজু উভয়টি দোহরাবে, আর যারা মুচকি হাসি দিয়েছ তাদের কিছুই দোহরাতে হবে না।' –[দারাকুতনী : ১/১৬৩, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক : ২/৩৭৬] وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসে নবী ﷺ অট্টহাসিদাতাকে অজু ও নামাজ উভয়টিই দোহরাতে বলেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, قَهْقَهَةٌ দ্বারা অজু ভেঙ্গে যায়।

اَلرَّدُّ عَلَى الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : আমাদের পেশকৃত হাদীসটি মাশহুর হাদীস। আর হাদীসে মাশহুর দ্বারা কিয়াসকে পরিহার করা হয়ে থাকে। তাই উক্ত হাদীসে মাশহুরের বিপরীতে কিয়াসের اِسْتِدْلَالْ সহীহ নয়।

তবে যেহেতু হাদীসটি পূর্ণ রুকু-সিজদাবিশিষ্ট নামাজ সম্পর্কিত, তাই এর হুকুম এতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এর থেকে অতিক্রম করে নামাজে জানাজা, সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং নামাজের বাইরে তা অজু ভঙ্গের কারণ হবে না। কেননা খিলাফে কিয়াস [নিয়ম বহির্ভূত]-এর হুকুম তার مَوْرِدْ তথা উৎস থেকে অতিক্রম করে না।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর : ১/৫২–৫৫, বাদায়িউস সানায়ে' : ১/১৩৬–১৩৮, বাহরুর রায়েক ১/৭৭–৮১]

قَوْلُهُ اِذَا كَانَ يَقْظَانُ حَتّٰى نَامَ فِى الصَّلٰوةِ : يَقْظَانٌ শব্দটি نَائِمْ শব্দের বিপরীত। অর্থ– জাগ্রত। এখানে রুকু-সিজদাবিশিষ্ট নামাজে জাগ্রত থাকাবস্থার অট্টহাসি অজু ভঙ্গের কারণ বলা হয়েছে। জাগ্রত থাকাবস্থার শর্ত এজন্যই লাগানো হয়েছে যে, قَهْقَهَةٌ দ্বারা زَجْرًا [শাসন বা ধমক প্রদানমূলক] অজু ভাঙ্গে। আর ঘুমন্ত ব্যক্তিকে ধমক দেওয়া যায় না। এতে ইমাম কারখী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, নামাজে ঘুমন্ত ব্যক্তির অট্টহাসিও অজু ভঙ্গের কারণ।

وَالْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ اِلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَهِيَ اَنْ يُّمَاسَّ بَدَنُهُ بَدَنَ الْمَرْأَةِ مُجَرَّدَيْنِ وَانْتَشَرَ اٰلَتُهُ وَتَمَاسَّ الْفَرْجَانِ ـ

অনুবাদ : মুবাশারাতে ফাহেশাহ অজু ভঙ্গের কারণ। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট [মুবাশারাতে ফাহেশাহ অজু ভঙ্গের কারণ] নয়। মুবাশারাতে ফাহেশাহ বলা হয়, পুরুষের নগ্ন শরীর মহিলার নগ্ন শরীরকে স্পর্শ করা, পুরুষের লিঙ্গ [সতেজাবস্থায়] নড়াচড়া করতে থাকা এবং পুরুষ ও মহিলার লিঙ্গ পরস্পর স্পর্শ করতে থাকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ الخ : শারেহ (র.) مُبَاشَرَةُ فَاحِشَةٌ-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন এটিই সবচেয়ে সুন্দর সংজ্ঞা। এখানে فَاحِشَةٌ শব্দ দ্বারা অশ্লীলতা উদ্দেশ্য নয়; বরং ظُهُوْرٌ [খোলা বা নগ্ন] উদ্দেশ্য। কেননা, কখনো কখনো স্বামী স্ত্রীর মাঝে এমন ঘটনা ঘটে যে, সহবাস ছাড়া তাদের সবই হয়ে যায়। এ ব্যাপারে বাহরুর রায়েক গ্রন্থকার 'বাদায়ে' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন– হযরত আবুল ইয়াসার (রা.) নবী ﷺ -কে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস ছাড়া সবই করেছি। এখন আমাকে কি করতে হবে। তিনি বললেন, "تَوَضَّأْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" তুমি [শুধু] অজু করে নামাজ পড়ে নাও। –[বাহরুর রায়েক : ১/ ৮১]

উক্ত صُوْرَةٌ-এ অজু ভেঙ্গে যাবে এ কারণে যে, সাধারণত এহেন صُوْرَةٌ-এ মযী (مَذْيٌ) নির্গত হয়। এটিই বিশুদ্ধ এবং শায়খাইন [ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ] (র.)-এর অভিমত। তোহফা ও মানিয়্যাহ গ্রন্থে শায়খাইনের মাযহাবকেই বিশুদ্ধ মাযহাব বলা হয়েছে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যতক্ষণ পর্যন্ত মযী ইত্যাদি নির্গত না হবে, ততক্ষণ অজু ভাঙ্গবে না।

قَوْلُهُ بَدَنَ الْمَرْأَةِ مُجَرَّدَيْنِ : অনুরূপ যদি দুজন মহিলা পরস্পর নিজেদের নগ্ন গোপ্তাঙ্গ স্পর্শ করায়, অনুরূপ যদি দুজন পুরুষ নিজেদের মাঝে مُبَاشَرَةً فَاحِشَةً করে, তবে শায়খাইন (র.)-এর নিকট অজু ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট যতক্ষণ পর্যন্ত মযী ইত্যাদি নির্গত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অজু ভাঙ্গবে না।

একসঙ্গে অজু ভঙ্গের কারণসমূহ : বিচ্ছিন্নভাবে যে সমস্ত অজু ভঙ্গের কারণের আলোচনা করা হয়েছে– তালিবে ইলমদের সুবিধার্থে আমরা সংক্ষেপে একসঙ্গে উল্লেখ করছি–

১. পায়খানা ও পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া।

২. পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া শরীরের যে-কোনো অংশ থেকে কোনো কিছু বের হয়ে প্রবাহিত হওয়া।

৩. মুখ ভরে বমি হওয়া। চাই রক্ত বমি হোক কিংবা পিত্ত কিংবা খাদ্য কিংবা পানি কিংবা জমাট রক্ত হোক।

৪. থুথুর সঙ্গে রক্ত সমান বা বেশি হওয়া।

৫. কাত হয়ে কিংবা হেলান দিয়ে কিংবা এমন কিছুতে ঠেসদাতার ঘুম, যা সরিয়ে দিলে সে পড়ে যাবে।

৬. সংজ্ঞাহীনতা ও উন্মত্ততা।

৭. রুকু-সিজদাবিশিষ্ট নামাজে প্রাপ্তবয়স্ক নামাজির অট্টহাসি।

৮. মুবাশারাতে ফাহেশাহ।

لَا دُوْدَةٌ خَرَجَتْ مِنْ جُرْحٍ لِاَنَّهَا طَاهِرَةٌ وَمَا عَلَيْهَا مِنَ النَّجَاسَةِ قَلِيْلَةٌ فَاَمَّا الْخَارِجَةُ مِنَ الدُّبُرِ فَتَنْقُضُ لِاَنَّ خُرُوْجَ الْقَلِيْلِ مِنْهُ نَاقِضٌ وَمِنَ الْاِحْلِيْلِ لَا لِاَنَّهَا خَارِجَةٌ مِنْ جَرْحٍ وَمِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ فِيْهِ اِخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ وَلَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ اَىْ مِنْ جَرْحٍ وَمَسُّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) .

অনুবাদ : ক্ষতস্থান থেকে নির্গত পোকা অজু ভঙ্গের কারণ নয়। কেননা, তা পবিত্র এবং এর শরীরে যে নাপাকী রয়েছে তা অতি সামান্য [তাই তা ক্ষমাযোগ্যে]। অবশ্যই পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত কৃমি অজু ভঙ্গের কারণ। কেননা, পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত সামান্য কিছুও অজু ভঙ্গের কারণ। পুরুষের পেশাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত কৃমি অজু ভঙ্গের কারণ নয়। কেননা, তা ক্ষতস্থান থেকে নির্গত হয়েছে। মহিলার পেশাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত কৃমির ব্যাপারে মাশায়িখে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে এবং ক্ষতস্থান থেকে পতিত গোশত, মহিলাকে স্পর্শ করা ও লিঙ্গ স্পর্শ করা অজু ভঙ্গের কারণ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) এতে ভিন্নমত পোষণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا دُوْدَةٌ خَرَجَتْ مِنْ جُرْحٍ : ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, পুরুষ ও মহিলার পায়খানার রাস্তা দিয়ে যদি কোনো কীট বা কৃমি বের হয় তবে এর দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাবে। কারণ, উক্ত কীট বা কৃমির সঙ্গে যদিও সামান্য নাপাকী নির্গত হয়েছে, কিন্তু তা তো বের হয়েছে পায়খানার রাস্তা দিয়ে। আর পায়খানার রাস্তা দিয়ে সামান্য নাপাক বের হলেও অজু ভেঙ্গে যায়। পক্ষান্তরে যদি উক্ত কীট পায়খানার রাস্তা ব্যতীত শরীরের অন্য কোনো ক্ষতস্থান থেকে নির্গত হয় কিংবা ক্ষতের থেকে গোশতখণ্ড খসে পড়ে, তবে তা অজু ভঙ্গকারী নয়। কেননা, মূলত কীটটি নাপাক নয়; বরং তার দেহে লেগে থাকা পদার্থ হলো নাপাক। আর তা অতি সামান্য, যা পায়খানা-পেশাবের রাস্তা ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে বের হলে অজু ভঙ্গকারী নয়। অনুরূপ মানুষের গোশতও নাপাক নয়, তাই শুধু গোশত খসে পড়ার দ্বারা অজু ভাঙ্গবে না। হ্যাঁ, যদি উক্ত গোশতের সঙ্গে প্রবহমান রক্তও বের হয়, তবে তা অজু ভঙ্গকারী।

অনুরূপভাবে যদি পুরুষের পেশাবের রাস্তা দিয়ে কীট নির্গত হয়, তবে তাও অজু ভঙ্গের কারণ নয়। কেননা, তা মূলত ক্ষতস্থান থেকে নির্গত হয়, তাই তা নাপাকী নিয়ে বের হয় না। শারেহ (র.) বলেন, কিন্তু মহিলার পেশাবের রাস্তা দিয়ে যদি কীট নির্গত হয়, তবে তা অজু ভঙ্গের কারণ হবে কিনা, এ নিয়ে মাশায়িখে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। যারা মহিলার পেশাবের রাস্তা দিয়ে হাওয়া বের হওয়াকে অজু ভঙ্গের কারণ বলেন, তারা কীট বের হওয়াকেও অজু ভঙ্গের কারণ বলেন। আর যারা হাওয়া বের হওয়াকে অজু ভঙ্গের কারণ বলেন না, তারা কীট বের হওয়াকেও অজু ভঙ্গের কারণ বলেন না।

অতঃপর বেকায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন যে, مَسُّ الْمَرْأَةِ তথা "মহিলাকে স্পর্শ করা" ও مَسُّ الذَّكَرِ তথা "লিঙ্গ স্পর্শ করা" অজু ভঙ্গের কারণ নয়। উল্লিখিত উভয় মাসআলায়ই ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। সংক্ষেপে আমরা দুটি মাসআলাই তুলে ধরছি।

❖ **مَسُّ الْمَرْأَةِ বা মহিলাকে স্পর্শ করার মাসআলা :** مَسُّ الْمَرْأَةِ অজু ভঙ্গের কারণ, এ নিয়ে اَلْاَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ ও আহনাফের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমামত্রয় বলেন, مَسُّ الْمَرْأَةِ অজু ভঙ্গের কারণ। তবে ইমাম মালেক (র.) তিনটি শর্ত আরোপ করেন– ১. মহিলা প্রাপ্তবয়স্কা হতে হবে। ২. অপরিচিতা হতে হবে। ৩. শাহওয়াতের সাথে স্পর্শ করতে হবে। এ তিন শর্তসাপেক্ষে তাঁর মতে مَسُّ الْمَرْأَةِ অজু ভঙ্গের কারণ। ইমাম শাফেয়ী (র.) শুধু কাপড়ের প্রতিবন্ধক না থাকার শর্তসাপেক্ষে مَسُّ الْمَرْأَةِ-কে অজু ভঙ্গের কারণ বলেন। চাই মহিলা নাবালেগা হোক কিংবা বালেগা হোক, মাহরাম হোক কিংবা গাইরে মাহরাম হোক, শাহওয়াতের সাথে স্পর্শ করুক কিংবা শাহওয়াত ব্যতীত। ওলামায়ে আহনাফ বলেন, مَسُّ الْمَرْأَةِ কোনো অবস্থাতেই অজু ভঙ্গের কারণ নয়।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমামত্রয় আল্লাহ তা'আলার বাণী– أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ দ্বারা দলিল পেশ করেন। وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, আয়াতে أَوْ لَامَسْتُمْ-এর অর্থ لَمْسٌ بِالْيَدِ [হাত দ্বারা স্পর্শ করা]। কেননা, ইমাম কাসাঈ ও হামযাহ (র.) উক্ত কেরাতকে لَمَسْتُمْ পড়েন। অতএব, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাকে স্পর্শ করা অজু ভঙ্গের কারণ।

ওলামায়ে আহনাফ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَاءِهٖ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَتَوَضَّأُ .

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোনো একজন স্ত্রীকে চুম্বন করে নামাজে চলে যেতেন, কিন্তু তিনি [এ কারণে] অজু করতেন না।" –[আবূ দাঊদ-হাদীস নং ১৭৯, তিরমিযী-হাদীস নং ৮৬]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীকে চুম্বন করার পর নামাজ আদায় করেছেন, কিন্তু অজু করেননি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদেরকে শুধু স্পর্শ করাই নয়; বরং তাদের চুম্বন করাও অজু ভঙ্গের কারণ নয়। কেননা, যদি তা অজু ভঙ্গের কারণ হতো তবে নবী করীম ﷺ অজু করা ছাড়া নামাজ পড়তেন না। অনুরূপ مَسُّ الْمَرْأَةِ অজু ভঙ্গের কারণ না হওয়া বুঝায় এমন আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে– বুখারী শরীফ ১ : ১৬১, নাসাঈ শরীফ ১ : ৩৮, মুসলিম শরীফ ১ : ১৯২, মুসনাদে আহমাদ ৬ : ২১০ পৃষ্ঠায়।

اَلرَّدُّ عَلَى الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : উক্ত আয়াতে أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ দ্বারা اَلْجِمَاعُ [সহবাস]-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, আয়াতের উক্ত অংশ তায়াম্মুমের আয়াত থেকে চয়ন করা হয়েছে। আর তায়াম্মুমের অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হলো, তায়াম্মুম حَدَثٌ اَصْغَرْ থেকেও হয় এবং حَدَثٌ اَكْبَرْ থেকেও হয়-এর বর্ণনা দেওয়া। সুতরাং أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ দ্বারা حَدَثٌ اَصْغَرْ-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ দ্বারা حَدَثٌ اَكْبَرْ- جِمَاعٌ-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর জিমা' তথা সহবাস দ্বারা শুধু অজু কেন; বরং গোসলই তো ভেঙ্গে যায়। তা ছাড়া أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ-এর দ্বারা যে اَلْجِمَاعُ-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এর আরো একটি দলিল হচ্ছে, أَوْلَا مَسْتُمْ - بَابُ مُفَاعَلَةٍ থেকে এসেছে। যা পরস্পর স্পর্শ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

তা ছাড়াও বিভিন্ন হাদীস এটা বুঝায় এবং أَوْ لَمَسْتُمْ-এর কেরাত দ্বারাও جِمَاعٌ-এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। –[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– [বাদায়েউস সানায়ে'– ১ : ১৩১-১৩২, বাহরুর রায়িক– ১ : ৮৫-৮৬, মা'আরিফুস সুনান– ১ : ৩০১, দরসে তিরমিযী– ১ : ৩০৯-৩১৬]

❖ **مَسُّ الذَّكَرِ বা লিঙ্গ স্পর্শ করার মাসআলা :** مَسُّ الذَّكَرِ অজু ভঙ্গের কারণ কিনা এ নিয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহনাফের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আমরা সংক্ষেপে তা তুলে ধরছি।

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি কাপড়ের প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ করে তবে তা অজু ভঙ্গের কারণ হবে। পক্ষান্তরে আহনাফ বলেন– مَسُّ الذَّكَرِ مُطْلَقًا অজু ভঙ্গের কারণ নয়।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত বুসরাহ বিনতে সাফওয়ান (রা.)-এর হাদীস দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "যে ব্যক্তি লিঙ্গ স্পর্শ করবে সে যেন অজু করে নেয়।"

-[আবূ দাঊদ : হাদীস নং ১৮১, তিরমিযী : হাদীস নং ৮২]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, নবী করীম ﷺ লিঙ্গ স্পর্শকারীকে অজু করার নির্দেশ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, مَسُّ الذَّكَرِ অজু ভঙ্গের কারণ।

আহনাফ কায়স ইবনে তালক ইবনে আলী (রা.)-এর হাদীস দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- وَهَلْ هُوَ اِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ "লিঙ্গ মানুষেরই অঙ্গবিশেষ।"

-[তিরমিযী, অধ্যায় : ৬২, আবূ দাঊদ-অধ্যায় : ৭০]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, নবী ﷺ বলেছেন, লিঙ্গ মানুষেরই অঙ্গবিশেষ। অতএব, তা স্পর্শ করার দ্বারা অজু ভঙ্গ হতে পারে না। যেমন অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করার দ্বারা অজু ভঙ্গ হয় না।

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) [ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে জবাব] :

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, তা দুর্বল (ضَعِيْفٌ)। কেননা, একদা উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা.) মারওয়ান ইবনে হিকাম (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁদের মাঝে অজু ভঙ্গের কারণসমূহের আলোচনা চলছিল। মারওয়ান مَسُّ الذَّكَرِ -কেও অজু ভঙ্গের কারণ বললেন। হযরত উরওয়া (রা.) তা অস্বীকার করেন। তাই মারওয়ান হযরত বুসরাহ (রা.)-এর উক্ত হাদীস শুনান। অতঃপর এর تَصْدِيْق -এর জন্য তিনি একজন পুলিশকে হযরত বুসরাহ (রা.)-এর দরবারে পাঠান। পুলিশটি ফিরে এসেও উক্ত হাদীসই শুনিয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত উরওয়া (রা.) সরাসরি উক্ত হাদীস বুসরাহ (রা.) থেকে শুনেননি; বরং হযরত মারওয়ান (রা.) -এর وَاسِطَةْ -এ, অথবা شُرْطِيْ [পুলিশ] -এর وَاسِطَةْ-এ হযরত বুসরাহ (রা.) থেকে শুনেছেন। আর شُرْطِيْ হলেন مَجْهُوْل রাবী এবং মারওয়ান হলেন বিতর্কিত রাবী। -[দরসে তিরমিযী ১ : ৩০৩]

২. হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, مَسُّ الذَّكَرِ -এর কারণে অজু করা মোস্তাহাব উম্মতের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য। -[মা'আরিফুস সুনান ১ : ২৯৬]

-[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- বাদায়েউস সানায়ে'- ১ : ১৩২-১৩৩, বাহরুর রায়িক- ১ : ৮২-৮৪, মা'আরিফুস সুনান- ১ : ২৯৫-৩০১]

وَفَرْضُ الْغُسْلِ الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَهُمَا سُنَّتَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) وَلَنَا اَنَّ الْفَمَ دَاخِلٌ مِنْ وَجْهٍ وَخَارِجٌ مِنْ وَجْهٍ حِسًّا عِنْدَ انْطِبَاقِ الْفَمِ وَانْفِتَاحِهِ وَحُكْمًا فِيْ اِبْتِلَاعِ الصَّائِمِ الرِّيْقَ وَدُخُوْلُ شَيْءٍ فِيْ فَمِهِ فَجَعَلَ دَاخِلًا فِي الْوُضُوْءِ خَارِجًا فِي الْغُسْلِ لِاَنَّ الْوَارِدَ فِيْهِ صِيْغَةُ الْمُبَالَغَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاطَّهَّرُوْا وَفِي الْوُضُوْءِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَكَذٰلِكَ الْاَنْفُ وَاِذَا تَمَضْمَضَ وَقَدْ بَقِيَ فِيْ اَسْنَانِهِ طَعَامٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ ـ

অনুবাদ : গোসলের ফরজ হলো, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া। এ দুটিই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট সুন্নত। আমাদের দলিল হচ্ছে, মুখ [এর ভিতরের অংশ] একদিক থেকে শরীরের আভ্যন্তরীণ অংশ এবং অন্যদিক থেকে শরীরের বাহিরের অংশ। যা মুখ খোলা ও বন্ধ করার সময় বুঝা যায় এবং শরিয়তের হুকুমের দিক থেকে বুঝা যায় রোজাদার থুথু গিলে ফেলা ও মুখে কোনো কিছু প্রবেশ করার সময়। তাই মুখ [এর ভিতরের অংশ]-কে অজুতে শরীরের আভ্যন্তরীণ অংশ এবং গোসলে শরীরের বাহিরের [প্রকাশ্য] অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, গোসলের ক্ষেত্রে [আল্লাহ তা'আলা] مُبَالَغَةٌ-এর শব্দ ব্যবহার করেছেন। তা হচ্ছে– فَاطَّهَّرُوْا আর অজুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন– فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ [অর্থাৎ مُبَالَغَةٌ-এর শব্দ ব্যবহার করেননি]। অনুরূপ নাকের হুকুম। যদি অজুকারী কুলি করে, এমতাবস্থায় তার দাঁতে খাদ্য লেগে থাকে তবে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَفَرْضُ الْغُسْلِ الْمَضْمَضَةُ الخ : গ্রন্থকার অজুর আহকাম বর্ণনার পর গোসলের আহকামের বর্ণনা শুরু করেছেন। কারণ, ১. গোসলের তুলনায় অজুর আহকাম বেশি। ২. অজুর মহল হলো جُزْءُ الْبَدَنِ আর গোসলের মহল হলো كُلُّ الْبَدَنِ নিয়ম আছে যে, جُزْءٌ - كُلٌ-এর পূর্বে আসে। ৩. তিনি আল্লাহর কালামের অনুসরণ করেছেন। কেননা, সেখানেও আগে অজুর আহকাম এবং পরে গোসলের বর্ণনা করা হয়েছে। উপরিউক্ত কারণগুলো সামনে রেখে অজুর আহকামকে গোসলের আহকামের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

❖ **গোসলের ফরজসমূহ :** শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আমরা এখানে একসঙ্গে গোসলের ফরজগুলো উল্লেখ করে দিচ্ছি। ওলামায়ে আহনাফের মতে গোসলের ফরজ তিনটি– ১. কুলি করা, ২. নাকে পানি দেওয়া, ৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া গোসলের ফরজ নয়; বরং সুন্নত।

❖ **গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ফরজ; সুন্নত নয় :** গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত না ফরজ এ নিয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহনাফের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ফরজ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– عَشَرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ وَمِنْهَا الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ অর্থাৎ "দশটি জিনিস ফিতরাত তথা সুন্নত -এর অন্তর্ভুক্ত তন্মধ্যে তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াকে উল্লেখ করেছেন।" –[আবূ দাউদ শরীফ ১ : ৮]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالْ এভাবে যে, নবী করীম ﷺ কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াকে দশ সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত।

তা ছাড়া তিনি গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াকে অজুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে তা অজুতে সুন্নত তেমনি গোসলেও সুন্নত।

ওলামায়ে আহনাফ আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا "যদি তোমরা জুনূবী হও, তবে পূর্ণরূপে তাহারাত অর্জন কর" দ্বারা দলিল পেশ করেন। পূর্ণরূপে তাহারাত অর্জনের অর্থ হলো, সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করা। তবে যে সমস্ত অঙ্গে পানি পৌঁছানো অসম্ভব তা ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন– চোখের ভিতরের অংশ। পক্ষান্তরে যে সমস্ত অঙ্গে পানি পৌঁছানো সম্ভব যেমন– মুখ ও নাকের ভিতরের অংশ– এগুলো ধৌত করার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এগুলো একদিক থেকে শরীরের ভিতরের অংশ এবং অন্যদিক থেকে তা শরীরের প্রকাশ্য অংশ। অতএব, এগুলো فَاطَّهَّرُوْا মুবালাগার শব্দ হওয়ার কারণে ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে অজুর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ বলেছেন, যা ভালোভাবে ধৌত করা বুঝায় না। অতএব, অজুতে তা ধৌত করা ফরজও হতে পারে না।

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) **[ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে জবাব]** : আমাদের اِسْتِدْلَالْ-এর বিবরণ দ্বারা অবশ্যই ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের খণ্ডন হয়ে গেছে। তথাপি বলছি যে, উক্ত হাদীস অজুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; গোসলের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস ও জাবের (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–هُمَا سُنَّتَانِ فِى الْوُضُوْءِ وَوَاجِبَتَانِ فِى الْغُسْلِ অর্থাৎ "কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া অজুতে সুন্নত, কিন্তু গোসলে ওয়াজিব।" –[ইনায়া-বেকায়া]

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াসের দলিলও আমাদের اِسْتِدْلَالْ দ্বারা খণ্ডন হয়ে গেছে। কেননা, সেখানে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা অজুর ক্ষেত্রে বলেছেন– فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ "তোমরা মুখমণ্ডল ধৌত কর।" আভিধানিক অর্থেও মুখমণ্ডল দ্বারা শুধু এতটুকু অংশই বুঝায় যা মুখামুখিতে প্রকাশ পায়। আর মুখ ও নাকের ভিতরের অংশ মুখামুখিতে প্রকাশ পায় না। তাই গোসলকে অজুর উপর কিয়াস করা ঠিক নয়।

–[এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর– ১ : ৬০-৬২, বাদায়িউস সানায়ে'– ১ : ১৪২-১৪৩, বাহরুর রায়িক– ১ : ৮৬-৯০, মা'আরিফুস সুনান– ১ : ১৬৫, দরসে তিরমিযী– ১ : ২৩৪-২৩৮]

قَوْلُهُ حِسًّا عِنْدَ اِنْطِبَاقِ الْفَمِ الخ : এখানে শারেহ (র.) বলছেন যে, মুখের ভিতরের অংশ মুখ বন্ধ করে রাখলে ভিতরের অংশ এবং মুখ খুলে রাখলে শরীরের প্রকাশ্য অংশ বুঝা যায়। শরিয়তের হুকুমের দিক থেকে তা এভাবে বুঝা যায় যে, যদি কোনো রোজাদার থুথু গিলে ফেলে তবে তার রোজা ভাঙ্গবে না। কেননা, মুখ শরীরের ভিতরের অংশ। যদি বাহিরের অংশ হতো তবে এর দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যেত। অনুরূপ যদি বাহিরের কোনো কিছু মুখের ভিতরে প্রবেশ করে, আর তা গলায় প্রবেশ না করে এর দ্বারাও রোজা ভঙ্গ হবে না। কেননা, মুখের ভিতরের অংশ শরীরের প্রকাশ্য অংশ। অতএব, মুখের ভিতরের অংশ একদিক থেকে শরীরের ভিতরের অংশ এবং অন্যদিক থেকে শরীরের প্রকাশ্য অংশ। আর গোসলের ক্ষেত্রে আল্লাহ مُبَالَغَةْ -এর শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাই গোসলে কুলি করা ফরজ এবং অজুতে কুলি করা সুন্নত। কেননা, অজুর ক্ষেত্রে আল্লাহ مُبَالَغَةْ -এর শব্দ ব্যবহার করেননি।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ الْاَنْفُ : অনুরূপ যেহেতু নাকের ভিতরাংশ স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় না, তাই তা শরীরের ভিতরের অঙ্গ। আর যদি গভীরভাবে দেখা হয় তবে দেখা যায় তাই তা শরীরের প্রকাশ্য অংশ। শরিয়তের হুকুমের দিক থেকে এভাবে বুঝা যায় যে, যদি নাক থেকে কফ নেমে গলায় চলে যায়, তবে এর দ্বারা রোজা ভাঙ্গে না। কেননা, নাকের ভিতরের অংশ শরীরের ভিতরের অংশই আবার বাহির থেকে কোনো কিছু যদি নাকে প্রবেশ করে, তবে এর দ্বারা রোজা ভাঙ্গে না। কারণ, তা শরীরের প্রকাশ্য অংশই। তাই নাকে পানি দেওয়ার হুকুমটিও হুবহু কুলি করার মতোই।

وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ اَىْ جَمِيْعِ ظَاهِرِ الْبَدَنِ حَتّٰى لَوْ بَقِىَ الْعَجِيْنُ فِى الظُّفْرِ فَاغْتَسَلَ لَا يَجْزِىْ وَفِى الدَّرَنِ يَجْزِىْ اِذْ هُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ هُنَاكَ وَكَذَا الطِّيْنُ لِاَنَّ الْمَاءَ يُنْفِذُ فِيْهِ وَكَذَا الصَّبْغُ بِالْحِنَّاءِ فَالْحَاصِلُ اَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِىْ هٰذَا الْحَرَجِ وَاِذَا ادَّهَنَ فَاَمَرَ الْمَاءَ فَلَمْ يَصِلْ يَجْزِىْ وَاَمَّا ثَقْبُ الْقُرْطِ فَاِنْ كَانَ الْقُرْطُ فِيْهَا فَاِنْ غَلَبَ فِىْ ظَنِّهٖ اَنَّ الْمَاءَ لَا يَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَحْوِيْكٍ فَلَابُدَّ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنِ الْقُرْطُ فِيْهَا فَاِنْ غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهٖ اَنَّ الْمَاءَ يَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ لَا يَتَكَلَّفُ وَاِنْ غَلَبَ اَنَّهٗ لَا يَصِلُ اِلَّا بِتَكَلُّفٍ يَتَكَلَّفُ وَاِنِ انْضَمَّ الثُّقْبُ بَعْدَ نَزْعِهٖ وَصَارَ بِحَالٍ اِنْ اَمَرَ عَلَيْهَا الْمَاءَ يَدْخُلُهَا وَاِنْ غَفَلَ لَا يَدْخُلُهَا اَمَرَّ الْمَاءَ وَلَا يَتَكَلَّفُ فِىْ اِدْخَالِ شَيْءٍ سِوَى الْمَاءِ مِنْ خَشَبٍ اَوْ نَحْوِهٖ وَاِنْ كَانَ فِىْ اِصْبَعِهٖ خَاتَمٌ ضَيِّقٌ يَجِبُ تَحْرِيْكُهٗ لِيَصِلَ الْمَاءُ تَحْتَهٗ وَيَجِبُ عَلَى الْاَقْلَفِ اِدْخَالُ الْمَاءِ دَاخِلَ الْقُلْفَةِ وَاِنْ نَزَلَ الْبَوْلُ اِلَيْهَا وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا نَقَضَ الْوُضُوْءَ هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ فَلَهَا حُكْمُ الظَّاهِرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يَجِبُ اِيْصَالُ الْمَاءِ اِلَيْهَا فِى الْغُسْلِ مَعَ اَنَّهٗ يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ اِذَا نَزَلَ الْبَوْلُ اِلَيْهَا فَلَهَا حُكْمُ الْبَاطِنِ فِى الْغُسْلِ وَحُكْمُ الظَّاهِرِ فِىْ اِنْتِقَاضِ الْوُضُوْءِ لَا دَلْكُهٗ ـ

অনুবাদ : পূর্ণ শরীর ধৌত করা। অর্থাৎ শরীরের সমুদয় প্রকাশ্য অংশ। এমনকি যদি আটার খামির নখে লেগে থাকে, আর এমতাবস্থায় গোসল করে তবে তা যথেষ্ট হবে না; [বরং তা পরিষ্কার করতে হবে]। আর যদি [শরীরে] ময়লা থাকে তবে উক্ত গোসল যথেষ্ট হয়ে যাবে। [অর্থাৎ তা ঘসে পরিষ্কার করার প্রয়োজন নেই।] কেননা, ময়লা সেখান থেকেই সৃষ্টি হয়। অনুরূপ মাটি। কেননা, এতে পানি পৌঁছে। মেহেদি দ্বারা রঙিন করাও অনুরূপ। সারকথা হলো, গোসলে অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করা হয়। যখন তেল ব্যবহার করার পর এর উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করে কিন্তু [তেলের কারণে এতে] পানি লাগে না, তবুও যথেষ্ট হবে। তবে কানের দুলের ছিদ্র, যদি উক্ত ছিদ্রে দুল থাকে এবং প্রবল ধারণা হয় যে, দুল নাড়াচাড়া করা ছাড়া ছিদ্রে পানি পৌঁছবে না তবে অবশ্যই তা নাড়াচাড়া করবে। আর যদি ছিদ্রে দুল না থাকে এবং প্রবল ধারণা হয় যে, কষ্ট করা ছাড়াই ছিদ্রে পানি পৌঁছবে, তবে কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, কষ্ট করা ছাড়া ছিদ্রে পানি পৌঁছবে না তবে কষ্ট করবে। দুল খুলে ফেলার পর যদি ছিদ্র এমন অবস্থায় বন্ধ হয় যে, যদি এর উপর পানি প্রবাহিত করা হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই এতে পানি প্রবেশ করবে, আর যদি গাফিল [অসতর্ক] থাকে, তবে ছিদ্রে পানি প্রবেশ করবে না, তবে পানি প্রবাহিত করে দেবে। পানি

ছাড়া ছিদ্রে লাকড়ি অথবা অন্য কিছু প্রবেশ করানোর চেষ্টা করবে না। যদি গোসলকারীর আঙ্গুলে টাইট আংটি থাকে তবে তা নাড়াচাড়া করা আবশ্যক। যাতে করে এর নীচের চামড়ায় পানি পৌঁছে। যাকে খতনা করানো হয়নি তার জন্য লিঙ্গের [মাথার] চামড়ার অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ করানো আবশ্যক। যদি প্রস্রাব নেমে লিঙ্গের অকর্তিত চামড়া পর্যন্ত চলে আসে এবং তা বের না হয় তবে তা অজু ভেঙ্গে দেবে। তা কতিপয় মাশায়েখের নিকট। কারণ, লিঙ্গের অকর্তিত চামড়া সর্বাবস্থায় শরীরের প্রকাশ্য অংশের হুকুমে। কারো নিকট গোসলে লিঙ্গের অকর্তিত অংশে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়। এতদসত্ত্বেও যে, তার নিকটও যদি পেশাব নেমে উক্ত অকর্তিত চামড়া পর্যন্ত চলে আসে [বের না হয়] তবে তা অজু ভেঙ্গে দেবে। অতএব, তা গোসলে শরীরের আভ্যন্তরীণ অংশের হুকুমে, আর অজু ভঙ্গের ক্ষেত্রে তা শরীরের প্রকাশ্য অংশের হুকমে এবং [গোসলে] শরীর মাজা ফরজ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ الخ : ইতঃপূর্বে আমরা গোসলের তিনটি ফরজ উল্লেখ করেছি। তন্মধ্যে সর্বশেষ ফরজ ছিল– "সমস্ত শরীর ধৌত করা।" এটি গোসলের ফরজ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। যদিও কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণও গত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ حَتّٰى لَوْ بَقِيَ الْعَجِيْنُ فِي الظُّفْرِ الخ : আটার খামিরের এটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, তার সঙ্গে পানি মিশ্রিত হয় না। ফলত তা হাতে বা নখে লেগে থাকলে এর নিচ পর্যন্ত পানি পৌঁছে না। অনুরূপ কোনো কোনো প্রকারের চুনাও এমন হয়ে থাকে যে, এর সঙ্গে পানি মিশ্রিত হয় না। অনুরূপ প্রত্যেক এমন জিনিস, যার সঙ্গে পানি মিশ্রিত হয় না তা ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। অন্যথায় গোসল হবে না। তবে যদি আটা খামির বানানো না হয়ে থাকে কিংবা এমন বস্তু যার সঙ্গে পানি মিশ্রিত হয় তা হাতে লেগে থাকার দ্বারা গোসলের কোনো সমস্যা হবে না।

শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি শরীরে ময়লা থাকে কিংবা মাটি থাকে কিংবা মেহেদির রং থাকে তবে তা গোসলের জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে না। কেননা, ময়লা শরীর থেকেই সৃষ্টি হয়, মাটির সঙ্গে পানি মিশ্রিত হয় এবং মেহেদির রং চামড়ায় পানি পৌঁছার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। তাই শারেহ (র.) বলেন, গোসলের অধ্যায়ে লক্ষণীয় হচ্ছে, শরীরের চামড়ায় পানি পৌঁছার জন্য কোনো প্রতিবন্ধক আছে কিনা। যদি থাকে তবে তা আগে পরিষ্কার করতে হবে, তারপর গোসল করতে হবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا ادَّهَنَ فَأَمَرَّ الْمَاءَ فَلَمْ يَصِلْ الخ : اِدَّهَنَ -এর মাসদার হচ্ছে اِدِّهَانٌ যার অর্থ হচ্ছে, "তৈল লাগানো।" উদ্দেশ্য হলো, যদি কেউ মাথা বা দাড়ি কিংবা শরীরে তৈল লাগিয়ে এর উপর পানি প্রবাহিত করে দেয়, আর ঐ তৈলের কারণে চামড়ায় পানি পৌঁছে না তবে এর হুকুম হচ্ছে, সাবান ইত্যাদি লাগিয়ে তা পরিষ্কার করার প্রয়োজন নেই। কেননা, এতে কষ্ট [অসুবিধা] অনেক। আর গোসলের অধ্যায়ে কষ্ট বা অসুবিধাকে বিবেচনা করা হয়। তাই চামড়ায় পানি লাগুক কিংবা না লাগুক এর উপর পানি প্রবাহিত করে দেওয়াই যথেষ্ট হবে।

قَوْلُهُ وَأَمَّا ثُقُبُ الْقُرْطِ فَإِنْ كَانَ الْقُرْطُ الخ : ثُقُبٌ শব্দটি بِضَمِّ الثَّاءِ হবে। এটি ثُقْبَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– ছিদ্র। قُرْط শব্দটিও بِضَمِّ الْقَافِ হবে। এর বহুবচন হচ্ছে أقراط অর্থ– কানের দুল। মহিলাদের জন্য কানে দুল ব্যবহার করা বৈধ। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে মহিলা ও বালিকারা কানে দুল ব্যবহার করত, কিন্তু তিনি এর উপর কোনো প্রকার মন্তব্য করেননি। কিন্তু পুরুষের জন্য তা ব্যবহার করা মাকরূহ। সর্বোপরি পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক কানে যদি ছিদ্র থাকে, তবে এতে পানি পৌঁছানো আবশ্যক। আর যদি ছিদ্রে পানি পৌঁছানোর জন্য দুল নাড়াচাড়া করা লাগে কিংবা দুল না থাকলে ছিদ্রাংশ নাড়াচাড়া করা লাগে তবে তাও করবে। অনুরূপ যদি কারো নাকে ছিদ্র থাকে তবে তাও নাড়াচাড়া করে হলেও এতে পানি পৌঁছাতে হবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ انْضَمَّ الثُّقُبُ بَعْدَ نَزْعِهِ الخ : অর্থাৎ যদি কান থেকে দুল খুলে ফেলে এবং ছিদ্রের অবস্থা এমন থাকে যে, যদি এতে পানি পৌঁছানো হয় তবে পানি পৌঁছে, আর না পৌঁছালে পানি পৌঁছে না তবে এতে পানি পৌঁছাতে হবে। আর যদি পানি পৌঁছানোর জন্য ছিদ্রে কোনো কিছু প্রবেশ করানো লাগে তবে তা تَكَلُّفٌ [কষ্টকর]। তাই এ কষ্টের কোনো প্রয়োজন নেই এবং পানিও পৌঁছানোর প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ فَلَهَا الخ : اَلْأَقْلَفُ বলা হয়, যাকে খতনা করানো হয়নি এবং চামড়া حَشَفَةٌ [সুপারি]-কে ঢেকে রাখে। এমন ব্যক্তির حَشَفَةٌ -কে ঢেকে রাখা চামড়ার আভ্যন্তরীণ অংশের হুকুম কি? এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। শারেহ (র.) বলেন, কোনো ফকীহ-এর নিকট তা শরীরের প্রকাশ্য অঙ্গের হুকুমে। তাই এর আভ্যন্তরীণ অংশও ধোয়া ফরজ। আর যদি এ পর্যন্ত পেশাব পৌঁছে যায় তবে অজু ভেঙ্গে যাবে। যদিও পেশাব বাহিরে বের না হয়। কোনো কোনো ফকীহের নিকট তা অজু ভঙ্গের ক্ষেত্রে তা শরীরের প্রকাশ্য অঙ্গের হুকুমে। অর্থাৎ যদি পেশাব এ পর্যন্ত চলে আসে তবে অজু ভেঙ্গে যাবে। যদিও তা বাহিরে বের না হয়। আর গোসলের ক্ষেত্রে তা শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গের হুকুমে। অর্থাৎ এর ভিতর পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রয়োজন নেই।

আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, "বাদায়ে'" ও "মুখতারুন নাওয়াযিল" গ্রন্থে "প্রথম অভিমতটি বিশুদ্ধ" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। "বাহরুর রায়িক" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে– "قُلْفَةٌ -এর অভ্যন্তরে পানি পৌঁছানো সমস্যা। তাই এর অভ্যন্তরে পানি পৌঁছানো হবে না।" তিনি আরো লেখেন, সম্ভবত নূরুল ঈযাহ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, যদি قُلْفَةٌ -কে খোলা তথা حَشْفَةٌ -এর চামড়া উল্টানো সম্ভব হয় তবে এর নীচ পর্যন্ত পানি পৌঁছাবে; অন্যথায় নয়।

قَوْلُهُ لَا دَلْكُهُ : গোসলে শরীর ঘষা ফরজ নয়, এটি জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা গোসলের আয়াতে مُبَالَغَةٌ -এর শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাই যতটুকু সম্ভব শরীর মেজে-ঘষে গোসল করবে। এটি তাঁর মতে আবশ্যক। জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ যর গিফারী (র.)-কে বলেছেন– اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَاِذَا اَوْجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَتَهُ অর্থাৎ "মুসলমানের অজু [গোসল] হচ্ছে পবিত্র মাটি, যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি না পাওয়া যায়। যদি পানি পাওয়া যায়, তবে যেন সে তার চামড়ায় পানি পৌঁছায়।" এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পানি প্রবাহিত করা ওয়াজিব; শরীর মাজা-ঘষা করা ওয়াজিব নয়। –[টীকা : শরহে বেকায়া]

وَسُنَّتُهُ اَنْ يَّغْسِلَ يَدَيْهِ اِلٰى رُسْغَيْهِ وَفَرْجَهُ وَيُزِيْلَ نَجَسًا اِنْ كَانَ اَىْ اِنْ كَانَ النَّجَسُ اَىِ النَّجَاسَةُ عَلٰى بَدَنِهٖ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ اِلَّا رِجْلَيْهِ اِسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ اَىْ يَغْسِلُ اَعْضَاءَ الْوُضُوْءِ اِلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى كُلِّ بَدَنِهٖ ثَلٰثًا ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ لَا فِىْ مَكَانِهٖ اَىْ اِذَا كَانَ مَكَانَ الْغُسْلِ مُجْتَمِعُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ حَتّٰى اِذَا اغْتَسَلَ عَلٰى لَوْحٍ اَوْ حَجَرٍ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ هُنَاكَ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقْضُ ضَفِيْرَتِهَا وَلَا بَلُّهَا اِذَا ابْتَلَّى اَصْلُهَا خُصَّ الْمَرْأَةُ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) يَكْفِيْكِ اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ اُصُوْلَ شَعْرِكِ وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ نَقْضُهَا وَقِيْلَ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُضَفَّرُ الشَّعْرِ كَالْعُلُوِيَّةِ وَالْاَتْرَاكِ لَا يَجِبُ وَالْاَحْوَطُ اَنْ يَجِبَ وَقَوْلُهٗ وَلَا بَلُّهَا قَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا تَبُلُّ ذَوَائِبَهَا وَتَعْصُرُهَا لٰكِنَّ الْاَصَحَّ عَدَمُ وُجُوْبِهٖ وَهٰذَا اِذَا كَانَتْ مَفْتُوْلَةً اَمَّا اِذَا كَانَتْ مَنْقُوْضَةً يَجِبُ اِيْصَالُ الْمَاءِ اِلٰى اَثْنَاءِ الشَّعْرِ كَمَا فِى اللِّحْيَةِ لِعَدَمِ الْحَرَجِ .

অনুবাদ : গোসলের সুন্নত হলো, [প্রথমে] উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করা, গুপ্তাঙ্গ ধৌত করা এবং নাপাকী দূর করা যদি থাকে অর্থাৎ শরীরে যদি নাপাকী থাকে। অতঃপর অজু করা, কিন্তু উভয় পা না ধোয়া। এটি اِسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ অর্থাৎ দুই পা ব্যতীত অজুর সমস্ত অঙ্গ ধৌত করা। অতঃপর সমস্ত শরীরে তিনবার পানি প্রবাহিত করা। অতঃপর উভয় পা গোসলের স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে [গিয়ে] ধৌত করা। অর্থাৎ তখন– যখন গোসলের স্থানে ব্যবহৃত পানিগুলো জমা হয়ে থাকে। কিন্তু যদি চৌকি কিংবা পাথরের উপর গোসল করে তবে [পা ধোয়ার জন্য গোসলের স্থান ছেড়ে অন্যস্থানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং] সে স্থানেই পা ধুয়ে নেবে। মহিলার জন্য আবশ্যক নয় [গোসলে] তার খোঁপা খোলা এবং খোঁপা [-এর চুল] ভিজানো যদি চুলের গোড়া ভিজে যায়। মহিলাকে এজন্যই খাস করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে বলেছেন, "তোমার চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যাওয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট।" আর পুরুষের জন্য চুলের খোঁপা খোলা আবশ্যক। বলা হয় যে, যদি পুরুষের চুল জটবাঁধা থাকে, যেমন– আলাবিয়্যাহ [আলী বংশীয়] এবং তুর্কি লোকজন, তবে তা খোলা আবশ্যক নয়। কিন্তু সতর্কতা হচ্ছে তাও খোলা আবশ্যক [হওয়া]। গ্রন্থকারের কথা– وَلَا بَلُّهَا [মহিলার খোঁপার চুল ভিজাতে হবে না] আমাদের কতিপয় মাশায়েখ বলেন, মহিলার খোঁপা ভিজিয়ে নিংড়ানো আবশ্যক। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো, তা আবশ্যক নয়। এটি তখন যখন চুল খোঁপা [বা বেণি] বাঁধা থাকে। আর যদি চুল খোলা থাকে তবে চুলের মধ্যখানে পানি পৌঁছানো আবশ্যক। যেমনটি হয় দাড়িতে– কোনো সমস্যা না থাকার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَسُنَّتُهُ [গোসলের সুন্নতসমূহ] : বেকায়া গ্রন্থকারের বর্ণনাধারা মোতাবেক সংক্ষেপে গোসলের সুন্নতসমূহ হচ্ছে–
১. কবজি পর্যন্ত হস্তদ্বয় ধৌত করা।
২. গুপ্তাঙ্গ ধৌত করা।
৩. যদি শরীরে কিংবা কাপড়ে নাপাকী থাকে তবে তা পরিষ্কার করা।
৪. পদদ্বয় ব্যতীত অজুর অন্যান্য অঙ্গ ধৌত করে অজু করা।
৫. সমস্ত শরীরে তিনবার পানি প্রবাহিত করা।
৬. যদি গোসলের স্থানে ব্যবহৃত পানি জমে থাকে, তবে অন্য স্থানে গিয়ে পদদ্বয় ধৌত করা। অন্যথায় সে স্থানেই ধৌত করা।
৭. মহিলার বেণি বাঁধা চুলের গোড়ায় যদি পানি না পৌঁছে তবে বেণি খুলে সেখানে পানি পৌঁছানো।

قَوْلُهُ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ إِلَى رُسْغَيْهِ الخ : সুন্নত তরিকার গোসলে প্রথমে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। কেননা, এ হস্তদ্বয় সমস্ত শরীর ও কাপড় পাক করার মাধ্যম। তারপর গুপ্তাঙ্গ ধৌত করতে হবে। কেননা, এটি নাপাকীর স্থল। তা ছাড়া এতে নাপাকী লেগে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অতঃপর শরীরে বা কাপড়ে নাপাকী থাকলে তা ধুয়ে নেবে, যাতে করে এর উপর পানি ঢাললে নাপাকী অন্যস্থানে না লাগে।

قَوْلُهُ يَغْسِلُ أَعْضَاءَ الْوُضُوْءِ إِلَّا رِجْلَيْهِ : يَغْسِلُ থেকে নিয়ে তৎপরবর্তী অংশ বেকায়া গ্রন্থকারের يَتَوَضَّأُ إِلَّا رِجْلَيْهِ ইবারতের ব্যাখ্যা। এর দ্বারা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-কে স্পষ্ট করা হয়েছে। তবে এর উপর একটি প্রশ্ন হয় যে, এখানে তো أَعْضَاءُ مَغْسُوْلَةٌ এর অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু مَسْحُ الرَّأْسِ তো এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই يَتَوَضَّأُ - يَغْسِلُ-এর অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়। উত্তরে বলা হয় যে, يَغْسِلُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো غَسْل عَامْ যা غَسْل ও مَسَح-কে শামিল রাখে। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন যে, يَتَوَضَّأُ - يَغْسِلُ-এর ব্যাখ্যা নয়। কেননা, তখন প্রশ্ন হয়; বরং এটি مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর إِظْهَارٌ বা প্রকাশকারী।

قَوْلُهُ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى كُلِّ بَدَنِهِ الخ : এ عِبَارَةٌ-এর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অজু করা এবং সমস্ত শরীরে পানি ঢালার মাঝে তারতীব সুন্নত। অনুরূপ পানি প্রবাহিত করা সুন্নত। অতএব, যদি পানি প্রবাহিত না করা হয় তবে সুন্নত তরিকার গোসল হবে না, যদিও حَدَثٌ [অপবিত্রতা] দূর হয়ে যায়। উক্ত প্রক্রিয়া হচ্ছে– স্রোতহীন, স্থির এবং স্বল্প পানির ক্ষেত্রে। আর যদি পানির স্রোত থাকে কিংবা পানি অনেক হয়। যেমন– পুকুর ইত্যাদি এবং ডুব দিয়ে এতটুকু সময় থাকে যে, ধারাবাহিকভাবে অজু ও গোসল হয়ে যায়, তবে এর দ্বারাও সুন্নত তরিকার গোসল হয়ে যাবে; অন্যথায় নয়।

উক্ত عِبَارَةٌ-এর মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করার সময় কুলি করবে না এবং নাকেও পানি দেবে না। কেননা, তা অজুর সময় আদায় করা হয়েছে, যা গোসলের স্থলাভিষিক্ত।

❖ **শরীরে পানি ঢালার পদ্ধতি :** আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, শরীরে পানি ঢালার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি অভিমত রয়েছে–
১. প্রথমে ডান কাঁধে তিনবার পানি ঢালবে। অতঃপর বাম কাঁধে তিনবার। অতঃপর মাথা ও সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করবে।
২. প্রথমে ডানদিকে তিনবার পানি ঢালবে। অতঃপর মাথায় ঢালবে। অতঃপর বামদিকে তিনবার ঢালবে।
৩. প্রথমে মাথায় তিনবার পানি ঢালবে। তারপর ডান কাঁধে, অতঃপর বাম কাঁধে পানি ঢালবে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এ তৃতীয় অভিমতটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, এটিই ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ -

قَوْلُهُ إِذَا كَانَ مَكَانُ الْغُسْلِ مُجْتَمَعَ الْمَاءِ الخ : ইতঃপূর্বে বেকায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেছিলেন যে, গোসলের সুন্নতসমূহের একটি হচ্ছে, শুধু পদদ্বয় ব্যতীত অজুতে সমস্ত অঙ্গ ধৌত করে অজু করা। এখানে এসে বলছেন যে, গোসল শেষে উক্ত পদদ্বয় ধৌত করবে। তবে গোসল শেষে পা ধৌত করা নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের তিনটি অভিমত রয়েছে।

১. مُطْلَقًا গোসল শেষে পা ধৌত করবে না; বরং অজুর সময় পা-ও ধুয়ে ফেলবে। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। আমাদের কোনো কোনো ইমামও তা গ্রহণ করেছেন।

২. مُطْلَقًا গোসল শেষে পা ধৌত করবে। আমাদের অধিকাংশ ইমামই এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। এটিই বেকায়া গ্রন্থকারের মাযহাব।

৩. যদি এমন স্থানে গোসল করে যে, সেখানে তার ব্যবহৃত পানি জমে থাকে, তবে গোসল শেষে পা ধৌত করবে এবং অন্য স্থানে গিয়ে ধৌত করবে। আর যদি চৌকি কিংবা পাথর কিংবা অন্য কোনো উঁচু জায়গায় গোসল করে যেখানে তার ব্যবহৃত পানিগুলো জমে থাকে না, তবে গোসলের পূর্বে অজুর সময়ই পা ধুয়ে নেবে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত মতানৈক্য শুধু উত্তম ও অনুত্তম হিসেবে। অন্যথায় উল্লিখিত তিন صُوْرَة ই জায়েজ।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقْضُ ضَفِيْرَتِهَا الخ : জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, মহিলার হায়েজের গোসল হোক কিংবা নিফাসের গোসল হোক কিংবা জানাবাতের গোসল হোক কিংবা অন্য কোনো গোসল হোক, তার মাথার বেণি বা খোঁপা খুলতে হবে না। তার মাথার চুল খুলে ভিজানো বা সমস্ত চুলে পানি পৌঁছানো সুন্নতও নয়; বরং তার জন্য চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে দেওয়াই যথেষ্ট। যদিও বেণি শুষ্ক থেকে যায়। কারণ, গোসলে মহিলার বেণি খোলা কষ্টকর। আর শরিয়ত কষ্ট বা সমস্যার اِعْتِبَارٌ করে থাকে, তাই তা ধৌত করতে হবে না।

তা ছাড়া হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর হাদীসও এটা বুঝায়। হাদীসটি নিম্নরূপ–

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ امْرَأَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِىْ اَفَاَنْقُضُهُ فِىْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِىْ عَلٰى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ ـ

অর্থাৎ "হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আমার মাথার চুলগুলো খুব শক্ত করে বেঁধে রাখি। জানাবাতের গোসলের সময় আমার কি তা খুলতে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, না তোমার জন্য মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢেলে দেওয়াই যথেষ্ট। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দেবে। এতেই তুমি পাক হয়ে যাবে।" –[মুসলিম– ৩৩০, আবূ দাউদ– ২৫১, তিরমিযী– ১০৩] এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়, তবে বেণি খুলে চুল ভিজানো আবশ্যক নয়।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُضَفَّرُ الشَّعْرِ الخ : এখানে قِيْلَ শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, এ মাযহাবটি দুর্বল। কেননা, একটু আগেই বলা হয়েছে যে, পুরুষের বেণি খুলে চুলে পানি পৌঁছানো আবশ্যক। মূলত আলাবী [আলী বংশীয়] ও তুর্কি পুরুষদের চুল বেণি বাঁধা কিংবা জটবাঁধা থাকে। عَلَوِىٌّ [আলাবী] ঐ সকল লোকদেরকে বলা হয় যারা হযরত হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর। তবে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বংশধর নয়; বরং হযরত আলী (রা.)-এর অন্যান্য স্ত্রীদের বংশধর।

اَتْرَاكٌ - تُرْك এর বহুবচন, এটি اِسْمُ جِنْس। অর্থ– তুর্কি লোক। সর্বোপরি তাদের বেণি বাঁধা চুল সম্পর্কে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ বর্ণনা হচ্ছে, তাদের বেণি খুলে চুলে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। আর তাঁর দুর্বল বর্ণনা হচ্ছে, অধিক সতর্কতা হচ্ছে, তা খুলে চুলে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব হওয়া। এমনকি যদি হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর উক্ত হাদীস না থাকত তবে মহিলার বেণিও খুলে চুলে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব হতো।

قَوْلُهُ قَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا تَبُلُّ الخ : আমাদের কতিপয় মাশায়েখ বলেন, মহিলার বেণি খুলে চুলে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। এমনকি নিংড়ানোও ওয়াজিব, কিন্তু শারেহ (র.) বলেন যে, বিশুদ্ধ কথা হলো, তা ওয়াজিব নয়; বরং চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। আমাদেরকে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, উপরিউক্ত সমস্ত বিবরণ তখনই প্রযোজ্য যখন চুল বেণি বাঁধা থাকবে। অন্যথায় যদি চুল খোলা থাকে তবে সমস্ত চুল ও চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে। কেননা, তখন আর কোনো কষ্ট থাকে না। যেমন কোনো কষ্ট হয় না দাড়ির গোড়ায় বা দাড়িতে পানি পৌঁছাতে।

وَمُوْجِبُهُ اِنْزَالُ مَنِيٍّ ذِيْ دَفْقٍ وَشَهْوَةٍ عِنْدَ الْاِنْفِصَالِ حَتّٰى لَوْ اَنْزَلَ بِلَا شَهْوَةٍ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) ثُمَّ الشَّهْوَةُ شَرْطٌ وَقْتَ الْاِنْفِصَالِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَ وَقْتُ الْخُرُوْجِ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) حَتّٰى اِذَا انْفَصَلَ عَنْ مَكَانِهٖ بِشَهْوَةٍ وَاَخَذَ رَأْسَ الْعُضْوِ حَتّٰى سَكَنَتْ شَهْوَتُهٗ فَخَرَجَ بِلَا شَهْوَةٍ يَجِبُ الْغُسْلُ عِنْدَهُمَا لَا عِنْدَهٗ وَاِنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ اَنْ يَبُوْلَ ثُمَّ خَرَجَ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ يَجِبُ الْغُسْلُ ثَانِيًا عِنْدَهُمَا لَا عِنْدَهٗ وَلَوْ فِيْ نَوْمٍ وَلَا فَرْقَ فِيْ هٰذَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) فِيْ غَيْرِ رِوَايَةِ الْاُصُوْلِ اِذَا تَذَكَّرَتِ الْاِحْتِلَامَ وَالْاِنْزَالَ وَالتَّلَذُّذَ وَلَمْ تَرَ بَلَلًا كَانَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ شَمْسُ الْاَئِمَّةِ الْحَلْوَائِيُّ لَا يُوْخَذُ بِهٰذِهِ الرِّوَايَةِ ـ

অনুবাদ : গোসল ওয়াজিব [ফরজ] হওয়ার কারণ হলো, মনি [বীর্য] নির্গত হওয়া, যা স্বস্থান থেকে পৃথক হওয়ার সময় সবেগে এবং উত্তেজনার সাথে বের হয়। এমনকি যদি উত্তেজনা ব্যতীত মনি বের হয়, তবে আমাদের নিকট গোসল আবশ্যক নয়। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। অতঃপর মনি স্বস্থান থেকে পৃথক হওয়ার সময় উত্তেজনার সাথে পৃথক হওয়ার শর্ত– ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট মনি নির্গত হওয়ার সময় উত্তেজনার সাথে নির্গত হওয়া শর্ত। এমনকি যদি মনি স্বস্থান থেকে উত্তেজনার সাথেই পৃথক হয় আর উক্ত ব্যক্তি [আপন] লিঙ্গের মাথা চেপে ধরে, ফলত উত্তেজনা থেমে যায়। অতঃপর মনি নির্গত হয় উত্তেজনা ব্যতীত, তবে طَرَفَيْن (رحـ) [ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)]-এর নিকট গোসল ওয়াজিব এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর নিকট গোসল ওয়াজিব নয়। আর যদি [উক্ত প্রক্রিয়ায়] পেশাব করার পূর্বে গোসল করে ফেলে, অতঃপর বাকি মনি নির্গত হয়, তবে (رحـ) طَرَفَيْن -এর নিকট দ্বিতীয়বার গোসল করা ওয়াজিব এবং আবূ ইউসুফ (র.) -এর নিকট ওয়াজিব নয়। যদিও তা ঘুমন্তাবস্থায় হয়। আর এ [মনি উত্তেজনার সাথে নির্গত হওয়া ও গোসল ওয়াজিব হওয়ার] ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই [বরং বরাবর]। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে একটি বিরল বর্ণনা রয়েছে যে, যদি মহিলার ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর স্বপ্নদোষ, মনি নির্গত হওয়া ও তালাজ্জুজ [মনি নির্গত হওয়ার স্বাদ কিংবা সহবাসের স্বাদ]-এর কথা স্মরণ হয়; কিন্তু সে [কাপড় ইত্যাদিতে] কোনো সিক্ততা না দেখে, তবে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব। শামসুল আইম্মাহ হুলওয়াঈ (র.) বলেন, উক্ত বর্ণনা গ্রহণ করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

❖ **গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ :** বেকায়া গ্রন্থকারের বর্ণনাধারা মোতাবেক গোসল ফরজ হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১. জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় নারী বা পুরুষের সবেগে ও কামোদ্দীপনার সাথে বীর্যস্খলন।

২. বীর্যস্খলন ব্যতীত দুই যৌনাঙ্গের মিলন। অন্যকথায় পুরুষের যৌনাঙ্গের حَشَفَةٌ [পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ] মহিলার যৌনাঙ্গে কিংবা পুরুষ ও মহিলার পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করা, যদিও বীর্যপাত না হয়।

৩. ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তি কাপড়ে মনি বা মজি দেখা, যদিও স্বপ্নদোষ না হয়ে থাকে। আর স্বপ্নদোষ হলে তো গোসল ওয়াজিব হবেই।

৪. ঋতুস্রাব -[এর সমাপ্তি]।

৫. নিফাস-[এর সমাপ্তি]।

قَوْلُهُ وَمُوْجِبُهُ اِنْزَالُ مَنِيٍّ ذِىْ دَفْقٍ الخ : বেকায়া গ্রন্থকার (র.) গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহের প্রথমেই উল্লেখ করেছেন- اِنْزَالُ مَنِيٍّ বা "বীর্যস্খলন।" এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার পূর্বে مَنِىْ -এর সংজ্ঞা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। আল্লামা ইউসুফ বিননূরী (র.) মা'আরিফুস সুনান গ্রন্থে مَنِىْ -এর সংজ্ঞা এভাবে উল্লেখ করেছেন-

وَالْمَنِيُّ مَاءٌ اَبْيَضُ ثَخِيْنٌ يَتَدَفَّقُ فِىْ خُرُوْجِهِ وَيَخْرُجُ بِشَهْوَةٍ وَيَتَلَذَّذُ بِخُرُوْجِهِ وَيَسْتَعْقِبُهُ الْفُتُوْرُ وَلَهُ رَائِحَةٌ كَرَائِحَةِ الطَّلْعِ ـ

অর্থাৎ "মনি বলা হয় গাঢ় শুভ্র পানিকে, যা কামোদ্দীপনার সাথে সজোরে নির্গত হয়। তা নির্গত হওয়ার দ্বারা স্বাদ পাওয়া যায়। নির্গত হওয়ার পর শরীরে দুর্বলতা চলে আসে এবং এর গন্ধ হয় খেজুরের শীষের গন্ধের ন্যায়।" -[মা'আরিফুল সুনান ১ : ৩৭৬]

মনির উল্লিখিত সংজ্ঞার সবগুলো কথা পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে মহিলার বীর্য হয় পাতলা এবং হলুদ বর্ণের।

বেকায়া গ্রন্থকারের اِنْزَالُ الْمَنِيِّ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বীর্য শরীরের বাহিরে নির্গত হওয়া কিংবা এর হুকুমে হওয়া। যেমন, قُلْفَةٌ তথা লিঙ্গের মাথার অকর্তিত চামড়া পর্যন্ত আসা। অতএব, যদি বীর্য লিঙ্গের ছিদ্রেই থেকে যায় তবে এর দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) : শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) এ عِبَارَةٌ দ্বারা আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে একটি مُخْتَلَفٌ فِيْهِ মাসআলার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মাসআলাটি হচ্ছে- কামোদ্দীপনা ব্যতীত বীর্যস্খলন গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ হওয়া ও না হওয়া। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ-

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, যদি কামোদ্দীপনা ব্যতীত বীর্যস্খলন হয় তবে এর দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, مُطْلَقًا বীর্যস্খলন গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ। চাই কামোদ্দীপনার সাথে হোক কিংবা না হোক। তাঁর সঙ্গে ইমাম মালেক (র.)-ও আছেন।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ "বীর্য নির্গত হওয়ার দ্বারা গোসল ওয়াজিব" দ্বারা দলিল পেশ করেন। وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীস شَهْوَةٌ [কামোদ্দীপনা]-এর কয়েদ থেকে مُطْلَقٌ আর اَلْمُطْلَقُ يَجْرِىْ عَلٰى اِطْلَاقِهٖ এ কানুন অনুযায়ী হাদীসটি مطلق-ই থাকবে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বীর্য বের হলেই গোসল ওয়াজিব। চাই شَهْوَةٌ -এর সাথে হোক, কিংবা না হোক। ওলামায়ে আহনাফ আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا "যদি তোমরা জুনূবী হও তবে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে" দ্বারা দলিল পেশ করেন। وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, কোনো ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কাম ইচ্ছা পূর্ণ করলে আরবিগণ বলেন- اَجْنَبَ الرَّجُلُ, যা شَهْوَةٌ -এর সাথে নির্গত হওয়া বুঝায়। جَنَابَةٌ শব্দের অর্থও شَهْوَةٌ -এর সাথে বীর্য নির্গত হওয়া। আর আয়াতে পবিত্রতা অর্জনের সাথে জুনূবীও শামিল। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গোসল ওয়াজিব হয় জুনূবী হলে। আর জুনূবী হয় شَهْوَةٌ -এর সাথে বীর্যপাত হলে। অতএব, شَهْوَةٌ ব্যতীত বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব হবে না।

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) [ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে জবাব] : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হিসেবে পেশকৃত হাদীসও شَهْوَةٌ -এর সাথে বীর্যপাত হওয়ার অর্থেই ব্যবহৃত হবে। কেননা, হাদীসটি শব্দের দিক থেকে ব্যাপক। তাইতো এ হাদীসে পেশাব, মযি, উত্তেজনা ও উত্তেজনাবিহীন বীর্যস্খলন সবগুলোই শামিল। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, এ হাদীস দ্বারা

সবগুলো উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং যেহেতু উত্তেজনার সাথে বীর্য নির্গত হলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়, তাই এ হাদীসকে উত্তেজনার সাথে বীর্য নির্গত হওয়ার অর্থেই গণ্য করতে হবে।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর– ১ : ৬৪-৬৬, বাদায়িউস সানায়ে'– ১ : ১৬৪, বাহরুর রায়িক– ১ : ৯৯-১০২]

قَوْلُهُ ثُمَّ الشَّهْوَةُ شَرْطٌ وَقْتَ الْاِنْفِصَالِ الخ : এ عِبَارَةٌ দ্বারা শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) আমাদের তিন ইমামের মাঝে একটি مُخْتَلَفٌ فِيْهِ মাসআলার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মাসআলাটি হচ্ছে, বীর্য লিঙ্গ থেকে নির্গত হওয়ার সময় উত্তেজনা (شَهْوَةٌ) থাকা শর্ত কিনা? এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : এতে সকল ইমাম একমত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বির্য লিঙ্গ থেকে নির্গত না হবে ততক্ষণ গোসল ওয়াজিব হবে না। কেননা, মনি স্বস্থান থেকে শুধু পৃথক হওয়ার দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয় না এবং এতেও একমত যে, বীর্য স্থান থেকে পৃথক হওয়ার সময় شَهْوَةٌ -এর সাথে পৃথক হতে হবে। কিন্তু মতানৈক্য হচ্ছে, যখন বীর্যটা লিঙ্গের মাথা থেকে নির্গত হয় তখন شَهْوَةٌ শর্ত কিনা।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, বীর্য লিঙ্গ থেকে নির্গত হওয়ার সময় شَهْوَةٌ শর্ত নয়; বরং اِنْفِصَالٌ -এর সময় তা শর্ত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, লিঙ্গ থেকে বীর্য নির্গত হওয়ার সময়ও شَهْوَةٌ শর্ত।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, গোসল ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে বীর্য স্বস্থান থেকে পৃথক হওয়া ও লিঙ্গ থেকে নির্গত হওয়ার উপর। আর সর্বসম্মতিক্রমে বীর্য স্বস্থান থেকে পৃথক হওয়ার সময় شَهْوَةٌ শর্ত, তাই নির্গত হওয়ার সময়ও شَهْوَةٌ শর্ত হবে। অর্থাৎ তিনি اِنْفِصَالٌ -এর সময়কে خُرُوْجٌ -এর সময়ের উপর কিয়াস করেন।

আর তরফাইনের দলিল হলো, বীর্য স্বস্থান থেকে পৃথক হওয়ার সময় যেহেতু شَهْوَةٌ পাওয়া গেছে, তাই جَنَابَةٌ -এর মর্ম পাওয়া গেছে। ফলত এর দাবি হলো, কোনো অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা ছাড়াই বীর্য নির্গত হওয়ার সাথে সাথে গোসল ওয়াজিব হওয়া।

تَرْجِيْحُ الرَّاجِحِ : যেহেতু এখানে সর্বাধিক সতর্কতার সুরত হচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব, তাই এটিই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাবে সতর্কতা তুলনামূলক কম।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর– ১ : ৬৬, বাদায়িউস সানায়ে'– ১ : ১৪৮, বাহরুর রায়িক– ১ : ১০২-১০৩]

قَوْلُهُ وَلَوْ فِيْ نَوْمٍ : এখানে বেকায়া গ্রন্থকার (র.) বলছেন, বীর্যস্খলন যদিও নিদ্রিত অবস্থায় হয় তবুও গোসল ওয়াজিব হবে। হ্যাঁ, যদি কারো স্বপ্নদোষ হয়, কিন্তু শরীর বা বিছানায় সিক্ততা বা অন্য কোনো নিদর্শন না পাওয়া যায়, তবে তার উপর গোসল আবশ্যক নয়। আর যদি সিক্ততা দেখে তবে স্বপ্ন স্মরণ হোক বা না হোক তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে।

وَغَيْبَةُ حَشْفَةٍ فِيْ قُبُلٍ اَوْ دُبُرٍ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ بِهٖ وَ رُؤْيَةُ الْمُسْتَيْقِظِ الْمَنِيِّ اَوْ الْمَذِيِّ وَاِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ اَمَّا فِى الْمَنِيِّ فَظَاهِرٌ وَاَمَّا فِى الْمَذِيِّ فَلِاحْتِمَالِ كَوْنِهٖ مَنِيًّا رَقَّ بِحَرَارَةِ الْبَدَنِ وَفِيْهِ خِلَافُ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَانْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ عَلٰى قِرَاءَةِ التَّشْدِيْدِ وَلَمَّا كَانَ الْاِنْقِطَاعُ سَبَبًا لِلْغُسْلِ فَاِذَا انْقَطَعَ ثُمَّ اَسْلَمَتْ لَا يَلْزَمُهَا الْاِغْتِسَالُ اِذَا وَقْتُ الْاِنْقِطَاعِ كَانَتْ كَافِرَةً وَهِىَ غَيْرُ مَامُوْرَةٍ بِالشَّرَائِعِ عِنْدَنَا وَمَتٰى اَسْلَمَتْ لَمْ يُوْجَدِ السَّبَبُ وَهُوَ الْاِنْقِطَاعُ بِخِلَافِ مَا اِذَا اَجْنَبَتِ الْكَافِرَةُ ثُمَّ اَسْلَمَتْ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ لِاَنَّ الْجَنَابَةَ اَمْرٌ مُسْتَمِرٌّ فَيَكُوْنُ جُنُبًا بَعْدَ الْاِسْلَامِ وَالْاِنْقِطَاعُ غَيْرُ مُسْتَمِرٍّ فَافْتَرَقَا لَا وَطْئُ بَهِيْمَةٍ بِلَا اِنْزَالٍ ـ

অনুবাদ : পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ [মহিলার] যৌনাঙ্গে কিংবা পায়খানার রাস্তায় ঢুকে যাওয়া, কর্তা এবং কৃত ব্যক্তি [উভয়]-এর উপর [গোসল ওয়াজিব হবে]। ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তির বীর্য কিংবা মযি দেখা– যদিও স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না হয়। তবে বীর্যের ক্ষেত্রে গোসল ওয়াজিব হওয়া তো স্পষ্ট [যে, বীর্য নির্গত হওয়ার কারণেই গোসল ওয়াজিব হয়]। মযির ক্ষেত্রে এ কারণে গোসল ওয়াজিব হবে যে, হতে পারে এটিও বীর্য [মনি], যা শরীরের উত্তাপের কারণে পাতলা হয়ে গেছে। এতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। হায়েজ ও নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়া [গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ]। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ –তারা [স্ত্রীগণ] উত্তমরূপে শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না।] يَطَّهَّرْنَ-এর কেরাত হবে তাশদীদের সাথে। [যেহেতু রক্ত বন্ধ হওয়া হচ্ছে গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ, তাই যখন রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, অতঃপর উক্ত মহিলা মুসলমান হয়, তখন তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না। কেননা, রক্ত বন্ধ হওয়ার সময় সে কাফের ছিল। সে তখন আমাদের নিকট শরিয়তের বিধিবিধানের প্রতি আদিষ্ট নয়। আর যখন সে মুসলমান হয়েছে তখন কারণ তথা 'রক্ত বন্ধ হওয়া' পাওয়া যায়নি। পক্ষান্তরে যখন কাফের নারী জুনূবী হয় অতঃপর মুসলমান হয়, তখন তার উপর জানাবত (جَنَابَةٌ)-এর গোসল ওয়াজিব হবে। কেননা, জানাবাত (جَنَابَةٌ) একটি স্থায়ী বিষয়, তাই ইসলাম গ্রহণ করার পরেও সে জুনূবীই থাকছে। আর হায়েজ-এর রক্ত বন্ধ হওয়া একটি অস্থায়ী বিষয়। তাই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। আর বীর্যস্খলন ব্যতীত চতুষ্পদ জন্তুর সঙ্গে অপকর্ম করা গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَغَيْبَةُ حَشْفَةٍ الخ : حَشْفَةٌ বলা হয়– رَأْسُ الذَّكَرِ اِلَى الْمَقْطَعِ 'লিঙ্গের মাথার অংশকে যা খতনা করার পর ফুলের কলির মতো দেখা যায়।' গ্রন্থকারের وَغَيْبَةُ حَشْفَةٍ الخ ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যদি ঐ حَشْفَةٌ [পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ] মহিলার গুপ্তাঙ্গে ঢুকে যায় কিংবা কারো পায়খানার রাস্তা দিয়ে ঢুকে যায় তবে উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হবে। এর দ্বারা চাই বির্যপাত হোক কিংবা না হোক; বরং مُطْلَقًا প্রবেশ করার দ্বারাই গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَغَابَتِ الْحَشْفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ اَنْزَلَ اَوْ لَمْ يَنْزِلْ

অর্থাৎ "উভয় খতনার স্থান যখন মিলিত হয় এবং পুরুষাঙ্গের মাথা মহিলার যৌনাঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন গোসল ওয়াজিব হয়, বীর্যস্খলন ঘটুক বা না ঘটুক।" –[বুখারী-হাদীস নং ২৯১, মুসলিম– হাদীস নং ৩৪৯]

তা ছাড়া যে জিনিসের উপর হুকুম দেওয়া হয় তা যদি خَفِىٌّ হয়, আর তার কোনো سَبَبٌ প্রকাশ হয় তখন এ ঐ سَبَبٌ ظَاهِرٌ -এর স্থলাভিষিক্ত হয়। আর এখানে اِلْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ হলো বীর্য নির্গত হওয়ার سَبَبٌ এবং বীর্য দ্বারা যে গোসলের হুকুম দেওয়া হবে তা হচ্ছে خَفِىٌّ বিষয়। আবার কখনো বীর্যস্খলন কম হওয়ার কারণে অজ্ঞাতও থেকে যায় যে, বীর্যস্খলন হলো কি হলো না। এজন্য اِنْزَالُ الْمَنِىِّ -কে- اِلْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ তথা বীর্যস্খলনের স্থলে ধরা হয়েছে। গোসলের হুকুমও اِلْتِقَاءُ -এর উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে; বীর্যস্খলনের উপর ভিত্তি করে নয়।

উল্লেখ্য যে, ইসলামের শুরু যুগে নবী ﷺ-এর اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ [বীর্যস্খলনের কারণে গোসল ওয়াজিব] হাদীসের উপর ভিত্তি করে কতিপয় সাহাবী বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বির্যস্খলন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোসল ওয়াজিব হবে না, কিন্তু পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে এসে সাহাবায়ে কেরামের এর উপর ইজমা' হয়েছে যে, اِلْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ হলেই গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে, যদিও বীর্যস্খলন না হয়। কেননা, এটি বির্যস্খলনের জন্য سَبَبٌ -

যদি পুরুষাঙ্গ গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করানো হয় তারও একই হুকুম অর্থাৎ গোসল ওয়াজিব হবে; যদিও বীর্যস্খলন না হয়। কেননা, বীর্যস্খলনের কারণ এখানেও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এমনকি কোনো কোনো ফাসিক লোক গুহ্যদ্বারে কামভাব চরিতার্থ করাকে সামনের রাস্তার তুলনায় প্রাধান্য দেয়। তাইতো কোনো কোনো কট্টর ফকীহ বলেন, দাড়িহীন বালকের مُحَاذَاتٌ দ্বারা এমনিভাবেই নামাজ ফাসিদ হয়ে যায় যেমনিভাবে মহিলাদের مُحَاذَاتٌ দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যার সাথে এ কাজ করা হয়, সতর্কতাস্বরূপ তার উপরও গোসল ওয়াজিব। কেননা, হতে পারে সেও তৃপ্তি অনুভব করেছে এবং বীর্যও নির্গত হয়েছে। অথবা সে তৃপ্তি অনুভব করেনি এবং তার বীর্যও নির্গত হয়নি, কিন্তু পবিত্রতার ক্ষেত্রে যেহেতু সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তাই তার উপরও গোসল ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে পশুসঙ্গম ও হস্তমৈথুন একটি ভিন্ন বিষয়। তাই এখানে বীর্যস্খলন ব্যতীত গোসল ওয়াজিব হবে না। কারণ, এখানে বীর্যস্খলনের سَبَبٌ একেবারেই দুর্বল। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় আরো কিছু সুরত উল্লেখ করেছেন যে, যদি পুরুষ মহিলার যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্য স্থানে সহবাস করে, আর حَشْفَةٌ [পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ] অদৃশ্য হয়নি, কিন্তু বীর্যস্খলন হয়েছে এবং উক্ত বীর্য মহিলার যৌনাঙ্গে প্রবাহিত করে দেয়, তবে মহিলার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না।

গ্রন্থকারের عِبَارَةٌ -এ- حَشْفَةٌ শব্দ দ্বারা মানুষ ও জিনের حَشْفَةٌ উদ্দেশ্য। অতএব, যদি কোনো জিন মহিলার সঙ্গে সহবাস করে তবে উক্ত মহিলার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। জিন ও মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো জন্তুর حَشْفَةٌ যদি মহিলা নিজের যৌনাঙ্গে প্রবেশ করায় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বীর্যস্খলন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর– ১ : ৬৭–৬৯, বাদায়িউস সানায়ে'– ১ : ১৪৭–১৪৮, বাহরুর রায়িক– ১ : ১০৯–১১২, ফাতহুল মুলহিম– ১ : ৪৮৪–৪৮৬, মা'আরিফুস সুনান– ১ : ৩৬৮–৩৭৩, দরসে তিরমিযী– ১ : ৩৪০–৩৪২]

قَوْلُهُ وَاَمَّا فِى الْمَذِىِّ فَلِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ الخ : 'যখীরাহ' (ذَخِيْرَةٌ) নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তি যদি স্বীয় বিছানায় কিংবা রানে সিক্ততা দেখে তার স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকে এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তা মনি কিংবা মযি, অথবা সন্দেহ যে, মনি বা মযি হবে তবে সর্বাবস্থায় তার উপর গোসল ওয়াজিব। কিন্তু যদি ওদি (ودى) হওয়া দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তবে গোসল ওয়াজিব হবে না। আর যদি স্বপ্নদোষের কথা মনে না থাকে এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে, তা ওদি, তবে তাহলেও গোসল ওয়াজিব হবে না। স্বপ্নদোষের কথা মনে না থাকাবস্থায় যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তা মনি তবে গোসল ওয়াজিব। এ অবস্থায়ই যদি মনি না মযি সন্দেহ হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, গোসল ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না।

উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে আমরা مَنِىٌّ -এর সংজ্ঞা উল্লেখ করেছি। এখানে যেহেতু সংক্ষিপ্তভাবে وَدِىٌّ ও مَذِىٌّ -এর আলোচনা চলে এসেছে তাই مَذِىٌّ ও وَدِىٌّ -এর সংজ্ঞাও উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। শায়খ ইউসুফ বিননূরী (র.) মা'আরিফুস সুনান গ্রন্থে مَذِىٌّ ও وَدِىٌّ -এর সংজ্ঞা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وَالْمَذِىُّ : مَاءٌ اَبْيَضُ رَقِيْقٌ لَزِجٌ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ اَتذكر الجِمَاعِ أَوْ إِرَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَا دَفْقٍ وَلَا يُعَقِّبُهُ فُتُوْرٌ وَ رُبَمَا لَا يَحِسُّ بِخُرُوْجِهِ ـ

অর্থাৎ "মযি বলা হয়, আটাল পাতলা সাদা পানিকে, যা সজোর ও উত্তেজনা ব্যতীত নারীর সঙ্গে ছলনা করা কিংবা সহবাসের আলোচনা অথবা সহবাসের ইচ্ছা করার সময় নির্গত হয় এবং তা নির্গত হওয়ার পর শরীরে দুর্বলতাও আসে না এবং কখনো কখনো তা বের হওয়ার সময় টেরও পাওয়া যায় না।"

وَالْوَدِيُّ : مَاءٌ اَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِيْنٌ يَشْبَهُ الْمَنِيَّ فِى الثَّخَانَةِ وَيُخَالِفُهُ فِى الْكُدُوْرَةِ وَلاَ رَائِحَةَ لَهُ ـ

অর্থাৎ "ওদি হলো, গাঢ় ঘোলা সাদা পানি, যা ঘনত্বের ক্ষেত্রে মনির মতোই হয় এবং ঘোলার ক্ষেত্রে মনির পরিপন্থি হয়।" –[মা'আরিফুস সুনান– ১ : ৩৭৬-৩৭৭]

قَوْلُهُ وَانْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ الخ : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, এখানে লক্ষ্যণীয় একটি বিষয় হচ্ছে, اِنْقِطَاعُ الدَّمِ তথা রক্ত বন্ধ হওয়া তো পবিত্র হওয়ার سَبَبٌ তথাপি اِنْقِطَاعُ الدَّمِ কিভাবে গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ হয়? اِنْقِطَاعُ الدَّمِ দ্বারা যদি গোসল ওয়াজিব হয় তবে বুঝা যায় যে, এর পূর্বে সে পবিত্র ছিল। অথচ এর পূর্বেই সে অপবিত্র ছিল। আর اِنْقِطَاعُ الدَّمِ দ্বারা সে পবিত্র হয়। তাই যদি এখানে বলা হতো خُرُوْجُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ [হায়েজ ও নিফাসের রক্ত বের হওয়া গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ] তবে উত্তম হতো। কেননা, ইতঃপূর্বে এ خُرُوْجُ الدَّمِ -ই পবিত্রতা ভঙ্গ করেছে এবং তা-ই এখন পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক করেছে।

قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ الخ : ঋতুস্রাব ও নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়া গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ– এর পক্ষে দলিল হিসেবে শারেহ (র.) আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ -কে তাশদীদের কেরাতের ভিত্তিতে পেশ করেছেন। يَطَّهَّرْنَ শব্দে দুই ধরনের কেরাত জায়েজ– ১. এর هَا ও طَا উভয় অক্ষরকে তাশদীদের সাথে পড়া। তখন এর অর্থ হবে– يَغْتَسِلْنَ [গোসল করা]। ২. طَا অক্ষরে সাকিন এবং هَا অক্ষরে পেশ দিয়ে পড়া। এর অর্থ হবে– يَنْقَطِعُ دَمُ حَيْضِهِنَّ [তাদের হায়েজের রক্ত বন্ধ হওয়া]। তাশদীদের কেরাত হলে পূর্ণ আয়াতের অর্থ হবে– তোমরা তাদের নিকটে যেও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পূর্ণাঙ্গরূপে পবিত্র হয়। আর পূর্ণাঙ্গরূপে পবিত্র তখনই হবে যখন ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গোসল করে নেবে। পক্ষান্তরে তাশদীদবিহীন কেরাতও মুতাওয়াতির। তবে সে সুরতে অর্থ হয়– "তোমরা তাদের নিকটে যেও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।" আর শুধু রক্ত বন্ধ হওয়ার দ্বারা তারা পূর্ণাঙ্গরূপে পবিত্র হতে পারে না, যার কারণে তাদের সঙ্গে সহবাস করা যেতে পারে।

তা ছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (র.) উভয় অবস্থার উপর এভাবে আমল করেন যে, দশদিন পূর্ণ হবার পর যদি ঋতুস্রাব বন্ধ হয়, তবে স্বামীর জন্য স্ত্রীর গোসল ব্যতীতই সহবাস করা জায়েজ, যা তাশদীদবিহীন কেরাত দ্বারা বুঝা যায়। কেননা, মহিলাটি রক্ত বন্ধ হওয়ার পরই পাক হয়ে গেছে। আর যদি দশদিনের কমে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়, তবে সহবাস করার জন্য তার উপর গোসল ওয়াজিব, তাশদীদযুক্ত কেরাত বুঝা যায়।

হায়েজের রক্তের হুকুম ও বিবরণের ন্যায়ই নিফাসের রক্তের হুকুম ও বিবরণ। প্রশ্ন হতে পারে যে, আয়াতে তো নিফাসের কথা উল্লেখ নেই। উত্তর হচ্ছে, আয়াতের শুরু অংশে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– قُلْ هُوَ اَذًى । এ اَذًى [পীড়াদায়ক] রক্তের মধ্যে হায়েজ ও নিফাসের রক্তও শামিল।

قَوْلُهُ وَالْاِنْقِطَاعُ غَيْرُ مُسْتَمِرٍّ فَافْتَرَقَا : جَنَابَةٌ ও اِنْقِطَاعُ الدَّمِ -এর মাঝে পার্থক্যের সারমর্ম হচ্ছে, جَنَابَةٌ -এর গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ (سَبَبٌ) স্বয়ং جَنَابَةٌ -ই। তা গোসলের সময় পর্যন্ত অটুট থাকে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত এ নারী গোসল না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে জুনুবী অবস্থায় থাকবে। অতএব, যখন মুসলমান হলো তখনও তার جَنَابَةٌ বাকি রয়ে গেছে। তাই তার উপর গোসল ওয়াজিব। পক্ষান্তরে হায়েজ ও নিফাসের গোসলের কারণ (سَبَبٌ) اِنْقِطَاعُ الدَّمِ [রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া]। যা একটি অস্থায়ী বিষয়। তা তার মধ্যে পাওয়া গেছে কাফের অবস্থায় অর্থাৎ কাফের অবস্থায় তার اِنْقِطَاعُ الدَّمِ হয়েছে। কিন্তু মুসলমান হওয়ার পর আর তা বাকি থাকেনি। অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পর আর اِنْقِطَاعٌ পাওয়া যায়নি, তাই তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়।

قَوْلُهُ وَلاَ وَطْئُ بَهِيْمَةٍ بِلاَ اِنْزَالٍ : পশু সঙ্গমের বিষয়ে কিছু আলোচনা আমরা পিছনে করেছি। তথাপি এখানে কিছু কথা না বললেই নয় যে, বীর্যপাত ব্যতীত পশুর সঙ্গে সঙ্গম করার দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয় না। হ্যাঁ, যদি বীর্যপাত হয় তবে গোসল ওয়াজিব হবে। কারণ, গোসল ওয়াজিব হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে বীর্যপাত। আর লিঙ্গের حَشَفَةٌ [পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ] প্রবেশ করানো হচ্ছে এর স্থলাভিষিক্ত। কেননা, সাধারণত حَشَفَةٌ প্রবেশ করানোই বীর্যপাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

وَسُنَّ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَالْاِحْرَامِ وَعَرَفَةَ فَغُسْلُ الْجُمُعَةِ سُنَّ لِصَلٰوةِ الْجُمُعَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَيَجُوْزُ الْوُضُوْءُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَالْمَطَرِ وَالْعَيْنِ وَاَمَّا مَاءُ الثَّلْجِ فَاِنْ كَانَ ذَائِبًا بِحَيْثُ يَتَقَاطَرُ يَجُوْزُ وَاِلَّا فَلَا وَاِنْ تَغَيَّرَ بِطُوْلِ الْمَكْثِ اَوْ غَيَّرَ اَحَدَ اَوْصَافِهِ اَىِ الطَّعْمَ اَوِ اللَّوْنَ اَوِ الرِّيْحَ شَىْءٌ طَاهِرٌ كَالتُّرَابِ وَالْاُشْنَانِ وَالصَّابُوْنِ وَالزَّعْفَرَانِ اِنَّمَا عُدَّ هٰذِهِ الْاَشْيَاءُ لِيُعْلَمَ اَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِاَنْ كَانَ الْمَخْلُوْطُ مِنْ جِنْسِ الْاَرْضِ كَالتُّرَابِ اَوْ شَيْئًا يَقْصُدُ بِخَلْطِهِ التَّطْهِيْرَ كَالْاُشْنَانِ وَالصَّابُوْنِ اَوْ شَيْئًا اٰخَرَ كَالزَّعْفَرَانِ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اِنْ كَانَ الْمَخْلُوْطُ شَيْئًا يَقْصُدُ بِهِ التَّطْهِيْرَ يَجُوْزُ بِهِ الْوُضُوْءُ اِلَّا اَنْ يَغْلِبَ عَلَى الْمَاءِ حَتّٰى يَزُوْلَ طَبْعُهُ وَهُوَ الرِّقَّةُ وَالسَّيَلَانُ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا لَا يَقْصُدُ بِهِ التَّطْهِيْرُ فَفِىْ رِوَايَةٍ يُشْتَرَطُ لِعَدَمِ جَوَازِ التَّوَضِّىْ بِهِ غَلَبَتُهُ عَلَى الْمَاءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا يُشْتَرَطُ وَمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْاَرْضِ فَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) .

অনুবাদ : জুমা, দুই ঈদ, ইহরাম ও আরাফার জন্য গোসল করা সুন্নত। জুমার গোসল জুমার নামাজের জন্য সুন্নত [জুমার দিনের জন্য নয়]। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। আসমানের পানি ও ভূমির পানি দ্বারা অজু করা বৈধ। যেমন– বৃষ্টির ও ঝরনার পানি। কিন্তু বরফের পানি যদি গলিত হয় যে, টপকে পড়ছে তবে এর দ্বারা অজু করা বৈধ। অন্যথায় বৈধ নয়। যদিও [বৃষ্টির ও ঝরনার] পানি দীর্ঘ সময় থাকার দরুন পরিবর্তিত হয়ে যায় কিংবা পানির তিনগুণ তথা স্বাদ, রং ও ঘ্রাণ -এর একটিকে কোনো পবিত্র জিনিস যেমন– মাটি, উশনান ঘাস, সাবান ও জাফরান পরিবর্তন করে দেয়। বেকায়া গ্রন্থকার (র.) এ সমস্ত জিনিসকে গণনা [উল্লেখ] করেছেন যাতে করে জানা যায় যে, হুকুম [তথা পানির পবিত্রতা] পরিবর্তিত হয় না যদি পানির সঙ্গে মিশ্রিত বস্তুটা ভূমির جِنْس [প্রকার] থেকে হয়। যেমন– মাটি। অথবা এমন বস্তু যা পানির সঙ্গে মিশানোর দ্বারা পানিকে পবিত্র করা উদ্দেশ্য হয়, যেমন– উশনান ঘাস ও সাবান। অথবা অন্য কোনো বস্তু। যেমন– জাফরান। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট যদি পানির মিশ্রিত বস্তু দ্বারা পানিকে পবিত্র উদ্দেশ্য হয় তবে তো এর দ্বারা অজু করা বৈধ। কিন্তু যদি মিশ্রিত বস্তুটি পানির চেয়ে অধিক হয়, এমনকি পানির তবিয়ত দূরীভূত হয়ে যায় [তবে এর দ্বারা অজু করা বৈধ নয়]। পানির তবিয়ত হচ্ছে, رِقَّةٌ [তরলতা] ও سَيَلَانٌ [প্রবাহ]। আর যদি পানির সঙ্গে মিশ্রিত বস্তু এমন হয় যে, এর দ্বারা পানিকে পবিত্র করা উদ্দেশ্য নয়, তবে তাঁর এক বর্ণনা অনুযায়ী এর দ্বারা অজু বৈধ না হওয়ার জন্য শর্ত হলো, পানির চেয়ে মিশ্রিত বস্তু অধিক হতে হবে। আর অন্য বর্ণনা অনুযায়ী তা শর্ত নয়। [বরং শর্ত ছাড়াই তা বৈধ নয়।] আর যা ভূমির جِنْس [প্রকার] থেকে নয় তাতে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَسُنَّ لِلْجُمُعَةِ الخ : এখানে সুন্নত দ্বারা গোসলের সুন্নত উদ্দেশ্য নয়; বরং সুন্নত গোসল উদ্দেশ্য। বিকায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন যে, চার সময়ে গোসল করা সুন্নত। যথা– ১. জুমার নামাজের জন্য, ২. দুই ঈদের নামাজের জন্য, ৩. ইহরাম বাঁধার জন্য ও ৪. আরাফার ময়দানে অবস্থান করার জন্য।

উল্লেখ্য যে, এখানে দুটি مُخْتَلَفْ فِيْهِ মাসআলা রয়েছে। ১. জুমার গোসল ওয়াজিব না সুন্নত, ২. জুমার গোসল জুমার নামাজের জন্য সুন্নত না জুমার দিনের জন্য সুন্নত। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এ দুটি মাসআলা উল্লেখ করছি।

❖ **জুমার গোসল সুন্নত; ওয়াজিব নয় :** জুমার গোসল ওয়াজিব না সুন্নত এ নিয়ে জমহুর ওলামায়ে কেরাম ও ইমাম মালেক (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, জুমার গোসল সুন্নত। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক (র.) বলেন, জুমার গোসল ওয়াজিব।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম মালেক (র.) নবী ﷺ -এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন–

১. নবী ﷺ ইরশাদ করেন– مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "যে ব্যক্তি জুমা পায় সে যেন গোসল করে।"
–[বুখারী-হাদীস নং ৮৭৭, মুসলিম– হাদীস নং ৮৪৪]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, নবী করীম ﷺ উক্ত হাদীসে اَمْرٌ শব্দ দ্বারা গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন, যা وُجُوْبٌ -এর জন্য ব্যবহার হওয়াই আসল। অতএব, জুমার গোসল ওয়াজিব।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

"জুমার দিন প্রত্যেক বালিগ ব্যক্তির উপর গোসল করা ওয়াজিব।" –[বুখারী– হাদীস নং ৮৭৯, মুসলিম– হাদীস নং ৮৪৬]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিনের গোসলকে ওয়াজিবই বলেছেন।

জমহুর ওলামায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَاغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ .

"যে ব্যক্তি জুমার দিনে অজু করে তার জন্য তা যথেষ্ট এবং ভালো, আর যে গোসল করে তা তার জন্য উত্তম।"
–[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমার দিন যদি কেউ গোসল করে তবে তার জন্য ভালো। এর দ্বারা জুমার গোসল সুন্নত প্রমাণিত হতে পারে না; বরং মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়।

اَلرَّدُّ عَلٰى مَالِكٍ (رح) **[ইমাম মালেক (র.)-এর বিপক্ষে জবাব] :** ইমাম মালেক (র.)-এর প্রথম হাদীসকে মোস্তাহাব অর্থে ধরা হবে, যাতে আমাদের হাদীস ও তাঁর হাদীসের মাঝে কোনো প্রকার বিরোধ না থাকে। তাঁর দ্বিতীয় হাদীসে وَاجِبٌ শব্দের অর্থ مُتَاَكَّدٌ لَازِمٌ যা দ্বারা জুমার দিনের গোসল সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বুঝা যায়; ওয়াজিব নয়। তা ছাড়া তাঁর দ্বিতীয় হাদীস আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীস দ্বারা مَنْسُوْخٌ [রহিত] হয়ে গেছে। যার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, ইসলামের শুরু যুগে জুমার গোসল ওয়াজিব ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর– ১ : ৬৯-৭১, বাহরুর রায়িক– ১ : ১১৬-১১৭, বাদায়িউস সানায়ে'- ১ : ৬০৪, ফাতহুল মুলহিম– ২ : ৩৮৪-৩৮৬, মা'আরিফুস সুনান ২ : ৩২০-৩২১, দরসে তিরমিযী ২ : ২৬৩-২৬৫]

❖ **জুমার দিনের গোসল জুমার নামাজের জন্য সুন্নত :** জুমার দিনের গোসল জুমার নামাজের জন্য সুন্নত, না জুমার দিনের জন্য সুন্নত– এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জুমার দিনের গোসল জুমার দিনের জন্য সুন্নত; জুমার নামাজের জন্য নয়, কিন্তু অন্যান্য কিতাবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-কে اَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ -এর সঙ্গেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ মাযহাবে শুধু হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-কে উল্লেখ করা হয়েছে। اَئِمَّةٌ اَرْبَعَةٌ -এর নিকট জুমার দিনের গোসল জুমার নামাজের জন্য সুন্নত। কোনো কোনো কিতাবে এ মাযহাবে শুধু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-কে উল্লেখ করা হয়েছে।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : প্রথম মাযহাবের অনুসারীগণ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– سَيِّدُ الْاَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ "জুমার দিন সমস্ত দিনের সরদার।" –[মুসনাদে আহমাদ ৩ : ৪৩০]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিনকে সমস্ত দিনের সরদার বলেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফজিলত জুমার দিবসের। তাই সেদিনের গোসল এর জন্যই সুন্নত হবে।

দ্বিতীয় মাযহাবের অনুসারীগণও হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমা পাবে সে যেন জুমার নামাজের জন্য গোসল করে।" –[বুখারী ও মুসলিম]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার নামাজ পাবে সে যেন গোসল করে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কারো উপর জুমার নামাজ ফরজ না হয় তবে তার গোসল করারও প্রয়োজন নেই। অতএব বুঝা যাচ্ছে, জুমার নামাজের জন্যই সেদিনের গোসল সুন্নত।

اَلرَّدُّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْاَوَّلِ : জুমার দিনের ফজিলত জুমার নামাজের জন্যই। ফলত জুমার দিনকে সমস্ত দিনের সরদার বলা হয়েছে। তা ছাড়া তাহারাতের সম্পর্ক নামাজের সাথে; দিন বা সময়ের সাথে নয়। এ কারণেও গোসলের ফজিলত নামাজের জন্য হওয়া চাই; জুমার দিনের জন্য নয়।

উল্লেখ্য যে, প্রথম মাযহাবে যেহেতু জুমার দিনের জন্য গোসল সুন্নত, তাই তাদের নিকট এ সুন্নত সন্ধ্যা পর্যন্ত বাকি থাকবে। অর্থাৎ যদি কেউ জুমার নামাজের পর সন্ধ্যার আগেও গোসল করে তবে তার গোসলের সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। দ্বিতীয় মাযহাব অনুসারীদের মধ্যে ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, গোসল এবং জুমার নামাজে যদি حَدَثٌ চলে আসে অর্থাৎ অজু ভেঙ্গে যায় তবে গোসলের ফজিলত পাওয়া যাবে না। তথা গোসল আদায় হবে না; বরং ফজিলত পাওয়ার জন্য গোসলের সঙ্গে জুমার নামাজে যেতে এবং নামাজ আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-সহ অন্যান্য ইমামগণ বলেন, গোসল এবং জুমার নামাজের মাঝে যদি حَدَثٌ-ও লাহেক হয় তবুও গোসলের ফজিলত পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় মাযহাবে যেহেতু বলা হয়েছে যে, গোসলের ফজিলত জুমার নামাজের জন্য, তাই যাদের উপর জুমার নামাজ ফরজ নয় তাদের জন্য উক্ত গোসল সুন্নত নয়। অনুরূপ দুই ঈদের দিনের গোসল ঈদের নামাজের জন্য, আরাফার দিনের গোসল আরাফার ময়দানে অবস্থান করার জন্য সুন্নত। ইহরাম সম্পর্কে আলোচনা ইনশাআল্লাহ হজ অধ্যায়ে আসবে। গোসলের অধ্যায়ে আমরা এ পর্যন্ত মোট নয় প্রকারের গোসল পেয়েছি। তন্মধ্যে পাঁচটি ফরজ। যথা– ১. বীর্যপাতের কারণে, ২. বীর্যপাত ব্যতীত দুই যৌনাঙ্গের মিলনের কারণে, ৩. স্বপ্নদোষের কারণে, ৪. ঋতুস্রাবের কারণে ও ৫. নিফাসের কারণে। বাকি চারটি হলো সুন্নত। যথা– ১. জুমার দিনের গোসল, ২. দুই ঈদের গোসল, ৩. ইহরামের জন্য গোসল ও ৪. আরাফার দিনের গোসল।

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ الْوُضُوْءُ بِمَاءِ السَّمَاءِ الخ : বেকায়া গ্রন্থকার এ পর্যন্ত অজু ও গোসলের প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছেন। এখানে আলোচনা করছেন যে, কোন জিনিস দ্বারা অজু ও গোসল করা যায়। গ্রন্থকার বলেছেন, আসমানের পানি যেমন– বৃষ্টির পানি এবং ভূমির পানি যেমন– ঝরনার পানি দ্বারা অজু করা বৈধ। মূলত তিনি আসমান ও ভূমির পানি বলে مَاءٌ مُطْلَقٌ-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। مَاءٌ مُطْلَقٌ হচ্ছে, সাত প্রকার। যথা– ১. বৃষ্টির পানি ২. সমুদ্রের পানি ৩. নদী বা খালের পানি ৪. কূপের পানি ৫. বরফ গলা পানি ৬. শিলা গলা পানি ও ৭. ঝরনার পানি।

এসব ধরনের পানি দ্বারাই অজু ও গোসল জায়েজ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا "আমি আসমান থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি।" [২৫ : ৪৮] আর ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন, طَهُوْرٌ বলা হয় 'যা অন্যকে পাক করে।' –[ফাতহুল কাদীর ১ : ৭৪]

উক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের মর্ম হচ্ছে, আমি আসমান থেকে পবিত্রকারী পানি বর্ষণ করি। আর مَاءٌ مُطْلَقٌ-এর উল্লিখিত সাত প্রকারই মূলত আসমানের পানি। ইরশাদ হচ্ছে– اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ "তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন? অতঃপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন। –[৩৯ : ২১]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সমস্ত পানি তথা ভূমির পানিও মূলত আসমানের পানি। অন্যান্য আরো অনেক আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এসব পানি দ্বারা অজু ও গোসল বৈধ। আমরা সংক্ষেপে শুধু এতটুকুই আলোচনা করলাম।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত সাত প্রকারের পানি দ্বারাই نَجَاسَةٌ غَلِيْظَةٌ [গাঢ় নাপাকী] ও نَجَاسَةٌ خَفِيْفَةٌ [হালকা নাপাকী] সব প্রকারের নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া যাবে।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর ১ : ৭৪–৭৬, বাদায়িউস সানায়ে' ১ : ১৩৯-১৪০, বাহরুর রায়িক ১ : ১২২-১২৫]

قَوْلُهُ وَاِنْ تَغَيَّرَ بِطُوْلِ الْمَكْثِ أَوْ غَيْرِ الخ : এখানে বিষয়টি স্পষ্ট যে, পানি পরিবর্তন হওয়ার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। কখনো কোনো অপবিত্র বস্তু মিশ্রণের কারণে পানি পরিবর্তন হয়। কখনো কোনো পবিত্র বস্তু মিশ্রণের কারণে পানি পরিবর্তন হয়। প্রথম সুরত তো স্পষ্ট যে, অপবিত্র বস্তু মিশ্রণের কারণে পানির পবিত্রতা দূর হয়ে গেছে। তাই এর দ্বারা অজু করা বৈধ নয়। আর যদি কোনো পবিত্র বস্তু মিশ্রণের কারণে অথবা পানি দীর্ঘ সময় এক স্থানে অবস্থান করার কারণে পানির মধ্যে পরিবর্তন আসে। কেননা, এক স্থানে পানি দীর্ঘ সময় অবস্থান করার কারণেও পানি পরিবর্তন হয়ে যায়। সর্বোপরি উক্ত পানি দ্বারা অজু বৈধ। কেননা, এ প্রকারের পরিবর্তন দ্বারা পানি مُطَهِّرٌ [পবিত্রকারী] হওয়ার গুণ থেকে দূরে সরে যায় না। কেননা; وَقَدِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ "একবার নবী ﷺ এমন এক পাত্রের পানি দ্বারা অজু করেছিলেন যাতে আটার চিহ্ন ছিল।" –[নাসাঈ শরীফ]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আটা মিশ্রিত পানি দ্বারা অজু করেছেন। অনুরূপ অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে- أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمَيِّتِ اَنْ يَغْسِلَ بِمَاءٍ مَخْلُوْطٍ بِسِدْرٍ "নবী করীম ﷺ বরই পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার নির্দেশ করেছেন।" -[বুখারী ও মুসলিম]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পাতা মিশ্রণের কারণে পানি অপবিত্র হয় না। অন্যথায় নবী করীম ﷺ মৃত ব্যক্তিকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দেওয়ার নির্দেশ দিতেন না।

পবিত্র বস্তু মিশ্রিত পানি দ্বারা অজু করার বৈধতার হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পানির তিনগুণের একগুণে পরিবর্তন আসবে। আর যদি দুইগুণ বা তিনগুণেই পরিবর্তন এসে যায়, তবে এর দ্বারা অজু করা বৈধ নয়। এখানে আমাদের জানা দরকার যে, পানির গুণ তিনটি। যথা- ১. اَلطَّعْمُ [স্বাদ], ২. اَللَّوْنُ [বর্ণ বা রং] ও ৩. اَلرِّيْحُ [গন্ধ] এবং পানির তবিয়ত [স্বভাব] দুটি। যথা- ১. اَلرِّقَّةُ [তরলতা], ২. اَلسَّيْلَانُ [প্রবাহিত হওয়া]।

নেহায়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, "পানির দুই বা তিনগুণ পরিবর্তন হওয়ার পরেও এর দ্বারা অজু করা জায়েজ। এমনকি হেমন্তকালে যখন কূপের মধ্যে বৃক্ষের পাতা পড়ে পানির সব গুণ পরিবর্তন করে দেয় তখনও মাশায়েখগণ উক্ত পানি দ্বারা অজু জায়েজ বলেন।" বুঝা গেল যে, সব গুণ পরিবর্তন হয়ে গেলেও অজু জায়েজ। তবে শর্ত হলো, পানির তরলতা অবশিষ্ট থাকতে হবে। যদি কোনো জিনিস মিশ্রিত হওয়ার দ্বারা পানি গাঢ় হয়ে যায় তবে তাঁদের নিকটও এর দ্বারা অজু জায়েজ নেই।

আমাদের উপরিউক্ত বিবরণের সারমর্ম হচ্ছে, পানি যদি দীর্ঘ সময় একস্থানে অবস্থান করার দরুন পরিবর্তিত হয়ে যায়, কিংবা মাটি জাতীয় কোনো বস্তু মিশ্রিত হওয়ার দ্বারা পানির একগুণ পরিবর্তিত হয়ে যায়, অথবা অন্য কোনো পবিত্র জিনিস যেমন- জাফরান, সাবান ও উশনান ঘাস ইত্যাদি মিশ্রিত হওয়ার দ্বারা পানির এক গুণ পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা অজু ও গোসল জায়েজ। আর যদি দুই বা ততোধিক গুণে পরিবর্তন আসে তবে এর দ্বারা অজু জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اِنْ كَانَ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মাযহাবের সারমর্ম হচ্ছে, যদি পানিতে এমন কোনো বস্তু মিশানো হয় যা দ্বারা পানিকে পবিত্র করা উদ্দেশ্য, তবে তা মিশানো ক্ষতিকর কিছু নয়, যেমন ক্ষতিকর নয় জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকটও। তবে যদি পানির নামই বাকি না থাকে; বরং অন্য কোনো নাম হয়ে যায় তবে তা ক্ষতিকর এবং এর দ্বারা অজু জায়েজ নেই। আর যদি মিশ্রিত বস্তু দ্বারা পানিকে পবিত্র করা উদ্দেশ্য না হয়, তবে এ ক্ষেত্রে তার দুটি বর্ণনা রয়েছে- ১. যদি মিশ্রিত বস্তু পানির চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা অজু বৈধ নয়। ২. مُطْلَقًا উক্ত পানি দ্বারা অজু বৈধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ ধরনের সমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে মিশ্রিত বস্তু পানির চেয়ে বেশি হলে এর দ্বারা অজু বৈধ না হওয়ার হুকুম দেন; অন্যথায় নয়।

قَوْلُهُ فَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ফুকাহায়ে কেরাম এর উপর একমত যে, مُقَيَّدْ পানি দ্বারা حَدَثْ দূরীভূত করা যায় না। অর্থাৎ এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। এমতাবস্থায় যদি مُطْلَقْ পানি না পাওয়া যায় তবে তায়াম্মুম করবে। পানির সঙ্গে মিশ্রিত বস্তু যদি মাটি জাতীয় না হয়। যেমন- জাফরান, সাবান ইত্যাদি এবং এর দ্বারা তার নাম مُطْلَقْ পানি থাকে না; বরং মিশ্রিত বস্তুর নামে নাম হয়ে যায়। যেমন- জাফরানের পানি, সাবানের পানি ইত্যাদি, তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নিকট এর দ্বারা অজু বৈধ নয়। কিন্তু যদি উক্ত মিশ্রিত বস্তু এতই কম হয় যে, তার নাম مُطْلَقْ পানিই রয়ে গেছে তবে এর দ্বারা অজু বৈধ। পক্ষান্তরে ওলামায়ে আহনাফ বলেন, জাফরান মিশ্রিত পানি ও সাবান মিশ্রিত পানি مُقَيَّدْ পানি নয়; বরং مُطْلَقْ পানিই। তাই এর দ্বারা অজু বৈধ। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহনাফের মাঝে পার্থক্য হলো, তিনি জাফরান ও সাবান মিশ্রিত পানিকে مُقَيَّدْ পানি বলেন, আর আহনাফ একে مُطْلَقْ পানিই বলেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যুক্তি হলো, এখানে পানির নামই পরিবর্তন হয়ে যায়। যে পানিকে ফুকাহায়ে কেরাম مُقَيَّدْ পানি বলেন, আর مُقَيَّدْ পানির পরিবর্তে তায়াম্মুমের বিধান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا "যদি তোমরা مُطْلَقْ পানি না পাও তবে তায়াম্মুম কর।" বুঝা গেল, জাফরানের পানি থাকা অবস্থায়ও তায়াম্মুম করতে হবে। পক্ষান্তরে মাটি মিশ্রিত পানি এর ব্যতিক্রম। কারণ, পানি সাধারণত মাটি থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই এর মিশ্রণের পরেও পানি مُطْلَقْ হিসেবেই বাকি থাকে।

আহনাফের যুক্তি হলো, পানির নামটি এখনো সাধারণভাবেই অক্ষুণ্ন আছে। এ ক্ষেত্রে আলাদা নতুন কোনো নাম যুক্ত হয়নি; বরং 'জাফরানের পানি' এমনভাবে বলা হয় যেমন বলা হয় কূপের পানি, ঝরনার পানি অথচ এগুলো مُطْلَقْ পানি। অনুরূপ জাফরানের পানিও مطلق পানি। আহনাফের অন্য একটি যুক্তি হলো, সামান্য জিনিসের মিশ্রণ পরিহার করা অসম্ভব, তাই তা ধর্তব্যও নয়। যেমন মাটি জাতীয় পদার্থের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাই এ ক্ষেত্রে মিশ্রিত বস্তুর আধিক্যই ধর্তব্য।

وَبِمَاءٍ جَارٍ فِيْهِ نَجَسٌ لَمْ يُرَ اَثَرُهُ اَىْ طَعْمُهُ اَوْ لَوْنُهُ اَوْ رِيْحُهُ اِخْتَلَفُوْا فِىْ حَدِّ الْجَارِىْ فَالْحَدُّ الَّذِىْ لَيْسَ فِيْ دَرْكِهِ حَرَجٌ مَا يَذْهَبُ بِتِبْنَةٍ اَوْ وَرَقٍ فَاِذَا سُدَّ النَّهْرُ مِنْ فَوْقٍ وَبَقِيَّةُ الْمَاءِ تَجْرِىْ مَعَ ضُعْفٍ يَجُوْزُ بِهِ الْوُضُوْءُ اِذْ هُوَ مَاءٌ جَارٍ وَكُلُّ مَاءٍ ضَعِيْفِ الْجَرْيَانِ اِذَا تَوَضَّأَ بِهِ يَجِبُ اَنْ يَجْلِسَ بِحَيْثُ لَا يَسْتَعْمِلُ غُسَالَتَهُ اَوْ يَمْكُثُ بَيْنَ الْغُرْفَتَيْنِ مِقْدَارَ مَا يَذْهَبُ غُسَالَتُهُ وَاِذَا كَانَ الْحَوْضُ صَغِيْرًا يَدْخُلُ فِيْهِ الْمَاءُ مِنْ جَانِبٍ وَيَخْرُجُ مِنْ جَانِبٍ اٰخَرَ يَجُوْزُ الْوُضُوْءُ فِىْ جَمِيْعِ جَوَانِبِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى مِنْ غَيْرِ تَفْصِيْلٍ بَيْنَ اَنْ يَكُوْنَ اَرْبَعًا فِىْ اَرْبَعٍ اَوْ اَقَلَّ فَيَجُوْزُ اَوْ اَكْثَرَ فَلَا يَجُوْزُ وَاعْلَمْ اَنَّهُ اِذَا اَنْتَنَ الْمَاءُ فَاِنْ عَلِمَ اَنَّ نَتْنَهُ لِلنَّجَاسَةِ لَا يَجُوْزُ وَاِلَّا يَجُوْزُ حَمْلًا عَلٰى اَنَّ نَتْنَهُ بِطُوْلِ الْمُكْثِ وَاِذَا سُدَّ كَلْبٌ عَرْضَ النَّهْرِ وَيَجْرِى الْمَاءُ فَوْقَهُ اِنْ كَانَ مَا يُلَاقِى الْكَلْبَ اَقَلَّ مِمَّا لَا يُلَاقِيْهِ يَجُوْزُ الْوُضُوْءُ فِى الْاَسْفَلِ وَاِلَّا لَا قَالَ الْفَقِيْهُ اَبُوْ جَعْفَرٍ عَلٰى هٰذَا اَدْرَكْتُ مَشَائِخِىْ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) لَا بَأْسَ بِالْوُضُوْءِ بِهِ اِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ اَحَدُ اَوْصَافِهِ ـ

অনুবাদ : এমন প্রবহমান পানি দ্বারা [অজু করা বৈধ] যাতে নাপাকী রয়েছে, কিন্তু নাপাকীর কোনো চিহ্ন তাতে দেখা যায় না। অর্থাৎ স্বাদ, রং কিংবা গন্ধ রয়ে গেছে। ফুকাহায়ে কেরাম প্রবহমান পানির সংজ্ঞার ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেন। ঐ সংজ্ঞা যা বুঝতে কষ্ট হয় না তা হলো, প্রবহমান পানি বলা হয় ঐ পানিকে যা ঘাস ও পাতাকে প্রবাহিত করে নিয়ে যায়। তাই যদি নদী [বা নালা]-কে উপরের দিক থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় আর অবশিষ্ট পানি নীচ দিয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকে তবে এর দ্বারা অজু জায়েজ। কেননা, তা প্রবহমান পানি। আর ধীরে ধীরে প্রবাহিত সমস্ত পানি দ্বারা অজু করার জন্য এমন স্থানে বসা আবশ্যক যেন ব্যবহৃত পানিগুলো পুনরায় ব্যবহার না করা হয় কিংবা দুই অঞ্জলি [পানি]-এর মাঝখানে এতটুকু পরিমাণ সময় অবস্থান করবে [এতক্ষণে] যেন ব্যবহৃত পানিগুলো প্রবাহিত হয়ে যায়। আর যখন حَوْض [কূপ] ছোট হয় এবং একদিক থেকে পানি ভিতরে প্রবেশ করে, অন্যদিক দিয়ে তা বাহিরে বের হয়ে যায়, তখন এর সমস্ত প্রান্তে বসে অজু জায়েজ। এরই উপর ফতোয়া। এতে এ বিশ্লেষণ নেই যে, যদি ঐ কূপ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে চার চার [হাত] করে হয় কিংবা এর চেয়েও কম হয় তবে জায়েজ। অথবা যদি এর চেয়ে বেশি হয় তবে জায়েজ নেই।

জ্ঞাতব্য যে, যদি পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, আর জানা যায় যে, নাপাকী [মিশ্রণ] -এর কারণে পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে, তবে এর দ্বারা অজু জায়েজ নেই। অন্যথায় জায়েজ এর উপর ভিত্তি করে যে, পানি দীর্ঘকাল অবস্থান করার কারণে দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে [নাপাকী মিশ্রণের কারণে নয়]। যদি কুকুর নালার প্রশস্ততা বন্ধ করে দেয়, আর এর উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়, তখন যদি কুকুরের সঙ্গে মিশ্রিত পানি অমিশ্রিত পানির চেয়ে কম হয় তবে এর নিচু অংশের পানিতে অজু জায়েজ; অন্যথায় জায়েজ নেই। ফকীহ আবূ জা'ফর (র.) বলেন, আমি আমার শায়েখদেরকে এর উপরই পেয়েছি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, এর দ্বারা অজু করার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত পানির কোনো একটি গুণে পরিবর্তন না আসবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَبِمَاءٍ جَارٍ فِيْهِ نَجِسٌ لَمْ يُرَ اَثَرُهُ : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) ইতঃপূর্বে বলেছিলেন যে, আসমানের পানি ও ভূমির পানি দ্বারা অজু করা বৈধ। সে ধারাবাহিকতায় এখানে বলছেন, প্রবহমান পানিতেও যদি নাপাক পতিত হয়, তবে এর দ্বারা অজু বৈধ তবে শর্ত হলো, এতে নাপাকীর কোনো চিহ্ন থাকতে পারবে না, চাই নাপাকী দৃশ্যমান হোক কিংবা অদৃশ্যমান হোক। এর দলিল হচ্ছে, পানির প্রবাহের কারণে নাপাকী স্থির থাকতে পারে না। তাই নাপাকী পতিত হওয়ার পরেও প্রবহমান পানি পাক থাকে। নাপাকীর চিহ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বাদ, গন্ধ ও রং পরিবর্তিত না হওয়া।

قَوْلُهُ اِخْتَلَفُوْا فِىْ حَدِّ الْجَارِىْ : শরহে বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলছেন যে, প্রবহমান পানির সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে চারটি অভিমত রয়েছে–

১. কোনো কোনো ফকীহ বলেন, প্রবহমান পানি হলো যা পুনঃপুন ব্যবহারে আসে না। যেমন– কেউ নালা থেকে পানি নিয়ে হাত ধৌত করল। ধৌত করা পানি আবার নালায় পড়ে গেল, দ্বিতীয়বার নালা থেকে পানি নেওয়া হলো তখন আর প্রথমবারের ব্যবহৃত পানিগুলো তার আঁজলায় আসে না। কেননা, তা প্রবাহিত হয়ে চলে গেছে।

২. কেউ বলেন, প্রবহমান পানি হলো যা শুষ্ক খড়কুটা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

৩. কেউ কেউ বলেন, কোনো ব্যক্তি প্রস্থের দিক থেকে পানিতে হাত দিলে যে পানির প্রবাহ বন্ধ হয় না সেটি হলো প্রবহমান পানি।

قَوْلُهُ يَجِبُ اَنْ يَجْلِسَ بِحَيْثُ الخ : ধীরে ধীরে প্রবাহিত পানি দ্বারা অজু করতে হলে এমন স্থানে বসে অজু করতে হবে যেন ঐ সমস্ত ব্যবহৃত পানি যেগুলো নালায় পড়ছে, সেগুলো পুনরায় হাতের মুঠোয় না উঠে। অথবা দুই অঞ্জলি পানির মাঝে এতটুকু পরিমাণ সময় অপেক্ষা করবে যেন এতক্ষণে ব্যবহৃত পানিগুলো প্রবাহিত হয়ে চলে যায়। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, "উক্ত হুকুমের ভিত্তি হলো مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ [ব্যবহৃত পানি] নাপাক হওয়ার" উপর। অর্থাৎ কেউ কেউ ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলেছেন। এ ব্যবহৃত পানি দ্বারা অজু বৈধ নয়। মূলত مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ [ব্যবহৃত পানি] সম্পর্কে বিশুদ্ধ অভিমত হলো, "مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ পবিত্র পানি, কিন্তু অন্যকে পবিত্রকারী নয়।" এরই উপর ফতোয়া প্রদান করা হয়।

قَوْلُهُ اَنْ يَكُوْنَ اَرْبَعًا فِىْ اَرْبَعٍ الخ : অর্থাৎ ঐ কূপ যা দৈর্ঘ্যে চার হাত এবং প্রস্থে চার হাত হয় কিংবা এর চেয়ে কম হয় আর এর একদিক দিয়ে পানি প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে যায় তবে এর যেদিকে ইচ্ছা বসে অজু করবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি কূপ চার হাতের চেয়ে অধিক হয় যেমন– পাঁচ হাত কিংবা ছয় হাত, তবে এর সকল প্রান্তে বসে অজু করা বৈধ নয়; বরং শুধু পানি প্রবেশের স্থানে ও পানি বের হওয়ার স্থানে বসে অজু করা বৈধ। কেননা, চার হাত বা এর কম নালার সমস্ত পানি প্রবেশ করা ও বের হওয়ার মধ্যেই নড়াচড়া করতে থাকে। তাই যেন সমস্ত পানিই আসা-যাওয়ার মধ্যে রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি কূপ এর চেয়ে বেশি বড় হয় তবে এতে পানি প্রবেশের স্থান ও বাহির হওয়ার স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে পানি জমে থাকে। আর ব্যবহৃত পানিগুলো সেখানে এসে জমে যায়, কিন্তু প্রথম প্রক্রিয়ার পানি এক স্থানে জমে থাকে না; বরং সাথে সাথে তা প্রবাহিত হয়ে চলে যায়।

قَوْلُهُ وَاِذَا سَدَّ كَلْبٌ عَرْضَ النَّهْرِ الخ : এখানে কুকুর দ্বারা মৃত কুকুর উদ্দেশ্য, যা নাপাক। এক বর্ণনায় জীবিত কুকুরকেও নাপাক বলা হয়েছে। তাই এ হিসেবে তা জীবিত কুকুরের দৃষ্টান্তও হতে পারে। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, "আমার ধারণায় যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত কুকুরের শরীরে নাপাকী না থাকবে, ততক্ষণ তা শুধু একটি কুকুর হিসেবে নাপাক নয়। তাই জীবিত কুকুর যদি শরীরের সঙ্গে যায় যদিও তার দেহ ভিজা হোক না কেন তবে শরীর নাপাক হবে না। হ্যাঁ, যদি এর শরীরে কোনো নাপাক থাকে তবে ভিন্ন কথা। সর্বোপরি যদি মৃত কুকুর নালায় পড়ে যায় আর এর দ্বারা পানি প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হয়ে যায় তবে লক্ষ্য করতে হবে যে, কুকুরের দেহের সঙ্গে লেগে অধিক পানি প্রবাহিত হচ্ছে না কুকুরের দেহের সঙ্গে লাগা ব্যতীত অধিক পানি প্রবাহিত হচ্ছে। যদি কুকুরের দেহের সঙ্গে লাগা ব্যতীত অধিক পানি প্রবাহিত হয়, তবে এর অধিকাংশ পানি পাক হওয়ার দরুন এর দ্বারা অজু করা বৈধ। কিন্তু যদি কুকুরের দেহের সঙ্গে লাগা পানি বেশি হয় তবে এর দ্বারা অজু বৈধ নয়। আর যদি কুকুরের দেহের সঙ্গে লাগা ও না লাগা পানি বরাবর হয়, তবে এর দ্বারা যদিও অজু করা বৈধ তবে সতর্কতা অবলম্বন করত এর দ্বারা অজু করবে না।

وَبِمَاءٍ مَاتَ فِيْهِ حَيَوَانٌ مَائِيُّ الْمَوْلِدِ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ بِكَسْرِ الدَّالِ وَإِنَّمَا قَالَ مَائِيُّ الْمَوْلِدِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَوْلِدُهٗ فِي غَيْرِ الْمَاءِ وَهُوَ يَعِيْشُ فِي الْمَاءِ يُفْسِدُ الْمَاءَ بِمَوْتِهِ فِيْهِ أَوْ مَا لَيْسَ لَهٗ دَمٌ سَائِلٌ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ لِأَنَّ النَّجِسَ هُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوْحُ كَمَا ذَكَرْنَا وَلِحَدِيْثِ وُقُوْعِ الذُّبَابِ فِي الطَّعَامِ وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) لَا بِمَا أُعْتُصِرَ الرِّوَايَةُ بِقَصْرِ مَا مِنْ شَجَرٍ أَوْ ثَمَرٍ .

অনুবাদ : এমন পানি দ্বারা অজু করা বৈধ যাতে পানিতে ভূমিষ্ঠ প্রাণী মারা গেছে। যেমন– মাছ, বেঙ, ضفدع শব্দটির دال অক্ষরে যের হবে। বিকায়া গ্রন্থকার "পানিতে জন্ম" কথাটি এজন্য বলেছেন যে, যদি কোনো প্রাণীর জন্ম স্থলে হয়ে থাকে, তবে তা পানিতে মারা যাওয়ার দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যাবে। অথবা এমন প্রাণী পানিতে পড়ে মারা গেছে যাতে প্রবহমান রক্ত নেই। যেমন– মশা ও মাছি, তবে এর দ্বারা অজু করা বৈধ। কেননা, নাপাক হচ্ছে প্রবাহিত রক্ত। যেমনটি আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং খাদ্যে মাছি পতিত হওয়ার হাদীসের কারণে। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। বৃক্ষ কিংবা ফল থেকে নিংড়ানো পানি দ্বারা অজু করা বৈধ নয়। [بِمَا শব্দটি] হামযাবিহীনই বর্ণিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَبِمَاءٍ مَاتَ فِيْهِ حَيَوَانٌ الخ : অর্থাৎ যদি পানিতে এমন প্রাণী মারা যায় যার জন্ম পানিতেই হয়েছে, তবে এর দ্বারা অজু করা বৈধ। কেননা, তা পাক এবং এমন প্রাণীর মৃত্যুর দ্বারা পানি নাপাক হয় না। এর কারণ হচ্ছে, শুধু মৃত্যুর দ্বারা পানি নাপাক হয় না; বরং নাপাক হয় প্রবাহিত রক্তের কারণে। কেননা, রগের প্রবাহিত রক্তগুলো মৃত্যুর পর সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আর জলজ প্রাণীর মধ্যে রক্ত হয় না এবং রক্তবিশিষ্ট প্রাণী পানিতে থাকে না। কারণ, রক্ত ও পানির মাঝে রয়েছে বৈপরীত্য। মাছ বা এ জাতীয় জলজ প্রাণীর মাঝে যে লাল পানি দেখা যায় তা মূলত রক্ত নয়। এর প্রমাণ হলো, যখন রক্ত রৌদ্রে রাখা হয় তখন তা কালো হয়ে যায়। আর যদি ঐ মাছের লাল পানিটি রৌদ্রে রাখা হয়, তবে দেখা যাবে তা সাদা হয়ে গেছে।

কেউ কেউ বলেন, "যেহেতু মাছ তার জন্মস্থান পানিতেই মারা যায় তাই এর দ্বারা পানি নাপাক হয় না। "মূলত তা একেবারেই দুর্বল অভিমত। কেননা, মাছ যদি পানির বাহিরে মারা যায় অতঃপর পানিতে পতিত হয় এর দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। অথচ এমনটি হচ্ছে না। কিন্তু ঐ প্রাণী যার স্থলে জন্ম হয়, আর পানিতে বসবাস করে। যেমন– হাঁস, জলকুক্কুট ইত্যাদি তা পানিতে মরার দ্বারা কিংবা পানির বাহিরে মারা গিয়ে পরে পানিতে পতিত হওয়ার দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যাবে। এ কারণেই বিকায়া গ্রন্থকার مَائِيُّ الْمَوْلِدِ বলে পানিতে জন্মগ্রহণকারী প্রাণীকে এর থেকে পৃথক করে দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ مَا لَيْسَ لَهٗ دَمٌ سَائِلٌ كَالْبَقِّ الخ : এ ইবারতের মধ্যে বিকায়া গ্রন্থকার যে মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, যে সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই, সেগুলোর মৃত্যুর দ্বারা পানি নাপাক হবে না। যেমন– মশা, মাছি, ভিমরুল এবং বিচ্ছু ইত্যাদি। এ মাসআলাটি মূলত مُخْتَلَفٌ فِيْهِ মাসআলা। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, যে সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই সেগুলোর মৃত্যুর দ্বারা পানি নাপাক হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এর দ্বারাও পানি নাপাক হয়ে যাবে।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) দলিল হিসেবে বলেন যে, এ সকল প্রাণী হারাম। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ "তোমাদের উপর মৃতপ্রাণীকে হারাম করা হয়েছে।"

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, যে সকল প্রাণীকে সম্মানার্থে হারাম করা হয়েছে সেগুলো তো পবিত্র; যেমন– মানুষ। কিন্তু যেগুলোকে সম্মানার্থে হারাম করা হয়নি সেগুলো নাপাক হওয়ারই আলামত। এখানের বিষয়টি এমনই যে, প্রবাহিত রক্তবিহীন প্রাণীকে সম্মানার্থে হারাম করা হয়নি। তাই এ সকল প্রাণীকে হারামকরণের দ্বারা এর নাপাকই প্রমাণিত হয়। অতএব, এর মৃত্যুর দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যাবে।

আহনাফের দলিল হলো, হযরত সালমান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত–

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ اِنَاءٍ فِيْهِ طَعَامٌ اَوْ شَرَابٌ يَمُوْتُ فِيْهِ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ فَقَالَ هٰذَا هُوَ الْحَلَالُ اَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَالْوُضُوْءُ مِنْهُ .

অর্থাৎ "নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, খাদ্য বা পানীয় -এর পাত্রে যদি ঐ প্রাণী মারা যায় যাতে প্রবাহিত রক্ত নেই, এর হুকুম কি? তিনি বললেন, তা খাওয়া ও পান করা হালাল এবং এর দ্বারা অজু করাও বৈধ। –[কেফায়া, ফাতহুল কাদীর ১ : ৮৮]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, অপ্রবাহিত রক্তবিশিষ্ট প্রাণী খাদ্য বা পানির পাত্রে পড়ে মারা গেলে উক্ত খাদ্য ও পানি হারাম হয় না; বরং তা খাওয়া ও পান করা বৈধ। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অপ্রবাহিত রক্তবিশিষ্ট প্রাণী মারা যাওয়ার দ্বারা পানি নাপাক হয় না। শরহে বিকায়া গ্রন্থকার (র.) আহনাফের আরো দুটি দলিল উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, প্রবাহিত রক্ত যা নাপাক। ইতঃপূর্বে আমরা তা اَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে এসেছি। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, অপ্রবাহিত রক্তবিশিষ্ট প্রাণী মারা যাওয়ার দ্বারা পানি নাপাক হয় না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَاِنَّ فِيْ اَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْاٰخَرِ شِفَاءً .

–[বুখারী শরীফ– অধ্যায় : بَدْءُ الْخَلْقِ বাব : ১৭]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন, যদি মাছি খাদ্যের পাত্রে পতিত হয়, তবে একে যেন সে তাতে ডুবিয়ে দেয়। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাছি খাদ্যে বা পানিতে পতিত হয়ে মারা গেলে এর দ্বারা পানি নাপাক হয় না।

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর اِسْتِدْلَالْ-এর খণ্ডন হচ্ছে, যা হারাম হবে তা নাপাকও হওয়া আবশ্যক নয়। যেমন– মাটি, কয়লা ইত্যাদি হারাম, কিন্তু তা নাপাক নয়। অনুরূপ যে সমস্ত প্রাণীর দেহে প্রবাহিত রক্ত নেই সেগুলো হারাম বটে, কিন্তু নাপাক নয়।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর– ১ : ৮৮, বাহরুর রায়িক– ১ : ১৫৯-১৬২]

قَوْلُهُ لَا بِمَا اُعْتُصِرَ الرِّوَايَةُ الخ : উক্ত ইবারতে বর্ণিত মাসআলাটি হচ্ছে, যে পানি বৃক্ষ বা ফল থেকে নিংড়ানো হয়েছে তা দ্বারা অজু করা বৈধ নয়। কেননা, তা مَاءٌ مُطْلَقٌ নয়। কারণ, مَاءٌ مُطْلَقٌ তো হলো ঐ পানি, পানি বলতেই যার দিকে মন ছুটে যায়। আর নিংড়ানো পানি এমন নয়; বরং তা مَاءٌ مُقَيَّدٌ যাকে গাছের পানি বা রস এবং ফলের পানি বা জুস বলা হয়। আর مَاءٌ مُطْلَقٌ না থাকাবস্থায় অজুর হুকুম তায়াম্মুমের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। ইরশাদ হচ্ছে– فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا "তোমরা যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে।" –[৪ : ৪৩]

قَوْلُهُ الرِّوَايَةُ بِقَصْرِ مَا : بِمَا اُعْتُصِرَ এখানে শরহে বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বর্ণনা করেছেন যে, বিকায়া গ্রন্থকারের ইবারত– بِمَا-এর শব্দটি مَا مَوْصُوْلَةٌ এটি مَاءٌ পানি অর্থে পড়াও বিশুদ্ধ। কেননা, বিকায়া গ্রন্থকার (র.) একটু পরেই বলেছেন– وَلَا بِمَاءٍ زَالَ الخ যার عَطْف অবশ্যই لَا بِمَا اُعْتُصِرَ-এর উপর করা হয়েছে। যা প্রমাণ বহন করে যে, এটিও হতে পারে। তবে বিকায়া গ্রন্থকার (র.) ও অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরাম থেকে مَا مَوْصُوْلَةٌ বর্ণিত আছে।

اَمَّا مَا يَقْطُرُ مِنَ الشَّجَرِ فَيَجُوْزُ بِهِ الْوُضُوْءُ وَلَا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهُ بِغَلَبَةِ غَيْرِهِ اَجْزَاءً اَلْمُرَادُ بِهِ اَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ طَبْعِ الْمَاءِ وَهُوَ الرِّقَّةُ وَالسَّيَلَانُ اَوْ بِالطَّبْخِ كَالْاَشْرِبَةِ وَالْخَلِّ نَظِيْرُ مَا اعْتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ فَشَرَابُ الرِّيْبَاسِ مُعْتَصَرٌ مِنَ الشَّجَرِ وَشُرْبِ التُّفَّاحِ وَنَحْوِهِ مُعْتَصَرٌ مِنَ الثَّمَرِ وَمَاءُ الْبَاقِلَّى نَظِيْرُ مَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ اَجْزَاءً وَالْمَرَقُ نَظِيْرُ مَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بِالطَّبْخِ وَاَمَّا الْمَاءُ الَّذِيْ تَغَيَّرَ بِكَثْرَةِ الْاَوْرَاقِ الْوَاقِعَةِ فِيْهِ حَتّٰى اِذَا رُفِعَ فِي الْكَفِّ يَظْهَرُ فِيْهِ لَوْنُ الْاَوْرَاقِ فَلَا يَجُوْزُ بِهِ الْوُضُوْءُ لِاَنَّهُ كَمَاءِ الْبَاقِلَّى .

অনুবাদ : কিন্তু বৃক্ষ থেকে টপকিয়ে পড়া পানি দ্বারা অজু করা বৈধ এবং ঐ পানি দ্বারা অজু করা বৈধ নয় যাতে অন্য কোনো বস্তুর প্রভাব বিস্তারের দ্বারা পানির প্রকৃত গুণ [তবিয়ত] দূর হয়ে গেছে। [অন্য বস্তুর প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি হবে] অংশের দিক থেকে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পানিকে তার [মৌলিক] গুণ [তবিয়ত] তথা তরলতা ও প্রবাহ থেকে বাহির করে দেওয়া। অথবা পাকানোর দ্বারা [পানির প্রকৃত গুণ দূর হয়ে গেছে] যেমন– শরবত ও সিরকা। তা বৃক্ষ ও ফল থেকে নিংড়ানো পানির মতোই। অতএব, রীবাস (رِيْبَاسْ) -এর শরবত [রীবাস] বৃক্ষ থেকে নিংড়ানো এবং আপেল ও এ জাতীয় ফলের জুস ফল থেকে নিংড়ানো এবং সবজির পানি, যা অন্য বস্তু প্রভাব বিস্তারকৃত পানির ন্যায় ও তরকারির ঝোল, যা পাকানোর কারণে অন্য বস্তুর প্রভাব বিস্তারকৃত পানির ন্যায় [এর দ্বারা অজু করা বৈধ নয়]। কিন্তু ঐ পানি যাতে অধিকহারে পাতা পতিত হওয়ার কারণে তা পরিবর্তন হয়ে গেছে, এমনকি যদি হাত দ্বারা পানি উঠানো হয় তবে তাতে পাতার রং পরিলক্ষিত হয় এমন পানি দ্বারা অজু করা বৈধ নয়। কেননা, তা সবজির পানির ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَمَّا مَا يَقْطُرُ مِنَ الشَّجَرِ الخ : অর্থাৎ ঐ পানি যা কোনো বৃক্ষ থেকে নিংড়ানো ব্যতীত নিজে নিজেই টপকে পড়ে তবে এর দ্বারা অজু করা বৈধ। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, হিদায়া ও অন্যান্য গ্রন্থে এ মতকেই উত্তম বলা হয়েছে। কিন্তু বাহরুর রায়িক ও আন্নাহরুল হুলিয়্যাহ গ্রন্থকার এর দ্বারা অজু বৈধ না হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, তা مُقَيَّدْ পানি। আমার অভিমতও হলো, এর দ্বারা অজু করা বৈধ নয়।

قَوْلُهُ اَجْزَاءً : এতে এ কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পানির সঙ্গে মিশ্রিত বস্তুর আধিক্য তখনই বুঝা যাবে যখন তা পানিকে তার মৌলিকে গুণ [তবিয়ত] থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং এর তরলতা ও প্রবাহের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব এবং এটিই বিশুদ্ধ। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট পানির রং পরিবর্তনের আধিক্য লক্ষ্য করা হবে।

قَوْلُهُ اَوْ بِالطَّبْخِ كَالْاَشْرِبَةِ : بِالطَّبْخِ-এর عَطْفٌ হয়েছে بِغَلَبَةٍ-এর উপর। অর্থাৎ যে পানি পাকানোর কারণে তার মৌলিক গুণ দূরীভূত হয়ে যায় তার দ্বারা অজু করা বৈধ নয়। আর শারেহ (র.)-এর প্রকাশ্য বিবরণ দ্বারা বুঝা যায় যে, এর عَطْفْ হয়েছে اَجْزَاءً-এর উপর। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, আমার ধারণায় এটি আধিক্যের বিষয় নয়; বরং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের বিষয়। কিন্তু যদি بِالطَّبْخِ-এর بَاء-এর অর্থ مَعَ হয় তবে ঠিক আছে।

قَوْلُهُ وَمَاءُ الْبَاقِلّٰى : اَلْبَاقِلّٰى শব্দটি بَقْلٌ শব্দ থেকে উদ্‌গত, যার অর্থ– সবজি। بَاقِلّٰى অর্থ বরবটিও হয়। উদ্দেশ্য হলো, এটি ঐ পানির মতো যাতে অন্য জিনিস প্রভাব বিস্তার করেছে।

وَلَا بِمَاءٍ رَاكِدٍ وَقَعَ فِيْهِ نَجَسٌ اِلَّا اِذَا كَانَ عَشَرَةُ اَذْرُعٍ فِىْ عَشَرَةِ اَذْرُعٍ وَلَا يَنْحَسِرُ اَرْضُهُ بِالْغُرَفِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ الْجَارِىْ فَاِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْضَعِ النَّجَاسَةِ بَلْ مِنَ الْجَانِبِ الْاٰخَرِ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَرْئِيَّةٍ يَتَوَضَّأُ مِنْ جَمِيْعِ الْجَوَانِبِ وَكَذَا مِنْ مَوْضَعِ غُسَالَتِهٖ قَالَ مُحِىُ السُّنَّةِ التَّقْدِيْرُ بِعَشَرٍ فِىْ عَشَرٍ لَا يَرْجِعُ اِلٰى اَصْلٍ شَرْعِيٍّ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ اَقُوْلُ اَصْلُ الْمَسْأَلَةِ اَنَّ الْغَدِيْرَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَا يَتَحَرَّكُ اَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيْكِ الطَّرْفِ الْاٰخَرِ اِذَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِىْ اَحَدِ جَوَانِبِهٖ جَازَ الْوُضُوْءُ مِنَ الْجَانِبِ الْاٰخَرِ ثُمَّ قُدِّرَ هٰذَا بِعَشَرٍ فِىْ عَشَرٍ وَاِنَّمَا قُدِّرَ بِهٖ بِنَاءً عَلٰى قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ حَفَرَ بِيْرًا فَلَهُ حَوْلَهَا اَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا فَيَكُوْنُ لَهَا حَرِيْمُهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشَرَةٌ فَفُهِمَ مِنْ هٰذَا اَنَّهُ اِذَا اَرَادَ اٰخَرُ اَنْ يَحْفِرَ فِىْ حَرِيْمِهَا بِيْرًا يَمْنَعُ مِنْهُ لِاَنَّهُ يَنْجَذِبُ الْمَاءُ اِلَيْهَا وَيَنْقُصُ الْمَاءُ فِى الْبِيْرِ الْاُوْلٰى وَاِنْ اَرَادَ اَنْ يَحْفِرَ بِيْرَ بَالُوْعَةٍ يَمْنَعُ اَيْضًا لِسِرَايَةِ النَّجَاسَةِ اِلَى الْبِيْرِ الْاُوْلٰى وَتُنَجِّسُ مَائُهَا وَلَا يَمْنَعُ فِيْمَا وَرَاءَ الْحَرِيْمِ وَهُوَ عَشَرٌ فِىْ عَشَرٍ فَعُلِمَ اَنَّ الشَّرْعَ اِعْتَبَرَ الْعَشَرَ فِى الْعَشَرِ فِىْ عَدَمِ سِرَايَةِ النَّجَاسَةِ حَتّٰى لَوْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ تَسْرِىْ يُحْكَمُ بِالْمَنْعِ ثُمَّ الْمُتَاخِّرُوْنَ وَسَّعُوْا الْاَمْرَ عَلَى النَّاسِ وَجَوَّزُوْا الْوُضُوْءَ فِىْ جَمِيْعِ جَوَانِبِهٖ ـ

অনুবাদ : এমন স্থির [অপ্রবাহিত] পানি দ্বারা অজু করা বৈধ নয়, যাতে নাপাকী পতিত হয়েছে। কিন্তু যদি ঐ কূপটি [দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে] দশ দশ হাত করে হয় এবং অঞ্জলি ভরে পানি উঠানোর দ্বারা [তলদেশের] মাটি প্রকাশ পায় না [তবে এতে নাপাকী পতিত হলেও এর দ্বারা অজু করা বৈধ]। তাই এর হুকুম প্রবাহিত পানির হুকুমের ন্যায়। অতএব, নাপাকী যদি দৃশ্যমান হয় তবে নাপাকীর স্থান দিয়ে অজু করবে না; বরং অন্য পাশ দিয়ে অজু করবে। আর যদি নাপাকী অদৃশ্যমান হয় তবে সমস্ত পাশ দিয়েই অজু করা যাবে। অনুরূপ ব্যবহৃত পানির স্থান দিয়েও অজু করা যাবে। মুহিউস সুন্নাহ (র.) [আবূ মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে মাসউদ আল-বাগাভী] বলেন, [দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে] দশ দশ হাত করে এর সীমানা নির্ধারণ করা শরিয়তের এমন কোনো দলিলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না যার উপর নির্ভর করা হয়। [শারেহ (র.) বলেন,] আমি বলি, মূলত মাসআলা হলো ঐ বড় কূপ [বা পুকুর] যার এক পাশে নাড়া দেওয়ার দ্বারা অন্য পাশ নড়ে না এমন কূপের এক পাশে যদি নাপাকী পতিত হয় তবে অন্য পাশে [বসে] অজু করা বৈধ। অতঃপর উক্ত কূপ দশ দশ হাত করে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এ নির্ধারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণীর উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। [তিনি বলেন,] "যদি কোনো ব্যক্তি কূপ খনন করে তবে এর আশপাশ হবে চল্লিশ হাত। অতএব, কূপের প্রত্যেক পাশ হবে দশ হাত করে।" এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি কেউ উক্ত কূপের হারীম [দশ হাতের ভিতর]-এ কূপ খনন করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে। কেননা, তখন প্রথম কূপের পানি দ্বিতীয় কূপে চলে আসবে এবং প্রথম কূপে

পানি হ্রাস পেয়ে যাবে। যদি কেউ [কূপের হারীমের ভিতরে] ময়লা ফেলার জন্য কূপ খনন করতে চায় তবে তাকেও বাধা দেওয়া হবে। কেননা, তখন নাপাকী প্রথম কূপে প্রবেশ করবে এবং এর পানি নাপাক হয়ে যাবে। আর কূপের হারীমের বাহিরে নিষেধ করা হবে না। তা হচ্ছে, দশ দশ হাত। অতএব, জানা গেল যে, শরিয়ত [এক কূপ থেকে অন্য কূপে] নাপাকী প্রবেশ না করার জন্য দশ দশ হাত [তফাত হওয়া]-কে লক্ষ্য করে। এমনকি যদি নাপাকী [অন্য কূপে] প্রবেশ করে তবে [শরিয়ত] বাধা প্রদানের হুকুম দেয়। অতঃপর مُتَأَخِّرِيْن ওলামায়ে কেরাম লোকজনকে এতে প্রসারতা দিয়েছেন এবং সকল পাশে অজু করা বৈধ রেখেছেন। [কেননা, তা প্রবহমান পানির ন্যায়।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا بِمَاءٍ رَاكِدٍ وَقَعَ فِيْهِ نَجَسٌ الخ : এখানে বিকায়া গ্রন্থকার (র.) স্থির পানিতে নাপাকী পতিত হওয়ার হুকুম বর্ণনা করেছেন। ফুকাহায়ে কেরাম এতে একমত যে, প্রবহমান পানিতে যদি নাপাকী পতিত হয় তবে ততক্ষণ পর্যন্ত পানি নাপাক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নাপাকী প্রভাব বিস্তার না করবে এবং এতেও একমত যে, যদি স্থির পানিতে নাপাকী প্রভাব বিস্তার না করে, অন্য কথায় পানির কোনো পারিবর্তন না হয় তবে কম পানি হলে নাপাক হয়ে যাবে; অধিক হলে নাপাক হবে না। এখন কম পানির পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

❖ **কম পানির পরিমাণ নির্ণয় :** আমরা জেনেছি, স্থির কম পানিতে নাপাক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আহনাফ, শাওয়াফে' ও মাওয়ালিক মতানৈক্য করেন। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম মালেক (র.) বলেন, নাপাকী পানিতে প্রভাব বিস্তার করা ও না করা হিসেবে পানির কমবেশ বুঝা যাবে। অর্থাৎ যদি পানিতে নাপাকী প্রভাব বিস্তার করে তবে বুঝা যাবে যে, পানি কম। আর যদি পানিতে নাপাকী প্রভাব বিস্তার না করে তবে বুঝা যাবে যে, পানি অনেক। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পানি যদি দুই মটকা পরিমাণের চেয়ে বেশি হয় তবে বুঝা যাবে যে, পানি বেশি। আর যদি দুই মটকা থেকে কম হয় তবে বুঝা যাবে যে, পানি কম। আহনাফ বলেন, পানি বিশেষজ্ঞরা যদি বলে যে, এখানে বেশি তবে পানি বেশি এবং পানি বিশেষজ্ঞরা যদি বলে যে, পানি কম তবে পানি কম হবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি স্থির পানির এক পাশে নাড়া দেওয়ার দ্বারা অপর পাশ নড়ে তবে তা কম পানি। আর যদি এক পাশে নাড়া দেওয়ার দ্বারা অপর পাশ না নড়ে তবে তা বেশি পানি।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম মালেক (র.) বুযা'আ (بُضَاعَةَ) নামক কূপ সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقٰى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتَنِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

অন্য বর্ণনায় আরো উল্লেখ রয়েছে যে, إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيْحَهُ "রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আমরা কি বুযা'আ কূপের পানি দ্বারা অজু করব যাতে হায়েজের নেকড়া, কুকুরের গোশত এবং ময়লা-আবর্জনা ফেলা হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পানি পবিত্র। কোনো কিছু তাকে অপবিত্র করতে পারে না।" –[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ]

দ্বিতীয় বর্ণনায় অতিরিক্ত অংশের অর্থ হচ্ছে, "হ্যাঁ যদি পানির তিন গুণের কোনো একটি গুণকে পরিবর্তন করে দেয় [তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে।]"

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি নাপাকী পানির কোনো গুণ পরিবর্তন করে দেয়, তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে। অন্যথায় পানিকে কোনো কিছু নাপাক করতে পারে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নাপাকী পানির কোনো গুণকে তখনই পরিবর্তন করতে পারবে যখন পানি কম হবে এবং তা নাপাক হয়ে যাবে, আর নাপাকী তখনই পানির কোনো গুণকে পরিবর্তন করতে পারবে না যখন পানি অনেক বেশি হবে এবং তা নাপাক হবে না। [পানির এ গুণ পরিবর্তনকেই ইমাম মালেক র. -এর অভিমতে নাপাকী প্রভাব বিস্তার করা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।]

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَحْمِلُ خُبْثًا

"পানি যদি দুই মটকা পরিমাণ হয় তবে তা নাপাক হয় না"। -[আবূ দাঊদ , তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানির পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, যদি দুই মটকা পরিমাণ পানি হয় তবে তা নাপাক হয় না। বুঝা গেল, এ পরিমাণ ও এর চেয়ে বেশি পরিমাণ পানি হলো অধিক পানি। আর যদি দুই মটকার চেয়ে কম পরিমাণ পানি হয় তবে তা নাপাক হয়ে যায়। বুঝা গেল, তা কম পানি।

আহনাফ -এর দলিল হলো-

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- إِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا

অর্থাৎ "তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠলে সে যেন তিনবার হাত ধৌত করা ব্যতীত পাত্রে হাত না ঢুকায়।"
-[আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, নবী করীম ﷺ যখন সম্ভাবনাময় নাপাকীর কারণে পানিতে হাত ঢুকানো নিষেধ করেছেন তখন একথা সহজেই অনুমেয় যে, প্রকৃত নাপাকী দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যাবে। এখানে দুই মটকা পরিমাণের কম বেশির কথা উল্লেখ নেই এবং নাপাকীর প্রভাব বিস্তারের কথাও উল্লেখ নেই।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অর্থাৎ "তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব না করে এবং তাতে ফরজ গোসল না করে।" -[বুখারী ও মুসলিম]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, স্থির পানিতে ফরজ গোসল করার দ্বারা পানির কোনো গুণ পরিবর্তন হয় না। তথাপি নবী করীম ﷺ স্থির পানিতে গোসল থেকে বারণ করেছেন। বুঝা গেল, এর দ্বারা পানি তার গুণ পরিবর্তন হওয়া ছাড়াই নাপাক হয়ে যায়। অতএব, এটি ইমাম মালেক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। অনুরূপ উক্ত হাদীসে দুই মটকা পরিমাণ পানি হওয়া ও না হওয়ার শর্তারোপ করা হয়নি। তাই এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিরুদ্ধেও দলিল হয়।

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِىِّ (رحـ) وَمَالِكٍ (رحـ) : ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল তথা বুযা'আ কূপের হাদীস মূলত স্থির পানির হুকুমে নয়; বরং প্রবহমান পানির হুকুমে। কেননা, সে কূপ থেকে পানি জমিনে সেঁচ করা হতো। অথবা হাদীসে নবী করীম ﷺ-কে বুযা'আ কূপের পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, "এর থেকে নাপাকী বের করার পর পানি আর নাপাক থাকবে না।" অন্যথায় হাদীসের প্রকাশ্য মর্ম অনুযায়ী এক মগ পানিতেও যদি নাপাকী পতিত হয়, আর পানির গুণ পরিবর্তন না হয়, তবে পানি নাপাক হবে না। অথচ এতে পানির গুণ পরিবর্তন হোক বা না হোক নাপাক হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল তথা قُلَّتَيْنِ -এর হাদীস একেবারেই দুর্বল। ইমাম বুখারী (র.) -এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন- لَمْ يَثْبُتْ حَدِيْثُ الْقُلَّتَيْنِ "দুই মটকা পরিমাণ পানির হাদীস প্রমাণিত নয়।" তা ছাড়া হাদীসের মূল مَتَنْ -এও اِضْطِرَابٌ রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا কোনো বর্ণনায় اَرْبَعِيْنَ قُلَّةً কোনো বর্ণনায় اَرْبَعِيْنَ غَرْبًا আবার কোনো বর্ণনায় اَرْبَعِيْنَ دَلْوًا রয়েছে। এমনিভাবে দ্বিতীয় অংশ কোনো বর্ণনায় لَا يَحْمِلُ الْخُبْثَ কোনো বর্ণনায় لَمْ يَنْجَسْ কোনো বর্ণনায় لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْئٌ আবার কোনো বর্ণনায় لَمْ يَحْمِلْ خُبْثًا রয়েছে। অনুরূপ قلة -এর অর্থ- মানুষের গঠন, পাহাড়ের চূড়া, লোটা ও মটকা প্রভৃতি। এখানে কোন অর্থ হবে তা অস্পষ্ট। এসব কারণে উক্ত হাদীস দলিল হতে পারে না।

তবে আহনাফের নিকট একপাশে নাড়া দেওয়ার দ্বারা অপর পাশ নড়ার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, দশ দশ হাত। এর মূল ঘটনা হলো, ফকীহ আবূ সুলাইমান (র.) স্বীয় উস্তাদ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে এর পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন- كَمَسْجِدِىْ هٰذَا "আমার এ মসজিদ পরিমাণ।" তখন আবূ সুলাইমান (র.) তা মেপে দেখেছেন যে, তা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে দশ দশ হাত করে।

-[এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- ফাতহুল কাদীর- ১ : ৭৯-৮৪, বাহরুর রায়িক- ১ : ১৩৬-১৫১, ফাতহুল মুলহিম- ১ : ৪৪১-৪৪৫, মা'আরিফুস্ সুনান- ১ : ২২১-২৫৩, দরসে তিরমিযী- ১ : ২৬৬-২৭৮]

قَوْلُهُ وَلَا يَنْحَسِرُ اَرْضُهُ بِالْغُرْفِ : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) পূর্বের ইবারতে বলেছেন যে, কূপ যদি দশ দশ হাত পরিমাণ বড় হয়, তবে এতে নাপাক পতিত হওয়ার পরেও এর দ্বারা অজু করা বৈধ। কেননা, এর দ্বারা এত বড় কূপের পানি নাপাক হয় না। এ عبارة-এ গ্রন্থকার উক্ত দশ দশ হাত কূপের গভীরতা বর্ণনা করেছেন যে, কূপটি এতটুকু পরিমাণ গভীর হতে হবে যে, এতে আঁজলা ভরে পানি উঠালে তলদেশের মাটি প্রকাশ পায় না। তবে এ গভীরতার পরিমাপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে–

১. এ পরিমাণ গভীর হওয়া যে, টাখনু পর্যন্ত পা ডুববে।

২. এক বিঘত পরিমাণ গভীর হওয়া।

৩. এক গজ পরিমাণ গভীর হওয়া।

৪. আঁজেলা ভরে পানি উঠালে তলদেশের মাটি প্রকাশ পায় না– এ পরিমাণ গভীর হতে হবে। এটিই আহনাফের মত, যা বেকায়া গ্রন্থকার عِبَارَةٌ-এর মাঝে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন যে, এখানে আরো মতামত রয়েছে যা আমি 'সিআইয়াহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

قَوْلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ الْجَارِيْ : এখানে فَاء টি فَاءْ تَفْرِيْعِيَّةْ অর্থাৎ শাখা পর্যায়ের মাসআলা বর্ণনার জন্য এসেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন উক্ত কূপের পানি দ্বারা অজু করা বৈধ তখন এর দ্বারা এটিও বুঝা যায় যে, এর হুকুম প্রবহমান পানির হুকুমের ন্যায়। অথবা فَاءْ টি فَاءْ تَعْلِيْلِيَّةْ হবে। তখন উদ্দেশ্য হবে যে, বিকায়া গ্রন্থকারের উল্লিখিত দশ দশ হাত পরিমাণ কূপ সম্পর্কিত স্বতন্ত্র মাসআলার হুকুম বর্ণনা করা।

قَوْلُهُ فَاِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً الخ : এ عِبَارَةٌ-এর সারমর্ম হচ্ছে, কূপে পতিত নাপাকী হয়তো দৃশ্যমান হবে যেমন– মৃতজন্তু, রক্ত ইত্যাদি। অথবা অদৃশ্যমান হবে যেমন– মদ, পেশাব ইত্যাদি। এগুলো পানির সাথে মিলার পরে আর দৃশ্যমান থাকে না। এখন যদি ঐ দশ দশ হাত পরিমাণ বা এর চেয়ে বড় কোনো কূপে যদি দৃশ্যমান নাপাকী পতিত হয়, তবে যে পাশে নাপাকী পতিত হয় না, সে পাশে বসে অজু করতে পারবে। আর যদি নাপাকী অদৃশ্যমান হয় তবে যে-কোনো পাশ দিয়ে অজু করতে পারবে। এটি বুখারার মাশায়িখের অভিমত। পক্ষান্তরে ইরাকের মাশায়েখে কেরাম বলেন, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান নাপাকীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; বরং উভয় প্রকারের নাপাকীই যদি কূপে পতিত হয়, তবে যে পাশে নাপাকী পতিত হয়নি সে পাশ দিয়ে অজু করতে পারবে, আর যে পাশে নাপাকী পতিত হয়েছে সে পাশে অজু করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا مِنْ مَوْضِعِ غُسَالَتِهِ : এটি مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ মাসআলা, যা "খুলাসাহ" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যদি ব্যবহৃত পানি পাক হয় তবে তো ব্যবহৃত পানি পতিত হওয়ার পাশে বসেও অজু করা যাবে। আর যদি ব্যবহৃত পানি নাপাকও হয় তথাপিও এতে অজু করা বৈধ। কেননা, তা অদৃশ্যমান নাপাকী। কিন্তু "যখীরাতুল উক্‌বা" নামক গ্রন্থে এ মাসআলায়ও মতানৈক্য উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ مُحْيِ السُّنَّةِ الخ : তাঁর নাম– আবূ মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবনে মাসউদ বাগাবী (র.)। মুহিউস সুন্নাহ তাঁর উপাধি। অনেক বড় মুহাদ্দিস ও মুফাসসির ছিলেন। শরহুস সুন্নাহ, মাসাবীহুস সুন্নাহ এবং মা'আলিমুত তানযীল-এর মতো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরাজি তিনি রচনা করেছেন। তিনি মূলত আহনাফের বক্তব্যের উপর একটি মন্তব্য করেছেন। মন্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, "দশ দশ হাত পরিমাণ কূপ হলে বড় কূপ অন্যথায় ছোট কূপ" এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে কিংবা ইঙ্গিতে কুরআন অথবা হাদীসে বর্ণিত থাকতে হবে। কিংবা কমপক্ষে এতে ওলামায়ে কেরামের ইজমা' থাকতে হবে। অথচ এ বিষয়ে কুরআন, হাদীস এবং ইজমা'র কোনো দলিল নেই। তাই আহনাফের কূপের উক্ত পরিমাণ নির্ধারণ করা ঠিক হয়নি।

পরবর্তীতে আমাদের শারেহ (র.) মূল মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে উক্ত মন্তব্যের খণ্ডন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এরও শরয়ী দলিল রয়েছে। তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ حَوْلَهَا اَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا فَيَكُوْنُ لَهَا حَرِيْمُهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشَرَةٌ ـ

অর্থাৎ "যদি কোনো ব্যক্তি কূপ খনন করে তবে এর আশপাশে দশ দশ হাত করে চল্লিশ হাত হবে এর হারীম।"

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কূপের আশপাশের দশ দশ হাত করে অংশ কূপের মালিকের অধিকারভুক্ত। তাই যদি এর ভিতরে কেউ কূপ খনন করতে চায়, তবে তাকে এর থেকে বাধা দেওয়া হবে। কেননা, তখন হতে পারে প্রথম কূপের পানি দ্বিতীয় কূপে চলে আসবে। অনুরূপ এর ভিতরে কোনো ঘরবাড়িও নির্মাণ করা থেকে বাধা দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ بِالْوَعَةِ : এটি এমন কূপ যার মুখ থাকে ছোট, যা বৃষ্টি ইত্যাদির পানি জমা হওয়ার জন্য হয়ে থাকে এবং ময়লা-আবর্জনাও এতে ফেলা হয়। তাই যদি দশ হাতের ভিতরে কেউ ময়লা ফেলার কূপ খনন করতে চায় তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে। কেননা, তখন প্রথম কূপে নাপাকী চলে আসবে। হ্যাঁ যদি দশ হাতের বাহিরে খনন করে তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে না। কেননা, তখন আর এতে নাপাকী প্রবেশ করবে না।

قَوْلُهُ فَعُلِمَ اَنَّ الشَّرْعَ اِعْتَبَرَ الْعَشَرَ الخ : উল্লিখিত حَدِيْث حَرِيْم দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রথম কূপের দশ হাতের ভিতরে পানির কূপ কিংবা ময়লা ফেলার কূপ খনন করা থেকে বাধা দেওয়া হবে। এর কারণ হলো, এ দ্বিতীয় কূপের পানি কিংবা ময়লা প্রথম কূপে চলে আসবে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শরিয়ত নাপাকী প্রবেশ করা ও না করার ক্ষেত্রে দশ হাত দূরত্বের اِعْتِبَارٌ করে। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম দশ দশ হাতের পরিমাণকে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, কমপক্ষে এ পরিমাণ কূপ হলে এর এক পাশের নাপাকী অপর পাশে যাবে না। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, "এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরাম অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। যার সারমর্ম শারেহ (র.) উল্লেখ করেছেন এবং এটিই নির্ভরযোগ্য।" হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, দশ দশ হাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা জরুরি নয়। শুধু মানুষের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্যে এ পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে।

وَلاَ بِمَاءٍ اُسْتُعْمِلَ لِقُرْبَةٍ أَوْ رَفْعِ حَدَثٍ **اِعْلَمْ** اَنَّ فِى الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ اِخْتِلاَفَاتٌ اَلْاَوَّلُ فِىْ اَنَّهٗ بِاَىِّ شَىْءٍ يَصِيْرُ مُسْتَعْمَلاً فَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) بِاِزَالَةِ الْحَدَثِ وَاَيْضًا بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فَاِذَا تَوَضَّأَ الْمُحْدِثُ وُضُوْءً غَيْرَ مَنْوِىٍّ يَصِيْرُ مُسْتَعْمَلاً وَلَوْ تَوَضَّأَ غَيْرُ الْمُحْدِثِ وُضُوْءً مَنْوِيًّا يَصِيْرُ مُسْتَعْمَلاً اَيْضًا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) بِالثَّانِىْ فَقَطْ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) بِاِزَالَةِ الْحَدَثِ لٰكِنَّ اِزَالَةَ الْحَدَثِ لاَ يَتَحَقَّقُ اِلاَّ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ عِنْدَهٗ بِنَاءً عَلٰى اِشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِى الْوُضُوْءِ وَالْاِخْتِلاَفُ الثَّانِىْ فِىْ اَنَّهٗ مَتٰى يَصِيْرُ مُسْتَعْمَلاً فَفِى الْهِدَايَةِ اَنَّهٗ كَمَا زَايَلَ الْعُضْوَ صَارَ مُسْتَعْمَلاً وَالْاِخْتِلاَفُ الثَّالِثُ فِىْ حُكْمِهٖ فَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) هُوَ نَجِسٌ نَجَاسَةً غَلِيْظَةً وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) هُوَ نَجِسٌ نَجَاسَةً خَفِيْفَةً وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُوْرٍ وَعِنْدَ مَالِكٍ (رح) وَالشَّافِعِىِّ (رح) فِىْ قَوْلِهِ الْقَدِيْمِ هُوَ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ وَنَحْنُ نَقُوْلُ لَوْ كَانَ طَاهِرًا وَ مُطَهِّرًا لَجَازَ فِى السَّفَرِ الْوُضُوْءُ بِهٖ ثُمَّ الشُّرْبُ مِنْهُ وَلَمْ يَقُلْ اَحَدٌ بِذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : ছওয়াব হাসিল কিংবা অপবিত্রতা দূরীকরণের লক্ষ্যে যে পানি ব্যবহার করা হয়েছে তা দ্বারা অজু করা বৈধ নয়। জেনে রাখুন যে, مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ [ব্যবহৃত পানি]-এর ক্ষেত্রে কয়েকটি মতানৈক্য রয়েছে। এক. কোন্ জিনিসের মাধ্যমে পানি مُسْتَعْمَلٌ হয়? শায়খাইন (র.)-এর নিকট حَدَثٌ [অপবিত্রতা] দূরীকরণের মাধ্যমে এবং ছওয়াব অর্জনের নিয়তেও [পানি ব্যবহার করার মাধ্যমে] পানি مُسْتَعْمَلٌ হয়ে যায়। তাই যদি কোনো مُحْدِثٌ ব্যক্তি অজুর নিয়ত ব্যতীত অজু করে তবে পানি مُسْتَعْمَلٌ হয়ে যাবে। আর যদি কোনো غَيْرُ مُحْدِثٌ ব্যক্তি ছওয়াবের নিয়তে অজু করে তবুও পানি مُسْتَعْمَلٌ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট শুধু দ্বিতীয়টি [তথা ছওয়াবের নিয়তে অজু করা] এর মাধ্যমে পানি مُسْتَعْمَلٌ হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট حَدَثٌ [অপবিত্রতা] দূরীকরণের মাধ্যমে পানি مُسْتَعْمَلٌ হয়। তবে তাঁর নিকট ছওয়াবের নিয়ত ব্যতীত حَدَثٌ [অপবিত্রতা] দূরীকরণ প্রমাণিত হয় না। কেননা, [তাঁর নিকট] অজুতে নিয়ত শর্ত। ২. দ্বিতীয় মতানৈক্য হচ্ছে, পানি কখন مُسْتَعْمَلٌ হবে? এ নিয়ে হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, অজুর অঙ্গ থেকে পানি পৃথক হওয়ার দ্বারা পানি مُسْتَعْمَلٌ হয়ে যাবে। ৩. তৃতীয় মতানৈক্য হচ্ছে, مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ-এর হুকুম সম্পর্কে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ نَجَاسَةٌ غَلِيْظَةٌ [গাঢ় নাপাকী]। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তা نَجَاسَةٌ خَفِيْفَةٌ [হালকা নাপাকী]। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট তা পবিত্র, কিন্তু অন্যকে পবিত্রকারী নয়। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর قَوْلٌ قَدِيْمٌ [পূর্বের অভিমত] হচ্ছে, তা পবিত্র এবং অন্যকেও পবিত্রকারী। আমরা বলি, যদি তা পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্রকারী হতো তবে সফরে এর দ্বারা অজু করা জায়েজ হতো, অতঃপর তা পান করাও জায়েজ হতো। অথচ কোনো ইমামই এমনটি বলেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا بِمَاءٍ اُسْتُعْمِلَ لِقُرْبَةٍ الخ [ব্যবহৃত পানির বিবরণ] : এখানে বিকায়া গ্রন্থকার (র.) مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ-এর আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি সংক্ষেপে বলেছেন, ছওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে কিংবা حَدَثٌ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে যে পানি ব্যবহার করা হয়েছে তা দ্বারা অজু ও গোসল করা বৈধ নয়। তবে শারেহ (র.) مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। এর সারমর্ম নিম্নরূপ–

শারেহ (র.) مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ সম্পর্কে তিনটি আলোচনা উল্লেখ করেছেন– ১. কোন জিনিসের দ্বারা পানি ব্যবহৃত (مُسْتَعْمَلٌ) হয়? ২. পানি কখন مُسْتَعْمَلٌ হয়। ৩. مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ-এর হুকুম।

১. এখানে গ্রন্থকার প্রথমে আলোচনা করেছেন যে, কোন জিনিসের দ্বারা পানি مُسْتَعْمَلٌ হয়। এতে ইমামদের মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট অপবিত্র অজুহীন ব্যক্তি যদি অজু করে, অনুরূপ পবিত্র অজুবান ব্যক্তি যদি ছওয়াব ও নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পুনরায় অজু করে তবে এর দ্বারা পানি مُسْتَعْمَلٌ হয়ে যায়। তাই যদি কোনো مُحْدِثٌ ব্যক্তি অজুর নিয়ত ছাড়াও অজু করে তবুও পানি مُسْتَعْمَلٌ হয়ে যাবে। কেননা, এর দ্বারা حَدَثٌ দূর করা হয়েছে। অনুরূপ যদি কোনো غَيْرُ مُحْدِثٍ [পবিত্র] ব্যক্তি অজুর নিয়তেও অজু করে, তবে পানি مُسْتَعْمَلٌ হয়ে যাবে। কেননা, ছওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট শুধু ছওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে [তথা অজুবান পবিত্র ব্যক্তি] অজু করার দ্বারা পানি مُسْتَعْمَلٌ হয়। কেননা, তখন পানিটা مُسْتَعْمَلٌ হয় গুনাহের কারণে। আর গুনাহ ঐ অজুর পানির সাথে ঝরে পড়ে, যা ছওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে করা হয়। এমনকি যদি কোনো জুনুবী ব্যক্তি কূপে পতিত কোনো জিনিস উঠানোর জন্য ডুব দেয় তবে তাঁর নিকট পানি নাপাক হবে না। কেননা, সে গোসল ছওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে হয়নি। যদিও এর দ্বারা তার حَدَثٌ [অপবিত্রতা] দূরীভূত হয়ে গেছে।

২. শারেহ (র.) দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করেছেন, পানি কখন مُسْتَعْمَلٌ হয়। ফুকাহায়ে কেরাম এর উপর একমত যে, যতক্ষণ পানি শরীরের সঙ্গে লেগে থাকবে ততক্ষণ পানি مُسْتَعْمَلٌ হবে না। তবে কখন مُسْتَعْمَلٌ হবে এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে।

১. পানি যখন শরীর থেকে পৃথক হবে তখন مُسْتَعْمَلٌ হয়ে যাবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ মতটিকেই উত্তম বলেছেন এবং এটিই হানাফী মাশায়িখের অভিমত।

২. যখন পানি শরীর থেকে পৃথক হয়ে এক স্থানে জমা হয় তখন তা مُسْتَعْمَلٌ হয়ে যায়। এটি ফখরুল ইসলাম (র.) ও বালখের মাশায়িখের অভিমত।

৩. শারেহ (র.) তৃতীয় পর্যায়ে আলোচনা করেছেন, مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ-এর হুকুম সম্পর্কে। এ আলোচনার সারাংশ হলো, ব্যবহৃত পানি তিন প্রকার–

ক. এমন পানি যা পাক জিনিস ধৌত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন শস্যাদি, শাক-সবজি ও পাক কাপড় ইত্যাদি ধোয়ার পানি সর্বসম্মতিক্রমে পাক।

খ. এমন পানি যা নাজাসাতে হাকীকী দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– পেশাব-পায়খানায় ব্যবহৃত পানি, নাপাক কাপড় ধোয়া পানি। এ পানি সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক।

গ. এমন পানি যা নাজাসাতে হুকমী দূরকরণার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন– অজুহীন ব্যক্তির অজু করা পানি। অথবা যা ছওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন– অজুকারী ব্যক্তির পুনরায় অজু করা পানি।

এ প্রকারের مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ-এর হুকুম সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়–

১. হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, ব্যবহৃত পানি নাজাসাতে গলীজা বা গাঢ় নাপাকী। কারণ, বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, অজুর পানির সাথে গুনাহ ঝরে যায়। আর যে পানির সঙ্গে তা রয়েছে সেটা সাধারণ নাপাক হতে পারে না; বরং তা নাজাসাতে গলীযা।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, ব্যবহৃত পানি নাজাসাতে খফীফা বা হালকা নাপাকী। কেননা, ব্যবহৃত পানি পাক নাপাক হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। আর ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্যের দ্বারা সহজ জিনিস বের হয়ে আসে। তাই ব্যবহৃত পানি নাজাসাতে খফীফা-এর হুকুমে হবে– নাজাসাতে গলীযার হুকুমে নয়।

৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, ব্যবহৃত পানি নিজে পবিত্র, কিন্তু অন্যকে পবিত্রকারী নয়। এটিই নির্ভরশীল, সর্বাধিক শক্তিশালী অভিমত এবং এরই উপর ফতোয়া। কেননা, অজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাক এবং পানিও পাক। আর পাক জিনিস পাক জিনিসের সঙ্গে মিলিত হওয়া নাপাক হওয়ার কারণ নয়। তবে যদি পানি ছওয়াব ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তাতে পানির গুণ পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন, সদকা ও জাকাতের মাল। কেননা, মাল মূলগতভাবে পাক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا "আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করবেন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পাক করবেন এবং পরিশোধিত করবেন।"–[সূরা তাওবা : ১০৩]

জাকাত আদায়কৃত মালকে শরিয়ত ময়লা-আবর্জনা বলে আখ্যা দিয়েছে। এমনিভাবে পানি যখন ছওয়াব ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তখন নাজাসাতে হুকমিয়ার কারণে পানি ময়লা হয়ে যায় এবং এর মূলরূপে অবশিষ্ট থাকে না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবহৃত পানি নিজে পবিত্র কিন্তু অন্যকে পাবিত্রকারী নয়।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) বলেন, ব্যবহৃত পানি পবিত্র এবং وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا এ আয়াতেও আল্লাহ مَاءٌ مُطْلَقٌ-কে طَهُوْر বলেছেন। যার অর্থ– বারবার পাক করা। অতএব, এর দ্বারা বুঝা গেল যে, পানি দ্বারা একবার পবিত্রতা অর্জন করার পর তা দ্বারা দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও পবিত্রতা অর্জন করা যাবে, তাই مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ নিজেও পবিত্র এবং অন্যকেও পবিত্রকারী।

আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের কয়েকটি খণ্ডন উল্লেখ করেছেন–

ক. طَهُوْرٌ - فَعُوْلٌ-এর ওযনে مُبَالَغَةٌ-এর صِيْغَةٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তা আমরা মানি না; বরং طَهُوْرٌ - فَعُوْلٌ-এর ওজনে مَصْدَرٌ [তথা طَهَارَةٌ]-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, কুরআনের আয়াত– وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا اى شَرَابًا طَاهِرًا এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস– مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ - لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِطُهُوْرٍ اَىْ طَهَارَةٍ যেহেতু طَهُوْر-এর অর্থ বারবার পাক করা নয়, তাই ব্যবহৃত পানিও অন্যকে পবিত্রকারী (مُطَهِّرٌ) হতে পারবে না।

খ. طَهُوْر ঐ জিনিসের নাম যার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়। যেমন, سَحُوْر ঐ খানাকে বলা হয় যা সুবহে সাদেকের পূর্বে খাওয়া হয়। সুতরাং এ হিসেবেও পানি বারবার পবিত্রকারী সাব্যস্ত হয় না।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর– ১ : ৯০-৯৬, বাদায়েউস সানায়ে'– ১ : ২০৮-২১৬, বাহরুর রায়িক– ১ : ১৬৪-১৭৫]

قَوْلُهُ وَنَحْنُ نَقُوْلُ لَوْ كَانَ طَاهِرًا : এ স্থানে শরহে বিকায়ার কোনো কোনো নোসখায় عِبَارَةٌ-এর পার্থক্য রয়েছে। এ নোসখায় তো আছে– لَوْ كَانَ طَاهِرًا لَجَازَ এবং কোনো কোনো নোসখায় আছে– لَوْ كَانَ طَاهِرًا وَمُطَهِّرًا لَجَازَ - প্রথম সুরতে مُطَهِّرٌ শব্দটি اِسْمُ مَفْعُوْلٍ পড়া হবে কিংবা اِسْمُ فَاعِلٍ মাসদারের অর্থে পড়া হবে। আর প্রথম সুরতে مُطَهِّرٌ শব্দটি طَاهِرٌ শব্দের تَاكِيْد হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে উদ্দেশ্য হলো, যারা এ عبارة এ- طَاهِرًا وَمُطَهِّرًا উভয় শব্দ উল্লেখ করেছে তাদের খণ্ডন করা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাবকে মজবুত করা। দ্বিতীয় নোসখার عِبَارَةٌ-এর সারমর্ম হচ্ছে, যদি ব্যবহৃত পানি প্রকৃতপক্ষে طَاهِرٌ [পবিত্র] হতো তবে সফরে এ পানি দ্বারা অজু করা এবং অজুকৃত পানি পান করা বৈধ হতো। অথচ কোনো ফকীহই এ কথা বলেন না; বরং সফরে পিপাসার ভয় থাকলেই তায়াম্মুম করতে বলা হয়েছে।

وَكُلُّ اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ اِلَّا جِلْدُ الْخِنْزِيْرِ وَالْاٰدَمِيِّ اِعْلَمْ اَنَّ الدِّبَاغَةَ هِيَ اِزَالَةُ النَّتَنِ وَالرُّطُوْبَاتِ النَّجِسَةِ مِنَ الْجِلْدِ فَاِنْ كَانَتْ بِالْاَدْوِيَةِ كَالْقَرْظِ وَنَحْوِهٖ يَطْهُرُ الْجِلْدُ لَا يَعُوْدُ نَجَاسَةً اَبَدًا وَاِنْ كَانَتْ بِالتُّرَابِ اَوْ بِالشَّمْسِ يَطْهُرُ اِذَا يَبِسَ ثُمَّ اِنْ اَصَابَهُ الْمَاءُ هَلْ يَعُوْدُ نَجِسًا فَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) رِوَايَتَانِ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اِنْ صَارَ بِالشَّمْسِ بِحَيْثُ لَوْ تَرَكَ لَمْ يَفْسُدْ كَانَ دِبَاغًا وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) جِلْدُ الْمَيْتَةِ اِذَا يَبِسَ وَوَقَعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يُنَجِّسْ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَالصَّحِيْحُ فِيْ نَافِجَةِ الْمِسْكِ جَوَازُ الصَّلٰوةِ مَعَهَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ۔

অনুবাদ : শূকর ও মানুষের চামড়া ব্যতীত যে-কোনো চামড়াকে দাবাগাত [তথা পরিশোধন] করা হলে তা পাক হয়ে যায়। জেনে রাখুন যে, দাবাগাত অর্থ হলো, দুর্গন্ধ ও তরল নাপাকীকে চামড়া থেকে দূরীভূত করা। অতএব, দাবাগাত যদি ঔষধের মাধ্যমে করা হয়, যেমন– কুরয [তথা সলম বৃক্ষের পাতা] ইত্যাদি [-এর মাধ্যমে] তবে চামড়া পাক হয়ে যাবে এবং কখনো আর এর নাপাকী ফিরে আসবে না। আর যদি মাটি কিংবা সূর্যের কিরণ দ্বারা দাবাগাত করা হয় তবে তা শুকালে পাক হয়ে যাবে। অতঃপর যদি তাতে পানি লাগে [এবং তা ভিজে যায়] তবে এর নাপাকী পুনরায় ফিরে আসবে কি আসবে না [এতে মতানৈক্য রয়েছে]। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত, সূর্যের তাপ দ্বারা দাবাগাতকৃত চামড়া যদি এমন হয় যে, তা রেখে দেওয়ার মাধ্যমে নষ্ট হয় না তবে তা দাবাগাতকৃত হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত, মৃতজন্তুর চামড়া যদি শুকিয়ে যায় অতঃপর তা পানিতে পতিত হয় তবে কোনো প্রকার বিশ্লেষণ ছাড়াই তা নাপাক হবে না এবং বিশুদ্ধ মতে, কোনো প্রকার বিশ্লেষণ ছাড়াই মৃগনাভির থলে সঙ্গে নিয়ে নামাজ আদায় করা বৈধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَكُلُّ اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ الخ : اِهَابٌ -এর হামযা অব্যয় যের -এর সাথে পড়া হবে। এর বহুবচন হচ্ছে, اُهُبٌ ও اُهْبَةٌ বিনায়া গ্রন্থকার লেখেন, দাবাগাত করার পর চামড়াকে اَدِيْمٌ এবং দাবাগাতের পূর্বে اِهَابٌ বলা হয়। আর جِلْدٌ শব্দটি উভয়টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইনায়া গ্রন্থকার লেখেন, চামড়ার দাবাগাতের সাথে তিনটি মাসআলার সম্পর্ক রয়েছে–

১. চামড়াটি পাক হওয়া। এ মাসআলার সম্পর্ক كِتَابُ الصَّيْدِ -এর সাথে। আমরা উক্ত অধ্যায়েই এর আলোচনা করব।

২. চামড়া দ্বারা পোশাক বা জায়নামাজ বানানো। এটির সম্পর্ক كِتَابُ الصَّلٰوةِ এর সাথে। এটিও আমরা উক্ত অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

৩. চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে এর পানি দ্বারা অজু করা। এ মাসআলার সম্পর্ক এ অধ্যায়ের সাথে যা আমরা এখানে আলোচনা করব। তবে এ মাসআলা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, শূকর ও মানুষের চামড়া ব্যতীত অন্য প্রাণীর চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পাক হয়ে যাবে। চাই মৃতজন্তুর চামড়া হোক কিংবা জীবিত প্রাণীর চামড়া হোক, হালাল প্রাণীর চামড়া হোক কিংবা হারাম প্রাণীর হোক এবং যে ধরনের জিনিস দ্বারাই দাবাগাত করা হোক না কেন। এর দ্বারা বানানো জায়নামাজে নামাজ আদায় করা যাবে এবং এর

দ্বারা বানানো মশকের পানি দ্বারা অজু ও গোসল করা বৈধ। ইমাম মালেক (র.) বলেন, মৃত জন্তুর চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পাক হয় না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কুকুরের চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পাক হয় না।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকালের একমাস পূর্বে জুহাইনা গোত্রের নিকট লেখেন, তোমরা মৃত পশুর চামড়া দাবাগাত করে এবং রগ দ্বারা উপকার গ্রহণ করবে না।" –[আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত পশুর চামড়াকে দাবাগাত করে কিংবা এর রগ দ্বারা উপকার গ্রহণ করা থেকে বারণ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মৃতপ্রাণীর চামড়া দাবাগাত করার পরও পাক হয় না। অন্যথায় এর দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, তিনি কুকুরকে শূকরের উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে শূকরের চামড়াকে দাবাগাত করার দ্বারা পাক হয় না, তেমনি কুকুরের চামড়াকেও দাবাগাত করার দ্বারা পাক হয় না।

আহনাফের দলিল হলো–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে-কোনো চামড়া দাবাগাত করা হলে পাক হয়ে যায়।" –[তিরমিযী, মুয়াত্তা' মালিক ও মুসনাদে আহমদ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, মৃত পশুর চামড়াকে দাবাগাত করার দ্বারা পাক হয়ে যায়। এতে মৃত ও কুকুরকে স্বতন্ত্র করা হয়নি।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُ مَيْتَةٌ فَقَالَ دِبَاغُهُ يُزِيْلُ خُبْثَهُ .

অর্থাৎ "একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মশকের পানি দিয়ে অজু করতে চাইলেন, তখন তাঁকে বলা হলো, এটি মৃত জানোয়ারের চামড়া দ্বারা তৈরি। তিনি বললেন, দাবাগাত করার দ্বারা এর নাপাকী দূর হয়ে যায়।" –[বায়হাকী, মুসনাদে হাকেম ও ইবনে খুযায়মা]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, নবী ﷺ বলেছেন– দাবাগাত করার দ্বারা মৃত জন্তুর চামড়াও পাক হয়ে যায়।

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) وَمَالِكٍ (رحـ) : ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ এবং أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ এ দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা, إِهَابٌ দাবাগাতের পূর্বের চামড়াকে বলা হয়। আর উক্ত হাদীসে দাবাগাতের পূর্বে চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের খণ্ডন হচ্ছে, কুকুরের চামড়াকে শূকরের চামড়ার উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা, বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কুকুরের চামড়া نَجِسُ الْعَيْنِ [মূল নাপাক] নয়। এর কারণ হচ্ছে, পাহারা বা শিকার করার জন্য কুকুর নিজের কাছে রাখা জায়েজ। যদি কুকুর نَجِسُ الْعَيْنِ হতো তবে কোনোভাবেই এর দ্বারা উপকার হাসিল করা বৈধ হতো না।

❖ **মানুষ ও শূকরের চামড়া দাবাগাত করলেও পাক হয় না :** চামড়া দাবাগাত করার অধ্যায়ে একটি মূলনীতি হচ্ছে, "যে সমস্ত প্রাণীর মূলই নাপাক সেগুলোকে দাবাগাত করার পরও পাক হয় না। আর যেগুলোর সঙ্গে নাপাক তরল বস্তু মিলিত হওয়ার কারণে নাপাক হয়েছে সেগুলোকে দাবাগাত করার দ্বারা পাক হয়ে যায়।"

বেকায়া গ্রন্থকার (র.) শূকর ও মানুষের চামড়াকে দাবাগাত করার হুকুম থেকে পৃথক করেছেন যে, মানুষ এবং শূকরের চামড়া দাবাগাত করলেও পাক হয় না। শূকরের চামড়া এ কারণে পাক হবে না যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ

فَإِنَّهُ رِجْسٌ "শূকরের গোশতকে হারাম করা হয়েছে। কেননা, তা নাপাক।" [সূরা আন'আম : ১৪৫] এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শূকর نَجِسُ الْعَيْنِ অর্থাৎ তা মূলগতভাবেই নাপাক। এটি এমন নয় যে, এর মূল পাক। আর এর সঙ্গে তরল নাপাকী মিশ্রিত হওয়ার কারণে নাপাক হয়েছে। যেমনটি কুকুরের ক্ষেত্রে হয়েছে। কেননা, তা মূলগতভাবে পাক। তবে এর সাথে তরল নাপাকী মিশ্রিত হওয়ার কারণে তা নাপাক হয়ে গেছে।

মানুষের চামড়া দাবাগাত করার পরেও পাক হবে না এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে– وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।" –[সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০]

এ সম্মানের কারণেই মানুষের চামড়া দাবাগাত করার পরও পাক হয় না।

–[এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর– ১ : ৯৬-১০২, বাহরুর রায়িক– ১ : ১৭৯-১৯০]

قَوْلُهُ اِعْلَمْ اَنَّ الدِّبَاغَةَ هِيَ اِزَالَةُ : শারেহ (র.) এখানে دِبَاغَةٌ [দাবাগাত]-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, দাবাগাত বলা হয়, দুর্গন্ধ ও নাপাকী তরল পদার্থকে চামড়া থেকে দূরীভূত করা। উক্ত عِبَارَةٌ-এর মাঝে মুসলমান বা কাফেরের দাবাগাতকে খাস করা হয়নি, তাই عِبَارَةٌ-এর ব্যাপকতার কারণে যে-কোনো মানুষের দাবাগাত এতে শামিল। মুসলমান হোক কিংবা কাফের হোক, বাচ্চা হোক কিংবা বৃদ্ধ হোক, সুস্থ মস্তিষ্কবান হোক কিংবা না হোক, পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক। সকলের হুকুম বরাবর যে, তাদের যে কারো কর্তৃক দাবাগাত করা হলে তা পাক হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, دِبَاغَةٌ দু প্রকার–

১. حَقِيْقِيٌّ যা ঔষধ দ্বারা করা হয়। যেমন– লবণ, সলম বৃক্ষের পাতা [এক ধরনের কাটাযুক্ত বৃক্ষ যার পাতা দ্বারা দাবাগাত করা হয়] ইত্যাদি।

২. حُكْمِيٌّ যা রোদ্রের তাপ বা মাটি দ্বারা করা হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) স্বীয় গ্রন্থ কিতাবুল আছার-এ লেখেন, যে জিনিস চামড়ার পচনকে রোধ করে তা-ই চামড়াকে দাবাগাতকারী পদার্থ। চাই তা রোদ্র হোক, মাটি হোক কিংবা লবণ হোক অথবা সলম বৃক্ষের পাতা হোক। কারণ, এগুলো দ্বারা নাপাকীর আর্দ্রতা দূর হওয়ার কারণে মূল উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে যায়।

শারেহ (র.) বলেন, প্রথম প্রক্রিয়ায় দাবাগাত করা হলে তথা ঔষধ দ্বারা দাবাগাত করা হলে আর কখনো তাতে নাপাকী ফিরে আসে না। আর যদি দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় দাবাগাত করা হয় তথা রোদ বা লবণ দ্বারা দাবাগাত করা হয়, আর তাতে পানি লাগে তবে এতে পুনরায় নাপাকী ফিরে আসবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে–

১. উক্ত চামড়া দ্বিতীয়বার পানির সঙ্গে লাগার দ্বারা তা পুনরায় নাপাক হয়ে যাবে।

২. তা দ্বিতীয়বার পানির সঙ্গে লাগার দ্বারা পুনরায় নাপাক হবে না।

قَوْلُهُ وَالصَّحِيْحُ فِيْ نَافِجَةِ الْمِسْكِ الخ : مِسْكٌ শব্দের অর্থ– মৃগনাভি। আর نَافِجَةٌ শব্দের অর্থ– মৃগনাভির থলে। মৃগনাভি একটি উত্তম সুগন্ধি, যা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হরিণের নাভিতে বছরের কোনো এক সময় জমা হয়। একেই মৃগনাভি বলা হয়। বিশুদ্ধ মতে এর হুকুম হলো, তা সঙ্গে নিয়ে নামাজ আদায় করা বৈধ।

قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ : এটি প্রথম غَيْرِ فَصْلٍ; এর মর্ম হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর থেকে বর্ণিত মৃত প্রাণীর চামড়া যদি শুকিয়ে যায় অতঃপর তাতে পানি লেগে যায় তবে এতে চামড়া পুনরায় নাপাক হবে না। চাই ঔষধের মাধ্যমে দাবাগাত করা হোক কিংবা রোদ্রের মাধ্যমে করা হোক।

وَمَا طَهُرَ جِلْدُهُ بِالدَّبْغِ طَهُرَ بِالذَّكَاةِ وَكَذَا لَحْمُهُ وَإِنْ لَمْ يُؤْكَلْ وَمَا لَا فَلَا أَىْ مَا لَمْ يَطْهُرْ جِلْدُهُ بِالدَّبْغِ لَا يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ وَالْمُرَادُ بِالذَّكَاةِ أَنْ يَذْبَحَ الْمُسْلِمُ أَوِ الْكِتَابِىُّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْرُكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا وَعَصَبُهَا وَحَافِرُهَا وَقَرْنُهَا وَشَعْرُ الْاِنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ وَيَجُوْزُ صَلٰوةُ مَنْ أَعَادَ سِنَّهُ إِلٰى فَمِهِ وَإِنْ جَاوَزَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ أَفْرَدَ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِالذِّكْرِ مَعَ أَنَّهَا فُهِمَتْ مِمَّا مَرَّ لِأَنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ الْعَظْمَ طَاهِرٌ لِمَكَانِ الْاِخْتِلَافِ فِيْهَا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا يَجُوْزُ الصَّلٰوةُ بِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) .

অনুবাদ : যে প্রাণীর চামড়া দাবগাত দ্বারা পাক হয় তা জবাই করার দ্বারাও পাক হয়। অনুরূপ এর গোশতও [পাক হয়ে যায়]; যদিও তা খাওয়া যায় না। যে প্রাণীর চামড়া দাবাগাত দ্বারা পাক হয় না তা জবাই করার দ্বারাও পাক হয় না। জবাই করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুসলমান অথবা আহলে কিতাব ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহকে বর্জন করা ব্যতীত জবাই করা। [শূকর ব্যতীত] মৃত জন্তুর পশম, হাড়, খুর, শিং এবং মানুষের চুল ও হাড় পবিত্র। যে ব্যক্তি [পতিত] দাঁতকে মুখে রেখে দেয় তার নামাজ বৈধ। যদিও ঐ দাঁত এক দিরহামের চেয়ে বেশি জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়। বিকায়া গ্রন্থকার (র.) এ মাসআলাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। অথচ এ মাসআলা পূর্বের আলোচনা থেকে জানা হয়ে গেছে। কেননা, দাঁত হচ্ছে হাড়। আর গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন যে, হাড় পাক। কারণ, এ মাসআলায় মতানৈক্য রয়েছে। অতএব, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট যদি [পতিত] দাঁত এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অতিক্রম করে চলে আসে তবে তা সহ নামাজ আদায় করা বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا طَهُرَ جِلْدُهُ بِالدَّبْغِ طَهُرَ الخ : যে চামড়া দাবাগাত দ্বারা পাক হয় তা জবাই করার দ্বারাও পাক হয়ে যায়। কারণ, দাবাগাত দ্বারা যেমন নাপাক আর্দ্রতা দূর করা হয় তেমনি জবাই করার দ্বারাও প্রাণীর সমস্ত আর্দ্রতা দূর হয়ে যায়। তাই জবাই করার দ্বারা এর গোশতও পাক হয়ে যায়। এমনকি রক্ত ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ পাক হয়ে যায়। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। যদিও তা এমন পশু হয় যার গোশত খাওয়া হালাল নয়। তবে জবাই দ্বারা চামড়া ও গোশত হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হলো, জবাইটা শরয়ীভাবে হতে হবে। যেমন, কোনো মুসলমান বা কিতাবী ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলে জবাই করা। আর যদি কোনো অগ্নিপূজক অথবা মুসলমান কিংবা কিতাবী ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ ব্যতীত জবাই করে তবে এ জবাইকৃত প্রাণী মৃত হয়ে যাবে। এমন জবাই দ্বারা এর চামড়া ও গোশত পাক হবে না।

قَوْلُهُ وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا الخ : মৃতজন্তুর পশম, হাড়, খুর, শিং ও পর ইত্যাদি যদি পানিতে পতিত হয় তবে ঐ পানি নাপাক হয় না এবং এর দ্বারা অজু করাও বৈধ। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) উক্ত মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহনাফের মধ্যে মতানৈক্য উল্লেখ করেছেন। আহনাফ বলেন, মৃত জন্তুর উল্লিখিত সমস্ত অঙ্গ পাক। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মৃত জন্তুর সবকিছুই নাপাক। তিনি দলিল হিসেবে পেশ করেন যে, উল্লিখিত অঙ্গগুলো মৃত পশুরই অংশ। আর মৃত পশুর সবকিছুই নাপাক। আর আহনাফের দলিল হলো, মৃত পশুর সমস্ত অঙ্গ নাপাক নয়; বরং শুধু ঐ সমস্ত অঙ্গ নাপাক যেগুলোর প্রাণ

রয়েছে। উপরিউক্ত অঙ্গগুলোর কোনোটির মধ্যেই প্রাণ নেই। কেননা, এগুলোর কোনোটিকে যদি কাটা হয়, তবে পশুর কোনো কষ্ট অনুভূত হয় না। তাই প্রাণ না থাকায় এগুলোতে মৃত্যু প্রবেশ করতে পারে না। অথচ মৃত্যু হলো প্রাণ বিলোপ করার নাম।

قَوْلُهُ وَحَافِرُهَا : حَافِرٌ ঘোড়া, গাধা, গাভী ও বকরির পায়ের নীচের হাড়কে বলা হয়। এক শব্দে যার অর্থ– খুর। যেহেতু পরিভাষায় একে হাড় বলা হয় না, তাই একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এটি একপ্রকারের হাড়। কিন্তু একে হাড় বলা হয় না।

قَوْلُهُ وَشَعْرُ الْاِنْسَانِ وَعَظْمُهُ الخ : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের চামড়া নাপাক এবং দাবাগাত করার পরও তা পাক হয় না। এর দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, চামড়ার মতো মানুষের হাড়, চুলও নাপাক। তাই এ দুটিকে পৃথক করে উল্লেখ করেছেন যে, এ দুটি পাক। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ মাসআলার ক্ষেত্রেও আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মধ্যে মতানৈক্য উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম নিম্নরূপ–

আহনাফ বলেন, মানুষের চুল ও হাড় পাক। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মানুষের চুল ও হাড় নাপাক। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, মানুষের চুল ও হাড় উপকার লাভের যোগ্যে নয় এবং এগুলো বিক্রি করাও জায়েজ নয়। বুঝা গেল যে, উভয়টি নাপাক। আহানাফের দলিল হলো, এগুলোর ব্যবহার বা বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা, যা সেগুলো নাপাক হওয়াকে বুঝায় না। তাছাড়া এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মাথার চুল মুণ্ডিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বণ্টন করেছেন। এগুলোও তো চুল পাক হওয়ার পরিচয় বহন করে।

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ صَلٰوةُ مَنْ أَعَادَ سِنَّهُ الخ : অর্থাৎ নামাজ আদায়কালে যদি কারো দাঁত পড়ে যায় এবং তা দাঁতেই রেখে বাকি নামাজ আদায় করে তবে তার নামাজ বৈধ। হ্যাঁ, যদি দাঁতের সঙ্গে রক্ত বের হয়ে প্রবাহিত হয় তবে ভিন্ন হুকুম হবে। অথবা, নামাজকালে পতিত দাঁতটি যদি মুখের বাইরে বের করে– পুনরায় মুখে নিয়ে নেয়, তবে তা বৈধ নয়। কিন্তু যদি এক দিরহাম বা এর চেয়েও কম পরিমাণ জায়গা অতিক্রম করে চলে আসে, তবে তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া বৈধ।

قَوْلُهُ لِمَكَانِ الْاِخْتِلَافِ فِيْهَا : শারেহ (র.) উক্ত عِبَارَةٌ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, বিকায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন, যদিও পতিত দাঁত এক দিরহাম পরিমান জায়গা অতিক্রম করে ফেলে তথাপিও একে মুখে রেখে নামাজ পড়া বৈধ। কিন্তু উক্ত মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) মতানৈক্য করেন। তিনি বলেন, যদি দাঁত পড়ে এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অতিক্রম করে ফেলে, তবে তা মুখে রেখে নামাজ পড়া বৈধ নয়।

তাছাড়া দাঁত হাড় না অন্যকিছু এবং হাড় হলে এতে অনুভূতি আছে, নাকি নেই? এ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হলো, দাঁত হচ্ছে হাড় এবং তা অনুভূতিহীন।

فَصْلٌ بِئْرٌ وَقَعَ فِيْهَا نَجَسٌ اَوْ مَاتَ فِيْهَا حَيَوَانٌ وَانْتَفَخَ اَوْ تَفَسَّخَ اَوْ مَاتَ اٰدَمِيٌّ اَوْ شَاةٌ اَوْ كَلْبٌ يُنْزَحُ كُلُّ مَائِهَا اِنْ اَمْكَنَ وَاِلاَّ فَقَدْرَ مَا فِيْهَا اَلْاَصَحُّ اَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ لَهُمَا بَصَارَةٌ فِي الْمَاءِ وَمُحَمَّدٌ (رح) قَدَّرَ بِمِائَتَيْ دَلْوٍ اِلَى ثَلٰثِمِائَةٍ وَفِيْ نَحْوِ حَمَامَةٍ اَوْ دَجَاجَةٍ مَاتَتْ فِيْهَا اَرْبَعُوْنَ اِلَى سِتِّيْنَ وَفِيْ نَحْوِ فَارَةٍ اَوْ عُصْفُوْرَةٍ عِشْرُوْنَ اِلَى ثَلٰثِيْنَ وَالْمُعْتَبَرُ الدَّلْوُ الْوَسْطُ اَوْ مَا جَاوَزَهُ اُحْتُسِبَ بِهِ وَيَتَنَجَّسُ الْبِئْرُ مِنْ وَقْتِ الْوُقُوْعِ اِنْ عُلِمَ ذٰلِكَ وَاِلاَّ فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِنْ لَمْ يَنْتَفِخْ وَمُذْ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا اِنِ انْتَفَخَ وَقَالاَ مُذْ وُجِدَ وَسُؤْرُ الْاٰدَمِيِّ وَالْفَرَسِ وَكُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ وَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيْرُ وَسِبَاعُ الْبَهَائِمِ نَجَسٌ وَالْهِرَّةُ وَالدَّجَاجَةُ الْمُخْلاَةُ وَسِبَاعُ الطَّيْرِ وَسَوَاكِنُ الْبُيُوْتِ مَكْرُوْهٌ وَالْحِمَارُ وَالْبَغْلُ مَشْكُوْكٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ اَيْ يَتَوَضَّأُ بِالْمَشْكُوْكِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ اِلاَّ فِي الْمَكْرُوْهِ يَتَوَضَّأُ بِهِ فَقَطْ اِنْ عَدَمَ غَيْرَهُ وَالْعَرَقُ مُعْتَبَرٌ بِالسُّؤْرِ لِاَنَّ السُّؤْرَ مَخْلُوْطٌ بِاللُّعَابِ وَحُكْمُ اللُّعَابِ وَالْعَرَقِ وَاحِدٌ لِاَنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا مُتَوَلِّدٌ مِنَ اللَّحْمِ ـ

অনুচ্ছেদ : কূপের বর্ণনা

অনুবাদ : কূপে যদি নাপাকী পতিত হয় অথবা তাতে কোনো প্রাণী মরে ফুলে যায় কিংবা ফেটে যায়, অথবা তাতে কোনো মানুষ কিংবা বকরি কিংবা কুকুর পড়ে মারা যায়, তবে যদি সম্ভব হয় কূপের সমস্ত পানি উঠিয়ে ফেলা হবে। আর যদি [সমস্ত পানি উঠানো] সম্ভব না হয় তবে এ কূপে যে পরিমাণ পানি আছে [অনুমান করে] তা উঠিয়ে ফেলা হবে। বিশুদ্ধ মতে [অনুমান করার ক্ষেত্রে] এমন দুই ব্যক্তির মতামতকে গ্রহণ করা হবে যাদের পানির [অনুমান করার] ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) দুইশত থেকে তিনশত বালতি পর্যন্ত অনুমান করেছেন। কবুতর অথবা মুরগি কিংবা এ জাতীয় কোনো প্রাণী কূপে পড়ে মারা গেলে চল্লিশ থেকে ষাট বালতি এবং ইঁদুর অথবা চড়ুই পাখি কিংবা এ জাতীয় কোনো প্রাণী পড়ে মারা গেলে বিশ থেকে ত্রিশ বালতি [পানি উঠাতে হবে] এবং [বালতির ক্ষেত্রে] গ্রহণযোগ্য হলো– মধ্যম পর্যায়ের বালতি। আর যদি মধ্যম পর্যায় থেকে অতিরিক্ত [বড় কিংবা ছোট] হয় তবে অনুমান করা হবে [যে, কয় বালতি হলে মধ্যম পর্যায়ের বালতির পরিমাণ হবে]। কূপে নাপাকী পতিত হওয়ার সময় যদি জানা থাকে, তবে নাপাকী পতিত হওয়ার সময় থেকে কূপ নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি নাপাক পতিত হওয়ার সময় জানা না থাকে এবং পতিত প্রাণী ফুলে না যায়, তবে একদিন ও একরাত [পূর্ব] থেকে কূপকে নাপাক ধরা হবে এবং যদি ফুলে যায়, তবে তিনদিন ও তিনরাত [পূর্ব] থেকে কূপকে নাপাক ধরা হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, যখন কূপে মৃত প্রাণী পাওয়া যাবে তখন থেকে [কূপকে নাপাক ধরা হবে]। মানুষ, ঘোড়া ও যে প্রাণীর গোশত খাওয়া যায়,

সে প্রাণীর ঝুটা পাক। কুকুর, শূকর ও হিংস্র প্রাণীর ঝুটা নাপাক। বিড়াল, বন্য মুরগি, হিংস্র পাখি ও ঘরে অবস্থানকারী প্রাণীর ঝুটা মাকরূহ। গাধা ও খচ্চরের ঝুটা সন্দেহযুক্ত। এর দ্বারা অজু করবে অতঃপর তায়াম্মুম করবে, কিন্তু মাকরূহ পানি দ্বারা শুধু অজু করবে, যদি অন্য কিছু না থাকে। ঘাম ঝুটার সঙ্গে ধর্তব্য। কেননা, এ দুটির প্রত্যেকটিই গোশত থেকে সৃষ্টি হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ بِئْرٌ فِيْهَا نَجَسٌ الخ : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, কূপের মাসআলা পূর্বোল্লিখিত মাসআলা থেকে ব্যতিক্রম, তাই উক্ত মাসআলাকে একটি ভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। বিকায়া গ্রন্থকার (র.) مُطْلَقًا বলেছেন, যদি কূপে নাপাকী পতিত হয় যার দ্বারা গলীযা নাপাকী ও খফীফা নাপাকী, কম নাপাকী এবং বেশি নাপাকী সবই এতে শামিল। এমনকি যদি পেশাব অথবা মদ কিংবা রক্তের এক ফোঁটাও কূপে পতিত হয়, তবে এর সমস্ত পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে। তবে জরুরতের কারণে এর স্বল্প পরিমাণকে ক্ষমা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ– উট এবং বকরির বিষ্ঠা দ্বারা পানি নাপাক হয় না। কেননা, জঙ্গলে কূপের কোনো ঢাকনা থাকে না, সেখানে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী পায়খানা করে এবং বাতাসে তা উড়িয়ে কূপে এনে ফেলে। তাই যদি তা কূপে পড়তেই কূপ নাপাক হয়ে যেত তবে অনেক বড় সমস্যা দেখা দিত। তাই স্বল্প পরিমাণ নাপাকীকে ক্ষমা করা হয়েছে। কিন্তু অধিক পরিমাণ নাপাকী তো অবশ্যই নাপাক এবং তা ক্ষমাও করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, কম ও বেশি পরিমাণ নাপাকী নির্ণয় করবে সমাজের বিবেকবান লোকেরা।

উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি অধিক পরিমাণ নাপাকী পতিত হয় যা ক্ষমার অযোগ্য, তবে সম্ভব হলে এর সমস্ত পানি উঠিয়ে ফেলবে। এটিই কূপের জন্য তাহারাত বলে বিবেচিত হবে। কূপের দেয়াল ধোয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু পানি বের করে ফেললেই কূপ পাক হয়ে যাবে। কেননা, এতে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি সম্পূর্ণ পানি বের করা সম্ভব না হয়, তবে কূপে যে পরিমাণ পানি ছিল সে পরিমাণ পানি অনুমান করে উঠিয়ে ফেলবে। পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পানি সম্পর্কে দুজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির রায় গ্রহণ করা হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, কূপ সংক্রান্ত মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে সালাফে সালিহীনের ফতোয়ার উপর। এখানে কিয়াসের কোনো দখল নেই। সুতরাং কিয়াস দ্বারা পানির কোনো পরিমাণ নির্ণয় করা যাবে না। কেননা, এক্ষেত্রে দু'টি বিপরীতমুখী কিয়াস রয়েছে। **১.** পানি একেবারেই নাপাক না হওয়া। কারণ, কূপের নিম্নদেশ থেকে পানি অনবরত বের হচ্ছেই, তাই কূপের পানি مَاءٌ جَارِيْ-এর অনুরূপ হবে। আর مَاءٌ جَارِيْ নাপাকী পড়ার দ্বারা অপবিত্র হয় না। **২.** কূপ কোনোভাবেই পাক না হওয়া। কেননা, কূপে নাপাকী পড়ায় পানি অপবিত্র হয়ে গেছে, কূপের দেয়াল অপবিত্র হয়ে গেছে, মাটি নাপাক হয়ে গেছে। এমনকি যতটুকু পানি বের করা হবে ঐ পরিমাণ পানি কূপের নীচ থেকে আবার বের হয়ে আসবে যা নাপাক, মাটি নাপাক। আবার নাপাক পানি নাপাক দেয়ালের সাথে মিলে নিজেও নাপাক হয়ে যাবে। আর এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে কিয়ামত অবধি কূপ পাক হবে না। সার কথা হচ্ছে, কূপ সংক্রান্ত সমস্ত মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে সাহাবী ও তাবেয়ীদের ফতোয়ার উপর; কিয়াসের উপর নয়।

قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ فِيْهَا حَيَوَانٌ الخ : এ ইবারতের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি মাসআলা হলো, যদি কোনো প্রাণী কূপে পড়ে জীবিত থাকে এবং জীবিতই বের হয়ে আসে আর নিশ্চিত জানা যায় এর শরীরে نَجَسْ عَيْنْ ছিল, কিংবা ঐ পানিই نَجَسْ عَيْنْ তবে কূপের সমস্ত পানি বের করতে হবে, অন্যথায় নয়। যদি কোনো প্রাণী কূপে পড়ে মারা যায় কিংবা বাইরে মরে কূপে পতিত হয়, তবে উভয় সুরতের হুকুম একই, যা বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বিস্তারিতভাবে ইবারতে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَانْتَفَخَ اَوْ تَفَسَّخَ أَوْ مَاتَ الخ : اِنْتَفَخَ অর্থ– ফুলে যাওয়া, আর تَفَسُّخٌ অর্থ– ফেটে যাওয়া এবং অঙ্গ পৃথক হয়ে যাওয়া। "ফোলা"-এর কথা বলার পরে "ফাটা"-এর কথা বলার প্রয়োজন নেই। কেননা, ফুলার হুকুম জানার দ্বারা ফাটার হুকুম আরো ভালোভাবে জানা যায়। কারণ, ফাটা ফোলার চেয়ে অধিক গুরুতর। তথাপিও বিকায়া গ্রন্থকার (র.) ফাটার কথা উল্লেখ করেছেন ঐ সন্দেহকে দূর করার জন্য যে, যদি পতিত প্রাণী মরে ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যায় তবে হয়তো কূপের দেয়ালও

ভালোভাবে মেজে-ঘষে পাক-পবিত্র করতে হবে। মূলত এমনটি নয় এবং এ কথাও জানা হয়ে গেল যে, মানুষ, কুকুর ইত্যাদি যদি কূপে পড়ে মারা যায়, তবে কূপের সমস্ত পানি বের করতে হবে। যদিও না ফুলে এবং না ফাটে। আর যদি কোনো ছোট প্রাণী পড়ে মারা যায় এবং ফুলে যায় তবে এ ছোট প্রাণী মরে ফুলে যাওয়া কিংবা ফেটে যাওয়া এবং বড় প্রাণী শুধু মারা যাওয়ার হুকুম বরাবর। তবে না ফোলা ও না ফাটার সুরতে হুকুম ভিন্ন।

قَوْلُهُ وَاِلَّا فَقُدِّرَ مَا فِيْهَا الخ : অর্থাৎ যদি সমস্ত পানি বের করা সম্ভব না হয়, কেননা কিছু কূপ এমন আছে যে, এর থেকে যে পরিমাণ পানি উঠানো হয় সে পরিমাণ, কখনো এর চেয়েও বেশি পরিমাণ পানি নীচ থেকে উৎসারিত হয়। তাই এর পানি বের করে শেষ করা যায় না। অতএব, এ সুরতে পানি উঠানোর ক্ষেত্রে পনি সম্পর্কে অভিজ্ঞ দুজন ব্যক্তির অভিমত গ্রহণ করা হবে। তাদের উভয়ের ফয়সালা অনুযায়ী যদি কূপের পানির পরিমাণ পঞ্চাশ বালতি হয়, তবে পঞ্চাশ বালতি পানি উঠানোর দ্বারা কূপ পাক হয়ে যাবে। এখানে ইমাম মুহাম্মদ (র.) স্বীয় অনুমান বলেছেন যে, দুইশত থেকে তিনশত বালতি পানি উঠালেই কূপ পাক হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَفِيْ نَحْوِ حَمَامَةٍ أَوْ دَجَاجَةٍ : এখান থেকে বিকায়া গ্রন্থকার (র.) কিছু শাখা পর্যায়ের মাসাআলা বর্ণনা করছেন যে, যদি কবুতর, মুরগি, বিড়াল কিংবা এ পরিমাণের কোনো প্রাণী পড়ে মারা যায় কিন্তু না ফুলে, তবে এর থেকে চল্লিশ থেকে ষাট বালতি পানি তুলতে হবে। অর্থাৎ চল্লিশ বালতি পানি উঠানো ওয়াজিব এবং ষাট বালতি পানি উঠানো মোস্তাহাব। কেউ কেউ ষাট বালতির স্থলে পঞ্চাশ বালতি মোস্তাহাব বলেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসকে– اِنَّهُ قَالَ فِى الدَّجَاجَةِ اِذَا مَاتَتْ فِى الْبِئْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ دَلْوًا "তিনি বলেছেন, মুরগি কূপে পড়ে মারা গেলে সেখান থেকে চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে।" –[হিদায়া– ১ : ৪৩]

قَوْلُهُ وَفِيْ نَحْوِ فَارَةٍ أَوْ عُصْفُوْرَةٍ : যদি ইঁদুর, চড়ুই পাখি কিংবা এ পরিমাণ ছোট প্রাণী কূপে পড়ে মারা যায়, তবে বিশ থেকে ত্রিশ বালতি পানি বের করে ফেলতে হবে। এখানেও বিশ বালতি বের করা আবশ্যক এবং ত্রিশ বালতি বের করা মোস্তাহাব।

قَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَرُ الدَّلْوُ الْوَسَطُ الخ : অর্থাৎ কূপ থেকে পানি উঠানোর ক্ষেত্রে বালতি বড় ছোট হয়ে থাকে। তাই প্রশ্ন হতে পারে যে, বালতি কত বড় হতে হবে? তাই গ্রন্থকার বললেন, বালতি না বড় হবে না ছোট; বরং তা হবে মধ্যম পর্যায়ের। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যে কূপে যে বালতি রয়েছে সে বালতিই ধর্তব্য হবে। চাই তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক। কিন্তু যদি কোনো কূপে নির্দিষ্ট বালতি না থাকে; বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বালতি দ্বারা পানি উঠানো হয় তবে তখন মধ্যম পর্যায়ের বালতি ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ وَمَا جَاوَزَهُ اُحْتُسِبَ بِهٖ : অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের বালতির স্থলে যদি একটি বড় বালতি হয় যা দ্বারা এক বালতি উঠালে মধ্যম পর্যায়ের তিন বালতির সমপরিমাণ হয়, তবে সে হিসেবেই উঠানো হবে। অর্থাৎ যেখানে মধ্যম পর্যায়ের বালতি দ্বারা ষাট বালতি উঠানো হয় সেখানে এর তিনগুণ বড় বালতি দ্বারা বিশ বালতি উঠানো হবে, তবেই কূপ পাক হয়ে যাবে।

وَيَتَنَجَّسُ الْبِئْرُ مِنْ وَقْتِ الْوُقُوْعِ الخ : এখান থেকে বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বর্ণনা করেছেন যে, কূপ কখন নাপাক হবে? তিনি বলেন, নাপাকী পতিত হওয়ার সময় থেকেই কূপ নাপাক হয়ে যাবে। এখন যদি কেউ উক্ত কূপ থেকে অজু অথবা গোসল করে এবং জানা যায় যে, এ কূপ ঐ সময় থেকে নাপাক, তবে তখন থেকে উক্ত কূপের পানি দ্বারা অজু করে যে সমস্ত নামাজ আদায় করা হয়েছে সেগুলো দোহরাতে হবে এবং যে সমস্ত কাপড় ঐ সময়ে এর পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে সেগুলোও পুনরায় ধৌত করতে হবে। আর যদি নিশ্চিতভাবে জানা না যায় যে, কখন থেকে নাপাকী পতিত হয়েছে তবে দেখতে হবে যে, উক্ত প্রাণী ফুলে গেছে কিনা? যদি ফুলে গিয়ে থাকে তবে তিনদিন এবং তিনরাত পূর্ব থেকে কূপকে নাপাক ধরা হবে। আর যদি না ফুলে তবে একদিন ও একরাত পূর্ব থেকে উক্ত কূপকে নাপাক ধরা হবে এবং সে মোতাবেক নামাজকে দোহরাতে হবে এবং কাপড় পুনরায় ধুতে হবে। কিন্তু সাহেবাইন (র.) বলেন, যখন কূপে নাপাকী পতিত হওয়ার বিষয়টি জানা যাবে তখন থেকে কূপকে নাপাক ধরা হবে। কুদূরীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ জওহারের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, সাহেবাইনের মতের উপরই ফতোয়া।

قَوْلُهُ سُؤْرُ الْاٰدَمِيِّ وَالْفَرَسِ وَكُلِّ الخ : কূপের আহকামের সঙ্গে বিকায়া গ্রন্থকার (র.) স্বল্প পানির আহকাম বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো পাত্র থেকে পানি পান করে তবে অবশিষ্ট পানি পাক। এ বর্ণনার ক্ষেত্রে মানুষের সম্মানার্থে মানুষের ঝুটার বিবরণ আগে আনা হয়েছে। আর مُطْلَقْ মানুষ বলার কারণে এতে পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা, বৃদ্ধ, জুনুবী,

তাহির-পবিত্র, হায়েজ-নিফাসবিশিষ্টা, মুসলিম, কাফের, মুশরিক সকলেই শামিল। অর্থাৎ তাদের ঝুটা পাক। হ্যাঁ যদি তাদের কারো মুখে নাপাকী থাকে তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে। যেমন– যদি কেউ মদ পান করে সাথে সাথে পানি পান করে তবে অবশিষ্ট পানি নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি সে এক ঘণ্টা পর তিনবার থুথু ফেলে পানি পান করে তবে তার অবশিষ্টাংশ পাক থাকবে। অনুরূপ জাহিরী বর্ণনা অনুযায়ী ঘোড়ার ঝুটাও পাক। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ঘোড়ার ঝুটার ব্যাপারে চারটি বর্ণনা রয়েছে– ১. উত্তম হলো, ঘোড়ার পানকৃত পানির অবশিষ্টাংশ পান না করা। ২. তা ঘোড়ার গোশতের ন্যায় মাকরূহ। ৩. গাধার ঝুটার ন্যায় মাশকূক বা সন্দেহযুক্ত। ৪. ঘোড়ার ঝুটা পাক এবং সাহেবাইন (র.)-এর মাযহাব এটিই। এটিই বিশুদ্ধ মাযহাব। যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেসব প্রাণীর ঝুটাও পাক। উল্লিখিত প্রাণীসমূহের ঝুটা পাক হওয়ার দলিল হলো, পানি মুখের লালার সঙ্গে মিলিত হয়ে উচ্ছিষ্ট হয়। আর এগুলোর লালা পাক হওয়ার উপর ইজমা রয়েছে। তাই এগুলোর ঝুটাও পাক।

❖ **سُؤْر চার প্রকার :** বিকায়া গ্রন্থকারের ইবারত থেকে আমরা سُؤْر বা উচ্ছিষ্টের চারটি প্রকার পাই– ১. তাহির বা পাক। যেমন– মানুষ, ঘোড়া ও হালাল প্রাণীর ঝুটা। ২. নাপাক। যেমন– শূকর ও হিংস্র প্রাণীর ঝুটা। ৩. মাকরূহ। যেমন– বিড়াল, বন্য মুরগি ইত্যাদির ঝুটা। ৪. মাশকূক বা সন্দেহযুক্ত। যেমন– গাধা ও খচ্চরের ঝুটা। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের বিবরণ ইতঃপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারের ঝুটা হলো নাপাক। যেমন– কুকুর শূকর ও হিংস্র প্রাণীর ঝুটা। এগুলোর ঝুটা নাপাক হওয়ার কারণ হলো, পানি লালার সঙ্গে মিলিত হয়ে ঝুটা হয়। আর এ প্রকারের প্রাণীর লালা সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক, তাই এর ঝুটাও নাপাক। তৃতীয় প্রকারের ঝুটা হলো মাকরূহ। যেমন– বিড়াল, বন্য-মুরগি, হিংস্র পাখি ও ঘরে অবস্থানকারী প্রাণীর ঝুটা মাকরূহ। হ্যাঁ, কোনো মুরগি যদি নির্দিষ্ট কোনো স্থানে বন্দি থাকে তবে এর ঝুটা পাক।

আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, যখন এ প্রকারের ঝুটার পানি ছাড়া অন্য পানি না পাওয়া যাবে তখন তা মাকরূহ নয়। আর যদি অন্য পানি পাওয়া যায় তবে তা মাকরূহ। বিড়ালের গোশত যেহেতু হারাম তাই নিয়মানুযায়ী এর লালাও হারাম এবং নাপাক হওয়ার কথা। কিন্তু হাদীসে বর্ণিত আছে যে, إِنَّمَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ "বিড়াল তোমাদের আশেপাশে বিচরণকারী ও বিবরণকারিণী।" –[আবূ দাঊদ শরীফ– ১ : ৭৫, তিরমিযী– ১ : ৯২]

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিড়ালের ঝুটা থেকে বাঁচা অসম্ভব। কেননা, তা মানুষের আশেপাশেই বসবাস করে থাকে। তাই ঘরে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণী নাপাক হওয়ার ইল্লাত [কারণ] রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু মাকরূহ হওয়া রহিত হয়নি। কেননা, তা নাপাকী থেকে বেঁচে থাকে না এবং এর লালা নাপাকীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। তবে বিড়ালের ঝুটা মাকরূহে তানযীহী এবং এরই উপর ফতোয়া। যদিও মাকরূহে তানযীহের একটি বর্ণনাও রয়েছে।

চতুর্থ প্রকারের ঝুটা হলো, মাশকূক [সন্দেহযুক্ত]। যেমন– গাধা ও খচ্চরের ঝুটা। এখানে গাধা বলতে গৃহপালিত গাধা উদ্দেশ্য। অন্যথায় বন্য-গাধার ঝুটা পাক। খচ্চর বলা হয়, ঘোড়া ও গাধার মিলনে যে প্রাণী সৃষ্টি হয় সেটাকে। খচ্চরের নিজস্ব কোনো বংশ নেই। এক অভিমত অনুযায়ী গাধার ঝুটা পানি পাক হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে। অপর অভিমত অনুযায়ী গাধার ঝুটা পানি পবিত্রকারী হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে। এ শেষ অভিমতটি সহীহ। আর যেহেতু এর ঝুটা পানি পবিত্রকারী হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে তাই এর ঝুটা পানি দ্বারা অজু করবে এবং তায়াম্মুমও করবে। পক্ষান্তরে মাকরূহ পানি থাকাবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ নয়; বরং এর দ্বারা অজু করবে। কেননা, মাকরূহ পানি অন্য পানি না থাকাবস্থায় মাকরূহ নয়। কিন্তু অন্য পানি না থাকাবস্থায় মাশকূক পানি দ্বারা অজু করার অতঃপর তায়াম্মুম করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর যদি অন্য পানি থাকে তবে মাশকূক পানি দ্বারা অজু করবে না।

قَوْلُهُ وَالْعَرَقُ مُعْتَبَرٌ بِالسُّؤْرِ : অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীর ঘামের হুকুম তার ঝুটার হুকুমের ন্যায়। উদ্দেশ্য হলো, যে প্রাণীর ঝুটা পাক সে প্রাণীর ঘামও পাক, যে প্রাণীর ঝুটা মাকরূহ সে প্রাণীর ঘামও মাকরূহ। অনুরূপ অন্যান্য সকল প্রাণীর ঘামের হুকুম। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, মদ পান করা যার অভ্যাস তার ঘাম নাপাক। কিন্তু দুররুল মুখতার গ্রন্থকার লেখেন, এটি একটি ভ্রান্ত অভিমত। এর উপর ফতোয়া নয়।

ঘামের হুকুম ঝুটার হুকুমের ন্যায় এ কারণে যে, ঝুটা লালা মিশ্রিত হয়ে থাকে আর লালা এবং ঘামের হুকুম এক। কেননা, লালা এবং ঘাম উভয়টিই গোশত থেকে সৃষ্টি হয়।

فَإِنْ قِيلَ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ سُؤْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَرْقٌ لِأَنَّهُ إِنِ اعْتُبِرَ اللَّحْمُ فَلَحْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَاهِرٌ أَلَا تَرَى أَنَّ غَيْرَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ نَجِسَ الْعَيْنِ إِذَا ذُكِّيَ يَكُونُ لَحْمُهُ طَاهِرًا وَإِنِ اعْتُبِرَ أَنَّ لَحْمَهُ مَخْلُوطٌ بِالدَّمِ فَمَأْكُولُ اللَّحْمِ وَغَيْرُهُ فِي ذٰلِكَ سَوَاءٌ قُلْنَا الْحُرْمَةُ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْكَرَامَةِ فَإِنَّهَا آيَةُ النَّجَاسَةِ لٰكِنَّ فِيهِ شُبْهَةً أَنَّ النَّجَاسَةَ لِاخْتِلَاطِ الدَّمِ بِاللَّحْمِ إِذْ لَوْلَا ذٰلِكَ بَلْ يَكُونُ نَجَاسَتُهُ لِذَاتِهِ لَكَانَ نَجِسَ الْعَيْنِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ فَغَيْرُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ إِذَا كَانَ حَيًّا فَلُعَابُهُ مُتَوَلِّدٌ مِنَ اللَّحْمِ الْحَرَامِ الْمَخْلُوطِ بِالدَّمِ فَيَكُونُ نَجِسًا لِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ وَهُمَا الْحُرْمَةُ وَالْاِخْتِلَاطُ بِالدَّمِ أَمَّا فِي مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْاِخْتِلَاطُ بِالدَّمِ فَلَمْ يُوجِبْ نَجَاسَةَ السُّؤْرِ لِأَنَّ هٰذِهِ الْعِلَّةَ بِانْفِرَادِهَا ضَعِيفَةٌ إِذِ الدَّمُ الْمُسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعِهِ لَمْ يُعْطَ لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ فِي الْحَيِّ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَيًّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُذَكًّى كَانَ نَجِسًا سَوَاءٌ كَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ صَارَ بِالْمَوْتِ حَرَامًا فَالْحُرْمَةُ مَوْجُودَةٌ مَعَ اخْتِلَاطِ الدَّمِ فَيَكُونُ نَجِسًا وَإِنْ كَانَ مُذَكًّى كَانَ طَاهِرًا أَمَّا فِي مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْحُرْمَةُ وَلَا اخْتِلَاطُ الدَّمِ وَأَمَّا فِي غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَجِدِ الْاِخْتِلَاطَ وَالْحُرْمَةَ الْمُجَرَّدَةَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي النَّجَاسَةِ عَلٰى مَا مَرَّ أَنَّهَا تَثْبُتُ بِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ فَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (رح) بِالْوُضُوءِ بِهِ فَقَطْ وَأَبُو يُوسُفَ (رح) بِالتَّيَمُّمِ فَحَسْبُ وَ مُحَمَّدٌ (رح) بِهِمَا وَالْخِلَافُ فِي نَبِيذٍ هُوَ حُلْوٌ رَقِيقٌ يَسِيلُ كَالْمَاءِ أَمَّا إِذَا اشْتَدَّ وَصَارَ مُسْكِرًا لَا يَتَوَضَّأُ بِهِ إِجْمَاعًا .

অনুবাদ : সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয় যে, হালাল প্রাণী ও হারাম প্রাণীর ঝুটার মাঝে কোনো পার্থক্য না হওয়া আবশ্যক ছিল। কেননা, যদি গোশতের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে এ উভয় প্রকারের প্রাণীর গোশতই হালাল। আপনি কি দেখেন না যে, হারাম প্রাণী যখন نَجِسُ الْعَيْنِ [প্রকৃত নাপাক] না হয় তখনো যদি তা জবাই করা হয়, তবে এর গোশত পাক হয়ে যায়। আর যদি রক্তের সঙ্গে গোশতের মিশ্রণের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে হালাল প্রাণী ও হারাম প্রাণী বরাবর। [উত্তরে] আমরা বলব, [কোনো প্রাণীর] সম্মানার্থে যখন তাকে হারাম করা হয় না, তখন তা

নাপাক হওয়ার নিদর্শন। তবে এতে সন্দেহ রয়েছে যে, গোশতের সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত হওয়ার কারণে তা নাপাক হয়েছে। কেননা, যদি এমনটি না হয়; বরং তা সত্তাগতভাবেই নাপাক হয়, তবে তো তা نَجَسُ الْعَيْنِ [প্রকৃত নাপাক] হয়ে যায়। অথচ বিষয়টি এমন নয়। অতএব, হারাম প্রাণী যদি জীবিত হয়, তবে এর লালা রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হারাম গোশত থেকে সৃষ্টি হয়। ফলত তা দুটি বিষয় তথা হারাম এবং রক্তের মিশ্রণ একত্রিত হওয়ার কারণে নাপাক হবে। কিন্তু হালাল প্রাণীর ক্ষেত্রে মাত্র একটি [কারণ] পাওয়া যায়, তা হলো– রক্তের সঙ্গে [গোশতের] মিশ্রণ। সুতরাং তা ঝুটা নাপাক হওয়াকে প্রমাণিত করবে না। কেননা, [শুধু] এ একটি কারণ [রক্তের সঙ্গে গোশতের মিশ্রণ] দুর্বল। কারণ, যে রক্ত স্বস্থানে স্থির থাকে জীবদ্দশায় তা নাপাক হওয়ার হুকুম প্রদান করা হয় না।

আর যদি জীবিত না হয়ে জবাইকৃত না হয় তবে তা নাপাক হবে। চাই হালাল [প্রাণী], কিংবা হারাম [প্রাণী] হোক। কেননা, তা মৃত্যুর কারণে হারাম হয়েছে। সুতরাং এখানে রক্তের মিশ্রণের সঙ্গে হারামও বিদ্যমান। তাই তা নাপাক। [পক্ষান্তরে] যদি তা জবাইকৃত হয় তবে তা পাক। হালাল প্রাণী এজন্য [পাক] যে, এখানে না হারাম বিদ্যমান, না রক্তের সঙ্গে [গোশতের] মিশ্রণ [বিদ্যমান]। হারাম প্রাণী এজন্য পাক যে, এখানে রক্তের সঙ্গে [গোশতের] মিশ্রণ বিদ্যমান নেই। আর শুধু হারাম হওয়া নাপাক হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। ইতঃপূর্বে যেমন বিবরণ গত হয়েছে যে, নাপাক হওয়া প্রমাণিত হয় দুটি কারণ জমা হওয়ার কারণে। যদি খুরমা ভিজানো পানি ব্যতীত অন্য কোনো পানি না থাকে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এর দ্বারা শুধু অজু করবে [অর্থাৎ তায়াম্মুম করবে না]। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, শুধু তায়াম্মুম করবে [অর্থাৎ অজু করবে না]। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, [অজু ও তায়াম্মুম] উভয়টিই করবে। খুরমা ভিজানো ঐ পানি সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে, যা মিষ্টি, তরল এবং পানির ন্যায় প্রবাহিত হয়। আর যখন তা গাঢ় হবে এবং নেশাযুক্ত হয়ে যাবে তখন সর্বসম্মতিক্রমে তা দ্বারা অজু করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنْ قِيْلَ يَجِبُ الخ : এখানে শারেহ (র.) পূর্বের আলোচনার উপর একটি মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। মন্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, লালা এবং ঘামের হুকুম এক। সে মোতাবেক হালাল প্রাণী ও হারাম প্রাণীর ঝুটার মধ্যে কোনো পার্থক্য না হওয়া দরকার ছিল। কেননা, লালা গোশত থেকে সৃষ্টি হয় এবং ঐ দুই প্রকারের প্রাণীর গোশতই পাক। কারণ, হারাম প্রাণী যদি نَجَسُ الْعَيْنِ [প্রকৃত নাপাক] না হয় তবে তা জবাই করার দ্বারা এর গোশত পাক হয়ে যায়। যদিও তা খাওয়া যায় না। কেননা, সমস্ত পাক জিনিস খাওয়া জরুরি নয়; বরং পাক এদিক থেকে যে যদি তা শরীর অথবা কাপড়ে লাগে তবে তা ধোয়া আবশ্যক নয়। আর যদি সেখানে রক্তের সঙ্গে গোশতের মিশ্রণ লক্ষ্য করা হয় তবে তা উভয় প্রকারের প্রাণীর ক্ষেত্রে বরাবর। হারাম প্রাণীর মধ্যে যেরূপ রক্তের সঙ্গে গোশতের মিশ্রণ রয়েছে, সেরূপ রয়েছে হারাম প্রাণীর মধ্যেও। তাই উভয় প্রকার প্রাণীর ঝুটার হুকুম বরাবর হওয়া দরকার। এর উত্তর শারেহ (র.) অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইবারতের মধ্যেই উল্লেখ করেছেন, তাই এখানে তা পুনরায় উল্লেখ করতে চাচ্ছি না।

قَوْلُهُ اِذَا ذُكِّيَ يَكُوْنُ لَحْمُهُ طَاهِرًا : অর্থাৎ যেসব হারাম প্রাণী نَجَسُ الْعَيْنِ [প্রকৃত নাপাক] নয় সেসব প্রাণীকে জবাই করার দ্বারা এর গোশত পাক হয়ে যায়, তাহলে যে প্রাণীকে জবাই করা হয়েছে তা অবশ্যই জীবিত নয়। আর লালার মাসআলা অবশ্যই জীবিত প্রাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা, জবাইকৃত প্রাণী আর জীবিত থাকেনি। তাই না তা পানি পান করবে, না এর লালা পানির সঙ্গে মিশ্রিত হবে। যদি বিষয়টি এমনই হয় তবে উল্লিখিত মন্তব্য স্পষ্ট নয়।

قَوْلُهُ اَمَّا فِىْ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ الخ : অর্থাৎ যখন কোনো প্রাণীর সম্মানার্থে তাকে হারাম করা হয় না, তখন তা নাপাক হওয়ারই নিদর্শন। তবে রক্তের সঙ্গে গোশতের মিশ্রণ নাপাক (نَجَاسَةٌ) -এর কারণ হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে। তাই যদি হারাম প্রাণী জীবিত হয়, তবে তা দুটি কারণে নাপাক হয়– ১. গোশত হারাম, ২. রক্তের সঙ্গে গোশতের মিশ্রণ। অনুরূপ এর গোশতও নাপাক এবং এ গোশত থেকে সৃষ্ট লালা, লালা থেকে সৃষ্ট ঝুটা পানিও নাপাক। পক্ষান্তরে হালাল প্রাণীতে শুধু একটি কারণ তথা রক্তের সঙ্গে গোশতের মিশ্রণ পাওয়া যায়, যা একাকী نَجَاسَةٌ [নাপাক হওয়া] -এর কারণ হতে পারে না। তাই এর লালার সঙ্গে মিশ্রিত ঝুটা নাপাক নয়।

قَوْلُهُ اِذِ الدَّمُ الْمُسْتَقَرُّ فِىْ مَوْضِعِه : রক্ত চাই রগে থাকুক কিংবা অন্যস্থানে থাকুক যতক্ষণ পর্যন্ত তা স্বস্থানে থাকবে একে নাপাক বলা যাবে না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, গোশত মূলত রক্ত অবস্থানের স্থান। তবে যদি এর দ্বারা دَمٌ غَيْرُ مَسْفُوْحٌ [অপ্রবাহিত রক্ত] উদ্দেশ্য হয়, তবে তো ঠিক আছে। আর যদি এর দ্বারা دَمٌ مَسْفُوْحٌ [প্রবাহিত রক্ত] উদ্দেশ্য হয়, তবে গোশতকে প্রবাহিত রক্তের স্থল সাব্যস্ত করা বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। কেননা, প্রবাহিত রক্তের স্থল হচ্ছে রগ।

قَوْلُهُ وَاِذَا لَمْ يَكُنْ حَيًّا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ الخ : ইবারতের জাহিরী অবস্থা দেখে মনে হয় একে اِذَا كَانَ حَيًّا -এর উপর عَطْف করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় সামনের ইবারত- سَوَاءٌ كَانَ مَاكُوْلُ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرُهُ অনর্থক হয়ে যায়। তাই বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী فَغَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ اِذَا كَانَ حَيًّا -এর উপর عَطْف হয়েছে। আর لَمْ يَكُنْ -এর যমীর مُطْلَقْ حَيَوَانْ -এর দিকে ফিরেছে; শুধু غَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ প্রাণীর দিকে নয়।

قَوْلُهُ فَاِنْ عدم الْمَاءُ اِلَّا نَبِيْذُ التَّمرِ : যেহেতু গাধা ও খচ্চরের ঝুটার সাথে খেজুর ভিজানো পানির সাদৃশ্য রয়েছে যে, কেউ কেউ খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা অজু এবং তায়াম্মুম করার হুকুম দিয়েছেন। তাই বিকায়া গ্রন্থকার (র.) গাধা ও খচ্চরের ঝুটার বিবরণের পর নবীয তথা খেজুর ভিজানো পানির বিবরণ নিয়ে এসেছেন। এখানে গ্রন্থকার নবীযে তামার তথা খেজুর ভিজানো পানিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এজন্য যে, অন্যান্য নবীয তথা আঙ্গুর, গম ইত্যাদি ভিজানো পানি দ্বারা মোটেও অজু করা বৈধ নয়। আর এর উপর কিয়াস করে খেজুর ভিজানো পানি দ্বারাও অজু করা বৈধ না হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা অজু করার বৈধতা সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে, তাই এর দ্বারা অজু করা বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

নবীয (نَبِيْذ) -এর সংজ্ঞা ও প্রকার : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় نَبِيْذ -এর সংজ্ঞা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, هُوَ الْمَاءُ الَّذِيْ تُنْبَذُ فِيْهِ تَمَرَاتٌ فَتَخْرُجُ حَلَاوَتُهَا فِى الْمَاءِ নবীয বলা হয় ঐ পানিকে, যাতে কিছু খেজুর ভিজিয়ে রাখা হয় এবং খেজুরের মিষ্টতা পানিতে চলে আসে। আল্লামা তকী ওসমানী [দা. বা.] দরসে তিরমিযীর মধ্যে নবীযে তামার (نَبِيْذُ تَمَرْ) তিন প্রকার উল্লেখ করেছেন–

১. তরল নবীযে তামার যা পাকানো হয়নি, যা নেশাদার নয়, মিষ্টি নয় এবং পানির স্বাভাবিক অবস্থাও পরিবর্তন হয়নি। এর হুকুম হলো, সর্বসম্মতিক্রমে এর দ্বারা অজু করা বৈধ।

২. গাঢ় নবীযে তামার যা পাকানো হয়েছে, নেশাদার এবং যার তরলতা ও প্রবাহের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এর হুকুম হলো, সর্বসম্মতিক্রমে এর দ্বারা অজু করা অবৈধ।

৩. তরল নবীযে তামারের যা পাকানো হয়নি, নেশাদারও নয়, তবে তা মিষ্টি। এ প্রকারের হুকুম সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

নবীযে তামারের হুকুম : উল্লিখিত তিন প্রকার নবীয-এর প্রথম দুই প্রকারের হুকুমও আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখযোগ্য তৃতীয় প্রকারটির হুকুম বর্ণনা করা হবে, যা সম্পর্কে মতানৈক্যও রয়েছে। যদি খেজুর ভিজানো পানি ছাড়া অজু করার জন্য অন্য কোনো পানি না পাওয়া যায় তবে এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে চার ধরনের বর্ণনা রয়েছে– ১. জামিউস সাগীর ও যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তা দ্বারা শুধু অজু করবে, তায়াম্মুম করবে না। ২. অজু ও তায়াম্মুম উভয়টি করা মোস্তাহাব। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এরও মাযহাব। ৩. অজু এবং তায়াম্মুম উভয়টি করা ওয়াজিব। ৪. এর দ্বারা অজু করা বৈধ নয়; বরং শুধু তায়াম্মুম করবে। এটি ইমামত্রয় ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব। আল্লামা কাসায়ী (র.) বাদায়িউস সানায়ে' গ্রন্থে লেখেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর জীবনের শেষ দিকে এসে এ চতুর্থ প্রকারের বর্ণনার দিকে ফিরে এসেছেন। তাই نَبِيْذُ تَمَرْ দ্বারা অজু করা বৈধ না হওয়ার মধ্যে চার ইমামই একমত।

হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও ফতোয়ার কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর "নবীজে তামার দ্বারা অজু করা বৈধ" বর্ণনার পক্ষে "লাইলাতুল জিন" -এর হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর কাছে অজুর পানি চান। তিনি বলেন, পানি নেই, তবে শুধু নবীযে তামার আছে। নবী ﷺ বললেন– تَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ وَاَخَذَهُ وَتَوَضَّأَ بِهِ وَصَلَّى الْفَجْرَ "খেজুর পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। অতঃপর তা দ্বারা তিনি অজু করলেন এবং ফজরের নামাজ আদায় করলেন।" –[আবূ দাউদ –১ : ৮৪, তিরমিযী– ১ : ৮৮, ইবনে মাজাহ– ১ : ৩৮৪]

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি নবীযে তামার ছাড়া অন্য কোনো পানি না থাকে তবে তা দ্বারা অজু করবে এবং তায়াম্মুম করার কোনো প্রয়োজন নেই।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, "লাইলাতুল জিন"-এর হাদীস কয়েকভাবে বর্ণিত আছে। এক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) "লাইলাতুল জিন"-এ রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। অন্য বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন না। তাছাড়া সঠিকভাবে জানা যায় না যে, "লাইলাতুল জিন" -এর ঘটনা কখন ঘটেছে। সুতরাং সতর্কতার চাহিদা হলো উভয়টির উপর আমল করা অর্থাৎ নবীযে তামার দ্বারা অজুও করবে পরে তায়াম্মুমও করবে, যা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বর্ণনাও বটে।

ইমামত্রয় ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সর্বশেষ বর্ণনার দলিল হলো তায়াম্মুমের আয়াত। আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا "যদি তোমরা পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।" এ আয়াতে مَاءٌ مُطْلَقٌ না থাকাবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের নিসবত মাটির দিকে করা হয়েছে। আর নবীযে তামার مَاءٌ مُطْلَقٌ নয়। অতএব, আয়াত দ্বারা "লাইলাতুল জিন"-এর হাদীস রহিত হয়ে যায়। তাছাড়া "লাইলাতুল জিন"-এর ঘটনা মক্কায় ঘটেছে, আর তায়াম্মুমের আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, পরের হুকুম পূর্বের হুকুমের জন্য নাসিখ বা রহিতকারী।

যেহেতু জমহুরের মাযহাবের প্রতি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর رجوع [প্রত্যাবর্তন] প্রমাণিত আছে তাই তাঁর নবীযে তামার দ্বারা অজু করা বৈধতার বর্ণনাকে প্রমাণিত করার জন্য জমহুরের মাযহাবকে খণ্ডন করার প্রয়োজন মনে করছি না। যদিও কোনো কোনো কিতাবে তা করা হয়েছে; বরং ইমাম তাহাবী (র.) স্বীয় গ্রন্থ তাহাবী শরীফে জমহুরের মাযহাবকেই প্রধান্য দিয়েছেন এবং প্রমাণিতও করেছেন।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর– ১ : ১২১–১২৪, বাদায়িউস সানায়ে'– ১ : ১৯২–১৯৩, বাহরুর রায়িক– ১ : ২৩৮–২৪১, মা'আরিফুস সুনান– ১ : ৩০৯–৩১৫, দরসে তিরমিযী– ১ : ৩২০–৩২১]

بَابُ التَّيَمُّمِ

هُوَ لِمُحْدِثٍ وَجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الْمَاءِ اَىْ عَلٰى مَاءٍ يَكْفِىْ لِطَهَارَتِهِ حَتّٰى اِذَا كَانَ لِلْجُنُبِ مَاءٌ يَكْفِىْ لِلْوُضُوْءِ لَا لِلْغُسْلِ يَتَيَمَّمُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَضِّىْ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) اَمَّا اِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَابَةِ حَدَثٌ يُوْجِبُ الْوُضُوْءَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ فَالتَّيَمُّمُ لِلْجَنَابَةِ بِالْاِتِّفَاقِ وَاَمَّا اِذَا كَانَ لِلْمُحْدِثِ مَاءٌ يَكْفِىْ لِغُسْلِ بَعْضِ اَعْضَائِهِ فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ اَيْضًا لِبُعْدِهِ مِيْلًا اَلْمِيْلُ ثُلُثُ الْفَرْسَخِ وَقِيْلَ ثَلٰثَةُ الْاٰفِ ذِرَاعٍ وَخَمْسُمِائَةٍ اِلٰى اَرْبَعَةِ الْاٰفٍ وَمَا ذُكِرَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَفِىْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ اَلْمِيْلُ اِنَّمَا يَكُوْنُ مُعْتَدًّا اِذَا كَانَ فِىْ طَرَفٍ غَيْرَ قُدَّامِهِ حَتّٰى يَصِيْرَ مِيْلَيْنِ ذَهَابًا وَمَجِيْئًا فَاَمَّا اِذَا كَانَ فِىْ قُدَّامِهِ فَيُعْتَبَرُ اَنْ يَكُوْنَ مِيْلَيْنِ -

পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুমের বিবরণ

অনুবাদ : মুহদিস [অজুহীন], জুনুবী ব্যক্তি, হায়েজ ও নিফাসবগ্রস্ত মহিলার তায়াম্মুম করা বৈধ, যখন তারা পানির উপর সক্ষম না হয়। অর্থাৎ যদি এ পরিমাণ পানি পাওয়া না যায়, যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যথেষ্ট হয়। এমনকি যদি জুনূবীর কাছে এ পরিমাণ পানি থাকে যা দ্বারা অজু যথেষ্ট হয় গোসল নয়, তবে সে তায়াম্মুম করবে এবং আমাদের মতে, তার উপর অজু করা আবশ্যক নয়। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু যদি জানাবাতের তায়াম্মুম করার পর এমন হদস [অজু ভঙ্গের কারণ] দেখা দেয়, যা অজুকে আবশ্যক করে তবে তার উপর অজু করা আবশ্যক। সর্বসম্মতিক্রমে জানাবাতের জন্য তায়াম্মুম রয়েছে। যখন মুহদিস [অজুহীন] ব্যক্তির নিকট এ পরিমাণ পানি থাকে যা [অজুর] কিছু ধোয়া যথেষ্ট হয়, তবে এতেও মতানৈক্য রয়েছে। পানি এক মাইল দূরে হওয়ার কারণে [তায়াম্মুম করবে]। এক মাইল হলো, এক ফরসাখ-এর একতৃতীয়াংশ। কেউ বলেন, সাড়ে তিন হাজার হাত থেকে নিয়ে চার হাজার হাত পর্যন্ত দূরত্ব –[হলো, এক মাইল]। [মতন -এ] যে মাইল উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো জাহিরী রেওয়ায়েত। ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর বর্ণনায় এক মাইল তখনই গ্রহণযোগ্য যখন পানি তার সামনের দিক ব্যতীত [ডান, বাম কিংবা পিছনের] দিকে হবে। যাতে করে আসা-যাওয়ায় [এক মাইলে] দুই মাইল হয়। কিন্তু যখন পানি তার সামনের দিকে হয়, তখন দুই মাইল গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ التَّيَمُّمِ :

অজু গোসলের বিবরণের পর تَيَمُّمٌ -এর বিবরণ আনার কারণ : অজু-গোসলের বিবরণের পর তায়াম্মুমের বিবরণ আনার কারণ দুটি– ১. পানি দ্বারা তাহারাত হাসিল করা হচ্ছে আসল (اَصْل), আর মাটি দ্বারা তাহারাত হাসিল করা হলো খলিফা বা শাখা। আর নিয়ম আছে যে, শাখা আসলের পরে আসে। তাই এখানে তায়াম্মুমের বিবরণকে পরে আনা হয়েছে। ২. কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা পানি দ্বারা তাহারাত অর্জনের বিবরণ দেওয়ার পর মাটি দ্বারা তাহারাত অর্জনের বিবরণ দিয়েছেন। তাই কুরআনের অনুসরণে গ্রন্থকার তায়াম্মুমের বিবরণকে পরে নিয়ে এসেছেন।

❖ **تَيَمُّمْ -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ :** تَيَمُّمْ -এর আভিধানিক অর্থ হলো– ইচ্ছা করা। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে তায়াম্মুমের পারিভাষিক সংজ্ঞা এভাবে লিখেছেন– هُوَ الْقَصْدُ اِلَى الصَّعِيْدِ الطَّاهِرِ لِلتَّطْهِيْرِ

অর্থাৎ "পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটির ইচ্ছা করা [ব্যবহার করা]।" –[ফাতহুল কাদীর– ১ : ১২৫]

আল্লামা কাসায়ী (র.) বাদায়িউস সানায়ে' গ্রন্থে تَيَمُّمْ -এর পারিভাষিক অর্থ এভাবে লিখেছেন–

عِبَارَةٌ عَنْ اِسْتِعْمَالِ الصَّعِيْدِ فِىْ عُضْوَيْنِ مَخْصُوْصَيْنِ عَلٰى قَصْدِ التَّطْهِيْرِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ ـ

অর্থাৎ "বিশেষ কিছু শর্তসাপেক্ষে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দুটি অঙ্গে মাটি ব্যবহার করাকে তায়াম্মুম বলা হয়।" –[বাদায়িউস সানায়ে– ১ : ১৬৫]

❖ **تَيَمُّمْ -এর শরয়ী অনুমোদন :** কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা তায়াম্মুম -এর অনুমোদন পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا অর্থাৎ "যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।" –[সূরা নিসা– ৪৩] উক্ত আয়াত দ্বারা তায়াম্মুম-এর সুস্পষ্ট অনুমোদন প্রমাণিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُوْرًا اَيْنَمَا اَدْرَكَتْنِى الصَّلَاةُ تَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ অর্থাৎ "ভূমিকে আমার জন্য মসজিদ এবং পবিত্র বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানেই নামাজের সময় হয় তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করে নেই।" অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلٰى عَشْرِ حِجَجٍ مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ـ

অর্থাৎ "পবিত্র মাটি মুসলমানকে পবিত্রকারী বস্তু। যদিও দশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় আর পানি না পাওয়া যায়।" –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী]

উক্ত হাদীসদ্বয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তায়াম্মুম শরিয়ত অনুমোদিত এবং তায়াম্মুম-এর অনুমোদনের উপর উম্মতের ইজমা ও রয়েছে। যেমনটি উল্লেখ রয়েছে বাদায়িউস সানায়ে' ও মা'আরিফুস সুনান গ্রন্থে।

❖ **কোথায় কিভাবে تَيَمُّمْ -এর বিধান অবতীর্ণ হলো :** تَيَمُّمْ -এর বিধান অবতীর্ণ হয়েছে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর হার হারানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তবে উক্ত ঘটনাস্থল ও সময়ের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। সময়ের ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়– ১. এ ঘটনা ঘটেছে চতুর্থ হিজরি সনে, ২. পঞ্চম হিজরি সনে, ৩. ষষ্ঠ হিজরি সনে, ঘটনাস্থলের ব্যাপারেও দুটি মত পাওয়া যায়– ১. গযওয়ায়ে বনী মুসতালিক, ২. গযওয়ায়ে যাতুর রিকা।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর হার হারানোর ঘটনাটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। এখানে একটি হাদীস আমরা অর্থসহ উপস্থাপন করছি।

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ اِنْقَطَعَ عِقْدٌ لِىْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهٖ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهٗ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَاَتَى النَّاسُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ فَقَالُوْا اَلَا تَرٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ اَبُوْبَكْرٍ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَاْسَهٗ عَلٰى فَخِذِىْ قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِىْ اَبُوْبَكْرٍ وَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِىْ بِيَدِهٖ فِىْ خَاصِرَتِىْ وَلَا يَمْنَعُنِىْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلَّا مَكَانَ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلٰى فَخِذِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ عَلٰى مَاءٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِىَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَااٰلَ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِىْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَاِذَا الْعِقْدُ تَحْتَهٗ ـ

অর্থাৎ "উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সফরে ছিলাম। যখন আমরা বায়দা বা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমার হার হারিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ স্থানেই থেমে গেলেন এবং হার তালাশ করতে লাগলেন। সাহাবীরাও তাঁর সাথে থেমে গেল। সে স্থানে পানি ছিল না এবং কারো নিকটও পানি ছিল না। কিছু লোক হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট অভিযোগ করলেন যে, কি কাজ করল হযরত আয়েশা! তার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং লোকজন [এমন স্থানে] অবস্থান করলেন যেখানে কোনো পানি নেই এবং তাদের কারো কাছেও কোনো পানি নেই।

হযরত আবূ বকর (রা.) আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার রানের উপর মাথা দিয়ে শায়িত ছিলেন। আর বললেন, [হে আয়েশা!] তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকদেরকে এমন এ স্থানে আটকে রেখেছ, যেখানে না আছে কোনো পানি আর না আছে তাদের কারো কাছে কোনো পানি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) আমাকে খুব শাসালেন এবং আল্লাহ যা চাইলেন তা আমাকে বললেন। তাঁর হস্ত দ্বারা আমার কোমর বারবার আঘাত করতে লাগলেন, আমি নড়াচড়া না করে চুপ থাকলাম এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথা আমার রানের উপর ছিল। সর্বশেষ রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল বেলায় ঘুম থেকে জাগলেন, তখনোও পানি ছিল না। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুম -এর আয়াত অবতীর্ণ করলেন। হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা.) বললেন, হে আবূ বকরের (রা.) পরিবার! এটি আপনাদের প্রথম বরকতের বিষয় নয়; বরং এর আগেও আপনাদের মাধ্যমে আমরা বরকতপ্রাপ্ত হয়েছি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, অতঃপর যখন আমরা আমাদের উটটিকে দাঁড় করালাম তখনোই তার তলদেশে হারটি পাওয়া গেল। –[বুখারী– ২য়]

قَوْلُهُ هُوَ لِمُحْدِثٍ الخ :

[যেসব কারণে تَيَمُّمْ করা যায়] : যেসব কারণে তায়াম্মুম করা যায় বিকায় গ্রন্থকারের ধারা মোতাবেক আমরা তা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরছি–

১. পানি যদি এক মাইল দূরে হয়। এতে মতানৈক্য রয়েছে যা অচিরেই আসবে।
২. অসুস্থ, যে পানি ব্যবহার করতে অক্ষম কিংবা পানি ব্যবহার করলে অসুস্থতা বেড়ে যাবে।
৩. প্রচণ্ড ঠাণ্ডা যে, যদি পানি ব্যবহার করা হয় তবে তার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে।
৪. দুশমনের ভয়। তথা পানির স্থানে দুশমন রয়েছে যে, যদি পানি আনতে যায় তবে তার উপর আক্রমণ করবে।
৫. যদি পানি দ্বারা অজু করে ফেলে তবে তার পান করার পানি থাকে না। পরে হয়তো সে পিপাসায় কষ্ট পাবে।
৬. কূপে পানি আছে কিন্তু পানি উঠানোর জন্য কোনো বালতি বা কোনো মাধ্যম নেই।
৭. যদি ঈদের নামাজ ছুটে যাওয়ার ভয় থাকে তথা যদি সে অজু করতে যায় তবে এদিকে ঈদের নামাজ শেষ হয়ে যাবে, তবে সে তাড়াতাড়ি তায়াম্মুম করে নামাজে শরিক হয়ে যাবে।
৮. অজুকারী ব্যক্তির নামাজের মধ্যে অজু ভেঙ্গে গেছে, এখন যদি সে অজু করতে যায় তবে নামাজের জামাত শেষ হয়ে যাবে, তবে সে তায়াম্মুম করে নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে। এতে মতানৈক্য রয়েছে, অচিরেই আমরা তা উল্লেখ করব।
৯. মৃত ব্যক্তির অভিভাবক ছাড়া অন্য কারো যদি জানাজা নামাজ ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে তায়াম্মুম করে জানাজার নামাজে শরিক হয়ে যাবে। উল্লিখিত প্রত্যেক কারণের বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।
কোন জিনিস দ্বারা তায়াম্মুম করবে, তায়াম্মুম -এর পদ্ধতি ও তায়াম্মুম সম্পর্কে অন্যান্য সকল আলোচনা সামনে নিজ নিজ স্থানে আসবে ইনশাআল্লাহ।

قَوْلُهُ وَجُنُبٌ وَحَائِضٌ الخ : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) জুনূবী, হায়েজ ও নিফাসবিশিষ্টা মহিলার কথা পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন, অথচ هُوَ لِمُحْدِثٍ শব্দ উল্লেখ করার পর এ সকল লোক এতে শামিল হয়ে গেছে। কেননা, 'হদস' (حَدَثٌ) বড় হোক চাই ছোট হোক এতে সবই শামিল। এর কারণ হলো, কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) শুধু হদসে আসগার (حَدَثٌ أَصْغَرُ) -এর জন্য তায়াম্মুমকে জায়েজ এবং জুনূবী ও অন্যান্যদের জন্য নাজায়েজ বলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এ সমস্ত লোকের জন্য তায়াম্মুম-এর বৈধতার উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে। যেমনটি উল্লেখ রয়েছে বাদায়িউস সানায়ে' গ্রন্থে। অসংখ্য হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তাদের সকলের জন্যই তায়াম্মুম বৈধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– لِلْجُنُبِ مِنَ الْجِمَاعِ اَنْ يَتَيَمَّمَ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ অর্থাৎ "সহবাসের কারণে জুনূবী ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ যদি পানি না পায়।" –[বুখারী ও মুসলিম]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে–

اِنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا قَوْمٌ نَسْكُنُ الرِّمَالَ وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا اَوْ شَهْرَيْنِ وَفِيْنَا الْجُنُبُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْاَرْضِ .

অর্থাৎ "এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট আসল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এমন এক সম্প্রদায় যে, আমরা বালুকাময় এলাকায় বসবাস করি। এক মাস দুই মাস পর্যন্ত আমরা পানি পাই না। অথচ আমাদের মাঝে জুনূবী লোক এবং হায়েজ ও নিফাসবিশিষ্টা মহিলারা রয়েছে। অতএব, আমরা কি করব? তিনি বললেন, তোমরা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।" –[মুসনাদে আহমাদ– ২ : ২৭২, বায়াহাকী– ১ : ২১৬]

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জুনূবী ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম বৈধ এবং হায়েজ ও নিফাসবিশিষ্টাদের জন্যও তায়াম্মুম বৈধ প্রমাণিত হয়। কেননা, দ্বিতীয় হাদীসে নবী ﷺ স্পষ্টভাবে হায়েজ ও নিফাসবিশিষ্টা মহিলাদেরও তায়াম্মুম করতে বলেছেন। তাছাড়া হায়েজ ও নিফাস জানাবাতের স্থলাভিষিক্ত।

قَوْلُهُ لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الْمَاءِ الخ : অর্থাৎ পানি ব্যবহারের উপর সক্ষম না হওয়া। এর অনেক পদ্ধতি হতে পারে। যেমন, কোনো ব্যক্তি অসুস্থ এবং তার কাছে পানি আছে, কিন্তু ব্যবহার করতে পারছে না, তবে সে তায়াম্মুম করবে। কিংবা তার নিকটে কূপ রয়েছে; কিন্তু কূপ থেকে পানি উঠানোর মতো কোনো বালতি নেই তবে সে তায়ুম্মাম করবে। অথবা এক মাইলের ভিতরে কোথাও পানি নেই, তবে সে তায়াম্মুম করবে। অথবা পানি তার নিকটবর্তী স্থানেই আছে কিন্তু দুশমনদের ভয়ে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়, কিংবা সেখানে সাপ, বিচ্ছু ও বাঘ রয়েছে, তবে সে তায়াম্মুম করবে।

قَوْلُهُ يَتَيَمَّمُ : অর্থাৎ যার উপর গোসল ওয়াজিব, কিন্তু তার কাছে অজু করার মতো সামান্য পানি রয়েছে, যা দ্বারা গোসল করা যাবে না তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা আবশ্যক। কেননা, তার কাছে যে পরিমাণ পানি রয়েছে তা দ্বারা গোসল করা অসম্ভব, তাই যেন তার কাছ পানি নাই-ই। আর যখন তার কাছে পানি নাই তখন সে তায়াম্মুম করবে। এ প্রক্রিয়ায় তার কাছে যে পানি রয়েছে তা দ্বারা অজু করা তার উপর আবশ্যক নয়। এ অভিমতটি আমাদের তথা ওলামায়ে আহনাফের নিকট। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, তার নিকট যে পরিমাণ অজুর পানি রয়েছে তা দ্বারা সে আগে অজু করবে। তারপর সে গোসলের জন্য তায়াম্মুম করবে। যেমনিভাবে নগ্ন ব্যক্তি যদি সতরের কিছু অংশ ঢাকার মতো কাপড়ও পেয়ে যায় তবে তার সতর ঢেকে নেওয়া আবশ্যক। অনুরূপ যদি কারো কাপড় অথবা শরীরে নাপাকী থাকে আর তার কাছে এ পরিমাণ পানি থাকে যে, পূর্ণ কাপড় বা পূর্ণাঙ্গ শরীর পবিত্র করা সম্ভব নয় তবে যে পরিমাণ পাক করা সম্ভব, সে পরিমাণই পাক করা আবশ্যক।

قَوْلُهُ اَمَّا اِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَابَةِ حَدَثٌ الخ : বাহ্যিকভাবে এ ইবারতে সংশয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেননা, এ ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, কখনো জানাবাতের সঙ্গে এমন হদস (حَدَثٌ)-ও হয়ে থাকে যা অজুকে আবশ্যক করে, অথচ বিষয়টি এমন নয়। কারণ, জানাবাতই হলো সবচেয়ে বড় হদস যার মধ্যে ছোট হদসও শামিল। তাই ছোট হদস আর এখানে নেই যা অজুকে আবশ্যক করে; বরং তার উপর গোসলকে আবশ্যককারী হদসই বিদ্যমান।

তাই উক্ত ইবারতের উদ্দেশ্য হলো, যদি জুনূবী ব্যক্তি তায়াম্মুম করার পূর্বে এ পরিমাণ পানি পেয়ে যায় যে, এর দ্বারা সে অজু করতে পারে, তবে আমাদের নিকট তার উপর অজু করা আবশ্যক নয়; বরং সে তায়াম্মুম করেই নামাজ পড়বে। হ্যাঁ, যদি তায়াম্মুম করার পর তার অজু ভঙ্গকারী কোনো হদস (حَدَثٌ) দেখা দেয়, তবে আমাদের মতে সে এখন এ পানি দ্বারা অজু করবে। কেননা, তার পূর্বের তায়াম্মুম ছিল জানাবাতের জন্য। আর তা সে অবস্থায় এখনো বাকি আছে। অর্থাৎ তার উপর আবার গোসল ফরজ হয়নি এবং হদসে আসগার [তথা অজু ভঙ্গের কারণ] দ্বারা তা ভেঙ্গে যায় না।

قَوْلُهُ اَلْمِيْلُ ثُلُثُ الْفَرْسَخِ الخ : শারেহ (র.) বলেন, এক মাইল হলো, এক ফরসাখের এক-তৃতীয়াংশ। আর ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, 'এক ফরসাখ হলো বারো হাজার কদম।" কেউ কেউ বলেন, এক মাইল হলো সাড়ে তিন হাজার গজ থেকে চার হাজার গজ পর্যন্ত।

পানির সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে জাহিরী বর্ণনা হলো, পানি এক মাইল দূরত্বে থাকলেই তায়াম্মুম করা বৈধ। কেননা, এতটুকু দূরত্ব থেকে শহরে প্রবেশ করতে তার কষ্ট হবে। অথচ তায়াম্মুম-এর প্রবর্তন হলো কষ্ট দূর করার জন্য। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ "তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেন নি।" -[সূরা হজ : ৭৮]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বর্ণনা করেন, যদি পানি সফরের সামনের দিকের পথে হয়, তবে দুই মাইল ধর্তব্য। আর যদি ডানে, বামে কিংবা পিছনের দিকে হয় তবে এক মাইল ধর্তব্য। কেননা, তখন আসা যাওয়া দুই মাইল হয়ে যাবে।

اَوْ لِمَرَضٍ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلٰى اِسْتِعْمَالِ الْمَاءِ اَوْ اِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اِشْتَدَّ مَرَضُهُ حَتّٰى لَا يُشْتَرَطُ خَوْفُ التَّلَفِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) اِذْ ضَرَرُ اِشْتِدَادِ الْمَرَضِ فَوْقَ ضَرَرِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَهُوَ يُبِيْحُ التَّيَمُّمَ اَوْ بَرْدٍ اَىْ اِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ يَضُرُّهُ اَوْ عَدُوٍّ اَوْ عَطَشٍ اَىْ اِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ خَافَ الْعَطَشَ اَوْ اُبِيْحَ الْمَاءُ لِلشُّرْبِ حَتّٰى اِذَا وَجَدَ الْمُسَافِرُ مَاءً فِىْ جُبٍّ مُعَدًّا لِلشُّرْبِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ اِلَّا اِذَا كَانَ كَثِيْرًا فَيُسْتَدَلُّ عَلٰى اَنَّهُ لِلشُّرْبِ وَالْوُضُوْءِ فَاَمَّا الْمَاءُ الْمُعَدُّ لِلْوُضُوْءِ فَاِنَّهُ يَجُوْزُ اَنْ يَّشْرَبَ مِنْهُ وَعِنْدَ الْاِمَامِ الْفَضْلِىْ (رحـ) عَكْسُ هٰذَا فَلَا يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ اَوْ عَدَمِ اٰلَةٍ كَالدَّلْوِ وَنَحْوِهَا اَوْ خَوْفِ فَوْتِ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فِى الْاِبْتِدَاءِ اَىْ اِذَا خَافَ فَوْتَ صَلٰوةِ الْعِيْدِ جَازَ لَهُ اَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَشْرَعَ فِيْهَا هٰذَا بِالْاِتِّفَاقِ وَبَعْدَ الشُّرُوْعِ مُتَوَضِّئًا وَالْحَدَثُ لِلْبِنَاءِ اَىْ اِذَا شَرَعَ فِىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ مُتَوَضِّئًا ثُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَيَخَافُ اَنَّهُ اِنْ تَوَضَّأَ يَفُوْتُهُ الصَّلٰوةُ جَازَ لَهُ اَنْ يَتَيَمَّمَ لِلْبِنَاءِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) خِلَافًا لَّهُمَا وَاِنْ شَرَعَ بِالتَّيَمُّمِ وَسَبَقَهُ الْحَدَثُ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ لِلْبِنَاءِ بِالْاِتِّفَاقِ فَقَوْلُهُ هُوَ لِمُحْدِثٍ مُبْتَدَأٌ وَضَرْبَةٌ خَبَرُهُ وَلَمْ يَقْدِرُوْا صِفَةٌ لِمُحْدِثٍ وَمَا بَعْدَهُ كَالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَغَيْرِهِمَا وَقَوْلُهُ لِبُعْدِهِ مِيْلًا مَعَ الْمَعْطُوْفَاتِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَمْ يَقْدِرُوْا وَفِى الْاِبْتِدَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُبْتَدَأِ تَقْدِيْرُهُ التَّيَمُّمُ لِخَوْفِ فَوْتِ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فِى الْاِبْتِدَاءِ وَبَعْدَ الشُّرُوْعِ مُتَوَضِّئًا ضَرْبَةٌ اَوْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ لِغَيْرِ الْوَلِىِّ لَا لِفَوْتِ الْجُمُعَةِ وَالْوَقْتِيَّةِ لِاَنَّ فَوْتَهُمَا اِلٰى خَلَفٍ وَهُوَ الظُّهْرُ وَالْقَضَاءُ .

অনুবাদ : অথবা অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহার করতে অক্ষম, কিংবা পানি ব্যবহার করলে অসুস্থতা বেড়ে যাবে। তবে ধ্বংস [মৃত্যু] হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা শর্ত নয়। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা, অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষতি চড়া মূল্যের ক্ষতির চেয়েও অধিক। আর পানির চড়া মূল্য তায়াম্মুমকে বৈধ সাব্যস্ত করে। কিংবা [প্রচণ্ড] ঠাণ্ডার কারণে অর্থাৎ যদি সে পানি ব্যবহার করে তবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দরুন তার অসুবিধা হবে। কিংবা শত্রু কিংবা পিপাসার ভয়ের কারণে অর্থাৎ যদি পানি ব্যবহার করে ফেলে তবে তার পিপাসার ভয় থাকে কিংবা শুধু পান করার জন্যই পানিকে মুবাহ করা হয়েছে। এমনকি যখন মুসাফির মটকায় পানি পেয়ে যায় যা [শুধু] পান করার জন্যই নির্ধারিত, তখন তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। কিন্তু যদি পানি অধিক হয় তবে এ আধিক্যের দ্বারা এ কথার উপর

প্রমাণ পেশ করা হবে যে, তা পান ও অজু করার জন্যই [নির্ধারিত]। পক্ষান্তরে যে পানি অজুর জন্য নির্ধারিত তা থেকে পান করাও জায়েজ আছে। ইমাম ফাযলী (র.)-এর নিকট এর ব্যতিক্রম। অতএব, [তাঁর নিকট] তায়াম্মুম বৈধ নয়। কিংবা [পানি উঠানোর] পাত্র না থাকার কারণে যেমন, বালতি বা অনুরূপ কোনো পাত্র। কিংবা শুরুতে ঈদের নামাজ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কার কারণে অর্থাৎ যখন এ ভয় হবে যে, [অজু করতে করতে] ঈদের নামাজ ছুটে যাবে, তখন তার জন্য জায়েজ আছে যে, সে তায়াম্মুম করে নামাজে শুরু করে দেবে। এটি সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। অজুর সাথে [ঈদের] নামাজ শুরু করার পর অজু ভঙ্গের কারণ দেখা দেওয়ার দরুন 'বিনা' করার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। অর্থাৎ যখন কেউ অজু অবস্থায় ঈদের নামাজ শুরু করে, অতঃপর [নামাজের মধ্যে] তার অজু ভঙ্গের কারণ দেখা দেয় এবং তার ভয় হয় যে, যদি সে অজু করতে যায় তবে তার [ঈদের] নামাজ ছুটে যাবে, তখন তার 'বিনা' করার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। এতে সাহেবাইন (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। আর যদি কেউ তায়াম্মুম দ্বারা ঈদের নামাজ শুরু করে, অতঃপর [নামাজের মধ্যে] তার অজু ভঙ্গের কারণ দেখা দেয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে 'বিনা' করার জন্য তার তায়াম্মুম করা বৈধ।

বিকায় গ্রন্থকারের বক্তব্য هُوَ لِمُحْدِثٍ মুবতাদা এবং [সামনে আগত] ضَرْبَةٌ হলো এর খবর। لَمْ يَقْدِرُوْا হচ্ছে, نُفَسَاءُ - حَائِضٌ - جُنُبٌ শব্দের সিফত। গ্রন্থকারের বক্তব্য لِبُعْدِهِ مَيْلًا এবং এ পরের অংশ যেমন, لِمُحْدِثٍ তার সমস্ত مُتَعَلِّقٌ শব্দটি فِي الْاِبْتِدَاءِ ; مُتَعَلِّقٌ -এর সাথে মُبْتَدَأٌ -এর সাথে لَمْ يَقْدِرُوْا -সহ مَعْطُوْف উহ্য ইবারত এভাবে হবে اَلتَّيَمُّمُ لِخَوْفِ فَوْتِ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فِى الْاِبْتِدَاءِ وَبَعْدَ الشُّرُوْعِ مُتَوَضِّئًا ضَرْبَةٌ কিংবা মৃত ব্যক্তির অভিভাবক ব্যতীত তার জানাজা নামাজ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কার কারণে। জুমা বা ওয়াক্তিয়া নামাজ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কার কারণে নয়। কেননা, এ দুটি ছুটে যাওয়ার [বিকল্প তথা] খলিফা রয়েছে। তা হলো, জোহর এবং কাযা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ حَتّٰى لَا يُشْتَرَطُ خَوْفُ التَّلَفِ : অর্থাৎ যদি অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহার করতে সক্ষম না হয় তবে সে তায়াম্মুম করবে। তবে অসুস্থ ব্যক্তি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম না হওয়ার দ্বারা এটি উদ্দেশ্য নয় যে, যদি সে পানি ব্যবহার করে তবে সে মরে যাবে। কিংবা এটিও উদ্দেশ্য নয় যে, পানি ব্যবহার করার দ্বারা তার কোনো অঙ্গ অকেজো হয়ে যাবে। যদি বিষয়টি এমনই হয় তবে তো তার জন্য পানি ব্যবহার করা হারাম হবে; বরং এখানে তার জন্য তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য শুধু এতটুকু আশঙ্কাই যথেষ্ট যে, যদি অসুস্থ ব্যক্তি পানি ব্যবহার করে তবে তার অসুস্থতা বেড়ে যাবে।

এর দলিল হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ الخ অর্থাৎ "যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক" ...... পরবর্তীতে বলেছেন, "আর পানি না পাও তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।" এ আয়াত অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ হওয়ার উপর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। অন্য একটি যৌক্তিক দলিল হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি অসুস্থ নয় তবে সে পানি মূল্যের বিনিময়ে পায়। এখন পানি বিক্রেতা যদি পানি ন্যায্য মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্য চায় তবে এ অবস্থায় অধিক মূল্যের ক্ষতিকে দূর করার লক্ষ্যে তার জন্য তায়াম্মুমকে জায়েজ করা হয়েছে। আর অসুস্থতা বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি পানির মূল্য বৃদ্ধিজনিত ক্ষতির চেয়ে অধিক গুরুতর। অথচ পানির মূল্য বৃদ্ধির ক্ষতির ক্ষেত্রে তায়াম্মুম-এর অনুমতি রয়েছে, যা ছোট ক্ষতি। অতএব, বড় ক্ষতি তথা অসুস্থতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও তায়াম্মুম -এর অনুমতি থাকা অধিক যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তায়াম্মুম তখন জায়েজ হবে, যখন পানির ব্যবহার দ্বারা অঙ্গহানি বা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব আয়াত وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى -এর প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা অগ্রাহ্য হয়ে যায়। কেননা, আয়াতটি

مُطْلَقٌ হওয়ার কারণে প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তির জন্যে তায়াম্মুম জায়েজ হওয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অঙ্গহানি বা প্রাণনাশের আশঙ্কার শর্তারোপ করার দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর زِيَادَةٌ লাযেম আসে, আর তা সম্পূর্ণই নাজায়েজ।

قَوْلُهُ إِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ خَافَ الْعَطَشَ : শারেহ (র.)-এর এ ইবারতের মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বর্তমানে তথা অজুর মুহূর্তেই তার পিপাসা লেগেছে এমনটি নয়; বরং কিছুক্ষণ পরেও যদি তার পিপাসা লাগার সম্ভাবনা থাকে তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। যদিও পরবর্তীতে তার পিপাসা না লাগে। অথবা যদি নিজের প্রাণনাশের কিংবা নিজের সাথি-সঙ্গীদের প্রাণনাশের ভয় থাকে তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ।

قَوْلُهُ أَوْ أُبِيحَ الْمَاءُ لِلشُّرْبِ : অর্থাৎ যদি কোথাও কোথাও এমন পানি পাওয়া যায়, যা শুধু পান করার জন্য নির্ধারিত এবং তা কম হয় তবে তায়াম্মুম করা বৈধ। আর যদি পানি অধিক হয় তবে তা দ্বারা অজু করবে।

قَوْلُهُ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ : অর্থাৎ মটকায় পানি আছে তবে তা কম এবং পান করার জন্য নির্ধারিত, তবে এ সুরতে শুধু তায়াম্মুম করা জায়েজই নয়; বরং কোনো কোনো সময় তা ওয়াজিবও হয়।

قَوْلُهُ فَيُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ لِلشُّرْبِ : অর্থাৎ যদি পানি অধিক পরিমাণ হয় এবং এগুলোকে পান ও অজু করার জন্য নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ পানি যারা রেখেছে তাদের পক্ষ থেকে অনুমতি থাকে তবে এর দ্বারা অজু করবে; বরং যেহেতু সে অজুর উপর সক্ষম সেহেতু তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। আর যদি শুধু পান করার অনুমতি থাকে তবে তা শুধু পানকারীদেরই অধিকার বা হক। যদি তা দ্বারা অজু করে ফেলে তবে পিপাসার আশঙ্কা থেকে যায়। এজন্য যেন সে অজুর উপর সক্ষম নয়, তাই সে তায়াম্মুম করবে।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الْإِمَامِ الْفَضْلِيِّ (رحـ) الخ : অর্থাৎ শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ফযল (র.) বলেন যে, যে পানি পান করার জন্য নির্ধারিত তা দ্বারা যদি কোনো ব্যক্তি অজু করে তবে তা জায়েজ। আর যদি অজুর জন্য পানি নির্ধারিত থাকে তবে তা পান করা যাবে না। অতএব, পান করার জন্য নির্ধারিত পানির উপর কিয়াস করে তায়াম্মুমকে জায়েজ বলা যাবে না।

قَوْلُهُ أَوْ خَوْفِ فَوْتِ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فِيْ الخ : যদি কোনো মুসল্লি ব্যক্তির এ ভয় হয় যে, যদি অজু করে তবে তার ঈদের নামাজ শেষ হয়ে যাবে, তবে তায়াম্মুম করে ঈদের নামাজ আদায় করা তার জন্য বৈধ। যদিও সে অসুস্থ নয় এবং পানিও উপস্থিত থাকে। ঈদের নামাজের জন্য তায়াম্মুম এজন্য জায়েজ যে, ঈদের নামাজ ছুটে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। অর্থাৎ তা ছুটে গেলে এর কোনো কাযা নেই, তাই তার কাছে পানি থাকা না থাকা বরাবর। এর দ্বারা এটিও প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক এমন ইবাদত যার কাযা নেই– আর তার অবস্থা যদি এমন হয় যে, যদি সে অজু করতে যায় তবে তার উক্ত ইবাদত ছুটে যাবে, তাহলে তায়াম্মুম করে উক্ত ইবাদতে শরিক হওয়া তার জন্য বৈধ। যেমন, জানাজার নামাজ যার বিবরণ সামনে আসছে। কিন্তু যদি ঈদের জামাত কিছুক্ষণ পরপর বিভিন্ন স্থানে কয়েকবার অনুষ্ঠিত হয় তবে সে অজু করে অন্য জামাতে শরিক হবে।

قَوْلُهُ إِذَا شَرَعَ فِيْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ مُتَوَضِّئًا : অর্থাৎ যখন অজু করে ঈদের নামাজ শুরু করে, আর নামাজের মধ্যে তার অজু ভেঙ্গে যায়, তখন যদি তার এ ভয় হয় যে, যদি সে অজু করতে যায় তবে তার পূর্ণ নামাজ ছুটে যাবে, তবে সে তায়াম্মুম করে দ্বিতীয়বার নামাজের 'বিনা' করবে। আর যদি তার ধারণা হয় যে, অজু করতে করতে তার পূর্ণ নামাজ ছুটবে না; বরং সে কিছু অংশ পেয়ে যাবে তবে সে অজু করে 'বিনা' করবে। যেমন, প্রথম রাকাতেই অজু ভেঙ্গে গেছে এবং পানি নিকটেই আছে এবং তাড়াতাড়ি অজু করে দ্বিতীয় রাকাত কিংবা বৈঠকে শরিক হতে পারবে তবে তায়াম্মুম জায়েজ নেই; বরং অজুই করতে হবে।

قَوْلُهُ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ لِلْبِنَاءِ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে তায়াম্মুম করে ঈদের জামাতে শরিক হয় এবং নামাজের মধ্যে তার অজু ভেঙ্গে যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার জন্য তায়াম্মুম করে উক্ত নামাজেই দ্বিতীয়বার শরিক হওয়া জায়েজ। কেননা, যদি তাকে এখন অজুর নির্দেশ দেওয়া হয় তবে তার পূর্ণ নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, প্রথমে যখন সে তায়াম্মুম করেছিল তখনো এর হুকুম এমন ছিল যে, যেন সে পানি পায়নি। আর এখন সে নামাজে পানি পেয়ে গেছে তাই তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে গেছে। যেহেতু এ অবস্থায় নামাজ নষ্ট হয়ে যায় এবং এ নামাজের কাযাও নেই তাই সকল ইমাম এতে একমত যে, সে তায়াম্মুম করে দ্বিতীয়বার নামাজে 'বিনা' করবে।

قَوْلُهُ اَوْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ لِغَيْرِ الْوَلِيِّ : এ বাক্যটির عَطْف - صَلَاةُ الْعِيْدِ বাক্যের উপর অর্থাৎ জানাজা সামনে উপস্থিত, এখন নামাজ শুরু হয়ে যাবে এমতাবস্থায় যদি মৃত ব্যক্তির অভিভাবক বা পরিবারের লোক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির ভয় হয় যে, যদি সে অজু করতে যায় এদিকে তার নামাজ ছুটে যাবে, তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। কেননা, যদি তার এ নামাজ ছুটে যায় তবে কোনো কাযা নেই। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির অভিভাবক ও পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য তায়াম্মুম করে জানাজায় শরিক হওয়া জায়েজ নেই। কেননা, সে নামাজে জানাজাকে কিছু সময়ের জন্য বিলম্বও করতে পারে। অভিভাবক বা পরিবারের সদস্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ ব্যক্তি যার মৃত ব্যক্তির জানাজার উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। চাই ঐ ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় হোক কিংবা না হোক। যেমন, রাষ্ট্রপতি বা বিচারপতি। এখন যদি অভিভাবক ব্যতীত অন্য ব্যক্তি তায়াম্মুম করে জানাজার নামাজে শরিক হয় এবং সাথে সাথে অন্য জানাজা উপস্থিত হয় তবে যদি তার এ পরিমাণ সময় থাকে যে, অজু করে জানাজায় শরিক হতে পারে তবে সে অজু করেই দ্বিতীয় জানাজায় শরিক হবে। আর যদি দ্বিতীয় জানাজা বিলম্ব না হয় তবে সে তায়াম্মুম দ্বারাই জানাজা পড়ে নেবে।

قَوْلُهُ وَهُوَ الظُّهْرُ : এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, জুমার দিনে মূল হলো, জুমার নামাজ। আর জোহর হলো এর খলিফা। যখন আসলের উপর আমল করা কষ্টকর হয় তখন এর স্থানে এর খলিফা চলে আসবে। অর্থাৎ যখন জুমার নামাজ আদায় করতে অক্ষম হবে তখন জোহরের নামাজ আদায় করবে। এটি ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট জুমা ও জোহরের দুটির যে-কোনো একটি ফরজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, ওয়াক্ত হচ্ছে– জোহরের ফরজ নামাজের। কিন্তু সেদিনে জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার কারণে মানুষ জোহরের নামাজকে বর্জন করার ব্যাপারে আদিষ্ট। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে ঐটি, যা আল্লামা আইনী ও অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন যে, জোহরের নামাজ হচ্ছে মূল বা আসল। এটি কারো খলিফা বা স্থলাভিষিক্ত নয়। তবে ধরনটা এমন হয়ে যায় যে, যদি জুমার নামাজ ছুটে যায় তবে জোহরের নামাজ এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَالْقَضَاءُ : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওয়াক্তিয়া নামাজ দ্বারা ঐ ফরজ, ওয়াজিব নামাজ উদ্দেশ্য যা ছুটে গেলে কাযা করা যায়। অন্যথায় চন্দ্রগ্রহণের নামাজ, সূর্যগ্রহণের নামাজ এবং তারাবীহের নামাজ ও ওয়াক্তিয়া নামাজ, এগুলো নির্ধারিত সময়েই আদায় করা হয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, শুধু 'কাযা' বলাই যথেষ্ট ছিল, জোহর বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা "কাযা"-এর মধ্যে জোহরও শামিল। উত্তর হচ্ছে, জুমা কখনো ওয়াক্ত ছুটে যাওয়ার দ্বারা ছুটে যায়, আবার কখনো ইমাম সাহেবের সালাম ফিরিয়ে ফেলার দ্বারা তথা জামাত ছুটার দ্বারা ছুটে যায়। কেননা, জুমার নামাজ কয়েকবার আদায় করা হয় না। অতএব, জোহরের নামাজের মধ্যে 'আদা' ও 'কাযা' শামিল। তাই 'জোহর' শব্দকে আলাদা উল্লেখ করে 'আদা' -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই 'জোহর' শব্দকে আলাদা উল্লেখ করে 'আদা'-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ضَرْبَةٌ لِمَسْحِ وَجْهِهٖ وَضَرْبَةٌ لِيَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيْبُ عِنْدَنَا وَالْفَتْوٰى عَلٰى اَنَّهٗ يُشْتَرَطُ الْاِسْتِيْعَابُ حَتّٰى لَوْ بَقِىَ شَيْءٌ قَلِيْلٌ لَا يُجْزِيْهِ وَالْاَحْسَنُ فِىْ مَسْحِ الذِّرَاعَيْنِ اَنْ يَمْسَحَ ظَاهِرَ الذِّرَاعِ الْيُمْنٰى بِالْوُسْطٰى وَالْبِنْصَرِ وَالْخِنْصَرِ مَعَ شَيْءٍ مِنَ الْكَفِّ الْيُسْرٰى مُبْتَدِئًا مِنْ رُءُوْسِ الْاَصَابِعِ ثُمَّ بَاطِنَهَا بِالْمُسَبِّحَةِ وَالْاِبْهَامِ اِلٰى رُءُوْسِ الْاَصَابِعِ وَهٰكَذَا يَفْعَلُ بِالذِّرَاعِ الْيُسْرٰى ثُمَّ اِذَا لَمْ يَدْخُلِ الْغُبَارُ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ فَعَلَيْهِ اَنْ يُخَلِّلَ اَصَابِعَهٗ فَيَحْتَاجُ اِلٰى ضَرْبَةٍ ثَالِثَةٍ لِتَخْلِيْلِهَا .

অনুবাদ : [তায়াম্মুম হলো,] মুখমণ্ডল মাসেহ করার জন্য একবার [মাটিতে] হাত মারা এবং কনুইসহ হস্তদ্বয় মাসেহ করার জন্য একবার [মাটিতে] হাত মারা। আমাদের নিকট তায়াম্মুমে তারতীব শর্ত নয়। [ইমাম শাফেয়ী (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন।] তবে ফতোয়া এ কথার উপর যে, ইসতি'আব [তথা পূর্ণ মুখমণ্ডল ও পূর্ণ হস্তদ্বয় মাসেহ করা] শর্ত। এমনকি যদি সামান্য অংশও মাসেহ ছাড়া থেকে যায় তবে [তায়াম্মুম] যথেষ্ট হবে না। হস্তদ্বয় মাসেহ করার উত্তম পদ্ধতি হলো, বাম হাতের তালুর কিছু অংশসহ [বাম হাতের] মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা ডান হাতের পৃষ্ঠদেশকে এমনভাবে মাসেহ করবে যে, আঙ্গুলের মাথা থেকে মাসেহ শুরু হয়, [এবং উপরের দিকে টেনে কনুই পর্যন্ত নিয়ে যাবে] অতঃপর ডান হাতের ভিতরের অংশকে বাম হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মাসেহ করে আঙ্গুলের [শেষ] মাথা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। অনুরূপ ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে মাসেহ করবে। অতঃপর যদি অঙ্গুলসমূহের মাঝে ধুলা প্রবেশ না করে তবে তার জন্য আঙ্গুল খিলাল করা আবশ্যক। অতএব, আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার জন্য তৃতীয়বার হাত মাটিতে মারার প্রয়োজন হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ضَرْبَةٌ لِمَسْحِ وَجْهِهٖ الخ : এখানে বিকায়া গ্রন্থকার (র.) তায়াম্মুম-এর রুকনের আলোচনা শুরু করেছেন। আল্লামা কাসায়ী (র.) বলেন, "তায়াম্মুম-এর রুকন হচ্ছে মাটিতে হাত মারা। তবে মাটিতে কয়বার হাত মারবে তা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। মূলত এখানে মাসআলা দুটি– ১. তায়াম্মুম-এর জন্য মাটিতে কয়বার হাত মারবে। ২. হাত কতটুকু পর্যন্ত মাসেহ করবে। মাসআলাদ্বয় যথাক্রমে–

মাটিতে কয়বার হাত মারবে : মাটিতে কয়বার হাত মারবে– এ নিয়ে ইমামদের মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের ইমামগণ এবং ইমাম মালেক, শাফেয়ী, যুহরী ও ইবনে আবী লায়লা (র.) বলেন, তায়াম্মুমের জন্য দুবার মাটিতে মারতে হবে– একবার মুখমণ্ডল মাসেহ করার জন্য এবং দ্বিতীয়বার হস্তদ্বয় মাসেহ করার জন্য। ইবনে সীরীন (র.) বলেন, তিনবার মাটিতে হাত মারবে। একবার মুখমণ্ডল মাসেহ করার জন্য। দ্বিতীয়বার হস্তদ্বয় মাসেহ করার জন্য। তৃতীয়বার মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের জন্য। কোনো কোনো ইমাম বলেন, একবার মাটিতে হাত মারবে।

যারা বলেন একবার মাটিতে হাত মারতে হবে– তাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِنْهُ এতে مُطْلَقًا তায়াম্মুম তথা মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে। আর

কায়দা আছে– اَلْمُطْلَقُ يُطْلَقُ عَلٰى اَدْنَاهُ "মুতলাককে তার সর্বনিম্ন فَرْد -এর উপর প্রয়োগ করা হয়।" আর এখানে সর্বনিম্ন فَرْد হলো, মাটিতে একবার হাত মারা।

জমহুর ওলামায়ে কেরামের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ "তায়াম্মুম হলো– দুইবার হাত মাটিতে মারা। একবার মুখমণ্ডলের জন্য, আরেকবার উভয় হাতের জন্য।"

–[মুসতাদরাকে হাকিম– ১ : ১৮০]

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে দুবার মাটিতে হাত মারতে বলেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাত দুবারই মারতে হবে।

তায়াম্মুমে হস্তদ্বয় মাসেহের পরিমাণ : তায়াম্মুমে হস্তদয়ের মাসেহের পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ওলামায়ে আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি বর্ণনা হলো, হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় মাসেহ করবে। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, বগল পর্যন্ত হস্তদ্বয় মাসেহ করবে।

ইমাম যুহরী (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত তথা فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِنْهُ -এ হাত মাসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আঙ্গুলের মাথা থেকে নিয়ে বগল পর্যন্ত অংশকে হাত বলে। অতএব, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হস্তদ্বয় বগল পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। কেননা, এতে কোনো غَايَةٌ বা সীমা উল্লেখ নেই।

ইমাম মালেক (র.) ও শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) জুনূবী হয়ে মাটিতে গড়াতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন– أَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ يَكْفِيْكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ "তুমি কি জান না যে, [তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে] তোমার জন্য মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করাই যথেষ্ট ছিল।" উক্ত হাদীসে হাতের ক্ষেত্রে كَفٌّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা হাতের তালু কিংবা আঙ্গুলের মাথা থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশকে বলা হয়। অতএব, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তায়াম্মুমে কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় মাসেহ করতে হয়।

ওলামায়ে আহনাফের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ এতে হস্তদ্বয় মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে। এখানে رُسْغ তথা غَايَةٌ -এর কথা উল্লেখ নেই। অতএব, কোনো দলিল ছাড়া رُسْغ -এর قَيْد লাগানো যাবে না। আর আমরা যে, مِرْفَقٌ তথা কনুই -এর قَيْد লাগিয়েছি এর দলিল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা হস্তদ্বয় ধোয়ার ক্ষেত্রে مِرْفَقٌ পর্যন্ত ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অজু হলো আসল বা মূল এবং তায়াম্মুম হচ্ছে এর খলিফা বা স্থলাভিষিক্ত। আর খলিফা আসলের হুকুমের ব্যতিক্রম হয় না। তাই আসলের মধ্যে مرفق -কে উল্লেখ করার দ্বারা পরোক্ষভাবে খলীফার মধ্যেও বুঝায়। হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ 'তায়াম্মুম হলো মাটিতে দুইবার হাত মারা। একবার মুখমণ্ডলের জন্য। দ্বিতীয়বার কনুইসহ হস্তদ্বয়ের জন্য।' –[মুসতাদরাকে হাকেম– ১ : ১৮০]

এ হাদীসও কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয় মাসেহ করার উপর স্পষ্টভাবে বুঝায়।

ইমাম যুহরী (র.) যে দলিল পেশ করেছেন– এর উত্তর হলো, হাত বলতে আঙ্গুলের মাথা থেকে বগল পর্যন্ত বুঝায় ঠিক; কিন্তু হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরিসীমা উল্লেখ করে দিয়েছেন। অতএব, এ ক্ষেত্রে তা আয়াতের ব্যাখ্যা। যদি হাদীসে مِرْفَقٌ -এর কথা উল্লেখ না থাকত তবে তখন বগল পর্যন্ত উদ্দেশ্য হতো। ইমাম মালেক (র.) ও শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের উত্তর হলো, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর উক্ত হাদীসের শুরু অংশ শেষাংশের বিপরীত। তা হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছিলেন– يَكْفِيْكَ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ এখানে তার একই বর্ণনার শেষাংশের মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়েছে। অতএব, তা দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

উল্লেখ্য যে, বিকায়া গ্রন্থকার (র.) اَلْوَضْعُ عَلَى التُّرَابِ ضَرْبَةٌ لِمَسْحِ وَجْهِهِ الخ বলেছেন, অথচ বলাই যথেষ্ট ছিল। মূলত তিনি এটি নবী ﷺ-এর উক্ত হাদীস থেকে সংগ্রহ করেছেন। ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এটি তায়াম্মুমের রুকন। অতএব, এর থেকে একটি মাসআলা বের হয় যে, যদি মাটিতে হাত মারে এবং মাসেহ করার পূর্বে কারো অজু ভঙ্গের কারণ দেখা দেয় তবে তার আবার মাটিতে হাত মারতে হবে।

❖ **تَيَمُّمْ করার পদ্ধতি :** ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তায়াম্মুম করার পদ্ধতি সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তায়াম্মুম হলো দুবার মাটিতে-হাত মারা। একবার মুখমণ্ডলের জন্য। দ্বিতীয়বার কনুইসহ হস্তদ্বয়ের জন্য। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা কিভাবে? অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয়কে মাটিতে মারলেন, সামনে ও পিছনের দিকে টানলেন, অতঃপর হস্তদ্বয় ঝাড়া দিলেন এবং মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার হস্তদ্বয় মাটিতে মারলেন, সামনে ও পিছনের দিকে টানলেন, অতঃপর হস্তদ্বয় ঝাড়া দিলেন এবং হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন।

আমাদের কোনো এক ফকীহ বলেন, বাম হাতের চার আঙ্গুলের পেট দ্বারা ডান হাতের পৃষ্ঠদেশ আঙ্গুলের মাথা থেকে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে। অতঃপর বাম হাতের তালু দ্বারা ডান হাতের পেট [তথা ভিতরাংশ] কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে। অতঃপর বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পেট দ্বারা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পিটের উপর ঘুরাবে। অনুরূপ বাম হস্তকেও করবে। –[বাদায়িউস সানায়ে'– ১ : ১৬৭]

আমাদের শারেহ (র.) বলেন, হস্তদ্বয় মাসেহ করার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, বাম হাতের তালুর কিছু অংশসহ [বাম হাতের] মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা ডান হাতের পৃষ্ঠদেশকে মাসেহ করা এবং আঙ্গুলের মাথা থেকে মাসেহ শুরু করা। অতঃপর বাম হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ডান হাতের পেট [তথা ভিতরাংশ] মাসেহ করা এবং তা কনুই থেকে শুরু করে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত আসা। অনুরূপ বাম হাতকে মাসেহ করা।

قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيْبُ عِنْدَنَا الخ : এখানে শারেহ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের নিকট তায়াম্মুমের তারতীব শর্ত নয়, যেমনটি অজুতে আমাদের নিকট তারতীব শর্ত নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট তায়াম্মুমেও তারতীব শর্ত। যেমনটি তিনি অজুতেও তারতীবকে শর্ত বলেছেন। মূলত এ ক্ষেত্রে অজুতে যেমন মতানৈক্য ছিল এখানেও তেমনই মতানৈক্য বিদ্যমান।

قَوْلُهُ عَلَى اَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْاِسْتِيْعَابُ : তায়াম্মুমের মধ্যে اِسْتِيْعَابْ [পূর্ণ অঙ্গ মাসেহ করা] শর্ত। সুতরাং মাসেহ ব্যতীত যদি কিছু অংশও অবশিষ্ট থেকে যায় তবে তায়াম্মুম হবে না। যেমনটি অজুর ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর থেকে জাহিরী বর্ণনার হুকুম। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, অধিকাংশ (اَكْثَرْ) পূর্ণাঙ্গ (كُلْ)-এর স্থলাভিষিক্ত হবে। দলিল হলো, মাসেহ করার অঙ্গসমূহ (اَعْضَاء مَمْسُوْحَةْ) -এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হওয়া শর্ত নয়। যেমন, মোজা ও মাথা মাসেহের মধ্যে পূর্ণ অঙ্গ মাসেহ করা শর্ত নয়। জাহিরী বর্ণনার কারণ হলো, তায়াম্মুম হচ্ছে অজুর স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, আঙ্গুলগুলো খিলাল করতে হবে। এমনকি যদি আংটি থাকে তবে খুলে নেবে যেন মাসেহ পূর্ণাঙ্গ হয়।

قَوْلُهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى ضَرْبَةٍ ثَالِثَةٍ : এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি বর্ণনা। এ কারণে যে, তাঁর নিকট বালুবিহীন তায়াম্মুম বৈধ নয়। অতএব, আঙ্গুলসমূহের মাঝে যেখানে ধুলা পৌঁছেনি সেখানে ধুলা পৌঁছানোর জন্য আবার মাটিতে হাত মারতে হবে। তিনি ব্যতীত অন্যান্য ইমামদের নিকট তৃতীয়বার মাটিতে হাত মারার প্রয়োজন নেই; বরং শুধু খিলাল করাই যথেষ্ট। যদিও সেখানে বালু না পৌঁছে।

عَلٰى كُلِّ طَاهِرٍ مُتَعَلِّقٌ بِضَرْبَةٍ مِنْ جِنْسِ الْاَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْحَجَرِ وَكَذَا الْكُحْلُ وَالزَّرْنِيْخُ وَاَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَا يَجُوْزُ بِهِمَا اِذَا كَانَا مَسْبُوْكَيْنِ فَاِنْ كَانَا غَيْرَ مَسْبُوْكَيْنِ مُخْتَلِطَيْنِ بِالتُّرَابِ يَجُوْزُ بِهِمَا وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ اِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا غُبَارٌ يَجُوْزُ وَلَا يَجُوْزُ عَلٰى مَكَانٍ كَانَ فِيْهِ نَجَاسَةٌ وَقَدْ زَالَ اَثَرُهَا مَعَ اَنَّهُ يَجُوْزُ الصَّلٰوةُ فِيْهِ وَلَا يَجُوْزُ بِالرَّمَادِ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَاَمَّا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) فَلَا يَجُوْزُ اِلَّا بِالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) لَا يَجُوْزُ اِلَّا بِالتُّرَابِ وَلَوْ بِلَا نَقْعٍ وَعَلَيْهِ اَىْ عَلَى النَّقْعِ فَلَوْ كَنَسَ دَارًا اَوْ هَدَمَ حَائِطًا اَوْ كَالَ حِنْطَةً فَاَصَابَ عَلٰى وَجْهِهٖ وَ ذِرَاعَيْهِ غُبَارٌ لَا يَجْزِيْهِ حَتّٰى يَمُرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهٖ عَلَى الصَّعِيْدِ بِنِيَّةِ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ فَالنِّيَّةُ فَرْضٌ فِى التَّيَمُّمِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) حَتّٰى اِذَا كَانَ بِهٖ حَدَثَانِ حَدَثٌ يُوْجِبُ الْغُسْلَ كَالْجَنَابَةِ وَحَدَثٌ يُوْجِبُ الْوُضُوْءَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَنْوِىَ عَنْهُمَا فَاِنْ نَوٰى عَنْ اَحَدِهِمَا لَا يَقَعُ عَنِ الْاٰخَرِ لٰكِنْ يَكْفِىْ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا فَلَا يَجُوْزُ تَيَمُّمُ كَافِرٍ لِاِسْلَامِهٖ اَىْ لَا يَجُوْزُ الصَّلٰوةُ بِهٰذَا التَّيَمُّمِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) فَعِنْدَهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ فِىْ حَقِّ جَوَازِ الصَّلٰوةِ اَىْ يَنْوِىَ قُرْبَةً مَقْصُوْدَةً سَوَاءٌ لَا تَصِحُّ بِدُوْنِ الطَّهَارَةِ كَالصَّلٰوةِ اَوْ تَصِحُّ كَالْاِسْلَامِ وَعِنْدَهُمَا قُرْبَةٌ مَقْصُوْدَةٌ لَا تَصِحُّ اِلَّا بِالطَّهَارَةِ فَاِنْ تَيَمَّمَ لِصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ اَوْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ يَجُوْزُ بِهٰذَا التَّيَمُّمِ اَدَاءُ الْمَكْتُوْبَاتِ وَاِنْ تَيَمَّمَ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ اَوْ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ لَا تَصِحُّ بِهِ الصَّلٰوةُ لِاَنَّهٗ لَمْ يَنْوِ بِهٖ قُرْبَةً مَقْصُوْدَةً لٰكِنْ يَحِلُّ لَهٗ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَ دُخُوْلُ الْمَسْجِدِ ـ

অনুবাদ : মাটি জাতীয় প্রত্যেক পবিত্র বস্তুর উপর [হাত মারবে]। এটি (عَلٰى كُلِّ) ضَرْبَة-এর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– মাটি, বালু ও পাথর। অনুরূপ সুরমা ও হরিতাল। কিন্তু স্বর্ণ ও রূপা যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় তবে এর দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ নেই। আর যদি তা পরিচ্ছন্ন না হয়; বরং মাটি মিশ্রিত হয় তবে তা দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। গম এবং যব-এর উপর যদি ধুলা থাকে তবে এর দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। যেখানে নাপাকী আছে সেখানে তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। যদিও নাপাকীর চিহ্ন সেখানে বর্তমানে না থাকে। তবে সেখানে নামাজ পড়া বৈধ। ছাই দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট মাটি এবং বালু ছাড়া অন্যকিছু দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট মাটি ব্যতীত অন্যকিছু দ্বারা তায়াম্মুম

বৈধ নয়। যদিও [মাটি জাতীয় পদার্থটি] বালুবিহীন হয়। বালুর উপর তায়াম্মুম করা বৈধ। যদি কোনো ঘর ঝাড়ু দেওয়া হয় কিংবা কোনো দেয়াল ভাঙ্গা হয় কিংবা গম মাপা হয় আর মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ে এসে বালু লাগে তবে তা তায়াম্মুম-এর জন্য যথেষ্ট নয়; বরং মাটির উপর হাত ঘষতে হবে। নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে পাক মাটির উপর সামর্থ্য থাকাবস্থায় [বালুর উপর তায়াম্মুম বৈধ]। অতএব, তায়াম্মুমে নিয়ত করা ফরজ। ইমাম যুফার (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। এমনকি যদি তার মধ্যে দুটি হদস হয়, একটি এমন হদস যা গোসলকে ওয়াজিব করে এবং অন্যটি এমন হদস যা অজুকে ওয়াজিব করে তবে তার জন্য উচিত উভয় [হদস]-এর নিয়ত করা। যদি দুটি [হদস] এর যে-কোনো একটির নিয়ত করে, তবে অপর হদস থেকে তায়াম্মুম হবে না। কিন্তু উভয় হদস থেকে এক তায়াম্মুমই যথেষ্ট। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের নিমিত্তে [কৃত] কাফেরের তায়াম্মুম বৈধ নয়। অর্থাৎ তরফাইন (র.)-এর নিকট উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ আদায় করা বৈধ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা তাঁর নিকট নামাজ বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে তায়াম্মুম বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো ইবাদতে মাকসূদাহ [খালিস ইবাদত]-এর নিয়ত করা। চাই উক্ত ইবাদত পবিত্রতা ব্যতীত শুদ্ধ না হোক যেমন– নামাজ কিংবা [পবিত্রতা ব্যতীত] শুদ্ধ হোক যেমন– ইসলাম গ্রহণ। আর তরফাইন (র.)-এর নিকট [শর্ত হলো], এমন ইবাদতে মাকসূদাহ -এর নিয়ত করা যা পবিত্রতা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। অতএব, কেউ যদি জানাজা নামাজের জন্য তায়াম্মুম করে কিংবা তিলাওয়াতের সিজদার জন্য তায়াম্মুম করে তবে উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা ফরজ নামাজ আদায় করা বৈধ। [পক্ষান্তরে] যদি কেউ কুরআন মাজীদ স্পর্শ করার জন্য কিংবা মসজিদে প্রবেশের জন্য তায়াম্মুম করে তবে উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ আদায় করা বিশুদ্ধ হবে না। কেননা, এতে ইবাদতে মাকসূদাহ -এর নিয়ত করা হয়নি। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির জন্য কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা ও মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ عَلٰى كُلِّ طَاهِرٍ الخ :

যে সমস্ত বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ : বিকায় গ্রন্থকার (র.) উক্ত ইবারতের অধীনে কোন কোন জিনিস দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ এর আলোচনা করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, প্রত্যেক ঐ বস্তু যা মাটি জাতীয় তার দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) আল্লামা যায়লায়ী (র.)-এর সূত্রে শরহে বিকায় গ্রন্থের টীকায় লেখেন, মাটি জাতীয় পদার্থ ও মাটি জাতীয় ভিন্ন পদার্থের মধ্যে পার্থক্য হলো, যে সমস্ত বস্তু জ্বালানোর দ্বারা ছাই হয়ে যায় যেমন– লাকড়ি অথবা যে সমস্ত বস্তুকে জালানোর দ্বারা নরম হয়ে গলে যায় যেমন– লোহা, স্বর্ণ, রূপা, সিসা ইত্যাদি, কিংবা যে সমস্ত বস্তু ভূমিতে রেখে দেওয়ার দ্বারা ভূমি তা খেয়ে ফেলে যেমন– গম ও যব ইত্যাদি এ সবকিছুই হচ্ছে বালু জাতীয় ভিন্ন বস্তু। এগুলোর দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, এগুলোর উপর যদি বালু থাকে তবে এর উপর হাত মেরে তায়াম্মুম করতে পারবে। আর যেসব জিনিস জ্বালানোর দ্বারা জ্বলে না কিংবা নরম হয়ে গলে যায় না কিংবা ভূমিও তা খায় না সেসব জিনিস মাটি জাতীয়। যেমন– মাটি, পাথর ইত্যাদি। এগুলোর দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। যদিও এগুলোর উপর বালু না থাকে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট যে, মাটি জাতীয় যে-কোনো বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট শুধু মাটি ও বালু দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট শুধু মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا "তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।" وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, صَعِيْد অর্থ– মাটি, طَيِّبٌ অর্থ– উৎপাদনকারী। এ তাফসীর দ্বারা বুঝা যায় যে, তায়াম্মুম শুধু মাটি দ্বারা জায়েজ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমরা এমন এক সম্প্রদায় যে, আমরা বালুময় এলাকায় বসবাস করি। এক/দুই মাস যাবৎ আমরা পানি পাই না। অথচ আমাদের মাঝে জুনূবী ব্যক্তি, নিফাসবিশিষ্টা ও হায়েজা মহিলা থাকে। অতএব আমরা এখন কি করব? তিনি বললেন, عَلَيْكُمْ بِالْاَرْضِ "তোমরা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।" –[মুসনাদে আহমদ– ২ : ২৭২, বায়হাকী– ১ : ২১৬] وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়াম্মুমের উপকরণের বিবরণ দিতে গিয়ে أَرْض শব্দ

ব্যবহার করেছেন। আর أَرْض -এর মধ্যে মাটি যেমন শামিল তেমনি বালুও শামিল। অতএব, মাটি তো আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং উক্ত হাদীস দ্বারা বালু প্রমাণিত হয়।

তরফাইন (র.) -এর দলিল হলো, আয়াতে বলা হয়েছে- فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا ; صَعِيْد ভূপৃষ্ঠের নাম, ভূপৃষ্ঠের উঁচু অংশ। অতএব, প্রত্যেক এমন বস্তু যা صَعِيْد হবে তথা মাটি জাতীয় হবে তা দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ হবে। আল্লামা যুজাজ (র.) 'মাআনিল কুরআনে' লেখেন- আমার জানা মতে صَعِيْد -এর এ অর্থের ব্যাপারে কারো কোনো মতবিরোধ নেই। طَيِّبْ -এর অর্থ ইমাম শাফেয়ী (র.) উৎপাদনকারী বলেছেন। আমরা বলি, طَيِّبْ দ্বারা তাহির [পবিত্র] অর্থও হতে পারে। আল্লাহর বাণী حَلَالًا طَيِّبًا -এর মধ্যে طَيِّبْ শব্দটি তাহির ও পবিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর এ অধ্যায়টি হচ্ছে তাহারাতের অধ্যায়। অতএব, উক্ত অর্থটিই এ স্থানে অধিক প্রযোজ্য।

আমাদের দলিল দ্বারা নিশ্চয় ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের খণ্ডন হয়ে গেছে। কেননা, আমরা صَعِيْد -এর এমন অর্থ করেছি যে, এর দ্বারা মাটি জাতীয় সমস্ত বস্তু صَعِيْد -এর মধ্যে শামিল হয়ে যায়। অতএব, صَعِيْد -এর দ্বারা শুধু মাটি উদ্দেশ্য নয়। অনুরূপ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলেরও খণ্ডন হয়ে যায়। কেননা, أَرْض -এর মধ্যে শুধু মাটি ও বালুই শামিল নয়; বরং এতে মাটি জাতীয় সমস্ত বস্তুই শামিল।

قَوْلُهٗ وَكَذَا الْكُحْلُ وَالزِّرْنِيْخُ : অর্থাৎ সুরমা ও হরিতাল দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। অনুরূপ চুনা, পাথর, সুরকি চুনা, সাধারণ চুনা, সুরমা, পাহাড়ি লবণ, ইয়াকূত, যামরাদ, যাবারজাদ, কাঁচা ইট, পাকা ইট ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। কেননা, এসবই মাটি থেকে সৃষ্টি হয়। তবে মোতি দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। কারণ, তা পানিতে সৃষ্টি হয়।

قَوْلُهٗ وَلَا يَجُوْزُ عَلٰى مَكَانٍ كَانَ الخ : উক্ত মাসআলার ধরন হলো, এক স্থানে কোনো বাচ্চা পেশাব করে দিয়েছে, পেশাব শুকিয়ে গেছে এবং যেখানে নাপাকীর কোনো চিহ্ন নেই, তবে সেখানে নামাজ পড়া বৈধ। কিন্তু এ স্থানের মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। কেননা, নামাজের ক্ষেত্রে শুধু জায়গা পাক হওয়া শর্ত। তাই যখন পেশাব শুকিয়ে গেছে এবং এর চিহ্ন দূরীভূত হয়ে গেছে তখন ঐ স্থান পাক হয়ে গেছে, তাই এতে নামাজ আদায় করা বৈধ। পক্ষান্তরে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে হুকুম হলো, فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا অতএব, উক্ত স্থান যদিও পাক কিন্তু طَيِّبْ নয়। এজন্য এর দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। সামনে بَابُ الْاَنْجَاسِ -এর মধ্যে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

قَوْلُهٗ وَلَا يَجُوْزُ بِالرَّمَادِ الخ : কয়লা [ছাই] দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। কেননা, তা মাটি জাতীয় নয়; বরং তা গাছ জাতীয়। কিন্তু যদি উক্ত কয়লা পাথরের হয় তবে এর দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ।

قَوْلُهٗ وَلَوْ بِلَا نَقْعٍ وَعَلَيْهِ : এ বাক্যটির সম্পর্ক হয়তো اَلْحَجَرُ -এর সাথে অথবা عَلٰى كُلِّ طَاهِرٍ -এর সাথে। উভয়টিই বিশুদ্ধ। যদি عَلٰى كُلِّ طَاهِرٍ -এর সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে এর অর্থ হবে, "মাটি জাতীয় প্রত্যেক পবিত্র বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ যদিও এর উপর বালু না থাকে।" আর যদি اَلْحَجَرُ -এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় তবে এর অর্থ হবে, "পাথর দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ যদিও এতে বালু না থাকে।"

قَوْلُهٗ مَعَ قُدْرَتِهٖ عَلَى الصَّعِيْدِ : এ ইবারতটির সুরত মূলত وَعَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهٖ عَلَى الصَّعِيْدِ الخ অর্থাৎ পবিত্র মাটি থাকাবস্থায় নামাজের নিয়তে বালু দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। কেননা, বালুও মাটি জাতীয়।

قَوْلُهٗ فَالنِّيَّةُ فَرْضٌ فِى التَّيَمُّمِ خِلَافًا الخ : এখানে তায়াম্মুমে নিয়ত ফরজ না ওয়াজিব এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ নিয়ে আমাদের এবং ইমাম যুফার (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের মতে তায়াম্মুমের জন্য নিয়ত করা ফরজ। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.)-এর নিকট তায়াম্মুমে নিয়ত করা ফরজ নয়। তাঁর দলিল হলো, তায়াম্মুম অজুর খলিফা। আর খলিফা গুণের দিক থেকে আসলের পরিপন্থি হতে পারে না। তাই যেমনিভাবে অজু নিয়ত ব্যতীত বিশুদ্ধ, তেমনি তায়াম্মুমও নিয়ত ব্যতীত বিশুদ্ধ হবে। কারণ, তায়াম্মুম যদি নিয়ত ব্যতীত সহীহ না হয়, তবে তো খলিফা আসলের পরিপন্থি হয়ে যায়, যা বৈধ নয়।

আমাদের দলিল হচ্ছে, তায়াম্মুমের আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা। আর ইচ্ছা হলো– নিয়তের নাম। নিয়ত ছাড়া ইচ্ছা পরিপূর্ণ হয় না, তাই এতে নিয়তকে ফরজ সাব্যস্ত না করা হলে স্বয়ং তায়াম্মুম -এর অর্থই পরিপূর্ণ হচ্ছে না। তাছাড়া মাটি প্রকৃতপক্ষে পবিত্র বা পবিত্রকারী বস্তু নয়; বরং তা নাপাক। তবে নামাজ আদায়ের ইচ্ছা করার সময় এবং পানি না থাকার সময় একে পবিত্রকারী বানানো হয়। অতএব, এতে নিয়ত করা শর্ত। পক্ষান্তরে পানি সৃষ্টিগতভাবেই তা পবিত্রকারী, তাই এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের সময় নিয়ত শর্ত নয়।

قَوْلُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ عَنْهُمَا : অর্থাৎ জানাবাত এবং হদসে আসগার উভয়টির নিয়ত করবে। তবে এতে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ বকর রাযী (র.) বলেন, পৃথকভাবে দুটির নিয়ত করতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যখন জুনুবী ব্যক্তি অজুর খলিফা তায়াম্মুমের নিয়ত করে তায়াম্মুম করে তবে তার এ তায়াম্মুম জানাবাত-এর জন্য যথেষ্ট হবে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। এখানে শারেহ (র.) যে মাসআলা বর্ণনা করেছেন তা হানাফী মাযহাবের পরিপন্থি মনে হয়। কিন্তু যদি يَنْبَغِيْ শব্দের অর্থ اِسْتِحْبَابٌ ধরা হয় তবে আহনাফের পরিপন্থি হবে না।

قَوْلُهُ فَلَا يَجُوْزُ تَيَمُّمُ كَافِرٍ لِاِسْلَامِهِ : প্রথমেই আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ইবাদত দু প্রকার– ১. عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ ২. عِبَادَةٌ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ অন্য কথায় عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ ও عِبَادَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ

عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ হলো, যে সমস্ত ইবাদত সূচনাতেই ইবাদত হিসেবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত হয়েছে। আর عِبَادَةٌ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ হলো, যা এর পরিপন্থি। অতএব, ইসলাম গ্রহণ করা, নামাজ আদায় করা, সিজদায়ে তিলাওয়াত করা, জানাজা নামাজ পড়া ইত্যাদি হলো ইবাদতে মাকসূদাহ। মসজিদে প্রবেশ করা, কুরআন স্পর্শ করা, দোয়া-দরূদ পড়া ইত্যাদি হচ্ছে, عِبَادَةٌ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ। অতঃপর ইবাদতে মাকসূদাহ -এর মধ্যে কোনো কোনো ইবাদত আছে যা পবিত্রতা ব্যতীত আদায় হয় না, যেমন– নামাজ এবং কিছু আছে পবিত্রতা ব্যতীতই আদায় হয়, যেমন– ইসলাম গ্রহণ। সুতরাং প্রত্যেক প্রকারের ইবাদতের কোনো একটির যদি পৃথকভাবে নিয়ত করে তবে তায়াম্মুম সহীহ, চাই তা ইবাদতে মাকসূদাহ হোক কিংবা ইবাদতে গায়রে মাকসূদাহ হোক। এতে সকলেই একমত।

কিন্তু কোন তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ আদায় করা সহীহ এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যে তায়াম্মুম عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ-এর নিয়তে করা হয়, তা দ্বারা নামাজ আদায় করা বৈধ। চাই উক্ত عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ পবিত্রতার মাধ্যমে আদায় হোক কিংবা পবিত্রতা ব্যতীতই আদায় হোক। অতএব, তাঁর নিকট কাফের ইসলাম গ্রহণের জন্য যে তায়াম্মুম করে তা দ্বারা নামাজ আদায় সহীহ হবে। পক্ষান্তরে তরফাইন (র.) বলেন, ঐ তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ আদায় সহীহ হবে, যা এমন عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ-এর নিয়তে করা হয়েছে যে ইবাদত পবিত্রতা ব্যতীত সহীহ হয় না। অতএব, তাঁদের নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য কাফের যে তায়াম্মুম করেছে তা দ্বারা নামাজ আদায় করা সহীহ হবে না। কেননা, ইসলাম গ্রহণ করা ইবাদতে মাকসূদাহ বটে তবে তা পবিত্রতা ব্যতীত সহীহ হয়।

قَوْلُهُ فَإِنْ تَيَمَّمَ لِصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ أَوْ سَجْدَةِ الخ : এ সুরতটি হচ্ছে পানি না থাকাবস্থায়। অর্থাৎ যখন পানি না থাকাবস্থায় সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য কিংবা জানাজা নামাজের জন্য তায়াম্মুম করবে তখন তা দ্বারা ফরজ নামাজও আদায় করা সহীহ হবে। কিন্তু পানি থাকাবস্থায় সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য কোনোভাবেই তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। কেননা, সিজদায়ে তিলাওয়াত ঐ প্রকারের ইবাদত যা পবিত্রতা ব্যতীত সহীহ হয় না। জানাজা নামাজ ছুটে যাওয়ার ভয়ে যে তায়াম্মুম করা হয়েছে তা জানাজা নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ভেঙ্গে যাবে। কেননা, তার কাছে পানি রয়েছে। সে জানাজা নামাজ ছুটে যাওয়ার ভয়ে তায়াম্মুম করেছে।

قَوْلُهُ لٰكِنْ يَحِلُّ لَهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ الخ : অর্থাৎ কুরআন স্পর্শ করার জন্য কিংবা মসজিদে প্রবেশের জন্য যে তায়াম্মুম করা হয় তা দ্বারা নামাজ আদায় করা বৈধ নয়। কেননা, উক্ত তায়াম্মুমে عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ-এর নিয়ত নেই। কিন্তু যদি সে পানি পেয়ে যায় তবে তার জন্য উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়। কেননা, কুরআন স্পর্শ করা এমন কাজ যা পবিত্রতা ব্যতীত বৈধ নয়। কিন্তু মসজিদে প্রবেশ করা এর পরিপন্থি। কেননা, এর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। অর্থাৎ তা পবিত্রতা ব্যতীতও বৈধ; বরং এর জন্য যদি পানি থাকাবস্থায়ও তায়াম্মুম করা হয়, তবে বৈধ।

وَجَازَ وَضُوْءُهُ بِلَا نِيَّةٍ حَتّٰى اَنْ تَوَضَّأَ بِلَا نِيَّةٍ فَاَسْلَمَ جَازَ صَلَاتُهُ بِهٰذَا الْوُضُوْءِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى مَسْأَلَةِ اِشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِى الْوُضُوْءِ وَاِنْ تَوَضَّأَ بِالنِّيَّةِ فَاَسْلَمَ فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ اَيْضًا لِاَنَّ نِيَّةَ الْكَافِرِ لَغْوٌ لِعَدَمِ الْاَهْلِيَّةِ وَاِنَّمَا قَالَ بِلَا نِيَّةٍ مُبَالَغَةٍ فَيَصِحُّ وَضُوْءُ الْكَافِرِ مَعَ النِّيَّةِ بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى وَيَصِحُّ فِى الْوَقْتِ اِتِّفَاقًا وَقَبْلَهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فَلَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ اِلَّا فِى الْوَقْتِ عِنْدَهُ وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى مَا عُرِفَ فِىْ اُصُوْلِ الْفِقْهِ اَنَّ التُّرَابَ خَلَفٌ ضَرُوْرِيٌّ لِلْمَاءِ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا خَلَفٌ مُطْلَقٌ فَفِىْ اِنَائَيْنِ طَاهِرٌ وَنَجِسٌ يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلتُّرَابُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلٰى عَشَرِ حُجَجٍ يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا وَبَعْدَ طَلَبِهِ مِنْ رَفِيْقٍ لَهُ مَاءٌ مَنَعَهُ حَتّٰى اِذَا صَلّٰى بَعْدَ الْمَنْعِ ثُمَّ اَعْطَاهُ يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ الْاٰنَ فَلَا يُعِيْدُ مَا قَدْ صَلّٰى وَقَبْلَ طَلَبِهِ جَازَ خِلَافًا لَهُمَا هٰكَذَا ذُكِرَ فِى الْهِدَايَةِ وَ ذُكِرَ فِى الْمَبْسُوْطِ اَنَّهُ اِنْ لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ وَصَلّٰى لَمْ يَجُزْ لِاَنَّ الْمَاءَ مَبْذُوْلٌ عَادَةً وَفِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ مِنَ الْمَبْسُوْطِ اِنَّهُ اِنْ كَانَ مَعَ رَفِيْقِهِ مَاءٌ فَعَلَيْهِ اَنْ يَسْأَلَهُ اِلَّا عَلٰى قَوْلِ حَسَنِ بْنِ زِيَادٍ فَاِنَّهُ يَقُوْلُ السُّؤَالُ ذُلٌّ وَفِيْهِ بَعْضُ الْحَرَجِ وَلَمْ يُشْرَعِ التَّيَمُّمُ اِلَّا لِدَفْعِ الْحَرَجِ وَلٰكِنَّا نَقُوْلُ مَاءُ الطَّهَارَةِ مَبْذُوْلٌ عَادَةً وَلَيْسَ فِىْ سُؤَالِ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ مَذَلَّةٌ فَقَدْ سَاَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْضَ حَوَائِجِهِ مِنْ غَيْرِهِ ـ

অনুবাদ : নিয়ত ব্যতীত কাফেরের অজু জায়েজ আছে। এমনকি যদি কাফের ব্যক্তি নিয়ত ব্যতীত অজু করে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে তবে উক্ত অজু দ্বারা তার নামাজ আদায় করা বৈধ। ইমাম শাফেয়ী (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। এ মতানৈক্যের ভিত্তি হলো, অজুতে নিয়ত করা শর্ত সাব্যস্ত করার মাসআলার উপর। আর যদি কাফের ব্যক্তি নিয়তসহ অজু করে, অতঃপর মুসলমান হয় তবুও [আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে] মতানৈক্য রয়েছে। কেননা, কাফের অযোগ্য হওয়ার কারণে তার নিয়ত অনর্থক। বিকায়া গ্রন্থাকার (র.) بِلَا نِيَّةٍ শব্দটি مُبَالَغَةً [অতিরঞ্জনের জন্য] বলেছেন। অতএব, নিয়তের সাথে কাফেরের অজু আরো ভালোভাবে সহীহ হবে। সর্বসম্মতিক্রমে [নামাজের] ওয়াক্তে তায়াম্মুম করা সহীহ এবং ওয়াক্তের পূর্বেও [সহীহ]। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। অতএব, তাঁর নিকট তায়াম্মুম দ্বারা শুধু ওয়াক্তেই নামাজ আদায় করা জায়েজ। এ মতানৈক্য নির্ভরশীল ঐ কথার উপর যা উসূলুল ফিকহ -এর মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট মাটি পানির জরুরি খলিফা [স্থলাভিষিক্ত]। আর আমাদের নিকট মাটি পানির মুতলাক খলিফা [সাধারণ স্থলাভিষিক্ত]। সুতরাং

যদি [অনির্দিষ্টভাবে] দুটি পাত্রে পানি থাকে যে, একটি পাক এবং অপরটি নাপাক, তবে আমাদের নিকট তায়াম্মুম করা বৈধ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে [চিন্তা করে যে-কোনো এক পাত্র থেকে অজু করে নেবে]। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী اَلتُّرَابُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلٰى عَشَرِ حُجَجٍ [মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী বস্তু যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি না পাওয়া যায়।] আমাদের কথা তথা "মাটি পানির মুতলাক খলিফা" -কে সমর্থন করে। আপন সঙ্গী যার কাছে পানি আছে তার কাছে পানি চাওয়ার পর যদি সে না দেয় [তবে তায়াম্মুম করবে]। এমনকি যদি পানি না দেওয়ার পর [তায়াম্মুম করে] নামাজ আদায় করে নেয়, অতঃপর পানি দেয় তবে তখন তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু [উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা] আদায়কৃত নামাজ আবার দোহরাতে হবে না। আপন সঙ্গীর কাছে পানি চাওয়ার পূর্বে তায়াম্মুম করা বৈধ। এতে সাহেবাইন (র.)-এর মতানৈক্য রয়েছে। হিদায়া গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ রয়েছে। মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি সঙ্গীর কাছে পানি না চায় এবং [তায়াম্মুম করে] নামাজ পড়ে নেয় তবে [তার] নামাজ হবে না। কেননাম সাধারণত পানি [যার প্রয়োজন তাকে] দেওয়া হয়। মাবসূত গ্রন্থের অন্যস্থানে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি তার সঙ্গীর কাছে পানি থাকে তবে তার কাছে পানি চাওয়া তার জন্য আবশ্যক। কিন্তু ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) -এর কথা হলো, তিনি বলেন, চাওয়া একটি লজ্জাকর বিষয়। এতে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। আর অসুবিধা দূর করার জন্যই তো তায়াম্মুম অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু আমরা বলি, পবিত্রতা হাসিলের পানি সাধারণত দেওয়া হয়। তাছাড়া জরুরি জিনিস চাওয়ার মাঝে কোনো লজ্জা নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও কোনো কোনো জরুরতের সময় অন্যের কাছে চেয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجَازَ وَضُوْءُهُ بِلَانِيَّةٍ الخ : যদি কাফের ব্যক্তি কাফের থাকাবস্থায় অজুর নিয়ত ব্যতীত অজু করে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে তবে উক্ত অজু দ্বারা নামাজ আদায় করা আমাদের নিকট বৈধ। কেননা, পানি পবিত্র এবং পবিত্রকারী। এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার জন্য নিয়তের প্রয়োজন নেই। যেমন, কাফের ব্যক্তি কাফের থাকাবস্থায় তার নাপাক কাপড় পানি দ্বারা ধোয়ার পর মুসলমান হলে উক্ত কাপড় পরিধান করে নামাজ পড়তে পারে। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, কাফের থাকাবস্থায় নিয়ত ব্যতীত যে অজু করেছে মুসলমান হওয়ার পর সে উক্ত অজু দ্বারা নামাজ আদায় করতে পারবে না। কেননা, তাঁর নিকট নিয়ত ছাড়া অজু অনর্থক হয়। চাই মুসলমান হোক কিংবা কাফের হোক। আসলে তায়াম্মুমে নিয়ত সম্পর্কে যে মতানৈক্য রয়েছে এর ভিত্তি হলো, অজুতে নিয়ত শর্ত হওয়া ও না হওয়ার মতানৈক্যের উপর। এর বিস্তারিত বিবরণ অজুর অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا قَالَ بِلَا نِيَّةٍ مُبَالَغَةً : এটি একটি মন্তব্যের খণ্ডন। মন্তব্যটি হচ্ছে, কাফেরের অজুর হুকুম একই। চাই সে এতে নিয়ত করুক কিংবা না করুক। অর্থাৎ আমাদের নিকট তার অজু গ্রহণযোগ্য, আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট তার অজু গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, এখানে بِلَا نِيَّةٍ শব্দটি বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। উত্তরের সারমর্ম হচ্ছে, গ্রন্থকার مُبَالَغَةً উক্ত হুকুম বলেছেন যে, নিয়ত ব্যতীতও যদি কাফের ব্যক্তি অজু করে তবে তার অজু গ্রহণযোগ্য, আর যদি নিয়তসহ অজু করে তবে তো তা আরো উত্তমরূপে গ্রহণযোগ্য।

এতেও যদি কেউ মন্তব্য করে যে, কাফের যেহেতু নিয়ত করা ও না করার অযোগ্য তাই তার নিয়ত করাও অনর্থক। সে নিয়তসহ অজু করা ও না করা বরাবর। ফলত নিয়তসহ অজু করলে তা আরো উত্তমরূপে গ্রহণযোগ্য বলাই অশুদ্ধ। এর উত্তর হলো, অজুকারীর সত্তার দিকে লক্ষ্য করলে যদিও মনে হয় তা অনর্থক কিন্তু অজুর দিকে লক্ষ্য করলে তো হুকুম এটিই হবে যে, এটি বিশুদ্ধ এবং নিয়তসহ হলে আরো বিশুদ্ধ। তাই শারেহ (র.) بِطَرِيْقٍ اَوْلٰى বলেছেন।

قَوْلُهُ اِنَّ التُّرَابَ خَلَفٌ ضَرُوْرِيٌّ لِلْمَاءِ : মাটি যা পানির স্থলাভিষিক্ত, আমাদের নিকট তা مُطْلَقًا পবিত্রকারী। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট মাটি مُطْلَقًا পবিত্রকারী নয়; বরং তাকে জরুরতের সময় পবিত্রকারী বানানো হয়। অতএব,

আমাদের নিকট যেহেতু মাটি مُطْلَقًا পবিত্রকারী, তাই এর দ্বারা যে-কোনো নামাজ, একাধিক নামাজ, সিজদায়ে তিলাওয়াত ইত্যাদি সবই জায়েজ। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট যেহেতু মাটি জরুরতের সময় পবিত্রকারী তাই যখনই জরুরত পূর্ণ হয়ে যাবে তখনই তার তায়াম্মুমও ভেঙ্গে যাবে। ফলত তাঁর নিকট এক তায়াম্মুম দ্বারা শুধু এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা যাবে। অতএব, যখনই ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে তখন তায়াম্মুমও ভেঙ্গে যাবে। অন্য ওয়াক্ত নামাজের জন্য আবার তায়াম্মুম করা আবশ্যক।

قَوْلُهُ فَفِىْ إِنَائَيْنِ طَاهِرٌ وَنَجَسٌ الخ : অর্থাৎ যদি অনির্দিষ্টভাবে দুটি পাত্রের একটিতে পবিত্র পানি এবং অপরটিতে অপবিত্র পানি থাকে, জানা নেই যে, কোনটিতে পবিত্র পানি এবং কোনটিতে অপবিত্র পানি তবে আমাদের নিকট تَحَرِّىْ বা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই; বরং তায়াম্মুম করে নামাজ পড়বে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট এ অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েজ নেই; বরং চিন্তা করবে এবং যে পাত্রে পবিত্র পানি আছে বলে প্রবল ধারণা হয়, সে পাত্রের পানি দ্বারা অজু করে নেবে। কেননা, মাটি পানির জরুরি খলিফা। আর উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় তেমন জরুরত প্রমাণিত হয়নি। কারণ, تَحَرِّىْ বা চিন্তা করা শরিয়তের দলিল। আর এ تَحَرِّىْ দ্বারা দুটির যে-কোনো একটি পাত্র পবিত্র হিসেবে নির্দিষ্ট করা যাবে। তাই এ প্রক্রিয়ায় তায়াম্মুম করা জায়েজ নেই। তাঁর নিকট তাহাররী (تَحَرِّىْ) -এর পূর্বে এ কারণে তায়াম্মুম জায়েজ নেই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পানি পেতে অক্ষম না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তায়াম্মুম সহীহ হবে না। আর যখন تَحَرِّىْ -এর সম্ভাবনা রয়েছে তখন আর পানি থেকে অক্ষম প্রমাণিত হয় না, তাই তায়াম্মুমও সহীহ নয়।

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلتُّرَابُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ الخ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী বস্তু, যদিও মুসলমান দশ বছর পর্যন্ত পানি না পায়।" নবী ﷺ -এর উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তায়াম্মুম অজুর জরুরি খলিফা নয়; বরং তা مُطْلَقًا পানির খলিফা এবং তা অপবিত্রতাকে দূর করে।

قَوْلُهُ مِنْ رَفِيْقٍ لَهُ مَاءٌ مَنَعَهُ الخ : এখানে رَفِيْق [বন্ধু] হচ্ছে قَيْد اِتِّفَاقِىْ অর্থাৎ যার কাছেই পানি আছে চাই সে বন্ধু হোক কিংবা না হোক তার কাছে পানি চাইবে। কেননা, পানি এমন এক বস্তু যার থেকে কাউকে নিষেধ করা হয় না। হ্যাঁ যদি পানি কম হয় তবে কখনো বারণ করা হয়। এখন যদি তার কাছে কেউ পানি চায়, আর সে পানি না দেওয়ার ধরুন তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করে ফেলে অতঃপর সে পানি দেয় তবে তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। তবে সে উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা যে নামাজ আদায় করা হয়েছে তা দোহরাতে হবে না। আর যদি সে তায়াম্মুম করার পর এখনো নামাজ আদায় করেনি তবে যেহেতু এখন সে পানি পেয়ে গেছে তাই তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে গেছে এবং তাকে অজু করে নামাজ আদায় করতে হবে।

قَوْلُهُ اَلسُّؤَالُ ذُلٌّ : ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বলেন, যে সাথির নিকট পানি আছে তার কাছে পানি চাওয়া আবশ্যক নয়; বরং পানি চাওয়া ব্যতীতই তায়াম্মুম করা জায়েজ। কেননা, পানি চাওয়া হলো একটি দূষণীয় ও লজ্জাকর বিষয়। বিশেষভাবে সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য অধিক লজ্জাকর। তাছাড়া চাওয়ার মধ্যে ক্ষতিও আছে অথচ তায়াম্মুম ক্ষতিকে দূর করার জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তর হচ্ছে, সাধারণত অজুর জন্য পানি খরচ করা হয়। মানুষ তা চাওয়ার মধ্যে কোনো প্রকার অসুবিধা মনে করে না। অতএব, এখানে লাঞ্ছনার প্রশ্নই আসে না; বরং লাঞ্ছনা তো এর মাঝে যে, অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য মানুষের কাছে নিজের মুখাপেক্ষিতা বারবার প্রকাশ করা। অজুর পানি এমনটি নয়; বরং তা প্রয়োজনীয় জিনিস। মানুষ খুশিতেই অজুর পানি দিয়ে থাকে। তাছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য কোনো জরুরি জিনিস অন্যজনের কাছে চাইতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অধিক মর্যাদাবান আর কে আছে? সর্বোপরি এটি প্রমাণিত হলো যে, অজু করার জন্য অন্যের কাছে পানি চাওয়া ওয়াজিব। তবে জাহিরী ইবারতে যদিও মাসআলাটির ব্যাপারে ইমাম আবূ হানিফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট পানি চাওয়ার পূর্বে তায়াম্মুম করা বৈধ এবং সাহেবাইন (র.)-এর নিকট পানি চাওয়ার পূর্বে তায়াম্মুম করা বৈধ এবং সাহেবাইন (র.)-এর নিকট পানি চাওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো মতানৈক্য নেই। কারণ, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.) এতে একমত যে, যদি পানি চাওয়ার পূর্বে এ ধারণা হয় যে, পানি দেবে না তবে পানি চাইবে না। ফতোয়া সাহেবাইন (র.)-এর অভিমতের উপর।

وَفِى الزِّيَادَاتِ اَنَّ الْمُتَيَمِّمَ الْمُسَافِرَ اِذْ رَأَى مَعَ رَجُلٍ مَاءً كَثِيْرًا وَ هُوَ فِى الصَّلٰوةِ وَغَلَبَ عَلٰى ظَنِّهِ اَنَّهُ لَا يُعْطِيْهِ اَوْشَكَ مَضٰى عَلٰى صَلَاتِهِ لِاَنَّهُ صَحَّ شُرُوْعُهُ فَلَا يَقْطَعُ بِالشَّكِّ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ خَارِجَ الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَطْلُبْ وَتَيَمَّمَ حَيْثُ لَا يَحِلُّ لَهُ الشُّرُوْعُ بِالشَّكِّ فَاِنَّ الْقُدْرَةَ وَالْعَجْزَ مَشْكُوْكٌ فِيْهِمَا وَاِنْ غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهِ اَنَّهُ يُعْطِيْهِ قَطَعَ الصَّلٰوةَ وَطَلَبَ الْمَاءَ ثُمَّ قَالَ فِى الزِّيَادَاتِ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَسَأَلَهُ فَاَعْطَاهُ اَوْ اَعْطٰى بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ اِسْتَاْنَفَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَبٰى تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَكَذَا اِذَا اَبٰى ثُمَّ اَعْطٰى لٰكِنْ يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ الْاٰنَ اَقُوْلُ اِنْ اَرَدْتَّ اَنْ تَسْتَوْعِبَ الْاَقْسَامَ كُلَّهَا فَاعْلَمْ اَنَّهُ اِذَا رَأَى الْمَاءَ خَارِجَ الصَّلٰوةِ وَصَلّٰى وَلَمْ يَسْأَلْ بَعْدَ الصَّلٰوةِ لِيَظْهَرَ الْعَجْزُ اَوِ الْقُدْرَةُ فَعَلٰى مَا ذُكِرَ فِى الْمَبْسُوْطِ سَوَاءٌ غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهِ الْاِعْطَاءُ اَوْ عَدَمُهُ اَوْ شَكَّ فِيْهِمَا وَهِىَ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ ـ

অনুবাদ : যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, তায়াম্মুমকারী মুসাফির যদি নামাজে থাকাবস্থায় কোনো ব্যক্তির কাছে অধিক পানি দেখে এবং প্রবল ধারণা হয় যে, সে পানি দেবে না, কিংবা [পানি দেওয়া ও না দেওয়ার মধ্যে] সন্দেহ হয় তবে স্বীয় নামাজ আদায় করে নেবে। কেননা, তার নামাজের সূচনাটা সহীহ। অত্র সন্দেহের দ্বারা তা ভঙ্গ করবে না। পক্ষান্তরে যদি সে নামাজের বাইরে থাকে, পানি না চায় এবং তায়াম্মুম করে ফেলে [তাহলে উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ শুরু করা জায়েজ নেই।] কারণ, সন্দেহের মাধ্যমে নামাজ শুরু করা জায়েজ নেই। কেননা, [পানি পেতে] সক্ষম হওয়া বা অক্ষম হওয়া উভয় ক্ষেত্রে সন্দেহ । আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, পানি দেবে তবে নামাজ ছেড়ে দেবে এবং পানি চাইবে।

অতঃপর যিয়াদাত গ্রন্থে [উক্ত গ্রন্থের লেখক] বলেন, যখন নামাজ থেকে অবসর হয়ে পানি চায় এবং পানিও দেয় কিংবা উচিত মূল্যের বিনিময়ে পানি দেয় এমতাবস্থায় তায়াম্মুমকারী মুসল্লি ন্যায্য মূল্যে পানি ক্রয় করতে সক্ষম হয়, তবে সে নামাজ নতুন করে আদায় করবে। আর যদি [পানি দিতে] অস্বীকার করে তবে তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি [সে প্রথমে পানি দিতে] অস্বীকার করে, অতঃপর দেয় [তবে তার নামাজ হয়ে যাবে]। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় তখন তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। [শারেহ (র.)] বলেন যে, আমি বলি– যদি তুমি [মাবসূত ও যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লিখিত] সমস্ত প্রকার একত্রে [পেতে] চাও তবে শুন! যখন মুসাফির ব্যক্তি নামাজের বাইরে পানি দেখে এবং তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করে ফেলে এবং নামাজের পরেও পানি না চায় যে, [পানি পেতে] অক্ষম বা সক্ষম প্রকাশ পাবে, তবে এর হুকুম হবে সেটিই যেটি মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। [অর্থাৎ তার নামাজ আদায় হবে না।] চাই তার পানি দেওয়ার প্রবল ধারণা হোক কিংবা পানি না দেওয়ার প্রবল ধারণা হোক, কিংবা দেওয়া ও না দেওয়ার মাঝে সন্দেহ হোক। এটি মতন (مَتَنْ) -এর মাসআলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْشَكَّ مَضٰى عَلٰى صَلَاتِهٖ : অর্থাৎ সঙ্গীর কাছে পানি চাইলে সঙ্গী পানি দিতেও পারে, আবার নাও দিতে পারে। ধারণা কোনো দিকেই প্রবল হয় না যে, দেবে বা দেবে না। একেই বলা হয় شَكٌّ আর যদি দুদিকের কোনো একদিকে মন টানে তবে তা হবে ظَنٌّ -আর যদি অধিক পরিমাণে টানে তবে তা হবে ظَنٌّ غَالِبٌ - উক্ত ظَنٌّ -এর বিপরীত দিককে وَهْمٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ خَارِجَ الخ : যদি কেউ নামাজের বাইরে পানি দেখে পানি না চেয়ে তায়াম্মুম করে নেয়, তবে তার তায়াম্মুম জায়েজ হবে না। কেননা, এখানে সে পানির উপর সক্ষম না অক্ষম এতে সন্দেহ রয়েছে। কারণ, সে পানি চায়নি, তাই বুঝাও যায়নি যে, সে পানি দেবে কি দেবে না। আর যেহেতু উভয় দিকে সন্দেহ রয়েছে সেহেতু এ সন্দেহের উপর নির্ভর করে তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। হ্যাঁ যদি অক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে জায়েজ।

قَوْلُهُ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهٖ فَسَأَلَهُ : অর্থাৎ তায়াম্মুমকারী মুসল্লি নামাজে পানি দেখেছে এবং তার প্রবল ধারণা হয়েছে যে, পানি দেবে না, কিংবা দেওয়া ও না দেওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়েছে তাই নামাজ পরিপূর্ণ করে ফেলেছে, অতঃপর নামাজ শেষে সে পানি চেয়েছে এবং তাকে পানি দিয়েছে কিংবা সাধারণ মূল্যের বিনিময়ে পানি দেয়– এমতাবস্থায় সে এ দামে পানি কিনতে সক্ষম তবে এর হুকুম হচ্ছে, তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে এবং পুনরায় নামাজ পড়তে হবে। কেননা, সে পানির উপর সক্ষম এবং তার এ সক্ষমতাটা ইতঃপূর্বেও ছিল, যা সে না চাওয়ার কারণে প্রকাশ পায়নি।

قَوْلُهُ وَكَذَا اِذَا اَبٰى ثُمَّ اَعْطٰى : এ ইবারতের عَطْف তার পূর্বের عِبَارَةُ تَمَّتْ صَلَاتُهُ -এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ নামাজ থেকে অবসর হওয়ার পর যদি পানি চায় আর পানিদাতা পানি দিতে অস্বীকার করে তবে তার নামাজ হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি সে প্রথমে নিষেধ করে অতঃপর পানি দেয়, তবে তার নামাজ হয়ে যাবে। কেননা, পানিদাতা যখন প্রথমে অস্বীকার করে ফেলেছে তখনই তার অক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে গেছে এবং নামাজও সহীহ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যেহেতু এখন সে পানির উপর সক্ষম হয়ে গেছে সেহেতু এখন তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে।

قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ فِيْهِمَا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ : অর্থাৎ যদিও পানি দেওয়া ও না দেওয়ার মধ্যে বরাবর সন্দেহ হয়, কিংবা পানি দেবে বলে প্রবল ধারণা হয়, কিংবা দেবে না বলে প্রবল ধারণা হয়– সর্বাবস্থায়ই তার নামাজ হবে না। কারণ, সে নামাজের আগে পানি পেয়েও পানি চায়নি এবং নামাজের পরেও চায়নি যার দ্বারা তার সক্ষমতা ও অক্ষমতা প্রমাণিত হতো। অথচ পানি ব্যাপকভাবে খরচ করা হয়। এমন জরুরতের জন্য পানি চাওয়াতেও কোনো অসুবিধা নেই। অতএব, তার জন্য পানি চাওয়া আবশ্যক। যেন তার অক্ষমতা ও সক্ষমতা প্রমাণিত হয়ে যায়।

وَإِذَا رَأَى فِي الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَسْأَلْ بَعْدَهَا فَكَذَا وَإِنْ رَأَى خَارِجَ الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَسْأَلْ وَصَلّٰى ثُمَّ سَأَلَهُ فَإِنْ أَعْطٰى بَطَلَتْ صَلٰوتُهُ وَإِنْ أَبٰى تَمَّتْ سَوَاءٌ ظَنَّ الْإِعْطَاءَ أَوِ الْمَنْعَ أَوْ شَكَّ فِيهِمَا وَإِنْ رَأَى فِي الصَّلٰوةِ فَكَمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ لٰكِنْ يَبْقٰى صُوْرَتَانِ أَحَدُهَا أَنَّهُ قَطَعَ الصَّلٰوةَ فِيمَا إِذَا ظَنَّ الْمَنْعَ أَوِ الشَّكَّ فَسَأَلَهُ فَإِنْ أَعْطٰى بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَإِنْ أَبٰى فَهُوَ بَاقٍ وَالْأُخْرٰى أَنَّهُ إِذَا أَتَمَّ الصَّلٰوةَ فِيمَا إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ يُعْطِي ثُمَّ سَأَلَ فَإِنْ أَعْطٰى بَطَلَ صَلٰوتُهُ وَإِنْ أَبٰى تَمَّتْ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ ظَنَّهُ كَانَ خَطَأً بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ التَّحَرِّي لِأَنَّ الْقِبْلَةَ حِينَئِذٍ جِهَةُ التَّحَرِّي إِصَالَةً وَهٰهُنَا الْحُكْمُ دَائِرٌ عَلٰى حَقِيقَةِ الْقُدْرَةِ وَالْعِجْزِ فَأُقِيمَ غَلَبَةُ الظَّنِّ مَقَامَهُمَا تَيْسِيرًا فَإِذَا ظَهَرَ خِلَافُهُ لَمْ يَبْقَ قَائِمًا مَقَامَهُمَا .

অনুবাদ : যখন তায়াম্মুমকারী মুসল্লি নামাজে পানি দেখে এবং নামাজের পরে পানি চায় না তখন এর হুকুমও অনুরূপ [নামাজ জায়েজ হবে না]। আর যদি নামাজের বাইরে [শুরু করার আগে] পানি দেখে এবং পানি না চায়; বরং তায়াম্মুম দ্বারাই নামাজ পড়ে নেয়, অতঃপর পানি চায় এবং যদি পানি দেয় তবে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। যদি পানি দিতে অস্বীকার করে তবে তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে। চাই তার দেওয়ার ধারণা হোক, কিংবা না দেওয়ার ধারণা হোক, কিংবা দেওয়া ও না দেওয়ার ক্ষেত্রে বরাবর সন্দেহ হোক। যদি নামাজে পানি দেখে তবে এর সে হুকুমই হবে, যা যিয়াদাতে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু দুটি সুরত অবশিষ্ট রয়ে গেছে। ১. তায়াম্মুমকারী [নামাজি ব্যক্তি] যখন নামাজে থাকাবস্থায় পানি না দেওয়ার ধারণায় কিংবা [পানি দেওয়া ও না দেওয়ার] সন্দেহে নামাজ ছেড়ে দেয় এবং পানি চায়, তখন যদি সে পানি দেয় তবে তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে [পানি দিতে] অস্বীকার করে তবে তার তায়াম্মুম অবশিষ্ট থাকবে। ২. সে যখন পানি দেওয়ার ধারণায় নামাজ পূর্ণ করেছে, অতঃপর [নামাজ শেষে] পানি চেয়েছে তখন যদি সে পানি দেয় তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি পানি দিতে অস্বীকার করে তবে [তার] নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। কেননা, প্রকাশিত হয়েছে যে, তার ধারণা ভুল ছিল। تَحَرِّيْ-এর মাসআলা এর পরিপন্থি। কেননা, তখন মূলত (إِصَالَةً) তাহার্‌রীর দিকই কিবলার দিক হয়। আর এখানে [তায়াম্মুম জায়েজ হওয়া ও না হওয়ার বিবরণে] হুকুম আরোপিত হয় পানির উপর সক্ষম ও অক্ষম হওয়ার উপর। তাই সহজের জন্য প্রবল ধারণাকে সক্ষম ও অক্ষম হওয়ার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। তবে যখন এর পরিপন্থি বিষয় [তথা পানি না দেওয়া] প্রকাশ পেয়ে গেছে তখন আর 'প্রবল ধারণা' সক্ষম ও অক্ষম হওয়ার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে অবশিষ্ট থাকেনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْطٰى بَطَلَتْ صَلٰوتُهُ الخ : অর্থাৎ যদি নামাজের বাইরে তথা নামাজের পূর্বে পানি দেখে এবং পানি না চায়; বরং তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে নেয়, অতঃপর নামাজ শেষে পানি চায় আর সে পানি দেয় তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা, এখন জানা হয়েছে যে, সে পানির উপর সক্ষম ছিল এবং ভুল তারই হয়েছে যে, সে পানি চায়নি। তাই এখন যেহেতু সে পানির উপর সক্ষম হয়েছে তাই সে নতুনভাবে অজু করে নামাজ পড়বে। তবে যদি পানি দিতে অস্বীকার করে তাহলে তার নামাজ হয়ে যাবে। কেননা, এখন তার অক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তার ধারণা হয়ে থাকে যে, পানি দেবে, কিংবা দেবে না, কিংবা দেওয়া ও না দেওয়া বরাবর সন্দেহ হয়। পানি যেহেতু দিচ্ছে না সেহেতু এ ধারণার কোনো মূল্য নেই।

কিন্তু যদি নামাজে থাকাবস্থায় পানি দেখে আর প্রবল ধারণা হয় যে, চাইলে পানি দেবে তবে সে নামাজ ছেড়ে দিয়ে পানি চাইবে। অন্যথায় নামাজ ছাড়বে না। যেমনটি যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ إِنَّهُ إِذَا أَتَمَّ الصَّلٰوةَ فِيْمَا إِذَا ظَنَّ الخ : অর্থাৎ পানি চাইলে পানি দেবে এ ধারণা থাকা সত্ত্বেও সে নামাজ পূর্ণ করেছে এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সে অজ্ঞতা ও না জানার কারণে নামাজ পূর্ণ করেছে। অন্যথায় তার উপর নামাজ ছেড়ে দিয়ে পানি চাওয়া আবশ্যক ছিল, অথচ সে নামাজ ছাড়েনি। তাই তার উপর পুনরায় অজু করে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। শর্ত হলো, নামাজের পর পানি চাইলে পানি দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি পানি দিতে অস্বীকার করে তবে তার তায়াম্মুমও ভাঙ্গবে না এবং নামাজও সহীহ থাকবে। কারণ, এখন প্রকাশ পেয়েছে যে, তার ধারণাটা ছিল সম্পূর্ণই ভুল।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ التَّحَرِّى : এ ইবারতটি মূলত একটি উহ্য প্রশ্ন (سُوَالٌ مُقَدَّرٌ)-এর উত্তর। **প্রশ্ন :** প্রশ্নটির সারমর্ম হচ্ছে, যদি নামাজি ব্যক্তির কাছে কিবলার দিক কোনটি সন্দেহ হয় তবে সে তাহার্‌রী [চিন্তা] করে কিবলার দিক নির্ধারণ করে নেবে এবং সে দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করবে। কিন্তু নামাজ শেষে যদি জানতেও পারে যে, মূলত কিবলার দিক এটি ছিল না; বরং তা ছিল অন্য দিক, তবুও তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে এবং দোহরানোর প্রয়োজন নেই। [এ তাহার্‌রীর মাসআলার আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।] অথচ একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তার ধারণা সম্পূর্ণই ভুল ছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পানির ক্ষেত্রে ধারণা ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর তা অগ্রাহ্য হবে বলা হয়েছে, আর কিবলার তাহার্‌রীর মাসআলায় ধারণা ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর তা গ্রাহ্য হবে বলা হয়েছে। তো এ দুটি মাসআলার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : কিবলার দিক নিয়ে সন্দেহ হলে তাহার্‌রী (تَحَرِّىْ) -এর দিক কিবলা হয়। তাই তার জন্য تَحَرِّىْ -এর দিকে মুখ করে নামাজ পড়া আবশ্যক। কারণ সেখানে ধারণা ভুল প্রমাণিত হওয়া ক্ষতিকর কিছু নয়। কিন্তু আমাদের আলোচিত মাসআলার হুকুমের ভিত্তি হচ্ছে, পানি দেওয়া ও না দেওয়ার পরিস্থিতিতে সে প্রকৃতপক্ষে পানির উপর সক্ষম হওয়া ও অক্ষম হওয়ার উপর। সহজ করার জন্য "প্রবল ধারণা (ظَنٌّ غَالِبٌ) -কে সক্ষম (قُدْرَةٌ) ও অক্ষম (عِجْزٌ)-এর স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আর যখন এর পরিপন্থি বিষয়টি [তথা পানি না দেওয়ার বিষয়টি] সুস্পষ্ট হয়ে গেছে তখন আর "প্রবল ধারণা" (ظَنٌّ غَالِبٌ) -এর স্থলাভিষিক্ত বাকি থাকেনি। এটিই কারণ যে, যখন ধারণার পরিপন্থি বিষয় প্রকাশ পেয়ে গেছে তখন আর এর গ্রহণযোগ্যতা বাকি থাকেনি।

وَيُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوْءِ
وَقُدْرَتُهُ عَلَى مَاءٍ كَافٍ لِطُهْرِهِ حَتّٰى إِذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ عَدِمَهُ أَعَادَ
التَّيَمُّمَ وَإِنَّمَا قَالَ كَافٍ لِطُهْرِهِ حَتّٰى إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ وَلَمْ يَصِلِ الْمَاءُ لَمْعَةَ ظَهْرِهِ
وَفَنِيَ الْمَاءُ وَاَحْدَثَ حَدَثًا يُوْجِبُ الْوُضُوْءَ فَتَيَمَّمَ لَهُمَا ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيْهِمَا
بَطَلَ تَيَمُّمُهُ فِيْ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكْفِ لِاَحَدٍ بَقِيَ فِيْ حَقِّهِمَا وَإِنْ كَفٰى
لِاَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ غَسَلَهُ وَيَبْقَى التَّيَمُّمُ فِيْ حَقِّ الْاٰخَرِ وَإِنْ كَفٰى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا
غَسَلَ اللَّمْعَةَ لِاَنَّ الْجَنَابَةَ اَغْلَظُ فَاِذَا غَسَلَ اللَّمْعَةَ هَلْ يُعِيْدُ التَّيَمُّمَ لِلْحَدَثِ فَفِيْهِ
رِوَايَتَانِ وَإِنْ تَيَمَّمَ اَوَّلًا ثُمَّ غَسَلَ اللَّمْعَةَ فَفِيْ اِعَادَةِ التَّيَمُّمِ رِوَايَتَانِ اَيْضًا وَإِنْ صَرَفَ اِلَى
الْحَدَثِ اِنْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ فِيْ حَقِّ اللَّمْعَةِ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَتَيْنِ هٰذَا اِذَا تَيَمَّمَ لِلْحَدَثَيْنِ
تَيَمُّمًا وَاحِدًا اَمَّا اِذَا تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ اَحْدَثَ فَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَكَذَا فِيْ
الْوَجْهِ الْمَذْكُوْرَةِ وَإِنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ اَحْدَثَ وَلَمْ يَتَيَمَّمْ لِلْحَدَثِ فَوَجَدَ الْمَاءَ فَاِنْ كَفٰى
اللَّمْعَةَ وَالْوُضُوْءَ فَظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَكْفِ لِاَحَدٍ لَا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ فَيَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ فِي
اللَّمْعَةِ تَقْلِيْلًا لِلْجَنَابَةِ وَيَتَيَمَّمُ لِلْحَدَثِ وَإِنْ كَفَى اللَّمْعَةَ لَا الْوُضُوْءَ اِنْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ
وَيَغْسِلُ اللَّمْعَةَ وَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ وَإِنْ كَفٰى لِلْوُضُوْءِ لَا لِلَّمْعَةِ فَتَيَمُّمُهُ بَاقٍ وَعَلَيْهِ
الْوُضُوْءُ وَإِنْ كَفٰى لِكُلِّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدًا يَصْرِفُهُ إِلَى اللَّمْعَةِ وَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ ـ

অনুবাদ : তায়াম্মুম দ্বারা ফরজ ও নফল নামাজের যা ইচ্ছা আদায় করবে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। যেসব জিনিস অজুকে ভঙ্গ করে তা তায়াম্মুমকেও ভঙ্গ করে। তায়াম্মুমকারী এ পরিমাণ পানির উপর সক্ষম হওয়াও [তায়াম্মুম ভঙ্গ করে] যা পবিত্রতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট হয়। এমনকি যদি পানির উপর সক্ষম হয় এবং অজু না করে, অতঃপর [আবার] পানিশূন্যতা দেখা দেয় তবে তায়াম্মুম পুনরায় করতে হবে। গ্রন্থকার (র.) كَافٍ لِطُهْرِهِ এজন্য বলেছেন যে, যদি পানি যথেষ্ট না হয় তবে তায়াম্মুম ভাঙ্গবে না এমনকি যখন [কোনো] জুনূবী ব্যক্তি গোসল করে, আর তার পিঠের কোনো অংশে পানি না পৌঁছে এবং পানি শেষ হয়ে যায়, অতঃপর এমন হদস যুক্ত হয়েছে যা অজুকে ওয়াজিব করে তবে অজু ও গোসলের জন্য তায়াম্মুম করবে। অতঃপর যদি এ পরিমাণ পানি পায় যে, [তার গোসলের শুষ্ক অংশ ও অজু] উভয়টির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে তার তায়াম্মুম অজু ও গোসলের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি [পানি] দুটির কোনো একটির জন্যও যথেষ্ট না হয়, তবে উভয়টির ক্ষেত্রেই তায়াম্মুম বাকি থাকবে। যদি [পানি] দুটির নির্দিষ্ট একটির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে তা ধৌত করবে এবং অপরটির ক্ষেত্রে তায়াম্মুম বাকি থাকবে। আর যদি দুটির প্রত্যেকটির জন্য পৃথকভাবে যথেষ্ট হয়, তবে [গোসলের অবশিষ্ট] শুষ্ক অংশটি ধৌত করে নেবে। কেননা, জানাবাত অধিক গাঢ়।

অতএব, যখন সে [তার] শুষ্ক অংশটি ধৌত করবে তখন কি হদসের জন্য সে তায়াম্মুমকে দোহরাবে? এতে দু-ধরনের বর্ণনা রয়েছে। আর যদি প্রথমে তায়াম্মুম করে, অতঃপর শুষ্ক অংশ ধৌত করে তবে এ অবস্থায়ও তায়াম্মুম দোহরানোর ক্ষেত্রে দু-ধরনের বর্ণনা রয়েছে। যদি সে হদস দূরীভূত করার জন্য পানি ব্যয় করে তবে উভয় বর্ণনার সম্মতিক্রমে শুষ্ক অঙ্গের ক্ষেত্রে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। এ বিস্তারিত বিবরণ তখনই [প্রযোজ্য] যখন উভয় হদসের জন্য সে এক তায়াম্মুম করবে। কিন্তু যখন [শুধু] জানাবাতের জন্য তায়াম্মুম করবে, অতঃপর হদস [অজু ভঙ্গের কারণ] যুক্ত হয়, এরপর হদসের জন্য তায়াম্মুম করে, অতঃপর পানি পায় তবে উল্লিখিত বিষয়সমূহে হুকুম অনুরূপই। আর যদি জানাবাতের জন্য তায়াম্মুম করে থাকে, অতঃপর হদস যুক্ত হয় এবং তায়াম্মুম না করে, তারপর পানি পায় তবে যদি তা শুষ্ক অংশ ও অজুর জন্য যথেষ্ট হয় তবে এর হুকুম স্পষ্ট [যে, তায়াম্মুম বাকি থাকবে না; বরং শুষ্ক অংশ ধৌত এবং অজু করতে হবে]। আর যদি কোনো একটির জন্যও যথেষ্ট না হয়, তবে তায়াম্মুম ভাঙ্গবে না। তবে জানাবাতকে হ্রাস করার জন্য পানিটুকু শুষ্ক অঙ্গে ব্যবহার করবে এবং হদসের জন্য তায়াম্মুম করবে। যদি পানি শুষ্ক অঙ্গের জন্য যথেষ্ট হয়, কিন্তু অজুর জন্য নয়, তবে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে এবং [পানি দ্বারা] শুষ্ক অঙ্গ ধৌত করবে এবং হদসের জন্য তায়াম্মুম করবে। যদি উক্ত পানি অজুর জন্য যথেষ্ট হয়, শুষ্ক অঙ্গের জন্য নয়, তবে তার [জানাবাতের] তায়াম্মুম বাকি থাকবে এবং তার উপর অজু করা ওয়াজিব। আর যদি উক্ত পানি প্রত্যেকটির জন্য পৃথকভাবে যথেষ্ট হয়, তবে তা শুষ্ক অংশে ব্যবহার করবে এবং হদসের জন্য তায়াম্মুম করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيُصَلِّيْ بِهٖ مَاشَاءَ مِنْ فَرْضٍ الخ :

এক তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক ফরজ ও নফল নামাজ পড়া বৈধ : এক তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক ফরজ ও নফল নামাজ আদায় করা যাবে কিনা? এ নিয়ে আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আমাদের মতে এক তায়াম্মুম দ্বারা অনেক নামাজ আদায় করা জায়েজ। চাই তা ফরজ নামাজ হোক কিংবা নফল নামাজ হোক, এক ওয়াক্তে আদায় করা হোক কিংবা একাধিক ওয়াক্তে আদায় করা হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত তার তায়াম্মুম ভঙ্গকারী কোনো কিছু না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার তায়াম্মুম বাকি থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এক তায়াম্মুম দ্বারা এক ফরজ নামাজ আদায় করা যাবে দ্বিতীয় কোনো ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য দ্বিতীয়বার তায়াম্মুম করা জরুরি। তবে তাঁর মতে এক তায়াম্মুম দ্বারা অনেক নফল নামাজ আদায় করা যাবে।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হচ্ছে, তায়াম্মুম হলো জরুরি অবস্থার তাহারাত। সুতরাং জরুরি অবস্থা অর্থাৎ ফরজ নামাজ আদায় হয়ে গেলে তার জরুরতও শেষ হয়ে যায়। অতএব, তখন তার তায়াম্মুমও ভেঙ্গে যাবে। এখন যদি সে অন্য ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে চায় তখন আবার জরুরত দেখা দিল ফলত তার এজন্য আবার তায়াম্মুম করতে হবে। আমাদের দলিল হলো, পানির অনুপস্থিতিতে মাটি مُطْلَقًا তাহারাত বা পবিত্রকারী। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَلتُّرَابُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ "মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী বস্তু"। অন্যত্র বলেছেন– جُعِلَتِ الْاَرْضُ لَنَا مَسْجِدًا وَ طُهُوْرًا "মাটিকে আমাদের জন্য মসজিদ ও পবিত্রকারী বস্তু বানানো হয়েছে।"

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) **[ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে জবাব] :** ইমাম শাফেয়ী (র.) যে মাটিকে জরুরি অবস্থায় শুধু পবিত্রকারী বলেন কথাটি ঠিক নয়। কেননা, এটি শুধু দাবি মাত্র। অন্যথায় পানির অনুপস্থিতে মাটি যে مُطْلَقًا পবিত্রকারী বস্তু তা হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া পুনরায় তায়াম্মুম করার মধ্যে অসুবিধা রয়েছে। অথচ এ অসুবিধাকে দূর করার জন্যই তায়াম্মুম অনুমোদিত হয়েছে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) এক তায়াম্মুম দ্বারা কয়েক নফল নামাজ করা জায়েজ বলেন, অথচ নফল ও ফরজ নামাজ পবিত্রতার শর্তের ক্ষেত্রে বরাবর।

❖ **তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ :** বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যে সকল বস্তু অজু ভঙ্গকারী সেগুলো তায়াম্মুমও ভঙ্গকারী। দলিল হচ্ছে, তায়াম্মুম হলো অজুর খলিফা। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আসল (اَصْلٌ) খলিফা থেকে শক্তিশালী হয়। সুতরাং যে সকল বস্তু শক্তিশালীর জন্য ভঙ্গকারী সেগুলো দুর্বল তথা তায়াম্মুম ভঙ্গকারীও বটে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, কিছু বস্তু এমনও রয়েছে যেগুলোর দ্বারা অজু ভাঙ্গে না, কিন্তু তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়। যেমন, তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি যদি পানি দেখে এবং পানি ব্যবহারে সে সক্ষমও বটে তবে এ পানি তার তায়াম্মুম ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে। শর্ত হলো, পানি অজুর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ হতে হবে। কেননা, যখন প্রথমেই স্বল্প পানি থাকলে তায়াম্মুম জায়েজ অর্থাৎ স্বল্প পানি ধর্তব্য নয় তখন শেষ অবস্থায়ও তা ধর্তব্য নয়।

قَوْلُهُ عَلٰى مَاءٍ كَافٍ لِطُهْرِهِ الخ : এ ইবারত এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অজুর প্রত্যেক অঙ্গ কমপক্ষে এক একবার করে ধৌত করার পরিমাণ পানি হলেই যথেষ্ট। অতএব, যদি কেউ পানি পেয়ে প্রত্যেক অঙ্গকে তিন তিনবার করে ধৌত করতে শুরু করে এবং অজু সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই পানি শেষ হয়ে যায় তবে দেখা হবে যে, যে পরিমাণ পানি ছিল তা দ্বারা যদি তার অজুর অঙ্গসমূহকে একবার করে ধৌত করা হতো তবে তার অজু পূর্ণ হয়ে যেত তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। খুলাসাতুল ফতোয়াতে এমনই উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَلِمَنْ يَصِلِ الْمَاءَ لَمْعَةَ ظَهْرِهِ : মূলত لَمْعَةٌ বলা হয় শরীরের ঐ অংশকে যা অজু কিংবা গোসলে ভুলে শুষ্ক থেকে যায়। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে لَمْعَةَ ظَهْرِهِ 'পিঠের শুষ্ক অংশ'। কেননা, সাধারণত পিঠের কিছু অংশ শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা থাকে। অন্যথায় শুষ্ক থাকা অংশ শুধু পিঠের সাথে খাস নয়। যদি কারো অন্য অঙ্গে শুষ্ক অংশ থাকে তবে তাকেও لَمْعَةٌ বলা হবে।

قَوْلُهُ حَتّٰى إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ وَلَمْ يَصِلِ الْمَاءَ : এখানে শারেহ (র.) মাসআলার কতিপয় সুরত বর্ণনা করেছেন। যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে–

১. জুনুবী ব্যক্তি যদি গোসল করে, তার অঙ্গের একাংশ শুষ্ক থেকে যায়, পানিও শেষ হয়ে যায়, অতঃপর তার থেকে এমন হদস সংঘটিত হয় যা অজু ওয়াজিব করে তবে সে উভয় হদসের জন্য তায়াম্মুম করবে। অতঃপর যদি সে এ পরিমাণ পানি পায় যে, তা শুষ্ক অংশ ও অজুর জন্য যথেষ্ট হয় তবে এ দুয়ের ক্ষেত্রেই তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে।
২. সে যে পরিমাণ পানি পেয়েছে তা যদি শুষ্ক অংশ ও অজুর কোনো একটির জন্যও যথেষ্ট না হয় তবে এ উভয় ক্ষেত্রেই তায়াম্মুম বাকি থাকবে। তার তায়াম্মুম ভাঙ্গবে না।
৩. যে পরিমাণ পানি সে পেয়েছে তা যদি শুষ্ক অঙ্গ ও অজুর যে-কোনো একটির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে যে ক্ষেত্রের জন্য যথেষ্ট হবে তা-ই ধৌত করবে এবং অপরটির ক্ষেত্রে তায়াম্মুম বাকি থাকবে।
৪. যে পরিমাণ পানি সে পেয়েছে তা যদি অনির্দিষ্ট ও পৃথকভাবে দুটির যে-কোনো একটির জন্য যথেষ্ট হয় তবে শুষ্ক অংশটি ধৌত করবে। কেননা, জানাবাতটি হচ্ছে হদসে আকবার, যা অধিক গাঢ় নাপাক। আর হদসে আসগার -এর ক্ষেত্রে তায়াম্মুম বাকি থাকবে।

قَوْلُهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : অর্থাৎ এ অবস্থায় যখন সে উক্ত পানি দ্বারা শুষ্ক অংশটি ধৌত করে নেয় তবে কি তার হদস-এর জন্য তায়াম্মুম করতে হবে? এর উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে।

১. পুনরায় তায়াম্মুম করবে না। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর রেওয়ায়েত। কারণ, সে যথেষ্ট পরিমাণ পানি পায়নি যা হদস দূরীভূতকারী। তাই হদস-এর ক্ষেত্রে তায়াম্মুমও বাতিল হয়নি।
২. তায়াম্মুম পুনরায় করবে। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর রেওয়ায়েত। কারণ, সে অজু করার পরিমাণ পানি পেয়ে গেছে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।

قَوْلُهُ فَفِى إِعَادَةِ التَّيَمُّمِ رِوَايَتَانِ : অর্থাৎ যে পরিমাণ পানি সে পেয়েছে তা যদি পৃথকভাবে দুই অঙ্গের যে-কোনো একটির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে সে তা দ্বারা শুষ্ক অঙ্গ ধৌত করবে। আর হদস-এর ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এখন উক্ত অবস্থায় যদি সে আগে তায়াম্মুম করে অতঃপর শুষ্ক অংশ ধৌত করে তবে তাকে তায়াম্মুম আবার দোহরাতে হবে কিনা এ ব্যাপারেও দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তায়াম্মুম পুনরায় করতে হবে না। কেননা, উক্ত পানি শুষ্ক অঙ্গে ধৌত করাই ওয়াজিব। তাই যেন শুরু থেকেই তার তায়াম্মুম ভঙ্গকারী কিছু পাওয়া যায়নি। ফলত এ ক্ষেত্রে তার তায়াম্মুমও বাতিল হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট তায়াম্মুম পুনরায় করবে। কেননা, সে অজুর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পানির উপর সক্ষম হয়ে গেছে। যতক্ষণ পানি থাকবে, ততক্ষণ তার তায়াম্মুমও নিষ্ফল থাকবে। যখন সে উক্ত পানিকে তার শুষ্ক অঙ্গে ব্যবহার করেছে তখন সে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি থেকে অক্ষম হওয়ার কারণে পুনরায় তায়াম্মুম করতে হবে।

قَوْلُهُ أَمَّا إِذَا تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ الخ : অর্থাৎ যদি সে পানি না থাকার কারণে প্রথমে জানাবাতের জন্য তায়াম্মুম করে এবং শুষ্ক অংশ বাকি থাকে, অতঃপর তার থেকে এমন হদস সংঘটিত হয় যা অজু আবশ্যককারী এবং এর জন্য পুনরায় তায়াম্মুম করে, অতঃপর পানি পেয়েছে তবে এর হুকুমও সেটিই যা প্রথম সূরতসমূহে ছিল। তথা পানি যদি এ পরিমাণ হয় যে, শুষ্ক অংশ ও অজুর জন্য যথেষ্ট হয় তবে উভয়ের ক্ষেত্রে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। যদি কোনোটির জন্যই যথেষ্ট না হয়, তবে উভয়ের ক্ষেত্রেই তায়াম্মুম বাকি থাকবে। আর যদি নির্দিষ্টভাবে একটির জন্য যথেষ্ট হয় তবে শুধু ঐ প্রকার হদসের ক্ষেত্রেই তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি পৃথকভাবে যে-কোনো একটির জন্য যথেষ্ট হয় তবে শুষ্ক অংশকেই ধৌত করবে।

قَوْلُهُ فَيَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ فِى اللَّمْعَةِ تَقْلِيْلًا الخ : অর্থাৎ পানি যদি এ পরিমাণ হয় যে, কোনো একটির জন্যও যথেষ্ট নয় তবে উভয়টির ক্ষেত্রেই তায়াম্মুম বাকি থাকবে। কিন্তু উক্ত পানি দ্বারা শুষ্ক অংশের যতটুকু সম্ভব ধুয়ে হ্রাস করবে। এটি আবশ্যক নয়; বরং তা করা উত্তম।

فَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ جَازَ وَيُعِيدُ التَّيَمُّمَ وَلَوْ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ وَلٰكِنْ بَدَأَ بِالتَّيَمُّمِ لِلْحَدَثِ ثُمَّ صَرَفَهُ إِلَى اللُّمْعَةِ هَلْ يُعِيدُ التَّيَمُّمَ أَمْ لَا فَفِيْ رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ يُعِيدُ وَفِيْ رِوَايَةِ الْأَصْلِ لَا ثُمَّ إِنَّمَا يَثْبُتُ الْقُدْرَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَصْرُوفًا إِلٰى جِهَةٍ أَهَمَّ حَتّٰى إِذَا كَانَ عَلٰى بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ يَصْرِفُهُ إِلَى النَّجَاسَةِ ثُمَّ الْقُدْرَةُ يَثْبُتُ بِطَرِيْقِ الْإِبَاحَةِ وَبِطَرِيْقِ التَّمْلِيْكِ فَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَيَمِّمِيْنَ لِيَتَوَضَّأْ بِهٰذَا الْمَاءِ أَيُّكُمْ شَاءَ عَلَى الْاِنْفِرَادِ وَالْمَاءُ يَكْفِيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدًا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُ كُلِّ وَاحِدٍ فَإِذَا تَوَضَّأَ بِهِ وَاحِدٌ يُعِيدُ الْبَاقُوْنَ تَيَمُّمَهُمْ لِثُبُوْتِ الْقُدْرَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ وَأَمَّا إِذَا قَالَ هٰذَا الْمَاءُ لَكُمْ وَقَبَضُوْا لَا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُمْ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ هِبَةَ الْمُشَاعِ يُوْجِبُ الْمِلْكَ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِشْتِرَاكِ فَيَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِقْدَارًا لَا يَكْفِيْهِ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبْقٰى عَلٰى مِلْكِ الْوَاهِبِ وَلَمْ يَثْبُتِ الْإِبَاحَةُ لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتِ الْهِبَةُ بَطَلَ مَا فِيْ ضِمْنِهَا مِنَ الْإِبَاحَةِ ثُمَّ إِنْ أَبَاحُوْا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ عِنْدَهُمَا لَا عِنْدَهُ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَمْلِكُوْهُ لَا يَصِحُّ إِبَاحَتُهُمْ لإردته حَتّٰى إِذَا تَيَمَّمَ الْمُسْلِمُ ثُمَّ ارْتَدَّ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَ يَصِحُّ صَلَاتُهُ بِذٰلِكَ التَّيَمُّمِ ـ

অনুবাদ : যদি পানি দ্বারা অজু করে [এবং শুষ্ক অংশ ধৌত না করে] তবে জায়েজ আছে। তবে [এ সুরতে] তায়াম্মুমকে দোহরাতে হবে। আর যদি পানি দ্বারা অজু না করে; বরং হদসের জন্য প্রথমে তায়াম্মুম করে, অতঃপর উক্ত পানিকে শুষ্ক অংশ ধৌত করার কাজে ব্যবহার করে, তবে এ সুরতে পুনরায় তায়াম্মুম করবে কিনা? এ ব্যাপারে যিয়াদাত গ্রন্থের বর্ণনা হলো– তায়াম্মুম পুনরায় করবে আর আসল [তথা মাবসূত] গ্রন্থের বর্ণনা হলো– পুনরায় তায়াম্মুম করবে না। অতঃপর তার পানির কুদরত ক্ষমতা তখনই প্রমাণিত হবে যখন [অজু ও শুষ্ক অংশ ধৌত করা দুটি দিকের] গুরুত্বপূর্ণ দিকে পানি খরচ করা আবশ্যক না হবে। এমনকি যদি [তার] শরীর কিংবা কাপড়ে নাপাকী থাকে তবে নাপাকী দূর করার জন্য পানি ব্যবহার করবে। অতঃপর কুদরত [দুই পদ্ধতি তথা] বৈধ ও মালিকানা পদ্ধতির দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুতরাং যদি পানির অধিকারী তায়াম্মুমকারী একদলকে বলে, তোমাদের যে কেউ চাও এককভাবে এ পানি দ্বারা তায়াম্মুম করবে, পানিও এ পরিমাণ আছে যে, এককভাবে প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে [তাদের] প্রত্যেকের তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। অতএব, যদি এ পানি দ্বারা একজন তায়াম্মুম করে, তবে অন্যান্যরা পুনরায় তায়াম্মুম করবে। কেননা, [তাদের] প্রত্যেকেরই এককভাবে [পানির উপর] কুদরত প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি পানির

অধিকারী বলে, এ পানি তোমাদের জন্য, আর তারা [উক্ত পানি] গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদের তায়াম্মুম ভাঙ্গবে না। সাহেবাইন (র.)-এর নিকট তায়াম্মুম এজন্য ভাঙ্গবে না যে, অবিভক্ত অংশের হিবা [দান] অংশীদারের পদ্ধতিতে মালিকানা সাব্যস্ত করে। ফলত [তারা] প্রত্যেকেই এ পরিমাণ পানির মালিক হয়েছে যা তার জন্য যথেষ্ট নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট বিশুদ্ধ [কথা] হলো, উক্ত পানি হিবাকারীর মালিকানায় বাকি থাকবে, তাই পানি মুবাহ [বা সকলের বৈধ] হবে না। [কেননা, তাঁর নিকট مُشَاعٌ তথা অবিভক্ত বস্তুর হিবা বাতিল।] কারণ, যখন হিবা বাতিল হয়ে গেছে তখন ঐ ইবাহাত [বৈধতা]ও বাতিল হয়ে গেছে যা হিবা-এর আওতাধীন ছিল। অতঃপর যদি তারা [সকলে উক্ত পানিকে] নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ করে দেয়, তবে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তায়াম্মুম ভাঙ্গবে না। কেননা, [হিবা বাতিল হওয়ার কারণে] যখন তারা পানির মালিক হয়নি তখন তাদের ইবাহাত [বৈধকরণ]-ও সহীহ হয়নি। রিদ্দাত [মুরতাদ হওয়া] তায়াম্মুম ভঙ্গকারী নয়। এমনকি যদি মুসলমান তায়াম্মুম করে মুরতাদ হয়ে যায় [নাউযুবিল্লাহ] অতঃপর মুসলমান হয়, তবে তার উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ আদায় করা সহীহ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ بَدَأَ بِالتَّيَمُّمِ لِلْحَدَثِ : এ মাসআলার সুরত হলো, পানি এ পরিমাণ পেয়েছে যে, শুষ্ক অংশ ও অজু দুটির কোনো একটির জন্য যথেষ্ট হয়, তা সে শুষ্ক অংশ ধৌত করার জন্য রেখে দিয়েছে এবং প্রথমে সে হদসে আসগারের জন্য তায়াম্মুম করেছে, তারপর সে পানি দ্বারা শুষ্ক অংশ ধৌত করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, শুষ্ক অংশ ধৌত করার পর হদসে আসগারের জন্য কৃত তায়াম্মুম কি আবার করতে হবে, না করতে হবে না? এ ব্যাপারে যিয়াদাত গ্রন্থের বর্ণনা হচ্ছে, সে তায়াম্মুমকে পুনরায় করবে। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব। তাঁর মাবসূত গ্রন্থের বর্ণনা হচ্ছে, পুনরায় তায়াম্মুম করবে না। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنَّمَا يَثْبُتُ الْقُدْرَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ : এ মাসআলার সুরত হলো, ঐ ব্যক্তি যার উপর অজুও ওয়াজিব এবং শুষ্ক অংশও ধোয়া বাকি রয়ে গেছে, তাছাড়া তার কাপড় কিংবা শরীরেও নাপাকী রয়েছে। তো এ অবস্থায় অজু ও গোসলের শুষ্ক অংশ ধৌত করা অজুর তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু যেহেতু তার কাপড়ে কিংবা শরীরে নাপাকী রয়েছে তাই এখন শুষ্ক অংশ ধোয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার করা ওয়াজিব নয়; বরং এ পানি দ্বারা শরীর কিংবা কাপড়ের নাপাকী দূর করা আবশ্যক, যা নামাজের জন্য বাধার কারণ। এ অবস্থায় শুষ্ক অংশ ও অজুর জন্য তায়াম্মুম করবে এবং পানি দ্বারা নাপাকী দূরীভূত করবে, যদি নাপাকী এ পরিমাণ হয় যা নামাজের জন্য প্রতিবন্ধক। পক্ষান্তরে যদি নাপাকী এ পরিমাণ হয় যা আল্লাহ মাফ করে দেন, তবে পানি নাপাকী দূর করার কাজে ব্যবহার করা আবশ্যক নয়। এর বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে।

قَوْلُهُ بِطَرِيْقِ الْإِبَاحَةِ وَبِطَرِيْقِ الخ : পানির উপর সক্ষম হওয়া শুধু পানির উপর নিজের মালিকানা থাকার উপর সীমাবদ্ধ নয়; বরং যদি কেউ অজু করার জন্য পানি মুবাহ করে দেয়, তবে এটিও পানির উপর সক্ষম বলে প্রমাণিত হবে। তবে মুবাহ ও মালিকানা এর পার্থক্য হচ্ছে, মালিকানাধীন পানির উপর তার ক্ষমতা ও দখল থাকে। তাই সে পানি বিক্রি, হিবা ইত্যাদি যা ইচ্ছা করতে পারবে। কিন্তু মুবাহ বস্তু দ্বারা শুধু উপকার হাসিল করার অধিকার সাব্যস্ত হয়। মালিকানাধীন বস্তুর ন্যায় তা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করতে পারবে না।

قَوْلُهُ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ الخ : এ মাসআলার সুরত হচ্ছে, পানির মালিক বলেছে যে, হে তায়াম্মুমকারীগণ! এ পানি আপনাদের জন্য। তো তারা সকলে পানি গ্রহণ করেছে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এর হুকুম হচ্ছে, তাদের কারোই তায়াম্মুম ভাঙ্গবে না। কিন্তু এ হুকুমের কারণ (عِلَّةٌ) সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। সাহেবাইন (র.)-এর নিকট এর কারণ হচ্ছে, অবিভক্ত

(مُشْتَرَكٌ) বস্তুর হিবা যদিও মালিকানার ফায়দা দেয় কিন্তু তা হয় অংশীদারভিত্তিক। তাই উল্লিখিত সুরতে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশের মালিক হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের অংশ এতো কম যে, এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যথেষ্ট নয়। মূলত যেন তাদের পানির উপর কুদরতই হাসিল হয়নি। তাই তাদের তায়াম্মুম বহাল থাকবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট কারণ হচ্ছে, তাঁর মতে এ ধরনের হিবা বিশুদ্ধ নয় এবং মালিকানারও ফায়দা দেয় না। তাই পানি এখনো হিবাকারীর মালিকানায় রয়েছে এবং সে পানির উপর সক্ষম হয়নি এবং তায়াম্মুম বহাল রয়েছে।

মূলত এ মাসআলার ভিত্তি এর উপর যে, যদি অবিভক্ত মুশতারাক বস্তু যদি এমন হয় যে, যদি একে বণ্টন করা হয়, তবে এর দ্বারা কোনো ফায়দা হবে না। যেমন– কলম, টুপি, অত্যন্ত ছোট স্থান ইত্যাদি। তবে সর্বসম্মতিক্রমে এর হিবা জায়েজ। আর হিবাকৃত বস্তুটি যদি এমন হয় যা বণ্টনযোগ্য তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট যতক্ষণ পর্যন্ত একে বিভক্ত না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত একে হিবা করা সহীহ হবে না। আর উক্ত বস্তু বিভক্ত করার প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করার পর তার অংশ পৃথক হয়ে যাবে। সাহেবাইন (র.)-এর নিকট হিবা যদিও মালিকানার ফায়দা দেয় কিন্তু যখন বিভক্ত করা ব্যতীত কোনো বস্তুকে যদি একত্রে হিবা করা হয়, যার মধ্যে কারো অংশই অজুর জন্য যথেষ্ট নয় তবে কারো তায়াম্মুমই ভাঙ্গবে না।

قَوْلُهُ فَالْاَصَحُّ اِنَّهُ يَبْقٰى عَلٰى مِلْكِ الْوَاهِبِ : এ ইবারতের অবস্থা দ্বারা বুঝা যায় যে, এতে মতানৈক্য রয়েছে। অতএব, ইসাব ইবনে ইউসুফ (র.) বর্ণনা করেন, অবিভক্ত বস্তুর হিবা ফাসিদ বা বাতিল এবং এ ফাসিদ বস্তুর উপরই দখল করার দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয়। কোনো কোনো মাশায়িখ এ অভিমতই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জাহিরী বর্ণনা মোতাবেক এর দ্বারা মালিকানা প্রমাণিত হয় না এবং একে ব্যবহার করাও বৈধ নয়।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتِ الْهِبَةُ بَطَلَ الخ : এটি একটি মন্তব্যের উত্তর। মন্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, "হিবা" দুটি বিষয়ের ফায়দা দেয়– ১. মালিকানা, ২. হিবাকৃত বস্তুর মাধ্যমে উপকার হাসিল করা বৈধ হওয়া। আর যেহেতু এটি অবিভক্ত জিনিসের "হিবা" তাই এতে মালিকানা প্রমাণিত হয় না, কিন্তু এর দ্বারা তো এটি আবশ্যক হয় না যে, এর থেকে উপকার হাসিলের বৈধতাও বাতিল হয়ে গেছে। তাই তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাওয়া উচিত। উত্তর হলো, এ প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণরূপে বৈধতা প্রমাণিত হয়; বরং বৈধতা 'হিবা'র অধীনে রয়েছে। আর যখন 'হিবাই বাতিল হয়ে গেছে তখন এর অধীনে আগত বিষয়ের হুকুমও বাতিল হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ لَارِدَّتُهُ حَتّٰى الخ : অর্থাৎ রিদ্দাত তথা মুরতাদ হওয়া তায়াম্মুম ভঙ্গকারী নয়। মাসআলার সুরত হলো, কোনো মুসলমান তায়াম্মুম করেছে, অতঃপর সে মুরতাদ হয়ে গেছে [নাউযুবিল্লাহ] তারপর আবার ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এ সময়ের মধ্যে তায়াম্মুম ভঙ্গকারী কোনো কিছু পাওয়া যায়নি, তবে তার ঐ তায়াম্মুম বাকি থাকবে। উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা তার নামাজ সহীহ হবে। এতে ইমাম যুফার (র.)-এর মতানৈক্য রয়েছে। তিনি বলেন, মুরতাদ হওয়ার কারণে তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে গেছে। এজন্য যে, কুফর তায়াম্মুমের বিপরীত। কেননা, তায়াম্মুম কিয়াসের পরিপন্থি শরিয়ত অনুমোদিত হয়েছে। আর কাফেরের মাঝে ইবাদত করার যোগ্যতা নেই।

এর উত্তর হলো, তায়াম্মুমের পর কুফরি আসার কারণে তায়াম্মুম তো উঠে গেছে, কিন্তু তায়াম্মুম দ্বারা যে পবিত্রতা হাসিল হয়েছে, তা বাকি রয়েছে। এ তাহারত [পবিত্রতা]-এর উপর কুফর আসাটা তাহারাতের পরিপন্থি নয়। যেরূপ অজুর পর কুফর আসার দ্বারা তার অর্জিত তাহারাত [পবিত্রতা] বাতিল হয় না। যদি এ প্রশ্ন করা হয় যে, আয়াত ও হাদীসসমূহের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুরতাদ হওয়ার দ্বারা পিছনের সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যায়, তবে মুরতাদের অজু ও তায়াম্মুম কিভাবে বাকি থাকে? উত্তর হলো, মুরতাদ হওয়ার দ্বারা আমলের ছওয়াব বাতিল হয়ে যায়; কিন্তু এটা নয় যে, এর উপর প্রমাণিত গুণ (وَصْفٌ) -ও বাতিল হয়ে যাবে।

وَنَدُبَ لِرَاجِيْهِ اَىْ لِرَاجِى الْمَاءِ اَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاتَهٗ اٰخِرَ الْوَقْتِ فَلَوْ صَلّٰى بِالتَّيَمُّمِ فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ لَا يُعِيْدُ الصَّلٰوةَ وَيَجِبُ طَلَبُهٗ قَدْرَ غَلْوَةٍ لَوْ ظَنَّهٗ قَرِيْبًا وَاِلَّا فَلَا اَلْغَلْوَةُ مِقْدَارُ ثَلٰثِمِائَةِ ذِرَاعٍ اِلٰى اَرْبَعِمِائَةٍ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهٗ اِذَا كَانَ الْمَاءُ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ اِلَيْهِ وَتَوَضَّأَ تَذْهَبُ الْقَافِلَةُ وَتَغِيْبُ عَنْ بَصَرِهٖ كَانَ بَعِيْدًا جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ قَالَ صَاحِبُ الْمُحِيْطِ هٰذَا حَسَنٌ جِدًّا وَلَوْ نَسِيَهٗ مُسَافِرٌ فِىْ رَحْلِهٖ وَصَلّٰى مُتَيَمِّمًا ثُمَّ ذَكَرَهٗ فِى الْوَقْتِ لَمْ يُعِدْ اِلَّا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَالْخِلَافُ فِيْمَا اِذَا وَضَعَهٗ بِنَفْسِهٖ اَوْ وَضَعَهٗ غَيْرُهٗ بِاَمْرِهٖ اَمَّا اِذَا وَضَعَهٗ غَيْرُهٗ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَدْ قِيْلَ يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ اِتِّفَاقًا وَقِيْلَ الْخِلَافُ فِى الْوَجْهَيْنِ كَذَا فِى الْهِدَايَةِ وَيَجِبُ اَنْ يَعْلَمَ اَنَّ الْمَانِعَ عَنِ الْوُضُوْءِ اِذَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ كَاَسِيْرٍ يَمْنَعُهُ الْكُفَّارُ عَنِ الْوُضُوْءِ اَوْ مَحْبُوْسٍ فِى السِّجْنِ وَالَّذِىْ قِيْلَ لَهٗ اِنْ تَوَضَّأْتَ قَتَلْتُكَ فَيَجُوْزُ لَهُ التَّيَمُّمُ لٰكِنَّ اِذَا زَالَ الْمَانِعُ يَنْبَغِىْ اَنْ يُعِيْدَ الصَّلٰوةَ كَذَا فِى الذَّخِيْرَةِ ـ

অনুবাদ : পানির আশাবাদীর জন্য মোস্তাহাব হলো, নামাজকে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করা। কিন্তু যদি [কেউ] তায়াম্মুম দ্বারা শুরু ওয়াক্তে নামাজ আদায় করে ফেলে অতঃপর ওয়াক্ত থাকতে থাকতে পানি পায় তবে নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে না। যদি ধারণা হয় যে, পানি নিকটেই আছে তবে তার জন্য এক "গুলওয়াহ" দূরত্ব পর্যন্ত পানি সন্ধান করা ওয়াজিব। অন্যথায় নয়। তিন থেকে চারশত গজের দূরত্বের পরিমাণকে এক "গুলওয়াহ" বলা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন পানি এত দূরে হয় যে, যদি পানির কাছে গিয়ে অজু করে তবে কাফেলা চলে যাবে এবং অদৃশ্যে চলে যাবে– তখন পানি দূরে বলে বিবেচিত হবে এবং তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। "اَلْمُحِيْطُ" গ্রন্থকার বলেন, এটি অত্যন্ত সুন্দর একটি অভিমত। যদি মুসাফির তার মালপত্রের সঙ্গে যে পানি রয়েছে সে সম্পর্কে ভুলে যায় এবং তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করে, অতঃপর ওয়াক্ত থাকতে থাকতে পানির কথা স্মরণ হয় তবে নামাজ পুনরায় পড়তে হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। মতানৈক্য ঐ সুরতে যখন পানি সে নিজে রাখবে কিংবা তার নির্দেশে অন্য কেউ রাখবে। পক্ষান্তরে যদি অন্য কেউ পানি রাখে অথচ সে জানে না তবে বলা হয়, সর্বসম্মতিক্রমে তখন তায়াম্মুম জায়েজ এবং এ-ও বলা হয় যে, উভয় সুরতেই মতানৈক্য রয়েছে। হিদায়া গ্রন্থে এমনই উল্লেখ রয়েছে। এ কথা জানা আবশ্যক যে, অজুর প্রতিবন্ধকতা যদি বান্দার পক্ষ থেকে হয় যেমন, [কাফেরদের হাতে] বন্দীকে কাফেররা অজু করতে না দেয়; কিংবা কারাগারে আবদ্ধ ব্যক্তিকে অজু করতে না দেয় এবং ঐ ব্যক্তি যাকে বলা হয়েছে, যদি তুমি অজু কর তবে তোমাকে হত্যা করা হবে– এ সকল লোকদের জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। কিন্তু যখন অজুর উক্ত প্রতিবন্ধক দূরীভূত হয়ে যাবে, তখন নামাজ পুনরায় আদায় করা উচিত। "যখীরা" নামক গ্রন্থে এ রকম উল্লেখ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَنَدُبَ لِرَاجِيْهِ الخ : অর্থাৎ যখন পানির উপর সক্ষম নয় তখন শুরু ওয়াক্তেই তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করা বৈধ। এজন্য পানি পাওয়ার আশাবাদী ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুমকে মোস্তাহাব ওয়াক্তের] শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব। তবে পানি পাওয়ার আশায় নামাজকে মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করা মোস্তাহাব এজন্য যে,

দুটি পবিত্রতার পূর্ণতম পবিত্রটি দ্বারা যেন নামাজ সম্পাদন করা যায়। অতএব, বিষয়টি জামাত পাওয়ার আশায় অপেক্ষমান ব্যক্তির ন্যায়। অর্থাৎ বিলম্বে নামাজ আদায় করলে জামাতের সাথে আদায় করা যাবে এ আশায়ও নামাজকে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করা মোস্তাহাব।

শায়খাইন (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পানি পাওয়ার আশায় নামাজকে বিলম্বিত করা ওয়াজিব। কেননা, প্রবল ধারণাও বাস্তবতুল্য। সুতরাং পানি বিদ্যমান থাকাবস্থায় যেমনিভাবে তায়াম্মুম করা জায়েজ নেই, তেমনিভাবে পানি পাওয়ার প্রবল ধারণা হলেও তায়াম্মুম করা যাবে না; বরং নামাজকে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করবে। যদি ওয়াক্তের ভিতরে পানি পাওয়া যায়, তবে তো ভলো। অন্যথায় তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করে নেবে।

قَوْلُهُ لَوْ ظَنَّهُ قَرِيْبًا وَاِلاَّ فَلاَ : যদি পানিহীন ব্যক্তি জনবসতী এলাকায় থাকে, তবে পানি তালাশ করা তার জন্য ওয়াজিব। কেননা, জনবসতী এলাকায় সাধারণত পানি পাওয়া যায়, তাই পানি তালাশ করা ওয়াজিব। যাতে করে পানি না থাকাটা স্পষ্ট হয় এবং তার অক্ষমতাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি সে মরুভূমিতে থাকে এবং নিকটে কোথাও পানি পাওয়ার ধারণা জাগে, তবে তার উপর পানি তালাশ করা ওয়াজিব নয়; হ্যাঁ তালাশ করা মোস্তাহাব মাত্র। পক্ষান্তরে যদি তার ধারণা হয় যে, পানি নিকটেই আছে তবে তালাশ করা ওয়াজিব। কেননা, শরিয়তে প্রবল ধারণা ধর্তব্য। যেরূপ আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। এখন যদি পানি তালাশ করা ব্যতীত তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ আদায় করে ফেলে, অতঃপর পানি তালাশ করে নামাজের ওয়াক্ত থাকাবস্থায় পানি পেয়ে যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে নামাজকে অজুর মাধ্যমে আবার আদায় করতে হবে। আর যদি পানি না পায় তবুও নামাজ পুনরায় পড়বে। কিন্তু এতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, নামাজ দোহরানো ওয়াজিব নয়।

قَوْلُهُ قَالَ صَاحِبُ الْمُحِيْطِ هٰذَا حَسَنٌ جِدًّا : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, পানি যদি এত দূরে হয় যে, যদি পানির কাছে যায় এবং অজু করে তবে তার কাফেলা দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে, তবে এটিও দূর বলে বিবেচিত হবে এবং তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। "اَلْمُحِيْطُ" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে উক্ত বর্ণনাটি হচ্ছে অত্যন্ত সুন্দর একটি বর্ণনা। কেননা, এ প্রক্রিয়াটি অধিক সহজ ও কষ্ট দূরীভূতকারী। কারণ, মুসাফির মরুভূমিতে একা হয়ে যাওয়া এবং কাফেলা দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া অত্যন্ত ভয়ানক ব্যাপার এবং এতে অনেক অসুবিধা হয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ نَسِيَهُ مُسَافِرٌ الخ : এখানে نِسْيَانٌ [ভুলে যাওয়া] শব্দটি ব্যবহার করে গ্রন্থকার شَكٌّ [সন্দেহ], وَهْمٌ [ধারণা] ইত্যাদি শব্দকে বের করে দিয়েছেন। এ কারণে যে, যদি পানি শেষ হয়ে যাওয়ার সন্দেহে সে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করে নেয়, অতঃপর পানি পায় অর্থাৎ পানি শেষ হয়ে যাওয়ার যে সন্দেহ ছিল তা দূর হয়ে গেছে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে নামাজকে দোহরাতে হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ فِى الْوَقْتِ : এ ইবারতে দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাজের ওয়াক্তে কিংবা ওয়াক্তের পরে পানির কথা স্মরণ হলে উভয় সুরতের হুকুম একই যে, নামাজ দোহরাতে হবে না। হ্যাঁ, যদি নামাজের মধ্যখানে পানির কথা স্মরণ হয়, তবে নামাজ ভেঙ্গে অজু করে নামাজ দোহরানো আবশ্যক।

قَوْلُهُ اِلاَّ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট নামাজ আদায়ের পর ওয়াক্তের মধ্যে পানির কথা স্মরণ হলে নামাজ পুনরায় পড়া আবশ্যক। এজন্য যে, যখন তার ব্যাগে পানি রয়েছে, তখন অবশ্যই সে পানির উপর সক্ষম। কেননা, ব্যাগ তার দখলেই রয়েছে। তাই তার ভুল-ত্রুটি ধর্তব্য নয়। এর উত্তর হচ্ছে, পানির উপর সক্ষম না হওয়ার কারণে তায়াম্মুম বৈধ হয়। আর এ কথা স্পষ্ট যে, পানি থাকা সম্পর্কে তার জানা না থাকার দরুন পানির উপর সে সক্ষম নয়, তাই তার ভুল-ত্রুটি ধর্তব্য।

قَوْلُهُ وَيَجِبُ اَنْ يَعْلَمَ اَنَّ الْمَانِعَ عَنْ الخ : তায়াম্মুমকে বৈধ করার যত ধরনের পদ্ধতি রয়েছে তা দু ভাগে বিভক্ত। ১. ঐ সমস্ত কারণ যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে যেমন– অসুস্থতা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, পিপাসার ভয় ইত্যাদি। এ সমস্ত সুরতে তায়াম্মুম করা বৈধ এবং এ সমস্ত কারণ নিঃশেষ হওয়ার পর নামাজ দোহরানো ওয়াজিব নয়। ২. ঐ সমস্ত কারণ যেগুলো বান্দাদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে যেমন– কাফেরের হাতে আটকে থাকাবস্থায় কাফের তাকে অজু করতে বারণ করে, কিংবা অজু করার দ্বারা তাকে হত্যা অথবা শাস্তির ভয় দেখায় তবে এ সমস্ত সুরতেও তায়াম্মুম করা বৈধ। তবে এ সমস্ত কারণ দূর হওয়ার পর নামাজকে দোহরাতে হবে। –[তায়াম্মুমের যে কোনো মাসআলা সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, ফাতহুল কাদীর– ১ : ১২৫-১৪৬, হিদায়া– ১ : ৪৯-৫৬, বাদায়িউস সানায়ে'– ১ : ১৬৩–১৯১, কানযুদ্দাকায়েক– ৯-১০, বাহরুর রায়িক– ১ : ২৪১-২৮৭, মা'আরিফুস সুনান– ১ : ৪৭৬-৪৯৫, দরসে তিরমিযী– ১ : ৩৮৩-৩৮৪]

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

جَازَ بِالسُّنَّةِ اَىْ بِالسُّنَّةِ الْمَشْهُوْرَةِ فَيَجُوْزُ بِهَا الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ فَاِنَّ مُوْجِبَهُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ لِلْمُحْدِثِ دُوْنَ مَنْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ قِيْلَ صُوْرَتُهُ جُنُبٌ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ اَحْدَثَ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ فَتَوَضَّأَ بِهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ مَرَّ عَلٰى مَاءٍ يَكْفِىْ لِلْاِغْتِسَالِ وَلَمْ يَغْتَسِلْ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ فَتَيَمَّمَ ثَانِيًا لِلْجَنَابَةِ فَاِنْ اَحْدَثَ بَعْدَ ذٰلِكَ تَوَضَّأَ وَنَزَعَ خُفَّيْهِ خُطُوْطًا بِاَصَابِعَ مُنْفَرِجَةً يَبْدَأُ مِنْ اَصَابِعِ الرِّجْلِ اِلَى السَّاقِ هٰذَا صِفَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُوْنِ فَلَوْ لَمْ يَفْرُجِ الْاَصَابِعُ لٰكِنَّ مَسَحَ مِقْدَارَ الْوَاجِبِ جَازَ وَاِنْ مَسَحَ بِاِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ بَلَّهَا وَمَسَحَ ثَانِيًا ثُمَّ هٰكَذَا جَازَ اَيْضًا اِنْ مَسَحَ كُلَّ مَرَّةٍ غَيْرَ مَا مَسَحَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ وَاِنْ مَسَحَ بِالْاِبْهَامِ وَالْمُسَبِّحَةِ مُنْفَرِجَتَيْنِ جَازَ اَيْضًا لِاَنَّ مَا بَيْنَهُمَا مِقْدَارُ اِصْبَعٍ اُخْرٰى وَسُئِلَ عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) عَنْ صِفَةِ الْمَسْحِ قَالَ اَنْ يَضَعَ اَصَابِعَ يَدَيْهِ عَلٰى مُقَدَّمِ خُفَّيْهِ وَيُجَافِىْ كَفَّيْهِ وَيَمُدُّهُمَا اِلَى السَّاقِ اَوْ يَضَعُ كَفَّيْهِ مَعَ الْاَصَابِعِ وَيَمُدُّهُمَا جُمْلَةً لٰكِنْ اِنْ مَسَحَ بِرُءُوْسِ الْاَصَابِعِ وَجَافٰى اُصُوْلَ الْاَصَابِعِ وَالْكَفِّ لَا يَجُوْزُ اِلَّا اَنْ يَبْتَلَّ مِنَ الْخُفِّ عِنْدَ الْوَضْعِ مِقْدَارَ الْوَاجِبِ وَهُوَ مِقْدَارُ ثَلٰثِ اَصَابِعَ هٰكَذَا ذُكِرَ فِى الْمُحِيْطِ.

পরিচ্ছেদ : মোজার উপর মাসেহ করার বিবরণ

অনুবাদ : মোজার উপর মাসেহ করার বৈধতা সুন্নতে মাশহুরা দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, এর [সুন্নতে মাশহুরা] দ্বারা কিতাবুল্লাহ [কুরআন]-এর উপর যিয়াদা [বৃদ্ধি] করা বৈধ। কেননা, কুরআন উভয় পা ধৌত করাকে ওয়াজিব করে। অজুহীন ব্যক্তির জন্য [মোজার উপর মাসেহ করা] বৈধ, কিন্তু যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরজ তার জন্য বৈধ নয়। বলা হয়– বৈধ না হওয়ার সুরত এই যে, কোনো জুনুবী ব্যক্তি জানাবাতের জন্য তায়াম্মুম করেছে, অতঃপর হদসে আসগর সংঘটিত হয়েছে, অথচ তার কাছে এ পরিমাণ পানি আছে যা দ্বারা অজু করা যায়, অতএব সে উক্ত পানি দ্বারা অজু করেছে, মোজা পরিধান করেছে অতঃপর এ পরিমাণ পানির পাশ দিয়ে সে অতিক্রম করেছে যা গোসলের জন্য যথেষ্ট এবং গোসল করেনি অতঃপর সে এ পরিমাণ পানি পেয়েছে যা দ্বারা অজু যথেষ্ট হয় এবং জানাবাতের জন্য সে দ্বিতীয়বার তায়াম্মুম করেছে, এখন যদি তার হদসে আসগর সংঘটিত হয়, তবে অজু করবে এবং মোজা খুলে পা ধৌত করবে। [মোজার উপর মাসেহ করার পদ্ধতি হচ্ছে,] হাতের [ভিজানো তিন] পৃথক আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুল

থেকে শুরু করে গোড়ালি পর্যন্ত রেখা টানা। [মোজার উপর] এটি সুন্নত তরিকা। সুতরাং যদি আঙ্গুলসমূহকে পৃথক না করে, কিন্তু ওয়াজিব পরিমাণ মাসেহ করে নেয় তবে জায়েজ। যদি [কেউ] এক আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করে, অতঃপর উক্ত আঙ্গুলটি ভিজিয়ে দ্বিতীয়বার মাসেহ করে, অতঃপর অনুরূপ [তৃতীয়বার আঙ্গুলটি ভিজিয়ে মাসেহ করে] তবুও তা জায়েজ, যদি প্রত্যেকবার ঐ অংশ মাসেহ করে যা ইতঃপূর্বের মাসেহকৃত অংশ নয়। আর যদি [কেউ] বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দ্বারা ফাঁকা রাখাবস্থায় মাসেহ করে তবুও জায়েজ। কেননা, এতদুভয়ের মাঝে তৃতীয় একটি আঙ্গুল পরিমাণ অংশ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে [মোজার উপর] মাসেহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, উভয় হস্তের আঙ্গুলসমূহকে মোজার সামনের অংশে রাখা, উভয় তালুকে পৃথক রাখা এবং উভয় তালুকে [পায়ের] গোড়ালি পর্যন্ত টেনে আনা। কিংবা উভয় তালুকে আঙ্গুলসহ [মোজার অগ্রভাগে] রাখা এবং [আঙ্গুল ও তালুর] সমষ্টিকে গোড়ালি পর্যন্ত টেনে আনা। কিন্তু যদি [কেউ] আঙ্গুলের মাথা দ্বারা মাসেহ করে এবং আঙ্গুলের গোড়া ও তালু পৃথক থাকে তবে জায়েজ হবে না। কিন্তু যদি আঙ্গুল রাখার সময় মোজার ওয়াজিব পরিমাণ অংশ ভিজে যায় [তবে জায়েজ হবে।] যা তিন আঙ্গুল পরিমাণ। "اَلْمُحِيْطُ" নামক গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ : বিকায়া গ্রন্থকার তায়াম্মুমের (র.) আলোচনা সমাপ্ত করার পর কয়েকটি কারণে মোজার উপর মাসেহ করার আলোচনা করেছেন। যথা–

১. এতদুভয়ের প্রত্যেকটিই মাসেহমূলক পবিত্রতা।
২. এতদুভয়ের প্রত্যেকটিই খলিফা। তায়াম্মুম হচ্ছে অজুর খলিফা এবং মোজার উপর মাসেহ হচ্ছে পা ধোয়ার খলিফা।
৩. তায়াম্মুম এবং মাসেহ উভয়টিই رُخْصَةٌ مُؤَقَّتَةٌ অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানি ব্যবহারের পরিবর্তে বিকল্প পথ অবলম্বনের অবকাশ।
৪. এতদুভয়ের প্রত্যেকটিই তাহারাত হাসিলের সাময়িক ব্যবস্থা। কারণ স্থায়ী ব্যবস্থা হচ্ছে ধৌত করা।
৫. তায়াম্মুম এবং মোজার উপর মাসেহ উভয়ের মধ্যেই অজুর অঙ্গসমূহের সবগুলো ব্যবহার করার পরিবর্তে শুধুমাত্র কয়েকটি অঙ্গকে ব্যবহার করা যথেষ্ট হয়।

মোজার উপর মাসেহ করার শরয়ী অনুমোদন : اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ [মোজার উপর মাসেহ করা] কুরআন দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং হাদীসে মাশহূর দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস দু প্রকার। যথা– ১. حَدِيْثٌ قَوْلِىٌّ তথা যা তিনি মুখে বলেছেন। ২. حَدِيْثٌ فِعْلِىٌّ তথা যা তিনি মুখে বলেননি, কিন্তু বাস্তবে নিজে আমল করেছেন। اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ উভয় ধরনের হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। حَدِيْثٌ قَوْلِىٌّ যেমন– হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) সহ সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট জামাত বর্ণনা করেছেন–

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুকীম ব্যক্তি একদিন একরাত্র [মোজার উপর] মাসেহ করবে এবং মুসাফির ব্যক্তি করবে তিনদিন তিনরাত্র।" –[বুখারী ১ : ৫৮, মুসলিম ১ : ২৩২]

حَدِيْثٌ فِعْلِىٌّ যেমন– হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজলী (রা.) বর্ণনা করেন– رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অজু করতে দেখেছি এবং তিনি মোজার উপর মাসেহ করেছেন।" –[মুসনাদে আহমাদ ৪ : ৩৫৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১ : ১৭৬] তা ছাড়া এ ধরনের হাদীস হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) প্রমুখ বড় বড় সাহাবীগণের এক বিরাট জামাত বর্ণনা করেছেন।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন– اَدْرَكْتُ سَبْعِيْنَ بَدْرِيًّا مِنَ الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ كَانُوْا يَرَوْنَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
অর্থাৎ "আমি সত্তরজনের মতো এমন বদরী সাহাবীকে পেয়েছি, যাদের প্রত্যেকেই مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ -এর পক্ষে হাদীস বর্ণনা করেছেন।" –[বাদায়িউস সানায়ে' ১ : ৭৭, মা'আরিফুস সুনান ১ : ৩৩১]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন– هُوَ اَنْ يُفَضِّلَ الشَّيْخَيْنِ وَاَنْ يُحِبَّ الْخَتَنَيْنِ وَاَنْ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ। অর্থাৎ "আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পরিচয় হচ্ছে, শায়খাইন তথা হযরত আবূ বকর এবং হযরত ওমর (রা.)-কে সমস্ত সাহাবীগণের তুলনায় শ্রেষ্ঠতম মনে করা, খাতানাইন তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দুই জামাতা হযরত ওসমান এবং হযরত আলী (রা.)-কে ভালোবাসা আর মোজার উপর মাসেহকে জায়েজ মনে করা।" –[মা'আরিফুস সুনান–১ : ৩৩২]

কোনো কোনো ফকীহ বলেন, মোজার উপর মাসেহ করা কুরআন দ্বারাও প্রমাণিত। আর তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ
এ আয়াতে اَرْجُلِكُمْ শব্দটি رُءُوْسِكُمْ -এর উপর عَطْف হওয়ার কারণে مَجْرُوْر পড়ার উপযুক্ত। আর مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْهِ -এর হুকুম যেহেতু একই, তাই অজুর ক্ষেত্রে পা-এর বিধানও সেটাই থাকবে যে বিধান রয়েছে মাথার। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অজুতে মাথা মাসেহ করা ফরজ। সুতরাং পা মাসেহ করাও ফরজ হওয়া উচিত। তবে كَسْرَهْ -এর কেরাতটি যেহেতু نَصَبْ যুক্ত কেরাতের বিপরীত, সেহেতু উভয় কেরাতের উপর আমল বজায় রাখায় নিমিত্তে এভাবে সমাধান করা হয়েছে যে, দুই কেরাত দুই অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত বলে ধরা হবে। অর্থাৎ যখন পায়ে মোজা থাকবে না তখন نَصَبْ যুক্ত কেরাত-এর ভিত্তিতে অজুর সময় পা ধৌত করা ফরজ বলে গণ্য হবে। আর যখন পায়ে মোজা থাকবে তখন جَرٌّ যুক্ত কেরাতের ভিত্তিতে পা মাসেহ করার বৈধতা প্রমাণিত হবে। তবে কিফায়া গ্রন্থকার উপরিউক্ত اِسْتِدْلَالْ -কে নাকচ করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, খাওয়ারেজ, রাওয়াফেজ ও শিয়া ইমামিয়া সম্প্রদায় مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ -কে অস্বীকার করে। তারা বলে যে, মোজার উপর মাসেহ করা শরিয়ত অনুমোদিত নয়। তারা দলিল হিসেবে পেশ করে অজুর আয়াতকে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ
উক্ত আয়াতে اَرْجُلَكُمْ -এর نَصَبْ -এর কেরাত مُطْلَقًا পা ধৌত করাকে চায়। কেননা, একে عَطْف করা হয়েছে وُجُوْهَكُمْ ও وَاَيْدِيَكُمْ -এর উপরে। আর কায়দা আছে যে, مَعْطُوْف عَلَيْهِ ও مَعْطُوْف -এর হুকুম এক হয়। আর مَعْطُوْف عَلَيْهِ -এর হুকুম যেহেতু ধৌত করা তাই مَعْطُوْف -এর হুকুমও ধৌত করা হবে।

جَرْ -এর কেরাত مُطْلَقًا পা মাসেহ করাকে চায়। কেননা, তখন এর عَطْف করা হয় رُءُوْسِكُمْ -এর উপর। আর رُءُوْس -এর হুকুম হলো মাসেহ করা। অতএব, مَعْطُوْف عَلَيْهِ ও مَعْطُوْف -এর হুকুম এক হিসেবে পদদ্বয়ের হুকুমও মাসেহ করা হবে। এর দ্বারা কোনোভাবেই মোজার উপর মাসেহ করা প্রমাণিত হয় না।

মূলত রাওয়াফেজ, খাওয়ারেজ ও ইমামিয়া সম্প্রদায়ের উক্ত অভিমত সহীহ নয়। কারণ, আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ কুরআন দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং হাদীসে মাশহূর দ্বারা প্রমাণিত। আর হাদীসে মাশহূর দ্বারা কুরআন-এর উপর زيادة করা তথা 'মোজার উপর মাসেহ করা" বৈধ বলা জায়েজ। তাছাড়া اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ -এর পক্ষের দলিলসমূহের একটি দলিল আমরা অজুর আয়াতকেও উল্লেখ করেছি। অতএব, তারা যেমন উক্ত আয়াত দ্বারা اَلْمَسْحُ জায়েজ না হওয়াকে প্রমাণিত করে, তেমনি আমরাও উক্ত আয়াত দ্বারা اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ জায়েজ হওয়াকে প্রমাণিত করেছি। আর আমাদের অতিরিক্ত দলিল হলো হাদীসে মাশহূরসমূহ, যা তাদের পক্ষে নেই। তাই আমাদের মাযহাবই প্রমাণিত হচ্ছে। –[মোজার উপর মাসেহ -এর অনুমোদন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– [ফাতহুল কাদীর ১ : ১৪৬–১৪৮, বাদায়িউস সানায়ে' ১ : ৭৬–৭৮, বাহরুর রায়িক– ১ : ২৮৭–২৯২, মা'আরিফুস সুনান– ১ : ৩৩১–৩৩৩, দরসে তিরমিযী– ১ : ৩২৮–৩২৯]

❖ **অজুর আয়াতের পর মোজার উপর মাসেহ অনুমোদন হয়েছে :** যারা মোজার উপর মাসেহকে অস্বীকার করে তারা বলে, মোজার উপর মাসেহ করার বৈধতা সম্পর্কে সমস্ত বর্ণনা অজুর আয়াত (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা, হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রা.) অজুর আয়াত নাজিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁর সূত্রে বর্ণিত আছে যে–

اِنَّهٗ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقِيْلَ لَهٗ اَتَفْعَلُ هٰذَا؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِيْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهٗ .

অর্থাৎ তিনি অজু করেছেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেছেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি কি মোজার উপর মাসেহ করছেন? তিনি বললেন, আমি করব না কেন? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি!

–[তিরমিযী-হাদীস নং ৯৩, বুখারী-হাদীস নং ৩৮৭, মুসলিম-হাদীস নং ২৭২]

মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক [হাদীস নং ৭৫৬]-এ উক্ত হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করা হয়েছে– فَقِيْلَ لَهٗ اَكَانَ ذٰلِكَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ؟ وَهَلْ اَسْلَمْتُ اِلَّا بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ؟ অর্থাৎ তাঁকে বলা হলো, সূরা মায়েদা তথা অজুর আয়াত নাজিল হওয়ার পর কি রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজার উপর মাসেহ করেছেন? তিনি বললেন, আমি তো সূরা মায়েদা নাজিল হওয়ার পরই ইসলাম গ্রহণ করেছি।' –[মুসনাদে আহমাদ ৪ : ৩৫৮, ইবনে আবী শায়বা ১ : ১৭৬]

হযরত আয়েশা (রা.) ও বারা ইবনে আযিব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত– اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ 'যে, নবী করীম ﷺ সূরা মায়েদা নাজিল হওয়ার পর মোজার উপর মাসেহ করেছেন।" –[দারাকুতনী ১ : ১৯৪, তাবারানী ১ : ২৫৫]

মূলত হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রা.)-এর اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করাই হচ্ছে اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ অস্বীকারকারীদের খণ্ডন। ইমাম তিরমিযী (রা.) বলেন– وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيْثُ جَرِيْرٍ لِاَنَّ اِسْلَامَهٗ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ "হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর হাদীস ওলামায়ে কেরাম-এর নিকট অধিক প্রিয়। কেননা, তিনি সূরা মায়েদা নাজিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।" –[তিরমিযী শরীফ]

❖ **কোন ধরনের মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ?** মোজা কয়েক প্রকার– ১. اَلْخُفُّ যা সম্পূর্ণই চামড়ার তৈরি, ২. اَلْجَوْرَبُ যা সুতা বা পশমের তৈরি। এটি আবার দু প্রকার। যথা–

১. اَلْجَوْرَبُ الْمُجَلَّدُ : যে جَوْرَبٌ -এর উপর ও নীচের অংশে চামড়া লাগানো হয়েছে।

২. اَلْجَوْرَبُ الْمُنَعَّلُ : যে جَوْرَبٌ -এর শুধু নীচের অংশে চামড়া লাগানো হয়েছে। উল্লিখিত সমস্ত প্রকারের মোজার উপর মাসেহ করা জায়েজ। এতে ফকীহগণ একমত।

৩. اَلْجَوْرَبُ غَيْرُ الْمُجَلَّدِ غَيْرُ الْمُنَعَّلِ অর্থাৎ যে جَوْرَبٌ টি مُنَعَّلٌ বা مُجَلَّدٌ নয়। এটি আবার দু প্রকার–

১. اَلْجَوْرَبُ الرَّقِيْقُ : সুতা বা পশমের তৈরি মোজা যা পাতলা। অর্থাৎ যার উপর পানি ঢাললে পা পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। যা পায়ের সাথে লাগানোর কোনো মাধ্যম ছাড়া লেগে থাকে না এবং এক মাইল দূরত্ব পর্যন্ত পথ শুধু উক্ত মোজার উপর দিয়ে চলা যায় না; বরং মোজা ফেটে যায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রকারের মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ নয়।

২. اَلْجَوْرَبُ الثَّخِيْنُ যা পশম বা সুতার তৈরি বটে, তবে এটি ثَخِيْنٌ তথা মোটা। যার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত পাওয়া যায়–

১. পানি ঢাললে পা পর্যন্ত পানি পৌঁছে না, ২. পায়ের সঙ্গে লাগানোর কোনো মাধ্যম লাগে না ও ৩. এক মাইল পথ পর্যন্ত শুধু উক্ত মোজা দ্বারা চলা সম্ভব হয়। এ প্রকারের মোজার উপর মাসেহ করা নিয়ে ওলামায়ে কেরাম-এর মতানৈক্য রয়েছে। জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ প্রকারের মোজার উপরও মাসেহ করা বৈধ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এ প্রকারের মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ নয়। মূলত ইমাম আবূ হানীফা (র.) এক সময় এ কথা বলতেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তাঁর এ সিদ্ধান্তে অটল থাকেননি; বরং মৃত্যুর তিন কিংবা নয় দিন পূর্বে জমহুরের মাযহাবে ফিরে এসেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার ও বাদায়িউস সানায়ে' গ্রন্থকার (র.) এমনই উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ جَازَ بِالسُّنَّةِ اَىْ بِالسُّنَّةِ الخ : মোজার উপর মাসেহ বলে গ্রন্থকার এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি ওয়াজিব নয়। কেননা, মোজা পরিধানকারীর জন্য এ অনুমতি আছে যে, সে মোজা খুলে পা ধৌত করে নেবে, অতঃপর মোজা পরে নেবে। আর এ বৈধতার হুকুম তখন হবে, যখন ওয়াজিব হওয়ার কোনো চাহিদা না থাকবে। যেমন– পানি এত কম যে, এর দ্বারা মাসেহ করা যথেষ্ট হবে, কিন্তু ধৌত করা অসম্ভব কিংবা মোজা খুলে পা ধোয়া ও আবার তা পরতে পরতে নামাজের ওয়াক্ত নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কিংবা আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা এ সমস্ত অবস্থায় মোজার উপর মাসেহ করা ওয়াজিব। অন্যথায় মাসেহ না করে পা ধোয়াই উত্তম।

قَوْلُهُ فَيَجُوْزُ بِهَا الزِّيَادَةُ عَلَى الخ : এটি একটি মন্তব্যের উত্তর। মন্তব্যটি হচ্ছে, কুরআনে কারীমের মধ্যে عَامٌ ভাবে পা ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন হাদীস দ্বারা কুরআনের উপর কিভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব? উত্তর হচ্ছে, খবরে ওয়াহিদ (خَبَرٌ وَاحِدٌ) দ্বারা কুরআন-এর উপর বৃদ্ধি জায়েজ নেই ঠিক, কিন্তু হাদীসে মাশহূর (حَدِيْثٌ مَشْهُوْرٌ) ও হাদীসে মুতাওয়াতির (حَدِيْثٌ مُتَوَاتِرٌ) দ্বারা কুরআন-এর উপর زِيَادَةٌ বা বৃদ্ধি জায়েজ আছে। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আমরা ইতঃপূর্বেও করেছি।

قَوْلُهُ تَوَضَّأَ وَنَزَعَ خُفَّيْهِ الخ : এখানে একটি মন্তব্য হয় যে, যখন সে পুনরায় তায়াম্মুম করেছে, তখন তার উপর আর গোসল ওয়াজিব থাকেনি। তাই গ্রন্থকারের কথা دُوْنَ مَنْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ টি বিশুদ্ধ সুরতটি হয়নি। কিন্তু যদি دُوْنَ مَنْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ -এর অর্থ এই ধরা হয় যে, دُوْنَ مَنْ عَلَيْهِ غُسْلُ الرِّجْلَيْنِ তবে উল্লিখিত সুরতটি বিশুদ্ধ হয়। অর্থাৎ সে যদি পুনরায় তায়াম্মুম করার পর অজু করে, তবে তার তখন মোজার উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। কেননা, যখন তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়েছে তখন তার পায়েও অপবিত্রতা চলে এসেছে। তাই এখন তা ধোয়াও আবশ্যক হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ خُطُوْطًا بِأَصَابِعَ مُنْفَرِجَةٍ : خُطُوْطًا শব্দটি جَازَ -এর فَاعِلٌ থেকে تَمْيِيْزٌ কিংবা حَالٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

❖ **মোজার উপর মাসেহ করার সুন্নত তরিকা :** মোজার উপর মাসেহ করার সুন্নত তরিকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) বর্ণনা করেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى خُفِّهِ الْاَيْمَنِ وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلَى خُفِّهِ الْاَيْسَرِ ثُمَّ مَسَحَ اِلَى اَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً حَتّٰى اَنْظُرَ اِلَى اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

অর্থাৎ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পেশাব করতে দেখেছি। অতঃপর এসে তিনি অজু করেছেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেছেন। তিনি ডান হস্তকে ডান মোজার উপর এবং বাম হস্তকে বাম মোজার উপর রেখেছেন। অতঃপর মোজাদ্বয়ের উপরের অংশ একবার মাসেহ করেছেন। এমনকি আমি এখনো হুজুর ﷺ -এর মোজার উপর আঙ্গুলের রেখা দেখতে পাচ্ছি। –[মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা]

এটিই গ্রন্থকার ও শারেহ (র.) বর্ণনাকৃত প্রথম পদ্ধতি। তবে শারেহ (র.) একটি قَيْدٌ বৃদ্ধি করেছেন। তা হলো, আঙ্গুলগুলো খোলা রাখাবস্থায় মাসেহ করা।

শারেহ (র.)-এর বর্ণনাকৃত দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো, এক আঙ্গুল দ্বারা তিনবার মাসেহ করা এবং প্রতিবার নতুনভাবে পানি নিয়ে নতুন নতুন জায়গা মাসেহ করা। মাসেহের এটি বৈধ সুরত; মাসনূন সুরত নয়।

শারেহ (র.) তৃতীয় একটি সুরত উল্লেখ করেছেন যে, কেউ যদি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীকে খোলা রেখে এর দ্বারা মাসেহ করে তবে এটিও জায়েজ। কেননা, এ আঙ্গুলদ্বয়ের মাঝে তৃতীয় একটি আঙ্গুলের জায়গা থাকে। তাই তিন আঙ্গুল পরিমাণ অংশের মাসেহ হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত পদ্ধতিটি শারেহ (র.) সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা আর এখানে উল্লেখ করছি না।

قَوْلُهُ لَا يَجُوْزُ اِلَّا اَنْ يَبْتَلَّ مِنَ الْخُفِّ : উল্লিখিত সুরতে যদি আঙ্গুল মাথায় রাখার সময় ওয়াজিবের পরিমাণ তথা তিন আঙ্গুল পরিমাণ ভিজে যায় তবে মাসেহ যথেষ্ট হবে। 'মুহীত' গ্রন্থে এমনই উল্লেখ রয়েছে।

وَذُكِرَ فِي الذَّخِيْرَةِ اَنَّ الْمَسْحَ بِرُءُوْسِ الْاَصَابِعِ يَجُوْزُ اِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَقَاطِرًا لِاَنَّهُ اِذَا كَانَ الْمَاءُ مُتَقَاطِرًا فَالْمَاءُ يَنْزِلُ مِنْ اَصَابِعِهِ اِلٰى رُءُوْسِهَا فَاِذَا مَدَّ كَاَنَّهُ اَخَذَ مَاءً جَدِيْدًا وَلَوْ مَسَحَ بِظَهْرِ الْكَفِّ جَازَ لٰكِنَّ السُّنَّةَ بِبَاطِنِهَا وَكَذَا اِنِ ابْتَدَأَ مِنْ طَرَفِ السَّاقِ وَلَوْ نَسِيَ الْمَسْحَ وَاَصَابَ الْمَطَرُ ظَاهِرَ خُفَّيْهِ حَصَلَ الْمَسْحُ وَكَذَا مَسْحُ الرَّأْسِ وَكَذَا لَوْ مَشٰى فِي الْحَشِيْشِ فَابْتَلَّ ظَاهِرُ خُفَّيْهِ وَلَوْ بِالطَّلِّ هُوَ الصَّحِيْحُ عَلٰى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ اَلْخُفُّ مَا يَسْتُرُ الْكَعْبَ كُلَّهُ اَوْ يَكُوْنُ الظَّاهِرُ مِنْهُ اَقَلَّ مِنْ ثُلُثِ اَصَابِعِ الرِّجْلِ اَصْغَرِهَا اَمَّا لَوْ ظَهَرَ قَدْرَ ثُلُثِ اَصَابِعِ الرِّجْلِ فَلَا يَجُوْزُ لِاَنَّ هٰذَا بِمَنْزِلَةِ الْخَرْقِ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَكُوْنَ وَاسِعًا بِحَيْثُ يُرٰى رِجْلَهُ مِنْ اَعْلَى الْخُفِّ .

অনুবাদ : 'যখীরা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, আঙ্গুলের মাথা দ্বারা মাসেহ করা জায়েজ আছে– যদি পানি টপকিয়ে পড়ে। কেননা, যখন পানি টপকিয়ে পড়বে তখন পানি আঙ্গুলের মাথা থেকে আঙ্গুলের গোড়ার দিকে নেমে আসে। অতএব, যখন আঙ্গুল টানবে তখন যেন সে নতুন পানি গ্রহণ করেছে। যদি [কেউ] তালুর পিঠ দ্বারা মাসেহ করে তবে তা জায়েজ হবে, কিন্তু সুন্নত হলো, হাতের তালুর পেট দ্বারা মাসেহ করা। অনুরূপ যদি কেউ গোড়ালির দিক থেকে মাসেহ শুরু করে, [তবে তা জায়েজ]। আর যদি [কেউ] মাসেহ ভুলে যায় এবং বৃষ্টি মোজার পিঠ পর্যন্ত লেগে যায়, তবে মাসেহ হাসিল হয়ে যাবে। অনুরূপ মাথা মাসেহের ক্ষেত্রেও। অনুরূপ যদি [কেউ] ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটে এবং তার মোজার পিঠের অংশ ভিজে যায় যদিও তা শিশিরের মাধ্যমে হয়। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। মাসেহ করবে] মোজার পিঠের উপর। মোজা হচ্ছে ঐ জিনিস যা [পায়ের] গোড়ালির পূর্ণাংশকে ঢেকে নেয় কিংবা পায়ের ছোট তিন আঙ্গুলের চেয়ে কম পরিমাণ অংশ খোলা থাকে। কিন্তু যদি পায়ের তিন আঙ্গুল পরিমাণ অংশ খোলা থাকে তবে মাসেহ জায়েজ হবে না। কেননা, তা মোজার অনেকাংশ ফাটলের স্থলাভিষিক্ত। আর মোজা যদি এ পরিমাণ প্রশস্ত হয় যে, মোজার উপরের দিক থেকে পা দেখা যায়, তবে এতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَذُكِرَ فِي الذَّخِيْرَةِ الخ : শারেহ (র.) "اَلْمُحِيْطُ" নামক গ্রন্থের ইবারত বর্ণনার পর 'যখীরা' নামক গ্রন্থের ইবারত বর্ণনা করেছেন যে, উভয় গ্রন্থের বিবরণ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন এবং উভয়টিই জরুরি। "اَلْمُحِيْطُ" নামক গ্রন্থের বিবরণ তো হলো, যদি মোজার তিন আঙ্গুল পরিমাণ অংশ পানি দ্বারা ভিজে যায় তবে আঙ্গুলের মাথা দ্বারাও মাসেহ করা জায়েজ। আর 'যখীরা' নামক গ্রন্থের বিবরণ হলো, যদি পানি টপকে পড়ে তবে মাসেহ জায়েজ। কেউ কেউ এ দুটির মধ্যে বৈপরীত্যের ধারণা করেছেন। অথচ এতদুভয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা, আঙ্গুলের মাথা দ্বারা তখনই মাসেহ করা বৈধ, যখন পানি টপকে পড়ে কিংবা আঙ্গুল রাখার সময় তিন আঙ্গুল পরিমাণ অংশ ভিজে যায়।

قَوْلُهُ لٰكِنَّ السُّنَّةَ بِبَاطِنِهَا : অর্থাৎ মাসেহ করার সুন্নত তরিকা হলো, হাতের তালু এবং আঙ্গুলের পেট দ্বারা মাসেহ করা। যদি কেউ হাতের তালু ও আঙ্গুলের পেট দ্বারা মোজার তালুর উপর কিংবা গোড়ালির দিক কিংবা পায়ের পার্শ্ব-এর উপর মাসেহ করে তবে এ মাসেহ বৈধ হবে না। কেননা, হাদীসসমূহে পায়ের উপরাংশ [পিঠ] মাসেহ করার কথা এসেছে। তাই পায়ের

উপরাংশ ব্যতীত অন্যস্থান মাসেহ করা বৈধ নয়। [এ মাসআলায় মতানৈক্য রয়েছে, যা আমরা ইনশাআল্লাহ অচিরেই উল্লেখ করব।] এখানে শারেহ (র.) বলেছেন যে, যদি মাসেহ করার পদ্ধতিতে কেউ ভিন্ন তরিকায় মাসেহ করে তথা হাতের পিঠ দ্বারা মাসেহ করে কিংবা উপর থেকে নীচের দিকে মাসেহ করে আসে, তবে এতে কোনো সমস্যা নেই। এজন্য যে, মাসেহের পদ্ধতি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়; বরং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে মাসেহের মহল।

❖ **মোজার উপরাংশে মাসেহ করবে :** মোজার উপরাংশে মাসেহ করবে, না নীচের অংশে মাসেহ করবে, না উপর ও নীচ উভয়াংশে মাসেহ করবে– এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, মোজার উপরাংশে মাসেহ করবে– নীচের অংশে নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.) বলেন, উপর ও নীচ উভয়াংশে মাসেহ করবে। তবে ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট উপর ও নীচ উভয়াংশে মাসেহ করা ওয়াজিব। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট উপরাংশে মাসেহ করা ওয়াজিব, কিন্তু নীচের অংশে মাসেহ করা মোস্তাহাব।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো– إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ اَعْلَى الْخُفِّ وَاَسْفَلِهٖ "রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজার উপর ও নীচে উভয়াংশে মাসেহ করেছেন।"–[তিরমিযী শরীফ] وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ স্পষ্ট।

ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর দলিল হলো, হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) বলেন–

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا ـ

অর্থাৎ "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উভয় মোজার উপরাংশে মাসেহ করতে দেখেছি।" –[তিরমিযী শরীফ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নবী করীম ﷺ উভয় মোজার উপরাংশে মাসেহ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শুধু মোজার উপরাংশে মাসেহ করাই যথেষ্ট। হযরত আলী (রা.)-এর একটি বাণী থেকেও এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন–

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنَ الْخُفِّ اَوْلٰى بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهٖ وَلٰكِنْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ دُوْنَ بَاطِنِهِمَا ـ

অর্থাৎ "দীন যদি যুক্তি ও বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল হতো, তবে মোজার ভিতরের অংশে মাসেহ করাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত হতো। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মোজার উপরাংশে মাসেহ করতে দেখেছি; ভিতরের অংশে নয়।"

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) وَمَالِكٍ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.) যে হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, তা مَعْلُوْلٌ হাদীস। এর দ্বারা দলিল পেশ করা সহীহ নয় কিংবা মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজার উপরাংশকেই মাসেহ করেছেন। কিন্তু মোজা শক্ত হওয়ার কারণে নীচের অংশেও ধরেছিলেন, কিন্তু মাসেহ করার উদ্দেশ্যে ধরেননি। আর একেই রাবী –[বর্ণনাকারী] নীচের অংশের মাসেহ বলে বর্ণনা করেছেন। –[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর ১ : ১৫১-১৫২, বাহরুর রায়িক ১ : ২৯৯-৩০১, মা'আরিফুস সুনান ১ : ৩৩৮-৩৪৫, দরসে তিরমিযী ১ : ৩৩২-৩৩৪]

قَوْلُهٗ لَوْ نَسِيَ الْمَسْحَ وَاَصَابَ الخ : অর্থাৎ যদি সে অজু করে এবং মোজার উপর মাসেহ করেনি, কিন্তু মোজা পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছে, যার দ্বারা মোজার উপরাংশ ভিজে গেছে, তবে মাসেহের নিয়ত করেনি, কিংবা ভিজা ঘাসে কিংবা বৃষ্টির পানিতে চলেছে এবং মাসেহের স্থান ভিজে গেছে, তবে তা জায়েজ। কেননা, পরোক্ষভাবে মাসেহ হাসিল হয়ে গেছে। আর এতে নিয়ত শর্ত নয়, কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট যেহেতু অজুতে নিয়ত শর্ত, তাই মাসেহ অজুর অংশ হওয়ার কারণে এতেও নিয়ত শর্ত।

قَوْلُهٗ وَلَوْ بِالطَّلِّ هُوَ الصَّحِيْحُ : اَلطَّلُّ শব্দের অর্থ– শিশির। এটি ঐ পানি নয় যা দ্বারা সাধারণত অজু করা হয়। তাই কেউ কেউ এতে মতানৈক্য করেছেন যে, শিশিরকে মোজা ভিতরে টেনে নেয় এবং একে পানি বলা হয় না, ফলত এর দরুন ভিজে যাওয়ার দ্বারা মাসেহ যথেষ্ট হবে না, কিন্তু শারেহ (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, তা যথেষ্ট হবে এবং এটিই বিশুদ্ধ।

قَوْلُهٗ اَلْخُفُّ مَا يَسْتُرُ الْكَعْبَ : এটি মোজা (اَلْخُفُّ) -এর মুরাদ [উদ্দেশ্য]-এর বিবরণ। এর সারমর্ম এই যে, যে মোজার উপর মাসেহ করা জায়েজ তা হলো, যা টাখনু পর্যন্ত সমস্ত পা ঢেকে নেয় এবং এর কোনো অংশই খোলা থাকে না। এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন– তা পায়ের ছোট তিন আঙ্গুল পরিমাণ ফাটা থাকতে পারবে না, পায়ের সাথে লেগে থাকতে হবে এবং এ পরিমাণ ফাঁকা থাকতে পারবে না যে, মোজা খুলে যাবে, তা পরিধান করে সাধারণভাবে চলতে সক্ষম হবে।

اَوْ جُرْمُوْقَيْهِ اَىْ عَلٰى خُفَّيْنِ يَلْبَسَانِ فَوْقَ الْخُفَّيْنِ لِيَكُوْنَا وِقَايَةً لَهُمَا مِنَ الْوَحْلِ وَالنَّجَاسَةِ فَاِنْ كَانَا مِنْ اَدِيْمٍ اَوْ نَحْوِهٖ جَازَ عَلَيْهِمَا الْمَسْحُ سَوَاءٌ لَبِسَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ اَوْ فَوْقَ الْخُفَّيْنِ وَاِنْ كَانَا مِنْ كِرْبَاسٍ اَوْ نَحْوِهٖ فَاِنْ لَبِسَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ لَا يَجُوْزُ وَكَذَا اِنْ لَبِسَهُمَا عَلَى الْخُفَّيْنِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَا بِحَيْثُ يَصِلُ بَلَلُ الْمَسْحِ اِلَى الْخُفِّ الدَّاخِلِ ثُمَّ اِذَا كَانَا مِنْ نَحْوِ اَدِيْمٍ وَقَدْ لَبِسَهُمَا فَوْقَ الْخُفَّيْنِ فَاِنْ لَبِسَهُمَا بَعْدَمَا اَحْدَثَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوْقَيْنِ وَاِنْ لَبِسَهُمَا قَبْلَ الْحَدَثِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نَزَعَهُمَا دُوْنَ الْخُفَّيْنِ اَعَادَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ الدَّاخِلَيْنِ بِخِلَافِ مَا اِذَا مَسَحَ عَلٰى خُفٍّ ذِىْ طَاقَيْنِ فَنَزَعَ اَحَدَ الطَّاقَيْنِ لَا يُعِيْدُ الْمَسْحَ عَلَى الطَّاقِ الْاٰخَرِ وَاِنْ نَزَعَ اَحَدَ الْجُرْمُوْقَيْنِ فَعَلَيْهِ اَنْ يُعِيْدَ الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْمُوْقِ الْاٰخَرِ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّهٗ يَخْلَعُ الْجُرْمُوْقَ الْاٰخَرَ وَيَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ـ

অনুবাদ : অথবা جُرْمُوْق বা আবরণী মোজা -এর উপর [মাসেহ করবে]। অর্থাৎ ঐ মোজার উপর যা [চামড়ার] মোজার উপর পরিধান করা হয়। যেন মোজাদ্বয় ময়লা, আবর্জনা ও নাপাকী থেকে মুক্ত থাকে। যদি জারমূকদ্বয় চামড়ার কিংবা চামড়ার অনুরূপ কিছুর হয় তবে এর উপর মাসেহ করা জায়েজ। চাই সে শুধু জারমূকদ্বয় পরিধান করুক কিংবা মোজার উপর পরিধান করুক। আর যদি জারমূকদ্বয় সুতি কাপড় বা এ জাতীয় কোনো কিছুর হয় এবং শুধু এ দুটিকে [মোজাবিহীন] পরিধান করে, তবে এর উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। অনুরূপ [মাসেহ জায়েজ হবে না] যদি জারমূককে মোজার উপর পরিধান করে [এবং মাসেহের সিক্ততা মোজা পর্যন্ত না পৌঁছে]। কিন্তু যদি জারমূকদ্বয় এমন হয় যে, মাসেহের আর্দ্রতা ভিতরের মোজা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে– [তবে এর উপর মাসেহ জায়েজ]। অতঃপর যদি জারমূকদ্বয় চামড়া জাতীয় জিনিসের হয় এবং উভয়টিকে মোজার উপর পরিধান করে, তবে যদি তা হদস-এর উপর পরে থাকে এবং মোজার উপর মাসেহ করে, তবে জারমূক -এর উপর মাসেহ করা বৈধ নয়। আর যদি হদস-এর পূর্বে জারমূকদ্বয় পরিধান করে এবং এর উপর মাসেহ করে, অতঃপর জারমূকদ্বয়কে খুলে ফেলে, কিন্তু মোজাদ্বয় নয়, তবে ভিতরের মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহকে দোহরাতে হবে।

পক্ষান্তরে যখন দুই ভাঁজ মোজার উপর মাসেহ করবে তখন যদি এক ভাঁজ খুলে ফেলে তবে অন্য ভাঁজের উপর মাসেহকে দোহরাতে হবে না। আর জারমূকদ্বয়ের একটি যদি খুলে ফেলে তবে তার জন্য অপর জারমূক -এর উপর মাসেহকে দোহরাতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, অপর জারমূক খুলে ফেলবে এবং মোজার উপর মাসেহ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اَوْ جُرْمُوْقَيْهِ الخ : جُرْمُوْق বলা হয় এমন মোজাকে যা চামড়ার মোজার উপর আবরণী হিসেবে পরিধান করা হয়, যেন এর কারণে চামড়ার মোজাকে ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত রাখা যায়। আর جُرْمُوْق -এর খাড়া অংশ [সাক] মোজার খাড়া

অংশের তুলনায় ছোট হয়ে থাকে। جُرْمُوْق -এর উপর মাসেহ করা জায়েজ আছে কিনা– এ নিয়ে আহনাফ ও শাফেয়ীদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আহনাফ বলেন, জারমূক-এর উপর মাসেহ করা জায়েজ আছে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, জারমূক-এর উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, মোজা হচ্ছে পায়ের বদল। আর বদলের বদল হয় না। কারণ, মোজার উপর মাসেহ করাকে শরিয়ত বৈধতাই দিয়েছে পায়ের বদল হিসেবে। অতএব, এখন যদি জারমূক-এর উপর মাসেহ জায়েজ করা হয় তবে তা হবে মোজার বদল হয়ে, অথচ তা জায়েজ নেই।

আহনাফের দলিল হচ্ছে, হযরত ওমর (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেন– رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْجُرْمُوْقَيْنِ অর্থাৎ "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জারমূক-এর উপর মাসেহ করতে দেখেছি।"

–[ইবনে খুযায়মা ১ : ৯৫, মুসতাদরাকে হাকেম ১ : ১৭০ ও আবূ দাউদ শরীফ]

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জারমূক-এর উপর মাসেহ করেছেন। তা ছাড়া আমাদের যৌক্তিক দলিল হলো, জারমূক ব্যবহার ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে মোজার تَابِعٌ হয়ে থাকে। ব্যবহারের দিক থেকে তো এ কারণে যে, জারমূক সর্বদা মোজার সাথে সংশ্লিষ্ট অবস্থায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর উদ্দেশ্যের দিক থেকে জারমূক মোজার تَابِعٌ , এ কারণে একে মোজার হেফাজতের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন মোজা ব্যবহার করা হয় পায়ের হেফাজতের জন্য। অতএব, মোজার উপর জারমূক যেন একটি দু-পাটবিশিষ্ট মোজা। দু-পাটবিশিষ্ট মোজার উপর যেমন সর্বসম্মতভাবে জায়েজ, তেমনি জারমূকের উপর মাসেহ করাও জায়েজ হবে।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) : জারমূক-বদলের বদল এ উক্তিটি সঠিক নয়। কারণ, জারমূক বদল বটে, তবে মোজার বদল নয়; বরং তা পায়ের বদল। তা বুঝার সহজ পদ্ধতি হলো, যদি জারমূক হদসের পর পরিধান করে, তবে এর উপর মাসেহ জায়েজ হবে না। কারণ, এ অবস্থায় হদস মোজার ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। এখন তা স্থানান্তরিত হয়ে জারমূক -এর উপর আসবে না। অতএব, যদি জারমূক মোজার স্থলাভিষিক্ত হতো, তবে এ অবস্থায়ও এর উপর মাসেহ করা জায়েজ হতো।

قَوْلُهُ أَوْ فَوْقَ الْخُفَّيْنِ الخ : অর্থাৎ জারমূকও মোজার মতোই এবং তা পায়ের প্রতি হদস বিস্তারের প্রতিবন্ধক। অতএব, এর উপর মাসেহ করা যথেষ্ট। যদিও মোজাবিহীন শুধু জারমূক পরিধান করে থাকে। এ সুরতটির সম্পর্ক ঐ জারমূক -এর সাথে যা চামড়া বা চামড়া জাতীয় কোনো জিনিসের তৈরি হয়।

পক্ষান্তরে জারমূক যদি সুতি কাপড়ের হয় এবং যদি একে মোজাবিহীন পরিধান করা হয়, তবে এর উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। কেননা, এতে মোজার অনেক বৈশিষ্ট্যই নেই। যেমন– মোজার ন্যায় সাধারণভাবে এর উপর দিয়ে চলা যায় না। এতে পা পর্যন্ত পানি পৌছে যায়। অথচ মোজার এটিও একটি শর্ত যে, পা পর্যন্ত আর্দ্রতা না পৌছা। আরেকটি শর্ত হলো– সাধারণভাবে এর উপর দিয়ে চলতে পারা। অনুরূপ যদি সুতি কাপড়ের জারমূক মোজার উপর পরিধান করে এবং আর্দ্রতা মোজা পর্যন্ত না পৌছে, তবে এর উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। কিন্তু যদি সুতি কাপড়ের জারমূক এমন হয় যে, যার উপর পানি লাগলে এর আর্দ্রতা জারমূক ভেদ করে মোজা পর্যন্ত পৌছতে পারে এ ধরনের জারমূকের উপর মাসেহ করা জায়েজ। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, জারমূক-এর উপর মাসেহ করা হয়েছে; বরং এ মাসেহ মোজার উপরই করা হয়েছে। কারণ, জারমূক অতি পাতলা হওয়ার কারণে মোজা পর্যন্ত পানি পৌছার জন্য তা প্রতিবন্ধক নয়।

قَوْلُهُ عَلَى خُفٍّ ذِيْ طَاقَيْنِ : অর্থাৎ দুই ভাঁজের মোজা এক ভাঁজের মোজার হুকুমের মধ্যেই। অতএব, যখন এক ভাঁজের উপর মাসেহ করে তখন যেন সে উভয় ভাঁজের উপরই মাসেহ করেছে। এখন এক ভাঁজ খোলা অপর ভাঁজের জন্য ক্ষতিকর নয়। কিন্তু জারমূক ও মোজা– দুটি স্বতন্ত্র জিনিস, তাই একটির উপর মাসেহ অপরটির উপর মাসেহ বলে গণ্য হবে না। যখন সে জারমূককে খুলে ফেলে তখন মোজা তাহারাত ব্যতীত থেকে যায়। অনুরূপ তার উপর আবশ্যক নয় যে, জারমূক ও মোজা দুটির উপর দুবার মাসেহ করবে।

أَوْ جَوْرَبَيْهِ الثَّخِيْنَيْنِ اَىْ بِحَيْثُ يَسْتَمْسِكَانِ عَلَى السَّاقِ بِلَا شَدٍّ مُنَعَّلَيْنِ اَوْ مُجَلَّدَيْنِ حَتّٰى إِذَا كَانَا ثَخِيْنَيْنِ غَيْرُ مُنَعَّلَيْنِ اَوْ مُجَلَّدَيْنِ لَا يَجُوْزُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) خِلَافًا لَهُمَا وَعَنْهُ اَنَّهُ رَجَعَ إِلٰى قَوْلِهِمَا وَبِهِ يُفْتٰى مَلْبُوْسَيْنِ عَلٰى طُهْرٍ تَامٍّ وَقْتَ الْحَدَثِ فَلَوْ تَوَضَّأَ وَضُوْءً غَيْرَ مُرَتَّبٍ فَغَسَلَ الرِّجْلَيْنِ وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ غَسَلَ بَاقِى الْاَعْضَاءِ ثُمَّ اَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ اَوْ تَوَضَّأَ وَضُوْءً مُرَتَّبًا فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَاَدْخَلَهَا الْخُفَّ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَاَدْخَلَهَا الْخُفَّ لَيْسَتْ لَهُ طَهَارَةٌ تَامَّةٌ فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى إِذَا لَبِسَ الْخُفَّيْنِ وَفِى الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا لَبِسَ الْيُمْنٰى لٰكِنَّهُمَا مَلْبُوْسَانِ عَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ فَعُلِمَ اَنَّ قَوْلَهُ مَلْبُوْسَيْنِ اَحْسَنُ مِنْ عِبَارَتِهِمْ وَهِىَ إِذَا لَبِسَهُمَا عَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ لِاَنَّ الْمُرَادَ الطَّهَارَةُ الْكَامِلَةُ وَقْتَ الْحَدَثِ وَهٰذَا الْوَقْتُ هُوَ زَمَانُ بَقَاءِ اللُّبْسِ لَا زَمَانُ حُدُوْثِهِ فَيَصِحُّ اَنْ يُقَالَ هُمَا مَلْبُوْسَانِ عَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ وَلَا يَصِحُّ اَنْ يُقَالَ لَبِسَهُمَا عَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ لِاَنَّ الْفِعْلَ دَالٌّ عَلَى الْحُدُوْثِ وَالْاِسْمُ دَالٌّ عَلَى الدَّوَامِ وَالْاِسْتِمْرَارِ -

---

অনুবাদ : অথবা মোটা দুই জাওরাব [চামড়া ছাড়া অন্য কিছুর তৈরি]-এর উপর [মাসেহ করবে]। যা এমন যে, বাঁধা ছাড়া গোড়ালির সঙ্গে লেগে থাকে, যা مُنَعَّلْ [নীচের অংশে চামড়া লাগানো] হয় কিংবা مُجَلَّدْ [উপর ও নীচের অংশে চামড়া লাগানো] হয়। এমনকি যদি জাওরাবদ্বয় মোটা হয়, কিন্তু مُنَعَّلْ কিংবা مُجَلَّدْ না হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট এর উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। এতে সাহেবাইন (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সাহেবাইন (র.)-এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং এরই উপর ফতোয়া। [মোজার উপর মাসেহ তখনই জায়েজ] যখন মোজাদ্বয় হদস যুক্ত হওয়ার সময় পরিপূর্ণ তাহারাত অবস্থায় পরিহিত হবে। অতএব, যদি কেউ ধারাবাহিকতা ছাড়া অজু করে [যেমন–] উভয় পাকে প্রথমে ধুয়ে মোজা পরিধান করে ফেলে, অতঃপর অন্যান্য অঙ্গকে ধৌত করে, তারপর হদস লাহেক হয় এবং অজু করে, কিংবা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে অজু করে। অতঃপর [হাত, মুখ ধোয়া ও মাথা মাসেহ করার পর] ডান পা ধৌত করে মোজায় প্রবেশ করিয়েছে, অত:পর বাম পা ধৌত করে মোজায় প্রবেশ করিয়েছে, তবে প্রথম সুরতে তার পরিপূর্ণ তাহারাত [পবিত্রতা] ছিল না এবং দ্বিতীয় সুরতে যখন সে ডান পায়ে মোজা পরিধান করেছে [তখনও তার পরিপূর্ণ তাহারাত হাসিল হয়নি]। কিন্তু উভয় মোজা হদস লাহেক হওয়ার সময় পরিপূর্ণ তাহারাতের উপর পরিহিত অবস্থায় ছিল। সুতরাং বোঝা গেল যে, গ্রন্থকারের مَلْبُوْسَيْنِ ইবারত ফুকাহায়ে কেরামের ইবারত إِذَا لَبِسَهُمَا عَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ -এর চেয়ে উত্তম। কেননা, উদ্দেশ্য হলো– হদস হওয়ার সময় পরিপূর্ণ তাহারাত থাকা। আর হদস হওয়ার উক্ত সময়টি হচ্ছে, মোজা পরিহিত অবস্থার সময়; পরিধান করার মুহূর্ত নয়। [কেননা, পরিধান করা তো আগেই হয়ে গেছে।] অতএব, এটা বলা সহীহ যে– هُمَا مَلْبُوْسَانِ عَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ [অর্থাৎ উক্ত মোজাদ্বয়

হদস হওয়ার সময় পূর্ণ তাহারাতের উপর পরিহিত।] এটি বলা সহীহ নয় যে– لَبِسَهُمَا عَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ حُدُوْثَ [অর্থাৎ এ দুটিকে হদস-এর সময় পরিপূর্ণ তাহারাত-এর উপর পরিধান করেছে।] কেননা, فِعْل [ক্রিয়া] [নতুনত্ব] -কে বুঝায়, আর اِسْم স্থায়িত্বকে বুঝায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْ جَوْرَبَيْهِ الثَّخِيْنَيْنِ الخ : جَوْرَبْ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আমরা ইতঃপূর্বে করেছি। তথাপি এখানে প্রসঙ্গ এসেছে বলে কিছু কথা তুলে ধরছি। جَوْرَبْ বলা হয় ঐ মোজাকে যা চামড়াবিহীন অন্য কিছুর তৈরি। চাই সুতার হোক, কিংবা পশমের হোক। কখনো جَوْرَبْ -এর নীচের অংশে চামড়া লাগানো হয়, তখন একে مُنَعَّلْ বলা হয়। আবার কখনো এর উপর ও নীচের উভয়াংশে চামড়া লাগানো হয়, তখন একে مُجَلَّدْ বলা হয়।

অতঃপর جَوْرَبْ -এর মোট সুরত চারটি –

১. جَوْرَبْ মোটা কাপড় দ্বারা তৈরি বা ثَخِيْن হয়ে مُجَلَّدْ হবে। তবে সর্বসম্মতিক্রমে এর উপর মাসেহ করা জায়েজ আছে।
২. جَوْرَبْ মোটা কাপড়ের তৈরি বা ثَخِيْن হয়ে مُنَعَّلْ হবে। তবে সর্বসম্মতিক্রমে এর উপরও মাসেহ করা বৈধ।
৩. جَوْرَبْ মোটা কাপড়ের তৈরি ثَخِيْن নয়; বরং رَقِيْق বা পাতলা কাপড়ের তৈরি, তবে مُجَلَّدْ- ও নয় এবং مُنَعَّلْ-ও নয়। তবে সর্বসম্মতিক্রমে এর উপর মাসেহ করা বৈধ নয়।
৪. جَوْرَبْ মোটা কাপড়ের তৈরি বা ثَخِيْن বটে, কিন্তু তা مُجَلَّدْ কিংবা مُنَعَّلْ নয়। তবে এর হুকুম নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। মূলত উক্ত মতানৈক্যের কোনো ভিত্তি নেই। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি পরবর্তীতে সাহেবাইন (র.)-এর অভিমতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। মতানৈক্যপূর্ণ এ মাসআলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِب : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, মোটা কাপড়ের তৈরি جَوْرَبْ ثَخِيْن যা مُجَلَّدْ কিংবা مُنَعَّلْ নয় এর উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) বলেন, এর উপরও মাসেহ করা জায়েজ।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো– হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত– اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ। "রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই জাওরাব-এর উপর মাসেহ করেছেন।" –[তিরমিযী ১ : ১৬৭, আবূ দাউদ ১ : ১২২]

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জারমূক-এর উপর মাসেহ করেছেন। আর হাদীসে উল্লেখ নেই যে, সে জারমূকটি مُجَلَّدْ কিংবা مُنَعَّلْ ছিল। হতে পারে সেটি দুটির একটিও ছিল না; বরং সেটি ছিল শুধু ثَخِيْن তথা মোটা কাপড়ের তৈরি।

সাহেবাইন (র.)-এর যৌক্তিক দলিল হলো, জাওরাব যদি এতটা মোটা এবং মজবুত হয় যে, কোনো বাঁধন ব্যতীত তা পায়ের নলার সাথে স্থিরভাবে মিশে থাকে, উপরে পানি লাগলে পায়ের চামড়া পর্যন্ত চুষে নেয় না এবং এটা পরিধান করে ক্রমাগত চলাচল সম্ভব হয়, তবে তা মোজার সদৃশ বলে গণ্য হয়। সুতরাং মোজার উপর মাসেহ করা যেমনিভাবে জায়েজ, তেমনি জাওরাব-এর উপর মাসেহ করাও জায়েজ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, জাওরাবকে তখনই মোজার সদৃশ বলে গণ্য করা হবে, যখন সর্বদিক থেকে জাওরাব মোজার অর্থ বহন করবে। অথচ বাস্তবে জাওরাব মোজার অর্থে নয়। কারণ, মোজা পরিধান করে ক্রমাগত চলাচল করা যায়, কিন্তু غَيْرُ مُجَلَّدْ ও غَيْرُ مُنَعَّلْ জাওরাব পরিধান করে তা করা যায় না। অবশ্যই مُجَلَّدْ ও مُنَعَّلْ জাওরাব দ্বারা যেহেতু এটা করা সম্ভব, সেহেতু এর উপর মাসেহ করা জায়েজ। তাঁর মতে, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিও مُجَلَّدْ কিংবা مُنَعَّلْ জাওরাব -এর উপর প্রয়োগ হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইন্তেকালের তিনদিন পূর্বে মতান্তরে ৯ দিন পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় غَيْرُ مُنَعَّلْ ও غَيْرُ مُجَلَّدْ জাওরাব -এর উপর মাসেহ করেছেন। যারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন– فَعَلْتُ مَا كُنْتُ اَمْنَعُ النَّاسَ عَنْهُ "আমি এখন তা-ই করলাম এতদিন মানুষকে যা করতে নিষেধ করতাম।" এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) স্বীয় মত পরিবর্তন করে সাহেবাইন (র.)-এর মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। শরহে বিকায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রত্যাবর্তিত মতের উপরই হানাফী মাযহাবের ফতোয়া।

❖ **মোজার উপর মাসেহ করার শর্তসমূহ :** মোজার উপর মাসেহ করার শর্তসমূহ দুভাগে বিভক্ত– ১. যা মোজার সাথে সংশ্লিষ্ট। এগুলোর বিবরণ আমাদের গত হয়ে গেছে যে, মোজা কোন ধরনের হতে হবে ইত্যাদি। ২. যা মাসেহকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ মাসেহকারী পুরুষ হোক চাই মহিলা হোক, যদি সে পূর্ণাঙ্গ তাহারাত অবস্থায় উভয় পায়ে মোজা পরিধান করে থাকে, তবে তার জন্য মোজার উপর মাসেহ করা জায়েজ আছে। আমাদের বিকায়া গ্রন্থকার (র.) مَلْبُوْسَيْنِ عَلٰى طُهْرٍ الخ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, যখন হদস সংঘটিত হবে তখন মোজাগুলো পরিপূর্ণ তাহারাতের উপর পরিহিত অবস্থায় থাকতে হবে। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন– طُهْر تَامْ বা পরিপূর্ণ তাহারাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, مَاءْ مُطْلَقْ দ্বারা যা অজু ও গোসলের মাধ্যমে অর্জিত হয়। তা ছাড়া অন্যান্য জিনিস দ্বারা যে তাহারাত হাসিল করা হয় তা طُهْر تَامْ নয়; বরং তা طُهْر نَاقِصْ যেমন– তায়াম্মুম কিংবা খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা অর্জিত পবিত্রতা ইত্যাদি। পরিপূর্ণ তাহারাত-এর উপর মোজা পরিধান করার পর যে হদস যুক্ত হবে, তা এমন হদস হতে হবে, যা শুধু অজুকে ওয়াজিব করে। কেননা, যদি পূর্ণাঙ্গ তাহারাত লাভের পর মোজা পরিধান এবং এরপর ঐ ব্যক্তির এমন হদস যুক্ত হয়, যা গোসলকে ওয়াজিব করে তবে তার জন্য মোজার উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ لَيْسَتْ لَهُ طَهَارَةٌ تَامَّةٌ فِى الصُّوْرَةِ الخ : অর্থাৎ যদি কেউ ধারাবাহিকতাবিহীন অজু করত প্রথমে পাদ্বয় ধুয়ে মোজা পরিধান করে ফেলে, অতঃপর অন্যান্য অঙ্গ ধুয়ে অজু পরিপূর্ণ করে– এ অবস্থায় যদি হদস যুক্ত হয়, তবে পরিধান করার সময় সে পরিপূর্ণ তাহারাতের উপর ছিল না; বরং তখন সে শুধু পা ধৌত করেছিল। কেননা, সে পরবর্তীতে তার অজু পরিপূর্ণ করেছে। হ্যাঁ এটা বলা যাবে যে, সে পরবর্তী হদস যুক্ত হওয়ার সময় পরিপূর্ণ তাহারাতের উপর থাকবে। এ সুরতে সে মোজার উপর মাসেহ করতে পারবে। কেননা, যদিও মোজা পরিধান করার সময় পরিপূর্ণ তাহারাত ছিল না, কিন্তু যখন তার সাথে হদস যুক্ত হয়েছে তখন সে পরিপূর্ণ তাহারাত-এর উপর মোজা পরিহিত অবস্থায় ছিল। আর মাসেহের জন্য এটিই জরুরি।

قَوْلُهُ وَفِى الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا لَبِسَ الخ : যদি ধারাবাহিকভাবে অজু করে এবং পা ধোয়ার সময় প্রথমে ডান পা ধুয়ে মোজা পরিধান করে ফেলে, অতঃপর বাম পা ধুয়ে অজু পরিপূর্ণ করে। এ সুরতেও তার ডান পায়ে মোজা পরিধান করার সময় সে পরিপূর্ণ তাহারাতের উপর ছিল না, তবে তার জন্য মোজার উপর মাসেহ জায়েজ আছে। কেননা, যখন হদস যুক্ত হয়েছে তখন তার পরিপূর্ণ পবিত্রতা ছিল না; কিন্তু হদস যুক্ত হওয়ার পূর্বে [অজু সমাপ্তির পরে] সে পরিপূর্ণ তাহারাতের উপর মোজা পরিহিত অবস্থায় ছিল। এ উপরোল্লিখিত বক্তব্য ছিল আহনাফের নিকট। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মোজা পরিধান করার সময় পরিপূর্ণ তাহারাত অবস্থায় পরিধান করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত মুগীরা (রা.) সূত্রে বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন–

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَاَهْوَيْتُ لِاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ : دَعْهُمَا فَاِنِّىْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

অর্থাৎ "হযরত মুগীরা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমি তাঁর [পায়ের] মোজাদ্বয় খুলতে চাইলাম। তিনি বললেন, মোজাদ্বয় খুলতে হবে না। কেননা, এগুলো আমি পরিধান করেছি এমতাবস্থায় যে, এগুলো পবিত্র-তাহির। অতঃপর তিনি এর উপর মাসেহ করেছেন।" –[বুখারী ও মুসলিম]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজাদ্বয় পরিধান করেছেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর পদদ্বয় পবিত্র ছিল। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মোজা পরিধান করার সময়ের পবিত্রতা শর্ত।

আহনাফ-এর দলিল হলো, মোজা পায়ে হদস বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। অতএব, যখন মোজা হদসের জন্য প্রতিবন্ধক হবে, তখনই পরিপূর্ণ তাহারাত থাকা শর্ত। আর সে সময়টি হচ্ছে হদস -এর সময়; মোজা পরিধান করার সময় নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, তার মর্ম হচ্ছে, তিনি যখন যে পায়ে মোজা পরিধান করেছেন তখন সে পা পবিত্র অবস্থায়ই ছিল। কেননা, তিনি তো তাঁর পা ধৌত করার পর মোজা পরিধান করেছেন। এমনটি নয় যে, তিনি পরিপূর্ণ তাহারাত অবস্থায় মোজা পরিধান করেছেন।

قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ اَنْ يُّقَالَ الخ : অর্থাৎ لَبِسَهُمَا عَلٰى طَهَارَةٍ الخ -এর উদ্দেশ্য হলো, মোজাদ্বয়কে হদস-এর সময় পরিপূর্ণ তাহারাতের উপর পরিধান করল।' এটি فِعْل তথা لَبِسَهُمَا -এর রূপ, যা حُدُوْث [নতুনত্ব] বুঝায়, তাই এমনটি বলা সহীহ নয়। اِسْم -এর রূপ [তথা هُمَا مَلْبُوْسَانِ عَلٰى طَاهِرَةٍ الخ] এর পরিপন্থি। কেননা, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে– "মোজাদ্বয় হদস যুক্ত হওয়ার সময় পরিপূর্ণ তাহারাতের উপর পরিহিত ছিল।" কারণ এটি اِسْمُ مَفْعُوْل -এর রূপ, যা ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব বুঝায়। উভয় শব্দের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

لَا عَلٰى عِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ وَبُرْقُعٍ وَقُفَّازَيْنِ اَلْقُفَّازُ مَا يَلْبَسُ الْكَفَّ لِيَكُفَّ عَنْهَا مِخْلَبَ الصَّقْرِ وَالْبَازِيْ وَنَحْوِهِ وَفَرْضُهُ قَدْرَ ثَلٰثِ اَصَابِعِ الْيَدِ فَاِنَّ مَسْحَ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ خُطُوْطًا فَعُلِمَ اَنَّهَا بِالْاَصَابِعِ دُوْنَ الْكَفِّ وَمَا زَادَ عَلٰى مِقْدَارِ ثَلٰثِ اَصَابِعَ اِنَّمَا هُوَ بِمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ فَلَا اِعْتِبَارَ لَهُ فَبَقِيَ مِقْدَارُ ثَلٰثِ اَصَابِعَ وَلَا يَفْرُضُ فِيْهِ شَيْءٌ اٰخَرُ كَالنِّيَّةِ وَغَيْرِهَا.

অনুবাদ : পাগড়ি, টুপি, বোরকা ও হাত-মোজার উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। কুফ্‌ফায [হাত-মোজা] বলা হয়, যা শ্যেন, বাজ ইত্যাদি পাখির থাবাকে প্রতিহত করার জন্য হাতে পরিধান করা হয়। মাসেহের ফরজ হলো, হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ [মাসেহ করা]। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাসেহ ছিল রেখা টানা। অতএব বুঝা গেল, তা ছিল আঙ্গুল দ্বারা; হাতের তালু দ্বারা নয়। আর তিন আঙ্গুল পরিমাণের চেয়ে যা বেশি তা হবে مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ [ব্যবহৃত পানি] দ্বারা। তাই তা ধর্তব্য নয়। সুতরাং বাকি থাকে তিন আঙ্গুল পরিমাণ। মাসেহের মধ্যে অন্য কিছু ফরজ নয়। যেমন– নিয়ত ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا عَلٰى عِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ الخ : পাগড়ি ও টুপির উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। হ্যাঁ, যদি মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করার পর টুপি কিংবা পাগড়ির উপর বাকি অংশ মাসেহ করে তবে তার মাসেহের فَرْضِيَّةٌ আদায় হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ও আওযাঈ (র.) বলেন, مُطْلَقًا পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েজ। আহনাফ বলেন, মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করার পর বাকি অংশ পাগড়ির উপর মাসেহ করলেও فَرْضِيَّةٌ আদায় হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও আওযাঈ (র.)-এর দলিল হলো, হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজা ও পাগড়ির উপর মাসেহ করেছেন। [আবূ দাউদ] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েজ।

আহনাফের দলিল হলো, মোজার উপর মাসেহ করার অবকাশ দেওয়াই হয়েছে অসুবিধা দূর করার জন্য, কিন্তু উপরিউক্ত জিনিসগুলো খোলা যেহেতু অসুবিধাজনক নয়, সেহেতু এগুলোর উপর মাসেহ করাও বৈধ নয়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) যে হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন তাও এমন যে, নবী করীম ﷺ প্রথমে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করার পর পাগড়ির উপর মাসেহ করেছেন। অতএব, এর দ্বারা পাগড়ির উপর মাসেহ করার বৈধতা প্রমাণিত হয় না।

অনুরূপ মহিলাদের জন্য বোরকার উপর মাসেহ করা বৈধ নয়। কোনো কোনো শিকারকারী শিকারি পাখি ধরার জন্য হাতে মোজা পরিধান করে, যাতে পাখির আঘাত থেকে হাত হেফাজত হয়, অথবা কেউ ঠাণ্ডার কারণে হাত মোজা ব্যবহার করে, এর উপরও মাসেহ করা জায়েজ নেই। উদ্দেশ্য হলো, মোজার উপর মাসেহ করা জায়েজ হওয়ার উপর কিয়াস করে পাগড়ি, টুপি, বোরকা এবং হাত-মোজার উপর মাসেহ বৈধ সাব্যস্ত করা সহীহ নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ সমস্ত জিনিসের উপর মাসেহ করা বর্ণিত নেই।

قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ : نَحْوُهُ শব্দটির মাঝে তিন প্রকারের إِعْرَابْ-ই সহীহ। যদি كَسْرَهْ পড়া হয়, তবে এর عَطْف হবে صَقْر-এর উপর। যদি এতে فتحه পড়া হয়, তবে এর عَطْف হবে مِخْلَبْ-এর উপর। আর যদি ضُمَّهْ পড়া হয়, তবুও এর عَطْف হবে مِخْلَبْ-এর উপর– উল্লিখিত দুই مُقَدَّرْ শব্দের ভিত্তিতে।

قَوْلُهُ وَفَرْضُهُ قَدْرُ ثَلٰثِ اَصَابِعِ الخ :

মোজার উপর মাসেহের ফরজ অংশ : হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাসেহ করা ফরজ। তবে হাতের হুবহু তিন আঙ্গুল হওয়া জরুরি নয়; বরং তিন আঙ্গুল পরিমাণ ফরজ। অধিকাংশ ফকীহগণের নিকট হাতের তিন আঙ্গুল ধর্তব্য। মাসেহের আয়াত-এর উপর ভিত্তি করে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম কারখী (র.) বলেন, পায়ের ছোট তিন আঙ্গুল ধর্তব্য। মোজা ফাটার পরিমাণের ক্ষেত্রে যেহেতু পায়ের ছোট তিন আঙ্গুল পরিমাণ ধর্তব্য, সেহেতু এখানেও এ পরিমাণই ধর্তব্য। এ সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَفْرُضُ فِيْهِ شَيْءٌ اٰخَرُ : অর্থাৎ "তিন আঙ্গুল মাসেহ" ব্যতীত নিয়ত, তারতীব, মুওয়ালাত ইত্যাদি কিছুই মাসেহের মধ্যে ফরজ নয়। কেননা, এগুলো ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো দলিল নেই। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, মাসেহ তায়াম্মুমের ন্যায়। যেমন– তায়াম্মুম গোসল ও অজুর বদল, তাই মাসেহের মধ্যে নিয়ত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়। যেমন– নিয়ত করা তায়াম্মুমের মধ্যে শর্ত। উত্তর হলো, দলিল-প্রমাণ থাকার কারণে তায়াম্মুমের নিয়ত শর্ত। কিন্তু মোজার উপর মাসেহের ক্ষেত্রে এমন কোনো দলিল নেই। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মাথা মাসেহ। উভয়টিই পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে বরাবর। আর মাথা মাসেহের মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়, তাই মোজার উপর মাসেহের ক্ষেত্রেও নিয়ত শর্ত নয়।

وَمُدَّتُهُ لِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا مِنْ حِيْنِ الْحَدَثِ لِاَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا اَلْحَدِيْثُ اَفَادَ جَوَازُ الْمَسْحِ فِى الْمُدَّةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَقَبْلَ الْحَدَثِ لَا اِحْتِيَاجَ اِلَى الْمَسْحِ فِى الزَّمَانِ الَّذِىْ يَحْتَاجُ فِيْهِ اِلَى الْمَسْحِ وَهُوَ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ مُقَدَّرٌ بِالْمِقْدَارِ الْمَذْكُوْرِ ـ

অনুবাদ : [মোজার উপর] মাসেহের সময়সীমা হচ্ছে, মুকীমের জন্য হদস যুক্ত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– "মুকীম একদিন একরাত এবং মুসাফির তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মাসেহ করবে।" [হাদীস শেষ পর্যন্ত।] উক্ত হাদীস উল্লিখিত সময়ে মোজার উপর মাসেহের বৈধতা বুঝায়। হদস যুক্ত হওয়ার পূর্বে মাসেহ করার প্রয়োজন হয় না। তাই ঐ সময় যখন মাসেহের প্রয়োজন দেখা দেয়, তা হদস যুক্ত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে উল্লিখিত সময় পরিমাণের সাথে ধর্তব্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمُدَّتُهُ لِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ الخ :

মোজার উপর মাসেহের সময়সীমা : মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা সম্পর্কে আহনাফ ও ইমাম মালেক (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, হদস যুক্ত হওয়ার পর থেকে নিয়ে মুকীম ব্যক্তি একদিন একরাত এবং মুসাফির ব্যক্তি তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মাসেহ করবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক (র.) থেকে দুটি অভিমত রয়েছে–

১. মুকীম ব্যক্তি মোজার উপর মোটেই মাসেহ করতে পারবে না, আর মুসাফির ব্যক্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য মাসেহ করতে পারবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা না খুলবে।

২. মুকীমের হুকুম মুসাফিরের হুকুমের ন্যায়। অর্থাৎ মুসাফির যেমন যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা না খুলে ততক্ষণ মাসেহ করতে পারে তেমনি মুকীমও মাসেহ করবে।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম মালেক (র.)-এর প্রথম অভিমতের দলিল হলো, মোজার উপর মাসেহকে শরিয়ত বৈধ করেছে জরুরতের কারণে, আর মুকীমের বেলায় এ ধরনের কোনো জরুরত নেই। তাই মুকীমের জন্য মোজার উপর মাসেহ করাও জায়েজ নেই।

ইমাম মালেক (র.)-এর দ্বিতীয় অভিমতের দলিল হলো, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেন–

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَوْمًا قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ حَتّٰى اِنْتَهَيْتُ اِلٰى سَبْعَةِ اَيَّامٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا كُنْتَ فِىْ سَفَرٍ فَامْسَحْ مَا بَدَالَكَ ـ

অর্থাৎ "আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একদিন মোজার উপর মাসেহ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি আবার বললাম, দুদিন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! এভাবে আমি [বলতে বলতে] সাতদিন পর্যন্ত পৌঁছলাম। তিনি বললেন, তুমি যখন সফর অবস্থায় থাকবে তখন যতদিন ইচ্ছা মোজার উপর মাসেহ করতে পারবে।" –[আবূ দাউদ ১ : ২১]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসাফির ব্যক্তির জন্য মোজার উপর মাসেহ করার ব্যাপারে কোনো সময়সীমা নির্ধারিত নেই।

আহনাফের দলিল হলো হাদীসে মাশহূর। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا .

অর্থাৎ মুকীম ব্যক্তি মোজার উপর একদিন একরাত মাসেহ করবে এবং মুসাফির ব্যক্তি তিনদিন তিনরাত মাসেহ করবে। –[মুসলিম-হাদীস : ২৭৬, নাসাঈ ১ : ৮৪, মুসনাদে আহমাদ– ১ : ১১৩]

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত মাসেহ করার অবকাশ রয়েছে।

اَلرَّدُّ عَلٰى مَالِكٍ (رحـ) : ইমাম মালেক (র.) মুকীমের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার কোনো জরুরত নেই বলে যে উক্তি করেছেন, এ বক্তব্যের সাথে আমরা একমত নই। কারণ, মুকীমেরও এর জরুরত আছে। ইমাম মালেক (র.) যে হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেছেন এর সনদ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রকম আপত্তি উত্থাপন করেছেন। যেমন– ইমাম বুখারী (র.) বলেন, হাদীসটি 'মাজহূল'। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, এ হাদীসের সকল رِجَالٌ-ই- غَيْرُ مَعْرُوْفٍ- আরো অনেক ইমাম অনেক রকমের মন্তব্য করেছেন। অতএব, এ অপ্রসিদ্ধ (شَاذٌ) হাদীস দ্বারা আমাদের মাশহূর হাদীসকে বর্জন করা যাবে না।

তা ছাড়া উক্ত হাদীস দ্বারা হুজুর ﷺ যা বুঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে, মোজার উপর মাসেহ করার ব্যাপারটি রহিত হয়ে যায়নি; বরং এটি একটি স্থায়ী বিধান। এর অর্থ এই নয় যে, এ সময়ের মাঝে আর মোজা খুলবে না।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর ১ : ১৪৯, বাদায়িউস সানায়ে' ১ : ৭৮-৮০, বাহরুর রায়িক ১ : ২৯৮-২৯৯, ফাতহুল মুলহিম ১ : ৪৩৭-৪৩৯, মা'আরিফুস সুনান ১ : ৩৩৫-৩৩৬, দরসে তিরমিযী ১ : ৩২৯-৩৩২]

قَوْلُهُ مِنْ حِيْنِ الْحَدَثِ : যে সময়ের মধ্যে সে মাসেহ করবে সে সময়ের সূচনা হয় হদস যুক্ত হওয়ার সময় থেকে। অর্থাৎ হদস যুক্ত হওয়ার পর থেকে মুকীমের একদিন একরাত এবং মুসাফিরের তিনদিন তিনরাত-এর হিসাব শুরু হবে। এটি জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হদস যুক্ত হওয়ার পর মাসেহ শুরু করা থেকে উক্ত সময়ের হিসাব শুরু হবে। ইমাম হাসান বসরী (র.)-এর নিকট উক্ত সময়ের হিসাব শুরু হবে পরিধান করার সময় থেকে। যেমন– কোনো ব্যক্তি জুমার দিন ফজরের নামাজের সময় অজু করে মোজা পরিধান করে এবং উক্ত অজু দ্বারাই জুমার নামাজ আদায় করে, অতঃপর তার হদস যুক্ত হয়, কিন্তু সে সাথে সাথে অজু করে মাসেহ করেনি; বরং আসরের নামাজের অজুতে মোজার উপর মাসেহ করে, তবে জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে তার জন্য দ্বিতীয় দিন জোহরের পর পর্যন্ত মাসেহ করার অনুমতি রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে, দ্বিতীয় দিন আসরের নামাজের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মাসেহ করার অনুমতি রয়েছে এবং ইমাম হাসান বসরী (র.)-এর মতে, পরের দিন ফজরের পূর্ব পর্যন্ত মাসেহ করার অনুমতি রয়েছে।

শারেহ (র.) জুমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমতের পক্ষে একটি যুক্তি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হদস যুক্ত হওয়ার পূর্বে মোজার উপর মাসেহ করার কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় না; বরং হদস যুক্ত হওয়ার পর মাসেহের প্রয়োজন দেখা দেয়। অতএব, তখন তথা হদস যুক্ত হওয়া থেকেই মাসেহের সময়সীমাকে হিসাব করা হবে। কেননা, এ হদসই পরবর্তীতে তাহারাত অর্জনকে আবশ্যক করে এবং পূর্ববর্তী তাহারাতকে ভেঙ্গে দেয়।

وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوْءِ وَنَزْعُ الْخُفِّ ذُكِرَ لَفْظُ الْوَاحِدِ وَلَمْ يَقُلْ نَزْعُ الْخُفَّيْنِ لِيُفِيْدَ اَنَّ نَزْعَ اَحَدِهِمَا نَاقِضٌ فَاِنَّهُ اِذَا نَزَعَ اَحَدُهُمَا وَجَبَ غَسْلُ اِحْدَى الرِّجْلَيْنِ فَوَجَبَ غَسْلُ الْاُخْرٰى اِذْ لَا جَمْعَ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ وَكَذَا اِنْ دَخَلَ الْمَاءُ اَحَدَ خُفَّيْهِ حَتّٰى صَارَ جَمِيْعُ الرِّجْلِ مَغْسُوْلًا وَاِنْ اَصَابَ الْمَاءُ اَكْثَرَهَا فَكَذَا عِنْدَ الْفَقِيْهِ اَبِىْ جَعْفَرٍ (رح) ـ

অনুবাদ : যা অজুকে ভঙ্গ করে তা মাসেহকেও ভঙ্গ করে এবং মোজা খুলে ফেলা [মাসেহ ভঙ্গ করে]। গ্রন্থকার (خُفّ) একবচন শব্দ উল্লেখ করেছেন এবং [দ্বিবচন] نَزْعُ الْخُفَّيْنِ শব্দ বলেননি, যেন এ কথার ফায়দা দেয় যে, এক মোজা খোলা মাসেহ ভঙ্গকারী। কেননা, যখন এক মোজা খুলে ফেলবে তখন তার একটি পা ধোয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। অতএব, অপর পা ধোয়াও ওয়াজিব হবে। কেননা, ধোয়া (غَسْل) ও মাসেহ (مَسْح) একত্রিত করা জায়েজ নেই। অনুরূপ যদি কোনো এক মোজায় পানি প্রবেশ করে, এমনকি যদি পূর্ণ ধোয়া হয়ে যায় [তবে তার অপর পা ধৌত করতে হবে]। আর যদি পায়ের অধিক অংশে পানি পৌঁছে, তবে ফকীহ আবূ জা'ফর (র.)-এর নিকট এর হুকুম অনুরূপই [তথা অপর পা-ও ধৌত করতে হবে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوْءِ الخ :

মাসেহ ভঙ্গের কারণসমূহ : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যেসব জিনিস অজু ভঙ্গকারী সেসব জিনিস মোজার মাসেহ ভঙ্গকারীও বটে। কারণ, মোজার উপর মাসেহ করা অজুরই অংশবিশেষ, তাই যা كُلّ [সমগ্র] -এর ভঙ্গকারী তা আরো উত্তমভাবে جُزْء [অংশ] -এরও ভঙ্গকারী হবে। আর মোজা খুলে ফেলাও মাসেহ ভঙ্গের একটি কারণ। কেননা, মোজা ছিল পায়ের পাতা পর্যন্ত হদস পৌঁছার পথে প্রতিবন্ধক। এখন মোজা খোলার মাধ্যমে যখন সেই প্রতিবন্ধক দূর হয়ে গেছে, তখন হদসও অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে মাসেহও ভেঙ্গে গেছে।

যদি এক পায়ের মোজা খুলে যায় তবুও মাসেহ ভেঙ্গে যাবে। তখন অপর পায়ের মোজা খুলে উভয় পাকে ধৌত করা ফরজ। কারণ, একই আমলের মধ্যে ধোয়া ও মাসেহকে একত্রিত করা শরয়ীভাবে অসম্ভব। তবে তাকে পরিপূর্ণ অজু করতে হবে না। কেননা, তার অজু ভঙ্গের কোনো কারণ দেখা দেয়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (র.) থেকে এমনই বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ حَتّٰى صَارَ جَمِيْعُ الرِّجْلِ الخ : অর্থাৎ যদি কোনো এক মোজায় কোনোভাবে পানি প্রবেশ করে তখন দেখা হবে যে, পায়ের কতটুকু অংশ পানিতে ভিজে গেছে। যদি পায়ের কম অংশ কিংবা তিন আঙ্গুল পরিমাণ অংশ কিংবা এর চেয়েও কম ভিজে, তবে মাসেহ ভাঙ্গবে না। ফতোয়ায়ে কাযীখান-এর মধ্যে এমনই উল্লেখ রয়েছে। আর যদি পূর্ণ পা ভিজে যায় কিংবা অধিকাংশ পা ভিজে যায়, তবে মাসেহ ভেঙ্গে যাবে।

وَمَضَى الْمُدَّةِ وَبَعْدَ اَحَدِ هٰذَيْنِ اَىْ نَزْعِ الْخُفِّ وَمَضِى الْمُدَّةِ عَلَى الْمُتَوَضِّى غَسْلُ رِجْلَيْهِ فَحَسْبُ اَىْ عَلَى الَّذِىْ كَانَ لَهُ وُضُوْءٌ لَا يَجِبُ اِلَّا غَسْلُ رِجْلَيْهِ اَىْ لَا يَجِبُ غَسْلُ بَقِيَّةِ الْاَعْضَاءِ وَيَنْبَغِىْ اَنْ يَّكُوْنَ فِيْهِ خِلَافُ مَالِكٍ (رح) بِنَاءً عَلَى فَرْضِيَّةِ الْوَلَاءِ عِنْدَهُ وَخُرُوْجُ اَكْثَرِ الْعَقِبِ اِلَى السَّاقِ نَزْعٌ وَلَفْظُ الْقُدُوْرِىْ اَكْثَرُ الْقَدَمِ وَمَا اخْتَارَهُ فِى الْمَتَنِ مَرْوِىٌّ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَيَمْنَعُهُ خَرْقُ خُفٍّ يَبْدُوْ مِنْهُ قَدْرَ ثَلٰثِ اَصَابِعِ الرِّجْلِ اَصْغَرُهَا لَا مَا دُوْنَهُ فَلَوْ كَانَ الْخَرْقُ طَوِيْلًا يَدْخُلُ فِيْهِ ثَلٰثُ اَصَابِعَ اِنْ اُدْخِلَتْ لٰكِنْ لَا يَبْدُوْ مِنْهُ هٰذَا الْمِقْدَارِ جَازَ الْمَسْحُ وَلَوْ كَانَ مَضْمُوْمًا لٰكِنْ يَنْفَتِحُ اِذَا مَشٰى وَيَظْهَرُ هٰذَا الْمِقْدَارُ لَا يَجُوْزُ فَعُلِمَ مِنْهُ اَنَّ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْغَزْلِ وَنَحْوِهِ مَشْقُوْقٌ اَسْفَلَ الْكَعْبِ اِنْ كَانَ يَسْتُرُ الْكَعْبَ بِخَيْطٍ اَوْ نَحْوِهِ يَشُدُّ بَعْدَ اللُّبْسِ بِحَيْثُ لَا يَبْدُوْ مِنْهُ شَىْءٌ فَهُوَ كَغَيْرِ الْمَشْقُوْقِ وَاِنْ بَدَا كَانَ الْخَرْقُ فَيُعْتَبَرُ الْمِقْدَارُ الْمَذْكُوْرُ وَيَجْمَعُ خُرُوْقَ خُفٍّ لَا خُفَّيْنِ اَىْ اِذَا كَانَ عَلٰى خُفٍّ وَاحِدٍ خُرُوْقٌ كَثِيْرَةٌ تَحْتَ السَّاقِ وَيَبْدُوْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَىْءٌ قَلِيْلٌ بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ الْبَادِىْ يَكُوْنَ مِقْدَارُ ثَلٰثِ اَصَابِعَ يَمْنَعُ الْمَسْحَ وَلَوْ كَانَ هٰذَا الْمِقْدَارُ فِى الْخُفَّيْنِ جَازَ الْمَسْحُ .

অনুবাদ : সময় উত্তীর্ণ হওয়া [মোজার মাসেহ ভঙ্গকারী] এবং এ দুই তথা মোজা খোলা ও সময় উত্তীর্ণ এর কোনো একটির পর অজুকারী ব্যক্তির উপর শুধু পাদ্বয় ধৌত করা ওয়াজিব। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যার অজু আছে তার উপর শুধু পাদ্বয় ধৌত করা ওয়াজিব; অন্যান্য অঙ্গ ধোয়া ওয়াজিব নয়। ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট যেহেতু অজুতে ওয়ালা [তারতীব] ফরজ, তাই এর ভিত্তিতে এতে তাঁর মতানৈক্য হওয়া সঙ্গত, [কিন্তু এতে তার স্পষ্টভাবে মতানৈক্য পাওয়া যায় না]। আর গোড়ালির দিকে গোড়ালির অধিকাংশ প্রকাশ পাওয়া হচ্ছে [মোজা] খোলা। [এ ক্ষেত্রে] কুদূরী গ্রন্থের শব্দ হলো– اَكْثَرُ الْقَدَمِ [পায়ের পাতার অধিক অংশ]। মতনে [আমাদের] গ্রন্থকার যে শব্দ চয়ন করেছেন, তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। মোজার ঐ পরিমাণ ছেঁড়া মাসেহকে নিষেধ করে, যার কারণে পায়ের ছোট তিন আঙ্গুল পরিমাণ অংশ দেখা যায়। এর চেয়ে কম পরিমাণ ছেঁড়া [মাসেহকে নিষেধ করে] না। অতএব, ছেঁড়া যদি এত লম্বা পরিমাণ হয় যে, যদি এতে তিন আঙ্গুল প্রবেশ করানো হয় তবে প্রবেশ হয়ে যায়– কিন্তু [চলার সময়] এ পরিমাণ অংশ প্রকাশ পায় না, তবে [এর উপর] মাসেহ করা জায়েজ। আর যদি ছেঁড়া অংশ মিলিত থাকে, কিন্তু চলার সময় তা প্রকাশ পেয়ে যায় এবং এ পরিমাণ অংশ খুলে যায়, তবে এর উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। সুতরাং এর থেকে বুঝা গেল যে, সুতা -এ জাতীয় কোনো বস্তু দ্বারা মেরামতকৃত কোনো মোজা যা টাখনুর নীচের অংশে ছেঁড়া হয়, তা

যদি পরিধান করার পর সুতা বা এ জাতীয় কিছুর দ্বারা বেঁধে রাখলে টাখনু এভাবে ঢেকে থাকে যে, পায়ের কোনো অংশ প্রকাশ পায় না, তবে এর হুকুম ছেঁড়াবিহীন মোজার হুকুমের ন্যায়। পক্ষান্তরে যদি পায়ের অংশ প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে এর হুকুম ছেঁড়া মোজার হুকুমের ন্যায়। তখন উল্লিখিত পরিমাণ [তথা তিন আঙ্গুল পরিমাণ] ধর্তব্য হবে। এক মোজার একাধিক ছেঁড়াকে একত্রিত করে [দেখা হবে], দুই মোজার [ছেঁড়াকে] নয়। অর্থাৎ যখন এক মোজার গোড়ালির দিকে অনেকগুলো ফাটা হবে এবং প্রত্যেক ছেঁড়া থেকে কিছু কিছু অংশ এমনভাবে প্রকাশ পাবে যে, যদি প্রকাশিত অংশগুলোকে একত্রিত করা হয়, তবে তিন আঙ্গুল সমপরিমাণ হয়ে যায়, তখন মাসেহ জায়েজ হবে না। আর যদি এ [তিন আঙ্গুল] পরিমাণ উভয় মোজায় হয় তবে মাসেহ জায়েজ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَضَى الْمُدَّةِ وَبَعْدَ اَحَدِ الخ : মাসেহ-এর সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও মোজার মাসেহ ভেঙ্গে যাবে। এর দলিল হলো ইতঃপূর্বের উল্লিখিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا "মুকীম একদিন একরাত এবং মুসাফির তিনদিন তিনরাত মোজার উপর মাসেহ করবে।"

–[নাসাঈ ১ : ৮৪, মুসনাদে আহমাদ ১ : ১১৩]

উক্ত হাদীসে যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ মুকীম ও মুসাফিরের জন্য মাসেহের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাই বুঝা গেল উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর মাসেহ ভেঙ্গে যাবে।

আমাদের বিকায়া গ্রন্থকার (র.) লেখেন, যদি কোনো ব্যক্তির অজু থাকে– এমতাবস্থায় মোজা খুলে যায়; কিংবা নির্ধারিত সময়সীমা অতীত হয়ে যায় তবে তার জন্য ওয়াজিব হলো, শুধু মোজাদ্বয় খুলে পদদ্বয় ধুয়ে নেওয়া। অজুর অন্যান্য অঙ্গ ধুয়ে অজু করা তার জন্য ওয়াজিব নয়। তবে শর্ত হলো, তার অজু ভঙ্গের কোনো কারণ দেখা না দিতে হবে। যদি অজু ভঙ্গের কোনো কারণ দেখা দেয় তবে শুধু পা ধৌত করলে যথেষ্ট হবে না; বরং পূর্ণ অজু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দলিল হলো, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস। হযরত ইবনে ওমর (রা.) কোনো এক জিহাদের সফরে ছিলেন। তিনি মোজা খুলে শুধু উভয় পা ধৌত করেছেন; পূর্ণ অজু করেননি।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সময়সীমা উত্তীর্ণ হোক কিংবা মোজা খুলে যাক– যদিও সে অজু অবস্থায় থাকে তার উপর পূর্ণ অজু করা ওয়াজিব। কেননা, তার সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা পায়ের তাহারাত [পবিত্রতা] দূরীভূত হয়ে গেছে কিংবা তার পায়ের মোজা খোলার দ্বারা তার পায়ের তাহারাত দূর হয়ে গেছে। আর তাহারাত দূর হওয়াটা تَجَزِّیْ [অংশে অংশে বিভক্ত হওয়া] হয় না। যেমন– হদসের কারণে অজু ভাঙ্গাটা تَجَزِّیْ হয় না। অতএব, পায়ের তাহারাত ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থই হলো, পুরো তাহারাত ভেঙ্গে যাওয়া। আর যেহেতু পুরো তাহারাত ভেঙ্গে গেছে সেহেতু তার উপর পূর্ণ অজু করা ওয়াজিব।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যুক্তির খণ্ডন হচ্ছে, হদস আর মাসেহ-এর সময়সীমা অতিক্রম করা– উভয়টি এক জিনিস নয়। তাই একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করাও যথার্থ নয়। সুতরাং উক্ত কিয়াস-কিয়াস مَعَ الْفَارِق হয়েছে।

এখানে শারেহ (র.) লিখেন, ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট যেহেতু অজুতে وَلَاءٌ তথা "এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বে অপর অঙ্গ ধৌত করা" ফরজ, আর আমরা এ সুরতে বলি যে, শুধু উভয় পা ধৌত করাই তার উপর ওয়াজিব, তাই এতে তাঁর মতানৈক্য থাকা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা স্পষ্টভাবে তাঁর কোনো মতানৈক্য পাইনি।

قَوْلُهُ وَخُرُوْجُ اَكْثَرِ الْعَقِبِ الخ : عَقْبٌ বলা হয়, গোড়ালিকে। গ্রন্থকার عَقْبٌ শব্দটি وَاحِدٌ [একবচন] করেছেন এ কথা বুঝানোর জন্য যে, এক পায়ের গোড়ালির অধিক অংশ প্রকাশ পাওয়ার দ্বারাই মাসেহ ভেঙ্গে যায়। ইমাম কুদূরী (র.) اَكْثَرٌ

اَلْعَقْبُ -এর স্থলে اَكْثَرُ الْقَدَمِ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাই উভয়ের শব্দ চয়নের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ قَدَمٌ বলা হয় পূর্ণ পাকে, আর عَقْبٌ হচ্ছে পায়ের একটি অংশ। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) লেখেন, قَدَمٌ শব্দের ব্যবহারই অধিক সহীহ।

قَوْلُهُ وَمَا اخْتَارَهُ فِى الْمَتْنِ الخ : মোজা খোলার পরিমাণ বর্ণনার ক্ষেত্রে গ্রন্থকার যে عِبَارَةٌ চয়ন করেছেন তথা خُرُوْجُ اَكْثَرُ الْعَقْبِ الخ এটি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে। বরজান্দ (র.) "মুখতাসারে বিকায়া"-এর শরাহের মধ্যে লেখেন, মতনে উল্লিখিত রেওয়ায়েত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত হচ্ছে, যদি মোজা পরিহিত ব্যক্তির পায়ের পিঠের তিন আঙ্গুল পরিমাণ মোজা খুলে যায়, তবে তার মাসেহ ভেঙ্গে যাবে।

❖ **ছেঁড়া বা ফাটা মোজার হুকুম :** মোজা যদি ছিঁড়ে বা ফেটে গিয়ে থাকে, তবে এর উপর মাসেহ করা বৈধ হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে চারটি মাযহাব রয়েছে। যথা–

১. আহনাফের মতে, ছেঁড়া কমবেশি হওয়ার দরুন এর হুকুমের মাঝেও ব্যবধান হবে। অর্থা যদি ছেঁড়া কম হয় তবে এর উপর মাসেহ করা বৈধ, আর যদি ছেঁড়া বেশি হয়, তবে এর উপর মাসেহ করা বৈধ নয়।
২. ইমাম শাফেয়ী ও যুফার (র.)-এর মতে ছেঁড়া কম হোক কিংবা বেশি হোক সর্বাবস্থায়ই মাসেহ বৈধ হবে না।
৩. সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে, উভয় অবস্থায় মাসেহ বৈধ।
৪. ইমাম আওযাঈ (র.)-এর মতে, মোজার ছেঁড়া দিয়ে পায়ের যে অংশ প্রকাশ পেয়েছে তা ধৌত করবে, আর বাকি অংশ মাসেহ করবে। তাঁর মতে, যেহেতু ধোয়া ও মাসেহ উভয়টিকে একই অঙ্গে একত্রিত করা যায়, সেহেতু তিনি এ ধরনের মত প্রকাশ করেছেন।

সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর দলিল হলো, মোজা পায়ের পাতা পর্যন্ত হদস পৌঁছার জন্য প্রতিবন্ধক, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা পরিধান করেছে বলা যাবে– ততক্ষণ এর উপর মাসেহ করাও বৈধ হবে। চাই এতে ছেঁড়া কম হোক কিংবা বেশি হোক।

ইমাম শাফেয়ী ও যুফার (র.)-এর দলিল হলো, মোজা ছেঁড়া হওয়ার কারণে পায়ের যে অংশ বের হয়ে গেছে– তা ধোয়া ওয়াজিব। আর ধোয়া ও মাসেহ করা যেহেতু একই অঙ্গে একত্রিত করা জায়েজ নেই, তাই মোজা খুলে পায়ের বাকি অংশ ধোয়াও ওয়াজিব।

আহনাফের দলিল হলো, সাধারণত অল্প-স্বল্প ছেঁড়া-ফাটা থেকে মোজা মুক্ত থাকে না। তাই এ হালকা কারণে যদি মোজা খুলে পা ধোয়ার হুকুম দেওয়া হয়, তবে এটি মানুষের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে। অথচ কষ্টকে দূর করার জন্য মোজার উপর মাসেহ অনুমোদিত হয়েছে। তাই মামুলি ছেঁড়া-ফাটার বিষয়টি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে বেশি পরিমাণ ফাটা থেকে যেহেতু মোজা সাধারণত মুক্ত থাকে, সেহেতু এ ক্ষেত্রে মোজা খুলে পা ধৌত করার হুকুম দেওয়াতে ব্যাপকহারে মানুষ কষ্টে পতিত হবে না। তাই বেশি পরিমাণ ফাটা হলে তা মাফ করা হবে না।

قَوْلُهُ وَيَمْنَعُهُ خَرْقُ خُفٍّ يَبْدُوْ الخ :

মোজা বেশি ও কম ফাটার মাপকাঠি : কতটুকু ছেঁড়া হলে বেশি এবং কতটুকু ছেঁড়া হলে কম ছেঁড়া বলে গণ্য হবে– এ ব্যাপারে আমাদের বিকায়া গ্রন্থকার (র.) লেখেন– "যদি পায়ের ছোট তিন আঙ্গুল পরিমাণ বা এর চেয়েও বেশি পরিমাণ পা মোজার ছেঁড়া অংশ দিয়ে প্রকাশ হয়ে যায়, তবে তাকে বেশি পরিমাণ ফাটা বলে গণ্য হবে। আর যদি এর চেয়ে কম পরিমাণ অংশ প্রকাশ পায়, তবে তা কম ছেঁড়া বলে গণ্য হবে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। এর দলিল হলো– পায়ের মধ্যে আঙ্গুলই আসল। তাই দিয়তের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেউ যদি অন্য কারো পায়ের আঙ্গুলগুলো কেটে দেয় তবে তার উপর পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হয়। পায়ের তিন আঙ্গুল যেহেতু পাঁচ আঙ্গুলের মাঝে পরিমাণে অধিক, তাই لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ এ মূলনীতির

আলোকে তিনকে সমগ্র পায়ের স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হয়েছে এবং তিন আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা খুলে যাওয়াকে সম্পূর্ণ পা খুলে যাওয়ার অবস্থায় ধরা হবে ও মোজা খুলে পা ধৌত করা ওয়াজিব হবে।

শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র.) বলেন, ফাটা যদি পায়ের বড় আঙ্গুলসমূহের উপর থাকে তবে বড় তিন আঙ্গুল ধর্তব্য হবে। আর যদি ফাটা পায়ের ছোট আঙ্গুলসমূহের উপর থাকে তবে ছোট তিন আঙ্গুল ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ فَعُلِمَ مِنْهُ إِنَّ مَا يُصْنَعُ الخ : পূর্বোল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, যদি তিন আঙ্গুল বরাবর কিংবা এর চেয়ে বেশি অংশ মোজার ছেঁড়া দিয়ে প্রকাশ পায় তবে এর উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই, কিন্তু যদি এর চেয়ে কম হয় তবে মাসেহ করা জায়েজ। শারেহ (র.) অন্য একটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন যে, ছেঁড়া-ফাটা মোজাকে যদি এমনভাবে মেরামত করা হয় যে, চলার সময় পা প্রকাশ পায় না তবে এর হুকুম ঐ মোজার হুকুমের ন্যায়, যার কোনো ছেঁড়া-ফাটা নেই। হ্যাঁ, যদি পা খুলে যায় তবে এর হুকুম ফাটা মোজার হুকুমের ন্যায় এবং তিন আঙ্গুল পরিমাণ ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ وَيَجْمَعُ خُرُوقُ خُفٍّ الخ :

এক মোজার বিচ্ছিন্ন ছেঁড়াকে একত্রিত করা হবে : ছেঁড়ার পরিমাণ প্রত্যেক মোজায় পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা করা হবে। যদি এক মোজায় পৃথক পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কয়েকটি ছেঁড়া থাকে, তবে সবগুলোকে এমনভাবে পরিমাণ করা হবে যে, যদি সবগুলো ছেঁড়াকে একত্রিত করা হতো, তাহলে এর পরিমাণ কেমন হতো। যদি দেখা যায় যে, তিন আঙ্গুল বা এর চেয়েও বেশি পরিমাণ হয়, তবে এর উপর মাসেহ করা বৈধ হবে না। আর যদি সব ছেঁড়া মিলিয়ে তিন আঙ্গুল পরিমাণের চেয়ে কম ছেঁড়া বলে বিবেচিত হয়, তবে এর উপর মাসেহ করা বৈধ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে দুই মোজার ছেঁড়াকে একত্রিত করে পরিমাপ করা হবে না। কেননা, এক মোজা ফাটা হওয়ার কারণে অপর মোজা দিয়ে পথ চলতে কোনো সমস্যা হয় না।

قَوْلُهُ تَحْتَ السَّاقِ : আলোচ্য ইবারতে এ কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গোড়ালির অংশের ছেঁড়া-ফাটা ধর্তব্য নয়। চাই তা বেশি হোক কিংবা কম হোক। কেননা, মোজার উপর মাসেহ করা হয় টাখনুর নীচের অংশে; টাখনুর উপরের অংশে নয়। তাই এ টাখনুর নীচের অংশই ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ هٰذَا الْمِقْدَارُ فِى الْخُفَّيْنِ جَازَ الْمَسْحُ : এখানে আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় উক্ত ইবারতের অধীন কিছু আলোচনা উল্লেখ করেছেন যে, দুই মোজার ছেঁড়া ও ফাটাকে একত্রিত করে দেখা হবে না; বরং এক মোজার ছেঁড়াগুলো একত্রিত করে দেখা হবে, কিন্তু মোজার মধ্যে নাপাকী লাগা ও সতর খুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে এমনটি নয়; বরং নাপাকী একত্রিত করে দেখা হবে। চাই তা দুই মোজায়, কিংবা শরীরে, কিংবা কাপড়ে, কিংবা জায়গায় হোক, সব নাপাকীকে একত্রিত করা হবে। অনুরূপ সতর খুলে যাওয়া। যদিও তা কম কম করে বিভিন্ন জায়গায় হয়। যেমন, মহিলার চুলের কিছু অংশ, পেটের কিছু অংশ, লজ্জাস্থানের কিছু অংশ– সব মিলিয়ে যদি এমন পরিমাণ অঙ্গ খোলা থাকে, যা এক অজুর এক-চতুর্থাংশ হয়ে যায়, তবে এ অবস্থায় উক্ত মহিলার নামাজ জায়েজ হবে না।

وَيَتِمُّ مُدَّةَ السَّفَرِ مَاسِحُ سَافِرٍ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَيُتِمُّهُمَا اِنْ اَقَامَ قَبْلَهُمَا وَيَنْزِعُ اِنْ اَقَامَ بَعْدَهُمَا فَهٰهُنَا اَرْبَعُ مَسَائِلَ لِاَنَّهُ اِمَّا اَنْ يُّسَافِرَ الْمُقِيْمُ اَوْ يُقِيْمُ الْمُسَافِرُ وَكُلٌّ اِمَّا قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اَوْ بَعْدَهُمَا وَقَدْ ذُكِرَ فِى الْمَتْنِ ثَلٰثٌ مِنْهَا وَلَمْ يَذْكُرْ مَا اِذَا سَافَرَ الْمُقِيْمُ بَعْدَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَحُكْمُهُ ظَاهِرٌ وَهُوَ وُجُوْبُ النَّزْعِ ـ

অনুবাদ : [মোজার উপর] মাসেহকারী ব্যক্তি, যে একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সফর শুরু করেছে, সে সফরের সময়সীমা পূর্ণ করবে। [মোজার উপর] মাসেহকারী মুসাফির একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি মুকীম হয়ে যায় তবে সে একদিন একরাত পূর্ণ করবে। আর যদি একদিন একরাত অতিক্রম করার পর সে মুকীম হয় তবে সে মোজা খুলে ফেলবে। এখানে চারটি মাসাআলা। কেননা, হয়তো মুকীম ব্যক্তি সফর করবে কিংবা মুসাফির ব্যক্তি মুকীম হবে এবং প্রত্যেকেই হয়তো একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে করবে কিংবা পরে করবে। মতনের মধ্যে উক্ত চার সুরতের তিনটি উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থকার উল্লেখ করেননি যে, যখন মুকীম একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পর সফর করবে, তবে এর হুকুম তো স্পষ্ট যে, মোজা খুলে ফেলা ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ سَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ الخ : ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, তাহারাত ভাঙ্গার পূর্বে কিংবা পরে সফর শুরু করুক, হুকুম একই। অর্থাৎ একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কিংবা পরে সফর শুরু করলে কিংবা মুকীম হলে সে হিসেবে হুকুম হবে। তাহারাত ভাঙ্গার আগে বা পরে সফর শুরু কিংবা মুকীম হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না।

শারেহ (র.) লেখেন যে, এখানে মোট চারটি সুরত। তিনটি গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, আর একটি শারেহ (র.) উল্লেখ করেছেন। উক্ত চারটি সূরত হলো−

১. মাসেহকারী মুকীম ব্যক্তি একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সফর করতে শুরু করেছে, তবে সে সফরের সময়সীমা পূর্ণ করবে।
২. মাসেহকারী মুসাফির ব্যক্তি একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মুকীম হয়ে গেছে, তবে সে একদিন একরাত পূর্ণ করবে।
৩. মাসেহকারী মুসাফির ব্যক্তি একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পর মুকীম হয়ে গেছে, তবে সে মোজা খুলে ফেলবে এবং পা ধৌত করবে।
৪. মাসেহকারী মুকীম ব্যক্তি একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পর সফর শুরু করেছে, তবে সে মোজা খুলে পা ধৌত করবে।

উল্লিখিত চার মাসআলার দলিল হলো ঐ সকল হাদীস যেগুলোতে মুকীম ও মুসাফিরের জন্য মাসেহের সময়সীমা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে তার নির্ধারিত সময়ের শেষ অবস্থায়ই ধর্তব্য হবে, যেমন নামাজের ক্ষেত্রে শেষ অবস্থা ধর্তব্য হয়। অর্থাৎ হায়েজা মহিলার যদি নামাজের শেষ ওয়াক্তে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়− অনুরূপ যদি নিফাসবিশিষ্টা মহিলার হয়, তবে তাদের উপর উক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ হয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ ভুল দলিল পেশ করে থাকেন যে, এটি একটি এমন ইবাদত যার প্রথম অবস্থা ধর্তব্য হয়। যেমন− যদি কেউ মুকীম অবস্থায় নৌকায় নামাজ শুরু করে এবং নামাজ শেষ হওয়ার পূর্বে সফর শুরু হয়ে যায়, কিংবা কেউ মুকীম অবস্থায় রোজা শুরু করেছে, তারপর মুসাফির হয়ে গেছে, তবে উভয়ই চার রাকাত নামাজ পূর্ণ করবে এবং রোজাও পূর্ণ করবে। তাই মুকীমের দুই সুরতে ইকামাতের অবস্থা এবং মুসাফিরের দুই সুরতে সফরের অবস্থা ধর্তব্য হওয়া উচিত। মূলত তাদের এ যুক্তি ভিত্তিহীন। কেননা, আমরা ইতঃপূর্বে হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, মাসেহের ক্ষেত্রে শেষ অবস্থা ধর্তব্য।

وَيَجُوْزُ عَلٰى جَبِيْرَةِ مُحْدِثٍ وَلَا يُبْطِلُهُ السُّقُوْطُ اِلَّا عَنْ بُرْءٍ اَلْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ اِنْ اَضَرَّ جَازَ تَرْكُهُ وَاِنْ لَمْ يَضُرَّ فَقَدْ اِخْتَلَفَ الرِّوَايَاتُ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) فِىْ جَوَازِ تَرْكِهٖ وَالْمَاخُوْذُ اِنَّهٗ لَا يَجُوْزُ تَرْكُهٗ ثُمَّ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْجَبِيْرَةِ مَشْدُوْدَةً عَلٰى طَهَارَةٍ وَاِنَّمَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ اِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلٰى مَسْحِ ذٰلِكَ الْعَضْوِ كَمَا لَا يَقْدِرُ عَلٰى غَسْلٍ بِاَنْ كَانَ الْمَاءُ يَضُرُّهٗ اَوْ كَانَتِ الْجَبِيْرَةُ مَشْدُوْدَةً يَضُرُّ حَلُّهَا اَمَّا اِذَا كَانَ قَادِرًا عَلٰى مَسْحِهٖ فَلَا يَجُوْزُ مَسْحُ الْجَبِيْرَةِ وَاِذَا كَانَ فِىْ اَعْضَائِهٖ شِقَاقٌ فَاِنْ عَجِزَ عَنْ غَسْلِهٖ يَلْزَمُهٗ اِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَاِنْ عَجِزَ عَنْهُ يَلْزَمُهُ الْمَسْحُ ثُمَّ اِنْ عَجِزَ عَنْهُ يُغْسَلُ مَا حَوْلَهٗ وَيَتْرُكُهٗ وَاِنْ كَانَ الشِّقَاقُ فِىْ يَدِهٖ وَيَعْجِزُ عَنِ الْوُضُوْءِ اِسْتَعَانَ بِالْغَيْرِ لِيُوَضِّيَهٗ فَاِنْ لَمْ يَسْتَعِنْ وَتَيَمَّمَ جَازَ خِلَافًا لَهُمَا وَاِذَا وَضَعَ الدَّوَاءَ عَلٰى شِقَاقِ الرِّجْلِ امر الْمَاءَ فَوْقَ الدَّوَاءِ فَاِذَا امر الْمَاءَ ثُمَّ سَقَطَ الدَّوَاءُ اِنْ كَانَ السُّقُوْطُ عَنْ بُرْءٍ غُسِلَ الْمَوْضَعُ وَاِلَّا فَلَا وَاِذَا فَصَدَ وَوُضِعَ خِرْقَةً وَشَدَّ الْعِصَابَةَ فَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ لَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى الْخِرْقَةِ .

অনুবাদ : মুহদিছ [অজুহীন] ব্যক্তির জন্য পট্টির উপর মাসেহ করা জায়েজ আছে। পট্টি খুলে যাওয়া- পট্টির মাসেহকে বাতিল করে না, তবে ক্ষত শুকিয়ে যাওয়ার কারণে [পট্টির মাসেহ বাতিল হয়ে যায়]। পট্টির উপর মাসেহ যদি ক্ষতিকর হয় তবে মাসেহ না করা জায়েজ আছে। আর যদি ক্ষতিকর না হয় তবে মাসেহ না করার বৈধতার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। তবে যে বর্ণনার উপর ফতোয়া তা হচ্ছে, [পট্টির] উপর মাসেহ না করা জায়েজ নেই। অতঃপর [এতে] এ শর্তও নেই যে, পট্টি তাহারাত অবস্থায় বাঁধতে হবে।

পট্টির উপর মাসেহ তখনই জায়েজ যখন [অজুকারী ব্যক্তি] ক্ষতস্থানের উপর মাসেহ করতে সক্ষম না হয়, যেমনিভাবে ক্ষতস্থান ধোয়ার উপর সক্ষম হয় না। তা এভাবে যে, পানি উক্ত অঙ্গকে ক্ষতি করে কিংবা বাঁধা পট্টিকে খোলা অজুর জন্য ক্ষতিকর হয়। কিন্তু যখন ক্ষত অঙ্গে মাসেহ করতে সক্ষম হয় তখন পট্টির উপর মাসেহ করা জায়েজ হবে না। যখন তার অঙ্গে অনেক ক্ষত অংশ হয় তখন যদি সে তা ধৌত করতে অক্ষম হয় তবে তার জন্য আবশ্যক হলো, ঘষা ব্যতীত এর উপর দিয়ে শুধু পানি প্রবাহিত করে দেওয়া। যদি এর থেকেও অক্ষম হয় তবে তার জন্য আবশ্যক হলো, তা মাসেহ করা। অতঃপর যদি মাসেহ থেকেও অক্ষম হয়, তবে [ক্ষতস্থান] -এর পার্শ্বকে ধৌত করে নেবে এবং মাসেহ করবে না। যদি তার হাতে অনেকগুলো ক্ষত হয় এবং [এ কারণে] অজু করতে অক্ষম হয় তবে অন্যের থেকে সাহায্য নেবে, যেন সে তাকে অজু করিয়ে দেয়। আর যদি কারো থেকে সাহায্য না নেয়; বরং তায়াম্মুম করে, তবে তা জায়েজ। এতে সাহেবাইন (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। যখন পায়ের ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগায়, তখন ঔষধের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করে দেবে। যখন পানি প্রবাহিত করে অতঃপর ঔষধ পতিত হয় তখন যদি ক্ষত শুকিয়ে

যাওয়ার কারণে ঔষধ পতিত হয়, তবে উক্ত স্থান ধুয়ে নেবে, অন্যথায় নয়। যখন শিঙ্গা লাগিয়ে [এর উপর কাপড়ের] নেকড়া রাখবে এবং তাতে পট্টি লাগাবে, তবে কোনো কোনো শায়খের নিকট এর উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই; বরং উক্ত নেকড়ার উপর মাসেহ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ عَلٰى جَبِيْرَةٍ الخ : جَبِيْرَةٌ ঐ কাষ্ঠখণ্ডকে বলা হয়, যা ভাঙ্গা হাড়ের উপর বাঁধা হয়। মুহদিছ [অজুহীন] ব্যক্তির জন্য জায়েজ আছে ক্ষতস্থানে বাঁধা পট্টির উপর মাসেহ করা। চাই পট্টি তাহারাত অবস্থায় বাঁধা হোক কিংবা হদস অবস্থায় বাঁধা হোক। বিকায়া গ্রন্থকার (র.) লেখেন, জাবীরা [পট্টি]-এর উপর মাসেহ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, ক্ষতস্থানের উপর মাসেহ করা কষ্টসাধ্য হওয়া। যদি ক্ষতস্থানের উপর মাসেহ করা কষ্টসাধ্য না হয়; বরং স্বাভাবিকভাবে মাসেহ করা যায়, তবে পট্টির উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই।

পট্টির উপর মাসেহের বৈধতার দলিল হলো হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেন–

خَرَجْنَا فِىْ سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِىْ رَأْسِهِ فَقَالَ لِاَصْحَابِهِ هَلْ تَجِدُوْنَ لِىْ رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ فَقَالُوْا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَاَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُخْبِرَ بِذٰلِكَ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلَا سَأَلُوْا اِذَا لَمْ يَعْلَمُوْا فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَتَيَمَّمَ اَوْ يَشُدَّ عَلٰى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ ـ

অর্থাৎ "আমরা সফরে ছিলাম। আমাদের এক ব্যক্তির মাথায় পাথর লেগে যায় এবং ক্ষত হয়ে যায়। তিনি তার সঙ্গীদের কাছে তায়াম্মুম করার অনুমতি চান। তাঁরা তাঁকে অনুমতি দেননি। তাই তিনি গোসল করলেন এবং মরে গেলেন। অতঃপর আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলাম তখন তাঁকে এ সম্পর্কে অবগত করলাম। তিনি বললেন, তারা তাকে হত্যা করে ফেলেছে, আল্লাহ তাদের হত্যা করুক। তারা যখন তা সম্পর্কে জানে না তখন কেন তারা জিজ্ঞাসা করেনি? নিশ্চয় অক্ষম ব্যক্তির প্রতিকার হচ্ছে প্রশ্ন। তার জন্য তায়াম্মুম যথেষ্ট ছিল কিংবা ক্ষতের উপর পট্টি বেঁধে এর উপর মাসেহ করা এবং সমস্ত শরীর ধৌত করা। –[আবূ দাঊদ শরীফ]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক হাদীসে তিনি বলেন– اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ "রাসূলুল্লাহ ﷺ পট্টির উপর মাসেহ করতেন।" –[দারাকুতনী]

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় "পট্টির উপর মাসেহ করার বৈধতা" বুঝায় এবং তাহারাত অবস্থায় পট্টি বাঁধা হোক কিংবা হদস অবস্থায় পট্টি বাধা হোক– উভয় অবস্থায়ই এর উপর মাসেহ করা জায়েজ– এ কথাও বুঝায়। কেননা, হাদীসদ্বয়ের মধ্যে তাহারাত ও হদস-এর শর্তারোপ করা হয়নি।

পট্টির উপর মাসেহের বৈধতার পক্ষে যৌক্তিক দলিল হলো, মোজা খোলার মধ্যে যতটুকু অসুবিধা রয়েছে, পট্টি খোলা আর বাঁধার মধ্যে এর চেয়েও অধিক অসুবিধা রয়েছে। সুতরাং যখন অসুবিধা দূর করার জন্য মোজার উপর মাসেহ করার বিধান দেওয়া হয়েছে, তখন তো পট্টির উপর মাসেহ করার বৈধতা আরো যুক্তিযুক্ত।

❖ **মোজার মাসেহ ও পট্টির মাসেহের মধ্যে পার্থক্য :** মোজার উপর মাসেহ ও পট্টির উপর মাসেহের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. মোজার উপর মাসেহ করার সময় নির্ধারণ করা আছে। পক্ষান্তরে পট্টির উপর মাসেহ করার নির্ধারিত সময় নেই।

২. মোজার উপর মাসেহ করার জন্য মোজা পরিহিত ব্যক্তিকে হদস যুক্ত হওয়ার সময় পূর্ণ তাহারাতের উপর থাকতে হবে। পক্ষান্তরে পট্টি বাঁধার সময় কিংবা হদস যুক্ত হওয়ার সময় তাহারাত থাকা শর্ত নয়।

৩. পট্টি যদি নিরাময় ছাড়াই খুলে পড়ে যায় তবে মাসেহ বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে মোজা যদি খুলে পা বের হয়ে যায় তবে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, পট্টির ক্ষেত্রে দলিল হলো, ওজর অব্যাহত আছে। আর যতক্ষণ ওজর থাকবে ততক্ষণ পট্টির উপর মাসেহ করা যাবে।

قَوْلُهُ اَلْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ إِنْ أَضَرَّ الخ : মুহীত নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি তার ক্ষতস্থানের পট্টির উপর মাসেহ করা ক্ষতি হয় তবে তার জন্য মাসেহ না করা জায়েজ আছে। হ্যাঁ, যদি মাসেহ কোনো ক্ষতি না করে তবে মাসেহ না করা জায়েজ নেই এবং এ অবস্থায় যদি সে মাসেহ না করে নামাজ আদায় করে তবে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট তার নামাজ সহীহ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তাঁর একটি বর্ণনা মোতাবেক উক্ত অবস্থায়ও মাসেহ না করা জায়েজ আছে।

قَوْلُهُ شُقَاقٌ : شُقَاقٌ শব্দের شِيْنٌ অক্ষরে পেশ পড়া হবে। কেউ কেউ شِقَاقٌ-এর স্থলে شُقُوْقٌ শব্দ উল্লেখ করেছেন। শব্দদ্বয় شَقٌّ-এর جَمْع [বহুবচন]। অর্থ– ফাটা। অর্থাৎ শীতকালে যে চামড়া ফেটে যায়, সে রোগকে شَقٌّ বলা হয়। কখনো কখনো এগুলো ধোয়া কষ্টসাধ্য হয়ে যায়, তখন শুধু এর উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করে দেবে।

قَوْلُهُ اِسْتِعَانَ بِالْغَيْرِ الخ : শারেহ (র.) লেখেন, যদি কারো হাতে ফাটা থাকে আর সে অজু করতে অক্ষম হয় তবে সে অন্যের থেকে সাহায্য নেবে, যে তাকে অজু করিয়ে দেবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট মোস্তাহাব। কিন্তু যদি সে অন্যের সাহায্য না নিয়ে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করে, তবে তার নামাজ সহীহ হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট অন্যের সাহায্য নেওয়া ওয়াজিব। যদি সে অন্যের সাহায্য নেওয়া ব্যতীত তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করে, তবে তার নামাজ সহীহ হবে না। হ্যাঁ, যদি তাকে অজু করিয়ে দেওয়ার মতো লোক না পাওয়া যায়, কিংবা লোক পাওয়া গেছে; কিন্তু সে তাকে অজু করিয়ে দিতে অস্বীকার করেছে, তবে সে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করবে। এখন তার নামাজ মতানৈক্য ছাড়াই সহীহ হবে। কেননা, এখন সে সার্বিকভাবে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ إِنْ كَانَ السُّقُوْطُ الخ : অর্থাৎ যদি ক্ষতস্থান নিরাময় [শুকানো]-এর কারণে ঔষধ পড়ে যায়, তবে এখন এ স্থান ধৌত করা আবশ্যক। মাসেহ বা পানি প্রবাহিত করা যথেষ্ট হবে না। আর যদি নিরাময়ের কারণে নয়; বরং পানি ঢালার কারণে ঔষধ পড়ে যায় তবে ক্ষতস্থানের বাকি অংশ ধোয়া আবশ্যক নয়। কেননা, ওজর এখনো বাকি, যা শুরুতেই ছিল।

قَوْلُهُ عَنْ بُرْءٍ : এ ধরনের স্থানে কখনো عَنْ-بَاءْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى কখনো لَامٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ আবার কখনো بَعْدَ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– عَمَّا قَلِيْلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِيْنَ

قَوْلُهُ وَإِذَا فَصَدَ وَ وَضَعَ خِرْقَةً الخ : হাত, পায়ের কোনো স্থানে চাকু ইত্যাদির মাধ্যমে কেটে নষ্ট রক্ত বের করাকে আরবি ভাষায় فَصَدَ [শিঙ্গা লাগানো] বলা হয়। خِرْقَةٌ শব্দের خَاء অক্ষরে যের পড়া হবে। অর্থ– কাপড়ের টুকরা। উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিঙ্গা লাগানোর স্থানে নেকড়া রেখে এর উপর পট্টি বাঁধবে। আর ক্ষতস্থানে যে পট্টি বাঁধা হয়, তাকে عِصَابَةٌ বলা হয়।

শারেহ (র.) লেখেন, যদি শিঙ্গা লাগানোর স্থলে নেকড়া রেখে পট্টি বাঁধা হয় তবে কোনো কোনো শায়খের মতে, এর উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। কেননা, মূল ক্ষতস্থানের উপর যখন নেকড়া রাখা হয়েছে তখন তা-ই মাসেহের উপযুক্ত হয়ে গেছে। অন্যথায় পট্টির উপর মাসেহ করা জায়েজ।

وَعِنْدَ الْبَعْضِ اِنْ اَمْكَنَهُ شَدُّ الْعِصَابَةِ بِلَا اِعَانَةِ اَحَدٍ لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا الْمَسْحُ وَاِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذٰلِكَ يَجُوزُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنْ كَانَ حَلُّ الْعِصَابَةِ وَغَسْلُ مَا تَحْتَهَا يَضُرُّ الْجِرَاحَةَ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا وَاِلَّا فَلَا وَكَذَا الْحُكْمُ فِىْ كُلِّ خِرْقَةٍ جَاوَزَتْ مَوْضَعَ الْقُرْحَةِ وَاِنْ كَانَ حَلُّ الْعِصَابَةِ لَا يَضُرُّهُ لٰكِنَّ نَزْعَهَا عَنْ مَوْضَعِ الْجِرَاحَةِ يَضُرُّهَا بِحَلِّهَا وَيَغْسِلُ مَا تَحْتَهَا اِلٰى مَوْضَعِ الْجِرَاحَةِ ثُمَّ يَشُدُّهَا وَيَمْسَحُ مَوْضَعَ الْجِرَاحَةِ وَعَامَّةُ الْمَشَائِخِ عَلٰى جَوَازِ مَسْحِ عِصَابَةِ الْمُفْتَصِدِ ـ

অনুবাদ : কারো কারো নিকট অন্যের সাহায্য ব্যতীত যদি পট্টি বাঁধা সম্ভব হয় তবে এর উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। আর যদি [অন্যের সাহায্য ব্যতীত] পট্টি বাঁধা অসম্ভব হয় তবে [এর উপর] মাসেহ করা জায়েজ। কেউ বলেন, যদি পট্টি খোলা হয় এবং এর নীচে [নেকড়ায়] মাসেহ করা তার ক্ষতস্থানের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে এর উপর মাসেহ করা জায়েজ; অন্যথায় নয়। অনুরূপ প্রত্যেক নেকড়ার হুকুম যা ক্ষতস্থান থেকে অতিক্রম করে গেছে। আর পট্টির গিট খোলা যদি ক্ষতিকর না হয়, কিন্তু ক্ষতস্থান থেকে পট্টিকে খোলা ক্ষতিকর হয়, তবে পট্টির গিঁঠ খুলে এর নীচে ক্ষতস্থান পর্যন্ত ধৌত করবে। অতঃপর পট্টি বেঁধে ক্ষতস্থানের উপর মাসেহ করবে। অধিকাংশ মাশায়িখ শিঙ্গা লাগানো ব্যক্তির পট্টির উপর মাসেহ বৈধ হওয়ার প্রবক্তা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الْبَعْضِ اِنْ اَمْكَنَهُ الخ : যদি কারো সহযোগিতা ব্যতীত পট্টি বাঁধা সম্ভব হয় তবে পট্টির উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই; বরং পট্টি খুলে ভিতরের নেকড়ার উপর মাসেহ করবে এবং পরবর্তীতে পট্টি লাগিয়ে নেবে। কারণ, এ অবস্থায় পট্টি খুলতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি অন্যের সাহায্য ব্যতীত পট্টি বাঁধা ও খোলা সম্ভব না হয়, তবে পট্টির উপরই মাসেহ করা জায়েজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা ও না করা ধর্তব্য নয়। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) বলেন, অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হওয়া ও না হওয়া ধর্তব্য।

قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنْ كَانَ الخ : এ ক্ষতস্থানের বিবরণ অধ্যায়ে ক্ষতির দিকটি লক্ষ্য করা হয়। যদি পট্টি ক্ষতস্থানে মাসেহ করলে ক্ষতের জন্য ক্ষতিকর না হয়, তবে পট্টির উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। আর যদি ক্ষতস্থানে মাসেহ করা ক্ষতিকর হয়, তবে পট্টির উপর মাসেহ করা জায়েজ। আর যদি পট্টি ক্ষতস্থানের সাথে লেগে যায় এবং তা খোলা কষ্টকর হয় তবে এর উপর মাসেহ করা জায়েজ, যদিও তা ক্ষতস্থান নিরাময়ের পর হয়। তবে এ অবস্থায় শরীরের সঙ্গে লেগে থাকা অংশে মাসেহ করতে হবে এবং আশপাশের অংশ যথাসম্ভব ধৌত করবে।

وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِىْ كُلِّ خِرْقَةٍ الخ : অর্থাৎ শিঙ্গা লাগানো ব্যক্তির পট্টির ক্ষেত্রেও একই হুকুম। অর্থাৎ যখন শিঙ্গা লাগানোর ক্ষতস্থানে পট্টি লাগানো হবে এবং পট্টির অংশ ক্ষতস্থানের বাহিরেও থাকবে তখন যদি তা খোলা ও ধৌত করা ক্ষতি করে তবে পুরোটার উপর মাসেহ করবে। অন্যথায় ক্ষতস্থানের উপরই মাসেহ করবে এবং আশপাশ ধুয়ে নেবে। আর যখন ক্ষতস্থানের উপর মাসেহ করা ক্ষতিকর না হয়, তখন পট্টির ভিতরের নেকড়া বা তুলার উপরও মাসেহ করা জায়েজ নেই।

وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الظَّاهِرُ مِنَ الْيَدِ مَا بَيْنَ الْعُقْدَتَيْنِ مِنَ الْعِصَابَةِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِيهِ الْمَسْحُ إِذْ لَوْ غَسَلَ تَبْتَلُّ الْعِصَابَةُ وَرُبَمَا يُنْفِذُ الْبَلَّةَ إِلَى مَوْضِعِ الْفَصْدِ وَيُشْتَرَطُ الْاِسْتِيْعَابُ فِيْ مَسْحِ الْجَبِيْرَةِ وَالْعِصَابَةِ فِيْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَهُوَ الْمَذْكُوْرُ فِى الْاَسْرَارِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَكْفِيْ الْاَكْثَرُ وَإِذَا مَسَحَ ثُمَّ نَزَعَهَا ثُمَّ اَعَادَهَا فَعَلَيْهِ اَنْ يُعِيْدَ الْمَسْحَ وَاِنْ لَمْ يُعِدْ اَجْزَاهُ وَإِذَا سَقَطَتْ عَنْهَا فَبَدَّلَهَا بِالْاُخْرٰى فَالْاَحْسَنُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ وَاِنْ لَمْ يُعِدْ اَجْزَاهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَثْلِيْثُ مَسْحِ الْجَبَائِرِ بَلْ يَكْفِيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَهُوَ الْاَصَحُّ وَيَجِبُ اَنْ يَعْلَمَ اَنَّ مَسْحَ الْجَبِيْرَةِ يُخَالِفُ مَسْحَ الْخُفِّ فِيْ اَنَّهُ يَجُوْزُ عَلٰى حَدَثٍ وَلَا يَقْدِرُ لَهُ مُدَّةً وَإِذَا سَقَطَتْ لَا عَنْ بُرْءٍ لَا يَبْطُلُ وَاِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ يَجِبُ غَسْلُ ذٰلِكَ الْمَوْضِعِ خَاصَّةً بِخِلَافِ مَا إِذَا خَلَعَ اَحَدَ الْخُفَّيْنِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ .

অনুবাদ : কিন্তু পট্টির দুই গিঁঠের মধ্যভাগে হাতের প্রকাশ্য অংশের হুকুম হলো, বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী [এর উপর] মাসেহই এর জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা, যদি তা ধৌত করে তবে পট্টি ভিজে যাবে। কখনো [পানির] তরলতা শিঙ্গা লাগানোর স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর বর্ণনায় পট্টি ও ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করার ক্ষেত্রে ইসতি'আব [পূর্ণাঙ্গ মাসেহ] শর্ত। 'আসরার' নামক গ্রন্থে এটিই উল্লেখ রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহের নিকট [ইসতি'আব শর্ত নয়,] অধিকাংশ মাসেহ করাই যথেষ্ট। যখন মাসেহ করে পট্টি খুলে ফেলে, অতঃপর আবার পট্টি বাঁধে তবে মাসেহকে দোহরানো তার জন্য আবশ্যক। আর যদি মাসেহ না দোহরায় তবুও যথেষ্ট হবে। যদি পট্টি পড়ে যায়, তাই অন্য পট্টি লাগায় তবে উত্তম হলো মাসেহকে দোহরানো। আর যদি না দোহরায় তবুও যথেষ্ট হবে। পট্টির উপর তিনবার মাসেহ করা শর্ত নয়; বরং একবার মাসেহ করাই যথেষ্ট এবং এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। এ কথা জানা আবশ্যক যে, পট্টির উপর মাসেহ মোজার উপর মাসেহ থেকে [কয়েকটি বিষয়ে] ব্যতিক্রম। যথা- ১. হদস অবস্থায় [পরিহিত] পট্টির উপরও মাসেহ করা জায়েজ। [পক্ষান্তরে হদস অবস্থায় পরিহিত মোজার উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই।] ২. পট্টির উপর মাসেহ করার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা নেই। [পক্ষান্তরে মোজার উপর মাসেহের নির্ধারিত সময়সীমা রয়েছে।] ৩. ক্ষত নিরাময়ের পূর্বে যদি পট্টি পড়ে যায় তবে মাসেহ বাতিল হয় না। [পক্ষান্তরে মোজা যদি পা থেকে পড়ে যায় তবে মাসেহ বাতিল হয়ে যায়।] ৪. ক্ষত নিরাময়ের কারণে যদি পট্টি পড়ে যায়, তবে বিশেষভাবে উক্ত স্থান ধৌত করা ওয়াজিব হয়। পক্ষান্তরে মোজাদ্বয়ের একটিও যদি খুলে যায় তবে উভয় পা ধৌত করা আবশ্যক হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الظَّاهِرُ الخ : বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী দুই পট্টি বা ব্যান্ডেজের মধ্যভাগে হাতের প্রকাশ্য অংশ ধৌত করা ওয়াজিব নয়; বরং তা মাসেহ করাই যথেষ্ট। কেননা, অনেক সময় উক্ত স্থান ধৌত করলে পট্টি ভিজে যায়, যা ক্ষতের জন্য ক্ষতিকর। অপর একটি অভিমত অনুযাযী উক্ত স্থান ধৌত করা ওয়াজিব।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَكْفِي الْأَكْثَرُ الخ : কোনো কোনো ফকীহ বলেন, পট্টি বা ব্যান্ডেজের অধিকাংশ মাসেহ করাই যথেষ্ট– ইসতি'আব আবশ্যক নয়। 'আল কাফী' নামক গ্রন্থে এ অভিমতকেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। কেননা, যদি اِسْتِيْعَابْ -এর শর্ত আরোপ করা হয় তবে পট্টি ও ব্যান্ডেজের সর্বাংশে পানি পৌঁছানো আবশ্যক হয়। আর এর কারণে পানির তরলতা হয়তো ক্ষতস্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, যা ক্ষতের জন্য ক্ষতিকর। ইনায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, মাথা মাসেহ ও মোজার উপর মাসেহের ক্ষেত্রে اِسْتِيْعَابْ শর্ত নয়। কেননা, মাথা মাসেহ কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। যেখানে بَاء মহলের উপর দাখিল হয়েছে, যার অর্থ হয় بَعْضِيَّةٌ -এর। আর মোজার উপর মাসেহ করা হাদীসে মাশহূর দ্বারা প্রমাণিত। উক্ত হাদীসসমূহেই "আংশিকের উপর মাসেহ যথেষ্ট" বলা হয়েছে। কিন্তু পট্টি বা ব্যাণ্ডেজের উপর মাসেহ প্রমাণিত হযরত আলী (রা.)-এর হাদীস দ্বারা, যার মধ্যে بَعْضِيَّةٌ [আংশিক]-এর কথা পাওয়া যায় না, তবে অসুবিধাকে দূর করার জন্য আংশিক মাসেহ প্রমাণিত হয়। কেননা, পূর্ণাঙ্গ মাসেহ করা অনেক সময় ক্ষতি করে।

قَوْلُهُ وَاِنْ لَمْ يُعِدْ اَجْزَاهُ الخ : কেউ যদি পট্টির উপর মাসেহ করে পট্টি খুলে ফেলে, অতঃপর আবার তা লাগায়, তবে তার জন্য উচিত হলো মাসেহকে দোহরানো। কিন্তু যদি না দোহরায় তবে যথেষ্ট হবে। কেননা, পট্টি পড়ে যাওয়া কিংবা নিরাময়ের কারণে পতিত হওয়া শুধু মাসেহ ভঙ্গের কারণ। তা ছাড়া অন্যান্য অঙ্গে যেহেতু عَجْز [অক্ষমতা]-এর ওজর রয়েছে, তাই সেসব ক্ষেত্রে মাসেহ ভাঙ্গবে না। ফলত পট্টি খোলার দ্বারা মাসেহ দোহরানো এবং এর নীচের অংশ ধৌত করা আবশ্যক হয় না।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْاَصَحُّ : এ ইবারতের মাঝে এ কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোনো কোনো শায়খের অভিমত হচ্ছে, এ পট্টির উপর মাসেহ করার ক্ষেত্রেও تَكْرَارْ [তিনবার] শর্ত। কেননা, তা ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত। হ্যাঁ, যদি মাথার উপর ক্ষত হয় তবে تَكْرَارْ শর্ত নয়।

قَوْلُهُ وَيَجِبُ اَنْ يَعْلَمَ اَنَّ مَسْحَ الْجَبِيْرَةِ الخ :

মোজা ও পট্টির উপর মাসেহের মধ্যে পার্থক্য : আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন– গভীর গবেষণার পর দেখা গেছে যে, প্রায় ত্রিশটি বিষয়ের ক্ষেত্রে মোজা ও পট্টির উপর মাসেহের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে দশটি অধিক প্রসিদ্ধ। শারেহ (র.) উক্ত দশটির মাঝে চারটি উল্লেখ করেছেন। আমরা উক্ত প্রসিদ্ধ দশটি উল্লেখ করছি–

১. পট্টির উপর মাসেহের ক্ষেত্রে তাহারাত অবস্থায় পট্টি বাঁধা শর্ত নয়। পক্ষান্তরে মোজার ক্ষেত্রে তাহারাত অবস্থায় মোজা পরিধান করা শর্ত।
২. পট্টির উপর মাসেহ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। পক্ষান্তরে মোজার উপর মাসেহ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। অর্থাৎ মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত।
৩. যদি পট্টি স্বস্থান থেকে সরে যায়, তবে মাসেহ বাতিল হয় না। পক্ষান্তরে যদি মোজা থেকে পা বের হয়ে যায়, যদিও তা অনিচ্ছায় বের হয় তবে এর মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে।
৪. পট্টি যদি নিরাময়ের কারণে পড়ে যায় তবে শুধু ঐ স্থান ধোয়া আবশ্যক হয়– অন্য কোনো স্থান ধৌত করা আবশ্যক হয় না। পক্ষান্তরে যদি এক মোজা খুলে, তবে দ্বিতীয় পা-ও ধৌত করা আবশ্যক হয়। এ চারটি সুরত শারেহ (র.) উল্লেখ করেছেন।
৫. এক বর্ণনা অনুযায়ী পট্টির উপর মাসেহ করা ছাড়াও নামাজ সহীহ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মোজার উপর মাসেহ করা ছাড়া নামাজ সহীহই হয় না।
৬. পট্টির উপর মাসেহ মুহদিছ [অজুহীন] ও জুনূবী উভয়ের জন্য জায়েজ। পক্ষান্তরে জুনূবীর জন্য মোজার উপর মাসেহ জায়েজ নেই– শুধু মুহদিছের জন্য জায়েজ।
৭. এক বর্ণনা মোতাবেক পট্টির উপর মাসেহের ক্ষেত্রে اِسْتِيْعَابْ শর্ত। পক্ষান্তরে মোজার উপর মাসেহের ক্ষেত্রে اِسْتِيْعَابْ শর্ত নয়।
৮. পট্টির উপর মাসেহের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে নিয়ত শর্ত নয়। পক্ষান্তরে মোজার উপর মাসেহ করার ক্ষেত্রে এক বর্ণনা অনুযায়ী নিয়ত শর্ত।
৯. এক পাকে পট্টির উপর মাসেহ করা এবং অপর পা ধৌত করা অর্থাৎ উভয়টিকে একত্রিত করা জায়েজ। পক্ষান্তরে মোজার উপর মাসেহের ক্ষেত্রে এমনটি জায়েজ নেই।
১০. পট্টির উপর মাসেহ করা জায়েজ, যদিও তা পা ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে হয়। পক্ষান্তরে মোজার উপর মাসেহ করার জন্য পায়ের মোজা শর্ত; অন্য কোনো মোজার উপর মাসেহ বৈধ নয়।

بَابُ الْحَيْضِ

اَلدِّمَاءُ الْمُخْتَصَّةُ بِالنِّسَاءِ ثَلٰثَةٌ حَيْضٌ وَاسْتِحَاضَةٌ وَنِفَاسٌ فَالْحَيْضُ هُوَ دَمٌ يُنْفِضُهُ رَحِمُ اِمْرَأَةٍ بَالِغَةٍ اَىْ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ لَا دَاءَ بِهَا وَلَمْ تَبْلُغِ الْاِيَاسَ فَالَّذِىْ لَا يَكُوْنُ مِنَ الرَّحْمِ لَيْسَ بِحَيْضٍ وَكَذَا الَّذِىْ قَبْلَ سِنِّ الْبُلُوْغِ اَىْ تِسْعِ سِنِيْنَ وَكَذَا مَا يُنْفِضُهُ الرَّحْمُ لِمَرَضٍ فَاِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ كَانَ سَيَلَانُ الْبَعْضِ طَبِيْعِيًّا فَكَانَ حَيْضًا وَسَيَلَانُ الْبَعْضِ بِسَبَبِ الْمَرَضِ فَلَا يَكُوْنُ حَيْضًا .

পরিচ্ছেদ : হায়েজ

অনুবাদ : মহিলাদের সাথে সংশ্লিষ্ট রক্ত তিন প্রকার– ১. হায়েজ, ২. ইস্তিহাজা, ৩. নিফাস। হায়েজ বলা হয় এমন রক্তকে, যা প্রাপ্তবয়স্কা নারীর জরায়ু থেকে নির্গত হয়। অর্থাৎ [যে কমপক্ষে] নয় বছরের কন্যা। যে সুস্থ এবং আয়াস [রক্ত না আসা]-এর বয়সে পৌঁছেনি। অতএব ঐ রক্ত যা জরায়ু থেকে নির্গত হয় না তা হায়েজ নয়। অনুরূপ [ঐ রক্তও হায়েজ নয়] যা প্রাপ্ত বয়সের পূর্বে তথা [কমপক্ষে] নয় বছরের [পূর্বে নির্গত হয়]। অনুরূপ অসুস্থতার কারণে যে রক্তকে জরায়ু নির্গত করে [তাও হায়েজ নয়]। সুতরাং রক্ত যখন অনবরত নির্গত হতে থাকবে তখন এর কিছু স্রাব হয় তবয়ী [স্বভাবগত] তাহলে তা হায়েজ হবে এবং কিছু স্রাব হয় অসুস্থতার কারণে তাহলে তা হায়েজ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ الْحَيْضِ : উদ্দেশ্য هٰذَا بَابُ الْحَيْضِ –এর মূলরূপ হচ্ছে- بَابُ الْحَيْضِ শব্দটি مُبْتَدَأٌ مَحْذُوْفٌ-এর খবর। এর মূলরূপ হচ্ছে– هٰذَا بَابُ الْحَيْضِ উদ্দেশ্য হলো, এ পরিচ্ছেদে হায়েজ ইত্যাদির আহকামের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার "ইস্তিহাজা ও নিফাসের" আহকামের বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু শিরোনামে শুধু بَابُ الْحَيْضِ বলেছেন; ইস্তিহাজা ও নিফাস শব্দ উল্লেখ করেননি। কারণ, এতে হায়েজের সাথে সংশ্লিষ্ট মাসআলার আহকামের বিবরণই অধিক দেওয়া হয়েছে। ইস্তিহাজা ও নিফাসের আহকাম হায়েজের আহকামের তুলনায় অতি কম। যেন এখানে হায়েজের আহকামই মূল ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য আহকাম এর তাবে' বা অনুগামী।

দ্বিতীয় কথা হলো, كِتَابُ الطَّهَارَةِ-এর মাঝে 'হায়েজ পরিচ্ছেদ'-কে শেষে আনা হয়েছে। কেননা, এ তাহারাত অধ্যায়ের যেসব মাসআলা পুরুষ ও নারীর মাঝে বরাবর তা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, আর যেসব মাসআলা শুধু মহিলাদের সাথে সংশ্লিষ্ট তথা হায়েজ, নিফাস ও ইস্তিহাজার মাসআলা, তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

হায়েজ, নিফাস ও ইস্তিহাজা হদস (حَدَثٌ)-এর অন্তর্ভুক্ত, নাকি নাপাকী (نَجَسٌ)-এর অন্তর্ভুক্ত? এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কারো কারো মত হলো, উভয়টি نَجَسٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। আবার কারো অভিমত হলো, উভয়টি হদস

(حَدَث) -এর অন্তর্ভুক্ত। তবে শেষোক্ত অভিমতটি যথোপযুক্ত। কারণ, এ আলোচনার পরেই গ্রন্থকার بَابُ الْاِنْجَاس বলে نَجَس -এর বিবরণ পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, হায়েজ, নিফাস ও ইস্তিহাজা نَجَس -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এগুলো نَجَس-এর অন্তর্ভুক্ত, তবে পরবর্তীতে আবার بَابُ الْاَنْجَاس শিরোনামে অধ্যায় স্থাপন করাটা শুধুমাত্র تَكْرَارْ বলেই গণ্য হবে।

حَيْض - نِفَاسْ ও اِسْتِحَاضَةْ -এর অর্থ : حيض শব্দটি حَاضَ يَحِيْضُ থেকে উদ্গত। এর শাব্দিক অর্থ- প্রবাহিত হওয়া। ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় حَيْض বলা হয়- هُوَ دَمٌ يَنْفُضُهُ رَحْمُ اِمْرَأَةٍ بَالِغَةٍ لَا دَاءَ بِهَا وَلَمْ تَبْلُغِ الْاَيَاسَ অর্থাৎ "এমন রক্ত যা সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্কা আয়াসের বয়সে পৌঁছেনি এমন নারীর জরায়ু থেকে নির্গত হয়।" -[শরহে বিকায়া ১ : ১০৮]

ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- هُوَ دَمٌ يَنْفُضُهُ رَحْمُ اِمْرَأَةٍ سَلِيْمَةٍ مِنَ الدَّاءِ وَالصِّغَرِ অর্থাৎ "প্রাপ্তবয়স্কা সুস্থ নারীর জরায়ু থেকে নির্গত রক্তকে حَيْض বলা হয়।" -[ফাতহুল কাদীর ১ : ১৬৩] نِفَاسْ বলা হয়- اِسْمٌ لِلدَّمِ الْخَارِجِ مِنَ الرَّحْمِ عَقِيْبَ الْوِلَادَةِ অর্থাৎ "সন্তান প্রসবের পর মহিলার জরায়ু থেকে নির্গত রক্তকে।" -[বাদায়িউস সানায়ে' ১ : ১৫৭]

اِسْتِحَاضَةْ বলা হয়- "অসুস্থতার কারণে মহিলার জরায়ু কিংবা রগ থেকে নির্গত রক্তকে।" বাদায়িউস সানায়ে' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- مَا انْتَقَصَ عَنْ اَقَلِّ الْحَيْضِ وَمَا زَادَ عَلٰى اَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ অর্থাৎ "ঐ রক্তকে ইস্তিহাজার রক্ত বলা হয়, যা হায়েজের ন্যূনতম সময়সীমার কম সময় নির্গত হয় কিংবা যা হায়েজ ও নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা থেকে অধিক সময় নির্গত হয়।" -[বাদায়িউস সানায়ে' ১ : ১৫৮]

❖ **হায়েজের সূচনা :** হায়েজের সূচনা হয়েছে আদি মাতা বিবি হাওয়া (আ.)-এর মাধ্যমে। তিনি নিষিদ্ধ ডালিম গাছের ফল খাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ অবস্থায় পতিত করেন। সে থেকে তাঁর সন্তানদের মাঝে এ অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

قَوْلُهُ اَلدِّمَاءُ الْمُخْتَصَّةُ الخ : শারেহ (র.) دِمَاءٌ -এর সাথে مُخْتَصَّةٌ শব্দের قَيْد দ্বারা নাকসীর, শিঙ্গা লাগানো ইত্যাদি রকমের রক্তকে এর থেকে পৃথক করেছেন। কেননা, এসব বিষয়ে পুরুষ-মহিলা বরাবর। শুধু মহিলার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। পক্ষান্তরে হায়েজ, নিফাস ও ইস্তিহাজা শুধুমাত্র মহিলার সাথে সংশ্লিষ্ট।

قَوْلُهُ لَا دَاءَ بِهَا الخ : এখানে নফী-এর পর داء -কে نَكِرَةْ আনার দ্বারা প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হলো, তার কোনো প্রকার রোগই থাকতে পারবে না। কারণ, রোগের কারণে যে রক্ত নির্গত হয় তা حَيْض নয়। এর থেকে একটি সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, যে জরায়ুতে রোগ রয়েছে, এর থেকে নির্গত সমস্ত রক্তই حَيْض নয়। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা, জরায়ুর রোগে আক্রান্ত নারীর জরায়ু থেকে যে রক্তটি তবয়ীভাবে নির্গত হয় তা অবশ্যই হায়েজ। আর যা রোগের কারণে বের হয় তা হায়েজ নয়। উক্ত সন্দেহের অপনোদন হচ্ছে, রক্ত নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রে সুস্থতা ও অসুস্থতার কারণে রক্ত নির্গত হওয়া ধর্তব্য- জরায়ু সুস্থ হওয়া ও অসুস্থ হওয়া ধর্তব্য নয়। তা ছাড়া মহিলা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মাধ্যমে নিজের রক্ত সম্পর্কে নিজেই ফয়সালা করতে পারে যে, কোন রক্ত রোগের কারণে নির্গত হচ্ছে এবং কোনটি রোগবিহীন তবয়ীভাবে নির্গত হচ্ছে।

قَوْلُهُ فَاِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ كَانَ الخ : এখানে এ কথার বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য যে, কখনো কখনো সময়ের তারতম্যের কারণে হায়েজ ও ইস্তিহাজা একত্রিত হয়ে যায়। তখন এমন মহিলা নিজের অভ্যাস অনুযায়ী ফয়সালা করবে যে, এ অনবরত নির্গত রক্তের কতটুকু হায়েজ। অতএব, যতটুকু হায়েজ হবে, তা ছাড়া বাকি পুরো রক্তকে ইস্তিহাজা গণ্য করা হবে; হায়েজ নয়।

وَكَمَا قَيَّدَهُ بِعَدَمِ الدَّاءِ يَجِبُ اَنْ يُقَيِّدَهُ بِعَدَمِ الْوِلَادَةِ اَيْضًا اِحْتِرَازًا عَنِ النِّفَاسِ ثُمَّ الْاَصَحُّ اَنَّ الْحَيْضَ مُوَقَّتٌ اِلٰى سِنِّ الْاِيَاسِ وَاَكْثَرُ الْمَشَائِخِ قَدَّرُوْهُ بِسِتِّيْنَ سَنَةً وَمَشَائِخُ بُخَارَا وَخَوَارِزْمَ بِخَمْسٍ وَّخَمْسِيْنَ سَنَةً فَمَا رَأَتْ بَعْدَهَا لَا يَكُوْنُ حَيْضًا فِيْ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَالْمُخْتَارُ اَنَّهَا اِنْ رَأَتْ دَمًا قَوِيًّا كَالْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ الْقَانِيْ كَانَ حَيْضًا وَيَبْطُلُ الْاِعْتِدَادُ بِالْاَشْهُرِ قَبْلَ التَّمَامِ وَبَعْدَهُ لَا وَاِنْ رَأَتْ صُفْرَةً اَوْ خُضْرَةً اَوْ تُرْبِيَّةً فَهِيَ اِسْتِحَاضَةٌ ـ

অনুবাদ : হায়েজের রক্তে গ্রন্থকার যেমন রোগ না থাকার শর্তারোপ করেছেন তেমনই সন্তান প্রসব না হওয়ার শর্তারোপ করাও ওয়াজিব, যাতে করে নিফাস-এর [রক্ত] থেকে বিরত থাকা হয়। অতঃপর বিশুদ্ধ অভিমত হলো, হায়েজ সন্নে আয়াস [বার্ধক্যের কারণে হায়েজ বন্ধ হয়ে যাওয়া] পর্যন্ত নির্ধারিত। অধিকাংশ মাশায়িখ সন্নে আয়াসের সীমা নির্ধারণ করেছেন ষাট বছর। বুখারা ও খাওয়ারিযম-এর মাশায়িখ [সন্নে আয়াসের সীমা নির্ধারণ করেছেন] পঞ্চান্ন বছর। অতএব, উক্ত সময়ের পর মহিলা যে রক্ত দেখতে পায় তা জাহিরী মাযহাব অনুযায়ী হায়েজ নয়। বিশুদ্ধ [মাযহাব] হচ্ছে, যদি মহিলা কালো কিংবা গাঢ় লাল রং-এর ন্যায় গাঢ় রক্ত দেখে তবে তা হায়েজ হবে। [সন্নে আয়াসে উপনীত তালাকপ্রাপ্তা মহিলা– যে মাসের হিসাবে ইদ্দত গণনা করে] যদি ইদ্দতের মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে রক্ত দেখে তবে মাসের মাধ্যমে ইদ্দত হিসাব করা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি পরে দেখে তবে বাতিল হবে না। [সন্নে আয়াসে উপনীত] মহিলা যদি হলুদ কিংবা সবুজ কিংবা মাটির রংয়ের রক্ত দেখে তবে তা [হায়েজ নয়; বরং] ইস্তিহাজা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِحْتِرَازًا عَنِ النِّفَاسِ : এখানে শারেহ (র.) মুসান্নিফ (র.)-এর উপর একটি মন্তব্য করেছেন। মন্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে– গ্রন্থকার যেরূপ মতনে لَا دَاءَ বলে হায়েজের রক্তকে ইস্তিহাজার রক্ত থেকে পৃথক করেছেন, অনুরূপ তাঁর জন্য জরুরি ছিল عَدَمُ الْوِلَادَةِ শর্ত লাগানো, যাতে করে নিফাসের রক্ত থেকেও হায়েজের রক্ত পৃথক থাকে। কেউ কেউ এর এ উত্তর দিয়েছেন যে, কখনো নিফাসকে হায়েজ বলা হয়। হাদীসে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) একটি এমন অধ্যায়ই কায়েম করেছেন যে, যদি হায়েজের সংজ্ঞা নিফাস-এর উপর প্রযোজ্য হয় তবে কোনো সমস্যা নেই। আমাদের গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যও এমনই যে, হায়েজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আম [ব্যাপক], যা নিফাসকেও শামিল করে। তাই এখানে অতিরিক্ত শর্ত লাগানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْاَصَحُّ اَنَّ الْحَيْضَ : অর্থাৎ বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, শরিয়তে হায়েজ সন্নে আয়াস পর্যন্ত নির্ধারিত। তাই যখন মহিলা উক্ত বয়সে পৌঁছে এবং রক্ত দেখে, তবে তা হায়েজ হবে না। তবে এটি বিশুদ্ধ অভিমতের পরিপন্থি। কেননা, যদি গাঢ় লাল রক্ত হয় তবে তা হায়েজ হবে। এ কথা স্পষ্ট যে, বিশুদ্ধ (اَصَحّ) শব্দ ও উত্তম (مُخْتَار) শব্দ উভয়টিই ফতোয়ার শব্দ। যখন এ দুয়ের মাঝে মতানৈক্য হয় তখন উভয়টিকে কিভাবে মুফতা বিহী মানা হবে? এর উত্তর হচ্ছে, اَصَحّ বা বিশুদ্ধ হওয়া تَوْقِيْت [সময় নির্ধারণ তথা সন্নে আয়াস]-এর দিকে ফিরবে; حَيْض শব্দ প্রয়োগ করার দিকে নয়, তাই কোনো মতানৈক্যই আর থাকছে না।

قَوْلُهُ قَدَّرُوْهُ بِسِتِّيْنَ الخ : এতে মতানৈক্য রয়েছে যে, সন্নে আয়াস-এর সময়সীমা কত বছর? কেউ ষাট বছরকে সন্নে আয়াস নির্ধারণ করেছেন। কেউ পঞ্চান্ন বছরকে সন্নে আয়াস বলেছেন এবং এ পঞ্চান্ন বছরের উপরই বর্তমানে সন্নে আয়াসের ফতোয়া। এক জামাত নিকটবর্তী যুগের ভিত্তিতে সন্নে আয়াস নির্ধারণ করেছেন। অপর জামাত বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য হিসেবে সন্নে আয়াস নির্ধারণ করেছেন।

قَوْلُهُ وَيَبْطُلُ الْاِعْتِدَادُ : অর্থাৎ যদি সন্নে আয়াসে উপনীত মহিলাকে তালাক দেওয়া হয়, তবে যেহেতু তার ইদ্দতের হিসাব মাসের হিসাবে হয় এবং তার ইদ্দত হয় তিন মাস, এখন যদি সে মাসের হিসাবে ইদ্দত গণনা শুরু করে, অতঃপর হায়েজ তার আসতে শুরু হয়, তখন যদি তার উক্ত হায়েজ ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আসে, তবে তার বিগত ইদ্দত বাতিল হয়ে যাবে এবং এখন নতুন করে হায়েজের হিসাবে ইদ্দত গণনা করতে হবে। কেননা, এখন এ কথা প্রকাশ হয়ে গেছে যে, সে হায়েজবিশিষ্টা মহিলা সন্নে আয়াসে পৌঁছেনি। হ্যাঁ, যদি উক্ত রক্ত তিন মাস ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পরে আসে তবে ইদ্দত বাতিল হবে না। যদি সে মহিলা তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পর নতুন স্বামী গ্রহণ করে তবে তার বিবাহ সহীহ হবে, তবে ভবিষ্যতে তাকে হায়েজের হিসাবে ইদ্দত গণনা করতে হবে।

وَاَقَلُّهُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَقَلُّهُ يَوْمَانِ وَاَكْثَرُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) اَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَاَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَنَحْنُ نَتَمَسَّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ ثُمَّ اعْلَمْ اَنَّ مَبْدَأُ الْحَيْضِ مِنْ وَقْتِ خُرُوْجِ الدَّمِ اِلَى الْفَرْجِ الْخَارِجِ وَ وُصُوْلُ الدَّمِ اِلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ فَاِذَا لَمْ يَصِلْ اِلَى الْفَرْجِ الْخَارِجِ بِحَيْلُوْلَةِ الْكُرْسُفِ لَا تَقْطَعُ الصَّلٰوةَ فَعِنْدَ وَضْعِ الْكُرْسُفِ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْخُرُوْجُ اِذَا وَصَلَ الدَّمُ اِلٰى مَا يُحَاذِى الْفَرْجَ الْخَارِجَ مِنَ الْكُرْسُفِ فَاِذَا احْمَرَّ مِنَ الْكُرْسُفِ مَا يُحَاذِى الْفَرْجَ الدَّاخِلَ لَا يَتَحَقَّقُ الْخُرُوْجُ اِلَّا اِذَا رُفِعَتِ الْكُرْسُفُ فَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوْجُ مِنْ وَقْتِ الرَّفْعِ وَكَذَا فِى الْاِسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ وَالْبَوْلِ وَ وَضْعِ الرَّجُلِ الْقُطْنَةَ فِى الْاِحْلِيْلِ وَالْقُلْفَةِ كَالْخَارِجِ ثُمَّ وَضْعُ الْكُرْسُفِ مُسْتَحَبٌّ لِلْبِكْرِ فِى الْحَيْضِ وَلِلثَّيِّبِ فِىْ كُلِّ حَالٍ وَمَوْضِعُهُ مَوْضِعُ الْبَكَارَةِ وَيُكْرَهُ فِى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ فَالطَّاهِرَةُ اِذَا وَضَعَتْ اَوَّلَ اللَّيْلِ فَحِيْنَ اَصْبَحَتْ رَأَتْ عَلَيْهِ اَثَرَ الدَّمِ فَالْاٰنَ يَثْبُتُ حُكْمُ الْحَيْضِ وَالْحَائِضُ اِذَا وَضَعَتْ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَرَأَتْ عَلَيْهِ الْبَيَاضَ حِيْنَ اَصْبَحَتْ حُكِمَ بِطَهَارَتِهَا مِنْ حِيْنَ وَضَعَتْ .

অনুবাদ : হায়েজের সর্বনিম্ন সময় হলো তিনদিন তিনরাত এবং সর্বোচ্চ সময় হলো দশদিন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট হায়েজের সর্বনিম্ন সময় হলো, দুই দিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ [অংশ]। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট হায়েজের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে একদিন একরাত এবং সর্বোচ্চ সময় হচ্ছে পনেরো দিন। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করি। [যার মধ্যে] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– "কুমারী ও অকুমারী কন্যার হায়েজের সর্বনিম্ন সময় হলো, তিনদিন তিনরাত এবং সর্বোচ্চ সময় হচ্ছে দশদিন।" অতঃপর জেনে রেখ, [মহিলার] গুপ্তাঙ্গের বহিরাংশের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসার দ্বারা হায়েজের সূচনা হয়। গুপ্তাঙ্গের ভিতরাংশের দিকে বের হয়ে আসার দ্বারা [হায়েজের সূচনা] হয় না।

অতএব, যখন কুরসুফ [প্যান্টি]-এর প্রতিবন্ধকতার কারণে রক্ত গুপ্তাঙ্গের বহিরাংশ পর্যন্ত না পৌঁছবে, উক্ত রক্ত নামাজকে ভঙ্গ করে না [অর্থাৎ এর কারণে নামাজ মওকুফ হয় না]। সুতরাং কুরসুফ [প্যান্টি] থাকাবস্থায় রক্ত নির্গত হওয়া তখনই প্রমাণিত হবে যখন রক্ত প্যান্টির ঐ অংশ পর্যন্ত পৌঁছবে, যা গুপ্তাঙ্গের বহিরাংশের সমান্তরাল। যখন প্যান্টির ঐ অংশ লাল বর্ণের হয়ে যাবে, যা গুপ্তাঙ্গের ভিতরাংশের সমান্তরাল তখন [রক্ত] নির্গত হওয়া প্রমাণিত হবে

না, তবে যখন প্যান্টি উঠাবে তখন [প্যান্টি] উঠানোর সময় থেকে নিয়ে রক্তের নির্গত হওয়া প্রমাণিত হবে। অনুরূপ হুকুম ইস্তিহাজা, নিফাস ও পেশাবের ক্ষেত্রেও এবং পুরুষের লিঙ্গের ছিদ্রে রুই রাখা ও লিঙ্গাগ্রের ত্বক [খতনাবিহীন চামড়া] বহিরাংশের ন্যায়।

হায়েজ অবস্থায় কুমারী নারীর জন্য প্যান্টি ব্যবহার করা মোস্তাহাব এবং অকুমারী নারীর জন্য সর্বাবস্থায় [মোস্তাহাব]। প্যান্টি বাঁধার স্থান হচ্ছে কুমারত্বের স্থান। গুপ্তাঙ্গের ভিতরাংশে [প্যান্টি] বাঁধা মাকরূহ। অতএব, যখন পবিত্রা [হায়েজমুক্ত] মহিলা রাতের শুরু অংশে প্যান্টি বেঁধেছে, আর তখন সকালে সে দেখে রক্তের চিহ্ন তবে এখন [তথা সকাল] থেকে হায়েজ সাব্যস্ত হবে। হায়েজা নারী যখন প্রথম রাতে প্যান্টি বাঁধে, আর সকালে এতে শুভ্রতা দেখে, তবে যখন প্যান্টি বেঁধেছে তখন থেকে নিয়ে পবিত্রতার হুকুম দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَقَلُّهُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ الخ :

হায়েজের সর্বনিম্ন সময় : হায়েজের সর্বনিম্ন সময় কতদিন– এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আহনাফ বলেন, হায়েজের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে তিনদিন তিনরাত। আর যে রক্ত এর চেয়ে কম সময় স্রাব হয় তা হায়েজ নয়; বরং তা ইস্তিহাজা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, হায়েজের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে, দুই দিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হায়েজের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে একদিন একরাত। ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট শুধু রক্তই হায়েজ, চাই তার প্রবাহ এক ঘণ্টাই হোক না কেন।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, দুই দিন ও তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময় মূলত তিন দিনই। কেননা, নিয়ম আছে– لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ তাই উক্ত সময় তিন দিনের বরাবর।

ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল হলো, হায়েজ হচ্ছে একটি হদস। সুতরাং অন্যান্য হদসের ন্যায় এ 'হায়েজ' নামক হদসটিও কোনো কিছুর সাথে নির্ধারিত নয়। অর্থাৎ যখনই যতটুকু সময় রক্ত নির্গত হয় তা-ই হায়েজ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হচ্ছে, রক্তের প্রবাহ যখন পূর্ণ একদিন একরাত ব্যাপী চলতে থাকে, তখন জানা হয়ে যাবে যে, এ রক্ত বাচ্চাদানী [জরায়ু] থেকে নির্গত। অতএব, হায়েজের রক্ত সনাক্ত করার জন্য এর চেয়ে বেশি সময়ের প্রয়োজন নেই।

আহনাফ-এর দলিল হলো, হযরত আয়েশা, আবূ উমামা বাহেলী, ওয়াইলা, আনাস ইবনে মালিক (র.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হাদীস– اِنَّهُ قَالَ اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুমারী ও অকুমারী নারীর হায়েজের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিনদিন তিনরাত, আর এর সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে দশদিন।" উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হায়েজের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিনদিন তিনরাত।

اَلرَّدُّ عَلَى الْاَئِمَّةِ : উল্লিখিত ইমামগণের পেশকৃত দলিলসমূহের উত্তর হচ্ছে, হায়েজের সর্বনিম্ন মেয়াদ শরিয়ত কর্তৃক তিনদিন তিনরাত নির্ধারিত। এখন যদি কেউ এর চেয়ে কম মেয়াদকে হায়েজের জন্য যথেষ্ট মনে করেন তবে তা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের চেয়ে কম করা হবে, অথচ শরিয়ত নির্ধারিত সময়সীমা হ্রাস করা জায়েজ নেই।

–[এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর ১ : ১৬৩-১৬৪, বাদায়িউস সানায়ে' ১ : ১৫৪-১৫৫, বাহরুর রায়িক– ১ : ৩৩৩-৩৩৪, মা'আরিফুস সুনান– ১ : ৪১২-৪১৩, দরসে তিরমিযী– ১ : ৩৬০]

হায়েজের সর্বোচ্চ সময় : হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদ নিয়েও ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদ পনেরো দিন। আমাদের মতে, হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে দশদিন।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঐ হাদীস, যা তিনি স্ত্রী লোকদের দীনি ত্রুটির ব্যাপারে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন– تَقْعُدُ اِحْدٰهُنَّ شَطْرَ عُمُرِهَا لَا تَصُوْمُ وَلَا تُصَلِّىْ অর্থাৎ "স্ত্রীলোকরা জীবনের অর্ধেক সময় বসে থাকে– নামাজও পড়ে না রোজাও রাখে না।" এ হাদীসে شَطْرٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে– অর্ধেক, আর এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে হায়েজের সর্বোচ্চ সময়কে।

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, মানুষের জীবন ও বয়স নির্ধারণ করা হয় বয়সের গণনার মাধ্যমে, আর বৎসর নির্ধারণ করা হয় মাস গণনার মাধ্যমে। আর এক মাসের অর্ধেক হচ্ছে পনেরো দিন। সুতরাং এর থেকে প্রমাণ হলো যে, স্ত্রীলোকেরা পনেরো দিন হায়েজের কারণে পনেরো দিন নামাজও পড়ে না এবং রোজাও রাখে না।

আহনাফ-এর দলিল হলো ইতঃপূর্বে উল্লিখিত মাসআলায় বর্ণিত আমাদের হাদীস। তা হলো–

اِنَّهٗ قَالَ (ع) اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَاَكْثَرُهٗ عَشَرَةُ اَيَّامٍ.

এ হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, "হায়েজের সর্বোচ্চ সময় হলো দশদিন।" এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদ দশদিন।

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) : হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদ দশদিন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যা শরিয়তের দলিল। অতএব, মেয়াদকে যদি এর চেয়ে বৃদ্ধি করা হয় তবে তা হবে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের বৃদ্ধি করা, অথচ তা জায়েজ নেই।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর ১ : ১৬৪-১৬৫, বাদায়িউস সানায়ে' ১ : ১৫৫-১৫৭, বাহরুর রায়িক ১ : ৩৩৩-৩৩৪, মা'আরিফস সুনান– ১ : ৪১৩, দরসে তিরমিযী– ১ : ৩৬০]

قَوْلُهٗ اِلَى الْفَرْجِ الْخَارِجِ : 'মুহীত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, মহিলাদের বিশেষ ছিদ্র মুখের মতো হয়। অর্থাৎ মহিলাদের গুপ্তাঙ্গের ধরন মুখের মতো। মুখ হচ্ছে গুপ্তাঙ্গের বহিরাংশের সদৃশ। আর গুপ্তাঙ্গের বাকারত্বের সদৃশ হচ্ছে দাঁত। বাকারত্ব হচ্ছে একটি পাতলা পর্দা, যা স্ত্রীসঙ্গমের মাধ্যমে দূরীভূত হয়ে যায়। فَرْجٌ دَاخِلٌ বা গুপ্তাঙ্গের ভিতরাংশ হচ্ছে ঠোঁট এবং দাঁতের মধ্যভাগের খালি অংশের ন্যায়।

قَوْلُهٗ لَا تَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الخ : অর্থাৎ যদি প্যান্টির প্রতিবন্ধকতার কারণে রক্ত গুপ্তাঙ্গের বহিরাংশের দিকে না আসে, তবে এমতাবস্থায় মহিলা নামাজ ছাড়বে না। কেননা, এখনো সে হায়েজার হুকুমে পড়েনি। কারণ, এখনো পর্যন্ত রক্ত فَرْجٌ خَارِجٌ তথা গুপ্তাঙ্গের বহিরাংশের দিকে আসেনি। হ্যাঁ, যখন রক্ত প্যান্টির ঐ অংশ পর্যন্ত চলে আসবে যা فَرْجٌ خَارِجٌ -এর বরাবর তখন নামাজ ছেড়ে দেবে।

قَوْلُهُ الْكُرْسُفُ : এ শব্দের ك অক্ষরে ضَمَّه - رَاء অক্ষরে সাকিন ও س অক্ষরে ضَمَّه পড়া হবে। 'করসুফ' বলা হয়– প্যান্টি কিংবা কাপড়ের টুকরা, রুই ইত্যাদির ভাঁজ করা নরম গদী, যা হায়েজা মহিলা গুপ্তাঙ্গের মুখে বেঁধে থাকে– যাতে করে হায়েজের রক্ত কাপড়ের সাথে না লাগে।

قَوْلُهٗ مُسْتَحَبٌّ لِلْبِكْرِ فِى الْحَيْضِ الخ : অর্থাৎ কুমারী নারীর জন্য হায়েজ অবস্থায় এবং অকুমারী [ছাইয়িবাহ] নারী সর্বাবস্থায় প্যান্টি বেঁধে থাকা মোস্তাহাব; বরং তা কুমারী ও অকুমারী নারী উভয়ের জন্য হায়েজ অবস্থায় সুন্নত। হাদীসেও বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরামের পবিত্রা স্ত্রীগণ তা ব্যবহার করতেন। بَاكِرَة [কুমারী] ও ثَيِّبَة [অকুমারী] নারীর মাঝে পার্থক্য হলো, ثَيِّبَة [অকুমারীর] নারী طُهْر অবস্থায়ও প্যান্টি লাগানো মোস্তাহাব– بَاكِرَة [কুমারী]-এর জন্য নয়, এর কারণ হলো, ثَيِّبَة [অকুমারী] নারীর কুমারত্ব দূর হয়ে যাওয়ার কারণে তার গুপ্তাঙ্গের ছিদ্রে প্রশস্ততা চলে আসে, তাই তার রক্ত তাড়াতাড়ি নেমে আসে এবং তা নেমে আসার সময় সে কম টের পায়। তাই উত্তম হলো, সর্বদা প্যান্টি লাগিয়ে রাখা, কিন্তু কুমারী নারীর জন্য তা প্রয়োজন নেই।

وَالطُّهْرُ الْمُتَخَلِّلُ اَىْ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِىْ مُدَّتِهٖ اَىْ فِىْ مُدَّةِ الْحَيْضِ وَمَا رَأَتْ مِنْ لَوْنٍ فِيْهَا اَىْ فِى الْمُدَّةِ سِوَى الْبَيَاضِ حَيْضٌ فَقَوْلُهٗ وَالطُّهْرُ مُبْتَدَأٌ وَمَا رَأَتْ عَطْفٌ عَلَيْهِ وَحَيْضٌ خَبَرُهٗ وَاعْلَمْ اَنَّ الطُّهْرَ الَّذِىْ يَكُوْنُ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بَلْ هُوَ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِىْ اِجْمَاعًا وَاِنْ كَانَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَكْثَرَ فَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَهُوَ قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اٰخِرًا لَا يَفْصِلُ وَاِنْ كَانَ اَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ فَيَجُوْزُ بِدَايَةُ الْحَيْضِ وَخَتْمُهٗ بِالطُّهْرِ عَلٰى هٰذَا الْقَوْلِ فَقَطْ وَقَدْ ذُكِرَ اَنَّ الْفَتْوٰى عَلٰى هٰذَا تَيْسِيْرًا عَلَى الْمُفْتِىْ وَالْمُسْتَفْتِىْ وَفِىْ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ (رحـ) عَنْهُ اَنَّهٗ لَايَفْصِلُ اِنْ اَحَاطَ الدَّمُ بِطَرَفَيْهِ فِىْ عَشَرَةٍ اَوْ اَقَلَّ وَ فِىْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْهُ اَنَّهٗ يَشْتَرِطُ مَعَ ذٰلِكَ كَوْنُ الدَّمَيْنِ نِصَابًا ـ

অনুবাদ : ঐ طُهْر [পবিত্রতা] যা হায়েজের মেয়াদের মধ্যে দুই রক্তের মাঝে দেখা যায় এবং হায়েজের মেয়াদে সাদা ব্যতীত যে-কোনো রং পরিলক্ষিত হোক তা হায়েজ। গ্রন্থকারের কথা وَالطُّهْرُ মুবতাদা এবং مَا رَأَتْ -এর উপর عَطْف হয়েছে। حَيْضٌ শব্দটি এর - خَبَر - জেনে রাখ, যে, طُهْر [পবিত্রতা] পনেরো দিনের চেয়ে কম হয় তা যখন দুই রক্তের মধ্যখানে দেখা দেবে– তা যদি তিনদিনের চেয়ে কম হয় তবে উক্ত طُهْر দুই রক্তের মাঝে পার্থক্য করবে না; বরং সর্বসম্মতিক্রমে তা ধারাবাহিক রক্ত প্রবাহের মতোই। আর যদি উক্ত طُهْر তিনদিন কিংবা এর চেয়ে বেশি হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শেষ অভিমত হলো [উক্ত طُهْر দুই রক্তের মাঝে] পার্থক্যকারী হবে না, যদিও তা দশদিনের চেয়ে বেশি হয়। অতএব [ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর] উক্ত অভিমতের ভিত্তিতে হায়েজের সূচনা ও পরিসমাপ্তি طُهْر দ্বারা হওয়া বৈধ হয় এবং উল্লেখ করা হয় যে, ফতোয়া প্রদানকারী ও ফতোয়া গ্রহণকারীর সহজের জন্য উক্ত অভিমতের উপরই ফতোয়া। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনা হলো, উক্ত طُهْر তখন পার্থক্যকারী হবে না যখন দশ কিংবা এর চেয়ে কম দিনে রক্ত طُهْر -এর উভয় প্রান্তকে বেষ্টন করে নেবে। ইমাম আবূ হানীফা থেকে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.)-এর বর্ণনা হলো, [দশ কিংবা এর চেয়ে কম দিনে طُهْر -এর উভয় প্রান্তকে বেষ্টন করা]-এর সাথে সাথে উভয় প্রান্তের রক্ত নেসাব পরিমাণ হওয়া শর্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالطُّهْرُ الْمُتَخَلِّلُ : اَلطُّهْرُ শব্দের طَاء অক্ষরে পেশ পড়া হবে। অর্থ– ঐ সময় যা দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী। طُهْر এর সর্বনিম্ন সময় পনেরো দিন এবং সর্বোচ্চ দিনের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই। যদি طُهْر পনেরো দিন হয় তবে তা صَحِيْح এবং এর উপর হায়েজ থেকে পবিত্রতা অর্জনের আহকাম চালু হবে। আর যদি طُهْر পনেরো দিনের চেয়ে কম হয়

তবে তা طُهْر فَاسِدٌ । আর طُهْر صَحِيْح সর্বসম্মতিক্রমে দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী। কিন্তু طُهْر فَاسِدٌ দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী কিনা– এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ছয়টি অভিমত রয়েছে। আমরা সংক্ষেপ করত তন্মধ্যে শুধু একটি অভিমত তুলে ধরছি। তা হলো, দুই রক্ত [হায়েজ]-এর মধ্যবর্তী طُهْر যদি পনেরো দিনের চেয়ে কম হয়, তবে তা طُهْر فَاصِلٌ বা দুই হায়েজের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টিকারী طُهْر বলে বিবেচিত হবে না; বরং আদ্যোপান্ত পূর্ণ সময়টিকে হায়েজ বলে গণ্য করা হবে।

قَوْلُهُ أَيْ بَيْنَ الدَّمَيْنِ : শারেহ (র.) بَيْنَ الدَّمَيْنِ বলেছেন بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ বলেননি। এর দ্বারা তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, طُهْر -এর উভয় প্রান্তকে বেষ্টনকারী রক্ত শুধু হায়েজই হবে তা জরুরি নয়। যেরূপ এর বিবরণ অচিরেই আসছে।

قَوْلُهُ فِيْ مُدَّتِهِ أَيْ فِيْ مُدَّةِ الْحَيْضِ : শারেহ হারবী (র.) বলেন, فِيْ مُدَّتِهِ বাক্যটি পরোক্ষভাবে পূর্বোল্লিখিত "রক্তসমূহ" -এর হাল (حَالْ)। হয়েজের মেয়াদের মধ্যে উক্ত রক্ত হওয়ার দ্বারা এটি আবশ্যক হয় যে, এ রক্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত طُهْر -ও এর মতই। আর যদি فِيْ مُدَّتِهِ -কে- مُتَخَلِّلٌ -এর ضَمِيْر থেকে কিংবা حُكْمًا উল্লিখিত تَخَلَّل থেকে حَالْ ধরা হয় তবে তখন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। কেননা, দুই রক্তের মাঝে طُهْر হওয়া ও তা উভয় রক্তের মধ্যখান হায়েজের মেয়াদে হওয়ার দ্বারা এটি আবশ্যক হয় না যে, উভয় রক্ত হায়েজের মেয়াদে হবে।

قَوْلُهُ سِوَى الْبَيَاضِ حَيْض : অর্থাৎ হায়েজের মেয়াদের মধ্যে সাদা রং ব্যতীত যে-কোনো রং-এর রক্ত দেখা গেলে হাকীকী (حَقِيْقِيَّة) কিংবা হুকমী (حُكْمًا) -ভাবে তা হায়েজ হবে। যদি চল্লিশ দিনের মধ্যে দুই রক্তের মাঝে طُهْر দেখা যায়, চাই উক্ত طُهْر পনেরো দিন হোক কিংবা এর চেয়ে কমবেশি হোক ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তা পার্থক্যকারী নয়; বরং উভয় প্রান্তের রক্তকে মধ্যখানের বিরতিসহ ধারাবাহিক রক্ত ধরা হবে এবং ফতোয়াও এরই উপর। ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া -এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, সাহেবাইন (র.)-এর নিকট পনেরো কিংবা এর চেয়ে বেশি দিনের طُهْر পার্থক্য করে থাকে।

قَوْلُهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا : পনেরো দিনের কম-এর শর্ত এজন্যই আরোপ করা হয়েছে যে, দুই রক্তের মধ্যখানে পনেরো দিনের طُهْر সর্বসম্মতিক্রমে পার্থক্যকারী হয়। তা হায়েজ হয় না, যেমন কোনো মহিলা তিনদিন রক্ত দেখল অতঃপর পনেরো দিন طُهْر দেখল, অতঃপর তিনদিন রক্ত দেখল তবে উক্ত পনেরো দিন সর্বসম্মতিক্রমে তা طُهْر এবং দুই হায়েজের মধ্যে পার্থক্যকারী তথা طُهْر صَحِيْح হবে। আর পার্থক্য না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ طُهْر -কে طُهْر গণনা করা যাবে না; বরং এগুলোও যেন ঐসব দিবস যেগুলোতে সে রক্ত দেখেছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ الخ : যদি طُهْر -এর মেয়াদ তিনদিন কিংবা এর চেয়ে বেশি, এমনকি দশদিনেরও যদি বেশি হয়, যেমন–একজন মহিলা একদিন রক্ত দেখেছে, অতঃপর দশদিন طُهْر দেখেছে, তারপর একদিন রক্ত দেখেছে তবে এ দশ দিনের طُهْر মূলত طُهْر صَحِيْح নয়; বরং একে ধারাবাহিক রক্ত ধরা হবে। কেননা, দুই রক্ত কিংবা হায়েজের মধ্যে পার্থক্যকারী طُهْر -এর মেয়াদ পনের দিন। যা طُهْر صَحِيْح। পনেরো দিনের চেয়ে কম طُهْر হলো طُهْر فَاسِدٌ, তাই এর উপর সহীহ হওয়ার হুকুম দেওয়া যাবে না। فَسَادٌ ও صَحِيْح -এর মাঝে এটিই মৌলিক পার্থক্য।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ اَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শেষ অভিমত ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট طُهْر مُتَخَلِّلٌ -টা যদিও দশদিনের বেশি হয় তবুও তা দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী নয়; বরং তা ধারাবাহিক রক্ত হবে। তবে শর্ত হলো, উক্ত طُهْر -টা পনেরো দিনের চেয়ে কম হতে হবে। কেননা, পনেরো দিন পূর্ণ হলে তা طُهْر فَاصِلٌ বা দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী হবে। "পনেরো দিনের চেয়ে কম হওয়া শর্ত" এর কথা শারেহ (র.) এজন্যই উল্লেখ করেননি যে, তা পূর্বের আলোচনা থেকেই বুঝা যায়। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, যখন طُهْر দশদিনের চেয়ে অধিক হয় তখন তা দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী না হওয়াও ইতঃপূর্বের اَوْ اَكْثَرَ শব্দ দ্বারা বুঝা যায়। তাই যদিও দশদিনের চেয়ে অধিক হয় এ কথা উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এর উত্তর হলো, أَوْ أَكْثَرَ -এর ক্ষেত্রে শুধু তিনদিনের চেয়ে অধিক হওয়াই উদ্দেশ্য– এ কথা বুঝানোর জন্য। এর ধরন এমন যে, একজন মহিলা একদিন রক্ত দেখেছে এবং চৌদ্দ দিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর একদিন রক্ত দেখেছে। এ সুরত এবং পূর্বোল্লিখিত সুরত উভয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক রক্ত ধরা হবে। অতএব দশদিন কিংবা এর চেয়ে কম দিনকে হায়েজ ধরা হবে এবং অতিরিক্ত দিনকে ইস্তিহাজা ধরা হবে।

قَوْلُهُ فَيَجُوْزُ بِدَايَةُ الْحَيْضِ الخ : যখন পনেরো দিনের কম طُهْر কোনো শর্ত ব্যতীত ব্যাপকভাবে দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী নয় তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট হায়েজের সূচনা ও পরিসমাপ্তি طُهْر -এর মাধ্যমে হয়। পক্ষান্তরে কোনো কোনো ফকীহ শর্তারোপ করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে। "ইনায়াহ" নামক গ্রন্থে এর এ উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মহিলার প্রত্যেক মাসের শুরুতে পাঁচদিন রক্ত আসা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। অতঃপর সে মাস আসার একদিন পূর্বেই রক্ত দেখেছে। অতঃপর তার অভ্যাসগত পাঁচদিনের প্রথম দিন طُهْر অবস্থায় থাকে, তারপর তিনদিন রক্ত দেখা যায় এবং পঞ্চম দিন طُهْر অবস্থায় থাকে, তারপর রক্ত নির্গত হতে থাকে; ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর নিকট তার হায়েজ পাঁচদিন হবে, যাদিও তার নির্ধারিত পাঁচদিনের সূচনা ও শেষ হয়েছে طُهْر দ্বারা। কেননা, এর আগে ও পরে রক্ত পাওয়া গেছে।

قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَفْصِلُ إِنْ أَحَاطَ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে, যখন পনেরো দিনের চেয়ে এবং তিনদিন কিংবা এর চেয়ে বেশি সময় طُهْر হবে তখন যদি হায়েজের রক্ত উভয় প্রান্তকে বেষ্টন করে নেয়, তবে এর পুরোটাই হায়েজ হবে। যেমন, সে একদিন রক্ত দেখেছে, অতঃপর আটদিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর একদিন রক্ত দেখেছে তবে তার পুরো দশদিনই হায়েজ ধরা হবে।

قَوْلُهُ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ مَعَ ذٰلِكَ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-এর বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে, যে طُهْر তিনদিন কিংবা এর চেয়ে বেশি হয়; কিন্তু পনেরো দিনের চেয়ে কম হয়– এখন যদি দশ কিংবা এর চেয়ে কম দিন রক্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় তবে তা হয়েজ হবে, যখন উভয় দিকের রক্ত হায়েজের নেসাব পরিমাণ হবে। অর্থাৎ শুরু এবং শেষের রক্ত একত্রে তিনদিন তিনরাত কিংবা এর চেয়ে বেশি হতে হবে। যদিও শুরু ও শেষের রক্ত পৃথকভাবে নেসাব পরিমাণ না হয়। এ বর্ণনা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য হলো– ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনায় শুরু ও শেষের রক্ত একত্রে হায়েজের নেসাব পরিমাণ বা এরচেয়ে বেশি হওয়ায় শর্ত নয়। পক্ষান্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-এর বর্ণনায় তা শর্ত। যেমন, একজন মহিলা একদিন রক্ত দেখেছে, অতঃপর পাঁচদিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর একদিন রক্ত দেখেছে– এখন এ সুরতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী পুরোটাই হায়েজ হবে। যদিও শুরু ও শেষের রক্ত একত্রে মাত্র দুই দিন হয় তথা নেসাব পরিমাণ হয় না। কেননা, এতে নেসাবের শর্তারোপ করা হয়নি। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এ সুরতে পুরোটা হায়েজ হচ্ছে না। কেননা, এর শুরু ও শেষের রক্ত একত্রে দুদিন হওয়ার কারণে তা নেসাব পরিমাণ হচ্ছে না। অথচ এ বর্ণনায় নেসাব পরিমাণ হওয়া শর্ত।

যখন উভয় দিকের রক্ত একত্রে নেসাব পরিমাণ হয়, তখন তা মজবুত হয় এবং এর অনুসরণে পুরোটাকেই হায়েজ বানিয়ে দেওয়া যায়। পক্ষান্তরে যা নেসাব পরিমাণ হয় না, তা মজবুতও হয় না এবং পুরোটাকে সাব্যস্ত করা যায় না।

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يَشْتَرِطُ مَعَ هٰذَا كَوْنَ الطُّهْرِ مُسَاوِيًا لِلدَّمَيْنِ اَوْ اَقَلَّ ثُمَّ اِذَا صَارَ دَمًا عِنْدَهُ فَاِنْ وُجِدَ فِيْ عَشَرَةٍ هُوَ فِيْهَا طُهْرٌ اٰخَرُ يَغْلِبُ الدَّمَيْنِ الْمُحِيْطَيْنِ بِهِ وَلٰكِنْ يَصِيْرُ مَغْلُوْبًا اِنْ عُدَّ ذٰلِكَ الدَّمُ الْحُكْمِيُّ دَمًا فَاِنَّهُ يُعَدُّ دَمًا حَتّٰى يُجْعَلَ الطُّهْرُ الْاٰخَرُ حَيْضًا اَيْضًا اِلَّا فِيْ قَوْلِ اَبِيْ سُهَيْلٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الطُّهْرِ الْاٰخَرِ مُقَدَّمًا عَلٰى ذٰلِكَ الطُّهْرِ اَوْ مُؤَخَّرًا وَعِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلطُّهْرُ الَّذِيْ يَكُوْنُ ثَلٰثَةً اَوْ اَكْثَرَ يَفْصِلُ مُطْلَقًا فَهٰذِهٖ سِتَّةُ اَقْوَالٍ وَقَدْ ذُكِرَ اَنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُتَاَخِّرِيْنَ اَفْتَوْا بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَنَحْنُ نَضَعُ مِثَالًا يَجْمَعُ هٰذِهِ الْاَقْوَالَ مُبْتَدَأَةٌ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَاَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا وَثَمَانِيَةً طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا وَسَبْعَةً طُهْرًا ثُمَّ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلٰثَةً طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا وَثَلٰثَةً طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمَيْنِ طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا فَهٰذِهٖ خَمْسَةٌ وَاَرْبَعُوْنَ يَوْمًا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট [উভয় দিকের রক্ত নেসাব পরিমাণ হওয়া]-এর সাথে সাথে طُهْر টা দুই রক্তের বরাবর কিংবা এর চেয়ে কম হওয়া শর্ত। অতঃপর যখন তাঁর নিকট طُهْر مُتَخَلِّلْ রক্তের হুকুমে হয়ে যায়, তখন যদি ঐ দশদিনে যাতে طُهْر مُتَخَلِّلْ দেখা দিয়েছিল, অন্য طُهْر দেখা দেয়, যা طُهْر -কে বেষ্টনকারী উভয় দিকের রক্তের উপর প্রবল হয়, কিন্তু যদি ঐ হুকমী রক্তকে রক্ত গণনা করা হয়, তবে ঐ [অন্য] طُهْر টি প্রবল হয় না, তবে ঐ হুকমী রক্তকে হায়েজ মনে করা হবে। এমনকি এ অপর طُهْر টিকেও হায়েজ ধরা হবে। কিন্তু আবূ সুহাইল (র.)-এর মতে, [মধ্যখানের طُهْر হুকমী হায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত শর্তাবলির সাথে সাথে এটিও শর্ত যে, উক্ত طُهْر -এ দুই প্রান্তের রক্ত – যা طُهْر -কে বেষ্টন করে রেখেছে এর চেয়ে কম কিংবা বরাবর হতে হবে, তবেই একে হায়েজ ধরা হবে]। অপর طُهْر উক্ত طُهْر [যা হুকমীভাবে হায়েজ হয়ে যায়]-এর আগে আসা কিংবা পরে আসা এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর নিকট যে طُهْر তিনদিন কিংবা এর চেয়ে অধিক হয় তা مُطْلَقًا [দুই রক্তের মাঝে] পার্থক্যকারী হয়। সুতরাং মোট এ ছয়টি অভিমত। কিন্তু উল্লেখ করা হয় যে, অধিকাংশ مُتَقَدِّمِيْن ও مُتَأَخِّرِيْن ওলামায়ে কেরাম ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতের উপর ফতোয়া দেন। এখন আমরা এমন একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি যা এ ছয় অভিমতের সমন্বয় করবে। [তথা] مُبْتَدَأَةٌ [প্রথম হায়েজগ্রস্ত মহিলা] একদিন রক্ত দেখেছে এবং চৌদ্দ দিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর একদিন রক্ত দেখেছে এবং আটদিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর একদিন রক্ত দেখেছে এবং সাতদিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর দুইদিন রক্ত এবং তিনদিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর একদিন রক্ত এবং তিনদিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর একদিন রক্ত এবং দুইদিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর একদিন রক্ত দেখেছে, অতএব, একত্রে তা পঁয়তাল্লিশ দিন হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يُشْتَرَطُ الـخ : ইতঃপূর্বে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছিল– মূলত তা ছিল ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে। এখানে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিজস্ব অভিমত উল্লেখ করা হচ্ছে যে, মধ্যখানে আসা طُهْر -কে হায়েজ ধরার ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা– ১. দশদিন কিংবা এর চেয়ে কম طُهْر -এর উভয় দিক রক্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতে হবে। ২. উভয় দিকের রক্ত একত্রে হায়েজের নেসাব তথা তিনদিন তিনরাত পরিমাণ হতে হবে। ৩. দুই রক্তের মাঝের طُهْر উভয় রক্তের বরাবর কিংবা কম হতে হবে। আর طُهْر যদি উভয় দিকের রক্তের চেয়ে বেশি পরিমাণ হয় তবে তা طُهْر فَاصِلْ হয়ে যাবে। অর্থাৎ একে ধারাবাহিক রক্ত ধরা হবে না।

অতএব, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-এর বর্ণনার ভিত্তিতে আমাদের উল্লিখিত উভয় সুরতে طُهْر فَاصِلْ টি হবে। কেননা, এ طُهْر উভয় রক্তের সমষ্টির চেয়ে অধিক। আর শরিয়তে প্রাবল্যের হুকুম হয়; অপ্রাবল্যের নয়। যেমন– একজন মহিলা দুইদিন রক্ত দেখেছে এবং পাঁচদিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর তিনদিন রক্ত দেখেছে, কিংবা একজন মহিলা তিনদিন রক্ত দেখেছে, অতঃপর তিনদিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর একদিন রক্ত দেখেছে– তবে যেহেতু প্রথম সুরতে রক্তের সমষ্টি طُهْر -এর বরাবর এবং দ্বিতীয় সুরতে রক্তের সমষ্টি طُهْر -এর চেয়ে অধিক, তাই উভয় সুরতে طُهْر পার্থক্যকারী হবে না; বরং পুরোটাকে হায়েজ ধরা হবে। কিংবা যেমন– একজন মহিলা দুইদিন রক্ত দেখেছে, অতঃপর পাঁচদিন طُهْر দেখেছে এবং দুইদিন রক্ত দেখেছে তবে যেহেতু طُهْر রক্তের সমষ্টির চেয়ে অধিক, তাই তা فَاصِلْ হবে; হায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِذَا صَارَ دَمًا عِنْدَهُ الـخ : এ দুই রক্তের মধ্যবর্তী طُهْر রক্তের সমষ্টির বরাবর কিংবা কম, যা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট হায়েজের অন্তর্ভুক্ত। শারেহ (র.)-এর কথা فَإِنْ وُجِدَ শব্দটি مَجْهُوْل -এর সীগাহ এবং এর فَاعِلْ হচ্ছে পরে উল্লিখিত طُهْر اٰخَر - فِيْ عَشَرَةٍ هُوَ অর্থাৎ ঐ طُهْر যা হুকমীভাবে হায়েজ হয়ে যায়। فِيْهَا অর্থাৎ এ দশদিনে। এ جُمْلَة টি عَشَرَة -এর সিফাত। يَغْلِبُ -এর ضَمِيْر ফিরেছে طُهْر اٰخَر -এর দিকে। এ جُمْلَة টি طُهْر اٰخَر -এর সিফাত অর্থাৎ দ্বিতীয় طُهْر টি ঐ দুই রক্তের অধিক হবে যা উক্ত طُهْر -কে বেষ্টন করে রেখেছে, তা রক্তের সমষ্টির চেয়ে অধিক হবে। مَغْلُوْبًا অর্থাৎ দ্বিতীয় طُهْر টি উভয় রক্তের সমষ্টির কম হবে যদি হুকমী রক্তকে রক্ত গণনা করা হয়। উদ্দেশ্য হলো, যদি প্রকৃত রক্তের প্রতি লক্ষ্য করা হয় যা এ طُهْر -কে বেষ্টন করে রেখেছে, তবে طُهْر রক্তের অধিক হবে। আর পূর্বের طُهْر -কে রক্ত সাব্যস্ত করে একদিকে শামিল করে হিসাব করা হয়, তবে দ্বিতীয় طُهْر উভয় দিকের সমষ্টিগত রক্তের চেয়ে কম হবে। যেমন– একজন মহিলা শুরুতেই দুইদিন রক্ত দেখেছে এবং তিনদিন طُهْر দেখেছে এবং একদিন রক্ত দেখেছে, অতঃপর তিনদিন طُهْر এবং একদিন রক্ত দেখেছে, এখন প্রথম طُهْر -এর মধ্যে শর্তাবলি বিদ্যমান, তাই তা ধারাবাহিক রক্ত হবে। কেননা, এতে হায়েজের মেয়াদের মধ্যে উভয় দিক রক্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং উভয় দিকের রক্তের সমষ্টি হায়েজের নেসাব পরিমাণও হয় এবং طُهْر -এর বরাবর। কিন্তু দ্বিতীয় طُهْر -এর উভয় দিকের এক একদিনের রক্তের সমষ্টি থেকে দ্বিতীয় طُهْر অধিক। তবে প্রথম طُهْر -কে হুকমী রক্ত ধরার দ্বারা রক্তের দিন সাত দিন হয়ে যায়– যা দ্বিতীয় طُهْر থেকে অধিক।

قَوْلُهُ إِلَّا فِيْ قَوْلِ أَبِيْ سُهَيْلٍ الـخ : অর্থাৎ আবূ সুহাইল (র.)-এর মতে মধ্যবর্তী طُهْر -কে হায়েজ ধরার জন্য উল্লিখিত সমস্ত শর্তাবলির সাথে সাথে এও শর্ত রয়েছে যে, ঐ طُهْر -এ দুই রক্তের বরাবর কিংবা কম হবে– যা طُهْر -কে বেষ্টন করে রেখেছে। তবে একেও হায়েজের মধ্যে শামিল করা হবে। অতএব উল্লিখিত দুই সুরতেই আবূ সুহাইল (র.) ব্যতীত সকল ইমামের নিকট পূর্ণ দশদিন.হায়েজ হবে। কিন্তু আবূ সুহাইল (র.)-এর নিকট প্রথম সুরতে শুধু প্রথম ছয়দিন হায়েজ হবে এবং দ্বিতীয় সুরতে শেষ ছয়দিন হায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الخ : ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর অভিমত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমতের সম্পূর্ণই পরিপন্থি, যা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম অভিমত। হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর অভিমতের সারমর্ম হচ্ছে- যদি তিন কিংবা চারদিন طُهْر হয় তবে কোনো শর্ত ব্যতীতই তা দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তা কোনো শর্ত ব্যতীতই দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী নয়।

قَوْلُهُ فَهٰذِهٖ سِتَّةُ اَقْوَالٍ : অর্থাৎ এ পর্যন্ত মোট ছয়টি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে-

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শেষ অভিমত যে, طُهْر مُتَخَلِّلْ যদি তিনদিন কিংবা এর চেয়ে বেশি হয় তবে তা দুই রক্তের মাঝে পাথক্যকারী নয়, যদিও طُهْر مُتَخَلِّلْ দশদিনের চেয়েও অধিক হয়।

২. ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) -এর অভিমত যে, طُهْر مُتَخَلِّلْ যদি তিন কিংবা এর চেয়ে বেশি হয় তবে তা مُطْلَقًا দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী হবে।

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-এর অভিমত যে, طُهْر مُتَخَلِّلْ যদি তিনদিন কিংবা এর চেয়ে অধিক হয়, কিন্তু পনেরো দিনের চেয়ে কম হয়, তবে যদি উক্ত طُهْر -এর উভয় দিকের রক্ত হায়েজের নেসাব পরিমাণ তথা তিনদিন, তিনরাত হয় তবে উক্ত طُهْر مُتَخَلِّلْ ধারাবাহিক রক্তের হুকুমে হবে।

৪. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত যে, طُهْر مُتَخَلِّلْ -কে হায়েজ ধরার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে- ক. দশদিন কিংবা এর চেয়ে কম দিনে- উক্ত طُهْر -এর উভয় দিক রক্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতে হবে। খ. طُهْر -এর উভয় দিকের রক্তের সমষ্টি হায়েজের নেসাব পরিমাণ হতে হবে। তথা তিনদিন ও তিনরাত। গ. طُهْر مُتَخَلِّلْ উভয় দিকের রক্তের সমষ্টির বরাবর কিংবা কম হতে হবে।

৫. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনা যে, যখন পনেরো দিনের চেয়ে কম এবং তিনদিন কিংবা এর চেয়ে বেশি طُهْر হয় তখন যদি طُهْر -এর উভয় দিক রক্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে তবে এ হায়েজ দশদিন হবে। যদিও সমষ্টিগত মাত্র দশদিন হয়।

৬. আবূ সুহাইল (র.)-এর অভিমত যে, طُهْر مُتَخَلِّلْ -কে হায়েজ ধরার জন্য অন্যান্য শর্তাবলির সাথে সাথে এটিও একটি শর্ত যে, উক্ত طُهْر উভয় দিকের রক্তের সমষ্টির বরাবর কিংবা কম হতে হবে।

قَوْلُهُ وَقَدْ ذُكِرَ اَنَّ كَثِيْرًا مِنَ الخ : অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য কিতাবাদির মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। এখানে একটি মন্তব্য হয় যে, শারেহ (র.) ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছেন- মাশায়েখে কেরাম সহজতার জন্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমতের উপর ফতোয়া দেন। কিন্তু এখানে উল্লেখ করেছেন যে, مُتَأَخِّرِيْن ও مُتَقَدِّمِيْن -এর অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতের উপর ফতোয়া দেন, তাই উভয় বিবরণের মাঝে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। এর উত্তর হচ্ছে, কোনো কোনো ফকীহ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত সহজ ভেবে এর উপর ফতোয়া দেন এবং কোনো কোনো ফকীহ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতের উপর ফতোয়া দেন। তাই উভয় অভিমত নিজ নিজ জায়গায় সহীহ।

قَوْلُهُ مُبْتَدَأَةٌ رَأَتْ يَوْمًا الخ : অর্থাৎ হায়েজের মাধ্যমে যে বালিকা বালেগা হতে চলছে মাত্র, আর তার এ শুরু হায়েজেই গোলমাল শুরু হয়ে যায়। কিন্তু যদি এ অবস্থা مُعْتَادَة [যার প্রত্যেক মাসের নির্দিষ্ট দিনে হায়েজ আসে] -এর হয় তবে তার অভ্যাস অনুযায়ী দিনগুলোকে হায়েজ গণনা করবে এবং অন্য দিনগুলোকে ইস্তিহাজা গণনা করবে।

ছয় অভিমতের সহজ নকশা : শারেহ (র.) যদিও ছয় অভিমত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, কিন্তু ছয়টি অভিমতকে সহজে বুঝার জন্য আমরা একটি নকশার মাধ্যমে তা তুলে ধরছি। নকশায় "د" চিহ্ন দ্বারা دم [রক্ত] এবং "ط" চিহ্ন দ্বারা طُهْر [পবিত্রতা] উদ্দেশ্য।

د ط ط ط ط ط ط ط ط ط | ط ط ط ط ط | د ط ط ط ط ط ط ط ط | د | ط ط ط ط ط ط ط ط | د د | د ط ط ط | ط ط | ط | د | ط ط ط

এ প্রথম দশদিন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট হাযে। [অর্থাৎ এ চৌদ্দ দিনের ধারাবাহিক طُهْر -এর মধ্য থেকে নয় দিনের সঙ্গে প্রথম একদিনের হায়েজ মিলিয়ে দশদিন হায়েজ হয়।] এ সূরাতে এটি স্পষ্ট যে, হায়েজের সূচনা হয়েছে রক্ত দ্বারা এবং সমাপ্ত হয়েছে طُهْر দ্বারা। কেননা, তাঁর নিকট পনেরো দিনের চেয়ে কম طُهْر মُطْلَقًا পার্থক্যকারী (فَاصِلْ) হয় না। চাই তা হায়েজের মেয়াদে হোক কিংবা না হোক এবং চাই রক্ত হায়েজের নেসাব পরিমাণ হোক কিংবা না হোক। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শেষ অভিমতও এমনই।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর বর্ণনা অনুযায়ী– এ দশদিন হায়েজ। কেননা, হায়েযের মেয়াদ তথা দশ দিনের উভয় দিক রক্ত দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার শর্ত এতে বিদ্যমান।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এ দশ দিন হায়েজ। কেননা, এ সুরতে হায়েজের মেয়াদের মধ্যে طُهْر -এ উভয় দিককে রক্ত বেষ্টন করার সাথে সাথে রক্ত হায়েযের নেসাব পরিমাণ পাওয়া গেছে।

আবূ সুহাইল (র.)-এর নিকট এ ছয়দিন হায়েজ।

ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর নিকট এ শেষ চার দিন হায়েজ।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট এ দশ দিন হায়েয।

এ দশদিনও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট হায়েজ, যার সূচনা ও শেষ উভয় দিকে طُهْر রয়েছে।

উল্লিখিত ছয় অভিমত অনুযায়ী হায়েজের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সকলের নিকট পরবর্তী দিনগুলো ইস্তিহাযা হবে।

فَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَلْعَشَرَةُ الْاُوْلٰى وَالْعَشَرَةُ الرَّابِعَةُ حَيْضٌ وَفِيْ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَلْعَشَرَةُ بَعْدَ طُهْرٍ هُوَ اَرْبَعَةَ عَشَرَ وَفِيْ رِوَايَةِ اِبْنِ الْمُبَارَكِ (رحـ) اَلْعَشَرَةُ بَعْدَ طُهْرٍ هُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَلْعَشَرَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ هُوَ سَبْعَةٌ وَعِنْدَ اَبِيْ سُهَيْلٍ (رحـ) اَلسِّتَّةُ الْاُوْلٰى مِنْهَا وَعِنْدَ الْحَسَنِ الْاَرْبَعَةُ الْاَخِيْرَةُ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ اِسْتِحَاضَةٌ فَفِيْ كُلِّ صُوْرَةٍ يَكُوْنُ الطُّهْرُ النَّاقِصُ فَاصِلًا فِيْ هٰذِهِ الْاَقْوَالِ سِوٰى قَوْلِ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) فَاِنْ كَانَ اَحَدُ الدَّمَيْنِ نِصَابًا كَانَ حَيْضًا وَاِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصَابًا فَالْاَوَّلُ حَيْضٌ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهُمَا نِصَابًا فَالْكُلُّ اِسْتِحَاضَةٌ وَاِنَّمَا اسْتُثْنِيَ قَوْلُ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) لِاَنَّ هٰذَا لَا يَتَاَتّٰى عَلٰى قَوْلِهِ ـ

অনুবাদ : অতএব ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম দশদিন এবং চতুর্থতম দশদিন হায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী চৌদ্দ দিনবিশিষ্ট طُهْر -এর পরের দশ দিন হায়েজ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আটদিনবিশিষ্ট طُهْر -এর পরের দশদিন হচ্ছে হায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট সাতদিনবিশিষ্ট طُهْر -এর পরের দশদিন হায়েজ। আবূ সুহাইল (র.)-এর নিকট এর [মুহাম্মদ (র.)-এর দশদিন হায়েজের] প্রথম ছয়দিন হায়েজ। হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) -এর নিকট সর্বশেষ চারদিন হায়েজ ছাড়া সমস্ত রক্ত ইস্তিহাজা হবে।

সুতরাং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত ব্যতীত এ পাঁচ অভিমতের প্রত্যেকটির মধ্যে এমন একটি সুরত পাওয়া যায়, যার মধ্যে অসম্পূর্ণ (نَاقِصْ) طُهْر -কে [দুই রক্তের মাঝে] فَاصِلْ [পার্থক্যকারী] পাওয়া যায়। অতএব দুই রক্তের কোনো একটি যদি [হায়েজের] নেসাব [তিনদিন তিনরাত] পরিমাণ হয় তবে তা হায়েজ হবে। আর যদি প্রত্যেক [দিকের] রক্ত নেসাব পরিমাণ হয়, তবে প্রথম রক্ত হবে হায়েজ। আর যদি দুটির কোনোটিই [হায়েজের] নেসাব পরিমাণ না হয় তবে প্রত্যেক রক্তই ইস্তিহাজা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমতকে পৃথক করা হয়েছে এ কারণে যে, তাঁর অভিমতের উপর طُهْر نَاقِصْ [অসম্পূর্ণ তুহুর] -কে فَاصِلْ হওয়ার কল্পনা করা যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَلْعَشَرَةُ الخ : অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত নকশার মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম দশদিন এবং চতুর্থতম দশদিন হায়েজ হয়, আর অন্যান্য দিন ইস্তিহাজার অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ, তাঁর নিকট পনেরো দিনের কম طُهْر - مُطْلَقًا দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী নয়। উল্লিখিত নকশায় মোট পঁয়তাল্লিশ দিন। তাই যেন তার ধারাবাহিকভাবে রক্তই প্রবাহিত হয়েছে। যেহেতু সাধারণত মহিলাদের প্রত্যেক মাসেই একবার হায়েজ এসে থাকে, তাই

مُبْتَدَأَةٌ -এর ক্ষেত্রে এ বিষয়টি গ্রহণযোগ্য। যার হায়েজের ধারাবাহিকতা আজও রীতির ভিতরে আসেনি। এখন এসব দিনের প্রথম দশদিন হায়েজের মধ্যে গণ্য হবে। যার প্রথম দিন রক্ত দেখা গিয়েছিল এবং বাকি নয় দিন طُهْر দেখেছিল।

অনুরূপ চতুর্থতম দশদিনের মাসআলা যে, এর প্রথম দুইদিন طُهْر দেখেছে– অতঃপর দুইদিন রক্ত দেখেছে, অতঃপর তিন দিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর একদিন রক্ত দেখেছে, অতঃপর দুইদিন طُهْر দেখেছে– তবে এর সমস্ত দিনই হায়েজ গণনা করা হবে এবং বাকি দিনগুলো ইস্তিহাজা ধরা হবে।

قَوْلُهُ وَفِيْ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ (رح) اَلْعَشَرَةُ الخ : উল্লিখিত দিবসগুলোর সমষ্টি যদিও ধারাবাহিক রক্তের হুকুমে, কিন্তু হায়েজের মেয়াদের মধ্যে যেসব দিবসের উভয় দিক রক্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত পাওয়া যায় শুধু তা-ই হায়েজের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তা হচ্ছে চৌদ্দ দিনবিশিষ্ট طُهْر -এর পরের দশদিন। যার মধ্যে সে একদিন রক্ত অতঃপর আটদিন طُهْر তারপর একদিন রক্ত দেখেছিল। বাকি সকল দিবস তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী ইস্তিহাজা।

قَوْلُهُ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ (رح) اَلْعَشَرَةُ الخ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আটদিনবিশিষ্ট طُهْر -এর পরের দশদিন হায়েজ হবে। কেননা, তা ঐ সবদিন, যার মধ্যে সে একদিন রক্ত দেখেছে এবং সাতদিন طُهْر দেখেছে। অতঃপর দুইদিন রক্ত দেখেছে। এ কারণে যে, হায়েজের মেয়াদের মধ্যে উভয় দিকে রক্ত পাওয়া গেছে এবং উভয় দিকে রক্ত একত্রে হায়েজের নেসাব পরিমাণও হয়েছে।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) اَلْعَشَرَةُ بَعْدَ الخ : অর্থাৎ উল্লিখিত নকশায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট সাত দিনবিশিষ্ট طُهْر -এর পরের দশদিন হায়েজ। কেননা, এগুলো ঐসব দিন যেগুলোর মধ্যে দুইদিন রক্ত দেখেছে, তিনদিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর একদিন রক্ত দেখেছে এবং তিনদিন طُهْر দেখেছে এবং একদিন রক্ত দেখেছে– এতে হায়েজের মেয়াদের মধ্যে দুই প্রান্তেই রক্ত পাওয়া গেছে, রক্তের সমষ্টি হায়েজের নেসাব পরিমাণ হওয়ার শর্তও পাওয়া গেছে এবং طُهْر ও এর বরাবর কিংবা কম এবং দ্বিতীয় طُهْر -এর হুকমী রক্তকে হাকীকী রক্তের সঙ্গে গণনা করার পর طُهْر রক্তের চেয়ে কম হয়ে যায়। তাই এ দশদিন হায়েজ। বাকি সমস্ত দিন ইস্তিহাজা হবে।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ اَبِيْ سُهَيْلٍ (رح) اَلسِّتَّةُ الْاَوْلٰى الخ : অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট যে দশদিনকে হায়েজ গণনা করা হয়েছিল-এর প্রথম ছয়দিন আবূ সুহাইল (র.) -এর নিকট হায়েজ হবে। কেননা, তিনি উভয় দিকের হাকীকী রক্ত طُهْر -এর বারবার কিংবা কম হওয়ার শর্ত করেন। আর এখানে হাকীকী রক্ত طُهْر -এর বরাবর হয়েছে। তবে তাঁর নিকট হুকমী রক্ত ধর্তব্য নয়। কারণ, এগুলো ঐ দিন যেগুলোতে মহিলা দুইদিন রক্ত দেখেছে, তিনদিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর একদিন রক্ত দেখেছে। উল্লিখিত ছয়দিন ব্যতীত বাকি সমস্ত দিন তাঁর মতে ইস্তিহাজা হবে।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الْحَسَنِ الْاَرْبَعَةُ الخ : ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর নিকট উল্লিখিত নকশার পঁয়তাল্লিশ দিনের থেকে শুধু শেষ চারদিন হায়েজ হবে। শুরুর দিকের বাকি একচল্লিশ দিন ইস্তিহাজা হবে। কেননা, তাঁর নিকট তিনদিনের অধিক طُهْر হলে তা فَاصِلٌ [তথা দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী] হয়। আর উল্লিখিত নকশায় সর্বশেষ طُهْر যা দুইদিন [যা তিনদিনের কম] তা দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী নয়; বরং তা ধারাবাহিক রক্ত। অতএব, এ দুইদিনবিশিষ্ট طُهْر -এর উভয় দিক রক্ত। আর এর পূর্বের সমস্ত طُهْر তিনদিনের চেয়ে অধিক যা তাঁর নিকট فَاصِلٌ হয়।

قَوْلُهُ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ اِسْتِحَاضَةٌ : আমরা উল্লিখিত ছয় অভিমতের ভিত্তিতে যে সমস্ত দিন হায়েজ বলে গণ্য হয়, তা ব্যতীত বাকি সমস্ত দিন হচ্ছে ইস্তিহাজা। কেননা, বাকি দিনগুলোতে ইমামদের শর্ত পাওয়া যায় না এবং তা এ কথার উপর দলিল যে,

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত ব্যতীত অন্যান্য অভিমতের মাঝে যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা শুধু দুই রক্তের মাঝের طُهْر -কে হায়েজ গণনা করার জন্য, طُهْر -কে ব্যাপকভাবে ধারাবাহিক রক্ত ধরার জন্য নয়। তাই এ সকল ইমামের নিকট বাকি সমস্ত দিন ধারাবাহিক রক্তের হুকুমে হবে। তবে তন্মধ্যে হায়েজ শুধু এ কয়দিনই হবে, যেগুলোতে শর্তাবলি পাওয়া যায়। আর বাকি সব দিন ইস্তিহাজা হবে।

فَفِى كُلِّ صُوْرَةٍ يَكُوْنُ الطُّهْرُ النَّاقِصُ الخ : এ বাক্যের تَرْكِيْب -এর ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। এর مَفْهُوْم সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে। আমরা এ সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্যে উক্ত মতানৈক্য উল্লেখ করতে চাচ্ছি না, তবে ইবারতের উদ্দেশ্য হলো, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত ব্যতীত বাকি সমস্ত অভিমতের ক্ষেত্রে এমন সুরত পাওয়া যায়, যার মধ্যে طُهْر نَاقِصْ - فَاصِلْ হয়, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমতের ক্ষেত্রে এ ধরনের চিন্তাও করা যায় না। কেননা, তাঁর নিকট طُهْر نَاقِصْ কোনো অবস্থাতেই فَاصِلْ নয়।

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ اَحَدُ الدَّمَيْنِ نِصَابًا الخ : যখন তা প্রমাণিত হলো, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত ব্যতীত বাকি সমস্ত অভিমতের কোনো কোনো সুরতে طُهْر نَاقِصْ - فَاصِلْ হয়, তো এখন দেখা হবে যে, এ طُهْر -কে পরিবেষ্টনকারী দুই রক্তের কোনো একটি যদি [হায়েজের] নেসাব পরিমাণ হয় কিংবা এর চেয়ে অধিক হয়ে দশদিন পর্যন্ত হয়, তবে তা হায়েজ হবে। বাকি طُهْر হুকমী হায়েজ হবে না। কেননা, এতে কোনো কোনো শর্ত পাওয়া যায় না এবং দ্বিতীয় রক্ত ইস্তিহাজা হবে। যেমন– একজন মহিলা তিনদিন রক্ত দেখেছে এবং দশদিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর একদিন রক্ত দেখেছে তবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও মুহাম্মদ (র.) -এর বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত طُهْر - فَاصِلْ হবে; হায়েজ হবে না। কেননা, তাঁরা উভয়ে শর্তারোপ করেন যে, হায়েজের মেয়াদে হয়ে– উভয় দিকে রক্ত থাকতে হবে– তবেই তা হায়েজ হবে। আর এতে উক্ত শর্ত পাওয়া যায় না। অতএব, এ সুরতে প্রথম তিনদিন কিংবা শেষ তিনদিন হায়েজ হবে। বাকি সমস্ত দিন ইস্তিহাজা হবে।

আর যদি সে একদিন রক্ত দেখে এবং পাঁচদিন طُهْر দেখে অতঃপর তিনদিন রক্ত দেখে– তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মাযহাব অনুযায়ী তিনদিন হায়েজ হবে এবং বাকি দিন ইস্তিহাজা হবে। কেননা, তাঁর নিকট طُهْر مُتَخَلِّلْ হায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, উভয় দিকের রক্তের সমষ্টি طُهْر -এর বরাবর হতে হবে কিংবা এর চেয়ে কম হতে হবে। আর এতে উক্ত শর্ত নেই। উদ্দেশ্য, যে সুরতেই দুই দিকের রক্তের কোনো একটি হায়েজের নেসাব পরিমাণ পাওয়া যায় এবং উল্লিখিত অভিমতসমূহের শর্তাবলি যদি না পাওয়া যায়, তবে তাতে এ নেসাবই হায়েজ হবে। আর বাকি সমস্ত দিন ইস্তিহাজা হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصَابًا الخ : অর্থাৎ দুই দিকের রক্তের প্রত্যেকটি যদি হায়েজের নেসাব পরিমাণ হয়, তবে প্রথম রক্তটি হায়েজ হবে এবং বাকি সব ইস্তিহাজা হবে। যেমন– একজন মহিলা তিনদিন রক্ত দেখেছে, অতঃপর সাতদিন طُهْر দেখেছে, অতঃপর তিনদিন রক্ত দেখেছে, তবে প্রথম তিনদিন হায়েজের হবে এবং বাকি সব দিন ইস্তিহাজার হবে। কারণ, উল্লিখিত মাযহাবসমূহের শর্তাবলি এতে নেই। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর নিকট طُهْر - فَاصِلْ হতে পারবে না। কেননা, তা পনেরো দিনের চেয়ে কম। তাই তাঁর নিকট দশদিন হায়েজের হবে এবং বাকি সব দিন ইস্তিহাযার হবে।

وَاعْلَمْ اَنَّ اَلْوَانَ الْحَيْضِ هِيَ الْحُمْرَةُ وَالسَّوَادُ فَهُمَا حَيْضٌ اِجْمَاعًا وَكَذَا الصُّفْرَةُ الْمُشْبَعَةُ فِي الْاَصَحِّ وَالْخُضْرَةُ وَالصُّفْرَةُ الضَّعِيفَةُ وَالْكُدْرَةُ وَالتُّرْبِيَّةُ عِنْدَنَا وَفَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا اَنَّ الْكُدْرَةَ مَا يَضْرِبُ اِلَى الْبَيَاضِ وَالتُّرْبِيَّةُ اِلَى السَّوَادِ وَاِنَّمَا قَدَّمَ مَسْأَلَةَ الطُّهْرِ الْمُتَخَلِّلِ عَلٰى اَلْوَانِ الْحَيْضِ لِاَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِمُدَّةِ الْحَيْضِ فَاَلْحِقَهَا بِهَا ثُمَّ ذُكِرَ الْاَلْوَانَ .

অনুবাদ : জেনে রেখ যে, হায়েজের রং হচ্ছে লাল এবং কালো। সর্বসম্মতিক্রমে এ দুটি হায়েজ। অনুরূপ বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী গাঢ় হলুদ রং। আর সবুজ, হালকা হলুদ, গাদলা ও মেটে রং আমাদের মতে হায়েজ। গাদলা ও মেটে রং-এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে যে, গাদলা হচ্ছে সাদার দিকে ধাবিত রং, আর মেটে কালোর দিকে ধাবিত রং। গ্রন্থকার হায়েজের রং-এর পূর্বে طُهْر مُتَخَلِّلْ -এর বিবরণ পেশ করেছেন। কেননা, طُهْر مُتَخَلِّلْ -এর মাসআলা হায়েজের মেয়াদের সাথে সম্পৃক্ত, তাই একে হায়েজের মেয়াদের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হায়েজের রং-এর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاعْلَمْ اَنَّ اَلْوَانَ الْحَيْضِ الخ :

হায়েজের রং : ফুকাহাগণের মতে হায়েজের রং মোট ছয় প্রকার– ১. কালো, ২. লাল, ৩. হলুদ ৪. গাদলা ৫. সবুজ এবং ৬. মেটে। তন্মধ্যে লাল ও কালো রং হায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মতানৈক্য নেই। এ দুটি সর্বসম্মতিক্রমে হায়েজ। লাল বর্ণের রক্ত হায়েজ এজন্য যে, তা রক্তের মূল রং। কিন্তু যদি রক্তটা অধিক দগ্ধ হয় তবে তা কালোর দিকে ধাবিত হয়ে যায়। কেননা, লাল যখন প্রবল হয়, তখন তা কালো রং-এর দিকে ফিরে আসে। এ কারণেই নবী করীম ﷺ বলেছেন– اِنَّهُ دَمُ الْحَيْضَةِ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ "হায়েজের রক্ত কালো হয়, যা চেনা যায়।" –[আবূ দাঊদ শরীফ]

হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, হায়েজের রক্ত গাঢ় কালো। এর উপর লালের আধিক্য হয় এবং ইস্তিহাজার রক্ত কালো এবং পাতলা হয়।

قَوْلُهُ وَكَذَا الصُّفْرَةُ الْمُشْبَعَةُ : صُفْرَةٌ শব্দের صَادْ অক্ষরে পেশ পড়া হবে, অর্থ– হলুদ বর্ণ। مُشْبَعَةٌ শব্দের অর্থ হলো। গাঢ়। অতএব, اَلصُّفْرَةُ الْمُشْبَعَةُ শব্দের অর্থ– গাঢ় হলুদ। উদ্দেশ্য হলো, এ গাঢ় হলুদ রংও হায়েজ। যেমন– বায়হাকী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) -এর সূত্রে বর্ণিত আছে–

اِنَّهَا كَانَتْ تَنْهَى النِّسَاءَ اَنْ يَنْظُرْنَ اِلَى اَنْفُسِهِنَّ لَيْلًا فِي الْحَيْضِ وَتَقُوْلُ اِنَّهَا قَدْ تَكُوْنُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ .

অর্থাৎ "তিনি [হযরত আয়েশা (রা.)] মহিলাদেরকে রাতে হায়েজ দেখতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন, হায়েজ কখনো হলুদ ও গাদলা রং এর হয়।"

আর বুখারী শরীফে হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রা.)-এর সূত্রে যে হাদীস বর্ণিত আছে যে, "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে হলুদ ও মেটে রং-এর রক্তকে কিছুই মনে করতাম না।" এটি ঐ অবস্থার উপর প্রযোজ্য হবে যে, مُعْتَادَةٌ মহিলার طُهْر -এর পর যদি এমন রং দেখে, তবে তা হায়েজ নয়; তাই আবূ দাঊদ শরীফের বর্ণনার মধ্যে بَعْدَ الطُّهْرِ শব্দ স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গাঢ় হলুদ রং হায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কারো কারো দ্বিমত রয়েছে, তাই গ্রন্থকার فِى الْأَصَحِّ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهُ وَالْخُضْرَةُ وَالصُّفْرَةُ الخ : اَلْخُضْرَةُ শব্দের خَاء অক্ষরে পেশ হবে। অর্থ– সবুজ। اَلصُّفْرَةُ الضَّعِيْفَةُ অর্থ– হালকা হলুদ। اَلْكُدْرَةُ অর্থ– গাদলা বা কাদা জাতীয় রং। এতে হালকা কালো রংও অন্তর্ভুক্ত। اَلتُّرْبِيَّةُ অর্থ– মেটে রং। আমাদের নিকট উক্ত চার প্রকারের রং-ই হায়েজের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ইমামগণ এতে একমত যে, উক্ত চার প্রকারের রংই হায়েজ হিসেবে নির্গত হয়ে থাকে। তবে অন্যান্য ইমামদের মাঝে এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবূ মনসূর মাতুরীদী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, যদি কোনো মহিলা طُهْر -এর দিবসগুলোতে হলুদ রং দেখে এবং হায়েজের দিবসগুলোতে লাল রং দেখে তবে তার হলুদ রং-এর দিবসগুলো طُهْر দিবসই হবে।

হযরত আবূ বকর ইসকাফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, হলুদ রং যদি بَقَّم [কাপড় রং করার এক জাতীয় রং] রং হয় তবে তা হায়েজ হবে; অন্যথায় নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হলুদ এবং গাদলা রং-এর রক্তই শুধু হায়েজ। আর সবুজ রং-এর রক্ত হায়েজ কিনা এ ক্ষেত্রে মাশায়েখে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, হায়েজের শুরুতে যদি এমন রং হয়, তবে তা হায়েজ হবে; অন্যথায় হায়েজ হবে না।

জমহুর ওলামায়ে কেরাম-এর নিকট সবুজ রং নিঃশর্তভাবে হায়েজ। বিশুদ্ধ মত হলো, যদি মহিলা হায়েজগ্রস্ত হয়, তাহলে তা হায়েজ এবং হায়েজের রং-এর বিবর্তনকে খাদ্যের উপর প্রয়োগ করা হবে। আর যদি সর্বদা পরিষ্কার লাল রক্ত আসে– এমন অভ্যাস্তা মহিলা শুধু সবুজ রং-এর রক্ত আসতে দেখে তবে একে বিকৃত রক্ত ধরা হবে। সুতরাং তা হায়েজ হবে না।

গাদলা ও মেটে রং-এর রক্তের একই হুকুম। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত হলো, যদি মহিলা রক্তের পরে এমন রং দেখে তবে তা হায়েজ হবে; অন্যথায় নয়। অতএব তাঁর নিকট যদি হায়েজ দিবসগুলোর শুরু দিকে এমন রং দেখে তবে তা হায়েজ নয়। তবে এ সম্পর্কে আমাদের বিশুদ্ধ অভিমত হলো, যদি গাদলা বা মেটে রং-এর রক্ত হায়েজের দিনগুলোতে দেখে তবে তা হায়েজ। যেমন হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত– "তাঁরা সাদা রং ব্যতীত অন্যান্য রংকেও হায়েজ ধরতেন।"

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا قَدَّمَ مَسْأَلَةَ الطُّهْرِ الْمُتَخَلِّلِ الخ : মূলত এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। **প্রশ্ন :** প্রশ্নটির সারমর্ম হচ্ছে, হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ স্থানে হায়েজের রং-এর বিবরণের পর طُهْر مُتَخَلِّلْ -এর বিবরণ পেশ করেছেন। আর বিকায়া গ্রন্থকার (র.) طُهْر مُتَخَلِّلْ -এর বিবরণের পর হায়েজের রং-এর বিবরণ উল্লেখ করেছেন। মূলত এ ক্ষেত্রে তিনি হিদায়া গ্রন্থকারের ধারাবাহিকতার পরিপন্থি করেছেন। অথচ তিনি স্বীয় কিতাবে হিদায়া গ্রন্থকারের ধারাবাহিকতার অনুসরণ করে থাকেন। **উত্তর :** এর উত্তরের সারমর্ম হচ্ছে, বিকায়া গ্রন্থকার (র.) যখন হায়েজের مُدَّة উল্লেখ করেছেন এবং তা অগ্রে উল্লেখ করাও আবশ্যক ছিল। কেননা, এ অধ্যায়ের অধিকাংশ মাসআলা হায়েজের مُدَّة -এর সাথে সংশ্লিষ্ট, তখন طُهْر مُتَخَلِّلْ -এর মাসআলাকেও এর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। কারণ, তা হায়েজের مُدَّة -এর সাথেই সংশ্লিষ্ট। পক্ষান্তরে হায়েজের রং-এর মাসআলা– এতে হায়েজের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়; হায়েজের مُدَّة সম্পর্কে নয়। তাই শারেহ (র.) وَاِنَّمَا قَدَّمَ দ্বারা উক্ত মন্তব্যের উত্তর দিয়েছেন।

ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ شَرَعَ فِيْ اَحْكَامِ الْحَيْضِ فَقَالَ يَمْنَعُ الصَّلٰوةَ وَالصَّوْمَ وَيَقْضِيْ هُوَ لَا هِيَ اَيْ يَقْضِي الصَّوْمَ لَا الصَّلٰوةَ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ الْحَيْضَ يَمْنَعُ وُجُوْبَ الصَّلٰوةِ وَصِحَّةَ اَدَائِهَا لٰكِنْ لَا يَمْنَعُ وُجُوْبَ الصَّوْمِ فَنَفْسُ وُجُوْبِهٖ ثَابِتٌ بَلْ يَمْنَعُ صِحَّةَ اَدَائِهٖ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ اِذَا طَهُرَتْ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَنَا اٰخِرُ الْوَقْتِ فَاِذَا حَاضَتْ فِيْ اٰخِرِ الْوَقْتِ سَقَطَتْ وَ اِنْ طَهُرَتْ فِيْ اٰخِرِ الْوَقْتِ وَجَبَتْ فَاِذَا كَانَتْ طَهَارَتُهَا لِعَشَرَةٍ وَجَبَتِ الصَّلٰوةُ وَاِنْ كَانَ الْبَاقِيْ مِنَ الْوَقْتِ لَمْحَةً وَاِنْ كَانَتْ لِاَقَلِّ مِنْهَا فَاِنْ كَانَ الْبَاقِيْ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ الْغُسْلَ وَالتَّحْرِيْمَةَ وَجَبَتْ وَاِلَّا فَلَا فَوَقْتُ الْغُسْلِ يُحْتَسَبُ هٰهُنَا مِنْ مُدَّةِ الْحَيْضِ ـ

অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার হায়েজের রং-এর বিবরণের পর হায়েজের আহকামের বিবরণ শুরু করেছেন। অতএব বলেছেন, হায়েজ নামাজ-রোজা থেকে বারণ করে এবং [এ অবস্থায়] রোজাকে কাজা করবে; নামাজকে নয়। এ ভিত্তিতে যে, হায়েজ নামাজ ওয়াজিব হওয়া ও এর আদায় সহীহ হওয়া উভয়টিকেই নিষিদ্ধ করে; কিন্তু হায়েজ রোজা ওয়াজিব হওয়াকে নিষেধ করে না। তাই রোজার وُجُوْب প্রমাণিত। তবে শুধু এর আদায়ের صِحَّة নিষিদ্ধ। সুতরাং হায়েজ থেকে যখন পাক হয়ে যাবে তখন তা কাজা করা ওয়াজিব হবে। অতঃপর আমাদের নিকট শেষ ওয়াক্ত ধর্তব্য। তাই যখন তার শেষ ওয়াক্তে হায়েজ আসে তখন [সে ওয়াক্তের] নামাজ রহিত হয়ে যাবে। আর যদি সে শেষ ওয়াক্তে হায়েজ থেকে পবিত্র হয়ে যায়, তবে তার উপর [সে ওয়াক্তের] নামাজ ওয়াজিব হয়। অতএব, যদি সে দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর পবিত্র হয় তবে তার উপর নামাজ ওয়াজিব হবে, যদিও [নামাজের] ওয়াক্তের আর এক মুহূর্ত বাকি থাকে। আর যদি দশদিন পূর্ণ হওয়ার আগে সে [হায়েজ থেকে] পবিত্র হয়, তবে যদি ওয়াক্তের এতটুকু সময় বাকি থাকে যে, এর মধ্যে গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা সম্ভব, তবে [তার উপর] নামাজ ওয়াজিব হবে; অন্যথায় নয়। অতএব এখানে [দশদিনের কমে হায়েজ বন্ধ হওয়ার সুরতে] গোসলের সময়কে হায়েজের মুদ্দত থেকেই গণনা করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ شَرَعَ فِيْ اَحْكَامِ الخ :

হায়েজের আহকাম : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) এখান থেকে হায়েজের হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধানের আলোচনা শুরু করেছেন। নিহায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, হায়েজের মোট বারোটি বিধান রয়েছে। তন্মধ্যে আটটি বিধান এমন, যার মধ্যে হায়েজ ও নিফাস উভয়টি শামিল। আর বাকি চারটি বিধান এমন, যা শুধু হায়েজের সাথে নির্দিষ্ট। উক্ত বিধানাবলির একটি হচ্ছে, নামাজ রহিত হয়ে যাওয়া, তবে কাজা করতে হবে না। দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে, হায়েজ অবস্থায় রোজা রহিত হয়ে যাওয়া, তবে কাজা ওয়াজিব হবে। দলিল হচ্ছে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেন–

كُنَّا نَحِيْضُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلٰوةِ ـ

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আমাদের হায়েজ আসত, তখন আমাদেরকে রোজা কাজা করার নির্দেশ দেওয়া হতো, কিন্তু নামাজ কাজা করার নির্দেশ দেওয়া হতো না।" –[বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে অন্যত্র বর্ণিত আছে–

كَانَتْ إِحْدَانَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا تَقْضِى الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِى الصَّلٰوٰتِ .

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আমাদের কেউ যখন হায়েজ থেকে পবিত্র হতো, তখন সে রোজার কাজা করত, কিন্তু নামাজের কাজা করত না।"

এ ক্ষেত্রে যৌক্তিক দলিল হলো, নামাজ এমন আমল যা দায়েমী এবং বছরের প্রতিদিনই পাঁচবার করে ফরজ হয়। কোনো দিন এর ব্যত্যয় ঘটে না। এমতাবস্থায় যদি হায়েজা মহিলা তার হায়েজের দিনগুলোর নামাজ কাজা করতে হয়, তবে প্রত্যেক দিন নির্ধারিত নামাজ ছাড়াও অতিরিক্ত দ্বিগুণ নামাজ আদায় করতে হবে, যা তার জন্য অসুবিধাজনক এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে রোজার ব্যাপারটি এর থেকে ভিন্ন। কারণ, রোজা ফরজ হয় সারা বৎসরে মাত্র এক মাস। এ এক মাসের মধ্যে যে স্ত্রীলোকের যতদিন ঋতুস্রাব চলতে থাকবে ততদিন সে রোজা রাখবে না ঠিক, কিন্তু এ মাস চলে যাওয়ার পর বাকি এগারো মাসের যে-কোনো সময় সে তার রোজাগুলোর কাজা করতে গেলে তাকে দ্বিগুণ রোজা রাখার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। এ কারণেই হায়েজা স্ত্রীগণের জন্য নামাজের কাজা ওয়াজিব না করে রোজার কাজা ওয়াজিব করা হয়েছে। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দা-বান্দিদেরকে অসুবিধায় পতিত করেন না। যেমন ইরশাদ হচ্ছে– وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ "তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো অসুবিধা বা কঠোরতা আরোপ করেননি।" –[সূরা : হজ্জ, আয়াত : ৭৮]

قَوْلُهُ فَاِذَا حَاضَتْ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ الخ : শারেহ (র.) বলেন, আমাদের নিকট হায়েজ আসা ও বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে নামাজের শেষ ওয়াক্ত ধর্তব্য। এ মূলনীতি থেকে শারেহ (র.) কতিপয় মাসআলা উল্লেখ করেন যে, যদি মহিলার নামাজের শেষ ওয়াক্তে হায়েজ আসে, এমতাবস্থায় সে এ ওয়াক্তের নামাজ আদায় করেনি, তবে উক্ত নামাজ তার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে এবং কাজাও আবশ্যক হবে না। আর যদি সে নামাজের শুরু ওয়াক্তে হায়েজা অবস্থায় থাকে এবং শেষ ওয়াক্তে হায়েজ বন্ধ হয়ে যায় তবে উক্ত নামাজ তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি সে ওয়াক্তে আদায় না করে তবে পরবর্তীতে তা আদায় করে নেবে। আমাদের মতে এর কারণ হচ্ছে, নামাজ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, নামাজের সাথে সম্পৃক্ত ওয়াক্ত। আর যেহেতু তা ওয়াজিব দীর্ঘ সময়ের জন্য, তাই এর سَبَبِيَّتْ -ও নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয় এবং শেষ ওয়াক্তে তা আদায় করা যায়। যখন নামাজের আদা (اَدَاء) শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত চলে আসে তখন সে ওয়াক্তই নামাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তাই শেষ ওয়াক্তই ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ الْبَاقِىْ مِنَ الْوَقْتِ : অর্থাৎ যদি দশদিন পূর্ণ হওয়ার পর মহিলার হায়েজ বন্ধ হয়, তবে তার উপর ঐ নামাজও ওয়াজিব হবে, যে নামাজের সামান্য ওয়াক্তও সে পেয়েছে। কেননা, হায়েজ দশদিনে সমাপ্ত হওয়া নিশ্চিত তাহারাত। কারণ, দশদিনের চেয়ে বেশি হায়েজ নিশ্চিত ইস্তিহাজা। আর যদি এর চেয়ে কম সময়ে হায়েজ বন্ধ হয়, তবে হায়েজের মুদ্দত বাকি থাকার কারণে দ্বিতীয়বার হায়েজ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য এতে এতটুকু সময় ধর্তব্য হবে যতটুকু সময়ের মধ্যে হায়েজের পর গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধতে পারে।

قَوْلُهُ مِنْ مُدَّةِ الْحَيْضِ : যদি দশদিনের কমে হায়েজ বন্ধ হয়ে যায় তবে যদি সে নামাজের ওয়াক্তের এতটুকু সময় পায় যে, গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধতে পারবে তবে তার উপর উক্ত ওয়াক্তের নামাজ ওয়াজিব হবে; অন্যথায় নয়। উল্লেখ্য, দশদিনের কমে হায়েজ বন্ধ হওয়ার সুরতে গোসলের সময়টুকুকে হায়েজের সময়ের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে। কেননা, গোসলের পরেই তাহারাত হাসিল হয়; এর পূর্বে নয়। তাই যদি হায়েজ বন্ধ হওয়ার পর সে গোসল করার মতো সময় না পায়, তবে তার উপর ঐ ওয়াক্তের নামাজ কাজা করা আবশ্যক নয়। কেননা, সে নামাজের ওয়াক্তে হায়েজ থেকে পাকই হয়নি। আর যদি সে গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার মতো সময় পায় তবে তার উপর উক্ত নামাজ কাজা করা আবশ্যক হবে। যেমনটি উসূলের কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু যদি দশদিন পূর্ণ হওয়ার পর হায়েজ বন্ধ হয়, তবে গোসলের সময়কে তাহারাতে অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে। অন্যথায় যদি গোসলের সময়কে তাহারাতের অন্তর্ভুক্ত না ধরা হয়, তবে হায়েজের মুদ্দত দশদিনের চেয়ে বেশি হয়ে যায়।

وَالصَّائِمَةُ إِذَا حَاضَتْ فِي النَّهَارِ فَإِنْ كَانَ فِيْ اٰخِرِهِ بَطَلَ صَوْمُهَا فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ إِنْ كَانَ صَوْمًا وَاجِبًا وَإِنْ كَانَ نَفْلًا لَا بِخِلَافِ صَلٰوةِ النَّفْلِ إِذَا حَاضَتْ فِيْ خِلَالِهَا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وَيَجِبُ قَضَاؤُهَا وَإِنْ طَهُرَتْ فِي النَّهَارِ وَلَا تَأْكُلْ شَيْئًا لَا يُجْزِئْ صَوْمُ هٰذَا الْيَوْمِ لٰكِنْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِمْسَاكُ وَإِنْ طَهُرَتْ فِي اللَّيْلِ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ يَصِحُّ صَوْمُ هٰذَا الْيَوْمِ وَإِنْ كَانَ الْبَاقِيْ مِنَ اللَّيْلِ لَمْحَةً وَإِنْ طَهُرَتْ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ يَصِحُّ الصَّوْمُ إِنْ كَانَ الْبَاقِيْ مِنَ اللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ الْغُسْلَ فَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ فِي اللَّيْلِ لَا يَبْطُلُ صَوْمُهَا .

অনুবাদ : রোজাদার মহিলার যখন দিনে হায়েজ আসবে তখন যদি তা দিনের শেষ সময়ে আসে তবে তার রোজা বাতিল হয়ে যাবে এবং এর কাজা ওয়াজিব হবে, যদি তা ওয়াজিব রোজা হয়। আর যদি তা নফল রোজা হয়, তবে এর কাজা ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে নফল নামাজ– যদি এর মধ্যখানে হায়েজ চলে আসে তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে এবং তা কাজা করা ওয়াজিব। আর যদি [রোজাদার মহিলা] দিনে হায়েজ থেকে পবিত্র হয়ে যায়, এমতাবস্থায় [সকাল থেকে] কিছু খায়নি, তবুও সেদিনের রোজা তার জন্য যথেষ্ট হবে না [এবং তার উপর এর কাজা ওয়াজিব হবে]। কিন্তু তার উপর [দিনের বাকি অংশে কোনো কিছু খাওয়া থেকে] বিরত থাকা ওয়াজিব। আর যদি দশদিন পূর্ণ হওয়ার পর [হায়েজ থেকে] রাতে পবিত্র হয় তবে [তার] সেদিনের রোজা সহীহ হবে, যদিও রাতের এক মুহূর্ত বাকি থাকে। আর যদি দশদিনের কম সময়ে [হায়েজ থেকে] পবিত্র হয়, তবে যদি রাতের এ পরিমাণ সময় বাকি থাকে যে, সে গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধতে পারে তবে তার সেদিনের রোজা সহীহ হবে। অতএব যদি সে রাতে গোসল নাও করে তবুও তার রোজা বাতিল হবে না। [কেননা, জানাবাত রোজার জন্য প্রতিবন্ধক নয়।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالصَّائِمَةُ إِذَا حَاضَتْ الخ : শারেহ (র.)-এর ইবারতের সারমর্ম হচ্ছে, হায়েজা মহিলার রোজা ও নামাজ হয়তো ফরজ হবে কিংবা নফল হবে। যদি রোজা ফরজ হয় তবে হায়েজ আসার দ্বারা তার রোজা বাতিল হয়ে যাবে এবং এর কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা, যে ফরজ কিংবা ওয়াজিব ভেঙ্গে যায় সে ফরজ কিংবা ওয়াজিবই পুনরায় আদায় করা আবশ্যক হয়। আর যদি ফরজ নামাজ হয়, তবে তার উপর থেকে উক্ত নামাজ রহিত হয়ে যায় এবং তার কাজা ওয়াজিব হয় না। এর কারণ হচ্ছে, আমাদের নিকট শেষ ওয়াক্ত ধর্তব্য। এখন যদি তার নামাজের ওয়াক্তে হায়েজ আসে, যদি তা নামাজের মধ্যখানে আসে, তবে উক্ত নামাজ তার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে এমনই উল্লেখ রয়েছে। আর যদি রোজা কিংবা নামাজ নফল হয় অর্থাৎ ফরজ-ওয়াজিব ব্যতীত সুন্নত হয়, যেমন– আরাফার দিবস, কিংবা আশুরার রোজা, কিংবা সাধারণ নফল রোজা, কিংবা ফরজ-ওয়াজিব ব্যতীত সুন্নত, কিংবা নফল হয়, তবে যেহেতু আমাদের নিকট নফল শুরু করার দ্বারা তা ওয়াজিব হয়ে যায়, তাই এখানেও যদি নফল রোজা কিংবা নফল নামাজের মধ্যখানে তার হায়েজ আসে তবে সাথে সাথে তখন তার নামাজ কিংবা রোজা বাতিল হয়ে যাবে, কিন্তু হায়েজ থেকে পাক হওয়ার পর তা কাজা করা আবশ্যক। ফাতহুল কাদীর, নিহায়া ও অন্যান্য কিতাবে এমনই উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَجْزِى صَوْمُ هٰذَا الْيَوْمِ الخ : যদি মহিলা দিনের অর্ধাংশেরও পূর্বে হায়েজ থেকে পবিত্র হয়, এ যাবৎ কোনো কিছু না খেয়ে থাকে এবং রোজার নিয়ত করে ফেলে তবু তার সেদিনের রোজা যথেষ্ট হবে না। কেননা, হায়েজ ও নিফাস উভয়টি مُطْلَقًا রোজার জন্য প্রতিবন্ধক। কেননা, রোজা সহীহ হওয়ার জন্য এগুলো না হওয়া শর্ত। দ্বিতীয় কথা হলো, রোজা এমন এক ইবাদত যার বিভক্তি হয় না। যখন দিনের শুরুতেই এর প্রতিবন্ধক বিষয় পাওয়া গেছে তখন এর বাকি অংশেও এ প্রতিবন্ধকের হুকুম হবে, তবে তার উপর রমজান মাসের ইহতিরাম করা আবশ্যক, তাই সেদিনের বাকি অংশে পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকবে। যেরূপ মুসাফির ব্যক্তি মুকীম হলে কিংবা অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হলে কিংবা নাবালেগ বালেগ হলে কিংবা কাফের মুসলমান হলে তাদের উপর রমজান মাসের সম্মানার্থে পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রোজা অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

قَوْلُهُ وَإِنْ طَهُرَتْ فِى اللَّيْلِ لِعَشَرَةِ اَيَّامٍ الخ : যদি দশদিন পূর্ণ হওয়ার পর মহিলা রাতে হায়েজ থেকে পবিত্র হয় তবে তার সেদিনের রোজা সহীহ হবে। চাই সেদিনটি রমজানের দিন হোক কিংবা نَذْر مُعَيَّنْ তথা নির্দিষ্ট দিনের রোজা হোক। যদিও তার জন্য উক্ত রাতের এক মুহূর্ত বাকি থাকে। কেননা, হায়েজ দশদিনের অধিক হয় না। তাই এ দশদিনের পর হায়েজ বন্ধ হয়ে গেছে বলে ধরা হবে। আর যদি দশদিনের পূর্বে হায়েজ থেকে পবিত্র হয় তবে রক্ত বন্ধ হওয়ার পর তাকে এতটুকু সময় পেতে হবে যাতে করে সে গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধতে পারে– তবেই তার উপর সেদিনের রোজা কিংবা সে ওয়াক্তের নামাজ ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ لَا يَبْطُلُ صَوْمُهَا : দশদিনের কমে এবং রাতে হায়েজ বন্ধ হয়ে গেলে মহিলা যদি রাতের এ পরিমাণ সময় পায় যে, সে গোসল করে তাহরীমা বাঁধতে পারে আর সে গোসল করেনি, তবে তার রোজা বাতিল হবে না। কেননা, যখন সে এতটুকু পরিমাণ সময় পেল যে, এতে গোসল করা সম্ভব, তখন তার উপর সেদিনের রোজা আবশ্যক হবে। আর যেহেতু রোজার প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়ে গেছে এবং জানাবাত রোজার প্রতিবন্ধক নয়, তাই যদি রাতে গোসল না করে; বরং দিনে গোসল করে তবুও কোনো সমস্যা নেই।

وَدُخُولَ الْمَسْجِدِ وَالطَّوَافَ لِكَوْنِهِ يُفْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنْ طَافَتْ مَعَ هٰذَا تَحَلَّلَتْ وَاسْتِمْتَاعَ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ كَالْمُبَاشَرَةِ وَالتَّفْخِيذِ وَيَحِلُّ الْقُبْلَةُ وَمُلَامَسَةُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) يَتَّقِي شِعَارَ الدَّمِ اَيْ مَوْضِعَ الْفَرْجِ فَقَطْ وَلَا تَقْرَأُ كَجُنُبٍ وَنُفَسَاءَ سَوَاءٌ كَانَ اٰيَةً اَوْ مَا دُونَهَا عِنْدَ الْكَرْخِيِّ (رح) وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَعِنْدَ الطَّحَاوِيِّ (رح) تَحِلُّ مَا دُونَ الْاٰيَةِ هٰذَا اِذَا قَصَدَتِ الْقِرَاءَةَ فَاِنْ لَمْ تَقْصِدْهَا نَحْوُ اَنْ تَقُولَ شُكْرًا لِلنِّعْمَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَيَجُوزُ لَهَا التَّهَجِّي بِالْقُرْاٰنِ وَالْمُعَلِّمَةُ اِذَا حَاضَتْ فَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ (رح) تُعَلِّمُ كَلِمَةً كَلِمَةً وَتَقْطَعُ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ وَعِنْدَ الطَّحَاوِيِّ (رح) نِصْفَ اٰيَةٍ وَتَقْطَعُ ثُمَّ تُعَلِّمُ النِّصْفَ الْاٰخَرَ وَاَمَّا دُعَاءُ قُنُوتٍ فَيُكْرَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ وَفِي الْمُحِيْطِ لَا يُكْرَهُ وَسَائِرُ الْاَدْعِيَةِ وَالْاَذْكَارِ لَا بَأْسَ بِهَا وَيُكْرَهُ قِرَاءَةُ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَا تَقْرَأُ وَلَا تَمَسُّ هٰؤُلَاءِ اَيِ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْمُحْدِثُ مُصْحَفًا اِلَّا بِغِلَافٍ مُتَجَافٍ اَيْ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ وَاَمَّا كِتَابَةُ الْمُصْحَفِ اِذَا كَانَ مَوْضُوعًا عَلٰى لَوْحٍ بِحَيْثُ لَا يَمَسُّ مَكْتُوبَهُ فَعِنْدَ اَبِيْ يُوسُفَ (رح) يَجُوزُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) لَا يَجُوزُ .

অনুবাদ : [হায়েজ] মসজিদে প্রবেশ ও তাওয়াফের জন্য প্রতিবন্ধক। কেননা, তাওয়াফ মাসজিদে হারামে করা হয়। অতএব যদি হায়েজা মহিলা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তাওয়াফ করে তবে সে [এ তাওয়াফের দ্বারা] ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। [হায়েজ] مَا تَحْتَ الْإِزَارِ [নাভি থেকে রান পর্যন্ত অংশ] থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য প্রতিবন্ধক। যেমন– মুবাশারাত ও তাফখীয [অর্থাৎ মহিলার উভয় রানকে একত্রিত করে এর অভ্যন্তরে পুরুষের লিঙ্গ প্রবেশ করানো]। [হায়েজা মহিলার] চুম্বন গ্রহণ করা বৈধ এবং কাপড়ের উপর দিয়ে [তাকে] স্পর্শ করা বৈধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট রক্তের স্থান তথা শুধু গুপ্তাঙ্গ থেকে বেঁচে থাকবে। হায়েজা মহিলা কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে না। যেমন– জুনুবী ও নেফাসগ্রস্ত মহিলা [তেলাওয়াত করতে পারে না]। চাই এক আয়াত হোক কিংবা এর চেয়ে কম হোক। এটি ইমাম কারখী (র.)-এর মত এবং এটিই উত্তম অভিমত। ইমাম তাহাবী (র.)-এর নিকট এক আয়াতের কম তেলাওয়াত করা বৈধ। এ নিষেধাজ্ঞা তখনই যখন [হায়েজা মহিলা] তেলাওয়াতের ইচ্ছা পোষণ করবে। অতএব, যদি তেলাওয়াতের ইচ্ছা পোষণ না করে; যেমন– নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করত 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলা– এর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। হায়েজা মহিলার জন্য কুরআন মাজীদ বানান করা জায়েজ আছে। যখন শিক্ষিকার [পাঠদান অবস্থায়] হায়েজ এসে যায়, তবে ইমাম কারখী (র.)-এর নিকট এক এক শব্দ করে পড়াবে

এবং প্রত্যেক দুই শব্দের মাঝে শ্বাস ফেলে ওয়াকফ করবে। ইমাম তাহাবী (র.)-এর নিকট অর্ধাংশ আয়াত পড়িয়ে ওয়াকফ করবে, অতঃপর পরের অর্ধাংশ পড়াবে। কিন্তু দোয়া কুনূত পড়া কোনো কোনো শায়খের নিকট মাকরূহ। "মুহীত" নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, তা মাকরূহ নয়। সমস্ত দোয়া ও জিকির পড়ার মাঝে কোনো সমস্যা নেই। [হায়েজা মহিলার জন্য] তাওরাত ও ইঞ্জিল [কিতাব] পাঠ করা মাকরূহ।

অজুহীন ব্যক্তি এর পরিপন্থি [অর্থাৎ সে তেলাওয়াত করতে পারবে]। এ বাক্যের সম্পর্ক وَلَا تَقْرَأُ -এর সঙ্গে। এ সকল মহিলা তথা হায়েজা, জুনূবী, নিফাসগ্রস্ত ও অজুহীনা [মুহদিছা] কুরআন মাজীদ স্পর্শ করবে না। হ্যাঁ, যদি [কুরআন থেকে] পৃথক কোনো গিলাফে আবৃত হয় [তবে স্পর্শ করতে পারবে], তবে কুরআন মাজীদ লেখা যখন তা কোনো কাষ্ঠখণ্ডের উপর এমনভাবে রাখা হবে যে, লিখিত অংশের উপর হাত লাগে না, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তা স্পর্শ করা জায়েজ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট জায়েজ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ وَالطَّوَافُ الخ :

হায়েজা মহিলার জন্য মসজিদে প্রবেশ জায়েজ নেই : হায়েজ সংক্রান্ত তৃতীয় হুকুম হচ্ছে, হায়েজা মহিলা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না, তবে এতে ওলামায়ে আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, হায়েজা মহিলার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হায়েজা মহিলা মসজিদের উপর দিয়ে পার হতে কিংবা পথ অতিক্রম করতে পারবে, কিন্তু সে মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান করতে পারবে না।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا .

অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তামরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের কাছেও যেয়ো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝতে পারবে তোমরা কি বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও গোসল করা ব্যতীত [নামাজের কাছেও যেয়ো না]। –[সূরা নিসা : ৪৩]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, আয়াতে صَلٰوة শব্দ বলে مَكَان صَلٰوة তথা মসজিদ বুঝানো হয়েছে। আর عَابِر سَبِيْل -এর অর্থ হলো– পথ অতিক্রমকারী। এর দ্বারা আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, জুনূবী ব্যক্তির জন্য মসজিদের নিকটে যাওয়া জায়েজ নেই, কিন্তু যদি মসজিদ অতিক্রম করে যায়– সেখানে অবস্থান না করে, তবে তা জায়েজ।

ওলামায়ে আহনাফের দলিল হলো, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত এই হাদীস–

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَاِنِّىْ لَا اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ .

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ গৃহগুলোর প্রবেশদ্বার মসজিদের দিক থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দাও। কারণ, আমি হায়েজা নারী ও জুনূবী ব্যক্তির জন্য [মসজিদে প্রবেশ] হালাল রাখিনি।"

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, "নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি হায়েজা মহিলার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা হালাল রাখিনি।" ফলত তিনি উক্ত গৃহগুলোর প্রবেশপথকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যেন হায়েজা মহিলাদের মসজিদ অতিক্রম করে ঘরে প্রবেশ করতে না হয়।

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) : আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলকে দুভাবে খণ্ডন করা হয়–

১. মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, উক্ত আয়াতের اِلَّا শব্দটি وَلَا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, জুনূবী ব্যক্তি মসজিদের নিকটবর্তী হবে না এবং সে পথ অতিক্রম করার জন্যও মসজিদে প্রবেশ করবে না।

২. আয়াতে صَلٰوة শব্দটি প্রকৃত صَلٰوة-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর عَابِرِيْ سَبِيْل দ্বারা মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে। ফলে আয়াতের মর্ম দাঁড়ায়– "নামাজ না নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়বে, না জুনূবী অবস্থায়। তবে কেউ যদি মুসাফির অবস্থায় জুনূবী হয় তবে সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি গোসল করার আগে তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ আদায় করতে পারবে।"

❖ **হায়েজা মহিলা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে না :** হায়েজ সংক্রান্ত চতুর্থতম হুকুম হচ্ছে, হায়েজা মহিলা বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে পারবে না। এর দলিল হলো, তাওয়াফ নামক ইবাদতটি মসজিদের [বাইতুল্লাহর] অভ্যন্তরেই ঘটে থাকে। অথচ হায়েজাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। এজন্য তাদের তাওয়াফ করাও নিষেধ।

মাওলানা নিযামুদ্দীন জাহেদী (র.) বলেন, উপরিউক্ত দলিলটি দুর্বল। কারণ, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হায়েজা মহিলারা যদি মসজিদের বাহিরে থেকে তাওয়াফ করে তা জায়েজ হওয়া উচিত। অথচ প্রকৃত মাসআলা হলো, হায়েজা মহিলাদের তাওয়াফ করাই জায়েজ নেই– চাই তা মসজিদের ভিতরে হোক কিংবা মসজিদের বাহিরে থেকে হোক। তাই এর উপযুক্ত দলিল হলো, তাওয়াফ নামাজের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ "বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করাও নামাজের মধ্যে শামিল।" তাই হায়েজার জন্য যেহেতু নামাজ আদায় নিষেধ সেহেতু তার জন্য তাওয়াফ করাও নিষেধ।

قَوْلُهُ فَإِنْ طَافَتْ مَعَ هٰذَا تَحَلَّلَتْ : অর্থাৎ হায়েজা মহিলার জন্য তাওয়াফের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি কেউ তাওয়াফ করে ফেলে, তবে সে গুনাহগার হবে, কিন্তু সে এর দ্বারা ইহরাম থেকে পবিত্র হয়ে যাবে এবং উক্ত গুনাহের কাফফারা হিসেবে তাকে একটি বুদনা [উট] জবাই করতে হবে।

❖ **হায়েজা নারীর সঙ্গে সহবাস করা হারাম :** হায়েজগ্রস্তদের পঞ্চম হুকুম হলো, তাদের সাথে সঙ্গম করা হারাম। এর দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ "তোমরা তাদের সাথে সঙ্গম করো না, তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত।" –[সূরা বাকারা, আয়াত : ২২২]

উক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, হায়েজা মহিলার সাথে সঙ্গম করা হারাম।

এখন যদি কোনো স্বামী হালাল মনে করে তার হায়েজা স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। অবশ্য যদি কেউ এ অবস্থায় সঙ্গম করাকে হারাম মনে করেই তা করে, তবে সে কাফের হবে না ঠিক, কিন্তু ফাসিক হয়ে যাবে এবং কবীরা গুনাহ করেছে বলে বিবেচিত হবে। এর জন্য তওবা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এক বা আধা দিনার পরিমাণ পয়সা সদকা করে দেবে।

তবে হায়েজা স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম না করে মেলামেশার মাধ্যমে মজা লাভ করা জায়েজ আছে কিনা, এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ, শাফেয়ী, মালেক (র.) প্রমুখের অভিমত হলো, হাঁটু থেকে উপরের দিকে নাভি পর্যন্ত শরীরের এ অংশ থেকে মজা লাভ করা হারাম। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, হায়েজা স্ত্রী থেকে اِسْتِمْتَاعٌ [মজা গ্রহণ করা] জায়েজ আছে কি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, مَا فَوْقَ الْاِزَارِ "নাভীর উপরের অংশ" থেকে اِسْتِمْتَاعٌ জায়েজ।

–[আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, এতে নবী ﷺ বলেছেন– مَا فَوْقَ الْاِزَارِ তথা নাভির উপরের অংশ থেকে اِسْتِمْتَاعٌ [মজা হাসিল করা] জায়েজ। অতএব বুঝা গেল– مَا تَحْتَ الْاِزَارِ তথা নাভির নীচের অংশ থেকে মজা লাভ করা জায়েজ নেই।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ ও আহমদ (র.) বলেন, শুধুমাত্র যোনিদ্বার বা লজ্জাস্থান ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অংশ থেকে মজা লাভ করা হারাম নয়। দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ اَيْ بِالْحَائِضِ اِلَّا النِّكَاحَ اَيِ الْجِمَاعَ "তোমরা হায়েজা স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম ছাড়া সবকিছু করতে পারবে।" –[তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হায়েজা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই করার অনুমতি দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, مَا تَحْتَ الْاِزَارِ তথা নাভির নীচের অংশ থেকেও সঙ্গম ব্যতীত মজা হাসিল করা হারাম নয়।

হায়েজা মহিলা কুরআন তেলাওয়াত করবে না : হায়েজা মহিলার ষষ্ঠতম হুকুম হচ্ছে, সে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতে পারবে না। যেরূপ জুনূবী ও নেফাসগ্রস্ত মহিলাও তেলাওয়াত করতে পারে না। এক আয়াত কিংবা এক আয়াতের চেয়ে কম পড়তে পারবে কিনা এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম কারখী (র.) সহ ওলামায়ে আহনাফ-এর নিকট এক আয়াত কিংবা এক আয়াতের চেয়ে কম আয়াতও হায়েজা মহিলা তেলাওয়াত করতে পারবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট হায়েজা মহিলার জন্য কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা জায়েজ। ইমাম তাহাবী (র.)-এর নিকট হায়েজা মহিলার জন্য কুরআন শরীফের এক আয়াতের চেয়ে কম পাঠ করা জায়েজ আছে।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল হলো, হায়েজা মহিলা হচ্ছে মাযূর। আবার কুরআন পাঠের প্রতিও সে মুহতাজ। অথচ পবিত্রতা অর্জনে সে অক্ষম। এসব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই হায়েজা স্ত্রীগণের জন্য কুরআন পাঠ করাকে জায়েজ করা হয়েছে।

ইমাম তাহাবী (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ [তোমরা কুরআনের যা সহজ অংশ তা পাঠ কর]। মুফাসসিরীনে কেরাম এর ব্যাখ্যা করেন, ছোট ছোট তিন আয়াত কিংবা লম্বা এক আয়াত দ্বারা। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক আয়াতের কম অংশ দ্বারা নামাজ সহীহ হবে না। অতএব হায়েজা মহিলা তা পড়ার মাঝে কোনো ক্ষতি নেই।

ওলামায়ে আহনাফের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ "হায়েজা মহিলা ও জুনূবী কুরআনের কোনো অংশ পাঠ করবে না।"

উক্ত হাদীস হায়েজা মহিলার জন্য কুরআনের যে-কোনো অংশই পাঠ করা নাজায়েজ বুঝায়।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلٰى مَالِكٍ وَالطَّحَاوِيْ (رح) : ইমাম মালেক (র.)-এর دَلِيْل عَقْلِيْ [যৌক্তিক দলিল] হাদীসের বিপক্ষে দলিল হতে পারে না। অপরদিকে হাদীসটি যেহেতু مُطْلَقْ [ব্যাপক], সেহেতু এতে কুরআনের এক আয়াত কিংবা এর চেয়ে কম অংশও দাখিল। এর দ্বারা ইমাম তাহাবী (র.)-এর অভিমতও নাকচ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ هٰذَا اِذَا قَصَدَتِ الْقِرَاءَةَ الخ : অর্থাৎ হায়েজা মহিলার জন্য কুরআন শরীফের এক আয়াত কিংবা এক আয়াতেরও কম তেলাওয়াত করা তখনই নাজায়েজ, যখন সে তেলাওয়াতের ইচ্ছা করবে। আর যদি সে তেলাওয়াতের ইচ্ছা না করে যেমন– সে শুকরিয়া স্বরূপ "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" বলল, তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, পড়ার সময়ের নিয়ত পরিবর্তন হওয়ার দ্বারা কুরআন-এর اَلْفَاظْ [শব্দাবলি]-এর হুকুমও পরিবর্তন হয়ে যায়। হ্যাঁ, যদি সে এমন কোনো আয়াত বা সূরা পাঠ করে যা তেলাওয়াত করা ছাড়া ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য হতে পারে না; যেমন– "সূরা লাহাব" তবে তা জায়েজ নয়। শারেহ (র.) পরবর্তীতে উল্লেখ করেছেন যে, হায়েজা মহিলা কুরআন মাজীদ বানান করে পড়তে পারবে; একত্রে উচ্চারণ করতে পরবে না।

قَوْلُهُ وَاَمَّا دُعَاءُ الْقُنُوْتِ فَيُكْرَهُ الخ : অর্থাৎ হায়েজা মহিলার জন্য দোয়া কুনূত পড়া কোনো কোনো শায়খের নিকট মাকরূহ। কেননা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দোয়া কুনূত কুরআন মাজীদের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি দুটি সূরার সমষ্টির নাম। যথা–

১. সূরা খালা (خَلْع)। তা হচ্ছে– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ থেকে مَنْ يَفْجُرُكَ পর্যন্ত।

২. সূরা হাফদ (حَفْد)। তা হচ্ছে– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ থেকে নিয়ে بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ পর্যন্ত।

অতঃপর এ উভয় সূরার তেলাওয়াত মানসূখ হয়েছে। ইমাম সুয়ূতী (র.) "দুররে মানছূর" নামক গ্রন্থে এমনই উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে জমহুর সাহাবায়ে কেরামের নিকট এটি কুরআন মাজীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা, যদি এমনই হতো তবে এর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত হতো, অথচ এমনটি নয়।

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ قِرَاءَةُ التَّوْرَاةِ الخ : অর্থাৎ হায়েজা মহিলার জন্য তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব তেলাওয়াত করা মাকরূহ। কেননা, এগুলো আল্লাহর পঠিত কালাম। তাই এগুলোর সম্মান করা আবশ্যক। অনুরূপই যাবূরসহ অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের হুকুম।

❖ **হায়েজা মহিলার জন্য কুরআন স্পর্শ করা নাজায়েজ :** হায়েজ সংক্রান্ত সপ্তম হুকুম হচ্ছে, হায়েজা মহিলা গেলাফবিহীন কুরআন মাজীদ স্পর্শ করতে পারবে না। অনুরূপ গেলাফবিহীন কুরআন মাজীদ স্পর্শ করতে পারবে না জুনুবী ব্যক্তি-পুরুষ হোক চাই মহিলা হোক, নিফাসগ্রস্ত ও অজুহীন ব্যক্তি-পুরুষ হোক চাই মহিলা হোক। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- **لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ** "শুধুমাত্র পবিত্র ব্যক্তিই কুরআন মাজীদ স্পর্শ করতে পারে।"

তবে হায়েজা মহিলা কুরআন মাজীদ ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ স্পর্শ করতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, কুরআন মাজীদ ব্যতীত অন্যান্য কিতাব স্পর্শ করার অনুমতি রয়েছে। কেননা, এটি একটি জরুরি বিষয়, তবে যতটুকু সম্ভব হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থাবলি অজুবিহীন স্পর্শ না করাই উত্তম। অজুবিহীন বাচ্চাদের হাতে কুরআন মাজীদ দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, যদি তাদের ক্ষেত্রে এ হুকুম না দেওয়া হয়, তবে দুটি ক্ষতি অনিবার্য হয়। ১. হয়তো বাচ্চাদেরকে কুরআন মাজীদ স্পর্শ করতে দেওয়া হবে না, যার ফলে তারা হিফজ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। ২. কিংবা তাদেরকে অজু করতে বাধ্য করা হবে, যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

قَوْلُهُ إِلَّا بِغِلَافٍ مُتَجَافٍ : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যে গেলাফ দ্বারা কিংবা যে গেলাফের উপর দিয়ে কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা জায়েজ, তা হচ্ছে এমন গেলাফ বা অন্য কিছু যা কুরআন মাজীদের সাথে স্থায়ীভাবে জড়িত হয়ে থাকে না। অর্থাৎ যা স্পর্শকারী ও কুরআন মাজীদের মাঝে একটি ব্যবধানকারী হিসেবে কাজ করে এবং যা স্পর্শকারীর শরীরের সাথে লেগে থাকা কাপড়ও নয়। যেমন- আস্তিন ইত্যাদি।

قَوْلُهُ وَأَمَّا كِتَابَةُ الْمُصْحَفِ الخ : অর্থাৎ যদি হায়েজা মহিলা কুরআন মাজীদ লিখতে চায় তবে যদি তার লিখিত অংশের উপর হাত লাগে তবে তা জায়েজ নেই। আর যদি লিখিত কাগজ কোনো কাষ্ঠখণ্ডের উপর রাখা হয় কিংবা ভিন্ন কোনো জিনিসের উপর রাখা হয় যে, এর উপর হাত লাগে না, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট এ সুরতও জায়েজ নেই। এজন্য যে, সে কুরআন মাজীদের একটি অংশ লিখেছে, যার হুকুম পূর্ণ কুরআনের হুকুমের ন্যায়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট লিখিত কাগজে হাত না লাগলে তা লেখা জায়েজ। কেননা, কাগজের লিখিত অংশ এবং তৎপার্শ্ববর্তী অংশের উপর পূর্ণ কুরআনের হুকুম জারি হয় না।

وَكُرِهَ بِالْكُمِّ وَلَا دِرْهَمًا فِيهِ سُورَةٌ اِلَّا بِصُرَّةٍ اَرَادَ دِرْهَمًا عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاِنَّمَا قَالَ سُوْرَةً لِاَنَّ الْعَادَةَ كِتَابَةُ سُوْرَةِ الْاِخْلَاصِ وَنَحْوِهٖ عَلَى الدَّرَاهِمِ وَحَلَّ وَطْئُ مَنْ قَطَعَ دَمُهَا لِاَكْثَرِ الْحَيْضِ اَوِ النِّفَاسِ قَبْلَ الْغُسْلِ دُوْنَ وَطْيٍ مِنْ قَطْعٍ لِاَقَلِّ مِنْهُ اَيْ لِاَقَلِّ مِنَ الْاَكْثَرِ وَهُوَ اَنْ يَنْقَطِعَ الْحَيْضُ لِاَقَلِّ مِنْ عَشَرَةٍ وَالنِّفَاسُ لِاَقَلِّ مِنْ اَرْبَعِيْنَ اِلَّا اِذَا مَضٰى وَقْتٌ يَسَعُ الْغُسْلَ وَالتَّحْرِيْمَةَ فَحِ يَحِلُّ وَطْيُهَا وَاِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ اِقَامَةً لِلْوَقْتِ الَّذِيْ يَتَمَكَّنُ فِيْهِ مِنَ الْاِغْتِسَالِ مَقَامَ حَقِيْقَةِ الْاِغْتِسَالِ فِيْ حَقِّ حِلِّ الْوَطْيِ وَاعْلَمْ اَنَّهٗ اِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِاَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ بَعْدَ مَا مَضٰى ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ اَوْ اَكْثَرُ فَاِنْ كَانَ الْاِنْقِطَاعُ فِيْمَا دُوْنَ الْعَادَةِ يَجِبُ اَنْ تُؤَخِّرَ الْغُسْلَ اِلٰى اٰخِرِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا خَافَتِ الْفَوْتَ اِغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَالْمُرَادُ اٰخِرُ وَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ دُوْنَ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ.

অনুবাদ : [এ সকল মহিলার জন্য] আঁচল দ্বারা [কুরআন মাজীদ] স্পর্শ করা মাকরূহ। এমন দিরহামও স্পর্শ করতে পারবে না, যার মধ্যে [কুরআনের] সূরা রয়েছে। তবে [দিরহামের] থলে স্পর্শ করতে পারবে। দিরহাম দ্বারা ঐ দিরহাম উদ্দেশ্য যাতে কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত [লিখিত] রয়েছে। গ্রন্থকার سُوْرَةً শব্দ এ কারণে বলেছেন যে, সাধারণত সূরা ইখলাস কিংবা অনুরূপ কোনো সূরা দিরহামের উপর লিখিত থাকে। যে মহিলার হায়েজের সর্বোচ্চ মুদ্দত [দশদিন] কিংবা নিফাসের সর্বোচ্চ মুদ্দত [চল্লিশ দিন]-এ রক্ত বন্ধ হয়, তার সাথে গোসলের পূর্বে সঙ্গম করা বৈধ। তবে যে মহিলার রক্ত [সর্বোচ্চ মুদ্দত]-এর কমে বন্ধ হয়, তার সাথে [গোসলের পূর্বে] সঙ্গম করা বৈধ নয়। তা হচ্ছে, হায়েজ দশদিনের কমে বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং নিফাস চল্লিশ দিনের কমে বন্ধ হয়ে যাওয়া। কিন্তু যদি এতটুকু পরিমাণ সময় গত হয়ে যায়, যাতে গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা যায়, তবে তার সাথে সঙ্গম করা হালাল, যদিও সে গোসল না করে। যাতে করে সঙ্গম বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে গোসল করা পরিমাণ সময়কে প্রকৃত গোসলের স্থলাভিষিক্ত করা যায়। জেনে রেখ যে, যখন তিনদিন কিংবা এর চেয়ে বেশি গত হওয়ার পর দশদিনের কমে [হায়েজের] রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে তখন যদি তা তার অভ্যাসের চেয়ে কম সময়ে বন্ধ হয় তবে নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত নামাজকে বিলম্ব করা ওয়াজিব। অতঃপর যখন নামাজ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হবে তখন গোসল করে নামাজ আদায় করে নেবে। [নামাজের] শেষ ওয়াক্ত দ্বারা মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ ওয়াক্ত উদ্দেশ্য; মাকরূহ ওয়াক্ত উদ্দেশ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَكُرِهَ بِالْكُمِّ الخ : বেকায়া গ্রন্থকার বলেন, পরিধেয় জামার আঁচল দ্বারা কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা মাকরূহে তাহরীমী। এর দ্বারা শুধু আঁচলই উদ্দেশ্য নয়; বরং পরিধেয় বস্ত্রের যে-কোনো অংশ উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি পরিধেয় বস্ত্র না হয় তবে তা দ্বারা স্পর্শ করা যাবে।

قَوْلُهُ إِلَّا بِصُرَّةٍ : صُرَّةٌ শব্দটির صَادْ অক্ষরে পেশ পড়া হবে, رَاء অক্ষরে তাশদীদ হবে। অর্থ- থলে, যাতে দিরহাম-পয়সা রাখা হয়। উদ্দেশ্য হলো, যে দিরহাম কিংবা পয়সায় কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত কিংবা সূরা লেখা থাকে- হায়েজা, নিফাসগ্রস্ত ও জুনূবী ব্যক্তির জন্য তা [illegible] করা জায়েজ নেই। কেননা, এর হুকুমও কুরআন মাজীদের হুকুমের ন্যায়। হ্যাঁ, যদি উক্ত পয়সা কোনো থলের মধ্যে রাখা হয়, তবে তা গেলাফের ন্যায় স্পর্শ করা যাবে।

قَوْلُهُ أَرَادَ دِرْهَمًا عَلَيْهِ أيَةٌ الخ : এ ইবারতের উদ্দেশ্য হলো, মতনের ইবারত থেকে উদ্ভূত সন্দেহের অপনোদন করা। সন্দেহ হচ্ছে, যার মধ্যে পূর্ণ সূরা লিখিত রয়েছে- হায়েজা, নিফাসগ্রস্ত, জুনূবী ও অজুহীন ব্যক্তির জন্য তা স্পর্শ করা জায়েজ নেই, তাহলে যাতে এক আয়াত লিখিত রয়েছে হয়তো তা স্পর্শ করা জায়েজ? তাই এ সন্দেহ অপনোদনের জন্য শারেহ (র.) বলেন যে, গ্রন্থকার سُوْرَة শব্দটি قَيْد اِتِّفَاقِيْ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় কুরআনের যে-কোনো অংশের হুকুম এমনই।

قَوْلُهُ وَحَلَّ وَطْئُ مَنْ قَطَعَ دَمُهَا الخ : হায়েজ সংক্রান্ত অষ্টম হুকুমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে, যখন হায়েজা মহিলার রক্ত সর্বোচ্চ মুদ্দত তথা দশদিনে বন্ধ হয়ে যায় কিংবা নিফাসগ্রস্ত মহিলার রক্ত সর্বোচ্চ মুদ্দত তথা চল্লিশ দিনে বন্ধ হয়ে যায় তবে সে গোসল করা ব্যতীতই তার স্বামী তার সাথে সঙ্গম করতে পারবে। অনুরূপ মনিবও তার দাসীর সাথে সঙ্গম করতে পারবে। আর যদি মহিলার হায়েজের রক্ত সর্বোচ্চ মুদ্দত তথা দশদিনের আগে কিংবা নিফাসগ্রস্ত মহিলার রক্ত সর্বোচ্চ মুদ্দত তথা চল্লিশ দিনের আগে বন্ধ হয়ে যায় তবে সে গোসল করা ব্যতীত তার সাথে সঙ্গম করা বৈধ নয়। কারণ, কখনো রক্ত প্রবাহিত হয়, আবার কখনো থেমে থাকে- তাই থেমে থাকা বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য গোসল করা জরুরি। যদি ঐ মহিলা রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গোসল না করে আর এমতাবস্থায় এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয় যে, ঐ সময়ে সে গোসল করে তাহরীমা বাঁধতে সক্ষম হতো, তবে তার সাথে সহবাস করা জায়েজ। কারণ, এ নামাজ তার উপর ঋণ স্বরূপ আরোপিত হয়েছে। তাই তাকে বিধি মোতাবেক (حُكْمًا) পবিত্র সাব্যস্ত করা হবে। কেননা, শরিয়ত যখন তার উপর নামাজ ফরজ করেছে, তখন তাকে (حُكْمًا) পবিত্রও সাব্যস্ত করেছে। কারণ, হায়েজা মহিলার জন্য নামাজ পড়া জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْاِنْقِطَاعُ فِيْمَا دُوْنَ الْعَادَةِ : যখন মহিলার একটি নির্দিষ্ট সময়ের অভ্যাস হবে; যেমন- তার অভ্যাস হলো প্রত্যেক মাসে সাত দিন রক্ত আসা। এখন যদি কোনো মাসে ছয়দিনে তার রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তবে সে গোসল ও নামাজ তাড়াতাড়ি করবে না; বরং নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে। কেননা, তার অভ্যাসগত সময় এখনো পূর্ণ হয়নি। ফলত তার দ্বিতীয়বার রক্ত আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এখন যদি তার রক্ত আসে তবে সে হায়েজাই থাকবে। মধ্যখানের এ طُهْر - فَاصِلْ হবে না। আর যদি দ্বিতীয়বার রক্ত না আসে এমতাবস্থায় নামাজের একেবারেই শেষ ওয়াক্ত হয়, তবে সে সতর্কতা স্বরূপ গোসল করে নামাজ আদায় করবে, তবে এ অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয়, গোসল করার পরেও বৈধ নয়। হ্যাঁ, তার অভ্যাসগত মুদ্দত যদি শেষ হয়ে যায় তখন গোসল করার পর তার সাথে সহবাস করা বৈধ। কেননা, অভ্যাসগত সময়ের মধ্যে অধিকাংশ মহিলারই হায়েজ এসে থাকে, তাই এ সময়ে তার সাথে সহবাস না করাই হচ্ছে সতর্কতা।

وَإِنْ كَانَ الْإِنْقِطَاعُ عَلٰى رَأْسِ عَادَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فَتَأْخِيْرُ الْإِغْتِسَالِ بِطَرِيْقِ الْإِسْتِحْبَابِ وَإِنِ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ أَخَّرَتِ الصَّلٰوةَ إِلٰى أٰخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَتِ الْفَوْتَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ثُمَّ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُوْرَةِ إِذَا عَادَ الدَّمُ فِي الْعَشَرَةِ بَطَلَ الْحُكْمُ بِطَهَارَتِهَا مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً فَإِذَا انْقَطَعَ لِعَشَرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَبِمُضِيِّ الْعَشَرَةِ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْإِغْتِسَالُ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ الْمُعْتَادَةَ الَّتِيْ عَادَتُهَا أَنْ تَرٰى يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا هٰكَذَا إِلٰى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَتْرُكُ الصَّلٰوةَ وَالصَّوْمَ فَإِذَا طَهُرَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيْ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ثُمَّ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ تَتْرُكُ الصَّلٰوةَ وَالصَّوْمَ ثُمَّ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ اِغْتَسَلَتْ وَصَلَتْ هٰكَذَا إِلَى الْعَشَرَةِ.

অনুবাদ : আর যদি মহিলার অভ্যাসগত সময় শেষ হওয়া কিংবা এর চেয়েও বেশি সময়ে রক্ত বন্ধ হয়; কিংবা মহিলা এই প্রথম হায়েজগ্রস্ত হয়, তবে তার জন্য গোসলকে বিলম্ব করা মোস্তাহাব। আর যদি তিনদিনের কমে হায়েজ বন্ধ হয়ে যায়, তবে সে নামাজকে শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবে। অতএব, যখন সে নামাজ ছুটে যাওয়ার ভয় করবে তখন অজু করে নামাজ আদায় করে নেবে। অতঃপর উল্লিখিত সুরতগুলোতে যদি দশদিনের ভিতরে আবার রক্ত আসে, তবে তার পবিত্রতার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে, চাই সে مُبْتَدَأَةً [প্রথম হায়েজা] হোক কিংবা مُعْتَادَة [অভ্যাসগত হায়েজা] হোক। সুতরাং যখন দশদিন কিংবা এর চেয়েও বেশি সময়ে রক্ত বন্ধ হবে তবে তার দশদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে পবিত্রতার হুকুম দেওয়া হবে এবং তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। ফতোয়ার কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে যে, مُعْتَادَة [অভ্যাসগত মহিলা]-এর অভ্যাস একদিন রক্ত দেখা এবং একদিন طُهْر দেখা এভাবে দশদিন পর্যন্ত চলে, তবে [তার হুকুম হচ্ছে,] সে যেদিন রক্ত দেখে সেদিন নামাজ ও রোজাকে বর্জন করবে। আর যখন সে দ্বিতীয় দিন পবিত্র হয় তখন অজু করে নামাজ পড়বে। অতঃপর তৃতীয় দিন নামাজ-রোজা বর্জন করবে। অতঃপর চতুর্থ দিন গোসল করে নামাজ পড়বে। এভাবে দশদিন পর্যন্ত চলবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً : যে মহিলা হায়েজের মাধ্যমে বালেগা হওয়া শুরু হয়েছে এবং তার অভ্যাস এখনো দৃঢ় হয়নি, তার জন্য শুধু সতর্কতা অবলম্বন করত শেষ সময় পর্যন্ত নামাজকে বিলম্ব করা মোস্তাহাব, কিন্তু ওয়াজিব নয়। আর যদি সে বিলম্ব ব্যতীত গোসল করে নামাজ পড়ে নেয়, তবে সে গুনাহগার হবে না। কেননা, তার দ্বিতীয়বার রক্ত আসার ধারণা নেই।

قَوْلُهُ أَخَّرَتِ الصَّلٰوةَ إِلٰى أٰخِرِ الْوَقْتِ : অর্থাৎ যদি তিনদিনের কমে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তবে সে নামাজকে মোস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্ব করবে। কেননা, দ্বিতীয়বার রক্ত আসার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি তার নামাজ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তবে সে গোসল ব্যতীত শুধু অজু করেই নামাজ আদায় করে নেবে। কেননা, তা ইস্তিহাজার রক্ত; হায়েজের রক্ত নয়। আর

যদি তার এর পূর্বে কিংবা পরে রক্ত আসে তবে একে হায়েজ বলা হবে এবং এ طُهْر - فَاصِلْ [দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী] হবে না, তবে এখানে সহবাসের ক্ষেত্রে সতর্কতা স্বরূপ এর থেকে বেঁচে থাকা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্ভরযোগ্য কোনো সুরত সামনে আসবে।

قَوْلُهُ فَبِمُضِيِّ الْعَشَرَةِ يُحْكَمُ الخ : অর্থাৎ যে মহিলার রক্ত দশদিন কিংবা এর চেয়ে বেশি সময়ে বন্ধ হয়, তাকে শুধু দশদিন অতিবাহিত হওয়ার দ্বারাই পবিত্রতার হুকুম দেওয়া হবে। অতএব, এখন তার সাথে সহবাস করাও বৈধ এবং তার উপর গোসল করাও ওয়াজিব। কেননা, হায়েজ দশদিনের চেয়ে বেশি হয় না, তাই দশদিনের অতিরিক্ত রক্ত ইস্তিহাজা হবে।

قَوْلُهُ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ : অর্থাৎ যখন সে দ্বিতীয় দিন পবিত্র হয়ে গেছে তখন সে শুধু অজু করে নামাজ পড়বে। কেননা, যে রক্ত তিনদিনের চেয়ে কম তা ইস্তিহাজার রক্ত। তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়; বরং সে অজু করে নামাজ আদায় করবে।

قَوْلُهُ اِغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ : অর্থাৎ চতুর্থ দিন শুধু অজু করে নামাজ আদায় করা যথেষ্ট নয়; বরং তাকে গোসল করতে হবে। কেননা, তার রক্ত তিনদিন হয়ে গেছে, যা হায়েজের সর্বনিম্ন মুদ্দত। এখন একে ইস্তিহাজা বলা হবে না।

قَوْلُهُ هٰكَذَا اِلَى الْعَشَرَةِ : অর্থাৎ যেদিন রক্ত দেখবে সেদিন নামাজ-রোজা বর্জন করবে, আর যেদিন সে পবিত্র হয়ে যায় সেদিন গোসল করে নামাজ পড়বে এবং রোজা রাখবে। **প্রশ্ন :** এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এটি পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপন্থি। কেননা, পূর্বের আলোচনায় ছিল, যেহেতু পনেরো দিনের কমে طُهْر - فَاصِلْ হয় না, তাই উল্লিখিত সুরতে এসব দিবস হায়েজের হবে। একদিনের طُهْر হয় না। **উত্তর :** এর উত্তর হচ্ছে, পূর্বোল্লিখিত আলোচনা ছিল প্রথম হায়েজগ্রস্ত মহিলার ক্ষেত্রে। আর এ আলোচনা হচ্ছে مُعْتَادَة [অভ্যাসগত] মহিলার ক্ষেত্রে। তা ছাড়া পূর্বের আলোচনা হচ্ছে, জমহুর ওলামায়ে কেরামের পছন্দনীয় মাযহাব এবং এটি হচ্ছে কোনো একজন ফকীহের রেওয়ায়েত বা বর্ণনা।

وَاَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا حَدَّ لِاَكْثَرِهٖ اِلَّا لِنَصْبِ الْعَادَةِ فَاِنَّ اَكْثَرَ الطُّهْرِ مُقَدَّرٌ فِىْ حَقِّهٖ ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِىْ تَقْدِيْرِ مُدَّتِهٖ وَالْاَصَحُّ اَنَّهٗ مُقَدَّرٌ بِسِتَّةِ اَشْهُرٍ اِلَّا سَاعَةً لِاَنَّ الْعَادَةَ نُقْصَانُ طُهْرِ غَيْرِ الْحَامِلِ عَنْ طُهْرِ الْحَامِلِ وَاَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ اَشْهُرٍ فَانْتَقَصَ عَنْ هٰذَا بِشَيْءٍ وَهُوَ السَّاعَةُ صُوْرَتُهٗ مُبْتَدَأَةٌ رَأَتْ عَشَرَةَ اَيَّامٍ دَمًا وَسِتَّةَ اَشْهُرٍ طُهْرًا ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ تَنْقَضِىْ عِدَّتُهَا بِتِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا اِلَّا ثَلٰثَ سَاعَاتٍ لِاَنَّا نَحْتَاجُ اِلٰى ثَلٰثِ حَيْضٍ كُلُّ حَيْضٍ عَشَرَةُ اَيَّامٍ وَاِلٰى ثَلٰثَةِ اَطْهَارٍ كُلُّ طُهْرٍ سِتَّةُ اَشْهُرٍ اِلَّا سَاعَةً ـ

অনুবাদ : তুহর (طُهْر) -এর সর্বনিম্ন মুদ্দত হচ্ছে পনেরো দিন এবং সর্বোচ্চ মুদ্দতের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। তবে অভ্যাস হয়ে যাওয়ার দ্বারা [সর্বোচ্চ মুদ্দত নির্ধারিত হয়]। কেননা, এ ক্ষেত্রে طُهْر -এর সর্বোচ্চ মুদ্দত নির্ধারিত। অতঃপর ফুকাহায়ে কেরাম طُهْر -এর সর্বোচ্চ মুদ্দত নির্ধারণ করা নিয়ে মতানৈক্য করেন। বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, [তুহরের সর্বোচ্চ মুদ্দত] এক ঘণ্টা কম ছয় মাস নির্ধারিত। কেননা, নিয়ম হলো– অন্তঃসত্ত্বাহীন মহিলার তুহর (طُهْر) অন্তঃসত্ত্বা মহিলার তুহর (طُهْر)-এর চেয়ে কম হয়। আর গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মুদ্দত হচ্ছে ছয় মাস। অতএব অন্তঃসত্ত্বাহীন মহিলার তুহর (طُهْر) -এর চেয়ে কিছু কম হবে– তা হচ্ছে এক ঘণ্টা। এর সুরত হচ্ছে, নতুন হায়েজগ্রস্ত মহিলা দশদিন রক্ত দেখেছে এবং ছয় মাস طُهْر দেখেছে। অতঃপর তার রক্ত স্থায়ী হয়ে গেছে, তবে তার ইদ্দত তিন ঘণ্টা কম নয় মাসে শেষ হবে। কেননা, ইদ্দত শেষ হওয়ার হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা তিনটি হায়েজের প্রতি মুখাপেক্ষী। [যার] প্রত্যেক হায়েজ দশদিন করে এবং [যা] তিন طُهْر -এর দিকে [মুখাপেক্ষী, যার] প্রত্যেক طُهْر এক ঘণ্টা কম ছয় মাস করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ الخ :

তুহর (طُهْر)-এর সর্বনিম্ন মুদ্দত : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) লিখেন যে, "তুহর (طُهْر) -এর সর্বনিম্ন মুদ্দত হচ্ছে পনেরো দিন।" হিদায়া গ্রন্থকার (র.) লিখেন, তাবেয়ী হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র.) থেকে এমনই বর্ণিত আছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এ কথা সাহাবীর নিকট শুনেছেন। আর সাহাবী শুনেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে। কারণ, এটি হচ্ছে পরিমাণগত ব্যাপার। আর শরিয়তের ক্ষেত্রে পরিমাণগত ব্যাপার শুনে শুনেই জানা যায়। এখানে কিয়াসের কোনো দখল নেই। শায়খ আবূ মানসূর মাতুরীদী (র.) طُهْر -এর সর্বনিম্ন মেয়াদ পনেরো দিন হওয়ার উপর দলিল পেশ করেছেন এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা নাবালেগা এবং বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য এক মাস সময়কে তুহর এবং হায়েজ উভয়ের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। আর মূলনীতি হলো, কোনো জিনিসকে যখন দুটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন একে উভয়ের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে বিভক্ত করে দেওয়া হয়। এ মূলনীতি অনুযায়ী মাসের অর্ধেক সময় তুহর এবং অর্ধেক সময় হায়েজ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হায়েজ অর্ধেক মাসের চেয়ে কম হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু দলিল বিদ্যমান, সেহেতু হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদ অর্ধেক মাসের চেয়ে কম হলেও তুহর -এর সর্বনিম্ন মেয়াদ নীতি মোতাবেক অর্ধেক মাসই রয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَلَاحَدَّ لِاَكْثَرِهِ : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) লেখেন যে, طُهْر -এর সর্বোচ্চ মেয়াদের নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই। অতএব যতদিন যাবৎ তুহর দেখবে ততদিন নামাজ-রোজা চালিয়ে যেতে থাকবে। কোনো মহিলার যদি এমন طُهْر সারা জীবন চলতে থাকে তবুও সে নামাজ-রোজা চালিয়ে যাবে। কারণ, কখনো কখনো তুহরের মেয়াদ এক বৎসর দুই বৎসরও দীর্ঘ হয়ে যায়; বরং এর চেয়ে অধিক হয়ে থাকে। এ সুরতে যদি ইদ্দত পালনের বিষয় আসে তবে তার অভ্যাস অনুযায়ী এর মেয়াদ নির্ধারণ করে নেবে।

قَوْلُهُ وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ مُقَدَّرٌ الخ : যদি কোনো স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তবে এমতাবস্থায় ওলামায়ে কেরামের মতে, তার জন্য কোনো না কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করা হবে। আর যদি মহিলার রক্তস্রাবের সূচনাই হয় অব্যাহতভাবে অর্থাৎ জীবনের প্রথম রক্ত আসা শুরু হওয়ার পর আর বন্ধ হয় না, তবে সে বালেগাই হয়েছে ইস্তিহাজার সাথে। এ ধরনের স্ত্রীলোকের জন্য প্রত্যেক মাসের দশদিনকে হায়েজ বলে নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আর তার অবশিষ্ট দিনগুলো হলো তুহর।

আর যদি প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার তিনদিন রক্ত আসার পর বন্ধ হয়ে যায়–একাধারে এক বছর দুই বছর যাবৎ আর রক্ত না আসে এবং এরপর আবার রক্ত শুরু হয়ে তা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তবে তার প্রথম তিনদিনকে হায়েজ বলা হবে, আর রক্তবিহীন এক বছর কিংবা দুই বছরকে বলা হবে তুহর। সুতরাং এমন মহিলাকে যদি তার স্বামী তালাক দিয়ে দেয় তবে তার ইদ্দত হবে তিন বা ছয় বছর নয় দিন।

মুহাম্মদ ইবনে শুজা' (র.) বলেন, উক্ত মহিলার তুহর হবে উনিশ দিন। কারণ, প্রত্যেক মাসে হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদ দশদিন, আর বাকিটা হয় তুহর। যদি মাসের দশদিনকে হায়েজের জন্য ধরা হয় তবে তুহরের জন্য সন্দেহাতীতভাবে উনিশ দিন নির্দিষ্ট থাকাটাই যুক্তিযুক্ত। আর মুহাম্মদ ইবনে সালামা (র.) বলেন, এ মহিলার তুহর সাতাশ দিন। কারণ, হায়েজের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিনদিন। অতএব অবশিষ্ট সাতাশ দিন তুহরের জন্যই নির্ধারিত থাকবে।

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-মাদীনী (র.) বলেন, এমন মহিলার তুহর হবে এক ঘণ্টা কম ছয় মাস। কারণ, হায়েজ না আসার সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে ছয় মাস, অর্থাৎ গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে ছয় মাস। আর মূলনীতি হলো, তুহরের মেয়াদ হামলের মেয়াদের চেয়ে কম হয়ে থাকে। এ কারণে আমরা এক ঘণ্টা কম ধরেছি। এ অভিমতকে শারেহ (র.) বিশুদ্ধ বলেছেন। এ মত অনুযায়ী উক্ত মহিলার ইদ্দত তিন ঘণ্টা কম উনিশ মাস হবে। এর রূপ হবে এই যে, এমন মহিলাকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হয়েছে, তাই তার ইদ্দত হবে তিন তুহর এবং তিন হায়েজ। আর তার এক তুহর হচ্ছে এক ঘণ্টা কম ছয় মাস এবং এক হায়েজ হচ্ছে দশদিন। সুতরাং সব মিলিয়ে তিন ঘণ্টা কম উনিশ মাস হবে।

হাকীম শহীদ (র.) বলেন, এ মহিলার তুহর দুই মাস। ইনায়া, কিফায়া এবং ফাতহুল কাদীর প্রভৃতি কিতাবের লেখকগণ উল্লেখ করেছেন, হাকীমের মতের উপরই ফতোয়া।

وَمَا نَقَصَ عَنْ اَقَلِّ الْحَيْضِ اَيِ الدَّمُ النَّاقِصُ عَنِ الثَّلٰثَةِ اَوْ زَادَ عَلٰى اَكْثَرِهٖ اَىْ عَلٰى الْعَشَرَةِ اَوْ عَلٰى اَكْثَرِ النِّفَاسِ وَهُوَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا اَوْ عَلٰى عَادَةٍ عُرِفَتْ لِحَيْضٍ وَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ اَوْ نِفَاسٍ وَجَاوَزَ الْاَرْبَعِيْنَ اَىْ اِذَا كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ فِى الْحَيْضِ وَفَرَضْنَاهَا سَبْعَةً فَرَأَتِ الدَّمَ اثْنَىْ عَشَرَ يَوْمًا فَخَمْسَةُ اَيَّامٍ بَعْدَ السَّبْعَةِ اِسْتِحَاضَةٌ وَاِذَا كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ فِى النِّفَاسِ وَهِىَ ثَلٰثُوْنَ يَوْمًا مَثَلًا فَرَأَتِ الدَّمَ خَمْسِيْنَ يَوْمًا فَالْعِشْرُوْنَ الَّتِىْ بَعْدَ الثَّلٰثِيْنَ اِسْتِحَاضَةٌ هٰذَا حُكْمُ الْمُعْتَادَةِ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُّبَيِّنَ حُكْمَ الْمُبْتَدَأَةِ فَقَالَ اَوْ عَلٰى عَشَرَةٍ حَيْضٍ مَنْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً اَوْ عَلٰى اَرْبَعِيْنَ نِفَاسِهَا اَلْمُبْتَدَأَةُ الَّتِىْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً حَيْضُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَشَرَةُ اَيَّامٍ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا اِسْتِحَاضَةٌ فَيَكُوْنُ طُهْرُهَا عِشْرِيْنَ يَوْمًا ـ

অনুবাদ : যে রক্ত হায়েজের সর্বনিম্ন মেয়াদ [তিনদিন] থেকে কম হয় কিংবা হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদ [তথা দশদিন] থেকে অধিক হয় কিংবা নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ তথা চল্লিশ দিনের চেয়ে অধিক হয় কিংবা হায়েজের নির্ধারিত অভ্যাসের চেয়ে অধিক হয় এবং এ অধিক অংশ রক্ত দশদিনের চেয়ে অধিক হয়ে যায় কিংবা নিফাসের নির্ধারিত অভ্যাসের চেয়ে অধিক হয় এবং তা চল্লিশ দিনের চেয়ে অধিক হয়ে যায়– অর্থাৎ যখন হায়েজে মহিলার অভ্যাস হবে, আমরা ধরে নিচ্ছি যেমন– মহিলার অভ্যাস হচ্ছে দশ দিন হায়েজ হওয়া– অতএব, বারো দিন রক্ত দেখেছে, তবে সাতদিনের পর যে পাঁচদিন রক্ত দেখেছে, তা ইস্তিহাজার রক্ত এবং যখন নিফাসে মহিলার অভ্যাস হবে; যেমন– তার ত্রিশ দিন রক্ত দেখা অভ্যাস, আর সে পঞ্চাশ দিন রক্ত দেখেছে, তবে ঐ বিশ দিন যা ত্রিশ দিনের পর, তা ইস্তিহাজার রক্ত। এটি ঐ মহিলার হুকুম যার অভ্যাস রয়েছে। অতঃপর مُبْتَدَأَة [যে সবেমাত্র হায়েজের মাধ্যমে বালেগা হয়েছে]-এর হুকুম বর্ণনা করার লক্ষ্যে গ্রন্থকার বলেন, কিংবা যে মহিলা মুস্তাহাজা হয়ে বালেগা হয়েছে, তার রক্ত যদি দশদিনের অধিক হয় কিংবা প্রথম নিফাসগ্রস্তের রক্ত চল্লিশ দিনের বেশি হয়, তবে তার হায়েজ প্রত্যেক মাসে দশদিন হবে এবং এর অতিরিক্ত রক্ত ইস্তিহাজা হবে। আর তার তুহর হবে বিশ দিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَا نَقَصَ عَنْ اَقَلِّ الْحَيْضِ الخ :

ইস্তিহাজার বিবরণ : এখান থেকে গ্রন্থকার ইস্তিহাজার হুকুম বর্ণনা করতে শুরু করেছেন। কেননা, তিনি পূর্বে উল্লেখ করেছিলেন যে, মহিলার যোনি থেকে নির্গত রক্ত তিন প্রকার– ১. হায়েজ, ২. নিফাস, ৩. ইস্তিহাজা। তন্মধ্যে গ্রন্থকার হায়েজের আলোচনা থেকে ফারিগ হয়েছেন। অতঃপর ইস্তিহাজার আলোচনা শুরু করেছেন। নিফাসের আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

ইতঃপূর্বে আমরা হায়েজ, নিফাস ও ইস্তিহাজার সংজ্ঞা উল্লেখ করেছি, তাই এখানে আর ইস্তিহাজার সংজ্ঞা উল্লেখ করছি না- সরাসরি আমরা মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি। গ্রন্থকার বলেন, হায়েজের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিনদিনের চেয়ে কম যে রক্ত প্রবাহিত হবে কিংবা হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদ দশদিনের চেয়ে বেশি যে রক্ত প্রবাহিত হবে কিংবা হায়েজের নির্ধারিত অভ্যাসের চেয়ে বেশি যে রক্ত প্রবাহিত এবং তা দশ দিনের চেয়ে বেশি হয় কিংবা যে রক্ত নিফাসের নির্ধারিত অভ্যাসের চেয়ে বেশি হয় এবং তা চল্লিশ দিনেরও অধিক হয়, সেসব রক্ত ইস্তিহাজার। অনুরূপ যে মহিলা ইস্তিহাজার মাধ্যমেই বালেগা হয়- তার প্রত্যেক মাসের প্রথম দশদিন হায়েজ এবং বাকি সব হচ্ছে ইস্তিহাজা। অনুরূপ প্রথম নিফাসগ্রস্ত মহিলার যদি চল্লিশ দিনের চেয়ে বেশি রক্ত আসে, তবে এ অতিরিক্ত রক্ত ইস্তিহাজা হবে।

قَوْلُهُ أَوْ عَلٰى عَادَةٍ عُرِفَتْ لِحَيْضٍ : একে عَلٰى اَكْثَرِهِ-এর উপর عَطْف করা হয়েছে। অর্থাৎ যে রক্ত তার অভ্যাসের চেয়ে বেশি হয় এবং তা দশদিনের চেয়ে অতিরিক্ত হয়; যেমন- কারো অভ্যাস হলো সাতদিন হায়েজ হওয়া। আর যদি কোনো মাসে সে বারো দিন রক্ত দেখে তবে তার সাতদিনের অতিরিক্ত পাঁচদিন ইস্তিহাজা হবে। কেননা, তা হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদকেও অতিক্রম করে ফেলেছে। হ্যাঁ যদি সাতকে অতিক্রম করে নয় দিনে শেষ হয়ে যায় তবে তার পূর্ণ নয় দিনই হায়েজ হবে। কেননা, তার হায়েজের মেয়াদ এখনো বাকি রয়েছে। তাই তাকে বলা হবে যে, সম্ভবত তার অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে গেছে।

অনুরূপ যদি নিফাসের ক্ষেত্রে কারো ত্রিশ দিন রক্ত আসার অভ্যাস হয়, কিন্তু একবার ত্রিশকে অতিক্রম করে পঞ্চাশের মধ্যে চলে গেছে তবে ত্রিশের পর পূর্ণ বিশ দিনই তার ইস্তিহাজা হবে। কেননা, তা নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশকে অতিক্রম করে পঞ্চাশে চলে গেছে। আর যদি ত্রিশকে অতিক্রম করে ঊনচল্লিশেও গিয়ে বন্ধ হয় তবে এসবই তার নিফাস হবে। কেননা, তা এখনো নিফাসের মেয়াদেই রয়ে গেছে।

قَوْلُهُ مَنْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً : অর্থাৎ যে মহিলা ইস্তিহাজার মাধ্যমে বালেগা হয়। ইস্তিহাজার মাধ্যমে বালেগা হওয়ার সুরত হচ্ছে, তার প্রথম হায়েজ দশদিনকে অতিক্রম করে ফেলেছে। তবে তার দশ দিন হবে হায়েজ এবং এর অতিরিক্ত দিনগুলো হবে ইস্তিহাজা। এ مُبْتَدَأَةٌ মহিলার তিনদিনের কম সময় রক্ত প্রবাহিত হওয়াও ইস্তিহাজা।

قَوْلُهُ أَوْ عَلٰى أَرْبَعِيْنَ نِفَاسُهَا : যে মহিলার ইতঃপূর্বে বাচ্চা হয়নি, এখন সর্বপ্রথম বাচ্চা হওয়ার পর যদি রক্ত অব্যাহতভাবে নির্গত হতে থাকে এবং তা চল্লিশ দিনেরও বেশি হয়ে যায়, তবে চল্লিশ দিনের অধিক অংশ ইস্তিহাজার হবে এবং চল্লিশ দিন হবে নিফাসের। আর যদি চল্লিশ থেকে কম হয়, তবে পুরোটাই নিফাস হবে।

قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَشَرَةُ أَيَّامٍ : যে মহিলা ইস্তিহাজার মাধ্যমে বালেগা হয়েছে, তার প্রত্যেক মাসের প্রথম দশদিন হায়েজ হবে এবং এর অতিরিক্ত দিনগুলো হবে ইস্তিহাজার। কেননা, তার নির্দিষ্ট কোনো অভ্যাস নেই, যার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা দেওয়া হবে। তাই হায়েজের চেয়ে অতিরিক্ত দিনগুলো নিঃসন্দেহে হায়েজ নয়; বরং ইস্তিহাজা। কেননা, এসব দিবসের মাঝে হায়েজ হওয়ার মতো যোগ্যতা নেই। আর যেহেতু মহিলাদের প্রত্যেক মাসেই হায়েজ আসে তাই দশদিন তাদের হায়েজের জন্য ধরে বাকি বিশ দিন طُهْر -এর জন্য হবে।

وَأَمَّا النِّفَاسُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ فِيْهِ عَادَةٌ فَنِفَاسُهَا أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَالزَّائِدُ عَلَيْهَا اِسْتِحَاضَةٌ فَقَوْلُهُ حَيْضُ مَنْ بَلَغَتْ بِالْجَرِّ عَطْفُ بَيَانٍ لِعَشَرَةٍ وَقَوْلُهُ نِفَاسُهَا بِالْجَرِّ عَطْفُ بَيَانٍ لِأَرْبَعِيْنَ أَوْ مَا رَأَتْ حَامِلٌ فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ أَيِ الدَّمُ الَّذِيْ تَرَاهُ الْحَامِلُ لَيْسَ بِحَيْضٍ بَلْ هُوَ اِسْتِحَاضَةٌ فَقَوْلُهُ وَمَا نَقَصَ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ خَبَرُهُ ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ الْاِسْتِحَاضَةِ فَقَالَ لَا تَمْنَعُ صَلٰوةً وَصَوْمًا وَ وَطْيًا وَمَنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ وَقْتُ فَرْضٍ إِلَّا وَبِهِ حَدَثٌ أَيِ الْحَدَثُ الَّذِيْ أُبْتُلِيَ بِهِ مِنْ اِسْتِحَاضَةٍ أَوْ رُعَافٍ أَوْ نَحْوِهِمَا يَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ فَرْضٍ اِحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) فَإِنَّ عِنْدَهُ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ فَرْضٍ وَيُصَلِّي النَّوَافِلَ بِتَبْعِيَّةِ الْفَرْضِ.

অনুবাদ : কিন্তু নিফাসের ক্ষেত্রে যখন মহিলার অভ্যাস না হবে তখন তার নিফাস চল্লিশ দিন হবে। আর এর অতিরিক্ত রক্ত ইস্তিহাজা হবে। অতএব, গ্রন্থকারের কথা حَيْضُ مَنْ بَلَغَتْ যের দ্বারা পড়া হবে। কেননা, এটি عَشَرَة -এর عَطْف بَيَانْ হয়েছে। অনুরূপ গ্রন্থকারের কথা نِفَاسُهَا ও যের দ্বারা পড়া হবে। কেননা, তা أَرْبَعِيْنَ -এর عَطْف بَيَانْ হয়েছে। কিংবা গর্ভবতী মহিলা যে রক্ত দেখে তা ইস্তিহাজার রক্ত। অর্থাৎ ঐ রক্ত যা গর্ভবতী নারী দেখে– তা হায়েজ নয়; বরং ইস্তিহাজা। অতএব গ্রন্থকারের কথা مَانَقَصَ মুবতাদা এবং তাঁর কথা فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ হচ্ছে খবর। অতঃপর গ্রন্থকার ইস্তিহাজার হুকুম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইস্তিহাজা নামাজ, রোজা ও সহবাস থেকে বারণ করে না। আর যে ব্যক্তি এমন যে, হদস [অপবিত্র] ব্যতীত তার কোনো ফরজ নামাজের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয় না তথা হদস যা দ্বারা সে আক্রান্ত। যেমন– ইস্তিহাজা, নাকসীর কিংবা অনুরূপ কিছু তবে সে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের ওয়াক্তের জন্য অজু করবে। এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত থেকে বিরত থাকা হয়েছে। কেননা, তাঁর নিকট প্রত্যেক ফরজ নামাজের জন্য অজু করবে এবং উক্ত অজু দ্বারা ফরজ নামাজের অনুসরণ করত নফল নামাজও পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا النِّفَاسُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الخ : নিফাসগ্রস্ত মহিলার কতবার সন্তান প্রসব হওয়ার দ্বারা সে مُعْتَادَة মহিলা হিসেবে পরিগণিত হবে, এ সম্পর্কে 'জামেউ'র রুমূয' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, তরফাইন (র.) -এর নিকট মহিলার দুবার সন্তান প্রসব হয়ে উভয়বার তার নির্দিষ্ট সময় পরিমাণ রক্তক্ষরণের মাধ্যমে সে مُعْتَادَة হবে; এর কমে নয়। কেননা, عَادَةٌ শব্দটি عَوْدٌ শব্দ থেকে উদ্‌গত। অর্থ– ফিরে আসা, বারবার আসা অর্থাৎ যা প্রথমে ছিল তা দ্বিতীয়বার ফিরে আসা, তবেই তার عَادَةٌ

[অভ্যাস] হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট একবারের মাধ্যমেই অভ্যাস হয়ে যাবে এবং এরই উপর ফতোয়া।

قَوْلُهُ وَمَا رَأَتْ حَامِلٌ فَهُوَ الخ : অর্থাৎ যে মহিলার পেটে বাচ্চা রয়েছে এবং এ গর্ভাবস্থার দিনগুলোতে সে রক্ত দেখে তবে এটি জরায়ুর রক্ত নয় যে, তা হায়েজ হবে। এ কারণে যে, গর্ভাবস্থার দিনগুলোতে জরায়ুর মুখ বন্ধ হয়ে যায়; বরং তা কোনো রগ ফেটে যাওয়ার রক্ত, তাই তা ইস্তিহাজা হবে। বিভিন্ন রেওয়াতে এর প্রমাণ বহন করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গর্ভবতী মহিলাদের সাথে বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা থেকে বারণ করেছেন। আর অগর্ভবতী মহিলাদের সাথে হায়েজ শেষ হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা থেকে বারণ করেছেন। এ হুকুম এজন্য যে, যেন জরায়ু বাচ্চা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। অতএব হায়েজকে জরায়ু বাচ্চাশূন্য হওয়ার নিদর্শন বানানো হয়েছে। এর দ্বারা জানা হয়ে গেছে যে, গর্ভবতী মহিলার হায়েজ আসে না। আর যদি সে রক্ত দেখেও তবে তা ইস্তিহাজার; হায়েজের নয়।

❖ **ইস্তিহাজার হুকুম** : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) ইস্তিহাজার হুকুম বর্ণনা করত উল্লেখ করেন যে, মুস্তাহাজা মহিলার জন্য নামাজ, রোজা ও সহবাস নিষিদ্ধ নয়; বরং সে রোজা রাখবে, তার সাথে সহবাসও করবে এবং সে প্রত্যেক ফরজ ওয়াক্তের জন্য অজু করে নামাজ আদায় করবে। অনুরূপ যে ব্যক্তির কোনো ফরজ ওয়াক্ত হদসবিহীন যায় না; যেমন– নাকসীর কিংবা সর্বদা পেশাবের ফোঁটা টপ টপ করে পড়তে থাকে ইত্যাদি। সেও প্রত্যেক ফরজ নামাজের ওয়াক্তের জন্য অজু করবে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– اِجْتَنِبِي الصَّلَاةَ اَيَّامَ حَيْضِكِ ثُمَّ اغْسِلِيْ وَصَلِّيْ وَتَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ অর্থাৎ "হায়েজের দিবসগুলোতে তুমি নামাজ থেকে বিরত থাক, অতঃপর গোসল করে নামাজ পড় এবং প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু কর।" –[আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ]

অন্য এক বর্ণনায় অতিরিক্ত অংশ রয়েছে যে, "যদিও তার রক্ত বিছানায় টপকে পড়তে থাকে।" অপর এক বর্ণনায় আছে যে, "হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রা.) মুস্তাহাজা অবস্থায় থাকতেন। আর তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতেন।"

قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ وَقْتُ فَرْضٍ الخ :

অবিরত মুহদিস প্রত্যেক ফরজ ওয়াক্তের জন্য অজু করবে : অর্থাৎ যে সকল লোকের কোনো ফরজ নামাজের ওয়াক্ত হদসবিহীন অতিবাহিত হয় না; যেমন– কারো সর্বদা প্রস্রাবের ফোঁটা টপটপ করে পড়ে কিংবা কারো নাকসীর কিংবা মুস্তাহাজা মহিলা– এ সকল লোকের হুকুম হচ্ছে, তারা প্রত্যেক ফরজ ওয়াক্তের জন্য অজু করে নামাজ পড়ে নেবে। এটি আমাদের তিন ইমামের মতে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, এ সকল লোক প্রত্যেক ফরজ নামাজের জন্য অজু করবে। তাঁর দলিল হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ "মুস্তাহাজা মহিলা প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে।" –[আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ]

তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, উক্ত ফরজ নামাজের অনুসরণ করত অবিরত মুহদিস ব্যক্তি সে অজু দ্বারাই নফল ও সুন্নত নামাজ পড়তে পারবে, কিন্তু একাধিক ফরজ নামাজ পড়তে পারবে না।

আমাদের দলিল হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুস্তাহাজা মহিলাকে বলেছেন–

تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتّٰى يَجِيْءَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ .

অর্থাৎ "তুমি ঐ ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে।" –[বুখারী শরীফ]

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত সে প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে। অর্থাৎ এক ওয়াক্তে একবার অজু করবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন তাতে উল্লিখিত لِكُلِّ -এর لَامْ অক্ষরটি لِوَقْتِ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَيُصَلِّيْ بِهِ فِيْهِ مَا شَاءَ مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَيَنْقُضُهُ خُرُوْجُ الْوَقْتِ لَا دُخُوْلُهُ اِحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ زُفَرَ (رحـ) فَاِنَّ النَّاقِضَ عِنْدَهُ دُخُوْلُ الْوَقْتِ وَعَنْ قَوْلِ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) فَاِنَّ النَّاقِضَ عِنْدَهُ كِلَاهُمَا فَيُصَلِّيْ مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الزَّوَالِ اِلٰى اٰخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ خِلَافًا لِاَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَ زُفَرَ (رحـ) فَاِنَّهُ حَصَلَ دُخُوْلُ الْوَقْتِ لَا الْخُرُوْجُ لَا بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَهُ اَيْ مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ لٰكِنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) فَاِنَّهُ وُجِدَ النَّاقِضُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَهُوَ الْخُرُوْجُ لَا عِنْدَ زُفَرَ (رحـ) فَاِنَّ النَّاقِضَ عِنْدَهُ الدُّخُوْلُ وَلَمْ يَحْصُلْ .

অনুবাদ : উক্ত অজু দ্বারা সে ওয়াক্তের মধ্যে ফরজ, নফল যা ইচ্ছা পড়বে। [সেসব মাজুর লোকদের] অজু ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার দ্বারা ভেঙ্গে যায়; [পরবর্তী] ওয়াক্ত আসার দ্বারা নয়। এতে ইমাম জুফার (র.)-এর অভিমত থেকে বিরত থাকা হয়েছে। কেননা, তাঁর নিকট [পরবর্তী] ওয়াক্তের আগমন অজু ভঙ্গের কারণ। [এতে] ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত থেকেও [বিরত থাকা হয়েছে]। কেননা, তাঁর নিকট [ওয়াক্তের শেষ হওয়া ও ওয়াক্তের আগমন] উভয়টি অজু ভঙ্গের কারণ। অতএব, যে ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের পূর্বে অজু করেছে সে জোহরের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত নামাজ পড়তে পারবে। এতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও যুফার (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা, এ সুরতে [পরবর্তী] ওয়াক্তের আগমন পাওয়া গেছে; কিন্তু [পূর্ববর্তী] ওয়াক্তের শেষ হওয়া পাওয়া যায়নি। যে [মাজুর] ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে অজু করেছে সে সূর্যোদয়ের পর নামাজ পড়তে পারবে না। অর্থাৎ যে সুবহে সাদেকের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে অজু করেছে সে উক্ত অজু দ্বারা সূর্যোদয়ের পর নামাজ পড়বে না। এতে ইমাম যুফার (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা, [এ সুরতে] আমাদের নিকট অজু ভঙ্গের কারণ পাওয়া গেছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট ওয়াক্তের শেষ হওয়া পাওয়া গেছে। ইমাম যুফার (র.)-এর নিকট অজু ভঙ্গের কারণ পাওয়া যায়নি। কেননা, তাঁর নিকট অজু ভঙ্গের কারণ হচ্ছে পরবর্তী ওয়াক্তের আগমন, আর তা এখানে পাওয়া যায়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُصَلِّيْ بِهِ فِيْهِ مَا شَاءَ مِنْ الخ :

অবিরত মুহদিসের এক ওয়াক্তে একাধিক ফরজ নামাজ আদায় : যে ব্যক্তির কোনো ফরজ ওয়াক্ত হদসবিহীন অতিবাহিত হয় না, সে এক অজু দ্বারা ওয়াক্তের মধ্যে একাধিক ফরজ নামাজ আদায় করতে পারবে কিনা এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আহনাফের মতে, এ ধরনের মাজুর ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য আলাদা অজু করবে। তারপর সে অজু দ্বারা যত ইচ্ছা নামাজ পড়বে। চাই সে নামাজ ফরজ, নফল, ওয়াজিব বা মানত যে নামাজই হোক না কেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে। অর্থাৎ এ ধরনের মাজুর ব্যক্তি এক অজু দ্বারা এক নামাজ আদায় করবে; একাধিক নামাজ আদায় করতে পারবে না।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ অর্থাৎ "মুস্তাহাযা মহিলা প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে।" এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ ধরনের মাজুর লোক প্রত্যেক ফরজ নামাজের জন্য অজু করবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যৌক্তিক দলিল হলো, মাজুরের তাহারাতের গ্রহণযোগ্যতা হলো ফরজ আদায়ের জন্য। তাই ফরজ আদায় থেকে অবসর হওয়ার সাথে সাথে তাহারাত ভেঙ্গে যাবে।

আহনাফের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ অর্থাৎ "মুস্তাহাজা নারী প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য অজু করবে।" প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য একবার অজু করার মাসআলা এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। অন্য একটি হাদীস যা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) সূত্রে বর্ণিত– اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِيْ حُبَيْشٍ تَوَضَّئِيْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশকে বলেছেন, প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য অজু করবে।"

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের খণ্ডন হচ্ছে, উক্ত হাদীসে উল্লিখিত لِكُلِّ صَلَاةٍ -এর لَامٌ অক্ষরটি ওয়াক্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাজুর লোকদের অজু ভঙ্গের কারণ : এ ধরনের মাজুর লোকদের অজু ভঙ্গের কারণ সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : তরফাইন (র.) বলেন, চলতি ওয়াক্ত শেষ হওয়ার দ্বারা উক্ত মাজুরের অজু ভেঙ্গে যাবে; পরের ওয়াক্ত আসার দ্বারা নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, চলতি ওয়াক্তের শেষ হওয়া ও পরবর্তী ওয়াক্তের আগমন উভয়টি অজু ভঙ্গের কারণ। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ ধরনের মাজুর লোকদের অজু ভঙ্গের কারণ হচ্ছে পরবর্তী ওয়াক্তের আগমন।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, এ ধরনের মাজুর লোকদের তাহারাত ধর্তব্য প্রয়োজন তথা নামাজ আদায়ের জন্য, আর ওয়াক্ত আসার আগে এর প্রয়োজনই দেখা দেয় না। অতএব, পূর্বের ওয়াক্ত ধর্তব্য নয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলেল মতোই। তবে তাঁর দলিলের মধ্যে অতিরিক্ত কথা হচ্ছে, সময়ের মধ্যে প্রয়োজন দেখা দেয়; সময়ের পূর্বে নয়, সময়ের পরেও নয়। তাই ওয়াক্ত ব্যতীত তাহারাত ধর্তব্য নয়। এজন্য ওয়াক্তের আগমন (دُخُوْل) ও শেষ হওয়া (خُرُوْج) উভয়টিই অজু ভঙ্গের কারণ বলে পরিগণিত হবে।

তরফাইন (র.)-এর দলিল হলো, ওয়াক্তের পূর্বে তাহারাতের প্রয়োজন এজন্য যে, যেন প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা যায়। আর ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া (خُرُوْج) মূলত প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ার দলিল। অতএব, যখন তার ওয়াক্ত শেষ হয়ে নতুন ওয়াক্ত প্রবেশ করল তখন তার পূর্বের প্রয়োজন বাকি থাকেনি, তাই পরবর্তী ওয়াক্তের প্রবেশই অজু ভঙ্গের কারণ। তরফাইন (র.)-এর নিকট ওয়াক্ত (وَقْت) দ্বারা ফরজ ওয়াক্ত (وَقْت فَرِيْضَة) উদ্দেশ্য। সুতরাং যদি মাজুর ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের পূর্বে ঈদের নামাজ আদায় করে তবে সে ঐ অজু দ্বারাই জোহরের নামাজ আদায় করতে পারবে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। হিদায়া গ্রন্থে এমনই উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَيُصَلِّيْ مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الزَّوَالِ الخ : উক্ত ইবারত পূর্বোল্লিখিত মতানৈক্যের ফলাফলের ব্যাখ্যাস্বরূফ। সারাংশ হচ্ছে, যখন মাজুর ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের পূর্বে অজু করে তবে তরফাইন (র.)-এর নিকট উক্ত অজু দ্বারা জোহরের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত নামাজ পড়ার অনুমতি আছে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও যুফার (র.)-এর নিকট যখন জোহরের ওয়াক্ত প্রবেশ করবে তখন তার অজু ভেঙ্গে যাবে। তাই সে উক্ত অজু দ্বারা শুধু দ্বিপ্রহরের পূর্বেই নামাজ পড়বে; দ্বিপ্রহরের পরে নয়। কেননা, এতে পরের ওয়াক্ত অনুপ্রবেশ করেছে। আর তা তাঁদের নিকট অজু ভঙ্গের কারণ।

আর যদি মাজুর ব্যক্তি সুবহে সাদেক-এর পর সূর্যোদয়ের পূর্বে অজু করে তবে তার জন্য সূর্যোদয়ের পূর্বে যে-কোনো নামাজ ইচ্ছা পড়তে পারবে, কিন্তু সূর্যোদয়ের পরে নয়। কেননা, ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেছে, যা অজু ভঙ্গের কারণ। এ মাসআলা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকটও। কেননা, তাঁর মতে, ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়াও অজু ভঙ্গের কারণ। তবে ইমাম যুফার (র.)-এর নিকট সূর্যোদয়ের পরেও উক্ত অজু দ্বারা নামাজ আদায় করা জায়েজ। কেননা, তাঁর নিকট ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া অজু ভঙ্গের কারণ নয়।

قَوْلُهُ لٰكِنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الخ : অর্থাৎ গ্রন্থকারের– مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَهُ ব্যাপক যে, সে সুবহে সাদেকের পরে কিংবা পূর্বে অজু করবে। যদি সুবহে সাদেকের পরে অজু করে তবে এতে মতানৈক্য দেখা যায়। কেননা, যদি সুবহে সাদেকের পূর্বে অজু করে তবে সূর্যোদয়ের পরে সর্বসম্মতিক্রমে এ অজু দ্বারা নামাজ পড়া বৈধ হবে না। কারণ, ইমামত্রয়ের নিকট ওয়াক্ত শেষ হওয়া (خُرُوْج) পাওয়া গেছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট পরের ওয়াক্তের প্রবেশ (دُخُوْل) পাওয়া গেছে এবং ইমাম যুফার (র.)-এর নিকটও পরের ওয়াক্তের অনুপ্রবেশ পাওয়া গেছে। তবে প্রথম সুরতে ইমাম যুফার (র.)-এর নিকট সূর্যোদয়ের উক্ত অজু দ্বারা নামাজ আদায় করা বৈধ। কেননা, তাঁর নিকট ওয়াক্ত শেষ হওয়া (خُرُوْج) অজু ভঙ্গের কারণ নয়।

وَالنِّفَاسُ دَمٌ يُعَقِّبُ الْوَلَدَ وَلَا حَدَّ لِاَقَلِّهِ وَاَكْثَرُهُ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) اِذْ اَكْثَرُهُ سِتُّوْنَ يَوْمًا عِنْدَهُ وَهُوَ لِاُمِّ التَّوَامَيْنِ مِنَ الْاَوَّلِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رحـ) اَلتَّوأَمَانِ وَلَدَانِ مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ لَا يَكُوْنُ بَيْنَ وِلَادَتِهِمَا اَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ هُوَ سِتَّةُ اَشْهُرٍ وَانْقِضَاءُ الْعِدَّةِ مِنَ الْاٰخَرِ اِجْمَاعًا وَسَقْطٌ يُرٰى بَعْضُ خَلْقِهِ وَلَدٌ سَقْطٌ مُبْتَدَأٌ يُرٰى صِفَتُهُ وَ وَلَدٌ خَبَرُهُ فَتَصِيْرُ هِيَ بِهِ نُفَسَاءَ وَالْاَمَةُ اُمُّ الْوَلَدِ وَيَقَعُ الْمُعَلَّقُ بِالْوَلَدِ اَيْ اِذَا قَالَ اِنْ وَلَدْتِ فَاَنْتِ طَالِقٌ تُطَلَّقُ بِخُرُوْجِ سَقْطٍ ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهِ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِ اَيْ اِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِيْ عِدَّتُهَا بِخُرُوْجِ هٰذَا السَّقْطِ ـ

অনুবাদ : নিফাস এমন রক্ত যা বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নির্গত হয়। এর সর্বনিম্ন মেয়াদের সীমা নেই। সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশ দিন। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা, তাঁর নিকট নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ ষাট দিন। দুই বাচ্চা প্রসবকারিণী মায়ের প্রথম বাচ্চা প্রসব হওয়ার দ্বারা নিফাস [শুরু] হবে। এতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। 'তাওআমান' এমন দুই বাচ্চাকে বলা হয়, যারা এক [মায়ের] পেট থেকে জন্ম হয় এবং উক্ত দুই বাচ্চার মধ্যখানে গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ যা ছয় মাস, তা হয় না; [বরং কম হয়]। সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসব হওয়ার দ্বারা [তার] ইদ্দত পূর্ণ হয়। অসম্পূর্ণ বাচ্চার যদি কোনো অঙ্গ দেখা যায় তবে এটি সন্তান। এখানে سَقْط মুবতাদা يُرٰى -এর সিফত এবং وَلَد এর খবর। অতএব, মহিলা এ অসম্পূর্ণ বাচ্চা প্রসবের কারণে নিফাসগ্রস্ত হয়ে যাবে, বাঁদি উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং সন্তান প্রসবের সাথে শর্তযুক্ত তালাক পতিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে বলে যে, যদি তুমি বাচ্চা প্রসব কর তবে তুমি তালাক– তখন যদি সে এমন অসম্পূর্ণ বাচ্চা প্রসব করে, যার কোনো অঙ্গ প্রকাশ পায়, তবে এর দ্বারা তালাক হয়ে যাবে। এর দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি স্বামী গর্ভাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে উক্ত অসম্পূর্ণ সন্তান প্রসব হওয়ার দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالنِّفَاسُ دَمٌ يُعَقِّبُ الخ :

নিফাস (نِفَاسٌ) শব্দের نُوْن অক্ষর যের ও যবর উভয় দ্বারা পড়া যায়। এর আভিধানিক অর্থ– প্রসব। শরিয়তের পরিভাষায় نِفَاسٌ বলা হয়– دَمٌ يُعَقِّبُ الْوَلَدَ "ঐ রক্ত যা সন্তান প্রসবের পর জরায়ু থেকে নির্গত হয়।" নিফাসের রক্ত নারীর যোনি দিয়ে বের হয়। যদি বাচ্চা তার যোনি ব্যতীত অন্যদিক দিয়ে বের করা হয়; যেমন– অপারেশনের মাধ্যমে বাচ্চা বের করল। তবে যদি তার জরায়ুর রক্ত যোনি দিয়ে বের হয়, তবে তা নিফাস; অন্যথায় তা নিফাস নয়। 'বাহরুর রায়িক' ও অন্যান্য গ্রন্থে এমনই উল্লেখ রয়েছে। মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গ্রন্থকার নিফাসের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন তা অসম্পূর্ণ।

قَوْلُهُ وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ : অর্থাৎ নিফাসের সর্বনিম্ন মেয়াদের শরয়ী কোনো সীমা নেই। তাই যদি মহিলা শুধু এক মুহূর্তও রক্ত দেখে, অতঃপর পাক হয়ে যায় তবে তার উপর গোসল করে নামাজ পড়া ওয়াজিব। তবে নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশ দিন নির্ধারিত। কেননা, হযরত উম্মে সালামার হাদীসে বর্ণিত আছে– كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের যখন রক্ত আসতে থাকত তখন তাঁরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত বসে থাকতেন।" –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী]

قَوْلُهُ وَهُوَ لِأُمِّ التَّوَامَيْنِ الخ : অর্থাৎ যে মহিলার এক পেট থেকে দুই বাচ্চা প্রসব হয় এবং উভয়ের প্রসবের মাঝে ছয় মাসের চেয়ে কম সময় হয় তবে তার নিফাস শায়খাইন (র.)-এর নিকট প্রথম বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর থেকে শুরু হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর তার নিফাস শুরু হবে। কেননা, সে মহিলা দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসব হওয়ার পূর্বেই গর্ভবতী ছিল, তাই তা নিফাস হতে পারে না।

শায়খাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উক্ত যুক্তির খণ্ডন এভাবে করা হয় যে, যখন সে প্রথম বাচ্চা প্রসব করল তখন তার জরায়ুর মুখ খুলে গেছে এবং রক্তও প্রবাহিত হতে শুরু হয়েছে, তাই জরায়ু থেকে নির্গত রক্ত নিফাসই হবে। হিদায়া গ্রন্থে এমনই উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَانْقِضَاءُ الْعِدَّةِ مِنَ الْاٰخِرِ أَبْعَدُ الْاَجَلَيْنِ : অর্থাৎ যদি গর্ভবতী মহিলার তালাক হয়ে যায় কিংবা স্বামী মারা যায় এবং [দুই ইদ্দত-এর দূরবর্তী ইদ্দত] -এর মাধ্যমে তার ইদ্দত পুরা হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত তার ইদ্দত চলতে থাকবে; প্রথম বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত নয়। কেননা, গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত। আর যে মহিলার স্বামী মারা গেছে সে যদি গর্ভবতী হয়, তবে তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন ও বাচ্চা প্রসব– দুটির যেটি অধিক দীর্ঘ সেটিই হবে এবং বাচ্চা প্রসবের সুরতে দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে গর্ভবতী, তাই নিঃসন্দেহে তার ইদ্দত শেষ হয়নি।

قَوْلُهُ وَالْاَمَةُ اُمُّ الْوَلَدِ : উম্মে ওয়ালাদ (اُمُّ الْوَلَدِ) ঐ বাঁদিকে বলা হয়, যার সাথে তার মনিব সহবাস করে এবং এর দ্বারা বাচ্চা প্রসব হয় এবং মনিব এ দাবিও করে যে, এ বাচ্চা তারই, তবে এর হুকুম হলো, মনিবের মৃত্যুর পর সে আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি বাঁদি অসম্পূর্ণ বাচ্চা (سَقْطَه) প্রসব করে তবে তার মনিব দাবি করার দ্বারা সে উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে।

بَابُ الْاَنْجَاسِ

يَطْهُرُ بَدَنُ الْمُصَلِّىْ وَثَوْبُهُ وَمَكَانُهُ عَنْ نَجَسٍ مَرْئِيٍّ بِزَوَالِ عَيْنِهٖ وَاِنْ بَقِىَ اَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ بِالْمَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ بِزَوَالِ عَيْنِهٖ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ مُزِيْلٍ كَخَلٍّ وَنَحْوِهٖ وَعَمَّا لَمْ يُرَ اَثَرُهُ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ عَنْ نَجَسٍ مَرْئِيٍّ بِغَسْلِهٖ ثَلٰثًا وَعَصْرِهٖ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ اِنْ اَمْكَنَ بِشَرْطِ اَنْ يُبَالِغَ فِى الْعَصْرِ فِى الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ بِقَدْرِ قُوَّتِهٖ وَاِلَّا يَغْسِلُ وَيَتْرُكُ اِلٰى عَدَمِ الْقَطَرَانِ ثُمَّ وَثُمَّ هٰكَذَا وَخُفُّهُ عَنْ ذِىْ جِرْمٍ جَفَّ بِالدَّلْكِ بِالْاَرْضِ وَجَوَّزَهُ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) فِىْ رَطْبِهٖ اَىْ فِىْ رَطْبِ ذِىْ جِرْمٍ اِذَا بَالَغَ وَبِهٖ يُفْتٰى وَعَمَّا لَا جِرْمَ لَهُ بِالْغَسْلِ فَقَطْ اَىْ يَطْهُرُ الْخُفُّ عَمَّا لَا جِرْمَ لَهُ كَالْبَوْلِ وَنَحْوِهٖ بِالْغَسْلِ فَقَطْ وَعَنِ الْمَنِىِّ بِغَسْلِهٖ سَوَاءٌ كَانَ رَطْبًا اَوْ يَابِسًا اَوْ فَرْكِ يَابِسِهٖ هٰذَا اِذَا كَانَ رَأْسُ الذَّكَرِ طَاهِرًا بِاَنْ بَالَ وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْبَوْلُ عَنْ رَأْسِ مَخْرَجِهٖ اَوْ تَجَاوَزَ وَاسْتَنْجٰى وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِىْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لَا يَطْهُرُ الْبَدَنُ بِالْفَرْكِ ـ

পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন নাজাসাত

অনুবাদ : মুসল্লি ব্যক্তির শরীর, কাপড় এবং স্থান পবিত্র হয়ে যাবে দৃশ্যমান নাপাকী হতে পানি কিংবা প্রত্যেক নাপাকী দূরীভূতকারী পবিত্র পানীয় বস্তু দ্বারা এর মূলকে দূর করার দ্বারা যদি তা দূর করা কষ্টকর হয়– যদিও এর চিহ্ন বাকি থাকে। بِالْمَاءِ শব্দটি بِزَوَالِ عَيْنِهٖ -এর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– সিরকা ইত্যাদি। অদৃশ্যমান নাপাক থেকে পবিত্র হয়– এ বাক্য গ্রন্থকারের কথা عَنْ نَجَسٍ مَرْئِيٍّ -এর উপর عَطْف হয়েছে– তিনবার ধৌত করার দ্বারা এবং যদি সম্ভব হয় তবে প্রত্যেকবার নিংড়াবে। এ শর্তে যে, তৃতীয়বার নিংড়ানোর সময় যথাসাধ্য শক্তি ব্যয় করবে। আর যদি নিংড়ানো সম্ভব না হয়, তবে তা ধৌত করবে এবং পানির ফোঁটা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তা ছেড়ে রাখবে। অনুরূপ তৃতীয়বারও করবে। দৃশ্যমান শুষ্ক নাপাকী থেকে মোজা মাটিতে ঘষার দ্বারা পাক হয়ে যায়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তরল নাপাক তথা স্থুল শরীরবিশিষ্ট তরল নাপাক– এর ক্ষেত্রেও মাটিতে ঘষে পবিত্র করাকে বৈধ রেখেছেন, যদি ভালোভাবে ঘষা হয় এবং এরই উপর ফতোয়া। আর শরীরবিহীন নাপাকী থেকে শুধু ধৌত করার দ্বারা মোজা পবিত্র হয়ে যায়। অর্থাৎ মোজা ঐ নাপাকী থেকে শুধু ধৌত করার দ্বারা পাক হয়ে যায় যার শরীর নেই। যেমন– পেশাব কিংবা অনুরূপ কিছু। ধৌত করার দ্বারা মনি থেকে পবিত্র হয়ে যায়। মনি চাই তরল হোক কিংবা শুষ্ক হোক। কিংবা শুষ্ক মনি ঘর্ষণের দ্বারা [পবিত্র হয়ে যায়]। এ হুকুম তখন, যখন লিঙ্গের মাথা পবিত্র থাকে এভাবে যে, পেশাব করেছে, কিন্তু পেশাব লিঙ্গের মুখ থেকে অন্যদিকে অতিক্রম করে যায়নি কিংবা অন্যদিকে অতিক্রম করে গেছে, কিন্তু ইস্তিঞ্জা করে [তা ধুয়ে পবিত্র করে ফেলেছে]। জাহিরী বর্ণনা অনুযায়ী কাপড় এবং শরীরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও হাসান (র.)-এর বর্ণনা হচ্ছে, ঘর্ষণের দ্বারা শরীর পবিত্র হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ الْاَنْجَاسِ :

اَنْجَاسٌ শব্দের বিশ্লেষণ : اَنْجَاسٌ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো– نَجَسٌ بِفَتْحِ الْجِيْمِ অর্থ– প্রকৃত নাপাকী (عَيْنِ نَجَاسَة)। আর اَلنَّجِسُ بِكَسْرِ الْجِيْمِ এর অর্থ– ঐ জন্তু যা পাক নয়।

❖ **নাজাসাতের প্রকার :** নাজাসাত দুই প্রকার– ১. নাজাসাতে হাকীকী যা প্রকৃত নাপাকী (عَيْنِ نَجَاسَة)। যেমন– পেশাব, পায়খানা, মনি, মদ ইত্যাদি। ২. নাজাসাতে হুকমী যা প্রকৃত নাপাকী নয়; বরং এর উপর নাপাকীর হুকুম লাগানো হয়েছে। যেমন– অজুহীন অপবিত্র ব্যক্তি।

বিকায়া গ্রন্থকার (র.) ইতঃপূর্বে নাজাসাতে হুকমীর আলোচনা করেছেন। এখানে নাজাসাতে হাকীকীর আলোচনা করছেন। নাজাসাতে হুকমীর আলোচনা অগ্রে করেছেন এ কারণে যে, নাজাসাতে হুকমী অধিক শক্তিশালী। কেননা, নাজাসাতে হাকীকী অল্পস্বল্প নাপাক নয়। পক্ষান্তরে নাজাসাতে হুকমী অল্পও নাপাক। তাই গ্রন্থকার নাজাসাতে হুকমীর আলোচনা অগ্রে করেছেন।

নাজাসাত দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান হওয়ার দিক থেকে আবার দু প্রকার– ১. نَجَس مَرْئِيْ বা দৃশ্যমান নাপাকী, ২. نَجَس غَيْر مَرْئِيْ বা অদৃশ্যমান নাপাকী।

❖ **দৃশ্যমান নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি :** বিকায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেন যে, দৃশ্যমান নাপাকীকে যদি পানি দ্বারা কিংবা নাপাকীকে দূরীভূতকারী পবিত্র পানীয় জিনিসের মাধ্যমে ধৌত করে এর মূলকে দূর করা যায়, যদিও এর চিহ্ন বাকি থাকে তবে তা পাক হয়ে যাবে। চাই দৃশ্যমান নাপাকী মিশ্রিত বস্তুটি কাপড়, শরীর কিংবা স্থান হোক।

❖ **অদৃশ্যমান নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি :** যে নাপাকী দৃশ্যমান নয় তা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য শরীর, কাপড় ইত্যাদি তিনবার ধৌত করতে হবে এবং যদি সম্ভব হয় তবে প্রত্যেকবার নিংড়াতে হবে। আর যদি নিংড়ানো সম্ভব না হয় তবে একবার ধুয়ে পানির ফোঁটা পড়া বন্ধ হওয়া পর্যন্ত রেখে দিতে হবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও এমন করতে হবে।

قَوْلُهُ يَطْهُرُ : يَطْهُرُ শব্দটি تَطْهِيْر মাসদার থেকে مَجْهُوْل-এর সীগাহ কিংবা طَهَارَة মাসদার থেকে مَعْرُوْف-এর সীগাহ। প্রথম সুরতে هَاء-এর উপর যবর এবং দ্বিতীয় সুরতে هَاء-এর উপর পেশ পড়া হবে। এটি যদিও জাহিরী সুরতে خَبَر مُقَدَّمْ কিন্তু এটি اَمْر-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। "নিহায়া" নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, وُجُوْب-এর চাহিদার ক্ষেত্রে মুজতাহিদের খবরও শরিয়তবেত্তার ন্যায়; বরং তাঁর খবর اَمْر-এর চেয়েও অধিক শক্তিশালী হয়। মূলকথা হলো, উল্লিখিত জিনিসগুলোকে নাপাকী থেকে মুক্ত করা ওয়াজিব।

قَوْلُهُ بَدَنُ الْمُصَلِّيْ : এখানে بَدَنْ শব্দটি جَسَدْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, جَسَد বলা হয় পূর্ণ শরীরকে, আর بَدَنْ বলা হয় মাথা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যতীত অংশকে। এখানে গ্রন্থকার بَدَنْ শব্দের সাথে مُصَلِّي শব্দটি উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, নামাজ আদায়ের জন্য শরীর পাক হওয়া শরিয়ত অনুমোদিত এবং যদি সে নামাজ আদায়ের ইচ্ছা পোষণ করে তবে তার জন্য তাহারাত ওয়াজিব। নামাজ ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক নয়; বরং নামাজ ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় নাপাক কাপড় পরিধান করা জায়েজ আছে। তবে যদি উক্ত নাপাকী এক দিরহাম পরিমাণ অংশের বেশি হয় এবং তার কাছে অন্য কোনো পবিত্র কাপড় থাকে তবে উক্ত নাপাক কাপড় পরিধান করা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ وَاِنْ بَقِيَ الخ : অর্থাৎ যদি নাপাকীর মূল দূর হয়ে যায় তবে তা পাক হয়ে যাবে, যদিও এর চিহ্ন বাকি থাকে, যে চিহ্ন দূর করা অসম্ভব। কারণ, অসুবিধা ও অতিরিক্ত কষ্টকর বিষয় نَصّ দ্বারাই মাফ করা হয়েছে। যেমন– কেউ নাপাক মেহেদি দ্বারা হাত রাঙিয়েছে, তবে ধৌত করার দ্বারাই হাত পবিত্র হয়ে যাবে, যদিও রং বাকি রয়েছে। يَشُقُّ زَوَالُهُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নাপাকী ধোয়ার ক্ষেত্রে পানি ব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজন হওয়া। যেমন– সাবান ও উশনান ইত্যাদি। আর وَاِنْ بَقِيَ أَثَرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যদিও নাপাকীর গন্ধ কিংবা রং বাকি থাকে। যেমন– কেউ নাপাক তৈল দ্বারা কাপড় রঙিন করেছে, তবে তা তিনবার ধৌত করার দ্বারা পাক হয়ে যাবে। তবে নাপাকীর ذَائِقَة [স্বাদ] অবশ্যই দূর করতে হবে। কেননা, নাপাকীর ذَائِقَة-এর অস্তিত্ব নাপাকীর অস্তিত্ব বুঝায়। আল্লামা বরজান্দী (র.) বলেন, زَوَال عَيْن দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা

হয়েছে যে, দৃশ্যমান নাপাকী দূর করার জন্য ধোয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যার প্রয়োজন নেই এবং عَيْنِ نَجَاسَةٍ দূরীভূত হওয়ার পর আর ধোয়ার প্রয়োজন নেই। চাই তা দূর করার ক্ষেত্রে শুধু একবার ধৌত করা হোক কিংবা দশবার ধৌত করা হোক।

قَوْلُهُ وَثَوْبُهُ وَمَكَانُهُ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, নামাজি ব্যক্তির জন্য কাপড় পাক হওয়া স্পষ্ট কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ "তুমি তোমার কাপড়কে পবিত্র কর।" তারপর শরীর এবং স্থান পাক হওয়া دَلَالَةُ النَّصِّ দ্বারা প্রমাণিত। তবে এ কথার মাঝে মন্তব্য রয়েছে যে, শরীর এবং স্থান পাক হতে হবে এ কথা অনেক হাদীসই বুঝায়। অতএব, তা হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয়- دَلَالَةُ النَّصِّ দ্বারা তা প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ بِالْمَاءِ : অর্থাৎ যখন পানি পাক হবে। اَلْمَاءُ [পানি] শব্দটি مطلق হওয়ার দ্বারা বুঝে আসে যে, যদি مَاء مُسْتَعْمَلْ [ব্যবহৃত পানি]-ও উপস্থিত থাকে তবুও তা নাপাকী দূর করার জন্য যথেষ্ট এবং এরই উপর ফতোয়া।

قَوْلُهُ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ الخ : উদ্দেশ্য হলো, যখন পানীয় বস্তুটি প্রবহমান, পবিত্র এবং নাপাকী দূর করার মতো যোগ্য হয় তখন এর দ্বারা ধুয়ে দৃশ্যমান নাপাকীকে দূরীভূত করার ভিত্তিতে শরীর, কাপড় ও স্থান পাক হয়ে যায়। যেমন- সিরকা, গোলাপজল ইত্যাদি। এখানে গ্রন্থকার مَائِعٌ শব্দটি বলে যে সমস্ত পানি প্রবহমান নয়, সেগুলোকে বের করেছেন। যেমন- বরফ যা পানীয় বটে, কিন্তু তা প্রবহমান নয় এবং এতে طاهر শব্দ বলে গ্রন্থকার নাপাক পানীয়কে বাদ দিয়েছেন। যেমন- হালাল প্রাণীর পেশাব। এটি শায়খাইন (র.)-এর অভিমত। কেননা, হালাল প্রাণীর পেশাব নাপাক। কেউ কেউ طاهر শর্তকে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। কারণ, পানীয় বস্তু নাপাক হলেও এর দ্বারা দৃশ্যমান নাপাকীকে দূর করা যায়, কিন্তু সেখানে পানীয় বস্তুটির নাপাকীটা অবশ্য বাকি থাকে। যেমন- একটি কাপড় রক্ত লাগার দ্বারা নাপাক হলো এবং সে হালাল প্রাণীর পেশাব দ্বারা উক্ত রক্ত ধৌত করে দূর করল, অতঃপর শপথ করল যে, কাপড়ে রক্তের নাপাকী নেই। তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। গ্রন্থকার مُزِيْل শব্দটি ব্যবহার করে ঐ সব জিনিসকে বের করেছেন, যা দ্বারা নাপাকী দূর করা যায় না। যেমন- রওগন ও যাইতুন ইত্যাদি। কেননা, এগুলোতে আঠার লেশ থাকে, যা নিংড়ানোর মাধ্যমে পরিষ্কার হয় না; তাই তা অন্য নাপাকীকে পরিষ্কার করতে পারবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জায়গা এবং কাপড় প্রত্যেক প্রবহমান পানীয় বস্তু দ্বারা পাক হয়ে যায়, কিন্তু শরীর যে কোনো প্রবহমান পানীয় বস্তু দ্বারা পবিত্র হয় না; বরং তা শুধু পানি দ্বারাই পবিত্র হয়। ইমাম মুহাম্মদ, যুফার ও শাফেয়ী (র.)-এর নিকট পানি ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস দ্বারা مُطْلَقًا পবিত্রতা অর্জন করা যায় না।

قَوْلُهُ وَعَمَّا لَمْ يُرَ اَثَرُهُ : অর্থাৎ শরীর, কাপড় এবং জায়গা যদি অদৃশ্যমান নাপাকী দ্বারা নাপাক হয়ে যায় তবে তা পানি কিংবা প্রবহমান পানীয় বস্তু দ্বারা ধোয়ার মাধ্যমে পাক হয়ে যায়। অদৃশ্যমান নাপাকী বলা হয় ঐ নাপাকীকে যার শরীর নেই এবং শুষ্ক হওয়ার পর তা নাপাকী মনে হয় না- চাই রং থাকুক কিংবা না থাকুক। তবে তা পানি কিংবা পানীয় বস্তু দ্বারা তিনবার ধৌত করবে। আর যদি সম্ভব হয় তবে প্রত্যেকবার নিংড়াবে, যেভাবে কাপড়কে নিংড়ানো হয়। এখন যদি ধৌত করে এবং না নিংড়ায় তবে তা পাক হবে না। কেননা, নিংড়ানোর মাধ্যমে কাপড়ের ভিতরের আটকানো ময়লাগুলো বের হয়ে আসে; বরং শেষবার নিংড়ানোর সময় স্বীয় শক্তি অনুযায়ী ভালোভাবে নিংড়াবে, যেন তাহারাত [পবিত্র হওয়া] -এর সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্ম হয়। কারণ, ধৌতকারীর প্রবল ধারণার উপর ফতোয়া দেওয়া হয় যে, তা পাক।

قَوْلُهُ بِشَرْطِ اَنْ يُبَالِغَ فِى الْعَصْرِ : তৃতীয়বার নিংড়ানোর সময় مُبَالَغَة করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমনভাবে নিংড়ানো, যেন পাক হওয়ার প্রবল ধারণা হয় এবং অনুমান হয় যে, কাপড় থেকে এখন আর পানি বের হবে না; বরং এখন নিংড়ালে কাপড় ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউ এ ধারণায় কাপড়কে কম নিংড়ায় তবে কাপড় পাক হবে না। কেননা, طَاقَة [শক্তি] -এর সাথে ظَنِّ غَالِبْ [প্রবল ধারণা]-এর শর্ত করা হয়েছে। অন্যথায় অধিক শক্তিশালী লোক যদি নিজের শক্তি অনুযায়ী নিংড়ানোর ক্ষেত্রে مُبَالَغَة করে তবে কাপড় ছিঁড়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَيَتْرُكُ اِلَى عَدَمِ الْقَطْرَانِ : উদ্দেশ্য হলো, ঐ জিনিস যা নিংড়ানো অসম্ভব তা যদি অদৃশ্যমান নাপাকী দ্বারা নাপাক হয় তবে তা পাক করার পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে একবার তা ধুয়ে রেখে দেবে, যেন এর পানিগুলো টপকে পড়ে যায়, এমনকি যেন

শেষ ফোঁটাটিও গড়িয়ে পড়ে যায়। অতঃপর দ্বিতীয়বার ধৌত করবে এবং পানি টপকে পড়ার জন্য রেখে দেবে। আর যখন পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যাবে তখন তৃতীয়বার ধৌত করবে এবং রেখে দেবে। নিংড়ানোর উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে নাপাকী বের করা হয়। আর যেসব কাপড় ংড়ানো অসম্ভব সেসব কাপড় থেকে পানি টপকানোর মাধ্যমেই নিংড়ানোর উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

❖ **মোজা পবিত্র করার পদ্ধতি :** মোজা কিংবা জুতার মাঝে যদি নাপাকী লাগে এবং তা শরীরবিহীন নাপাকী হয়; যেমন– পেশাব, মদ ইত্যাদি তবে তা ধৌত করা আবশ্যক– চাই তা তরল নাপাকী হোক কিংবা শুষ্ক নাপাকী হোক। আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ফজল (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন জুতা কিংবা মোজায় পেশাব কিংবা মদ লাগে তবে সে মাটি কিংবা বালুর উপর হাঁটবে যাতে করে মাটি কিংবা বালু লেগে উক্ত নাপাকী শুকিয়ে যায়, তবে তা মাটিতে ঘষাই যথেষ্ট।

আর যদি নাপাকী শরীরবিশিষ্ট হয়, যেমন– রক্ত, পায়খানা ইত্যাদি এবং যদি উক্ত নাপাকী ভিজা হয়, তবে তা ধৌতই করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি তা মাটি বা বালু দ্বারা পরিষ্কার করে মাটির মধ্যে ঘষা হয় তবে তা পাক হয়ে যাবে। আর যদি শরীরবিশিষ্ট নাপাকীটি শুষ্ক হয়, তবে তা মাটির উপর ঘষার দ্বারাই পাক হয়ে যাবে। এতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) মতানৈক্য করেন। কারণ, তাঁর নিকট শুধু ধোয়ার দ্বারাই পাক হবে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– إِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِيْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْاَرْضِ وَيُصَلِّيْ فِيْهِمَا

অর্থাৎ "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসবে তখন দেখবে, যদি তার জুতায় ময়লা [নাপাকী] থাকে তবে তা মাটিতে ঘষে পরিষ্কার করে তাতে নামাজ পড়বে।" –[আবূ দাউদ শরীফ]

قَوْلُهُ وَبِهِ يُفْتٰى : শরীরবিশিষ্ট ভিজা নাপাকী যদি মোজায় লাগে তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর নিকট তা মাটিতে ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করার দ্বারা পাক হয়ে যাবে। এরই উপর ফতোয়া প্রদান করা হয়। কারণ, এটি সহজ এবং পূর্বোল্লিখিত হাদীসও এটা বুঝায়। তা এভাবে যে, হাদীসটি مُطْلَقٌ আর مُطْلَقٌ হওয়ার কারণে তা শরীরবিশিষ্ট ভিজা ও শুষ্ক নাপাকীকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব শরীরবিশিষ্ট ভিজা নাপাকও মাটিতে ঘষার দ্বারা পবিত্র হয়ে যাবে। **প্রশ্ন :** যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উক্ত হাদীস তো শরীরবিহীন নাপাকীকেও অন্তর্ভুক্ত করে, তবে শরীরবিহীন নাপাকীর ক্ষেত্রে শুধু ধৌত করাকে কেন খাস করা হলো?

উত্তর : এর উত্তর হচ্ছে, যে নাপাকীর শরীর নেই তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ ইরশাদ– فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طَهُوْرٌ [মাটিই একে নাপাকী থেকে পাক করে দেয়] -এর মাধ্যমে বের হয়ে গেছে। কারণ, আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, যখন পেশাব কিংবা মদ মোজা কিংবা জুতায় লেগে ভিতরে চলে যায় তবে তা শুধু মাটিতে ঘষার দ্বারা নাপাকী দূর হয় না এবং তা শুধু নিংড়ানোর দ্বারাও নাপাকী বের হয়ে আসে না।

❖ **মনি পাক নাকি নাপাক?** মনি পাক ও নাপাক হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, মানুষের মনি নাপাক। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মানুষের মনি পাক। উল্লেখ্য, মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে কুকুর ও শূকরের মনি সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। তা ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মনির ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। ১. সব প্রাণীর মনি পাক– চাই مَاكُوْلُ اللَّحْمِ প্রাণী হোক কিংবা غَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ প্রাণী হোক। ২. সমস্ত প্রাণীর মনি নাপাক। ৩. مَاكُوْلُ اللَّحْمِ প্রাণীর মনি পাক, আর غَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ প্রাণীর মনি নাপাক।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন–

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَفْرُكَهُ بِاَصَابِعِهِ وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاَصَابِعِيْ.

অর্থাৎ "আঙ্গুল দ্বারা ঘষে মনি উঠিয়ে ফেলাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমি মাঝে মাঝে আঙ্গুল দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাপড় থেকে মনি ঘষে উঠাতাম।" –[তিরমিযী শরীফ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, যদি মনি নাপাক হতো তবে তা শুধু আঙ্গুল দ্বারা ঘষে উঠানোই যথেষ্ট হতো না; বরং রক্তের ন্যায় তা ধৌত করা আবশ্যক হতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে এসেছে–

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ اَوِ الْبُزَاقِ وَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ اَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ اَوْ اِذْخِرَةٍ.

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাপড়ে লেগে থাকা মনি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বললেন, সেটা তো শ্লেষ্মা ও থুথুর মতো, তিনি আরো বলেন, তা কোনো বস্ত্রখণ্ড কিংবা ইয্খির ঘাস দ্বারা মুছে ফেললে যথেষ্ট হয়ে যাবে।"

–[দারাকুতনী ও তাবারানী শরীফ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসে মনিকে শ্লেষ্মার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর শ্লেষ্ম হলো পাক। অতএব, মনিও পাক। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যৌক্তিক দলিল হলো, মনি মানব সৃষ্টির সূচনা। তাই তা মাটির অনুরূপ। কেননা, আম্বিয়ায়ে কেরামের সৃষ্টি নাপাক বস্তু দ্বারা অসম্ভব।

ওলামায়ে আহনাফের দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.)-এর এই হাদীস–

كُنْتُ اَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَرَاهُ فِيْهِ بُقْعَةً اَوْ بُقَعًا.

অর্থাৎ "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মনি মিশ্রিত কাপড় ধৌত করতাম। অতঃপর আমি এতে মনির চিহ্ন দেখতাম।"–[আবূ দাউদ]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত অন্য একটি হাদীস–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ فِيْ ذٰلِكَ الثَّوْبِ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ মনি ধৌত করতেন অতঃপর উক্ত কাপড়েই নামাজ পড়তেন। –[মুসলিম শরীফ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উল্লিখিত উভয় হাদীসে বলা হয়েছে, মনি ধৌত করতেন। যদি মনি পাক হতো তবে তা ধৌত করার প্রয়োজন ছিল না। অনুরূপ ইমাম শাফেয়ী (র.) যে সমস্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন এবং যেসব হাদীসে فَرْك -এর কথা উল্লেখ রয়েছে, সেসব হাদীস আমাদেরও দলিল। তা এভাবে যে, মনি সম্পর্কিত একটি হাদীসেও বলা হয়নি যে, মনিকে ধৌত করা কিংবা আঙ্গুল দ্বারা ঘষা ছাড়া এর উপর নামাজ পড়া হয়েছে। অন্তত আঙ্গুল দ্বারা ঘষে তা উঠানো হয়েছে। যদি মনি পাক হতো তবে তা আঙ্গুল দ্বারা ঘষেও উঠানোর প্রয়োজন হতো না। ওলামায়ে আহনাফের যৌক্তিক দলিল হলো, সর্বসম্মতিক্রমে পেশাব, মযি ও ওয়াদি নাপাক, আর এগুলোর দ্বারা শুধু অজু ওয়াজিব হয়। অথচ মনি দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয়। অতএব মনি আরো উত্তমরূপে নাপাক।

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পেশকৃত প্রথম হাদীসের খণ্ডন হচ্ছে, উক্ত হাদীস শয়ন করার কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ তিনি তা আঙ্গুল দ্বারা খুঁচিয়ে পরিষ্কার করে এতে ঘুমাতেন; নামাজ পড়তেন না। অথবা বলা যায় যে, মনি থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি দুটি– ১. ধৌত করা, ২. আঙ্গুল দ্বারা খুঁচিয়ে উঠানো। তবে দ্বিতীয় সুরতে শর্ত হলো, তা শুষ্ক হতে হবে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে মনি থেকে কাপড়কে পবিত্র করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় হাদীস তথা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর হাদীসের খণ্ডন হচ্ছে, তা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উপর مَوْقُوْف যা আমাদের مَرْفُوْع হাদীসের বিপরীতে দলিল হতে পারে না। তাঁর যৌক্তিক দলিলের খণ্ডন হচ্ছে, আমরা এ কথা মানি না যে, মানব সৃষ্টির সূচনা সরাসরি মনি দ্বারা হয়েছে; বরং বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের পর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– মনি রক্ত হয়েছে, তারপর জমাট রক্ত হয়েছে, তারপর মাংসপিণ্ড হয়েছে। এ সমস্ত অবস্থা অতিক্রম করে সম্মানিত মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর ১ : ১৯৭, বাহরুর রায়িক ১ : ৩৮৯, মা'আরিফুস সুনান ১ : ৩৮৩, দরসে তিরমিযী– ১ : ৩৪৬]

❖ **মনি থেকে কাপড় পরিষ্কার করার পদ্ধতি :** ইমাম শাফেয়ী (র.) যেহেতু মনিকে পাক বলেন, সেহেতু তাঁর মতে মনি থেকে পবিত্র হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। মনি থেকে কাপড় পরিষ্কার করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন যে, মনি দুই প্রকার হতে পারে– ১. ভিজা মনি, ২. শুষ্ক মনি। তবে মনি থেকে কাপড় পবিত্র করা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ওলামায়ে আহনাফের মতে, মনি যদি শুষ্ক হয় তবে তা আঙ্গুল দ্বারা ঘঁষা দিলে পাক হয়ে যাবে। আর যদি মনি ভিজা হয় তবে তা শুধু ধৌত করার দ্বারা পবিত্র হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও ইমাম যুফার (র.) -এর মতে, মনি মিশ্রিত কাপড় পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে; আঙ্গুল দ্বারা ঘষলে যথেষ্ট হবে না।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল হলো, শুষ্ক মনিও যখন কাপড়ে লেগেছে তখন তা ভিজাই ছিল। পরবর্তীতে শুকিয়েছে। তাই এর নাপাকী যা কাপড়ের সাথে মিশ্রিত হওয়ার তা হয়ে গেছে। অতএব, উক্ত কাপড় ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না। ওলামায়ে আহনাফের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে বলেছেন–

فَاغْسِلِيْهِ اِنْ كَانَ رَطْبًا وَافْرُكِيْهِ اِنْ كَانَ يَابِسًا ـ

অর্থাৎ "আর্দ্র হলে তা ধুয়ে ফেল এবং শুষ্ক হলে তা খুঁচিয়ে তুলে ফেল।" –[দারাকুতনী ও বাযযার]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন– كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَابِسًا وَاَغْسِلُهٗ اِذَا كَانَ رَطْبًا

অর্থাৎ "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাপড়ের মনি শুষ্ক হলে খুঁচিয়ে উঠাতাম আর আর্দ্র হলে তা ধুয়ে ফেলতাম।"

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, মনি যদি শুষ্ক হয় তবে খুঁচিয়ে উঠানো, আর যদি আর্দ্র হয় তবে ধৌত করা হবে।

قَوْلُهٗ وَعَنِ الْمَنِىِّ بِغَسْلِهٖ : জাহিরী সুরতে এর عَطْف হয়েছে ذِىْ جِرْمٍ -এর উপর কিংবা عَمَّا لَا جِرْمَ لَهٗ -এর উপর। কিন্তু তখন এর উপর মন্তব্য হয় যে, মনি নামক নাপাকীর হুকুম শুধু মোজার সাথে খাস নয়; বরং তা শরীর ও কাপড়ের সাথেও হতে পারে। তাই সহীহ অভিমত হলো, এর عَطْف হয়েছে عَنْ نَجَسٍ مَرْئِىٍّ -এর উপর। হ্যাঁ, যদি এ মাসআলাকে মোজার পূর্বে উল্লেখ করা হতো তবে উত্তম হতো।

قَوْلُهٗ بِاَنْ بَالَ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ الخ : এ সুরত সহজে বুঝে আসবে না যে, মনি নির্গত হবে আর লিঙ্গের মাথা পাক থাকবে। কেননা, সাধারণভাবে যখন মনি নির্গত হয়, তখন মযি দ্বারা লিঙ্গের মাথা ভিজে যায়। এমতাবস্থায় মনি এদিক-সেদিক ছড়িয়ে যাওয়া স্বাভাবিক বিষয়। হ্যাঁ, যদি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হয় তবে তখন মনি নির্গত হওয়ার সময় নিঃসন্দেহে লিঙ্গের মাথা শুষ্ক থাকে। কিন্তু তখনও এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, মনি এদিক-সেদিক ছড়ায়নি; বরং নির্গত হওয়ার সাথে সাথেই কাপড়ে লেগে যায়। সর্বোপরি শারেহ (র.) যে সম্ভাবনাময়ী সুরত বর্ণনা করেছেন, তা যদি ঘটনাক্রমে ঘটেও এবং লিঙ্গের মাথা পাক থাকে তবে যেহেতু এতে নাপাকী মিলে গেছে তাই তা খুঁচিয়ে উঠানোর দ্বারা পাক হবে না।

وَالسَّيْفُ وَنَحْوُهُ بِالْمَسْحِ وَالْبِسَاطُ يَجْرِى الْمَاءُ عَلَيْهِ لَيْلَةً وَالْاَرْضُ وَالْاَجُرُّ الْمَفْرُوْشُ بِالْيَبْسِ وَ ذَهَابِ الْاَثَرِ لِلصَّلٰوةِ لَا لِلتَّيَمُّمِ اَىْ يَجُوْزُ الصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَلَا يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ بِهِمَا وَكَذَا الْخَصُّ فِى الْمَغْرِبِ هُوَ بَيْتٌ مِنْ قَصَبٍ وَالْمُرَادُ هٰهُنَا السُّتْرَةُ الَّتِى تَكُوْنُ عَلَى السُّطُوْحِ مِنَ الْقَصَبِ وَشَجَرٌ وَكَلَأٌ قَائِمٌ فِى الْاَرْضِ لَوْ تَنَجَّسَ ثُمَّ جَفَّ طَهُرَ هُوَ الْمُخْتَارُ وَمَا قُطِعَ مِنْهُمَا بِغَسْلِهِ لَا غَيْرُ لَمَّا ذَكَرَ تَطْهِيْرَ النَّجَاسَاتِ شَرَعَ فِى تَقْسِيْمِهَا عَلَى الْغَلِيْظَةِ وَالْخَفِيْفَةِ وَبَيَانُ مَا هُوَ عَفْوٌ مِنْهُمَا فَقَالَ وَقَدْرُ الدِّرْهَمِ مِنْ نَجِسٍ غَلِيْظٍ كَبَوْلٍ وَ دَمٍ وَخَمْرٍ وَخُرْءِ دَجَاجَةٍ وَبَوْلِ حِمَارٍ وَهِرَّةٍ وَفَارَةٍ وَ رَوْثٍ وَخِثْىٍ وَمَا دُوْنَ رُبُعِ ثَوْبٍ مِمَّا خَفَّ كَبَوْلِ فَرَسٍ وَمَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ وَخُرْءِ طَيْرٍ لَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ عَفْوٌ وَاِنْ زَادَ لَا قِيْلَ اَلْمُرَادُ بِرُبُعِ الثَّوْبِ رُبُعُ اَدْنٰى ثَوْبٍ يَجُوْزُ فِيْهِ الصَّلٰوةُ وَقِيْلَ رُبُعُ الْمَوْضِعِ الَّذِى اَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ كَالذَّيْلِ وَالْكُمِّ وَالدِّخْرِيْصِ وَقَدْ رَوَاهُ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) بِشِبْرٍ فِى شِبْرٍ وَاعْتُبِرَ وَزْنُ الدِّرْهَمِ بِقَدْرِ مِثْقَالٍ فِى الْكَثِيْفِ وَمَسَاحَتُهُ بِقَدْرِ عَرْضِ كَفٍّ فِى الرَّقِيْقِ اَلْمُرَادُ بِعَرْضِ الْكَفِّ عَرْضُ مُقْعَرِ الْكَفِّ وَهُوَ دَاخِلُ مَفَاصِلِ الْاَصَابِعِ .

অনুবাদ : তলোয়ার ও অনুরূপ বস্তু মোছার দ্বারা পবিত্র হয়। বিছানার উপর একদিন একরাত পানি প্রবাহিত করার দ্বারা তা পবিত্র হয়। ভূমি ও বিছানো ইট শুকানো ও নাপাকীর চিহ্ন দূরীভূত হওয়ার দ্বারা পবিত্র হয়- নামাজের জন্য; তায়াম্মুমের জন্য নয়। অর্থাৎ [ভূমি ও বিছানো ইট যখন শুকানো ও নাপাকীর চিহ্ন দূরীভূত হওয়ার দ্বারা পাক হয় তখন] এর উপর নামাজ পড়া বৈধ। কিন্তু এর দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। অনুরূপ খাস্। 'মাগরিব' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, খাস অর্থ- বাঁশের ঘর। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বাঁশের ঐ পর্দা যা ছাদের উপর হয়ে থাকে। গাছ এবং ঘাস যা ভূমিতে বিদ্যমান, তা যদি নাপাক হয়ে যায় অতঃপর তা শুকিয়ে যায় তবে তা পাক হয়ে যাবে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। যে গাছ ও ঘাস কেটে ফেলা হয়েছে [তা যদি নাপাক হয়ে যায়] তবে তা ধোয়ার দ্বারা পাক হয়ে যাবে। অন্য কোনো পদ্ধতিতে নয়। যখন গ্রন্থকার নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করলেন তখন তিনি তার গলীযা ও খফীফায় বিভক্তি ও এর ক্ষমাযোগ্য পরিমাণের বর্ণনা শুরু করেছেন। অতএব তিনি বলেছেন, এক দিরহাম পরিমাণ গলীযা নাপাকী ক্ষমাযোগ্য। [গলীযা নাপাকী] যেমন- পেশাব, রক্ত, মদ, মুরগির মল, গাধা, বিড়াল ও ইঁদুর-এর পেশাব, [ঘোড়া, গাধা ও শূকরের] লাদ এবং [গরু, হাতি ইত্যাদির] গোবর। খফীফা [হালকা] নাপাকী কাপড়ের এক-চতুর্থাংশের কম পরিমাণ অংশ ক্ষমাযোগ্য। [খফীফা নাপাকী] যেমন- ঘোড়া ও হালাল প্রাণীর পেশাব, হারাম পাখির পায়খানা। উল্লিখিত অংশ [অর্থাৎ গলীযা নাপাকীতে এক দিরহাম এবং খফীফা নাপাকীতে কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ]-এর অতিরিক্ত ক্ষমাযোগ্য নয়। [অর্থাৎ এর সাথে নামাজ বৈধ নয়।] বলা হয় যে, কাপড়ের এক-চতুর্থাংশের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যার চেয়ে কম কাপড়ে নামাজ বৈধ হয় না এবং বলা হয়, এর দ্বারা কাপড়ের ঐ অংশের চতুর্থাংশ উদ্দেশ্য যে অংশে নাপাকী লেগেছে। যেমন- আঁচল, আস্তিন ও কলি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এ

এক-চতুর্থাংশের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন [দৈর্ঘ ও প্রস্থে] এক বিঘত এক বিঘত দ্বারা। গাঢ় নাপাকীর ক্ষেত্রে এক মিছকাল পরিমাণ দিরহাম ধর্তব্য এবং তরল নাপাকীর ক্ষেত্রে প্রশস্ত তালুর এক দিরহাম পরিমাণ ধর্তব্য। তালুর প্রশস্ততা দ্বারা পরিপূর্ণ প্রশস্ত অংশ উদ্দেশ্য নয়; বরং তালুর গভীর [ভিতরের] অংশ উদ্দেশ্য, যা আঙ্গুলসমূহের জোড়ার মধ্যখান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالسَّيْفُ وَنَحْوُهُ بِالْمَسْحِ :

তরবারি পবিত্র করার পদ্ধতি : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) তরবারি পবিত্র করার পদ্ধতির বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, মাটিতে মোছার দ্বারাই তরবারী পাক হয়ে যায়। শর্ত হলো, এতে খোদাই-এর মাধ্যমে কিছু লেখা থাকতে পারবে না। দলিল হলো– এর মাঝে নাপাকী প্রবিষ্ট হতে পারে না। অনুরূপ ছুরি, আয়না ইত্যাদি। তাই এগুলোর ভিতর থেকে কোনো নাপাকী বের করারও কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এগুলোর উপরাংশে যে নাপাকী লেগে থাকে তা মোছার মাধ্যমেই পাক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি তরবারি, আয়না, ছুরি ইত্যাদির মধ্যে খোদাই করে কিছু লেখা থাকে যাতে ময়লা, নাপাকী ইত্যাদি লেগে থাকে, তবে তা ধৌত করা ব্যতীত পাক হবে না; বরং এগুলো ধোয়ার ক্ষেত্রে ব্রাশ দ্বারা ঘষাও জরুরি।

قَوْلُهُ وَالْبِسَاطُ يَجْرِى الْمَاءَ الخ :

বিছানা পাক করার পদ্ধতি : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেন, বিছানা একদিন একরাত পানি ঢালার দ্বারা পাক হয়। গ্রন্থকার যদিও এখানে শুধু لَيْلَة শব্দ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো একদিন একরাত। বিভিন্ন ব্যাখ্যা এরূপই উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْاَرْضُ وَالْاَجُرُّ الْمَفْرُوْشُ الخ :

ভূমি ও বিছানো ইট পাক করার পদ্ধতি : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) ভূমি ও বিছানো ইট পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করেন, যে ভূমি কিংবা বিছানো ইটে নাপাকী লেগেছে তা যদি শুকিয়ে যায় এবং নাপাকীর চিহ্ন দূরীভূত হয়ে যায় তবে তা পাক হয়ে যাবে এবং এতে নামাজ আদায় বৈধ হবে। তবে ঐ স্থানের মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ঐ স্থানে নামাজ আদায়ও বৈধ নয়। তাঁদের দলিল হলো, ঐ স্থানে নাপাকী লেগে থাকা অবশ্যম্ভাবী এবং নাপাকী দূরকারী কোনো জিনিসও পাওয়া যায়নি। এজন্য ঐ স্থান নাপাকই থাকবে। এর উপর নামাজ পড়া বৈধ হবে না। এ কারণেই তো এর দ্বারা তায়াম্মুম করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– ذَكَاةُ الْاَرْضِ يَبْسُهَا অর্থাৎ "শুষ্কতাই হলো ভূমির পবিত্রতা।" একই অর্থের আরেকটি হাদীস হলো– اَيُّمَا اَرْضٍ جَفَّتْ فَقَدْ ذَكَتْ "যে ভূমি শুকিয়ে যায় তা পাক হয়ে যায়।"

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের খণ্ডন হচ্ছে, নাপাকী দূরকারী কোনো কিছু পাওয়া যায়নি কথাটি ভুল; বরং নাপাকী দূরকারী জিনিস বিদ্যমান, তা হচ্ছে হারারাত তথা তাপ। অর্থাৎ যেমনিভাবে আগুন দ্বারা পাক করা যায় তেমনিভাবে হারারাত তথা তাপ দ্বারাও পাক করা যায়। চাই হারারাত কম বা বেশি হোক। ঐ স্থানের মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ নেই এজন্য যে, যে সমস্ত মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ সে সমস্ত মাটি কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا "তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা আয়াম্মুম কর।" অতএব খবরে ওয়াহেদ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে এর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। কারণ, উক্ত মাটির তাহারাত সাব্যস্ত হয়েছে খবরে ওয়াহেদ তথা ذَكَاةُ الْاَرْضِ يَبْسُهَا দ্বারা।

وَالْاَجُرُّ الْمَفْرُوْشُ বলে গ্রন্থকার ইটের সাথে 'বিছানো'র শর্ত এজন্য করেছেন যে, যে সমস্ত ইট একেবারেই বিছানো নয়; বরং নাড়াচাড়া করা যায় এবং এদিক-সেদিক নেওয়া যায় তবে তা শুকানোর মাধ্যমে পবিত্র হবে না। অনুরূপ গাছ ও ঘাসের হুকুমও। যদি তা কাটা না হয়; বরং ভূমিতেই বিদ্ধ থাকে তবে তা শুকানোর মাধ্যমে পাক হয়ে যাবে। আর যদি কাটা হয় তবে শুকানোর মাধ্যমে পবিত্র হবে না। কারণ, যেহেতু একে তুলে নিয়ে পানিতে ধৌত করা সম্ভব সেহেতু তা শুকানোর দ্বারা পাক হবে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا الْخُصُّ : গ্রন্থকার উল্লেখ করেন যে, খাসও ভূমি এবং বিছানো ইটের ন্যায়। অর্থাৎ খাস শুকানোর দ্বারা পাক হয়ে যায়– যদি এর চিহ্ন দূর হয়ে যায়। তবে খাস শব্দের সংজ্ঞা নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, খাস বলা হয় বাঁশের ঘরকে। কেউ বলেন, ঘাস বলা হয় "বাঁশের ঐ পর্দাকে যা ছাদের উপর দেওয়া হয়।" শারেহ (র.) বলেন, এখানে এ দ্বিতীয় অর্থটিই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَشَجَرٌ وَكَلَأٌ قَائِمٌ الخ :

গাছ ও ঘাস পবিত্র করার পদ্ধতি : গ্রন্থকার বলেন, গাছ ও ঘাস যদি ভূমিতেই থাকে, কর্তিত না হয়– আর তা যদি নাপাক হয়ে যায় তবে তা শুকানোর দ্বারাই পাক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তা কর্তিত হয় এবং পরে নাপাক হয়ে যায়, তবে তা ধৌত

করা ব্যতীত পাক হবে না। কেননা, ভূমি শুকানোর দ্বারা পাক হয়ে যাওয়া হচ্ছে খিলাফে কিয়াস [কিয়াসের পরিপন্থি] এবং এর সাথে সাথে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বস্তুও শুকানোর দ্বারা পাক হয়ে যাবে। কিন্তু যখন এ সমস্ত বস্তুকে ভূমি থেকে পৃথক করে ফেলা হবে তখন ভূমির হুকুম এগুলোর দিকে ফিরবে না। কেননা, এগুলো ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত নয়।

قَوْلُهُ وَقَدْرُ الدِّرْهَمِ مِنْ نَجَسٍ الخ :

নাপাকীর প্রকার : শারেহ (র.) লেখেন, গ্রন্থকার এ যাবৎ নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এখান থেকে তিনি নাপাকীর প্রকার ও এর ক্ষমাযোগ্য পরিমাণের বর্ণনা শুরু করছেন। আমরা নাপাকীর প্রকার ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। তবুও যেহেতু গ্রন্থকার এখানে প্রসঙ্গ এনেছেন তাই আমরাও সংক্ষেপে তা তুলে ধরছি। প্রকৃত নাপাকী কিংবা عَيْنُ النَّجَاسَةِ দু প্রকার– ১. নাজাসাতে গলীযা বা গাঢ় নাপাকী, ২. নাজাসাতে খফীফা বা হালকা [পাতলা] নাপাকী। প্রত্যেকটির হুকুম আমরা নিম্নে তুলে ধরছি–

নাজাসাতে গলীযা ও খফীফার হুকুম : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, নাজাসাতে গালীযা ও খফীফা যদি কাপড়ে কিংবা শরীরে লাগে তবে এর হুকুম হচ্ছে, তা যদি নাজাসাতে গালীযা হয় এবং এক দিরহাম কিংবা এর চেয়ে কম পরিমাণ অংশ হয় তবে তা ক্ষমাযোগ্য। অর্থাৎ তা সহ নামাজ আদায় করা বৈধ। আর যদি তা এক দিরহামের চেয়ে বেশি পরিমাণ হয় তবে তা ক্ষমাযোগ্য নয়। অর্থাৎ তা সহ নামাজ আদায় বৈধ নয়।

উক্ত নাপাকী যদি নাজাসাতে খফীফা হয় এবং তা যদি ছোট কাপড় কিংবা বড় কাপড়ের ঐ অংশ যার মধ্যে নাপাকী লেগেছে; যেমন– আঁচল, কলি ইত্যাদির এক-চতুর্থাংশ কিংবা এর চেয়ে কম পরিমাণ হয় তবে তা ক্ষমাযোগ্য। আর যদি এর চেয়ে বেশি পরিমাণ অংশ হয় তবে তা ক্ষমাযোগ্য নয়। অর্থাৎ তা সহ নামাজ আদায় সহীহ নয়।

নাজাসাতে গলীযা; যেমন– পেশাব, রক্ত, মদ, মুরগির, গাধা, বিড়াল ও ইঁদুরের পেশাব; ঘোড়া, গাধা ও শূকরের লাদ; গাভী, হাতি ইত্যাদির গোবর। আর নাজাসাতে খফীফা। যেমন– ঘোড়ার পেশাব, হালাল প্রাণীর পেশাব, হালাল পাখির মল ইত্যাদি।

قَوْلُهُ كَبَوْلٍ وَدَمٍ : এ بَوْل [পেশাব] দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পেশাব– যদিও তা দুর্বল কিংবা বাচ্চাদের পেশাব হয়। কেননা, তাদের পেশাবও নাপাক। অনুরূপ মানুষের প্রত্যেক ঐ জিনিস নাপাক যা শরীর থেকে নির্গত হওয়ার দ্বারা অজু কিংবা গোসল ওয়াজিব হয়। তবে এর দ্বারা হালাল প্রাণীও উদ্দেশ্য হতে পারে।

قَوْلُهُ وَبَوْلُ حِمَارٍ وَهِرَّةٍ وَفَارَةٍ : গাধার পেশাবের কথা গ্রন্থকার পৃথকভাবে এজন্য উল্লেখ করেছেন যে, যেন কেউ এর لُعَابٌ [লালা] -এর উপর কিয়াস করে এর পেশাবকেও مَشْكُوْك না বলে। বিড়াল ও ইঁদুর এজন্য পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যারা বিড়াল ও ইঁদুরের পেশাবকে পাক বলেন, তাদের অভিমতের যেন খণ্ডন হয়ে যায়। কেননা, কোনো কোনো ফকীহের নিকট এগুলোর পেশাব পাক।

এক দিরহাম ও এক-চতুর্থাংশের উৎস : নাজাসাতে গলীযা ও নাজাসাতে খফীফার এক দিরহাম কিংবা এর চেয়ে কম পরিমাণ অংশ এবং এক-চতুর্থাংশ কিংবা এর চেয়ে কম পরিমাণ অংশ ক্ষমাযোগ্য গুনাহের দিক থেকে নয়; বরং নামাজ সহীহ হওয়ার দিক থেকে, যা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। কেননা, ক্ষমাযোগ্য পরিমাণ নাপাকী রেখে দেওয়া এবং তা সহ নামাজ আদায় করা মাকরূহে তাহরীম। তা ধোয়া ওয়াজিব। এর চেয়ে কম পরিমাণ অংশ রেখে দেওয়া মাকরূহে তানযীহী। তা ধোয়া সুন্নত।

নাজাসাতে গলীযার ক্ষেত্রে এক দিরহাম-এর পরিমাণ গ্রহণ করা হয়েছে– কুলুপ [ঢিলা] দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার হাদীসসমূহ থেকে। কেননা, এটি স্পষ্ট যে, এসব ঢিলা পাক করার জন্য নয়; বরং ঐ স্থানকে শুষ্ক করার জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর উক্ত স্থান মূলত এক দিরহাম পরিমাণই। আর এ স্থান থেকেই নাজাসাতে গলীযা-এর ক্ষেত্রে এক দিরহাম পরিমাণ নাপাকী ক্ষমাযোগ্য বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ رُبُعُ الْمَوَاضِعِ الَّذِىْ الخ : এর সারসংক্ষেপ বিবরণ হচ্ছে, কাপড়ের ঐ পরিপূর্ণ অংশের এক-চতুর্থাংশ উদ্দেশ্য, যে অংশে নাপাকী লেগেছে। যেমন– আস্তিন, আঁচল, কলি ইত্যাদি। অর্থাৎ এসব অংশের এক-চতুর্থাংশ উদ্দেশ্য। অনুরূপ ঐ অঙ্গের এক-চতুর্থাশ উদ্দেশ্য যার উপর নাপাকী লাগে। যেমন– হাত, পা ইত্যাদি। আল-মুহীত, তুহফা ও মুজতবা নামক গ্রন্থাবলিতে এ অভিমতকেই সহীহ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاعْتُبِرَ وَزْنُ الدِّرْهَمِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে 'দিরহাম'-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। কখনো তিনি তালু দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেছেন। কখনো এক মিছকাল দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন, আর এক মিছকাল বিশ কীরাত-এর সমান। এ দুই অভিমতের মাঝে সামঞ্জস্যবিধান এভাবে করা হয় যে, প্রথম ব্যাখ্যা ঐ সুরতে, যখন নাজাসাতে গলীযা পাতলা হয়, আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ঐ সুরতে যখন নাজাসাতে গলীযাটা গাঢ় হবে।

وَدَمُ السَّمَكِ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَلُعَابُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ لَا يُنَجِّسُ طَاهِرًا لِاَنَّهُ مَشْكُوْكٌ فَالطَّاهِرُ لَا يَزُوْلُ طَهَارَتُهُ بِالشَّكِّ وَبَوْلٌ اُنْتُضِحَ مِثْلَ رُءُوْسِ الْاِبَرِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَمَاءٌ وَرَدَ عَلٰى نَجَسٍ نَجَسٌ كَعَكْسِهٖ اَىْ كَمَا اَنَّ الْمَاءَ نَجَسٌ فِىْ عَكْسِهٖ وَهُوَ وُرُوْدُ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَاءِ لَا رَمَادُ قَذَرٍ وَمِلْحٌ كَانَ حِمَارًا اَىْ لَا يَكُوْنُ شَيْءٌ مِنْهُمَا نَجَسًا وَفِىْ رَمَادِ الْقَذَرِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) وَيُصَلِّىْ عَلٰى ثَوْبٍ بِطَانَتُهُ نَجَسَةٌ اَىْ اِذَا لَمْ يَكُنِ الثَّوْبُ مُضَرَّبًا وَعَلٰى طَرَفِ بِسَاطٍ طَرَفٌ اٰخَرُ مِنْهُ نَجَسٌ يَتَحَرَّكُ اَحَدُهُمَا بِتَحْرِيْكِ الْاٰخَرِ اَوْ لَا وَاِنَّمَا قَالَ هٰذَا اِحْتِرَازًا عَنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ اِنَّمَا يَجُوْزُ الصَّلٰوةُ عَلَى الطَّرَفِ الْاٰخَرِ اِذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ اَحَدُ الطَّرَفَيْنِ بِتَحْرِيْكِ الْاٰخَرِ .

অনুবাদ : মাছের রক্ত নাপাক নয়, আর শূকর ও গাধার লালা পাক বস্তুকে নাপাক করে না। কেননা, তা সন্দেহযুক্ত। অতএব, পবিত্র বস্তুর পবিত্রতা সন্দেহের দ্বারা দূর হয় না। পেশাবের ঐ ফোঁটা, যা সুই-এর মাথার ন্যায় তা নাপাককারী কিছু নয়। যে পানি নাপাকীর উপর পতিত হয় তা নাপাক। যেরূপ এর পরিপন্থি [হলে নাপাক হয়ে যায়]। অর্থাৎ যেমন পানি নাপাক হয়ে যায় এর পরিপন্থি হলে। তা হলো, নাপাকী পানিতে পতিত হওয়া। ছাই নাপাক নয় এবং ঐ লবণও নাপাক নয় যা গাধা ছিল। অর্থাৎ এ দুয়ের কোনো একটিও নাপাক হবে না। নাপাকীর কয়লা [পবিত্র হওয়া] -এর ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) মতানৈক্য করেন। ঐ কাপড়ের উপর নামাজ পড়া জায়েজ আছে যার ভিতরের পাট নাপাক। অর্থাৎ যখন কাপড় দুটি একত্রে সেলাইকৃত না হবে। এমন বিছানার এক প্রান্তেও নামাজ আদায় জায়েজ আছে, যার অপর প্রান্তে নাপাকী রয়েছে। এক প্রান্তে নাড়া দেওয়ার দ্বারা অপর প্রান্ত নড়ুক চাই না নড়ুক। গ্রন্থকার এ কথা বলে ঐ ব্যক্তির অভিমত থেকে বিরত রয়েছেন যিনি বলেন যে, এর দ্বিতীয় প্রান্তে নামাজ পড়া তখন জায়েজ যখন এক প্রান্তে নাড়া দেওয়ার দ্বারা অপর প্রান্ত না নড়ে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَدَمُ السَّمَكِ لَيْسَ بِنَجَسٍ :

মাছের রক্তের হুকুম : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মাছের রক্ত নাপাক নয়। আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন যে, এর দলিল হলো, মাছের রক্ত মূলত রক্ত নয়; বরং তা লাল পানি। এর দলিল হলো– যখন প্রকৃত রক্তকে রৌদ্রে রাখা হয় তখন তা রৌদ্রের তাপে কালো হয়ে যায়, আর মাছের রক্ত রৌদ্রের তাপে রাখলে তা সাদা হয়ে যায়। অতএব, যেহেতু তা রক্ত নয় সেহেতু তা নাপাকও নয়।

قَوْلُهُ وَلُعَابُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ لَا يُنَجِّسُ طَاهِرًا :

শূকর ও গাধার লালা নাপাককারী কিছু নয় : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, শূকর ও গাধার লালা কোনো পবিত্র বস্তুকে নাপাক করে না। কারণ, গাধা ও শূকরের লালা হচ্ছে মাশকূক বা সন্দেহযুক্ত। তা সহ নামাজ আদায় করা বৈধ। এর আলোচনা

গত হয়ে গেছে। আর شَكّ [সন্দেহ]-এর দ্বারা يَقِيْنِيْ [দৃঢ়] বিষয় দূরীভূত হয় না। অর্থাৎ শূকর ও গাধার লালা মাশকূক হওয়ার কারণে তা পবিত্র এবং يَقِيْنِيْ বিষয়, আর এ يَقِيْنِيْ তাহারাত شَكّ -এর দ্বারা দূর হয় না। অতএব, তা অন্য কোনো পবিত্র বস্তুকে নাপাককারীও নয়।

قَوْلُهُ مِثْلُ رُءُوْسِ الْإِبَرِ : إِبَرٌ শব্দটি إِبْرَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– সুই, যাতে সুতা ঢুকিয়ে কাপড় সেলাই করা হয়। সুই-এর মাথার শর্ত এজন্য করেছেন যে, যদি সুই -এর অপর দিক পরিমাণ পেশাবের ফোঁটা লাগে তবে তা ধৌত করা আবশ্যক।

নাপাকীর কয়লা নাপাক নয় : বিকায়া গ্রন্থকার বলেন, কোনো নাপাকীকে যখন জ্বালানো হয় তখন তা আর নাপাক থাকে না; বরং পাক হয়ে যায়। কারণ, আগুনে জ্বলার দ্বারা নাপাকীর প্রভাব থাকে না; বরং তা জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়। অনুরূপ ঐ গাধার হুকুম, যা লবণে পতিত হয়েছে আর লবণ উক্ত গাধাকেও লবণ বানিয়ে দিয়েছে এবং গাধার কোনো চিহ্ন বাকি থাকেনি, তবে তা পাক হয়ে যাবে। এর কারণ হলো, গাধার ذَاتٌ [অস্তিত্ব] পরিবর্তন হওয়ার দ্বারা এর وَصْف [গুণ] -ও দূর হয়ে যায়। কেননা, যখন ذَاتٌ পরিবর্তন হয়ে যায় তখন এর وَصْف -ও পরিবর্তন হয়ে যায়।

قَوْلُهُ ثَوْبٌ بِطَانَتُهُ نَجَسَةٌ : بِطَانَة শব্দের بَاء অক্ষরে যের হবে। অর্থাৎ কাপড়ের ভিতরের অংশ কিংবা গেঞ্জি। উদ্দেশ্য হলো, যখন দুই পাটবিশিষ্ট কাপড় হয়, যার এক পাট পাক এবং অপর পাট নাপাক। আর নাপাক পাটের উপর পাক পাটটি বিছিয়ে এর উপর নামাজ পড়া বৈধ। শর্ত হলো কাপড় দুটি পরস্পরে সেলাইকৃত হতে পারবে না। কাপড় দুটি পৃথক পৃথক হওয়ার কারণে তা দুই কাপড়ের হুকুমে। কিন্তু যদি তা দ্বিতীয় কাপড়টির সঙ্গে সেলাইকৃত হয় তবে তা এক কাপড়ের হুকুমে হবে এবং এর উপর নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ إِذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدُ الخ : কোনো কোনো ফকীহ বলেন, এমন দুই পাটবিশিষ্ট কাপড়ের এক প্রান্তে নামাজ আদায় সহীহ নয় যার অপর প্রান্তে নাপাকী রয়েছে এবং এক প্রান্তে নাড়া দেওয়ার দ্বারা অপর প্রান্ত নড়ে। কারণ, যদি কাপড়টি ছোট হয় এবং এক প্রান্তে নাড়া দেওয়ার দ্বারা অপর প্রান্ত নড়ে তবে উভয় প্রান্ত একই হুকুমে হবে। যেন সে নাপাকীর উপরই নামাজ পড়েছে। আর যে সকল ফকীহ এমন শর্ত করেন না তাঁদের দলিল হলো, বিছানা ভূমির ন্যায়। আর ভূমির ক্ষেত্রে শুধু নামাজের জায়গা পাক হওয়া শর্ত। অতএব, বিছানার ক্ষেত্রেও সে যে অংশে নাপাকী নেই; বরং পবিত্র সে অংশে নামাজ পড়েছে। তাই তার নামাজ হয়ে যাবে।

وَفِىْ ثَوْبٍ ظَهَرَ فِيْهِ نَدْوَةُ ثَوْبٍ رَطْبٍ نَجِسٍ لُفَّ فِيْهِ لَا كَمَا يَقْطُرُ شَيْءٌ لَوْ عُصِرَ اَىْ ظَهَرَ فِيْهِ النَّدْوَةُ بِحَيْثُ لَا يَقْطُرُ الْمَاءُ لَوْ عُصِرَ اَوْ وَضَعَ رَطْبًا عَلٰى مَا طُيِّنَ بِطِيْنٍ فِيْهِ سِرْقِيْنٌ وَيَبِسَ اَوْ تَنَجَّسَ طَرَفٌ مِنْهُ فَنَسِيَهُ وَغَسَلَ طَرَفًا اُخَرَ بِلَا تَحَرٍّ اَىْ لَا يُشْتَرَطُ التَّحَرِّىْ فِىْ غَسْلِ طَرَفٍ مِنَ الثَّوْبِ كَحِنْطَةٍ بَالَ عَلَيْهَا حُمُرٌ تَدُوْسُهَا فَقُسِّمَ اَوْ وُهِبَ بَعْضُهَا فَيَطْهُرُ مَا بَقِىَ اِعْلَمْ اَنَّهُ اِذَا وُهِبَ بَعْضُهَا اَوْ قُسِّمَتِ الْحِنْطَةُ يَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقِسْمَيْنِ طَاهِرًا اِذْ يَحْتَمِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقِسْمَيْنِ اَنْ يَكُوْنَ النَّجَاسَةُ فِى الْقِسْمِ الْاٰخَرِ فَاعْتُبِرَ هٰذَا الْاِحْتِمَالُ فِى الطَّهَارَةِ لِمَكَانِ الضَّرُوْرَةِ۔

অনুবাদ : এমন কাপড়ে নামাজ আদায় করা জায়েজ, যার মধ্যে "নাপাক ভিজা ভাঁজকৃত কাপড়ের" আর্দ্রতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এমন হয়নি যে, যে কাপড়ে আর্দ্রতা প্রকাশ পেয়েছে তা নিংড়ালে পানি টপকে পড়ে। অর্থাৎ এতে নামাজ আদায় করা তখন জায়েজ হবে যখন নাপাক ভিজা কাপড়ের আর্দ্রতা শুধু এতে প্রকাশ পেয়েছে, তা নিংড়ানোর দ্বারা পানি টপকে পড়ে না। এমন কাপড়েও নামাজ আদায় করা বৈধ, যা ভিজাবস্থায় এমন স্থানে রেখেছে, যা গোবর দ্বারা লেপা হয়েছে এবং তা শুকিয়ে গেছে, কিংবা এমন কাপড় যার এক প্রান্ত নাপাক তবে তা কোন্ প্রান্ত সে ভুলে গেছে এবং চিন্তাভাবনা ব্যতীত দ্বিতীয় প্রান্ত ধুয়ে ফেলেছে– [তবে এতে নামাজ আদায় বৈধ]। অর্থাৎ কাপড়ের এক প্রান্ত ধোয়ার ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা করা শর্ত নয়। যেমন ঐ গম পাক যার উপর মাড়ানোর সময় গাধা পেশাব করে দিয়েছে। অতঃপর এ গমকে বণ্টন করা হয়েছে, কিংবা এর কিছু অংশ হিবা [দান] করে দেওয়া হয়েছে, তবে গমের বাকি অংশ পাক হয়ে যাবে। জেনে রেখ যে, যখন গমের কিছু অংশ হিবা কিংবা বণ্টন করা হয়েছে তখন উভয় প্রকারের প্রত্যেকটিই পাক। কেননা, সম্ভাবনা রয়েছে যে, উভয় প্রকারের প্রত্যেকটি এমন যে, নাপাক গমগুলো দ্বিতীয়ভাগে; এ ভাগে নয়। তাই জরুরতের কারণে তাহারাতের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা ধরা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَىْ ظَهَرَ فِيْهِ النَّدْوَةُ : অর্থাৎ একটি ভিজা ভাঁজকৃত নাপাক কাপড় অন্য একটি শুষ্ক পাক কাপড়ের উপর রাখা হয়েছে আর উক্ত নাপাক ভিজা কাপড়ের আর্দ্রতা শুষ্ক পাক কাপড়টির উপর প্রকাশ পেয়েছে, তবে এত বেশি প্রকাশ পায়নি যে, তা নিংড়ানোর দ্বারা পানি টপকে পড়ে, তবে এ শুষ্ক কাপড়টির উপর নামাজ আদায় করা বৈধ। আর যদি উক্ত শুষ্ক কাপড়টি এত বেশি ভিজে যায় যে, যদি তা নিংড়ানো হয়, তবে পানি টপকে পড়বে তাহলে এতে নামাজ আদায় করা বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَضَعَ رَطْبًا عَلٰى مَا طُيِّنَ : অর্থাৎ এমন মাটি, যা গোবর ও ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি মিশ্রিত। আর যদি ভিজা কাপড়কে উক্ত নাপাকী মিশ্রিত মাটির সঙ্গে মিলিত করে রাখা হয়– চাই মিলিত মাটি শুকিয়ে যাক কিংবা মিলিত নাপাকী শুকিয়ে যাক– এখন যদি ভিজা কাপড়টিতে উক্ত নাপাকীর এ পরিমাণ প্রভাব পড়েছে যে, শরিয়ত তা মাফ করে দিয়েছে, তবে কাপড় পাক থাকবে। পক্ষান্তরে যদি নাপাকী মিশ্রিত মাটি ভিজা হয় কিংবা নাপাকীটা তরল হয়, আর ভিজা কাপড় এর উপর রাখা হয় তবে উক্ত কাপড় নাপাক হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لَا يَشْتَرِطُ التَّحَرِّىْ : এর সারমর্ম হচ্ছে, এ কথা নিশ্চিত জানা আছে যে, কাপড়ের যে-কোনো এক প্রান্তে নাপাকী রয়েছে, তবে ঐ প্রান্তটি নির্দিষ্টভাবে জানা নেই যে, এটি কোন্ প্রান্ত কিংবা জানা ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে ভুলে গেছে– তাই সে চিন্তা ব্যতীত যে-কোনো একটি প্রান্তকে ধুয়ে নিয়েছে– তবে তার পূর্ণ কাপড় পাক হয়ে যাবে। এজন্য সব প্রান্তের নাপাকীর ক্ষেত্রেই সন্দেহ হয়ে গেছে। আর সন্দেহের দ্বারা কাপড় নাপাক হয় না। তবে কোনো কোনো ফকীহ বলেন, এতেও تحرى বা চিন্তাভাবনা করা ওয়াজিব। যদি নির্দিষ্ট একদিকে নাপাকী বলে প্রবল ধারণা হয় তবে উক্ত প্রান্ত ধৌত করা আবশ্যক। অন্যথায় তথা যদি নির্দিষ্ট কোনো দিকে নাপাকী বলে প্রবল ধারণা না হয় তবে পূর্ণ কাপড় ধৌত করবে।

قَوْلُهُ حُمُرٌ تَدُوْسُهَا : حُمُرٌ শব্দটি حِمَارٌ-এর বহুবচন। অর্থ– গাধা। এ গাধার কথা বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাধার পেশাব সর্বসম্মতিক্রমে নাজাসাতে গলীযা। অতএব, এর হুকুম জানার দ্বারা অন্যান্য জিনিসের হুকুম আরো উত্তমরূপে জানা যাবে। অর্থাৎ গাধার পেশাব নাজাসাতে গলীযা হওয়া সত্ত্বেও এর দ্বারা যখন গম নাপাক হচ্ছে না তখন অন্যান্য জানোয়ারের পেশাব কিংবা অন্য কোনো পানীয় নাপাকী দ্বারা আরো উত্তমরূপে নাপাক হবে না।

قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ هٰذَا الْاِحْتِمَالُ : অর্থাৎ যে গমের মধ্যে মাড়ার সময় গাধা পেশাব করেছে তা যদি বণ্টন করা হয় কিংবা এর থেকে কিছু হিবা করা হয়, তবে তা পাক। কেননা, এখানে জানা নেই যে, কোন গমগুলোতে গাধার পেশাব লেগেছে। তাই সম্ভাবনা রয়েছে যে, বণ্টনকৃত প্রত্যেক ভাগে কিংবা হিবাকৃত অংশে কিংবা বাকি অংশের প্রত্যেকটির মধ্যেই পেশাব লেগেছে। তাই তাহারাতের ক্ষেত্রে এ اِحْتِمَالْ ও সম্ভাবনা জরুরতের কারণে ধর্তব্য হয়েছে। কেননা, সমস্ত গমের মধ্যে নিশ্চিতভাবে পবিত্রতা বিদ্যমান। আর এর বিপরীত দিক তথা নাপাকীও অনির্দিষ্টভাবে এতে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। গমগুলো বণ্টন করার পর প্রত্যেক ভাগেই নাপাকী থাকার সন্দেহ রয়েছে। তাই সবগুলোতে নিশ্চিতরূপে যে বিষয়টি তথা তাহারাত বিদ্যমান, এর উপরই আমল করা হবে।

فَصْلٌ اَلْاِسْتِنْجَاءُ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ اَىْ خَارِجٍ مِنْ اَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ غَيْرِ النَّوْمِ وَالرِّيْحِ فَاِنْ قُلْتَ اِنْ قُيِّدَ الْحَدَثُ بِالْخَارِجِ مِنْ اَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ فَاسْتِثْنَاءُ النَّوْمِ مُسْتَدْرَكٌ وَاِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِهٖ فَفِىْ كُلِّ حَدَثٍ غَيْرِ النَّوْمِ وَالرِّيْحِ يَكُوْنُ الْاِسْتِنْجَاءُ سُنَّةً فَيُسَنُّ فِى الْفَصْدِ وَنَحْوِهٖ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ قُلْتُ يُقَيَّدُ الْحَدَثُ بِالْخَارِجِ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ وَاسْتِثْنَاءُ النَّوْمِ غَيْرُ مُسْتَدْرَكٍ لِاَنَّهٗ مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ لِاَنَّ النَّوْمَ اِنَّمَا يَنْقُضُ لِاَنَّ فِيْهِ مَظِنَّةُ الْخُرُوْجِ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ بِنَحْوِ حَجَرٍ يَمْسَحُهٗ حَتّٰى يُنَقِّيَهٗ بِلَا عَدَدٍ سُنَّةً اَىْ لَيْسَ فِيْهِ عَدَدٌ مَسْنُوْنٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) .

অনুচ্ছেদ : এস্তেঞ্জা

অনুবাদ : ঘুম এবং হাওয়া [পাদ] ব্যতীত প্রত্যেক হদস থেকে এস্তেঞ্জা করবে। অর্থাৎ এমন হদস, যা পায়খানা ও পেশাবের কোনো এক রাস্তা দিয়ে বের হয়। যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, যদি হদসকে পায়খানা-পেশাবের রাস্তার কোনো একটি দিয়ে নির্গত হওয়ার সাথে শর্তারোপ করা হয় তবে ঘুমকে পৃথককরণ অনর্থক হয়ে যায়। [কারণ, مُسْتَثْنٰى مِنْهُ তথা نَوْم - سَبِيْلَيْن-এর কোনো একটি থেকে নির্গত নয়।] আর যদি উক্ত শর্তারোপ না করা হয় তবে ঘুম ও হাওয়া ব্যতীত প্রত্যেক হদস থেকেই এস্তেঞ্জা করা সুন্নত হওয়া আবশ্যক হয়। অতএব, সিঙ্গা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সুন্নত হয়। অথচ মাসআলা এমনটি নয়। এর উত্তরে আমরা বলব, হদসকে سَبِيْلَيْن-এর কোনো একটি থেকে নির্গত বস্তুর সাথে শর্তারোপ করা হবে। আর ঘুম (نَوْم)-এর পৃথককরণ অনর্থক নয়। কেননা, ঘুম (نَوْم)-ও এ [سَبِيْلَيْن-এর কোনো একটি] থেকে। কারণ, স্বয়ং ঘুম অজু ভঙ্গকারী নয়; বরং ঘুম এজন্য অজু ভঙ্গের কারণ যে, এতে سَبِيْلَيْن-এর কোনো একটি থেকে কিছু নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাথর ইত্যাদির দ্বারা أَحَدُ السَّبِيْلَيْن-কে মুছবে, যাতে করে পরিষ্কার হয়ে যায়। সংখ্যাবিহীন তা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। অর্থাৎ আমাদের নিকট পাথর দ্বারা এস্তেঞ্জা করার ক্ষেত্রে সংখ্যা [তথা তিন পাথর] হওয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা নয় [বরং মোস্তাহাব]। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ بِنَحْوِ حَجَرٍ يَمْسَحُهٗ الخ : بِنَحْوِ حَجَرٍ-এর সম্পর্ক (تَعَلُّق) اَلْاِسْتِنْجَاءُ শব্দের সাথে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পাথর কিংবা এ জাতীয় যে-কোনো পবিত্র জিনিস দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে। এর মাধ্যমে নাপাকী দূর হয়ে যাবে। যেমন– মাটি, কাপড়, টিসু ইত্যাদি। তবে আমাদের নিকট পাথরের সংখ্যা তথা তিন পাথর হওয়া সুন্নত নয়; বরং যদি এক কিংবা দুই পাথর কিংবা তিন পাথর কিংবা চার পাথর মোটকথা, নাপাকী পরিষ্কার করার জন্য যতটির প্রয়োজন ব্যবহার করবে। তবে যখন একটি কিংবা দুটি পাথর দ্বারা ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন তিনটি ব্যবহার করা সুন্নত। মূলত এখানে মাসআলা তিনটি– ১. اَلْاِنْقَاءُ তথা নাপাকী পরিষ্কার করা। ২. تَثْلِيْثُ الْاَحْجَارِ তথা তিন পাথর ব্যবহার করা। ৩. اَلْاِيْتَارُ তথা বিজোড় পাথর ব্যবহার করা।

اِنْقَاء তথা নাপাকী পরিষ্কার করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। تَثْلِيْثُ الْاَحْجَارِ তথা পাথর তিনটি ব্যবহার করা ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে ওয়াজিব। পক্ষান্তরে আহনাফ ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে তা সুন্নত। اَلْاِيْتَارُ তথা বিজোড় ঢিলা ব্যবহার করা সর্বসম্মতিক্রমে মোস্তাহাব।

اِنْقَاء ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো, এস্তেঞ্জা সম্পর্কিত সমস্ত হাদীস। কেননা, এমন একটি হাদীসও বর্ণিত নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পায়খানা-পেশাব করেছেন আর ঢিলা ও পানি দ্বারা কিংবা শুধু ঢিলা দ্বারা কিংবা পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করেননি। অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, اِنْقَاء ওয়াজিব।

تَثْلِيْثُ الْاَحْجَارِ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَاِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ .

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ বাথরুমে যাবে তখন যেন সে তিনটি পাথর সাথে করে নিয়ে যায়। এর দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে। কারণ, এর জন্য তিন পাথরই যথেষ্ট। –[আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি পাথর দ্বারা ঢিলা করার জন্য সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন।

আহনাফ ও ইমাম মালেক (র.)-এর দলিলও উক্ত হাদীস। তবে وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি পাথর নিয়ে বাথরুমে যেতে বলেছেন এবং এ তিনটি পাথর দ্বারা কি করা হবে তাও বলে দিয়েছেন যে, এর দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করা হবে এবং এ তিনটি পাথর পবিত্রতা হাসিলের জন্য যথেষ্ট। অতএব, এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনটি পাথর নেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং এ তিনটি পাথর দ্বারা সাধারণত পবিত্রতা হাসিল হয়। তাই তিনি তিনটি পাথর নেওয়ার কথা বলেছেন। অন্যথায় যদি এক পাথর দ্বারা পবিত্রতা হাসিল হয় তবে তিন পাথর ব্যবহার করা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। অনুরূপ যতটি পাথর দ্বারা পবিত্রতা হাসিল হয় ততটি ব্যবহার ওয়াজিব।

اِيْتَارْ মোস্তাহাব হওয়ার দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি পাথর দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে সে যেন বিজোড় করে। যে বিজোড় করল সে উত্তম কাজ করল, আর যে বিজোড় করল না তার কোনো অসুবিধা নেই।" এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এস্তেঞ্জায় اِيْتَارْ মোস্তাহাব মাত্র।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– বাদায়িউস সানায়ে' ১ : ১০৯, বাহরুর্ রায়িক ১ : ৪১৬, মা'আরিফুস সুনান ১ : ১১২ -১২৪, দরসে তিরমিযী ১ : ২০৫ – ২১৪]

وَهِىَ ثَلٰثَةُ اَحْجَارٍ يُدْبِرُ بِالْحَجَرِ الْاَوَّلِ وَيُقْبِلُ بِالثَّانِىْ وَيُدْبِرُ بِالثَّالِثِ صَيْفًا وَيُقْبِلُ الرَّجُلُ الْاَوَّلَ وَالثَّالِثَ شِتَاءً اَلْاِدْبَارُ اَلْاِذْهَابُ اِلٰى جَانِبِ الدُّبُرِ وَالْاِقْبَالُ ضِدُّهٗ ثُمَّ اَنَّ فِى الْمَسْحِ اِقْبَالًا وَاِدْبَارًا مُبَالَغَةً فِى التَّنْقِيَةِ وَفِى الصَّيْفِ يُدْبِرُ بِالْحَجَرِ الْاَوَّلِ لِاَنَّ الْخُصْيَةَ فِى الصَّيْفِ مُدَلَاةٌ فَلَا يُقْبِلُ اِحْتِرَازًا عَنْ تَلْوِيْثِهَا ثُمَّ يُقْبِلُ ثُمَّ يُدْبِرُ مُبَالَغَةً فِى التَّنْظِيْفِ وَفِى الشِّتَاءِ غَيْرَ مُدْلَاةٍ فَيُقْبِلُ بِالْاَوَّلِ لِاَنَّ الْاِقْبَالَ اَبْلَغُ فِى التَّنْقِيَةِ ثُمَّ يُدْبِرُ ثُمَّ يُقْبِلُ لِلْمُبَالَغَةِ وَاِنَّمَا قُيِّدَ بِالرَّجُلِ لِاَنَّ الْمَرْأَةَ تُدْبِرُ بِالْاَوَّلِ اَبَدًا لِئَلَّا يَتَلَوَّثُ فَرْجُهَا وَالصَّيْفُ وَالشِّتَاءُ فِىْ ذٰلِكَ سَوَاءٌ.

অনুবাদ : তিন পাথর দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে। প্রথম পাথরকে সামনে থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে, দ্বিতীয় পাথরটি পিছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে এবং তৃতীয় পাথরটি সামনে থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে, এটা হবে গ্রীষ্মকালে। আর শীতের মৌসুমে পুরুষ প্রথম ও তৃতীয় পাথরটি পিছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে। اِدْبَارْ অর্থ– পিছনের দিকে টেনে নেওয়া। আর اِقْبَالْ এর বিপরীত। অতঃপর মাসেহের ক্ষেত্রে اِدْبَارْ [পিছনে নেওয়া] ও اِقْبَالْ [সামনে আনা] হয় ভালোভাবে পরিষ্কার করার জন্য। গরমের মৌসুমে প্রথম পাথরকে সামনে থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে। কেননা, গরমের মৌসুমে অণ্ডকোষ লটকে [ঝুলন্ত] থাকে। তাই [তখন] সামনের দিকে টেনে আনবে না, যাতে করে অণ্ডকোষের সাথে ময়লা না লেগে যায়। অতঃপর اِقْبَالْ [সামনের দিকে] করবে, অতঃপর اِدْبَارْ [পিছনের দিকে] করবে, যেন ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর শীতের মৌসুমে অণ্ডকোষ ঝুলন্ত থাকে না। তাই প্রথম পাথরকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে আসবে, যেন আরো ভালোভাবে পরিষ্কার করা যায়। অতঃপর ভালোভাবে পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে পিছনের দিকে টেনে নেবে, অতঃপর সামনের দিকে টেনে নেবে। পুরুষের সাথে এজন্য শর্তারোপ করা হয়েছে যে, মহিলা সর্বদাই প্রথম পাথরকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে, যেন যোনিতে ময়লা না লাগে। এ ক্ষেত্রে গরম ও শীত বরাবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهِىَ ثَلٰثَةُ اَحْجَارٍ يُدْبِرُ الخ :

ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করার পদ্ধতি : মূলত মলসমূহ ত্যাগ করার পরও ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করা হয় এবং পেশাব করার পরও ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করা হয়। গ্রন্থকার মলমূত্র থেকে ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে, মহিলা সর্বকালে এবং পুরুষ শুধু গ্রীষ্মকালে প্রথম ঢিলাটি সামনে থেকে পিছনের দিকে নেবে, দ্বিতীয় ঢিলাটি পিছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে এবং তৃতীয় ঢিলাটি সামনে থেকে পিছনের দিকে নেবে। শুধু পুরুষ শীতকালে প্রথম ঢিলাটি পিছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে, অতঃপর দ্বিতীয় ঢিলাটি সামনে থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে এবং তৃতীয় ঢিলাটি পিছন থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে।

গ্রীষ্মকালে পুরুষের অণ্ডকোষ ঝুলন্ত থাকে, তাই গ্রীষ্মকালে সে প্রথম ঢিলাটি সামনে থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে, যেন তার অণ্ডকোষের সাথে নাপাকী না লাগে। আর শীতকালে তার অণ্ডকোষ ভিতরে থাকে– ঝুলে থাকে না, তাই এর সঙ্গে নাপাকী লাগার সম্ভাবনা নেই। অতএব, শীতকালে পুরুষ প্রথম ঢিলাই পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে।

মহিলারা সর্বকালেই প্রথম ঢিলাটি সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে। তাদের ক্ষেত্রে শীত ও গ্রীষ্মকালের মধ্যে কোনো তফাত নেই। কারণ, সে যদি প্রথম ঢিলাটি পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসে তবে সম্ভাবনা রয়েছে যে, নাপাকী তার যোনির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাবে। তাই সে প্রথম ঢিলাটি সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে। অতঃপর এর দ্বারা যখন কিছুটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন দ্বিতীয় ঢিলাটি পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে।

وَغَسْلُهُ بَعْدَ الْحَجَرِ اَدَبٌ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْخِى الْمَخْرَجَ مُبَالَغَةً وَيَغْسِلُهُ بِبَطْنِ اِصْبَعٍ اَوْ اِصْبَعَيْنِ اَوْ ثَلٰثِ اَصَابِعَ لَا بِرُءُوْسِهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَانِيًا وَيَجِبُ فِىْ نَجَسٍ جَاوَزَ الْمَخْرَجَ اَوْ اَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ هٰذَا مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ مَا تَجَاوَزَ اَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يُعْتَبَرُ مَا تَجَاوَزَ الْمَخْرَجَ مَعَ مَوْضِعِ الْاِسْتِنْجَاءِ وَلَا يَسْتَنْجِىْ بِعَظْمٍ وَرَوْثٍ وَيَمِيْنٍ وَكُرِهَ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِى الْخَلَاءِ وَلَا يَخْتَلِفُ هٰذَا عِنْدَنَا فِى الْبُنْيَانِ وَالصَّحْرَاءِ ـ

অনুবাদ : পাথর [ঢিলা] ব্যবহারের পর মলমূত্রের স্থল ধৌত করা মোস্তাহাব। অতএব, প্রথমে উভয় হাত ধৌত করবে। অতঃপর মলমূত্রের স্থলকে ভালোভাবে পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ঢিলা করবে। অতঃপর তা এক আঙ্গুল কিংবা দুই আঙ্গুল কিংবা তিন আঙ্গুলের পেট দ্বারা ধৌত করবে; আঙ্গুলের মাথা দ্বারা নয়। অতঃপর দ্বিতীয়বার হস্তদ্বয়কে ধৌত করবে। আর যে নাপাকী [মলমূত্রের] স্থল থেকে অতিবাহিত হয়ে গেছে তা যদি এক দিরহামের চেয়ে বেশি পরিমাণ হয় তবে তা ধৌত করা ওয়াজিব। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব। তা হলো, [মলমূত্রের] স্থল অতিক্রমকারী নাপাকী এক দিরহামের বেশি হওয়া। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট এস্তেঞ্জার স্থলের নাপাকীসহ (তা) অতিক্রমকারী নাপাকী ধর্তব্য। হাড়, লাদ এবং ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে না। বাথরুমে কিবলার দিকে মুখ করে কিংবা কিবলার দিকে পিঠ করে [বসা] মাকরূহ। আমাদের নিকট বসতি ও মরুভূমি এলাকায় [মলমূত্র ত্যাগ ও পেশাবের সময় কিবলার দিকে মুখ করা কিংবা পিঠ করার মাঝে] কোনো পার্থক্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পেশাব থেকে এস্তেঞ্জা করার পদ্ধতি : আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, পেশাবের পর এস্তেঞ্জা করার পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লামা জাহেদী (র.) বলেন, হাত দ্বারা লিঙ্গকে ধরবে এবং দেয়াল কিংবা পাথর কিংবা ঢিলার সাথে একে মুছবে। শায়খ শারাম্বলালী (র.) বলেন, মানুষের জন্য আবশ্যক হলো, সে এমনভাবে এস্তেঞ্জা করবে যে, তার পেশাবের চিহ্ন দূর হয়ে যায় এবং তার অন্তর পেশাবের চিহ্ন দূর হয়ে গেছে বলে আশ্বস্ত হয়। অর্থাৎ সে ঢিলা ধরে কিছুক্ষণ চলবে, ঘষবে এবং উঠবে, বসবে ইত্যাদি। 'মুকাদ্দামাতুল গাযীরাহ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, পেশাবের পর মহিলারা ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে না; বরং তারা পেশাবের পর কিছু সময় বসে থাকবে অতঃপর পানি দ্বারা তা পরিষ্কার করে নেবে।

قَوْلُهُ وَغَسْلُهُ بَعْدَ الْحَجَرِ الخ :

ঢিলা ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করা মোস্তাহাব : পাথর [ঢিলা] ব্যবহারের পর পানি দ্বারা উক্ত স্থান ধৌত করা মোস্তাহাব; ফরজ নয়, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাও নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَتَطَهَّرُوْا অর্থাৎ "সেখানে এমন লোক রয়েছে, যারা ভালোভাবে পবিত্র হওয়াকে পছন্দ করে।" এ আয়াতের শানে নুযূলে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি মসজিদে কুবাবাসীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাঁরা মলমূত্র ত্যাগ করার পর ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার পর আবার পানি দ্বারা উক্ত স্থান ধৌত করতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঢিলা ও পানি উভয়টির ব্যবহার উত্তম। তবে শুধু ঢিলা ব্যবহার করাও যথেষ্ট।

কেননা, হাদীসে আছে- إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ বাথরুমে যাবে তখন যেন সে সাথে তিনটি পাথর নিয়ে যায়। তা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্য তা যথেষ্ট।

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, পাথর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে এবং তা তার জন্য যথেষ্ট। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক নয়। অনুরূপ শুধু পানি ব্যবহার করাও যথেষ্ট। কেননা, পানি স্বয়ং طَهُوْر [পবিত্র] এবং অন্যের জন্যও طَاهِرٌ [পবিত্রকারী]। ইরশাদ হচ্ছে- وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا "আমি আসমান থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি।"

আর আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) লেখেন- طَهُوْر বলা হয়- যা অন্যকে পবিত্র করে। অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে- وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ অর্থাৎ "আমি আসমান থেকে এমন পানি বর্ষণ করি, যা তোমাদেরকে পবিত্র করে।" অতএব, আয়াতদ্বয় পরিপূর্ণরূপে বুঝায় যে, শুধু পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাও যথেষ্ট।

পেশাবের পর পুরুষ ঢিলা ও পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে : ইতঃপূর্বে মলমূত্র ত্যাগ করার পর পবিত্রতা অর্জনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে আমরা পেশাবের পর পুরুষের পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত বিবরণ তুলে ধরছি। আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পেশাবের পর ঢিলা করে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাও প্রমাণিত আছে। তবে জরুরি বিষয়; বরং যৌক্তিক বিষয়ও হচ্ছে, পুরুষের জন্য পেশাবের পর ঢিলা ব্যবহার করা আবশ্যক। কারণ, পুরুষের পেশাব পরবর্তীতেও টপকে পড়ে। যদি সে পেশাবের পর পানি দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করে ফেলে, অতঃপর পেশাব টপকে পড়ে তবে কাপড়ও নাপাক হয়ে যাবে। এজন্য বুঝা যায় যে, মলমূত্র ত্যাগ করার পর ঢিলা ব্যবহারের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, পেশাবের পর ঢিলা ব্যবহার করা। সম্ভবত এ কারণেই হযরত ওমর (রা.) এমনটি করতেন। হযরত আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) পেশাব করার পর মাটি কিংবা পাথরের সাথে লিঙ্গের মাথাকে মিলাতেন। অতঃপর পানি দ্বারা তা ধৌত করতেন।

ঢিলা ও পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করার পদ্ধতি : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ঢিলা ও পানি উভয়টি ব্যবহার করার পদ্ধতি হলো, প্রথমে পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ঢিলা করার পর হস্তদ্বয় ধৌত করবে। অতঃপর বাম হাতের এক আঙ্গুল কিংবা দুই আঙ্গুল কিংবা তিন আঙ্গুলের পেট দ্বারা ঘষে তা ধৌত করবে। তবে এ ক্ষেত্রে আঙ্গুলের মাথা ব্যবহার করবে না।

ঢিলা করার পর হস্তদ্বয় ধৌত করা : আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, ঢিলা করার পর হস্তদ্বয় ধৌত করা প্রসঙ্গে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যথা- ১. হস্তদ্বয় তিনবার ধৌত করা শর্ত। ২. হস্তদ্বয় সাতবার ধৌত করবে। ৩. হস্তদ্বয় দশবার ধৌত করবে। ৪. পেশাবের ঢিলা করার পর তিনবার এবং পায়খানা করার পর পাঁচবার ধোয়া শর্ত। মূলত বিশুদ্ধ অভিমত হলো, এর জন্য কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করা নেই; বরং এ পরিমাণ ধৌত করবে যে, অন্তর বলে- হাত পবিত্র হয়ে গেছে। তবে এটি অবশ্যই শর্ত যে, হাত ও মলমূত্রের স্থান থেকে পরিপূর্ণরূপে নাপাকী দূর করতে হবে।

স্বীয় স্থল অতিক্রমকারী মলমূত্রের হুকুম : এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, পাথর [ঢিলা] নাপাকীকে দূরীভূতকারী নয়। কেননা, তা مُطَهِّر [পবিত্রকারী] নয়; বরং এর দ্বারা নাপাকী কমে যায় এবং শুকিয়ে যায়। তাই ঢিলা দ্বারা শুধু নাপাকীর স্থলই পরিষ্কার করা যাবে। কারণ, এতটুকু পর্যন্তই পরিষ্কার করা প্রয়োজন। আর এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের বেশি করা যাবে না। অতএব যে নাপাকী مَخْرَجْ তথা মলমূত্রের স্থল অতিক্রম করে গেছে, তা যদি এক দিরহামের চেয়ে বেশি পরিমাণ হয় তবে তা ধৌত করতে হবে। সেখানে ঢিলা দ্বারা পরিষ্কার করা যথেষ্ট নয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত নাপাকীর স্থল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও শায়খাইন (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মলমূত্রের স্থলের মলমূত্রসহ আশপাশের অতিক্রমকারী নাপাকী এক দিরহামের বেশি হওয়া। পক্ষান্তরে শায়খাইন (র.) বলেন, শুধু মলমূত্রের স্থল অতিক্রমকারী নাপাকী এক দিরহামের চেয়ে বেশি হওয়া। কেননা, এ ক্ষেত্রে নাপাকীর স্থলের নাপাকী ধর্তব্য নয়। কারণ, তা ঢিলা দ্বারা পরিষ্কার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَنْجِىْ بِعَظْمٍ وَ رَوْثٍ الخ :

যেসব জিনিস দ্বারা এস্তেঞ্জা করা নিষেধ : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) লেখেন যে, হাড় ও গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন–

اِبْغِنِىْ اَحْجَارًا اَسْتَنْفِضْ مِنْهَا وَلَا تَأْتِنِىْ بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثَةٍ قُلْتُ مَا بَالُ الْعِظَامِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ .

অর্থাৎ "আমার জন্য পাথর তালাশ কর, তা দ্বারা আমি তাহারাত হাসিল করব। তবে হাড় ও গোবর আনবে না। আমি বললাম, হাড় ও গোবরের কি অবস্থা? [কেন আনব না?] তিনি বললেন, এগুলো জিন জাতির খাদ্য।" –[বুখারী শরীফ]

উল্লেখ্য যে, উক্ত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি কেউ হাড় কিংবা গোবর দ্বারা এস্তেঞ্জা করে, তবে এস্তেঞ্জার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে, কিন্তু সুন্নত আদায় হবে না। মূলত গোবর নাপাক, তাই এর দ্বারা এস্তেঞ্জা করা থেকে বারণ করা হয়েছে। আর হাড় জিনের খাদ্য হওয়ার কারণে এর থেকে বারণ করা হয়েছে। তবে উক্ত হাদীসকে ইমাম মালেক (র.) গোবর পাক হওয়ার পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। কিন্তু এ দলিলটি এজন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, গোবর নাপাক হওয়ার ব্যাপারে দলিল বিদ্যমান। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ গোবরের ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-কে বলেছিলেন– هٰذَا رِكْسٌ অর্থাৎ "এটা দুর্গন্ধ, এটা নাপাক।"

ঢিলা করার ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হচ্ছে, ফুকাহায়ে কেরাম লেখেন, প্রত্যেক এমন জিনিস যা সম্মানিত কিংবা খাদ্য কিংবা নাপাকী কিংবা ক্ষতিকারক, এর দ্বারা এস্তেঞ্জা করা নাজায়েজ।

ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা করা নিষেধ : ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلَا يَسْتَنْجِىْ بِيَمِيْنِهِ وَلَا يَتَنَفَّسُ .

অর্থাৎ "যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ পেশাব করবে তবে যেন সে ডান হাত দ্বারা স্বীয় লজ্জাস্থানকে স্পর্শ না করে, ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা না করে এবং পাত্রে শ্বাস নিক্ষেপ না করে।" উক্ত হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা করা নিষেধ।

পেশাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা মাকরূহ : পেশাব-পায়খানার জন্য কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে বসা মাকরূহ। চাই বাথরুমে হোক কিংবা মরুভূমি-খোলা ময়দানে হোক। মূলত এ মাসআলার ক্ষেত্রে বিস্তর মতানৈক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে ফিকহের বড় বড় কিতাব ও হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা তুলে ধরছি–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আহনাফের মতে বাথরুমে হোক কিংবা মাঠে-ময়দানে হোক সর্বস্থানেই পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ করে বসা মাকরূহ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.), মালেক (র.) ও এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, মাঠে-ময়দানে হলে কিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ করা উভয়টিই নাজায়েজ, আর বাথরুমে উভয়টিই জায়েজ। এ প্রসঙ্গে আরো ছয়টি অভিমত রয়েছে। সংক্ষেপ করত আমরা তা এখানে উল্লেখ করছি না।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) -এর দলিল হলো, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন–

رَقِيْتُ يَوْمًا عَلٰى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى حَاجَتِهٖ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ .

অর্থাৎ "একদা আমি হযরত হাফসা (রা.)-এর ঘরে রাত্রি যাপন করেছি। আমি নবী ﷺ -কে শামের দিকে মুখ করে এবং কিবলার দিকে পিঠ করে তাঁর হাজত পুরা করতে দেখেছি।" –[তিরমিযী শরীফ]

তারা اِسْتِقْبَالٌ ও اِسْتِدْبَارٌ -এর বৈধতাকে بُنْيَانٌ তথা বাথরুমের সাথে খাস করে ফেলেছেন। কারণ, রাসূল ﷺ ও বাথরুমে اِسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ করেছিলেন বলে হযরত ইবনে ওমর (রা.) দেখেছেন।

আহনাফের দলিল হলো, হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَّلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা বাথরুমে যাবে তখন কিবলার দিকে বসে পায়খানা কিংবা পেশাব করবে না। তবে পূর্ব দিকে করবে কিংবা পশ্চিম দিকে।

وَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ করে পেশাব কিংবা পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তা জায়েজ নেই।

اَلرَّدُّ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَ مَالِكٍ وَ أَحْمَدَ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) যে দলিল পেশ করেছেন, তার খণ্ডন হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকে পিঠ করে বসেননি; বরং তিনি হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে দেখে নিজেকে আড়াল করতে গিয়ে একটু বাঁকা হয়েছেন, যেন হযরত ইবনে ওমর (রা.) তাঁকে না দেখেন। কিংবা বলা যায়, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য। অন্য মানুষ তথা উম্মতের জন্য তা জায়েজ নেই।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল মুলহিম ১ : ৪২৪, মা'আরিফুস সুনান ১ : ৮৯ – ১০২, দরসে তিরমিযী ১ : ১৮৪ – ১৯৮]

উল্লেখ্য, পায়খানা-পেশাব করতে বসে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, সালাম দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া মাকরূহ।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

١. "كِتَابُ الطَّهَارَةِ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الخ فَفَرْضُ الْوُضُوْءِ غَسْلُ الْوَجْهِ الخ" لِمَ أَوْرَدَ لَفْظَ الطَّهَارَةِ مُفْرَدَةً مَعَ كَثْرَةِ الطَّهَارَةِ وَلِمَ قُدِّمَ الدَّلِيْلُ عَلَى الْحُكْمِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ تَقَدُّمُ الدَّعْوٰى عَلَى الدَّلِيْلِ؟

٢. حَرِّرْ مَعْنَى الطَّهَارَةِ وَالْغَسْلِ (بِالْفَتْحِ) وَالطُّهَارَةِ وَالْغُسْلِ (بِالضَّمِّ) وَالطِّهَارَةِ وَالْغِسْلِ (بِالْكَسْرِ)؟

٣. مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الطَّهَارَةِ بِالْفَتْحِ وَالطِّهَارَةِ بِالْكَسْرِ وَالطُّهَارَةِ بِالضَّمِّ؟

٤. لِمَ أَدْخَلَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) الْفَاءَ فِيْ بَدْءِ الْكَلَامِ؟

٥. مَا أَرَادَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهٖ أَيْ قِصَاصَ الخ وَمَا مَعْنَى الْقِصَاصِ .

٦. أُكْتُبْ مَعْنَى الْغَسْلِ (بِالْفَتْحِ) وَالْغُسْلِ (بِالضَّمِّ) وَالْغِسْلِ (بِالْكَسْرِ) ثُمَّ بَيِّنْ حَدَّ غَسْلِ الْوَجْهِ .

٧. مَا الْإِخْتِلَافُ فِيْ دُخُوْلِ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ فِيْ حُكْمِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَمَا وَجْهُ الْإِخْتِلَافِ؟

٨. قَوْلُهٗ "وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ" مَا مَعْنَى الْكَعْبِ؟ أُكْتُبْ مَعَ ذِكْرِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ مُدَلَّلًا .

٩. مَا مَعْنَى الْمِرْفَقِ وَكَمْ قَوْلًا لِلْعُلَمَاءِ فِيْ مَعْنَى الْكَعْبِ وَمَا هِيَ وَمَا هُوَ الْأَصَحُّ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا .

١٠. قَوْلُهٗ "وَسُنَّتُهٗ لِلْمُسْتَيْقِظِ غَسْلُ يَدَيْهِ إِلٰى رُسْغَيْهِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ" أُذْكُرْ كَيْفِيَّةَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلْمُسْتَيْقِظِ .

١١. أُذْكُرْ اَقْوَالَ الْاَئِمَّةِ فِيْ دُخُوْلِ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْاُذُنِ فِيْ حَدِّ الْوَجْهِ؟ اَثْبِتْ تَمَامَ حُدُوْدِ الْوَجْهِ.

١٢. قَوْلُهُ "وَمَسْحُ رُبُعِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ" بَيِّنْ اَقْوَالَ الْفُقَهَاءِ فِيْ حُكْمِ مَسْحِ اللِّحْيَةِ مُدَلَّلًا.

١٣. قَوْلُهُ "وَمَسْحُ رُبُعِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ" مَا مَعْنَى الْمَسْحِ لُغَةً وَشَرْعًا؟

١٤. أُذْكُرْ اَقْوَالَ الْفُقَهَاءِ فِي الْقَدْرِ الْمَفْرُوْضِ فِيْ مَسْحِ اللِّحْيَةِ مَعَ بَيَانِ الْقَوْلِ الْمُفْتٰى بِهٖ؟

١٥. مَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِي الْقَدْرِ الْمَفْرُوْضِ مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ؟ بَيِّنْ مُدَلَّلًا مَعَ قَوْلِ الْاِمَامِ مَالِكٍ (رح).

١٦. قَوْلُهُ "وَمُسْتَحَبُّهُ التَّيَامُنُ" أُذْكُرِ الْاِيْرَادَ عَلَيْهِ وَالْجَوَابَ عَنْهُ وَاضِحًا.

١٧. اَلنِّيَّةُ فِي الْوُضُوْءِ فَرْضٌ اَمْ لَا وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ اَجِبْ مَعَ بَيَانِ دَلَائِلِ الْاَحْنَافِ وَالشَّوَافِعِ مُفَصَّلًا.

١٨. قَوْلُهُ "وَلَا بِمَاءٍ اُسْتُعْمِلَ لِقُرْبَةٍ اَوْ لِرَفْعِ حَدَثٍ" بِاَيِّ شَيْءٍ يَصِيْرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَمَتٰى وَمَا حُكْمُهُ؟ حَرِّرْ مَعَ بَيَانِ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ مُفَصَّلًا.

١٩. مَا مَعْنَى الْوَلَاءِ فِي الْوُضُوْءِ وَمَا حُكْمُهُ؟

٢٠. اُكْتُبْ مَعْنَى الْاِغْمَاءِ وَالْجُنُوْنِ وَالسُّكْرِ مَعَ بَيَانِ حُكْمِهَا فِي الْوُضُوْءِ.

٢١. قَوْلُهُ "كُلُّ اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ اِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيْرِ وَالْاٰدَمِيِّ" اِشْرَحِ الْقَوْلَ الْمَذْكُوْرَ عَلٰى طَرْزِ الشَّارِحِ الْعَلَّامِ.

٢٢. اَوْضِحْ قَوْلَهُ "وَمَا طَهُرَ جِلْدُهُ بِالدَّبْغِ طَهُرَ بِالذَّكَاةِ".

٢٣. اِذَا قَاءَ قَلِيْلًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَبْلُغُ مِلْأَ الْفَمِ. كَمْ صُوْرَةً فِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ وَمَا حُكْمُهَا؟ اَجِبْ مُفَصَّلًا.

٢٤. قَوْلُهُ "وَالْعَرَقُ مُعْتَبَرٌ بِالسُّوْرِ" اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ الْعَلَّامِ مَعَ بَيَانِ الْاِيْرَادِ عَلَيْهِ وَالْجَوَابِ عَنْهُ.

٢٥. مَا هُوَ الطَّرِيْقُ الْاَحْسَنُ فِيْ مَسْحِ الذِّرَاعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ؟

٢٦. "وَقَهْقَهَةُ مُصَلٍّ بَالِغٍ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ" اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ تَامًّا.

كِتَابُ الصَّلٰوةِ
অধ্যায় : নামাজ

❖ **নামাজ-এর অধ্যায়কে অন্যান্য ইবাদত থেকে অগ্রে আনার কারণ :** নামাজ সকল ইবাদতের উৎস এবং সমূহ নেক আমলের ভিত্তি। এজন্য একে সমস্ত বিধানের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর পবিত্রতা নামাজের পূর্বশর্ত। বস্তুত, কোনো বস্তুর শর্ত ঐ বস্তুর পূর্বে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এজন্য পবিত্রতার অধ্যায়কে নামাজের অধ্যায়-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

❖ **'সালাত' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ :** 'সালাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ কয়েকটি রয়েছে। যথা– দোয়া, দরুদ, রহমত, ইসতিগফার ইত্যাদি। صَلٰوةٌ শব্দটি মূলত صَلّٰى থেকে উদ্গত, যার অর্থ– নিতম্ব হেলানো। শরিয়তের পরিভাষায়– هِىَ عِبَارَةٌ عَنِ الْاَرْكَانِ الْمَعْهُوْدَةِ وَالْاَفْعَالِ الْمَخْصُوْصَةِ فِىْ أَوْقَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ بِكَيْفِيَّةٍ مَخْصُوْصَةٍ
অর্থাৎ বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ সময়ে সুনির্দিষ্ট কতিপয় রোকন ও কর্ম সম্পাদন করাকে সালাত বলা হয়।

'বাহরুর রায়িক' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে– وَهِىَ شَرْعًا اَلْاَفْعَالُ الْمَخْصُوْصَةُ مِنَ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ
অর্থাৎ কতিপয় সুনির্দিষ্ট কর্ম তথা দাঁড়ানো, কেরাত পড়া, রুকু করা ও সিজদা করাকে শরিয়তের পরিভাষায় সালাত বলা হয়।
–[বাহ্রুর রায়িক ১ : ৪২৩]

❖ **নামাজ ফরজ হওয়ার সময়-কাল :** ফুকাহায়ে কেরাম এতে একমত যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয় শবে মি'রাজে। আর অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত হচ্ছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে কোনো ফরজ নামাজ ছিল না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ ছিল। দুই বছর পর মক্কায় মি'রাজের পূর্বে তাহাজ্জুদকে مَنْسُوْخ করে দুই ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করা হয়েছে– ১. ফজর, ২. আসর। যার দলিল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا
অর্থাৎ "তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসায় সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পরে [এ দুই সময়ে] তাসবীহ [সালাত] পাঠ কর।" এ আয়াত মি'রাজের পূর্বে নাজিল হয়েছে। উক্ত দুই ওয়াক্ত নামাজের কথা এতে উল্লেখ রয়েছে। মূলত উক্ত দুই ওয়াক্ত নামাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ফরজ ছিল, না নফল ছিল এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো দলিল নেই।

নামাজের ছুবূত [প্রমাণ] : নামাজ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের দ্বারা প্রমাণিত। এখানে সংক্ষেপ করত একটি আয়াত, একটি হাদীস, ইজমা ও একটি যুক্তি উল্লেখ করছি।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا "নিশ্চয়ই মু'মিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করা ফরজ।" –[নিসা : ১০৩]

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–
اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَحُجُّوْا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَاَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا اَنْفُسُكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ـ
অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর, নামাজ আদায় কর, রোজা রাখ, তোমাদের প্রভুর ঘর জিয়ারত কর এবং তোমাদের সম্পদের জাকাত প্রদান কর। এর দ্বারা তোমাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। তবেই তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" –[তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ]

৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার উপর ওলামায়ে কেরাম একমত। –[বাহরুর রায়িক : ১ : ২৫৫]

৪. নামাজ ফরজ হওয়ার যুক্তি হলো, সমস্ত নামাজ আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া হিসেবে ফরজ হয়েছে। আর আমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কোনো সীমা নেই। অতএব, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমাদের উপর ফরজ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

–[বাদায়েউস সানায়ে' ১ : ২৫২ – ২৫৬]

❖ **নামাজ ফরজ হওয়ার কারণ (سَبَبٌ)** : ফাতহুল কাদীর -এর টীকায় উল্লেখ রয়েছে– وَسَبَبُ وُجُوْبِهَا أَوْقَاتُهَا "নামাজ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبٌ হচ্ছে ওয়াক্ত।" –[ফাতহুল কাদীর ১ : ২১৮]

❖ **নামাজের শর্তাবলি** : নামাজের শর্তাবলি নিম্নরূপ–

اَلطَّهَارَةُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتُ وَالنِّيَّةُ وَتَكْبِيْرُالْاِفْتِتَاحِ .

১. পবিত্রতা, ২. সতর ঢাকা, ৩. কিবলামুখী হওয়া, ৪. ওয়াক্ত হওয়া, ৫. নিয়ত করা ও ৬. তাকবীরে তাহরীমা বলা।

❖ **নামাজের রোকন** : নামাজের রোকন হচ্ছে– اَلْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ وَالْقَعْدَةُ الْاَخِيْرَةُ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ

১. দাঁড়ানো, ২. কেরাত পড়া, ৩. রুকু করা, ৪. সিজদা করা ও ৫. আত্‌তাহিয়্যাতু পড়ার সমপরিমাণ সময় শেষ বৈঠক করা।

❖ **নামাজের হুকুম** : নামাজের হুকুম হচ্ছে– سُقُوْطُ الْوَاجِبِ عَنْهُ بِالْاَدَاءِ فِى الدُّنْيَا وَنَيْلُ الثَّوَابِ الْمَوْعُوْدِ فِى الْاٰخِرَةِ

"দুনিয়াতে তা আদায়ের মাধ্যমে দায়মুক্ত হওয়া এবং আখিরাতে প্রতিশ্রুত ছওয়াব হাসিল হওয়া।"

❖ **পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার হিকমত** : নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত কেন ফরজ হলো? এর চেয়ে কম কিংবা বেশি কেন হলো না? এর কয়েকটি হিকমত আমরা নিম্নে তুলে ধরছি–

ক. মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক জিনিস জানার জন্য মানুষের মাঝে পাঁচটি শক্তি সৃষ্টি করেছেন।

১. দৃষ্টিশক্তি, ২. শ্রবণশক্তি, ৩. ঘ্রাণ নেওয়ার শক্তি, ৪. স্বাদ গ্রহণের শক্তি ও ৫. স্পর্শ করার শক্তি।

উক্ত পাঁচ শক্তির মোকাবিলায় মহান আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হুকুম দিয়েছেন।

খ. মানুষের পূর্ণ জীবন পাঁচ অবস্থায় অতিবাহিত হয়–

১. শায়িত অবস্থায়, ২. বসা অবস্থায়, ৩. দাঁড়ানো অবস্থায়, ৪. নিদ্রা অবস্থায় ও ৫. জাগ্রত অবস্থায়।

উক্ত পাঁচ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর অগণিত রহমত ও নিয়ামত বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হয়ে থাকে, যা গণনা করা অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা উক্ত পাঁচ অবস্থার সমূহ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ল সে উক্ত সময়ে আল্লাহর প্রত্যেক নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। এখানে আরো কিছু আলোচনা রয়েছে, সংক্ষেপ করত আমরা তা বর্ণনা করছি না।

اَلْوَقْتُ لِلْفَجْرِ مِنَ الصُّبْحِ الْمُعْتَرِضِ اِلٰى طُلُوْعِ ذُكَاءٍ اِحْتَرَزَ بِالْمُعْتَرِضِ عَنِ الْمُسْتَطِيْلِ وَهُوَ الصُّبْحُ الْكَاذِبُ وَلِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِهَا اِلٰى بُلُوْغِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ سِوٰى فَيْءِ الزَّوَالِ لَابُدَّ هٰهُنَا مِنْ مَعْرِفَةِ وَقْتِ الزَّوَالِ وَفَيْءِ الزَّوَالِ وَطَرِيْقُهُ اَنْ تُسَوَّى الْاَرْضُ بِحَيْثُ لَا يَكُوْنُ بَعْضُ جَوَانِبِهَا مُرْتَفِعًا وَبَعْضُهَا مُنْخَفِضًا اِمَّا بِصَبِّ الْمَاءِ اَوْ بِبَعْضِ مَوَازِيْنِ الْمُقَنِّيْنَ وَتُرْسَمُ عَلَيْهَا دَائِرَةٌ وَتُسَمَّى الدَّائِرَةُ الْهِنْدِيَّةُ وَيُنْصَبُ فِيْ مَرْكَزِهَا مِقْيَاسٌ قَائِمٌ بِاَنْ يَكُوْنَ بُعْدُ رَأْسِهِ عَنْ ثَلٰثِ نُقَطٍ مِنْ مُحِيْطِ الدَّائِرَةِ مُتَسَاوِيًا وَلْتَكُنْ قَائِمَتُهُ بِمِقْدَارِ رُبُعِ قَطْرِ الدَّائِرَةِ.

অনুবাদ : ফজরের ওয়াক্ত হচ্ছে, সুবহে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্য উদয় পর্যন্ত। [গ্রন্থকার] مُعْتَرِضْ [বিস্তৃত] শব্দ বলে مُسْتَطِيْل [দীর্ঘ] শব্দ থেকে বিরত থেকেছেন। আর তা হচ্ছে, সুবহে কাযিব [কপটপ্রভাত]। জোহরের ওয়াক্ত হচ্ছে, সূর্য হেলার পর থেকে নিয়ে প্রত্যেক জিনিসের ছায়া এর মূল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। এখানে وَقْتُ الزَّوَالِ ও فَيْءُ الزَّوَالِ -এর পরিচয় জানা আবশ্যক। এর পরিচয় জানার পদ্ধতি হলো, এক জায়গায় মাটিকে বরাবর করে স্থাপন করা হবে যে, এর কোনো দিক উঁচু-নিচু থাকবে না। এর সমতাকে পানি ঢেলে যাচাই করবে কিংবা নালি খুদাইকারীদের কোনো যন্ত্র দ্বারা যাচাই করা হবে। এ সমতল ভূমির উপর একটি গোল চক্কর বানানো হবে, একে হিন্দী গোল চক্কর বলা হয়। উক্ত বৃত্তের মধ্যখানে একটি লাঠি এমন সমানভাবে স্থাপন করবে যে, চতুর্দিকের গোল বৃত্ত থেকে লাঠির মাথার দূরত্ব হবে তিন নুকতা বরাবর। [অর্থাৎ লাঠির মাথা থেকে এক নুকতার দূরত্ব যতটুকু, প্রথম নুকতা থেকে দ্বিতীয় নুকতার দূরত্ব ততটুকু। অনুরূপ তৃতীয় নুকতার দূরত্ব দ্বিতীয় নুকতা থেকে ততটুকু হবে।] লাঠির দৈর্ঘ্য হবে বৃত্তের অন্তর্বর্তী দাগের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ। [দাগ বলতে বৃত্তের মধ্যখানের ঐ দাগকে বুঝানো হয়েছে, যা বৃত্তের দুই দিকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে বৃত্তকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْوَقْتُ لِلْفَجْرِ مِنَ الصُّبْحِ الخ :

নামাজের ওয়াক্ত এবং ফজরের নামাজের আলোচনা অগ্রে করার কারণ : আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, ফুকাহায়ে কেরাম এতে একমত যে, নামাজ ওয়াজিব হওয়ার কারণ (سَبَبٌ) হচ্ছে ওয়াক্ত। এজন্য গ্রন্থকার নামাজ সম্পর্কিত অন্যান্য আলোচনার অগ্রে নামাজের ওয়াক্ত -এর আলোচনা করেছেন। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে ফজরের নামাজের আলোচনা অন্যান্য নামাজের অগ্রে এজন্যই করেছেন যে, মানুষ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর সর্বপ্রথম নামাজ হচ্ছে ফজর।

'সুবহ'-এর প্রকার ও সংজ্ঞা : 'সুবহ' বা প্রভাত দুই প্রকার– ১. সুবহে কাযিব। তা হচ্ছে– পূর্বাকাশের ঐ শুভ্রতা যা আসমানের নীচের দিক থেকে উপরের দিকে দেখা যায় এবং কিছুক্ষণ পর তা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সমগ্র পৃথিবী আবার

অন্ধকারে ছেয়ে যায়। ২. সুবহে সাদেক। তা হচ্ছে– পূর্বাকাশে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যে আলো দেখা যায়, যা ধীরে ধীরে পূর্বাকাশের সমস্ত দিককে আলোকিত করে এবং সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করে দেয়।

فَيْءُ الزَّوَالِ ও وَقْتُ الزَّوَالِ-এর পরিচয় জানার পদ্ধতি : فَيْءُ الزَّوَالِ ও وَقْتُ الزَّوَالِ-এর পরিচয় জানার পদ্ধতি হচ্ছে, ভূমিকে এমনভাবে সমান করবে যেন উঁচু-নিচু না থাকে। উক্ত সমতল ভূমিতে সম্পূর্ণ গোল করে দাগ দেওয়া হবে। অতঃপর এর ঠিক মধ্যখানে একটি খুঁটি গাড়বে এবং বৃত্তের শেষ প্রান্ত থেকে লাঠির মাথার দূরত্ব হবে তিন নুকতা পরিমাণ। আর লাঠির দৈর্ঘ্য হবে বৃত্তের ঠিক মধ্যখানে লম্বালম্বি টানা দাগের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ।

দিনের শুরুতে উক্ত লাঠির ছায়া বৃত্তের বাহিরে পড়বে, তবে তা কমতে কমতে বৃত্তের ভিতরে ঢুকে পড়বে। অতএব, তখন ছায়ার প্রবেশস্থলে একটি চিহ্ন দিতে হবে। তারপর তা কমতে কমতে আবার অপর দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকবে, এমনকি অপর দিকে তা বের হয়ে যাবে। অতএব, তা বের হওয়ার স্থলে একটি চিহ্ন দিতে হবে। অতঃপর উক্ত লাঠিকে দুটি ভাগ করা হবে এবং লাঠির অর্ধাংশ থেকে বৃত্তের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এমনভাবে দাগ টানা হবে যে, তা বৃত্তের অপর দিকে বের হয়ে পড়বে। সুতরাং এ দাগ অর্ধ দিবসের দাগ। তাই যখন লাঠির ছায়া এই দাগের উপর পড়বে তখন অর্ধদিন হবে। তখন লাঠির যে পরিমাণ ছায়া হবে তা-ই হবে فَيْءُ الزَّوَالِ - আর যখন ছায়া এই দাগ থেকে বের হয়ে চলে যাবে তখন তা হবে وَقْتُ الزَّوَالِ -

قَوْلُهُ وَتُرْسَمُ عَلَيْهَا دَائِرَةٌ : অর্থাৎ উক্ত সমতল ভূমিতে এমন একটি গোলাকার বৃত্ত আঁকবে যে, মধ্যখানের দাগ থেকে যেদিকেই দাগ টানা হয়, বরাবর হয় এবং মধ্যখানের দাগ বা চিহ্নকে এই বৃত্তের প্রাণকেন্দ্র বলা হয়। আর বৃত্ত যেহেতু সমতল ভূমিতে আঁকা হয়েছে, তাই এতে ছায়া প্রবেশ করা ও বের হওয়ার হিসাব সহীহ হবে; অন্যথায় নয়। সর্বপ্রথম হিন্দুস্তানের গবেষকরা এ دائرة বা বৃত্তকে আবিষ্কার করেছে, তাই একে دَائِرَةٌ هِنْدِيَّةٌ বা হিন্দী চক্কর বলা হয়।

قَوْلُهُ وَيُنْصَبُ فِيْ مَرْكَزِهَا مِقْيَاسٌ قَائِمٌ : উক্ত বৃত্তের মধ্যখানে একটি লাঠি দাঁড় করিয়ে দেবে। مِقْيَاسٌ-এর আভিধানিক অর্থ– পরিমাণ। পরিভাষায় مِقْيَاسٌ বলা হয় উঁচু যন্ত্রকে, যার মাধ্যমে ছায়া পরিমাপ করা হয়, যা অধিক পাতলাও নয় এবং অধিক মোটাও নয়। যার দৈর্ঘ্য হয় বৃত্তের অর্ন্তবর্তী ঐ দাগের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ, যা বৃত্তের উভয় দিকে লম্বালম্বিভাবে গিয়ে বৃত্তকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়। যদিও এর এ পরিমাণ দৈর্ঘ্য হওয়ার দরকার ছিল যে, এর ছায়া বৃত্তের দাগের অর্ধাংশ পরিমাণ হয়। কিন্তু বৃত্তের লম্বালম্বি দাগের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, যেন ছায়ার প্রবেশ ও বের হওয়া স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা, অধিকাংশ দেশেই فَيْءُ الزَّوَالِ-কে এর মাধ্যমে জানা হয়।

قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُوْنَ بُعْدُ رَأْسِهِ : যখন বৃত্তের তিনটি নুকতার দূরত্ব বরাবর হবে তখন তা কোনো দিকে ঝুঁকা ব্যতীত সোজা খাড়া হয়ে থাকবে।

فَرأْسُ ظِلِّهِ فِىْ اَوَائِلِ النَّهَارِ خَارِجَ الدَّائِرَةِ لٰكِنَّ الظِّلَّ يَنْقُصُ اِلٰى اَنْ يَدْخُلَ فِى الدَّائِرَةِ فَتَضَعُ عَلَامَةً عَلٰى مَدْخَلِ الظِّلِّ مِنْ مُحِيْطِ الدَّائِرَةِ وَلَاشَكَّ اَنَّ الظِّلَّ يَنْقُصُ اِلٰى حَدٍّمَّا ثُمَّ يَزِيْدُ اِلٰى اَنْ يَنْتَهِىَ اِلٰى مُحِيْطِ الدَّائِرَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا وَ ذٰلِكَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَتَضَعُ عَلَامَةً عَلٰى مَخْرَجِ الظِّلِّ ـ

অনুবাদ : অতএব, দিনের শুরুতে উক্ত লাঠির ছায়ার মাথা বৃত্তের বাহিরে চলে যাবে। কিন্তু ছায়া ধীরে ধীরে কমতে থাকবে– এমনকি তা বৃত্তের ভিতরে ঢুকে পড়বে। সুতরাং বৃত্তের যে স্থান দিয়ে ছায়া ভিতরে প্রবেশ করে সে প্রবেশস্থলে একটি চিহ্ন স্থাপন করা হবে এবং নিঃসন্দেহে ছায়া কমতে কমতে একটি সীমানায় পৌছবে। অতঃপর তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, এমনকি বৃত্তের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। অতঃপর তা বৃত্তের বাহিরে চলে যাবে এবং তা হবে অর্ধ দিবসের পর। অতএব, [বৃত্তের থেকে] ছায়া বের হওয়ার স্থলে একটি চিহ্ন স্থাপন করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَرَأْسُ ظِلِّهِ فِىْ أَوَائِلِ النَّهَارِ : অর্থাৎ দিনের শুরুতে এই ছায়া এবং দিনের অংশ গত হওয়ার ছায়ার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ দিনের শুরুতে ছায়া থাকে অনেক দৈর্ঘ্য। অতঃপর সূর্য যখন উপরে উঠতে থাকে ছায়াও তখন কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ছায়া কমতে কমতে বৃত্তের ভিতরে ঢুকে পড়ে। তবে যখন ছায়া বৃত্তের ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু হয় তখন এর প্রবেশস্থলে একটি চিহ্ন বসিয়ে দেওয়া হবে। কেননা, তা দুপুরের আগে পশ্চিম দিক থেকে প্রবেশ করবে।

قَوْلُهُ إِلٰى حَدٍّمَّا : অর্থাৎ যে পরিমাণ সূর্য উপরে উঠবে এ পরিমাণ ছায়া কমতে থাকে। এমনকি সূর্য যখন দুপুর পর্যন্ত পৌঁছে তখন ছায়াটা এমন নুকতার উপর হয়, যা আসমানকে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দুটি ভাগ করে দেয়, যা উত্তর ও দক্ষিণ পৃথিবীর মেরুতে বিচরণ করে। তখন যদি সূর্য ঠিক মাথার উপরে চলে আসে তবে লাঠির ছায়া মোটেই থাকবে না। অতঃপর দ্বিপ্রহরের পর থেকে ধীরে ধীরে ছায়া পূর্ব দিকে বাড়তে থাকে। আর যদি সূর্য ঠিক মাথার উপর না হয়; বরং কিছুটা দক্ষিণ দিকে ঝুঁকা হয়, যেমন– অধিকাংশ দেশে এমনই হয়ে থাকে তবে এ প্রক্রিয়ায়ও ঠিক দুপুরে লাঠির ছায়ার কিছু অংশ বাকি থাকে, যাকে فَيْءُ الزَّوَالِ বলা হয় এবং এটিই أَصْلِىْ [মৌলিক] ছায়া।

قَوْلُهُ ثُمَّ يَزِيْدُ إِلٰى أَنْ يَنْتَهِىَ : অর্থাৎ সূর্য হেলার সাথে সাথেই লাঠির ছায়া পূর্ব দিকে পড়তে শুরু হয় এমনকি বৃত্তের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তখন এ বের হওয়ার স্থলে একটি চিহ্ন দেওয়া হবে। কেননা, তা দুপুরের পর পূর্ব দিক দিয়ে বের হয়ে যায়।

فَتُنْصَفُ الْقَوْسَ الَّتِيْ هِيَ مَا بَيْنَ مَدْخَلِ الظِّلِّ وَمَخْرَجِهٖ وَتُرْسَمُ خَطًّا مُسْتَقِيْمًا مِنْ مُتَنَصَّفِ الْقَوْسِ اِلٰى مَرْكَزِ الدَّائِرَةِ مَخْرَجًا اِلَى الطَّرْفِ الْاٰخَرِ مِنَ الْمُحِيْطِ فَهٰذَا الْخَطُّ هُوَ خَطُّ نِصْفِ النَّهَارِ ـ

অনুবাদ : অতএব, উক্ত লাঠি যা প্রবেশস্থল ও বের হওয়ার স্থলের মধ্যখানে রয়েছে, একে দুই ভাগ করবে এবং লাঠির অর্ধাংশ থেকে বৃত্তের প্রাণকেন্দ্র পর্যন্ত একটি সোজা দাগ টানা হবে যে, তা বৃত্তের অপর দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। অতএব, এ দাগ অর্ধ দিবসের দাগ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَتُنْصَفُ الْقَوْسُ الَّتِيْ : এই লাঠি মূলত বৃত্তের ঐ অংশ যা ছায়ার প্রবেশস্থল ও বের হওয়ার স্থলের মধ্যখানে। এখন এই লাঠিকে বরাবর দুটি ভাগে বিভক্ত করে সেখান থেকে গোলাকারের কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত সোজা একটি দাগ টানবে। এ দাগকেই অর্ধ দিবসের দাগ বলা হবে।

قَوْلُهٗ فَهُوَ نِصْفُ النَّهَارِ الخ : অর্থাৎ যখন লাঠির ছায়া দুই ভাগে বিভক্ত এই লাঠির মধ্যখানে লম্বালম্বি দাগ পর্যন্ত চলে আসবে তখন বুঝতে হবে যে, এখন অর্ধ দিবস হয়েছে। কেননা, ছায়া তখন অর্ধ দিবসের দাগে পড়ে।

فَإِذَا كَانَ ظِلُّ الْمِقْيَاسِ عَلٰى هٰذَا الْخَطِّ فَهُوَ نِصْفُ النَّهَارِ وَالظِّلُّ الَّذِيْ فِيْ هٰذَا الْوَقْتِ هُوَ فَيْءُ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَ الظِّلُّ مِنْ هٰذَا الْخَطِّ فَهُوَ وَقْتُ الزَّوَالِ فَذٰلِكَ اَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَاٰخِرُهٗ إِذَا صَارَ ظِلُّ الْمِقْيَاسِ مِثْلَيِ الْمِقْيَاسِ سِوٰى فَيْءِ الزَّوَالِ مَثَلًا إِذَا كَانَ فَيْءُ الزَّوَالِ مِقْدَارَ رُبُعِ الْمِقْيَاسِ فَاٰخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ اَنْ يَصِيْرَ ظِلُّهٗ مِثْلَيِ الْمِقْيَاسِ وَرُبُعَهٗ هٰذَا فِيْ رِوَايَةٍ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَفِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) وَمُحَمَّدٍ (رح) وَالشَّافِعِيِّ (رح) إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهٗ سِوٰى فَيْءِ الزَّوَالِ ـ

অনুবাদ : তাই যখন লাঠির ছায়া এ দাগের উপর হবে তখন [দুপুর] অর্ধ দিবস হবে। আর তখন লাঠির যে ছায়া হবে, তা হচ্ছে فَيْءُ الزَّوَالِ - সুতরাং যখন ছায়া এই দাগ থেকে বের হয়ে যাবে তখন তা وَقْتُ الزَّوَالِ হবে এবং এটিই ظُهْر [জোহর] -এর প্রথম সময়। আর জোহরের শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন লাঠির ছায়া এর فَيْءُ الزَّوَالِ [মূল ছায়া] ব্যতীত দ্বিগুণ হবে। যেমন– যদি فَيْءُ الزَّوَالِ [মূল ছায়া] লাঠির এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ হয় তবে তা জোহরের শেষ ওয়াক্ত হবে। যদি লাঠির ছায়াটা লাঠির দ্বিগুণ পরিমাণ হয় এবং এর এক-চতুর্থাংশ [তথা সোয়া দ্বিগুণ] হয়। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অপর একটি বর্ণনা হলো, যা ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত– যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার মূল ছায়া ব্যতীত এক গুণ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ هُوَ فَيْءُ الزَّوَالِ : এটি ঐ ছায়া, যখন সূর্য ঠিক অর্ধ দিবসের স্থলে থাকে এবং লাঠির ছায়া তখন نِصْفُ النَّهَارِ-এর দাগের উপর থাকে, একেই فَيْءُ الزَّوَالِ বা দ্বিপ্রহরের ছায়া বলা হয়। যেহেতু এরপর সঙ্গে সঙ্গে সূর্য হেলতে থাকে সেহেতু এ সামান্য যোগসূত্রের ভিত্তিতে একে فَيْءُ الزَّوَالِ বলা হয়। আর فَيْءُ الزَّوَالِ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক জিনিসের ঐ ছায়া– যখন সূর্য ঠিক অর্ধ দিবসে থাকে, এরপর সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলতে থাকে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আসমানের ঠিক মধ্যখান থেকে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার নাম হচ্ছে زَوَالْ এবং সূর্য ঠিক মধ্য আসমানে থাকাকে اِسْتِوَاء বলে। শাব্দিক দিক বিশ্লেষণে এটিই সহীহ উদ্দেশ্য। শরিয়তের পরিভাষার ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে এই উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে। তবে কখনো কখনো শুধু زَوَالْ -এর উপরও اِسْتِوَاء -এর প্রয়োগ করা হয়। এ থেকেই মূলত জোহরের প্রথম ওয়াক্ত সম্পর্কে মতানৈক্য প্রকাশ পায়। ফলত কেউ কেউ বলে থাকেন, زَوَالْ -এর ওয়াক্তই হচ্ছে জোহরের প্রথম ওয়াক্ত। আবার কেউ বলেন, زَوَالْ -এর পর থেকে জোহরের প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয়।

قَوْلُهٗ فَهُوَ وَقْتُ الزَّوَالِ : এটি তখন হবে, যখন زَوَالْ -এর সময়ও লাঠির ছায়ার কিছু অংশ বাকি থাকবে। যেরূপ অধিকাংশ দক্ষিণা দেশগুলোতে হয়ে থাকে যে, সূর্য ঠিক মাথার উপর আসে না; বরং ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়ও কিছুটা দক্ষিণ দিকে ঢলা থাকে। আর যেসব দেশে সূর্য ঠিক মাথার উপর চলে আসে, সেসব দেশে فَيْءُ الزَّوَالِ তথা মূল ছায়া থাকে না। অতঃপর زَوَالْ -এর পর যখন পূর্ব দিকে ছায়া পড়তে শুরু হয় তখন বুঝা যায় যে, এখন زَوَالْ শুরু হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاٰخِرُهُ اِذَا صَارَ ظِلُّ الْمِقْيَاسِ : অর্থাৎ জোহরের শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন লাঠির ছায়া তার মূল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হবে। মূল ছায়া (فَيْئُ الزَّوَالِ) তখনই ধর্তব্য, যখন اِسْتِوَاء -এর সময় লাঠির ছায়া থাকবে। অন্যথায় শুধু লাঠির দ্বিগুণ পরিমাণ ছায়াই ধর্তব্য। যখন এমন হবে তখন জোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হবে।

قَوْلُهُ مِثْلَى الْمِقْيَاسِ الخ : স্মরণ রাখা চাই যে, اِسْتِوَاء -এর সময় লাঠির ছায়ার মাথায় নিশান লাগিয়ে দেবে। এরপর যখন فَيْئُ الزَّوَالِ ব্যতীত দুই مِثْل [গুণ] মাপা হবে তখন এই নিশান থেকে মাপা হবে; লাঠির মাথা থেকে নয়। কিংবা তা এভাবে বুঝ যে, যে নুকতার উপর লাঠি দাঁড়ানো একে যেমন, اَلِفْ এবং যে নুকতার উপর লাঠির ছায়ার মাথা একে بَاء বলবে। আর অনুমান কর যে, اَلِفْ থেকে بَاء পর্যন্ত দৈর্ঘ্য লাঠির এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ হবে। এখন যখন فَيْئُ الزَّوَالِ ব্যতীত দুই مِثْل মাপা হবে তখন بَاء থেকে মাপা হবে اَلِفْ থেকে নয়। আর যখন এর ছায়া সোয়া দ্বিগুণ হবে যে, জোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেছে এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে গেছে।

জোহরের শেষ ওয়াক্ত : জোহরের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : সাহেবাইন (র.) ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বর্ণনাসহ সকল ওলামায়ে কেরামের মতে, প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার মূল ছায়া ব্যতীত এক গুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত বাকি থাকবে। অতঃপর আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর থেকে এ ব্যাপারে চারটি অভিমত রয়েছে। যথা– ১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের সাথে। ২. ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেন, প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার মূল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকবে এবং এরপর আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যাবে। এটিই ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে مَشْهُوْر [প্রসিদ্ধ] বর্ণনা। ৩. তাঁর থেকে ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বর্ণনা করেন, প্রথম مِثْل পর্যন্ত জোহরের সময়, তৃতীয় مِثْل -এর থেকে আসরের সময় এবং দ্বিতীয় مِثْل হলো مُهْمَلْ তথা এতে না জোহর পড়া যাবে, না আসর পড়া যাবে। ৪. প্রথম مِثْل জোহরের ওয়াক্ত, তৃতীয় مِثْل আসরের ওয়াক্ত এবং দ্বিতীয় مِثْل হলো مُشْتَرَكْ অর্থাৎ এতে জোহর ও আসর উভয় নামাজই পড়া যাবে।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : জমহুর ওলামায়ে কেরামের দলিল হলো হাদীসে ইমামতে জিবরাঈল (আ.)। এতে রয়েছে–

فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ .

অর্থাৎ "যখন দ্বিতীয় দিন হলো, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে নিয়ে জোহরের নামাজ পড়েন, তখন বস্তুর ছায়া তার এক مِثْل পরিমাণ হয়েছে।" –[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী শরীফ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বিতীয় দিন ওয়াক্তের শেষ সময়ে নামাজ পড়িয়েছেন। আর উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় দিন হযরত জিবরাঈল (আ.) জোহরের নামাজ তখন পড়েছেন যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া এর এক গুণ হয়েছে। অতএব, জোহরের সময় এ এক গুণ পর্যন্তই থাকে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর مَشْهُوْر বর্ণনার দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ অর্থাৎ "যখন প্রচণ্ড গরম হয় তখন নামাজ [বিলম্ব করে] ঠাণ্ডায় পড়।" –[বুখারী ও মুসলিম]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহরের নামাজকে গরমকালে বিলম্ব করে ঠাণ্ডায় পড়তে বলেছেন, আর দ্বিতীয় مِثْل -এর সময়ই গরম কিছুটা কমে এবং ঠাণ্ডা হয়।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الْجُمْهُوْرِ : হযরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক ইমামত সম্পর্কিত হাদীসের জবাব আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) এভাবে দিয়েছেন যে, নামাজের সময়ের ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসটি প্রথম দিকের। আর উক্ত হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ সব হাদীস পরের দিকের। প্রকাশ থাকে যে, পরের হাদীস আগের হাদীসের জন্য নাসিখ বা রহিতকারী হিসেবে গণ্য হয়। অতএব, বুঝা গেল যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক ইমামত সম্পর্কিত হাদীসটি মানসূখ বা রহিত, তাই এ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে না।

وَلِلْعَصْرِ مِنْهُ إِلٰى غَيْبَتِهَا فَوَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ اٰخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ إِلٰى اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ وَلِلْمَغْرِبِ مِنْهُ إِلٰى مَغِيْبِ الشَّفَقِ وَهُوَ الْحُمْرَةُ عِنْدَهُمَا وَبِهٖ يُفْتٰى وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَلشَّفَقُ هُوَ الْبَيَاضُ وَلِلْعِشَاءِ مِنْهُ وَلِلْوِتْرِ مِمَّا بَعْدَ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ لَهُمَا اَىْ لِلْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ .

অনুবাদ : আসরের ওয়াক্ত হচ্ছে, জোহরের শেষ সময় থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অর্থাৎ উভয় অভিমতের ভিত্তিতে জোহরের শেষ ওয়াক্ত থেকে শুরু হয়ে আসরের সময়– সূর্যাস্ত পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত হচ্ছে, সূর্যাস্ত থেকে নিয়ে শফক [লালিমা বা শুভ্রতা] ডুবা পর্যন্ত। সাহেবাইন (র.)-এর নিকট লালিমাকে শফক বলা হয় এবং এরই উপর ফতোয়া। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট শুভ্রতাকে শফক বলা হয়। ইশার ওয়াক্ত হচ্ছে, শফক ডুবার পর থেকে নিয়ে এবং বিত্‌রের ওয়াক্ত হচ্ছে, ইশার নামাজ আদায়ের পর থেকে নিয়ে উভয় নামাজের তথা ইশা ও বিতরের নামাজের শেষ ওয়াক্ত– ফজর [অর্থাৎ সুবহে সাদেক] পর্যন্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلِلْعَصْرِ مِنْهُ إِلٰى الخ :

আসরের শুরু ওয়াক্ত : আসরের শুরু ওয়াক্ত নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে– জোহরের শেষ ওয়াক্ত নিয়ে মতানৈক্য থাকার কারণে। দুই মাযহাবের ভিত্তিতে যখন জোহরের নামাজের ওয়াক্ত শেষ হবে তখন থেকে আসরের ওয়াক্ত শুরু হবে। অতএব, আসরের শুরু ওয়াক্ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা জোহরের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কিত আলোচনার অনুরূপ।

قَوْلُهٗ وَلِلْمَغْرِبِ مِنْهُ إِلٰى مَغِيْبِ الخ :

মাগরিবের শেষ ওয়াক্ত : মাগরিবের নামাজের শুরু ওয়াক্ত নিয়ে কোনো মতানৈক্য নেই, তবে এর শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, شَفَقٌ অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে। যদিও شَفَقٌ -এর সংজ্ঞা সম্পর্কে তাঁদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সূর্যাস্তের পর অজু, আজান, ইকামত ও পাঁচ রাকাত নামাজ আদায় পরিমাণ সময় পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকবে। তবে আহনাফের অনুরূপও তাঁর একটি বর্ণনা রয়েছে।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, حَدِيْثُ إِمَامَةِ جِبْرَئِيْلَ (ع) অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) মাগরিবের নামাজ দুদিন একই সময়ে পড়িয়েছেন। অতএব, যদি মাগরিবের নামাজের সময় দীর্ঘ হতো এবং এর শুরু ও শেষ থাকত তবে হযরত জিবরাঈল (আ.) দুদিন একই সময়ে নামাজ পড়াতেন না।

আহনাফের দলিল হচ্ছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ "শফক (شَفَقٌ) অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে।" –[মুসলিম, মিশকাত]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, شَفَقٌ অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত বাকি থাকে।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) : হযরত জিবরাঈল (আ.) উভয় দিন একই সময়ে মাগরিবের নামাজ পড়িয়েছেন– যেন মাকরূহ ওয়াক্ত থেকে বাঁচা যায়। কেননা, মাগরিবকে শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ, কিংবা পরের বর্ণনার মাধ্যমে حَدِيْثُ اِمَامَةِ جِبْرَئِيْل (ع) মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর ১ : ২২২, বাহরুর রায়িক ১ : ৪২৬, মা'আরিফুস সুনান ২ : ৭২, দরসে তিরমিযী ১ : ৩৯৭]

شَفَقْ -এর পরিচয় : شَفَقْ -এর অর্থ সম্পর্কে সাহেবাইন (র.) ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন– بَيَاضْ [শুভ্রতাকে] شَفَقْ বলা হয়। কিন্তু সাহেবাইন (র.) ও অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরাম বলেন– حُمْرَةْ [লালিমা]-কে شَفَقْ বলা হয়।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : সাহেবাইন (র.) ও অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরামের দলিল হলো, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন– اَلشَّفَقُ هُوَ الْحُمْرَةُ "লালিমাকেই শফক বলা হয়।" –[দারাকুতনী] এর দ্বারা স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয় যে, লালিমাকেই شَفَقْ বলে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস–

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اٰخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اِذَا اَسْوَدَ الْاُفُقُ .

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাগরিবের শেষ সময় যখন দিগন্ত কালো হয়।"

প্রকাশ থাকে যে, দিগন্তে আলোর পরেই অন্ধকার আসে। অতএব প্রমাণিত হলো, দিগন্তে আলো বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত মাগরিবের সময় থাকবে।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الْجُمْهُوْرِ : সাহেবাইনসহ জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের দলিল হলো হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উপর مَوْقُوْف হাদীস। এটি দলিল হওয়ার যোগ্য নয়। যদি একে مَرْفُوْع মেনেও নেওয়া হয়, তবে এর মর্মের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আলো। আবার কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লালিমা। অতএব, এ বিতর্কিত হাদীস দলিল হতে পারে না।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর ১ : ২২৩-২২৪, বাহরুর রায়িক ১ : ৪২৭, মা'আরিফুস সুনান ২ : ১৪-১৫, দরসে তিরমিযী ১ : ৩৯৭-৩৯৮]

قَوْلُهُ وَالِلْعِشَاءِ مِنْهُ الخ :

ইশার শুরু ওয়াক্ত : ইশার শুরু ওয়াক্ত নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে, তবে আমরা তা এখানে উল্লেখ করছি না। কারণ, এর আলোচনা হুবহু মাগরিবের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কিত আলোচনার অনুরূপ। অতএব, মতানৈক্যের ভিত্তিতে যখনই মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হবে তখনই ইশার ওয়াক্ত শুরু হবে।

ইশার শেষ ওয়াক্ত : ইশার শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, সুবহে সাদেক উদিত হওয়া পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত বাকি থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ইশার সময় বাকি থাকবে।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো حَدِيْثُ إِمَامَةِ جِبْرَئِيْلَ ; এতে রয়েছে–

ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ .

অর্থাৎ "অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বিতীয় দিন ইশার নামাজ পড়িয়েছেন, তখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ গত হয়ে গেছে।" –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, দ্বিতীয় দিনও হযরত জিবরাঈল (আ.) ইশার নামাজ রাতের এক-তৃতীয়াংশে পড়িয়েছেন। অথচ দ্বিতীয় দিন নামাজের শেষ ওয়াক্তের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, ইশার ওয়াক্ত রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত থাকে।

আহনাফের দলিল হলো, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

اٰخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ .

অর্থাৎ "সুবহে সাদেক উদয় হওয়া পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত থাকে।"

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, সুবহে সাদেক উদয় হওয়া পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত থাকবে।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) : حَدِيْثُ إِمَامَةِ جِبْرَئِيْلَ (ع)-এর মধ্যে দ্বিতীয় দিন তিনি রাতের এক-তৃতীয়াংশে ইশার নামাজ পড়িয়েছেন– মাকরূহ সময় থেকে বাঁচার জন্য। কিংবা বলা যায় যে, حَدِيْثُ إِمَامَةِ جِبْرَئِيْلَ রহিত হয়ে গেছে।

বিতরের ওয়াক্ত : বিতরের নামাজের শুরু ওয়াক্ত নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : সাহেবাইন (র.) বলেন, ইশার নামাজ আদায়ের পর থেকে বিতরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহে সাদেক উদয় হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ইশার ওয়াক্তই হচ্ছে বিতরের ওয়াক্ত।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, বিতর আমলের দিক থেকে ফরজ। আর যদি এক সময়ে দুই ওয়াজিব নামাজকে একত্রিত করা যায় তবে উক্ত দুই নামাজের ওয়াক্ত একই হবে। যেমন– কাজা নামাজ ও ওয়াক্তিয়া নামাজ। তবে যেহেতু ইশা ও বিতরের নামাজে তারতীব আবশ্যক তাই ইশার নামাজের আগে বিতর আদায় করা যাবে না।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হচ্ছে, খারিজা ইবনে হুযাফা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস–

قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ اَضَافَ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ .

অর্থাৎ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি নামাজ বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা তোমাদের জন্য লাল উষ্ট্রী থেকেও উত্তম। তা হচ্ছে বিতরের নামাজ। অতঃপর তিনি একে ইশা ও সুবহে সাদেকের মাঝে রাখেন। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, ইশারের পরেই বিতরের ওয়াক্ত।

وَيَسْتَحِبُّ لِلْفَجْرِ الْبِدَايَةُ مُسْفِرًا بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ تَرْتِيلُ أَرْبَعِيْنَ آيَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا ثُمَّ إِعَادَتُهُ إِنْ ظَهَرَ فَسَادُ وُضُوْئِهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ وَالتَّاخِيْرُ لِظُهْرِ الصَّيْفِ فِيْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيْ أَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَلِلْعَصْرِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ وَلِلْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلِلْوِتْرِ إِلَى آخِرِهِ لِمَنْ وَثِقَ بِالْإِنْتِبَاهِ فَحَسْبُ وَالتَّعْجِيْلُ لِظُهْرِ الشِّتَاءِ وَالْمَغْرِبِ وَيَوْمَ غَيْمٍ يُعَجَّلُ الْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ وَيُؤَخَّرُ غَيْرُهُمَا .

অনুবাদ : ফজরের নামাজের জন্য মোস্তাহাব হচ্ছে, আলোতে শুরু করা। এভাবে যে, চল্লিশ কিংবা এর চেয়ে বেশি আয়াত যেন তারতীলের সাথে পড়া সম্ভব হয়। অতঃপর যদি কোনো মুসল্লির অজু ভেঙ্গে যায় [কিংবা নামাজকে দোহরানোর মতো কোনো কারণ দেখা দেয়] তবে যেন ওয়াক্তের মধ্যে [এ পরিমাণ কেরাতের সাথে] নামাজ পুনরায় পড়তে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "তোমরা ফজরকে আলোতে পড়। কেননা, এতে অনেক ছওয়াব রয়েছে।" গ্রীষ্মকালে জোহর বিলম্ব করে পড়া মোস্তাহাব। সহীহ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে– "তোমরা জোহরকে ঠাণ্ডা করে পড়। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা হয় জাহান্নামের উত্তাপ থেকে।" সূর্য পরিবর্তন [হলুদ বর্ণের] হওয়া পর্যন্ত আসরকে বিলম্ব করা মোস্তাহাব। রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ইশার নামাজ বিলম্ব করা মোস্তাহাব এবং ঐ ব্যক্তির জন্য শেষ রাত পর্যন্ত বিতরকে বিলম্ব করা মোস্তাহাব, যে শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে নিজের উপর আস্থাশীল। শীতকালে জোহর এবং [সর্বকালে] মাগরিব জলদি করে পড়া মোস্তাহাব। বর্ষা দিবসে আসর ও ইশাকে জলদি করে পড়া এবং অন্যান্য নামাজকে বিলম্ব করে পড়া মোস্তাহাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ لِلْفَجْرِ الْبِدَايَةُ الخ :

اَلْاَوْقَاتُ الْمُسْتَحَبَّةُ বা নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্ত : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) এখান থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্তের বিবরণ দেবেন। সেই ধারাবাহিকতায় প্রথমে তিনি ফজরের নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্তের বিবরণ শুরু করেছেন। তিনি বলেন যে, ফজরের নামাজ আলোতে এমনভাবে শুরু করতে হবে যে, চল্লিশ আয়াত কিংবা এর চেয়ে বেশি আয়াত তারতীলের সাথে পাঠ করা যায় এবং যদি কারো অজু ভেঙ্গে যায় কিংবা কারো নামাজ দোহরানোর মতো কারণ দেখা দেয় তবে যেন ঐ ওয়াক্তের মধ্যে সে পরিমাণ কেরাতসহ পুনরায় নামাজ আদায় করতে পারে। ফজরের নামাজ আলোতে পড়া উত্তম না অন্ধকারে পড়া উত্তম, এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আমরা নিম্নে তুলে ধরছি–

ফজর আলোতে পড়া উত্তম : ফজরের প্রথম ওয়াক্ত নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কোনো মতানৈক্য নেই, তবে এর শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ওলামায়ে আহনাফ -এর মতে, শুধু মাগরিবের নামাজ ব্যতীত সমস্ত নামাজ বিলম্ব করে তথা ওয়াক্তের শেষ সময়ে পড়া উত্তম। সে হিসেবে ফজরের নামাজও বিলম্বে তথা আলোতে পড়া উত্তম। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, ইশার নামাজ ব্যতীত সমস্ত নামাজ জলদি করে পড়া উত্তম। সে হিসেবে ফজরের নামাজ অন্ধকারে পড়া উত্তম।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ ـ

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজ পড়তেন, অতঃপর মহিলারা চাদর আবৃত অবস্থায় বাড়িতে যেতেন, কিন্তু অন্ধকারের কারণে তাদেরকে দেখা যেত না।" –[তিরমিযী, আবূ দাউদ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল ﷺ ফজরের নামাজ এত আগে পড়তেন যে, নামাজ শেষে মহিলারা বাড়িতে যেতেন, কিন্তু তাঁদেরকে চেনা যেত না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফজরের নামাজ আগে আগে তথা অন্ধকারে পড়াই উত্তম।

ওলামায়ে আহনাফের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস। তিনি ইরশাদ করেন– اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ

অর্থাৎ "তোমরা ফজরের নামাজ আলোতে পড়। কেননা, এতে অনেক বেশি প্রতিদান রয়েছে।" –[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, "তোমরা ফজরের নামাজ আলোতে পড় এবং এটা প্রতিদানের ক্ষেত্রে অনেক বড়।" অতএব, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফজরের নামাজ আলোতে পড়াই উত্তম।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হিসেবে পেশকৃত হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, হাদীসে مِنَ الْغَلَسِ [অন্ধকারের কারণে] শব্দটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বৃদ্ধিকৃত। এটি হাদীসের ইবারতে ছিল না। তা ছাড়া তাদেরকে চিনতে না পারার কারণ ছিল চাদর; অন্ধকার নয়।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর ১ : ২২৭, বাদায়িউস সানায়ে' ১ : ৩২২, মা'আরিফুস সুনান ২ : ৩৫, দরসে তিরমিযী ১ : ৪০১]

জোহরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত : ইতঃপূর্বে আমরা জোহরের শেষ সময় সম্পর্কে একটি মাসআলা আলোচনা করেছি। কিন্তু সে মাসআলা এখানে নয়; বরং এখানে জোহরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। বিকায়া গ্রন্থকার (র.) লেখেন, গ্রীষ্মকালে জোহরের নামাজ বিলম্ব করে পড়া মোস্তাহাব। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শীতকালে জোহরের নামাজ জলদি করে পড়া মোস্তাহাব। গ্রন্থকার দলিল হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসকে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা জোহরের নামাজ ঠাণ্ডা করে পড়। কেননা, জাহান্নামের উত্তাপ থেকে প্রচণ্ড গরমের সৃষ্টি হয়।" –[বুখারী শরীফ]

বুখারী শরীফে অপর একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যা শীতকালে জোহর জলদি করে পড়াকেও বুঝায়। তা হচ্ছে, হযরত আনাস (রা.) বলেন– كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ

অর্থাৎ "যখন প্রচণ্ড শীত হতো তখন প্রিয়নবী জোহরের নামাজ অবিলম্বে পড়তেন, আর যখন প্রচণ্ড গরম পড়ত তখন [জোহরের নামাজ] শীতল করে পড়তেন।" –[বুখারী শরীফ]

তা ছাড়া প্রচণ্ড গরমে নামাজে খুশুখুযু থাকে না এবং তখন সময়টা থাকে আল্লাহর غَضَبْ [ক্রোধ] -এর সময়। তাই সে সময়ে দোয়া ও নামাজে সফলতা আসে না।

আসরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত : আসরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আহনাফের মতে, গ্রীষ্ম ও শীত উভয় মৌসুমেই আসরকে সূর্য বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। ইমামত্রয় বলেন, আসরের নামাজ জলদি করে পড়া মোস্তাহাব।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমামত্রয়ের দলিল হলো, হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِيْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ـ

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামাজ পড়তেন এবং পথিক মদিনার আওয়ালী (عَوَالِيْ) -এর দিকে চলে যেতেন এবং ঐ সময় সূর্য উঁচুতেই থাকত।" –[বুখারী ও মুসলিম]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, আসরের নামাজ আদায় করে عَوَالِيْ -তে যাওয়া এবং সূর্য উঁচুতেই থাকা তখনই সম্ভব যখন আসর অবিলম্বে আদায় করা হবে। কেননা, عَوَالِيْ মদিনা থেকে তিন/চার মাইল দূরে।

আহনাফের দলিল হলো হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ تَعْجِيْلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ اَشَدُّ تَعْجِيْلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ.

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহরকে তোমাদের থেকে জলদি করে পড়তেন, আর তোমরা আসরকে তাঁর থেকে জলদি করে পড়।" –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, হযরত উম্মে সালামা (রা.) বললেন, তোমরা আসরের নামাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অধিক জলদি পড়। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আসরের নামাজ বিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) একটি যৌক্তিক দলিল উল্লেখ করেছেন এভাবে যে, আসরের পর কোনো নফল নামাজ পড়া যায় না, তাই আসরকে কিছুটা বিলম্ব করে পড়া হবে– যেন পূর্বে বেশি করে নফল নামাজ পড়া যায়।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : عَوَالِيْ মদিনা থেকে দু-তিন মাইল দূরে অবস্থিত। আর মাইল দ্বারা এখানে ঐ মাইলকে বুঝানো হয়েছে, যা তায়াম্মুমের অধ্যায়ে ধর্তব্য। তা তেমন বেশি দূর নয়। অতএব, আসরের নামাজ বিলম্বে আদায় করেও এতটুকু দূরত্বে যাওয়া যায় এবং সূর্যও উপরে থাকবে।

সূর্য বিবর্ণ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য : হিদায়া প্রণেতা বলেন, সূর্য বিবর্ণ হওয়ার দ্বারা সূর্যের গোলক বিবর্ণ হওয়া ধর্তব্য। তা হচ্ছে, সূর্য এমন অবস্থায় পৌঁছা যে, এর প্রতি যদি কেউ দেখে তবে এতে তার চোখ ধাঁধাবে না; বরং এর উপর দৃষ্টি স্থির থাকবে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র.) বলেন, সূর্য বিবর্ণ হওয়ার দ্বারা তার আলো বিবর্ণ হওয়া উদ্দেশ্য।

মাগরিবের মোস্তাহাব ওয়াক্ত : মাগরিবের নামাজ অবিলম্বে আদায় করা মোস্তাহাব। অর্থাৎ আজান এবং ইকামতের মাঝে কোনো ব্যবধান করবে না; বরং শুধু হালকা বৈঠক করবে কিংবা সামান্য বিরতি রাখবে। কেননা, ইহুদিরা মাগরিবের নামাজ বিলম্ব করে পড়ে। তাদের সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে যেন বাঁচা যায়। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَايَزَالُ اُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْمَغْرِبَ وَاَخَّرُوا الْعِشَاءَ.

অর্থাৎ "আমার উম্মত যতদিন মাগরিব অবিলম্বে এবং ইশা বিলম্বে পড়বে ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে।"–[হিদায়া]

এর দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, মাগরিবের নামাজ অবিলম্বে পড়া মোস্তাহাব।

ইশার মোস্তাহাব ওয়াক্ত : ইশার নামাজ রাতের এক-তৃতীয়াংশের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। এক বর্ণনা অনুযায়ী রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। দলিল রাসূল ﷺ -এর হাদীস–

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَخَّرْتُ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ.

অর্থাৎ "যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবে মনে না করতাম তবে অবশ্যই আমি ইশার নামাজ রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম।" তা ছাড়া আরো অনেক দলিল রয়েছে। আমরা সংক্ষেপ করত তা উল্লেখ করছি না। কোনো কোনো ফকীহ -এর মতে, গ্রীষ্মকালে ইশার নামাজ অবিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। কেননা, গ্রীষ্মকালে রাত ছোট হয় এবং মানুষ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। তাই যদি ইশার নামাজ বিলম্ব করে পড়া হয়, তবে জামাতে লোক কম হবে।

বিতরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত : যদি কেউ তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হয় এবং শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার বিশ্বাস থাকে তবে তার ক্ষেত্রে মোস্তাহাব হলো, বিতরের নামাজ শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পরে পড়া। পক্ষান্তরে যদি শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার বিশ্বাস না থাকে অথবা তাহাজ্জুদের নামাজের অভ্যাস না থাকে, তবে সে ব্যক্তি ঘুমের পূর্বেই বিতর পড়ে নেবে, কিন্তু হাদীসের মর্ম থেকে বুঝে আসে যে, তাহাজ্জুদের পরেই বিতর পড়া উত্তম।

বর্ষার দিনে আসর ও ইশা অবিলম্বে পড়বে : বর্ষা-বাদলের দিনে আসরের নামাজকে অবিলম্বে পড়বে। কারণ, তা বিলম্ব করার দ্বারা মাকরূহ সময় চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই মাকরূহ ওয়াক্ত থেকে বাঁচার জন্য তা অবিলম্বে পড়বে। অনুরূপ বর্ষার দিনে ইশার নামাজও অবিলম্বে পড়বে। কারণ, সম্ভাবনা আছে যে, বর্ষার দিনে নামাজ বিলম্ব করলে লোকজন জামাতে কম আসবে। যেহেতু উল্লিখিত দুটি কারণ অন্যান্য নামাজের ক্ষেত্রে নেই, সেহেতু সেগুলো বিলম্ব করে পড়া মোস্তাহাব।

وَلَا يَجُوْزُ صَلٰوةٌ وَسَجْدَةُ تِلَاوَةٍ وَصَلٰوةُ جَنَازَةٍ عِنْدَ طُلُوْعِهَا وَقِيَامِهَا وَغُرُوْبِهَا اِلَّا عَصْرَ يَوْمِهٖ فَقَدْ ذُكِرَ فِىْ كُتُبِ اُصُوْلِ الْفِقْهِ اَنَّ الْجُزْءَ الْمُقَارِنَ لِلْاَدَاءِ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ الصَّلٰوةِ وَاٰخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ وَقْتٌ نَاقِصٌ اِذْ هُوَ وَقْتُ عِبَادَةِ الشَّمْسِ فَوَجَبَ نَاقِصًا فَاِذَا اَدَّاهُ اَدَّاهُ كَمَا وَجَبَ فَاِذَا اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالْغُرُوْبِ لَا تَفْسُدُ وَ فِى الْفَجْرِ كُلُّ وَقْتِهٖ وَقْتٌ كَامِلٌ لِاَنَّ الشَّمْسَ لَا تُعْبَدُ قَبْلَ الطُّلُوْعِ فَوَجَبَ كَامِلًا فَاِذَا اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالطُّلُوْعِ تَفْسُدُ لِاَنَّهٗ لَمْ يُؤَدِّهَا كَمَا وَجَبَ فَاِنْ قِيْلَ هٰذَا تَعْلِيْلٌ فِىْ مَعْرِضِ النَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ الطُّلُوْعِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْفَجْرَ وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوْبِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ قُلْنَا لَمَّا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَبَيْنَ النَّهْيِ الْوَارِدِ عَنِ الصَّلٰوةِ فِى الْاَوْقَاتِ الثَّلٰثَةِ رَجَعْنَا اِلَى الْقِيَاسِ كَمَا هُوَ حُكْمُ التَّعَارُضِ وَالْقِيَاسُ رَجَّحَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ وَحَدِيْثَ النَّهْيِ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَاَمَّا سَائِرُ الصَّلٰوةِ فَلَا يَجُوْزُ فِى الْاَوْقَاتِ الثَّلٰثَةِ لِحَدِيْثِ النَّهْيِ اِذْ لَا مُعَارِضَ لِحَدِيْثِ النَّهْيِ فِيْهَا ـ

অনুবাদ : সূর্যোদয়, দ্বিপ্রহর ও সূর্যাস্তের সময় কোনো নামাজ, তিলাওয়াতে সিজদা এবং জানাজা নামাজ জায়েজ নেই। তবে সেদিনের আসরের নামাজ [সূর্যাস্তের সময় জায়েজ]। উসূলুল ফিকহ-এর কিতাবের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, ওয়াক্তের যে অংশ আদা-এর সাথে সংযুক্ত থাকে, তা নামাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبٌ [কারণ]। আর আসরের শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে وَقْت نَاقِصْ [অসম্পূর্ণ ওয়াক্ত]। কেননা, তা সূর্যের উপাসনার ওয়াক্ত। অতএব, [যদি কেউ আসরের শেষ ওয়াক্তে সেদিনের আসরের নামাজ শুরু করে তবে তার উপর উক্ত আসরের নামাজটি] অসম্পূর্ণরূপে ওয়াজিব হবে। তাই যখন সে তা আদায় করেছে তখন যেভাবে ওয়াজিব হয়েছে সেভাবেই আদায় করেছে। অতএব, সূর্য ডুবার দ্বারা নামাজ বিনষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে ফজরের ক্ষেত্রে এর পুরো ওয়াক্তটাই وَقْت كَامِلْ [পূর্ণ ওয়াক্ত]। কেননা, সূর্যোদয়ের পূর্বে সূর্যের পূজা করা হয় না, তাই ফজরের নামাজ পূর্ণ ওয়াক্তে ওয়াজিব হয়েছে। অতএব, যখন সূর্যোদয়ের মাধ্যমে নামাজ বিনষ্টের কারণ দেখা দেবে তখন নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, সে ফজরের নামাজ যেভাবে ওয়াজিব হয়েছে সেভাবে আদায় করেনি। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই কারণ দর্শানো তো নস্-এর পরিপন্থি হয়, আর তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– "যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকাত পেল সে পূর্ণ ফজর পেল, আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকাত পেল সে পূর্ণ আসর পেল।" উত্তরে আমরা বলব, যখন এ হাদীস এবং তিন সময়ে নামাজ পড়া থেকে নিষেধাজ্ঞার মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে তখন আমরা কিয়াস [অনুমান]-এর দিকে ফিরে গিয়েছি। যেমন বৈপরীত্যের হুকুম। আর কিয়াস এ হাদীসকে আসরের নামাজের ক্ষেত্রে

প্রাধান্য দিয়েছে এবং ফজরের নামাজের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার হাদীসের কারণে উক্ত তিন সময়ে অন্যসব নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। কেননা, সেগুলোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার হাদীসের কোনো বৈপরীত্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ صَلٰوةٌ وَسَجْدَةُ تِلَاوَةٍ الخ :

الأوقات المنهية : অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহরের সময় নামাজ, তিলাওয়াতে সিজদা ইত্যাদি নাজায়েজ। চাই নফল নামাজ হোক, ফরজ নামাজ হোক, ওয়াজিব নামাজ হোক কিংবা অন্য কোনো নামাজ হোক। যেমন– জানাজা নামাজ, সমস্ত নামাজই নাজায়েজ। এ নাজায়েজ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাকরূহ তাহরীমী। সিজদায়ে তিলাওয়াত যেহেতু নামাজের হুকুমে সেহেতু তা নাজায়েজ।"

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উক্ত সময়গুলোতে যে-কোনো শহরে যে-কোনো স্থানে ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ আছে এবং পবিত্র মক্কায় উক্ত সময়গুলোতে নফল নামাজ পড়াও জায়েজ আছে। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا .

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা নামাজ পড়তে ভুলে যায়, সে ঐ সময় নামাজ পড়ে নেবে যখন তা স্মরণ হয়। কেননা, এটাই তার সময়।"

এ হাদীস দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, ঐ সময়গুলোতেও ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ আছে। অন্যত্র বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– يَا بَنِيْ عَبْدَ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى فِيْ أَيَّةِ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ وَنَهَارٍ

অর্থাৎ "হে বনী আবদে মানাফ! তোমরা কোনো ব্যক্তিকে এ গৃহে তাওয়াফ করতে এবং নামাজ পড়তে বাধা দিও না– রাতদিনে যখনই নামাজ পড়তে চায়।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র মক্কায় যে-কোনো নামাজ যে-কোনো সময় পড়া জায়েজ আছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, জুমার দিনের দ্বিপ্রহরে নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে। দলিল হলো হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস– إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিপ্রহরে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য হেলে না পড়ে। তবে হ্যাঁ, জুমার দিন এর ব্যতিক্রম।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জুমার দিনের দ্বিপ্রহরে নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে।

জমহুর ওলামায়ে কেরামের দলিল হলো হযরত ওক্‌বা ইবনে আমির (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেন–

ثَلَاثُ أَوْقَاتٍ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهَا مَوْتَانَا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتّٰى تَزُوْلَ وَحِيْنَ تَضِيْفُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ .

অর্থাৎ "তিনটি ওয়াক্ত এমন রয়েছে যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়তে এবং আমাদের মৃতদের দাফন করতে [জানাজা নামাজ পড়তে] নিষেধ করেছেন– ১. সূর্যোদয়ের সময়– যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্য উপরে উঠবে, ২. দ্বিপ্রহরের সময়– যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্য হেলে পড়বে, ৩. ডুবার জন্য সূর্য যখন হলুদ বর্ণের হবে– যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্য ডুবে যাবে।" أَنْ نَقْبُرَ فِيْهَا مَوْتَانَا দ্বারা জানাজার নামাজ উদ্দেশ্য। কেননা, ঐ সময়ে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা মাকরূহ নয়। উক্ত সময়গুলোতে مُطْلَقًا নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। চাই ফরজ, ওয়াজিব, নফল কিংবা জানাজা নামাজই হোক।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের খণ্ডন হচ্ছে, তার দুটি হাদীস দ্বারা উক্ত তিন সময়ে নামাজের বৈধতা প্রমাণিত হয়, আর আহনাফের হাদীস দ্বারা উক্ত সময়গুলোতে নামাজ হারাম প্রমাণিত হয়। উসূলুল ফিকহের গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, বৈধ ও অবৈধ একত্রিত হলে অবৈধ প্রাধান্য পায়। অতএব, উক্ত সময়গুলোতে নামাজ আদায় করা বৈধ নয়।

সূর্যাস্তের সময় সেদিনের আসর পড়া বৈধ : যদি সূর্যাস্তের পূর্বে কেউ সেদিনের আসরের নামাজ আদায় না করে থাকে– তবে সে সূর্যাস্তের সময়ও তা আদায় করতে পারবে। অর্থাৎ নামাজ কাজা করার চেয়ে সে সময় আদায় করা উত্তম। শারেহ (র.) এর কারণ উল্লেখ করে বলেন, উসূলুল ফিকহ-এর কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, যে সময় নামাজ আদায় করা হয়, তা-ই হচ্ছে ঐ নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সবব (سَبَبٌ)। আর আসরের শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে وَقْت نَاقِصٌ [অসম্পূর্ণ ওয়াক্ত]। কেননা, তখন সূর্যের উপাসনার সময়।

অতএব, যে ব্যক্তি সে সময় আসর আদায় করে, তার উপর وَقْت نَاقِصٌ-এর মধ্যেই তা ওয়াজিব হয়। তাই তার উপর তা যেভাবে [وَقْت نَاقِصٌ-এ] ওয়াজিব হয়, সেভাবেই সে তা [وَقْت نَاقِصٌ-এ] আদায় করে। ফলে সূর্যাস্তের দ্বারাও তার নামাজ বিনষ্ট হবে না।

সূর্যোদয়ের সময় ফজর পড়া বৈধ নয় : যদি কেউ ফজরের নামাজ শেষ ওয়াক্তে শুরু করে, আর এমতাবস্থায় সূর্য উদয় হয়ে যায়, তবে তার নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে। শারেহ (র.) এর কারণ উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্তটা কামিল ও পরিপূর্ণ, আর আদায়ের সময়টাই হয় নামাজ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبٌ অতএব, যখন সূর্যোদয়ের পূর্বে সে নামাজ শুরু করে তখন তার নামাজ وَقْت كَامِلٌ-এ ওয়াজিব হয় এবং যখন শেষ হতে হতে সূর্যোদয় হয়ে যায় তখন উক্ত নামাজ وَقْت نَاقِصٌ-এ শেষ হয়। কেননা, যেভাবে তার উপর وَقْت كَامِلٌ-এ নামাজটি ওয়াজিব হয়েছিল সেভাবে সে তা আদায় করেনি; বরং শেষ অংশ وَقْت نَاقِصٌ-এ আদায় করেছে।

একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর : প্রশ্ন : প্রশ্নের সারমর্ম হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– "সূর্যোদয়ের পূর্বে যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকাত পেল সে পূর্ণ ফজরই পেল, আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকাত পেল, সে পূর্ণ আসর পেল।" এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজর ও আসরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বে যদি এক রাকাত করেও নামাজ পায় তবে তার উভয় নামাজই পরিপূর্ণরূপে পাওয়া হবে, কিন্তু যুক্তির দ্বারা শুধু আসরের নামাজ হবে, আর ফজরের নামাজ হবে না– প্রমাণিত করাটা মূলত হাদীসের পরিপন্থি হচ্ছে। আর হাদীসের বিপরীতে যুক্তি আসতে পারে না।

উত্তর : উত্তরের সারমর্ম হচ্ছে, এখানে হাদীস দুই ধরনের– ১. যে হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। ২. উল্লিখিত তিন ওয়াক্তে নামাজ আদায় নিষেধাজ্ঞার হাদীস। যখন হাদীসদ্বয়ের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে তখন আমরা কিয়াসের দিকে ফিরে গিয়েছি। আর কিয়াস উক্ত হাদীসকে আসরের নামাজের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছে এবং তিন ওয়াক্তে নামাজ আদায় নিষেধ সংক্রান্ত হাদীসকে ফজরের নামাজের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছে। আর অন্যান্য নামাজের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার হাদীস বহাল রয়েছে। যেহেতু সে ক্ষেত্রে কোনো বৈপরীত্য নেই।

কিয়াসের দিকে আমরা এ কারণে গিয়েছি যে, উসূলের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, যদি দুটি নস্ পরস্পর একটি অপরটির পরিপন্থি হয় এবং উভয়টিকে একত্রিত করা না যায়, তবে উভয়ের কোনোটিতেই আমল করা যাবে না। কিন্তু যদি উভয় হাদীসের উপর একসঙ্গে আমল করা যায়, তবে তা করা আবশ্যক। সে আমলই এখানে করা হয়েছে।

وَكُرِهَ النَّفْلُ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ اِلَّا سُنَّتَهُ وَبَعْدَ اَدَاءِ الْعَصْرِ اِلٰى اَدَاءِ الْمَغْرِبِ وَصَحَّ الْفَوَائِتُ وَصَلٰوةُ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فِىْ هٰذَيْنِ اَىْ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ اَدَاءِ الْعَصْرِ اِلٰى اَدَاءِ الْمَغْرِبِ لٰكِنَّهَا يُكْرَهُ فِى الْاَوَّلِ وَهُوَ مَا اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ لِلْخُطْبَةِ وَلَا يَجْمَعُ فَرْضَانِ فِىْ وَقْتٍ بِلَا حَجٍّ وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) .

অনুবাদ : আর ইমাম যখন জুমার খুতবা দানের জন্য বের হয় তখন এবং সুবহে সাদেকের পরে নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। তবে সুবহে সাদেকের পর শুধু ফজরের সুন্নত পড়া জায়েজ। আসরের নামাজ আদায়ের পর থেকে মাগরিবের নামাজ আদায় পর্যন্ত [নফল নামাজ পড়া মাকরূহ]। তবে এ দুই ওয়াক্তে কাজা নামাজ, জানাজা নামাজ ও তিলাওয়াতে সিজদা বৈধ। অর্থাৎ সুবহে সাদেকের পর এবং আসর আদায়ের পর থেকে মাগরিব আদায় পর্যন্ত। কিন্তু এগুলো [অর্থাৎ কাজা, জানাজার নামাজ ও তিলাওয়াতে সিজদা] প্রথমটি তথা যখন ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বের হয় -এর মধ্যে মাকরূহ। হজের সময় ব্যতীত অন্য কোনো ওয়াক্তে দুই ফরজ নামাজ আদায় করা যাবে না। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكُرِهَ النَّفْلُ اِذَا خَرَجَ الخ :

اَلْاَوْقَاتُ الْمَكْرُوْهَةُ : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) أَوْقَاتٌ -এর বিবরণ থেকে ফারিগ হওয়ার পর أَوْقَات مَكْرُوْهَة -এর বর্ণনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, তিন সময় নফল নামাজ পড়া মাকরূহ–

১. ইমাম যখন জুমার খুতবা দেওয়ার জন্য বের হবে এবং মিম্বরে বসবে তখন নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। চাই তা তাহিয়্যাতুল উযূ হোক কিংবা জুমার পূর্বের সুন্নত হোক। হযরত আলী (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.) ও ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা ইমাম বের হওয়ার পর নামাজ পড়া ও কথা বলা মাকরূহ তথা মাকরূহ তাহরীমী জানতেন।

২. সুবহে সাদেকের পর থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাজ পড়া মাকরূহ। তবে এতে শুধু ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ পড়তে পারবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ .

অর্থাৎ সুবহে সাদেকের পর থেকে সূর্য উঠা পর্যন্ত কোনো নামাজ নেই এবং আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো নামাজ নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

৩. আসর আদায়ের পর থেকে মাগরিব আদায় পর্যন্ত। দলিল হলো, দ্বিতীয় প্রকারে উল্লিখিত হাদীস। তবে সূর্যাস্তের পর মাগরিব আদায়ের পূর্বেও যে-কোনো নফল নামাজ মাকরূহ এজন্য যে, এর কারণে মাগরিবের নামাজ বিলম্ব হয়ে যায়। অথচ মাগরিবকে বিলম্বিত করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকে এটাও বুঝে আসে যে, যদি কেউ মাগরিবের পূর্বে ছোট ছোট দুই রাকাত নামাজ পড়ে নেয় যার দ্বারা মাগরিবের নামাজ বিলম্বিত হয় না, তবে তা মাকরূহ নয়। বাহরুর রায়িক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত পড়তে চায় সে তা পড়ে নেবে।"– "যে ব্যক্তি পড়তে চায়"– এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তা শুধুমাত্র জায়েজ; সুন্নত নয়।

❖ **ইমাম খুতবার জন্য বের হওয়ার সময় কখন থেকে নামাজ পড়া মাকরূহ :** আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, জুমার খুতবার সময় কখন থেকে নামাজ পড়া নিষেধ এ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে– ১. যখন ইমাম মিম্বরে উঠবে। ২. যখন খুতবা শুরু হয়ে যাবে। ৩. যখন ইমাম স্বীয় স্থান থেকে উঠবে কিংবা স্বীয় কামরা থেকে বের হবে।

কোনো কোনো ফকীহ জনগণের সুবিধার্থে খুতবা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নামাজ ও কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কোনো কোনো ফকীহ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ "ইমাম যখন বের হবে তখন কোনো নামাজ ও কথাবার্তা নেই"– এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম যখন কামরা থেকে বের হয় কিংবা মিম্বরে উঠে কিংবা খুতবা শুরু করে তখন থেকেই সমস্ত নামাজ ও কথাবার্তা থেকে বারণ করেন। এমনকি أَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ [সৎকাজের আদেশ করা]ও নিষিদ্ধ। এমনকি খুতবা চলাকালীন অবস্থায় অন্যকে চুপ করানোর জন্যও কথা বলা নিষিদ্ধ। তবে তাকে হাতের ইশারায় চুপ করাতে হবে। হ্যাঁ, যদি কেউ জুমার পূর্বের চার রাকাত সুন্নত পড়তে শুরু করে আর এমতাবস্থায় ইমাম খুতবা শুরু করে এবং সে অধিকাংশ নামাজ তথা তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাকাতে থাকে তবে সে নামাজ শেষ করবে। আর যদি সে প্রথম বৈঠকে কিংবা এরও পূর্বে থাকে তবে সে দুই রাকাতেই সালাম ফিরিয়ে ফেলবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَجْمَعُ فَرْضَانِ الخ :

এক ওয়াক্তে দুই ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ নেই : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) أَوْقَات مَكْرُوهَة-এর বিবরণ থেকে ফারিগ হওয়ার পর সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি মাসআলার আলোচনা শুরু করেছেন। তা হচ্ছে, দুই ফরজ নামাজকে تَقْدِيْم কিংবা تَاخِيْر করে এক ওয়াক্তে আদায় করা জায়েজ নেই। তবে শুধু হজে হাজীরা আরাফার দিনে জোহর ও আসরকে تَقْدِيْم করে তথা আসরকে জোহরের সঙ্গে পড়ে নেয়। আর يَوْمُ النَّحْرِ [কুরবানির দিন]-এ মুজদালিফার ময়দানে মাগরিব ও ইশাকে تَاخِيْر করে তথা মাগরিবকে ইশার সাথে আদায় করে নেয়। এটি আহনাফের মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, হজ ব্যতীত অন্যান্য সময়ে কিংবা হজের মৌসুমে হাজী ব্যতীত অন্যান্য লোকের জন্য সফর অবস্থায় জোহর ও আসরের মধ্যে تَقْدِيْم করা এবং মাগরিব ও ইশার মধ্যে تَاخِيْر করা জায়েজ আছে। তাঁর দলিল হলো, অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর অবস্থায় এমনটি করেছেন, যেগুলো বুখারী, মুসলিম ও সুনানের কিতাবসমূহে বর্ণিত রয়েছে।

আহনাফের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اَتٰى بَابًا مِنْ اَبْوَابِ الْكَبَائِرِ .

অর্থাৎ "কোনো ওজর ব্যতীত যে ব্যক্তি দুই ফরজ নামাজকে একসঙ্গে পড়ে, সে কবীরা গুনাহের অসংখ্য দরজার একটি দরজা খুলল।" অর্থাৎ সে কবীরা গুনাহ করল। এ হাদীস স্পষ্টভাবে বুঝায় যে, ওজর ব্যতীত দুই ফরজ নামাজ একসঙ্গে আদায় করা কবীরা গুনাহ। আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন, এটিই হক কথা যে, প্রয়োজনের সময় দুই ফরজ নামাজকে একত্রে এক ওয়াক্তে পড়া বৈধ।

وَمَنْ طَهُرَتْ فِىْ وَقْتِ عَصْرٍ اَوْ عِشَاءٍ صَلَّتْهَا فَقَطْ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فَإِنَّ عِنْدَهُ مَنْ طَهُرَتْ فِىْ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ اَيْضًا وَمَنْ طَهُرَتْ فِىْ وَقْتِ الْعِشَاءِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ اَيْضًا فَاِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عِنْدَهُ كَوَقْتٍ وَاحِدٍ وَكَذَا وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَلِهٰذَا يَجُوْزُ الْجَمْعُ عِنْدَهُ فِى السَّفَرِ وَمَنْ هُوَ اَهْلُ فَرْضٍ فِىْ اٰخِرِ وَقْتِهٖ يَقْضِيْهِ لَا مَنْ حَاضَتْ فِيْهِ يَعْنِىْ اِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ اَوْ اَسْلَمَ الْكَافِرُ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ اِلَّا قَدْرَ التَّحْرِيْمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلٰوةِ ذٰلِكَ الْوَقْتِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) وَمَنْ حَاضَتْ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ صَلٰوةِ ذٰلِكَ الْوَقْتِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) .

অনুবাদ : যে মহিলা আসরের সময় কিংবা ইশার সময় পাক হয়, তবে সে শুধু ঐ নামাজই পড়বে [যে ওয়াক্তে সে পাক হয়েছে]। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) মতানৈক্য করেন। কেননা, তাঁর নিকট যে মহিলা আসরের সময় পাক হবে সে জোহরের নামাজও পড়বে। আর যে মহিলা ইশার ওয়াক্তে পাক হবে সে মাগরিবের নামাজও পড়বে। কেননা, তাঁর নিকট জোহর ও আসরের ওয়াক্ত এক ওয়াক্তের ন্যায়। অনুরূপ মাগরিব ও ইশার ওয়াক্তও এক ওয়াক্তের ন্যায়। এজন্যই তাঁর নিকট সফরে দুই ওয়াক্ত নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া জায়েজ। যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের শেষ ওয়াক্তে নামাজের উপযুক্ত হয়, সে ঐ নামাজ আদায় করবে। আর যে মহিলা শেষ ওয়াক্তে হায়েজা হয় সে ঐ ওয়াক্তের নামাজ কাজা করবে না। অর্থাৎ যখন বালক নামাজের শেষ ওয়াক্তে বালেগ হবে কিংবা কাফের মুসলমান হবে, আর ওয়াক্তের শুধু তাহরীমা বাঁধা পরিমাণ সময় বাকি থাকে তবে তার উপর ঐ ওয়াক্তের নামাজ কাজা করা ওয়াজিব। এতে ইমাম যুফার (র.) মতানৈক্য করেন। যে মহিলা শেষ ওয়াক্তে হায়েজা হবে, তার উপর ঐ ওয়াক্তের নামাজ কাজা করা ওয়াজিব নয়। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ هُوَ أَهْلُ فَرْضٍ فِىْ اٰخِرِ الخ : অর্থাৎ যদি কেউ শেষ ওয়াক্তে ফরজ -এর মুকাল্লাফ (مُكَلَّفٌ) হয়। যেমন– কোনো কাফের মুসলমান হলো কিংবা কোনো বালক বালেগ হলো কিংবা কোনো হায়েজা বা নিফাসগ্রস্ত মহিলা পাক হলো এবং তখনও এ পরিমাণ সময় বাকি থাকে যে, তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা যায়, তবে তার উপর ঐ ওয়াক্তের নামাজ কাজা করা ওয়াজিব। কারণ, আমাদের নিকট সববিয়্যাত (سَبَبِيَّةٌ) ওয়াক্তের শেষ অংশের দিকে ফিরে। এখন যেহেতু সে ওয়াক্তের শেষ অংশে ফরজের مُكَلَّفٌ [উপযুক্ত] হয়ে গেছে, তাই তার উপর ফরযিয়্যাত [ফরজ] প্রমাণিত হয়ে যায়। অতএব, তা কাজা করা ওয়াজিব।

এতে ইমাম যুফার (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শেষ ওয়াক্তে ফরজের مُكَلَّفٌ [উপযুক্ত] হয়, তার উপর ঐ ওয়াক্তের নামাজ ওয়াজিব নয়। কেননা, এ স্বল্প সময় এ পরিমাণ নয় যে, এতে নামাজ আদায় করা যায়। তাই তার উপর নামাজ আদায় করা ওয়াজিবও নয়। অতএব, তার উপর কাজাও ওয়াজিব নয়। আহনাফ এর এই উত্তর দেন যে, প্রকাশ্যভাবে মনে হয়– সময় কম, কিন্তু خَرْقُ الْعَادَةِ [অকস্মাৎ মু'জিযা] হিসেবে তা সম্ভব। তা ছাড়া যখন সে ওয়াক্তের মধ্যে ফরজ -এর উপযুক্ত হওয়া পাওয়া গেছে, তখন তা ওয়াজিব না হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। হ্যাঁ, সে উপযুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই তা আদায়ের জন্য প্রস্তুত নয়, তাই কাজা ওয়াজিব।

قَوْلُهٗ وَمَنْ حَاضَتْ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ الخ : অর্থাৎ আমাদের নিকট সববিয়্যাত (سَبَبِيَّةٌ) ওয়াক্তের শেষ অংশের দিকে ফিরে। তাই যে মহিলা শেষ ওয়াক্তে হায়েজা হয়, আমাদের মতে তার উপর ঐ ওয়াক্তের নামাজ ওয়াজিব নয়। কারণ, শেষ ওয়াক্তটি তার হায়েজ অবস্থায় কেটেছে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার উপরও ঐ নামাজ ওয়াজিব। কারণ, সে ওয়াক্তের শুরুতে কিংবা মধ্যখানে পাক ছিল। তা ছাড়া তাঁর নিকট সববিয়্যাত শেষ ওয়াক্তের দিকে ফিরে না।

بَابُ الْاَذَانِ

هُوَ سُنَّةٌ لِلْفَرَائِضِ فَحَسْبُ فِىْ وَقْتِهَا هُوَ سُنَّةٌ لِلْفَرَائِضِ الْخَمْسِ وَ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فِى النَّوَافِلِ فَقَوْلُهٗ فِىْ وَقْتِهَا اِحْتِرَازٌ عَنِ الْاَذَانِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَعَنِ الْاَذَانِ بَعْدَ الْوَقْتِ لِاَجْلِ الْاَدَاءِ فَاَمَّا الْاَذَانُ بَعْدَ الْوَقْتِ لِلْقَضَاءِ فَهُوَ مَسْنُوْنٌ اَيْضًا وَلَا يَرِدُ اِشْكَالٌ لِاَنَّهٗ فِىْ وَقْتِ الْقَضَاءِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهٗ بَعْدَ وَقْتِ الْاَدَاءِ لِاَنَّهٗ لَيْسَ لِلْاَدَاءِ بَلْ لِلْقَضَاءِ فِىْ وَقْتِهٖ قَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَالشَّافِعِىِّ (رحـ) يَجُوْزُ لِلْفَجْرِ فِى النِّصْفِ الْاٰخِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ ـ

পরিচ্ছেদ : আজানের বর্ণনা

অনুবাদ : ওয়াক্তের মধ্যে শুধু ফরজ নামাজের জন্য আজান সুন্নত। অর্থাৎ আজান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমার জন্য সুন্নত; নফলের জন্য তা সুন্নত নয়। অতএব, গ্রন্থকার فِىْ وَقْتِهَا [সময়ের মধ্যে] বলে ওয়াক্তের পূর্বে আজান এবং [নামাজ] আদায়ের জন্য ওয়াক্তের পরে আজান থেকে বিরত থেকেছেন। তবে ওয়াক্তের পরে কাজা নামাজের জন্য আজান দেওয়া ও সুন্নত এবং এতে কোনো মন্তব্য উত্থাপিত হয় না। কেননা, তা কাজার ওয়াক্তে রয়েছে এবং এ আজান আদায়ের ওয়াক্তের পরে হওয়ার কারণে ক্ষতিকর নয়। কেননা, তা আদায়ের জন্য নয়; বরং কাজার ওয়াক্তের মধ্যে কাজার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি নামাজ থেকে [তথা নামাজের ওয়াক্তে] ঘুমিয়ে থাকে কিংবা নামাজের কথা ভুলে যায় তবে [যখন সে জাগ্রত হবে কিংবা] যখন তার স্মরণ হবে তখন সাথে সাথে নামাজ পড়ে নেবে। কেননা, এটাই তার ওয়াক্ত।" ইমাম আবূ ইউসুফ ও শাফেয়ী (র.)-এর নিকট রাতের শেষ অংশে ফজরের আজান দেওয়া জায়েজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ بَابُ الْاَذَانِ :

আজান-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : اَذَانٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ اَلْاِعْلَامُ জানানো এবং ঘোষণা দেওয়া। اَذَانٌ শব্দটি কুরআন মাজীদে 'ঘোষণা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ

অর্থাৎ "আর মহান হজের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে।" [তাওবা : ৩] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ "মানুষের মাঝে হজের জন্য ঘোষণা করে দাও।" –[হজ : ২৭]

শরিয়তের পরিভাষায়– عِبَارَةٌ عَنْ إِعْلَامٍ مَخْصُوْصٍ فِىْ أَوْقَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ অর্থাৎ "নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ঘোষণাকে আজান বলা হয়।"–[ফাতহুল কাদীর ১ : ২৪৩]

আজানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : যখন সাহাবীদের নামাজ এবং জামাতের সময় জানানোর প্রয়োজন হলো, তখন তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করলেন। কেউ প্রস্তাব দিলেন যে, ইহুদিদের ন্যায় ঘণ্টা বাজানো হোক। কেউ প্রস্তাব দিলেন যে, আগুন জ্বালানো হোক। কিন্তু রাসূল তা পছন্দ করলেন না। হযরত ওমর (রা.) প্রস্তাব দিলেন, নামাজের সময় اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ বলা হোক। এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ এবং হযরত ওমর (রা.) স্বপ্নে দেখলেন যে, এক ফেরেশতা তাঁদেরকে আজানের নিয়ম

শিক্ষা দিলেন। সে নিয়মে নামাজের সময় এবং জামাত সম্পর্কে অবগত করা হবে। সকালে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে পেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ ঘটনা সত্য। হযরত বেলাল (রা.)-কে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, এভাবে আজান দাও। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) এসে স্বীয় স্বপ্ন বর্ণনা করলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, এ ঘটনার পূর্বে আজান সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর নিকট ওহী এসেছে।

আজানের হুকুম কখন এসেছে? মোল্লা আলী কারী (র.) এ সম্পর্কে শরহে নিকায়া গ্রন্থে দুটি মত উল্লেখ করেছেন।

১. প্রথম হিজরিতে আজানের হুকুম এসেছে।

২. দ্বিতীয় হিজরিতে আজানের হুকুম এসেছে। দ্বিতীয় মতের দলিল হলো, ইবনে সা'দ ও নাফে ইবনে যুবাইর (র.) ও হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর এবং সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন–

اِنَّهُمْ قَالُوْا كَانَ النَّاسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ يُّؤْمَرُوْا بِالْاَذَانِ يُنَادِيْ مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّلَاةُ جَامِعَةً فَتَجْتَمِعُ النَّاسُ فَلَمَّا صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ اُمِرَ بِالْاَذَانِ .

অর্থাৎ "তাঁরা বলেন, রাসূল ﷺ -এর যুগে আজানের বিধান আসার পূর্বে এরূপ নিয়ম ছিল যে, রাসূল ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি اَلصَّلَاةُ جَامِعَةً বলে ঘোষণা দিতেন। ফলে এ আহ্বান শ্রবণ করে লোকেরা একত্রিত হতো। কিন্তু যখন কিবলা পরিবর্তন হলো– তখন আজান দেওয়ার বিধান আসল।"

একথায় সকলে একমত যে, দ্বিতীয় হিজরিতে কিবলা পরিবর্তন হয়েছে। অতএব, বুঝা গেল যে, আজানের বিধান দ্বিতীয় হিজরিতে দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে সিআয়াহ (اَلسِّعَايَةُ) গ্রন্থে লেখেন, কোনো কোনো হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, আজানের বিধান পবিত্র মক্কায় হিজরতের পূর্বে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উক্ত হাদীসসমূহকে সহীহ না হওয়ার দাবি করেছেন।

আজানের হুকুম : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমার নামাজের জন্য আজান সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। কোনো কোনো ফকীহের মতে তা ওয়াজিব। কেননা, ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, "যদি শহরবাসী সকলে আজান বর্জন করার উপর ঐকমত্য হয় তবে তাদের সাথে জিহাদ করা হবে।" প্রকাশ থাকে যে, জিহাদ ওয়াজিব বর্জনের কারণে হয়; সুন্নত বর্জনের কারণে নয়। অতএব, বুঝা গেল যে, আজান ওয়াজিব। এর খণ্ডন হচ্ছে, আজান মূলত সুন্নতই। তবে আজান বর্জনের উপর ঐকমত্য হলে দীনের অবমাননা হয়। আর দীন অবমাননার অবস্থায় জিহাদ ওয়াজিব হয়। এজন্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাদের সাথে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমার জন্য আজান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

আজানের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব : আজান আল্লাহর জিকিরের মধ্যে সর্বাধিক বড় জিকির। এতে তাওহীদ-রিসালাতের সাক্ষ্যের সুস্পষ্ট ঘোষণা আছে। এর দ্বারা ইসলামের প্রভাব এবং শক্তি প্রকাশ পায়। অনেক হাদীসে মুয়াজ্জিনের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

১. "আজানের ধ্বনি যে পর্যন্ত পৌঁছে এবং যারা তা শ্রবণ করে জিন হোক বা মানুষ হোক, তারা আজান প্রদানকারীর ঈমানের সাক্ষ্য দেবে।" –[বুখারী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ]

২. রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি লোকেরা জানত যে, আজানে কত বেশি পুণ্য তবে লটারি দিয়ে হলেও তারা আজান দেওয়ার এ সুযোগ লাভ করার চেষ্টা করত। –[বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী]

৩. হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাত বছর ধারাবাহিকভাবে আজান দেবে এবং তার উদ্দেশ্য হবে ছওয়াব অর্জন তবে তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ লিখে দেওয়া হবে।" –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী]

قَوْلُهُ فَاَمَّا الْاَذَانُ بَعْدَ الْوَقْتِ الخ :

কাজা নামাজের জন্য আজান সুন্নত : ওয়াক্তের মধ্যে নামাজ আদায়ের জন্য যেরূপ আজান দেওয়া সুন্নত, অনুরূপ কাজা নামাজ আদায়ের জন্যও আজান দেওয়া সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত আছে যে, এক সফরে তাঁরা ফজরের নামাজের সময় ঘুমিয়েছিলেন। যখন তাঁরা উক্ত নামাজ কাজা করার ইচ্ছা করলেন তখন হযরত বেলাল (রা.) আজান দিলেন এবং ইকামত বললেন। অতঃপর রাসূল ﷺ জামাতের সাথে নামাজ পড়িয়েছেন।

–[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী]

قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ اِشْكَالٌ لِاَنَّهُ فِى الخ : এখানে মন্তব্য হতো যে, فِىْ وَقْتِهَا কথাটি ক্ষতিকর। কারণ, কাজার জন্যও আজান সুন্নত। অথচ কাজা নামাজ ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা হয় না। এর উত্তর হচ্ছে, এখানে ফরজ আদায়ের ওয়াক্ত উদ্দেশ্য নয়; বরং عَام [ব্যাপক] ওয়াক্ত উদ্দেশ্য এবং যে ওয়াক্তে ফরজ নামাজ কাজা করা হয় সে ওয়াক্তই তা কাজা করার ওয়াক্ত। যদিও তা আদায় করার ওয়াক্ত নয়। অতএব, ওয়াক্তের মধ্যেই আজান হচ্ছে।

ওয়াক্তের পূর্বে আজান দেওয়া বৈধ নয় : নামাজের সময় দাখিল হওয়ার পূর্বে আজান দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কেউ সময়ের পূর্বে আজান দেয় তবে সময় আসলে পুনঃ আজান দিতে হবে। কেননা, আজানের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নামাজের সময় হওয়ার সংবাদ দেওয়া। আর সময়ের পূর্বে আজান দেওয়া মানুষকে অজ্ঞতার মধ্যে ফেলে দেওয়ার শামিল। তাই সময়ের পূর্বে আজান দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে ফজরের নামাজের জন্য ওয়াক্তের পূর্বে আজান দেওয়া জায়েজ আছে কিনা এ নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, ফজরের নামাজের জন্যও ওয়াক্তের পূর্বে আজান দেওয়া যথেষ্ট নয়; বরং যদি ওয়াক্তের পূর্বে কেউ আজান দেয়ও তবে ওয়াক্ত আসলে আবার আজান দিতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, ফজরের আজান অর্ধ রাতে তথা ওয়াক্তের পূর্বে দেওয়া জায়েজ এবং এটিই ফজরের নামাজের জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয়বার আজান দিতে হবে না।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম আবূ ইউসুফ ও শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْمَعُوْا اَذَانَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ـ

অর্থাৎ বেলাল (রা.) রাতে আজান দেয়, তখনও তোমরা পানাহার করবে– ইবনে উম্মে মাকতূমের আজান শ্রবণ পর্যন্ত। –[তিরমিযী]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত বেলাল (রা.) ফজরের পূর্বে রাতে আজান দিতেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, হযরত ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস–

اِنَّ بِلَالًا اَذَّنَ بِلَيْلٍ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُنَادِىَ اَنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ ـ

অর্থাৎ হযরত বেলাল (রা.) রাতে আজান দিতেন। রাসূল ﷺ তাঁকে পুনঃ আজান দিতে নির্দেশ দিতেন। কেননা, তখন লোকজন ঘুমিয়ে থাকে। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত বেলাল (রা.) ফজরের জন্য ওয়াক্তের পূর্বে আজান দিলেও রাসূল ﷺ ওয়াক্ত আসলে তাকে আবার আজান দিতে বলতেন। অতএব, বুঝা যায়, সে আজান ফজরের আজান ছিল না।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) : ইমাম আবূ ইউসুফ ও শাফেয়ী (র.)-এর হাদীস আমাদের পক্ষে দলিল হয়; তাঁদের পক্ষে নয়। তা এভাবে যে, উক্ত হাদীসে রয়েছে, হযরত বেলাল (রা.) -এর দেওয়া রাতের আজানের পরেও হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম পুনঃ আজান দিতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত বেলালের আজান ফজরের জন্য যথেষ্ট ছিল না; বরং ফজরের জন্য ছিল হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের আজান। আর বেলাল (রা.)-এর আজান তাহাজ্জুদ কিংবা সেহরির জন্য ছিল।

فَيُعَادُ لَوْ أُذِّنَ قَبْلَهُ وَيُؤَذِّنُ عَالِمًا بِالْأَوْقَاتِ لِيَنَالَ الثَّوَابَ اَيِ الثَّوَابُ الَّذِيْ وُعِدَ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَاِصْبَعَاهُ فِيْ أُذُنَيْهِ وَيَتَرَسَّلُ فِيْهِ اَيْ يَتَمَهَّلُ بِلَا لَحْنٍ وَتَرْجِيْعٍ لَحْنٌ فِي الْقِرَاءَةِ طَرَبٌ وَتَرَنُّمٌ مَاخُوْذٌ مِنْ اَلْحَانِ الْاَغَانِيْ فَلَا يَنْقُصُ شَيْئًا مِنْ حُرُوْفِهِ وَلَا يَزِيْدُ فِيْ اَثْنَائِهِ حَرْفًا وَكَذَا لَا يَنْقُصُ وَلَا يَزِيْدُ مِنْ كَيْفِيَّاتِ الْحُرُوْفِ كَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْمَدَّاتِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ لِتَحْسِيْنِ الصَّوْتِ وَاَمَّا مُجَرَّدُ تَحْسِيْنِ الصَّوْتِ بِلَا تَغَيُّرِ لَفْظِهِ فَاِنَّهُ حَسَنٌ وَالتَّرْجِيْعُ فِي الشَّهَادَتَيْنِ اَنْ يَخْفِضَ بِهِمَا ثُمَّ يَرْفَعُ الصَّوْتَ بِهِمَا وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ يُمْنَةً وَيُسْرَةً وَيَسْتَدِيْرُ فِيْ صَوْمَعَتِهِ اِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْوِيْلٌ مَعَ الثُّبَاتِ فِيْ مَكَانِهِ اَلْمُرَادُ بِهِ اَنَّهُ اِنْ كَانَتِ الْمِيْذَنَةُ بِحَيْثُ لَوْ حَوَّلَ وَجْهَهُ مَعَ ثُبَاتِ قَدَمَيْهِ لَا يَحْصُلُ الْاِعْلَامُ فَحِ يَسْتَدِيْرُ فِيْهَا فَيُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْكَوَّةِ الْيُمْنٰى وَيَقُوْلُ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ثُمَّ يَذْهَبُ اِلَى الْكَوَّةِ الْيُسْرٰى وَيُخْرِجُ رَأْسَهُ وَيَقُوْلُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَيَقُوْلُ بَعْدَ فَلَاحِ الْفَجْرِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ .

অনুবাদ : অতএব, যদি ওয়াক্তের পূর্বে আজান দেওয়া হয় তবে আজান দোহরাতে হবে। ঐ ব্যক্তি আজান দেবে যে ওয়াক্ত সম্পর্কে জ্ঞাত, যেন আজানের ছওয়াব পাওয়া যায়। অর্থাৎ ঐ ছওয়াব যা মুয়াজ্জিনদের জন্য ওয়াদা করা হয়েছে। উভয় হস্তের দুই তর্জনিকে উভয় কর্ণে রেখে কিবলামুখী হয়ে আজান দেবে। আজানের মধ্যে (تَرَسُّل) থেমে থেমে বলবে– [জলদি করবে না]। [আজানে] লাহন ও তারজী‘ (تَرْجِيْع) করবে না। কেরাত [তথা আজানের শব্দাবলির]-এর ক্ষেত্রে লাহন হচ্ছে, যা গানের বাজনা [-এর মতো হয়ে যায়]। এ লাহন– أَلْحَانُ الْاَغَانِيْ [গানের লাহন] থেকে উদ্গত। অতএব, মুয়াজ্জিন আজানে কোনো অক্ষর হ্রাস করবে না এবং এতে কোনো অক্ষর বৃদ্ধিও করবে না। অনুরূপ অক্ষর পদ্ধতিতেও কমবেশি করবে না। যেমন– আওয়াজকে সুন্দর করার জন্য হরকত, সাকিন, মদ্দ ইত্যাদিতে কোনো কিছু কমবেশি করবে না। তবে আজানের শব্দের মাঝে কোনো প্রকার পরিবর্তন করা ব্যতীত শুধু আওয়াজকে সুন্দর করা উত্তম। দুই শাহাদাতের ক্ষেত্রে তারজী‘ (تَرْجِيْع) হচ্ছে– দুই শাহাদাতকে প্রথমে হালকা আওয়াজে বলা, অতঃপর দ্বিতীয়বার উঁচু আওয়াজে বলা। "হাইয়া আলাস্ সালাহ" এবং "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলার সময় মুয়াজ্জিন আপন চেহারাকে ডান ও বাম দিকে ফিরাবে। মুয়াজ্জিন যদি স্বীয় স্থানে দাঁড়িয়ে চেহারা ফিরাতে না পারে তবে সে তার আজান খানায় ঘুরবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি আজানের জায়গা এমন হয় যে, মুয়াজ্জিন স্বীয় স্থানে দাঁড়িয়ে চেহারা ঘুরালে [উঁচু আওয়াজে] ঘোষণা হয় না, তবে সে আজানের স্থানে ঘুরবে। অতএব, সে ডান দিকের জানালা দিয়ে মাথাকে বাহিরে বের করে 'হাইয়া আলাস্ সালাহ' বলবে। অতঃপর বাম দিকের জানালায় যাবে এবং মাথা বাহিরে বের করে দিয়ে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলবে। আর ফজরের আজানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পর দুবার "আস্সালাতু খাইরুম মিনান নাউম" বলবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُؤَذِّنُ عَالِمًا بِالْأَوْقَاتِ الخ :

ওয়াক্ত সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি আজান দেবে : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যে ব্যক্তি ওয়াক্ত সম্পর্কে জ্ঞাত সে আজান দেবে, যেন সে তার প্রতিশ্রুত ছওয়াব পায়। এতে এ কথার ইঙ্গিতও রয়েছে যে, مُطْلَقٌ ছওয়াব পাওয়া ওয়াক্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার

উপর নির্ভরশীল নয়। কেননা, যে কেউ আল্লাহকে স্মরণ করবে সে অবশ্যই ছওয়াব পাবে। আর আজান হচ্ছে, সবচেয়ে বড় জিকির [আল্লাহর স্মরণ]। অতএব, আজানের مُطْلَقْ ছওয়াব পাওয়ার জন্য ওয়াক্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক নয়।

قَوْلُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ :

কিবলামুখী হয়ে আজান দেবে : কিবলামুখী হয়ে আজান দেওয়া সুন্নত। কিন্তু যদি কেউ অন্য কোনো দিকে ফিরে আজান দেয় তবে জায়েজ আছে। কেননা, আজানের মূল উদ্দেশ্য হলো, নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার ঘোষণা দেওয়া, আর তা হাসিল হয়ে যাচ্ছে। তবে জরুরতবিহীন কিবলামুখী হয়ে আজান না দেওয়া মাকরূহ।

قَوْلُهُ وَاِصْبَعَاهُ فِىْ اُذُنَيْهِ :

কর্ণে আঙ্গুল দিয়ে আজান দেবে : আজান দেওয়ার সময় মুয়াজ্জিন উভয় হাতের দুই তর্জনী অঙ্গুলিকে দুই কর্ণের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে আজান দেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বেলাল (রা.)-কে এভাবে আজান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর কারণ হিসেবে বলেছেন যে, এর দ্বারা আজানের আওয়াজ উঁচু হয়। এতে আরো ফায়দা রয়েছে যে, যদি কেউ বধির হয় তবে সে মুয়াজ্জিনের এহেন দৃশ্য দেখে বুঝতে পারবে যে, আজান হচ্ছে। তা ছাড়া যদি কেউ বধির নাও হয় তবুও সে দূর থেকে দেখে বুঝতে পারবে যে, আজান হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَيَتَرَسَّلُ فِيْهِ :

আজানে তারাস্‌সুল (تَرَسُّلْ) হবে : تَرَسُّلْ শব্দের অর্থ– থেমে থেমে শ্বাস ফেলে পড়া। আজানে تَرَسُّلْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আজানের প্রত্যেক দুই বাক্যের মাঝে ওয়াক্‌ফ করবে; বরং শ্বাস ফেলে নতুন শ্বাস গ্রহণ করবে এবং তাড়াহুড়া করবে না। তবে ইকামতে জলদি করা সুন্নত। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, إِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِىْ اَذَانِكَ وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْدُرْ অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ বেলাল (রা.)-কে বলেছেন, যখন তুমি আজান দেবে তখন আজানের বাক্যগুলো থেমে থেমে বলবে। আর যখন ইকামত বলবে তখন বাক্যগুলো জলদি করে বলবে।" –[তিরমিযী শরীফ]

আজানের বাক্য সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য : আজানের বাক্য সংখ্যা নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তবে এ মতানৈক্যের ভিত্তি দুটি পরিভাষার উপর– ১. تَرْبِيْع তথা আল্লাহু আকবার চারবার বলা। ২. تَرْجِيْع তথা দুই শাহাদাতকে প্রথমে দুইবার হালকা আওয়াজে বলে পরবর্তীতে আবার দুবার উঁচু আওয়াজে বলা। এ মাসআলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, আজানে تَرْجِيْع এবং تَرْبِيْع উভয়টি উত্তম। ফলে তাঁর নিকট আজানের বাক্য ১৯ টি। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, আজানে تَرْجِيْع উত্তম, তবে تَرْبِيْع নয়। অর্থাৎ আজানের শুরুতে 'আল্লাহু আকবার' চারবার নয়; বরং দুবার বলা উত্তম। ফলে তাঁর নিকট আজানের বাক্য ১৭টি। আহনাফ ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, আজানে تَرْبِيْع উত্তম; تَرْجِيْع নয়।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, আজানে تَرْبِيْع অনুত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল হ[illegible], হযরত আনাস (রা.) বলেন– أُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ

অর্থাৎ "হযরত বেলাল (রা.) আজানের বাক্যগুলো জোড় এবং ইকামতের বাক্যগুলো বিজোড় বলার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন।" আর এ شَفْع [জোড়] শব্দটি تَكْبِيْر তথা 'আল্লাহু আকবার'-এর মধ্যেও শামিল। অতএব, তা দুবার বললেই জোড় হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে আজানে تَرْجِيْع উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল হলো–

إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً .

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ মাহযূরা (রা.)-কে উনিশ বাক্যে আজান এবং সতেরো বাক্যে ইকামত শিখিয়েছেন।" –[তিরমিযী শরীফ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, এ হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, আজান উনিশ বাক্যে। আর তা تَرْجِيْع সহ-ই হয়, অন্যথায় হয় না।

আহনাফ ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতো আজানে تَرْجِيْع অনুত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-কে স্বপ্নে যে আজান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তাতে ترجيع নেই। হযরত যায়েদ থেকে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি বলেন– كَانَ اَذَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَفْعًا شَفْعًا فِى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর আজান ও ইকামত ছিল জোড় জোড়।" –[তিরমিযী শরীফ]

وَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, আজানের বাক্যগুলো জোড় জোড় হবে– অর্থাৎ দুবার করে হবে। এর দ্বারা দুই শাহাদাতও দুবার বলা প্রমাণিত হয়। আর 'আল্লাহু আকবার' -এর ক্ষেত্রে যদিও চারবার বলা হয়, তা এখানে চার বাক্য দুই শ্বাসে বলা উদ্দেশ্য। তা ছাড়া تَرْبِيْع -এর ক্ষেত্রে আমাদের দলিল হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-কেও যে আজান স্বপ্নে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তাতে تَرْبِيْع রয়েছে।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) وَمَالِكٍ (رح) : ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, تَرْبِيْع অনুত্তম হওয়ার পক্ষে হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসের উত্তর হচ্ছে, আজানে আল্লাহু আকবার -এর ক্ষেত্রে شَفْع [জোড়] হওয়ার দ্বারা আল্লাহু আকবারকে এক শ্বাসে দুবার বলা উদ্দেশ্য। এভাবে দুই শ্বাসে চারবার হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর تَرْجِيْع উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে হযরত আবূ মাহযূরার হাদীসের উত্তর হচ্ছে, তাকে আজান শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূল ﷺ দুই শাহাদাতকে দুবার করে বলেছেন, কিংবা বলা যায়, প্রথম দুবারের দ্বারা তাকে মুসলমান বানিয়েছেন অতঃপর দুবার আজানের জন্য বলেছেন।

[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর ১ : ২৪৫, বাদায়িউস সানায়ে' ১ : ৩৬৫ – ৩৬৭, বাহরুর রায়িক ১ : ৪৪৫, মাআরিফুস সুনান ২ : ১৭৪ – ১৮২, দরসে তিরমিযী ১ : ৪৫৩ – ৪৫৭]

লাহন (لَحْن) -এর উৎস : لَحْن শব্দের অর্থ হচ্ছে– সুর। একে اَلْحَانُ الْاَغَانِىْ [গানের সুর] থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ গানের ক্ষেত্রে গানের সুরকে সুন্দর করার জন্য শব্দের মধ্যে কমবেশি করা হয়, যার দ্বারা শ্রোতাকে আকর্ষণ করা হয়। অনুরূপ যদি আজানের সুরকে সুন্দর করার জন্য অক্ষর কমবেশি করা হয় তবে আজান আর গানের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। তাই আজানে তা জায়েজ নেই। হ্যাঁ, যদি সমস্ত অক্ষর মাখরাজ থেকে আদায় করে আওয়াজকে সুন্দর করা যায় তবে তা অনেক ভালো। কারণ, এর দ্বারা খুব প্রভাব পড়ে। কোনো কোনো সময় তো এমন হয় যে, মুয়াজ্জিন সাহেবের খুব সুন্দর সুরের আজান শ্রোতাদের অন্তরে খুব প্রভাব ফেলে। ফলে তারা দৌড়িয়ে মসজিদে আসতে থাকে। ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যে, অনেক অমুসলিম শুধু আজানের আওয়াজ শুনে মুসলমান হয়েছে। তাদের অনুভূতিটা হলো, আজানের আওয়াজই এত সুন্দর! আর এ আজান যে ধর্মের, সে ধর্ম নাজানি কত সুন্দর! অতএব, অনেক সময় সুন্দর আজান সিরাতে মুসতাকীমের জন্য পথপ্রদর্শক হয়।

قَوْلُهُ وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ فِى الْحَيْعَلَتَيْنِ الخ : অর্থাৎ মুয়াজ্জিন 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলার সময় আপন চেহারাকে ডান দিকে এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার সময় চেহারাকে বাম দিকে ফিরাবে। কারণ, এটি হচ্ছে তথা خِطَابٌ [সম্বোধন] সূচক বাক্য। আর সম্বোধন করার সময় জনগণের দিকে চেহারা ফিরানো চাই। হযরত বেলাল (রা.) থেকে এমন আমলই বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ وَيَسْتَدِيْرُ فِىْ صَوْمَعَتِهٖ : صَوْمَعَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে– গির্জা। এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐ কামরা, যা শুধু আজান দেওয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। যাতে কিবলা, ডান ও বাম দিকে জানালা থাকে। যেন আজানের আওয়াজ দূর দূর পর্যন্ত পৌঁছে।

قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَوْ حَوَّلَ وَجْهَهُ الخ : যদি আজানের নির্ধারিত স্থানে মুয়াজ্জিন স্বীয় পা রেখে শুধু চেহারা ঘুরিয়ে আজান দেয় তবে আওয়াজ হয় না। তখন মুয়াজ্জিনের জন্য আবশ্যক হলো, 'হাইয়া আলাসসালাহ' বলার সময় ডান দিকের জানালায় গিয়ে চেহারাকে বাহিরে বের করে দিয়ে 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলবে। অনুরূপ 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার সময় বাম দিকের জানালায় গিয়ে মাথা বের করে দিয়ে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলবে। অতঃপর পূর্বের জায়গায় ফিরে আসবে এবং বাকি আজান শেষ করবে। এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আজান দ্বারা শুধু اِعْلَامٌ [ঘোষণা] করাই উদ্দেশ্য; অন্য কিছু নয়।

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُ بَعْدَ فَلَاحِ الْفَجْرِ الخ : অর্থাৎ ফজরের আজানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর পরে "আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান্ নাউম" দুবার বলবে। হযরত বেলাল (রা.)-ও সর্বদা 'হাইয়া আলাল ফালাহ' -এর পরেই 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' বলতেন। তাও শুধু ফজরের আজানে; অন্য কোনো আজানে নয়। তবে কোনো কোনো ফকীহ বলেন যে, আজানের পরে 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' বলবে। তবে এমন কোনো আমল হযরত বেলাল (রা.) থেকে পাওয়া যায় না। **প্রশ্ন :** এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তবে অন্যান্য নামাজে আজানে কেন সর্তক করা হয় না? যেমন ফজরের আজানে 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান্ নাউম' বলে ঘুম থেকে সর্তক করা হয়।

উত্তর : এর উত্তর হচ্ছে, ঘুম এমন একটি মাশগালাহ (مَشْغَلَةٌ) যা কখনো কখনো ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন– যদি ইবাদতে সতেজতা আনার জন্য কেউ একটু শুয়ে পড়ে– অতঃপর উঠে ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, তবে এ ঘুমও ইবাদত বলে গণ্য হবে। তাই ফজরের আজানে এ ঘুম নামক ইবাদত থেকে সর্তক করে اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলা হয়, কিন্তু অন্যান্য আজানের সময় এমন কোনো মাশগালাহ নেই যে, তা ইবাদতে শামিল হয়। অতএব সেখানে সর্তক করারও প্রয়োজন নেই।

وَالْإِقَامَةُ مِثْلُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فَإِنَّ عِنْدَهُ الْإِقَامَةُ فُرَادٰى إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ لٰكِنَّ يُحْدَرُ فِيْهَا وَيَقُوْلُ بَعْدَ فَلَاحِهَا قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ مَرَّتَيْنِ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيْهِمَا اَىْ لَا يَتَكَلَّمُ فِىْ اَثْنَاءِ الْاَذَانِ وَلَا فِىْ اَثْنَاءِ الْإِقَامَةِ وَاسْتَحْسَنَ الْمُتَاَخِّرُوْنَ تَثْوِيْبَ الصَّلٰوةِ كُلِّهَا اَلتَّثْوِيْبُ هُوَ الْإِعْلَامُ بَعْدَ الْإِعْلَامِ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا إِلَّا فِى الْمَغْرِبِ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيْمُ اَىْ إِذَا صَلّٰى فَائِتَةً وَاحِدَةً وَكَذَا الْاُوْلٰى الْفَوَائِتِ اَىْ إِذَا صَلّٰى فَوَائِتَ كَثِيْرَةً وَلِكُلٍّ مِنَ الْبَوَاقِىْ يَاْتِىْ بِهِمَا اَوْ بِهَا وَجَازَ اَذَانُ الْمُحْدِثِ وَكُرِهَ إِقَامَتُهُ وَلَمْ يُعَادَا ـ

অনুবাদ : ইকামত আজানের মতোই। ইমাম শাফেয়ী (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা, তাঁর নিকট ইকামত [-এর বাক্য] একবার করে বলবে, তবে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ দুবার বলবে। কিন্তু ইকামত জলদি হবে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পরে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ দুবার বলবে এবং দুয়ের মাঝে কথা বলবে না। অর্থাৎ আজান ও ইকামতের মাঝে কথা বলবে না। মুতাআখখিরীন [শেষ যুগের] ওলামায়ে কেরাম সমস্ত নামাজে "তাসবীব" (تَثْوِيْب) উত্তম মনে করেন। তাসবীব বলা হয়– إِعْلَامْ [আজান]-এর পরে إِعْلَامْ [ঘোষণা] করা এবং আজান ও ইকামতের মাঝে কিছু সময় বসবে, তবে মাগরিবে বসবে না। কাজা নামাজের জন্য আজান ও ইকামত বলবে। অর্থাৎ যখন এক নামাজ কাজা করবে। অনুরূপ একাধিক কাজা নামাজের প্রথমটির জন্য। অর্থাৎ যখন একাধিক কাজা নামাজ আদায় করবে [তখন শুধু প্রথমটির জন্য আজান ও ইকামত বলবে]। বাকি কাজা নামাজের প্রত্যেকটির জন্য আজান ও ইকামত বলবে কিংবা শুধু ইকামত বলবে। অজুহীন ব্যক্তির আজান বৈধ এবং তার ইকামত মাকরূহ। তবে উভয়টিকেই দোহরাতে হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْإِقَامَةُ مِثْلُهُ الخ :

ইকামতের বাক্য সংখ্যা : ইকামতের اَلْفَاظْ [বাক্য] সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, ইকামত আজানের মতোই। তবে এতে শুধু قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ দুবার বৃদ্ধি পাবে। তাই তাদের মতে ইকামতের বাক্য মোট ১৭ টি। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে ইকামতে ১১টি বাক্য। প্রথমে 'আল্লাহু আকবার' দুইবার এক শ্বাসে। অতঃপর شَهَادَتَيْنِ ও حَيْعَلَتَيْنِ-কে একবার করে এবং قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ দুবার, আল্লাহু আকবার দুবার এক শ্বাসে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ একবার। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, ইকামতে ১০ টি বাক্য। তাঁর মতে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ-ও একবার এবং বাকি সব একবার করে।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালেক (র.)-এর দলিল হলো, হযরত আনাস (রা.) বলেন– أُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْإِقَامَةَ অর্থাৎ "হযরত বেলাল (রা.) আজান জোড় জোড় এবং ইকামত বিজোড় দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন।" –[তিরমিযী শরীফ]

وَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, এ হাদীসে ইকামতের বাক্যগুলো বিজোড় বলার কথা বলা হয়েছে। আর বিজোড় বললে বাক্য সতেরোটিই হয়। ইমাম মালেক (র.) এ বিজোড় হওয়ার বিষয়টিকে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ-এর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন।

তাই তাঁর মতে ইকামতের বাক্য দশটি হয়। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ -কে দুবার বলার ক্ষেত্রে দলিল হলো, মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে একটি অতিরিক্ত শব্দ اِلَّا الْاِقَامَةَ রয়েছে, যার মর্ম হয়– ইকামতের বাক্যগুলোকে বিজোড় বলবে, তবে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বাক্যটি নয়। অর্থাৎ তা একবার বলবে না; বরং দুবারই বলবে।

ওলামায়ে আহনাফের দলিল হলো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (র.) বলেন– كَانَ اَذَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَفْعًا شَفْعًا فِى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ -এর আজান ও ইকামতের বাক্যগুলো জোড় জোড় ছিল।" –[তিরমিযী শরীফ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, এতে ইকামতের বাক্যগুলোও জোড় জোড় বলার কথা বলা হয়েছে।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : উক্ত হাদীসে اِيْتَار [বিজোড়] বলে ইকামতের দুই বাক্যকে এক শ্বাসে বলা বুঝানো হয়েছে। اِلَّا الْاِقَامَةَ শব্দবিশিষ্ট রেওয়ায়েতের উপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর রেওয়ায়েত প্রাধান্য পাবে। কেননা, আজান ও ইকামতের ক্ষেত্রে তাঁর রেওয়ায়েতই আসল। আর তাতে قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ দুইবার রয়েছে।

–[এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর– ১ : ২৪৭, বাদায়িউস সানায়ে'– ১ : ৩৬৬, বাহরুর রায়িক– ১ : ৪৪৬ – ৪৪৭, মাআরিফুস সুনান– ২ : ১৮৩ – ১৯২, দরসে তিরমিযী– ১ : ৪৫৭ – ৪৬১]

উল্লেখ্য যে, উভয় মাযহাব মোতাবেক আমল করা জায়েজ আছে, তবে উত্তম ও অনুত্তম নিয়ে হচ্ছে মতানৈক্য।

قَوْلُهٗ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيْهِمَا :

আজান ও ইকামতের মাঝে কোনো কথা বলবে না : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, আজানের মধ্যখানে এবং ইকামতের মধ্যখানে কথা বলা নিষেধ। উদ্দেশ্য, আজান ও ইকামতের বাক্য ব্যতীত অন্য কোনো কথা বলা যাবে না। এমনকি সালামের জবাব এবং হাঁচির জবাবও দেওয়া যাবে না। যদি কেউ আজান ও ইকামতের মাঝে কথা বলে তবে তাকে আজান কিংবা ইকামত দোহরাতে হবে। বাহরুর রায়িক ও খুলাসাহ নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কথা একেবারে কম হয় তবে তা ক্ষমা করা হবে।

قَوْلُهٗ تَثْوِيْبَ الصَّلٰوةِ كُلِّهَا :

আজানের পরে তাসবীব (تَثْوِيْب) করা : تَثْوِيْب শব্দের আভিধানিক অর্থ– প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। শরিয়তের পরিভাষায় تَثْوِيْب বলা হয় اَلْاِعْلَامُ بَعْدَ الْاِعْلَامِ বা ঘোষণার পর ঘোষণা দেওয়া। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন– "আজান ও ইকামতের মাঝে নামাজের ঘোষণাকে তাসবীব বলে।" তাসবীব মূলত দুই প্রকার। ১. تَثْوِيْب قَدِيْم বা পুরাতন তাসবীব। তা হচ্ছে– اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলা। ২. تَثْوِيْب مُحْدَثْ বা সৃষ্ট তাসবীব। তা হচ্ছে– আজান ও ইকামতের মাঝে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ কিংবা এর সমার্থবোধক সমাজে প্রচলিত কোনো শব্দ বলা। এ প্রকারের তাসবীবের জন্য কোনো শব্দ কিংবা ভাষা নির্ধারিত নেই; বরং যে-কোনো ভাষায় সমাজে প্রচলিত যে-কোনো শব্দে তাসবীব করতে পারবে। এমনকি কাশি দেওয়ার দ্বারাও যদি লোকেরা বুঝে তবে তাসবীব হয়ে যাবে।

تَثْوِيْب مُحْدَثْ বলার কারণ : দ্বিতীয় প্রকারের তাসবীবকে مُحْدَثْ এ কারণেই বলা হয় যে, এটা রাসূল ﷺ -এর যুগে ছিল না এবং সাহাবীদের যুগেও ছিল না; বরং তাবেঈনদের যুগে যখন মানুষের অবস্থা পরিবর্তন হলো এবং লোকেরা দীনি কাজে অলসতা করতে লাগল, তখন কুফার আলেমগণ তা আবিষ্কার করেছেন। ধরা যায় যে, এটা বিদআতে হাসানা (بِدْعَة حَسَنَة)। এটি حَسَنَة এজন্য যে, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ফকীহগণ একে ভালো মনে করেছেন। আর মুসলমানরা যেটাকে ভালো মনে করে সেটা আল্লাহর নিকটও ভালো। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

مَا رَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ وَمَا رَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ قَبِيْحًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ قَبِيْحٌ .

অর্থাৎ "মুসলমান যেটাকে ভালো মনে করবে সেটা আল্লাহর নিকটও ভালো। আর মুসলমানরা যেটাকে খারাপ মনে করে সেটা আল্লাহর নিকটও খারাপ।

তাসবীব কি সব আজানের পর করা যাবে? সব নামাজের আজানের পর তাসবীব করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : عُلَمَاء مُتَقَدِّمِيْن বলেন, তাসবীব শুধু ফজরের নামাজের ক্ষেত্রে জায়েজ; অন্য নামাজে জায়েজ নেই। عُلَمَاء مُتَاخِّرِيْن বলেন, মাগরিব ব্যতীত সমস্ত নামাজে তাসবীব জায়েজ।

عُلَمَاء مُتَقَدِّمِيْن : بَيَانُ الْاَدِلَّةِ -এর দলিল হলো, হযরত বেলাল (রা.) বলেন–

اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَا اُثَوِّبَ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِى الْفَجْرِ .

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, ফজর ব্যতীত অন্য কোনো নামাজে যেন তাসবীব না করি।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আলী (রা.) এক মুয়াজ্জিনকে ইশার নামাজে তাসবীব করতে দেখেছেন তখন তিনি বলেছেন– اَخْرِجُوْا هٰذَا الْمُبْتَدِعَ مِنَ الْمَسْجِدِ অর্থাৎ "এ বিদআতীকে মসজিদ থেকে বের করে দাও।" উল্লিখিত হাদীসদ্বয় স্পষ্টভাবে বুঝায় যে, তাসবীব শুধু ফজরের নামাজেই জায়েজ– অন্য কোনো নামাজে জায়েজ নেই। عُلَمَاء مُتَاَخِّرِيْن-এর দলিল হলো, মানুষ দীনি কাজে অলসতা করে। যেহেতু ফজরে ঘুমের আলস্যের কারণে তাসবীব জায়েজ। অতএব, অলসতা এবং কাজে গাফলতের কারণেও অনায়াসে তাসবীব জায়েজ হবে।

عُلَمَاء مُتَاَخِّرِيْن : بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الْمُتَاَخِّرِيْنَ-এর এ মত সঠিক নয়। কেননা, ঘুমের কারণে যে অলসতা আসে তা ইচ্ছাকৃত নয় এবং এতে মানুষের কোনো অবহেলা ও অবাধ্যতা নেই। অতএব, এ অনিচ্ছাকৃত অলসতাকে অন্যান্য অলসতার উপর কিয়াস করা যাবে না। কারণ, অন্যান্য নামাজে এহেন অনিচ্ছাকৃত অলসতা নেই।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, বিচারক ও শাসকদের জন্য ফজর ব্যতীত অন্যান্য নামাজেও তাসবীব জায়েজ। কারণ, তারা জনসাধারণের কাজে ব্যস্ত থাকে। তাই তাদেরকে বিশেষভাবে পুনঃ ঘোষণা দেবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) উক্ত অভিমতকে দুর্বোধ্য মনে করেছেন। কারণ, শরিয়তের দৃষ্টিতে সকল মুসল্লি সমপর্যায়ের।

তাসবীব করার সময় : আজানের পর চল্লিশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময় বিরতির পর তাসবীব করবে।

قَوْلُهُ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا : উদ্দেশ্য হলো, আজান ও ইকামতের মাঝে এ পরিমাণ সময় বিলম্ব করব যে, লোকেরা আজান শুনে অজু করে মসজিদে এসে সুন্নত পড়তে পারে, কিংবা যাদের হাজত আছে তারা হাজত সেরে জামাতে শরিক হতে পারে। তবে মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এমন যেন না হয় যে, লোকদের জামাতে আসার আশায় অপেক্ষা করতে করতে মাকরূহ ওয়াক্ত চলে আসে। হাদীসে বর্ণিত আছে–

اِجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْاٰكِلُ مِنْ اَكْلِهٖ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهٖ وَالْمُعْتَصِرُ اِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهٖ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেছেন, "তুমি তোমার আজান ও ইকামতের মাঝে এ পরিমাণ বিলম্ব করবে যে, যেন আহারকারী আহার থেকে, পানকারী পান করা থেকে অবসর হতে পারে এবং হাজতগ্রস্ত ব্যক্তি প্রয়োজন পূরণ হতে অবসর হতে পারে।" –[তিরমিযী শরীফ]

উল্লিখিত আলোচনা মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, মাগরিবের আজান ও ইকামতের মাঝে এ পরিমাণ সময় বিলম্ব করবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, মাগরিবের আজান ও ইকামতের মাঝে এ পরিমাণ সময় বিলম্ব করবে যে, ছোট ছোট তিন আয়াত তেলাওয়াত করা যায় কিংবা তিন কদম হাঁটা যায় কিংবা তিনবার তসবিহ পড়া যায়। সাহেবাইন (র.) বলেন, সামান্য সময় বসবে। যেমন– দুই খুতবার মাঝে বসা হয়।

قَوْلُهُ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيْمُ :

কাজা নামাজেরও আজান-ইকামত রয়েছে : অর্থাৎ যদি এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করে তবে এর জন্য আজান ও ইকামত বলবে, আর যদি কাজা নামাজ একাধিক হয়, তবে তাদের اِخْتِيَارْ রয়েছে। তারা শুধু প্রথম কাজা নামাজের জন্য আজান-ইকামত বলবে এবং বাকিগুলোর জন্য শুধু ইকামত বলবে; কিংবা প্রত্যেক কাজা নামাজের জন্য আজান ও ইকামতটিই বলবে। রাসূল ﷺ খন্দকের যুদ্ধের দিন জোহর, আসর ও মাগরিবের নামাজ ছুটে যাওয়ার পর এগুলোর জন্য এক আজান এবং প্রত্যেক নামাজের জন্য ইকামত দিতে বলেছিলেন।

قَوْلُهُ وَجَازَ اَذَانُ الْمُحْدِثِ الخ :

অজুহীন ব্যক্তির আজান বৈধ, ইকামত মাকরূহ : অজুহীন ব্যক্তির জন্য আজান দেওয়া বৈধ। কারণ, আজান অন্যান্য জিকিরের মতো একটি জিকির; এর জন্য পাক হওয়া মোস্তাহাব। কিন্তু অজুবিহীনও তা বৈধ। যেমন– অজুহীন অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত বৈধ। কিন্তু অজুবিহীন ইকামত দেওয়া মাকরূহ। কারণ, এর দ্বারা ইকামত ও নামাজ শুরু করার মাঝে বিলম্ব করা হয়। আর তা জায়েজ নেই। কেননা, নিয়ম হলো ইকামত শেষে সাথে সাথে নামাজ শুরু করে দেবে। কিন্তু যদি কেউ অজুবিহীন আজান ও ইকামত দেয়, তবে আজান ও ইকামত কোনোটিই দোহরাতে হবে না। কারণ, অজুহীন ব্যক্তির আজান তো বৈধ এবং সে ইকামত দিলে ইকামত দোহরাতে হবে না এজন্য যে, তখন ইকামত দুবার হয়ে যায়, আর তা অনুমোদিত নয়।

وَكُرِهَ أَذَانُ الْجُنُبِ وَإِقَامَتُهُ وَلَا تُعَادُ هِيَ بَلْ هُوَ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ تَكْرَارُ الْإِقَامَةِ لِأَنَّهَا لِإِعْلَامِ الْحَاضِرِيْنَ فَيَكْفِي الْوَاحِدَةُ وَالْأَذَانُ لِإِعْلَامِ الْغَائِبِيْنَ فَيَحْتَمِلُ سَمَاعَ الْبَعْضِ دُوْنَ الْبَعْضِ فَتَكْرَارُهُ مُفِيْدٌ كَأَذَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَجْنُوْنِ وَالسَّكْرَانِ أَيْ يُكْرَهُ وَيُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهُ وَيَأْتِي بِهِمَا الْمُسَافِرُ وَالْمُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً أَوْ فِيْ بَيْتِهِ فِيْ مِصْرٍ وَكُرِهَ تَرْكُهُمَا لِلْأَوَّلَيْنِ لَا لِلثَّالِثِ أَيْ كُرِهَ تَرْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْمُسَافِرِ وَالْمُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً أَمَّا تَرْكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَمْ يَذْكُرْهُ فَنَقُوْلُ أَمَّا الْمُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً فَيُكْرَهُ لَهُ تَرْكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَيَجُوْزُ لَهُ الْإِكْتِفَاءُ بِالْإِقَامَةِ وَالْمُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِهِ فِيْ مِصْرٍ إِنْ تَرَكَ كُلًّا مِنْهُمَا يَجُوْزُ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) أَذَانُ الْحَيِّ يَكْفِيْنَا وَهٰذَا إِذَا أُذِّنَ وَأُقِيْمَ فِيْ مَسْجِدِ حَيِّهِ وَأَمَّا فِي الْقُرٰى فَإِنْ كَانَ فِيْهَا مَسْجِدٌ فِيْهِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ فَحُكْمُ الْمُصَلِّيْ فِيْهَا كَمَا مَرَّ وَالْمُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِهِ يَكْفِيْهِ أَذَانُ الْمَسْجِدِ وَإِقَامَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا مَسْجِدٌ كَذَا فَمَنْ يُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسَافِرِ وَيَقُوْمُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ وَيَشْرَعُ عِنْدَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ .

অনুবাদ : জুনূবী ব্যক্তির আজান ও ইকামত মাকরূহে তাহরিমী। [যদি জুনূবী ব্যক্তি আজান ও ইকামত দেয় তবে] আজান দোহরাবে, কিন্তু ইকামত দোহরাতে হবে না। কেননা, ইকামত একাধিকবার হওয়া শরিয়ত অনুমোদিত নয়। কারণ, উপস্থিত লোকদের অবগত করার জন্য ইকামত দেওয়া হয়। অতএব, একবার ইকামত দেওয়াই যথেষ্ট। আর অনুপস্থিত লোকদের অবগত করার জন্য আজান দেওয়া হয়। সুতরাং এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, কেউ আজান শুনেছে এবং কেউ [আবার] শুনেনি। অতএব, আজান দ্বিতীয়বার দেওয়ার মাঝে উপকার রয়েছে। যেমন– মহিলা, পাগল ও মাতাল ব্যক্তির আজান অর্থাৎ [জুনূবী ব্যক্তির আজানের মতো তাদের আজানও] মাকরূহে তাহরীমী এবং তা দোহরানো মোস্তাহাব। মুসাফির ব্যক্তি আজান ও ইকামত [উভয়টি] বলবে, [অনুরূপ] মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি, কিংবা শহরের ঘরে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি [উভয়টিই] বলবে। প্রথম দুজনের জন্য তথা মুসাফির ও মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায়কারীর জন্য আজান ও ইকামত উভয়টি বর্জন করা মাকরূহ। আর তৃতীয় ব্যক্তি– শহরের ঘরে নামাজ আদায়কারী-এর জন্য মাকরূহ নয়। কিন্তু [আজান ও ইকামত] এ দুটির কোনো একটিকে বর্জন করার ব্যাপারে গ্রন্থকার কিছুই উল্লেখ করেননি। [তাই শারেহ (র.) বলেন,] আমরা বলি, মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায়কারীর জন্য একটিও বর্জন করা মাকরূহ, তবে মুসাফিরের জন্য শুধু ইকামত বলা যথেষ্ট। আর শহরের ঘরে নামাজ আদায়কারীর জন্য দুটির প্রত্যেকটিই বর্জন করা বৈধ। কেননা, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, "মহল্লার আজান আমাদের জন্য যথেষ্ট।" আর এটা [শহরের ঘরে নামাজ আদায়কারী] আজান ও ইকামত উভয়টিই বর্জন করতে পারবে] তখন যখন মহল্লার মসজিদে আজান ইকামত দেওয়া হবে। কিন্তু গ্রামে যদি মসজিদ থাকে– যাতে আজান ও ইকামত উভয়টি হয় তবে এর হুকুম সেটিই, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ঘরে নামাজ আদায়কারীর জন্য মসজিদের আজান ও ইকামত যথেষ্ট। আর যদি গ্রামে মসজিদ না থাকে তবে যে ব্যক্তি ঘরে নামাজ আদায় করবে তার হুকুম মুসাফিরের হুকুমের ন্যায়। ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সময় দাঁড়াবে এবং قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলার সময় ইমাম নামাজ শুরু করে দেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكُرِهَ أَذَانُ الْجُنُبِ الخ :

জুনূবী ব্যক্তির আজান-ইকামত মাকরূহ : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, জুনূবী ব্যক্তির আজান ও ইকামত উভয়টিই মাকরূহে তাহরীমী। কিন্তু যদি কোনো জুনূবী ব্যক্তি আজান ও ইকামত দেয়, তবে ইকামত দোহরাতে হবে না; বরং আজান দোহরাতে হবে। কেননা, অনুপস্থিত লোকদের নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবগত করার জন্য আজান দেওয়া হয়। তাই এ ক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে যে, আজান কেউ শুনেছে আবার কেউ শুনেনি। তাই এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার আজান দেওয়া লাভজনক। পক্ষান্তরে উপস্থিত লোকদের নামাজ শুরু হওয়া সম্পর্কে অবগত করার জন্য ইকামত দেওয়া হয়। আর তা দ্বিতীয়বার বলার দ্বারা কোনো ফায়দা নেই, তাই তা দোহরাতেও হবে না।

قَوْلُهُ كَأَذَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَجْنُوْنِ الخ :

মহিলা, পাগল ও মাতালের আজান : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মহিলা, পাগল ও মাতালের আজান– জুনূবী ব্যক্তির আজানের ন্যায় মাকরূহে তাহরীমী এবং আজান দোহরানো মোস্তাহাব। কেননা, মহিলার আজানে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, মহিলাদের আওয়াজও সতর। আর পাগল ও মাতাল হচ্ছে মতিভ্রম। অতএব তাদের আজান মাকরূহ।

মুসাফিরের জন্য শুধু ইকামত যথেষ্ট : মুসাফির ব্যক্তি নামাজের জন্য আজান ও ইকামত উভয়টি করবে, তবে তার জন্য শুধু ইকামতের উপর নির্ভর করা জায়েজ আছে। চাই মুসাফির ব্যক্তি একা হোক কিংবা তার সাথী-সঙ্গী থাকুক। হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা.) যখন রাসূল ﷺ -এর দরবার থেকে নিজের মাতৃভূমিতে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও তাঁর সঙ্গী ছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁদেরকে বলেছিলেন, যখন নামাজের ওয়াক্ত হবে তখন তোমাদের একজন আজান দেবে। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী]

قَوْلُهُ وَالْمُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً الخ :

মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায়কারীর জন্য আজান ও ইকামত আবশ্যক : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায়কারীদের জন্য আজান ও ইকামত উভয়টি আবশ্যক। একটির উপর নির্ভর করা বৈধ নয়। যদিও এমন মুসল্লি একজন হয়। কারণ, মসজিদে জামাতের জন্য আজান ও ইকামত দেওয়া شَعَائِرُ الْإِسْلَامِ [ইসলামের নিদর্শন] -এর অন্তর্ভুক্ত। তবে আজান ও ইকামতের সাথে জামাত হওয়ার পর যদি কিছু লোক আবার জামাত কায়েম করে তবে তখন আজান দিতে হবে না; বরং না দেওয়াই উত্তম। কিন্তু ইকামত দেওয়ার মাঝে কোনো সমস্যা নেই।

শহরের গৃহে নামাজ আদায়কারীর জন্য আজান-ইকামত একটিরও প্রয়োজন নেই : শহরের মধ্যে গৃহে নামাজ আদায়কারীর জন্য আজান ও ইকামতের একটিও আবশ্যক নয়। এখানে সম্পূর্ণ তার ইচ্ছা– সে চাইলে উভয়টি করতে পারবে, আবার নাও করতে পারবে। আবার চাইলে যে-কোনো একটিও করতে পারবে। কারণ, তার নামাজ মূলত আজান ও ইকামতের সাথেই আদায় হবে। কেননা, তার জন্য মসজিদের আজানই যথেষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন– أَذَانُ الْحَيِّ يَكْفِيْنَا অর্থাৎ "মহল্লার আজান আমাদের জন্য যথেষ্ট।"

قَوْلُهُ وَيَقُوْمُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ الخ :

ইমাম-মুক্তাদী কখন দাঁড়াবে এবং নামাজ শুরু করবে : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন– حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বলার সাথে সাথে ইমাম আপন জায়নামাজের উপর এবং মুক্তাদী কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে। এতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, মসজিদে প্রবেশ করে জামাতের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে না; বরং এক জায়গায় বসে পড়বে। অতঃপর যখন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বলবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বলার সময়ই দাঁড়াতে হবে– এর পূর্বে দাঁড়ানো যাবে না; বরং যদি ইকামত শুরু হওয়ার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে নেয়, তাও উত্তম। حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ -এর পরে দাঁড়ানো বৈধ নয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জামাতের জন্য দাঁড়ানোর শেষ সময় হচ্ছে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বলার সময়।

ইমাম ও মুক্তাদী কখন নামাজ শুরু করবে এ ব্যাপারে বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, 'যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলা হবে তখন ইমাম নামাজ শুরু করবে এবং ইমামের সাথে মুক্তাদীও শুরু করবে।' কিন্তু এতে একটি সমস্যা সৃষ্টি হয় যে, এ প্রক্রিয়ায় নামাজ শুরু করার পরেও ইকামত শেষ হয় না। ফলত দেখা যায়, একদিকে ইমাম কেরাত শুরু করে দিয়েছে এবং অপরদিকে ইকামত শেষ হচ্ছে না। এজন্য قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ দুবার বলার পর তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠাবে এবং নিয়ত করবে। এরই মধ্যে ইকামত শেষ হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে ইমাম নামাজ শুরু করবে। পরবর্তীতে মুক্তাদীও শুরু করবে।

بَابُ شُرُوْطِ الصَّلٰوةِ

هِيَ طُهْرُ بَدَنِ الْمُصَلِّيْ مِنْ حَدَثٍ وَخُبْثٍ اَلْحَدَثُ اَلنَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ وَالْخُبْثُ اَلنَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ وَثَوْبُهٗ وَمَكَانُهٗ وَسَتْرُ عَوْرَتِهٖ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالنِّيَّةُ وَالْعَوْرَةُ لِلرَّجُلِ مِنْ تَحْتَ سُرَّتِهٖ اِلٰى تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ وَلِلْاَمَةِ مِثْلُهٗ مَعَ ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا وَلِلْحُرَّةِ كُلُّ بَدَنِهَا اِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّ وَالْقَدَمَ وَكَشْفُ رُبُعِ سَاقِهَا وَبَطْنِهَا وَفَخِذِهَا وَ دُبُرِهَا وَشَعْرٍ نَزَلَ مِنْ رَاْسِهَا وَ رُبُعِ ذَكَرِهٖ مُنْفَرِدًا وَالْاُنْثَيَيْنِ يَمْنَعُ اَلْحَاصِلُ اَنَّ كَشْفَ رُبُعِ الْعُضْوِ الَّذِيْ هُوَ عَوْرَةٌ يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلٰوةِ فَالرَّأْسُ عُضْوٌ وَالشَّعْرُ النَّازِلُ عُضْوٌ اٰخَرُ وَالذَّكَرُ عُضْوٌ وَالْاُنْثَيَانِ عُضْوٌ اٰخَرُ وَعَادِمُ مُزِيْلِ النَّجَسِ صَلّٰى مَعَهٗ وَلَمْ يُعِدْ فَاِنْ صَلّٰى عَارِيًا وَ رُبُعُ ثَوْبِهٖ طَاهِرٌ لَمْ يَجُزْ وَفِيْ اَقَلَّ مِنْ رُبُعِهِ الْاَفْضَلُ صَلَاتُهٗ فِيْهِ وَمَنْ عَدِمَ ثَوْبًا فَصَلّٰى قَائِمًا جَازَ وَقَاعِدًا مُؤْمِئًا نُدِبَ ـ

পরিচ্ছেদ : নামাজের শর্তসমূহ

অনুবাদ : নামাজের শর্ত হচ্ছে, হদস ও নাপাকী থেকে মুসল্লির শরীর পাক হওয়া। হুকমী নাপাকীকে حَدَثٌ বলে এবং হাকীকী নাপাকীকে خُبْثٌ বলে। মুসল্লির কাপড় ও জায়গা পাক হওয়া, আওরাত [সতর] ঢাকা, কিবলামুখী হওয়া এবং নিয়ত করা। পুরুষের জন্য নাভির নীচ থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত আওরাত [সতর]। দাসীর জন্যও পিঠ এবং পেটসহ পুরুষের ন্যায় আওরাত [সতর]। স্বাধীন নারীর জন্য চেহারা, হাত এবং পা ব্যতীত পূর্ণ শরীরই আওরাত [সতর]। মহিলার গোছের এক-চতুর্থাংশ, পেটের এক-চতুর্থাংশ, রানের এক-চতুর্থাংশ, নিতম্বের এক-চতুর্থাংশ এবং মাথার ঝুলন্ত চুলের এক-চতুর্থাংশ এবং পুরুষের লিঙ্গের এক-চতুর্থাংশ ও দুই অণ্ডকোষের এক-চতুর্থাংশ খুলে গেলে নামাজ হবে না। সারকথা যে অঙ্গ সতর, সে অঙ্গের এক-চতুর্থাংশ খুলে গেলে নামাজ বৈধ হবে না। অতএব, মাথা একটি পূর্ণ অঙ্গ, ঝুলন্ত চুল ভিন্ন অঙ্গ এবং লিঙ্গ একটি পূর্ণ অঙ্গ, দুই অণ্ডকোষ ভিন্ন অঙ্গ। নাপাকী দূরকারী কোনো কিছু যার কাছে নেই, সে নাপাকীসহই নামাজ পড়বে এবং নামাজ দোহরাবে না। অতএব যদি কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ পাক থাকাবস্থায় কেউ নাঙ্গা নামাজ পড়ে তবে তার নামাজ হবে না। এক-চতুর্থাংশের চেয়ে কম পাক থাকাবস্থায় এ নাপাক কাপড় পরিধান করে নামাজ পড়া উত্তম, [নাঙ্গা পড়াও বৈধ]। যার কাছে কাপড় নেই, তার জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া জায়েজ আছে, তবে বসে ইশারা করে পড়া মোস্তাহাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ بَابُ شُرُوْطِ الصَّلٰوةِ :

আজান-ইকামতের পর নামাজের শর্তের বিবরণ দেওয়ার কারণ : এ সম্পর্কে আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, আজান ও ইকামতের বিবরণ থেকে অবসর হয়ে নামাজের শর্তের বিবরণ শুরু করেছেন।

شُرُوْطٌ শব্দের বিশ্লেষণ : شُرُوْطٌ শব্দটি শারতুন (شَرْطٌ) -এর বহুবচন। شرط -এর راء অক্ষর সাকিন হবে। এর বহুবচন তিনটি- ১. شُرُوْطٌ [শুরূতুন], ২. شَرَائِطُ [শারায়িতুন], ৩. اَشْرَاطٌ [আশরাতুন]। এর আভিধানিক অর্থ- আলামত বা চিহ্ন। পরিভাষায় ঐ বস্তু যার উপর অন্য জিনিসের অস্তিত্ব নির্ভর করে। তবে তা সেই অন্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয় না। কারণ, একটি কায়দা আছে যে, شَرْطُ الشَّئِ خَارِجُ الشَّئِ অর্থাৎ "কোনো জিনিসের শর্ত ঐ জিনিসের বহির্ভূত বিষয়।"

নামাজের শর্তসমূহের প্রকার : নামাজের শর্ত মোট তেরোটি। এ তেরোটি শর্ত দু ভাগে বিভক্ত। ১. ঐসব শর্ত যেগুলো নামাজের বাইরের অংশ। তা মোট ছয়টি। ২. ঐসব শর্ত যেগুলো নামাজের ভিতরের অংশ। তা মোট সাতটি। এখানে নামাজের বাইরের ছয় শর্ত সম্পর্কেই আলোচনা করা হবে।

নামাজের বাইরের শর্তসমূহ : নামাজের শর্ত মোট ছয়টি। যথাক্রমে-

১. নামাজি ব্যক্তির শরীর হদস ও নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া। দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا অর্থাৎ "যদি জুনূবী হও তবে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে।" অন্যত্র আছে- اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ الخ এ আয়াতে حَدَثْ اَصْغَرْ এবং পূর্বের আয়াতে حَدَثْ اَكْبَرْ থেকে পবিত্র হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

২. নামাজি ব্যক্তির কাপড় পাক হওয়া। উদ্দেশ্য যেসব কাপড় নামাজ পড়াবস্থায় শরীরে থাকবে, ঐসব কাপড়। যেমন- পায়জামা, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, গেঞ্জি, টুপি, মোজা এমনকি পকেটের রুমালসহ এর অন্তর্ভুক্ত। দলিল হলো, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ "আপনি আপনার কাপড় পবিত্র করুন।"

৩. নামাজের জায়গা পাক হওয়া। হযরত বরজুনদী (র.) বলেন যে, এর দ্বারা শুধু উভয় পা এবং সিজদার জায়গা পাক হওয়া উদ্দেশ্য। হাত কিংবা হাঁটুর জায়গায় যদি নাপাকও থাকে তবে কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ যদি হাত ও হাঁটুর জায়গার মাটিগুলো এমন হয় যে, তা হাঁটু কিংবা হাতে লেগে যায় তবে সেখানে নামাজ পড়া বৈধ নয়।

৪. সতর ঢাকা। অর্থাৎ ঐ অঙ্গ ঢাকা যা আবৃত রাখা আবশ্যক। নামাজে নামাজি ব্যক্তির সতর অন্যের তুলনায় হয়। যেমন- কোনো নামাজি ব্যক্তির দৃষ্টি যদি রুকুতে স্বীয় গুপ্তাঙ্গের উপর পড়ে যায়, আর এমতাবস্থায় অন্য লোকের দৃষ্টিতে এ গুপ্তাঙ্গ আবৃত দেখা যায়, তবে তার নামাজ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে দলিল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী- خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ এ আয়াতে زِيْنَةٌ দ্বারা পোশাক এবং مَسْجِدٌ দ্বারা নামাজ উদ্দেশ্য।

৫. কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "মসজিদে হারাম [কা'বা] -এর দিকে আপনি আপনার চেহারা ফিরান।"- এখানে হুবহু কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফিরানো উদ্দেশ্য নয়; বরং কা'বা যেদিকে-সেদিকে মুখ ফিরানোই উদ্দেশ্য। ফুকাহায়ে কেরাম এতে একমত যে, শুধু মক্কাবাসীদের জন্য সরাসরি কা'বার দিকে হওয়া আবশ্যক, আর অন্যান্য লোকদের জন্য কা'বা যেদিকে সে দিকে হওয়াই যথেষ্ট। অতএব আমাদের বাংলাদেশের জন্য কিবলা পশ্চিম দিকে। তাই পশ্চিম দিক হয়ে দাঁড়াবে, যদিও কা'বা শরীফ বরাবর সামনে না থাকে।

৬. নামাজের নিয়ত করা। রাসূল ﷺ বলেছেন- اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" এর ব্যাখ্যা হলো, নামাজ একটি আমল, যা নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। অতএব, যে নামাজ নিয়ত ছাড়া হবে তা মূলত নামাজ হিসেবেই গণ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَالْعَوْرَةُ لِلرَّجُلِ مِنْ تَحْتَ الخ :

পুরুষ, মহিলা ও দাসীর সতর : এখানে সতর শব্দটি আমাদের কাছে পরিচিত, তাই আমরা সতর বলেছি। অন্যথায় সতর শব্দের অর্থ- ঢাকা। গ্রন্থকার বলেছেন- سَتْرُ الْعَوْرَةِ অর্থাৎ আওরাত ঢাকা। عَوْرَةٌ বলা হয়- যে সমস্ত অঙ্গ ঢেকে রাখা আবশ্যক। মহিলাদেরকে এ কারণেই عَوْرَةٌ বলা হয় যে, তাদের পর্দায় আবৃত থাকা আবশ্যক।

পুরুষের সতর নাভি থেকে নিয়ে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত। দাসীর সতরও পুরুষের সতরের মতোই। তবে এর সাথে তাদের পিঠ ও পেট যোগ হবে। অর্থাৎ তাদের সতর পিঠ ও পেটসহ হাঁটু পর্যন্ত। স্বাধীন মহিলার সতর হচ্ছে– হাত, পা ও মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন– اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ অর্থাৎ "মহিলা আওরাত-সতর। তা ঢেকে রাখা কর্তব্য। যখন সে ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে দেখে।" মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এ দুটি অঙ্গ সাধারণত বিভিন্ন কাজের জন্য বের করার প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া হাদীসে বর্ণিত আছে– اِنَّ الْجَارِيَةَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ اَنْ يُرٰى مِنْهَا اِلَّا وَجْهُهَا وَيَدَهَا اِلَى الْمِفْصَلِ অর্থাৎ "কোনো নারী যখন বয়ঃপ্রাপ্তা হয়, তখন তাকে দেখা জায়েজ নেই। কিন্তু মুখমণ্ডল এবং হাত কব্জি পর্যন্ত দেখা জায়েজ।" –[মারাসিলে আবী দাউদ]

অনুরূপ মহিলার পাও সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, মহিলার পা দেখে তেমন খাহেশ সৃষ্টি হয় না, যেমনটা তার চেহারা দেখে সৃষ্টি হয়। চেহারার প্রতি অধিক খাহেশ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব, পাও সতরের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَالشَّعْرُ النَّازِلُ عُضْوٌ اٰخَرُ :

মহিলার মাথার ঝুলন্ত চুলও সতর : মহিলার মাথার ঝুলন্ত চুল সতর কিনা? এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। বিশুদ্ধ মত হলো, তার ঝুলন্ত চুলও সতর। অতএব তা ঢেকে রাখা আবশ্যক; বরং যদি এর এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ খুলে যায় তবে নামাজ হবে না। কিন্তু মহিলার মাথার বেণি বাঁধা চুল সতর হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। এজন্যই শারেহ (র.) মহিলার ঝুলন্ত চুলকে একটি পূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, যে সমস্ত চুল মাথার সাথে লেগে আছে এবং বেণি বাঁধা আছে, তা মাথার হুকুমেই। মাথা থেকে পৃথক কোনো অঙ্গ নয়। তবে তার ঝুলন্ত চুলগুলো ভিন্ন একটি অঙ্গ।

قَوْلُهُ وَفِىْ اَقَلَّ مِنْ رُبُعِهِ الْاَفْضَلُ صَلَاتُهُ الخ : অর্থাৎ যদি কারো কাছে এমন কাপড় থাকে যার এক-চতুর্থাংশ পাক, আর এমতাবস্থায় সে নগ্ন হয়ে নামাজ পড়ে তবে তার নামাজ হবে না। আর যদি এক-চতুর্থাংশের কম পরিমাণ কাপড় পাক থাকে তবে তার জন্য নগ্ন নামাজ পড়া বৈধ। তবে ঐ নাপাক কাপড় পরিধান করে নামাজ পড়া উত্তম।

قَوْلُهُ وَمَنْ عَدِمَ ثَوْبًا الخ :

যার কাছে কোনো কাপড় নেই, সে কিভাবে নামাজ পড়বে : যে ব্যক্তির কাছে কোনো কাপড় নেই, যা দ্বারা সতর ঢেকে নামাজ পড়বে তবে সে নাঙ্গা অবস্থায়ই নামাজ পড়বে। তবে তার জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া বৈধ। কিন্তু বসে ইশারার মাধ্যমে পড়া মোস্তাহাব। কেননা, নামাজের রুকনের খলিফা হচ্ছে ইশারা-ইঙ্গিত, কিন্তু নগ্ন গুপ্তাঙ্গের কোনো খলিফা নেই। তাই বসে ইশারার মাধ্যমে নামাজ পড়লে গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পড়ে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এমনই ফতোয়া দিয়েছেন। তবে হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, তার জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া বৈধ নয়।

আল-বুরহান নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, তার জন্য দাঁড়িয়ে কিংবা বসে–অনুরূপ দাঁড়িয়ে রুকু-সিজদা কিংবা ইশারার মাধ্যমে এবং বসে রুকু-সিজদা কিংবা ইশারার মাধ্যমে পড়া বৈধ।

وَقِبْلَةُ خَائِفِ الْاِسْتِقْبَالِ جِهَةُ قُدْرَتِهٖ فَاِنْ جَهِلَهَا وَعَدِمَ مَنْ يَسْأَلُهُ تَحَرّٰى وَلَمْ يُعِدْ اِنْ اَخْطَأَ وَاِنْ عَلِمَ بِهٖ مُصَلِّيًا اَوْ تَحَوَّلَ رَأْيُهُ اِلٰى جِهَةٍ اُخْرٰى وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ اِسْتَدَارَ اَىْ اِنْ عَلِمَ بِالْخَطَأِ فِى الصَّلٰوةِ وَتَحَوَّلَ غَلَبَةُ ظَنِّهٖ اِلٰى جِهَةٍ اُخْرٰى وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ اِسْتَدَارَ وَاِنْ شَرَعَ بِلَا تَحَرٍّ لَمْ يَجُزْ وَاِنْ اَصَابَ لِاَنَّ قِبْلَتَهُ جِهَةُ تَحَرِّيْهِ وَلَمْ تُوْجَدْ فَاِنْ تَحَرّٰى كُلٌّ جِهَةً بِلَا عِلْمِ حَالِ اِمَامِهِمْ وَهُمْ خَلْفَهُ جَازَ لَا لِمَنْ عَلِمَ حَالَهُ اَوْ تَقَدَّمَهُ اَىْ صَلّٰى قَوْمٌ فِىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ بِالْجَمَاعَةِ وَتَحَرَّوا الْقِبْلَةَ وَتَوَجَّهَ كُلٌّ وَاحِدٍ اِلٰى جِهَةِ تَحَرِّيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ اَحَدٌ اَنَّ الْاِمَامَ اِلٰى اَىِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ لٰكِنْ يَعْلَمُ كُلٌّ وَاحِدٍ اَنَّ الْاِمَامَ لَيْسَ خَلْفَهُ جَازَتْ صَلَاتُهُمْ ۔

অনুবাদ : কিবলার দিকে ফিরতে আশঙ্কাকারী ব্যক্তির কিবলা সেদিকে– যেদিকে সে ফিরতে সক্ষম। অতএব, যদি কিবলার দিক জানা না থাকে এবং এমন কোনো লোকও না থাকে, যার কাছে সে জিজ্ঞাসা করবে তবে সে তাহাররী [চিন্তাভাবনা] করবে। যদি চিন্তাভাবনায় ভুল হয় তবে নামাজ দোহরাবে না। আর যদি নামাজ পড়াবস্থায় ভুল সম্পর্কে অবগত হয়, কিংবা নামাজে থাকাবস্থায় তার প্রবল ধারণা অন্যদিকে ফিরে যায় তবে সে [নামাজ পড়াবস্থায়ই] সেদিকে ফিরে যাবে। আর যদি চিন্তাভাবনা ছাড়া নামাজ শুরু করে দেয় তবে যদিও সে সঠিক দিকে নামাজ পড়ছে তবুও তার নামাজ হবে না। কেননা, তার জন্য চিন্তাভাবনা করার দিক হচ্ছে কিবলা। আর সেটা এখানে পাওয়া যায়নি। সুতরাং যদি মুক্তাদীদের প্রত্যেকে ইমামের অবস্থা জানা ব্যতীত এক দিকে চিন্তাভাবনা করে, আর এমতাবস্থায় তারা ইমামের পিছনেই থাকে তবে তা জায়েজ। তবে ঐ ব্যক্তির নামাজ হবে না, যে ইমামের অবস্থা সম্পর্কে জেনে গেছে, কিংবা সে ইমামের সামনে চলে গেছে। অর্থাৎ অন্ধকার রাতে অনেক লোক জামাতের সাথে নামাজ পড়ছে এবং তারা সকলেই কিবলার দিক চিন্তা করে আপন আপন চিন্তার দিকে মুখ করেছে, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কারোই জানা নেই যে, ইমাম কোন দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছেন। তবে তারা প্রত্যেকেই জানে যে, ইমাম তাদের পিছনে নেই, তবে তাদের সকলের নামাজ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قِبْلَةُ خَائِفِ الْاِسْتِقْبَالِ الخ : অর্থাৎ যদি কারো কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে শত্রু কিংবা কোনো হিংস্র প্রাণীর ভয় থাকে, কিংবা এমন অসুস্থ হয় যে, মুখ কিবলার দিকে করতে পারে না এবং তার কাছে এমন লোকও নেই, যে তাকে ক্বিবলার দিকে ফিরিয়ে দেবে, তবে যেদিকে তার মুখ করার সামর্থ্য রয়েছে সেদিকে ফিরেই নামাজ পড়বে। কারণ, এখন তার কিবলা সেদিকেই যেদিকে তার মুখ করার সামর্থ্য আছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ অর্থাৎ "যেদিকেই মুখ ফিরাবে, সেটাই আল্লাহর দিক।"

قَوْلُهُ فَاِنْ جَهِلَهَا وَعَدِمَ الخ :

যে ব্যক্তির কিবলার দিক জানা নেই : যে ব্যক্তির কিবলার দিক জানা নেই এবং তার কাছে এমন লোকও নেই– যার কাছে সে কিবলার দিকের কথা জিজ্ঞাসা করবে তবে সে তখন চিন্তা করবে যে, কিবলা কোন দিকে হতে পারে। চিন্তার মাধ্যমে

যেদিকে কিবলা বলে তার ধারণা হবে সেদিকে ফিরে সে নামাজ পড়বে। এখন যদি সে চিন্তা অনুযায়ী নামাজ পড়ার পর জানতে পারে যে, তার চিন্তা ভুল ছিল এবং কিবলা মূলত অন্যদিকে ছিল, তবে তার নামাজ দোহরাতে হবে না। কারণ, না জানার অবস্থায় সেদিকেই কিবলা হয়, যেদিকে তার চিন্তাভাবনা রায় দেয়। উদ্দেশ্য হলো, কিবলার দিক না জানা অবস্থায় تحرى [চিন্তাভাবনা] করা আবশ্যক। আর সে তা করেছে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "কতিপয় সাহাবীর কিবলার দিক নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তা অনুযায়ী দিক নির্ণয় করে নামাজ পড়ে নিয়েছেন, যখন সকাল হলো তখন জানা গেল যে, তাঁদের চিন্তা ভুল ছিল এবং কিবলার ভিন্ন দিকে তারা নামাজ পড়েছেন। তখন তাঁরা তা রাসূল ﷺ -এর কাছে বললেন, রাসূল ﷺ তাঁদেরকে নামাজ দোহরানোর নির্দেশ দেননি।"

এখন যদি কেউ বিবেচনার আলোকে নামাজ শুরু করে থাকে, আর নামাজে থাকাবস্থায় সে বুঝতে পারে যে, তার বিবেচনা ভুল ছিল, কিংবা নামাজে থাকাবস্থায় তার প্রবল ধারণা হলো যে, কিবলা অন্যদিকে– তবে সে সাথে সাথে সেদিকে ফিরে যাবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ شَرَعَ بِلَا تَحَرٍّ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَصَابَ : যদি কোনো ব্যক্তির কিবলার দিক জানা না থাকে তবে তার জন্য আবশ্যক হলো, তার চিন্তা ও বিবেচনার দ্বারা কিবলার দিক নির্ণয় করা এবং সেদিকে ফিরে নামাজ পড়া। এর দ্বারা যদি তার কিবলার দিক ভুলও নির্ণয় করা হয় তবুও তার নামাজ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউ চিন্তা ও বিবেচনা করা ছাড়াই এক দিকে ফিরে নামাজ পড়ে নেয় তবে এমতাবস্থায় ঘটনাক্রমে তার কিবলার দিক সঠিক হলেও তার নামাজ সহীহ হবে না। কারণ, এ অবস্থায় তার কিবলার দিক সেটাই যেটা সে বিবেচনা করে নির্ণয় করেছে, আর এ বিবেচনা যেহেতু এখানে নেই– সেহেতু এখানে কিবলার দিকও নির্ণয় করা হয়নি। তাই নামাজও সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ فَإِنْ تَحَرَّى كُلٌّ جِهَةً الخ : অর্থাৎ অন্ধকার রাতে যদি অনেক লোক জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে, তারা সকলেই কিবলার দিক বিবেচনা করে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ বিবেচনার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ল এবং কারোই জানা নেই যে, ইমাম কোন দিক ফিরে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু তারা সকলেই জানে যে, ইমাম তার পিছনে নয়, তবে তাদের সকলের নামাজ হয়ে যাবে। কারণ, প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তা ও বিবেচনার দ্বারা নির্বাচিত দিকে ফিরে নামাজ পড়েছে। যেন তাদের প্রত্যেকের দিকই সহীহ দিক। অনুরূপ তাদের দিক ইমামের দিকের পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও [যেমন– ইমাম উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে আর মুক্তাদী পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ইমাম মুক্তাদীদের সামনেই রয়েছে তবুও] তাদের সকলের নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। যেরূপ কা'বা শরীফের মাঝে এমন হওয়ার দ্বারা কোনো সমস্যা হয় না। কেননা, কা'বার ভিতরে ইমামের পিঠের দিকে যদি মুক্তাদীর পিঠও করে তবুও নামাজ বৈধ। কিন্তু যদি চিন্তা ও বিবেচনার দ্বারা ইমামের দিক সম্পর্কে জানা যায়, আর তথাপি ইমামের পরিপন্থি দিকে দাঁড়ায় তবে নামাজ সহীহ হবে না। কারণ, ইমামের বিরোধিতা করার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজ হয় না। আর যদি চিন্তা ও বিবেচনার দ্বারা জানা যায় যে, ইমাম তার পিছনে, তবুও নামাজ হবে না। কারণ, এ প্রক্রিয়ায় লক্ষ্যবস্তুর পরিপন্থি হয়ে যায়। তা এভাবে যে, ইমামকে তো এজন্য ইমাম বলা হয় যে, তিনি আগে থাকেন।

আর যদি চিন্তা ও বিবেচনা করে নামাজ শুরু করেছে, কিন্তু মুক্তাদী চিন্তা ও বিবেচনা করেনি, তখন এ সুরতে যদি ইমামের বিবেচনায় সঠিক দিক নির্ণয় হয়ে থাকে তবে সকলের নামাজ হয়ে যাবে। আর যদি ইমামের বিবেচনায় ভুল দিক নির্ণয় হয়ে থাকে তবে বিবেচনা করার কারণে ইমামের নামাজ হয়ে যাবে, কিন্তু মুক্তাদীদের নামাজ হবে না।

একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর : প্রশ্ন : প্রশ্নের সারমর্ম হচ্ছে, যদি রাতে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে, তবে কেরাত হয় উচু আওয়াজে (جَهْرِيْ)। আর যখন ইমাম جَهْرِيْ কেরাত পড়বে, তখন ইমাম কোন দিকে, এ নিয়ে কিভাবে সন্দেহ সৃষ্টি হয়?

উত্তর : উত্তরের সারমর্ম হচ্ছে, ইমাম সামনে হওয়ার দ্বারা একথা আবশ্যক হয় না যে, ইমাম কোন দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে তাও জানা যাবে; বরং ইমামকে দেখা না যাওয়ার কারণে ইমামের দিক জানা আরো কষ্টকর। কারণ, যদি ইমাম সামনে হয়ে মুক্তাদীর দিকে মুখ করে দাঁড়ায় কিংবা মুক্তাদীর ডান বা বাম দিকে ফিরে উঁচু আওয়াজে কেরাত পড়ে তুবও ইমাম সামনে বলে প্রমাণিত।

أَمَّا إِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ فِي الصَّلٰوةِ جِهَةَ تَوَجُّهِ الْإِمَامِ وَمَعَ ذٰلِكَ خَالَفَهُ لَا يَجُوْزُ صَلَاتُهُ وَكَذَا إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ خَلْفَهُ فَقَوْلُهُ وَهُمْ خَلْفَهُ فِيْهِ تَسَاهُلٌ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِيْمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ أَنَّ الْإِمَامَ إِلٰى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ فَكَيْفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الْإِمَامَ أَمَامَهُ وَهٰذَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ هُوَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ قُدَّامَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ وَجْهُهُ إِلٰى وَجْهِ الْإِمَامِ أَوْ إِلٰى جَنْبِهِ أَوْ إِلٰى ظَهْرِهِ وَإِنَّمَا يَكُوْنُ هُوَ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ وَجْهُهُ إِلٰى ظَهْرِ الْإِمَامِ وَحِ يَكُوْنُ جِهَةُ تَوَجُّهِ الْإِمَامِ مَعْلُوْمَةً وَكَلَامُنَا لَيْسَ فِيْ هٰذَا وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ وَلَا يَضُرُّ جَهْلُهُ جِهَةَ إِمَامِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ خَلْفَهُ بَلْ تَقَدُّمَهُ أَوْ عَلِمَ مُخَالَفَتَهُ أَيْ إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ خَلْفَهُ .

অনুবাদ : কিন্তু যদি কারো নামাজের মধ্যে ইমামের দিক সম্পর্কে জানা হয়ে যায়, এতদসত্ত্বেও সে ইমামের পরিপন্থি করে তবে তার নামাজ হবে না। অনুরূপ যদি জানা হয়ে যায় যে, ইমাম তার পিছনে তবুও তার নামাজ হবে না। অতএব গ্রন্থকারের কথা وَهُمْ خَلْفَهُ -এর মাঝে تَسَاهُلٌ রয়েছে। কেননা, আমাদের কথা ঐ সুরতে যখন কেউ জানে না যে, ইমাম কোন দিকে দাঁড়িয়েছে। তবে কিভাবে জানা যাবে যে, সে ইমামের পিছনে আছে। মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে জানে– ইমাম তার আগে আছে। এ কথাটি অধিক ব্যাপক ঐ কথার চেয়ে যে, সে ইমামের পিছনে আছে বা নেই। কেননা, ইমাম যখন তার আগে হবে তখন সম্ভাবনা আছে যে, মুক্তাদীর চেহারা ইমামের চেহারার দিকে কিংবা ইমামের পার্শ্বের দিকে কিংবা ইমামের পিঠের দিকে। [সে] ইমামের পিছনে হওয়া তো তখন প্রমাণিত হবে যখন মুক্তাদীর চেহারা ইমামের পিঠের দিকে থাকবে এবং তখন ইমামের দাঁড়ানোর দিক জানা যাবে। অথচ আমাদের আলোচনা এ সুরতে নয়। আর 'মুখতাসারুল বিকায়া' -এর ইবারত হচ্ছে وَلَا يَضُرُّ جَهْلُهُ الخ অর্থাৎ স্বীয় ইমামের দিক জানা না থাকা ক্ষতিকর নয়, যখন জানা যাবে যে, ইমাম তার পিছনে নয়; বরং ইমামের আগে হওয়া কিংবা ইমামের পরিপন্থি বুঝা যাওয়া, [ক্ষতিকর]। গ্রন্থকারের কথা– إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ خَلْفَهُ এটি গ্রন্থকারের পূর্ববর্তী কথা– إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ خَلْفَهُ -এর ব্যাখ্যা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أَمَّا إِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ فِي الصَّلٰوةِ الخ : فِي الصَّلٰوةِ -এর সাথে শর্তারোপ করে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি নামাজের পর মুক্তাদীর দিক ইমামের দিকের পরিপন্থি বলে জানা যায়, তবে এতে কোনো ক্ষতি নেই। অন্য সুরত তথা ইমাম থেকে মুক্তাদী আগে বেড়ে যাওয়ার সুরতে এ শর্তের প্রয়োজন নেই। কারণ, মুক্তাদী ইমামের আগে হওয়া তথা ইমাম মুক্তাদীর পিছনে হওয়া সর্বাবস্থায়ই ক্ষতিকর, চাই তা নামাজে জানা যাক কিংবা নামাজের পরে জানা যাক– তার নামাজ

হবে না। কিন্তু যদি ইমামের আগে হওয়া জানাই না যায় এবং এ বেখবর অবস্থায় সে ইমামের আগে থেকে নামাজ পড়ে নেয় এবং সে তা নামাজে তো জানতে পারেনি এমনকি নামাজের পরেও জানা যায়নি; তবে তার নামাজ হয়ে যাবে।

আলোচনার সারাংশ হচ্ছে, মুক্তাদী একথা জেনে যাওয়া যে, ইমাম তার পিছনে আছে কিংবা তার পিছনে ছিল আর সে ইমামের আগে আছে কিংবা আগে ছিল তবে তার নামাজ হবে না; চাই সে তা নামাজে থাকাবস্থায় জানুক কিংবা নামাজের পরে জানুক। আর যদি ইমামের দিকের পরিপন্থি হওয়া নামাজে থাকাবস্থায় জানা যায় তবে তার নামাজ হবে না। হ্যাঁ, যদি জানার সাথে সাথে ইমামের দিকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু যদি তা নামাজের পরে জানা যায় তবে তার নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং তার নামাজ হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ فِيْهِ تَسَاهُلٌ : অর্থাৎ শারেহ (র.) বলেন, বিকায়া গ্রন্থকারের কথা **وَهُمْ خَلْفَهٗ**-এর মাঝে **تَسَاهُلٌ** হয়েছে। কারণ, যদি **وَهُمْ خَلْفَهٗ**-এর এ অর্থ নেওয়া হয় যে, তারা মূলত ইমামের পিছনে রয়েছে, চাই তারা জানুক কিংবা না জানুক– তখন একথা শর্ত হয়ে যায়। অথচ তা শর্ত নয়। এজন্য যে, যদি তারা একথা মনে করে ইকতেদা করে যে, তারা ইমামের পিছনে আছে তবে তাদের নামাজ হয়ে যাবে। যদিও তারা মূলত ইমামের আগেই হোক না কেন। আর যদি এ অর্থ নেওয়া হয় যে, তারা জানে– তারা ইমামের পিছনে তবে এর উপর প্রশ্ন হয় যে, আমরা এমন সুরত সম্পর্কে আলোচনা করছি যে সম্পর্কে স্বয়ং তারা নিজেরা জানে না যে, ইমাম কোন দিকে? তবে এটা কিভাবে জানবে যে, তারা ইমামের পিছনে আছে?

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا يَكُوْنُ هُوَ خَلْفَ الْاِمَامِ : এতে সন্দেহ রয়েছে। সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে ইমামরে পিছনে হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইমামের তুলনায় সে কিবলার অধিক নিকটবর্তী। চাই তার মুখ ইমাম যেদিকে মুখ করেছে সেদিকে হোক কিংবা ইমামের পিঠের দিকে হোক। এমন ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য করলে ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে কোনো পার্থক্য হবে না।

قَوْلُهٗ اِذَا عَلِمَ اَنَّهٗ : ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ ইবারত বিকায়া গ্রন্থকারের পূর্ববর্তী ইবারত **اِذَا عَلِمَ اَنَّ الْاِمَامَ لَيْسَ خَلْفَهٗ**-**لَيْسَ خَلْفَهٗ**-এর ব্যাখ্যা। অতএব তাদের অনুসরণ করত আমিও এর অনুবাদ অনুরূপ করেছি। কিন্তু তথাপি আমার মনে এ সন্দেহ রয়ে গেছে যে, সম্ভবত এটি **اَوْ عَلِمَ مُخَالَفَتَهٗ**-এর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ইমামের পরিপন্থি হওয়ার বিভিন্ন সুরত রয়েছে। যেমন– ইমাম তার পিছনে কিংবা ডান দিকে কিংবা বাম দিকে কিংবা সামনে ইত্যাদি। কিন্তু এখানে শুধু "ইমাম তার পিছনে" উদ্দেশ্য; অন্য কোনো দিকে হওয়া উদ্দেশ্য নয়। যদি এটাই অর্থ হয় তবে ইমামের ডানে কিংবা বাম দিকে কিংবা বরাবর সামনের দিকে হওয়ার দ্বারা কোনো সমস্যা নেই।

وَيَصِلُ قَصْدَ قَلْبِهِ صَلَاتَهُ بِتَحْرِيْمَتِهَا هٰذَا تَفْسِيْرُ النِّيَّةِ وَالْقَصْدُ مَعَ لَفْظِهِ اَفْضَلُ وَيَكْفِيْ لِلنَّفْلِ وَالتَّرَاوِيْحِ وَسَائِرِ السُّنَنِ نِيَّةُ مُطْلَقِ الصَّلٰوةِ وَلِلْفَرْضِ شَرْطُ تَعْيِيْنِهِ لَا نِيَّةَ عَدَدِ رَكْعَاتِهِ وَلِلْمُقْتَدِىْ نِيَّةُ صَلَاتِهِ وَاقْتِدَائِهِ .

অনুবাদ : নামাজের নিয়তকে তাকবীরে তাহরীমার সাথে সংযুক্ত করবে। এটি নিয়তের তাফসীর-ব্যাখ্যা। [অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামাজের নিয়ত করবে এবং সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাহরীমা বাঁধাবে।] মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা উত্তম। নফল, তারাবীহ এবং সমস্ত সুন্নত নামাজের জন্য সাধারণ নামাজের নিয়ত করা যথেষ্ট। ফরজ নামাজের জন্য নামাজকে নির্ধারণ করে নিয়ত করা শর্ত। কিন্তু [ফরজ নামাজেও] রাকাতের সংখ্যার নিয়ত করা শর্ত নয়। আর মুক্তাদীর জন্য আবশ্যক হলো, সে নিজের নামাজের নিয়তের সাথে সাথে ইমামের ইকতেদার নিয়তও করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَصِلُ قَصْدَ قَلْبِهِ صَلَاتَهُ الخ :

নিয়তের সাথে সাথে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধবে : অর্থাৎ নামাজের নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমা একত্রে হবে। এমন যেন না হয় যে, নামাজের নিয়ত করে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোনো কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, অতঃপর উক্ত কাজ থেকে অবসর হয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলে। গ্রন্থকার (র.) قَصْدَ قَلْبِهِ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, নিয়ত অন্তর থেকে করা জরুরী। মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। তবে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা উত্তম। আর নামাজের নিয়ত এবং তাহরীমা একত্রে করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আগে নিয়ত করবে অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বলবে। এর পরিপন্থি নয়। অর্থাৎ আগে তাহরীমা তারপর নিয়ত নয়।

قَوْلُهُ وَالْقَصْدُ مَعَ لَفْظِهِ الخ :

নিয়ত করার প্রক্রিয়া : নিয়ত করার প্রক্রিয়া মোট তিনটি–

১. শুধু অন্তরের দ্বারা নিয়ত করা– মুখে কিছুই উচ্চারণ না করা। সর্বসম্মতিক্রমে এভাবে নিয়ত করা বৈধ। এ প্রক্রিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত ও অনুমোদিত। সাহাবায়ে কেরাম থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। কোনো সাহাবী থেকেই বর্ণিত নেই যে, নবী ﷺ কিংবা কোনো সাহাবী নামাজের নিয়তের বাক্যগুলো মুখে উচ্চারণ করেছেন যে, অমুক ওয়াক্তের অমুক নামাজের নিয়ত করছি।

২. অন্তর দ্বারা নিয়ত না করা; বরং শুধু মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা। সর্বসম্মতিক্রমে এমন নিয়ত জায়েজ নেই।

৩. উভয়টি করবে। অর্থাৎ অন্তর দ্বারাও নিয়ত করবে এবং মুখেও উচ্চারণ করবে। এটি মোস্তাহাব ও উত্তম প্রক্রিয়া; ওলামায়ে কেরাম এটিই পছন্দ করেছেন এবং তারা বলেন, এর দ্বারা অন্তর ও ভাষার মধ্যে মিল হয় এবং দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়।

যে-কোনো সুন্নত ও নফলের জন্য সাধারণ নিয়ত : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যে-কোনো সুন্নত ও নফল নামাজের জন্য সাধারণ নামাজের নিয়ত করা যথেষ্ট। নামাজের ওয়াক্ত, নামাজের নাম তথা সুন্নত কিংবা নফল এবং নামাজের রাকাত সংখ্যা উল্লেখ করে নিয়ত করার প্রয়োজন নেই। সুন্নত চাই সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ হোক কিংবা সুন্নতে যায়েদা হোক।

ফরজ নামাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে হবে : এ তো আমাদের জানা হয়েছে যে, সমস্ত নফল ও সুন্নতের জন্য সাধারণ নামাজের নিয়ত করবে– ওয়াক্ত ও নামাজের নাম নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি ফরজ নামাজ হয় তবে ওয়াক্ত, নামাজের নাম ইত্যাদি নির্ধারণ করতে হবে। তাও অন্তরেই তা নির্ধারণ করা আবশ্যক; মুখে বলা জরুরি নয়। তবে মুখে বলা উত্তম। কিন্তু যেহেতু নামাজের নাম নেওয়ার দ্বারা নামাজের রাকাত নির্ধারিত হয়ে যায় তাই রাকাতকে পৃথকভাবে নির্ধারিত করার প্রয়োজন নেই।

মুক্তাদী স্বীয় নামাজ ও ইমামের ইকতেদার নিয়ত করবে : মুক্তাদীর জন্য আবশ্যক হলো, সে তার নামাজ এবং ইমামের ইকতেদার নিয়ত করবে। কারণ, ইমামের নামাজ সহীহ হওয়ার উপর মুক্তাদীর নামাজ সহীহ হওয়া নির্ভরশীল। অর্থাৎ যদি কোনো কারণে ইমামের নামাজ সহীহ না হয় এবং ইমামের নামাজ মাকরূহ হয় তবে মুক্তাদীর নামাজও মাকরূহ হবে। আর ইমামের নামাজ যদি সহীহ হয় তবে মুক্তাদীর নামাজও সহীহ হবে। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, ইমামের অজু ভাঙ্গার দ্বারা মুক্তাদীর অজুও ভেঙ্গে যাবে; বরং উদ্দেশ্য হলো, ইমামের নামাজ যেমন হবে, তেমনি মুক্তাদীর নামাজও হবে। হ্যাঁ যদি কোনো মুক্তাদীর ব্যক্তিগতভাবে কোনো সমস্যা তথা অজু ভাঙ্গা কিংবা নামাজ ভাঙ্গার কারণ দেখা দেয়, তবে তা তার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। ইমাম কিংবা অন্য কোনো মুক্তাদীর দিকে তা প্রত্যাবর্তন করবে না।

بَابُ صِفَةِ الصَّلٰوةِ

فَرْضُهَا التَّحْرِيْمَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَمَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) رُكْنٌ فَامَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فَسُنَّةٌ وَالْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ بِالْجَبْهَةِ وَالْاَنْفِ وَبِهٖ اُخِذَ يَجُوْزُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) الْاِكْتِفَاءُ بِالْاَنْفِ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ خِلَافًا لَهُمَا وَالْفَتْوٰى عَلٰى قَوْلِهِمَا وَالْقُعْدَةُ الْاَخِيْرَةُ قَدْرُ التَّشَهُّدِ وَالْخُرُوْجُ بِصُنْعِهٖ ـ

পরিচ্ছেদ : নামাজের পদ্ধতি

অনুবাদ : নামাজের ফরজ হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা। আর তাহরীমা হচ্ছে, আল্লাহু আকবার কিংবা ঐ শব্দ যা আল্লাহু আকবার-এর স্থলাভিষিক্ত। তাকবীরে তাহরীমা আমাদের নিকট নামাজের শর্ত। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "যে তার প্রভুর নাম স্মরণ করে অতঃপর নামাজ আদায় করে।" ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নিকট তা রুকন। তবে তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হস্ত উঠানো সুন্নত। দাঁড়ানো, কেরাত পড়া, রুকু করা এবং কপাল ও নাক দ্বারা সিজদা করা। এটি ফুকাহায়ে কেরাম গ্রহণ করেছেন। ওজর না থাকাবস্থায়ও ইমাম আবূ হানীফ (র.)-এর নিকট শুধু নাক দ্বারা সিজদা করা জায়েজ। সাহেবাইন (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। তবে ফতোয়া সাহেবাইন (র.)-এর মতের উপর। তাশাহহুদ পরিমাণ শেষ বৈঠক করা এবং নামাজি ব্যক্তি স্বীয় কার্য দ্বারা নামাজ শেষ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ صِفَةِ الصَّلٰوةِ :

صِفَة শব্দের বিশ্লেষণ : صِفَة শব্দের অর্থ– গুণ, পদ্ধতি। এর প্রতিশব্দ (مُرَادِفٌ) হচ্ছে وَصْف, তবে এ صِفَة দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে কয়েকটি মতামত রয়েছে–

১. صِفَة দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাজের ঐ অবস্থা, যা এর আরকান ও আনুষঙ্গিক বিষয় দ্বারা অর্জিত হয়।

২. صِفَة দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং মোস্তাহাবসমূহ। এ সুরত صِفَة-এর اِضَافَة – صَلَاة -এর দিকে হবে এবং তা اِضَافَةُ الْجُزْءِ اِلَى الْكُلِّ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নামাজের كَيْفِيَّة [অবস্থা]। এ সুরতে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। মূলত ইবারত হবে এভাবে– بَابُ صِفَةِ اَجْزَاءِ الصَّلَاةِ

ফরজ ও রুকন -এর সংজ্ঞা : فَرْض [ফরজ] বলা হয়– যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং যা করা অবধারিত, চাই তা রুকন হোক কিংবা শর্ত হোক। আর رُكْن [রুকন] বলা হয় যা নামাজের ভিতরের অংশ। কারণ, নিয়ম আছে رُكْنُ الشَّيْءِ دَاخِلُ الشَّيْءِ অর্থাৎ "কোনো জিনিসের রুকন ঐ জিনিসের ভিতরের অংশ হয়।"

ফরজের হুকুম : ফরজকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। ফরজ বর্জন করা কবীরা গুনাহ এবং এর জন্য পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

قَوْلُهُ فَرْضُهَا التَّحْرِيْمَةُ :

নামাজের ফরজসমূহ : নামাজের ভিতরের ফরজ ছয়টি– ১. তাকবীরে তাহরীমা, ২. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া, ৩. কেরাত পড়া, ৪. রুকু করা, ৫. কপাল ও নাকের দ্বারা সিজদা করা, ৬. তাশাহহুদ পরিমাণ শেষ বৈঠক করা।

'তাকবীরে তাহরীমা' দ্বারা উদ্দেশ্য : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা কিংবা এর সামর্থবোধক শব্দ বলা, যা শরিয়ত অনুমোদিত। এ কারণে যে, এ তাকবীর নামাজি ব্যক্তির জন্য এ সমস্ত কাজকে হারাম করে দেয়, যা নামাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন– مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

অর্থাৎ নামাজের চাবি পবিত্রতা, এর তাহরীমা [হারাম হওয়া] হচ্ছে– তাকবীর এবং এর তাহলীল [হালাল হওয়া] হচ্ছে– সালাম। –[তিরমিযী শরীফ]

'তাকবীরে তাহরীমা' ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল হচ্ছে– ১. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ "আপনার প্রভুর মহত্ত্ব বর্ণনা করুন।" এর দ্বারা আল্লাহু আকবার বলা উদ্দেশ্য। ২. তাহরীমার উপর রাসূল ﷺ -এর সর্বদা আমল করা। ৩. ইজমা। কারণ, রাসূল ﷺ -এর যুগ থেকে নিয়ে অদ্যাবধি তাকবীরে তাহরীমার وُجُوْبُ -এর ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

আল্লাহু আকবার বলা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ : তাকবীরে তাহরীমার জন্য আল্লাহু আকবার-এর সমার্থবোধক শব্দ বলা জায়েজ, কিন্তু সরাসরি اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। রাসূল ﷺ থেকে এ বাক্য قَوْلًا – فِعْلًا এবং تَعْلِيْمًا বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ এ বাক্য দ্বারা তাহরীমা বাঁধার কথা বলেছেন, নিজে আমল করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। এজন্যই ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বাক্য দ্বারা তাহরীমা বাঁধা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

আল্লাহু আকবারের সমার্থবোধক শব্দাবলি : اَللّٰهُ اَكْبَرُ -এর সমার্থবোধক কোন কোন শব্দ দ্বারা তাহরীমা বাঁধা যাবে– এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে শুধু اَللّٰهُ اَكْبَرُ দ্বারা তাহরীমা বাঁধা জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে– اَللّٰهُ اَكْبَرُ ও اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ শুধু এ দুই বাক্য দ্বারাই তাহরীমা বাঁধা জায়েজ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, শুধু চার বাক্য তথা اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ ، اَللّٰهُ كَبِيْرٌ এবং اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ বাক্য দ্বারাই তাহরীমা বাঁধতে পারবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে উল্লিখিত চার বাক্য ছাড়াও ঐ সমস্ত শব্দ দ্বারা তাহরীমা বাঁধা যাবে, যা আল্লাহর মাহাত্ম্য ও বড়ত্বকে বুঝায়। যেমন– اَللّٰهُ اَجَلُّ ও اَللّٰهُ اَعْظَمُ ইত্যাদি বাক্যাবলি। এটিই হলো মুখতার [উত্তম] অভিমত। তবে ঐ সমস্ত বাক্য যেগুলোতে দোয়ার অর্থ রয়েছে– আল্লাহর বড়ত্বের অর্থ নেই, যেমন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ এ ধরনের বাক্য দ্বারা নামাজ শুরু করা কারো নিকটই জায়েজ নেই।

'হামদ', 'তাসবীহ' ও ভিন্ন ভাষায় তাহরীমা -এর হুকুম : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) 'নূরুল ঈযাহ' প্রণেতার বরাত দিয়ে শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন– اَللّٰهُ اَكْبَرُ -কে আরবি ভিন্ন অন্য ভাষায় বলা, যেমন– বাংলা, উর্দু, ফারসি ও ইংরেজি ইত্যাদি, কিংবা তাসবীহ দ্বারা তাহরীমা বলা, যেমন– সুবহানাল্লাহ, কিংবা হামদ দ্বারা তাহরীমা বলা, যেমন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দ্বারা তাহরীমা বাঁধা মাকরূহ।

তাকবীরে তাহরীমা শর্ত না রুকন : তাকবীরে তাহরীমা নামাজের জন্য শর্ত না রুকন? এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আহনাফের মতে, তাকবীরে তাহরীমা নামাজের জন্য শর্ত; রুকন নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তা নামাজের রুকন। ঐ মতানৈক্যের ফলাফল বের হবে তখন যখন নামাজের এক অংশকে অপর অংশের উপর প্রয়োগ করা হবে। যেমন– কোনো ব্যক্তি ফরজ নামাজ পড়ল এবং সালাম ফিরানো ব্যতীত নফল নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে

গেল এবং নফলের জন্য তাকবীরে তাহরীমা পর্যন্ত করল না, তবে আমাদের নিকট তা জায়েজ আছে। কারণ, আমাদের মতে তা নামাজের জন্য শর্ত। যেমন শর্ত- অজু এবং এক অজু দ্বারা কয়েক নামাজ আদায় করা যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট তা জায়েজ নেই। কারণ, তাঁর মতে তাকবীরে তাহরীমা নামাজের রুকন। তাই এক নামাজের রুকন অন্য নামাজের রুকনের সঙ্গে আদায় হবে না। আর আমাদের মতে জায়েজের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাজ হয়ে যাবে, তবে কারাহাত [মাকরূহ] মুক্ত নয়।

আমাদের মতে তাকবীরে তাহরীমা শর্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى "সে তার প্রভুর নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামাজ আদায় করে।"

وَجْه اِسْتِدْلَال এভাবে যে, এতে আল্লাহ তা'আলা اِسْمُهٗ-এর উপর صَلَاةْ-কে عَطْف করেছেন এবং তাও করেছেন فَاء অক্ষরের মাধ্যমে, যা تَعْقِيْب-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং عَطْف-এর মধ্যে مُغَايِرَة হয়ে থাকে। এর দ্বারা বুঝা গেল, তাহরীমা নামাজের مُغَايِرْ বিষয় এবং নামাজ-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও পরে আসার বিষয়।

قَوْلُهٗ وَالسُّجُوْدُ بِالْجَبْهَةِ وَالْاَنْفِ :

কপাল ও নাক দ্বারা সিজদা করা সুন্নত : বিকায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায়, নাক ও কপাল দ্বারা সিজদা করা ফরজ এবং এরই উপর ফতোয়া। মূলত বিষয়টি এমন নয়। কারণ, আমাদের ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, কোনো ওজর ব্যতীত শুধু নাকের উপর সিজদা করাও জায়েজ। সাহেবাইন (র.) বলেন, শুধু নাকের উপর সিজদা করা জায়েজ নেই এবং শারেহ (র.) বলেন যে, এরই উপর ফতোয়া। তবে শুধু কপালের উপর সিজদা করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। মূলত مُطْلَقْ সিজদা ফরজ। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থতার দরুন সিজদা করতে না পারে তার জন্য হুকুম হলো, যতটুকু সম্ভব সে মাথা জমিনের দিকে ঝুঁকাবে এবং এদিকে লক্ষ্য রাখবে যে, এ প্রক্রিয়ায় সে রুকুর জন্য যে পরিমাণ মাথা ঝুঁকাবে সিজদার জন্য এর চেয়ে বেশি ঝুঁকাবে। এরই উপর ফতোয়া। অতএব, যদি সিজদায় কপাল ও নাক উভয়টি মাটিতে রাখা ফরজ হতো, তবে শুধু মাথা ঝুঁকানোর দ্বারা সিজদা আদায় হতো না। তাই প্রমাণিত হলো যে, কপাল ও নাক উভয়টি দ্বারা সিজদা করা ফরজ নয়; বরং সুন্নত।

قَوْلُهٗ وَالْقَعْدَةُ الْاَخِيْرَةُ الخ : অর্থাৎ শেষ বৈঠক ফরজ এবং তা এ পরিমাণ সময় বসা ফরজ- যেন এতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাশাহহুদ পড়া যায়। কেউ কেউ বলেন যে, এ পরিমাণ সময় বসা ফরজ- যেন এতে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া যায়। তবে প্রথম অভিমতটি বিশুদ্ধ।

قَوْلُهٗ وَالْخُرُوْجُ بِصُنْعِهٖ : অর্থাৎ নামাজি ব্যক্তি স্বীয় নামাজ শেষ করে কোনো কাজের মাধ্যমে নামাজ থেকে বের হওয়া। চাই উক্ত কাজ সালাম হোক, যা ওয়াজিব- কিংবা অন্য মানুষের সঙ্গে কথা বলে, কিংবা হেসে, কিংবা কেঁদে, কিংবা কিছু খেয়ে বা পান করে নামাজ থেকে বের হয়ে আসবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, সালাম ব্যতীত অন্য কোনো কাজের মাধ্যমেও নামাজ থেকে বাইরে আসা যায়, যা নামাজ ভঙ্গকারী হয়। কিন্তু তা করা মাকরূহে তাহরীমী। অর্থাৎ সালাম ব্যতীত অন্য কাজ দ্বারা যদিও নামাজ থেকে বের হওয়া যায় তবুও এমনটি করা মাকরূহে তাহরীমী।

وَ وَاجِبُهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَضَمُّ سُوْرَةٍ وَ رِعَايَةُ التَّرْتِيْبِ فِيْمَا تَكَرَّرَ فِى الْهِدَايَةِ وَمُرَاعَاةُ التَّرْتِيْبِ فِيْمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا مِنَ الْاَفْعَالِ وَ ذُكِرَ فِىْ حَوَاشِى الْهِدَايَةِ نَقْلًا عَنِ الْمَبْسُوْطِ كَالسَّجْدَةِ فَاِنَّهُ لَوْ قَامَ اِلَى الثَّانِيَةِ بَعْدَ مَا سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً قَبْلَ اَنْ يَسْجُدَ الْاُخْرٰى يَقْضِيْهَا وَيَكُوْنُ الْقِيَامُ مُعْتَبَرًا لِاَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ اِلَّا الْوَاجِبَ اَقُوْلُ قَوْلُهُ فِيْمَا تُكَرَّرُ لَيْسَ قَيْدًا يُوْجِبُ نَفْىَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ فَاِنَّ مُرَاعَاةَ التَّرْتِيْبِ فِى الْاَرْكَانِ الَّتِىْ لَا تَتَكَرَّرُ فِىْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ كَالرُّكُوْعِ وَنَحْوِهٖ وَاجِبَةٌ اَيْضًا عَلٰى مَا سَيَاْتِىْ فِىْ بَابِ سُجُوْدِ السَّهْوِ اَنَّ سُجُوْدَ السَّهْوِ يَجِبُ بِتَقْدِيْمِ رُكْنٍ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَ اَوْرَدُوا لِنَظِيْرِ تَقْدِيْمِ الرُّكْنِ الرُّكُوْعِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَسَجْدَةَ السَّهْوِ لَا تَجِبُ اِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ فَعُلِمَ اَنَّ التَّرْتِيْبَ بَيْنَ الرُّكُوْعِ وَالْقِرَاءَةِ وَاجِبٌ مَعَ اَنَّهُمَا غَيْرُ مُكَرَّرٍ فِىْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ قَالَ فِى الذَّخِيْرَةِ اَمَّا تَقْدِيْمُ الرُّكْنِ نَحْوَ اَنْ يَرْكَعَ قَبْلَ اَنْ يَقْرَأَ فَلِاَنَّ مُرَاعَاةَ التَّرْتِيْبِ وَاجِبَةٌ عِنْدَ اَصْحَابِنَا الثَّلٰثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رح) فَاِنَّهَا فَرْضٌ عِنْدَهُ فَعُلِمَ اَنَّ رِعَايَةَ التَّرْتِيْبِ وَاجِبَةٌ مُطْلَقًا فَلَا حَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ فِيْمَا تُكَرَّرُ فَلِهٰذَا لَمْ اَذْكُرْهُ فِى الْمُخْتَصَرِ وَيَخْطُرُ بِبَالِىْ اَنَّ الْمُرَادَ بِمَا تُكَرَّرُ فِى الصَّلٰوةِ اِحْتِرَازًا عَمَّا لَا يُتَكَرَّرُ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِيَّةِ وَهُوَ تَكْبِيْرُ الْاِفْتِتَاحِ وَالْقَعْدَةُ الْاَخِيْرَةُ مِنْ مُرَاعَاةِ التَّرْتِيْبِ فِىْ ذٰلِكَ فَرْضٌ ـ

অনুবাদ : নামাজের ওয়াজিব হচ্ছে সূরা ফাতিহা পড়া, [সূরা ফাতিহার সাথে অন্য] কোনো সূরা মিলানো, একই রাকাতে যা একাধিকবার আসে– সে ক্ষেত্রে তারতীব [ধারাবাহিকতা] রক্ষা করা। হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, নামাজের যে সমস্ত কাজ একাধিকবার আসে– সে ক্ষেত্রে তারতীব [ধারাবাহিকতা] রক্ষা করা। হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, নামাজের যে সমস্ত কাজ একাধিকবার করা শরিয়ত অনুমোদিত হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে তারতীব রক্ষা করা। মাবসূত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে হিদায়া গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ রয়েছে যে, [একাধিকবার করার দৃষ্টান্ত] যেমন– সিজদা। কারণ, যদি কেউ এক সিজদা করে দ্বিতীয় সিজদা করার পূর্বে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তবে দ্বিতীয় সিজদাকে কাজা করতে হবে। দ্বিতীয় রাকাতে তা করা শরিয়তে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সে শুধুমাত্র ওয়াজিবকে বর্জন করেছে। [শারেহ (র.) বলেন] আমি বলি, একাধিকবার করার শর্তটি কোনো কিছুকে বের করার শর্ত নয় যে, অন্য কিছুর ক্ষেত্রে [তারবীব] না হওয়ার হুকুমকে প্রমাণিত করবে। কেননা, ঐ সমস্ত রুকন যা এক রাকাতে একাধিকবার করতে হয় না। যেমন– রুকু ইত্যাদি তবে এতেও তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। যেরূপ সিজদায়ে সাহুর অধ্যায়ে আসবে। কোনো রুকনকে আপন জায়গা থেকে مُقَدَّمْ [পূরবর্তী] করার দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। রুকনকে অগ্রে করার ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়– 'কেরাতের পূর্বে রুকু করাকে।' শুধু ওয়াজিব বর্জন করার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। অতএব বুঝা গেল যে, রুকু এবং কেরাতের মাঝে তারতীব ওয়াজিব। অথচ এগুলো এক রাকাতে একাধিকবার করা হয় না। 'যখীরা' নামক গ্রন্থে [সিজদায়ে সাহুর অধ্যায়ে] বলেন, কিন্তু

রুকনকে مُقَدَّمْ করা। যেমন– রুকুর পূর্বে কেরাত পড়া– তবে এ প্রক্রিয়ায় সিজদায়ে সাহু এজন্য ওয়াজিব হয় যে, আমাদের ইমামত্রয়ের নিকট তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। এতে ইমাম যুফার (র.) মতানৈক্য করেন। কারণ, তাঁর নিকট তারতীব রক্ষা করা ফরজ। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, [কোনো রুকন একাধিকবার করার নিয়ম থাকুক বা না থাকুক] مُطْلَقًا তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। অতএব, একাধিকবার করার কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। এজন্যই মুখতাসারে বিকায়াতে এ শর্ত উল্লেখ করা হয়নি। [শারেহ (র.) বলেন,] আমার অন্তরে একথা উদিত হয়েছে যে, مَا تُكَرَّرُ দ্বারা مَا تُكَرَّرُ فِى الصَّلَاةِ উদ্দেশ্য [مَا تُكَرَّرُ فِىْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ উদ্দেশ্য নয়।] যেন ঐ জিনিস থেকে বিরত থাকা যায়, যা নামাজে ফরজ হিসেবে একাধিকবার করা হয় না। যেমন– সূচনায় তাকবীরে তাহরীমা এবং শেষ বৈঠক। কেননা, এ ক্ষেত্রে তারতীব রক্ষা করা ফরজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَوَاجِبُهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ الخ :

নামাজের ওয়াজিবসমূহ : বিকায়া গ্রন্থকারের ধারা অনুযায়ী আমরা এখানে নামাজের ওয়াজিবসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। ১. সূরা ফাতিহা পড়া, ২. সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো, ৩. তারতীব রক্ষা করা, ৪. প্রথম বৈঠক, ৫. উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া, ৬. সালাম শব্দ দ্বারা নামাজ শেষ করা, ৭. বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়া, ৮. দুই ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা, ৯. ফরজের প্রথম দুই রাকাতকে কেরাতের জন্য নির্ধারণ করা, ১০. তা'দীলে আরকান করা, ১১. জিহরী (جَهْرِىْ) নামাজে কেরাত উঁচু আওয়াজে পড়া এবং সির্‌রী (سِرِّىْ) নামাজে কেরাত মনে মনে পড়া।

ওয়াজিব-এর সংজ্ঞা ও হুকুম : ওয়াজিব বলা হয় ঐ বিধানকে, যা دَلِيْل ظَنِّىْ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তবে তা আমলের ক্ষেত্রে ফরজের বরাবর। কিন্তু ওয়াজিবকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের হবে না। যদি কেউ ভুলে ওয়াজিবকে বর্জন করে তবে তার জন্য সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিবকে বর্জন করে তবে তার নামাজ বাতিল হবে না, কিন্তু নামাজকে দোহরানো আবশ্যক।

নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব : নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল হচ্ছে, রাসূল ﷺ বলেছেন– لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ অর্থাৎ "সূরা ফাতিহা ব্যতীত কোনো নামাজ হয় না।" এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। কিন্তু কোনো কোনো ইমাম উক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পড়াকে ফরজ বলে থাকেন। মূলত বিষয়টি এমন নয়। কারণ, হাদীসে لَائے نَفِى جِنْس টি- نَفْىُ الْكَمَالِ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সূরা ফাতিহা না পড়লে নামাজ পরিপূর্ণ হবে না, কিন্তু একেবারে নামাজই হবে না– সে অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়।

সূরা ফাতিহা-এর সাথে অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) লেখেন, সূরা ফাতিহার সাথে অন্য যে কোনো সূরা মিলানো ওয়াজিব। তবে উক্ত সূরা ছোট তিন আয়াত বরাবর হতে হবে। কিন্তু যদি এক আয়াত কিংবা দুই আয়াত হয় তবে তা ছোট তিন আয়াতের বরাবর হলে যথেষ্ট হবে।

তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এক রাকাতের মাঝে যে সমস্ত রুকন একাধিকবার করার বিধান রয়েছে সেসব রুকনের ক্ষেত্রে তারতীব [ধারাবাহিকতা] রক্ষা করা ওয়াজিব। কিন্তু শারেহ (র.) বলেন, এক রাকাতের মধ্যে যেসব রুকন একাধিকবার করার নিয়ম রয়েছে সে সবের ক্ষেত্রে তো তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব আছেই, তবে অন্যান্য রুকন যেগুলো এক রাকাতে تَكْرَارْ হয়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রেও তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। এমনকি ইমাম যুফার (র.)-এর মতে সে ক্ষেত্রে তারতীব রক্ষা করা বরং ফরজ। তাই তিনি বলেন, যেসব রুকন এক রাকাতে تَكْرَارْ হয়েছে সেসবের ক্ষেত্রে তারতীব রক্ষা করাকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই; বরং বলা দরকার مُطْلَقًا তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব।

قَوْلُهُ وَيَخْطُرُ بِبَالِىْ اَنَّ الْمُرَادَ الخ : ইতঃপূর্বে শারেহ (র.) বলেছেন যে, مُطْلَقًا নামাজে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব; শুধু যেসব রুকন تَكْرَارْ হয়েছে, সেসবের ক্ষেত্রে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব– এমনটি নয়। তাই গ্রন্থকারের فِيْمَا تُكَرَّرُ বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এখানে শারেহ (র.) বলেছেন যে, আমার অন্তরে একটি বিষয় উদিত হয়েছে যে, فِيْمَا تُكَرَّرُ – قَيْد-এর মাধ্যমে গ্রন্থকার ঐ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যেসব রুকন এক রাকাতে ওয়াজিব হিসেবে تَكْرَارْ হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব এবং اِحْتِرَازْ করেছেন ঐসব রুকন থেকে, যেগুলো এক রাকাতে ফরজ হিসেবে تَكْرَارْ হয়নি। কারণ, সে ক্ষেত্রে তারতীব রক্ষা করা শুধু ওয়াজিবই নয়; বরং ফরজ।

وَالْقَعْدَةُ الْاُوْلٰى وَالتَّشَهُّدَانِ ذُكِرَ فِى الذَّخِيْرَةِ اَنَّ الْقَعْدَةَ الْاُوْلٰى سُنَّةٌ وَالثَّانِيَةُ وَاجِبَةٌ وَفِى الْهِدَايَةِ اَنَّ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ فِى الْقَعْدَةِ الْاُوْلٰى سُنَّةٌ وَفِى الثَّانِيَةِ وَاجِبَةٌ لٰكِنَّ الْمُصَنِّفَ (رحـ) لَمْ يَأْخُذْ بِهٰذَا لِاَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ قُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ لَا يُوْجِبُ الْفَرْقَ فِىْ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ فِى الْاُوْلٰى وَالثَّانِيَةِ بَلْ يُوْجِبُ الْوُجُوْبَ فِىْ كِلَيْهِمَا وَلَمَّا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ فِى الْقَعْدَةِ الْاُوْلٰى وَاجِبَةً كَانَتِ الْقَعْدَةُ الْاُوْلٰى اَيْضًا وَاجِبَةً لَا سُنَّةً وَلَفْظُ السَّلَامِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فَاِنَّهُ فَرْضٌ عِنْدَهُ ـ

অনুবাদ : প্রথম বৈঠক এবং উভয় তাশাহহুদ [ওয়াজিব]। 'যখীরা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রথম বৈঠক সুন্নত এবং দ্বিতীয় বৈঠক ওয়াজিব। হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া সুন্নত এবং দ্বিতীয় বৈঠকে ওয়াজিব। কিন্তু [বিকায়া] গ্রন্থকার এসব অভিমত উল্লেখ করেননি। কেনন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-কে বলেছেন- قُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি শেষ পর্যন্ত পড়।" [অতএব, নবী ﷺ-এর এ কথা বলা] প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার মাঝে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না; বরং উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। যখন প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব হলো তখন প্রথম বৈঠকও ওয়াজিব হবে; সুন্নত নয়। সালাম শব্দ বলা [ওয়াজিব]। ইমাম শাফেয়ী (র.) এতে মতানৈক্য করেন। কেননা, তাঁর নিকট সালাম শব্দ বলা ফরজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْقَعْدَةُ الْاُوْلٰى وَالتَّشَهُّدَانِ الخ :

প্রথম বৈঠক দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী (র.) শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, প্রথম বৈঠক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যা শেষ বৈঠক নয়। কারণ, কখনো কখনো বৈঠক দুই -এর চেয়ে অধিক হয়ে থাকে। যেমন- চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজে কেউ তিন রাকাত পায়নি, তবে তার বৈঠক হবে তিনটি। অনুরূপ তিন রাকাতবিশিষ্ট নামাজে যে দুই রাকাত পায়নি, তার বৈঠকও হবে তিনটি। অনুরূপ আর একটি সুরত হচ্ছে, যাতে বৈঠক হয় চারটি। যেমন- তিন রাকাতবিশিষ্ট নামাজে যে ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকাতের সিজদায় শরিক হয় তার বৈঠক হয় চারটি, তবে এ সমস্ত সুরতে শুধু শেষ বৈঠক ফরজ এবং বাকি সব ওয়াজিব।

প্রথম বৈঠক ওয়াজিব; সুন্নত নয় : শারেহ (র.) লেখেন, 'যখীরা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রথম বৈঠক সুন্নত এবং দ্বিতীয় বৈঠক ওয়াজিব। এটি মূলত ইমাম কারখী (র.) ও তাহাবী (র.)-এর অভিমত। অন্যথায় বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, প্রথম বৈঠক ওয়াজিব এবং শেষ বৈঠক ফরজ। বাদায়িউস সানায়ে' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, আমাদের অধিকাংশ মাশায়িখে কেরাম প্রথম বৈঠককে সুন্নত বলেছেন। কারণ, فِعْلًا [কার্যকরীভাবে]-এর وُجُوْب সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিংবা সুন্নত অর্থ- সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ এবং সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ অর্থ- ওয়াজিব এবং ওয়াজিব অর্থ- ফরজ।

قَوْلُهُ وَفِى الْهِدَايَةِ اَنَّ قِرَاءَةَ : আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন "হিদায়া গ্রন্থের কোথাও একথা উল্লেখ নেই যে, প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া সুন্নত; বরং হিদায়ায় সিজদায়ে সাহু -এর অধ্যায়েই এর وُجُوْب প্রমাণ করা হয়েছে।"

قَوْلُهُ يُوْجِبُ الْوُجُوْبَ فِيْ كِلَيْهِمَا : বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ প্রত্যেক বৈঠকে আত্‌তাহিয়্যাতু পড়ার নির্দেশ দিতেন। এটি এ কথার উপর স্পষ্ট দলিল যে, প্রত্যেক বৈঠকে আততাহিয়্যাতু পড়া ওয়াজিব, কিন্তু এর উপর একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন হুজুর ﷺ তাশাহহুদ পড়ার জন্য বারবার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন বুঝা যায় তাশাহহুদ পড়া ফরজ। এর উত্তর হচ্ছে, তাশাহহুদের হাদীস হলো খবরে ওয়াহেদ, আর খবরে ওয়াহেদ (خَبَر وَاحِدٌ) দ্বারা ফরজ প্রমাণিত হয় না।

قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ فِي الْقَعْدَةِ الخ : এটি প্রথম বৈঠক ওয়াজিব হওয়ার উপর একটি দলিল। কারণ, যা ব্যতীত ওয়াজিব পরিপূর্ণ হয় না– তা কমপক্ষে ওয়াজিব হয়ে থাকে। যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, শেষ বৈঠকও ওয়াজিব হওয়া চাই। কারণ, এতে তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব। এর উত্তর হচ্ছে, কখনো নয়। কেননা, যা ব্যতীত ওয়াজিব পরিপূর্ণ হয় না– তার জন্য আবশ্যক হলো, তা ওয়াজিব থেকে কম না হতে হবে। এটি আবশ্যক নয় যে, তা সর্ব দিক থেকে বরাবর হতে হবে। এখন যদি কোনো দলিল দ্বারা তাশাহহুদ পড়ার فَرْضِيَّة প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে উদ্দেশ্যের জন্য তা দোষের কিছু নয়।

এখন যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, প্রথম বৈঠকও ফরজ হওয়া চাই, তবে এর উত্তর হচ্ছে, যদি সুনানের কিতাবসমূহে উক্ত হাদীস বর্ণনা না করা হতো তবে আমরা তা ফরজ হওয়ার হুকুম দিয়ে দিতাম। হাদীস হলো, রাসূল ﷺ দুই রাকাতের পর বসেননি; বরং দাঁড়িয়ে গেছেন এবং তিনি সিজদায়ে সাহু করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া ফরজ নয় এবং স্বয়ং প্রথম বৈঠকও ফরজ নয়। অন্যথায় নবী ﷺ সিজদায়ে সাহু না করে নামাজ দোহরাতেন।

قَوْلُهُ وَلَفْظُ السَّلَامِ الخ :

সালাম শব্দ দ্বারা নামাজ শেষ করা ওয়াজিব : সালাম শব্দ দ্বারা নামাজ শেষ করা ওয়াজিব, নাকি ফরজ? এ সম্পর্কে আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আহনাফ বলেন, সালাম শব্দ বলে নামাজ শেষ করা ওয়াজিব; ফরজ নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সালাম শব্দ বলে নামাজ শেষ করা ফরজ।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : আমাদের দলিল হচ্ছে ঐ হাদীস, যাতে রাসূল ﷺ বলেছেন– "যখন ইমাম শেষ বৈঠক করবে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে তার حَدَثٌ [হদস] যুক্ত হবে তখন তার নামাজ হয়ে যাবে এবং তার মুক্তাদীর নামাজও হয়ে যাবে যারা নামাজ পরিপূর্ণ করেছে।" –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও তাহাবী শরীফ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়– স্বীয় কর্মের মাধ্যমে নামাজ থেকে বের হওয়া ফরজ। কেননা, যদি শব্দটি বলা ফরজ হতো তবে নবী ﷺ এভাবে সালাম শব্দ ব্যতীত নামাজ পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার হুকুম দিতেন না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন–

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

অর্থাৎ "নামাজের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা, এর হারামকারী হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা এবং এর হালালকারী হচ্ছে সালাম শব্দ বলে সালাম ফিরানো।"

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত হাদীসে تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ বলা হয়েছে। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সালাম শব্দ দ্বারা নামাজ শেষ করলে তার অন্যান্য কাজ হালাল হবে। অতএব, তা সালাম শব্দটি ফরজ হওয়ার উপরই বুঝায়।

وَقُنُوْتُ الْوِتْرِ وَتَكْبِيْرَاتُ الْعِيْدَيْنِ وَتَعْيِيْنُ الْأُوْلَيَيْنِ لِلْقِرَاءَةِ وَتَعْدِيْلُ الْأَرْكَانِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) وَأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) فَإِنَّهُ فَرْضٌ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الْاِطْمِيْنَانُ فِي الرُّكُوْعِ وَكَذَا فِي السُّجُوْدِ وَقُدِّرَ بِمِقْدَارِ تَسْبِيْحَةٍ وَكَذَا الْاِطْمِيْنَانُ بَيْنَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالْجَهْرُ وَالْاِخْفَاءُ فِيْمَا يُجْهَرُ وَيُخْفٰى وَسُنَّ غَيْرُهُمَا أَوْ نُدِبَ أَيْ مَا عَدَا الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ إِمَّا سُنَّةٌ أَوْ مَنْدُوْبٌ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ عَلٰى مَا عُرِفَ فِيْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ فَعِنْدَهُ أَفْعَالُ الصَّلٰوةِ إِمَّا فَرَائِضُ أَوْ سُنَنٌ أَوْ مُسْتَحَبَّاتٌ.

অনুবাদ : বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়া [ওয়াজিব], দুই ঈদের নামাজের তাকবীরসমূহ, প্রথম দুই রাকাতকে কেরাতের জন্য নির্ধারণ করা ও তা'দীলে আরকান। এতে [তা'দীলে আরকান-এর ক্ষেত্রে] ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা, তাঁদের নিকট তা'দীলে আরকান ফরজ। আর তা'দীলে আরকান হচ্ছে, রুকু-সিজদায়, রুকু-সিজদার মধ্যখানে এবং দুই সিজদার মধ্যখানে [তাড়াহুড়া না করা, বরং] এক তাসবীহ পরিমাণ সময় প্রশান্তির সাথে অবস্থান করা। উঁচু আওয়াজের কেরাতের নামাজে উঁচু আওয়াজে কেরাত পড়া এবং আওয়াজহীন কেরাতের নামাজে আওয়াজহীন কেরাত পড়া। পূর্বোল্লিখিত ফরজ ও ওয়াজিব ব্যতীত বাকি সব সুন্নত কিংবা মোস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট ফরজ এবং ওয়াজিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, যা উসূলুল ফিকহ-এর ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ কথা। অতএব, তাঁর নিকট নামাজের সমস্ত কার্যসমূহ ফরজ কিংবা সুন্নত কিংবা মোস্তাহাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقُنُوْتُ الْوِتْرِ :

কুনূত-এর মর্ম : কুনূত শব্দের অর্থ– অনুগত। যে-কোনো দোয়াকে শরিয়তের পরিভাষায় কুনূত বলা হয়। এখানেও কুনূত বলতে যে-কোনো দোয়াই উদ্দেশ্য। ঐ নির্দিষ্ট দোয়া কুনূত– (اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ الخ) যা আমরা সাধারণত পড়ে থাকি সেটি এখানে উদ্দেশ্য নয়। হ্যাঁ, এটিও একটি দোয়া হিসেবে উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, বিতরের তৃতীয় রাকাতে مُطْلَقًا দোয়া পড়া ওয়াজিব।

قَوْلُهُ وَتَكْبِيْرَاتُ الْعِيْدَيْنِ :

দুই ঈদের তাকবীরসমূহ : দুই ঈদের দুই রাকাত নামাজে ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর বলা ওয়াজিব। প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পরে রুকুর পূর্বে তিন তাকবীর। তন্মধ্যে প্রত্যেক তাকবীরই ওয়াজিব। যদি কারো কোনো একটি তাকবীরও ছুটে যায় তবে তার উপর সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَتَعْيِيْنُ الْأُوْلَيَيْنِ لِلْقِرَاءَةِ :

প্রথম দুই রাকাতকে কেরাতের জন্য নির্ধারণ করা ওয়াজিব : তিন কিংবা চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতকে কেরাতের জন্য নির্ধারণ করা ওয়াজিব। আর যদি দুই রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ হয় তবে উভয় রাকাতে কেরাত পড়া ফরজ। অনুরূপ সমস্ত সুন্নত ও নফল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে কেরাত পড়া ফরজ। চাই চার রাকাতবিশিষ্ট হোক কিংবা দুই রাকাতবিশিষ্ট হোক। যদি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের প্রথম দুই রাকাতে কেরাত পড়া ছেড়ে দেয় এবং শেষ দুই রাকাতে

পড়ে তবে তার নামাজ হয়ে যাবে। কিন্তু তার উপর সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে।

قَوْلُهُ وَتَعْدِيْلُ الْاَرْكَانِ :

তা'দীলে আরকানের মাসআলা : নামাজে তা'দীলে আরকান ওয়াজিব না ফরজ? এ ব্যাপারে আহনাফ এবং ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, নামাজে তা'দীলে আরকান ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ও আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, নামাজে তা'দীলে আরকান ফরজ।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম আবূ ইউসুফ ও শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, এক সাহাবী তাড়াতাড়ি করে নামাজ পড়ছিলেন, রাসূল ﷺ তাকে বললেন- قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "তুমি দাঁড়াও এবং নামাজ পড়। কেননা তুমি নামাজ পড়নি।"

-[বুখারী, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত সাহাবী নামাজে তা'দীলে আরকান না করার দরুন রাসূল ﷺ তাকে বলেছেন যে, তুমি নামাজই পড়নি, তাই তুমি আবার নামাজ পড়। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নামাজে তা'দীলে আরকান ফরজ।

ওলামায়ে আহনাফের দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا

অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকু এবং সিজদা কর।" এখানে রুকু ও সিজদার ক্ষেত্রে اَمْر مُطْلَقْ শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাই এর দ্বারা اَدْنٰى فَرْد-ই শুধু ফরজ হবে।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.) যে হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন তা একটি خَبَر وَاحِدْ মাত্র। আর এর দ্বারা শুধু ওয়াজিব প্রমাণিত হয়; ফরজ প্রমাণিত হয় না।

তা'দীলে আরকান -এর মর্ম : শারেহ (র.) তা'দীলে আরকান -এর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন-

هُوَ الْاِطْمِيْنَانُ فِى الرُّكُوْعِ وَكَذَا فِى السُّجُوْدِ وَقُدِّرَ بِمِقْدَارِ تَسْبِيْحَةٍ وَكَذَا الْاِطْمِيْنَانُ بَيْنَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

অর্থাৎ "রুকু-সিজদায়, রুকু-সিজদার মধ্যখানে এবং দুই সিজদার মধ্যখানে তাড়াতাড়ি না করে কমপক্ষে একবার তসবিহ পরিমাণ اِطْمِيْنَانْ-এর সাথে অবস্থান করা।"

এক তসবিহের চেয়ে বেশি পরিমাণ সময় অবস্থান করা মোস্তাহাব, আর এক তসবিহ পরিমাণ অবস্থান করা ওয়াজিব।

কওমা ও জলসায় অবস্থান করা ওয়াজিব : কওমা বলা হয়, রুকু থেকে উঠে সোজা দাঁড়ানোকে, আর জলসা বলা হয়- দুই সিজদার মধ্যখানে বসাকে। উক্ত কওমা ও জলসায়ও اِطْمِيْنَانْ-এর সাথে দাঁড়ানো এবং বসা ওয়াজিব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, কওমা এবং জলসা সর্বসম্মতিক্রমে নামাজের রুকন নয়; তবে কিভাবে এতে তা'দীল ওয়াজিব হয়? এর উত্তর হচ্ছে, নামাজের রুকুন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- যা নামাজের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে। ঐ কার্য উদ্দেশ্য নয় যা বর্জন করার দ্বারা নামাজ বাতিল হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত কওমায় رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ কিংবা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ অন্য বর্ণনায়- اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا পড়া সুন্নত। অনুরূপ জলসায় رَبِّ اغْفِرْلِىْ কিংবা رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَارْزُقْنِىْ পড়া সুন্নত। তাই যদি কেউ কওমা ও জলসায় বসে উক্ত দোয়া পড়ে তবে তার اِطْمِيْنَانْ-এর সাথে বসাও হয়ে যাবে এবং দোয়াও পড়া হয়ে যাবে, যার দ্বারা ছওয়াবও হবে।

বিধানের স্তর চারটি- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, পুণ্যের দিক থেকে বিধানের স্তর মোট চারটি- ১. ফরজ, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নত এবং ৪. মোস্তাহাব। অর্থাৎ আহনাফ ফরজের পর ওয়াজিবের একটি স্তর সাব্যস্ত করেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) পুণ্যের দিক থেকে বিধানের স্তর তিনটি সাব্যস্ত করেন- ১. ফরজ, ২. সুন্নত, ৩. মোস্তাহাব। অর্থাৎ তিনি ওয়াজিব পর্যায়ের কোনো স্তর সাব্যস্ত করেন না। তিনি বলেন- ওয়াজিব এবং ফরজ একই স্তরের।

فَاِذَا اَرَادَ الشُّرُوْعَ كَبَّرَ حَاذِفًا بَعْدَ رَفْعِ يَدَيْهِ اَلْمُرَادُ بِالْحَذْفِ اَنْ لَا يَأْتِىَ بِالْمَدِّ فِىْ هَمْزَةِ اَللّٰهُ وَلَا فِىْ بَاءِ اَكْبَرُ غَيْرَ مُفَرِّجٍ اَصَابِعَهُ وَلَا ضَامٍّ بَلْ يَتْرُكُهَا عَلٰى حَالِهَا مَاسًّا بِاِبْهَامَيْهِ شَحْمَتَىْ اُذُنَيْهِ وَالْمَرْأَةُ تَرْفَعُ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا فَاِنْ اَبْدَلَ التَّكْبِيْرَ بِاللّٰهُ اَجَلُّ اَوْ اَعْظَمُ اَوِ الرَّحْمٰنُ اَكْبَرُ اَوْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ اَوْ قَرَأَ بِهَا بِعُذْرٍ اَوْ ذَبَحَ وَسَمّٰى بِهَا جَازَ وَبِاللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ لَا فَالْحَاصِلُ اَنَّهُ يَجُوْزُ اَنْ يُبَدِّلَ بِذِكْرٍ مَا يَدُلُّ عَلٰى مُجَرَّدِ التَّعْظِيْمِ وَلَا يَشُوْبُ بِالدُّعَاءِ ـ

অনুবাদ : যখন নামাজ শুরু করার ইচ্ছা করবে তখন হাত উঠানোর পর হাযাফ করার সাথে আল্লাহু আকবার বলবে। হাযাফ (حَذْف) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহু (اَللّٰهُ) শব্দের هَمْزَه -তে এবং আকবার (اَكْبَرُ) শব্দের بَاء -তে মদ্দ না করা। এমতাবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলো পরিপূর্ণ ফাঁকা রাখবে না এবং মিলিতও রাখবে না; বরং আঙ্গুলগুলোকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেবে। এমতাবস্থায় উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা উভয় কানের লতিকে স্পর্শ করবে। মহিলা [উভয় হাতকে] কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। যদি কেউ 'আল্লাহু আকবার'-কে আল্লাহু আজাল (اَللّٰهُ اَجَلُّ) (اَللّٰهُ اَعْظَمُ) কিংবা اَلرَّحْمٰنُ اَكْبَرُ কিংবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কিংবা [আরবি ভাষাকে] ভিন্ন ভাষায় পরিবর্তন করে কিংবা ওজরের কারণে ফারসি ভাষায় কেরাত পড়ে কিংবা জবাই করার সময় ফারসি ভাষায় বিসমিল্লাহ বলে তবে তা জায়েজ। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ শব্দ দ্বারা [তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা] জায়েজ নেই। সারকথা হচ্ছে, তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে اَللّٰهُ শব্দকে এমন শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েজ আছে; যা শুধু আল্লাহর বড়ত্বের উপর বুঝায়, যা দোয়ার সাথে মিশ্রিত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِذَا اَرَادَ الشُّرُوْعَ الخ : যখন নামাজ শুরু করার ইচ্ছা করবে তখন কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকবার বলবে। এটি তখন, যখন নামাজি ব্যক্তি মুনফারিদ [একাকী] কিংবা ইমাম হবে। পক্ষান্তরে যদি নামাজি ব্যক্তি মুক্তাদী হয় তবে ইমামের তাকবীরের অপেক্ষা করবে। এ প্রক্রিয়ায় উত্তম হচ্ছে, ইমামের তাকবীরের পর সাথে সাথে মুক্তাদীর তাকবীর বলা। ইমামের তাকবীরের পর মুক্তাদী যে পরিমাণ বিলম্ব করবে সে পরিমাণ তার ছওয়াব হ্রাস পেতে থাকবে। যদি মুক্তাদী ইমামের সাথে সাথে তাকবীর বলে তবুও জায়েজ। কিন্তু যদি ইমামের পূর্বে তাকবীর বলে তবে তার ইকতেদা সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ بَعْدَ رَفْعِ يَدَيْهِ : অর্থাৎ হাত উঠানোর পর আল্লাহু আকবার বলা ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমতের একটি। হিদায়া গ্রন্থে উক্ত অভিমতকে বিশুদ্ধ অভিমত বলা হয়েছে। মাবসূত নামক গ্রন্থে উক্ত অভিমতকে হানাফী ফকীহদের দিকে নিসবত করা হয়েছে। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) লেখেন, উক্ত পদ্ধতি রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে, যা হযরত আবূ হুমাইদ আস-সায়িদী (রা.) থেকে ইমাম বুখারী, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ (র.) বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে, হাত উঠানো এবং তাকবীর বলা একসঙ্গে হবে। ইমাম কুদূরী ও কাজী খান (র.) এ মতটিকেই উত্তম বলেছেন। এ পদ্ধতিও এক বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে। তৃতীয় অভিমত হচ্ছে, প্রথমে তাকবীর বলা অতঃপর হাত উঠানো। এ পদ্ধতিও রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে। কিন্তু প্রথম অভিমতটি হচ্ছে উত্তম।

قَوْلُهُ اَلْمُرَادُ بِالْحَذْفِ اَنْ لَا يَأْتِيَ الخ : অর্থাৎ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -এর اَللّٰهُ শব্দের اَلِفْ -কে মদ্দ -এর সাথে اَللّٰهُ পড়বে না। কারণ, তখন দুই হামযা হয়ে যাবে। তন্মধ্যে প্রথম হামযাটি হবে اِسْتِفْهَامْ [প্রশ্ন] -এর অর্থের জন্য। তখন অর্থ হবে– "আল্লাহ কি সবচেয়ে বড়? সুস্পষ্ট যে, এর দ্বারা আল্লাহর বড়ত্বকে একদিক; বরং এর দ্বারা আল্লাহর বড়ত্বের উপর সন্দেহ প্রকাশ পায়, যা পরিষ্কার কুফরি। অনুরূপ اَكْبَرُ শব্দের بَاء অক্ষরেও মদ্দ করবে না। কারণ, মদ্দ-এর সাথে اَكْبَارُ বলার দ্বারা তা শয়তানের নাম হয়ে যায়। যার মর্ম হয়, আল্লাহ শয়তান। নাঊযুবিল্লাহ! তাই এ স্থানে অত্যন্ত সর্তক থাকা আবশ্যক।

قَوْلُهُ غَيْرَ مُفَرِّجٍ اَصَابِعَهُ الخ : অর্থাৎ হাত উঠানোর সময় আঙ্গুলগুলো পুরো খোলাও রাখবে না এবং পুরো মিলানোও রাখবে না; বরং সেগুলোকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হযরত ইবনে হিব্বান (র.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ নামাজে স্বীয় আঙ্গুল খুলে রাখতেন। মোল্লা আলী কারী (র.) মিরকাত -এর মধ্যে লেখেন– বৈঠকে হাত হাঁটুর উপর রাখার অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় আঙ্গুলসমূহ খোলা রাখা মোস্তাহাব নয়। সিজদার অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা মোস্তাহাব নয়। এ দুই [সিজদা ও বৈঠক] অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেবে।

قَوْلُهُ مَاسًّا بِاِبْهَامَيْهِ الخ : অর্থাৎ তখন উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা উভয় কানের লতিকে স্পর্শ করবে। হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, উভয় হাতকে এ পরিমাণ উঠাবে যে, হাতের আঙ্গুল এবং কানের লতি যেন বরাবর হয়। আমাদের অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। হিদায়া প্রণেতা "মুখতারাতুন নাওয়াযিল" নামক গ্রন্থে এবং অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, কানের লতি স্পর্শ করতে হবে। বিকায়া গ্রন্থকার (র.)ও তাদেরই অনুসরণ করেছেন। তবে এটি সুন্নত নয় এবং তা সুন্নত হওয়ার কোনো দলিলও নেই। তবে কেউ কেউ একে মোস্তাহাব বলেছেন সম্ভবত এর কারণ এই যে, এতটুকু পরিমাণ হাত উঠার দ্বারা হাত উঠার ব্যাপারে পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়ে যায়।

কানের লতি স্পর্শ করা জরুরি নয় এজন্য যে, রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে, তিনি হাত কানের লতি বরাবর উঠাতেন। আবার উভয় হাতকে কাঁধ পর্যন্ত উঠানোও তাঁর থেকে প্রমাণিত আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এটিই গ্রহণ করেন।

قَوْلُهُ وَالْمَرْأَةُ تَرْفَعُ حِذَاءَ الخ : অর্থাৎ মহিলারা কান পর্যন্ত হাত উঠাবে না; বরং কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। মহিলা চাই স্বাধীন হোক কিংবা দাসী হোক উভয়ের হুকুম এক তবে একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মহিলারাও পুরুষের ন্যায় কান পর্যন্ত হাত উঠাবে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হচ্ছে– তারা কাঁধ পর্যন্তই হাত উঠাবে। কারণ, এতে সতর অধিক ঢাকা হয়।

قَوْلُهُ اَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ : এ স্থানে যদি بِالْفَارِسِيَّةِ না বলে بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ বলতেন অনেক উত্তম হতো। কারণ, এ হুকুম শুধু ফারসি ভাষার সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং এটি আরবি ছাড়া যে-কোনো ভাষা হতে পারে। আরবি ছাড়া অন্য যে-কোনো ভাষায়ও তাকবীর বলা এবং কেরাত পড়া ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিকট জায়েজ। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে তা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ اَوْ قَرَأَ بِهَا بِعُذْرٍ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি আরবি ভাষায় কুরআন মাজীদ পড়তে অক্ষম হয় ফলে বাংলায় পাঠ করে, তবে তা ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর নিকট জায়েজ। কারণ, কুরআন যদিও مَعْنٰى এবং اَلْفَاظْ -এর নাম, কিন্তু এটিও সহীহ যে, এক হিসেবে এর مَعْنٰى ও কুরআন; বরং اَلْفَاظْ -এর তুলনায় مَعْنٰى অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখন যদি কেউ বাস্তবেই কুরআন পড়তে অক্ষম হয় এবং কুরআনের اَلْفَاظْ উচ্চারণ করতে না পারে তবে সে তখন এক হিসেবেই কুরআন পড়বে তথা مَعْنٰى পড়বে। কেননা, সাধ্য অনুযায়ীই হুকুম বর্তায়। একথা প্রসিদ্ধ যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট আরবিতে কিরাত পড়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনারবী ভাষায় কিরাত পড়া জায়েজ। কিন্তু তিনি এর থেকে ফিরে [رُجُوْع করে] এসেছেন। অর্থাৎ এখন তাঁর নিকটও আরবির উপর সামর্থ্য থাকাবস্থায় অনারবি ভাষায় কেরাত পড়া জায়েজ নেই।

অনুরূপ জবাই করার সময় অনারবি ভাষায় বিসমিল্লাহ কিংবা নামাজে অনারবি ভাষায় তাশাহহুদ পড়া ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিকট জায়েজ, তবে মাকরূহ। সাহেবাইন (র.)-এর নিকট আরবির উপর সক্ষম ব্যক্তির জন্য তা জায়েজ নেই।

وَيَضَعُ يَمِيْنَهُ عَلٰى شِمَالِهٖ تَحْتَ سُرَّتِهٖ كَالْقُنُوْتِ وَصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ وَيُرْسِلُ فِيْ قَوْمَةِ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ فَالْحَاصِلُ اَنَّ كُلَّ قِيَامٍ فِيْهِ ذِكْرٌ مَسْنُوْنٌ فَفِيْهِ الْوَضْعُ وَكُلُّ قِيَامٍ لَيْسَ كَذَا فَفِيْهِ الْاِرْسَالُ ثُمَّ يَثْنِيْ وَلَا يُوَجِّهُ اَرَادَ بِالثَّنَاءِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَالتَّوْجِيْهِ قِرَاءَةُ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ الْاٰيَةَ بَعْدَ التَّحْرِيْمَةِ وَيَتَعَوَّذُ لِلْقِرَاءَةِ لَا لِلثَّنَاءِ اَلْمُخْتَارُ اَنَّ التَّعَوُّذَ تَبْعٌ لِلْقِرَاءَةِ لَا تَبْعٌ لِلثَّنَاءِ فَيَقُوْلُهُ الْمَسْبُوْقُ لَا الْمُؤْتَمُّ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ الْمَسْبُوْقَ يَقْرَأُ وَلَا يَثْنِيْ فَيَتَعَوَّذُ وَالْمُؤْتَمُّ يَثْنِيْ وَلَا يَقْرَأُ فَلَا يَتَعَوَّذُ وَاَمَّا مَنْ جَعَلَهُ تَبْعًا لِلثَّنَاءِ فَالْحُكْمُ عِنْدَهُ عَلٰى عَكْسِ مَا ذُكِرَ وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ لِاَنَّ التَّكْبِيْرَاتِ بَعْدَ الثَّنَاءِ فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ التَّعَوُّذُ مُتَّصِلًا بِالْقِرَاءَةِ لَا بِالثَّنَاءِ ـ

অনুবাদ : ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে নাভির নীচে রাখবে। যেরূপ দোয়া কুনূত এবং জানাজা নামাজে রাখা হয় এবং কওমায় [রুকু থেকে দাঁড়িয়ে] ও দুই ঈদের তাকবীরে উভয় হাত ছেড়ে দেবে। সারকথা হচ্ছে, প্রত্যেক এমন দাঁড়ানো (قِيَامْ) যাতে জিকির সুন্নত তাতে এক হাতকে অপর হাতের উপর রাখবে। আর প্রত্যেক ঐ দাঁড়ানো (قِيَامْ) যা এমন নয় তাতে হাত ছেড়ে দেবে। অতঃপর ছানা পড়বে এবং ইন্নী ওয়াজ্জাহতু পড়বে না। ছানা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা শেষ পর্যন্ত পড়া। আর তাওজীহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী শেষ পর্যন্ত তাকবীরে তাহরীমার পরে পড়া। কেরাত পড়ার জন্য আউযুবিল্লাহ পড়বে; ছানার জন্য নয়। উত্তম হচ্ছে, আউযুবিল্লাহ কেরাতের অনুগামী; ছানার অনুগামী নয়। তাই মাসবূক ব্যক্তি তা পড়বে; শুরু থেকে নামাজে শরিক হওয়া ব্যক্তি তা পড়বে না। এ ভিত্তিতে যে, মাসবূক কেরাত পড়ে; কিন্তু ছানা পড়ে না। অতএব, সে কেরাত পড়ার সময় আউযুবিল্লাহ পড়বে। শুরু থেকে ইমামের সাথে নামাজে শরিক হওয়া ব্যক্তি ছানা পড়ে, কিন্তু কিরাত পড়ে না। তাই সে আউযুবিল্লাহও বলবে না। যে ব্যক্তি আউযুবিল্লাহকে ছানার অনুগামী বানাবে, তার নিকট হুকুম উল্লিখিত হুকুমের পরিপন্থি হবে। দুই ঈদের তাকবীরসমূহের পরে আউযুবিল্লাহ পড়বে। কেননা, তাকবীর বলা হয় ছানার পরে। তাই আউযুবিল্লাহ কেরাতের সাথে হওয়া উপযোগী; ছানার সাথে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَضَعُ يَمِيْنَهُ عَلٰى الخ : এক বর্ণনায় আছে– রাসূল ﷺ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখেছেন। –[আবূ দাউদ, ইবনে হিব্বান]

এক বর্ণনায় আছে– রাসূল ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে ধরেছেন। –[নাসায়ী শরীফ]

অতএব, কোনো কোনো ফকীহ এসব বর্ণনার উপর একত্রে আমল করার প্রক্রিয়া বের করেছেন যে, ডান হাতের তালুর ভিতরের অংশ বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখবে এবং ডান হাতের কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরবে। আহনাফের নিকট এ পদ্ধতিরই প্রচলন রয়েছে।

قَوْلُهُ تَحْتَ سُرَّتِهِ : অর্থাৎ নামাজে নাভির নীচে হাত বাঁধা সুন্নত। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "রাসূল ﷺ নাভির নীচে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখেছেন।" –[ইবনে আবী শইবা] তবে সহীহ সনদসহ রাসূল ﷺ থেকে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, তিনি নাভির উপর বক্ষের নিকট হাত রেখেছেন। –[আহমদ ইবনে খুযাইমা]

ইমাম শাফেয়ী (র.) এ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন, নামাজে হাত নাভির উপরে বাঁধবে। আহনাফ উক্ত হাদীসকে মহিলাদের উপর প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, মহিলারা হাত নাভির উপরে বক্ষের নিকটে বাঁধবে। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

قَوْلُهُ اَنَّ كُلَّ قِيَامٍ فِيْهِ ذِكْرٌ مَسْنُوْنٌ الخ : এ বাক্যে مَسْنُوْن শব্দটি مَشْرُوْع -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যথায় এ مَسْنُوْن শব্দের قَيْد দ্বারা قِيَام -এর ফরজ তথা কেরাত এবং قِيَام -এর ওয়াজিব তথা সূরা ফাতিহা ও এর সঙ্গে অন্য সূরা মিলানো قِيَامْ থেকে বাদ পড়ে যায়। তাই তা مَشْرُوْع -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেন এতে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব শামিল থাকে। অনুরূপ উক্ত জিকির দ্বারা ذِكْر طَوِيْل উদ্দেশ্য, অন্যথায় রুকু থেকে দাঁড়িয়েও হাত বাঁধা আবশ্যক হবে। কারণ, এতে ছোট একটি ذِكْر তথা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ হয়, কিন্তু লম্বা ذِكْر হয় না। তাই এতে হাতও বাঁধতে হয় না।

قَوْلُهُ ثُمَّ يَثْنِىْ وَلَا يُوَجِّهُ : ছানা হচ্ছে– سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ রাসূল ﷺ থেকে এ ছানা প্রমাণিত আছে। মুহাদ্দিসীনে কেরাম বিভিন্ন সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন। আর তাওজীহ (تَوْجِيْه) হচ্ছে–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ .

এ ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ছানার পরে পড়বে না, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট এ তাওজীহ পড়া মোস্তাহাব। তবে কোনো কোন রেওয়ায়েত দ্বারা এ তাওজীহ রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। আমাদের মাশায়িখে কেরাম একে নিয়তের পূর্বে পড়া মোস্তাহাব বলেন।

قَوْلُهُ الْمُخْتَارُ اَنَّ التَّعَوُّذَ تَبَعٌ الخ : এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত যে, تَعَوُّذْ -কে কেরাতের অনুগামী বানাবে; ছানার অনুগামী নয়। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর নিকট تَعَوُّذْ ছানার অনুগামী। খুলাসাহ নামক গ্রন্থে একেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। তবে মোল্লা আলী কারী (র.) একে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এটি ভুল। কারণ تَعَوُّذْ কুরআনের অনুগামী। যদি একে ছানার অনুগামী সাব্যস্ত করা হয় তবে তা আল্লাহর বাণী– فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -এর পরিপন্থি হয়।

قَوْلُهُ عَلٰى عَكْسِ مَا ذُكِرَ الخ : অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) تَعَوُّذْ -কে ছানার অনুগামী বানিয়েছেন। তাই তাঁর নিকট হুকুম হচ্ছে, মাসবূক ব্যক্তি تَعَوُّذْ পড়বে না। কারণ, তার জন্য ছানা নেই। অতএব, তার ছানার تَعَوُّذْ -ও নেই। আর যে ব্যক্তি শুরু থেকেই ইমামের সাথে নামাজে শরিক হয়েছে তার জন্য ছানা পড়া সুন্নত। তাই সে تَعَوُّذْ -ও পড়বে। عَلٰى عَكْسِهٖ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ হুকুমটি আগের হুকুমের পরিপন্থি।

وَيُسَمِّى لَا بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّوْرَةِ وَيُسِرُّهُنَّ اَىِ الثَّنَاءَ وَالتَّعَوُّذَ وَالتَّسْمِيَةَ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رحـ) فِى التَّسْمِيَةِ بِنَاءً عَلٰى اَنَّهُ اٰيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ عِنْدَهُ لَا عِنْدَنَا وَكَثِيْرٌ مِنَ الْاَحَادِيْثِ الصِّحَاحِ وَارِدٌ فِىْ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِيْنَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ثُمَّ يَقْرَأُ وَيُؤَمِّنُ بَعْدَ وَلَا الضَّالِّيْنَ سِرًّا كَالْمُؤْتَمِّ ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ خَافِضًا وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ مُفَرِّجًا اَصَابِعَهُ بَاسِطًا ظَهْرَهُ غَيْرَ رَافِعٍ وَلَا مُنَكِّسٍ رَأْسَهُ وَيُسَبِّحُ ثَلٰثًا وَهُوَ اَدْنَاهُ ثُمَّ يُسَمِّعُ اَىْ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَافِعًا رَأْسَهُ وَيَكْتَفِىْ بِهِ الْاِمَامُ وَبِالتَّحْمِيْدِ الْمُؤْتَمُّ وَالْمُنْفَرِدُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيَقُوْمُ مُسْتَوِيًا ـ

অনুবাদ : [আউযুবিল্লাহ্‌র সাথে] বিসমিল্লাহ পড়বে; সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরার মধ্যখানে নয়। এসবই আস্তে আস্তে পড়বে। অর্থাৎ ছানা, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ [আস্তে পড়বে]। ইমাম শাফেয়ী (র.) বিসমিল্লাহ আস্তে পড়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেন– এই ভিত্তিতে যে, তাঁর নিকট বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার একটি আয়াত; আমাদের নিকট নয়। এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দ্বারা কেরাত পড়া শুরু করতেন। অতঃপর [বিসমিল্লাহর পর] কেরাত পড়বে। وَلَا الضَّالِّيْنَ -এর পরে মুক্তাদীর ন্যায় আমীন বলবে। অতঃপর নীচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে রুকুর জন্য তাকবীর বলবে। হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা রেখে উভয় হাত দ্বারা হাঁটুতে ভর দেবে। স্বীয় পিঠকে বিছিয়ে দেবে। স্বীয় মাথাকে উঁচুও করবে না এবং নিচুও করবে না। তিনবার তসবিহ পাঠ করবে। এটিই সর্বনিম্ন সংখ্যা। অতঃপর তাসমী' বলবে, অর্থাৎ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে, রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময়। ইমামের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আর মুক্তাদীর জন্য তাহমীদ [رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলা] যথেষ্ট। মুনফারিদ [একাকী] ব্যক্তি উভয়টি বলবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُسَمِّى لَا بَيْنَ الْفَاتِحَةِ الخ : অর্থাৎ تَعَوُّذْ -এর পর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে। সর্বসম্মতিক্রমে তা প্রথম রাকাতে সুন্নত। অন্যান্য রাকাতে সূরা ফাতিহার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত কিনা? এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে শুধু প্রথম রাকাতে আউযুবিল্লাহ পড়ার ক্ষেত্রে একমত। কিন্তু শায়খাইন (র.)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব হচ্ছে, সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ পড়বে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট সূরার শুরুতেও বিসমিল্লাহ পড়বে। যদিও তা সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে, কিন্তু এ কথার উপর সকলে একমত যে, তা পড়া মাকরূহ নয়; বরং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তা উত্তম।

বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার আয়াত কিনা? সূরা নামল-এর মধ্যে যে বিসমিল্লাহ তথা اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ রয়েছে– সর্বসম্মতিক্রমে তা কুরআন -এর আয়াত। আর অন্যান্য সূরার শুরুতে যে বিসমিল্লাহ রয়েছে, তা কুরআনের আয়াত কিনা? এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, সূরার শুরুতে যেসব বিসমিল্লাহ রয়েছে, সেগুলো কুরআনের আয়াত নয়। অন্যান্য সকল ওলামায়ে কেরাম একমত যে, তাও কুরআনের আয়াত। এখন তা যেমন কুরআনের আয়াত তেমন উক্ত সূরারও আয়াত কিনা? এ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। শাফেয়ী মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম বলেন, তা উক্ত সূরারও আয়াত ও অংশ। অতএব, তা সূরা ফাতিহারও আয়াত ও অংশ। আর হানাফী ওলামায়ে কেরাম বলেন, তা উক্ত সূরার আয়াত বা অংশ নয়, অতএব তা সূরা ফাতিহারও অংশ নয়।

قَوْلُهُ وَارِدٌ فِىْ اَنَّهُ عَلَيْهِ الخ : এটি আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.) মাযহাবের খণ্ডন। মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূল ﷺ, হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রা.)-এর পিছনে নামাজ পড়েছি। তাঁরা সকলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দ্বারা সূরা ফাতিহা শুরু করতেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তাঁরা বিসমিল্লাহ পড়তেন, কিন্তু তা [تَعَوُّذْ ও تَسْمِيَة -এর মতো] আস্তে আস্তে পড়তেন।

'আমীন' (اٰمِيْن) কে বলবে : সূরা ফাতিহার وَلَا الضَّالِّيْنَ বলার পর হামযা-এর মদ্দের সাথে اٰمِيْن বলবে। যার অর্থ- "কবুল করুন।" হামযা-এর মদ্দ ছাড়াও জায়েজ আছে, তবে মদ্দসহ বলা উত্তম। নামাজি ব্যক্তি ইমাম হোক কিংবা মুনফারিদ [একাকী] হোক উভয়ে আমীন (اٰمِيْن) বলবে। যদি উঁচু আওয়াজের কেরাতবিশিষ্ট নামাজ হয়, তবে মুক্তাদীও আমীন বলবে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, ইমাম আমীন বলবে না; বরং তা মুক্তাদী ও মুনফারিদ-এর সাথে খাস। কারণ, এক হাদীসে এসেছে যে, "যখন ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবে তখন তোমরা اٰمِيْن বলবে।"

-[বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ]

অন্য এক বর্ণনায় আছে- "যখন ইমাম اٰمِيْن বলবে তখন তোমরাও اٰمِيْن বলবে।" এ হাদীসে মূলত اٰمِيْن বলার সময় বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইমাম ও মুক্তাদী একসঙ্গে اٰمِيْن বলবে।

'আমীন' جَهْرِىْ বলা হবে, নাকি سِرِّىْ : নামাজ جَهْرِىْ হোক কিংবা سِرِّىْ হোক اٰمِيْن আস্তে বলবে। অনুরূপ ইমাম ও মুনফারিদও আস্তে আমীন বলবে। এটি আহনাফ ও ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাব এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর قَوْل جَدِيْد - আর ইমাম আহমদ (র.) ও শাফেয়ী (র.)-এর قَوْل قَدِيْم হলো, ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য اٰمِيْن আওয়াজ দিয়ে দিয়ে পড়া উত্তম। তাদের দলিল হচ্ছে, রাসূল ﷺ বলেছেন- إِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا অর্থাৎ "যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে।"

وَجْه اِسْتِدْلَال এভাবে যে, এতে ইমাম যখন اٰمِيْن বলবে তখন মুক্তাদীদেরকে اٰمِيْن বলতে বলা হয়েছে। অতএব, ইমাম যখন اٰمِيْن আওয়াজ দিয়ে বলবে, তখনই মুক্তাদী শুনতে পাবে। আর মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করত আওয়াজ দিয়ে اٰمِيْن বলবে।

আর আহনাফের দলিল হচ্ছে, রাসূল ﷺ বলেছেন- إِذَا قَالَ الْاِمَامُ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّ الْاِمَامَ يَقُوْلُهَا

وَجْهُ اِسْتِدْلَال এভাবে যে, এতে বলা হয়েছে- ইমাম যখন وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবে তখন মুক্তাদী اٰمِيْن বলবে। কেননা, ইমাম তখন اٰمِيْن বলে। فَاِنَّ الْاِمَامَ يَقُوْلُهَا এ বাক্যটি বুঝায় যে, ইমাম اٰمِيْن আস্তে পড়বে। অতএব, ইমামের অনুসরণ করত মুক্তাদীও اٰمِيْن আস্তে বলবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহমদ (র.) যে হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, তা মূলত ইমামের اٰمِيْن বলার স্থান নির্ণয় করে দেয়। ইমাম আওয়াজ দিয়ে اٰمِيْن বলা বুঝায় না।

قَوْلُهٗ ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ الخ : এতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেরাত থেকে অবসর হওয়ার পর রুকুর ওয়াক্ত। এটাও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাকবীরের পর কোনো কেরাত পড়বে না। এই তাকবীর এবং এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার সমস্ত তাকবীর সুন্নত। خَافِضًا শব্দটি يُكَبِّرُ-এর فَاعِلْ-এর حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ মাথা ঝুঁকানো অবস্থায় রুকুর জন্য তাকবীর বলবে; বরং যখন রুকুর জন্য ঝুঁকতে শুরু করবে তখন তাকবীর বলাও শুরু করে দেবে। আর ঝুঁকা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাকবীর বলাও শেষ হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ بَاسِطًا ظَهْرَهٗ الخ : অর্থাৎ নামাজি ব্যক্তি রুকুতে স্বীয় পিঠ বিছিয়ে দেবে এবং বরাবর করে রাখবে। এমনকি যদি পিঠে পানি ভরা গ্লাস রাখা হয়, তবে পড়ে যাবে না। মাথাও পিঠের বরাবর রাখবে। পিঠের চেয়ে উঁচু করবে না; বরং উত্তম হচ্ছে, কোমর পিঠ ও মাথা বরাবর রাখবে। তন্মধ্যে কোনোটাই কোনোটা থেকে উঁচু-নিচু রাখবে না। এটিই হচ্ছে সুন্নত তরিকা।

قَوْلُهٗ وَيُسَبِّحُ ثَلٰثًا وَهُوَ الخ : অর্থাৎ রুকুতে কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ বলবে। এর চেয়ে বেশি তথা পাঁচবার কিংবা সাতবার বলা উত্তম। আর যদি কেউ তিনবারের চেয়ে কম বলে তবে তার সুন্নত আদায় হবে না। সিজদার তাসবীহের হুকুমও এমনই। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "যদি তোমাদের কেউ রুকু করে তবে সে ইচ্ছে করলে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ বলবে এবং এটিই হচ্ছে সর্বনিম্ন সংখ্যা। আর যখন সিজদা করবে তখন তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى বলবে এবং এটিই সর্বনিম্ন সংখ্যা।" রাসূল ﷺ-এর এ اَمْر [নির্দেশ] فَرْضِيَّة-এর জন্য নয়; বরং اِسْتِحْبَابْ-এর জন্য। এতে ওলামায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে।

قَوْلُهٗ وَيَكْتَفِىْ بِهِ الْاِمَامُ الخ : অর্থাৎ ইমামের জন্য سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলা যথেষ্ট। এখন সে ইচ্ছে করলে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতে পারে কিংবা নাও বলতে পারে। কিন্তু যদি ইমাম رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলে তবে সে আস্তে আস্তে বলবে। আর মুক্তাদী শুধু رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে এবং মুনফারিদ উভয়টি বলবে। অর্থাৎ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে উঠবে এবং উঠে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। এটিই ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফারিদ-এর রীতি।

ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ فَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ يَدَيْهِ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَيَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ضَامًّا أَصَابِعَهُ مُبْدِئًا ضَبْعَيْهِ مُجَافِيًا بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ مُوَجِّهًا أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَيُسَبِّحُ فِيْهِ ثَلٰثًا فَإِنْ سَجَدَ عَلٰى كَوْرِ عِمَامَتِهٖ أَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهٖ أَوْ شَيْءٍ يَجِدُ حَجْمَهُ وَيَسْتَقِرُّ جَبْهَتُهُ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَا وَكَذَا لَوْ سَجَدَ لِلزِّحَامِ عَلٰى ظَهْرِ مَنْ يُصَلِّيْ صَلَاتَهُ لَا مَنْ لَا يُصَلِّيْهَا أَيْ لَا عَلٰى ظَهْرِ مَنْ لَا يُصَلِّيْ صَلَاتَهُ وَهُوَ إِمَّا أَنْ لَا يُصَلِّيْ أَصْلًا أَوْ يُصَلِّيْ وَلٰكِنْ لَا يُصَلِّيْ صَلَاتَهُ وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ وَتَلْزَقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا وَيَجْلِسُ مُطْمَئِنًّا وَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ مُطْمَئِنًّا وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ وَيَقُوْمُ مُسْتَوِيًا بِلَا اِعْتِمَادٍ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا قُعُوْدٍ وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رح) وَيُسَمّٰى جِلْسَةَ الْاِسْتِرَاحَةِ.

অনুবাদ : অতঃপর সে তাকবীর বলবে এবং সিজদা করবে। প্রথমে উভয় হাঁটু জমিনে রাখবে অতঃপর উভয় হাত অতঃপর উভয় হাতের মাঝে মুখমণ্ডলকে এমনভাবে রাখবে যে, উভয় হস্ত উভয় কান বরাবর থাকবে। [সিজদাবস্থায়] হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখবে, বাহুদ্বয়কে বগল থেকে পৃথক করে রাখবে, পেটকে রান থেকে পৃথক করে রাখবে, পায়ের আঙ্গুলসমূহকে কিবলামুখী করে রাখবে এবং সিজদায় তিনবার তসবিহ পড়বে। অতএব, যদি কেউ পাগড়ির ভাঁজের উপর সিজদা করে কিংবা বর্ধিত কাপড়ের উপর কিংবা এমন কোনো জিনিসের উপর যার দেহ অনুভূত হয় এবং কপাল এতে স্থির থাকে তবে তা জায়েজ। আর যদি এতে কপাল স্থির না থাকে তবে তা জায়েজ নেই। অনুরূপ যদি ভিড়ের কারণে ঐ ব্যক্তির পিঠে সিজদা করে, যে ঐ সিজদার নামাজ আদায় করছে [তবে তা জায়েজ]। আর যদি ঐ ব্যক্তির পিঠে সিজদা করে, যে ঐ সিজদার নামাজ পড়ে না তবে তা জায়েজ নেই। এর দুটি সুরত হতে পারে– হয়তো ঐ ব্যক্তি [যার পিঠের উপর সিজদা দিচ্ছে] মূলত নামাজই পড়ছে না কিংবা নামাজ পড়ছে, কিন্তু অন্য নামাজ পড়ছে। মহিলারা সিজদায় আপন অঙ্গগুলোকে গুটিয়ে রাখবে এবং পেটকে রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। [তিনবার তাসবিহ পড়ার পর] তাকবীর বলে মাথা উঠাবে এবং আরামে বসবে অতঃপর তাকবীর বলে আরামের সাথে দ্বিতীয় সিজদা করবে। তাকবীর বলে প্রথমে মাথা উঠাবে, অতঃপর হাত, অতঃপর হাঁটু এবং ভূমিতে ভর দেওয়া ও বসা ব্যতীত সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। [অর্থাৎ তাঁর নিকট সিজদা থেকে উঠার সময় কিছু সময় বসবে এবং এ বসাকে] جلسة الاستراحة বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ أَوَّلًا الخ : অর্থাৎ রুকুর পর সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে উভয় হাঁটু ভূমিতে রাখবে, অতঃপর উভয় হাত রাখবে, তারপর উভয় হাতের মধ্যখানে মুখমণ্ডল রাখবে। মুখমণ্ডলের ক্ষেত্রেও প্রথমে নাক অতঃপর কপাল রাখবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, সিজদায় যেসব অঙ্গ ভূমিতে রাখা হয়, তন্মধ্যে যেগুলো ভূমির নিকটবর্তী সেগুলোকে প্রথমে রাখবে, অতঃপর এর চেয়ে দূরবর্তী অঙ্গ রাখবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত রাখবে। অর্থাৎ কপাল যেহেতু ভূমি থেকে সবচেয়ে দূরে সেহেতু এটাকে

সবচেয়ে শেষে ভূমিতে রাখা হবে। আর হাঁটু যেহেতু ভূমির সবচেয়ে নিকটবর্তী সেহেতু সেটাকে সর্বপ্রথম ভূমিতে রাখা হবে। সিজদা থেকে উঠার সময় ভূমির নিকটবর্তী অঙ্গকে সব শেষে উঠাবে এবং সবচেয়ে দূরবর্তী অঙ্গকে সর্বপ্রথম উঠাবে।

قَوْلُهُ وَيَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ الخ অর্থাৎ সিজদায় মুখমণ্ডলকে উভয় হাতের মধ্যখানে ভূমির উপর এমনভাবে রাখবে যে, হাত ও কান বরাবর হয়। এমনকি যদি কান থেকে কিছু পড়ে তবে যেন হাতে পড়ে। এটি সুন্নত তরিকা। কিন্তু যদি এদিক-সেদিক সাধারণ পার্থক্য হয় তবে এতে কোনো ক্ষতি হবে না।

قَوْلُهُ مُبْدِيًا ضَبْعَيْهِ الخ : অর্থাৎ সিজদায় উভয় বাহুকে বগল থেকে পৃথক রাখবে এবং পেটকে রান থেকে পৃথক রাখবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, সিজদায় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করে রাখবে, এমনকি কোনো কোনো ফকীহ -এর অভিমত হচ্ছে, রুকু অবস্থায় যদি কোনো বকরি পেটের নীচ দিয়ে অতিক্রম করে যায় তবে স্বাভাবিকভাবে যেতে পারে। এ হুকুম পুরুষের ক্ষেত্রে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হুকুম, যার বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

قَوْلُهُ مُوَجِّهًا أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ الخ : অর্থাৎ সিজদা অবস্থায় পায়ের আঙ্গুলের মাথা কিবলার দিকে করে রাখবে। অনুরূপ হুকুম হাতের আঙ্গুলেরও। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যখন বান্দা সিজদা করে তখন তার সাথে তার সাত অঙ্গও সিজদা করে– দুই পা, দুই হাঁটু, দুই হাত এবং মুখমণ্ডল। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সিজদা তো তখনই হবে, যখন এসব অঙ্গ একসাথে কিবলার দিকে করে ঝুঁকবে এবং সিজদা করবে।

قَوْلُهُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ الخ : অর্থাৎ পাগড়ির ভাঁজ– যা কপালের উপর হয়। অনুরূপ পরিধেয় কাপড়ের অতিরিক্ত অংশে, যেমন– আস্তিন, আঁচল ইত্যাদি। তবে এর উপর সিজদা করা জায়েজ। রাসূল ﷺ থেকে এমনই প্রমাণিত আছে এবং অনেক সাহাবী থেকেও এমন প্রমাণিত আছে। কিন্তু রাসূল ﷺ থেকে তা প্রমাণিত– এর দ্বারা আদৌ একথা উদ্দেশ্য নয় যে, পাগড়ির প্যাচ কিংবা কাপড়ের অতিরিক্ত অংশে সিজদা করা সুন্নত; বরং এর দ্বারা শুধু جَوَازٌ প্রমাণিত হয়। কারণ, সিজদার মূল হচ্ছে– وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ [ভূমিতে কপাল রাখা]। অতএব, কপাল এবং ভূমির মাঝে এমন কোনো প্রতিবন্ধক থাকতে পারবে না, যা ভূমিতে কপাল রাখার জন্য বাধার কারণ হয়। আর পাগড়ির পেঁচ এবং কাপড়ের অতিরিক্ত অংশ প্রচলিত ধারণায় প্রতিবন্ধক নয় বলে বলা হয়।

قَوْلُهُ أَوْ شَيْءٍ يَجِدُ حَجْمَهُ الخ : অর্থাৎ এমন জিনিস যার উপর সিজদা করার দ্বারা চেহারা এর উপর স্থির থাকে– যেমনটি ভূমির উপর সিজদা করার দ্বারা স্থির থাকে। যেমন কোনো ব্যক্তি বরফের মধ্যে নামাজ পড়ছে। এখন যদি সিজদায় তার চেহারা তেমন স্থির থাকে যেমন স্থির থাকে সাধারণ মাটিতে তবে তা জায়েজ। আর যদি এমন হয় যে, চেহারা এতে স্থির রাখা যায় না। তবে তা জায়েজ নেই। কারণ, তখন তার সিজদাটি এমন হবে যেমন কেউ হাওয়ায় সিজদা করে। অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এভাবে নামাজ হয় না।

قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ سَجَدَ لِلزِّحَامِ الخ : অর্থাৎ যদি নামাজে অধিক পরিমাণ লোক জমায়েত হয় এবং লোকের তুলনায় জায়গা কম হয় এবং সকলেই যদি একই নামাজ পড়ে তবে সামনের সারির লোকদের পিঠে সিজদা করা জায়েজ। যার পিঠে সিজদা করছে সে যদি অন্য নামাজ পড়ে, যেমন– এক ব্যক্তি জোহরের নামাজ পড়ছে, কিন্তু জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে সে সামনের ব্যক্তির পিঠের উপর সিজদা করছে। যার পিঠের উপর সিজদা করছে সেও যদি জোহর পড়ে থাকে তবে তা জায়েজ। আর যদি সে অন্য কোনো নামাজ পড়ে তবে তা জায়েজ নেই। অনুরূপ কোনো ব্যক্তি নামাজ পড়ছে না, তবে তার পিঠের উপর সিজদা দেওয়া জায়েজ নেই। এ ক্ষেত্রে শুধু একটিই সুরত রয়েছে যে, সিজদাকারী এবং যার পিঠে সিজদা করছে উভয়ের নামাজ এক হতে হবে; অন্যথায় তা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ وَتَلْزَقُ الخ : অর্থাৎ মহিলারা সিজদাবস্থায় পুরুষের পরিপন্থি করবে। অর্থাৎ পূর্ণ হাতকে ভূমির উপর বিছিয়ে দেবে। বাহুকে বগলের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং পেটকে রানের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে। অর্থাৎ যথাসম্ভব গোলগাল হয়ে সিজদা করবে। যার দ্বারা তার শরীর অধিক আবৃত থাকবে। হাদীসে এসেছে– রাসূল ﷺ দুজন মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন– যারা তখন নামাজ পড়ছিল। তিনি বললেন, যখন তোমরা সিজদা করবে তখন তোমাদের কতক অঙ্গকে ভূমিতে লাগিয়ে রাখবে।

قَوْلُهُ بِلَا اِعْتِمَادٍ عَلَى الْاَرْضِ وَلَا قُعُوْدٍ : অর্থাৎ সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় ভূমিতে ঠেস লাগাবে না এবং বসবেও না; বরং যদি ঠেস লাগাতে হয়, তবে হাঁটু দ্বারা লাগাবে। কারণ, রাসূল ﷺ -এর থেকে নিষেধ করেছেন। তাই প্রয়োজন ছাড়া ভূমিতে ঠেস লাগানোকে ফুকাহায়ে কেরাম মাকরূহে তানযীহ বলেছেন। কিন্তু যদি কেউ দুর্বল হয় এবং ঠেস লাগানো ব্যতীত উঠা তার জন্য কষ্টকর হয়, তবে ঠেস লাগানোর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।

جَلْسَةِ اِسْتِرَاحَة নেই : নামাজে جَلْسَةِ اِسْتِرَاحَة আছে নাকি নেই? এ নিয়ে আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আহনাফ বলেন, সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় বসে جَلْسَةِ اِسْتِرَاحَة করবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় একটু বসা তথা جَلْسَةِ اِسْتِرَاحَة করা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিছ (রা.) -এর হাদীস। তিনি বলেছেন–

أُرِيْكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْاَرْضِ ـ

অর্থাৎ "আমি তোমাদেরকে রাসূল ﷺ -এর নামাজ দেখাচ্ছি। তিনি নামাজ পড়লেন। দ্বিতীয় সিজদা থেকে যখন তিনি মাথা উঠালেন, তখন তিনি বসেছেন এবং ভূমিতেই ঠেস লাগিয়েছেন।" –[বুখারী, তিরমিযী, আবূ দাউদ]

وَجْه اِسْتِدْلَالْ এভাবে যে, হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিছ (রা.) রাসূল ﷺ -এর নামাজ দেখাতে গিয়ে সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় একটু সময় বসেছেন এবং ভূমির সাথে ঠেস লাগিয়েছেন। এর দ্বারা جَلْسَةِ اِسْتِرَاحَة প্রমাণিত হয়। جَلْسَةِ اِسْتِرَاحَة প্রথম রাকাতে দুই সিজদার পর হয় এবং চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজে তৃতীয় রাকাতের পর হয়।

ওলামায়ে আহনাফের দলিল হচ্ছে– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهَضُ فِى الصَّلَاةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ

অর্থাৎ "হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ নামাজে তাঁর দুই পায়ের মাথার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে যেতেন।" –[তিরমিযী]

উক্ত হাদীস দ্বারা রাসূল ﷺ جَلْسَةِ اِسْتِرَاحَة করেছেন, কিংবা মাটিতে ঠেস লাগিয়েছেন এমন কোনো কিছু প্রমাণিত হয় না। তা ছাড়া অধিকাংশ বড় বড় সাহাবী যেমন– হযরত ওমর, হযরত ইবনে ওমর, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসঊদ, হযরত ইবনে যুবাইর ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) প্রমুখের আমলেও جَلْسَه اِسْتِرَاحَة ছিল না। হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিছ (রা.)-এর হাদীসকে جَوَازْ ও عُذْر -এর উপর আরোপ করা হবে।

وَالرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ كَالْأُوْلٰى لٰكِنَّ لَا ثَنَاءَ وَلَا تَعَوُّذَ وَلَا رَفْعَ يَدَيْهِ فِيْهَا وَاِذَا اَتَمَّهَا اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَجَلَسَ عَلَيْهَا نَاصِبًا يُمْنَاهُ مُوَجِّهًا اَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ مُوَجِّهًا اَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ مَبْسُوْطَةً وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رح) فَاِنَّ عِنْدَهُ يَعْقِدُ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصَرَ وَيَحْلِقُ الْوُسْطٰى وَالْاِبْهَامَ وَيُشِيْرُ بِالسَّبَابَةِ عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَمِثْلُ هٰذَا جَاءَ عَنْ عُلَمَائِنَا اَيْضًا وَيَتَشَهَّدُ كَابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) وَلَا يَزِيْدُ عَلَيْهِ فِى الْقَعْدَةِ الْاُوْلٰى وَيَقْرَأُ فِيْمَا بَعْدَ الْاُوْلَيَيْنِ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ وَهِىَ اَفْضَلُ وَاِنْ سَبَّحَ اَوْ سَكَتَ جَازَ وَيَقْعُدُ كَالْاُوْلٰى خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) فَاِنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُ فِى التَّشَهُّدِ الثَّانِىْ اَلتَّوَرُّكُ وَهُوَ هَيْأَةُ جُلُوْسِ الْمَرْأَةِ فِى الصَّلٰوةِ وَهِىَ هٰذِهٖ وَالْمَرْأَةُ تَجْلِسُ عَلٰى اِلْيَتِهَا الْيُسْرٰى مُخْرِجَةً رِجْلَيْهَا مِنْ جَانِبِ الْاَيْمَنِ فِيْهِمَا اَىْ فِى التَّشَهُّدَيْنِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَدْعُوْ بِمَا يَشْبَهُ الْقُرْاٰنَ اَوِ الْمَاثُوْرَ مِنَ الدُّعَاءِ لَا كَلَامَ النَّاسِ فَلَا يَسْأَلُ شَيْئًا مِمَّا يُسْأَلُ مِنَ النَّاسِ .

অনুবাদ : দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের মতো। তবে এতে ছানা, আউযুবিল্লাহ ও হস্তদ্বয় উঠানো নেই। যখন দ্বিতীয় রাকাত পূর্ণ করবে তখন বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসবে এবং ডান পাকে খাড়া করে রাখবে। আঙ্গুলগুলো রাখবে কিবলামুখী করে। উভয় হাতকে উভয় রানের উপর এমনভাবে রাখবে যে, আঙ্গুলগুলো ফাঁকা থাকবে এবং কিবলামুখী থাকবে। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতানৈক্য রয়েছে। কেননা, তাঁর নিকট অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলকে গুটিয়ে নেবে, মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা হালকা [বৃত্ত] বানাবে এবং দুই শাহাদতকে উচ্চারণ করার সময় তর্জনী দ্বারা ইশারা করবে। অনুরূপ কথা আমাদের ওলামায়ে কেরামের থেকেও বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর তাশাহহুদ পড়বে। প্রথম বৈঠকে এর চেয়ে বেশি কিছু পড়বে না। প্রথম দুই রাকাতের পরে [এর রাকাতগুলোতে] শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে এবং এটিই উত্তম। আর যদি তসবিহ পড়ে কিংবা চুপ থাকে তবে জায়েজ। দ্বিতীয় বৈঠক করবে প্রথম বৈঠকের ন্যায়। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিমত রয়েছে। কেননা, তাঁর নিকট দ্বিতীয় বৈঠকে তাওয়াররুক (تَوَرُّكْ) করা সুন্নত। আর تَوَرُّكْ হচ্ছে নামাজে মহিলাদের ন্যায় বসা। তা হলো, মহিলা উভয় বৈঠকে তার বাম নিতম্বের উপর বসবে এবং উভয় পাকে ডান দিক দিয়ে বের করে দেবে, [দ্বিতীয় বৈঠকে] তাশাহহুদ পড়বে। নবী ﷺ -এর উপর দরুদ পড়বে এবং ঐসব শব্দে দোয়া পড়বে যা কুরআন ও হাদীসে [উল্লিখিত] দোয়ার মতো হয়, মানুষের কথার সাথে মিলিত শব্দে নয়। অতএব, দোয়ায় এমন জিনিস চাওয়া যাবে না, যা মানুষের কাছে চাওয়া হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لٰكِنَّ لَاثَنَاءَ وَلَا تَعَوُّذَ الخ :

দ্বিতীয় রাকাতে ثَنَاء - تَعَوُّذ ও رَفْع يَدَيْن নেই : অর্থাৎ প্রথম রাকাত ব্যতীত অন্যান্য রাকাতে ثَنَاء - تَعَوُّذ ও رَفْع يَدَيْن নেই। কারণ, এসবই প্রথম রাকাতের সাথে নির্দিষ্ট এবং এগুলো নামাজের সূচনা। এখন যেহেতু নামাজের সূচনার বিষয়টি নেই, অতএব সূচনার কার্যগুলোও নেই। তবে تَعَوُّذ সম্পর্কে একটি সন্দেহ থেকেই যায় যে, এটি তো কেরাতের অনুগামী। আর কেরাত এখনো পড়া হবে। সম্ভবত হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এর উপর ভিত্তি করেই প্রত্যেক রাকাতে বিসমিল্লাহ পড়া মোস্তাহাব বলেছেন। আমির ইবনে হাজ্জ (র.) "আল-হুলইয়াতুল মাহাল্লা" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সাহেবাইন (র.) দ্বিতীয় রাকাতেও تَعَوُّذ পড়ার প্রবক্তা। কেননা, তা কেরাতের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। আর প্রত্যেক রাকাতে নতুন নতুন কেরাত পড়া হয়।

قَوْلُهُ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى الخ :

নামাজে اِفْتِرَاش বৈঠক করবে : এখানে اِفْتِرَاش বৈঠকের বিবরণ দেওয়া হবে এবং সামনে تَوَرُّك বৈঠকের বিবরণ আসবে, যার প্রবক্তা ইমাম শাফেয়ী (র.)। اِفْتِرَاش বৈঠক হচ্ছে– বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসা। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে ডান পা খাড়া করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ থেকে এমনই আমল রয়েছে। হযরত ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, "নামাজে সুন্নত হচ্ছে– ডান পা খাড়া করিয়ে দেওয়া এবং এর আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে দেওয়া এবং বাম পায়ে বসা।" আর ডান পা খাড়া করার দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, হাঁটু পর্যন্ত খাড়া করাবে; বরং উভয় হাঁটু ভূমিতে কিবলামুখী করে রাখবে। শুধু পায়ের পাতার অংশ খাড়া করিয়ে রাখবে। আমাদের ইমামদের নিকট এ তরিকাবিশেষ কোনো বৈঠকের সাথে খাস নয়; বরং সমস্ত বৈঠকেই এ পদ্ধতি সুন্নত। কোনো কোনো বর্ণনায় একথা স্পষ্টভাবে রয়েছে যে, রাসূল ﷺ প্রথম বৈঠকে اِفْتِرَاش বৈঠক করতেন আর দ্বিতীয় বৈঠকে تَوَرُّك বৈঠক করতেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ হাদীস দ্বারাই দলিল পেশ করেন। এর আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

قَوْلُهُ اَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ الخ : এতে اَصَابِعَهُ-এর ضَمِيْر-এর مَرْجِعْ কয়েকটি হতে পারে–

১. اَصَابِعَهُ-এর ضَمِيْر-এর مَرْجِعْ হবে رِجْل يُمْنٰى। এ সুরতে উদ্দেশ্য হবে– ডান পাকে খাড়া করে এর আঙ্গুলগুলো পিছনের দিকে করা মাকরূহ।

২. اَصَابِعَهُ-এর ضَمِيْر-এর مَرْجِع হবে মুসল্লি ব্যক্তি। এ সুরতে উদ্দেশ্য হবে– তার উভয় পা এবং উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহকে কিবলামুখী করে রাখা অতঃপর বাম পা, যা বিছানো রয়েছে এর আঙ্গুলগুলোও যতটুকু সম্ভব কিবলামুখী করে রাখা মোস্তাহাব।

৩. اَصَابِعَهُ-এর ضَمِيْر-এর مَرْجِعْ হবে رِجْل يُسْرٰى কিংবা يُمْنٰى ও رِجْل يُسْرٰى। তখন এর উদ্দেশ্য হবে– বিছানো পায়ের আঙ্গুলগুলোও কিবলামুখী করে রাখা মোস্তাহাব।

বৈঠকে হাতের আঙ্গুলগুলো খোলা অবস্থায় এবং বিছিয়ে রাখবে : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, তাশাহহুদ বৈঠকে মুসল্লি হাতের আঙ্গুলগুলো খোলা অবস্থায় রানের উপর বিছিয়ে রাখবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলকে গুটিয়ে নেবে, মধ্যমা এবং বৃদ্ধ আঙ্গুল দ্বারা হালকা [বৃত্ত] বানাবে এবং দুই শাহাদাতকে উচ্চারণ করার সময় তর্জনী দ্বারা ইশারা করবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উক্ত অভিমতের অনুরূপ হানাফী ওলামায়ে কেরামও বলেছেন। কিন্তু দুটির মাঝে পার্থক্য হলো, ইমাম শাফেয়ী (র.) বৈঠকের শুরু থেকেই এমন হালকা বানানোর কথা বলেন এবং এটিই তার নিকট সুন্নত। হানাফী ওলামায়ে কেরাম বলেন, বৈঠকের শুরুতে আঙ্গুলগুলো বিছিয়েই রাখবে অতঃপর দুই শাহাদাত বলার সময় হালকা [বৃত্ত] বানাবে এবং ইশারা করবে, যেন মুখে বলা এবং হাতের ইশারা উভয়টির মাধ্যমে তাওহীদের সাক্ষ্য দেওয়া হয়। ইমাম গাযালী (র.) বলেন, اِلَّا اللّٰهُ বলার সময় তর্জনী আঙ্গুল উঠাবে। শাহাদাতের সময় তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা বিভিন্ন বর্ণনায় রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

কোনো কোনো مُتَاَخِّرِيْن হানাফী আলেম বলেছেন, হালকা বানানো ছাড়াই ইশারা করবে। রাসূল ﷺ থেকে এ বর্ণনাও রয়েছে যে, "তিনি যখন বৈঠক করতেন তখন ডান হাত ডান রানের উপর রাখতেন এবং সমস্ত আঙ্গুল গুটিয়ে নিতেন আর তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন এবং বাম হাতকে বাম রানের উপর রাখতেন।" ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত এটিই।

قَوْلُهُ وَيَتَشَهَّدُ كَابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) الخ :

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহহুদ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনাকৃত তাশাহহুদ কিংবা রাসূল ﷺ তাঁকে যে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেলেন সে তাশাহহুদ পড়বে। তা হচ্ছে–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ـ

হাদীসের সুনান গ্রন্থকারগণ এই তাশাহহুদ বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র.) তা বর্ণনা করে বলেছেন, এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনা। কিন্তু প্রথম বৈঠকে এর চেয়ে বেশি কিছুই পড়বে না। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ আমাকে এও শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু শেষ পর্যন্তই পড়বে। আর শেষ বৈঠকে এরপরে দরুদ ও দোয়া মাছুরা পড়বে।

ফরজের শেষ দুই রাকাতে কি পড়বে? ফরজের প্রথম দুই রাকাতে তো সূরা ফাতিহা এবং এর সাথে অন্য সূরা পড়বে। কিন্তু শেষ দুই রাকাতে কি পড়বে? এ ব্যাপারে তিন ধরনের রীতি রয়েছে।

১. শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে।

২. তিনবার তসবিহ পড়বে।

৩. কিংবা তিন তসবিহ পরিমাণ সময় চুপ থকবে। কিন্তু এতে সূরা ফাতিহা পড়া উত্তম, তারপর তসবিহ পড়া উত্তম, তারপর চুপ থাকার স্তর। এখন যদি কেউ সূরা ফাতিহা থেকে অধিক পড়ে তবে মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) "আল-গানিয়্যাহ" নামক গ্রন্থের সূত্রে শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, এর দ্বারা কোনো ক্ষতি হবে না। সিজদায়ে সাহুও আবশ্যক হবে না। স্মরণ রাখতে হবে, এখানে যে চুপ থাকতে বলা হয়েছে তা জায়েজ মাত্র। কিন্তু এতে কোনো ফজিলতের কথা নেই; বরং সুন্নত হচ্ছে কিছু পড়া। তন্মধ্যেও উত্তম হচ্ছে সূরা ফাতিহা পড়া।

تَوَرُّكْ বৈঠক প্রসঙ্গ : মহিলাদের ন্যায় দুই নিতম্বের উপর বসাকে تَوَرُّكْ বলে। দ্বিতীয় বৈঠকে রাসূল ﷺ থেকে تَوَرُّكْ-এর তিনটি পদ্ধতি বর্ণিত আছে–

১. নিতম্ব ভূমির উপর রাখবে এবং উভয় পা ডান দিকে বের করে দেবে। –[আবূ দাঊদ শরীফ]

২. নিতম্ব ভূমির উপর রাখবে, বাম পা বিছিয়ে দেবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। –[বুখারী শরীফ]

৩. বাম পাকে রান এবং গোছার মধ্যখানে রাখবে এবং ডান পাকে বিছিয়ে দেবে। –[মুসলিম শরীফ]

ওলামায়ে আহনাফ প্রথম অভিমতকে মহিলাদের জন্য সুন্নত বলেন। কেননা, এতে অধিক পর্দা রয়েছে। দ্বিতীয় অভিমতকে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিতীয় বৈঠকে পুরুষের জন্যও সুন্নত বলেন।

নামাজে যে দরুদ পড়বে : শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর রাসূল ﷺ-এর উপর দরুদ শরীফ পড়বে। এখানে ঐ দুরুদ শরীফ পড়া উত্তম, যা হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, আমাদের ইমামদের নিকট এই দরুদ উত্তম–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

এখানে অন্য দরুদ পড়াও রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, যা অন্যান্য বড় বড় কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

দরুদের পর যে দোয়া পড়বে : অর্থাৎ নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও দরুদ শরীফের পর দোয়া পড়বে। উক্ত দোয়া কুরআন কিংবা হাদীসে উল্লিখিত দোয়ার অনুরূপ হতে হবে। যেমন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

কিংবা– اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

কিংবা অন্য কোনো দোয়া যা তার পছন্দ হয়। শর্ত হলো, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দোয়ার সদৃশ হতে হবে। এমন শব্দে দোয়া চাইতে পারবে না, যা মানুষের কথার সদৃশ হয়ে যায়। কিংবা আল্লাহর কাছে এমন কিছু চাইতে পারবে না, যা সাধারণত মানুষের কাছে চাওয়া হয়। যেমন– اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِيْ زَوْجَةً كَذَا কিংবা اَللّٰهُمَّ كَذَا اَمْوَالًا كَذَا وَغَيْرَ কারণ, এসব দোয়া নামাজে পড়া উচিত নয়। হ্যাঁ, যদি নামাজের বাইরে এসব দোয়া পড়া হয় তবে কোনো ক্ষতি নেই।

ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ بِنِيَّةِ مَنْ ثَمَّهُ مِنَ الْبَشَرِ وَالْمَلَكِ ثُمَّ عَنْ يَسَارِهٖ كَذٰلِكَ وَالْمُؤْتَمُّ يَنْوِيْ اَمَامَهُ فِيْ جَانِبِهٖ وَفِيْهِمَا اِنْ حَاذَاهُ وَالْاِمَامُ بِهِمَا اَيْ يَنْوِي الْاِمَامُ بِالتَّسْلِيْمَتَيْنِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ اَلْاِمَامُ لَا يَنْوِيْ لِاَنَّهُ يُشِيْرُ اِلَى الْقَوْمِ وَالْاِشَارَةُ فَوْقَ النِّيَّةِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ اَلْاِمَامُ يَنْوِيْ بِالتَّسْلِيْمَةِ الْاُوْلٰى وَالْمُنْفَرِدُ الْمَلَكَ فَقَطْ ـ

অনুবাদ : অতঃপর ডান দিকে যেসব মানুষ ও ফেরেশতা রয়েছেন তাদের নিয়তে ডান দিকে সালাম ফিরাবে। অতঃপর অনুরূপ বাম দিকে সালাম ফিরাবে। মুক্তাদী সালামের ক্ষেত্রে যেদিকে ইমাম রয়েছে সেদিকে ইমামের নিয়ত করবে। আর যদি মুক্তাদী সরাসরি ইমামের পিছনে হয় তবে সে উভয় দিকে ইমামের নিয়ত করবে। আর ইমাম উভয় দিকে মুক্তাদী এবং ফেরেশতাদের নিয়ত করবে। কোনো কোনো ফকীহের নিকট ইমাম নিয়ত করবে না। কেননা, ইমাম জাতির দিকে ইশারা করবে। আর ইশারা নিয়তের চেয়েও উপরে। কোনো কোনো ফকীহের নিকট ইমাম প্রথম সালামে নিয়ত করবে। মুনফারিদ মুসল্লি শুধু ফেরেশতার নিয়ত করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামাজ শেষে সালাম ফিরাবে : অর্থাৎ মুসল্লি তাশাহহুদ, দরুদ শরীফ ও দোয়ার পর উভয় দিকে সালাম ফিরাবে। প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে। আর সালামের শব্দাবলি হচ্ছে– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ কোনো কোনো বর্ণনায় শেষে وَبَرَكَاتُهُ-ও রয়েছে। জমহুর ওলামা, কিবারে সাহাবা, হযরত ওমর, হযরত আলী এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) প্রমুখের মাযহাব এটাই। দলিল হলো হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর হাদীস–

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهٖ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْسَرِ ـ

পক্ষান্তরে ইমাম মালেক (র.) বলেন, শুধু সামনের দিকে একবার সালাম ফিরাবে। তাঁর দলিল হলো, হযরত আয়েশা ও হযরত ইবনে সা'দ (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস– اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَذٰلِكَ "রাসূল ﷺ এমনটিই করেছেন", অর্থাৎ নামাজ থেকে বের হওয়ার জন্য এক সালাম করেছেন। আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, কিবারে সাহাবাদের অভিমত গ্রহণ করা উত্তম– ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমত গ্রহণ করার তুলনায়। তা ছাড়া হযরত আয়েশা (রা.) মহিলাদের কাতারে থাকতেন আর সাহাল থাকতেন শিশুদের কাতারে। হতে পারে, তাঁরা উভয়ে দ্বিতীয় সালাম শুনেননি। বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ -এর দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালামের তুলনায় নিচু আওয়াজে হতো।

সালাম ফিরানোর সময় যাদের নিয়ত করবে : যখন ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরাবে তখন যেদিকে সালাম ফিরাবে সেদিকের সমস্ত মুসল্লি ও সমস্ত ফেরেশতার নিয়ত করবে। উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সময় এমনভাবে নিয়ত করবে। তবে যেদিকে ইমাম রয়েছে সেদিকে সালাম ফিরানোর সময় মুক্তাদী ইমামেরও নিয়ত করবে। আর যদি মুক্তাদী সরাসরি ইমামের পিছনে হয় তবে উভয় দিকে ইমামের নিয়ত করবে। ইমাম উভয় দিকে সালামে মুক্তাদী ও ফেরেশতার নিয়ত করবে। তবে এতে মতানৈক্য রয়েছে। কারো নিকট ইমাম কোনো নিয়ত করবে না। কারো কারো নিকট শুধু প্রথম সালামে মুক্তাদী ও ফেরেশতার নিয়ত করবে এবং দ্বিতীয় সালামে কিছুই করবে না। কিন্তু উত্তম হচ্ছে, উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সময় মুক্তাদী ও ফেরেশতাদের নিয়ত করা, আর মুনফারিদ ব্যক্তি যে মুক্তাদীও নয় আবার ইমামও নয়– সে শুধু ফেরেশতাদের নিয়ত করবে। কারণ, তার সাথে অন্য কোনো ব্যক্তি শরিক নেই।

فَصْلٌ فِى الْقِرَاءَةِ

يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِى الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَالْفَجْرِ وَ أُوْلَى الْعِشَاءَيْنِ أَدَاءً وَقَضَاءً لَا غَيْرَ وَالْمُنْفَرِدُ خُيِّرَ إِنْ أَدّٰى وَخَافَتَ حَتْمًا إِنْ قَضٰى وَأَدْنَى الْجَهْرِ إِسْمَاعُ غَيْرِهٖ وَأَدْنَى الْمُخَافَتَةِ إِسْمَاعُ نَفْسِهٖ هُوَ الصَّحِيْحُ إِحْتِرَازٌ عَمَّا قِيْلَ إِنَّ أَدْنَى الْجَهْرِ إِسْمَاعُ نَفْسِهٖ وَأَدْنَى الْمُخَافَتَةِ تَصْحِيْحُ الْحُرُوْفِ وَكَذَا فِىْ كُلِّ مَا تَعَلَّقَ بِالنُّطْقِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَالْاِسْتِثْنَاءِ وَغَيْرِهَا اَىْ أَدْنَى الْمُخَافَتَةِ فِىْ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ إِسْمَاعُ نَفْسِهٖ حَتّٰى لَوْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ بِحَيْثُ صَحَّحَ الْحُرُوْفَ لٰكِنْ يُسْمِعُ نَفْسَهٗ لَا يَقَعُ وَلَوْ طَلَّقَ جَهْرًا وَ وَصَلَ بِهٖ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِحَيْثُ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهٗ يَقَعُ الطَّلَاقَ وَلَمْ يَصِحُّ الْاِسْتِثْنَاءُ.

অনুচ্ছেদ : কেরাত

অনুবাদ : জুমা, দুই ঈদের নামাজ, দুই ইশা [তথা মাগরিব ও ইশা]-এর প্রথম দুই রাকাতে ইমাম উঁচু আওয়াজে কেরাত পড়বে। চাই [এসব নামাজ] আদা (أَدَاء) হোক কিংবা কাজা (قَضَاء) হোক; অন্যান্য নামাজে নয়। আদা নামাজে মুনফারিদ ব্যক্তির ইচ্ছা। কাজা নামাজে অবশ্যই সে আস্তে কেরাত পড়বে। جَهْر [আওয়াজ] -এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, অন্যকে শুনানো এবং مُخَافَة [আওয়াজহীন]-এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, নিজেকে শুনানো। এটিই বিশুদ্ধ কথা। এটি ঐ কথা থেকে বিরত থাকা যেখানে বলা হয়েছে যে, جَهْر -এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে– নিজেকে শুনানো এবং مُخَافَة -এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, অক্ষরের উচ্চারণ বিশুদ্ধভাবে করা। অনুরূপ হুকুম প্রত্যেক ঐ জিনিসের ক্ষেত্রে যা কথা বলার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– তালাক, ইতাক [আজাদ], استثناء [পৃথক করা] ইত্যাদি। অর্থাৎ এসব বিষয়ের ক্ষেত্রে مُخَافَة -এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, নিজেকে শুনানো। এমনকি যদি অক্ষরকে বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে তালাক দেয় কিংবা আজাদ করে, কিন্তু নিজেকে শুনায়নি, তবে এসব পতিত হবে না। আর যদি উঁচু আওয়াজে তালাক দেয় এবং এর সাথে সম্পৃক্ত করে এমনভাবে 'ইনশাআল্লাহ' বলে যে, নিজেকে শুনায়নি, তবে তালাক পতিত হবে এবং إِسْتِثْنَاء সহীহ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : গ্রন্থকার নামাজের সিফত, পদ্ধতি, আরকান, ফারায়েজ, ওয়াজিবাত এবং সুনান-এর আলোচনা থেকে অবসর হয়ে কেরাতের আহকাম সম্পর্কে আলাচনা শুরু করেছেন। অথচ কেরাতও নামাজের আরাকানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অন্যান্য আরকানের তুলনায় কেরাতের আহকাম যেহেতু আরো অধিক তাই গ্রন্থকার কেরাতের আহকামকে আলাদা অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছেন।

جَهْرِىْ ও سِرِّىْ কেরাতের নামাজ : গ্রন্থকার বলেন, মুসল্লি যদি ইমাম হয় তবে ফজরের দুই রাকাত, মাগরিবের ও ইশার প্রথম দুই রাকাত এবং জুমার দুই রাকাতে কেরাত উচ্চৈঃস্বরে পড়া ওয়াজিব। আর অবশিষ্ট রাকাত তথা মাগরিবের তৃতীয় রাকাত এবং ইশার শেষ দুই রাকাতে চুপে চুপে কেরাত পড়া ওয়াজিব। আর এ ওয়াজিব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত–

إِنَّهُ قَالَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَقْرَأُ فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفٰى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ .

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, প্রত্যেক নামাজে কুরআন পাঠ করা হতো, যেখানে রাসূল ﷺ আমাদেরকে শুনিয়েছেন– আমরাও তোমাদেরকে শুনিয়েছি– আর যেখানে গোপন করেছেন [শুনাননি] আমরাও গোপন করেছি।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জেহরী নামাজে জেহরী কেরাত এবং সিররী নামাজে সিররী কেরাত পড়া ওয়াজিব। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে উম্মতের ইজমাও অনেক বড় দলিল। কেননা, রাসূল ﷺ -এর যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত জেহরী নামাজে জেহরী কেরাত এবং সিররী নামাজে সিররী কেরাত -এর উপর উম্মতের ইজমা রয়েছে।

قَوْلُهُ يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ الخ : এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আমরা ইতঃপূর্বে করেছি। এখানে শুধু একটি صُوْرَة مَسْئَلَة উল্লেখ করব। তা হচ্ছে, যদি কোনো ব্যক্তি একা একা জেহরী নামাজ পড়ে এবং কেরাত চুপে চুপে পড়ে– এ সময় অন্য কোনো মুসল্লি এসে তার ইকতেদা করে তবে যদি সে পুরো কেরাতও পড়ে ফেলে তবুও তার হুকুম হচ্ছে– সে দ্বিতীয়বার উচ্চৈঃস্বরে সূরা ফাতিহা পড়বে। যেরূপ উল্লেখ রয়েছে 'খুলাসাহ' নামক গ্রন্থে। اَلْقُنْيَه নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, যেখানে এসে মুক্তাদী শরিক হয়েছে সেখান থেকে কেরাত উচ্চৈঃস্বরে পড়বে।

জোহর ও আসরের কেরাত চুপে চুপে পড়বে : জোহর ও আসরের নামাজে ইমামের জন্য চুপে চুপে কেরাত পড়া ওয়াজিব। সুতরাং জামাতের অবস্থায় যখন ইখফা [নিচু আওয়াজ] করা ওয়াজিব তখন মুনফারিদের জন্য জোহর ও আসরের নামাজে ইখফা করা অবশ্যই ওয়াজিব। দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেন– صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ "দিবসের নামাজে এমন কেরাত নেই যা শোনা যায়।" অর্থাৎ এ দুই নামাজে কোনো জেহরী কেরাত নেই; তবে سِرِّىْ কেরাত আছে।

قَوْلُهُ لَا غَيْرَ : অর্থাৎ উল্লিখিত জুমা, দুই ঈদ, ফজর, মাগরিব ও ইশা ব্যতীত অন্য কোনো নামাজে কেরাত جَهْرِىْ -ভাবে পড়বে না; বরং سِرِّىْ পড়বে। তবে সাহেবাইন (র.) -এর নিকট রমজানে তারাবীহ এবং বিতরের নামাজে কেরাত جَهْرِىْ পড়া ওয়াজিব। অনুরূপ صَلَاةُ الْاِسْتِسْقَاءِ এবং صَلَاةُ الْكُسُوْفِ -এর মাঝেও কেরাত جَهْرِىْ করা তাঁদের নিকট ওয়াজিব। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা لَا غَيْر -এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন لَا غَيْرَ الْاِمَامِ অর্থাৎ উল্লিখিত নামাজে ইমামের জন্য কেরাত جَهْرِىْ -ভাবে পড়া ওয়াজিব; মুনফারিদ -এর জন্য নয় এবং মুক্তাদীর জন্য مُطْلَقًا কেরাতই নেই। জেহরীও নেই, সিররীও নেই।

নামাজে মুনফারিদ -এর কেরাত : যদি কোনো মুনফারিদ ব্যক্তি جَهْرِىْ নামাজ পড়ে এবং اَدَاء পড়ে; কাজা নয়– তবে তার জন্য সম্পূর্ণ اِخْتِيَارْ সে ইচ্ছা করলে কেরাত جَهْرًا পড়তে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে চুপে চুপেও পড়তে পারবে। কেননা, جَهْرًا কেরাত পড়া হচ্ছে জামাতের বৈশিষ্ট্য। এখানে যেহেতু জামাত নেই, তাই جَهْر করার ওয়াজিবও নেই, তবে جَهْر করা উত্তম। আর যদি মুনফারিদ ব্যক্তি কাজা নামাজ পড়ে তবে কেরাত سِرِّىْ পড়া ওয়াজিব।

مُتَأَخِّرِيْن ফুকাহায়ে কেরাম মুনফারিদ -এর سِرِّىْ নামাজের কেরাত সম্পর্কে বলেছেন, এতে سِرِّىْ কেরাত পড়া ওয়াজিব। কেরাত সম্পর্কিত উল্লিখিত সমস্ত বিবরণ হচ্ছে ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে। নফল নামাজের কেরাতের হুকুম হচ্ছে, দিনে سِرًّا কেরাত পড়া ওয়াজিব, আর রাতে তার ইচ্ছা, তবে রাতে جَهْرًا কেরাত পড়া উত্তম।

سِرّ ও جَهْر -এর সর্বনিম্ন স্তর : কেরাতকে جَهْر পড়ার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, ইমামের কেরাত আশপাশের মুক্তাদীগণ শুনবে। এখন যদি ইমাম এত বেশি উচ্চৈঃস্বরে পড়ে যে, সমস্ত মুসল্লি শুনে তবে ভালো। কিন্তু সমস্ত মুক্তাদীকে কেরাত শুনানো ইমামের জন্য আবশ্যক নয়; বরং আশপাশের কয়েকজন শুনলেই যথেষ্ট। এটিই جَهْر -এর সর্বনিম্ন স্তর।

আর سِرّ -এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, এত চুপে চুপে পড়া যে, শুধু নিজে নিজেই শুনে– আশপাশের লোকজন তার আওয়াজ শুনে না। আর যদি আশপাশের লোকজন তার ফিসফিস আওয়াজ শুনতে পায়, তবে তা হবে سِرّ -এর সর্বোচ্চ স্তর।

قَوْلُهُ تَصْحِيْحُ الْحُرُوْفِ : اَدْنَى الْمُخَافَتَةِ -এর ব্যাখ্যা تَصْحِيْحُ الْحُرُوْفِ দ্বারা করা উচিত নয়। কারণ, চুপে চুপে কেরাত পড়ার অর্থ হচ্ছে– মুখে বলতে হবে। আর মুখে বলাটা হয় اَلْفَاظْ বা শব্দ দ্বারা আর اَلْفَاظْ হয় হরফ বা অক্ষর দ্বারা। আর حَرْف ঐ অবস্থার নাম যা আওয়াজের উপযুক্ত হয়। অতএব, আওয়াজ ব্যতীত শুধু تَصْحِيْحُ الْحُرُوْفِ -এর মাঝে حَرْف -ই হয় না; বরং এর দ্বারা হরফের مَخْرَجْ -এর দিকে ইশারা করা হয়। আর শুধু হরফের مَخْرَجْ -এর দিকে ইশারা করার দ্বারা حَرْف হয় না। অতএব, শুধু تَصْحِيْحُ الْحُرُوْفِ দ্বারা اَدْنَى الْمُخَافَتَةِ হতে পারে না।

فَإِنْ تَرَكَ سُوْرَةً أُوْلَى الْعِشَاءِ قَرَأَهَا بَعْدَ فَاتِحَةِ أُخْرَيَيْهِ وَجَهَرَ بِهِمَا إِنْ أَمَّ وَلَوْ تَرَكَ فَاتِحَتَهُمَا لَمْ يُعِدْ لِأَنَّهُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَلَوْ قَضَى فِيْهِمَا فَاتِحَةَ الْأُوْلَيَيْنِ يَلْزَمُ تَكْرَارُ الْفَاتِحَةِ فِيْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ ذَا غَيْرُ مَشْرُوْعٍ وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ آيَةٌ وَالْمُكْتَفِيْ بِهَا مُسِيْئٌ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَسُنَّتُهَا فِي السَّفَرِ عُجْلَةٍ نِ الْفَاتِحَةُ وَأَيُّ سُوْرَةٍ شَاءَ وَأَمَنَةٍ نَحْوَ الْبُرُوْجِ وَانْشَقَّتْ وَفِي الْحَضَرِ اِسْتَحْسَنُوْا طِوَالَ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَأَوْسَاطَهُ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَقِصَارَهُ فِي الْمَغْرِبِ وَمِنَ الْحُجُرَاتِ طِوَالُهُ إِلَى الْبُرُوْجِ وَمِنْهَا أَوْسَاطُهُ إِلَى لَمْ يَكُنْ وَمِنْهَا قِصَارُهُ إِلَى الْآخِرِ وَفِي الضَّرُوْرَةِ بِقَدْرِ الْحَالِ وَكُرِهَ تَوْقِيْتُ سُوْرَةٍ لِلصَّلٰوةِ أَيْ تَعْيِيْنُ سُوْرَةٍ لِلصَّلٰوةِ بِحَيْثُ لَا يَقْرَأُ فِيْهَا إِلَّا تِلْكَ السُّوْرَةَ ـ

অনুবাদ : যদি কেউ ইশার প্রথম দুই রাকাতে সূরা না পড়ে তবে শেষ দুই রাকাতে ফাতিহার পর সূরা পড়বে। আর যদি সে ইমাম হয় তবে جَهْرًا কেরাত পড়বে। যদি প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা বর্জন করে তবে [শেষ দুই রাকাতে] তা দোহরাবে না। কেননা, সে শেষ দুই রাকাতে এমনিই সূরা ফাতিহা পড়বে। এখন যদি সে এতে প্রথম দুই রাকাতের ফাতিহাকে কাজা করে তবে এক রাকাতে ফাতিহা দুবার হয়ে যাবে। আর তা শরিয়ত অনুমোদিত নয়। ফরজ কেরাতের নিম্ন পরিমাণ হচ্ছে এক আয়াত। কিন্তু এক আয়াত পড়ুয়া ব্যক্তি ওয়াজিব বর্জন করার কারণে গুনাহগার হবে। সফরে কেরাতের সুন্নত হচ্ছে, যদি তাড়াহুড়া থাকে তবে সূরা ফাতিহা এবং অন্য যে কোনো সূরা ইচ্ছা [পড়বে]। আর যদি তাড়াহুড়া না থাকে তবে সূরা বুরূজ ও সূরা ইনশাককাত-এর মতো সূরা [পড়বে]। হযর [ইকামত]-এ ফুকাহায়ে কেরাম, ফজর ও জোহরে طِوَالُ الْمُفَصَّلِ চয়ন করেছেন– আসর ইশায় أَوْسَاطُ الْمُفَصَّلِ চয়ন করেছেন এবং মাগরিবে قِصَارُ الْمُفَصَّلِ চয়ন করেছেন। আর طِوَالُ الْمُفَصَّلِ হচ্ছে সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত। أَوْسَاطُ الْمُفَصَّلِ হচ্ছে সূরা বুরূজের পর থেকে সূরা لَمْ يَكُنْ পর্যন্ত। قِصَارُ الْمُفَصَّلِ হচ্ছে সূরা لَمْ يَكُنْ-এর পর থেকে শেষ পর্যন্ত। প্রয়োজনের সময় মুসল্লি পরিমাণ মতো কেরাত পড়বে। কোনো নামাজের জন্য কোনো সূরাকে নির্ধারণ করে নেওয়া মাকরূহ। অর্থাৎ কোনো নামাজের জন্য কোনো সূরাকে এমনভাবে নির্ধারণ করা যে, সে নামাজে ঐ সূরাই পড়া হবে; অন্য সূরা নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَ سُوْرَةً أُوْلَى الخ : এখানে ইশাকে নির্ধারণ করা হয়েছে জেহরী নামাজের কারণে যে, যদি ইমাম প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা না পড়ে থাকে তবে শেষ দুই রাকাতে সেই সূরা কাজা করে নেবে। আর যদি নামাজ জেহরী না হয়। যেমন– জোহর, আসর হয়– তবুও এটিই হুকুম এবং এ হুকুমটি শুধু ইমামের সাথেও সুনির্দিষ্ট নয়; বরং মুনফারিদও এতে শামিল।

পক্ষান্তরে যদি প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা না পড়ে তবে শেষ দুই রাকাতে একে কাজা করবে না; বরং শেষ দুই রাকাতে নির্ধারিত ফাতিহা পড়বে। কারণ, যদি এতে প্রথম দুই রাকাতের ফাতিহাকে কাজা করা হয়, তবে একই রাকাতে ফাতিহা দুবার হয়ে যায়, যা শরিয়ত অনুমোদিত নয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, শেষ দুই রাকাতে তো ফাতিহা পড়া কিংবা তসবিহ পড়া কিংবা চুপ থাকারও অনুমতি রয়েছে। এতএব, যদি কেউ ফাতিহা না পড়ে তসবিহ পড়ে এবং প্রথম দুই রাকাতের ফাতিহাকে কাজা করে তবে তো এক রাকাতে দুবার ফাতিহা হবে না।

এর উত্তর হচ্ছে, শেষ দুই রাকাতের ফাতিহা যদিও ফরজ নয়; কিন্তু ফাতিহা পড়া উত্তম; বরং তা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ, যার বিস্তারিত বিবরণ ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এখন নামাজের প্রকাশ্য অবস্থা দেখে বুঝা যায় যে, যদি সে ইমাম হয় তবে সে ফাতিহাকে বর্জন করবে না। এতদসত্ত্বেও যদি সে কাজা করে, তবে অবশ্যই ফাতিহা দুবার হবে, যা অনুমোদিত নয়।

নিম্নে এক আয়াত কেরাত পড়া ফরজ : অর্থাৎ কেরাতে ফরজ পরিমাণ হচ্ছে– কমপক্ষে এক আয়াত। আর কুরআনে এক আয়াতের সর্বনিম্ন অক্ষর পাঁচটি। যেমন– ثُمَّ نَظَرَ ছয় অক্ষরবিশিষ্ট আয়াতকেও কম অক্ষরবিশিষ্ট আয়াত বলা হয়। যেমন– وَالطُّوْرِ، وَالْفَجْرِ، وَالْعَصْرِ ইত্যাদি। কারো কারো নিকট এক অক্ষরও এক আয়াত হয়। যেমন– حُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتِ তথা صٓ - قٓ কিংবা দুই বা তিন অক্ষরে এক আয়াত হয়। যেমন– الٓرٰ، يٰسٓ، طٰهٰ ইত্যাদি। কিন্তু حُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتِ-এর এক এক অক্ষরকে এক এক আয়াত গণনা করার ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে– حُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتِ -এর অক্ষরকে এক আয়াত ধরা বৈধ নয়।

সর্বোপরি ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ এক রাকাতে শুধু এক আয়াত পড়ে, তবে সে গুনাহগার হবে। আর যদি কেউ ভুলে এমনটি করে, তবে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। কেননা, সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব ছিল, আর ওয়াজিব বর্জন করার কারণে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। অনুরূপ যদি কেউ শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে এবং এর সঙ্গে অন্য সূরা না মিলায় তবুও তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। কারণ, অন্য সূরা মিলানোও ওয়াজিব ছিল। তবে উভয় সুরতে আল্লাহর বাণী فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -এর দ্বারা আমল হয়ে যায়।

নামাজে সুন্নত কেরাত : নামাজি ব্যক্তির অবস্থা পরিবর্তনের কারণে নামাজের সুন্নত কেরাতের মাঝেও পরিবর্তন ঘটে। কারণ, নামাজি ব্যক্তি হয়তো সফরে থাকবে; কিংবা হযর (حَضَرْ) -এ থাকবে। অতঃপর উভয়টি আবার দু প্রকার। হয়তো তাড়াহুড়া থাকবে; কিংবা তাড়াহুড়া থাকবে না। অতএব, যদি নামাজি ব্যক্তি সফরে থাকে এবং তার তাড়াহুড়া থাকে তবে তার জন্য সুন্নত কেরাত হচ্ছে সূরা ফাতিহা পড়া এবং এর সঙ্গে অন্য যে-কোনো একটি সূরা পড়া। আর যদি সে সফরে থাকে আর তাড়াহুড়া না থাকে তবে তার জন্য সুন্নত কেরাত হচ্ছে– সূরা বুরূজ, সূরা ইনশিকাক কিংবা অনুরূপ কোনো সূরা পড়া।

পক্ষান্তরে যদি নামাজি ব্যক্তি হযর [ইকামত] -এ থাকে আর তার তাড়াহুড়া না থাকে তবে তার জন্য সুন্নত কেরাত হচ্ছে– ফজর ও জোহরে طِوَالُ الْمُفَصَّلِ আসর ও ইশায় اَوْسَاطُ الْمُفَصَّلِ এবং মাগরিবে قِصَارُ الْمُفَصَّلِ - আর যদি তার তাড়াহুড়া থাকে তবে তার জন্য সুন্নত কেরাত হচ্ছে তার প্রয়োজন অনুযায়ী কেরাত পড়া।

طِوَالُ الْمُفَصَّلِ ও اَوْسَاطُ الْمُفَصَّلِ - قِصَارُ الْمُفَصَّلِ -এর পরিচয় : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) লেখেছেন, طِوَالُ الْمُفَصَّلِ হচ্ছে– সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত, اَوْسَاطُ الْمُفَصَّلِ হচ্ছে– সূরা বুরূজের পর থেকে নিয়ে সূরা বায়্যিনাহ পর্যন্ত, আর قِصَارُ الْمُفَصَّلِ হচ্ছে– সূরা বায়্যিনাহ-এর পর থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত।

মাওলানা আবদুস সামাদ সারেম আল-আযহারী (র.) تَارِيْخُ الْقُرْاٰنِ নামক গ্রন্থে লেখেন, সূরা قٓ থেকে সূরা مُرْسَلَاتْ পর্যন্ত طِوَالُ الْمُفَصَّلِ সূরা নাবা থেকে সূরা ضُحٰى পর্যন্ত اَوْسَاطُ الْمُفَصَّلِ এবং সূরা اِنْشِرَاحْ থেকে শেষ পর্যন্ত হচ্ছে قِصَارُ الْمُفَصَّلِ ।

ফজরে রাসূল ﷺ -এর কেরাত : বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূল ﷺ ফজরে কখনো সূরা وَالطُّوْرِ এবং সূরা تَكْوِيْر এবং কখনো সূর قٓ পড়তেন। সেসব রেওয়ায়েত ইমাম বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাঊদ (র.) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ জোহর নামাজে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, আমরা জোহর ও আসরে হুজুর ﷺ -এর قِيَامْ-কে অনুমান করতাম [যে, তিনি কতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং এতক্ষণে কোন সূরা পড়া যায়।] অতএব, আমরা জোহরের প্রথম দুই রাকাতে 'আলিফ লাম মীম সাজদা' সূরা পরিমাণ তাঁর قِيَامْ-কে অনুমান করেছি। –[মুসলিম শরীফ]

কোনো নামাজের জন্য কোনো সূরাকে নির্ধারণ করা মাকরূহ : অর্থাৎ কোনো খাস সূরাকে কোনো খাস নামাজের জন্য নির্ধারণ করা যে, এই খাস সূরা ব্যতীত অন্য কোনো সূরা এই খাস নামাজে পড়ব না, তবে তা মাকরূহ হবে। কারণ, ঐ নামাজে ঐ খাস সূরা ব্যতীতও পূর্ণ কুরআনের যে-কোনো অংশ ও সূরা পড়ার অনুমতি রয়েছে। শরিয়ত এর জন্য কোনো খাস সূরাকে নির্ধারণ করেনি। অতএব, শরিয়ত যা নির্ধারণ করেনি, তা নির্ধারণ করার দ্বারা সাধারণ জনতার আকিদায় ক্ষতি হয়। কেননা, তারা এটাকে এর জন্য আবশ্যক মনে করে। হ্যাঁ যেখানে শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা পাওয়া যায়, সেখানে মাকরূহ হবে না। যেমন– প্রমাণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ফজরের নামাজে সূরা জুমু'আ, সূরা قٓ , সূরা দাহর ইত্যাদি পড়তেন। এখন যদি কেউ হুজুর ﷺ -এর অনুসরণ করত এসব সূরা ফজরের নামাজে পড়ে তবে তা মাকরূহ হবে না।

وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ لَهٗ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهٗ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا لِيْ اُنَازِعُ فِي الْقُرْاٰنِ وَسُكُوْتُ الْاِمَامِ لِيَقْرَأَ الْمُؤْتَمُّ قَلْبُ الْمَوْضُوْعِ وَاِنْ قَرَأَ اِمَامُهٗ اٰيَةَ تَرْغِيْبٍ اَوْ تَرْهِيْبٍ اَوْ خُطَبٍ اَوْ صَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَّا اِذَا قَرَأَ قَوْلَهٗ تَعَالٰى صَلُّوْا عَلَيْهِ فَيُصَلِّيْ سِرًّا ـ

অনুবাদ : মুক্তাদী কেরাত পড়বে না, [বরং ইমামের কেরাত] শুনবে এবং চুপ থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন কুরআন পঠিত হয় তখন তোমরা তা শোন এবং চুপ থাক।" রাসূল ﷺ বলেছেন, "যখন ইমাম তাকবীর বলে তখন তোমরা তাকবীর বল– আর যখন সে কেরাত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাক।" নবী ﷺ আরো বলেছেন, "নামাজে যার ইমাম রয়েছে তখন [তার] ইমামের কেরাতই তার কেরাত।" নবী ﷺ আরো বলেছেন, "আমার কি হলো যে, আমি কুরআন [তেলাওয়াত]-এ ঝগড়া করছি।" আর মুক্তাদীর কেরাতের জন্য ইমামের চুপ থাকা লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিপন্থি। যদিও ইমাম উৎসাহ-উদ্দীপনা কিংবা ভয়-ভীতির আয়াত পড়েন, কিংবা খুতবা কিংবা নবী ﷺ-এর উপর দরুদ পড়েন [তবুও মুক্তাদী শুনবে এবং চুপ থাকবে]। কিন্তু যদি [খতিব আল্লাহর বাণী– صَلُّوْا عَلَيْهِ [তোমরা তাঁর উপর দরুদ পড়] পড়েন, তবে মুক্তাদী চুপে চুপে দরুদ পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ الخ :

قِرَاءَةُ خَلْفَ الْاِمَامِ-**এর মাসআলা :** এ মাসআলা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের অনেক বড় মতানৈক্য রয়েছে, যা বড় বড় কিতাবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এখানে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমামত্রয় বলেন, মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব; না পড়লে নামাজ হবে না। আর ওলামায়ে আহনাফ বলেন, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা কিংবা অন্য কোনো কেরাত পড়া হারাম।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমামত্রয়ের দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন– لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়েনি, তার নামাজ হবে না।" –[বুখারী ও মুসলিম]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, ইমাম ও মুক্তাদীকে খাস বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে, যে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামাজ হবে না। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, ইমাম ও মুক্তাদী প্রত্যেকের জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। আহনাফের দলিল হলো–

১. আল্লাহর বাণী– وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا

২. নবী ﷺ বলেছেন– اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

৩. তিনি আরো বলেন– مَنْ كَانَ لَهٗ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهٗ

৪. তিনি আরো বলেন– مَا لِيْ اُنَازِعُ فِي الْقُرْاٰنِ؟

উল্লিখিত একটি আয়াত এবং তিনটি হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইমাম যখন কেরাত পড়বেন, তখন মুক্তাদীর কেরাত পড়তে হবে না; বরং তার জন্য ইমামের কেরাত শোনা ওয়াজিব।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : ইমামত্রয় যে হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন তা হচ্ছে– خَبَر وَاحِدْ আর خَبَر وَاحِدْ দ্বারা كِتَابُ اللّٰهِ -এর উপর বৃদ্ধি করা জায়েজ নেই। আর كِتَابُ اللّٰهِ তথা فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ দ্বারা مُطْلَقْ কেরাত প্রমাণিত হয় এবং وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا দ্বারা মুক্তাদীর জন্য ইমামের কেরাত শোনা ফরজ প্রমাণিত হয়। অতএব, মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহাসহ কোনো সূরাই পড়তে পারবে না।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ : আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলা হয় যে, একদা রাসূল ﷺ নামাজ পড়ছিলেন, সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পিছনে কেরাত পড়তে শুরু করেন, যার আওয়াজ তাঁর কান পর্যন্ত পৌঁছতেছিল, যার কারণে তাঁর কেরাতের মাঝে অসুবিধা হচ্ছিল– তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছে যে, "যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা তা শুনবে এবং চুপ থাকবে।" এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তেলাওয়াত শোনা এবং চুপ থাকা ফরজ।

এক বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত আয়াত খুতবা প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু খুতবার অধিকাংশই কুরআনের আয়াত হয়ে থাকে, তাই বলা হয়েছে যে, যখন খুতবা পড়া হবে তখন যেহেতু এতে অধিকাংশ কুরআনের আয়াতই পড়া হয়, তাই তোমরা তা শোন এবং চুপ থাক। এর দ্বারাও বুঝা যায় যে, খুতবা শোনা এবং খুতবার সময় চুপ থাকা ফরজ। আর খুতবার মাঝে কুরআনের আয়াত থাকার কারণে যদি খুতবার সময় চুপ থাকা এবং খুতবা শোনা ফরজ হয়, তবে সরাসরি কুরআন তেলাওয়াতের সময় চুপ থাকা এবং শোনা আরো উত্তমরূপে ফরজ প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهٗ اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ فَكَبِّرُوْا : অর্থাৎ "ইমাম যখন তাকবীর বলেন তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, আর যখন তিনি কেরাত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে।" এ হাদীস ইমাম আবূ দাউদ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, মুক্তাদীর জন্য কেরাতের উক্ত নিষেধাজ্ঞা তখন যখন ইমাম কেরাত পড়তে থাকবেন; مُطْلَقْ নিষেধাজ্ঞা নয়। এজন্যই ইমাম মালেক (র.) جَهْرِىْ নামাজে শুধু মুক্তাদীর জন্য কেরাত পড়া নিষেধ বলেন।

قَوْلُهٗ مَنْ كَانَ لَهٗ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الخ : এ হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে– যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে– তার কেরাত পড়ার প্রয়োজন নেই; বরং ইমামের কেরাতই তার জন্য যথেষ্ট। এ হাদীসকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এর দ্বারা শুধু এটুকু বুঝে আসে যে, ইমামের কেরাত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। এর দ্বারা এটা বুঝা যায় না যে, মুক্তাদীর কেরাত মাকরূহ কিংবা নিষেধ।

উত্তর : এর উত্তর হলো, এ হাদীসে রাসূল ﷺ ইমামের কেরাতকে মুক্তাদীর ও কেরাত বলেছেন। অর্থাৎ যখন ইমাম কেরাত পড়ে তখন যেন মুক্তাদীও কেরাত পড়ে। তাই মুক্তাদীর কেরাতও حُكْمِىْ ভাবে হচ্ছে। এখন যদি মুক্তাদী নিজেও কেরাত পড়ে তবে তার দ্বিগুণ কেরাত হয়ে যাবে– ১. حُكْمِىْ ২. حَقِيْقِىْ হুকমী কেরাত হচ্ছে– যা তার পক্ষ থেকে ইমাম পড়ছে। আর হাকীকী হচ্ছে– যা সে নিজে পড়েছে। আর শরিয়তের মধ্যে এমন حُكْمِىْ ও حَقِيْقِىْ কেরাতের দৃষ্টান্ত নেই। তাই হাদীসের উদ্দেশ্য হবে, শরিয়তই মুক্তাদীকে কেরাত থেকে বারণ করেছে। কারণ, এর দ্বারা অন্য একটি খারাবি আবশ্যক হয়, যা وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا -এর শানে নুযূলের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। এর পরেও যদি কেউ কেরাত পড়ে তবে শরিতের বিধানকে ভাঙ্গা আবশ্যক হয়, যা মূলত শরিয়তে বাড়াবাড়ির নামান্তর।

قَوْلُهٗ مَا لِىْ اُنَازِعُ فِى الْقُرْاٰنِ : অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার কি হলো যে, আমি কুরআন পড়ার সময় খটকায় পড়ে যাচ্ছি! এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ। ইমাম মালেক (র.) স্বীয় মুয়াত্তার মাঝে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি এক নামাজ থেকে অবসর হয়েছেন, যাতে তিনি جَهْرِىْ কেরাত পড়েছেন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কি কেউ আমার সাথে সাথে কেরাত পড়েছে? এক ব্যক্তি আরজ করল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পড়েছি। তিনি

বললেন, إِنِّىْ أَقُوْلُ مَا لِىْ أُنَازِعُ فِى الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ "আমি বলি, আমি কিভাবে কুরআন পড়ছি যে, আমার খটকা হচ্ছে।" উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আমি কেরাত পড়ছি– তোমার কেরাতের আওয়াজ যখনই আমার কানে আসছে তখনই আমার খটকা সৃষ্টি হচ্ছে এবং আমার মনোযোগ এলোমেলো হয়ে গেছে। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর একথা শুনলেন, তখন নামাজে তাঁর পিছনে কেরাত পড়া ছেড়ে দিলেন।

প্রশ্ন : এ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন হতে পারে যে, এর দ্বারা ঐ কেরাতের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয় যা খটকা সৃষ্টি করে, مُطْلَقْ কেরাতের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয় না। বিশেষভাবে সিররী নামাজে এবং জেহরী নামাজে যখন ওয়াকফ করা হয়, তখন কেরাত পড়া নিষিদ্ধ হয় না। এজন্যই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ইমামের পিছনে মনে মনে সূরা ফাতিহা পড়ার ফতোয়া দেন।

উত্তর : এর উত্তর হচ্ছে– যেহেতু মুক্তাদীর কেরাত ইমামের কেরাতের মাঝে খটকা সৃষ্টি করে থাকে এবং এর সম্ভাবনা থেকে যায়– অতএব, তা বাস্তবে খটকা সৃষ্টি করুক চাই না করুক তা নিষিদ্ধ।

قَوْلُهٗ وَسُكُوْتُ الْإِمَامِ لِيَقْرَأَ الْمُؤْتَمُّ : এটি একটি ঊহ্য প্রশ্নের উত্তর। **প্রশ্ন :** প্রশ্নটি হচ্ছে– ইমাম যখন কেরাতের মাঝখানে ওয়াকফ করে তখন মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়ে নেবে। এ পদ্ধতি ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, ইমাম ফাতিহা পড়ার পর এটুকু সময় চুপ থাকবে, যার মধ্যে মুক্তাদী ফাতিহা পড়ে নিতে পারে। এটি কুরআনের আয়াতেরও পরিপন্থি হচ্ছে না এবং حَدِيْثُ الْمُنَازَعَةِ-এরও পরিপন্থি হচ্ছে না। **উত্তর :** এর উত্তর হচ্ছে, ইমাম এজন্য যে, মুক্তাদী তার ইকতেদা করবে। আর মুক্তাদী এজন্য যে, সে সমস্ত কার্যের ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করবে। এখন যদি ইমাম মুক্তাদীকে কেরাত পড়ার সুযোগ দানের জন্য চুপ হয়ে যায়, তবে ইমাম মুক্তাদীর অনুসারী বলে প্রমাণিত হয়, আর এটা লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিপন্থি। অথচ ইমামকে নির্ধারণ করা হয়েছে কেরাত পড়ার জন্য।

قَوْلُهٗ وَاِنْ قَرَأَ اِمَامُهٗ اٰيَةَ تَرْغِيْبٍ : অর্থাৎ যদি ইমাম কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক আয়াত পড়ে। যেমন– এমন আয়াত পড়ল যার মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। কিংবা যদি ইমাম কোনো ভয়-ভীতির আয়াত পড়ে। যেমন– এমন আয়াত পড়ল যার মধ্যে জাহান্নামের শাস্তির বিবরণ রয়েছে– তবে এ সমস্ত স্থানেও মুক্তাদী চুপ থাকবে। জান্নাত পাওয়ার দোয়াও করবে না এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়াও করবে না। অনুরূপ যদি কোনো আয়াতে রাসূল ﷺ -এর নাম আসে, তবে দরূদ শরীফ পড়বে না; বরং চুপ থাকবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুক্তাদী সর্বাবস্থায় ইমামের কেরাত শুনবে এবং চুপ থাকবে।

খুতবা পড়ার সময়ও চুপ থাকবে : অর্থাৎ ইমাম যখন খুতবা পড়ে তখনও মুক্তাদী চুপ থাকবে এবং কিছুই পড়বে না। খুতবায় যদি হুজুর ﷺ -এর উপর দরূদ পড়া হয়, তবুও কিছু পড়বে না; বরং চুপ করে শুনতে থাকবে। কারণ, বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, খুতবায় খটকা সৃষ্টি করে এমন যে-কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। কিন্তু যদি খতিব ঐ আয়াত পড়ে যার মধ্যে দরূদ পড়ার নির্দেশ রয়েছে। যেমন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا তবে শ্রবণকারীগণ চুপে চুপে দরূদ শরীফ পড়বে। তবে এ দরূদ পড়া শুধুমাত্র উত্তম; ওয়াজিব নয়। হক কথা হচ্ছে, ওয়াকফ ও বিরতির স্থানে দরূদ পড়ায় অসুবিধা নেই। শর্ত হলো, খুতবা শ্রবণের মাঝে কোনো খটকা সৃষ্টি করতে পারবে না। যদি দরূদ পড়ার কারণে খুতবার মাঝে খটকা সৃষ্টি হয়; কিংবা খটকা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে এ দরূদ পড়াও মোস্তাহাব নয়।

فَصْلٌ فِى الْجَمَاعَةِ

اَلْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنَ الْوَاجِبِ وَالْاَوْلٰى بِالْاِمَامَةِ الْاَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ الْاَقْرَأُ ثُمَّ الْاَوْرَعُ ثُمَّ الْاَسَنُّ فَاِنْ اَمَّ عَبْدٌ اَوْ اَعْرَابِىٌّ اَوْ فَاسِقٌ اَوْ اَعْمٰى اَوْ مُبْتَدِعٌ اَوْ وَلَدُ الزِّنَا كُرِهَ كَجَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ وَيَقِفُ الْاِمَامُ فِىْ وَسْطِهِنَّ لَوْ فَعَلْنَ لَفْظُ الْاِمَامِ يَسْتَوِىْ فِيْهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فَلِهٰذَا لَمْ تَدْخُلْ تَاءُ التَّانِيْثِ فِيْهِ وَكَحُضُوْرِ الشَّابَّةِ كُلَّ جَمَاعَةٍ وَالْعَجُوْزِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ لَا الْبَاقِيَةَ اَىْ لَا بَاْسَ لِلْعَجُوْزَاتِ بِالْخُرُوْجِ فِى الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ـ

অনুচ্ছেদ : জামাত

অনুবাদ : জামাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ, যা ওয়াজিবের নিকটবর্তী। ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য ঐ ব্যক্তি [উপস্থিত লোকদের] যিনি সুন্নত [নামাজের মাসায়েল] সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। অতঃপর যিনি কেরাতে সর্বোত্তম, অতঃপর যিনি অধিক পরহেজগার, অতঃপর যিনি অধিক বয়সী। যদি গোলাম, গ্রাম্য লোক, ফাসিক কিংবা অন্ধ ব্যক্তি কিংবা বিদআতি কিংবা জারজ সন্তান যদি ইমামতি করে তবে তা মাকরূহ হবে। যেমন মাকরূহ শুধু মহিলাদের জামাত। যদি মহিলারা জামাত করে তবে ইমাম তাদের মধ্যখানে দাঁড়াবে। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে اِمَامٌ শব্দটি বরাবর। এজন্যই [মহিলাদের জামাতের ক্ষেত্রেও] اِمَامٌ শব্দে تَاءُ التَّانِيْثِ দাখিল হয়নি এবং যেমন যুবতী নারীদের প্রত্যেক জামাতে হাজির হওয়া মাকরূহ এবং বৃদ্ধাদের [যেমন] জোহর ও আসরে হাজির হওয়া মাকরূহ; অন্যান্য নামাজে নয়; অর্থাৎ বৃদ্ধা নারীদের মাগরিব, ইশা ও ফজরে বের হওয়াতে কোনো ক্ষতি নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ :

ফরজ নামাজের জামাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা : ফরজ নামাজসমূহ জামাতে পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর সুন্নতে মুয়াক্কাদাও এমন যা ফরজের কাছাকাছি। এ ব্যাপারে ছয়টি অভিমত রয়েছে–

১. জামাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা যা ওয়াজিবের কাছাকাছি। একে সুন্নতে হুদাও বলা হয়। এর ছওয়াব অনেক বেশি এবং ওজর ব্যতীত তা বর্জনকারী ভর্ৎসনার যোগ্য। দলিল হচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত– রাসূল ﷺ বলেছেন– "যার এ কামনা আছে যে, পূর্ণাঙ্গ মুমিন হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে যেন আজানের সাথে সাথে নামাজের হেফাজত করে। কেননা, আল্লাহ নবীর জন্য সুন্নতে হুদা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদি তোমরা জামাতে থেকে পিছনে থাকা ব্যক্তির মতো ফরজ নামাজও ঘরে পড় তবে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নতকে ছেড়ে দিলে। যদি তোমরা সুন্নত ছেড়ে দাও তবে তোমরা গোমরাহ হয়ে যাবে। আর জামাতে নামাজ পড়া থেকে একমাত্র মুনাফিকই বিরত থাকে।"
২. জামাত মোস্তাহাব। দলিল হলো ঐ সব হাদীস যেগুলোতে জামাতের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– জামাতে নামাজ পড়া একা নামাজ পড়ার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি ছওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ ইমাম এ অভিমতকে প্রত্যাখ্যান

করেছেন। কেননা, যদি জামাত মোস্তাহাব হতো, তবে জামাত বর্জনকারীর জন্য وَعِيْد [ধমকি] আসত না। অথচ ওজর ব্যতীত জামাত বর্জনকারীর জন্য وَعِيْد এসেছে। এক হাদীসে আছে যে, যে মহল্লায় কমপক্ষে তিনজন লোক আছে সেখানে যদি জামাতে কায়েম না হয় তবে শয়তান তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে। অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, যারা আজান শুনে ওজর ব্যতীত জামাতে শরিক না হয়, আমার মন চায়, ইমামতিতে অন্য কাউকে দিয়ে আমি গিয়ে তাদের ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেই।

৩. জামাত ওয়াজিব; কোনো কোনো ইমাম এ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
৪. জামাত ফরজে কিফায়া। ইমাম তাহাবী (র.) ও শাফেয়ী ইমামগণের অভিমত এটিই।
৫. জামাত ফরজে আইন, তবে নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। ইমাম আহমদ (র.) ও কোনো কোনো শাফেয়ী ইমাম এ অভিমতকেই সহীহ বলেন।
৬. জামাত নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত।

قَوْلُهُ وَالْاَوْلٰى بِالْاِمَامَةِ الخ :

অধিক উপযুক্ত ইমামদের ধারাবাহিকতা : উপস্থিত মুসল্লিদের মাঝে যারা ইমামতি করার উপযুক্ত, তাদের কায়েকটি স্তর রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, সর্বাগ্রে ইমামতির যোগ্য হচ্ছেন, যিনি নামাজের বিধিবিধান সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। দলিল হলো, রাসূল ﷺ তাঁর অসুস্থতার সময় হযরত আবূ বকর (রা.)-কে ইমামতির জন্য অগ্রে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন যিনি কুরআন ভালোভাবে পাঠ করতে জানেন তাঁর দলিল হলো, নামাজে কেরাত এমন একটি রুকন, যা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আর ইলম -এর প্রয়োজন তো তখন দেখা দেয়, যখন নামাজে কোনো প্রকার ভুলত্রুটি হয়ে যায়।

জমহুরের পক্ষ থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের উত্তরে বলা হয়, কেরাতের প্রয়োজন শুধু একটি রুকনের ক্ষেত্রে, আর ইলম-এর প্রয়োজন সমস্ত রুকনের ক্ষেত্রে। কারণ নামাজ ফাসিদকারী ও সহীহকারী বস্তু ইলম দ্বারাই জানা যায়

২. তারপর সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন যিনি কেরাতে সর্বোত্তম। দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন– يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ অর্থাৎ "কওমের ইমামতি করবেন যিনি আল্লাহর কিতাবকে ভালোভাবে পাঠ করতে পারেন।"

৩. যদি কেরাতে সকলে বরাবর হয়, তবে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তি ইমামতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন– مَنْ صَلّٰى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ فَكَاَنَّمَا خَلْفَ نَبِيٍّ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি একজন আল্লাহভীরু আলিমের পিছনে নামাজ পড়ল, সে যেন একজন নবীর পিছনে নামাজ পড়ল।" [তবে মোল্লা আলী কারী (র.) বলেছেন– এ হাদীসটি مَوْضُوْع]

৪. যদি তাকওয়ার দিক থেকে সকলে বরাবর হয়, তবে বয়সে সর্বাধিক বড় যিনি তিনি ইমামতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। দলিল হলো, রাসূল ﷺ আবূ মুলায়কার পুত্রদ্বয়কে বলেছিলেন– وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا سِنًّا "তোমাদের দুয়ের বড়জন ইমামতি করবে।"

৫. বয়সেও যদি সকলে বরাবর হয়, তবে যার চরিত্র অধিক ভালো তিনি ইমামতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন– خِيَارُكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে আখলাকে সর্বোত্তম।"

৬. আখলাকেও যদি সকলে বরাবর হয় যিনি অধিক সুন্দর তিনি ইমামতির অধিক যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৭. যদি সৌন্দর্যেও সকলে বরাবর হয়, তবে বংশীয়ভাবে যে সর্বাগ্রে তিনি ইমামতির অধিক যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৮. বংশীয়ভাবেও যদি সকলে বরাবর হয়, তবে যার স্ত্রী অধিক সুন্দরী তিনি ইমামতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৯. এতেও যদি সকলে বরাবর হয় তবে লটারির মাধ্যমে ইমাম বানানো হবে।

قَوْلُهُ فَاِنْ اَمَّ عَبْدٌ اَوْ اَعْرَابِيٌّ الخ :

যাদের ইমামতি করা মাকরূহ : কতিপয় লোক এমন রয়েছে যাদের ইমামতি করা কিংবা যাদের পিছনে নামাজ পড়া মাকরূহ।

১. স্বাধীন ব্যক্তি উপস্থিত থাকাবস্থায় গোলামের ইমামতি করা মাকরূহ। যদিও সে আজাদকৃত গোলাম হয়। দলিল হলো, গোলাম ব্যক্তি নামাজের মাসআলা-মাসায়েল শেখার সময় পায় না; নামাজের আহকাম সম্পর্কে তার জ্ঞান কম থাকে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি স্বাধীন ব্যক্তি এবং গোলাম কেরাত, ইলম ও পরহেজগারিতে সমান হয় তবে স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না। তাঁর দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন–

اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَلَوْ أُمِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ اَجْدَعُ .

অর্থাৎ "শুন এবং মান, যদিও তোমাদের উপর হাবশী গোলামকে আমির নিযুক্ত করে দেওয়া হয়।"এর উত্তরে আমরা বলি যে, উক্ত হাদীস দ্বারা অধিনায়কত্ব ও আমিরত্ব উদ্দেশ্য; ইমামতি উদ্দেশ্য নয়।

২. বেদুইন ও গ্রাম্য ব্যক্তিরও ইমামতি করা মাকরূহ। কারণ, মূর্খতাই তার মাঝে প্রবল। তা ছাড়া রাসূল ﷺ বলেছেন–

اَلَا لَا يَؤُمَّنَّ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا اَعْرَابِيٌّ .

অর্থাৎ "সাবধান! কোনো মহিলা যেন পুরুষের ইমামতি না করে এবং কোনো বেদুইনও যেন ইমামতি না করে।"

৩. ফাসিকের জন্যও ইমামতি করা মাকরূহ। কারণ, সে দীনি বিষয়ে যত্নবান নয়। ইমাম মালেক (র.) বলেন, ফাসিকের ইমামতি জায়েজই নেই। কারণ, যখন তার থেকে দীনি ব্যাপারে খেয়ানত পাওয়া গেল, তখন সে নামাজের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও দায়িত্বশীল হতে পারবে না। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আনাস ইবনে মালেক ও অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ– রাঈসুল ফুস্‌সাক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পিছনে নামাজ পড়েছেন।

৪. অন্ধ ব্যক্তির জন্যও ইমামতি করা মাকরূহ। কেননা, সে অন্ধ হওয়ার কারণে নাপাকী থেকে পূর্ণাঙ্গরূপে বেঁচে থাকতে পারে না।

৫. বিদআতি ব্যক্তির জন্য ইমামতি করা মাকরূহ। কেননা, সে শরিয়ত বহির্ভূত বিষয়গুলো শরিয়তের বিষয় সাব্যস্ত করে এবং সেগুলোকে শরিয়ত বলে চালিয়ে দেয়। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্নৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন– ফাসিক ব্যক্তির ইমামতির চেয়ে বিদআতি ব্যক্তির ইমামতি অধিক গাঢ় মাকরূহ।

৬. জারজ সন্তানের জন্যও ইমামতি করা মাকরূহ। কারণ, তার পিতা না থাকার কারণে সে দীনি শিক্ষাদীক্ষা লাভ করতে পারে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের পিছনে নামাজ পড়া তো মাকরূহ যদি তাদেরকে আগে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এখন যদি তারা আগে বেড়ে নামাজ পড়াতে থাকে তবে নামাজ হয়ে যাবে। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন– صَلُّوْا خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ অর্থাৎ "তোমরা নেককার এবং বদকার সকল ইমামের পিছনেই নামাজ পড়বে।"

قَوْلُهُ كَجَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ :

শুধু মহিলাদের জামাত মাকরূহ : পুরুষবিহীন শুধু মহিলাদের জন্য জামাত করা মাকরূহ। একান্ত যদি তাদেরকে জামাত করতেই হয়, তবে তাদের মহিলা ইমাম কাতারের সামনে দাঁড়াবে না; বরং কাতারে মধ্যখানে সামান্য সামনে দাঁড়াবে এবং জেহরী নামাজে কেরাত জেহরী করবে না। কেননা, এতে পর্দার বিধান লঙ্ঘন হয়।

قَوْلُهُ وَكَحُضُوْرِ الشَّابَّةِ اِلخ :

যুবতীদের যে-কোনো জামাতে শরিক হওয়া মাকরূহ : যুবতী মহিলাদের পুরুষের সাথে যে-কোনো জামাতে শরিক হওয়া মাকরূহ। চাই দিনে হোক কিংবা রাতে হোক। কেননা, কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। তবে বৃদ্ধা মহিলারা রাতে পুরুষের সাথে জামাতে শরিক হওয়ার জন্য বের হওয়া মাকরূহ নয়। কারণ, রাতের অন্ধকারে পর্দা করা সম্ভব। কিন্তু দিনের নামাজের জন্য বৃদ্ধা মহিলারও বের হওয়া মাকরূহ। কারণ, দিনে পর্দা করা সম্ভব হয় না, তবে বর্তমানে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাই বর্তমানে বৃদ্ধা মহিলাদের জন্যও কোনো নামাজের জামাতে শরিক হওয়া নিষেধ। যদিও হাদীস দ্বারা মহিলাদের জামাতে শরিক হওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়। তবে সে যুগে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার কোনো ভয় ছিল না। রাসূল ﷺ -এর পরে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এই ফিতনার যুগে যদি রাসূল ﷺ থাকতেন তবে মহিলাদেরকে জামাতে শরিক হওয়া থেকে বারণ করতেন। অথচ সে যুগ ছিল সাহাবীদের যুগ। যাকে বলা হয় সোনালি যুগ। এর দ্বারা বুঝা যায়, যদি বর্তমান যুগে রাসূল ﷺ থাকতেন, তবে মহিলাদের জন্য জামাতে শরিক হওয়া হারাম করে দিতেন।

وَيَقْتَدِي الْمُتَوَضِّئُ بِالْمُتَيَمِّمِ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَالْخَلْفِيَّةُ فِي التُّرَابِ عِنْدَنَا وَالْغَاسِلُ بِالْمَاسِحِ لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ مِنْ سِرَايَةِ الْحَدَثِ إِلَى الرِّجْلِ وَمَا عَلَى الْخُفِّ طَهُرَ بِالْمَسْحِ وَالْقَائِمُ بِالْقَاعِدِ بِنَاءً عَلَى فِعْلِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمُؤْمِئُ بِالْمُؤْمِئِ وَالْمُتَنَفِّلُ بِالْمُفْتَرِضِ لَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ لِأَنَّ الْوَاجِبَ تَاخِيْرُهُنَّ بِالنَّصِّ وَطَاهِرٌ بِمَعْذُوْرٍ وَقَارِئٌ بِأُمِّيٍّ وَلَابِسٌ بِعَارٍ وَغَيْرُ مُؤْمِئٍ بِمُؤْمِئٍ وَمُفْتَرِضٌ بِمُتَنَفِّلٍ لِأَنَّ بِنَاءَ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيْفِ لَا يَجُوْزُ وَمُفْتَرِضٌ فَرْضًا اٰخَرَ لِأَنَّ الْاِقْتِدَاءَ شَرْكَةٌ فَيَجِبُ الْاِتِّحَادُ ـ

অনুবাদ : অজুকারী ব্যক্তি তায়াম্মুমকারী ইমামের ইকতেদা করতে পারবে। কেননা, পানি না থাকার সময় তায়াম্মুম হচ্ছে মুতলাক তাহারাত। আমাদের নিকট স্থলাভিষিক্ততা মাটির ক্ষেত্রে। ধৌতকারী ব্যক্তি মাসেহকারী ইমামের [ইকতেদা করতে পারবে]। কেননা, মোজা পায়ের দিকে হদস সংক্রমিত হওয়ার প্রতিবন্ধক। আর যে হদস মোজার উপর ছিল তা মাসেহ করার দ্বারা পাক হয়ে গেছে। দণ্ডায়মান ব্যক্তি বসে নামাজ আদায়কারী ইমামের [ইকতেদা করতে পারবে], রাসূল ﷺ-এর আমলের উপর ভিত্তি করে। ইশারাকারী ব্যক্তি অন্য একজন ইশারাকারী ইমামের [পিছনে ইকতেদা করতে পারবে]। নফল আদায়কারী ব্যক্তি ফরজ আদায়কারী ইমামের [ইকতেদা করতে পারবে]। পুরুষ মহিলা কিংবা [নাবালেগ] বাচ্চার [ইকতেদা করতে পারবে না]। কেননা, নস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহিলাদেরকে পিছনে দেওয়া ওয়াজিব। পবিত্র ব্যক্তি মাজুর [অপবিত্র] ইমামের [ইকতেদা করতে পারবে না]। কারী মুক্তাদী উম্মী ইমামের, বস্ত্র পরিধেয় মুক্তাদী বিবস্ত্র ইমামের, ইশারাকারী নয় এমন মুক্তাদী ইশারাকারী ইমামের এবং ফরজ আদায়কারী মুক্তাদী নফল আদায়কারী ইমামের ইকতেদা করতে পারবে না। কেননা, মজবুত-শক্তিশালীর ভিত্তি দুর্বলের উপর জায়েজ নেই। এক ফরজ নামাজ আদায়কারী অন্য ফরজ নামাজ আদায়কারীরও [ইকতেদা করতে পারবে না]। কেননা, ইকতেদা হচ্ছে শিরকাত [অংশগ্রহণ]। তাই এর জন্য ইত্তিহাদ [এক হওয়া] ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَقْتَدِي الْمُتَوَضِّئُ بِالْمُتَيَمِّمِ الخ :

অজুকারী তায়াম্মুমকারীর ইকতেদা করতে পারবে : অজুকারী মুক্তাদী তায়াম্মুমকারী ইমামের ইকতেদা করতে পারবে। কেননা, আমাদের নিকট পানি না থাকাবস্থায় মাটিই মুতলাক পবিত্রকারী। যেমন পানি মুতলাক পবিত্রকারী। অতএব, পানি দ্বারা অজুকারী এবং মাটি দ্বারা তায়াম্মুমকারী ব্যক্তির মাঝে কোনো তফাত নেই।

قَوْلُهُ وَالْقَائِمُ بِالْقَاعِدِ الخ :

ধৌতকারী মাসেহকারীর ইকতেদা করতে পারবে : পা ধৌতকারী ব্যক্তি মোজার উপর মাসেহকারী ইমামের ইকতেদা করতে পারবে। কারণ, পা পর্যন্ত হদস সংক্রমিত হওয়ার জন্য মোজা প্রতিবন্ধক। কেননা, যখন হদস লেগেছে তখন তার মোজার মাসেহ ভেঙ্গে যায়নি। আর যে হদস মোজার উপরে ছিল তা তো মাসেহ করার দ্বারা পাক হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَالْقَائِمُ بِالْقَاعِدِ الخ :

قَائِمٌ ব্যক্তি قَاعِدٌ -এর ইকতেদা করতে পারবে : অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ুয়া ব্যক্তি ঐ ইমামের অনুসরণ করতে পারবে, যে ওজরের কারণে বসে বসে নামাজ পড়ছে। তবে বসে নামাজ আদায়ের সাথে শর্ত আছে যে, রুকু ও সিজদার সাথে নামাজ আদায় করতে হবে, তবেই সে তার ইকতেদা করতে পারবে। অন্যথায় যদি বসে নামাজ পড়ুয়া ব্যক্তি ইশারার মাধ্যমে নামাজ পড়ে তবে قَائِمٌ [দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ুয়া] ব্যক্তি তার ইকতেদা করতে পারবে না। কিন্তু কিয়াসের চাহিদা হচ্ছে– قَاعِدٌ -এর পিছনে قَائِمٌ -এর ইকতেদা সহীহ না হওয়া। কেননা, قِيَامٌ হচ্ছে ফরজ। এ কিয়াসের উপর ভিত্তি করেই ইমাম মুহাম্মদ (র.) قَاعِدٌ -এর পিছনে قَائِمٌ -এর ইকতেদা নাজায়েজ বলেন। তবে যখন আমরা হাদীস পেয়ে গেলাম যে, নবী ﷺ যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হয়ে গেলেন, তখন তিনি বসে বসে নামাজ পড়িয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম সকলেই দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছেন। তাই আমরা কিয়াসকে বর্জন করেছি।

قَوْلُهُ وَالْمُوْمِئُ بِالْمُوْمِئِ :

ইশারাকারী অন্য ইশারাকারীর ইকতেদা করতে পারবে : যে ব্যক্তি ইশারা করে নামাজ পড়ছে তিনি অন্য একজন ইশারাকারী ইমামের ইকতেদা করতে পারবে। কারণ, তারা উভয়ে وَصْف -এর ক্ষেত্রে বরাবর। কিন্তু প্র্যাক্টিকেল নামাজের আরকান আদায়কারী ব্যক্তি ইশারাকারীর ইকতেদা করতে পারবে না। কারণ, وَصْف -এর ক্ষেত্রে তারা উভয়ে বরাবর নয়।

قَوْلُهُ وَالْمُتَنَفِّلُ بِالْمُفْتَرِضِ :

নফল আদায়কারী ফরজ আদায়কারীর ইকতেদা করতে পারবে : ফরজ আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারী ইকতেদা করতে পারবে। কারণ, এ ক্ষেত্রে ইমাম اَقْوٰى তথা অধিক মজবুত। এ থেকে এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইকতেদা করার জন্য হয়তো উভয়ে বরাবর হতে হবে; কিংবা যার ইকতেদা করা হবে সে ইকতেদাকারীর চেয়ে উপর স্তরের হতে হবে। যেমন– ইমাম দাঁড়ানো আর মুক্তাদী বসা, কিংবা ইমাম ফরজ পড়েছেন আর মুক্তাদী নফল পড়ছে, কিন্তু এর পরিপন্থি সুরত জায়েজ নেই। যেমন– ইমাম নফল পড়ছেন, আর মুক্তাদী ফরজ পড়ছে। কিংবা ইমাম বসা আর মুক্তাদী দাঁড়ানো ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, মাগরিবের নামাজে নফল আদায়কারীও ফরজ আদায়কারীর ইকতেদা করতে পারবে না। কেননা, মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত আর নফল নামাজ তিন রাকাত নেই।

قَوْلُهُ لَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ :

পুরুষ মহিলা ও শিশুর ইকতেদা করতে পারবে না : কোনো পুরুষ মুসল্লি মহিলা ইমামের ইকতেদা করতে পারবে না। কারণ, রাসূল ﷺ এ থেকে নিষেধ করেছেন। অনুরূপ নাবালেগ বাচ্চার ইকতেদাও কোনো বালেগ পুরুষ করতে পারবে না। কেননা, বাচ্চা যদিও ফরজ পড়ছে, কিন্তু এ ফরজ নামাজ নফলে পরিণত হবে। কারণ, সে এখনও শরিয়তের مُكَلَّفٌ [দায়িত্বপ্রাপ্ত] হয়নি। ফলত তার নামাজ নফলে পরিগণিত হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন–

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَفِيْقَ -

অর্থাৎ "তিন ব্যক্তি থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়েছে– শিশু থেকে, সে বালেগ হওয়া পর্যন্ত। ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে, সে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত। পাগল থেকে, সে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত।" –[বুখারী, আবূ দাউদ]

পুরুষ মহিলার ইকতেদা করতে না পারার সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন– اَلَا لَا تَؤُمَّنَّ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا اَعْرَابِيٌّ অর্থাৎ "সাবধান, মহিলা যেন পুরুষের ইমামতি না করে এবং বেদুইন ব্যক্তিও যেন ইমামতি না করে।"

নাবালেগ হাফেজের পিছনে খতমে তারাবীহ : আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, যদি ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে নফল আদায়কারী হয়। যেমন– তারাবীহের নামাজ, তবে এ সম্পর্কে বালখ -এর ফুকাহা ও অধিকাংশ مُتَاَخِّرِيْن হানাফী ফকীহ বলেন, নাবালেগ হাফেজের জন্য তারাবীহের ইমামতি জায়েজ। কারণ, এখানে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে নফল আদায়কারী এবং এর দ্বারা হাফেজের হিফজ ইয়াদ থাকে। তা ছাড়া এর দ্বারা তার হিম্মত বাড়ে। কিন্তু

অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামই বলেছেন, নাবালেগ হাফেজের পিছনেও তারাবীহের ইকতেদা জায়েজ নেই। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন, আমার খেয়াল হলো, নাবালেগ হাফেজের হিফজ ইয়াদ রাখা ও তাকে সাহস দেওয়ার জন্য তার পিছনে খতমে তারাবীহের ইকতেদা সহীহ হওয়া উচিত।

পাক ব্যক্তি مَعْذُوْر নাপাক ব্যক্তির ইকতেদা করতে পারবে না : পাক ব্যক্তি– যে অজু ও গোসলের মাধ্যমে পাক হয়েছে– যার কোনো প্রকার عُذْر নেই, সে ওজরওয়ালা অর্থাৎ দায়েমী ওজরওয়ালা যেমন– নাকসীরওয়ালা কিংবা যার সর্বদা পেশাব পড়ে– এ ধরনের ব্যক্তির ইকতেদা করতে পারবে না। কারণ, যে ইকতেদা করছে তার কোনো প্রকার ওজর নেই। আর যার ইকতেদা করছে তার সর্বদা পেশাবের ফোঁটা পড়ছে; কিংবা সে নাকসীরওয়ালা। ফলত সুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতা পূর্ণাঙ্গ। আর ওজরওয়ালা ব্যক্তির পবিত্রতা অপূর্ণাঙ্গ।

قَوْلُهُ وَقَارِئٌ بِأُمِّيٍّ :

قَارِئٌ - أُمِّيٌّ-এর ইকতেদা করতে পারবে না : এখানে قَارِئٌ বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যার কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে। আর أُمِّيٌّ [উম্মী] বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যার কুরআনের এক আয়াতও মুখস্থ নেই। কেউ কেউ বলেন, قَارِئٌ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে দেখে দেখে কুরআন পড়তে সক্ষম এবং مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلَاةُ পরিমাণ তার মুখস্থও আছে। আর উম্মী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে কোনো না কোনোভাবে مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلَاةُ পরিমাণ মুখস্থ করে ফেলেছে, কিন্তু দেখে কুরআন পড়তে পারে না। قَارِئٌ ব্যক্তি أُمِّيٌّ ব্যক্তির ইকতেদা করতে পারবে না। কারণ, কারী কুরআন পড়তে জানে, আর উম্মী তা জানে না।

قَوْلُهُ وَلَابِسٌ بِعَارٍ :

বস্ত্র পরিধেয় ব্যক্তি বিবস্ত্র ব্যক্তির ইকতেদা করতে পারবে না : যে ব্যক্তি পোশাক পরিধেয় সে, যে ব্যক্তি পোশাক পরিধেয় নয়; বরং বিবস্ত্র তার ইকতেদা করতে পারবে না। এখানে বিবস্ত্র ব্যক্তি বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, যার কাছে এ পরিমাণ শরীর আবৃত করার কাপড় নেই– যে পরিমাণ অংশ নামাজে ঢাকা ফরজ। আর বস্ত্র পরিধেয় ব্যক্তি বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, যার কাছে এ পরিমাণ ঢাকার কাপড় আছে, যে পরিমাণ নামাজে ঢাকা ফরজ।

قَوْلُهُ وَغَيْرُ مُوْمٍ بِمُوْمٍ :

আরকানসহ নামাজ আদায়কারী ইশারাকারীর ইকতেদা করতে পারবে না : যে ব্যক্তি রুকু-সিজদা সবকিছু ঠিকমতো আদায় করে নামাজ আদায় করছে সে, যে ব্যক্তি ইশারা করে নামাজ পড়ছে তার পিছনে ইকতেদা করতে পারবে না। চাই এ রুকু-সিজদাসহ নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি বসে নামাজ আদায় করুক কিংবা দাঁড়িয়ে আদায় করুক। তবে এক ইশারাকারী ব্যক্তি অপর ইশারাকারী ব্যক্তির পিছনে ইকতেদা করতে পারবে। যদিও মুক্তাদী দাঁড়িয়ে ইশারা করে আর ইমাম বসে ইশারা করে।

قَوْلُهُ وَمُفْتَرِضٌ بِمُتَنَفِّلٍ :

ফরজ আদায়কারী নফল আদায়কারীর পিছনে ইকতেদা করতে পারবে না : নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর ইকতেদা সহীহ নয়। যেমন– ইমাম চার রাকাত নফল পড়ছে আর মুক্তাদী চার রাকাত ফরজ পড়ছে তবে তার ইকতেদা সহীহ হবে না। কারণ, নফলের ভিত্তি হচ্ছে দুর্বল এবং ফরজের ভিত্তি হচ্ছে মজবুত আর মজবুতের। ইকতেদা দুর্বলের পিছনে সহীহ হয় না; অনুরূপ এক ফরজ নামাজ আদায়কারী অন্য ফরজ নামাজ আদাকারীর পিছনে ইকতেদা করতে পারবে না। কারণ, ইকতেদা হচ্ছে শিরকাত বা অংশগ্রহণ। তাই এর জন্য ইত্তিহাদ বা এক হওয়া ওয়াজিব। যদিও উভয়ের নামাজ মর্যাদাগত ও রাকাতগত দিক থেকে বরাবর হয়। যেমন– ইমাম আসরের নামাজ পড়ছে আর মুক্তাদী জোহরের নামাজ পড়ছে, তবে এখানে স্পষ্ট যে, উভয় নামাজ চার চার রাকাত করে এবং উভয়টিই ফরজ নামাজ। কিন্তু যেহেতু উভয়ের নামাজ এক নয়; তাই ইকতেদাও সহীহ নয়।

وَالْإِمَامُ لَا يُطِيْلُهَا وَلَا قِرَاءَةَ الْأُوْلٰى إِلَّا فِى الْفَجْرِ وَيُقِيْمُ مُؤْتَمًّا تَوَحَّدَ عَنْ يَمِيْنِهٖ اَىْ إِذَا كَانَ الْمُؤْتَمُّ وَاحِدًا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِاَنْ يَقُوْمَ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَفِيْهِ إِشَارَةٌ إِلٰى اَنَّ الْإِمَامَ اٰمِرٌ وَالْمَامُوْمُ مَامُوْرٌ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ مَنْقَادًا لَه وَيَتَقَدَّمُ إِنْ زَادَ فِيْهِ إِشَارَةٌ إِلٰى اَنَّ الْقَوْمَ إِذَا كَانُوْا كَثِيْرًا فَالْاَوْلٰى اَنْ يَتَقَدَّمَ الْإِمَامُ لَا اَنْ يَأْمُرَهُمُ الْإِمَامُ بِالتَّاخِيْرِ عَنْهُ فَإِنَّ ذٰلِكَ اَيْسَرُ مِنْ هٰذَا وَلَوْ ظَهَرَ حَدَثُهٗ يُعِيْدُ الْمُؤْتَمُّ لِاَنَّ صَلٰوةَ الْإِمَامِ مُتَضَمِّنٌ صَلٰوةَ الْمُقْتَدِىْ فَفَسَادُهٗ يُوْجِبُ فَسَادَهٗ ـ

অনুবাদ : ইমাম নামাজকে দীর্ঘ করবে না, প্রথম রাকাতের কেরাতও [দীর্ঘ করবে] না। তবে ফজরের নামাজে [কেরাত দীর্ঘ করবে]। মুক্তাদী যদি একজন হয় তবে ইমাম তাকে ডান পাশে দাঁড় করাবে। অর্থাৎ মুক্তাদী যদি একজন হয় তবে মুক্তাদী তাকে হুকুম করবে যে, সে যেন ইমামের ডান পাশে দাঁড়ায়। এতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইমাম আদেশকারী হয়, আর মুক্তাদী مَأْمُوْر [নির্দেশিত] হয়। তাই মুক্তাদীর জন্য ইমামের আনুগত করা ওয়াজিব। আর যদি মুক্তাদী অধিক হয়ে যায় তবে ইমাম আগে চলে যাবে। এতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখন মুক্তাদী অধিক হবে তখন উত্তম হচ্ছে– ইমাম নিজে আগে বেড়ে যাওয়া এবং মুক্তাদীদেরকে পিছনে যাওয়ার হুকুম না করা। কেননা, ইমাম আগে যাওয়া, মুক্তাদী পিছনে যাওয়ার তুলনায় অধিক সহজ। যদি প্রকাশ পায় যে, ইমাম মুহদিস [অজুহীন] ছিলেন, তবে মুক্তাদীর নামাজও দোহরাতে হবে। কেননা, ইমামের নামাজ মুক্তাদীর নামাজকে শামিল রাখে। অতএব, তার নামাজ বিনষ্ট হওয়া মুক্তাদীর নামাজ বিনষ্ট হওয়াকে আবশ্যক করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْإِمَامُ لَا يُطِيْلُهَا وَلَاقِرَاءَةَ الخ :

ইমাম নামাজকে দীর্ঘ করবে না : ইমাম সাহেব নামাজ এবং কেরাতকে অতি দীর্ঘ করবে না যে, মুসল্লিরা হয়রান হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে– مَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلْيُصَلِّىْ بِهِمْ صَلَاةَ اَضْعَفِهِمْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرُ وَالْمَرِيْضُ وَذَا الْحَاجَةِ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোনো জাতির ইমামতি করবে, তবে তার জন্য উচিত, সে যেন নামাজ সংক্ষেপ করে পড়ায়। কারণ, এতে বৃদ্ধ, অসুস্থ ও হাজতমান্দ ব্যক্তিও রয়েছে।" –[বুখারী ও মুসলিম]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমামের মুক্তাদীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অন্য এক হাদীসে আছে যে, একদিন রাসূল ﷺ ফজরের নামাজে সূরা ফালাক ও সূরা নাস তেলাওয়াত করেছিলেন। নামাজ শেষে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনি নামাজ খুব সংক্ষেপ করেছেন? তখন তিনি বললেন, বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজে আমার ভয় হয়েছিল যে, তাদের মায়েরা ফিতনায় পড়ে যাবে।

ইমাম ফজরের কেরাতকে লম্বা করবেন : ইমাম ফজরের জামাতে কেরাত লম্বা করে পড়বেন। কারণ, তখনকার সময়টা হচ্ছে ঘুম ও অলসতার সময়। সকল মুসল্লি সময়মতো এসে হাজির হতে পারে না। যদি কেরাত লম্বা করা হয় তবে অনেক লোক জামাতে শরিক হতে পারে। কিন্তু ফজর ব্যতীত অন্য নামাজে ইমাম এমনটি করবে না। লম্বা বা দীর্ঘ কেরাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– যে সূরা যে নামাজের জন্য সুন্নত হিসেবে নির্ধারণ করা আছে এর চেয়েও দীর্ঘ সূরা পড়া। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট ইমাম প্রত্যেক নামাজের প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় লম্বা করবে।

قَوْلُهُ وَيَتَقَدَّمُ اِنْ زَادَ : অর্থাৎ মুক্তাদী যদি একাধিক হয় তবে ইমাম আগে বেড়ে যাবে। এর দুটি অর্থ হতে পারে–

১. শুরু থেকেই নামাজে একাধিক মুক্তাদী হবে। তখন ইমাম আগে চলে যাবেন। যেমনটি সমগ্র বিশ্বে চলছে যে, ইমাম সবচেয়ে আগে এবং একা দাঁড়ান। মুক্তাদী যত জনই হয়, তারা ইমামের পিছনেই কাতার বাঁধে। শারেহ (র.)-ও ইবারতকে এ অর্থের উপর আরোপ করেছেন।

২. নামাজ শুরু করার সময় শুধু একজন মুক্তাদী ছিল এবং সে ইমামের ডান দিকে দাঁড়িয়েছে। এখন যদি নামাজের মধ্যখানে আরেকজন মুক্তাদী এসে যায় তবে দুই সুরত জায়েজ– ক. প্রথম মুক্তাদী পিছনে চলে যাবে এবং পরবর্তীতে আগত মুক্তাদী তার সাথে কাতার বাঁধবে। খ. স্বয়ং ইমামই স্বীয় জায়গা থেকে আগে চলে যাবে এবং আগত মুক্তাদীর জন্য জায়গা খালি করে দেবে। এ উভয় সুরতই জায়েজ। কিন্তু দ্বিতীয় সুরতটি উত্তম। তবে এসব পরিস্থিতিতে দেখতে হবে যে, ইমাম সামনে বাড়ার মতো জায়গা খালি আছে কিনা? যদি থাকে তবে ইমাম আগে যাওয়া উত্তম। আর যদি ইমামের সামনে বাড়ার মতো জায়গা না থাকে, কিংবা আছে, কিন্তু নাপাকী রয়েছে তবে ইমাম আগে যাবে না; বরং মুক্তাদী পিছনে যাবে। এমনকি পরবর্তীতে আগত মুক্তাদী প্রথম মুক্তাদীকে ধরে কিংবা ইশারা করে পিছনে নিয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ ظَهَرَ حَدَثُهُ يُعِيْدُ الخ : উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমাম নামাজ পড়িয়েছে এবং পরবর্তীতে জানা গেছে যে, সে অজুহীন ছিল, কিংবা সে জুনুবী ছিল, তবে তার নামাজ হবে না। তাই তাকে নামাজ দোহরাতে হবে এবং সাথে সাথে মুক্তাদীদের নামাজও দোহরাতে হবে। কারণ, ইমামের নামাজ মুক্তাদীর নামাজকে শামিল করে। তাই মুক্তাদীর নামাজ সহীহ হওয়া ও না হওয়া ইমামের নামাজের উপর নির্ভরশীল। ইমামের নামাজ যেমন হবে মুক্তাদীর নামাজও তেমনই হবে। এজন্যই ইমামের যদি সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়, তবে মুক্তাদীর উপরও তা আবশ্যক হয়। মুক্তাদীর ভুল হওয়ার দ্বারা ইমামের উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না। তাই মুক্তাদীর উপরও সিজদায়ে সাহু আবশ্যক হয় না। এ মাসআলাকে মুক্তাদীর নামাজে থাকাবস্থায় হদস লাহেক হওয়ার উপর কিয়াস করা যাবে না। কেননা, সাহু বা ভুল নামাজের মধ্যেই হয়। এর জন্য নামাজের পূর্বে কোনো প্রস্তুতি নেওয়া হয় না। পক্ষান্তরে হদস– নামাজের পূর্বেই এ হদস দূরীভূত করা আবশ্যক। এখন যদি ঘটনাক্রমে এ হদস নামাজে যুক্ত হয়, তবে যার সাথে যুক্ত হয়েছে সেই এটার জিম্মাদার; ইমাম নয়।

وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخَنَاثٰى ثُمَّ النِّسَاءُ اَلْخَنَاثٰى بِالْفَتْحِ جَمْعُ الْخُنْثٰى كَالْحَبَالٰى جَمْعُ الْحُبْلٰى فَاِنْ حَاذَتْهُ فِىْ صَلٰوةٍ مُشْتَرِكَةٍ تَحْرِيْمَةً وَاَدَاءً فَسَدَتْ صَلٰوتُهُ اِنْ نَوٰى اِمَامَتَهَا وَاِلَّا صَلَاتُهَا اَىْ اِنْ صَلَّتْ عَلٰى جَنْبِ رَجُلٍ اِمْرَأَةٌ مُشْتَهَاةٌ بِحَيْثُ لَا حَائِلَ بَيْنَهُمَا وَالصَّلٰوةُ مُشْتَرِكَةٌ تَحْرِيْمَةً وَاَدَاءً فَسَدَتْ صَلٰوةُ الرَّجُلِ اِنْ نَوَى الْاِمَامُ اِمَامَةَ الْمَرْأَةِ وَاِنْ لَمْ يَنْوِ تَفْسُدُ صَلٰوةُ الْمَرْأَةِ وَفَسَّرُوا الْاِشْتِرَاكَ فِى التَّحْرِيْمَةِ بِاَنْ يَكُوْنَا بَانِيَيْنِ تَحْرِيْمَتَهُمَا عَلٰى تَحْرِيْمَةِ الْاِمَامِ وَالشَّرِكَةُ فِى الْاَدَاءِ بِاَنْ يَكُوْنَ لَهُمَا اِمَامٌ فِيْمَا يُؤَدِّيَانِهِ اِمَّا حَقِيْقَةً كَالْمُقْتَدِيَيْنِ وَاِمَّا حُكْمًا كَاللَّاحِقَيْنِ يَعْنِىْ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ اِقْتَدَيَا بِرَجُلٍ فَسَبَقَهُمَا حَدَثٌ فَتَوَضَّا وَبَنَيَا وَقَدْ فَرَغَ الْاِمَامُ فَحَاذَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فَسَدَتْ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فَاللَّاحِقُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اِمَامٌ حَقِيْقَةً فَلَهُ اِمَامٌ حُكْمًا فَاِنَّهُ اِلْتَزَمَ اَنْ يُؤَدِّىَ جَمِيْعَ صَلَاتِهِ خَلْفَ الْاِمَامِ ـ

অনুবাদ : [জামাতের নামাজে] প্রথমে পুরুষ লোক কাতার বাঁধবে। অতঃপর বাচ্চারা, অতঃপর খুনছারা [হিজড়ারা] অতঃপর মহিলারা [কাতার বাঁধবে]। এখানে যবর দ্বারা خَنَاثٰى হচ্ছে خُنْثٰى-এর বহুবচন। যেমন– حُبْلٰى - حَبَالٰى -এর বহুবচন, সুতরাং যদি পুরুষের বরাবর কোনো মহিলা এসে এমন নামাজে দাঁড়ায় যাতে তাহরীমা ও আদার ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা মুশতারাক, তবে যদি ইমাম মহিলার নামাজের নিয়ত করে থাকে, তবে পুরুষের নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। অন্যথায় মহিলার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা যদি পুরুষের পার্শ্ব ঘেঁষে এমনভাবে নামাজ পড়ে যে, তাদের দুজনের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক নেই এবং নামাজ তাহরীমা ও আদার ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের মাঝে মুশতারাক হয়, তবে এমন পরিস্থিতিতে যদি ইমাম মহিলার ইমামতির নিয়ত করে তবে তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। আর যদি মহিলার ইমামতির নিয়ত না করে তবে মহিলার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। ফুকাহায়ে কেরাম اِشْتِرَاكٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ-এর এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে স্বীয় তাহরীমাকে ইমামের তাহরীমার উপর মওকুফ করেছে, আর اِشْتِرَاكٌ فِى الْاَدَاءِ-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে– যে জিনিস তারা উভয়ে আদায় করছে এতে তাদের উভয়ের ইমাম এক। حَقِيْقَةً এক ইমাম, যেমন– দুই মুক্তাদীর মাঝে হয়ে থাকে। حُكْمًا এক ইমাম যেমন দুই লাহেকের মাঝে হয়ে থাকে। অর্থাৎ একজন পুরুষ ও একজন মহিলা– একজন পুরুষের সাথে ইকতেদা করেছে, আর উভয়ের নামাজের মাঝে হদস যুক্ত হয়েছে। তাই উভয়ে অজু করেছে এবং বেনা (بِنَاء) করেছে, অথচ এতক্ষণে ইমাম নামাজ থেকে অবসর হয়ে গেছে, তবে মহিলা তার ছুটে যাওয়া নামাজকে আদায় করার সময় পুরুষের বরাবর হয়েছে। তখন পুরুষের নামাজ ফাসেদ হয়ে গেছে। তো লাহেকের জন্য যদিও حَقِيْقَةً ইমাম নেই; কিন্তু حُكْمًا ইমাম আছে। কেননা, সে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছে যে, ইমামের পিছনে সে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ الخ :

কাতারের তরতীব : জামাতের নামাজে ইমামের পিছনে সর্বপ্রথম দাঁড়াবে– আকেল-বালেগ পুরুষ। তারপর বাচ্চাদের কাতার যারা নাবালেগ, তারপর হিজড়াদের কাতার, তারপর মহিলাদের কাতার।

হিজড়া বলতে উদ্দেশ্য হলো, এমন হিজড়া যার মাঝে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের আলামত বরাবর। কোনো আলামতের প্রাধান্য নেই; কিংবা কোনো আলামতই নেই। কিন্তু যদি কোনো আলামত প্রাধান্য পায়, তবে তার সে আলামত মোতাবেক তাকে পুরুষ কিংবা মহিলার হুকুমে ধরা হবে। মহিলাদের কাতার হিজড়াদের কাতারের পিছনে হবে। কারণ, তাদের মাঝে পুরুষ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

مَسْئَلَةُ مُحَاذَاةٍ : مُحَاذَاةٌ শব্দের অর্থ– বরাবর হওয়া। মহিলা পুরুষের বরাবর হয়ে দাঁড়ালে নামাজ ফাসেদ হওয়ার কয়েকটি শর্ত রয়েছে। তা হচ্ছে– ১. মহিলা বালেগা [প্রাপ্তবয়স্কা] হতে হবে। ২. আকেলা [বুদ্ধিমতি] হতে হবে; পাগল হতে পারবে না ৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট এক রুকন পরিমাণ مُحَاذَاةٌ -এর মধ্যে থাকতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট এক রুকন পরিমাণের সাথে সাথে এক রুকন আদায়ও করতে হবে। ৪. রুকু-সিজদাবিশিষ্ট নামাজ হতে হবে। অতএব. জানাজা নামাজ কিংবা সিজদায়ে তেলাওয়াত হলে ফাসেদ হবে না। ৫. তাহরীমার দিক থেকে নামাজ مُشْتَرَكْ হতে হবে। ৬. اَدَاءْ -এর দিক থেকেও নামাজ مُشْتَرَكْ হতে হবে। ৭. জায়গা এক হতে হবে। অতএব, যদি একজন খাটে কিংবা পালং -এ কিংবা অন্য কোনো উঁচু জায়গায় হয়, তবে নামাজ ফাসেদ হবে না। ৮. উভয়ের দিক এক হতে হবে। এখন যদি দিক বিভিন্ন হয়। যেমন– খানায়ে কা'বা বিভিন্ন দিকে নামাজ পড়ে, তবে مُحَاذَاةٌ -এর কারণে নামাজ ফাসেদ হবে না। ৯. উভয়ের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক পর্দা থাকতে পারবে না। ১০. ইমামের মহিলার ইমামতির নিয়ত করতে হবে।

ওলামায়ে আহনাফের নিকট যদি উল্লিখিত দশটি শর্ত পাওয়া যায় তবে مُحَاذَاةٌ -এর কারণে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে; অন্যথায় নয়। জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, مُحَاذَاةٌ -এর কারণে পুরুষের নামাজ ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু মহিলার নামাজ ভাঙ্গবে না। দলিল হিসেবে তাঁরা রাসূল ﷺ -এর ঐ হাদীসকে পেশ করেন, যার মধ্যে তিনি মহিলাদেরকে পিছনে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব এ নির্দেশের দ্বারা মহিলাদেরকে পিছনে রাখা ফরজ প্রমাণিত হয়। আর এর مُخَاطَبْ [সম্বোধিত] হচ্ছে পুরুষ; মহিলা নয়। আর সে পুরুষই মহিলাকে পিছনে রাখেনি, ফলত সে নির্দেশের অবাধ্যতা করেছে। তাই পুরুষের নামাজই ফাসেদ হবে– মহিলার নামাজ ফাসেদ হবে না। যদিও পরোক্ষভাবে মহিলাও এ নির্দেশে সম্বোধিত। তাই পুরুষ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং মহিলা পরোক্ষভাবে تَاخِيْر [পিছনে থাকা]-এর নির্দেশকে লজ্ঘন করেছে। মূলত এ মাসআলাটি এমন, যেমন ইমামের সাথে মুক্তাদী। যেভাবে মুক্তাদীর জন্য ইমামের আগে যাওয়া জায়েজ নেই এবং যাওয়ার দ্বারা নামাজ ফাসেদ হয়ে যায় এবং ইমামের জন্য পিছনে আসা জায়েজ নেই, কিন্তু যদি আসে তবে তার নামাজ ভাঙ্গবে না। مُحَاذَاةٌ -এর মাসআলায় পুরুষ-মহিলার অনুরূপ হুকুম। অর্থাৎ পুরুষের নামাজ ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু মহিলার নামাজ ভাঙ্গবে না।

قَوْلُهُ فَسَدَتْ صَلٰوةُ الرَّجُلِ الخ : ফাতহুল কাদীর নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, একজন মহিলার কারণে তিনজন পুরুষের নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়– ক. ডানের পুরুষ, খ. বামের পুরুষ ও গ. পিছনের পুরুষের। অন্যান্যদের নামাজ ফাসেদ হবে না। কারণ, এ তিনজন অন্যান্যদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। অনুরূপ দুইজন মহিলা চারজন পুরুষের নামাজ ফাসিদ করে দেয়। আর যদি দুজন মহিলা পৃথক পৃথক জায়গায় দাঁড়ায় তবে প্রত্যেকেই তিনজনের নামাজ ফাসেদ করবে।

قَوْلُهُ إِمَّا حَقِيْقَةً كَالْمُقْتَدِيْنَ : যে সকল ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামাজের ইকতেদা করে– তারা সকলে বরাবর নয়। কারণ, তাদের কেউ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে শরিক থাকে, তাকে مُدْرِكْ বলে। কেউ শুরু থেকেই ইমামের সাথে শামিল ছিল না; বরং দু-এক রাকাত হয়ে যাওয়ার পর এসেছে, তাকে মাসবূক বলা হয়। আবার কেউ শুরু থেকে শরিক ছিল ঠিক, কিন্তু মধ্যখানে তার হদস যুক্ত হয়ে গেছে কিংবা প্রথম বৈঠকে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে, আর এদিকে নামাজ শেষ হয়ে গেছে, কিংবা পরবর্তী রাকাত হয়ে গেছে– সে এখনও ঘুমে, তাই তার মাঝখানের কিংবা শেষের কিছু অংশ ছুটে গেছে, পরবর্তীতে সে অজু করে এসে কিংবা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামাজে শরিক হয়েছে, তাকে লাহেক বলে। প্রত্যেকের হুকুম নিজ নিজ জায়গায় বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, মাসবূক তার ছুটে যাওয়া নামাজ এমনভাবে আদায় করবে, যেন সে মুনফারিদ। আর লাহেক তার হদস যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে সে অজু করে নামাজে শরিক হবে এবং মধ্যখানে তার ছুটে যাওয়া নামাজ সে কেরাত ব্যতীত শুধু রুকু-সিজদা করে আদায় করবে। যদি অজু করতে করতে ইমাম সালাম ফিরিয়ে ফেলে তবুও সে তার ছুটে যাওয়া নামাজ কেরাত ব্যতীত শুধু রুকু-সিজদা করে আদায় করবে। অনুরূপ যদি সে নামাজের মধ্যখানে শুয়ে যায় তবে জাগ্রত হতেই ইমামের সাথে শরিক হবে এবং ছুটে যাওয়া নামাজ কেরাত ব্যতীত আদায় করবে। শর্ত হলো, তার অজু না ছুটতে হবে। আর যদি অজু ছুটে যায় তবে প্রথমে অজু করবে।

فَإِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَتَوَضَّأَ وَبَنَى يُجْعَلُ كَأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ أَحْكَامُ الْمُقْتَدِيْنَ كَحُرْمَةِ الْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ الْمَسْبُوْقِ وَهُوَ الَّذِيْ أَدْرَكَ اٰخِرَ صَلٰوةِ الْإِمَامِ فَلَمْ يَلْتَزِمْ أَدَاءَ الْكُلِّ خَلْفَ الْإِمَامِ فَهُوَ فِيْ أَدَاءِ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ مَعَ الْإِمَامِ مُنْفَرِدٌ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَالْمَسْبُوْقَانِ وَإِنْ كَانَا مُشْتَرِكَيْنِ فِي التَّحْرِيْمَةِ إِذْ بَنَيَا تَحْرِيْمَتَهُمَا عَلٰى تَحْرِيْمَةِ الْإِمَامِ فَلَيْسَا مُشْتَرِكَيْنِ أَدَاءً فَإِنْ حَاذَتْ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا فِيْ أَدَاءِ مَا سَبَقَا لَمْ تَفْسُدْ صَلٰوةُ الرَّجُلِ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ فِي الْأَدَاءِ ـ

অনুবাদ : অতএব, যখন তার হদস যুক্ত হয়েছে, তখন সে অজু করেছে এবং বেনা করেছে– তাই একে এমন ধরা হবে যে, যেন সে ইমামের পিছনেই আছে। এমনকি তার জন্য মুক্তাদীর আহকাম সাব্যস্ত হবে। যেমন– কেরাত পড়া হারাম ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মাসবূক ব্যক্তি। আর মাসবূক ঐ ব্যক্তি, যে ইমামের সাথে নামাজের শেষ অংশ পেয়েছে। সুতরাং সে ইমামের পিছনে পূর্ণ নামাজ আদায় করা নিজের জন্য আবশ্যক করেনি। অতএব, সে নামাজের যে অংশ ইমাম সাহেবের সাথে পায়নি; তা আদায়ের ক্ষেত্রে সে মুনফারিদ। এমনকি তার কেরাত পড়া ওয়াজিব। তাই উভয় মাসবূক যদিও তাহরীমার মাঝে মুশতারাক– কেননা তারা উভয়ে নিজের তাহরীমাকে ইমামের তাহরীমার উপর ভিত্তি করেছে, কিন্তু তারা উভয়ে أَدَاء -এর মাঝে মুশতারাক নয়। [কারণ, তারা দুই মাসবূক দুই মুনফারিদ।] সুতরাং যদি মাসবূক তার ছুটে যাওয়া নামাজ আদায়ের সময় কোনো মাসবূক মহিলা তার বরাবর এসে দাঁড়ায় তবে পুরুষের নামাজ ফাসেদ হবে না। কেননা, তারা أَدَاء -এর ক্ষেত্রে মুশতারাক নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَحُرْمَةِ الْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهَا : আমাদের ইমামদের নিকট মুক্তাদীর কেরাত তো একেবারে হারাম নয়, কিন্তু মাকরূহে তাহরীমী। মাকরূহে তাহরীমী যেহেতু হারামের নিকটবর্তী এজন্য একে হারাম বলা হয়েছে। وَنَحْوِهَا দ্বারা مُدْرِك -এর জন্য প্রমাণিত আহকাম উদ্দেশ্য। অতএব বলা হচ্ছে যে, লাহেকের ছুটে যাওয়া রাকাত আদায় করতে গিয়ে যদি ভুল হয়ে যায় তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। মুসাফির হওয়ার সুরতে নামাজের মধ্যখানে যদি ইকামতের নিয়ত করে তবে ফরজ -এর রাকাতে কোনো পার্থক্য হবে না। কিন্তু মাসবূকের ক্ষেত্রে এসব আহকামের পরিপন্থি হবে। অর্থাৎ মাসবূকের ছুটে যাওয়া রাকাতগুলো আদায় করতে গিয়ে যদি কোনো ভুল হয়ে যায়, তবে তাকে সিজদায়ে সাহু করতে হবে এবং মুসাফির মাসবূক যদি নামাজের মধ্যখানে ইকামতের নিয়ত করে তবে তার নামাজে পরিবর্তন আসবে।

قَوْلُهُ مَعَ الْإِمَامِ مُنْفَرِدٌ الخ : অর্থাৎ মাসবূক ব্যক্তি তার ছুটে যাওয়া নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে মুনফারিদ। তাই সে تَعَوُّذْ, তাসমিয়া ও কেরাত ইত্যাদি সব পড়বে। তবে কোনো কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে এ মাসবূক প্রকৃত মুনফারিদ থেকে ব্যতিক্রম হয়। যেমন– প্রকৃত মুনফারিদের ইকতেদা করা জায়েজ। পক্ষান্তরে এ মাসবূক মুনফারিদের ইকতেদা করা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ إِذْ بَنَيَا تَحْرِيْمَتَهُمَا : কারণ তারা উভয়ে ইমামের সাথে নামাজ শুরু করেছে এবং নামাজের শুরু থেকেই ইমামের ইকতেদা করেছে। এজন্যই মাসবূকের ইকতেদা করা জায়েজ নেই। কেননা, সে তাহরীমার ক্ষেত্রে মুক্তাদী। আর মুক্তাদীর ইকতেদা করা যায় না।

قَوْلُهُ فَلَيْسَا مُشْتَرِكَيْنِ الخ : أَدَاء -এর ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের ইমাম নেই। হাকীকী ইমাম না থাকাতো স্পষ্ট। আর হুকমী ইমাম এজন্য নেই যে, তারা উভয়ে নিজেদের পূর্ণ নামাজ ইমামের সাথে আদায় করাকে আবশ্যক করেনি। কেননা, এ আদায়কৃত নামাজের অংশে তারা মুনফারিদ।

اَقُوْلُ فِیْ تَفْسِیْرِ الشِّرْكَةِ فِی التَّحْرِیْمَةِ وَالْاَدَاءِ تَسَاهُلٌ وَیَنْبَغِیْ اَنْ یُقَالَ الشِّرْكَةُ فِی التَّحْرِیْمَةِ اَنْ یَبْنٰی اَحَدُهُمَا تَحْرِیْمَتَهٗ عَلٰی تَحْرِیْمَةِ الْاٰخَرِ اَوْ بَنَیَا تَحْرِیْمَتَهُمَا عَلٰی تَحْرِیْمَةِ ثَالِثٍ وَالشِّرْكَةُ فِی الْاَدَاءِ اَنْ یَكُوْنَ اَحَدُهُمَا اِمَامًا لِلْاٰخَرِ فِیْمَا یُؤَدِّیَانِهٖ اَوْ یَكُوْنَ لَهُمَا اِمَامٌ فِیْمَا یُؤَدِّیَانِهٖ حَتّٰی یَشْمُلَ الشِّرْكَةُ بَیْنَ الْاِمَامِ وَالْمَامُوْمِ فَاِنَّ مُحَاذَاةَ الْمَرْاَةِ الْاِمَامَ مُفْسِدَةٌ صَلٰوةَ الْاِمَامِ مَعَ اَنَّهٗ لَا اِشْتِرَاكَ بَیْنَهُمَا تَحْرِیْمَةً وَاَدَاءً بِالتَّفْسِیْرِ الَّذِیْ ذَكَرُوْا وَاَیْضًا لَا اَجِدُ فَائِدَةً فِیْ ذِكْرِ الشِّرْكَةِ فِی التَّحْرِیْمَةِ بَلْ یَكْفِیْ ذِكْرُ الشِّرْكَةِ فِی الْاَدَاءِ فَاِنَّ الْاِمَامَ اِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَاسْتَخْلَفَ اٰخَرَ فَاقْتَدٰی اَحَدٌ بِالْخَلِیْفَةِ فَالشِّرْكَةُ فِی الْاَدَاءِ ثَابِتَةٌ بَیْنَ الَّذِیْ اِقْتَدٰی بِالْخَلِیْفَةِ وَبَیْنَ الْاِمَامِ الْاَوَّلِ وَكُلُّ مَنِ اقْتَدٰی بِهٖ بِاِعْتِبَارِ اَنَّ لَهُمْ اِمَامًا فِیْمَا یُؤَدُّوْنَهٗ وَهُوَ الْخَلِیْفَةُ وَلَا شِرْكَةَ بَیْنَهُمْ فِی التَّحْرِیْمَةِ لِاَنَّ الْمُقْتَدِیَ بِالْخَلِیْفَةِ بَنٰی تَحْرِیْمَتَهٗ عَلٰی تَحْرِیْمَةِ الْخَلِیْفَةِ وَالْاِمَامُ الْاَوَّلُ وَمَنِ اقْتَدٰی بِهٖ لَمْ یَبْنُوْا تَحْرِیْمَتَهُمْ عَلٰی تَحْرِیْمَةِ الْخَلِیْفَةِ فَلَمْ تُوْجَدْ بَیْنَهُمُ الشِّرْكَةُ فِی التَّحْرِیْمَةِ۔

অনুবাদ : [শারেহ (র.) বলেন,] আমি বলি, شِرْكَةٌ فِی الْاَدَاءِ ও شِرْكَةٌ فِی التَّحْرِیْمَةِ -এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের তাসাহুল হয়েছে; বরং এটা বলা উপযোগী ছিল যে, شِرْكَةٌ فِی التَّحْرِیْمَةِ হচ্ছে- দুই ব্যক্তির একজন নিজের তাহরীমার বেনা অন্যজনের তাহরীমার উপর করা। কিংবা উভয়ে স্বীয় তাহরীমার বেনা তৃতীয় ব্যক্তির তাহরীমার উপর করা। আর شِرْكَةٌ فِی الْاَدَاءِ হচ্ছে- দুই ব্যক্তির মধ্য থেকে একজন অপরজনের জন্য ঐ নামাজের ক্ষেত্রে ইমাম হবে যা তারা উভয়ে আদায় করছে। কিংবা তারা যে নামাজ আদায় করছে সে ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তি তাদের ইমাম হবে- যেন শিরকতের মধ্যে ইমাম ও মুক্তাদী শামিল থাকে। কেননা, মহিলার مُحَاذَاة ইমামের নামাজকে ফাসেদ করে দেয়। এতদসত্ত্বেও যে, ফুকাহায়ে কেরামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী- মহিলা মুক্তাদী ও ইমাম তাহরীমা ও আদা -এর ক্ষেত্রে মুশতারাক নয়। একথাও [উল্লেখযোগ্য] যে, شِرْكَةٌ فِی التَّحْرِیْمَةِ উল্লেখ করার মাঝে কোনো ফায়দা দেখা যাচ্ছে না; বরং شِرْكَةٌ فِی الْاَدَاءِ উল্লেখ করাই যথেষ্ট। কেননা, ইমামের যখন হদসযুক্ত হয় তখন সে অন্যকে খলিফা বানায়। অতএব, কেউ খলিফার সাথে ইকতেদা করেছে- তবে যে খলিফার ইকতেদা করেছে তার এবং প্রথম ইমামের মাঝে شِرْكَةٌ فِی الْاَدَاءِ প্রমাণিত। [অনুরূপ شِرْكَةٌ فِی الْاَدَاءِ রয়েছে] প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির মাঝেও যে প্রথম ইমামের সাথে ইকতেদা করেছে। এ হিসেবে যে, যে জিনিস সে আদায় করছে এতে তাদের একজন ইমাম এবং অন্যজন খলিফা। কিন্তু তাদের মাঝে شِرْكَةٌ فِی التَّحْرِیْمَةِ নেই। কেননা, খলিফার

ইকতেদাকারী স্বীয় তাহরীমাকে খলীফার তাহরীমার উপর নির্ভর করেছে। প্রথম ইমাম এবং প্রথম ইমামের সাথে ইকতেদাকারী স্বীয় তাহরীমার ভিত্তি খলিফার তাহরীমার উপর করেনি। সুতরাং তাদের মাঝে شِرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ পাওয়া যায়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ حَتّٰى يَشْتَمِلَ الشِّرْكَةُ : এর সারমর্ম হচ্ছে, ঐ সুরতে এ হুকুমের ফায়দা পাওয়া যাবে– যখন একজন মহিলা মুক্তাদী একজন পুরুষ মুক্তাদীর مُحَاذَاةٌ-এর মাঝে চলে আসবে। ঐ সুরতে নয় যে, মহিলা ইমামের مُحَاذَاة-এর মাঝে আসে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী উভয় সুরতের উপর হুকুম প্রযোজ্য হবে।

قَوْلُهُ مُفْسِدَةٌ صَلٰوةَ الْإِمَامِ الخ : অর্থাৎ যদি মহিলা স্বীয় ইমামের مُحَاذَاة-এর মাঝে এসে যায় তবে ইমামের নামাজ ভেঙ্গে যাবে, আর যখন ইমামের নামাজ ভেঙ্গে যাবে তখন সমস্ত মুক্তাদীর নামাজও ভেঙ্গে যাবে– ঘটনা মূলত এমন নয়; বরং আল-মুহীত ও যখীরা নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, মহিলা ইমামের مُحَاذَاة-এর মাঝে আসার দ্বারা ইমামের নামাজ ভাঙ্গার জন্য শর্ত হলো, ইমাম মহিলাকে পিছনে যাওয়ার ইশারা না করতে হবে। আর যদি ইমাম মহিলাকে পিছনে যাওয়ার ইশারা করে আর মহিলা পিছনে না যায়, তবে ইমামের নামাজ ভাঙ্গবে না; বরং শুধু এই মহিলার নামাজ ভেঙ্গে যাবে।

قَوْلُهُ بَلْ يَكْفِىْ ذِكْرُ الشِّرْكَةِ : এ মন্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে– أَدَاء-এর ক্ষেত্রে شِرْكَة-এর উল্লিখিত অর্থই যথেষ্ট। এতে مُحَاذَاة-এর কারণে নামাজ ভেঙ্গে যাবে এবং اِشْتِرَاكٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ-এর শর্ত নেই। এর কারণ হচ্ছে– যদি ইমামের অজু ভেঙ্গে যায় এবং সে অন্য কাউকে খলিফা বানিয়ে অজু করার জন্য চলে যায়, অতঃপর ফিরে এসে তার খলিফার ইকতেদা করে এবং একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা পরস্পরে مُحَاذَاة-এ চলে আসে– তন্মধ্যে একজন প্রথমে ইমামের ইকতেদা করেছে, আর দ্বিতীয়জন দ্বিতীয় ইমাম তথা খলিফার ইকতেদা করে– এ সুরতেও مُحَاذَاة-এর কারণে পুরুষের নামাজ ভেঙ্গে যাবে। অথচ এতে উল্লিখিত আলোচনা অনুসারে شِرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ নেই। এজন্য যে, উভয়ের তাহরীমার ভিত্তি এক ইমামের তাহরীমার উপর নয়।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْخَلِيْفَةُ وَلَا شِرْكَةَ الخ : এজন্য যে, সমস্ত মুক্তাদী, প্রথম ইমামের দুই মুক্তাদী এবং স্বয়ং প্রথম ইমাম – তারা সকলে তার পিছনে নামাজ পড়ছে।

وَمَعَ ذٰلِكَ لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا مِنَ الْمُقْتَدِيْنَ بِالْاِمَامِ الْاَوَّلِ اَوْ مِنَ الْمُقْتَدِيْنَ بِالْخَلِيْفَةِ فَحَاذَتِ الطَّائِفَةَ الْاُخْرٰى تَفْسُدُ الصَّلٰوةُ بِاعْتِبَارِ الشَّرْكَةِ فِى الْاَدَاءِ لَا التَّحْرِيْمَةُ وَلَوْ قِيْلَ اَلشَّرْكَةُ فِى التَّحْرِيْمَةِ ثَابِتَةٌ تَقْدِيْرًا فَاَقُوْلُ اَلشَّرْكَةُ فِى الْاَدَاءِ لَا تُوْجَدُ بِدُوْنِ الشَّرْكَةِ فِى التَّحْرِيْمَةِ وَالشَّرْكَةُ فِى التَّحْرِيْمَةِ قَدْ تُوْجَدُ بِدُوْنِ الشَّرْكَةِ فِى الْاَدَاءِ كَمَا فِى الْمَسْبُوْقِ فَلَا حَاجَةَ اِلٰى ذِكْرِ الشَّرْكَةِ فِى التَّحْرِيْمَةِ ـ

অনুবাদ : এতদসত্ত্বেও যদি কোনো মহিলা– যে উক্ত দুই গ্রুপের কোনো এক গ্রুপের সাথে হয় [অর্থাৎ] প্রথম ইমামের ইকতেদাকারী হয়; কিংবা খলিফার ইকতেদাকারী হয়– অপর গ্রুপের সাথে مُحَاذَاةٌ করে তবে شَرْكَةٌ فِى الْاَدَاءِ হিসেবে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে, কিন্তু شَرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ হিসেবে নামাজ ফাসেদ হবে না।

যদি বলা হয় যে, شَرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ পরোক্ষভাবে এতে প্রমাণিত আছে– তবে আমি বলব, شَرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ ব্যতীত شَرْكَةٌ فِى الْاَدَاءِ পাওয়া যায় না, কিন্তু شَرْكَةٌ فِى الْاَدَاءِ ব্যতীত شَرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ পাওয়া যায়। যেমনটি হয় মাসবূকের ক্ষেত্রে। তাই شَرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَعَ ذٰلِكَ : অর্থাৎ উল্লিখিত আলোচনা অনুযায়ী তাদের মাঝে شَرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ নেই।

قَوْلُهُ لَا التَّحْرِيْمَةُ : অর্থাৎ যদি شَرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ শর্ত হতো তবে এ সুরতে নামাজ ফাসেদ হতো না। এজন্য যে, শর্ত না পাওয়া যাওয়ার কারণে مَشْرُوْط -ও পাওয়া যায়নি। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, شَرْكَةٌ فِى الْاَدَاءِ -ই শর্ত, شَرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ নয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ قِيْلَ اَلشَّرْكَةُ فِى التَّحْرِيْمَةِ الخ : এটি উল্লিখিত মন্তব্যের জবাব। উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাহরীমা হাকীকী হোক কিংবা পরোক্ষভাবে হোক, এর দ্বারা উদ্দেশ্য 'আম [ব্যাপক], আর উল্লিখিত সুরতে شَرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ -এর সাথে সাথে مُحَاذَاة -এ আসার কারণে নামাজ ফাসেদ হয়ে গেছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে উভয় গ্রুপের মঝে شَرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ নেই, কিন্তু পরোক্ষভাবে شَرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ পাওয়া গেছে। কারণ, খলিফার তাহরীমার ভিত্তি মূলত ইমামের তাহরীমার উপর। আর কোনো জিনিসের ভিত্তির উপর ভিত্তি করা মূলত এর প্রথম জিনিসের উপর ভিত্তি করা হয়। এখন যে ব্যক্তি খলিফার ইকতেদা করেছে, তার তাহরীমার ভিত্তিও ইমামের তাহরীমার উপর। এভাবেই তার এবং প্রথম মুক্তাদীর মাঝে شَرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ পাওয়া গেছে।

قَوْلُهُ فَاَقُوْلُ اَلشَّرْكَةُ فِى الْاَدَاءِ الخ : এটি জবাবের খণ্ডন এবং দ্বিতীয় পদ্ধতির উপর মন্তব্য। এর সারমর্ম হচ্ছে, যখন شَرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ -টা হাকীকী ও تَقْدِيْرِىْ -ভাবে عَامٌّ হয়ে গেছে তখন মন্তব্য হয় যে, شَرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ - شَرْكَةٌ فِى الْاَدَاءِ -এর অস্তিত্বকে আবশ্যক করে, তাই একে উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

هٰذَا اِذَا نَوَى الْاِمَامُ اِمَامَةَ الْمَرْأَةِ اَمَّا اِذَا لَمْ يَنْوِ لَمْ يَصِحَّ اِقْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهَا لِاَنَّهَا لَمْ تَقْرَأْ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهَا وَلَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ فَبَقِيَتْ بِلَا قِرَاءَةٍ وَعُلِمَ مِنْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ اَنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا اقْتَدَتْ بِالْاِمَامِ مُحَاذِيَةً لِرَجُلٍ لَا يَصِحُّ اِقْتِدَاؤُهَا اِلَّا اَنْ يَنْوِيَ الْاِمَامُ اِمَامَتَهَا اَمَّا اِذَا لَمْ تَقْتَدِ مُحَاذِيَةً هَلْ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْاِمَامِ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ صَلّٰى اُمِّيٌّ بِقَارِئٍ وَاُمِّيٍّ اَوِ اسْتَخْلَفَ فِي الْاُخْرَيَيْنِ اُمِّيًّا فَسَدَتْ لِلْكُلِّ اَيْ اِنْ اَمَّ اُمِّيٌّ قَارِئًا وَاُمِّيًّا فَسَدَتْ صَلٰوةُ الْكُلِّ اَمَّا صَلٰوةُ الْقَارِئِ فَاِنَّهُ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَاَمَّا صَلٰوةُ الْاُمِّيَّيْنِ فَلِاَنَّهُمَا لَمَّا رَغِبَا فِي الْجَمَاعَةِ وَجَبَ اَنْ يَقْتَدِيَا بِالْقَارِئِ لِيَكُوْنَ قِرَاءَتُهُ قِرَاءَةً لَهُمَا فَتَرَكَا الْقِرَاءَةَ التَّقْدِيْرِيَّةَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَلَوِ اسْتَخْلَفَ الْقَارِئُ فِي الْاُخْرَيَيْنِ اُمِّيًّا فَسَدَتْ صَلٰوةُ الْكُلِّ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) فَاِنَّ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ قَدْ اُدِّيَ فِي الْاُوْلَيَيْنِ قُلْنَا يَجِبُ الْقِرَاءَةُ فِيْ جَمِيْعِ الصَّلٰوةِ تَحْقِيْقًا اَوْ تَقْدِيْرًا وَلَمْ تُوْجَدْ ـ

অনুবাদ : এটি [مُحَاذَاة দ্বারা নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে তখন] যখন ইমাম মহিলার ইমামতের নিয়ত করবে। কিন্তু যদি [মহিলার ইমামতের] নিয়ত না করে তবে মহিলার ইকতেদা করা সহীহ হবে না। তাই মহিলার নামাজ ফাসেদ হয়ে গেছে। কারণ, মহিলা এই ভিত্তিতে কেরাত পড়েনি যে, ইমামের কেরাত তার কেরাত। অথচ ঘটনা এমনটি নয়। তাই মহিলার নামাজ কেরাত ব্যতীতই থেকে যায়। [আর এটি স্পষ্ট যে, কেরাত ব্যতীত নামাজ হয় না।] এ মাসআলার দ্বারা বুঝা গেল যে, যখন কোনো মহিলা কোনো পুরুষের বরাবর হয়ে ইমামের ইকতেদা করে তখন তার ইকতেদা ততক্ষণ পর্যন্ত সহীহ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং ইমাম তার ইমামের নিয়ত না করবে। আর যদি মহিলা কোনো পুরুষের বরাবর না হয়ে ইমামের সাথে ইকতেদা করে তবে এই সুরতেও কি ইমামের নিয়ত শর্ত? এ সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। যদি একজন কারী [পাঠক] ও একজন উম্মীর ইমাম একজন উম্মী হয় কিংবা কারী ইমাম শেষ দুই রাকাতে উম্মীকে খলিফা বানিয়েছে তবে সকলের নামাজ ফাসেদ হয়ে গেছে। অর্থাৎ যদি উম্মী ব্যক্তি কারী উম্মীর ইমামতি করে তবে সকলের নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। কারীর নামাজ এ কারণে ফাসেদ হয়ে যাবে যে, সে কেরাতের উপর সক্ষম থাকা সত্ত্বেও কেরাতকে বর্জন করেছে। উভয় উম্মী [একজন ইমাম এবং অন্যজন মুক্তাদী]-এর নামাজ ফাসিদ হবে এ কারণে যে, যখন তারা উভয়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়ার ইচ্ছা করেছে, তখন তাদের উপর ওয়াজিব ছিল– কোনো কারী ইমামের ইকতেদা করা, যাতে করে কারীর কেরাত পরোক্ষভাবে তাদের দুজনের কেরাত হয়ে যেত। সুতরাং উম্মীকে ইমাম বানিয়ে তাদের দুজনের কেরাতের উপর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের কেরাত হয়নি। আর যদি কারী ইমাম– শেষ দুই রাকাতে উম্মীকে খলিফা বানায় তবে সকলের নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। এতে ইমাম যুফার (র.)-এর মতানৈক্য রয়েছে। তিনি বলেন, প্রথম দুই রাকাতে কেরাত ফরজ আর তা আদায় হয়ে গেছে। আমরা [এর উত্তরে] বলি, সমস্ত রাকাতে কেরাত পড়া ওয়াজিব। চাই তা প্রকৃতপক্ষে হোক কিংবা পরোক্ষভাবে হোক। [এখানে] তা পাওয়া যায়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ اِقْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ الخ : অর্থাৎ যদি ইমাম মহিলার ইমামতির নিয়ত না করে তবে মহিলার ইকতেদা করা সহীহ হবে না, আর যার জন্য ইকতেদা করা সহীহ নয় তার নামাজ ফাসেদ হওয়া স্পষ্ট। কারণ, আমাদের নিকট নিয়ত ব্যতীত ইমাম ও মহিলা মুক্তাদীর নামাজের মাঝে اِشْتِرَاكٌ পাওয়া যায় না। লক্ষ্য কর যে, নামাজের কাতারের ক্ষেত্রে পুরুষ অগ্রে থাকা আবশ্যক, আর যার উপর কোনো জিনিস আবশ্যক হয় তা করার উপর এর আবশ্যকীয়তা (لُزُوْم) নির্ভর করে। যেমন– মুক্তাদী। এ কারণে যে, ইমামের নামাজ ভেঙ্গে যাওয়ার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজও ভেঙ্গে যায়। কেননা, এর আবশ্যকীয়তা (لُزُوْم) -এর উপর নির্ভরশীল।

ইমাম যুফার (র.) এতে মতানৈক্য করেন। তিনি বলেন, মহিলাদের ইমাম হওয়ার জন্য তাদের ইমামতির নিয়ত করা শর্ত নয়। যেমনটি পুরুষের ইমাম হওয়ার জন্য তাদের ইমামতির নিয়ত করা শর্ত নয়। কিয়াসের চাহিদাও এমনই। হিদায়া ও বেনায়া গ্রন্থে এমনই উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَنَّهَا لَمْ تَقْرَأْ بِنَاءً الخ : অর্থাৎ এ মহিলার নামাজ এজন্য হয়নি যে, সে حَقِيْقِيْ কিংবা حُكْمِيْ কোনোভাবেই কেরাত পড়েনি। حَقِيْقِيْ কেরাত না হওয়া তো স্পষ্ট। আর হাদীসের আলোকে ইমামের কেরাতই হয় তার কেরাত, যদি ইমাম তার ইমামতির নিয়ত করে। আর তাও পাওয়া যায়নি। অতএব, তার নামাজ কেরাত ব্যতীত হয়েছে। আর কেরাত ব্যতীত নামাজের কল্পনাও করা যায় না।

قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْ هٰذِهِ الْمَسْاَلَةِ الخ : হিদায়া গ্রন্থ ও এর টীকায় এর বিস্তারিত বিবরণ এই উল্লেখ রয়েছে যে, ইকতেদার সময় যদি মহিলা এমন একজন পুরুষের বরাবর দাঁড়ায়, যে ইমামের বরাবর দাঁড়ানো, আর ইমামও মহিলার ইমামতের নিয়ত করে তবে মহিলার নামাজ হয়ে যাবে। কিন্তু এ পুরুষ মুক্তাদীর নামাজ হবে না, যদি ইমাম মহিলার ইমামতির নিয়ত না করে, তবে মহিলার নামাজও হবে না। অর্থাৎ এ সুরতে তাদের দুজনের কারো নামাজই হবে না। পুরুষের নামাজ এজন্য হবে না যে, মহিলা তার مُحَاذَاة -এর মাঝে চলে এসেছে। আর মহিলার নামাজ এজন্য হবে না যে, ইমাম তার ইমামতের নিয়ত করেনি। এক অভিমত অনুযায়ী মহিলা যদি ইকতেদার ক্ষেত্রে مُحَاذَاة নাও করে তবুও সেখানে ইমাম তার ইমামতির নিয়ত করা শর্ত। অন্য অভিমত অনুযায়ী সেখানে ইমাম মহিলার ইমামতির নিয়ত করা শর্ত নয়। এটিই বিশুদ্ধ বলে মনে হয়।

قَوْلُهُ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ : দুররুল মুখতার নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কেউ মহিলাদের ইমামতি করে, সে নামাজ যদি জানাজা নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ হয় এবং মহিলা কোনো পুরুষের বরাবর এসে দাঁড়ায়, তবে মহিলার নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য ইমামের কর্তব্য হচ্ছে, মহিলার ইমামতির নিয়ত করা। যেন اِلْتِزَامْ ব্যতীত নামাজে আসার কারণে তার নামাজ না ভেঙ্গে যায়। আর যদি মহিলা পুরুষের বরাবর এসে দাঁড়িয়ে ইমামের সাথে ইকতেদা না করে তবে এক অভিমত অনুযায়ী ইমামতের নিয়ত শর্ত নয়। অপর অভিমত অনুযায়ী তা শর্ত। প্রথম অভিমত সহীহ মনে হয়। যেমন– জানাজার নামাজ, জুমার নামাজ এবং দুই ঈদের নামাজে বিশুদ্ধ মাযহাব মোতাবেক তা শর্ত নয়।

قَوْلُهُ فَسَدَتْ صَلٰوةُ الْكُلِّ الخ : অর্থাৎ এ সুরতে কারো নামাজই সহীহ হবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে উম্মী এবং অসম্পূর্ণ পড়ুয়া ব্যক্তির নামাজ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَاِنَّ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ قَدْ الخ : এটি ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল। এর সারসংক্ষেপ হচ্ছে, কেরাত শুধু প্রথম দুই রাকাতে ফরজ, আর সে দুই রাকাত আদায় হয়ে গেছে। কেননা, এ দুই রাকাতে ইমাম কারী ছিল এবং সে তা পড়িয়েছে। এখন শেষ দুই রাকাতে খলিফা বানানোর প্রশ্ন এসেছে। যার মধ্যে কেরাত নেই; বরং হাদীস অনুযায়ী তসবিহ পড়ার দ্বারাও নামাজ হয়ে যায়। তাই এতে কারী এবং উম্মী বরাবর। অতএব, যদি এতে উম্মী খলিফা হয় তবে নামাজ ভাঙ্গবে না। আমাদের পক্ষ থেকে এর এই জওয়াব দেওয়া হয় যে, সমস্ত রাকাতে কেরাত ফরজ। কেননা, প্রত্যেক রাকাত হচ্ছে নামাজ। আর কেরাত ব্যতীত নামাজের কল্পনাও করা যায় না। তবে কেরাত হাকীকীও হয় তাকদীরীও হয়। এখন উম্মীর মাঝে কেরাত পড়ার মতো যোগ্যতা না থাকার কারণে কোনোভাবেই কেরাত পাওয়া যায়নি। না হাকীকী না তাকদীরী, তাই নামাজ ভাঙ্গবে না।

بَابُ الْحَدَثِ فِى الصَّلٰوةِ

مُصَلٍّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ تَوَضَّأَ وَاَتَمَّ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) وَلَوْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ خِلَافًا لَهُمَا فَاِنَّهُ اِذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لَمْ يَتِمَّ لِاَنَّ الْخُرُوْجَ بِصَنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَهُ وَالْاِسْتِيْنَافُ اَفْضَلُ لَمَّا ذَكَرَ حُكْمًا اِجْمَالِيًّا شَامِلًا لِجَمِيْعِ الْمُصَلِّيْنَ فَصَّلَ حُكْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْاِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَالْمُقْتَدِىْ ـ

পরিচ্ছেদ : নামাজে হদস হওয়া

অনুবাদ : মুসল্লির যখন হদস হবে তখন সে অজু করবে এবং নামাজ পূর্ণ করবে। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দ্বিমত রয়েছে। যদিও তাশাহহুদের পরে হয়। এতে সাহেবাইন (র.)-এর দ্বিমত রয়েছে। কেননা, যখন তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক হয়ে গেছে, তখন নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর ইমাম আবূ হানীফ (র.)-এর নিকট নামাজ পূর্ণ হবে না। কেননা, মুসল্লি স্বীয় কার্যের মাধ্যমে নামাজ থেকে বের হওয়া তার নিকট ফরজ। তবে ইসতিনাফ [নতুন করে নামাজ পড়া] উত্তম। গ্রন্থকার নামাজে হদস হওয়ার যখন একটি সংক্ষিপ্ত হুকুম উল্লেখ করলেন যা সমস্ত মুসল্লিকে শামিল রাখে, তখন তিনি ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফারিদ প্রত্যেকের হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : এ পরিচ্ছেদে নামাজে অজু ভঙ্গের কোনো কারণ দেখা দেওয়ার মাসায়েল বর্ণনা করা হবে। কেউ যেন এ মর্ম না বুঝে যে, قِرَاءَةٌ فِى الصَّلٰوةِ -এর ন্যায় حَدَثٌ فِى الصَّلٰوةِ -ও নামাজের একটি অংশ; বরং এর মর্ম হচ্ছে– যদি হঠাৎ কারো অজু ভঙ্গের কোনো কারণ দেখা দেয়, তবে এর হুকুম কি? এ পরিচ্ছেদে এ মাসাআলা সম্পর্কেই আলোচনা করা হবে।

মাসআলা : কোনো ব্যক্তির যদি নামাজে অজু ভঙ্গের কোনো কারণ দেখা দেয় তবে সে ফিরে যাবে, অজু করবে এবং ফিরে এসে নামাজে বেনা করবে ও নামাজ পূর্ণ করবে। যদিও তা তাশাহহুদের পরে হয়। তবে পূর্বের নামাজে বেনা না করে নতুন করে নামাজ পড়া উত্তম।

قَوْلُهُ سَبَقَهُ الْحَدَثُ تَوَضَّأَ : এতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখন নামাজে অনিচ্ছায় অজু ভঙ্গের কোনো কারণ দেখা দেবে তখনই একমাত্র বেনা করা জায়েজ। অতএব যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হদস ঘটায় কিংবা অন্যের পক্ষ থেকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অজু ভঙ্গের কারণ চলে আসে, তবে এতে বেনা সহীহ হবে না। যেমন– কারো জখম [ক্ষত] ছিল। নামাজের মধ্যখানে সে চুলকিয়েছে– ফলে এর থেকে রক্ত পড়েছে কিংবা কেউ তাকে নামাজে পাথর মেরেছে, তাই এর থেকে রক্ত ঝরেছে, তবে এ সুরতে বেনা জায়েজ হবে না। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে– মুসল্লির শরীর থেকে ঐ জিনিস বের হয়ে গড়িয়ে পড়তে হবে। অতএব, যদি নামাজে মুসল্লির কাপড় এক দিরহামের চেয়ে বেশি নাপাক হয়ে যায়, কিংবা বেহুশ কিংবা মাতাল হয়ে যায়, কিংবা অট্টহাসি দেওয়ার কারণে তার অজু ভেঙ্গে যায়, তবে এ সুরতগুলোতে বেনা করা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ تَوَضَّأَ وَاَتَمَّ : অর্থাৎ তার কর্তব্য হলো– অজু করা। অতঃপর তার ইচ্ছা– সে ফিরে এসে চাইলে বাকি নামাজ পূর্ণ করতে পারে কিংবা নতুন করে নামাজ পড়তে পারে। বাকি নামাজকে পূর্ণ করার নাম বেনা। আর বেনা করার জন্য শর্ত হলো,

হদস-অজু ভঙ্গের পর বাইরে এত দীর্ঘ সময় দেরি করবে না যে, এক রুকন পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে নামাজ ভেঙ্গে যাবে অনুরূপ অজু করার জন্য যাওয়া-আসা এবং মধ্যখানে এমন কোনো কাজ করতে পারবে না, যা নামাজের অবস্থায় করলে নামাজ ভেঙ্গে যায়। যেমন– কারো সাথে কথা বলা কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আবার হদস করা কিংবা সতর খোলা ইত্যাদি। যদি এমন কিছু করে তবে নামাজ ভেঙ্গে যাবে। অনুরূপ অজুর জন্য নিকটের জায়গা পরিহার করে দূরে যাবে না, তাহলে নামাজ ভেঙ্গে যাবে এবং বেনা করা সহীহ হবে না।

مَسْئَلَةُ الْبِنَاءِ : বেনা করার মাসআলা সম্পর্কে আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আহনাফ বলেন, নামাজে বেনা করা জায়েজ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নামাজে বেনা করা জায়েজ নেই।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন– لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ অর্থাৎ "পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না।" –[তিরমিযী, আবূ দাউদ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না, আর বেনার মাসআলায় অজু ভেঙ্গে যাওয়ার পর অজু করে এসে বেনা করা হয়। এর দ্বারা নামাজের কিছু সময় অজুহীন অবস্থায় হচ্ছে, আর তা জায়েজ নেই।

আহনাফের দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَنْ اَصَابَهُ قَيْئٌ اَوْ رُعَافٌ اَوْ قَلَسٌ اَوْ مَذِيٌّ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلٰى صَلَاتِهٖ وَهُوَ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ .

অর্থাৎ যার বমি হয়, কিংবা নাকসীর হয়, কিংবা পুঁজ, কিংবা মযী বের হয়– সে যেন ফিরে যায় এবং অজু করে, অতঃপর তার নামাজে বেনা করে। এমতাবস্থায় যে, সে এতে কথা বলেনি। –[ইবনে মাজাহ শরীফ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ স্পষ্ট।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর খণ্ডন হচ্ছে– বেনাকারী অজু করে এসে হদস হওয়ার পর ছুটে যাওয়া নামাজ থেকে শুরু করে। অতএব বুঝা গেল তার মধ্যখানের অজু করার সময় ও হদসের সময় মূলত নামাজের কোনো অংশ নয়। আর অজু করতে যাওয়া, আসা এবং অজু করা এসব عَمَلٌ كَثِيْرٌ খিলাফে কিয়াস উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

তাশাহহুদের পর বেনা করার মাসআলা : তাশাহহুদের পর বেনা করার প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে সাম্যন্য মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফ (র.) বলেন, তাশাতহুদের পরেও যদি হদসযুক্ত হয় তবে তাকে অজু করে এসে বেনা করতে হবে। দলিল হলো, মুসল্লি নিজস্ব কোনো কার্যের মাধ্যমে নামাজ থেকে বের হওয়া ফরজ। আর সে ফরজ তার এখনো বাকি রয়ে গেছে। অতএব, তাকে অজু করে এসে বেনা করে উক্ত ফরজ আদায় করতে হবে।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) বলেন, তাশাহহুদের পর যদি হদসযুক্ত হয়, তবে তাকে অজু করে বেনা করতে হবে না দলিল হলো, শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা ফরজ, আর তা আদায় হয়ে গেছে। অর্থাৎ তার اَرْكَانْ ও فَرَائِضْ সব আদায় হয়ে গেছে। কারণ, তাদের নিকট মুসল্লি নিজস্ব কাজ দ্বারা নামাজ থেকে বের হওয়া ফরজ নয়। অতএব, তাশাহহুদ পরিমাণ সময় শেষ বৈঠক করার দ্বারা তার নামাজ পরিপূর্ণ হয়েছে, তাই তার বেনা করা আবশ্যক নয়।

فَقَالَ وَالْإِمَامُ يَجُرُّ اٰخَرَ اِلٰى مَكَانِهٖ هٰذَا تَفْسِيْرُ الْاِسْتِخْلَافِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُتِمُّ ثَمَّهٗ اَوْ يَعُوْدُ اَىْ اِنْ شَاءَ يُتِمُّ حَيْثُ تَوَضَّأَ وَاِنْ شَاءَ عَادَ اِلَى الْمَكَانِ الْاَوَّلِ وَاِنَّمَا خُيِّرَ لِاَنَّ فِى الْاَوَّلِ قِلَّةَ الْمَشْىِ وَفِى الثَّانِىْ اَدَاءَ الصَّلٰوةِ فِىْ مَكَانٍ وَاحِدٍ فَيَمِيْلُ اِلٰى اَيِّهِمَا شَاءَ وَكَذَا الْمُنْفَرِدُ اِنْ شَاءَ يُتِمُّ حَيْثُ تَوَضَّأَ وَاِنْ شَاءَ عَادَ اِنْ فَرَغَ اِمَامُهٗ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهٖ وَيُتِمُّ ثَمَّهٗ اَوْ يَعُوْدُ وَالضَّمِيْرُ فِىْ اِمَامِهٖ يَرْجِعُ اِلَى الْاِمَامِ الْاَوَّلِ وَاِمَامُهٗ هُوَ الَّذِىْ اِسْتَخْلَفَهٗ فَاِنَّ الْخَلِيْفَةَ اِمَامٌ لِلْاِمَامِ الْاَوَّلِ وَلِلْقَوْمِ وَاِلَّا عَادَ اَىْ وَاِنْ لَمْ يَفْرُغْ اِمَامُهٗ وَهُوَ الْخَلِيْفَةُ يَعُوْدُ الْاِمَامُ وَيُتِمُّ خَلْفَ خَلِيْفَتِهٖ وَكَذَا الْمُقْتَدِىْ اَىْ اِنْ فَرَغَ اِمَامُهٗ يُتِمُّ ثَمَّهٗ اَوْ يَعُوْدُ وَاِنْ لَمْ يَفْرُغْ يَعُوْدُ وَلَوْ جُنَّ اَوْ اُغْمِىَ عَلَيْهِ اَوِ احْتَلَمَ اَىْ نَامَ فِىْ صَلَاتِهٖ نَوْمًا لَا يَنْقُضُ بِهٖ وُضُوْءُهٗ فَاحْتَلَمَ اَوْ قَهْقَهَهٗ اَوْ اَحْدَثَ عَمْدًا اَوْ اَصَابَهٗ بَوْلٌ كَثِيْرٌ اَوْ شُجَّ فَسَالَ اَوْ ظَنَّ اَنَّهٗ اَحْدَثَ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ اَوْ جَاوَزَ الصُّفُوْفَ خَارِجَهٗ ثُمَّ ظَهَرَ طُهْرُهٗ بَطَلَتْ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ اَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْ بَنٰى اِعْلَمْ اَنَّ هٰذِهِ الْحَوَادِثَ نَادِرَةٌ فَلَمْ تَكُنْ فِىْ مَعْنٰى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَاءَ اَوْ رَعَفَ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلٰى صَلَاتِهٖ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ـ

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, [যখন ইমামের হদস যুক্ত হবে তখন] ইমাম অন্য কাউকে টেনে তার জায়গায় নিয়ে আসবে। এটি খলিফা বানানোর ব্যাখ্যা। অতঃপর অজু করবে এবং [যেখানে অজু করেছে] সেখানে নামাজ পূর্ণ করবে কিংবা ফিরে আসবে। অর্থাৎ তার ইচ্ছা– চাইলে যেখানে অজু করেছে সেখানে নামাজ পূর্ণ করবে কিংবা চাইলে পূর্বের জায়গায় ফিরে আসবে। আর এ স্বাধীনতা এ কারণে দেওয়া হয়েছে যে, প্রথম সুরতে কম পথ চলা হয় এবং দ্বিতীয় সুরতে এক জায়গায় নামাজ আদায় করা হয়। তাই এ দুটির যেটি তার ইচ্ছা সেদিকে ফিরে যাবে। অনুরূপ মুনফারিদেরও ইচ্ছা। ইচ্ছে হলে যেখানে অজু করেছে সেথায় নামাজ পূর্ণ করবে কিংবা পূর্বের জায়গায় ফিরে আসবে, যদি তার ইমাম নামাজ থেকে অবসর হয়ে যায়। এটি গ্রন্থকারের কথা– وَيُتِمُّ ثَمَّهٗ اَوْ يَعُوْدُ-এর সাথে সম্পৃক্ত। اِمَامُهٗ-এর ضَمِيْر প্রথম ইমামের দিকে ফিরেছে। আর ইমাম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তাকে খলিফা বানিয়েছে। অতএব, খলিফা প্রথম ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লিদের ইমাম। অন্যথায় ফিরে আসবে। অর্থাৎ যদি তার ইমাম নামাজ থেকে অবসর না হয়– যে খলিফা, তবে ইমাম ফিরে আসবে এবং তার খলিফার পিছনে নামাজ পূর্ণ করবে। অনুরূপ মুক্তাদী। অর্থাৎ যদি তার ইমাম নামাজ থেকে অবসর হয়ে যায় তবে সে ইচ্ছা করলে সেখানেই নামাজ পূর্ণ করবে, কিংবা ফিরে আসবে। আর যদি তার ইমাম নামাজ থেকে অবসর না হয়, তবে সে ফিরে আসবে। যদি [কেউ নামাজে] পাগল হয়ে যায় কিংবা বেহুঁশ হয়ে যায়, কিংবা তার ইহতিলাম [স্বপ্নদোষ] হয়। অর্থাৎ সে নামাজে

এমন ঘুম ঘুমিয়েছে যার দ্বারা অজু ভাঙ্গে না তবে তার স্বপ্নদোষ হয়ে গেছে, কিংবা সে অট্টহাসি দিয়েছে, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে হদস করেছে, কিংবা তার কাপড়ে অধিক পরিমাণে পেশাব লেগেছে, কিংবা আঘাত লেগেছে তাই রক্ত প্রবাহিত হয়েছে; কিংবা তার ধারণা যে, সে হদস ঘটিয়েছে– ফলে সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেছে, কিংবা কাতার অতিক্রম করে মসজিদের বাইরে চলে গেছে, অতঃপর তার পবিত্রতা প্রকাশ পেয়েছে। তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে মসজিদ থেকে বাহির না হয়; কিংবা মসজিদের বাহিরে হলে কাতার অতিক্রম না করে তবে [তার নামাজ বাতিল হবে না] বরং সে বেনা করবে। [এবং বাকি নামাজ পূর্ণ করবে।] বুঝা গেল যে, উল্লিখিত অজু ভঙ্গের কারণসমূহ খুব কমই ঘটে থাকে, তাই নস অবতীর্ণ হওয়ার স্থানের অর্থে হবে না। [অতএব, নস অবতীর্ণ হওয়ার স্থানের উপর একে কিয়াস করা যাবে না।] আর নস হচ্ছে– "রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজে বমি করেছে, কিংবা নাসিকা থেকে রক্ত ঝরেছে তবে সে নামাজ ছেড়ে চলে যাবে, অজু করবে এবং স্বীয় নামাজের উপর বেনা করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কথাবার্তা না বলবে।" [কেননা, কথাবার্তা বলার দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْإِمَامُ يَجُرُّ اٰخَرَ اِلٰى مَكَانِهٖ : অর্থাৎ যদি ইমামের হদস যুক্ত হয়, তবে সে মুক্তাদীদের কাউকে তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেবে এবং সে বাকি নামাজের ইমামতি করবে। অতএব, ইমাম এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তার কাপড়ে ধরে টেনে আনবে কিংবা ইশারা করে নিয়ে আসবে। যদি মুক্তাদীর সঙ্গে কথা বলে সামনে আনে তবে তার নামাজ ভেঙ্গে যাবে এবং সে পরবর্তীতে বেনা করতে পারবে না। আর যদি সে কাউকেই খলিফা না বানায় এবং হদস হওয়ার সাথে সাথে সে অজু করার জন্য মসজিদ থেকে বাইরে চলে যায়, তবে সকলের নামাজ ভেঙ্গে যাবে।

قَوْلُهُ وَاِلَّا عَادَ اَىْ الخ : অর্থাৎ যদি নামাজের জায়গায় এসে ইকতিদা করার জন্য কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে তবে ফিরে আসা ওয়াজিব। আর যদি ইকতিদা করার কোনো প্রতিবন্ধক থাকে, যেমন– রাস্তা, নালা ইত্যাদি, তবে তার ইচ্ছা– সে যেখানে অজু করেছে সেখানেও নামাজ পড়তে পারে; কিংবা প্রথম জায়গায়ও ফিরে আসতে পারে।

قَوْلُهُ اَىْ نَامَ فِىْ صَلَاتِهٖ نَوْمًا : যেহেতু এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, স্বপ্নদোষ তো হয় শুধু ঘুমের মাঝে, তবে তা নামাজে হয় কিভাবে? এর উত্তরের দিকে ইশারা করেই বলা হয়েছে যে, সে নামাজে ঘুমিয়ে পড়েছে এবং স্বপ্নদোষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সন্দেহ হয়, ঘুম তো স্বয়ং অজু ভঙ্গের কারণ, তাই তার নামাজ তো স্বপ্নদোষ ব্যতীতও ভেঙ্গে যাবে। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, এমন ঘুম যা দ্বারা অজু ভাঙ্গে না। যেমন– তাশাহহুদের বৈঠকে বসে বসে ঘুমালে অজু ভাঙ্গে না। মূলত গ্রন্থকার যদি اِحْتِلَامْ-এর জায়দায় اِنْزَالْ শব্দ বলতেন তবে উত্তম হতো। কেননা, اِحْتِلَامْ ঐ اِنْزَالْ-কে বলা হয়, যা ঘুমন্ত অবস্থায় হয় কিন্তু اِنْزَالْ; এর চেয়ে আম। কেননা, ঘুম ব্যতীত কোনো মহিলাকে দেখে কিংবা কোনো বিষয়ে কল্পনা করার দ্বারা اِنْزَالْ হতে পারে। আর তা নামাজেও কল্পনা করা যায়।

قَوْلُهُ اَوْ قَهْقَهَةً : নামাজে অট্টহাসি দেওয়ার দ্বারা অজু ভেঙ্গে যায়। অতএব, তার নামাজও ভেঙ্গে যাবে। قَهْقَهَة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আওয়াজ দিয়ে হাসা– যা অন্য লোকও শুনে। আর যদি আওয়াজ অন্য লোক না শুনে; বরং সে নিজেই শুনে, তবে তা হবে ضِحْك , এর দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়; কিন্তু অজু ভাঙ্গে না। আর যদি হাসির আওয়াজ অন্য কেউ তো শুনেনি; বরং সে নিজেও শুনেনি তবে তা হবে تَبَسُّمْ। এর দ্বারা না অজু ভাঙ্গে; না নামাজ ভাঙ্গে। হ্যাঁ যদি কেউ জান্নাত কিংবা আল্লাহর সাক্ষাৎকে কল্পনা করে খুশিতে অট্টহাসি দেয়; কিংবা দোজখকে কল্পনা করে উচ্চৈঃস্বরে কান্না করে, তবে তা নামাজে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করবে না।

قَوْلُهُ اَوْ اَصَابَهُ بَوْلٌ كَثِيْرٌ : بَوْل كَثِيْر দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– এই পরিমাণ নাপাক কাপড়ে লাগা, যা নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক। আর পেশাবের কথা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে– এই পরিমাণ নাপাক যদি কাপড়ে লাগে যা শরিয়ত ক্ষমা করে না।

قَوْلُهُ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ : এ قَيْد এজন্য লাগানো হয়েছে যে, যদি মসজিদ থেকে বের না হয়, তবে তার নামাজ বাতিল হবে না; বরং বাকি নামাজ পড়বে। কারণ, মসজিদের ভিতরের প্রান্ত যদিও বিভিন্ন হয়; কিন্তু পুরোটাই মসজিদ এবং এজন্যই ইকতেদা করা সহীহ এবং তেলাওয়াতের সিজদাও দ্বিতীয়বার করা আবশ্যক নয়; কিন্তু কিয়াসর চাহিদা হচ্ছে– নতুন করে নামাজ পড়া। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও এভাবে বর্ণনা রয়েছে। কেননা, এতে আসা-যাওয়া ও কিবলার দিক থেকে সরে যাওয়া রয়েছে, যার দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়। আমাদের নিকট যুক্তি হচ্ছে, সে اِصْلَاحْ -এর নিয়তে আসা-যাওয়া সবকিছু করেছে; নামাজ ছেড়ে দেওয়ার নিয়তে নয়।

قَوْلُهُ اَوْ جَاوَزَ الصُّفُوْفَ : একে خَرَجَ -এর উপর عَطْف করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি মসজিদে থাকে তবে মসজিদ থেকে বের হওয়া আর যদি মসজিদের বাইরে হয় তবে কাতার অতিক্রম করা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, মরুভূমিতে কাতারের জায়গা মসজিদের হুকুমে। এ হুকুম তখন যখন সে পিছনের দিকে ফিরে যাবে। আর যদি সে সামনের দিকে যায় তবে সুতরা পর্যন্ত ধর্তব্য হবে। সুতরা না থাকাবস্থায়– পিছনের কাতার পরিমাণ অংশ ধর্তব্য হবে। আর মুনফারিদের জন্য সর্বদিক থেকে তার সিজদা পরিমাণ জায়গা ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ بَطَلَتْ : এটি وَلَوْ جُنَّ -এর جَزَا অর্থাৎ নামাজে উল্লিখিত বিষয়াদি দেখা দেওয়ার দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়, তাই নামাজ নতুন করে পড়তে হয়। পাগলামি, মাতালামি এবং অট্টহাসি যদিও অজু ভঙ্গের কারণ, কিন্তু এতে শরীর থেকে অজু ভঙ্গের কোনো কিছু বের হয়নি; বরং তা একেবারেই কম সংঘটিত হয়ে থাকে। উল্লিখিত বিষয়গুলো তাশাহহুদের পূর্বে সংঘটিত হওয়ার দ্বারা নামাজ বাতিল হবে। আর যদি তা তাশাহহুদের পরে হয়, তবে নামাজ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি পেশাব লেগে যায়, তবে যেহেতু হদস যুক্ত হওয়ার সুরতে বেনা করা জায়েজ, তাই নাপাকী লাগার সুরতের সাথে এ মাসআলা আসবে না। আর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নির্গত হওয়ার সুরত কম ঘটে থাকে তাই এটি مَوْرِد حَدِيْث -এর সাথে যুক্ত হবে না। অনুরূপ মসজিদ থেকে বাইরে যাওয়া এবং কাতার থেকে আগে যাওয়ার সুরতও কম ঘটে থাকে। এজন্য এমন সুরতে যখন তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখনও তা مَوْرِد حَدِيْث -এর হুকুমে আসবে না। উদ্দেশ্য হচ্ছে– এসব বিষয় যেহেতু حَدِيْث مَوْرِد -এর بِنَاء -এর পরিপন্থি, তাই এর হুকুম বেনা করা হবে না এবং এতে কিয়াস ও দৃষ্টান্তের সঙ্গে দৃষ্টান্ত মিলানো কোনোটাই চলবে না। কেননা, কিয়াসের বহিরাগত বিষয়ের উপর কিয়াস করা জায়েজ নেই।

وَلَوْ اَحْدَثَ عَمْدًا بَعْدَ التَّشَهُّدِ اَوْ عَمِلَ مَا يُنَافِيْهَا تَمَّتْ لِوُجُوْدِ الْخُرُوْجِ بِصُنْعِهٖ وَيَبْطُلُهَا بَعْدَهٗ اَىْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) رُؤْيَةُ الْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ وَ نَزْعُ الْمَاسِحِ خُفَّهٗ بِعَمَلٍ يَسِيْرٍ اِنَّمَا قَالَ بِعَمَلٍ يَسِيْرٍ لِاَنَّهٗ لَوْ عَمِلَ هُنَاكَ عَمَلًا كَثِيْرًا يَتِمُّ صَلَاتُهٗ وَمُضِىُّ مُدَّةِ مَسْحِهٖ وَتَعَلُّمُ الْاُمِّىِّ سُوْرَةً وَنَيْلُ الْعَارِىْ ثَوْبًا وَ قُدْرَةُ الْمُؤْمِىْ عَلَى الْاَرْكَانِ وَتَذَكُّرُ فَائِتَةٍ اَىْ لِصَاحِبِ التَّرْتِيْبِ وَتَقْدِيْمُ الْقَارِئِ اُمِّيًّا وَطُلُوْعُ ذُكَاءٍ فِى الْفَجْرِ وَ دُخُوْلُ وَقْتِ الْعَصْرِ فِى الْجُمُعَةِ وَ زَوَالُ عُذْرِ الْمَعْذُوْرِ وَسُقُوْطُ الْجَبِيْرَةِ عَنْ بُرْءٍ اَلْخِلَافُ فِىْ هٰذِهِ الْمَسَائِلِ الْاِثْنَىْ عَشَرَ بَيْنَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَصَاحِبَيْهِ (رحـ) مَبْنِىٌّ عَلٰى اَنَّ الْخُرُوْجَ بِصُنْعِهٖ فَرْضٌ عِنْدَهٗ لَا عِنْدَهُمَا ۔

অনুবাদ : তাশাহহুদের পর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হদস ঘটায়, যা নামাজের জন্য নিষিদ্ধ তবে তার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। কারণ, এতে নিজস্ব কাজের মাধ্যমে বের হওয়া পাওয়া গেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট নামাজ বাতিল হয়ে যায়, তায়াম্মুমকারী পানি দেখার কারণে এবং মাসেহকারী আমলে কালীল (عَمَل قَلِيْل) -এর মাধ্যমে তার মোজা খোলার কারণে। গ্রন্থকার এ কারণে عَمَل قَلِيْل বলেছেন যে, যদি عَمَل كَثِيْر -এর মাধ্যমে খুলে তবে নামাজ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। [কেননা, এতে خُرُوْجٌ بِصُنْعِهٖ পাওয়া যায়।] মাসেহেব মুদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে, উম্মী-তার সূরা পড়তে পারার কারণে, বিবস্ত্র ব্যক্তি কাপড় পাওয়ার কারণে, ইশারাকারী আরকান আদায়ের উপর সক্ষম হওয়ার কারণে, صَاحِب تَرْتِيْب -এর কাজা নামাজের কথা স্মরণ হওয়ার কারণে, কারী ইমাম উম্মীকে খলিফা বানানোর কারণে, ফজরের নামাজে সূর্য উদিত হওয়ার কারণে, জুমার নামাজে আসরের ওয়াক্ত চলে আসার কারণে, মাজুর ব্যক্তির ওজর দূর হয়ে যাওয়ার কারণে এবং ক্ষতস্থান শুকিয়ে পট্টি পড়ে যাওয়ার কারণে– [এসব বিষয় যদি তাশাহহুদের পর সংঘটিত হয় তবে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে]। উল্লিখিত বারোটি সুরতে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। মতানৈক্যের ভিত্তি এ কথার উপর যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট মুসল্লির নিজস্ব কাজ দ্বারা নামাজ থেকে বের হওয়া ফরজ। আর সাহেবাইন (র.)-এর নিকট তা ফরজ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ تَمَّتْ : অর্থাৎ যদি কেউ তাশাহহুদের পর হদস করে কিংবা স্বেচ্ছায় নামাজে এমন কাজ করেছে যা নামাজের জন্য নিষিদ্ধ, তবে যেহেতু তাশাহহুদের পর خُرُوْجٌ بِصُنْعِهٖ পাওয়া গেছে সেহেতু তার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু এর দ্বারা সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। কেননা, سَلَامْ শব্দের মাধ্যমে নামাজ থেকে বের হওয়া ওয়াজিব ছিল, আর সে তা বর্জন করেছে। এজন্য নামাজ দোহরানো ওয়াজিব। যারা বুঝে না তারা আহনাফের উপর তিরস্কার করে, স্বেচ্ছায় হদস করার দ্বারা নামাজ পরিপূর্ণ হওয়ার হুকুমকে তারা খারাপ জানে। তাদের কেউ কেউ মনে করে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে হদস ঘটিয়ে নামাজ থেকে অবসর হওয়াকে আহনাফ জায়েজ বলে। অথচ আহনাফের নিকট সালাম শব্দের মাধ্যমে নামাজ থেকে অবসর হওয়া ওয়াজিব আর তাদের নিকট ওয়াজিব বর্জন করা মাকরূহে তাহরীমী; বরং বরাবর হারাম।

প্রশ্ন হয়, হদসের মাধ্যমে কিভাবে নামাজ থেকে বের হওয়া যায়? এর উত্তরে মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এ মাসআলার উৎস হচ্ছে– হাদীস। এ সম্পর্কে প্রায় বিশটির মতো বর্ণনা রয়েছে, যার সারমর্ম হচ্ছে– শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর যদি হদস সংঘটিত হয় তবে নামাজ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لِوُجُوْدِ الْخُرُوْجِ بِصُنْعِهِ : হালবী (র.) লেখেন, যদি বলা হয় যে, এমন গুনাহের মাধ্যমেও কি নামাজ থেকে বের হওয়া সম্ভব? যেমন– মিথ্যা বলে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে হদস ঘটিয়ে। অথচ হদসকে নামাজের ফরজের অন্তর্ভুক্ত করা ও এর جُزْء [অংশ] বানানো অনেক মন্দ কথা। আমরা বলব, কোনো একটি কাজের মাধ্যমেই শুধু নামাজ থেকে বের হওয়া ফরজ, তাই বের হওয়া (خُرُوْج) যা مُسَبَّبْ তা ফরজ। আর কার্য, যা সবব তা ফরজ নয়। আর سَبَبْ [কার্য] মন্দ হওয়ার দ্বারা مُسَبَّبْ মন্দ হওয়া আবশ্যক হয় না।

قَوْلُهُ رُؤْيَةُ الْمُتَيَمِّمِ : অর্থাৎ তায়াম্মুমকারী তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর সালাম ফিরানোর পূর্বে পানি দেখেছে এবং সে তা ব্যবহারে সক্ষম তবে তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে তার নামাজও বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَ نَزْعُ الْمَاسِحِ خُفَّهُ : কারণ, যখন মুসল্লি সালামের পূর্বে মোজা খুলে ফেলেছে, তখন তার মাসেহ বাতিল হয়ে গেছে এবং তার জন্য পা ধোয়া ওয়াজিব হয়ে গেছে। এজন্য তার নামাজও বাতিল হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَمَضَى مُدَّةِ مَسْحِهِ : কারণ, যখন মোজার উপর মাসেহকারীর মাসেহের মুদ্দত সালাম ফিরানোর পূর্বে শেষ হয়ে যাবে, তখন তার মাসেহ বাতিল হয়ে যায় এবং পা ধোয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। ফলে তার নামাজও বাতিল হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَ تَعَلُّمُ الْأُمِّيِّ سُوْرَةً : উম্মী ব্যক্তি যে কেরাত ব্যতীতই নামাজ পড়ছে– যদি তাশাহহুদের পর তার কোনো সূরা স্মরণ আসে। যেমন– সূরা ইখলাস কিংবা কোনো বড় আয়াত, কিংবা ছোট ছোট তিন আয়াত সালামের পূর্বে স্মরণ আসে– যে পরিমাণ কেরাত দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় এবং সে তা পড়েছেও যার দ্বারা তার অক্ষমতাটা দূর হয়ে যায়– তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَنَيْلُ الْعَارِيْ ثَوْبًا : অর্থাৎ যার কাছে কাপড় নেই সে বিবস্ত্র নামাজ পড়বে। তাশাহহুদের পর যদি সে কাপড় পেয়ে যায়– তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَقُدْرَةُ الْمُؤْمِىْ عَلَى الْأَرْكَانِ : অর্থাৎ নামাজের আরকান আদায় করতে অক্ষম ব্যক্তি ইশারার মাধ্যমে নামাজ পড়তে শুরু করেছে। অতঃপর তাশাহহুদের পর সালামের পূর্বে আরকান আদায় করার উপর সক্ষম হয়ে যায়, তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَتَذَكُّرُ فَائِتَةٍ : অর্থাৎ কোনো সাহেবে তারতীব যেমন আসরের নামাজ পড়ছে– তাশাহহুদের পর সালামের পূর্বে হঠাৎ স্মরণ হয়েছে যে, তার জোহরের নামাজ কাজা হয়ে গেছে, তবে তার ঐ আসরের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। এখন তার জন্য আবশ্যক, প্রথমে জোহরের নামাজ আদায় করা, অতঃপর আসরের নামাজ আদায় করা। কিন্তু এতে শর্ত হচ্ছে– ঐ ওয়াক্তী নামাজের যেন শেষ ওয়াক্ত না হয়; অন্যথায় এটিও কাজা হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ -এর অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

قَوْلُهُ تَقْدِيْمُ الْقَارِئِ أُمِّيًّا : অর্থাৎ যখন 'কারী ইমাম'-এর তাশাহহুদের পর হদস যুক্ত হয় এবং সে কোনো উম্মী মুক্তাদীকে তার খলিফা বানায়, তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَطُلُوْعُ ذُكَاءٍ فِى الْفَجْرِ : অর্থাৎ সে সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময়ে নামাজ শুরু করেছে এবং তাশাহহুদের পর সূর্য উদয় হয়ে গেছে, তবে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَدُخُوْلُ وَقْتِ الْعَصْرِ : অর্থাৎ জুমার নামাজ এত বিলম্ব করে শুরু করেছে যে, তাশাহহুদের পরে সালাম ফিরানোর পূর্বে জুমার ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেছে এবং আসরের ওয়াক্ত চলে আসছে, তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَ زَوَالُ عُذْرِ الْمَعْذُوْرِ : অর্থাৎ সর্বদা যার পেশাব টপটপ করে পড়ে কিংবা যে নাকসীরের রোগে আক্রান্ত কিংবা ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা طَهَارة ضَرُوْرِيَّة -এর মাধ্যমে নামাজ শুরু করেছে এবং তাশাহহুদের পর সে সুস্থ হয়ে গেছে, তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَسُقُوْطُ الْجَبِيْرَةِ عَنْ بُرْءٍ : অর্থাৎ ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে এর উপর মাসেহ করে নামাজ শুরু করেছে, কিন্তু তাশাহহুদের পর যখন ভালো হয়ে পট্টি পড়ে গেছে তবে তার পবিত্রতা বাতিল হয়ে গেছে, ফলত তার নামাজও বাতিল হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى اَنَّ الْخُرُوْجَ بِصُنْعِهِ : অর্থাৎ উল্লিখিত মাসায়েলের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আর মতানৈক্যের ভিত্তি এ কথার উপর যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট মুসল্লি নিজস্ব কাজের মাধ্যমে নামাজ থেকে বের হওয়া ফরজ। আর উল্লিখিত সুরতগুলোতে যেহেতু তা পাওয়া যায়নি। অতএব, নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট তা ফরজ নয়; বরং তাশাহহুদের পর নামাজের জন্য নিষিদ্ধ কোনো কিছু পাওয়া গেলেই নামাজ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তাই উল্লিখিত সুরতগুলোতে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট নামাজ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

وَكَذَا قَهْقَهَةُ الْإِمَامِ وَحَدَثُهُ عَمْدًا صَلٰوةَ الْمَسْبُوْقِ اَىْ يَبْطُلُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ صَلٰوةُ الْمَسْبُوْقِ لِوُقُوْعِهٖ فِىْ خِلَالِ صَلٰوتِهٖ لَا كَلَامُهٗ وَخُرُوْجُهٗ مِنَ الْمَسْجِدِ اَىْ اِنْ تَكَلَّمَ الْإِمَامُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ لَا يَبْطُلُ صَلٰوةُ الْمَسْبُوْقِ لِاَنَّ الْكَلَامَ كَالسَّلَامِ مِنْهُ لِلصَّلٰوةِ اِمَامٌ حُصِرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فَاسْتَخْلَفَ صَحَّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) خِلَافًا لَهُمَا وَهٰذَا اِذَا لَمْ يَقْرَأْ قَدْرَ مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ اَمَّا اِذَا قَرَأَ تَفْسُدُ صَلَاتُهٗ لِاَنَّ الْاِسْتِخْلَافَ عَمَلٌ كَثِيْرٌ فَيَجُوْزُ حَالَةَ الضَّرُوْرَةِ كَتَقْدِيْمِهٖ مَسْبُوْقًا اَىْ كَتَقْدِيْمِ الْإِمَامِ مَسْبُوْقًا سَوَاءٌ اَحْدَثَ الْإِمَامُ اَوْ حُصِرَ فَاِنَّهٗ يَنْبَغِىْ اَنْ يُقَدِّمَ مُدْرِكًا لَا مَسْبُوْقًا وَمَعَ ذٰلِكَ اِنْ قَدَّمَ مَسْبُوْقًا يَصِحُّ فَيُتِمُّ صَلٰوةَ الْإِمَامِ اَوَّلًا وَيُقَدِّمُ مُدْرِكًا يُسَلِّمُ بِهِمْ وَحِيْنَ اَتَمَّهَا يَضُرُّهُ الْمُنَافِىْ الْاَوَّلَ اِلَّا عِنْدَ فَرَاغِهٖ لَا الْقَوْمَ اَىْ حِيْنَ اَتَمَّ الْمَسْبُوْقُ صَلٰوةَ الْإِمَامِ لَوْ وُجِدَ مِنْهُ مُنَافِىُ الصَّلٰوةِ كَالْقَهْقَهَةِ وَالْكَلَامِ وَالْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ تَفْسُدُ صَلَاتُهٗ وَصَلٰوةُ الْإِمَامِ الْاَوَّلِ لِاَنَّهٗ وُجِدَ فِىْ خِلَالِ صَلَاتِهِمَا اِلَّا عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ الْاَوَّلِ بِاَنْ تَوَضَّأَ وَاَدْرَكَ خَلِيْفَتَهٗ بِحَيْثُ لَمْ يَفُتْهُ شَىْءٌ وَاَتَمَّ صَلَاتَهٗ خَلْفَ خَلِيْفَتِهٖ وَلَا تَفْسُدُ صَلٰوةُ الْقَوْمِ لِاَنَّهٗ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ .

অনুবাদ : অনুরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামের অট্টহাসি ও তার হদস মাসবূকের নামাজকে। অর্থাৎ তাশাহহুদের পরে [যদি ইমাম এমনটি করে তবে] মাসবূকের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, মাসবূকের নামাজের মধ্যখানে ইমামের অট্টহাসি ও হদস সংঘটিত হয়েছে। ইমামের কথা বলা ও মসজিদ থেকে বের হওয়া নয়। অর্থাৎ যদি ইমাম তাশাহহুদের পর যদি কথা বলে তবে মাসবূকের নামাজ বাতিল হবে না। কেননা, সালামের মতো তার কথাটাও নামাজ সমাপ্তকারী। এক ইমাম কেরাতে আটকে গেছে, তাই যদি সে খলিফা বানায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট সহীহ। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট সহীহ নয়। আর এ খলিফা বানানো তখন জায়েজ যখন مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلَاةُ পরিমাণ কেরাত না পড়বে। কিন্তু যদি এ পরিমাণ কেরাত পড়ে ফেলে [অতঃপর সে কাউকে খলীফা বানায়] তবে তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা, খলীফা বানানো হচ্ছে عَمَلٌ كَثِيْرٌ । অতএব তা শুধু প্রয়োজনের সময়ই জায়েজ। যেরূপ মাসবূককে খলিফা বানানো জায়েজ। ইমামের চাই হদস ঘটুক কিংবা কেরাতে আটকে যাক। কিন্তু مُدْرِكٌ -কে খলিফা বানানো উচিত; মাসবূককে নয়। এতদসত্ত্বেও যদি মাসবূককে খলিফা বানানো হয়, তবে তা সহীহ হবে। অতএব, [খলিফা হওয়ার পর] প্রথমে ইমামের নামাজ পূর্ণ করবে এবং কোনো مُدْرِكٌ -কে সামনে বাড়িয়ে দেবে, যেন মুক্তাদীদের সাথে নিয়ে সালাম ফিরাতে পারে। আর যখন মাসবূক ইমামের নামাজ পূর্ণ করবে, তখন নামাজের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো তাকে এবং প্রথম ইমামকে ক্ষতি করবে, তবে প্রথম ইমাম অবসর হওয়ার পর। মুক্তাদীদের [ক্ষতি করবে] না। অর্থাৎ যখন মাসবূক প্রথম ইমামের নামাজ পূর্ণ করবে, তখন যদি তার থেকে নামাজে নিষিদ্ধ এমন কোনো কার্য সংঘটিত হয়। যেমন– অট্টহাসি, কাথাবার্তা, মসজিদ থেকে বের হওয়া তবে তার নামাজ এবং প্রথম ইমামের নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। কারণ, নামাজে নিষিদ্ধ ঐ কারণটি তাদের দুজনের নামাজে

পাওয়া গেছে। কিন্তু যদি প্রথম ইমাম নামাজ থেকে অবসর হয়ে যায়, এভাবে যে, সে অজু করে নিজের খলিফাকে এমনভাবে পেয়েছে যে, নামাজের কোনো অংশ ছুটে যায়নি এবং স্বীয় নামাজ সে খলিফার পিছনে পূর্ণ করেছে। মুক্তাদীদের নামাজ ফাসেদ হবে না। কেননা, তাদের নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ صَلٰوةُ الْمَسْبُوْقِ : অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে পূর্ণ নামাজ পেয়েছে, তার নামাজ তো হয়ে যাবে, তবে মাসবূক অর্থাৎ যে ইমামের সাথে পূর্ণ নামাজ পায়নি; বরং মধ্যখানে এসে শামিল হয়েছে, তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, নামাজের মধ্যখানে– নামাজের নিষিদ্ধ কাজ পাওয়া গেছে।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْكَلَامَ كَالسَّلَامِ مِنْهُ : অর্থাৎ ইমাম যদি তাশাহহুদের পর কোনো কথা বলে ফেলে কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, তবে তার মুদরিক মুক্তাদীর নামাজ তো পূর্ণ হয়ে যাবে, এমনকি মাসবূকের নামাজও বাতিল হবে না। কেননা, কথা বলা সালামের মতোই নামাজকে পরিপূর্ণ করে। এখানে مِنْهُ শব্দটিকে কেউ কেউ حَرْف جَرّ ধারণা করেন। অথচ এটি حَرْف جَرّ নয়; বরং এটি اِنْهَاءٌ মাসদার থেকে اِسْم فَاعِلْ -এর সীগাহ, যা مُكْمِلٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত।

قَوْلُهُ اِمَامٌ حُصِرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ : এ حُصِرَ শব্দ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, এটি تَعِبَ -এর ওযনে এসেছে। যার অর্থ– মন সংকীর্ণ হওয়া। কেউ বলেন, এটি بَاب نَصَرَ থেকে فِعْل مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ যার অর্থ হচ্ছে– লজ্জা এবং ভয়ের কারণে পড়তে না পারা।

উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি কোনো ইমাম ভয় কিংবা লজ্জার কারণে পড়া থেকে থেমে যায় এবং বাধ্য হয়ে অন্য কাউকে খলিফা বানায়, তবে তা আমাদের নিকট জায়েজ। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর নিকট জায়েজ নেই। তাঁদের দলিল হলো, এমন কমই ঘটে থাকে, তাই مَوْرِد نَصّ -এর সাথে একে যুক্ত করা যাবে না। আমাদের দলিল হচ্ছে– অক্ষমতার কারণেই اِسْتِخْلَاف [খলিফা বানানো] -এর جَوَاز প্রমাণিত হয়। আর حَصْر -এর প্রক্রিয়ায় হঠাৎ কেরাতে অক্ষম হয়ে যাওয়া বিরল কোনো বিষয় নয়।

قَوْلُهُ قَدْرَ مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ : অর্থাৎ حَصْر -এর সুরতে খলিফা বানানো জায়েজ এই শর্তে যে, যদি এটুকু পরিমাণ কেরাত সে নাও পড়ে থাকে, যা দ্বারা নামাজ হয়ে যায়, যা একটি বড় আয়াত কিংবা ছোট তিন আয়াত। আর যদি এ পরিমাণ পড়ার পর حَصْر যুক্ত হয়, তবে খলিফা বানানো জায়েজ নেই। مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلَاةُ পড়ার পর যদি কাউকে খলিফা বানানো হয়, তবে তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। কারণ, খলিফা বানানো একটি عَمَل كَثِيْر , তাই তা শুধু প্রয়োজনের সময়ই জায়েজ।

قَوْلُهُ فَاِنَّهُ يَنْبَغِيْ اَنْ يُقَدِّمَ مُدْرِكًا : অর্থাৎ যদি কোনো প্রয়োজনের সময় কাউকে খলিফা বানাতে হয়, তবে উত্তম হলো– মুদরিক (مُدْرِكٌ)-কে খলিফা বানানো, যে শুরু থেকেই নামাজ পেয়েছে। যদিও মাসবূককেও খলিফা বানানো যায়। কিন্তু তাকে বানানো উচিত নয়। কেননা, তাকে খলিফা বানানো দ্বারা নামাজ যেভাবে পরিপূর্ণ করতে হয়, তা সকল মুসল্লির জানা নেই। এজন্য নামাজ ফাসেদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

قَوْلُهُ لَا مَسْبُوْقًا وَمَعَ ذٰلِكَ الخ : অর্থাৎ মাসবূককে খলিফা বানাবে না, لَاحِقْ -কেও খলিফা বানাবে না। অনুরূপ মুকীম ইমাম, মুসাফির মুক্তাদীকে খলিফা বানাবে না। কেননা, তারা উভয়ে নামাজ পরিপূর্ণ করার উপর সক্ষম নয়।

قَوْلُهُ وَحِيْنَ اَتَمَّهَا يَضُرُّهُ الْمُنَافِيْ الخ : এর সারসংক্ষেপ হচ্ছে, মাসবূক খলিফা প্রথমে ইমামের নামাজ পরিপূর্ণ করে পিছনে সরে আসবে এবং কোনো مُدْرِكْ -কে সামনে বাড়িয়ে দেবে, সে নামাজ পরিপূর্ণ করে সালাম ফিরাবে, যেন লোকদের নামাজ পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর মাসবূক দাঁড়িয়ে তার বাকি নামাজ পূর্ণ করবে। এখন যদি তার থেকে নামাজে নিষিদ্ধ এমন কোনো কার্য প্রকাশ পায় তবে তা তার জন্য ক্ষতিকর এবং প্রথম ইমামের জন্যও তা ক্ষতিকর। কেননা, সে অজু করার পর নিজের মাসবূক খলিফার পিছনে নামাজ পড়ছে।

مَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ فَأَحْدَثَ أَوْ ذَكَرَ سَجْدَةً فَسَجَدَهَا يُعِيْدُ مَا أَحْدَثَ فِيْهِ إِنْ بَنٰى حَتْمًا وَمَا ذَكَرَهَا فِيْهِ نَدْبًا أَىْ مَنْ أَحْدَثَ فِىْ رُكُوْعِهٖ أَوْ سُجُوْدِهٖ وَتَوَضَّأَ وَبَنٰى فَلَابُدَّ لَهٗ أَنْ يُعِيْدَ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ الَّذِىْ أَحْدَثَ فِيْهِ وَإِنْ تَذَكَّرَ فِىْ رُكُوْعِهٖ أَوْ سُجُوْدِهٖ أَنَّهٗ تَرَكَ سَجْدَةً فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى فَقَضَاهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الرُّكُوْعِ أَوِ السُّجُوْدِ الَّذِىْ تَذَكَّرَ فِيْهِ لٰكِنْ إِنْ أَعَادَ يَكُوْنُ مَنْدُوْبًا وَإِنْ أَمَّ وَاحِدًا فَأَحْدَثَ فَالرَّجُلُ إِمَامٌ بِلَا نِيَّةٍ إِنْ كَانَ وَإِلَّا قِيْلَ تَبْطُلُ صَلَاتُهٗ أَىْ إِنْ أَمَّ وَاحِدًا فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَإِنْ كَانَ الْمُؤْتَمُّ رَجُلًا يَصِيْرُ إِمَامًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِىَ الْإِمَامُ إِمَامَتَهٗ لِأَنَّ النِّيَّةَ لِلتَّعَيُّنِ وَهٰهُنَا هُوَ مُتَعَيِّنٌ وَإِنْ كَانَ اِمْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا قِيْلَ تَفْسُدُ صَلٰوةُ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ أَوِ الصَّبِىَّ صَارَ إِمَامًا لَهٗ لِتَعَيُّنِهٖ وَقِيْلَ لَا تَفْسُدُ لِأَنَّهٗ لَمْ يُوْجَدْ مِنْهُ الْإِسْتِخْلَافُ وَفِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ إِنَّمَا يَصِيْرُ إِمَامًا لِتَعَيُّنِهٖ وَصَلَاحِيَّتِهٖ وَهٰهُنَا لَمْ يَصْلُحْ فَلَمْ يَصِرْ إِمَامًا وَالْإِمَامُ إِمَامٌ كَمَا كَانَ لٰكِنَّ الْمُقْتَدِىَ بَقِىَ بِلَا إِمَامٍ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهٗ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি রুকু করেছে, কিংবা সিজদা করেছে– এতে তার হদস হয়ে গেছে, কিংবা [ছুটে যাওয়া একটি] সিজদার কথা স্মরণ হয়েছে ফলে সে সিজদা করেছে, তবে এ রুকু কিংবা সিজদাকে অবশ্যই সে দোহরাবে, যার মধ্যে হদস হয়েছিল। তবে শর্ত হচ্ছে– তাকে ঐ নামাজে বেনা করতে হবে, আর ঐ রুকু কিংবা সিজদা যার মধ্যে দ্বিতীয় সিজদা স্মরণ হয়েছিল– তা দোহরানো মোস্তাহাব। অর্থাৎ রুকু কিংবা সিজদায় যার হদস হয়েছে এবং অজু করে নামাজের বেনা করেছে তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে– ঐ রুকু কিংবা সিজদাকে দোহরানো, যার মধ্যে হদস হয়েছে। আর যদি রুকু কিংবা সিজদার মধ্যে স্মরণ হয় যে, সে প্রথম রাকাতে এক সিজদা বর্জন করেছে, তাই তা কাজা করেছে, তবে তার উপর ঐ রুকু কিংবা সিজদাকে দোহরানো আবশ্যক নয়– যার মধ্যে সিজদার কথা স্মরণ হয়েছে। কিন্তু যদি দোহরায় তবে তা মোস্তাহাব হবে। যদি কেউ একজন মুক্তাদীর ইমামতি করে, অতঃপর ইমাম হদস করেছে– তো মুক্তাদী যদি পুরুষ হয় তবে প্রথম ইমামের নিয়ত করা ব্যতীতই মুক্তাদী ইমাম হয়ে যাবে। আর যদি মুক্তাদী পুরুষ না হয় তবে বলা হয় যে, তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি কেউ এক ব্যক্তির ইমামতি করে এবং ইমামের হদস হয়, তবে যদি মুক্তাদী পুরুষ হয় তবে প্রথম ইমামের নিয়ত করা ব্যতীতই সে মুক্তাদী ইমাম হয়ে যাবে। কেননা, নিয়ত تَعْيِيْن [নির্ধারণ করা] -এর জন্য হয় আর এখানে সে একজন মুক্তাদী নির্ধারিত। যদি মুক্তাদী মহিলা কিংবা নাবালেগ ছেলে হয় তবে বলা হয় যে, ইমামের নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা, মহিলা কিংবা নাবালেগ ছেলে যে নির্ধারিত একজন সেই তার জন্য ইমাম হয়ে গেছে এবং এটাও বলা হয় যে, তার নামাজ বাতিল হবে না। কেননা, এখানে খলিফা পাওয়া যায়নি। আর [মুক্তাদী] পুরুষ হওয়ার সুরতে তার যোগ্যতা ও নির্ধারিত হওয়ার কারণে ইমাম হয়ে যায়। কিন্তু এখানে [মুক্তাদী মহিলা কিংবা বাচ্চা ছেলে হওয়ার সুরতে] সে ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়। তাই সে ইমামও হয়নি এবং ইমাম যেমন প্রথমে ইমাম ছিল এখনও তেমন ইমামই রয়েছে। কিন্তু মুক্তাদী ইমাম ছাড়া বাকি রয়েছে, তাই তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاَحْدَثَ اَوْ ذَكَرَ الخ : অর্থাৎ রুকু বা সিজদার মধ্যে যদি হদস যুক্ত হয়, তবে যে রুকনে হদস হয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে। তাই তা দোহরানো আবশ্যক। যদিও কিয়াস হচ্ছে– পুরো নামাজ বাতিল হয়ে যাওয়া। কিন্তু হাদীসের কারণে কিয়াসের উপর আমল করা হয়নি তাই যে রুকনে হদস হয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ اِنْ بَنٰى حَتْمًا : অর্থাৎ যে রুকনে হদস হয়েছে, যদি ঐ নামাজে বেনা করে তবে ঐ রুকনকে দোহরানো তার উপর ওয়াজিব, যার মধ্যে হদস যুক্ত হয়েছে। যদি একে না দোহরায় তবে তার নামাজ হবে না। কেননা, প্রত্যেক রুকন তাহারাতের সাথে আদায় করা শর্ত। আর এখানে তা না দোহরালে এ রোকনটি তাহারাতবিহীন হয়ে যায়। তখন পূর্ণ নামাজ দোহরানো জরুরি হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهَا الخ : অর্থাৎ রুকু কিংবা সিজদায় যদি পিছনে ছুটে যাওয়া সিজদার কথা স্মরণ হয় এবং সেখানেই ছুটে যাওয়া সিজদাটি আদায় করে, চাই তা নামাজের সিজদা হোক কিংবা তিলাওয়াতের সিজদা হোক, তবে যে রুকু কিংবা সিজদায় ছুটে যাওয়া সিজদা আদায় করেছে, তা দোহরাবে। তবে তা দোহরানো মোস্তাহাব। অর্থাৎ যদি নাও দোহরায় তবুও জায়েজ।

قَوْلُهُ وَاِنْ اَمَّ وَاحِدًا فَاَحْدَثَ : অর্থাৎ যদি ইমাম একজন মুক্তাদীর ইমামতি করে এবং ইমামের হদস যুক্ত হয়, অতঃপর সে অজুর জন্য চলে যায় এবং খলিফা বানানো ব্যতীতই সে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, তবে ইমাম ও মুক্তাদীর নিয়ত ব্যতীতই সে একা মুক্তাদী ইমাম হয়ে যাবে। অতএব, মুহদিস ইমাম অজু করে এসে এ খলিফার পিছনে নামাজ পরিপূর্ণ করবে।

قَوْلُهُ فَالرَّجُلُ اِمَامٌ بِلَا نِيَّةٍ الخ : উত্তম ইবারত হতো যদি فَالْوَاحِدُ বলা হতো, কিংবা এই ইবারত হলে–

فَاِنْ كَانَ الْوَاحِدُ رَجُلًا يَكُوْنُ اِمَامًا بِلَا نِيَّةٍ ـ

قَوْلُهُ يَصِيْرُ اِمَامًا مِنْ غَيْرِ الخ : মুক্তাদী যদি পুরুষ হয় তবে সে ইমাম হয়ে যাবে। কারণ, এতে স্বয়ং তার নামাজের হেফাজত হচ্ছে। কেননা, যদি ইমাম নির্ধারণ না করা হয়, তবে ইমামের জায়গা খালি হয়ে যায়। যার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজ ভেঙ্গে যায়।

قَوْلُهُ لِاَنَّ النِّيَّةَ لِلتَّعْيِيْنِ الخ : অর্থাৎ যদি মুক্তাদী একের চেয়ে অধিক হয় তবে কোনো একজনকে ইমাম বানানো জরুরি। পক্ষান্তরে যদি মুক্তাদী একজন হয় তবে সে ইমাম হিসেবে নির্ধারিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْمَرْأَةَ اَوِ الصَّبِيَّ الخ : অর্থাৎ যদি সে একজন মুক্তাদী মহিলা কিংবা বাচ্চা হয়, তবে তার মাঝে ইমাম হওয়ার যোগ্যতা নেই বলে সে ইমাম হতে পারবে না। ফলে তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ قِيْلَ لَا تَفْسُدُ الخ : এটিই হলো মৌলিক কথা। এরই উপর ফতোয়া দেওয়া হয়। কেননা, তার নিয়ত ব্যতীতই ইমামত স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। তাকে খলিফা বানাতে হয়নি حَقِيْقَةً বানানো তো স্পষ্ট। حُكْمًا এ জন্য খলিফা বানানো হয়নি যে, সে মুক্তাদী ইমামতি করার যোগ্য নয়।

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يَكْرَهُ فِيهَا

يُفْسِدُهَا الْكَلَامُ وَلَوْ سَهْوًا اَوْ فِيْ نَوْمٍ وَالسَّلَامُ عَمْدًا قُيِّدَ بِالْعَمْدِ لِاَنَّ السَّلَامَ سَهْوًا غَيْرُ مُفْسِدٍ لِاَنَّهُ مِنَ الْاَذْكَارِ فَفِيْ غَيْرِ الْعَمْدِ يُجْعَلُ ذِكْرًا وَفِي الْعَمْدِ كَلَامًا وَرَدُّهُ لَمْ يُقَيِّدِ الرَّدَّ بِالْعَمْدِ وَيَخْطُرُ بِبَالِيْ اَنَّهُ اِنَّمَا اَطْلَقَ لِاَنَّهُ مُفْسِدٌ عَمْدًا كَانَ اَوْ سَهْوًا لِاَنَّ رَدَّ السَّلَامِ لَيْسَ مِنَ الْاَذْكَارِ بَلْ هُوَ كَلَامٌ يُخَاطَبُ بِهِ وَالْكَلَامُ مُفْسِدٌ عَمْدًا كَانَ اَوْ سَهْوًا ـ

পরিচ্ছেদ : যা নামাজকে ভঙ্গ এবং মাকরূহ করে

অনুবাদ : নামাজে কথা বলা নামাজ ভঙ্গের কারণ, যদিও তা ভুলে কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে [কাউকে] সালাম দেওয়া [নামাজ ভঙ্গের কারণ]। عَمْد -এর শর্ত এজন্যই করা হয়েছে যে, ভুলে কাউকে সালাম দেওয়া নামাজ ভঙ্গকারী নয়। কেননা, সালাম জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। তাই অনিচ্ছার সুরতে একে জিকির সাব্যস্ত করা হবে। আর স্বেচ্ছায় বলার সুরতে একে কালাম [কথা] সাব্যস্ত করা হবে। নামাজের মধ্যে সালামের উত্তর দেওয়া [নামাজ ভঙ্গের কারণ]। গ্রন্থকার সালামের উত্তরের সাথে عَمْد -এর শর্ত করেননি। [তাই শারেহ (র.) বলেন,] আমার অন্তরে উদয় হয়েছে যে, গ্রন্থকার সালামের জবাবকে مُطْلَقْ [শর্তহীন] রেখেছেন। এজন্য যে, সালামের জবাব স্বেচ্ছায় হোক কিংবা ভুলে হোক সর্বাবস্থায় তা নামাজ ভঙ্গের কারণ। কারণ, সালামের জবাব জিকিরের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তা এমন কথা যার দ্বারা সম্বোধন করা হয়। আর [এটি স্পষ্ট যে,] কথা স্বেচ্ছায় হোক কিংবা ভুলে হোক– সর্বাবস্থায় তা নামাজ ভঙ্গের কারণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : নামাজে সংঘটিত হয় এমন عَوَارِضْ দু প্রকার– ১. اِخْتِيَارِيْ [ইচ্ছাধীন], ২. اِضْطِرَارِيْ [অনিচ্ছাধীন]। আর অনিচ্ছাধীন বিষয়াদি যেহেতু মৌলিক তাই এগুলোকে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এখানে اِخْتِيَارِيْ বিষয়াদি আবার দু প্রকার– ১. যেগুলো নামাজ ভঙ্গের কারণ ২. যেগুলো নামাজকে মাকরূহ করে দেয়। এ দুটির মধ্যে নামাজ ভঙ্গের কারণগুলো হচ্ছে মৌলিক, তাই লেখক এগুলো আগে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে فَسَادْ এবং بُطْلَانْ শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহার হয়। অর্থাৎ اَرْكَانْ ও شَرَائِطْ ছুটে যাওয়ার কারণে ইবাদত ইবাদতের পর্যায়ে থাকে না, যাকে 'ফাসেদ হয়ে যাওয়া' বলা হয়। আর شَرَائِطْ ও اَرْكَانْ ছুটে যাওয়ার কারণে ইবাদতের পুণ্য কিছুটা হ্রাস পায়, যাকে 'মাকরূহ হওয়া' বলা হয়।

اَلْكَلَامُ فِى الصَّلَاةِ -এর মাসআলা : নামাজে জাগ্রত অবস্থায় কিংবা ঘুমে স্বেচ্ছায় কথা বলা সর্বসম্মতিক্রমে নামাজ ভঙ্গের কারণ। তবে ভুলক্রমে কথা বলা নামাজ ভঙ্গের কারণ কিনা? এ নিয়ে আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আহনাফ বলেন, ভুলক্রমেও যদি নামাজে কথা বলা হয় তবে নামাজ ভেঙ্গে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ভুলক্রমে নামাজে কথা বলা নামাজ ভঙ্গের কারণ নয়, তবে কথা দীর্ঘ না হতে হবে।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِنْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ اَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ اَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَ صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ . فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ .

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত– নবী কারীম ﷺ দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলেছেন। যুলইয়াদাইন তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি নামাজ সংক্ষিপ্ত করেছেন, নাকি ভুলে গেছেন? রাসূল ﷺ বললেন, যুলইয়াদাইন কি সত্য বলছে? লোকজন বলল– হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল ﷺ দাঁড়ালেন এবং শেষ দুই রাকাত পড়লেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন, তাকবীর বললেন এবং সিজদা করলেন। –[তিরমিযী শরীফ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, এতে যুলইয়াদাইন (রা.)-এর নামাজে কথা বলার হুকুম সম্পর্কে জানা ছিল না। অতএব তার কথা হয়েছে جَهْلًا عَنِ الْحُكْمِ আর রাসূল ﷺ কথা বলেছেন ভুলে। এতদসত্ত্বেও রাসূল ﷺ নামাজকে দোহরাননি; বরং পূর্বের নামাজই পরিপূর্ণ করেছেন।

আহনাফের দলিল হলো, হযরত মুআবিয়া ইবনে হাকাম আসসুলামী সূত্রে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন–

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَطَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَا ثُكْلَ اُمَّاهُ مَا لِىْ اَرَاكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَىَّ شَزْرًا فَضَرَبُوْا بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ فَعَلِمْتُ اَنَّهُمْ يُسْكِتُوْنَنِىْ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِىُّ ﷺ دَعَانِىْ فَوَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُ مُعَلِّمًا اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ مَا كَهَرَنِىْ وَلَا زَجَرَنِىْ وَلٰكِنْ قَالَ اِنَّ صَلَاتَنَا هٰذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَئٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَاِنَّمَا هِىَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّهْلِيْلُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ .

অর্থাৎ "আমি রাসূল ﷺ-এর পিছনে নামাজ পড়েছি, ইতঃমধ্যে কেউ হাঁচি দিল। আমি বললাম– يَرْحَمُكَ اللّٰهُ - লোকেরা আমাকে খুব ক্ষিপ্তদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। আমি বললাম– তার মা তাকে হারিয়ে ফেলুন! আমার কি হলো! আমি তোমাদের দেখছি যে, তোমরা আমাকে অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টিতে দেখছ? তারা তাদের রানের উপর হাত মারল। আমি বুঝলাম, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে। অতঃপর রাসূল ﷺ নামাজ থেকে অবসর হয়ে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর থেকে উত্তম শিক্ষক আর কখনো দেখিনি! তিনি আমাকে ধমকালেনও না এবং শাসালেনও না; বরং বললেন, আমাদের এ নামাজ কোনো মানুষের কথা বলার উপযোগী নয়। নামাজ তো তাসবিহ, তাহলীল ও কুরআন পাঠ ছাড়া অন্য কিছু নয়।" –[মুসলিম শরীফ]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, নামাজে কথা না বলা নামাজের হক। যেমনিভাবে পবিত্র হওয়া নামাজের হক। সুতরাং যেমনিভাবে তাহারাত ব্যতীত নামাজ হয় না, এমনিভাবে কথা বললেও নামাজ হবে না।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِىِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হিসেবে পেশকৃত হাদীস নামাজে কথা বলা নিষিদ্ধের হাদীসসমূহের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। অতএব, ইসলামের শুরু যুগে নামাজে কথা বলা জায়েজ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে। [এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ফাতহুল কাদীর– ১: ৪০৫ – ৪০৯ বাদায়িউস সানায়ে'– ১ : ৫১৮, বাহরুর রায়িক– ২ : ৩ – ৪, মাআরিফুস সুনান– ৩ : ৫০৪ – ৫৪১, দরসে তিরমিযী– ২ : ১৫০ – ১৫৫]

سَهْو – نِسْيَان ও خَطَأ -এর মাঝে পার্থক্য : আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন– سَهْو -এর সুরতে সাধারণভাবে সর্তক করার দ্বারা মানুষ সর্তক হয়ে যায়। نِسْيَانْ -এর মাঝে মানুষের আসল কথাই মনে থাকে না। আবার নতুন করে বলতে হয় কিংবা করতে হয়। তাকে সর্তকও করতে হয় খুব যত্নের সাথে। আর خَطَأ -এর সুরতে যেমন কেউ কুরআন পড়ছে– হঠাৎ তার মুখ থেকে সাধারণ লোকদের কথা চলে আসছে।

قَوْلُهُ اَوْ فِى نَوْمٍ : যেমন কেউ নামাজে এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে যে, তার অজু ভাঙ্গে না। উদাহরণস্বরূপ বৈঠকে ঘুমিয়ে পড়েছে আর উক্ত ঘুমেই সে কথা বলেছে, তবে তার নামাজ ভেঙ্গে যাবে। আমাদের কোনো কোনো ফকীহ এতে মতানৈক্য করেছেন এবং বলেছেন, নামাজের মাঝে ঘুমিয়ে কথা বললে নামাজ ভাঙ্গে না।

قَوْلُهُ وَالسَّلَامُ عَمْدًا :

ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজে সালাম দেওয়া নামাজ ভঙ্গের কারণ : ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজে কাউকে সালাম দেওয়ার দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়। তবে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে সালাম দেয়, তবে তার নামাজ ভাঙ্গবে না।

দলিল : অনিচ্ছাকৃতভাবে সালাম দেওয়া জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। তাশাহহুদের মধ্যেও এমন সালাম বলা হয়। যেমন– اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ। তা ছাড়া সালাম শব্দটি আল্লাহর ৯৯ নামের একটি নাম। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম দেওয়া জিকিরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, তখন নামাজের চেয়ে সালামের গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়।

'বাহরুর রায়িক' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, مُطْلَقًا সালাম নামাজ ভঙ্গের কারণ, চাই তা قَصْدًا হোক কিংবা سَهْوًا হোক। কেননা, এটি كَلَامٌ [কথা] এবং خِطَابٌ [সম্বোধন]। তাই এতে قَصْدًا এবং سَهْوًا উভয়টি বরাবর। আর যদি নামাজ শেষ করার জন্য সালাম দেওয়া হয়, তবে যদি নামাজ পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে করে তবে তার নামাজ ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ভুলে সালাম দেয় কিংবা নামাজ পরিপূর্ণ হওয়ার ধারণায় হয়, তবে যদি বৈঠকের অবস্থায় হয় তবে নামাজ ভাঙ্গবে না। আর যদি জানাজা নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় হয় তবে নামাজ ভেঙ্গে যাবে। কেননা, জানাজা নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজে দাঁড়িয়ে সালাম ফিরানো বৈধ নয়।

সালাম ذِكْر ও كَلَامٌ : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, সালাম এক হিসেবে كَلَامٌ আবার আরেক হিসেবে জিকির। কেননা, এটি আল্লাহর اَسْمَاءِ حُسْنٰى-এর একটি নাম এবং তাশাহহুদেও সালাম আছে। এতে كَاف خِطَابٌ থাকার কারণে এটি كَلَامٌ-ও। তাই قَصْدًا-এর সুরতে এটি كَلَامٌ হবে, আর سَهْوًا-এর সুরতে كَلَامٌ হবে না।

قَوْلُهُ وَرَدُّهُ :

নামাজে সালামের জবাব দেওয়া সর্বাবস্থায় নামাজ ভঙ্গের কারণ : নামাজে সালামের জবাব দেওয়া নামাজ ভঙ্গের কারণ। আর যদি হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেয় তবে নামাজ ভাঙ্গবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত–

كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِى الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِىْ مَلِكِ الْحَبْشَةِ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ اِنَّ فِى الصَّلَاةِ شُغْلًا ـ

অর্থাৎ "আমরা হুজুর ﷺ -কে নামাজরত অবস্থায় সালাম দিতাম, তিনিও উত্তর দিতেন। পরবর্তীতে আমরা ইথিওপিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট থেকে এসে তাঁকে নামাজরত অবস্থায় সালাম দিয়েছি। কিন্তু তিনি উত্তর দেননি; বরং বললেন, নামাজে অনেক কাজ রয়েছে।" –[আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ]

অন্য এক বর্ণনায় আছে– اِنَّ اللّٰهَ يَحْدُثُ مِنْ اَمْرِهٖ مَا يَشَاءُ وَقَدْ اَحْدَثَ اَنْ لَا تَكَلَّمُوْا فِى الصَّلَاةِ

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তা করেন। এখন নতুন যে বিষয়টির নির্দেশ করেছেন তা হচ্ছে, তোমরা নামাজে কথা বলবে না।" –[আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ]

وَالْاَنِيْنُ وَالتَّأَوُّهُ وَالتَّافِيْفُ وَالْبُكَاءُ بِصَوْتٍ مِنْ وَجْعٍ اَوْ مُصِيْبَةٍ وَتَنَحْنَحٌ بِلَا عُذْرٍ وَتَشْمِيْتُ عَاطِسٍ وَجَوَابُ خَبَرِ سُوْءٍ بِالْاِسْتِرْجَاعِ وَسَارٍّ بِالْحَمْدَلَةِ وَعَجِيْبٍ بِالسَّبْحَلَةِ وَالْهَيْلَلَةِ وَفَتْحُهُ عَلٰى غَيْرِ اِمَامِهٖ اِنَّمَا قَالَ عَلٰى غَيْرِ اِمَامِهٖ لِاَنَّ فَتْحَهُ عَلٰى اِمَامِهٖ لَا يَفْسُدُ قَالَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ اِذَا قَرَأَ اِمَامُهُ مِقْدَارَ مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ اَوِ انْتَقَلَ اِلٰى اٰيَةٍ اُخْرٰى فَفَتَحَ تَفْسُدُ صَلٰوةُ الْفَاتِحِ وَاِنْ اَخَذَ الْاِمَامُ مِنْهُ تَفْسُدُ صَلٰوةُ الْاِمَامِ اَيْضًا وَبَعْضُهُمْ قَالُوْا لَا تَفْسُدُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَسَمِعْتُ اَنَّ الْفَتْوٰى عَلٰى ذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : আহ আহ শব্দ করা, উহ উহ শব্দ করা, উফ উফ শব্দ করা, ব্যথা কিংবা বিপদের কারণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা, বিনা ওজরে কাশি দেওয়া, হাঁচির জবাব দেওয়া, কোনো মন্দ সংবাদের উত্তরে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলা, সুসংবাদ শুনে আলহামদুলিল্লাহ বলা, বিস্মিত হয়ে সুবহানাল্লাহ বলা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং নিজের ইমাম ব্যতীত অন্য ইমামকে লুকমা দেওয়া নামাজ ভঙ্গের কারণ। গ্রন্থকার নিজের ইমাম ব্যতীত অন্য ইমামের কথা বলেছেন। কেননা, নিজের ইমামকে লুকমা দেওয়ার কারণে নামাজ ভাঙ্গে না। কোনো কোনো শায়খ বলেছেন, যখন ইমাম مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ পরিমাণ কেরাত পাঠ করলেন কিংবা তিনি অন্য আয়াত পড়তে শুরু করলেন, আর তখন মুক্তাদী লুকমা দেয়– তবে লুকমাদানকারীর নামাজ ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ইমাম তার লুকমা গ্রহণ করেন তবে ইমামের নামাজও ভেঙ্গে যাবে। কোনো কোনো শায়খ বলেছেন, এ জাতীয় কোনো ক্ষেত্রে নামাজ ভাঙ্গবে না। [শারেহ (র.) বলেন,] আমি [আমার উস্তাদদের কাছে] শুনেছি, ফতোয়া এর উপরই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْاَنِيْنُ وَالتَّأَوُّهُ الخ :

উহ আহ শব্দ করা নামাজ ভঙ্গের কারণ : اَلْاَنِيْنُ শব্দের অর্থ– আহ আহ করা। اَلتَّأَوُّهُ শব্দের অর্থ– উহ উহ করা। اَلتَّافِيْفُ শব্দের অর্থ– উফ উফ করা। এ তিনটি শব্দই সমার্থবোধক। এ সমস্ত শব্দ বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশের সময় এমনিই মানুষের মুখ থেকে বের হয়ে যায়। যদি কেউ নামাজে এসব শব্দ করে তবে তার নমাজ ভেঙ্গে যাবে। কেননা, এতে অস্থিরতা ও আক্ষেপ প্রকাশ পায়। ফলে তা মানুষের কথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা নামাজ ভঙ্গের কারণ : ব্যথা কিংবা বিপদ-আপদের কারণে নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা নামাজ ভঙ্গের কারণ, তবে এ কান্নার সাথে অশ্রুও প্রবাহিত হবে। আওয়াজ করে কান্নার মাধ্যমে নামাজ ভাঙ্গার জন্য শর্ত হচ্ছে– এ আওয়াজে দুই কিংবা ততোধিক অক্ষরের শব্দ হওয়া। পক্ষান্তরে যদি কেউ আওয়াজ ছাড়া অশ্রু প্রবাহিত করে কাঁদে, কিংবা জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদে, তবে তার নামাজ ভাঙ্গবে না। –[ফাতহুল কাদীর ও নিকায়া]

হ্যাঁ, যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তি হয়– যে সর্বদাই কাঁদে কিংবা উহ আহ শব্দ করতে থাকে তবে তার নামাজ ভাঙ্গবে না।

قَوْلُهُ وَتَنَحْنَحٌ بِلَا عُذْرٍ :

বিনা ওজরে কাশি দেওয়া নামাজ ভঙ্গের কারণ : কোনো ওজর ব্যতীত এমনিই নামাজে কাশি দেওয়ার দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়। কারণ, এটিও এক ধরনের কথা। তবে এ কাশি নামাজ ভঙ্গের কারণ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে–

১. কোনো ওজর ব্যতীত কাশি দেওয়া। অতএব, যদি কারো অসুস্থতার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে কাশি চলে আসে তবে তার নামাজ ভাঙ্গবে না।

২. বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে কাশি না দিতে হবে। যেমন– কেউ কণ্ঠ পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে আওয়াজ সুন্দর করার জন্য কাশি দিয়েছে, তবে তা اِصْلَاحُ الْقِرَاءَةِ -এর জন্য হবে। এর দ্বারা নামাজ ভাঙ্গবে না। অনুরূপ কেউ বেখেয়ালে নামাজি ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চলছে, তখন নামাজি গলা কাশি দিয়ে তাকে বুঝাল যে, আমি নামাজে আছি– অতএব তুমি এদিক দিয়ে যেয়ো না, তবে এর দ্বারাও নামাজ ভাঙ্গবে না।

হাঁচির জবাব দেওয়া নামাজ ভঙ্গের কারণ : কোনো ব্যক্তি নামাজের বাইরে হাঁচি দিয়ে আল-হামদুলিল্লাহ বলেছে, অপর ব্যক্তি নামাজে থাকাবস্থায় এর জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলেছে, তবে তার নামাজ ভেঙ্গে যাবে। কারণ, এ বাক্য সম্বোধনসূচক, যা কালাম বা কথা। আর কথার মাধ্যমে নামাজ ভেঙ্গে যায়। হিদায়ার ব্যাখ্যাতাগণ লেখেন, যদি কোনো ব্যক্তি নামাজে হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে কিংবা নিজে নিজেই يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলে তবে তার নামাজ ফাসেদ হবে না।

قَوْلُهُ وَجَوَابُ خَبَرِ سُوْءٍ بِالْاِسْتِرْجَاعِ : অর্থাৎ যদি কেউ নামাজে থাকাবস্থায় মন্দ খবর শুনে আর সঙ্গে সঙ্গে সে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ে কিংবা নামাজে থাকাবস্থায় কোনো সুসংবাদ শুনে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে কিংবা কোনো বিস্ময়কর সংবাদ শুনে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বা سُبْحَانَ اللّٰهِ বলে এ সমস্ত সুরতে নামাজ ভেঙ্গে যাবে। এতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, এসব বাক্য জিকিরের অন্তর্ভুক্ত, তাই এর দ্বারা নামাজ ভাঙ্গবে না। তরফাইন (র.)-এর দলিল হলো, এ সমস্ত বাক্য কোনো ব্যক্তির জবাবে যদি বলে, তবে এগুলো كَلَامٌ হয়ে যায়। হ্যাঁ যদি এ সমস্ত বাক্য দ্বারা জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য না হয়; বরং সতর্ক করা উদ্দেশ্য হয় যে, 'আমি নামাজে, তাই এখন এসব সংবাদ আমাকে শুনাবে না', তবে এর দ্বারা নামাজ ফাসেদ হবে না।

قَوْلُهُ وَفَتْحَهُ عَلٰى غَيْرِ اِمَامِهٖ : স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রয়োজনের সময় নিজের ইমামকে তালকীন করা জায়েজ আছে। কারণ, মানুষের এ ধরনের ভুল হয়েই থাকে। যদি তা জায়েজ না হয় তবে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। তা চাই পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ নামাজ হোক কিংবা নফল নামাজ হোক। যেমন- তারাবীহের নামাজ। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূল ﷺ নামাজ পড়াচ্ছিলেন। কেরাতে এক জায়গায় তাঁর পেঁচ লেগে গেছে, কিন্তু কেউ লুকমা দেয়নি। যখন তিনি নামাজ থেকে অবসর হলেন, তখন উবাই ইবনে কা'বকে বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামাজে ছিলে? তিনি আরজ করলেন- হ্যাঁ! তিনি বললেন, কোন জিনিস তোমাকে বলে দেওয়া থেকে বারণ করেছে? অর্থাৎ যখন আমার মুশাবাহ [সদৃশ] হয়ে গেছে, তখন তুমি কেন লুকমা দিলে না? অনুরূপ হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল ﷺ নামাজ পড়াচ্ছিলেন, তিনি কেরাতের কিছু অংশ ছেড়ে দিলেন- কিন্তু কেউ নামাজে লুকমা দেয়নি। যখন তিনি নামাজ শেষ করলেন, তখন এক ব্যক্তি আরজ করল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই এই আয়াত ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কেন স্মরণ করিয়ে দিলে না? সে আরজ করল, আমি মনে করেছি যে, হয়তো ঐ অংশ রহিত হয়ে গেছে।

তবে নিজের ইমাম ব্যতীত অন্য ইমামকে লুকমা দেওয়া নামাজ ভঙ্গের কারণ। এর কয়েকটি সুরত হতে পারে- ক. মুক্তাদী মুনফারিদকে লুকমা দেওয়া। খ. নামাজরত ব্যক্তি নামাজ পড়ছে না এমন ব্যক্তিকে লুকমা দেওয়া। গ. নামাজ পড়েছে না এমন ব্যক্তি নামাজরত ব্যক্তিকে লুকমা দেওয়া। ঘ. নিজের ইমাম ব্যতীত অন্য ইমামকে লুকমা দেওয়া। ঙ. ইমাম এবং মুনফারিদকে অন্য কোনো ব্যক্তি বলে দেওয়া। উল্লিখিত সমস্ত সুরতে নামাজ ভেঙ্গে যাবে। কারণ, বলে দেওয়া বা লুকমা দেওয়া মূলত তালীম ও তালকীন, যা كَلَامٌ-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। শুধু প্রয়োজনের ভিত্তিতে নিজের ইমামকে বলে দেওয়া জায়েজ রাখা হয়েছে। তাই তা অন্য জায়গায় নামাজ ভঙ্গের কারণ। আর যদি ইমাম مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ পরিমাণ কেরাত পড়ে ফেলে, অতঃপর মুশাবাহ [সন্দেহ] লাগার কারণে অন্য আয়াত কিংবা অন্য সূরা পড়তে শুরু করে অতঃপর মুক্তাদী লুকমা দেয় এবং ইমামও লুকমা গ্রহণ করে- তবে এর দ্বারা নামাজ ভাঙ্গবে কিনা? অনুরূপ যদি مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ পরিমাণ কেরাত পড়ার পর যদি মুশাব্বাহ [সদৃশ] লাগে আর অন্য আয়াত কিংবা অন্য সূরার দিকে যায়, অতঃপর মুক্তাদী বলে দেয়, তবে তার নামাজ ভেঙ্গে যাবে কিনা? এ নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন- নামাজ ভেঙ্গে যাবে। কারণ; লুকমা দেওয়া বৈধ ছিল প্রয়োজনের ভিত্তিতে, আর এখানে প্রয়োজনের বাকি থাকেনি। কেননা, সে مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلَاةُ পরিমাণ কেরাত পড়ে ফেলছে। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, এর দ্বারা مُطْلَقًا নামাজ ভাঙ্গবে না।

قَوْلُهُ اِذَا قَرَأَ اِمَامُهُ مِقْدَارَ مَا الخ : কোনো কোনো ফকীহ লুকমা দেওয়া ও গ্রহণ করার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছন যে, ইমাম مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ পরিমাণ কেরাত পড়ে ফেলেছে অতঃপর তার মুশাবাহ [সদৃশ] হয়েছে, কিংবা পরবর্তী আয়াত আর মনে নেই। তখন অন্য আয়াত কিংবা সূরা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ফলে কোনো মুক্তাদী এ আয়াতে লুকমা দিয়েছে- যার মধ্যে মুশাবাহ হয়েছে- এখন দেখা হবে যে, ইমাম উক্ত লুকমা গ্রহণ করেছে কিনা? যদি ইমাম ঐ লুকমা গ্রহণ না করে; বরং সূরা ছেড়ে দেয় এবং প্রথম আয়াত পড়তে শুরু করে দেয়, তবে স্বয়ং ইমামের নামাজ ভেঙ্গে যাবে। আর একথা স্পষ্ট যে, ইমামের নামাজ ভাঙ্গার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজও ভেঙ্গে যায়। কিন্তু কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন- তন্মধ্যে কোনো সুরতেই নামাজ ভাঙ্গবে না। শারেহ (র.) বলেন, আমি আমার উস্তাদদের থেকে শুনেছি, এ নামাজ না ভাঙ্গার উপরই ফতোয়া।

وَقِرَاءَتُهُ مِنْ مُصْحَفٍ وَسُجُوْدُهُ عَلٰى نَجَسٍ وَالدُّعَاءُ بِمَا يُسْأَلُ عَنِ النَّاسِ نَحْوُ اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِىْ فُلَانَةً اَوْ اَعْطِنِىْ اَلْفَ دِيْنَارٍ وَنَحْوُ ذٰلِكَ وَاَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَكُلُّ عَمَلٍ كَثِيْرٍ اِخْتَلَفَ مَشَائِخُنَا (رح) فِىْ تَفْسِيْرِ الْعَمَلِ الْكَثِيْرِ فَقِيْلَ هُوَ مَا يَحْتَاجُ فِيْهِ اِلَى الْيَدَيْنِ وَقِيْلَ مَا يَعْلَمُ نَاظِرُهُ اَنَّ عَامِلَهُ غَيْرُ مُصَلٍّ وَعَامَّةُ الْمَشَائِخِ (رح) عَلٰى هٰذَا وَقِيْلَ مَا يَسْتَكْثِرُهُ الْمُصَلِّىْ قَالَ الْاِمَامُ السَّرَخْسِىُّ هٰذَا اَقْرَبُ اِلٰى مَذْهَبِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) فَاِنَّ دَابَهُ التَّفْوِيْضُ اِلٰى رَأْىِ الْمُبْتَلٰى بِهٖ مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً ثُمَّ شَرَعَ صَلّٰى كَمُلًا اِنْ شَرَعَ فِىْ اُخْرٰى وَاِلَّا اَتَمَّ الْاُوْلٰى اَىْ صَلّٰى رَكْعَةً مِنْ صَلٰوةٍ ثُمَّ شَرَعَ اَىْ نَوٰى وَجَدَّدَ التَّحْرِيْمَةَ مِنْ غَيْرِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فَاِنْ شَرَعَ فِىْ صَلٰوةٍ اُخْرٰى يُتِمُّ هٰذِهِ الْاُخْرٰى وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا الرَّكْعَةُ الَّتِىْ صَلَّاهَا وَاِنْ شَرَعَ فِى الصَّلٰوةِ الْاُوْلٰى فَالرَّكْعَةُ الَّتِىْ صَلَّاهَا مَحْسُوْبَةٌ فَيُتِمُّ الْاُوْلٰى ۔

অনুবাদ : কুরআন দেখে দেখে কেরাত পড়া, নাপাক জায়গায় সিজদা করা এবং দোয়ার মধ্যে এমন জিনিস চাওয়া যা সাধারণত মানুষের কাছে চাওয়া হয়- [নামাজ ভঙ্গের কারণ]। যেমন- اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِىْ فُلَانَةً [হে আল্লাহ! অমুক মহিলাকে আমায় শাদি করিয়ে দাও] কিংবা اَعْطِنِىْ اَلْفَ دِيْنَارٍ [হে আল্লাহ! আমাকে এক হাজার দিনার দাও] ইত্যাদি। নামাজে পানাহার করা ও যে-কোনো ধরনের আমলে কাছীর [নামাজ ভঙ্গের কারণ]। আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম "আমলে কাছীর"-এর ব্যাখ্যায় মতানৈক্য করেন। কেউ বলেন, ঐ কাজকে আমলে কাছীর বলে, যা করার জন্য উভয় হাতের প্রয়োজন হয়। কেউ বলেন, আমলে কাছীর হচ্ছে, যা দেখে দর্শক মনে করে যে, সে নামাজরত নয়। আম মাশায়েখে কেরামের অভিমত এটিই। কেউ বলেন, আমলে কাছীর হচ্ছে, মুসল্লি নিজে যা আমলে কাসীর মনে করে। ইমাম সারাখসী (র.) বলেন, এ ব্যাখ্যা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের কাছাকাছি। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর তরিকা হচ্ছে- তিনি مُبْتَلٰى بِهٖ [ভুক্তভোগী]-এর উপর বিষয়টিকে সোপর্দ করেন। যে ব্যক্তি এক রাকাত পড়েছে- অতঃপর [নতুন তাহরীমা বেঁধে] অন্য নামাজ শুরু করেছে তবে সে দ্বিতীয় নামাজ পূর্ণ করবে- যদি দ্বিতীয় নামাজ শুরু করে থাকে। অন্যথায় প্রথম নামাজকে পূর্ণ করবে। অর্থাৎ যে এক রাকাত পড়েছে, অতঃপর অন্য নামাজ শুরু করেছে- তথা মনে মনে নিয়ত করেছে এবং হাত উত্তোলন ব্যতীত শুধু তাকবীরে তাহরীমা নতুন করে বলেছে- অতএব, যদি অন্য নামাজ শুরু করে তবে তা পূর্ণ করবে। আর ঐ রাকাত যা [প্রথমে] পড়া হয়েছিল তা এ দ্বিতীয় নামাজের ধরা হবে না। আর যদি প্রথম নামাজ শুরু করে থাকে- তবে যে রাকাত প্রথমে আদায় করা হয়েছিল তা এর মধ্যে ধরা হবে। তাই প্রথম নামাজ পূর্ণ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقِرَاءَتُهُ مِنْ مُصْحَفٍ الخ :

কুরআন দেখে কেরাত পড়া নামাজ ভঙ্গের কারণ : কুরআন মাজীদ দেখে দেখে নামাজে কেরাত পড়ার দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়। চাই সে ইমাম হোক কিংবা মুক্তাদী হোক। কারণ, কুরআন মাজীদ দেখে দেখে পড়া যেন নামাজের বাইরের কারো

থেকে তালকীন দেওয়া, যা নামাজ ভঙ্গের কারণ। চাই কুরআন নিজের হাতে রেখে পড়ুক কিংবা কোনো উঁচু জিনিসের উপর রেখে পড়ুক। অনুরূপ চাই কুরআনের পৃষ্ঠা সে নিজে উল্টাক, কিংবা অন্য কেউ উল্টিয়ে দেক। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, কুরআন মাজীদ দেখে কেরাত পড়া নামাজ ভঙ্গের কারণ নয়; বরং মাকরূহ। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মুক্তাদী যদি কুরআন মাজীদ দেখে দেখে ইমামকে লুকমা দেয় এবং ইমামও লুকমা গ্রহণ করে, তবে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের নামাজ ভেঙ্গে যাবে।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হচ্ছে, "হযরত জাকওয়ান (রা.) রমজান মাসে তারাবীহ পড়াতেন এবং কুরআন মাজীদ দেখে দেখে তিনি কেরাত পড়তেন।" তা ছাড়া কুরআন মাজীদ দেখাও একটি ইবাদত। তাই এই দেখাকে কেরাতের সাথে মিলানো ক্ষতিকর নয়। অতএব, এর দ্বারা নামাজ ফাসেদ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু দেখে দেখে নামাজে কেরাত পড়ার এ বিষয়টি যেহেতু আহলে কিতাবদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় তাই মাকরূহ হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত– "রাসূল ﷺ আমাদেরকে নামাজে কুরআন মাজীদ দেখে দেখে তেলাওয়াত করা থেকে বারণ করেছেন।" –[আবূ দাঊদ শরীফ]

সাহেবাইন (র.)-এর পেশকৃত দলিলের খণ্ডন হচ্ছে– মূলত এটি ছিল নামাজ শুরু করার পূর্বে কুরআন মাজীদ দেখা। কিংবা হযরত জাকওয়ান (রা.) প্রত্যেক দুই রাকাতের পর কুরআন খুলে পরের দুই রাকাতের কেরাত দেখে নিতেন এবং মুখস্থ করতেন। বর্ণনাকারী মনে করেছেন যে, তিনি কুরআন মাজীদ দেখে দেখে তেলাওয়াত করেছেন।

قَوْلُهُ وَالدُّعَاءُ بِمَا يُسْأَلُ عَنْ الخ : নামাজে এমন কোনো দোয়া পড়া যা সাধারণত মানুষের কাছে চাওয়া হয়– এর দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যাবে। তবে سِرَاجُ الْوَهَّاجِ নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, মানুষের কাছে যা চাওয়া হয়, সেই দোয়া যদি নামাজে পড়া হয় তবে এর নামাজ ভঙ্গের জন্য শর্ত হলো, এ দোয়া নামাজের ফারায়েজ ও আরকান আদায়ের পূর্বে পড়তে হবে। কিন্তু যদি তাশাহহুদ পরিমাণ শেষ বৈঠক করার পর উক্ত দোয়া পড়ে তবে তার নামাজ ভাঙ্গবে না।

আমলে কাছীর নামাজ ভঙ্গের কারণ : যে-কোনো ধরনের আমলে কাছীর নামাজ ভঙ্গের কারণ– যা নামাজের আমালের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যা إِصْلَاحُ الصَّلَاةِ-ও নয়। অতএব, যদি কেউ রুকু-সিজদাকে অধিক লম্বা করে তবে এর দ্বারা নামাজ ভাঙ্গবে না। অনুরূপ যদি তার হাদাস হয় আর সে চলে যায় এবং অজু করে এসে সে নামাজে বেনা করে তবুও তার নামাজ ভাঙ্গবে না, যদিও তা আমলে কাছীর হয়। আমলে কাছীরের দ্বারা নামাজ ভাঙ্গার কারণ হচ্ছে– এটি নামাজের পরিপন্থি বিষয় আর যখনই নামাজের কোনো পরিপন্থি বিষয় পাওয়া যাবে, এর দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যাবে।

আমলে কাছীর -এর সংজ্ঞা : আমলে কাছীর-এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমাদের ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে আল্লামা আইনী (র.) পাঁচটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে শারেহ (র.) তিনটি উল্লেখ করেছেন–

১. যা করার জন্য দুই হাতের প্রয়োজন হয়।

২. যা দেখে দর্শক মনে করে যে, সে নামাজরত নয়। এটিই অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত।

৩. নামাজি ব্যক্তি নিজে যে কাজটিকে 'আমলে কাছীর' মনে করে। অন্য দুটি সংজ্ঞা হচ্ছে–

৪. একটি কাজকে ধারাবাহিকভাবে তিনবার করা। এর চেয়ে কম হলে আমলে কালীল হবে।

৫. যে কাজের উদ্দেশ্য হয় নিজের জন্য পৃথক অবস্থা তৈরি করা তা আমলে কাছীর। এ ভিত্তিতেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যদি নামাজরত স্ত্রীকে স্বামী স্পর্শ করে, কিংবা উত্তেজনার সাথে তাকে চুম্বন করে কিংবা নামাজরত মহিলার স্তনকে তার বাচ্চা ধরে দুধ বের করে ফেলে, তবে এর দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যাবে।

যা করতে দুই হাতের প্রয়োজন তা আমলে কাছীর : যে সমস্ত কাজ সাধারণত দুই হাতে করা হয় তা আমলে কাছীর হবে এবং এর দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যাবে, যদিও সেই কাজটি এক হাতে করে থাকে। যেমন– পাগড়ি বাঁধা, পায়জামা পরা। এর দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যাবে। পক্ষান্তরে যে কাজ সাধারণত এক হাতে করা হয় তা আমলে কালীল। যদিও তা দুই হাতে করে

যেমন– পায়জামা খোলা, টুপি পরিধান করা। এর দ্বারা নামাজ ভাঙ্গবে না। হ্যাঁ, যদি এই আমলে কালীলকে তিনবার করে, তবে তা আমলে কাসীর হয়ে যাবে। এর দ্বারা নামাজও ভেঙ্গে যাবে।

দর্শক আমলে কাছীর মনে করলে তা আমলে কাছীর : নামাজে এমন কোনো কাজ করা– যা নামাজের বাইরের কোনো লোক দেখলে মনে করে যে, এ ব্যক্তি নামাজে নয়, তবে তা আমলে কাছীর হবে। নামাজের বাইরের যে ব্যক্তি দেখবে– তার জানা না থাকতে হবে যে, সে নামাজে আছে।

আমলে কাছীর -এর সংজ্ঞায় ইমাম আযম (র.)-এর অভিমত : মুসল্লি নামাজে যে কাজটি করছে তা যদি সে নিজে আমলে কাছীর মনে করে তবে তা 'আমলে কাছীর' হবে। কারণ, তাঁর মাযহাব হচ্ছে– مُبْتَلٰى بِهٖ -কে তার রায়ের উপর সোপর্দ করা যে, সে নিজে তার কাজ সম্পর্কে কি ধারণা করে? তবে এ ধরনের মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাধারণ লোকদেরকে তাদের রায়ের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, সকল লোক সমস্ত বিষয়ে ফয়সালায় পৌঁছতে পারে না।

قَوْلُهٗ مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً ثُمَّ شَرَعَ الخ : এ এক রাকাতের কয়েদ [শর্ত] قَيْد اِتِّفَاقِيْ । কেননা, যদি এর চেয়ে বেশি হয় তবুও একই হুকুম হবে। অর্থাৎ যদি এক নামাজ পরিপূর্ণ করার পূর্বে অন্য নামাজ শুরু করে দেয় তবে তার উপর আবশ্যক হলো, দ্বিতীয় নামাজ পূর্ণ করা। এক নামাজ থেকে অন্য নামাজের দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার সুরত কয়েকটি হতে পারে। যেমন– কেউ জোহরের নামাজ শুরু করেছে। এক রাকাত পড়ার পর আবার আসরের নামাজ শুরু করেছে। কিংবা তাকবীর বলে– ফরজ ছেড়ে নফল শুরু করে দিল। তবে অন্য নামাজ শুরু করার কারণে তার প্রথম নামাজটি বাতিল হয়ে যাবে। তাই সে দ্বিতীয় নামাজটিই পূর্ণ করবে। অনুরূপ যদি সে ওয়াজিব নামাজের নিয়ত করে, কিংবা সে জানাজা নামাজে ছিল, অতঃপর অন্য একটি জানাজা চলে আসছে এখন সে তাকবীর বলে উভয় জানাজার নিয়ত করেছে কিংবা দ্বিতীয় জানাজার নিয়ত করেছে তবুও হুকুম এমনই। অর্থাৎ দ্বিতীয় নামাজ শুরু করার দ্বারা প্রথম নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ وَاِلَّا اَتَمَّ الْاُوْلٰى : যদি কেউ এক নামাজ শুরু করে অতঃপর তা পূর্ণ করার আগে আবার তা নতুন তাকবীর বলে নতুন করে পড়তে শুরু করে, তবে তার প্রথম নামাজ বাতিল হবে না; বরং সে প্রথম নামাজই পূর্ণ করবে এবং যা পড়া হয়েছিল তা জারি রাখবে। তার দ্বিতীয় নিয়তটি এখানে অনর্থক। কারণ, সে নামাজটি পড়তে শুরু করেছে, তাই আবার নিয়ত করেছে।

وَلَا يُفْسِدُهَا بُكَاءُهُ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ اَوِ النَّارِ وَالْعَمَلِ الْقَلِيْلِ وَهُوَ ضِدُّ الْكَثِيْرِ عَلٰى اِخْتِلَافِ الْاَقْوَالِ وَمُرُوْرُ اَحَدٍ وَيَاْثَمُ اِنْ مَرَّ فِيْ مَسْجِدِهٖ عَلَى الْاَرْضِ بِلَا حَائِلٍ اَلْمَسْجِدُ مِنَ الْاَلْفَاظِ الَّتِيْ جَاءَتْ عَلَى الْمَفْعِلِ بِالْكَسْرِ وَيَجُوْزُ فِيْهَا الْفَتْحُ عَلَى الْقِيَاسِ فَالْفُقَهَاءُ اِذَا قَالُوْا بِالْفَتْحِ اَرَادُوْا مَوْضِعَ السُّجُوْدِ وَاِنْ قَالُوْا بِالْكَسْرِ اَرَادُوا الْمَعْنَى الْمَشْهُوْرَ فَاِنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا الْكَسْرَ وَهُوَ خِلَافُ الْقِيَاسِ اِلَّا فِي الْمَعْنَى الْمَشْهُوْرِ فَفِي الْمَعْنَى الْاَوَّلِ اِسْتَمَرُّوْا عَلَى الْقِيَاسِ وَالْمُرَادُ مِنَ الْمَسْجِدِ هٰهُنَا مَوْضِعُ السُّجُوْدِ فَاِنَّ الْمُرُوْرَ فِيْ مَوْضِعِ السُّجُوْدِ يُوْجِبُ الْاِثْمَ وَفِيْ تَفْسِيْرِ مَوْضِعِ السُّجُوْدِ تَفْصِيْلٌ فَاعْلَمْ اَنَّ الصَّلٰوةَ اِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ الصَّغِيْرِ فَالْمُرُوْرُ اَمَامَ الْمُصَلِّيْ حَيْثُ كَانَ يُوْجِبُ الْاِثْمَ لِاَنَّ الْمَسْجِدَ الصَّغِيْرَ مَكَانٌ وَاحِدٌ فَاَمَامُ الْمُصَلِّيْ حَيْثُ كَانَ فِيْ حُكْمِ مَوْضِعِ سُجُوْدِهٖ ـ

অনুবাদ : জান্নাত কিংবা জাহান্নামের আলোচনার কারণে মুসল্লি নামাজে কাঁদা এবং আমলে কালীল নামাজ ভঙ্গের কারণ নয়। এটি আমলে কাছীরের বিভিন্ন অভিমতের ভিত্তিতে– আমলে কাছীরের পরিপন্থি। ভূমির এক সিজদা পরিমাণ দূরত্ব দিয়ে যদি কোনো প্রকার প্রতিবন্ধক ব্যতীত কেউ অতিক্রম করে যায় তবে সে গুনাহগার হবে। مَسْجِدٌ শব্দটি ঐ সমস্ত শব্দের অন্তর্ভুক্ত– যেগুলো مَفْعِلٌ بِالْكَسْرِ -এর ওযনে আসে এবং কিয়াসের ভিত্তিতে এতে فَتْح পড়াও জায়েজ। অতএব, ফুকাহায়ে কেরাম যখন مَسْجَدٌ যবর দ্বারা পড়েন তখন তারা সিজদার স্থল উদ্দেশ্য করেন, আর যখন مَسْجِدٌ যের দ্বারা পড়েন তখন এর প্রসিদ্ধ অর্থ [মসজিদ] উদ্দেশ্য করেন। কেননা, ফুকাহায়ে কেরাম কিয়াসের পরিপন্থি যেরসহ مَسْجِدٌ শব্দকেই শুধু প্রসিদ্ধ [মসজিদ] অর্থে পেয়েছেন। অতএব, এটি কিয়াস অনুযায়ীই প্রথম অর্থে বিদ্যমান। এখানে مَسْجِدٌ দ্বারা সিজদার স্থল উদ্দেশ্য। কেননা, সিজদার স্থল দিয়ে অতিক্রম করা গুনাহ। সিজদার স্থলের ব্যাখ্যায় আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। অতএব বুঝা গেল, মসজিদ যদি ছোট হয় তবে মুসল্লির সামনে যে-কোনো জায়গা দিয়ে অতিক্রম করা গুনাহ। কেননা, ছোট মসজিদ হচ্ছে, একই স্থান। সুতরাং মুসল্লির সামনে যেখানেই হোক তা সিজদার স্থলের হুকুমে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ اَوِ النَّارِ الخ : অর্থাৎ জান্নাত, জাহান্নাম কিংবা কবরের শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ের স্মরণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাঁদার দ্বারা নামাজ ভাঙ্গে না। কারণ, এর দ্বারা নামাজে পূর্ণ খুশুখুযু সৃষ্টি হয়। এতে রয়েছে জান্নাতের কামনা, জাহান্নাম থেকে মুক্তির অভিলাষ। যদিও সে তা স্পষ্টভাবে আল্লাহর কাছে চায়। যেমন সে বলল– اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ তবুও তার নামাজ ভাঙ্গবে না। শুধু ইশারা-ইঙ্গিতে চাইলে তো নামাজ ভাঙ্গার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু যদি কোনো মসিবত ও বিপদ-আপদের কারণে উচ্চৈঃস্বরে কান্না জুড়ে দেয়, তবে তার নামাজ ভেঙ্গে যাবে।

قَوْلُهُ وَيَأْثَمُ إِنْ مَرَّ فِي مَسْجِدِهِ الخ : অর্থাৎ নামাজের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নামাজি ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি যদি বুঝত যে, এটি কতটুকু জঘন্য ব্যাপার, তবে সে সেখানে চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকাকেও মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা থেকে উত্তম মনে করত।" হাদীসের এ 'চল্লিশ' শব্দটিকে কেউ কেউ চল্লিশ বছর উদ্দেশ্য করেছেন, কেউ চল্লিশ দিন, কেউ চল্লিশ মাস, কেউ চল্লিশ ঘণ্টা আর কেউ চল্লিশ মিনিট উদ্দেশ্য করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কেরাম চল্লিশ বছরই উদ্দেশ্য করেছেন।

قَوْلُهُ عَلَى الْمَفْعِلِ بِالْكَسْرِ : অর্থাৎ عَيْن কালিমায় যের দ্বারা। অভিধানে উল্লেখ রয়েছে যে, مَسْكَنْ -এর ওযনে مَسْجَدْ কপালের অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর مَسْجِدْ যের দ্বারা নির্দিষ্ট জায়গার নাম, যা নামাজের জন্য নির্ধারিত। অর্থাৎ মসজিদ। একে مَسْجَدْ যবর দ্বারাও পড়া জায়েজ আছে। اَلْمَفْعَلُ . بَاب نَصَرَ يَنْصُرُ থেকে اِسْم হবে, কিংবা– عَيْن কালিমায় যবরসহ مَصْدَرْ হবে। তবে مَسْجِدُ . مَنْسِكُ . مَنْبِتُ . مَرْفِقُ . مَسْكِنُ . مَجْزِرُ . مَفْرِقُ . مَغْرِبُ . مَشْرِقُ . مَطْلِعُ . এ সমস্ত শব্দে عَيْن কালিমায় যের পড়া আবশ্যক, তবে যবর পড়া জায়েজ। যদিও আমরা তা শুনিনি।

قَوْلُهُ مَوْضِعَ السُّجُوْدِ فَاِنَّ الْمُرُوْرَالخ : এখানে সিজদার স্থান উদ্দেশ্য। কারণ, যদি প্রসিদ্ধ অর্থ– মসজিদ উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তবে মুসল্লির সামনে দিয়ে যে কোনো স্থান দিয়ে অতিক্রম করা গুনাহ হবে, অথচ এমন ফতোয়া কোনো ফকীহই দেন না। তা ছাড়াও যদি এর দ্বারা মসজিদই উদ্দেশ্য করা হয়, তবে মরুভূমির হুকুম এর থেকে বুঝা যায় না।

قَوْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ الصَّغِيْرِ : 'জামেউর রুমূয' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ছোট মসজিদের পরিমাণ হচ্ছে ষাট গজ। অপর এক অভিমত হচ্ছে, চল্লিশ গজ। এখন একথা জানা নেই যে, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থেও কি ষাট গজ করে নাকি সর্বদিক মিলে ষাট গজ।

قَوْلُهُ مَكَانٌ وَاحِدٌ : 'দুররুল মুখতার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, দুই কাতারের দূরত্ব ইকতেদার জন্য প্রতিবন্ধক নয়; বরং তা একই জায়গার হুকুমে। পক্ষান্তরে যদি বড় মসজিদ হয় তবে এতে তা প্রতিবন্ধক হবে। ছোট মসজিদে মুসল্লি থেকে নিয়ে কিবলা দিকের দেয়াল পর্যন্ত এক জায়গা ধরা হবে। ময়দানে কিংবা বড় মসজিদে যদি এমন হয় তবে নামাজি ব্যক্তির সামনে দিয়ে কোনো ব্যক্তির অতিক্রম করা কষ্টকর হয়ে যায়, তাই এখানে সিজদার জায়গাই উদ্দেশ্য হবে।

وَاِنْ كَانَتْ فِى الْمَسْجِدِ الْكَبِيْرِ اَوْ فِى الصَّحْرَاءِ فَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ اِنْ مَرَّ فِىْ مَوْضِعِ السُّجُوْدِ يَأْثَمُ وَاِلَّا فَلَا وَعِنْدَ الْبَعْضِ اَلْمَوْضِعُ الَّذِىْ يَقَعُ عَلَيْهِ النَّظَرُ اِذَا كَانَ الْمُصَلِّىْ نَاظِرًا فِىْ مَوْضِعِ سُجُوْدِهٖ لَهٗ حُكْمُ مَوْضِعِ السُّجُوْدِ فَيَأْثَمُ بِالْمُرُوْرِ فِىْ ذٰلِكَ الْمَوْضِعِ اِذَا عَرَفْتَ هٰذَا فَاِنْ كَانَ الْمُصَلِّىْ عَلٰى دُكَّانٍ وَيَمُرُّ الْاٰخَرُ اَمَامَهٗ تَحْتَ الدُّكَّانِ فَلَاشَكَّ اَنَّهٗ لَمْ يَمُرَّ فِىْ مَوْضِعِ سُجُوْدِهٖ حَقِيْقَةً فَلَا يَأْثَمُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْاُوْلٰى وَاَمَّا عَلَى الثَّانِيَةِ فَالْمَارُّ تَحْتَ الدُّكَّانِ اِنْ مَرَّ فِىْ مَوْضِعِ النَّظَرِ اِذَا نَظَرَ فِىْ مَوْضِعِ السُّجُوْدِ فَـ<u>اِنْ حَاذٰى بَعْضُ اَعْضَاءِ الْمَارِّ بَعْضَ اَعْضَاءِ الْمُصَلِّىْ يَأْثَمُ وَاِلَّا فَلَا</u> فَلِهٰذَا قَالَ <u>وَحَاذَى الْاَعْضَاءُ الْاَعْضَاءَ لَوْ كَانَ عَلٰى دُكَّانٍ</u> اَخْذًا بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ <u>وَيَغْرِزُ اِمَامَهٗ فِى الصَّحْرَاءِ سُتْرَةً بِقَدْرِ ذِرَاعٍ وَغِلَظِ اِصْبَعٍ بِقُرْبِهٖ عَلٰى اَحَدِ حَاجِبَيْهِ وَلَا تُوْضَعُ وَلَا يُخَطُّ وَيَدْرَأُهٗ بِالتَّسْبِيْحِ اَوِ الْاِشَارَةِ لَا بِهِمَا اِنْ عَدِمَ سُتْرَةً اَوْ مَرَّ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا وَكَفٰى سُتْرَةُ الْاِمَامِ وَجَازَ تَرْكُهَا عِنْدَ عَدَمِ الْمُرُوْرِ وَالطَّرِيْقِ۔</u>

অনুবাদ : যদি বড় মসজিদ কিংবা ময়দানে নামাজ হয় তবে কোনো কোনো ফকীহের নিকট যদি সিজদার জায়গা দিয়ে অতিক্রম করে তবে গুনাহগার হবে; অন্যথায় নয়। কোনো কোনো ফকীহের নিকট সিজদার স্থানে মুসল্লি দৃষ্টি ফেলার দ্বারা যে পর্যন্ত দৃষ্টি পড়ে তাও সিজদার স্থানের হুকুমে। তাই সেখান দিয়ে অতিক্রম করার দ্বারাও গুনাহগার হবে। যখন তুমি এ [বিস্তারিত আলোচনা] জানলে, তখন মুসল্লি যদি দোকানে [উঁচু জায়গায়] নামাজ পড়ে, আর দোকানের নীচ দিয়ে তার সামনে দিয়ে অন্য ব্যক্তি অতিক্রম করে যায় তবে নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি তার সিজদার প্রকৃত স্থান দিয়ে অতিক্রম করেনি। তাই প্রথম বর্ণনার ভিত্তিতে গুনাহগার হবে না। দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী দোকানের নীচ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি মুসল্লির সিজদার স্থানে দৃষ্টি করার দ্বারা তার দৃষ্টি যে পর্যন্ত পড়ে সেখান দিয়ে অতিক্রম করে যায় তখন যদি অতিক্রমকারীর কিছু অঙ্গ মুসল্লির কিছু অঙ্গের বরাবর হয় তবে সে গুনাহগার হবে; অন্যথায় গুনাহগার হবে না। এ কারণেই গ্রন্থকার বলেছেন, “দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী <u>যদি মুসল্লি দোকানে হয় এবং অতিক্রমকারীর কোনো অঙ্গ মুসল্লির কোনো অঙ্গের বরাবর হয় [তবে সে গুনাহগার হবে]। ময়দানে মুসল্লি নিজের সামনে এবং নিকটে কোনো একটি ভ্রুর বরাবর এমন একটি সুতরা গাড়বে, যা লম্বায় এক হাত পরিমাণ হয় এবং মোটায় এক আঙ্গুল পরিমাণ হয়। সুতরাকে ভূমিতে রেখে দেবে না এবং দাগও টানবে না। আর যদি সুতরা না থাকে কিংবা সুতরা থাকে কিন্তু অতিক্রমকারী সুতরা ও মুসল্লির মধ্যখান দিয়ে অতিক্রম করে তবে উঁচু আওয়াজে তসবিহ পড়ে কিংবা ইশারার দ্বারা অতিক্রমকারীকে বারণ করবে। তবে [তসবিহ ও ইশারা] উভয়টি দ্বারা বারণ করবে না। [জামাতের নামাজে] ইমামের সুতরা যথেষ্ট। অতিক্রম না করা কিংবা পথ না হওয়ার সুরতে সুতরা না গাড়া জায়েজ আছে।</u>

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ الخ : এখানে যেহেতু মুসল্লির পা থেকে সিজদার জায়গা পর্যন্ত তার নামাজের জায়গা, তাই এতে যথেষ্ট অবকাশ বের হয়ে আসে। অতএব, এ জায়গা দিয়ে অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে।

قَوْلُهُ عِنْدَ الْبَعْضِ الْمَوْضِعُ الَّذِىْ : মুসল্লি তার সিজদার জায়গায় দৃষ্টি ফেলার পর যতটুকু পর্যন্ত তার দৃষ্টি পড়ে ততটুকু তার সিজদার স্থানের হুকুমে। ফখরুল ইসলাম (র.) এ অভিমতকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। নিহায়া ও ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার এ অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

قَوْلُهُ فِىْ مَوْضِعِ سُجُوْدِهٖ لَهٗ حُكْمُ الخ : বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, যদি মুসল্লি খুশুখুযুর সাথে নামাজ পড়ে তাহল অতিক্রমকারীর উপর দৃষ্টি পড়ে না, তবে সেখান দিয়ে অতিক্রম করা মাকরূহ হবে না। যেমন– দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গায়, রুকুতে পায়ের উপর, সিজদায় নাকের দুই পাশে, বৈঠকে কোলে এবং সালামে কাঁধের উপর দৃষ্টি পড়ে।

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّىْ عَلٰى دُكَّانٍ الخ : دُكَّانٌ শব্দের دَالْ অক্ষরে পেশ এবং كَافْ অক্ষরটি مُشَدَّدْ হবে। অর্থ– দোকান। এটি ফারসি শব্দ دُكَّانْ থেকে আরবি হয়েছে। এর দ্বারা যে-কোনো উঁচু জায়গা উদ্দেশ্য। যেমন– চৌকি, পালংক ইত্যাদি।

قَوْلُهُ إِنْ حَاذٰى بَعْضُ أَعْضَاءِ الْمَارِّ : 'জামেউর রুমূয' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, অতিক্রমকারী কোনো অঙ্গ মুসল্লির কোনো অঙ্গের বরাবর হলে তার সমস্ত অঙ্গের বরাবর হয়ে যায়। কেউ বলেন, সমস্ত অঙ্গ বরাবর হওয়া জরুরি নয়। এতে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, যদি অতিক্রমকারীর কতিপয় অঙ্গ কিংবা অর্ধেক অঙ্গ মুসল্লির অঙ্গের বরাবর চলে আসে তবে তা মাকরূহ হবে না।

قَوْلُهُ أَخْذًا بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : ইসফারায়েনী (র.) বলেন, সিজদার জায়গার হুকুমের ক্ষেত্রে মতানৈক্য উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দোকানের মাসআলার ক্ষেত্রে মতানৈক্য উল্লেখ করা হয়নি। অতএব, শারেহ (র.)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী এ মাসআলার ভিত্তি অন্য কথার উপর। কিন্তু এটিও স্পষ্ট যে, ছোট মসজিদে দোকান ইত্যাদি বরাবর। এজন্য উচিত ছিল, ছোট মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের সাথে খাস করা। এজন্য মতনের ইবারত অসম্পূর্ণ মনে হয়। সম্ভবত দোকানের আলোচনার ভিত্তি এ কথার উপর নয় যে, দোকানের নীচের অংশ সিজদার জায়গা নাকি সিজদার জায়গা নয়।

সুতরার দৈর্ঘ্য ও মোটার পরিমাণ : সুতরা দৈর্ঘ্যে নিম্নে এক হাত পরিমাণ হতে হবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) যখন রাসূল ﷺ -কে সুতরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তখন রাসূল ﷺ বলেছেন, হাওদার পিছনের লাকড়ির মতো, যার দৈর্ঘ্য সাধারণত এক হাত হয়ে থাকে। অনুরূপ সুতরা এক আঙ্গুল পরিমাণ মোটা হবে। হাদীস দ্বারা এমনই বুঝা যায়। দৈর্ঘ্য ও মোটার উল্লিখিত পরিমাণ হচ্ছে সর্বনিম্ন। যদি এর চেয়ে মোটা কিংবা এর চেয়ে লম্বা হয়, তবে তা ভালো। সুতরা অনেক দূরে গাড়বে না; বরং মুসল্লির একেবারে নিকটে গাড়বে এবং সুতরা একেবারে কপাল বরাবরও গাড়বে না; বরং ডান দিকে কিংবা বাম দিকে গাড়বে। এ সমস্ত আহকাম রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত।

قَوْلُهُ لَا تُوْضَعُ وَلَا يُخَطُّ : অর্থাৎ সুতরাকে ভূমির উপর রেখে দেবে না; বরং গাড়বে। কেননা, এভাবে রেখে দেওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। কিন্তু অপারগতার সুরতে ব্যতিক্রম হবে। যেমন– পাথুরে ভূমিতে সুতরা গাড়া অসম্ভব। সাহেবাইন (র.)-এর নিকট শুধু এভাবে সুতরা রেখে দেওয়াও যথেষ্ট। অনুরূপ সুতরা না গেড়ে শুধু দাগ টানাও যথেষ্ট নয়। তবে যদি অপারগ হয়– যেমন, সুতরা নেই তবে দাগই টেনে দেবে। তবে এ সুরতে চাঁদের ন্যায় বাকা দাগ হতে হবে, যা মিহরাবের মতো হয়।

قَوْلُهُ وَيَدْرَأُهُ بِالتَّسْبِيْحِ : অর্থাৎ যদি কারো সামনে সুতরা না থাকে আর কেউ তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করে কিংবা সুতরা আছে, কিন্তু অতিক্রমকারী সুতরা এবং মুসল্লির মধ্যখান দিয়ে অতিক্রম করে তবে মুসল্লির উপর ওয়াজিব হলো, এ অতিক্রমকারীকে অতিক্রম করা থেকে বারণ করা। এখন তাকে বারণ করার সুরত দুইটি–

১. আওয়াজ করে কোনো তসবিহ পড়বে। যেমন– সুবহানাল্লাহ। যার দ্বারা অতিক্রমকারী সতর্ক হয়ে যাবে যে, এ ব্যক্তি নামাজ পড়ছে। কিংবা যদি মুসল্লি দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে তবে কোনো আয়াত পড়বে কিংবা যা সে পড়ছে এর কিছু অংশ উঁচু আওয়াজে পড়বে।

২. অতিক্রমকারীকে হাত, চক্ষু কিংবা মাথা দ্বারা ইশারা করে বারণ করবে। কিন্তু তসবিহ ও ইশারা উভয়টি দ্বারা একসঙ্গে বারণ করবে না। এক পদ্ধতিতে বারণ করাই যথেষ্ট এবং প্রয়োজনের বেশি করা মাকরূহ। উঁচু আওয়াজে তসবিহ পড়ার নিয়ম পুরুষের জন্য। আর মহিলাদের নিয়ম হচ্ছে তালি বাজানো। তবে যদি এর পরিপন্থি হয়। যেমন– পুরুষে তালি বাজায় এবং মহিলা তসবিহ পড়ে তবে এর দ্বারা নামাজ ভাঙ্গবে না। তা সুন্নতের পরিপন্থি হবে।

قَوْلُهُ وَكَفٰى سُتْرَةُ الْإِمَامِ :

ইমামের সুতরা মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট : জামাতে নামাজ আদায়ের সময় ইমামের সুতরা মুক্তাদীদের জন্যও যথেষ্ট।

দলিল হলো, হযরত আবূ জুহাইফা (রা.) সূত্রে বর্ণিত– إِنَّهٗ صَلّٰى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّوْنَ مِنْ وَرَائِهَا অর্থাৎ "রাসূল ﷺ সমতল ভূমিতে লোকদেরকে নিয়ে নামাজ পড়ছিলেন। তার সামনে একটি লাঠি ছিল। স্ত্রীলোক ও গাধা লাঠির বাইরে দিয়ে অতিক্রম করছিল।" –[বুখারী ও মুসলিম]

তখন মুক্তাদীদের কোনো সুতরা ছিল না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমামের সুতরা মুক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট।

وَكُرِهَ سَدْلُ الثَّوْبِ فِى الْمَغْرِبِ هُوَ اَنْ يُرْسِلَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَضُمَّ جَانِبَيْهِ وَقِيْلَ هُوَ اَنْ يُلْقِيَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيُرْخِيْهِ عَلَى مَنْكَبَيْهِ اَقُوْلُ هٰذَا فِى الطَّيْلَسَانِ اَمَّا فِى الْقَبَاءِ وَنَحْوِهِ فَهُوَ اَنْ يُلْقِيَهُ عَلَى كَتِفَيْهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِى كُمَّيْهِ وَيَضُمَّ طَرَفَيْهِ وَكَفُّهُ وَهُوَ اَنْ يَضُمَّ اَطْرَافَهُ اِتِّقَاءَ التُّرَابِ وَنَحْوِهِ وَعَبَثُهُ بِهِ وَبِجَسَدِهِ وَعَقْصُ شَعْرِهِ فِى الْمَغْرِبِ وَهُوَ جَمْعُ الشَّعْرِ عَلَى الرَّاْسِ وَقِيْلَ لَيُّهُ وَاِدْخَالُ اَطْرَافِهِ فِى اُصُوْلِهِ وَفُرْقَعَةُ اَصَابِعِهِ وَهُوَ اَنْ يَغْمِزَهَا اَوْ يَمُدَّهَا حَتّٰى تَصُوْتَ وَالْتِفَاتُهُ وَهُوَ اَنْ يَنْظُرَ يُمْنَةً وَيَسْرَةً مَعَ لِىِّ عُنُقِهِ وَاَمَّا النَّظَرُ بِمُؤَخَّرِ عَيْنِهِ بِلَا لِىِّ الْعُنُقِ فَلَا يُكْرَهُ ـ

অনুবাদ : [নামাজে] কাপড় ঝুলিয়ে রাখা মাকরূহ। 'আল-মাগরিব' নামক অভিধানে উল্লেখ রয়েছে যে, سَدْل অর্থ– কাপড়ের উভয় পার্শ্ব মিলিয়ে না রেখে ঝুলিয়ে রাখা। কেউ বলেন, কাপড়কে মাথায় রেখে উভয় কাঁধের উপর লটকিয়ে দেওয়া। [শারেহ (র.) বলেন,] আমি বলি– এটি শুধু চাদর কিংবা রুমালের ক্ষেত্রে হতে পারে। তবে জুব্বা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে, জামার হাতায় হাত না ঢুকিয়ে জামা পরিধান করা এবং উভয় পার্শ্বকে না মিলানো। [নামাজে] কাপড় ভাঁজ করা [মাকরূহ]। অর্থাৎ কাপড়কে ধুলোবালি থেকে হেফাজত করার জন্য কাপড় গুটানো। মুসল্লির কাপড়, শরীর দ্বারা খেলা করা এবং মাথায় চুল একত্রিত করা [মাকরূহ]। 'আল-মাগরিব' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, عَقْصُ الشَّعْرِ -এর অর্থ– মাথায় চুল জমায়েত করা [তথা খোঁপা বানানো]। কেউ বলেন, عَقْصُ الشَّعْرِ -এর অর্থ– চুল পেঁচানো এবং চুলের মাথা চুলের গোড়ায় প্রবেশ করানো। [নামাজে] আঙ্গুল ফুটানো [মাকরূহ]। তা হচ্ছে– আওয়াজ হওয়ার জন্য আঙ্গুলে চাপ দেওয়া কিংবা আঙ্গুল টানা। নামাজি ব্যক্তির জন্য এদিক-সেদিক তাকানো [মাকরূহ]। তা [এভাবে] যে, গর্দানসহ ডান দিকে ও বাম দিকে তাকানো। কিন্তু যদি গর্দান ফিরানো ব্যতীত শুধু চক্ষু ঘুরিয়ে দেখে তবে তা মাকরূহ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : গ্রন্থকার যখন নামাজ ভঙ্গের কারণসমূহ ও এর প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বর্ণনা থেকে অবসর হয়েছেন তখন তিনি নামাজের مَكْرُوْهَاتٌ -এর বর্ণনা শুরু করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মাকরূহ দু প্রকার। ১. মাকরূহে তাহরীমী, ২. মাকরূহে তানযীহী, তবে مُطْلَقْ মাকরূহ বলার দ্বারা মাকরূহে তাহরীমী উদ্দেশ্য হয়। এটি ওয়াজিবের পর্যায়ের। অর্থাৎ ওয়াজিব যে পর্যায়ের দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়, মাকরূহে তাহরীমীও সে পর্যায়ের দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর মাকরূহে তানযীহীর অবস্থান হচ্ছে, তা বর্জন করা উত্তম এবং অধিকাংশ সময় একে শুধু مَكْرُوْه বলা হয়। তাই যখন مَكْرُوْه শব্দ আসবে তখন দলিল দেখা হবে। যদি দলিল– نَهِى ظَنِّى হয়, তবে তা মাকরূহে তাহরীমী হবে। আর যদি দলিল 'বর্জন করা উত্তম' পর্যায়ের নাহী (نَهِىْ) হয় তবে তা মাকরূহে তানযীহী হবে।

قَوْلُهُ وَكُرِهَ سَدْلُ الثَّوْبِ :

سَدْلُ الثَّوْبِ **-এর বিবরণ :** سَدْلُ الثَّوْبِ অর্থ– কাপড় লটকানো। এখানে কাপড় লটকানো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, টাখনুর নীচে কাপড় লটকানো। কিন্তু শারেহ (র.) এখানে অন্য অর্থ বর্ণনা করেছেন। তবে সেটি শাব্দিক অর্থ হবে। কিন্তু ভাবার্থ এটিই যে, পায়জামা কিংবা লুঙ্গি টাখনুর নীচে পরিধান করা, যার দ্বারা পা ঢেকে যায়। অনুরূপ মাথায় কিংবা কাঁধে কোনো প্রকার বাঁধা ছাড়া কাপড় লটকিয়ে রাখাও মাকরূহ। যেমন– লুঙ্গিকে চাদরের মতো কিংবা জামাকে চাদরের মতো ব্যবহার করা মাকরূহ। শারেহ (র.)-এর ব্যাখ্যাও এ অর্থকে মজবুত করে। কেননা, শারেহ (র.) سَدْلُ الثَّوْبِ -এর যে কয়টি সুরত উল্লেখ করেছেন, এর সারসংক্ষেপ এই যে, যে কাপড় যেভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুতকারক প্রস্তুত করেছেন– সেটি এর পরিপন্থি ব্যবহার করা মাকরূহ। আর سَدْلُ الثَّوْبِ হচ্ছে এর একটি শাখা।

قَوْلُهُ وَكَفُّهُ الخ :

নামাজে আঁচল ভাঁজ করা মাকরূহ : নামাজে রুকু কিংবা সিজদায় যাওয়ার সময় কিংবা বৈঠকে ধুলোবালি থেকে কাপড়কে হেফাজত করার জন্য পাঞ্জাবির কলি কিংবা আঁচল গুটানো বা ভাঁজ করা মাকরূহ। কেউ কেউ একে মাকরূহে তাহরীমীও বলেছেন। এ ক্ষেত্রে মূল দলিল হচ্ছে রাসূল ﷺ -এর হাদীস। রাসূল ﷺ বলেছেন–

أُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَاَنْ لَا اَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا .

অর্থাৎ "সাত অঙ্গের উপর সিজদা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং চুল ও কাপড় গুটাতে নিষেধ করা হয়েছে।" এ হাদীসের অধীনে এটি চলে এসেছে যে, নামাজে কাপড় ভাঁজ করা কিংবা গুটানো মাকরূহ।

قَوْلُهُ وَعَبَثُهُ بِهٖ وَبِجَسَدِهٖ :

নামাজে কাপড় কিংবা শরীর নিয়ে খেলাধুলা করা মাকরূহ : নামাজে কাপড় কিংবা শরীর নিয়ে খেলাধুলা করা মাকরূহ। কিতাবে খেলাধুলা অর্থ প্রকাশের জন্য عَبْث শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর عَبْث বলা হয় এমন কাজকে যা শরিয়ত অনুমোদিত নয়, যাতে কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই এবং অনর্থক। 'বাহরুর রায়িক' গ্রন্থে এই عَبْث -কে মাকরূহে তাহরীমী বলা হয়েছে। এটি তখন, যখন খেলাধুলা আমলে কাছীর পর্যন্ত না পৌঁছবে। অন্যথায় যদি আমলে কাছীর হয়ে যায় তবে নামাজ ভেঙ্গে যাবে এবং অপ্রয়োজনের সুরতেও নামাজ ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু প্রয়োজনে এমনটি করা মাকরূহ নয়। হাদীস শরীফে এসেছে– اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا اَلْعَبَثُ فِى الصَّلَاةِ وَالرَّفَثُ فِى الصَّوْمِ وَالضِّحْكُ فِى الْمَقَابِرِ

অর্থাৎ "তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন– ১. নামাজে [অনর্থক] খেলাধুলা করা। ২. রোজার মধ্যে অশ্লীল কাজ করা। ৩. কবরস্থানে হাসা।" –[নাসায়ী শরীফ] সর্বোপরি নামাজে কাপড় কিংবা শরীর নিয়ে অনর্থক খেলাধুলা করা মাকরূহে তাহরীমী।

قَوْلُهُ وعَقْصُ شَعْرِهٖ :

নামাজে খোঁপা বা বেণি বাঁধা মাকরূহ : নামাজে মাথার চুলকে জমা করা তথা খোঁপা বাঁধা কিংবা বেণি বাঁধা মাকরূহ। বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এটিও মাকরূহে তাহরীমী এবং এ নিয়ম তখন যখন নামাজের পূর্বে খোঁপা বা বেণি বাঁধা থাকবে। আর যদি নামাজে বেণি বা খোঁপা বাঁধে তবে নামাজ ভেঙ্গে যাবে।

قَوْلُهُ وفَرْقَعَةُ اَصَابِعِهٖ :

নামাজে আঙ্গুল ফুটানো মাকরূহ : নামাজে নিজের আঙ্গুল ফুটানো মাকরূহ। হাদীসে এসেছে– لَا تُفَرْقِعْ اَصَابِعَكَ وَاَنْتَ فِى الصَّلَاةِ অর্থাৎ "যখন তুমি নামাজে থাকবে তখন আঙ্গুল ফুটাবে না।" –[ইবনে মাজাহ]

এ হাদীসের আলোকে একে মাকরূহে তাহরীমী বলা উচিত। 'বাহরুর রায়িক' নামক গ্রন্থে এমনই উল্লেখ রয়েছে। غنية নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, নামাজের বাইরেও আঙ্গুল ফুটানো মাকরূহ। কারণ, হযরত লূত (আ.)-এর উম্মতেরা আঙ্গুল ফুটাত। তবে শর্ত হচ্ছে– তা হতে হবে কোনো প্রয়োজন ব্যতীত। পক্ষান্তরে যদি কেউ প্রয়োজন সাপেক্ষে নামাজের বাইরে আঙ্গুল ফুটায় তবে তা মাকরূহ হবে না। –[দুররুল মুখতার]

قَوْلُهُ وَالْتِفَاتُهُ الخ :

নামাজে এদিক-সেদিক তাকানো মাকরূহ : নামাজে গর্দান ফিরিয়ে ডান, বাম, কিংবা পিছনের দিকে তাকানো মাকরূহ। রাসূল ﷺ বলেছেন– اِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلَاةِ فَاِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ অর্থাৎ "নামাজে এদিক-সেদিক তাকানো থেকে তুমি বিরত থাকবে কারণ এটি ধ্বংসের কারণ।" –[তিরমিযী শরীফ]

অন্য এক হাদীসে আছে– هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ অর্থাৎ "[নামাজে] এদিক-সেদিক তাকানো– একটি অতর্কিত হামলা, যা শয়তান বান্দার নামাজে করে থাকে।"–[বুখারী শরীফ]

এ হাদীসের আলোকে اَلْاِلْتِفَاتُ فِى الصَّلَاةِ -কে মাকরূহে তাহরীমী বলা উচিত।

তবে নামাজে গর্দান ফিরানো ব্যতীত শুধু চক্ষু ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক দেখা মাকরূহ নয়। اَلْغُنْيَةُ নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে– اَلْاِلْتِفَاتُ فِى الصَّلَاةِ তিন প্রকার–

১. এমন اِلْتِفَاتٌ যা নামাজ ভঙ্গকারী। তা হচ্ছে, যার মধ্যে বক্ষ পর্যন্ত কিবলার দিক থেকে ফিরে যায়।

২. মাকরূহ اِلْتِفَاتٌ তা হচ্ছে, গর্দান ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক দেখা।

৩. এমন اِلْتِفَاتٌ যা মাকরূহ নয়। তা হচ্ছে, শুধু চক্ষু ঘুরিয়ে দেখা।

وَقَلْبُ الْحَصٰى لِيَسْجُدَ اِلَّا مَرَّةً وَتَخَصُّرُهُ اَىْ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ وَتَمَطِّيْهِ اَىْ تَمَدُّدُهُ وَاِقْعَاؤُهُ وَهُوَ الْقُعُوْدُ عَلٰى اِلْيَتَيْهِ نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ وَتَرَبُّعُهُ بِلَا عُذْرٍ وَقِيَامُ الْاِمَامِ فِىْ طَاقِ الْمَسْجِدِ اَىْ فِى الْمِحْرَابِ بِاَنْ يَكُوْنَ الْمِحْرَابُ كَبِيْرًا فَيَقُوْمُ فِيْهِ وَحْدَهُ اَوْ عَلٰى دُكَّانٍ اَوِ الْاَرْضِ وَحْدَهُ اَىْ يَقُوْمُ الْاِمَامُ عَلَى الْاَرْضِ وَالْقَوْمُ عَلَى الدُّكَّانِ اَوْ بِالْعَكْسِ وَالْقِيَامُ خَلْفَ صَفٍّ وُجِدَ فِيْهِ فُرْجَةٌ وَصُوْرَةٌ اَىْ صُوْرَةُ حَيَوَانٍ اَمَامَهُ اَوْ بِحِذَائِهِ اَىْ عَلٰى اَحَدِ جَنْبَيْهِ اَوْ فِى السَّقْفِ اَوْ مُعَلَّقَةً فَاِنْ كَانَتْ خَلْفَهُ اَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَا يُكْرَهُ وَصَلَاتُهُ حَاسِرًا رَأْسَهُ لِلتَّكَاسُلِ اَوْ لِلتَّهَاوُنِ بِهَا لَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّهَاوُنِ الْاِهَانَةُ بِالصَّلٰوةِ فَاِنَّهَا كُفْرٌ بَلِ الْمُرَادُ قِلَّةُ رِعَايَتِهَا وَمُحَافَظَةِ حُدُوْدِهَا لَا لِلتَّذَلُّلِ وَفِىْ ثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَهِىَ مَا يُلْبَسُ فِى الْبَيْتِ وَلَا يَذْهَبُ بِهَا اِلَى الْكُبَرَاءِ وَمَسْحُ جَبْهَتِهِ مِنَ التُّرَابِ فِيْهَا وَالنَّظَرُ اِلَى السَّمَاءِ وَالسُّجُوْدُ عَلٰى كَوْرِ عِمَامَتِهِ ـ

অনুবাদ : সিজদা করার জন্য পাথর [ধুলোবালি] হটানো তবে একবার হটানো বৈধ। কোমরের উপর হাত রাখা, হাই তোলা, উভয় হাঁটুকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দুই নিতম্বের উপর বসা, সিজদার অবস্থায় উভয় হাতকে বিছিয়ে দেওয়া, ওজর ব্যতীত আসন পেতে বসা– [মাকরূহ]। ইমাম মিহরাবের ভিতরে দাঁড়ানো। তা এভাবে যে, মিহরাব বড় এবং ইমাম এতে একা দাঁড়িয়েছে। কিংবা ইমাম একা দোকানে বা ভূমিতে দাঁড়ানো অর্থাৎ ইমাম ভূমিতে আর মুক্তাদী দোকানে কিংবা এর বিপরীত। এমন কাতারের পিছনে দাঁড়ানো যাতে খালি জায়গা রয়েছে, মুসল্লির সামনে, ডানে, বামে কিংবা ছাদে কিংবা লটকানো কোনো প্রাণীর ছবি থাকা [মাকরূহ]। কিন্তু যদি প্রাণীর ছবি মুসল্লির পিছনে কিংবা পায়ের নীচে হয় তবে তা মাকরূহ হবে না। অলসতা কিংবা অবহেলার কারণে খালি মাথায় নামাজ পড়া [মাকরূহ]। এখানে অবহেলার দ্বারা নামাজের ইহানত [অবমাননা] করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, নামাজের ইহানত করা কুফরি; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাজের প্রতি গুরুত্ব কম দেওয়া ও নামাজের নিয়মাবলির হেফাজত কম করা। খুশুখুযুর জন্য [যদি খালি মাথায় নামাজ পড়ে] তবে মাকরূহ হবে না। পুরাতন ময়লা কাপড়ে নামাজ পড়া [মাকরূহ]। [এখানে] পুরাতন ময়লা কাপড় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন কাপড় যা ঘরে পরিধান করা হয় এবং তা পরিধান করে বড়দের কাছে যায় না। নামাজরত অবস্থায় কপাল দ্বারা ধুলা পরিষ্কার করা [মাকরূহ]। আকাশের দিকে তাকানো এবং পাগড়ির পেঁচের উপর সিজদা করা [মাকরূহ]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَلْبُ الْحَصٰى الخ :

নামাজে সিজদার জায়গা থেকে ধুলোবালি সরানো মাকরূহ : নামাজের অবস্থায় সিজদার জায়গা থেকে পাথর-কণা ও ধুলোবালি সরানো মাকরূহ। তবে একবার সরানো মাকরূহ নয়। ফতোয়ায়ে কাযীখানে উল্লেখ রয়েছে যে, "যদি এত বেশি কঙ্কর হয় যে, কঙ্কর সরানো ব্যতীত সিজদা করা সম্ভব নয়, তবে একবার কিংবা দুবার কঙ্কর সরাতে পারবে। তবে তিনবার করলে নামাজ ভেঙ্গে যাবে।" তবে প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী একবারই সরাতে পারবে। বিকায়া গ্রন্থকারের অভিমতও এমনই যেমনটি মতনে উল্লেখ রয়েছে, তবে এ অবকাশ শুধু অপারগতার সুরতে। অন্যথায় এমনটি না করাই উত্তম।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِى الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً ـ

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন– যে সিজদা করার জন্য মাটি সমান করছিলেন, যদি তুমি এমনটি করতেই চাও তবে একবার করতে পার।" –[মুসলিম শরীফ]

قَوْلُهُ وَتَخَصُّرُهُ :

নামাজে কোমরে হাত রাখা মাকরূহ : নামাজে কোমর কিংবা পার্শ্বে হাত রাখা মাকরূহ। কারণ, এতে খুশুখুযু থাকে না; বরং অলসতা ও অবহেলা প্রকাশ পায়। এর উপর কিয়াস করে বলা হয়, নামাজে হাই তোলা কিংবা শরীর মোচড়ানো মাকরূহ। কারণ, তা খুশুখুযুর পরিপন্থি। নামাজে প্রত্যেক এমন কাজ মাকরূহ যা নামাজকে সংশোধনের জন্য নয়। তাছাড়া খুশুখুযুর অবস্থায় এসব কাজই হয় না।

قَوْلُهُ وَاِقْعَاؤُهُ الخ :

اِقْعَاء-এর সুরত : اِقْعَاء বৈঠকের দুটি সুরত হতে পারে–

১. হাঁটুদ্বয়কে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দুই নিতম্বের উপর বসা। এটি শারেহ (র.) উল্লেখ করেছেন।

২. পদদ্বয়কে এমনভাবে দাঁড় করানো– যেভাবে সিজদায় দাঁড় করানো হয় এবং পায়ের দুই গোড়ালির উপর দুই নিতম্বকে রেখে বসা। এটি আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করেছেন। এ উভয় প্রকারের বৈঠকই নামাজে মাকরূহ।

قَوْلُهُ وَتَرَبُّعُهُ بِلَا عُذْرٍ :

নামাজে আসন পেতে বসা মাকরূহ : নামাজে আসন পেতে বসা মাকরূহ। 'দুররুল মুখতার' নামক গ্রন্থে এ ধরনের বৈঠককে মাকরূহে তানযীহী বলা হয়েছে। কারণ, এ ধরনের বসা সুন্নত তরিকায় বসার পরিপন্থি। সুন্নত তরিকার বৈঠক হচ্ছে, বাম পা বিছিয়ে এর উপরে বসা এবং ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখা। তবে ওজরের সুরতে ব্যতিক্রমও হতে পারে। কেননা, প্রয়োজনের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ জিনিসও বৈধ হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) ওজরের সময় আসন পেতে বসতেন, কিন্তু তিনি অন্যান্য লোক তথা ওজরহীনদেরকে এর থেকে বারণ করতেন।

قَوْلُهُ وَقِيَامُ الْاِمَامِ فِىْ طَاقِ الْمَسْجِدِ :

ইমাম একা মিহরাবের ভিতরে দাঁড়ানো মাকরূহ : ইমাম একা মিহরাবের ভিতরে দাঁড়ানোর সুরত দুটি হতে পারে–

১. ইমাম মসজিদে দাঁড়িয়েছে এবং সিজদা করে মিহরাবে। সর্বসম্মতিক্রমে এ সুরত মাকরূহ নয়।

২. ইমাম মিহরাবের ভিতরে দাঁড়ানো। ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন– এ সুরত মাকরূহ। কারণ, ১. এটি আহলে কিতাব-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ তাদের ইমাম জায়গার দিক থেকে মুক্তাদী থেকে পৃথক হতো, তথা মুক্তাদী মসজিদের ভিতরে থাকত এবং ইমাম মসজিদের বাইরে [মিহরাবে] দাঁড়াত। ২. ডান ও বাম দিকের মুসল্লিরা ইমাম আছে নাকি নাই? এ নিয়ে সংশয়ে পড়ে যায়। সুতরাং প্রথম কারণ অনুযায়ী মিহরাবের ভিতরে দাঁড়ানো مُطْلَقًا মাকরূহ। আর দ্বিতীয় কারণ অনুযায়ী যদি ডান ও বাম দিকের মুসল্লিদের ইমামের অবস্থা সম্পর্কে জানা থাকে তবে মাকরূহ হবে না। যদি মিহরাব বড় হয় এবং ইমামের সাথে অন্য লোকও দাঁড়ানো যায় তবে অন্য লোকসহ ইমাম মিহরাবের ভিতরে দাঁড়ানো মাকরূহ নয়। শারেহ (র.)-ও فَيَقُوْمُ فِيْهِ وَحْدَهُ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اَوْ عَلٰى دُكَّانٍ الخ :

ইমাম উঁচু স্থানে এবং মুসল্লি নিচু জায়গায় দাঁড়ানো কিংবা এর বিপরীত করা মাকরূহ : যদি ইমাম কোনো উঁচু জায়গায় যেমন– দোকান, খাট ইত্যাদিতে একা দাঁড়ান এবং মুক্তাদীরা নীচে দাঁড়ায় কিংবা ইমাম নীচে এবং মুক্তাদী উপরে দাঁড়ায় তবে এ উভয় সুরতই মাকরূহ। বিশেষ করে দ্বিতীয় সুরত মাকরূহ। কেননা, এতে ইমামের অবমাননা হয়। অথচ শরিয়তে ইমামের ইজ্জত-সম্মানও উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে যদি এ উভয় সুরতে ইমাম একা না হন; বরং মুক্তাদীরও কয়েকজন তার সাথে থাকে, তবে তা মাকরূহ হবে না।

قَوْلُهُ وَالْقِيَامُ خَلْفَ صَفٍّ الخ :

সামনের কাতারে জায়গা থাকাবস্থায় পিছনের কাতারে দাঁড়ানো মাকরূহ : সামনের কাতারে জায়গা থাকাবস্থায় পিছনের কাতারে দাঁড়ানো মাকরূহ। বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, "প্রথমে সামনের কাতার পূর্ণ করবে অতঃপর এর পরের কাতার। যে সামনের কাতারে জায়গা পায়নি সে পিছনের কাতারে দাঁড়াবে।" –[আবূ দাউদ ও নাসাঈ]

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, প্রথমে সামনের কাতার পূর্ণ করা উচিত। সামনের কাতারে জায়গা থাকাবস্থায় পিছনের কাতারে দাঁড়ানো মাকরূহ। অনুরূপ কোনো কাতারে একা দাঁড়ানোও মাকরূহ। কিন্তু যদি সামনের কাতারে জায়গা না পাওয়া যায়– ফলে সে একা দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়িয়ে যায়– আর অন্য কোনো মুসল্লিও না আসে তবে কোনো সমস্যা নেই। এ ক্ষেত্রেও উত্তম হলো, সামনের কাতার থেকে কাউকে টেনে পিছনের কাতারে নিয়ে আসা এবং দুজন একসঙ্গে দাঁড়ানো।

قَوْلُهُ وَصُورَةٌ أَيْ صُورَةُ حَيَوَانٍ الخ :

মুসল্লির সামনে, ডানে, বাঁয়ে ও উপরে ছবি রাখা মাকরূহ : নামাজরত অবস্থায় মুসল্লির সামনে, ডানে, বাঁয়ে কিংবা ছাদে ছবি লটকিয়ে রাখার দ্বারা নামাজ মাকরূহ হয়। সুতরার মাঝে ছবি থাকাও মাকরূহ। বিছানায় সিজদার জায়গায় থাকাও মাকরূহ। কিন্তু যদি মুসল্লির পিছনে কিংবা বিছানায় মুসল্লির পায়ের নীচে ছবি থাকে– তবে তা মাকরূহ হবে না। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, যেখানে মূর্তিপূজার সাদৃশ হয় কিংবা ছবিকে সম্মান দেখানো হয় সেখানে নামাজ পড়াও মাকরূহ। আর যেখানে এমনটি হয় না সেখানে নামাজ পড়া মাকরূহ নয়। তবে এটি ভিন্ন কথা যে, ঘরে ছবি রাখা নিষিদ্ধ। হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ঘরে ছবি কিংবা কুকুর থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'

উল্লেখ্য যে, ছবি দ্বারা এখানে প্রাণীর ছবি উদ্দেশ্য। প্রাণহীন জিনিসের ছবি যেমন– চন্দ্র, তারা, গাছ, ফুল, ফল, ঘর, মসজিদ ইত্যাদির ছবি মাকরূহ নয়; বরং এসব জিনিসের ছবি সৌন্দর্যের জন্য ঘরে রাখা ভালো। এজন্যই শারেহ (র.) حيوان শব্দ বলে হুকুমটিকে প্রাণীর ছবির সাথে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং প্রাণহীন জিনিসের ছবিকে এ হুকুম থেকে বাদ দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَصَلَاتُهُ حَاسِرًا الخ :

অলসতা কিংবা অবহেলার দরুন খালি মাথায় নামাজ পড়া মাকরূহ : যদি টুপির প্রতি অবহেলা কিংবা অলসতা করে খালি মাথায় নামাজ পড়ে তবে তা মাকরূহ হবে। পক্ষান্তরে যদি কোনো ওজরের কারণে টুপি মাথায় দিতে না পারে তবে তা অক্ষমতা এবং তা মাকরূহ হবে না। তবে এটি মাকরূহে তানযীহী হবে, তাহরীমী নয়। কেননা, যদি নামাজে টুপি পড়ে যায় তবে তা উঠিয়ে মাথায় পরা উত্তম। কিন্তু যদি এতে আমলে কাসীর করতে হয় তবে টুপি উঠিয়ে পড়বে না। অন্যথায় নামাজ ভেঙ্গে যাবে।

قَوْلُهُ لَا لِلتَّذَلُّلِ :

খুশুখুযুর জন্য খালি মাথায় নামাজ পড়লে মাকরূহ হবে না : খুশুখুযুর জন্য যদি টুপি ছাড়া নামাজ পড়ে তবে তা মাকরূহ হবে না। কেননা, নামাজে খুশুখুযুই উদ্দেশ্য। আর তা তো অন্তরের কাজ। এখন যদি কেউ প্রকাশ্য অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তা প্রকাশ করে দেয় তবে কোনো সমস্যা নেই। আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, খুশুখুযুর জন্য টুপি ছাড়া নামাজ উত্তম না অনুত্তম এ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে– মুসল্লি যদি তাকওয়া ও পরহেজগারিতে মজবুত হয় তবে খুশুখুযুর জন্য খালি মাথায় নামাজ পড়া মাকরূহ হবে না। আর সাধারণ লোকদের জন্য খালি মাথায় নামাজ না পড়াই উত্তম।

قَوْلُهُ وَفِي ثِيَابِ الْبِذْلَةِ الخ :

পুরাতন ময়লা কাপড়ে নামাজ পড়া মাকরূহ : এখানে ময়লা ও পুরাতন কাপড় বলতে এমন কাপড় উদ্দেশ্য যা ঘরে কাজকর্মের সময় পরিধান করা হয় এবং যা পরিধান করে বড় বড় ব্যক্তিত্বের সামনে যাওয়া হয় না। তা পরিধান করে তাদের সামনে যাওয়া দূষণীয় মনে করা হয়। অতএব, তা পরিধান করে আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়া কিভাবে পছন্দনীয় হতে পারে? বরং কোনো কোনো ফকীহের অভিমত অনুযায়ী ইমামের জন্য এ ধরনের কাপড় পরিধান করা মাকরূহে তাহরীমী। কেননা, মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করছে। যদি সে এমন কাপড় পরিধান করে ইমামতি করে তবে তার প্রতি মুক্তাদীদের ঘৃণা আসবে। অনুরূপ তার নামাজ মাকরূহ হওয়ার দ্বারা মুক্তাদীদের নামাজও মাকরূহ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এমন কাপড় ব্যতীত অন্য কোনো কাপড় না থাকে তবে তা পরিধান করে নামাজ পড়া মাকরূহ হবে না।

মোস্তাহাব হচ্ছে, লুঙ্গি কিংবা পায়জামা, জামা কিংবা পাঞ্জাবি ও টুপি পরিধান করা। লুঙ্গি, পায়জামা যেন কখনো টাখনুর নীচে না আসে এবং পায়ের গোছার অর্ধেকের উপরেও যেন না উঠে। জামা ও পাঞ্জাবির বোতাম লাগিয়ে রাখবে, যেন বক্ষ খুলে না যায়। জামা, পাঞ্জাবির আঁচল বা হাতা কমপক্ষে কনুইকে ঢেকে রাখতে হবে। কেননা, নামাজে বক্ষ ও কনুই খোলা রাখা মাকরূহ। টুপির সাথে যদি পাগড়ি থাকে তবে আরো ভালো। তবে টুপি ছাড়া শুধু পাগড়ি পরা কেউ কেউ বিদআত বলেছেন। ইমাম যদি শুধু টুপি পরিধান করে তবে মুক্তাদী পাগড়ি পরার মাঝে কোনো সমস্যা নেই। মহিলাদের জন্য উভয় পা, হাতের তালু এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা ফরজ।

قَوْلُهُ وَالنَّظَرُ إِلَى السَّمَاءِ الخ :

নামাজে আকাশের দিকে দেখা মাকরূহ : নামাজে আকাশের দিকে দৃষ্টি করা মাকরূহ। রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْتَفِعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ وَقَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ ذٰلِكَ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ .

অর্থাৎ এ জাতির কি হলো যে, তারা নামাজে তাদের দৃষ্টিকে আকাশের দিকে উঠায়! তিনি বলেন, তারা যেন তা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিকে তুলে নেওয়া হবে। –[বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ]

তা ছাড়া নামাজে এদিক-সেদিক কিংবা আকাশের দিকে তাকানোর দ্বারা খুশুখুযু নষ্ট হয়ে যায়। অথচ নামাজে খুশুখুযু'ই উদ্দেশ্য। অনুরূপ পাগড়ির পেঁচের উপর সিজদা করা মাকরূহ। তবে গরমের কারণে কিংবা জমিন শক্ত হওয়ার কারণে যদি পাগড়ির পেঁচের উপর সিজদা করে তবে মাকরূহ হবে না।

وَعَدُّ الْآيِ وَالتَّسْبِيْحِ فِيْهَا وَلِبْسُ ثَوْبٍ ذِىْ صُوْرَةٍ وَالْوَطْئُ وَالْبَوْلُ وَالتَّخَلِّىْ فَوْقَ الْمَسْجِدِ وَغَلْقُ بَابِهٖ لَا نَقْشُهٗ بِالْجَصِّ وَالسَّاجِ وَمَاءِ الذَّهَبِ وَقِيَامُهٗ فِيْهِ سَاجِدًا فِىْ طَاقِهٖ وَصَلٰوتُهٗ اِلٰى ظَهْرِ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ اِلَّا اِذَا رَفَعَ صَوْتَهٗ بِالْحَدِيْثِ لِاَنَّهٗ رُبَمَا يَصِيْرُ ذٰلِكَ سَبَبًا لِقَطْعِ الصَّلٰوةِ وَعَلٰى بِسَاطٍ ذِىْ صُوْرَةٍ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهَا وَصُوْرَةٍ صَغِيْرَةٍ لَا تَبْدُوْ لِلنَّاظِرِ وَتِمْثَالِ غَيْرِ حَيَوَانٍ اَوْ حَيَوَانٍ مُحِىَ رَأْسُهٗ وَقَتْلُ حَيَّةٍ اَوْ عَقْرَبٍ فِيْهَا وَالْبَوْلُ فَوْقَ بَيْتٍ فِيْهِ مَسْجِدٌ اَىْ مَكَانٌ اُعِدَّ لِلصَّلٰوةِ وَجُعِلَ لَهٗ مِحْرَابٌ وَاِنَّمَا قُلْنَا هٰذَا لِاَنَّهٗ لَمْ يُعْطَهٗ حُكْمُ الْمَسْجِدِ ـ

অনুবাদ : নামাজে আয়াত ও তসবিহ গণনা করা, ছবিবিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা, মসজিদের ছাদে সহবাস, পেশাব ও পায়খানা করা এবং মসজিদের গেট বন্ধ করা [মাকরূহ]। চুনা, সুরকি ও স্বর্ণের পানি দ্বারা মসজিদকে নকশা করা মাকরূহ নয়। ইমাম নামাজে এমনভাবে দাঁড়ানো যে, মিহরাবে সিজদা করে [তবে মাকরূহ নয়]। বসে আলোচনায় লিপ্ত কোনো ব্যক্তির পিঠের দিকে ফিরে নামাজ পড়া মাকরূহ নয়। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি উঁচু আওয়াজে কথা বলে [তবে তার পিঠের দিকে ফিরে নামাজ পড়া মাকরূহ হবে]। কেননা, কখনো উঁচু আওয়াজ নামাজ ভঙ্গের কারণ হয়। প্রাণীর ছবিবিশিষ্ট বিছানায় নামাজ পড়া মাকরূহ নয়– যদি ছবির উপর সিজদা না দেওয়া হয় এবং এমন ছোট ছবিবিশিষ্ট বিছানায়ও নামাজ পড়া মাকরূহ নয় যা দেখা যায় না। প্রাণহীন জিনিসের ছবি কিংবা মাথা কাটা প্রাণীর ছবিও মাকরূহ নয়। নামাজে থাকাবস্থায় সাপ-বিচ্ছু মারা মাকরূহ নয়। এমন ঘরের ছাদে পেশাব করা মাকরূহ নয় যাতে মসজিদ রয়েছে। অর্থাৎ এমন জায়গা যা নামাজের জন্য নির্ধারিত এবং এর মিহরাব বানানো হয়েছে। [শারেহ (র.) বলেন,] এটি আমরা এজন্য বলেছি যে, এটি মসজিদের হুকুমে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَعَدُّ الْآيِ وَالتَّسْبِيْحِ فِيْهِ :

নামাজে আয়াত ও তসবিহ গণনা করা মাকরূহ : নামাজে কুরআনের আয়াত কিংবা তসবিহ হাত [illegible] কিংবা আঙ্গুল দ্বারা কিংবা বিচি দ্বারা গণনা করা মাকরূহ। তবে আঙ্গুলের মাথা চেপে কিংবা অন্তরে স্মরণ রেখে গণনা করা মাকরূহ নয় এবং কথায়-ভাষায় গণনা করা নামাজ ভঙ্গের কারণ। তাছাড়া এমনটি করা খুশুখুযুর পরিপন্থি। আর এ কারাহাত ফরজ নামাজের সাথে খাস নয়; বরং এ হুকুম ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল সমস্ত নামাজে বরাবর। কিন্তু কেউ বলেন, নফল নামাজে তা মাকরূহ নয়। এ মাসআলা নামাজের সাথে সুনির্দিষ্ট। আর যদি নামাজের বাইরে হয় তবে যেভাবে ইচ্ছা গণনা করা মাকরূহ।

قَوْلُهٗ وَلِبْسُ ثَوْبٍ ذِىْ صُوْرَةٍ :

ছবিবিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা মাকরূহ : যে কাপড়ে প্রাণীর ছবি রয়েছে তা পরিধান করে নামাজ পড়া মাকরূহ। এ মাসআলা থেকে এটি বুঝা গেছে যে, প্রাণীর ছবিবিশিষ্ট জায়নামাজে নামাজ পড়া মাকরূহ। তাই প্রাণীর ছবিবিশিষ্ট কাপড় পরিধান করে নামাজ পড়া আরো অধিকতর মাকরূহ হয়। কিন্তু যদি ছবিটি কাপড়ের এমন জায়গায় হয়, যা দেখা যায় না। যেমন– বগলের নীচে কিংবা কাপড়ের নীচের পার্টে তবে তা মাকরূহ হবে না।

قَوْلُهٗ وَالْوَطْئُ وَالْبَوْلُ وَالتَّخَلِّىْ الخ :

মসজিদের ছাদে সহবাস ও পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ : মসজিদের ছাদে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা কিংবা পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ। কেননা, মসজিদের ছাদও মসজিদেরই হুকুমে হয়। কারণ, যদি ইমাম নীচে হয় তবুও ছাদে ইমামের ইকতেদা করা জায়েজ। আর ই'তিকাফকারী যদি ছাদে উঠে তবে কোন সমস্যা হবে না। আর জুনূবী ব্যক্তির সেখানে অবস্থান করা জায়েজ নেই। এ মাসআলা যদিও নামাজের মাকরূহসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তবুও মসজিদ যেহেতু নামাজের স্থান আর এটি মসজিদের সাথে সম্পর্কিত মাসআলা, তাই এর বর্ণনাও দেওয়া হলো।

قَوْلُهُ وَغَلْقُ بَابِهِ :

মসজিদের দরজা বন্ধ করা মাকরূহ : অর্থাৎ মসজিদের দরজায় তালা লাগানো মাকরূহ। কেননা, এতে নামাজ থেকে নিষেধ করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ

অর্থাৎ "যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা প্রদান করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে?" –[সূরা বাকারা : ১১৪]

কিন্তু যদি মসজিদের দরজা খোলা থাকলে মসজিদের মালামাল চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে মসজিদের দরজা বন্ধ করা মাকরূহ নয়; বরং সামান-পত্রের হেফাজতের জন্য তা জরুরি। তবে শর্ত হচ্ছে, তা নামাজের ওয়াক্ত ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তে হতে হবে এবং নামাজের ওয়াক্তে মসজিদের দরজা খোলা রাখতে হবে।

قَوْلُهُ لَانَقْشُهُ بِالْجَصِّ الخ :

যেসব বিষয় মাকরূহ নয় : চুনা, সুরকি ও স্বর্ণের পানি দ্বারা মসজিদকে সজ্জিত করা মাকরূহ নয়। ইমাম মসজিদে দাঁড়িয়ে মিহরাবে সিজদা করা মাকরূহ নয়। আলোচনায় লিপ্ত ব্যক্তির পিঠের দিকে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া মাকরূহ নয়। শর্ত হলো কথা আস্তে আস্তে বলতে হবে। এমন ছবিবিশিষ্ট বিছানায় নামাজ পড়া মাকরূহ নয়, যে ছবির উপর সিজদা করতে হয় না। ছোট প্রাণীর ছবি, যা দৃষ্টিগোচর হয় না তা মাকরূহ নয়। প্রাণহীন বস্তুর ছবি কিংবা প্রাণীর ছবি তবে মাথা কাটা, তাহলে মাকরূহ নয়। নামাজে সাপ-বিচ্ছু মারা মাকরূহ নয়। যে ঘরে মসজিদ রয়েছে সে ঘরের ছাদে পেশাব করা মাকরূহ নয়।

তবে কোনো কোনো ফকীহের অভিমত হচ্ছে, মসজিদকে সজ্জিত করা বিশেষভাবে মিহরাবকে সজ্জিত করা মাকরূহ। কেননা, এতে মুসল্লিদের খুশুখুযু বাকি না থাকার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, নামাজ পড়ার সময় সম্ভাবনা রয়েছে যে, নকশা ও কারুকার্য মুসল্লির দৃষ্টিতে পড়বে। ফলে তার মনোযোগ এরই প্রতি থাকবে। নামাজে যে খুশুখুযু উদ্দেশ্য তা ছুটে যাবে। তাই মসজিদকে সজ্জিত করা যদিও মাকরূহ নয়; বরং জায়েজ, কিন্তু তা অনুত্তম।

قَوْلُهُ وَصَلٰوتُهُ إِلٰى ظَهْرِ قَاعِدٍ : কোনো ব্যক্তি যদি কিবলার দিকে মুখ করে বসে কথা বলে কিংবা কথা বলে না; বরং চুপ করে বসে থাকে তবে তার পিঠের দিকে মুখ করে নামাজ পড়া মাকরূহ নয়। এখানে বসার শর্তটি إِتِّفَاقِىْ। অন্যথায় দাঁড়ানো ও শোয়ার হুকুমও এমনই। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি কিবলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিবলার দিকে পিঠ দেয় তবে তার চেহারার দিকে ফিরে নামাজ পড়া জায়েজ নেই।

কোনো কোনো লোক নামাজ থেকে অবসর হয়ে পিছনের দিকে ফিরে দেখে, যদি পিছনের মুসল্লির নামাজ শেষ হয়ে যায় তবে সে চলে যায় কিংবা নামাজ শেষ না হলে পিছনের মুসল্লির দিকে ফিরে তার নামাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করে– এটি বড়ই মন্দ কথা; বরং তার দিকে পিঠ করে কিবলার দিকে মুখ করে তার নামাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে মূলকথা হচ্ছে, যদি উভয়ে কিবলার দিকে মুখ করে থাকে তবে উভয়ে ইবাদতরত অবস্থায় থাকছে। আর যদি একজন কিবলার দিকে ফিরে নামাজ পড়তে থাকে আর অপরজন কিবলার দিকে পিঠ করে ঐ ব্যক্তির নামাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে তবে নামাজরত ব্যক্তি হচ্ছে আবিদ আর সামনে তার দিকে মুখ করে বসা ব্যক্তি হয়ে যাচ্ছে মা'বুদ। তাই কোনো কোনো ফকীহ এমন সুরতকে হারাম ও শিরক সদৃশ বলেছেন।

قَوْلُهُ وَعَلٰى بِسَاطٍ ذِىْ صُوْرَةٍ : অর্থাৎ এমন বিছানায় নামাজ পড়া মাকরূহ নয় যার মাঝে প্রাণীর ছবি রয়েছে। শর্ত হলো, ঐ ছবির উপর সিজদা না করতে হবে। অর্থাৎ ঐ ছবি পায়ের নীচে কিংবা বসার জায়গায় হলে নামাজ মাকরূহ হবে। তবে মসজিদে ছবিবিশিষ্ট বিছানা রাখা মূর্তিপূজার সাথে সামঞ্জস্য হয়ে যায়, তাই তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

قَوْلُهُ وَصُوْرَةٍ صَغِيْرَةٍ الخ :

ছোট প্রাণীর ছবি রাখা মাকরূহ নয় : অত্যন্ত ছোট ছবি যা দেখা যায় না তা রাখা মাকরূহ নয়। অনুরূপ প্রাণহীন জিনিসের ছবি যেমন– গাছ, পাহাড়, মসজিদ ও বাগান ইত্যাদির ছবি রাখাও মাকরূহ নয় এবং এসব ছবি সামনে রেখে নামাজ পড়াও মাকরূহ নয়; বরং তা ঘরের সজ্জার জন্য উত্তম। অনুরূপ যদি প্রাণীর ছবি এমন হয় যে, এর মাথা কাটা তবে তা রাখাও মাকরূহ নয়। কিন্তু শুধু হাত কিংবা পা মুছে দেওয়ার পরও মাকরূহ থাকবে। কেননা, অনেক প্রাণী এমন আছে যে, এর হাত-পা কেটে দেওয়ার পরও তা জীবিত থাকে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَقَتْلُ حَيَّةٍ أَوْ عَقْرَبٍ الخ : যদি নামাজরত অবস্থায় কেউ সাপ কিংবা বিচ্ছু দেখে এবং আশঙ্কা করে যে, তা দংশন করবে তবে মেরে ফেলা মাকরূহ নয়। যদিও এজন্য আমলে কাছীর করতে হয়। এর দ্বারা নামাজ মাকরূহও হয় না এবং নামাজ ভাঙ্গেও না। রাসূল ﷺ বলেছেন– اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ "নামাজে দুই কালো [সাপ ও বিচ্ছু]-কে মেরে ফেল।" –[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

قَوْلُهُ وَالْبَوْلُ فَوْقَ بَيْتٍ فِيْهِ مَسْجِدٌ الخ : অর্থাৎ এমন ঘরের ছাদে পেশাব করা মাকরূহ নয়, যার একটি কক্ষ নামাজের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছে। অনুরূপ এর ছাদে পায়খানা ও সহবাস করাও জায়েজ। যদিও উক্ত নামাজের কক্ষে মিহরাবও বানিয়ে থাকে। কেননা, মূলত সেটি মসজিদের হুকুমে নয়। কারণ ঐ জায়গা বিক্রি করার সময় নামাজের জায়গাটিও বিক্রি করা জায়েজ।

بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ

اَلْوِتْرُ ثَلٰثُ رَكَعَاتٍ وَجَبَتْ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَمَّا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) فَهُوَ سُنَّةٌ بِسَلَامٍ اَىْ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) وَيَقْنُتُ قَبْلَ رُكُوْعِ الثَّالِثَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فَاِنَّ الْقُنُوْتَ عِنْدَهٗ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَيُكَبِّرُ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ يَقْنُتُ فِيْهِ اَبَدًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فَاِنَّ قُنُوْتَ الْوِتْرِ عِنْدَهٗ فِى النِّصْفِ الْاَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ فَقَطْ دُوْنَ غَيْرِهٖ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فِى الْفَجْرِ وَيَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً وَيَتَّبِعُ الْقَانِتَ بَعْدَ رُكُوْعِ الْوِتْرِ لَا الْقَانِتَ فِى الْفَجْرِ بَلْ يَسْكُتُ اَىْ اِنْ قَرَأَ الْاِمَامُ قُنُوْتَ الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَتَّبِعُهُ الْمُقْتَدِىْ وَاِنْ قَنَتَ الْاِمَامُ فِى الْفَجْرِ لَا يَتَّبِعُهُ الْمُقْتَدِىْ بَلْ يَسْكُتُ وَالْاَصَحُّ اَنَّهٗ يَسْكُتُ قَائِمًا وَسُنَّ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ رَكْعَتَانِ وَقَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا اَرْبَعٌ بِتَسْلِيْمَةٍ وَحُبِّبَ الْاَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَبَعْدَهٗ ـ

পরিচ্ছেদ : বিতর ও নফল নামাজ

অনুবাদ : বিতরের নামাজ তিন রাকাত ওয়াজিব। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। পক্ষান্তরে সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট তা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। [বিতরের নামাজ] এক সালামে। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। তৃতীয় রাকাতের পূর্বে দোয়ায়ে কুনূত পড়বে। এতেও ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা, তাঁর নিকট কুনূত রুকুর পর পড়বে। উভয় হাত উঠিয়ে তাকবীর বলবে। অতঃপর সর্বদা দোয়া কুনূত পড়বে। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা, তাঁর নিকট শুধু রমজানের শেষ পনেরো দিনের বিতরে দোয়ায়ে কুনূত পড়বে। বিতর ব্যতীত অন্য কোনো নামাজে দোয়ায়ে কুনূত পড়বে না। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। কারণ, তাঁর নিকট ফজরের নামাজেও কুনূত পড়বে। বিতরের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বে। বিতরের নামাজে রুকুর পর মুক্তাদীও কুনূত পড়ুয়া ইমামের অনুসরণ করবে। তবে ফজরের নামাজে কুনূত পড়ুয়া ইমামের অনুসরণ মুক্তাদী করবে না; বরং চুপ থাকবে। অর্থাৎ যদি ইমাম বিতরের নামাজে রুকুর পর কুনূত পড়ে তবে মুক্তাদীও তার অনুসরণ করে কুনূত পড়বে। আর যদি ইমাম ফজরের নামাজে কুনূত পড়ে তবে মুক্তাদী তার অনুসরণ করবে না; বরং চুপ থাকবে। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। ফজরের পূর্বে, জোহর, মাগরিব ও ইশা'র পরে দুই দুই রাকাত করে নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। জোহরের পূর্বে এবং জুমার পূর্বাপরে চার চার রাকাত করে এক সালামে [সুন্নত]। আসরের পূর্বে এবং ইশার পূর্বাপরে চার চার রাকাত করে নামাজ মোস্তাহাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْوِتْرُ ثَلٰثُ رَكَعَاتٍ الخ :

বিতর ও নফল নামাজ : বিতর হলো ঐ নামাজ, যা ইশার পর আদায় করা হয়। নফল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– যা ফরজ নয়, ওয়াজিব নয় এবং সুন্নতও নয়। যদিও সুন্নত নফলের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ পরিচ্ছেদে নফল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– যা ওয়াজিব নয় এমনকি সুন্নতও নয়।

قَوْلُهٗ اَلْوِتْرُ ثَلٰثُ رَكَعَاتٍ الخ :

বিতরের রাকাত সংখ্যা : বিতরের রাকাত সংখ্যা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে এবং বিতর এক সালামে না দুই সালামে এ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিতর এক রাকাত থেকে সাত রাকাত পর্যন্ত পড়তে পারবে। ওলামায়ে আহনাফ বলেন, বিতর তিন রাকাত।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, ঐ সমস্ত রেওয়ায়েত যেগুলোতে اَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ থেকে নিয়ে اَوْتَرَ بِسَبْعٍ পর্যন্ত শব্দ বর্ণিত আছে।

ওলামায়ে আহনাফের দলিল হলো- كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثِ رَكْعَاتٍ অর্থাৎ "হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ বিতর তিন রাকাত আদায় করতেন।" -[নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদ]

হযরত হাসান বসরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন- اَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى اَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَا سَلَامَ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ

অর্থাৎ "মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, বিতর তিন রাকাত। শুধু শেষ রাকাতে সালাম।" -[বাদায়িউস সানায়ে'- ১: ৬০৯]

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হিসেবে পেশ করা হাদীসটি- বিতরের রাকাত ও বিষয়টি দৃঢ় হওয়ার পূর্বের বিষয়। এর দলিল হচ্ছে, আমাদের পেশকৃত হাদীসদ্বয়।

-[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ফাতহুল কাদীর- ১ : ৪৪২, বাদায়িউস সানায়ে'- ১ : ৬০৯, বাহরুর রায়িক- ২ : ৬৮, মাআরিফুস সুনান- ৪ : ২১৮, দরসে তিরমিযী- ২ : ২১৫]

বিতরের হুকুম : বিতরের হুকুম সম্পর্কেও ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিরবণ নিম্নরূপ।

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, বিতর সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমামত্রয় ও সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, বিতরের মধ্যে সুন্নতের নমুনা রয়েছে। যেমন- সুন্নতের ন্যায় বিতর অস্বীকারকারী কাফের হয় না। এমনিভাবে বিতরের জন্য স্বতন্ত্র কোনো আজান দেওয়া হয় না। যেমনিভাবে সুন্নতের জন্য আজান দেওয়া হয় না। এর দ্বারা বুঝা গেল, বিতর সুন্নত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন-

اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا .

অর্থাৎ "বিতর হক, যে ব্যক্তি বিতরের নামাজ পড়ল না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" -[আবূ দাউদ শরীফ]

অন্যত্র ইরশাদ করেন- اَوْتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا অর্থাৎ "সকাল হওয়ার আগে আগেই বিতর পড়ে নাও।" -[মুসলিম ও আবূ দাউদ]

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, বিতরের নামাজ ওয়াজিব।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ : ইমামত্রয় ও সাহেবাইন (র.)-এর পেশকৃত দলিলের খণ্ডন হচ্ছে, বিতর অস্বীকারকারী ব্যক্তি এজন্য কাফের হয় না যে, বিতরের প্রামাণ্য হলো- سُنَّةٌ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ দ্বারা, যা দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।

-[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- ফাতহুল কাদীর- ১ : ৪৩৬, বাহরুর রায়িক- ২ : ৬৫, মাআরিফুস সুনান- ৪ : ১৭১, দরসে তিরমিযী- ২ : ২০৭]

قَوْلُهُ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) : বিতরের নামাজ এক সালামে নাকি দুই সালামে- এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আহনাফ বলেন, বিতর তিন রাকাত এক সালামে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিতর তিন রাকাত দুই সালামে। প্রথম দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলবে। অতঃপর উঠে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত আরেক রাকাত পড়বে এবং সালাম ফিরাবে।

কুনূত ও কুনূতের স্থলে অন্য দোয়া : কুনূত হচ্ছে ঐ দোয়া যা হানাফী ইমামদের থেকে বর্ণিত আছে। তা হচ্ছে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ .

কিংবা এই দোয়া পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ فَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ وَتَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ .

এ দোয়া শাফেয়ী ওলামায়ে কেরাম ফজরের নামাজে পড়তেন। উত্তম হলো, দোয়া কুনূত ও পরের দোয়া উভয়টি পড়বে। যে ব্যক্তির উল্লিখিত দোয়া দুটি মুখস্থ নেই সে رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ পড়বে, এক অভিমত অনুযায়ী اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ তিনবার বলবে। অপর অভিমত অনুযায়ী يَا رَبِّ তিনবার বলবে। তবে এসবই নিচু আওয়াজে পড়বে, উঁচু আওয়াজে নয়।

কুনূত পড়ার স্থল : কুনূত পড়ার স্থল সম্পর্কে আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আহনাফ বলেন, রুকুর পূর্বে কুনূত পড়বে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কুনূত পড়বে রুকুর পরে।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো– اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَنَتَ فِىْ اٰخِرِ الْوِتْرِ অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতরের শেষে কুনূত পড়তেন।" –[মুসলিম শরীফ]

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, বিতরের শেষ বা সমাপ্তি রুকুর পরই হয়ে থাকে।

আহনাফের দলিল হলো, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত– اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর পড়তেন এবং রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তেন।" এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুনূত রুকুর পূর্বে পড়া হয়।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পেশকৃত দলিলের জবাব হলো, হাদীসের মধ্যে قَنَتَ فِىْ اٰخِرِ الْوِتْرِ শব্দ এসেছে। উল্লেখ্য যে, কোনো জিনিসের অর্ধেকের বেশি যা হয় তার উপর اٰخِر শব্দটির প্রয়োগ হতে পারে। সুতরাং এ হাদীসও আমাদের মতের বিরোধী হয় না।

কুনূত শুধু বিতরের নামাজে এবং সারা বছর পড়বে : কুনূত পড়ার সময়কাল ও বিতর ব্যতীত অন্যান্য নামজে কুনূত পড়বে কিনা? এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু রমজানের শেষ পনেরো দিনে বিতরের নামাজে কুনূত পড়বে এবং ফজরের নামাজেও কুনূত পড়বে। ওলামায়ে আহনাফ বলেন, শুধু বিতরের নামাজে সারা বছর কুনূত পড়বে; ফজরের নামাজে নয় এবং শুধু রমজান মাসেও নয়।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো–

اِنَّ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِى التَّرَاوِيْحِ وَيَقْنُتُ فِىْ نِصْفِ الْاٰخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَقَطْ.

অর্থাৎ "হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) তারাবীহের ইমামতি করতেন এবং শুধু রমজানের শেষ পনেরো দিনে বিতরে কুনূত পড়তেন।" –[আবূ দাঊদ শরীফ]

উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শুধু রমজান মাসের শেষ পনেরো দিনের বিতরে কুনূত পড়বে। ফজরের নামাজে কুনূত পড়ার ব্যাপারে আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দাবি হলো–রাসূল ﷺ ফজরের নামাজেও কুনূত পড়তেন। অতএব, ফজরের নামাজেও কুনূত পড়া হবে। তা ছাড়া হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত– اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَنَتَ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ এক মাস ব্যাপী ফজরের নামাজে কুনূত পড়েছেন। অতঃপর তা ছেড়ে দিয়েছেন।"

ওলামায়ে আহনাফের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাসান ইবনে আলীকে দোয়ায়ে কুনূতের তা'লীম দিয়েছেন। অতঃপর বলেছেন– اِجْعَلْ هٰذَا فِىْ وِتْرِكَ অর্থাৎ "এ দোয়াকে তোমার বিতরের মধ্যে পড়বে।" উক্ত হাদীসে রমজান কিংবা গায়রে রমজানের কোনো ব্যবধান নেই। সুতরাং সারা বছরই দোয়ায়ে কুনূত পড়তে হবে। আর ফজরে কুনূত পড়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) যে দলিল পেশ করেছেন সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গে। অচিরেই আমরা তা উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পেশকৃত হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর হাদীসে কুনূত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাজে দীর্ঘ কেরাত (طُوْلُ الْقِرَاءَةِ) পড়া। হযরত উবাই ইবনে কা'বকে রমজানের শেষার্ধে দীর্ঘ কেরাত পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন– لَا اَعْرِفُ الْقُنُوْتَ اِلَّا طُوْلَ الْقِيَامِ অর্থাৎ "আমার মতে طُوْل قِيَامْ ব্যতীত কুনূতের ভিন্ন কোনো অর্থ নেই।"

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) ফজরে কুনূত পড়ার ব্যাপারে যে দলিল পেশ করেছেন, এর উত্তর হচ্ছে, রাসূল ﷺ কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক মাস পর্যন্ত দোয়া কুনূত পড়েছেন, অতঃপর ছেড়ে দিয়েছেন। তবে সে কুনূত ছিল কুনূতে নাজেলাহ। ফজরের কুনূত সম্পর্কিত সমস্ত হাদীস এই কুনূতে নাজেলার ব্যাপারে প্রযোজ্য।

বিতরের সুন্নত কেরাত : বিতরের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়া আবশ্যক। তবে সুন্নত কেরাত সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীস রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ .

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ বিতর তিন রাকাত পড়তেন। প্রথম রাকাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى দ্বিতীয় রাকাতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ এবং তৃতীয় রাকাতে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ও مُعَوِّذَتَيْنِ তথা সূরায়ে ফালাক ও নাস পড়তেন।" –[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে– "রাসূল ﷺ প্রথম রাকাতে সূরা কাদ্র, যিলযাল ও তাকাছুর, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আসর, কাউছার ও নাসর এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা কাফিরূন, লাহাব ও ইখলাস পড়তেন।" –[মুসনাদে আহমদ]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে– "রাসূল ﷺ প্রথম রাকাতে سَبِّحِ اسْمَ দ্বিতীয় রাকাতে সূরা كَافِرُوْن এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়তেন।" –[তিরমিযী শরীফ]

উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী যদি কেউ সুন্নত হওয়ার নিয়তে আমল করে তবে তার ছওয়াব হবে, যদিও তা সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে কোনো قَطْعِي دَلِيل নেই। কারণ, রাসূল ﷺ -এর উপর স্থায়ীভাবে আমল করেননি এবং কাউকে তা শিক্ষাও দেননি তাই ফতোয়া এটাই যে, বিতরে কোনো সূরা নির্ধারিত নেই; বরং যে সূরা ইচ্ছা পড়তে পারবে।

قَوْلُهُ وَيَتَّبِعُ الْقَانِتَ بَعْدَ : ইমাম যদি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হন, আর মুক্তাদী হানাফী মাযহাবের এবং ইমাম বিতরে রুকুর পর কুনূত পড়েন তবে মুক্তাদীও ইমামের অনুসরণে কুনূত পড়বে। কিন্তু যদি ইমাম ফজরের নামাজে কুনূত পড়েন তবে মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে না এবং কুনূতও পড়বে না; বরং চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। এর দ্বারা বুঝা যায়, শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ইমামের পিছনে হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুক্তাদী ইকতেদা করা বৈধ। আর যদি ইমাম হানাফী মাযহাবের অনুসারী হন, তবে তিনি রুকুর পূর্বে কুনূত পড়বেন এবং তার অনুসরণ করা তো ওয়াজিব। কিন্তু যদি ইমাম কুনূত পড়া ব্যতীত রুকুতে চলে যান অতঃপর রুকুতে কুনূতের কথা স্মরণ হয়, তবে সে কুনূত পড়বে না; বরং পরবর্তীতে সিজদায়ে সাহু করবে কুনূতের কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে যদি রুকু থেকে ফিরে এসে কুনূত পড়ে তবে নামাজ ভাঙ্গবে না। তবে তার জন্য এমনটি না করা উচিত ছিল। কেননা, এর দ্বারা সে ফরজ থেকে ওয়াজিবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। –[দুররুল মুখতার]

শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ইমামের পিছনে হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুক্তাদী বিতরে রুকুর পরে কুনূত পড়ার ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করা আবশ্যক। এজন্য যে, রুকুর পরে কুনূত পড়া একটি ইজতিহাদী (اِجْتِهَادِيْ) মাসআলা। এটি আবশ্যকীয় কিছু নয় এবং সুন্নাতের পরিপন্থিও নয়। তাই এ ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে ইমামের পরিপন্থি কিছু করবে না।

পক্ষান্তরে ফজরের কুনূত আমাদের নিকট মানসূখ [রহিত] হয়ে গেছে। রাসূল ﷺ তা করেছেন এবং ছেড়ে দিয়েছেন। রহিত বিষয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হয় না। যেমন– জানাজা নামাজে যদি ইমাম পঞ্চম তাকবীর বলেন তবে পঞ্চম তাকবীর যেহেতু রহিত হয়ে গেছে, তাই এক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করা হবে না।

قَوْلُهُ وَسُنَّ قَبْلَ الْفَجْرِ الخ :

সুন্নতের প্রকারভেদ : সুন্নত দু প্রকার– ১. সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ২. সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা। সুন্নতে মুয়াক্কাদা ঐ সুন্নতকে বলা হয়, যা রাসূল ﷺ সর্বদা করেছেন। তবে কখনো কখনো তা ছেড়েও দিয়েছেন। আর সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা বলা হয়, যা রাসূল ﷺ সর্বদা করেননি।

সুন্নতে মুয়াক্কাদা মোট বারো রাকাত : ফজরের পূর্বে দুই রাকাত, জোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত ও ইশার পরে দুই রাকাত। এগুলো হচ্ছে দৈনন্দিনের সুন্নতে মুয়াক্কাদা। তা ছাড়া জুমার ফরজের পূর্বে ও পরে চার চার রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা এবং তারাবীহের নামাজও সুন্নতে মুয়াক্কাদা। উল্লিখিত সুন্নতে মুয়াক্কাদা ব্যতীত বাকি সবই সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা।

হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে এক সালামে চার রাকাত পড়ে, তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। –[আবূ দাউদ শরীফ]

জুমার পূর্বাপরের সুন্নত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ জুমার পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত পড়তেন। –[তিরমিযী শরীফ]

সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা : আসরের পূর্বে চার রাকাত, ইশার পূর্বে চার রাকাত এবং ইশার পরে চার রাকাত সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা। হাদীসে বর্ণিত আছে, 'আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন, যে আসরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়ে।' –[তিরমিযী শরীফ] হযরত সা'দ ইবনে মানসূর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ইশার পর বার রাকাত নামাজ পড়ে, সে যেন কদরের রাতে নামাজ পড়ল। অর্থাৎ সে কদরের রাতের নামাজের ছওয়াব পাবে।

وَكُرِهَ مَزِيْدُ النَّفْلِ عَلٰى أَرْبَعٍ بِتَسْلِيْمَةٍ نَهَارًا أَوْ عَلٰى ثَمَانٍ لَيْلًا وَالْأَرْبَعُ أَفْضَلُ فِى الْمَلْوَيْنِ وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَرْضِ وَكُلٍّ مِنَ الْوِتْرِ وَالنَّفْلِ وَلَزِمَ إِتْمَامُ نَفْلٍ شَرَعَ فِيْهِ قَصْدًا اِحْتِرَازٌ عَنِ الشُّرُوْعِ ظَنًّا كَمَا إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَرْضَ الظُّهْرِ فَشَرَعَ فِيْهِ فَيُذْكَرُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّاهُ صَارَ مَا شَرَعَ فِيْهِ نَفْلًا لَا يَجِبُ إِتْمَامُهُ حَتّٰى لَوْ نَقَضَهُ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ وَلَوْ عِنْدَ الطُّلُوْعِ وَالْغُرُوْبِ وَقَضٰى رَكْعَتَانِ لَوْ نَقَضَ فِى الشَّفْعِ الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِىْ يَعْنِىْ شَرَعَ فِىْ أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ مِنَ النَّفْلِ وَأَفْسَدَهَا فِى الشَّفْعِ الْأَوَّلِ يَقْضِى الشَّفْعَ الْأَوَّلَ لَا الثَّانِىَ خِلَافًا لِأَبِىْ يُوْسُفَ (رح) لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ فِى الشَّفْعِ الثَّانِىْ ـ

অনুবাদ : দিনে এক সালামে চার রাকাতের চেয়ে বেশি নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। রাতে এক সালামে আট রাকাতের বেশি পড়া মাকরূহ। দিবারাত্রে এক সালামে চার রাকাত পড়াই উত্তম। ফরজ নামাজে দুই রাকাতে এবং বিতর ও নফল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে কেরাত পড়া ফরজ। নফলের নিয়ত করে যে নামাজ শুরু করেছে, তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। যদিও তা সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের সময় শুরু করা হোক না কেন। নফলের নিয়ত করে নামাজ শুরু করার কথা বলে গ্রন্থকার ধারণামূলক নফল শুরু করা থেকে বিরত থেকেছেন। যেমন– কেউ ধারণা করল যে, সে জোহরের ফরজ নামাজ পড়েনি, তাই সে ফরজ নামাজ শুরু করে দিয়েছে, এখন তার স্মরণ হয়েছে যে, সে জোহরের ফরজ পড়েছে। তবে যে নামাজ সে শুরু করেছিল, তা নফল নামাজ হয়ে যাবে এবং তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব নয়। এমনকি যদি সে নামাজ ভেঙ্গে ফেলে তবে তা কাজা করা ওয়াজিব হবে না। প্রথম শুফা' কিংবা দ্বিতীয় শুফা'য় যদি নামাজ ভেঙ্গে ফেলে তবে দুই রাকাত কাজা করতে হবে। অর্থাৎ যদি চার রাকাত নফল নামাজ শুরু করে এবং প্রথম শুফা'য় [প্রথম দুই রাকাত] -এ নামাজ ভেঙ্গে দেয় তবে সে শুধু প্রথম শুফা'ই কাজা করবে; দ্বিতীয় শুফা' নয়। এতে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। কারণ [দ্বিতীয় শুফা'কে কাজা না করার কারণ] সে দ্বিতীয় শুফা' শুরু করেনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكُرِهَ مَزِيْدُ النَّفْلِ الخ :

নফল পড়ার পদ্ধতি : দিনে নফল নামাজ এক সালামে সর্বোচ্চ চার রাকাত পড়া যায়। এক সালামে চার রাকাতের চেয়ে বেশি পড়া মাকরূহ। অনুরূপ রাতে নফল নামাজ এক সালামে আট রাকাত পড়া যায়। তবে এক সালামে আট রাকাতের চেয়ে বেশি পড়া মাকরূহ। কেননা, রাসূল ﷺ থেকে এ কথা প্রমাণিত নয় যে, দিনে এক সালামে চার রাকাতের চেয়ে বেশি নফল নামাজ কিংবা রাতে এক সালামে আট রাকাতের চেয়ে বেশি নফল নামাজ পড়েছেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত মাকরূহ হচ্ছে, মাকরূহে তানযীহী; তাহরীমী নয়।

দিবারাত্রে চার রাকাত করে নফল পড়া উত্তম : নফল নামাজ চাই দিনে হোক কিংবা রাতে হোক– ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এক সালামে চার রাকাত করে পড়া উত্তম। কেননা, এতে অনেক কষ্ট হয়। আর যত বেশি কষ্ট হয়, তত বেশি ছওয়াব হয়। সাহেবাইন (র.) বলেন, দিনে এক সালামে চার রাকাত করে পড়া উত্তম– ঠিক আছে। কিন্তু রাতে দুই দুই রাকাত

করে নফল পড়াও উত্তম। কারণ, হাদীসে এসেছে- صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى অর্থাৎ "রাতের নামাজ দুই দুই রাকাত করে।"-[বুখারী ও মুসলিম]

মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন, সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত বিশুদ্ধ এবং শক্তিশালী।

قَوْلُهُ وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ فِيْ رَكْعَتَيِ الخ :

ফরজের দুই রাকাত এবং বিতর ও নফলের প্রত্যেক রাকাতে কেরাত পড়া ফরজ : ফরজ নামাজের যে-কোনো দুই রাকাতে কেরাত পড়া ফরজ। তবে প্রথম দুই রাকাতকে কেরাতের জন্য নির্ধারণ করা ওয়াজিব। গ্রন্থকার মতনে فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, ফরজ নামাজের যে-কোনো দুই রাকাতে কেরাত পড়া ফরজ। তবে বিতর ও নফল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে কেরাত পড়া ফরজ। কেননা, নফলের প্রতি দুই রাকাতই আলাদা নামাজ। এ কারণেই প্রথম তাহরীমা দ্বারা দুই রাকাত ওয়াজিব হয় যদিও দুই রাকাতের অধিক নিয়ত করে। আর বিতরের প্রত্যেক রাকাতে কেরাত ফরজ হওয়ার কারণ হচ্ছে, নামাজের মধ্যে কেরাত প্রত্যক্ষভাবে রুকন (رُكْن) এবং মূল উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَلَزِمَ اِتْمَامُ نَفْلِ الخ :

নফল নামাজ শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায় : নফল নামাজের নিয়ত করে শুরু করার দ্বারা নফল নামাজ ওয়াজিব হয়ে যায় কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ-

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : হানাফী আলেমদের মতে, নফল নামাজ ও রোজা শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায়। অতএব, শুরু করার পর যদি তা ফাসেদ করে দেয় তবে এর কাজা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, নফল শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয় না। অতএব, যদি কোনো ব্যক্তি নফল নামাজ শুরু করার পর তা ফাসেদ করে দেয় তবে তার উপর এর কাজা ওয়াজিব হবে না।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, নফল আদায়কারী ব্যক্তি নামাজ স্বেচ্ছায় আরম্ভ করে। আর যে স্বেচ্ছায় কিছু করে তার উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ অর্থাৎ "স্বেচ্ছায় পুণ্যকারীদের উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।" [৯ : ৯১] অতএব, নফল শুরুকারীর উপরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

আহনাফ -এর দলিল হলো, নফল আমলটি শুরু করার পরে তা আদায়কৃত আমলের অংশে গণ্য হয়ে গেছে। সুতরাং তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা, আমল নষ্ট না করা জরুরি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ অর্থাৎ "তোমরা স্বীয় আমল নষ্ট করো না।" -[৪৭ : ৩৩]

উক্ত আয়াতে আমল নষ্ট করা থেকে বারণ করা হয়েছে। অথচ নফল আমল শুরু করার পর তা ফাসেদ করে দিলে তা নষ্ট করা হয়। অতএব, এর কাজা ওয়াজিব।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব হচ্ছে, স্বেচ্ছায় নফল আরম্ভকারীর উপর প্রথমে কোনো জিনিস আবশ্যক ছিল না। তবে তা শুরু করার দ্বারা আবশ্যক হয়ে গেছে। আর مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ আয়াতটি নফল শুরু করার আগের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত; পরের অবস্থার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

قَوْلُهُ يَقْضِيْ الشَّفْعَ الْأَوَّلَ لَا الثَّانِيَ خِلَافًا لِأَبِيْ يُوْسُفَ الخ : অর্থাৎ যদি চার রাকাত নফল নামাজের নিয়ত করে এবং প্রথম দুই রাকাতেই তা ভেঙ্গে ফেলে তবে শুধু প্রথম দুই রাকাত কাজা করতে হবে। কেননা, নফলের প্রত্যেক দুই রাকাত ভিন্ন ভিন্ন নামাজ হয়। আর সে চার রাকাত শুরু করার পর প্রথম দুই রাকাতেই ভঙ্গ করে ফেলেছে। অতএব, শুধু এ দুই রাকাতই কাজা করতে হবে। যেহেতু দ্বিতীয় দুই রাকাত শুরু করেনি তাই এর কাজাও ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যেহেতু সে চার রাকাতের নিয়ত করে ফেলেছে, তাই তার উপর চার রাকাতই কাজা করা ওয়াজিব।

وَاِنْ قَعَدَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَقَامَ اِلَى الثَّالِثَةِ وَاَفْسَدَهَا يَقْضِى الشَّفْعَ الْاَخِيْرَ فَقَطْ لِاَنَّ الْاَوَّلَ قَدْ تَمَّ وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى اَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِنَ النَّفْلِ صَلٰوةٌ عَلٰى حِدَةٍ كَمَا لَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ شَفْعَيْهِ اَوِ الْاَوَّلَ اَوِ الثَّانِىَ اَوْ اِحْدَى الثَّانِىْ اَوْ اِحْدَى الْاَوَّلِ اَوِ الْاَوَّلَ وَاِحْدَى الثَّانِىْ لَا غَيْرَ اَىْ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِىْ غَيْرِ هٰذِهِ الصُّوَرِ وَاَرْبَعٌ لَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِىْ اِحْدٰى كُلِّ شَفْعٍ اَوْ فِى الثَّانِىْ وَاِحْدَى الْاَوَّلِ ـ

অনুবাদ : আর যদি দুই রাকাতের পর বসে তাশাহহুদ পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং তা [তৃতীয় রাকাত] ভেঙ্গে ফেলে তবে শুধু দ্বিতীয় শুফা'কে কাজা করবে। কারণ, প্রথম শুফা' পূর্ণ হয়ে গেছে। তা এ ভিত্তিতে যে, নফলের প্রত্যেক শুফা' ভিন্ন ভিন্ন নামাজ। যেমন– যদি নফলের উভয় শুফা'তে কেরাত বর্জন করে কিংবা প্রথম শুফা'তে কেরাত বর্জন করে এবং দ্বিতীয় শুফা'তে কেরাত পড়ে কিংবা দ্বিতীয় শুফা'তে কেরাত বর্জন করে এবং প্রথম শুফা'তে কেরাত পড়ে কিংবা দ্বিতীয় শুফা'র এক রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে এবং প্রথম শুফা'র উভয় রাকাতে কেরাত পড়েছে; কিংবা শুধু প্রথম শুফা'র এক রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে; কিংবা প্রথম শুফা' উভয় রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে– অন্য সুরতে নয়। অর্থাৎ উল্লিখিত সুরতগুলো ব্যতীত অন্য সুরতে দুই রাকাত কাজা নেই। চার রাকাত কাজা করবে যদি প্রত্যেক শুফা'র এক এক রাকাতে কিংবা প্রথম শুফা'র এক রাকাতে ও দ্বিতীয় শুফা'র উভয় রাকাতে কেরাত বর্জন করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنْ قَعَدَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ : অর্থাৎ যদি সে দুই রাকাত পড়ে বসে যায় অতঃপর তৃতীয় রাকাত কিংবা দ্বিতীয় শুফা'র জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং তা ফাসেদ করে দেয় তবে তার উপর শুধু দ্বিতীয় শুফা' কাজা করা ওয়াজিব; প্রথম শুফা' নয়। পক্ষান্তরে যদি দুই রাকাতের পর না বসে এবং সোজা তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, যদিও তা ভুলক্রমে হয়– তবে যদি সে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাকাতে নামাজ ফাসেদ করে দেয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর চার রাকাত কাজা করা ওয়াজিব। কেননা, এতে উভয় শুফা'র মাঝে বৈঠকের মাধ্যমে পার্থক্য করা হয়নি। অতএব, উভয় শুফা' একই হুকুমে হবে।

قَوْلُهٗ وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى اَنَّ كُلَّ شَفْعٍ الخ : অর্থাৎ উভয় সুরতে এক শুফা'কে কাজা করবে এ ভিত্তিতে যে, যদিও উভয় শুফা'কে এক নামাজের নিয়তে শুরু করেছিল, কিন্তু এক শুফা' ফাসেদ হয়ে যাওয়ার দ্বারা দ্বিতীয় শুফা' কাজা করা আবশ্যক হবে না। কেননা, নফলের প্রত্যেক শুফা' পৃথক পৃথক নামাজ। যেমন– কেউ রাকাত সংখ্যা নির্ধারণ করা ব্যতীত مُطْلَقًا নফল নামাজের নিয়ত করেছে তবে সে যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় রাকাত শুরু না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর দুই রাকাত নফলই ওয়াজিব হবে। আর এখানে এ মাসআলাও রয়েছে যে, যেহেতু এ দ্বিতীয় শুফা' পৃথক নামাজ, এজন্য মোস্তাহাব হচ্ছে তৃতীয় রাকাতের শুরুতে ছানা ও আউযুবিল্লাহ পড়া।

فَاعْلَمْ اَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ تَرْكَ الْقِرَاءَةِ فِىْ رَكْعَتَىِ الشَّفْعِ الْاَوَّلِ يُبْطِلُ التَّحْرِيْمَةَ حَتّٰى لَا يَصِحُّ بِنَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِىْ عَلَى الشَّفْعِ الْاَوَّلِ وَفِىْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَلْ يُفْسِدُ الْاَدَاءَ فَيَصِحُّ بِنَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِىْ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَلتَّرْكُ فِىْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يُبْطِلُ التَّحْرِيْمَةَ اَيْضًا حَتّٰى لَا يَصِحُّ بِنَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِىْ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا يُبْطِلُ التَّحْرِيْمَةَ اَصْلًا بَلْ يُوْجِبُ فَسَادُ الْاَدَاءِ فَقَطْ فَيَصِحُّ بِنَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِىْ سَوَاءٌ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِىْ رَكْعَةٍ مِنَ الشَّفْعِ الْاَوَّلِ اَوْ فِىْ رَكْعَتَيْهِ اِذَا عَرَفْتَ هٰذَا فَاعْلَمْ اَنَّ الْمَسَائِلَ ثَمَانِيَةٌ لِاَنَّ تَرْكَ الْقِرَاءَةِ اِمَّا مُقْتَصَرٌ عَلٰى شَفْعٍ وَاحِدٍ وَهٰذَا فِىْ اَرْبَعِ صُوَرٍ وَهِىَ مَا قَالَ فِى الْمَتَنِ اَوِ الْاَوَّلِ اَوِ الثَّانِىْ اَوْ اِحْدَى الثَّانِىْ اَوْ اِحْدَى الْاَوَّلِ وَفِىْ هٰذِهِ الْاَرْبَعِ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ بِالْاِجْمَاعِ ـ

অনুবাদ : জেনে রাখ, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট কায়দা হচ্ছে, প্রথম শুফা'-এর উভয় রাকাতে কেরাত বর্জন করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয়। এমনকি প্রথম শুফা'র উপর দ্বিতীয় শুফা'র ভিত্তি সহীহ হয় না। এক রাকাতে কেরাত বর্জন করা তাহরীমাকে বাতিল করে না; বরং আদা-কে ফাসেদ করে দেয়। অতএব, এর উপর দ্বিতীয় শুফা'র ভিত্তি সহীহ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট এক রাকাতে কেরাত বর্জন করাও তাহরীমাকে বাতিল করে দেয়। এমনকি দ্বিতীয় শুফা'র ভিত্তি এর উপর সহীহ হয় না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট মূলত তাহরীমাকে বাতিল করে না; বরং নামাজকে ফাসেদ করে দেয়। অতএব, দ্বিতীয় শুফা'র ভিত্তি প্রথম শুফা'র উপর সহীহ হবে। চাই প্রথম শুফা'র এক রাকাতে কেরাত বর্জন করুক কিংবা উভয় রাকাতে। যখন তুমি এ মতবিরোধপূর্ণ বিষয়টি বুঝলে তখন তুমি জেনে রাখ যে, মাসায়েল আটটি। কেননা, কেরাত বর্জন করা হয়তো এক শুফা'য় সীমাবদ্ধ থাকবে– এর চার সুরত, তা ঐসব সুরত যা গ্রন্থকার মতনে উল্লেখ করেছেন, কিংবা প্রথম শুফা'য় কিংবা দ্বিতীয় শুফা'য় কিংবা দ্বিতীয় শুফা'র এক রাকাতে কিংবা প্রথম শুফা'র এক রাকাতে [কেরাত বর্জন করেছে তবে] উক্ত চার সুরতেই সর্বসম্মতিক্রমে দুই রাকাত কাজা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : গ্রন্থকার ইতঃপূর্বে চার রাকাতবিশিষ্ট নফল নামাজে কেরাত বর্জন করার যেসব সুরত উল্লেখ করেছেন শারেহ (র.) এখান থেকে সেসবের বিস্তারিত হুকুম বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ فَاعْلَمْ اَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : আল্লামা হালবী (র.) 'মুনিয়্যাহ' গ্রন্থের শরাহ 'গানিয়্যাতে' উল্লেখ করেছেন, এ মাসআলার কোনো সুরতে চার রাকাত কাজা করা, কোনো সুরতে দুই রাকাত কাজা করার যে মতানৈক্য রয়েছে– এর ভিত্তি মূলত আমাদের ইমামদের মাঝে ভিন্ন একটি মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার উপর। তা হচ্ছে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট প্রথম শুফা'র দুই কিংবা এক রাকাতে কেরাত বর্জন করার দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয়ে যায়। এজন্য এর উপর দ্বিতীয় শুফা'র ভিত্তি সহীহ হবে না এবং দ্বিতীয় শুফা' ভঙ্গ করার কারণে তা কাজা করা তার উপর আবশ্যক নয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তা ওয়াজিব হয় না; বরং আদা ফাসেদ করার দ্বারা তা ওয়াজিব হয়। তাই দ্বিতীয় শুফা'র ভিত্তি এর উপর সহীহ হবে এবং দ্বিতীয় শুফা'কে ফাসেদ করার দ্বারাও তা কাজা করা আবশ্যক হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত প্রথম মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতো এবং দ্বিতীয় মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতো। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, তাহরীমা মূলত নামাজের أَفْعَالٌ -এর জন্য হয়। আর যখন কেরাতকে বাতিল করার দ্বারা নামাজের أَفْعَالٌ ই বাতিল হয়ে গেছে– তাই তাহরীমাও বাতিল হয়ে গেছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, কেরাত একটি অতিরিক্ত রুকন। কেননা, হাকীকী কিংবা হুকমীভাবে কেরাত না হওয়া সত্ত্বেও নামাজের অস্তিত্ব সম্ভব। যেমন– বোবা কিংবা উম্মী ব্যক্তির নামাজ। তবে কেরাত ব্যতীত নামাজ সহীহ হয় না। কিন্তু আদা ভেঙ্গে দেওয়া কেরাত বর্জন করার চেয়ে অধিক শক্তিশালী নয়। আর আদা বর্জন করার দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, এ কথার উপর সকলে একমত যে, প্রথম শুফা'য় কেরাত বর্জন করার দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু এক রাকাতে কেরাত বর্জন করার দ্বারা সকলের নিকটই নামাজ বাতিল হয় না। অতএব, আমরা তাহরীমা বাতিল হওয়ার উপর এক রাকাতে কেরাত ফরজ হওয়ার দলিল দ্বারা সতর্কতা স্বরূপ উভয় জায়গায় কাজা ওয়াজিবের হুকুম দিয়েছি।

قَوْلُهُ بَلْ يُفْسِدُ الْاَدَاءَ فَيَصِحُّ : অর্থাৎ প্রথম শুফা'র এক রাকাতে কেরাত বর্জন করার দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয় না। কেননা, নফলের প্রত্যেক শুফা' ভিন্ন ভিন্ন নামাজ। এক রাকাতে কেরাত বর্জন করার দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয়ে যাওয়া একটি ইজতিহাদী মাসআলা। অতএব, আমরা সতর্কতা স্বরূপ দ্বিতীয় শুফা'য় তাহরীমা বাকি থাকাকে ধরে নিয়ে কাজা ওয়াজিব হওয়ার হুকুম দিয়েছি।

قَوْلُهُ فَاعْلَمْ اَنَّ الْمَسَائِلَ اَلخ : মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন, বিশ্লেষণের দিক থেকে এ মাসআলার পনেরোটি সুরত হয়। নিম্নের নকশায় সে সমস্ত সুরত হুকুমসহ প্রদত্ত হলো। এ নকশা 'জামেউর রুমূয' নামক গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী উল্লেখ করা হলো। এতে ق অক্ষর দ্বারা কেরাত পড়া এবং ك অক্ষর দ্বারা কেরাত বর্জন করা উদ্দেশ্য–

১	২	৩	৪
ق	ك	ك	ك
ك	ق	ك	ك
ق	ك	ق	ك
ق	ك	ك	ق
ك	ق	ك	ق
ك	ق	ق	ك

এসব সুরতে শায়খাইন (র.)-এর নিকট চার রাকাত এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট দুই রাকাত কাজা করবে।

১	২	৩	৪
ك	ك	ك	ق
ك	ك	ق	ك
ك	ك	ك	ك

এসব সুরতে তরফাইন (র.)-এর নিকট দুই রাকাত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট চার রাকাত কাজা করবে।

১	২	৩	৪
ك	ك	ق	ق
ك	ق	ق	ق
ق	ك	ق	ق

এসব সুরতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম দুই রাকাত কাজা করবে।

১	২	৩	৪
ق	ق	ك	ك
ق	ق	ق	ك
ق	ق	ك	ق

এসব সুরতে সর্বসম্মতিক্রমে শেষ দুই রাকাত কাজা করবে।

قَوْلُهُ اَنَّ الْمَسَائِلَ ثَمَانِيَةً : 'ইনায়া' নামক গ্রন্থে এ মাসআলার মোট ষোলটি সুরত উল্লেখ করা হয়েছে–

১. প্রত্যেক রাকাতে কেরাত পড়েছে।	২. প্রত্যেক রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।
৩. প্রথম দুই রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।	৪. শেষ দুই রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।
৫. প্রথম রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।	৬. দ্বিতীয় রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।
৭. তৃতীয় রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।	৮. চতুর্থ রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।
৯. প্রথম তিন রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।	১০. প্রথম দুই রাকাত ও চতুর্থ রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।
১১. প্রথম রাকাত এবং শেষ দুই রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।	১২. শেষ তিন রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।
১৩. প্রথম রাকাত এবং তৃতীয় রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।	১৪. প্রথম এবং চতুর্থ রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।
১৫. দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।	১৬. দ্বিতীয় রাকাত ও তৃতীয় রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে।
	এ হচ্ছে মোট ষোল সুরত।

গ্রন্থকার প্রথম সুরত উল্লেখ করেননি। কারণ, নামাজ ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা চলছে। আর প্রথম সুরতে নামাজ ভঙ্গের কোনো কারণ নেই। আর বাকি সাত সুরত, আট সুরতের মধ্যেই দাখিল। কেননা, এ সমস্ত সুরতের হুকুম একই।

قَوْلُهُ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ بِالْاِجْمَاعِ : অর্থাৎ আমাদের তিন ইমামই এতে একমত। কেননা, প্রত্যেক শুফা' পৃথক পৃথক নামাজ। এখন এর এক রাকাত কিংবা উভয় রাকাতে কেরাত বর্জন করার কারণে উক্ত শুফা' কাজা করা ওয়াজিব। অতএব, যদি সে প্রথম শুফা'য় কেরাত পড়ে তবে সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় শুফা'কে কাজা করবে। কেননা, তার তাহরীমা বাতিল হয়নি। তাই তার দ্বিতীয় শুফা' শুরু করা সহীহ হবে। অতঃপর দ্বিতীয় শুফা'য় কেরাত বর্জন করার কারণে প্রথম শুফা'ও ফাসেদ হবে না। আর যদি শুধু দ্বিতীয় শুফা'য় কেরাত পড়ে তবে সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম শুফা'কে কাজা করতে হবে। কেননা, তরফাইন (র.)-এর নিকট দ্বিতীয় শুফা' শুরু করা সহীহ হয়নি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট যদিও দ্বিতীয় শুফা' শুরু করা সহীহ হয়েছে, কিন্তু সে তা আদায় করেছে। যদি দ্বিতীয় শুফা'র কোনো এক রাকাতে কেরাত না পড়ে থাকে এবং অন্যান্য রাকাতে পড়ে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর শেষ শুফা' কাজা আবশ্যক হবে। আর যদি প্রথম শুফা'র কোনো এক রাকাতে কেরাত বর্জন করে এবং অন্যান্য রাকাতে পড়ে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর প্রথম দুই রাকাত কাজা করা ওয়াজিব।

وَاَمَّا غَيْرُ مُقْتَصِرٍ بَلْ هُوَ مَوْجُوْدٌ فِى الشَّفْعَيْنِ وَهٰذَا اَيْضًا فِىْ اَرْبَعِ مَسَائِلَ لِاَنَّهٗ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ التَّرْكُ فِىْ كُلِّ الْاَوَّلِ مَعَ كُلِّ الثَّانِىْ وَهُوَ مَا قَالَ فِى الْمَتَنِ كَمَا لَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ شَفْعَيْهِ اَوْ مَعَ بَعْضِ الثَّانِىْ وَهُوَ مَا قَالَ فِى الْمَتَنِ اَوِ الْاَوَّلِ مَعَ اِحْدَى الثَّانِىْ وَفِىْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَ مُحَمَّدٍ (رح) لِبُطْلَانِ التَّحْرِيْمَةِ عِنْدَهُمَا فَلَا يَصِحُّ الشُّرُوْعُ فِى الشَّفْعِ الثَّانِىْ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الشَّفْعِ الْاَوَّلِ فَقَطْ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) قَضَاءُ الْاَرْبَعِ لِاَنَّهٗ صَحَّ الشُّرُوْعُ فِى الشَّفْعِ الثَّانِىْ وَقَدْ اَفْسَدَ الشَّفْعَيْنِ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فَيَقْضِىْ اَرْبَعًا ـ

অনুবাদ : কিংবা [কেরাত বর্জন করা] এক শুফা'র উপর সীমাবদ্ধ হবে না; বরং কেরাত বর্জন করা উভয় শুফা'য় বিদ্যমান থাকবে। তবে এ সুরতেও চারটি মাসায়েল। কেননা, প্রথম শুফা'র প্রত্যেক রাকাতে কেরাত বর্জন করা হয়তো দ্বিতীয় শুফা'র প্রত্যেক রাকাতে কেরাত বর্জন করার সাথে হবে– তা হচ্ছে ঐ সুরত যা গ্রন্থকার মতনে বলেছেন যে, كَمَا لَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ شَفْعَيْهِ কিংবা দ্বিতীয় শুফা'র কোনো এক রাকাতে কেরাত বর্জনের সাথে হবে, তাও ঐ সুরত যা গ্রন্থকার মতনে বলেছেন যে, اَوِ الْاَوَّلِ مَعَ اِحْدَى الثَّانِىْ উক্ত দুই মাসআলায় তরফাইন (র.)-এর নিকট দুই রাকাত কাজা করবে। কেননা, তাঁদের নিকট এ উভয় সুরতে তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। তাই দ্বিতীয় শুফা' শুরু করা সহীহ হবে না। অতএব, শুধু প্রথম শুফা' কাজা করা আবশ্যক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট চার রাকাত কাজা করা ওয়াজিব। কেননা, তাঁর নিকট দ্বিতীয় শুফা' শুরু করা সহীহ। কিন্তু কেরাত বর্জন করার কারণে যেহেতু উভয় শুফা'কে ফাসেদ করে দিয়েছে– তাই চার রাকাত কাজা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَفِىْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ الخ : অর্থাৎ সমস্ত রাকাতে কেরাত বর্জন করা কিংবা প্রথম শুফা'র প্রথম রাকাত এবং দ্বিতীয় শুফা'র এক রাকাতে কেরাত পড়ার দ্বারা তরফাইন (র.)-এর নিকট দুই রাকাত কাজা করবে। কেননা, উভয় সুরতে প্রথম শুফা'র উভয় রাকাতে কেরাত বর্জন করা হয়েছে। তাই তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। আর যখন তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে তখন এর উপর দ্বিতীয় শুফা'র ভিত্তি সহীহ হয়নি। তাই শুধু দুই রাকাতের কাজা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهٗ لِبُطْلَانِ التَّحْرِيْمَةِ الخ : এটি তরফাইন (র.)-এর দলিল। এর সারসংক্ষেপ হচ্ছে, যেহেতু শুফা'র কোনো রাকাতেই কেরাত পড়া পাওয়া যায়নি তাই তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। ফলে এর উপর দ্বিতীয় শুফা' শুরু করাও সহীহ হয়নি। তাই এর কাজাও আবশ্যক নয়। তবে প্রথম শুফা' যা সে শুরু করেছিল তা কাজা করা অর্থাৎ দুই রাকাত কাজা করা আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট যেহেতু তাহরীমা বাতিল হয়নি, তাই এর উপর দ্বিতীয় শুফা'র ভিত্তিও সহীহ হয়েছে। কিন্তু এর আদা ফাসেদ হয়ে গেছে, তাই তাঁর নিকট চার রাকাত কাজা করবে।

وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ التَّرْكُ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ مَعَ كُلِّ الثَّانِي أَوْ مَعَ رَكْعَةٍ مِنْهُ وَهُمَا مَا قَالَ فِي الْمَتَنِ وَأَرْبَعٌ لَوْ تَرَكَ فِي إِحْدَى كُلِّ شَفْعٍ أَوْ فِي الثَّانِي وَإِحْدَى الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا يَقْضِي الْأَرْبَعَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) وَأَبِي يُوسُفَ (رحـ) لِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ عِنْدَهُمَا أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَّهُ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ وَالتَّحْرِيمَةُ لَا تَبْطُلُ بِهِ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رحـ) فَلِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ لَا تَبْطُلُ بِالتَّرْكِ أَصْلًا وَقَدْ أَفْسَدَ الشَّفْعَيْنِ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فَيَقْضِي أَرْبَعًا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لَيْسَ إِلَّا قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ فَظَهَرَ مَا قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ فَيَقْضِي أَرْبَعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) فِيمَا تَرَكَ فِي إِحْدَى الْأَوَّلِ مَعَ الثَّانِي أَوْ بَعْضِهِ أَيْ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ مَعَ كُلِّ الشَّفْعِ الثَّانِي أَوْ رَكْعَةٍ مِنْهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رحـ) فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ يُوجَدُ التَّرْكُ فِي الشَّفْعَيْنِ وَفِي الْبَاقِي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ سِتُّ مَسَائِلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) وَأَرْبَعٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رحـ) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) رَكْعَتَيْنِ فِي الْكُلِّ.

অনুবাদ : কিংবা দ্বিতীয় শুফা'র প্রত্যেক রাকাতে কেরাত বর্জন করাসহ কিংবা দ্বিতীয় শুফা'র এক রাকাতে কেরাত বর্জনসহ প্রথম শুফা'র এক রাকাতে কেরাত বর্জন করবে। এ উভয় সুরত হচ্ছে– যা গ্রন্থকার মতনে বলেছেন যে, وَأَرْبَعٌ لَوْ تَرَكَ فِي إِحْدَى كُلِّ شَفْعٍ أَوْ فِي الثَّانِي وَإِحْدَى الْأَوَّلِ শায়খাইন (র.)-এর নিকট এ উভয় সুরতে চার রাকাত কাজা করবে। কেননা, তঁাদের নিকট তাহরীমা বাকি আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তাহরীমা এজন্য বাকি যে, সে প্রথম শুফা'র এক এক রাকাতে কেরাত বর্জন করেছে। এর দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয় না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তাহরীমা এজন্য বাকি যে, তাঁর নিকট কেরাত বর্জন করার কারণে তাহরীমা মোটেই বাতিল হয় না, [যদিও উভয় রাকাতে কেরাত বর্জন করে]। তবে সে কেরাত বর্জন করার দ্বারা যেহেতু উভয় শুফা'কে ফাসেদ করে ফেলেছে, তাই চার রাকাত কাজা করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট এ সমস্ত সুরতে শুধু দুই রাকাত কাজা করবে। অতএব, ঐ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যা মুখতাসারে বিকায়ায় বলেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট চার রাকাত কাজা করবে ঐ সমস্ত সুরতে যেগুলোতে প্রথম শুফা'র এক রাকাতে কেরাত বর্জন করাসহ দ্বিতীয় শুফা'র প্রত্যেক রাকাত কিংবা এক রাকাতে কেরাত বর্জন করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট চারটি মাসায়িলেই উভয় শুফা'য় প্রত্যেক রাকাত কিংবা এক রাকাতে কেরাত বর্জন করা পাওয়া যায়। [এতে চার রাকাত কাজা করবে।] আর বাকি সুরতে দুই রাকাত কাজা করবে। তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট ছয়টি মাসায়েল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট চারটি মাসায়েল। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট এ সমস্ত [আট] সুরতে ঐ দুই রাকাতই কাজা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَمَّا اَنْ يَّكُوْنَ التَّرْكُ الخ : এ বাক্য اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ التَّرْكُ فِى كُلِّ الْاَوَّلِ-এর উপর عَطْف হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَرْبَعٌ لَوْ تَرَكَ فِىْ اِحْدٰى كُلِّ الخ : অর্থাৎ যদি প্রথম শুফা'র এক রাকাতে কেরাত বর্জন করাসহ দ্বিতীয় শুফা'র এক রাকাতে কিংবা উভয় রাকাতে কেরাত বর্জন করে তবে চার রাকাত কাজা করবে। কেননা, উভয় সুরতে যেহেতু প্রথম শুফা'র এক রাকাতে কেরাত পড়া পাওয়া গেছে সেহেতু তাহরীমা বাতিল হয়নি, তাই দ্বিতীয় শুফা' শুরু করাও সহীহ। অতএব, উভয় শুফা'র আদা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে উভয় শুফা'র চার রাকাত কাজা করবে।

قَوْلُهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) الخ : অর্থাৎ শায়খাইন (র.)-এর নিকট চার রাকাত কাজা করবে। 'জামিউস সাগীর' নামক গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এবং তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এমনই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) প্রথম শুফা'র এক রাকাতে কেরাত বর্জন করার রেওয়ায়েতকে অস্বীকার করেছেন এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সাথে বলেছেন– আমি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে রেওয়ায়েত করেছি যে, দুই রাকাত কাজা করা আবশ্যক হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অস্বীকার করা সত্ত্বেও ইমাম মুহাম্মদ (র.) ফিরে আসেননি। অতএব, আমাদের হানাফী ফুকাহায়ে কেরাম ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর রেওয়ায়েতের উপর নির্ভর করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অস্বীকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেননি।

قَوْلُهُ فِىْ جَمِيْعِ الصُّوَرِ لَيْسَ اِلَّا الخ : এখানে فِىْ جَمِيْعِ الصُّوَرِ দ্বারা মাসআলার সমস্ত সুরত কিংবা শুধু চার রাকাত কাজা করার সমস্ত সুরত উদ্দেশ্য। সর্বোপরি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট যেহেতু প্রথম শুফা'র এক রাকাত কিংবা উভয় রাকাতে কেরাত বর্জন করার দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয়ে যায় তাই দ্বিতীয় শুফা'র ভিত্তিও সহীহ হবে না। তাই তা কাজা করার প্রশ্নই উঠে না। ফলে শুধু দুই রাকাতই কাজা করবে।

قَوْلُهُ فَظَهَرَ مَا قَالَ فِى الْمُخْتَصَرِ الخ : অর্থাৎ মুখতাসারে বিকায়াতে যা বলা হয়েছে, এর দ্বারা তার মর্ম স্পষ্ট হয়ে গেছে। মুখতাসারে বিকায়ার ভাষ্য নিম্নরূপ–

وَتَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِى الشَّفْعِ الْاَوَّلِ يُبْطِلُ التَّحْرِيْمَةَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) فِىْ رَكْعَةٍ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا بَلْ يُفْسِدُ الْاَدَاءَ فَيَقْضِىْ اَرْبَعًا الخ .

অর্থাৎ উভয় মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট চার রাকাত কাজা করবে। প্রথম মাসআলা হচ্ছে, প্রথম শুফা'র এক রাকাতে কেরাত বর্জন করাসহ দ্বিতীয় শুফা'র উভয় রাকাতে কেরাত বর্জন করা। দ্বিতীয় মাসআলা হচ্ছে, প্রথম শুফা'র এক রাকাতে কেরাত বর্জন করাসহ দ্বিতীয় শুফা'রও এক রাকাতে কেরাত বর্জন করা, তবে চার রাকাত কাজা কবা ওয়াজিব।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট চার সুরতে চার রাকাত কাজা করবে। তন্মধ্যে দুটি ঐ সুরত যা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাব। তৃতীয় সুরত হচ্ছে, উভয় শুফা'র প্রত্যেক রাকাতে কেরাত বর্জন করা। চতুর্থ সুরত হচ্ছে, প্রথম শুফা'র উভয় রাকাতে এবং দ্বিতীয় শুফা'র এক রাকাতে কেরাত বর্জন করা।

قَوْلُهُ وَفِى الْبَاقِىْ رَكْعَتَيْنِ الخ : এ বাক্যটি শায়খাইন (র.)-এর অভিমতের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ মাসায়িলে সামানিয়্যা [অষ্ট মাসআলা] -এর বাকি সুরতে তরফাইন (র.) দুই রাকাত কাজা করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট এর ছয় সুরত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট চার সুরত। এ সমস্ত সুরতের বিস্তারিত বর্ণনা ইতঃপূর্বে করা হয়েছে।

وَلَا قَضَاءَ لَوْ تَشَهَّدَ أَوَّلًا ثُمَّ نَقَضَ اَیْ نَوٰی اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مِنَ النَّفْلِ وَقَعَدَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ ثُمَّ نَقَضَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِاَنَّهٗ لَمْ يَشْرَعْ فِى الشَّفْعِ الثَّانِىْ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اَوْ شَرَعَ ظَانًّا اَنَّهٗ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْمَسْاَلَةُ وَاِنْ فُهِمَتْ مِمَّا سَبَقَ وَهُوَ قَوْلُهٗ وَلَزِمَ اِتْمَامُ نَفْلٍ شَرَعَ فِيْهِ قَصْدًا فَهٰهُنَا صَرَّحَ بِهَا اَوْ لَمْ يَقْعُدْ فِىْ وَسَطِهٖ اَیْ اِذَا صَلّٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مِنَ النَّفْلِ وَلَمْ يَقْعُدْ فِىْ وَسَطِهٖ كَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يُفْسِدَ الشَّفْعَ الْاَوَّلَ وَيَجِبُ قَضَاؤُهٗ لِاَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِنَ النَّفْلِ صَلٰوةٌ عَلٰى حِدَةٍ وَمَعَ ذٰلِكَ لَا يُفْسِدُ الشَّفْعَ الْاَوَّلَ قِيَاسًا عَلَى الْفَرْضِ ـ

অনুবাদ : যদি প্রথমে তাশাহহুদ পড়ে অতঃপর নামাজ ভেঙ্গে ফেলে, তবে কাজা ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ যদি কেউ চার রাকাত নফলের নিয়ত করে এবং দুই রাকাতের পর তাশাহহুদ পরিমাণ বসে নামাজ ভেঙ্গে ফেলে, তবে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে দ্বিতীয় শুফা' শুরু করেনি। তাই তার উপর কাজা ওয়াজিব হয়নি। কিংবা এই ধারণায় নামাজ শুরু করেছে যে, এ নামাজ তার উপর ওয়াজিব। এ মাসআলা যদিও ইতঃপূর্বের وَلَزِمَ اِتْمَامَ نَفْلٍ شَرَعَ فِيْهِ قَصْدًا দ্বারা বুঝা গেছে– তবুও এখানে এ মাসআলার সাথে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কিংবা নামাজের মধ্যখানে বৈঠক করেনি। অর্থাৎ যখন চার রাকাত নফল নামাজ পড়েছে এবং মধ্যখানে বৈঠক করেনি তখন উচিত হলো– প্রথম শুফা' ফাসেদ হয়ে যাওয়া এবং এর কাজা ওয়াজিব হওয়া। কেননা, নফলের প্রত্যেক শুফা' পৃথক নামাজ। এতদসত্ত্বেও ফরজ নামাজের উপর কিয়াস করে প্রথম শুফা' ফাসেদ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا قَضَاءَ لَوْ تَشَهَّدَ أَوَّلًا الخ : অর্থাৎ যদি চার রাকাতবিশিষ্ট নফল নামাজে দুই রাকাত পড়ে তাশাহহুদ পরিমাণ বসে অতঃপর নামাজ ভেঙ্গে ফেলে তবে তার উপর কোনো কাজাই আবশ্যক হবে না। কারণ, সে দ্বিতীয় শুফা'-ও শুরু করেনি তাই এর কাজাও তার উপর আবশ্যক নয়। কিন্তু যদি সে তাশাহহুদের পূর্বে নামাজ ভেঙ্গে ফেলে তবে যেহেতু সে প্রথম শুফা' পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে নামাজ ভেঙ্গে ফেলেছে তাই তার উপর প্রথম শুফা'র কাজা আবশ্যক হবে। আর যদি তাশাহহুদের পর দ্বিতীয় শুফা' শুরু করে ভেঙ্গে ফেলে তবে যেহেতু তা একটি পূর্ণাঙ্গ নামাজ ছিল– তা পরিপূর্ণ করা তার উপর আবশ্যক ছিল তাই তা কাজা করা ওয়াজিব।

قَوْلُهٗ اَوْ شَرَعَ ظَانًّا اَنَّهٗ عَلَيْهِ : অর্থাৎ যখন সে এ ধারণা করে নামাজ শুরু করেছে যে, এটি জোহর কিংবা আসরের নামাজ. অতঃপর তার স্মরণ হয়েছে যে, সে এ নামাজ আদায় করে ফেলেছে। এখন তা নফল হয়ে যাবে। কেননা, সে নিজের দায়িত্বের নামাজ আদায়ের জন্য নামাজ শুরু করেছিল, নিজের উপর অন্য কোনো নামাজ অবধারিত করার জন্য নয়, এখন যখন তার স্মরণ হলো যে, সে এ নামাজ আদায় করে ফেলেছে তখন তা এমন নামাজে পরিণত হয়েছে, যা তার উপর আবশ্যক ছিল না। তাই যদি তা ভেঙ্গে ফেলে তবে তা কাজা করা আবশ্যক নয়। অনুরূপ যদি কেউ এমন ধারণা করে তার ইকতেদা করে তবুও তার উপর তা কাজা করা আবশ্যক নয়। –[ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়্যাহ]

قَوْلُهٗ كَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يُفْسِدَ الخ : অর্থাৎ কিয়াসের চাহিদা হলো, প্রথম শুফা' ভেঙ্গে যাওয়া এবং এর কাজা আবশ্যক হওয়া কারণ, প্রত্যেক শুফা একটি পরিপূর্ণ নামাজ। তাই প্রত্যেক দুই রাকাতে বসাও ফরজ। কেননা, শেষ বৈঠক ফরজ। আর ফরজ ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা নামাজ বাতিল হয়ে যায়। যদিও তা ভুলক্রমে হয়। এটি ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত শায়খাইন (র.)-এর মতে, اِسْتِحْسَانًا নামাজ ভাঙ্গবে না। কেননা, নফলের প্রত্যেক দুই রাকাতে بِغَيْرِهَا বসা ফরজ. بِعَيْنِهَا বসা ফরজ নয়। অর্থাৎ যখন দুই রাকাত পড়ে নিশ্চিত নামাজ শেষ করবে তখন শেষ বৈঠক ফরজ। আর যখন সে চার রাকাত নফল পড়ে– দুই রাকাত নয়, তখন একে ফরজ নামাজের উপর কিয়াস করে ফরজ বলা হয়নি।

وَيَتَنَفَّلُ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَةِ قِيَامِهِ اِبْتِدَاءً وَكُرِهَ بَقَاءً اِلَّا بِعُذْرٍ اَىْ اِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ يَجُوْزُ اَنْ يَشْرَعَ فِى النَّفْلِ قَاعِدًا وَاِنْ شَرَعَ فِى النَّفْلِ قَائِمًا كُرِهَ اَنْ يَقْعُدَ فِيْهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ اِلَّا بِعُذْرٍ فَاَرَادَ بِحَالِ الْاِبْتِدَاءِ حَالَ الشُّرُوْعِ وَبِحَالِ الْبَقَاءِ حَالَ وُجُوْدِهِ الَّذِىْ بَعْدَ الشُّرُوْعِ وَ رَاكِبًا مُؤْمِئًا خَارِجَ الْمِصْرِ اِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ اِنَّمَا قَالَ خَارِجَ الْمِصْرِ لِقَوْلِ اِبْنِ عُمَرَ (رض) رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّىْ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ اِلَى خَيْبَرَ يُوْمِئُ اِيْمَاءً وَلَمَّا كَانَ هٰذَا الْفِعْلُ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ اِقْتَصَرَ عَلَى مَوْرِدِهِ فَلَوِ افْتَتَحَهُ رَاكِبًا ثُمَّ نَزَلَ بَنٰى وَبِعَكْسِهِ فَسَدَ لِاَنَّ فِى الْاَوَّلِ مَا يُؤَدِّيْهِ اَكْمَلُ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ وَفِى الثَّانِىْ اِنْعَقَدَ التَّحْرِيْمَةُ مُوْجِبَةً لِلرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَلَا يَجُوْزُ اَدَاؤُهُ بِالْاِيْمَاءِ۔

অনুবাদ : দাঁড়িয়ে পড়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সূচনাতেই বসে নফল নামাজ পড়া জায়েজ। بَقَاءً [দাঁড়িয়ে শুরু করে পরবর্তীতে] বসে নফল পড়া মাকরূহ। তবে ওজরের কারণে নামাজের মধ্যখানে বসে বসে পড়া মাকরূহ নয়। অর্থাৎ যদি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার সামর্থ্য থাকে তবুও নফল নামাজ বসে শুরু করা জায়েজ। যদি নফল নামাজ দাঁড়িয়ে শুরু করে তবে ওজর ব্যতীত দাঁড়ানোর সামর্থ্য থাকা অবস্থায় মধ্যখানে বসে যাওয়া মাকরূহ। অতএব, حَالُ الْاِبْتِدَاءِ দ্বারা শুরু অবস্থা উদ্দেশ্য, আর حَالُ الْبَقَاءِ দ্বারা শুরু হওয়ার পরের অবস্থা উদ্দেশ্য। শহরের বাইরে কিবলার পরিপন্থি দিকেও সওয়ারির উপর ইশারায় নফল নামাজ পড়া জায়েজ। গ্রন্থকার শহরের বাইরে এজন্য বলেছেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গাধার উপর সওয়ার হয়ে খায়বারের দিকে রওয়ানা হয়ে ইশারায় নামাজ পড়তে দেখেছি। যেহেতু এ কাজ কিয়াসের পরিপন্থি তাই তা স্বীয় স্থলেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অতএব, যদি আরোহী অবস্থায় নফল নামাজ শুরু করে অতঃপর সওয়ারি থেকে নেমে যায়, তবে এর উপর বেনা করবে। এর পরিপন্থি করলে নামাজ ভেঙ্গে যাবে। কেননা, প্রথম সুরতে সে যা আদায় করছে, তা তার উপর যা ওয়াজিব হয়েছে এর চেয়ে পরিপূর্ণ, আর দ্বিতীয় সুরতে তাহরীমা রুকু এবং সিজদাকে আবশ্যক করার জন্য সংঘটিত হয়েছে। তাই ইশারার মাধ্যমে তা আদায় করা জায়েজ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَتَنَفَّلُ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَتِهِ الخ :

নফল নামাজ বসেও পড়া জায়েজ : দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বসে নফল নামাজ পড়া জায়েজ। কিন্তু ওজর ব্যতীত ফরজ নামাজ বসে পড়া জায়েজ নেই। তবে বসে নামাজ আদায়কারী দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীর অর্ধেক ছওয়াব পাবে।

দলিল : রাসূল ﷺ বলেছেন- صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ অর্থাৎ "বসাবস্থায় নামাজের ছওয়াব দাঁড়ানো অবস্থার নামাজের অর্ধেক।" -[বুখারী ও সুনান গ্রন্থসমূহ]

যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে ওজর ব্যতীত ফরজ নামাজ বসে আদায় করা জায়েজ নেই, তাই এ হাদীস নফল নামাজের সাথে সুনির্দিষ্ট।

নফল নামাজের বৈঠকের পদ্ধতি : নফল নামাজ বসে পড়া জায়েজ। তবে বৈঠকের পদ্ধতি সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, নফল আদায়কারী ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছামতো বসে নফল নামাজ পড়তে পারবে।

কেননা, তার জন্য যেহেতু কিয়াম (قِيَامْ) ছাড়া জায়েজ, তাই তার জন্য বৈঠকের নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছেড়ে দেওয়া অবশ্যই জায়েজ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হাবওয়া (حَبْوَا) বানিয়ে বসবে। অর্থাৎ উভয় হাঁটু দাঁড় করে রাখবে, উভয় নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে দেবে এবং হস্তদ্বয় দ্বারা দুই হাঁটুকে পেঁচিয়ে ধরবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, আসন পেতে বসবে। ইমাম যুফার (র.) থেকে বর্ণিত যে, তাশাহহুদের অবস্থার ন্যায় বসবে। মূলত ফুকাহায়ে কেরাম এ আত্তাহিয়্যাতুর ন্যায় বৈঠককেই গ্রহণ করেছেন। কেননা, এটি নামাজের সুন্নত তরিকায় বসা এবং এরই উপর ফতোয়া।

قَوْلُهُ وَكُرِهَ بَقَاءً إِلَّا بِعُذْرٍ : অর্থাৎ যদি দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়তে শুরু করে কোনো ওজর ব্যতীত মধ্যখানে বসে যায়, তবে নামাজ হয়ে যায়, কিন্তু মাকরূহ হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মানতের উপর কিয়াস করে বলেন, এমনটি করাই জায়েজ নেই। কেননা, যদি কেউ দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়ার মানত করে তবে তার জন্য বসে নামাজ পড়া জায়েজ নেই। কেননা, সে তা নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছে। অনুরূপ সে নফল নামাজ দাঁড়িয়ে শুরু করেছে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পড়ার নিয়ত করেছে অতএব, তা এখন মানতের মতো হয়ে গেছে। তাই মধ্যখানে বসতে পারবে না।

আমাদের নিকট এমনটি করা কারাহাতের সাথে জায়েজ। কেননা, তা দাঁড়িয়ে শুরু করার কারণে সমস্ত নামাজে তা (قِيَامْ) আবশ্যক নয়। এমনটি করা যদিও মাকরূহ বলা হয়েছে, তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মাকরূহে তানযীহী। কোনো কোনো ফকীহ এ অভিমতকেই উত্তম বলেছেন। 'বাহরুর রায়িক' ও 'গানিয়্যাহ' নামক গ্রন্থে একথাও রয়েছে যে, বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে– মাকরূহও হবে না।

قَوْلُهُ خَارِجَ الْمِصْرِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ : অর্থাৎ শহরের বাইরে সওয়ারির উপর নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে। চাই সওয়ারি যেদিকেই যাক। নামাজের শুরুতেও কিবলার দিকে মুখ করা শর্ত নয়। কিন্তু যদি শুরুতে কিবলার দিকে মুখ করতে সমস্যা না হয় তবে কিবলার দিকে মুখ করে নামাজ শুরু করা মোস্তাহাব। কিন্তু যদি সেদিকে মুখ করে ফেলে যেদিকে কিবলাও নয়, সওয়ারির মুখও নয় তবে তা জায়েজ নেই। আর শহরের বাহির বলতে উদ্দেশ্য হলো, ঐ স্থান যেখানে মুসাফির হয়ে যায় এবং নামাজ কসর পড়ে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর নিকট শহরেও সওয়ারির উপর নফল নামাজ পড়া জায়েজ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট কারাহাতের সাথে জায়েজ।

قَوْلُهُ إِلَى خَيْبَرَ يُوْمِئُ إِيْمَاءً : উক্ত হাদীসে রাসূল ﷺ গাধার উপর সওয়ার হয়ে খায়বরের দিকে যাওয়ার সময় ইশারার মাধ্যমে নামাজ পড়ার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এভাবে সওয়ারির উপর নফল নামাজ পড়ার জন্য কিবলার দিক হওয়া শর্ত নয় কেননা, মদীনা শরীফ থেকে দক্ষিণ দিক হচ্ছে কিবলার দিক এবং খায়বর হচ্ছে ভিন্ন দিকে। আর রাসূল ﷺ সে ভিন্ন দিকের সওয়ারিতে ইশারার দ্বারা নামাজ পড়েছেন।

قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَ هٰذَا الْفِعْلُ : অর্থাৎ যেহেতু স্বয়ং রাসূল ﷺ থেকে কিবলার ভিন্ন দিক হয়ে নফল নামাজ পড়া প্রমাণিত আছে, যা কিবলামুখী হওয়ার নস-এর পরিপন্থি তাই তা সে পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ এর দ্বারা বলা যাবে না যে, শহরের ভিতরেও অনুরূপ নফল পড়া জায়েজ। কিংবা ফরজ পড়া সওয়ারির উপর কিংবা কিবলার ভিন্ন দিকে কিংবা জমিনে দাঁড়িয়ে কিবলার ভিন্ন দিকে জায়েজ বলা যাবে না।

قَوْلُهُ مَا يُؤَدِّيْهِ أَكْمَلُ مِمَّا الخ : অর্থাৎ যখন সে সওয়ারির উপর ছিল এবং নামাজ শুরুর পর সওয়ারি থেকে নেমে গেছে তবে এখন সে রীতিমতো রুকু ও সিজদা আদায় করবে। কেননা, সওয়ারির উপর ইশারার দ্বারা নামাজ পড়া ওয়াজিব ছিল, যা রুকু ও সিজদার মাধ্যমে আদায়ের তুলনায় দুর্বল। এখন যেহেতু সওয়ারি থেকে নেমে গেছে তাই রুকু-সিজদার মাধ্যমে মৌলিক তরিকায় আদায় করবে। কিন্তু এর পরিপন্থি করা যেমন– জমিনের উপর নফল নামাজ পড়তে শুরু করেছে অতঃপর মধ্যখানে সওয়ারির উপর আরোহণ করেছে– তবে তার নামাজ ভেঙ্গে যাবে। কেননা, সে জমিনের উপর কিবলামুখী ছিল, এখন তা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তা ছাড়া সওয়ারি থেকে নামার তুলনায় সওয়ারিতে উঠার ক্ষেত্রে কষ্ট বেশি হয়, যা নামাজ ফাসেদ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

سَنَّ التَّرَاوِيْحُ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَعْدَهُ خَمْسُ تَرْوِيْحَاتٍ لِكُلِّ تَرْوِيْحَةٍ تَسْلِيْمَتَانِ وَجَلْسَةٌ بَعْدَهُمَا قَدْرَ تَرْوِيْحَةٍ وَالسُّنَّةُ فِيْهَا الْخَتْمُ مَرَّةً وَلَا يَتْرُكُ لِكَسْلِ الْقَوْمِ وَلَا يُوْتِرُ جَمَاعَةً خَارِجَ رَمَضَانَ وَاِنَّمَا كَانَتِ التَّرَاوِيْحُ سُنَّةً لِاَنَّهُ وَاظَبَ عَلَيْهَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَّنَ الْعُذْرَ فِيْ تَرْكِ الْمُوَاظَبَةِ وَهُوَ مَخَافَةَ اَنْ تُكْتَبَ عَلَيْنَا ـ

অনুবাদ : ইশার পর বিতরের পূর্বে কিংবা পরে বিশ রাকাত তারাবীহ সুন্নত। তারাবীতে পাঁচটি তারবীহা রয়েছে। প্রত্যেক তারবীহা-এর জন্য দুটি করে সালাম রয়েছে এবং দুই সালামের পর এক বৈঠক পরিমাণ তারবীহা করবে। তারাবীতে এক খতম কুরআন পড়া সুন্নত। মুসল্লিদের অলসতার কারণে কুরআন খতম বর্জন করা যাবে না। বিতরের নামাজ রমজানের বাইরে জামাতের সাথে পড়া যায় না। তারাবীর নামাজ এজন্য সুন্নত যে, সাহাবায়ে কেরাম এর উপর মুয়াযাবাত [সর্বদা]-এর সাথে আমল করেছেন। রাসূল ﷺ মুয়াযাবাতকে বর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদের উপর তা ফরজ হয়ে যাওয়ার ভয়কে ওজর হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ سَنَّ التَّرَاوِيْحُ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً الخ :

তারাবীর নামাজের হুকুম : রমজান মাসে ইশার পর বিতরের পূর্বে বিশ রাকাত তারাবীর নামাজ সুন্নত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে মোস্তাহাব হওয়ার কথাও বর্ণিত আছে। উক্ত সুন্নত দ্বারা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ উদ্দেশ্য। দলিল হলো, খুলাফায়ে রাশেদীন নিয়মিতভাবে সর্বদা তারাবীহ-এর নামাজ পড়েছেন। আর রাসূল ﷺ বলেছেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ ـ

অর্থাৎ "তোমরা আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধর এবং আমার পর খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে ধর।" –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যেরূপ রাসূল ﷺ -এর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা জরুরি, তদ্রূপ খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নতকেও আঁকড়ে ধরা আবশ্যক।

জামাতের সাথে তারাবীহ পড়ার সূচনা যেভাবে হলো : হাদীসে বর্ণিত আছে–

اِنَّهُ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِيْ رَمَضَانَ وَصَلّٰى عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ اِجْتَمَعَ النَّاسُ فَخَرَجَ وَصَلّٰى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ كَثُرَ النَّاسُ فَلَمْ يَخْرُجْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ عَرَفْتُ اِجْتِمَاعَكُمْ لٰكِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. وَ زَادَ الْبُخَارِيُّ (رحـ) فِيْهِ "فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ".

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ রমজানের কোনো এক রাতে তশরিফ আনলেন এবং লোকদেরকে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়ালেন। যখন দ্বিতীয় রাত আসল তখন লোকেরা একত্রিত হলো, রাসূল ﷺ তশরিফ আনলেন এবং লোকদেরকে নিয়ে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়লেন। যখন তৃতীয় রাত আসল তখন অনেক লোক একত্রিত হলো, কিন্তু রাসূল ﷺ তশরিফ আনলেন না। বললেন, আমি তোমাদের সমবেত হওয়ার কথা জেনেছি। তবে আমার আশঙ্কা হয়েছে যে, ঐ নামাজ তোমাদের উপর ফরজ

হয়ে যায় কিনা! [এজন্য বের হইনি।]" ইমাম বুখারী (র.) এতে আরো বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকাল হয়ে গেছে, আর তারাবীর বিষয়টি এ অবস্থায়ই রয়ে গেছে। –[বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাঊদ]

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূল ﷺ কখনো জামাতের সাথে তারাবীহ পড়েছেন, আবার কখনো ঘরে একাকী পড়েছেন। তবে রাসূল ﷺ -এর মৃত্যুর পর হযরত ওমর (রা.)-এর আমল পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম একাকী তারাবীহ পড়েছেন। হযরত ওমর (রা.) স্বীয় শাসন আমলে বলেন–

إِنِّيْ أَرٰى أَنْ أَجْمَعَ النَّاسَ عَلٰى إِمَامٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمْ عَلٰى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَلّٰى بِهِمْ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً ـ

অর্থাৎ "আমি লোকদেরকে এক ইমামের পিছনে সমবেত করা সমীচীন মনে করলাম। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) তাদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পিছনে একত্রিত করলেন। তিনি তাদেরকে পাঁচ তারবীহায় বিশ রাকাত নামাজ পড়ালেন।" –[বুখারী ও মুয়াত্তা মালিক]

তারাবীর রাকাত সংখ্যা : তারাবীহের রাকাত সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আহলে হক ওলামায়ে কেরাম বলেন, তারাবীহ বিশ রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। পক্ষান্তরে আহলে হাদীস ওলামায়ে কেরাম বলেন, তারাবীহ আট রাকাত। আহলে হাদীসদের দলিল হচ্ছে, হযরত আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান (র.) বলেন–

سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رضـ) كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهٖ عَلٰى إِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً ـ

অর্থাৎ "আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রমজানে রাসূল ﷺ -এর নামাজ কিরূপ ছিল? তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি রমজান ও রমজানের বাইরে এগারো রাকাতের অধিক নামাজ পড়েননি।" [তন্মধ্যে আট রাকাত তারাবীহ ও তিন রাকাত বিতর।] –[ফাতহুল কাদীর]

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ আট রাকাত তারাবীহ পড়েছেন।

আহলে হক-এর দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

إِنَّهٗ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ ـ

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ রমজানে বিতর ব্যতীত বিশ রাকাত [তারাবীহ] নামাজ পড়তেন।" –[তারাবানী ও বায়হাকী শরীফ]

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে–

إِنَّ عُمَرَ (رضـ) جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلٰى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَلّٰى بِهِمْ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً ـ

অর্থাৎ "হযরত ওমর (রা.) রাসূল ﷺ -এর সকল সাহাবীকে রমজান মাসে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পিছনে সমবেত করেছেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে প্রত্যেক রাতে বিশ রাকাত পড়েছেন।" –[মুয়াত্তা মালিক ও বায়হাকী]

বিশ ও আট রাকাতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান : আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে বিশ ও আট রাকাতের বর্ণনাদ্বয়ের মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, রাসূল ﷺ বিশ রাকাতও পড়েছেন এবং আট রাকাতও পড়েছেন– এবং রাসূল ﷺ -এর তিরোধানের পর সাহাবায়ে কেরাম আট রাকাত পড়তেন; কিন্তু পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে এসে বিশ রাকাতের উপর ইজমা হয়ে গেছে। কারণ, তখন সকল সাহাবীর উপস্থিতিতে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়া হয়েছে; কিন্তু কেউ এতে দ্বিমত পোষণ করেননি।

কিংবা কেউ কেউ এভাবে সামঞ্জস্যতা কায়েম করেছেন যে, আট রাকাত তারাবীহ সুন্নত, আর বিশ রাকাত মুস্তাহাব।

তারাবীহ নামাজের ওয়াক্ত : তারাবীহ নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, ইশা ও বিতরের মাঝের সময়টি তারাবীর ওয়াক্ত। অতএব, ইশা এবং বিতরের পরে তা আদায় করা যাবে না। বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইশার পর এবং বিতরের পূর্বে কিংবা পরে তারাবীর ওয়াক্ত। তবে জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, ইশার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত তারাবীর ওয়াক্ত। কিন্তু তা ইশার পূর্বে আদায় করা যাবে না। কেননা, তারাবীহ নামাজ ইশার তাবে' বা অনুসারী। তাই তা ইশার পরই হতে হবে।

তারাবীহ জামাতে পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ : তারাবীর নামাজ মসজিদে এবং জামাতের সাথে পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা। দলিল হলো, রাসূল ﷺ যে কদিন তারাবীহ পড়েছেন, সে কদিন মসজিদে এবং জামাতের সাথে পড়েছেন। সাহাবায়ে কেরামও ঠিক এমনই করেছেন। তবে এ সুন্নত কি সুন্নতে আইন, না কিফায়া– এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, জামাত সুন্নতে কিফায়াহ। অতএব, যদি কোনো মসজিদের অধিবাসীরা তারাবীর জামাত বর্জন করে তবে তারা সকলেই গুনাহগার হবে। কিন্তু যদি কিছু সংখ্যক লোক তারাবীহ জামাতে আদায় করে এবং অন্যরা তা বর্জন করে তবে জামাতে অনুপস্থিত ব্যক্তিরা জামাতের ফজিলত থেকে বঞ্চিত হবে, কিন্তু জামাত বর্জন করার জন্য গুনাহগার হবে না।

কোনো কোনো ফকীহ বলেন, তারাবীর জামাত সুন্নতে আইন। অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য জামাত সুন্নত। অতএব, যদি কেউ একাকী তারাবীর নামাজ আদায় করে তবে তার সুন্নত বর্জনের গুনাহ হবে।

قَوْلُهُ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَعْدَهُ : بَعْدَهُ-এর যমীরের মারজি' وِتْر-এর দিকে ফিরেছে। যার মর্ম হচ্ছে, তারাবীর নামাজ বিতরের পরেও জায়েজ আছে। তবে বিতরের পরে তারাবীহ হওয়ার দুটি সুরত রয়েছে– ১. সারা বছরের অভ্যাস অনুযায়ী যদি কেউ ইশার পর বিতর পড়ে ফেলে– তবে এখন সে তারাবীহ বিতরের পরেই পড়ে নেবে। আর যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করে তবে তা জায়েজ হবে বটে, কিন্তু মাকরূহ হবে। ২. যদি কারো তারাবীর কোনো অংশ কোনো কারণে ছুটে যায় যেমন– অজু ভেঙ্গে গেছে কিংবা বাথরুমে গেছে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে তারাবীর কিছু অংশ ছুটে গেছে এবং ইমাম সাহেব বিতরের জন্য দাঁড়িয়ে গেছে, সেও ইমামের সাথে বিতর পড়ে ফেলেছে, সে এ বিতরের পরে তার ছুটে যাওয়া তারাবীর অংশ আদায় করে নেবে।

قَوْلُهُ خَمْسُ تَرْوِيْحَاتٍ : এর সম্পর্ক عِشْرُوْنَ رَكْعَةً-এর সাথে। উহ্য ইবারত হবে এভাবে– اَلتَّرَاوِيْحُ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بِخَمْسِ تَرْوِيْحَاتٍ অর্থাৎ 'পাঁচ তারবীহায় তারাবীহ বিশ রাকাত।' তারবীহা শব্দের অর্থ– বিশ্রাম নেওয়া। আর প্রতি চার রাকাত হচ্ছে একটি তারবীহ, যাতে দুই সালাম হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুই দুই রাকাতের নিয়ত করে চার রাকাত পড়ার পর উক্ত চার রাকাত পরিমাণ সময় আরাম করা। جَلْسَةً بَعْدَهُمَا قَدْرَ تَرْوِيْحَةٍ-এর মর্ম এটিই।

খতমে তারাবীর হুকুম : পূর্ণ রমজান মাসে কমপক্ষে এক খতম কুরআন পাঠ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। যদি একের চেয়ে অধিক খতম পাঠ করা হয় তবে সেটি আরো ভালো। তবে ইমামকে অবশ্যই মুসল্লিদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। মুসল্লিদের যদি এক খতমের চেয়ে বেশি পাঠ করা কষ্টকর হয় তবে এক খতমই পাঠ করবে। এটিই সুন্নত। কিন্তু যদি মুসল্লিরা অলসতাবশত এক খতমও পড়তে না চায় তবে এক খতম বর্জন করা যাবে না; বরং তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কমপক্ষে এক খতম পড়তে হবে।

খতমে তারাবীর বিনিময় : খতমে তারাবীহ বিনিময় গ্রহণ করা কিংবা চুক্তিবদ্ধভাবে হাফেজ ও ইমাম নিয়োগ দেওয়া জায়েজ নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থাৎ "স্বল্প মূল্যে তোমরা আমার আয়াতকে বিক্রি করো না।" এতে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করা নিষেধ দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, চড়া মূল্যে বিক্রি করা যাবে; বরং এখানে স্বল্প মূল্য বলে বিনিময়কে সম্পূর্ণরূপে হারাম বলা হয়েছে।

তবে কোনো কোনো আলেম বলেন, খতমে তারাবীহ শেষে যদি কোনো মহল্লাবাসী খুশি হয়ে হাফেজদের পুরস্কার দেয়, কিংবা হাফেজদেরকে বেতন নির্ধারণ করে ওয়াক্তিয়া নামাজ ও তারাবীর নামাজের ইমাম নিয়োগ দেওয়া হয়, কিংবা যদি হাফেজদের পথ খরচ ও থাকা-খাওয়া বাবদ কিছু পয়সা দেওয়া হয় তবে তা জায়েজ। কিন্তু আদৌ মনে মনে তা কল্পনা করা যাবে না যে, এটি খতমে তারাবীর বিনিময়, তাহলে হারাম-এর হুকুম চলে আসবে। কিন্তু কোনো কোনো মুফতি আরো কঠিন হয়ে বলে থাকেন, হাফেজদেরকে এভাবে এতটুকু দেওয়াও জায়েজ নেই; বরং একেবারে ফী সাবিলিল্লাহ হাফেজগণ তারাবীতে এক খতম তেলাওয়াত শুনাবে। যে-কোনো হিলা-বাহানা করেই তাদেরকে কিছু দেওয়া হোক না কেন তা তেলাওয়াতের বিনিময়ই হয়ে যায়। অতএব, এর থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

فَصْلٌ عِنْدَ الْكُسُوْفِ يُصَلِّىْ اِمَامُ الْجُمُعَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَالنَّفْلِ اَىْ عَلٰى هَيْأَةِ النَّافِلَةِ بِلَا اَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَعِنْدَنَا فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوْعٌ وَاحِدٌ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) رُكُوْعَانِ مُخْفِيًّا مُطَوِّلاً قِرَاءَتَهٗ فِيْهِمَا وَبَعْدَهُمَا يَدْعُوْ حَتّٰى تَنْجَلِىَ الشَّمْسُ وَلَا يَخْطُبُ وَاِنْ لَمْ يَحْضُرْ اَىْ اِمَامُ الْجُمُعَةِ صَلَّوْا فُرَادٰى كَالْخُسُوْفِ وَلَا جَمَاعَةَ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ وَلَا خُطْبَةَ وَاِنْ صَلَّوْا وُحْدَانًا جَازَ وَهُوَ دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ بِلَا قَلْبِ رِدَاءٍ وَحُضُوْرِ ذِمِّىٍّ ـ

অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের নামাজ

অনুবাদ : সূর্যগ্রহণের সময় জুমার ইমাম লোকদেরকে নিয়ে নফলের ন্যায় দুই রাকাত নামাজ পড়বে। অর্থাৎ আজান ও ইকামত ব্যতীত নফলের আকৃতিতে পড়বে। আমাদের নিকট প্রত্যেক রাকাতে একটি করে রুকু [যেরূপ অন্যান্য নামাজে হয়ে থাকে, কিন্তু] ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট প্রত্যেক রাকাতে দুটি করে রুকু। উভয় রাকাতে কেরাত আস্তে এবং দীর্ঘ পড়বে। উভয় রাকাতের পর সূর্য আলোকিত হওয়া পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবে এবং খুতবা দেবে না। যদি তিনি তথা জুমার ইমাম উপস্থিত না হন তবে লোকেরা জামাত ছাড়া একাকী নামাজ পড়বে। যেরূপ চন্দ্র গ্রহণের নামাজ পড়ে থাকে। ইস্তিসকার নামাজে জামাতও নেই এবং খুতবাও নেই। যদি একাকী নামাজ পড়ে তবে জায়েজ। ইস্তিসকা মূলত দোয়া ও ইস্তিগফার। দোয়া ও ইস্তিগফারে কিবলামুখী হবে। [ইস্তিসকার নামাজে] কালবে রিদা [চাদর পরিবর্তন] করবে না এবং জিম্মি উপস্থিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خُسُوْف ও كُسُوْف শব্দের অর্থ : আরবি পরিভাষায় كُسُوْف ও خُسُوْف শব্দদ্বয় গ্রহণের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়- كُسِفَتِ الشَّمْسُ وَخُسِفَتِ الشَّمْسُ "সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে।" অনুরূপ চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রেও উক্ত শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়। তবে সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে كُسُوْف এবং চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রে خُسُوْف শব্দ অধিক প্রযোজ্য বলে মনে হয়। এটিই ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষা। গবেষকদের ধারণায় চন্দ্র, সূর্য এবং পৃথিবী ঘুরে। কখনো কখনো তিনটি একই কক্ষ পথে একটি অপরটির মুখোমুখি চলে আসে। অনুরূপ কখনো পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যখানে চন্দ্র প্রতিবন্ধক হয়ে যায় তখন সূর্যের আলোর পর্দা পড়ে যায়, যাকে সূর্যগ্রহণ বলা হয়। অনুরূপ চন্দ্র এবং সূর্যের মধ্যখানে পৃথিবী প্রতিবন্ধক হয়ে যায়, যাকে চন্দ্রগ্রহণ বলে।

قَوْلُهٗ عِنْدَ الْكُسُوْفِ يُصَلِّىْ الخ :

সূর্যগ্রহণের নামাজ : যদি সূর্যগ্রহণ লেগে যায়, তবে জুমার ইমাম সাহেব জামে মসজিদ কিংবা ঈদগাহে গিয়ে লোকদেরকে নিয়ে নফলের অনুরূপ দুই রাকাত নামাজ আদায় করবেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে নফল নামাজ আজান ও ইকামত ছাড়া আদায় করা হয় তেমনিভাবে সূর্যগ্রহণের নামাজও আজান-ইকামত ছাড়া আদায় করবেন। উল্লেখ্য যে, দুই রাকাত হচ্ছে- সর্বনিম্ন নামাজ। এর চেয়ে বেশিও পড়তে পারে। তবে বেশি পড়লে প্রতি চার রাকাত কিংবা দুই রাকাতের মাথায় অবশ্যই সালাম ফিরাতে হবে।

সূর্যগ্রহণের নামাজে রুকুর সংখ্যা : সূর্যগ্রহণের নামাজের প্রত্যেক রাকাতে রুকু একটি হবে নাকি দুটি হবে? এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ-

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আহনাফ বলেন, প্রত্যেক রাকাতে একটি করে রুকু হবে। যেমনটি অন্যান্য নামাজে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, প্রত্যেক রাকাতে দুটি করে রুকু হবে।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন–

خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَ صَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهٗ فَكَبَّرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَيَرْكَعُ رُكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِىَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَفَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ فَاسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ بِاَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهٖ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ ـ

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ -এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তিনি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং দাঁড়িয়ে পিছনের লোকদেরকে কাতারবন্দী করলেন। তারপর তাকবীরে তাহরীমা বলে দীর্ঘ কেরাত পড়লেন। অতঃপর তাকবীর বলে লম্বা রুকু করলেন। তারপর রুকু থেকে মাথা উঠালেন এবং 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বললেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কেরাত পড়লেন, তবে এ কেরাত প্রথম কেরাতের তুলনায় ছোট ছিল। তারপর তাকবীর বলে দীর্ঘ রুকু করলেন, তবে এ রুকু পূর্বের রুকুর তুলনায় সংক্ষিপ্ত ছিল। অতঃপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলে মাথা উঠালেন। তারপর সিজদা করলেন এবং দ্বিতীয় কেরাতেও একই আমল করলেন। সুতরাং তিনি [দুই রাকাত] চার রুকু ও চার সিজদার মাধ্যমে পূর্ণ করলেন। তাঁর নামাজ থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে লোকদেরকে খুতবা শুনালেন এবং আল্লাহ তা'আলার শান অনুযায়ী হাম্দ ও ছানা পড়ে ইরশাদ করেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলি হতে দুটি নিদর্শন। কারো হায়াত-মওতের কারণে গ্রহণ লাগে না। তাই যখন তোমরা তা দেখবে তখন নামাজের দিকে দৌড়ে যাবে।" এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূল ﷺ এক রাকাতে দুই রুকু করেছেন।

আহনাফের দলিল হলো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন–

اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ـ

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ -এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ লাগে। তখন রাসূল ﷺ এত দীর্ঘ সময় দাঁড়ালেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি রুকু করবেন না। অতঃপর তিনি এ পরিমাণ সময় রুকু করলেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি মাথা উঠাবেন না। অতঃপর মাথা উঠালেন। মনে হচ্ছিল যে, তিনি সিজদায় যাবেন না। অতঃপর সিজদায় গেলেন। মনে হচ্ছিল যে, তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন না। তারপর মাথা উঠালেন। মনে হচ্ছিল যে, দ্বিতীয় সিজদা করবেন না। তারপর দ্বিতীয় সিজদা করলেন। মনে হচ্ছিল যে, তিনি মাথা উঠাবেন না। কিন্তু তিনি মাথা উঠালেন। একই আমল তিনি দ্বিতীয় রাকাতেও করলেন।" উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূল ﷺ এক রাকাতে একটি মাত্র রুকু করেছেন। যদিও ঐ রুকু ও সিজদা অনেক দীর্ঘ ছিল।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম মুহাম্মদ (র.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, রাসূল ﷺ সম্ভবত অনেক দীর্ঘ রুকু করেছেন। যার কারণে প্রথম কাতারের লোকেরা ধারণা করেছে যে, রাসূল ﷺ রুকু থেকে উঠে গেছেন, তাই তাঁরাও মাথা উঠিয়ে ফেলেছিলেন। পরে যারা প্রথম কাতারের পিছনে ছিলেন, তারাও তাদেরকে দেখে মাথা উঠিয়ে নেন। অতঃপর প্রথম কাতারের লোকেরা যখন দেখল যে, রাসূল ﷺ তো এখনো রুকুতে আছেন তখন তাঁরা আবার রুকুতে চলে গেলেন এবং যাঁরা তাঁদের পিছনে ছিলেন তারাও দ্বিতীয়বার রুকুতে চলে যান। এখন প্রথম কাতারের পিছনের লোকেরা ভাবলেন যে, তিনি দুবার রুকু করেছেন। আর এটিই তাঁরা রেওয়ায়েত করতে থাকেন।

সূর্যগ্রহণের নামাজে কেরাত : সূর্যগ্রহণের নামাজে কেরাত আস্তে আস্তে এবং দীর্ঘ কেরাত পড়বে। কেননা, আবূ দাঊদ শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "হুজুর ﷺ সূর্যগ্রহণের নামাজে কেরাত পড়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা তাঁর কেরাত শুনিনি।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি সূর্যগ্রহণের নামাজে রাসূল ﷺ -এর কেরাতের একটি অক্ষরও শুনিনি।" –তবে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়ার একটি অভিমতও রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ সূর্যগ্রহণের নামাজে কেরাত جَهْرًا পড়েছেন। কিন্তু ওলামায়ে আহনাফ একে সূর্যগ্রহণের নামাজে শিক্ষাদানের উপর প্রয়োগ করেছেন। কেরাত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ কেরাত দীর্ঘ পড়তেন এবং প্রায় সূরা বাকারার সমপরিমাণ কেরাত পড়তেন। কেরাতের ন্যায় রুকু-সিজদাকেও দীর্ঘ করবে। এমনকি দীর্ঘ দোয়া করবে, যেন সূর্য আলোকিত হয়ে যায়।

সূর্যগ্রহণের নামাজে খুতবা নেই : সূর্যগ্রহণের নামাজ শেষে খুতবা দেওয়া সুন্নত নয়। রাসূল ﷺ থেকে যে খুতবা দেওয়ার কথা বর্ণিত আছে– তা উপস্থিত লোকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার জন্য দিয়েছেন। অতএব, সূর্যগ্রহণের নামাজে খুতবা শরিয়ত অনুমোদিত নয়। ঘটনা হচ্ছে, যেদিন রাসূল ﷺ -এর সাহেবজাদা ইবরাহীম ইবনে নবী ﷺ -এর মৃত্যু হয় সেদিন ঘটনাক্রমে সূর্যগ্রহণ লাগে। তখন কোনো কোনো লোক বলতে লাগল, নবীর ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ লেগেছে। অতএব, যখন রাসূল ﷺ লোকদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা শুনলেন তখন নামাজ শেষে বললেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনাবলি হতে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ লাগে না।

قَوْلُهٗ صَلُّوْا فُرَادٰى كَالْخُسُوْفِ : অর্থাৎ যদি জুমার বা ঈদগাহের ইমাম উপস্থিত না হয় তবে প্রত্যেকে একা একা নামাজ পড়বে; জামাত করবে না। কিন্তু যদি ইমাম অন্য কাউকে ইমামতি করার অনুমতি দিয়ে দেয় তবে জামাত করতে পারবে। গ্রন্থকার كَالْخُسُوْفِ বলে একথার দিকে ইশারা করেছেন যে, খুসূফ [চন্দ্রগ্রহণ]-এর নামাজে মোটেই জামাত নেই; বরং চন্দ্রগ্রহণের সময় প্রত্যেক মুসল্লি একা একা নামাজ পড়বে।

ইস্তিসকা নামাজের স্থল : ইস্তিসকা অর্থ– পানি চাওয়া। ইস্তিসকার নামাজ এমন স্থানে হয় যেখানে নদ-নদী, খাল-বিল এবং কূপ ইত্যাদি নেই– যার থেকে নিজে পানি পান করবে কিংবা পশুপাখিকে পানি পান করাবে। কিংবা এগুলো আছে, কিন্তু তাদের প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট হচ্ছে না। কেননা, এসব জিনিস যদি যথেষ্ট পরিমাণ থাকে তবে লোকেরা ইস্তিসকার জন্য বের হবে না। কারণ, ইস্তিসকা অধিক প্রয়োজনের সময় হয়ে থাকে।

ইস্তিসকার নিয়ম : ইস্তিসকার ক্ষেত্রে সুন্নত হলো, ইমাম মহল্লার লোকদেরকে তিনদিন পর্যন্ত রোজা রাখতে বলবেন। অতঃপর চতুর্থ দিন লোকদেরকে নিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে ময়দানে যাবেন এবং তওবা ও ইস্তিগফার করবেন। এভাবে তিনদিন করবেন। তবে সেখানে নামাজ পড়বেন কিনা? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট ইস্তিসকা হচ্ছে– তওবা ও ইস্তিগফার-এর নাম। এতে নামাজ নেই। আর যেহেতু নামাজ নেই তাই এতে জামাত ও খুতবাও নেই। কেননা, জামাত নামাজের অনুগামী আর খুতবা জামাতের অনুগামী। ইমামত্রয় ও সাহেবাইন (র.)-এর নিকট ইমাম লোকদেরকে দুই রাকাত নামাজ পড়াবেন এবং দোয়া ও ইস্তিগফার করবেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকটও যদি ইমাম লোকদের নিয়ে জামাত পড়ে তবে তা জায়েজ।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ـ

অর্থাৎ "তখন আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।"

وَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি প্রেরণ করাকে ইস্তিগফারের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন; নামাজের সাথে করেননি।

ইমামত্রয় ও সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে–

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتّٰى اَتَى الْمُصَلّٰى فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهٖ وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدَيْنِ .

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বের হয়ে ঈদগাহে তশরিফ নিলেন। কিন্তু খুতবা পড়েননি। দোয়া ও কান্নাকাটির মধ্যেই লিপ্ত ছিলেন। তিনি দুই রাকাত নামাজ পড়ালেন যেমনটি দুই ঈদে পড়া হয়।" এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইস্তিসকার জন্য দুই রাকাত নামাজ রয়েছে।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ : রাসূল ﷺ ইস্তিসকার মাঝে কখনো নামাজ পড়েছেন আবার কখনো বর্জন করেছেন। এজন্য এর দ্বারা ইস্তিসকার নামাজ জায়েজ হওয়া তো প্রমাণিত হয়, কিন্তু সুন্নত হওয়া প্রমাণিত হয় না। আর নামাজ পড়া জায়েজ আমরাও বলি।

قَوْلُهُ بِلَا قَلْبِ رِدَاءٍ : অর্থাৎ ইস্তিসকার নামাজে চাদর উল্টিয়ে পড়বে না, তথা উপরের দিককে নীচের দিকে এবং ডানদিককে বামদিকে দেবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। দলিল হলো, এমন হাদীস নেই যাতে রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তা ছাড়া এটাতো একটি দোয়া মাত্র। সুতরাং অন্যান্য দোয়ার সাথেই তাকে বিবেচনা করতে হবে। আর অন্যান্য দোয়ার মধ্যে চাদর উল্টানো নেই, এজন্য ইস্তিসকার দোয়ার মধ্যেও চাদর উল্টানো হবে না। পক্ষান্তরে ইমামত্রয় ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট চাদর উল্টানো সুন্নত। দলিল হলো, আবূ দাউদ শরীফে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূল ﷺ ইস্তিসকার নামাজে চাদর উল্টিয়েছেন। এর উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, রাসূল ﷺ -এর চাদর উল্টানো সুলক্ষণ হিসেবে, কিংবা রাসূল ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে আকাশের অবস্থা পরিবর্তন হওয়া চাদর উল্টানোর সময় জানানো হয়েছিল, এজন্য তিনি চাদর উল্টিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ وَحُضُوْرُ ذِمِّيٍّ : ইস্তিসকার জমায়েতে কাফের যাবে না, যদিও সে জিম্মি হয়। কেননা, ইস্তিসকা মূলত রহমত তলব করা। আর কাফেরদের উপর আল্লাহর লানত হয়। এজন্য তার উপস্থিতিতে সফলতা হয়তো নাও আসতে পারে।

بَابُ اِدْرَاكِ الْفَرِيْضَةِ

مَنْ شَرَعَ فِىْ فَرْضٍ فَاُقِيْمَتْ لَهٗ اِنْ لَمْ يَسْجُدْ لِلرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى اَوْ سَجَدَ وَهُوَ فِىْ غَيْرِ الرُّبَاعِىْ اَوْ فِيْهِ وَضَمَّ اِلَيْهَا اُخْرٰى قَطَعَ وَاقْتَدٰى اَىْ مَنْ شَرَعَ فِىْ فَرْضٍ مُنْفَرِدًا فَاُقِيْمَتْ لِهٰذَا الْفَرْضِ وَالضَّمِيْرُ فِىْ اُقِيْمَتْ يَرْجِعُ اِلَى الْاِقَامَةِ كَمَا يُقَالُ ضُرِبَ ضَرْبٌ فَاِنْ لَمْ يَسْجُدْ لِلرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى قَطَعَ وَاقْتَدٰى وَاِنْ سَجَدَ فَاِنْ كَانَ فِىْ غَيْرِ الرُّبَاعِىِّ فَكَذَا لِاَنَّهٗ اِنْ لَمْ يَقْطَعْ وَصَلّٰى رَكْعَةً اُخْرٰى يَتِمُّ صَلَاتُهٗ فِى الثُّنَائِىِّ وَيُوْجَدُ الْاَكْثَرُ فِى الثُّلَاثِىْ وَلِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فَتَفُوْتُهُ الْجَمَاعَةُ وَلِاَنَّهٗ يَصِيْرُ مُتَنَفِّلًا بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْغُرُوْبِ فِى الْمَغْرِبِ وَالْقَطْعُ وَاِنْ كَانَ اِبْطَالًا لِلْعَمَلِ وَهُوَ مَنْهِىٌّ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ فَالْاِبْطَالُ لِقَصْدِ الْاِكْمَالِ لَا يَكُوْنُ اِبْطَالًا وَاِنْ كَانَ فِى الرُّبَاعِىِّ يَضُمُّ رَكْعَةً اُخْرٰى حَتّٰى يَصِيْرَ رَكْعَتَانِ نَافِلَةً ثُمَّ يَقْطَعُ وَيَقْتَدِىْ فَقَوْلُهٗ وَضَمَّ اِلَيْهَا حَالٌ مِنْ قَوْلِهٖ اَوْ فِيْهِ تَقْدِيْرُهٗ اَوْ سَجَدَ لِلرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَهُوَ حَاصِلٌ فِى الرُّبَاعِىِّ وَقَدْ ضَمَّ اِلَى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى رَكْعَةً اُخْرٰى فَقَطَعَ وَاقْتَدٰى حَتّٰى لَوْ لَمْ يَضُمَّ اِلَيْهَا اُخْرٰى لَا يَقْطَعُ بَلْ يَضُمُّ فَاِذَا ضَمَّ قَطَعَ وَاقْتَدٰى ـ

পরিচ্ছেদ : জামাত পাওয়ার মাসায়েল

অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি ফরজ নামাজ শুরু করেছে, অতঃপর নামাজের জন্য ইকামত বলা হচ্ছে, তাহলে যদি সে উক্ত নামাজের প্রথম রাকাতের সিজদা না করে থাকে, কিংবা সিজদা করেছে, কিন্তু উক্ত নামাজ চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজ নয়, কিংবা সেটি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজ তবে প্রথম রাকাতের সাথে দ্বিতীয় রাকাতও মিলিয়ে ফেলেছে– তবে সে নামাজকে ছেড়ে দেবে এবং জামাতে শামিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ কেউ একা একা ফরজ নামাজ শুরু করেছে– অতঃপর উক্ত ফরজ নামাজের জন্য ইকামত বলা হচ্ছে [অর্থাৎ জামাত দাঁড়াচ্ছে]। এখানে اُقِيْمَتْ -এর ضَمِيْر ইকামত (اِقَامَةٌ) -এর দিকে ফিরেছে। যেমন বলা হয় ضرب ضرب [প্রহারের কাজ সংঘটিত হওয়ার অর্থে]। তখন যদি প্রথম রাকাতের সিজদা না করে থাকে তবে সে নামাজ ছেড়ে দেবে এবং জামাতে শামিল হয়ে যাবে। আর যদি সিজদা করে থাকে এবং নামাজ চার রাকাতবিশিষ্ট না হয়, তবে হুকুম একই [অর্থাৎ নামাজ ছেড়ে দেবে এবং জামাতে শামিল হয়ে যাবে]। কেননা, যদি সে নামাজ না ছাড়ে এবং দ্বিতীয় রাকাতও পড়ে ফেলে, তবে দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে তার নামাজ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর তিন রাকাতবিশিষ্ট নামাজের অধিক অংশ পাওয়া যায়, আর অধিক অংশের জন্য পূর্ণাঙ্গের হুকুম রয়েছে। অতএব, তার জামাত ছুটে যাবে এজন্য যে, মাগরিবের নামাজে সূর্যাস্তের পর দুই রাকাত নফল আদায় হয়ে যাবে। [অথচ সূর্যাস্তের পর ফরজের পূর্বে নফল পড়া মাকরূহ।] নামাজ ভঙ্গ করা যদিও আমল বাতিল করা, আর আমল বাতিল করা আল্লাহর বাণী– وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ [তোমরা তোমাদের আমল বাতিল করো না]-এর কারণে নিষিদ্ধ বিষয়, কিন্তু আমলকে পূর্ণতাদানের উদ্দেশ্যে আমল বাতিল করার দ্বারা মূলত আমল বাতিল করা হয় না। আর যদি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজ হয়, তবে দ্বিতীয় রাকাত মিলিয়ে নেবে যেন দুই রাকাত নফল হয়ে যায়। অতঃপর নামাজ ছেড়ে দিয়ে ইকতিদা করবে। গ্রন্থকারের কথা "وَضَمَّ إِلَيْهَا" তার কথা اَوْ

فَاِذَا ضَمَّ قَطَعَ وَاقْتَدٰى থেকে حَالٌ فِيْهِ হয়েছে। আর ইবারত হবে اَوْ سَجَدَ لِلرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى تَقْدِيْرِىْ থেকে পর্যন্ত। অর্থাৎ যদি প্রথম রাকাতের সিজদা করে ফেলে উক্ত নামাজ চার রাকাতবিশিষ্ট হয় এবং প্রথম রাকাতের সাথে দ্বিতীয় রাকাত মিলিয়ে থাকে, তবে নামাজ ছেড়ে দিয়ে ইকতিদা করবে। আর যদি দ্বিতীয় রাকাত না মিলিয়ে থাকে, তবে নামাজ শেষ করবে না; বরং দ্বিতীয় রাকাত মিলিয়ে নামাজ সমাপ্ত করে ইকতিদা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ شَرَعَ فِىْ فَرْضٍ : অর্থাৎ যদি কেউ কোনো ফরজ নামাজ যেমন, জোহরের নামাজ একাকী পড়তে শুরু করেছে– তারপর ঐ জোহরের নামাজের জামাত দাঁড়িয়েছে এবং ইকামত চলছে এখন দেখা হবে যে, ঐ একাকী নামাজ পড়ুয়া ব্যক্তি ঐ নামাজের কতটুকু আদায় করেছে– যদি সে প্রথম রাকাতের সিজদা না করে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সে ঐ নামাজ ছেড়ে দেবে এবং জামাতে শামিল হয়ে যাবে। কেউ কেউ তো এ কথাও বলেছেন যে, যদি সে প্রথম রাকাতের সিজদাও করে ফেলে তবুও সে ঐ নামাজ ছেড়ে জামাতে শরিক হবে। জোহর ও জুমার পূর্বের সুন্নতের হুকুমও অনুরূপ। অর্থাৎ সুন্নত পড়তে শুরু করলে যদি এমতাবস্থায় ফরজের জামাত দাঁড়িয়ে যায়, তবে ঐ সুন্নত ছেড়ে দিয়ে ফরজের জামাতে শরিক হয়ে যাবে, যদি প্রথম রাকাতের সিজদা না করে থাকে। পক্ষান্তরে যদি প্রথম রাকাতের সিজদা করে থাকে, তবে দেখতে হবে সে চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজ পড়ছে, নাকি তিন কিংবা দুই রাকাতবিশিষ্ট নামাজ পড়ছে। যদি তিন কিংবা দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজ পড়ে থাকে তবে সে ঐ অবস্থায়ই নামাজ ছেড়ে দেবে এবং জামাতে শরিক হয়ে যাবে। কেননা, যদি সে নামাজ না ছাড়ে; বরং এর সাথে অন্য একটি রাকাত মিলিয়ে নেয়– তবে এর মর্ম হচ্ছে, যদি দুই রাকাতবিশিষ্ট নামাজ হয়, তবে পরিপূর্ণ হয়ে যায়– তাই এখন হুকুম এমন হয় যে, নামাজ না ছেড়ে পূর্ণ করে ফেলবে। কেননা, তাকে সর্বোচ্চ বলা যাবে, তার জামাত ছুটে গেছে। আর যদি সে তিন রাকাতবিশিষ্ট নামাজ পড়ে থাকে, তবে এর সাথে দ্বিতীয় রাকাত মিলানোর দ্বারা তার অধিকাংশ নামাজ পড়া হয়ে যাচ্ছে। আর لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ হিসেবে তার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। অনুরূপ সে এখন নামাজ না ছেড়ে নামাজকে পরিপূর্ণ করবে। তিন রাকাতবিশিষ্ট নামাজের আরো একটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তিন রাকাত ফরজ শুধু মাগরিবের। আর মাগরিবের নামাজে যদি সে প্রথম রাকাতের সাথে দ্বিতীয় রাকাত মিলিয়ে সালাম ফিরিয়ে গিয়ে জামাতে শরিক হয়, তবে তার পূর্বের দুই রাকাত হচ্ছে নফল। অথচ আমাদের ফুকাহায়ে কেরামের নিকট সূর্যাস্তের পর মাগরিবের ফরজ আদায়ের পূর্বে নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। মাকরূহ হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয় যে, মাগরিবের নামাজ শুরু ওয়াক্তে পড়া সুন্নত। আর নফল পড়ার দ্বারা মাগরিবের ফরজ বিলম্ব হয়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ এমনভাবে নফল পড়ে যে, মাগরিবের ফরজ বিলম্ব হয় না– তবে মাকরূহ হবে না।

আর উক্ত নামাজ যদি চার রাকাতবিশিষ্ট হয়, তবে সে প্রথম রাকাতের সাথে দ্বিতীয় রাকাতকে মিলিয়ে নেবে এবং সালাম ফিরিয়ে জামাতে শরিক হবে, তাহলে উক্ত দুই রাকাত তার তার নফল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَالْقَطْعُ وَاِنْ كَانَ اِبْطَالًا الخ : **প্রশ্ন :** পূর্বোল্লিখিত হুকুমের উপর একটি মন্তব্য হয় যে, যে নামাজ সে শুরু করেছে, তা তো মূলত আমলই। আর আমলকে বাতিল করা থেকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই বারণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে– وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ "তোমরা তোমাদের আমলকে বাতিল করো না।" এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, শুরু করা নামাজ ভেঙ্গে ফেলা নিষিদ্ধ। তথাপিও উক্ত নামাজ ভেঙ্গে জামাতে শামিল হওয়ার হুকুম কিভাবে দেওয়া হলো? **উত্তর :** শারেহ (র.) এর উত্তরে লেখেন, নামাজ ভাঙ্গা যদিও اِبْطَالُ الْعَمَلِ যা নিষিদ্ধ, কিন্তু তা اِكْمَالٌ বা পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্যে হচ্ছে, اِفْسَادٌ-এর উদ্দেশ্য নয়। কারণ, একা নামাজ পড়ার চেয়ে জামাতে নামাজ পড়া উত্তম। তাই শরয়ীভাবে তা اِبْطَالٌ বা ভঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়।

قَوْلُهُ حَتّٰى يَصِيْرَ رَكْعَتَانِ الخ : এটি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজে দ্বিতীয় রাকাত মিলানোর পর সালাম ফিরানোর হিকমত। অর্থাৎ যদি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজ পড়ে এবং এক রাকাত পড়ার পর জামাত শুরু হয় তবে হুকুম হচ্ছে, ঐ রাকাতের সাথে অন্য রাকাত মিলিয়ে সালাম ফিরাবে এবং জামাতে শরিক হয়ে যাবে। যেন তার আদায়কৃত রাকাতটি অনর্থক না হয়ে যায়; বরং এ দুটি রাকাত নফল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَقَطَعَ وَاقْتَدٰى الخ : বাহরুর রায়িক গ্রন্থকার বলেন, নামাজ ভঙ্গ করা কখনো হারাম হয়, কখনো মুবাহ হয়, কখনো মোস্তাহাব এবং কখনো ওয়াজিব হয়। অতএব, ওজর ব্যতীত নামাজ ভাঙ্গা হারাম। মালামাল ধ্বংস হওয়ার ভয়ে নামাজ ভাঙ্গা মুবাহ। নামাজকে উত্তম ও اَكْمَلْ পদ্ধতিতে আদায় করার জন্য নামাজ ভাঙ্গা মোস্তাহাব এবং কারো জীবন বাঁচানোর জন্য ভাঙ্গা ওয়াজিব।

وَإِنْ صَلّٰى ثَلَاثًا مِنْهُ اَيْ مِنَ الرُّبَاعِيِّ يَتِمُّهُ ثُمَّ يَقْتَدِيْ مُتَنَفِّلًا لِاَنَّهُ قَدْ اَدَّى الْاَكْثَرَ وَلِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ اِلَّا فِي الْعَصْرِ اَيْ لَا يَقْتَدِيْ فَاِنَّ النَّافِلَةَ بَعْدَ اَدَاءِ الْعَصْرِ مَكْرُوْهٌ وَكُرِهَ خُرُوْجُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مِنْ مَسْجِدٍ اُذِّنَ فِيْهِ لَا لِمُقِيْمِ جَمَاعَةٍ اُخْرٰى اَيِ الَّذِيْ يَنْتَظِمُ بِهِ اَمْرُ جَمَاعَةٍ اُخْرٰى بِاَنْ يَّكُوْنَ مُؤَذِّنَ مَسْجِدٍ اَوْ اِمَامَهُ اَوْ مَنْ يَقُوْمُ بِاَمْرِهِ جَمَاعَةٌ يَتَفَرَّقُوْنَ اَوْ يَقِلُّوْنَ بِغَيْبَتِهِ ثُمَّ عَطَفَ عَلٰى قَوْلِهِ لَا لِمُقِيْمِ جَمَاعَةٍ قَوْلَهُ وَلِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ اَوِ الْعِشَاءَ مَرَّةً اِلَّا عِنْدَ الْاِقَامَةِ اَيْ لَا يُكْرَهُ لَهُ الْخُرُوْجُ اِلَّا عِنْدَ الْاِقَامَةِ فَالْاِسْتِثْنَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ اَوِ الْعِشَاءَ مَرَّةً وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِقَوْلِهِ لَا لِمُقِيْمِ جَمَاعَةٍ اُخْرٰى فَاِنَّ مُقِيْمَ الْجَمَاعَةِ الْاُخْرٰى لَا يُكْرَهُ لَهُ الْخُرُوْجُ وَاِنْ اُقِيْمَتْ.

অনুবাদ : আর যদি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের তিন রাকাত পড়ে ফেলে তবে তা পূর্ণ করবে, অতঃপর নফলের নিয়তে ইকতিদা করবে। কেননা, সে নামাজের অধিকাংশ আদায় করে ফেলেছে। আর অধিকাংশের জন্য পূর্ণাঙ্গের হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু আসরের নামাজে ইকতিদা করবে না। কেননা, আসরের নামাজ আদায় করার পর নফল পড়া মাকরূহ। যে ব্যক্তি এখনো নামাজ পড়েনি, তার জন্য এমন মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ, যাতে আজান দেওয়া হয়েছে। তবে অন্য জামাত কায়েমকারীর জন্য মাকরূহ নয়। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যার মাধ্যমে অন্য [জায়গায় অন্য] জামাত হয়, তা এভাবে যে, সে অন্য কোনো মসজিদের মুয়াজ্জিন কিংবা ইমাম কিংবা সে এমন লোক যার হুকুমে জামাত দাঁড়ায় এবং তার অনুপস্থিতিতে মুসল্লি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কিংবা মুসল্লি কম হয় [তবে তার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ নয়]। অতঃপর গ্রন্থকার স্বীয় কথা لَا لِمُقِيْمِ جَمَاعَةٍ -এর উপর عَطْف করে বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার জোহর কিংবা ইশার নামাজ পড়েছে, তার জন্য বের হওয়া মাকরূহ নয়। তবে ইকামতের সময় বের হওয়া মাকরূহ। অতএব, এ ইসতিছনা وَلِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ اَوِ الْعِشَاءَ مَرَّةً -এর সাথে সম্পৃক্ত। لَا لِمُقِيْمِ جَمَاعَةٍ اُخْرٰى -এর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা অন্য জামাত কায়েমকারীর জন্য ইকামতের সময়ও বের হওয়া মাকরূহ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ يَقْتَدِيْ مُتَنَفِّلًا : সে তার একাকী শুরু করা ফরজ নামাজ শেষ করে ইমামের সাথে নফলের ইকতিদা করবে কেননা, ফরজ নামাজ একাধিকবার হয় না। রাসূল ﷺ এমন দুই ব্যক্তিকে বলেছেন, যারা নামাজ পড়ছিলেন, "যখন তোমরা তোমাদের হাওদায় নামাজ পড়ে ফেলবে, অতঃপর ঐ নামাজই পড়ুয়া অন্যকোনো জামাতের সাক্ষাৎ পাবে, তবে তাদের সাথে নামাজ দ্বিতীয়বার পড়বে এবং একে নফল মনে করবে।"– [আবূ দাউদ, তিরমিযী]

কিন্তু এখানে একটি সন্দেহ হয় যে, নফল নামাজ এভাবে জামাতে পড়া আবশ্যক হয়ে যায়, যা মাকরূহ। এর উত্তর হচ্ছে, নফল জামাতে পড়া তখন মাকরূহ হয়– যখন ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে নফল পড়ে। পক্ষান্তরে যদি ইমাম ফরজ পড়ে এবং মুক্তাদী তার পিছনে নফলের ইকতিদা করে তবে তা মাকরূহ নয়।

قَوْلُهُ اِلَّا فِى الْعَصْرِ : অর্থাৎ চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজে তিন রাকাত পড়ার পর যদি ঐ নামাজের জামাত শুরু হয়, তবে সে নামাজ ভাঙ্গবে না; বরং নামাজ শেষ করে নফলের নিয়তে জামাতে শরিক হবে। তবে এ হুকুম আসরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা, আসরের নামাজ পড়ার পর নফল পড়া মাকরূহ। অনুরূপ ফজরের নামজের ক্ষেত্রেও। কেননা, ফজরের ফরজ পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নফল পড়া মাকরূহ। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে। অনুরূপ হুকুম মাগরিবের নামাজের ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ যে ব্যক্তি একাকী মাগরিবের নামাজ পড়ে ফেলেছে– অতঃপর ঐ মাগরিবের নামাজেরই জামাত হচ্ছে, তবে সে উক্ত জামাতে নফলের নিয়তে শরিক হতে পারবে না। কেননা মাগরিব হচ্ছে তিন রাকাত, আর তিন রাকাততো কোনো নফল নামাজ নেই। তাই একাকী ফরজ পড়ার পর উক্ত ফরজ নামাজের জামাতে নফলের নিয়তে শরিক হওয়ার হুকুমটি শুধু জোহর ও ইশার সাথে সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَكُرِهَ خُرُوْجُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الخ : অর্থাৎ কোনো মসজিদে আজান হয়েছে কিংবা আজান হচ্ছে আর কোনো ব্যক্তি সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবে তা মাকরূহ তাহরীমী। এ ধরনের ব্যক্তিকে রাসূল ﷺ মুনাফিক বলেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন– مَنْ اَدْرَكَ الْاَذَانَ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيْدُ الرُّجُوْعَ فَهُوَ مُنَافِقٌ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মসজিদে আজান পেয়ে প্রয়োজন ছাড়া [মসজিদ থেকে] বের হয়ে গেল এবং তার ফিরে আসারও নিয়ত নেই, তবে সে মুনাফিক।"– [ইবনে মাজাহ]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে–

اِنَّهُ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا اُذِّنَ فِيْهِ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ আজান হওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া এক ব্যক্তিকে বলেছেন, সে আবুল কাসিম মুহাম্মদ ﷺ -এর অবাধ্যতা করেছে।" [মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য সুনানগ্রন্থ] উল্লেখ্য যে, উক্ত মসজিদ থেকে বের হওয়া যেমন মাকরূহে তাহরীমী অনুরূপ নামাজে শরিক হওয়া ব্যতীত তখন শুধু বসে থাকাও মাকরূহে তাহরীমী।

قَوْلُهُ لَا لِمُقِيْمِ جَمَاعَةٍ اُخْرٰى : অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্য মসজিদে জামাত পড়াবে কিংবা অন্য মসজিদে ইকামত দেবে, তবে তার জন্য আজানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ নয়। জামাত দাঁড়ানোর দ্বারা শুধু তাকবীর বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং জামাতের অন্যান্য বিষয়ও এতে শামিল। তাই শারেহ (র.) ব্যাখ্যা করতঃ এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এতে ইমাম মুয়াজ্জিন এবং অন্য জায়গায় জামাত কায়েমকারী সকলেই এতে শামিল। অন্য জায়গায় জামাত কায়েমকারীদের অন্তর্ভুক্ত ঐ ব্যক্তি ও যে অন্য স্থানে জামাত কায়েম করে না ঠিক, কিন্তু তার উপস্থিতিতে লোকজনের সমাগম অধিক হয় এবং তার অনুপস্থিতিতে লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ ধরনের লোক আজানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ নয়।

قَوْلُهُ وَلِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ اَوِ الْعِشَاءَ الخ : যে ব্যক্তি জোহর কিংবা ইশার নামাজ একাকী পড়েছে কিংবা অন্য মসজিদে জামাতের সাথে পড়েছে তবে তার জন্য আজান হওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ নয়। কেননা, মুয়াজ্জিনের আজানের উপর সে একবার সাড়া দিয়ে ফেলেছে এবং দ্বিতীয়বার তাকে নামাজের হুকুম দেওয়া হবে না। এখন তার ইচ্ছা, নফলের নিয়তে জামাতেও শরিক হতে পারে কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে পারে।

وَالْفَرْقُ بَيْنَ مُقِيْمِ جَمَاعَةٍ وَبَيْنَ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ اَوِ الْعِشَاءَ مَرَّةً اِنَّ هٰذَا اِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ الْخُرُوْجُ لِاَنَّهُ اِنْ خَرَجَ عِنْدَ الْاِقَامَةِ يَتَّهِمُ بِمُخَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ وَيُصَلِّى يَحْرُزُ فَضِيْلَةَ الْمُوَافِقَةِ وَثَوَابَ النَّافِلَةِ فَاِيْثَارُ التُّهْمَةِ وَالْاِعْرَاضِ عَنِ الْفَضِيْلَةِ وَالثَّوَابِ قَبِيْحٌ جِدًّا وَاَمَّا مُقِيْمُ الْجَمَاعَةِ الْاُخْرٰى فَاِنَّهُ اِنْ خَرَجَ عِنْدَ الْاِقَامَةِ لَا يَتَّهِمُ لِاَنَّهُ يَقْصُدُ الْاِكْمَالَ وَهُوَ الْجَمَاعَةُ الَّتِىْ تَتَفَرَّقُ بِغَيْبَتِهِ وَاِنْ لَمْ يَخْرُجْ لَا يَحْرُزُ مَا ذَكَرْنَا بَلْ يَخْتَلُّ اَمْرُ الْجَمَاعَةِ الْاُخْرٰى .

অনুবাদ : অন্য জামাত কায়েমকারীও জোহর কিংবা ইশা একবার আদায়কারীর মাঝে পার্থক্য হচ্ছে, জোহর কিংবা ইশার নামাজ একবার আদায়কারীর জন্য বের হওয়া মাকরূহ। এজন্য যে, যদি সে বের হয়ে যায়, তবে সে জামাতবিরোধীর অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। আর যদি না বের হয় এবং জামাতে শরিক হয়ে নামাজ পড়ে তবে সে مُوَافَقَةٌ-এর ফজিলত ও নফলের ছওয়াব পাবে। সুতরাং অভিযোগকে চয়ন করা এবং ছওয়াব ও ফজিলত থেকে বিমুখ হওয়া নিঃসন্দেহে একটি মন্দ কাজ। পক্ষান্তরে অন্য জামাত কায়েমকারী যদি ইকামতের সময়ও বের হয় তবে সে অভিযুক্ত হবে না। কেননা, সে اِكْمَالْ-এর ইচ্ছা পোষণ করছে। আর اِكْمَالْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– ঐ জামাত, যা তার অনুপস্থিতিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি মসজিদ থেকে না বের হয় তার ফজিলত ও ছওয়াব হাসিল হবে না; বরং তার অন্য জামাতের অবস্থায় অসুবিধা সৃষ্টি করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مُقِيْمِ جَمَاعَةٍ وَبَيْنَ الخ : অন্য মসজিদে জামাত কায়েমকারী এবং একবার জোহর কিংবা ইশার নামাজ আদায়কারীর মাঝে পার্থক্য হলো, জোহর কিংবা ইশা একবার আদায়কারী জামাতে শরিক না হওয়ার দ্বারা জামাতের বিরোধিতা করা আবশ্যক হয় এবং সে জামাতে শরিক হওয়ার দ্বারা ছওয়াব পাবে। তাই তা মাকরূহ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্য জায়গায় জামাত কায়েম করে সে মসজিদ থেকে বের হওয়ার দ্বারা তার উপর অপবাদ আসবে না; বরং সে যদি ঐ মসজিদে না যায় তবে ঐ মসজিদের মুসল্লিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাই তার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ নয়।

قَوْلُهُ قَبِيْحٌ جِدًّا : অপবাদ গ্রহণ করা এবং ছওয়াব থেকে বিমুখ হওয়া একটি মন্দ কথা। কারণ, এতে দুটি খারাবি জমা হয় ১. তার উপর জামাত বর্জন করার অপবাদ লাগে। ২. ফজিলত ও ছওয়াব থেকে সে বিমুখ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لَا يَحْرُزُ مَا ذَكَرْنَا بَلْ الخ : এ ইবারতটি মনে হয় পেঁচের ইবারত। কেননা, যদি সে মসজিদ থেকে না বের হয় এবং জামাতে শরিক হয়ে যায়, তবে এ শরিক হওয়ার মাঝেও তো অধিক ছওয়াব ও ফজিলত রয়েছে। তথাপিও مَا يَحْرُزُ مَا ذَكَرْنَا দ্বারা কি উদ্দেশ্য? যদি مَا ذَكَرْنَا দ্বারা مَا ذَكَرْنَا مِنْ فَضَائِلِ النَّوَافِلِ উদ্দেশ্য হয়, তবে এর জায়গা এটি নয় কেননা, সে প্রথমে ফরজ নামাজ আদায় করেনি। তাই এখন সে যা আদায় করবে তা তার ফরজ নামাজই আদায় করবে বেশির চেয়ে বেশি একথা আবশ্যক হবে যে, দ্বিতীয় জামাতে অসুবিধা সৃষ্টি হবে। হ্যাঁ, এর ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, দ্বিতীয় জামাতের অসুবিধাটা এত বেশি যে, এর মোকাবিলায় এ জামাতের ছওয়াব ও ফজিলত ধর্তব্য হবে না।

وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ اَوِ الْعَصْرَ اَوِ الْمَغْرِبَ يَخْرُجُ وَاِنْ اُقِيْمَتْ لِاَنَّهُ اِنْ صَلّٰى يَكُوْنُ نَافِلَةً وَالنَّافِلَةُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ مَكْرُوْهٌ وَاَمَّا فِى الْمَغْرِبِ فَاِنَّ النَّافِلَةَ لَا تُشْرَعُ ثَلٰثُ رَكَعَاتٍ وَيَتْرُكُ سُنَّةَ الْفَجْرِ وَيَقْتَدِىْ مَنْ لَا يُدْرِكُهُ اَىِ الْفَجْرَ وَالْمُرَادُ فَرْضُهُ بِجَمْعٍ اِنْ اَدَّاهَا وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهُ صَلَّاهَا وَلَا يَقْضِيْهَا اِلَّا تَبْعًا لِفَرْضِهِ اَىْ اِنْ فَاتَتْ سُنَّةُ الْفَجْرِ فَاِنْ فَاتَتْ بِدُوْنِ الْفَرْضِ لَا يَقْضِىْ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَكَذَا بَعْدَ الطُّلُوْعِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَاَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) يَقْضِيْهَا اِلَى الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ وَاِنْ فَاتَتْ مَعَ الْفَرْضِ فَاِنْ قَضٰى قَبْلَ الزَّوَالِ يَقْضِيْهِمَا جَمِيْعًا وَكَذَا بَعْدَ الزَّوَالِ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ (رح) وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا بَلْ يَقْضِىْ الْفَرْضَ وَحْدَهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا فَاتَهُ الْفَجْرُ لَيْلَةَ التَّعْرِيْسِ قَضَاهُ مَعَ السُّنَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِالْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ جَمَاعَةً وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فَعُلِمَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَرْعِيَّةُ الْقَضَاءِ بِالْجَمَاعَةِ وَالْجَهْرُ فِيْهِ وَالْاَذَانُ وَالْاِقَامَةُ لِلْقَضَاءِ وَاِنَّ السُّنَّةَ تَقْضِىْ مَعَ الْفَرِيْضَةِ فَمِنْ هٰذِهِ الْاَحْكَامِ عُلِمَ عَدَمُ اِخْتِصَاصِهِ بِمَوْرِدِ النَّصِّ فَعُدِّىَ عَنْهُ اِلٰى غَيْرِهِ مِنَ الصَّلٰوَاتِ وَهِىَ مَا عَدَا قَضَاءِ السُّنَّةِ فَعُدِّىَ عَنْ مَوْرِدِ النَّصِّ وَهُوَ قَضَاءُ الْفَجْرِ اِلٰى قَضَاءِ سَائِرِ الصَّلٰوَاتِ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ফজর কিংবা আসর কিংবা মাগরিবের নামাজ [একা একা] পড়ে ফেলেছে, সে মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে পারবে যদিও ইকামত বলা হয়। কেননা, যদি সে জামাতে শরিক হয়ে নামাজ পড়ে তবে নফল হবে। আর ফজর ও আসরের পর নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। আর মাগরিবের ক্ষেত্রে এজন্য বের হয়ে যেতে পারবে যে, মাগরিব তিন রাকাত, আর তিন রাকাতবিশিষ্ট নফল নামাজ শরিয়ত অনুমোদিত নয়। ফজরের সুন্নত আদায় করার দ্বারা যদি ফরজের জামাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তবে সুন্নত ছেড়ে দেবে এবং জামাতে শামিল হয়ে যাবে। আর সুন্নত পড়ার দ্বারা যদি এক রাকাত পাওয়ার আশাবাদীও হয়, তবে সুন্নত পড়ে নেবে। ফজরের সুন্নতকে কাজা করবে না, তবে ফজরের ফরজকে কাজা করলে সুন্নতকেও কাজা করতে পারবে। অর্থাৎ যদি ফজরের সুন্নত কাজা হয়ে যায়, তবে যদি তা ফরজ ব্যতীত [শুধু] সুন্নত কাজা হয় তবে শায়খাইন (র.)-এর নিকট সূর্যোদয়ের পূর্বেও কাজা আদায় করবে না এবং সূর্যোদয়ের পরেও না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত কাজা করতে পারবে, পরে নয়। আর যদি ফরজসহ সুন্নত ছুটে যায়, তবে যদি তা দ্বিপ্রহরের পূর্বে কাজা করে, তবে সুন্নত ও ফরজ উভয়টি কাজা করবে। কোনো কোনো ফকীহের নিকট দ্বিপ্রহরের পরেও এভাবে পড়বে। কোনো কোনো ফকীহের নিকট এভাবে পড়বে না; বরং শুধু ফরজ নামাজই কাজা করবে। লাইলাতুত তা'রীসে রাসূল ﷺ [ও সাহাবায়ে কেরাম]-এর যখন ফজরের নামাজ কাজা হয়ে গেল, তখন তিনি দ্বিপ্রহরের পূর্বে আজান, ইকামত, জামাত, উচ্চৈঃস্বরে কেরাত এবং সুন্নতসহ কাজা করেছেন। অতএব, রাসূল ﷺ-এর এ আমল দ্বারা বুঝা যায় যে, জামাতের সাথে কাজা করা শরিয়তে অনুমোদিত, কাজা নামাজে কেরাত উঁচু আওয়াজে হয়, কাজা নামাজের জন্য আজান-ইকামত উভয়টি হয় এবং ফরজের সাথে সুন্নতেরও কাজা রয়েছে। সুতরাং এসব আহকাম থেকে বুঝা গেল যে, নস অবতরণের স্থলের সঙ্গে কাজা খাস নয়। তাই ফজরের নামাজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজের কাজার দিকে একে مُتَعَدِّىْ [ফিরানো] করা হয়েছে, যা সুন্নত ব্যতীত কাজা করা হয়। অতএব, নস অবতরণের স্থল যা ফজরের কাজা প্রসঙ্গে এর থেকে অন্য সব কাজা নামাজের দিকে হুকুমকে ফিরানো হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَخْرُجُ وَإِنْ أُقِيْمَتْ : যে ব্যক্তি ফজর, আসর কিংবা মাগরিবের নামাজ একাকী পড়ে ফেলেছে, সে মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে পারবে। যদিও মসজিদে ইকামত বলতে থাকে। শারেহ (র.) এর কারণ উল্লেখ করেছেন, ফজর এবং আসরের পর নফল নামাজ মাকরূহ। অথচ সে জামাতে শরিক হয়ে যা পড়ত তা তার জন্য নফল হতো। অনুরূপ মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত। সে যদি তখন জামাতে শরিক হয়, তবে সে তিন রাকাত নফল হবে। আর তিন রাকাত নফল শরিয়ত অনুমোদিত নয়। "নাহার" নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এমন পরিস্থিতিতে তার জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া ওয়াজিব। কারণ, নামাজ ব্যতীত সেখানে অবস্থান করা আরো অধিক মাকরূহ। তবে হিদায়া গ্রন্থকার 'মুখতারাতুন নাওয়াযিল' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তার জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া উত্তম।

قَوْلُهُ وَيَتْرُكُ سُنَّةَ الْفَجْرِ الخ : অর্থাৎ যে ব্যক্তি এখনো ফজরের সুন্নত পড়েনি এবং জামাত দাঁড়িয়ে গেছে– এখন যদি তার ধারণা হয় যে, সুন্নত পড়তে পড়তে জামাত ছুটে যাবে তবে সুন্নত ছেড়ে দিয়ে জামাতে শরিক হয়ে যাবে। কারণ, সুন্নত পড়ার চেয়ে জামাত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি তার এ ধারণা হয় যে, সুন্নত পড়ার দ্বারা ফরজের এক রাকাত ছুটে যাবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে সে শামিল হতে পারবে, তবে সে প্রথমে সুন্নত পড়ে নেবে অতঃপর জামাতে শরিক হবে। এটি হলো বিকায়া গ্রন্থকারের অভিমত। কিন্তু ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার ও আল্লামা হালবী (র.) বলেন, যদি সুন্নত পড়ে তাশাহুদের মাঝেও ইমামকে পাওয়ার ধারণা হয়, তবে সুন্নত পড়ে নেবে। কেননা, সমস্ত সুন্নত নামাজের মধ্যে ফজরের এ সুন্নতটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটিই مُفْتٰى بِهٖ অভিমত যে, সুন্নত পড়ে তাশাহহুদের মধ্যে ইমামকে পাওয়ার ধারণা হলে সুন্নত আগে পড়ে নেবে। অন্যথায় জামাতে শরিক হয়ে যাবে এবং সূর্যোদয়ের পর সুন্নত পড়ে নেবে।

قَوْلُهُ صَلَّاهَا وَلَا يَقْضِيْهَا الخ : অর্থাৎ যদি জামাতে শামিল হওয়ার আশা করা যায় তবে সুন্নত পড়বে। কিন্তু সুন্নত মসজিদের বাইরে বারান্দায় কিংবা অন্য কোথাও কিংবা মসজিদের এক কোণায় পড়বে। জামাতের কাতারের সাথে মিলে পড়বে না। কেননা, জামাতে ফরজ নামাজ পড়া হচ্ছে। আর সে পড়ছে সুন্নত। কাতারের লোকদের বরাবর দাঁড়িয়ে অন্য নামাজ আদায় করা মাকরূহ। কিন্তু জামাতের মুসল্লি ও সুন্নত পড়ুয়ার মাঝে যদি কোনো সুতরা বা অন্য কিছু থাকে তবে তা মাকরূহ হবে না।

قَوْلُهُ لَا يَقْضِىْ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ : অর্থাৎ যদি জামাতে শামিল হয়ে ফরজ পড়ে ফেলে এবং সুন্নত থেকে যায়, তবে তা সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়বে না। কেননা, ফরজের পর পড়ার কারণে তা নফলের হিসেবে হয়ে থাকে। আর ফজরের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে নফল পড়া মাকরূহ।

قَوْلُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا فَاتَهُ الخ : এটি "যখন ফজরের ফরজ ও সুন্নত উভয়টি কাজা হয়ে যায় তখন ফরজের অনুসরণে সুন্নতও কাজা করবে, আর যদি শুধু সুন্নত কাজা হয়, তবে তা কাজা করবে না–" এর কারণ হচ্ছে ঐ ঘটনা যা রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ঘটেছিল। ঘটনা হচ্ছে, রাসূল ﷺ একবার এক সফরের শেষ রাতে এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করলেন এবং একজন সাহাবীকে দায়িত্ব দিলেন যে, তিনি ফজরের নামাজে ডেকে দেবেন এবং রাসূল ﷺ ও অন্যান্য সাহাবী ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘটনাক্রমে ঐ ব্যক্তিরও ঘুম এসে গেছে, যাকে জাগানোর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। তখন সকলে ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং ফজরের নামাজের সময় কেউ জাগ্রত হতে পারেননি। এমনকি যখন সূর্যের তাপ তাঁরা অনুভব করলেন, তখন সকলে জেগে উঠেছেন। রাসূল ﷺ যাত্রা শুরু করলেন এবং বললেন, এটি এমন জায়গা যেখানে শয়তান এসে গেছে। রাসূল ﷺ কিছু সামনে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন। মুয়াজ্জিন আজান দিয়েছেন। অতঃপর দুই রাকাত সুন্নত আদায় করেছেন। অতঃপর উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়ে জামাতের সাথে ফরজ আদায় করেছেন। এ ঘটনাকে– "লাইলাতুত্ তা'রীসের ঘটনা" বলে। তা'রীস শব্দের অর্থ শেষ রাতে যাত্রা বিরতি করা।

قَوْلُهُ فَعُلِمَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَرْعِيَّةُ الخ : অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর উক্ত আমল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অর্থাৎ যদি কোনো নামাজ একাধিক ব্যক্তির ছুটে যায়, তবে যদি ঐ নামাজকে তারা জামাতের সাথে আদায় করতে চায় তাহলে তা জায়েজ এবং শরিয়ত অনুমোদিত। এমনকি এর আজান ইকামতও অনুমোদিত। আর যদি جَهْرِىْ কেরাতের নামাজ কাজা হয়– যেমন ফজর, মাগরিব কিংবা ইশা–তবে উঁচু আওয়াজে কেরাত পড়াও অনুমোদিত। লাইলাতুত্ তা'রীসের ঘটনা যেহেতু ফজরের নামাজের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই দ্বিপ্রহরের পূর্বে ফরজের অনুসরণে ফজরের সুন্নতের কাজাও অনুমোদিত। তবে এর উপর কিয়াস করে অন্যান্য সুন্নত ও ফরজের অনুসরণে কাজা করা আবশ্যক বলে ফতোয়া দেওয়া বৈধ নয়।

وَامَّا قَضَاءُ السُّنَّةِ فَقَدْ عُلِمَ اَنَّ سُنَّةَ الْفَجْرِ اٰكَدُ مِنْ سَائِرِ السُّنَنِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ شَرْعِيَّةِ قَضَائِهَا شَرْعِيَّةُ قَضَاءِ سَائِرِ السُّنَنِ وَلاَ مِنْ قَضَائِهَا بِتَبْعِيَّةِ الْفَرْضِ قَضَاؤُهَا بِدُوْنِ الْفَرْضِ لٰكِنْ يَلْزَمُ مِنْ قَضَائِهَا بِتَبْعِيَّةِ الْفَرْضِ قَبْلَ الزَّوَالِ قَضَاؤُهَا بِتَبْعِيَّةِ الْفَرْضِ بَعْدَ الزَّوَالِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْمَشَائِخِ (رحـ) لِاَنَّ اِخْتِصَاصَهٗ بِتَبْعِيَّةِ الْفَرْضِ بِكَوْنِهٖ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا مَعْنٰى لَهٗ.

অনুবাদ : কিন্তু সুন্নতের কাজা প্রসঙ্গে জানা হয়ে গেছে যে, ফজরের সুন্নত অন্যান্য নামাজের সুন্নতের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই ফজরের সুন্নতের কাজা শরিয়ত অনুমোদিত হওয়ার দ্বারা অন্যান্য নামাজের সুন্নতের কাজা শরিয়ত অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক হয় না এবং তা ফরজের অনুগামী হিসেবে শরিয়ত অনুমোদিত হওয়ার দ্বারা ফরজ ব্যতীতও শুধু সুন্নত কাজা করা শরিয়ত অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক হয় না। তবে ফজরের সুন্নতের কাজা ফরজের অনুগামী হিসেবে দ্বিপ্রহরের পূর্বে অনুমোদিত হওয়ার দ্বারা দ্বিপ্রহরের পরেও অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক হয়। যেরূপ কোনো কোনো ফকীহের মাযহাব। কেননা, ফরজের অনুগামী হয়ে ঐ সুন্নতের কাজা দ্বিপ্রহরের পূর্বের সাথে খাস হওয়ার কোনো অর্থ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَامَّا قَضَاءُ السُّنَّةِ فَقَدْ عُلِمَ الخ : এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, লাইলাতুত্ তা'রীসের ঘটনায়– "দ্বিপ্রহরের পূর্বে ফজরের ফরজ ও সুন্নত উভয়টি কাজা করা হয়েছে।" আর এর দ্বারা এটি আবশ্যক হয় না যে, ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নতও কাজা করা আবশ্যক। কেননা, ফজরের সুন্নত অন্যান্য সুন্নত থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি কেউ কেউ এটাকে ওয়াজিবও বলেছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে– صَلُّوْهَا وَاِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ অর্থাৎ "যদিও তোমরা ঘোড়া তাড়াও তবু ফজরের সুন্নত পড়বে।" –[আবূ দাউদ শরীফ]

তাছাড়া রাসূল ﷺ থেকে সফর ও হযরে ফজরের সুন্নত বর্জন করা বর্ণিত নেই। অতএব, অধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নতকে কাজা করার দ্বারা অন্যান্য সুন্নত কাজা করা আবশ্যক হয় না।

অনুরূপ ফজরের ফরজের সাথে সুন্নতকে কাজা করার দ্বারা এটিও আবশ্যক হয় না যে, ফরজ ব্যতীত ফজরের শুধু সুন্নত কাজা করা। কেননা, এমন কিছু বিষয় রয়েছে– যার হুকুম অন্যের অনুগামী হয়ে সাব্যস্ত হয়, কিন্তু তা এককভাবে প্রমাণিত নয়। হ্যাঁ যদি তা এককভাবে সাব্যস্ত হওয়ার উপর দলিল বিদ্যমান থাকে, তবে তা ভিন্ন কথা।

قَوْلُهٗ لٰكِنْ يَلْزَمُ مِنْ قَضَائِهَا الخ : এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হচ্ছে, ফজরের সুন্নতকে বর্ণিত হাদীসের উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ ফরজসহ সুন্নত কাজা করা যাবে, অন্যথায় নয়। অথচ অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, দ্বিপ্রহরের পূর্বে ফজরের কাজা করতে পারবে। এখন প্রমাণিত হয় যে, দ্বিপ্রহরের পরে ফজরের সুন্নত কাজা করতে পারবে না। তবে কোনো কোনো ফকীহ-এর নিকট দ্বিপ্রহরের পরেও ফজরের সুন্নত ফরজের সাথে কাজা করতে পারবে। **উত্তর :** শারেহ (র.) এর উত্তর দিয়েছেন যে, বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে আমাদের অভিমত হচ্ছে, দ্বিপ্রহরের পর ফজরের সুন্নতের কাজা নেই। যদিও তা ফরজের সাথে হোক।

قَوْلُهٗ لَا مَعْنٰى لَهٗ : এটি কোনো কোনো ফকীহের মাযহাবের যৌক্তিক দলিল। অর্থাৎ ফজরের সুন্নত ফরজের সাথে কাজা করার বিষয়টি দ্বিপ্রহরের পূর্বের সাথে খাস হওয়ার কোনো অর্থ নেই। কারণ, যখন তা আদা (ادا) -এর ওয়াক্ত নয়, তখন দ্বিপ্রহরের পূর্বে কিংবা পরে উভয়টি বরাবর। কোনো এক সময়ের সাথে কাজা খাস হয় না।

وَيَتْرُكُ سُنَّةَ الظُّهْرِ فِي الْحَالَيْنِ اَيْ سَوَاءً يُدْرِكُ الْفَرْضَ اِنْ اَدَّاهَا اَوْ لَا وَ ايتم ثُمَّ قَضَاهَا قَبْلَ شَفْعِهِ اَيْ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْفَرْضِ وَغَيْرُهُمَا لَا يَقْضِيْ اَصْلًا وَمُدْرِكُ رَكْعَةٍ مِنْ ظُهْرٍ غَيْرُ مُصَلٍّ جَمَاعَةً بَلْ هُوَ مُدْرِكُ فَضْلِهَا اَيْ اِنْ حَلَفَ لَيُصَلِّيَنَّ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ فَاَدْرَكَ رَكْعَةً يُحْنَثُ لِاَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ جَمَاعَةً لٰكِنْ اَدْرَكَ فَضِيْلَةَ الْجَمَاعَةِ وَاٰتِيْ مَسْجِدًا صَلَّى فِيْهِ يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ اِلَّا عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ اَيْ مَنْ اَتٰى مَسْجِدًا صَلّٰى فِيْهِ فَاَرَادَ اَنْ يُصَلِّيَ فَرْضَهُ مُنْفَرِدًا فَهَلْ يَأْتِيْ بِالسُّنَنِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا (رحـ) وَمِنْهُمُ الْكَرْخِيُّ (رحـ) لَا فَاِنَّ السُّنَنَ اِنَّمَا سُنَّتْ اِذَا اَدَّى الْفَرْضَ بِالْجَمَاعَةِ اَمَّا بِدُوْنِهِ فَلَا وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ (رحـ) مَنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ فَاَرَادَ اَنْ يُصَلِّيَ فِيْ مَسْجِدِ بَيْتِهِ يَبْدَأُ بِالْمَكْتُوْبَةِ لٰكِنَّ الْاَصَحَّ اَنْ يَأْتِيَ بِالسُّنَنِ فَاِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا وَاِنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ لٰكِنْ اِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ يَتْرُكُ السُّنَّةَ وَيُؤَدِّي الْفَرْضَ حَذْرًا عَنِ التَّفْوِيْتِ مَنِ اقْتَدٰى بِاِمَامٍ رَاكِعٍ فَوَقَفَ حَتّٰى رَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) ـ

অনুবাদ : জোহরের সুন্নত উভয় অবস্থায় বর্জন করবে। অর্থাৎ সুন্নত পড়ার দ্বারা ফরজ পাওয়া যাক কিংবা না পাওয়া যাক এবং ইমামের সাথে ইকতিদা করবে। অতঃপর شفع -এর পূর্বে তা কাজা করবে। অর্থাৎ ফরজের পর দুই রাকাত [সুন্নত] পড়ার পূর্বে। ফজর ও জোহরের সুন্নতের কাজা ব্যতীত মূলত অন্য কোনো সুন্নতের কাজা নেই। জামাতের সাথে জোহরের এক রাকাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি জামাতের মুসল্লি নয়; বরং জামাতের ফজিলতপ্রাপ্ত। অর্থাৎ যদি সে শপথ করে যে, অবশ্যই আমি জোহরের নামাজ জামাতের সাথে পড়ব, আর সে [জোহরের] এক রাকাত পায়, তবে সে হানেছ [শপথ ভঙ্গকারী] হয়ে যাবে। কেননা, সে জোহরের নামাজ জামাতের সাথে পড়েনি। তবে সে জামাতের ফজিলত পেয়েছে। যে ব্যক্তি এমন মসজিদে প্রবেশ করেছে, যাতে জোহরের জামাত হয়ে গেছে– তাহলে সে ফরজের পূর্বে সুন্নত পড়ে নেবে। তবে স্বল্প ওয়াক্ত হলে সুন্নত পড়বে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন মসজিদে প্রবেশ করে যাতে নামাজ হয়ে গেছে, তাই সে একা ফরজ পড়ার ইচ্ছা করেছে, তবে সে কি সুন্নত পড়বে, নাকি পড়বে না? আমাদের কোনো কোনো ফকীহ বলেন, তন্মধ্যে ইমাম কারখী (র.)ও আছেন, সুন্নত পড়বে না। কারণ, সুন্নত পড়া তখনই সুন্নত, যখন ফরজ নামাজ জামাতের সাথে পড়বে, কিন্তু তাছাড়া সুন্নত নয়। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তির জামাত ছুটে গেছে আর সে নিজের ঘরে নামাজ পড়ার ইচ্ছা করেছে, তবে সে ফরজ নামাজ দ্বারা শুরু করবে। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, সুন্নতও পড়া চাই। কেননা, রাসূল ﷺ সর্বদা সুন্নতের উপর আমল করতেন, যদিও তাঁর জামাত ছুটে যেত। তবে যখন নামাজের ওয়াক্ত কম থাকবে তখন সুন্নত ছেড়ে ফরজ পড়ে ফেলবে; যেন ফরজ ছুটে না যায়। যে ব্যক্তি ইমামের রুকু অবস্থায় ইমামের ইকতিদা করেছে এবং ইমাম রুকু থেকে মাথা উঠানো পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তবে সে ঐ রাকাতকে পায়নি। এতে ইমাম যুফার (র.) দ্বিমত পোষণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فِي الْحَالَيْنِ : অর্থাৎ জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত এখনও পড়েনি, আর জামাত শুরু হয়ে গেছে– তাহলে হুকুম হচ্ছে, সুন্নত ছেড়ে দিয়ে জামাতে শরিক হয়ে যাবে। চাই সুন্নত পড়ার পর জামাত পাওয়ার আশা থাকুক কিংবা না থাকুক।

কিন্তু যদি সে সুন্নতের এক রাকাত পড়ে থাকে, আর এমতাবস্থায় জামাত দাঁড়িয়ে যায় তবে উত্তম হলো, সে আরও এক রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলবে। যেন এ দুই রাকাত নফল হয়ে যায়। আর যদি তিন রাকাত পড়ার পর জামাত দাঁড়ায়, তবে সে চার রাকাত সুন্নত পরিপূর্ণ করে জামাতে শরিক হবে। আর যদি সে এক রাকাতও না পড়ে থাকে; বরং মাত্র [সুন্নত] শুরু করে থাকে। আর তখন জামাত দাঁড়িয়ে যায়– তাহলে সে এ অবস্থায়ই নামাজ ছেড়ে দিয়ে জামাতে শরিক হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ قَضَاهَا قَبْلَ شَفْعِهِ : অর্থাৎ ফরজের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত ফরজের পরে এবং দুই রাকাত সুন্নত পূর্বে পড়বে। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট দুই রাকাত সুন্নতের পর আদায় করবে। কারণ, যেহেতু পূর্বের চার রাকাত সুন্নত সেখানে আদায় করা যায়নি, তাই এর জন্য অন্য কোনো সুন্নতকে নিজের জায়গা থেকে সরানো যাবে না; বরং তা স্বীয় স্থানেই থাকবে এবং ছুটে যাওয়া সুন্নতকে এর পরে পড়বে। হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে– إِذَا فَاتَتْهُ الْاَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ قَضَاهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ অর্থাৎ "যখন রাসূল ﷺ -এর জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত ছুটে যেত, তখন তিনি তা দুই রাকাত সুন্নত আদায়ের পর আদায় করতেন।" –[তিরমিযী শরীফ]

قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا لَا يَقْضِى أَصْلًا : অর্থাৎ ফজরের সুন্নত এবং জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত ব্যতীত মাগরিব ও ইশার সুন্নত এবং জোহরের পরের সুন্নতের কাজা নেই। কেউ কেউ বলেন যে, যদি ফরজের সাথে হয়, তবে কাজা আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, উক্ত দুই সুন্নত ব্যতীত অন্য কোনো সুন্নতের কাজা নেই।

قَوْلُهُ اِنْ حَلَفَ لَيُصَلِّيَنَّ الظُّهْرَ الخ : মাসআলা ছিল, যদি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজে কেউ এক রাকাত পায়– তবে সে জামাত পায়নি; বরং জামাতের ছওয়াব পেয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে মাসআলা বের করছেন যে, যদি কেউ শপথ করে যে, আল্লাহর শপথ! আজ আমি জোহরের নামাজ জামাতে পড়ব, অতঃপর সে জামাতে শুধু এক রাকাত পেয়েছে তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হানেস হয়ে যাবে এবং তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে। এর কারণ হচ্ছে, সে জামাত পায়নি, তাই তাকে পৃথকভাবে তিন রাকাত পড়তে হবে। আর চার রাকাতের মধ্যে তিন রাকাত হচ্ছে অধিক সংখ্যা, আর অধিক (اَكْثَرْ) সমস্তের হুকুমে হয়। অতএব, যেন সে জামাত পায়নি। ফলত সে শপথ ভঙ্গকারী।

قَوْلُهُ وَمِنْهُمُ الْكَرْخِيُّ (رح) لَا : যদি মসজিদে জামাত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে কোনো মুসল্লি মসজিদে আসে, তবে সে সুন্নত পড়বে না। অর্থাৎ এখন আর তার জন্য এ নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ নয়। কেননা, সুন্নত তো জামাতে সুন্নত আদায়ের জন্য সুন্নত। আর এখন যেহেতু জামাত আদায় হয়ে গেছে, তাই সুন্নতেরও সুন্নত হওয়া অবশিষ্ট নেই। কিন্তু কখনো উদ্দেশ্য এমন নয় যে, তখন সুন্নত পড়া মাকরূহ; বরং ওয়াক্ত কম না হলে সুন্নত পড়া উত্তম।

বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, সুন্নত পড়বে। কেননা, সুন্নত হলো ফরজসমূহের تَكْمِلَةٌ বা পরিপূর্ণকারী। চাই ফরজ জামাতের সাথে আদায় করা হোক কিংবা একাকী আদায় করা হোক। তাই বিনা ওজরে সুন্নত ছেড়ে দেওয়া দূষণীয়। হ্যাঁ যদি ওয়াক্ত এত কম হয় যে, যদি সুন্নত পড়তে যায় তবে ফরজ ছুটে যাবে, তাহলে সে সুন্নত ছেড়ে দিয়ে ফরজ পড়ে নেবে।

قَوْلُهُ مَنِ اقْتَدٰى بِاِمَامٍ الخ : অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি জামাতে শরিক হওয়ার জন্য মসজিদে উপস্থিত হয়েছে– তখন ইমাম রুকুতে আছেন– এমতাবস্থায় সে তাকবীর বলেছে– তবে সে রুকুতে যায়নি; বরং দাঁড়িয়ে রয়েছে, এতক্ষণে ইমাম রুকু থেকে উঠে গেছেন, তবে সে উক্ত রাকাত পায়নি। ইমাম যুফার (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, قِيَامْ [দাঁড়ানো]-এর রুকুর সাথে একদিক থেকে মিল রয়েছে যে, রুকুও অর্ধেক দাঁড়ানোর ন্যায়। এখন যেহেতু তার ইমামের সাথে মিল রয়েছে তাই সে রাকাত পেয়ে গেছে।

আমরা উত্তরে বলি, ইমামের পিছনে তার ইকতিদা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, নামাজের কোনো রুকুনে ইমামের সাথে শরিক হতে হবে। আর এখানে সে ইমামের সাথে না قِيَامْ -এর মধ্যে শরিক হয়েছে, না রুকুর মধ্যে শরিক হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে–

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْـئًا وَمَنْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ اَىْ اَلرُّكُوْعَ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ فَاِنَّ اِدْرَاكَ الرُّكُوْعِ اِنَّمَا يَكُوْنُ اِذَا رَكَعَ مَعَ الْاِمَامِ -

অর্থাৎ "যখন তোমরা নামাজে আসবে আর আমরা যদি সিজদায় থাকি, তবে তোমরা সিজদা কর। কিন্তু ঐ সিজদাকে তোমরা কিছুই মনে করবে না। যে ব্যক্তি রাকাত অর্থাৎ রুকু পেয়েছে সে এমন, যেন সে ইমামের সাথে রাকাত পড়েছে।" –[আবূ দাউদ শরীফ]

মূলত রুকু দ্বারা রাকাত উদ্দেশ্য। কেননা, যদি রুকু না হয়, তবে রাকাতও হবে না। আমাদের নিকট রুকুতে শরিক হয়ে কমপক্ষে একবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ পড়তে হবে কিংবা এ পরিমাণ সময় রুকুতে পেতে হবে– তবে সে রুকু পেয়ে যাবে এবং রাকাতও পেয়ে যাবে।

مَنْ رَكَعَ فَلَحِقَهُ اِمَامَهُ فِيْهِ صَحَّ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) فَاِنَّ مَا اَتٰى بِهٖ قَبْلَ الْاِمَامِ غَيْرُ مُعْتَدٍ بِهٖ فَكَذَا مَا بَنٰى عَلَيْهِ قُلْنَا وُجِدَتِ الْمُشَارَكَةُ فِىْ جُزْءٍ وَاحِدٍ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি রুকু করেছে এবং রুকুতে ইমাম তার সাথে মিলে গেছে, তবে তার রুকু সহীহ হয়ে যাবে। এতে ইমাম যুফার (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা, ইমামের পূর্বে সে রুকুর যে অংশ আদায় করেছে সেটি مُعْتَدْ بِهٖ নয়। অনুরূপ রুকুর পরবর্তী যে অংশ এর উপর নির্ভরশীল সেটিও [مُعْتَدْ بِهٖ নয়]। আমরা বলব, [রুকুর] এক অংশে শিরকাত পাওয়া গেছে [তাই তা مُعْتَدْ بِهٖ হবে।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ رَكَعَ فَلَحِقَهُ الخ : অর্থাৎ মুক্তাদী ইমামের পূর্বে রুকু করে ফেলেছে, অতঃপর ইমাম রুকু করেছে তবে এতে مُشَارَكَةٌ [তথা ইমামের সাথে রুকুতে শরিক হওয়া] পাওয়া গেছে এবং রাকাতও পেয়েছে। কিন্তু এমনটি করা মাকরূহে তাহরীমী। হাদীসে বর্ণিত আছে– لَا تَسْبِقُوْنِىْ بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْاِنْصِرَافِ অর্থাৎ "রুকু, সিজদা, কিয়াম ও ফিরে আসার ক্ষেত্রে তোমরা আমার অগ্রে যেও না।" –[মুসলিম শরীফ]

কোনো কোনো বর্ণনায়– ইমামের পূর্বে রুকু ও সিজদা করার উপর ধমকি দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে রুকু কিংবা সিজদা করবে– আল্লাহ তার চেহারাকে গাধার চেহারায় পরিবর্তন করে দেবেন। বিশেষ করে এ ধমকিকে যদি পরীক্ষা করে দেখতে চায়, তবে এটি আরও অধিক ভয়ানক হবে। সর্বোপরি যদি কেউ ইমামের পূর্বে রুকুতে চলে যায় আর ইমাম রুকুতে গিয়ে তার সাথে মিলে যায় তবে তার রাকাত সহীহ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) فَاِنَّ مَا الخ : অর্থাৎ ইমাম যুফার (র.)-এর নিকট যদি কেউ ইমামের পূর্বে রুকুতে চলে যায়– তবে তার রুকু সহীহ হবে না। কেননা, সে ইমামের পূর্বে রুকুর যে অংশ আদায় করেছে– তা مُعْتَمَدْ بِهٖ নয়। তাই এর উপর রুকুর যে অংশ নির্ভর করে তাও مُعْتَمَدْ بِهٖ নয়। যেন তার পূর্ণ নামাজই সহীহ হয়নি।

قَوْلُهُ قُلْنَا وُجِدَتِ الْمُشَارَكَةُ الخ : আমাদের দলিল হচ্ছে, নামাজের اَجْزَاءٌ-এর কোনো একটি جُزْء-এর মধ্যে مُشَارَكَةٌ পাওয়া গেলে ঐ جُزْء পাওয়া যায়। যেমন রুকু কিংবা কিয়াম। এটি আবশ্যক নয় যে, شِرْكَةٌ না পাওয়া যাওয়ার কারণে কোনো অংশ অগ্রহণযোগ্য হলে অন্য অংশও অগ্রহণযোগ্য হবে।

بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

فَرْضُ التَّرْتِيْبِ بَيْنَ الْفُرُوْضِ الْخَمْسَةِ وَالْوِتْرِ فَائِتًا كُلُّهَا اَوْ بَعْضُهَا اَىْ اِنْ كَانَ الْكُلُّ فَائِتًا فَلَابُدَّ مِنْ رِعَايَةِ التَّرْتِيْبِ بَيْنَ الْفُرُوْضِ الْخَمْسَةِ وَكَذَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوِتْرِ وَكَذَا اِنْ كَانَ الْبَعْضُ فَائِتًا وَالْبَعْضُ وَقْتِيًا لَابُدَّ مِنْ رِعَايَةِ التَّرْتِيْبِ فَيَقْضِى الْفَائِتَةَ قَبْلَ اَدَاءِ الْوَقْتِيَةِ فَلَمْ يَجُزْ فَرْضُ فَجْرٍ مِنْ ذِكْرِ اَنَّهُ لَمْ يُوْتِرْ هٰذَا تَفْرِيْعٌ لِقَوْلِهٖ وَالْوِتْرُ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) خِلَافًا لَهُمَا بِنَاءً عَلٰى وُجُوْبِ الْوِتْرِ عِنْدَهٗ ـ

পরিচ্ছেদ : কাজা নামাজের বিবরণ

অনুবাদ : পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ও বিতরের নামাজের মাঝে তারতীব ফরজ। চাই সমস্ত নামাজ কাজা হোক কিংবা এক ওয়াক্ত কাজা হোক। অর্থাৎ যদি সমস্ত [পাঁচ ওয়াক্ত] নামাজ কাজা হয়, তবে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ এবং পাঁচ ফরজ ও বিতরের তারতীবের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। অনুরূপ যদি এক ওয়াক্ত কাজা হয় এবং এক ওয়াক্ত ওয়াক্তী হয়, তবুও তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অতএব, ওয়াক্তী নামাজ আদায়ের পূর্বে কাজা নামাজ আদায় করবে। সুতরাং যার স্মরণ হয়েছে যে, সে বিতর পড়েনি, তবে তার ফজরের ফরজ নামাজ জায়েজ হবে না। এটি গ্রন্থকারের কথা وَالْوِتْر থেকে তাফরী' (تَفْرِيْع)। এ হুকুম ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। এতে সাহেবাইন (র.)-এর দ্বিমত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট বিতর ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তিতে [উক্ত হুকুম]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : পূর্বের অধ্যায়ে আদা (اَدَاءٌ) নামাজ সম্পর্কীয় আহকামের আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে কাজা নামাজের আহকাম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। যেহেতু আদা (اداء) নামাজ আসল আর কাজা (قَضَاءٌ) আদা নামাজ-এর খলিফা, এজন্য আদা নামাজের আলোচনা আগে এবং কাজা নামাজের আলোচনা পরে আনা হয়েছে।

قَوْلُهٗ فَرْضُ التَّرْتِيْبِ بَيْنَ الخ : অর্থাৎ যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যায়, তবে এতে তারতীব ফরজ। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই কাজা হয়ে গেছে তবে যে তারতীবে কাজা হয়েছে সে তারতীবেই কাজা আদায় করতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে ফজর অতঃপর যুহর, অতঃপর আসর, অতঃপর মাগরিব, অতঃপর ইশা আদায় করবে। আর যদি বিতরও কাজা হয়, তবে তাও তারতীব অনুযায়ী স্বস্থানে আদায় করবে। যেমন, কারো মাগরিব, ইশা এবং বিতর নামাজ কাজা হয়েছে, তবে সে সকালে প্রথমে মাগরিব, অতঃপর ইশা, অতঃপর বিতর কাজা আদায় করবে, অতঃপর ফজর পড়বে। গ্রন্থকারের ইবারত كُلُّهَا اَوْ بَعْضُهَا -এর উদ্দেশ্য এটাই যে, দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বিতরসহ কাজা হয়ে যায় কিংবা তন্মধ্যে কিছু ওয়াক্ত কাজা হয়েছে– সর্বাবস্থায় তারতীব ঠিক রাখা আবশ্যক। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "খন্দকের যুদ্ধে যুদ্ধ ব্যস্ততার কারণে রাসূল ﷺ -এর জোহর, আসর ও মাগরিবের নামাজ কাজা হয়ে যায়– তিনি এগুলোকে ইশার ওয়াক্তে তারতীব অনুযায়ী আগে আদায় করেছেন। অতঃপর ইশার নামাজ আদায় করেছেন।" –[তিরমিযী শরীফ]

قَوْلُهٗ فَلَمْ يَجُزْ فَرْضُ فَجْرٍ الخ : তারতীব ফরজ হওয়ার উপর এটি একটি তাফরী' (تَفْرِيْع)। অর্থাৎ বিতর কাজা থাকাবস্থায় এ ওয়াক্তী নামাজ তথা ফজরের নামাজ জায়েজ হবে না। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি তার স্মরণ থাকে যে, সে বিতরের নামাজ পড়েনি, তথাপিও সে ফজরের নামাজ পড়ে ফেলেছে– তবে তা জায়েজ হবে না; বরং প্রথমে তাকে বিতর পড়তে হবে, অতঃপর ফজর পড়বে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। কারণ, তাঁর নিকট বিতর ওয়াজিব। আমলের দিক থেকে এটি ফরজের পর্যায়ের। তাই বিতর ও অন্যান্য ফরজের মাঝে তাঁর নিকট তারতীব ফরজ। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট বিতর সুন্নত। তাই তা কাজা থাকাবস্থায় ফজরের নামাজে কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। কেননা, ফরজ ও সুন্নতের মাঝে সর্বসম্মতিক্রমে তারতীব ফরজ নয়।

يُعِيدُ الْعِشَاءَ وَالسُّنَّةَ لَا الْوِتْرَ مَنْ عَلِمَ اَنَّهُ صَلَّى الْعِشَاءَ بِلَا وُضُوْءٍ وَالْاٰخِرَيْنِ بِهٖ يَعْنِيْ تَذَكَّرَ اَنَّهُ صَلَّى الْعِشَاءَ بِلَا وُضُوْءٍ وَالسُّنَّةُ وَالْوِتْرَ بِوُضُوْءٍ يُعِيْدُ الْعِشَاءَ وَالسُّنَّةَ لِاَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ اِدَاءُ السُّنَّةِ مَعَ اَنَّهَا اَدَّيْتَ بِالْوُضُوْءِ لِاَنَّهَا تَبَعٌ لِلْفَرْضِ اَمَّا الْوِتْرُ فَصَلٰوةٌ مُسْتَقِلَّةٌ عِنْدَهٗ فَصَحَّ اَدَاؤُهٗ لِاَنَّ التَّرْتِيْبَ وَاِنْ كَانَ فَرْضًا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْعِشَاءِ لٰكِنَّهٗ اَدَّى الْوِتْرَ بِزَعْمِ اَنَّهٗ صَلَّى الْعِشَاءَ بِالْوُضُوْءِ فَكَانَ نَاسِيًا اَنَّ الْعِشَاءَ كَانَ فِيْ ذِمَّتِهٖ فَسَقَطَ التَّرْتِيْبُ وَعِنْدَهُمَا يَقْضِى الْوِتْرَ اَيْضًا لِاَنَّهٗ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا اِلَّا اِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ اَلْاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهٖ فَرْضُ التَّرْتِيْبِ وَالْمَعْنٰى اَنَّهٗ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنِ الْقَضَاءِ وَالْاَدَاءِ وَاِنْ كَانَ الْبَاقِيْ مِنَ الْوَقْتِ بِحَيْثُ يَسَعُ فِيْهِ بَعْضُ الْفَوَائِتِ مَعَ الْوَقْتِيَةِ فَاِنَّهٗ يَقْضِيْ مَا يَسَعُهُ الْوَقْتُ مَعَ الْوَقْتِيَّةِ كَمَا اِذَا فَاتَ الْعِشَاءُ وَالْوِتْرُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْفَجْرِ اِلَّا اَنْ يَّسَعَ فِيْهِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ يَقْضِى الْوِتْرَ وَيُؤَدِّى الْفَجْرَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاِنْ فَاتَ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اِلَّا مَا يُصَلِّيْ فِيْهِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ يُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْمَغْرِبَ.

অনুবাদ : যে ব্যক্তির স্মরণ হয় যে, সে ইশার নামাজ অজু ছাড়া এবং সুন্নত ও বিতর অজুর সাথে পড়েছে– তবে সে ইশা ও সুন্নতকে দোহরাবে। বিতরকে দোহরাবে না। অর্থাৎ যার স্মরণ হয়েছে যে, সে ইশার নামাজ অজু ছাড়া পড়েছে এবং সুন্নত ও বিতর অজুসহ পড়েছে, তবে সে ইশা ও সুন্নতকে দোহরাবে। কেননা, অজুসহ সুন্নত আদায় করা সত্ত্বেও তার সুন্নত আদায় হয়নি। কারণ, সুন্নত হচ্ছে ফরজের অনুগামী। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট বিতর একটি পূর্ণাঙ্গ নামাজ। তাই এর আদা বিশুদ্ধ হয়ে গেছে। কেননা, যদিও বিতর ও ইশার মাঝে তারতীব আবশ্যক ছিল, কিন্তু সে এ ধারণায় ইশার নামাজ আদায় করেছে যে, সে ইশার নামাজ অজুর সাথে আদায় করেছে। সুতরাং সে ভুলে গেছে যে, তার জিম্মায় ইশার নামাজ বাকি ছিল। তাই তার তারতীব ছুটে গেছে। আর সাহেবাইন (র.)-এর নিকট বিতরও কাজা পড়বে। কেননা, তাঁদের নিকট বিতর সুন্নত। তবে যদি ওয়াক্ত কম হয়। এ استثناء গ্রন্থকারের কথা فَرْضُ التَّرْتِيْبِ-এর সাথে সম্পৃক্ত। মর্ম হচ্ছে, কাজা ও আদায়ের জন্য ওয়াক্ত কম হয়ে গেছে। আর যদি এ পরিমাণ ওয়াক্ত থাকে যে, ওয়াক্তী নামাজসহ কিছু কাজা নামাজ পড়া যাবে তবে সে ওয়াক্তী নামাজসহ যত ওয়াক্ত কাজা নামাজ সম্ভব আদায় করবে। যেমন, ইশা ও বিতরের নামাজ কাজা হয়ে গেছে এবং ফজরের ওয়াক্ত এই পরিমাণ বাকি রয়েছে যে, যাতে শুধু পাঁচ রাকাত নামাজ পড়া যাবে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট বিতরকে কাজা এবং ফজরকে আদা পড়বে। আর যদি জোহর ও আসরের নামাজ কাজা হয়ে যায় এবং মাগরিবের শুধু এই পরিমাণ ওয়াক্ত বাকি থাকে যাতে সাত রাকাত পড়া যাবে তবে সে জোহর ও মাগরিব পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْاُخْرَيَيْنِ بِهِ : অর্থাৎ কেউ ফরজ পড়ার পর অজু করেছে এবং এ অজু দ্বারা সুন্নত ও বিতর পড়েছে– অতঃপর তার স্মরণ হয়েছে যে, সে ইশার ফরজ নামাজ অজু ছাড়া পড়েছে এবং সুন্নত ও বিতর নামাজ অজুর সাথে পড়েছে, তবে এর হুকুম হচ্ছে– সে ইশার ফরজ ও সুন্নত উভয়টি দোহরাবে। কারণ, যখন ফরজ আদায় করা হয়নি তখন সুন্নত যা ফরজের অনুগামী তা অজুসহ আদায় করা সত্ত্বেও আদায় হয়নি, তবে যেহেতু বিতর একটি পরিপূর্ণ নামাজ এবং তা আহনাফের নিকট ওয়াজিব, তাই তা আদায় করা সহীহ হয়ে গেছে। তা দোহরানোর প্রয়োজন নেই। এখানে স্মরণ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইশার ওয়াক্তে স্মরণ হওয়া। কারণ, ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর সুন্নতের কাজা হয় না। এজন্যই গ্রন্থকার اِعَادَةٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ– দ্বিতীয়বার পড়া। আদা (اداء) হচ্ছে– ওয়াক্তের মধ্যে ওয়াজিব ইবাদতকে আদায় করা। আর কাজা (قَضَاءٌ) হচ্ছে– ওয়াক্ত সমাপ্ত হওয়ার পর নামাজ আদায় করা।

قَوْلُهُ لِاَنَّهَا تَبَعٌ لِلْفَرْضِ : এটি শারেহ (র.)-এর উক্তি لَمْ يَصِحَّ -এর কারণ। যার সারমর্ম হচ্ছে, যদিও সে অজুর সাথে সুন্নত পড়েছে, কিন্তু তা বিশুদ্ধ হয়নি। কেননা, সুন্নত হচ্ছে ফরজের অনুগামী এবং ফরজ আদায়ের পর তা আদায় করা হয়। কিন্তু যখন অজুর সাথে ফরজ আদায় করেনি এবং অজু ছাড়া সুন্নত পড়েছে, তখন ফরজ দ্বিতীয়বার পড়ার সময় সুন্নতও দোহরাতে হবে।

قَوْلُهُ اَمَّا الْوِتْرُ فَصَلٰوةٌ الخ : অর্থাৎ বিতর যেহেতু একটি পরিপূর্ণ নামাজ এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তা ওয়াজিব এবং ইশার সাথে এর শুধু এতটুকু সম্পর্ক যে, তা ইশার পর পড়া হয়। আর তার ধারণা অনুযায়ী সে ইশা পড়ে ফেলেছে, তাই তা [বিতর] সহীহ হয়ে যাবে। কেননা, সে نَاسِىْ [ভুলে গেছে এমন ব্যক্তি]-এর হুকুমে হবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে– সে বিতর পড়ার সময় যেন সে ভুলে গেছে যে, তার জিম্মায় ইশার নামাজ বাকি রয়ে গেছে। আর এ কথা স্পষ্ট যে, ভুলে যাওয়ার দ্বারা ফরজের তারতীব রহিত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ اِلَّا اِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ : অর্থাৎ ওয়াক্ত কম হওয়ার সময় তারতীব ফরজ থাকে না। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি কাজা নামাজ পড়তে পড়তে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার ভয় এবং ঐ ওয়াক্তী নামাজ পর্যন্ত ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা হয়– তবে কাজা নামাজ ছেড়ে দেবে এবং ওয়াক্তী নামাজ পড়ে নেবে। কেননা ওয়াক্তের ফরজ নামাজটি কাজা নামাজের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। কারণ, কুরআন, হাদীস ও ইজমা-এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ওয়াক্তের মধ্যে ওয়াক্তী নামাজ ফরজ। অতএব, ওয়াক্ত কম হওয়ার সময় ঐ ওয়াক্তী ফরজই অগ্রগণ্য হবে।

قَوْلُهُ يَقْضِى الْوِتْرَ الخ : মাসআলার আলোচনা চলছিল যে, ওয়াক্ত কম থাকার কারণে ফরজের তারতীব বাদ হয়ে যাবে। আর যদি এ পরিমাণ সময় থাকে যে, ওয়াক্তী নামাজ আদায় করার পর অল্প সময় বাঁচবে যাতে কিছু কাজা নামাজ আদায় করা যাবে, তাহলে হুকুম হচ্ছে, সম্ভব পরিমাণ কাজা নামাজকে আগে পড়ে নেবে, অতঃপর ওয়াক্তী নামাজকে পড়বে। কিন্তু সম্ভব পরিমাণ যে কাজা নামাজগুলো পড়বে, সেগুলোর মধ্যেও তারতীব আবশ্যক। অতএব, উক্ত উদাহরণে দেখানো হয়েছে যে, কারো ইশা ও বিতর কাজা হয়ে গেছে– ফজরের ওয়াক্তে শুধু পাঁচ রাকাত পরিমাণ সময় বাকি তবে হুকুম হচ্ছে– বিতরের তিন রাকাত এবং ফজরের দুই রাকাত পড়বে। তবে 'মুজতাবা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এমন মুহূর্তে যদি কাজা নামাজগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু ওয়াক্তী নামাজ পড়ে তবে তা জায়েজ। এক্ষেত্রে মূল হচ্ছে, ওয়াক্তী নামাজ আদায় করে কাজা নামাজ থেকে যতটুকু সম্ভব আদায় করবে। আর কাজা নামাজ যত ওয়াক্তই আদায় করা হোক সেগুলোর মধ্যে তারতীব রক্ষা করবে।

আর দ্বিতীয় উদাহরণের মধ্যে দেখানো হয়েছে যে, কারো জোহর ও আসরের নামাজ ছুটে গেছে এবং মাগরিবের মধ্যে শুধু সাত রাকাত পড়ার পরিমাণ সময় বাকি আছে, তবে সে জোহরের চার রাকাত এবং মাগরিবের তিন রাকাত পড়বে।

أَوْ نُسِيَتْ أَوْ فَاتَتْ سِتَّةٌ حَدِيْثَةً كَانَتْ أَوْ قَدِيْمَةً قِيْلَ السِّتَّةُ وَمَا دُوْنَهَا حَدِيْثَةٌ وَمَا فَوْقَهَا قَدِيْمَةٌ كَذَا فِيْ فَوَائِدِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ الْحُسَامِيْ قَلَّتْ بَعْدَ الْكَثْرَةِ أَوْ لَا فَيَصِحُّ وَقْتِيْ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةَ شَهْرٍ فَنَدِمَ وَاَخَذَ يُؤَدِّيْ الْوَقْتِيَاتِ ثُمَّ تَرَكَ فَرْضًا هٰذَا تَفْرِيْعٌ لِقَوْلِهٖ قَدِيْمَةً كَانَتْ أَوْ حَدِيْثَةً فَاِنَّهٗ اِذَا اَخَذَ يُؤَدِّيْ الْوَقْتِيَاتِ صَارَتْ فَوَائِتُ الشَّهْرِ قَدِيْمَةً وَهِيَ مُسْقِطَةٌ لِلتَّرْتِيْبِ فَاِذَا تَرَكَ فَرْضًا يَجُوْزُ مَعَ ذِكْرِهٖ اَدَاءُ وَقْتِيْ بَعْدَهٗ ـ

অনুবাদ : কিংবা [যদি] কাজা নামাজের কথা ভুলে যায়, অথবা ছয় ওয়াক্ত নামাজ যদি ছুটে যায়, নতুন হোক চাই পুরাতন হোক। হুসামীর ফাওয়ায়ে জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, কেউ বলেন, ছয় কিংবা ছয়ের চেয়ে কম ওয়াক্ত হলে নতুন [কাজা] নামাজ, আর ছয়ের চেয়ে বেশি হলে পুরাতন [কাজা] নামাজ। আধিক্যের পর কম হোক কিংবা না হোক। সুতরাং যে ব্যক্তির এক মাসের নামাজ কাজা হয়ে গেছে, অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে ওয়াক্তী নামাজকে আদায় করতে শুরু করে দিয়েছে, অতঃপর তার এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ কাজা হয়ে গেছে– তবে তার ওয়াক্তী নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। এটি حَدِيْثَةً كَانَتْ أَوْ قَدِيْمَةً কথার প্রসঙ্গ মাসআলা। কেননা, যখন সে ওয়াক্তী নামাজ আদায় করতে শুরু করেছে তখন এক মাসের কাজা নামাজ পুরাতন হয়ে গেছে, আর পুরাতন কাজা নামাজ তারতীবকে রহিত করে দেয়। তাই যখন তার এক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে গেছে, তখন তা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তী নামাজ আদায় করা জায়েজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ أَوْ نُسِيَتْ : এটি مَجْهُوْل-এর সীগাহ। এর ضَمِيْر-টি فَائِتَةٌ শব্দের দিকে ফিরেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি তার স্মরণ না থাকে যে, তার জিম্মায় কিছু নামাজ বাকি রয়ে গেছে এবং সে ওয়াক্তী নামাজ পড়ে ফেলেছে, তবে তার নামাজ সহীহ্ হয়ে যাবে। আর যখন কাজা নামাজের কথা স্মরণ হবে, তখন তা আদায় করে নেবে। এখন এতে তারতীব আবশ্যক হবে না। কেননা, ভুলে যাওয়া একটি আসমানী ওজর। তাই তাকে মাজূর (مَعْذُوْر) ধরা হবে।

قَوْلُهٗ أَوْ فَاتَتْ سِتَّةٌ حَدِيْثَةً : কাজা নামাজ ও ওয়াক্তী নামাজের মধ্যে তারতীব আবশ্যক না হওয়ার তৃতীয় সুরতটি হচ্ছে, যদি ন্যূনতম ছয় ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যায়, তবে এতে তারতীব আবশ্যক নয়। কাজা নামাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– ফরজ নামাজ কাজা হওয়া। বিতর এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, বিতর দিবারাত্রের নামাজের تَكْمِلَةٌ বা পূর্ণতা দানকারী। যদিও বিতর একটি পরিপূর্ণ নামাজ, কিন্তু যেহেতু এটি ফরজের চেয়ে নিম্নস্তরের বিধায় মুজতাহিদীনে কেরাম একে উক্ত ছয় নামাজের মাঝে গণনা করেননি। ইমামগণ যেখানে ছয় ওয়াক্তের গণনা করেছেন সেখানে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি ষষ্ঠতম ওয়াক্তের সময় এসে যায় অর্থাৎ পঞ্চম ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে গেছে এবং ষষ্ঠতম নামাজের ওয়াক্ত এসেছে তবুও তা ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهٗ حَدِيْثَةً كَانَتْ أَوْ قَدِيْمَةً : অর্থাৎ কাজা হওয়া নামাজগুলো চাই ওয়াক্তী নামাজের নিকটবর্তী কালের হোক কিংবা ওয়াক্তী নামাজের চেয়ে অনেক দূরবর্তী কালের হোক। সুতরাং নিকটবর্তী কালের কাজা হওয়া নামাজের তারতীব অসুবিধা দূর করার জন্য আবশ্যক নয়। কারো কারো নিকট দূরবর্তী কালের কাজা নামাজের হুকুমও অনুরূপ। যেমন, কেউ এক মাসের নামাজ কাজা করেছে, অতঃপর কিছু ওয়াক্তী নামাজ পড়েছে, তারপর এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে গেছে, এখন যদি তার এ ছুটে

যাওয়া এক ওয়াক্ত নামাজের কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও সামনের ওয়াক্তী নামাজ পড়ে, তবে তা জায়েজ। কোনো কোনো ফকীহের নিকট তা জায়েজ নেই। কিন্তু জায়েজ হওয়ার উপরই ফতোয়া। আর বিকায়া গ্রন্থকারের নিকট এ অভিমতই উত্তম। সারকথা হচ্ছে, কাজা নামাজ যদি ছয় ওয়াক্ত হয়ে যায়– চাই তা নতুন কাজা হোক, কিংবা পুরাতন কাজা হোক, কিংবা কিছু নতুন ও কিছু পুরাতন কাজা হোক এতে তারতীব ঠিক থাকবে না।

قَوْلُهُ اَلسِّتَّةُ وَمَا دُوْنَهَا : এ قِيْلَ শব্দের কারণে বুঝা যায়, এটি একটি দুর্বল অভিমত। কেননা, গ্রন্থকার পূর্বেই বলে দিয়েছেন যে কাজা নামাজ ছয় ওয়াক্ত হয়ে গেলে তারতীব ঠিক থাকে না। আর যদি এর চেয়ে কম হয়, তাহলে তারতীব আবশ্যক। তবে তারতীব জরুরি না হওয়ার তিনটি সুরত রয়েছে। ১. যদি ওয়াক্তী নামাজের সময় একেবারে কম থাকে। ২. যদি কাজা নামাজের কথা ভুলে যায়। ৩. কাজা নামাজের সংখ্যা কমপক্ষে ছয় ওয়াক্ত হয়ে যাওয়া। চাই তা নতুন কাজা হোক কিংবা পূর্বের কাজা হোক। এখন আবার قِيْلَ দ্বারা ভিন্নভাবে এই বলা যে, ছয় কিংবা ছয়ের চেয়ে কম ওয়াক্ত হলে حَدِيْثَةٌ [নতুন]। আর ছয়ের চেয়ে বেশি ওয়াক্ত হলে قَدِيْمَةٌ [পুরাতন]। এটি একটি অগ্রহণযোগ্য কথা। কারণ, ছয়ের চেয়ে কম ওয়াক্ত নামাজ কাজা হওয়ার সুরতে নামাজকে حَدِيْثَةٌ [নতুন কাজা] বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুই কিংবা তিন ওয়াক্ত নামাজ কাজা হলে এগুলোতে তারতীব আবশ্যক নয়। অথচ সর্বসম্মতিক্রমে ছয় ওয়াক্তের কমের মাঝে তারতীব ওয়াজিব। এজন্যই শারেহ (র.) এ অভিমতটি বর্ণনার সময় قِيْلَ শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেন বুঝা যায় যে, এটি দুর্বল অভিমত।

قَوْلُهُ قَلَّتْ بَعْدَ الْكَثْرَةِ اَوْ لَا الخ : অর্থাৎ কাজা নামাজ যদি অধিক হয় তথা ছয় কিংবা এর চেয়ে অধিক হয়, তবে مُطْلَقًا এতে তারতীব নেই। এখন আধিক্যের পর কম হয়ে যায় অর্থাৎ যেমন, কারো দশ ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়েছে– সে কাজা আদায় করতে করতে এখন আর তিন ওয়াক্ত বাকি রয়েছে, তবে এখন তিন হওয়ার তথা কমে যাওয়ার কারণে এতে তারতীব আবশ্যক হবে না। কারণ, এ তিনও ঐ দশের অন্তর্ভুক্ত যা কাজা হয়েছিল।

قَوْلُهُ فَاتَتْهُ اِذَا اَخَذَ يُؤَدِّيْ الخ : নিহায়া নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এক ব্যক্তি এক মাসের নামাজ কাজা করেছে অতঃপর সে অনুতপ্ত হয়ে নামাজ পড়তে শুরু করেছে– তখন তার এ কাজা নামাজগুলো قَدِيْمَةٌ বা পুরাতন কাজা হবে। অতঃপর সে কাজা নামাজগুলো আদায়ের পূর্বে আরও এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করে ফেলেছে– অতঃপর ওয়াক্তী নামাজ পড়েছে, তবে যদি তার এক ওয়াক্ত ছুটে যাওয়া নামাজের কথা স্মরণ থাকে, তথাপিও তার ওয়াক্তী নামাজ জায়েজ হবে। কেননা, একটি কাজা নামাজ আদায়ের জন্য লেগে যাওয়া অন্যান্য কাজা নামাজগুলো আদায়ে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে উত্তম নয়। আর যদি সমস্ত কাজা নামাজ আদায়ের পিছনে লেগে যায়, তবে ওয়াক্তী নামাজ থেকে যাবে। তাই সে ওয়াক্তী নামাজ আদায় করে নেবে।

أَوْ قَضٰى صَلٰوةَ الشَّهْرِ اِلَّا فَرْضًا أَوْ فَرْضَيْنِ هٰذَا تَفْرِيْعٌ لِقَوْلِهٖ قَلَّتْ بَعْدَ الْكَثْرَةِ أَوْ لَا فَاِنَّهٗ لَمَّا قَضٰى صَلَوَاتِ الشَّهْرِ اِلَّا فَرْضًا أَوْ فَرْضَيْنِ قَلَّتِ الْفَوَائِتُ بَعْدَ الْكَثْرَةِ فَلَا يَعُوْدُ التَّرْتِيْبُ اِلَّا اَنْ يَقْضِىَ الْكُلَّ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ (رح) اِنْ قَلَّتْ بَعْدَ الْكَثْرَةِ يَعُوْدُ التَّرْتِيْبُ وَاخْتَارَ الْاِمَامُ السَّرَخْسِىُّ اَلْاَوَّلَ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحِيْطِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى ـ

অনুবাদ : কিংবা এক মাসের কাজা নামাজ পড়ে ফেলেছে, কিন্তু এক ওয়াক্ত কিংবা দুই ওয়াক্ত ফরজ বাকি রয়ে গেছে। এটি গ্রন্থকারের কথা قَلَّتْ بَعْدَ الْكَثْرَةِ أَوْ لَا -এর প্রাসঙ্গিক বিষয়। কারণ, যখন এক মাসের নামাজ কাজা পড়েছে, তন্মধ্যে এক কিংবা দুই ওয়াক্ত নামাজ রয়ে গেছে, তখন আধিক্যের পর কাজা নামাজ কম হয়ে গেছে। অতএব, তারতীব পুনরায় আবশ্যক হবে না। হ্যাঁ, সমস্ত কাজা নামাজ আদায় করে ফেললে [তারতীব পুনরায় আবশ্যক হবে]। কোনো কোনো ফকীহের নিকট আধিক্যের পর যদি কাজা নামাজ কমে যায়, তবে পুনরায় তারতীব আবশ্যক হবে। ইমাম সারাখসী (র.) প্রথম অভিমত গ্রহণ করেছেন। "মুহীত" গ্রন্থকার বলেন, এর উপরই ফতোয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ أَوْ قَضٰى صَلَاةَ الشَّهْرِ الخ : "ইনায়া" নামক গ্রন্থে উক্ত মাসআলা এভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, এক ব্যক্তি এক মাসের নামাজ ছেড়ে দিয়েছে, অতঃপর এক কিংবা দুই ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত বাকি সব নামাজের কাজা আদায় করে ফেলেছে, অতঃপর ওয়াক্তী নামাজ পড়েছে– যে ওয়াক্ত এসেছে এবং তার উক্ত এক কিংবা দুই ওয়াক্ত নামাজের কথা স্মরণও আছে, তবে এমতাবস্থায় তার ওয়াক্তী নামাজ পড়া সহীহ হবে কি হবে না? ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটি সহীহ হওয়া ও অপরটি সহীহ না হওয়ার পক্ষে। আবূ জাফর (র.) বলেন, সহীহ হবে না। আবূ হাফস, ফখরুল ইসলাম, শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী, কাজী খাঁ (র.) প্রমুখ ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, সহীহ হবে। এর কারণ বর্ণনা করেন, এর তারতীব যেহেতু একবার রহিত হয়ে গেছে, এখন ঐ রহিত হওয়া তারতীব পুনরায় ফিরে আসবে না। যেমন নাপাক পানি, অধিক এবং জারি পানির সাথে মিলে পাক হয়ে যায় এবং এর নাপাকী পুনরায় ফিরে আসে না।

ইমাম সারাখসী (র.) : তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ। উপাধি শামসুল আইম্মা। তিনি শামসুল আইম্মা আব্দুল আজিজ হালওয়ায়ী (র.) [মৃত্যু ৪৪৮ হি.]-এর ছাত্র। খুরাসানের একটি শহরের নাম সারাখস। তিনি সেখানকার অধিবাসী ছিলেন বিধায় তাঁকে সারাখসী বলা হয়। তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে ৫০০ হিজরিতে। উক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁর অভিমত হচ্ছে– এতে তারতীব আবশ্যক নয়। মুহীত গ্রন্থকার এর স্বপক্ষে বলেন যে, এরই উপর ফতোয়া।

مَنْ صَلّٰى خَمْسًا ذَاكِرًا فَائِتَةً فَسَدَ الْخَمْسُ مَوْقُوْفًا اِنْ اَدّٰى سَادِسًا صَحَّ الْكُلُّ وَاِنْ قَضٰى الْفَائِتَةَ بَطَلَ فَرْضِيَّةَ الْخَمْسِ لَا اَصْلُهَا رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ فَادّٰى مَعَ ذِكْرِهَا خَمْسًا بَعْدَهَا فَسَدَتْ هٰذِهِ الْخَمْسُ لِوُجُوْبِ التَّرْتِيْبِ لٰكِنَّ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) فَسَادًا غَيْرَ مَوْقُوْفٍ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فَسَادًا مَوْقُوْفًا اِنْ اَدّٰى سَادِسًا صَحَّ الْكُلُّ وَاِنْ قَضَى الْفَائِتَةَ فَالْخَمْسُ الَّتِىْ اَدَّاهَا بَطَلَ وَصَفُ فَرْضِيَّتِهَا لَا اَصْلُهَا فَاِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْفَرْضِيَّةِ بُطْلَانُ اَصْلِ الصَّلٰوةِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رحـ) وَاِنَّمَا قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) بِالْفَسَادِ الْمَوْقُوْفِ لِاَنَّهُ اِنْ فَسَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْوُجُوْبَ رِعَايَةَ التَّرْتِيْبِ فَسَادًا غَيْرَ مَوْقُوْفٍ فَحِيْنَ اَدّٰى السَّادِسَ تَبَيَّنَ اَنَّ رِعَايَةَ التَّرْتِيْبِ كَانَتْ فِى الْكَثِيْرِ وَهٰذَا بَاطِلٌ فَقُلْنَا بِالتَّوَقُّفِ حَتّٰى يَظْهَرَ اَنَّ رِعَايَةَ التَّرْتِيْبِ اِنْ كَانَتْ فِى الْكَثِيْرِ فَلَا تَجُوْزُ وَاِنْ كَانَتْ فِى الْقَلِيْلِ فَتَجُوْزُ ـ

অনুবাদ : কেউ এ অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছেন যে, এক ওয়াক্ত কাজা নামাজের কথা তার স্মরণ আছে, তবে তার উক্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ مَوْقُوْفًا ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি ষষ্ঠ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তবে সমস্ত নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি [ঐ] কাজা নামাজটি পড়ে তবে পাঁচ ওয়াক্তের ফরজিয়্যাত (فَرْضِيَّةٌ) বাতিল হয়ে যাবে, কিন্তু মূল নামাজ নয়। অর্থাৎ এক ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে গেছে, ঐ কাজা নামাজের কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও এরপর সে আরও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছে, তবে তারতীব ওয়াজিব হওয়ার কারণে এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। সাহেবাইন (র.)-এর নিকট মওকুফ (مَوْقُوْفٌ) ব্যতীতই ফাসেদ হবে এবং এটিই কিয়াস। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তা [ষষ্ঠ ওয়াক্ত নামাজের উপর] মওকূফ হয়ে ফাসেদ হবে। যদি ষষ্ঠ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে নেয়, তবে সমস্ত নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি ঐ কাজা নামাজ পড়ে নেয়, তবে এ পাঁচ নামাজের فَرْضِيَّةٌ বাতিল হয়ে যাবে, যা সে আদায় করেছে। [কিন্তু] মূল নামাজ বাতিল হবে না। কেননা, শায়খাইন (র.)-এর নিকট فَرْضِيَّةٌ বাতিল হওয়ার দ্বারা মূল নামাজ বাতিল হওয়া আবশ্যক হয় না। এতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) একে مَوْقُوْفًا ফাসেদ এজন্য বলেন যে, তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব হওয়ার কারণে যদি এতে কৃত প্রত্যেক ফাসাদ মওকুফ হওয়া ব্যতীত ফাসাদ হয়, তবে যখন ষষ্ঠ ওয়াক্ত আদায় করবে, তখন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা অধিক নামাজের ক্ষেত্রে আবশ্যক ছিল। এটি বাতিল। কেননা, আমরা مَوْقُوْفًا এজন্য ফাসেদ বলি, যেন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যদি অধিক নামাজে তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় তবে তা জায়েজ নয়। আর যদি কম নামাজে হয়, তবে তা জায়েজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ خَمْسٌ ذَاكِرًا فَائِتَةً الخ : এটিই সর্বশেষ সংখ্যা। এর চেয়ে কম হওয়ার সুরতেও একই হুকুম। অর্থাৎ যদি কারো এক নামাজ কাজা হয়ে যায়, আর এ কাজা নামাজের কথা স্মরণ থাকাবস্থায় সে ওয়াক্তী নামাজ পড়তে শুরু করে দেয়, তখন দেখা হবে যে, সে তার ঐ কাজা নামাজটি পড়ছে, নাকি পড়ছে না। যদি ঐ কাজা নামাজের পর পাঁচ ওয়াক্ত কিংবা এর চেয়ে কম নামাজ পড়ে, অতঃপর ঐ কাজা নামাজকে পড়ে তবে কাজা হওয়ার পর আদায়কৃত ওয়াক্তী নামাজগুলোর فَرْضِيَّةٌ বাতিল হয়ে যাবে। তা সব নফলে পরিগণিত হবে। হ্যাঁ, যদি সে কাজা নামাজকে রেখে ধারাবাহিকভাবে ছয় ওয়াক্ত ওয়াক্তী নামাজ আদায় করে, তবে ঐ সমস্ত নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। এখন সে যখন ইচ্ছা তখন ঐ কাজা নামাজকে আদায় করতে পারবে।

قَوْلُهُ إِنْ اَدّٰى سَادِسًا صَحَّ الخ : এর প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ সমস্ত নামাজের صِحَّةٌ এ কথার উপর নির্ভরশীল যে, কাজা নামাজের পর ছয় ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। ফাতহুল কাদীর নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ওয়াক্তী নামাজসমূহ ষষ্ঠ নামাজের ওয়াক্ত দাখিল হওয়ার উপর নির্ভরশীল। 'তাতারখানিয়া'তে উল্লেখ রয়েছে যে, পঞ্চম ওয়াক্ত নামাজের সময় অতীত হওয়াই যথেষ্ট। এ সুরতে কাজা নামাজটি ষষ্ঠ ওয়াক্ত হয়ে যাবে। ফিকহের কিতাবসমূহে ছয় ওয়াক্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, যেন কাজা নামাজ নিশ্চিতভাবে ছয় ওয়াক্ত হয়ে যায়। একে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়নি।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ : কেননা, ওয়াক্তী নামাজ আদায়ের পূর্বে অধিক ওয়াক্ত কাজা হওয়া তারতীবকে রহিতকারী। ওয়াক্তী নামাজ আদায়ের পরের অধিক কাজা তারতীব রহিতকারী নয়। এখন যদি সে একটি ওয়াক্তী নামাজ আদায় করে এবং তার কাজা নামাজের কথাও স্মরণ ছিল, তবে তার এই নামাজ ফাসেদ হয়ে গেছে। কেননা, এখনো তারতীব রহিতকারী অধিক সংখ্যক কাজা নামাজ হয়নি। আর এ খিয়ালও করা যাবে না যে, আগামীতে এ অধিক সংখ্যা হবে কি হবে না।

قَوْلُهُ لَا أَصْلُهَا الخ : অর্থাৎ যার এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয় এবং সে স্বেচ্ছায় তা আদায় করা ব্যতীত পাঁচ কিংবা এর চেয়ে কম ওয়াক্তী নামাজ আদায় করেছে, এখন যদি সে ঐ কাজা নামাজ আদায় করে, তবে তার ঐ পাঁচ নামাজ বাতিল হয়ে যাবে, যা কাজা আদায় ব্যতীত আদায় করেছিল। এ বাতিল হওয়ার দ্বারা এটি উদ্দেশ্য নয় যে, ঐ নামাজ নামাজই থাকবে না; বরং তা নামাজ হিসেবেই থাকবে এবং নফলে পরিগণিত হবে এবং فَرْضِيَّةٌ বাতিল হয়ে যাবে। যার কারণে তাকে এ নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।

قَوْلُهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رح) : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে, তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা হয়েছিল ফরজের জন্য। এখন যখন ফরজ বাতিল হয়ে যাচ্ছে, তখন তাহরীমাও বাতিল হয়ে যাবে। শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, তাহরীমা বাঁধা হয়েছিল নামাজের জন্য, আর فَرْضِيَّةٌ হচ্ছে নামাজের وَصْف [গুণ]। এখন এটি জরুরি নয়। وَصْف বাতিল হওয়ার দ্বারা তাহরীমাও বাতিল হয়ে যাবে। এ মতানৈক্যের ফলাফল এভাবে বুঝা যায় যে, যদি নামাজ থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে কেউ অট্টহাসি দেয় তবে শায়খাইন (র.)-এর নিকট অজু ভেঙ্গে যায় আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট অজু ভাঙ্গবে না। যেরূপ হিদায়া ও বিনায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) الخ : এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) فَسَادٌ مَوْقُوْفٌ বলার দলিল। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে– এ অভিমতের দলিল হচ্ছে ইস্তিহসান। অর্থাৎ তারতীব রহিত হওয়ার কারণ অধিক কাজা নামাজ। আর সকলের মাঝেই এ কারণ বিদ্যমান। এখন রহিত হওয়ার প্রভাব পড়াও জরুরি। অতএব, যদি তা তারতীব ব্যতীত দোহরায়, তবে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট তা জায়েজ হবে। এর কারণ হচ্ছে, নামাজ কম কাজা হওয়া জায়েজ হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক। আর তা রহিত হয়ে গেছে। তবে এর হুকুম কোনো একটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যা এর অবস্থা স্পষ্ট করে দেবে। যেমন কেউ প্রথমেই জাকাত দিয়ে দিয়েছে, তবে এর فَرْضِيَّةٌ বছর অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত মওকুফ থাকবে। এখন যদি বছর পরিপূর্ণ হয়ে যায় তবে তা ফরজ হবে। অন্যথায় তা নফল হয়ে যাবে। অনুরূপ মুযদালিফার পথে যদি কেউ মাগরিব পড়ে নেয়, তবে যদি তা ফজরের পূর্বে না দোহরায় তবে ফরজ থাকবে। আর যদি দোহরায় তবে তা নফল হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি জুমার দিনে জোহর পড়ে এবং জুমায় উপস্থিত না হয়, তবে তা ফরজ হয়ে যাবে। আর যদি জুমায় শরিক হয় তবে তা নফল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَحِيْنَ اَدّٰى السَّادِسَ الخ : অর্থাৎ যখন ষষ্ঠ ওয়াক্ত পড়ে ফেলে তখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কাজা নামাজের সংখ্যা অধিক হয়ে গেছে। কিন্তু তথাপিও অধিক কাজার মাঝে তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাতিল বিষয়।

بَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ

يَجِبُ لَهُ بَعْدَ سَلَامٍ وَاحِدٍ سَجْدَتَانِ وَتَشَهُّدٌ وَسَلَامٌ اِذَا قَدَّمَ رُكْنًا وَاَخَّرَهُ اَوْ كَرَّرَهُ اَوْ غَيَّرَ وَاجِبًا اَوْ تَرَكَهُ سَاهِيًا كَرُكُوْعٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَتَاخِيْرِ الْقِيَامِ اِلَى الثَّالِثَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى التَّشَهُّدِ رُوِىَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِنَّ مَنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ الْاَوَّلِ حَرْفًا يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُوْدُ السَّهْوِ وَقِيْلَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُوْدُ السَّهْوِ بِقَوْلِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَنَحْوِهِ وَاِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ مِقْدَارُ مَا يُؤَدّٰى فِيْهِ رُكْنٌ وَ رُكُوْعَيْنِ وَالْجَهْرِ فِيْمَا يُخَافِتُ وَعَكْسُهُ وَتَرْكِ الْقُعُوْدِ الْاَوَّلِ وَقِيْلَ كُلُّ هٰذِهٖ يَؤُلُ اِلٰى تَرْكِ الْوَاجِبِ وَلَا يَجِبُ بِسَهْوِ الْمُؤْتَمِّ بَلْ بِسَهْوِ اِمَامِهٖ اَنْ سَجَدَ وَالْمَسْبُوْقُ يَسْجُدُ مَعَ اِمَامِهٖ ثُمَّ يَقْضِىْ مَا فَاتَ عَنْهُ وَمَنْ سَهَا عَنِ الْقُعْدَةِ الْاُوْلٰى وَهُوَ اِلَيْهَا اَقْرَبُ عَادَ وَلَا سَهْوَ وَاِلَّا قَامَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ـ

পরিচ্ছেদ : সিজদায়ে সাহু-এর বিবরণ

অনুবাদ : নামাজি ব্যক্তির জন্য এক সালামের পর দুই সিজদা, তাশাহহুদ ও সালাম ওয়াজিব– [এটি তখন] যখন নামাজের কোনো রুকনকে আগে আদায় করে ফেলবে, কিংবা বিলম্বে আদায় করবে, কিংবা একাধিকবার আদায় করবে, কিংবা কোনো ওয়াজিবকে পরিবর্তন করে ফেলবে, কিংবা ভুলে ছেড়ে দেবে। যেমন– কেরাতের পূর্বে রুকু করা কিংবা [প্রথম বৈঠকে] তাশাহহুদের অধিক কিছু পড়তে গিয়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতে বিলম্ব করা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রথম [বৈঠকে] তাশাহহুদের পর যদি কেউ এক অক্ষরও বেশি পড়ে– তবে তার উপর সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হবে। কেউ বলেন, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ কিংবা অনুরূপ কোনো বাক্য বলার দ্বারা সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হবে না। [কিছু বলা বা করার ক্ষেত্রে] ঐ পরিমাণ ধর্তব্য, যাতে একটি রুকন আদায় করা যায়। [যখন] দুই রুকু করবে, আস্তে কেরাতের নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়বে, উচ্চৈঃস্বরের কেরাতের নামাজে আস্তে কেরাত পড়বে এবং প্রথম বৈঠককে বর্জন করবে– [তখনও সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব]। বলা হয় যে, এ প্রত্যেক বিষয়ই ওয়াজিব বর্জন করার দিকে ফিরিয়ে নেয়। মুক্তাদীর ভুলের কারণে সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হয় না; বরং তার ইমামের ভুলের কারণে তার উপর সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হয়, যদি ইমাম সিজদা করে। মাসবূক ব্যক্তি স্বীয় ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহূ করবে। অতঃপর যা কিছু তার ছুটে গেছে তা আদায় করবে। যে ব্যক্তি প্রথম বৈঠক থেকে দাঁড়াতে শুরু করেছে অথচ [এখনও] বসার অধিক নিকটবর্তী রয়েছে, তবে সে বসার দিকে ফিরে যাবে এবং সিজদায়ে সাহূ করবে না। অন্যথায় [অর্থাৎ যদি দাঁড়ানোর অধিক নিকটবর্তী হয়, তবে] সে দাঁড়িয়ে যাবে এবং সিজদায়ে সাহূ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : আদা নামাজ ও কাজা নামাজের আলোচনা থেকে অবসর হয়ে বিকায়া গ্রন্থকার ওয়াক্তী নামাজ এবং কাজা নামাজের মাঝে সংঘটিত ত্রুটি (سَهْو) -কে লাঘবকারী জিনিসের আলোচনা করবেন অর্থাৎ সিজদায়ে সাহু-এর আলোচনা করবেন। গ্রন্থকার "সুজূদুস্ সাহু" (سُجُوْدُالسَّهْوِ) -এর মাঝে مُسَبَّبْ তথা সুজূদ (سُجُوْد)-(سُجُوْد)-কে سَبَبْ তথা سَهْو-এর দিকে اِضَافَةْ করেছেন। কেননা, নামাজে সাহু (سَهْو) -এর কারণে সিজদা ওয়াজিব হয়।

সিজদায়ে সাহু দুটি হওয়ার হিকমত : হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (র.) "اَحْكَام اِسْلَامْ عَقَلْ كِى نَظَرْ مِيْں" নামক গ্রন্থে লেখেন, প্রথম সিজদা ওয়াজিব– মনকে এ কথার প্রতি সতর্ক করার জন্য যে, আমি এ মাটি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছি আর দ্বিতীয় সিজদা এ কথার প্রতি সতর্ক করার জন্য যে, আমাকে এ মাটিতেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। মুফতি জামীল সাহেব [দা. বা.] উক্ত গ্রন্থের টীকায় লেখেন, শয়তান সিজদা করতে অস্বীকার করেছে– তাকে অবমাননা করার জন্য দুটি সিজদা ওয়াজিব হয়েছে।

সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব; সুন্নত নয় : ইবারতে উল্লিখিত কারণগুলোর কোনো একটি যদি কারো নামাজে সংঘটিত হয় তবে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। সিহাহ সিত্তার কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ সিজদায়ে সাহু-এর উপর সর্বদা আমল করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, "সিজদায়ে সাহু" সুন্নত। কেননা, এটি নামাজের ভুল-ত্রুটির নিরসনের জন্য পড়া হয়। যেরূপ হজে দম [কুরবানি] দিয়ে হজকে পূর্ণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, কোনো সুন্নতকে বর্জন করার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। কারণ, সেগুলো ওয়াজিব নয়। আর যেগুলো ওয়াজিব নয় সেগুলোর ত্রুটি পূর্ণ করাও ওয়াজিব নয়। নামাজের কোনো রুকন বর্জন করলেও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না কারণ, নামাজের রুকন চাই ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক বর্জন করলে সর্বাবস্থায় নামাজ ভেঙ্গে যাবে। কেননা, রুকন বর্জন করার দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়, তাই তখন নামাজই দোহরায়ে পড়তে হবে। অনুরূপ যদি কেউ স্বেচ্ছায় কোনো ওয়াজিব বর্জন করে তবে তার উপরও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। কেননা, হাদীসে সিজদায়ে সাহু করার কথা বলা হয়েছে– কিন্তু স্বেচ্ছায় ওয়াজিব বর্জন করার সুরতে সিজদায়ে সাহুর কথা বলা হয়নি; বরং স্বেচ্ছায় ওয়াজিব বর্জন করলে নামাজকে দোহরানো ওয়াজিব

قَوْلُهٗ يَجِبُ لَهٗ بَعْدَ سَلَامٍ وَاحِدٍ الخ :

সিজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে, নাকি পরে? সর্বসম্মতিক্রমে সালামের পূর্বে এবং পরে সিজদায়ে সাহু করা জায়েজ। কিন্তু উত্তম ও অনুত্তম নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আহনাফ বলেন, ডান দিকে একবার সালাম ফিরানোর পর সিজদায়ে সাহু করবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সালামের পূর্বে সিজদায়ে করবে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, নামাজি ব্যক্তি যদি নামাজে কোনো কিছু কম করে তবে সিজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে করবে, আর যদি কোনো কিছু বেশি করে তবে সালামের পরে সিজদায়ে সাহু করবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, রাসূল ﷺ থেকে যেখানে সালামের আগে করা প্রমাণিত আছে সেখানে আগে করবে, আর যেখানে রাসূল থেকে সালামের পরে সিজদায়ে সাহু করা প্রমাণিত আছে সেখানে পরে করবে।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমামত্রয় কোনো না কোনো সুরতে সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহু করার প্রবক্তা। অতএব, তাঁদের দলিল একত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালিক (র.) সূত্রে বর্ণিত–

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهٗ حَتّٰى اِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهٗ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ .

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ জোহরের নামাজ পড়লেন, প্রথম দুই রাকাতে প্রথম বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর সাথে লোকেরাও দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যখন নামাজ সমাপ্ত করার উপক্রম হলো– তখন লোকেরা তাঁর সালাম ফিরানো অপেক্ষা করছিলেন। রাসূল ﷺ বসে বসে তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সিজদা দিলেন।" –[সিহাহ সিত্তা]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, সিজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে হয়।

আহনাফের দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন– لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلَامِ
অর্থাৎ "প্রতিটি ভুলের জন্য সালামের পরে দুটি সিজদা।" –[আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ]

আহনাফের যৌক্তিক দলিল হলো, যদি কেউ সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহূ করে, অতঃপর নামাজের সালাম ফিরানোর পূর্বে তার সংশয় হয় যে, নামাজ তিন রাকাত হলো– না চার রাকাত হলো? আর এ চিন্তায় থাকার কারণে সালাম ফিরাতে বিলম্ব হয়, অতঃপর স্মরণ আসে যে, নামাজ চার রাকাতই হয়েছে– তবে তার সালাম বিলম্ব হওয়ার কারণে পুনরায় সিজদায়ে সাহূ করতে হবে। এখন তার সিজদায়ে সাহূ দুবার করা হচ্ছে, যা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ নেই। অর্থাৎ দুবার সিজদায়ে সাহূ করা জায়েজ নেই। আর যদি সালামের পরে সিজদায়ে সাহূ করে তবে দুই সিজদায়ে সাহূ করার সম্ভাবনা থাকে না।

بَيَانُ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ : ইমামত্রয়-এর দলিল হিসেবে পেশকৃত হাদীসের উত্তর হচ্ছে– ১. এটি جَوَازٌ-এর উপর প্রয়োগ করা হবে। ২. উক্ত হাদীসে সালামের পূর্বে বলতে নামাজের সালামের পূর্বে; সিজদায়ে সাহূর সালামের পূর্বে নয়।

সিজদায়ে সাহূ-এর পদ্ধতি : তাশাহুদের পর ডান দিকে একবার সালাম ফিরিয়ে দুই সিজদা দেওয়া। অতঃপর আবার তাশাহুদ পড়া এবং দরুদ শরীফ ও দোয়া মাসুরা পড়া। অতঃপর সালাম ফিরানো। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহূ করা।

প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর অন্য কিছু পড়ার সুরতে সিজদায়ে সাহূর হুকুম : যদি প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পরে অন্য কিছু পড়ে তবে তার উপর সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হবে কিনা? এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রথম বৈঠকে যদি কেউ তাশাহুদের পরে একটি অক্ষরও অতিরিক্ত পড়ে, তবে তার উপর সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হবে। এটিই বিকায়া গ্রন্থকারের অভিমত। কিন্তু এক অভিমত অনুযায়ী اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ-এর চেয়ে অধিক পড়লে সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হবে।

এক অভিমত অনুযায়ী যদি وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ না বলে তবে সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হবে না। কোনো কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ বলার সুরতেও সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হবে না। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ -এর উপর দরুদ শরীফ পড়ার কারণে সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হওয়ার হুকুম দেওয়া যায় না। একদা ইমাম শাফেয়ী (র.) নবী ﷺ -কে স্বপ্নে দেখেছেন। তখন রাসূল ﷺ ইমাম শাফেয়ী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পরে দরুদ পড়ার কারণে সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হওয়ার হুকুম কেন দাও না? ইমাম শাফেয়ী (র.) উত্তরে বললেন, আমার ভয় হয় যে, আপনার উপর দরুদ পড়ার অপরাধে আমি সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হওয়ার হুকুম দেব। নবী ﷺ অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর আমার উপর দরুদ পড়ার কারণে কেন তুমি সিজদায়ে সাহূর হুকুম দাও? তিনি উত্তরে বললেন, আমি এজন্য সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হওয়ার হুকুম দেই যে, সে ভুলে আপনার উপর দুরুদ পড়েছে। যদি সে স্বেচ্ছায় দরুদ পড়ত তাহলে সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হতো না। এ উত্তর শুনে রাসূল ﷺ মুচকি হাসি দিলেন।

قَوْلُهُ وَالْجَهْرُ فِيْمَا يُخَافَتُ الخ : অর্থাৎ سِرِّىْ নামাজে আওয়াজ দিয়ে কেরাত পড়া কিংবা جَهْرِىْ নামাজে আস্তে আস্তে কেরাত পড়াও সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হওয়ার কারণ। কিন্তু এটি ইমামের ক্ষেত্রে। মুনফারিদের ক্ষেত্রে এ হুকুম নয়। কারণ, আওয়াজ দিয়ে কিংবা আস্তে কিরাত পড়া জামাতের বৈশিষ্ট্য। আল্লামা যায়লায়ী ও হিদায়া গ্রন্থকার (র.) একে উত্তম বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থকারই এ কথা বলেন যে, নামাজি ব্যক্তি ইমাম হোক কিংবা মুনফারিদ হোক যদি সে جَهْرِىْ নামাজে কেরাত আস্তে কিংবা سِرِّىْ নামাজে কিরাত আওয়াজ দিয়ে পড়ে তবে مُطْلَقًا তার উপর সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হবে যদি এক কালিমা পরিমাণ পড়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন, উভয় সুরতে যদি এ পরিমাণ পড়ে যে, যা দ্বারা নামাজ সহীহ হয়ে যায়, তবে সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হবে; অন্যথায় নয়। কেননা, রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে যে, "তিনি سِرِّىْ নামাজে কেরাত আস্তে পড়তেন। কিন্তু এক দুই আয়াত কখনো কখনো শুনিয়ে দিতেন।" –[বুখারী ও মুসলিম]

قَوْلُهُ قِيلَ كُلُّ هٰذِهِ يَؤُلُ الخ : অর্থাৎ উল্লিখিত সমস্ত সুরত যাতে সিজদায়ে সাহু আবশ্যক হয়- এসবগুলোই ওয়াজিব বর্জন করার দিকে ফিরবে। কেননা, যেমন- سِرِّى কেরাতের স্থলে جَهْرٌ কেরাত পড়া سِرِّىْ -কে বর্জন করা আবশ্যক হয়। অনুরূপ جَهْرِىْ কেরাতের স্থলে سِرِّىْ কেরাত পড়া جَهْرِىْ -কে বর্জন করা আবশ্যক হয়। রুকনসমূহকে تَاخِيْر ও تَقْدِيْم করার দ্বারা তারতীব বর্জন করা আবশ্যক হয়। অনুরূপ মুনফারিদ কোনো রুকনকে দুবার আদায় করার দ্বারা تَكْرَارْ আবশ্যক হয়। যেহেতু এসবই ওয়াজিব আর ওয়াজিব বর্জন করার দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। অতএব, এর দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

মুক্তাদীর উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব নয় : মুক্তাদীর ভুলের কারণে ইমামের উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না এবং মুক্তাদীর উপরও ওয়াজিব হয় না। ইমামের উপর আবশ্যক নয় এজন্য যে, মুক্তাদী ইমামের অনুগামী। আর অনুগামী অনুসৃতের উপর কোনো কিছু আবশ্যক করতে পারে না। তাছাড়া মুক্তাদীর ভুলের কথা ইমাম জানেন না। আর মুক্তাদীর উপর এজন্য আবশ্যক হয় না যে, ইমাম হয়তো সালামের পূর্বে করবে কিংবা সালামের পরে করবে। যদি সালামের পূর্বে করে, তবে তার ইমামের বিরোধিতা করা হচ্ছে। এর দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়। আর যদি সালামের পরে করে, তবে তো তখন নামাজ সমাপ্ত হয়ে যায়। অনুরূপ যদি ইমামের ভুল হয়, আর ইমাম সিজদায়ে সাহু না করে তবুও মুক্তাদীর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি সিজদায়ে সাহু করে, তবে মুক্তাদীর উপরও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব যদিও তার ভুল হয়নি।

মাসবূক ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহু করবে : মাসবূক ব্যক্তি ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহু করবে। চাই সে ইমামের সাথে নামাজে শরিক হওয়ার পর ইমামের ভুল হোক কিংবা শরিক হওয়ার ভুল হোক। কারণ, যদি শরিক হওয়ার পরে ভুল হয় তবে তো স্পষ্ট যে, ইমামের ভুল হওয়া অর্থাৎ তারও ভুল হওয়া। কেননা, সে ইমামের অনুগামী। আর যদি সে ইকতিদা করার পূর্বে ইমামের ভুল হয়ে থাকে, তবুও তাকে সিজদায়ে সাহু করতে হবে। কেননা, ইমাম সিজদায়ে সাহু করার সময় যদি মুক্তাদী না করে তবে ইমামের বিরোধিতা করা আবশ্যক হয়, যা জায়েজ নেই। ইমামের শেষ সালামের পর মাসবূক দাঁড়িয়ে তার ছুটে যাওয়া নামাজকে আদায় করবে। এখানে স্মরণ রাখা জরুরি যে, ইমাম যখন ডান দিকে সালাম ফিরায় তখন সাথে সাথে যেন মাসবূক দাঁড়িয়ে না যায়; বরং সে অপেক্ষা করবে যে, ইমাম বাম দিকে সালাম ফিরান, নাকি সিজদায়ে সাহু করেন। যদি বাম দিকে সালাম ফিরায় তবে সে উঠে বাকি নামাজ পূর্ণ করবে। আর যদি সিজদায়ে সাহু করে তবে সেও এতে শরিক হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ سَهَا عَنِ الْقَعْدَةِ الْأُوْلٰى الخ : এটি তিন কিংবা চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের মাসআলা। এতে প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠক নামে দুটি বৈঠক রয়েছে। প্রথম বৈঠক ওয়াজিব, যা বর্জন করলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ফরজ, যা বর্জন করার কারণে নামাজের মূল বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ যদি ফরজ নামাজ হয় তবে এর فَرْضِيَّةٌ বাতিল হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়বার নামাজ পড়তে হয়। তবে নামাজের মূল বাতিল হয় না; বরং তা নফল হয়ে যায়। এখন যে ব্যক্তি ভুলে প্রথম বৈঠক করেনি; বরং বসার স্থলে সে দাঁড়াতে শুরু করেছে- এমতাবস্থায় তার স্মরণ হয়েছে যে, তার এখন বসার দরকার ছিল তখন দেখা হবে যে, সে দাঁড়ানোর নিকটবর্তী- না বসার নিকটবর্তী? যদি বসার নিকটবর্তী থাকে, তবে বসে যাবে এবং সিজদায়ে সাহু-এর প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি দাঁড়িয়ে যায় কিংবা দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয়ে যায়, তবে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং বাকি নামাজ পূর্ণ করে সিজদায়ে সাহু করবে। আর যদি কেউ দাঁড়িয়ে গেছে কিংবা দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয়ে মনে হয় যে, তার বসা উচিত ছিল, তখন সে বসে পড়েছে, তাহলে কি তার নামাজ সহীহ হবে? এ সুরতে আমাদের ইমামগণ নামাজ ভেঙ্গে যাওয়ার ফতোয়া দেন। কেননা, সে ফরজ থেকে ওয়াজিবের দিকে ফিরে গেছে। কারণ, তৃতীয় রাকাতের قِيَامٌ ফরজ ছিল এবং প্রথম বৈঠক ছিল ওয়াজিব। আর সে এই ফরজ ছেড়ে ওয়াজিবের দিকে আসছে। পক্ষান্তরে ইবনে হুমাম (র.) নামাজ না ভাঙ্গার বিষয়টিকে প্রধান্য দিয়েছেন।

وَإِنْ سَهَا عَنِ الْأَخِيْرَةِ عَادَ مَا لَمْ يُقَيِّدْ بِالسَّجْدَةِ وَسَجَدَ السَّهْوَ وَإِنْ قَيَّدَ تَحَوَّلَ فَرْضُهُ نَفْلًا وَضَمَّ سَادِسَةً إِنْ شَاءَ إِنَّمَا قَالَ إِنْ شَاءَ لِأَنَّهُ نَفْلٌ لَمْ يَشْرَعْ فِيْهِ قَصْدًا فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِتْمَامُهُ وَإِنْ قَعَدَ الْأَخِيْرَةَ ثُمَّ قَامَ سَهْوًا عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ لِلْخَامِسَةِ وَسَلَّمَ وَإِنْ سَجَدَ لَهَا ثُمَّ فَرْضُهُ وَضَمَّ سَادِسَةً وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَالرَّكْعَتَانِ نَفْلٌ وَلَا قَضَاءَ لَوْ قَطَعَ وَلَا تَنُوْبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ فَإِنْ قُلْتَ لِمَ قَالَ قَبْلَ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَضَمَّ سَادِسَةً إِنْ شَاءَ وَقَالَ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَضَمَّ سَادِسَةً وَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ مَعَ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ نَفْلٌ فِي الصُّوْرَتَيْنِ بِحَيْثُ لَوْ قَطَعَ لَا قَضَاءَ فَيَكُوْنُ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ ضَمُّ السَّادِسَةِ مُقَيَّدًا بِمَشِيَّتِهِ قُلْتُ ضَمُّ السَّادِسَةِ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ اكد مِنْ ضَمِّ السَّادِسَةِ فِيْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ لَا قَضَاءَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَذٰلِكَ لِأَنَّ فَرْضَهُ قَدْ تَمَّ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ لٰكِنَّ بِتَاخِيْرِ السَّلَامِ يَجِبُ سُجُوْدُ السَّهْوِ فِيْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَسُجُوْدُ السَّهْوِ لِتَدَارُكِ نُقْصَانِ الْفَرْضِ وَاجِبٌ فِيْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ.

অনুবাদ : যদি শেষ বৈঠক থেকে ভুলে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ রাকাতের সিজদা না করবে– বসে যাবে এবং সিজদায়ে সাহু করে ফেলবে। আর যদি ঐ রাকাতের সিজদা করে ফেলে, তবে তার ফরজ নফল হয়ে যাবে। এখন যদি সে ইচ্ছা করে ষষ্ঠ রাকাতকে এর সাথে মিলিয়ে নেবে। [বিকায়া] গ্রন্থকার (র.) إِنْ شَاءَ এজন্য বলেছেন যে, এটি এমন নফল হচ্ছে, যা সে স্বেচ্ছায় শুরু করেনি। তাই তা পরিপূর্ণ করা তার জন্য আবশ্যক নয়। আর যদি শেষ বৈঠক করে ফেলে, অতঃপর ভুলে দাঁড়িয়ে যায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত পঞ্চম রাকাতের সিজদা না করবে– বসে যাবে এবং সালাম ফিরিয়ে ফেলবে। আর যদি সিজদা করে ফেলে– তবে তার ফরজ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এখন এর সাথে ষষ্ঠ রাকাত মিলিয়ে নেবে এবং সিজদায়ে সাহু করে ফেলবে। তবে শেষ দুই রাকাত নফল হয়ে যাবে। আর এ দুই রাকাতকে ভেঙ্গে দেওয়ার দ্বারা কাজাও আবশ্যক হবে না। আবার এ দুই রাকাত জোহরের সুন্নতের স্থলাভিষিক্তও হবে না। তুমি যদি প্রশ্ন কর যে, গ্রন্থকার ইতিপূর্বের মাসআলায় ضَمَّ سَادِسَةً إِنْ شَاءَ বললেন, আর এই মাসআলাটি [শুধু] ضَمَّ سَادِسَةً বললেন, إِنْ شَاءَ বললেন না কেন? অথচ এ উভয় রাকাত উভয় সুরতে এমন নফল যা ভাঙ্গার কারণে কাজা ওয়াজিব হয় না। অতএব, দ্বিতীয় মাসআলায় ضَمَّ سَادِسَةً-কে- (إِنْ شَاءَ) مَشِيَّةٌ-এর সাথে শর্তারোপ করার প্রয়োজন ছিল। আমি [উত্তরে] বলব, এ মাসআলায় ضَمَّ السَّادِسَةِ প্রথম মাসআলার ضَمَّ السَّادِسَةِ-এর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অথচ উভয় সুরতে যদি নামাজ ভেঙ্গে ফেলে, তবে এর কাজা ওয়াজিব নয়। আর এটি এজন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, দ্বিতীয় মাসআলায় ফরজ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু সালাম বিলম্ব করার কারণে এ দুই রাকাতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হচ্ছে। সুতরাং ফরজ নামাজের ক্ষতিপূরণের জন্য এ দুই রাকাতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ سَهَا عَنِ الْاَخِيْرَةِ الخ :

মাসআলা : যদি কেউ ভুলক্রমে শেষ বৈঠকের স্থলে দাঁড়িয়ে যায় এবং স্মরণ হয় যে, এখানে বসার প্রয়োজন ছিল, তবে সাথে সাথে বসে যাবে। চাই সে বসার নিকটবর্তী থাকুক কিংবা পরিপূর্ণ দাঁড়িয়ে যাক। এমনকি যদি সে পূর্ণ রাকাত পড়ে ফেলে কিন্তু এখনো সিজদা করেনি, তবে সে ফিরে আসবে এবং তাশাহহুদের পর সিজদায়ে সাহু করবে। কিন্তু যদি বসার নিকটবর্তী থেকে বসে যায় তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। হ্যাঁ, যদি পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে ফেলে, তবে এর হুকুম হচ্ছে, নামাজের فَرْضِيَّةٌ বাতিল হয়ে যাবে; পূর্ণ নামাজ নফল হয়ে যাবে। এখন যদি সে ইচ্ছা করে তবে এর সাথে ষষ্ঠ রাকাত মিলিয়ে নিয়ে সিজদায়ে সাহু করবে। পূর্ণ ছয় রাকাতই এখন নফল হয়ে যাবে। আর যদি সে ইচ্ছা করে, ষষ্ঠ রাকাতকে নাও মিলাতে পারে। তবে ষষ্ঠ রাকাত না মিলানোর সুরতে পঞ্চম রাকাতটি বেকার হয়ে যাবে। এজন্য ষষ্ঠ রাকাত মিলিয়ে নেওয়া উত্তম, যেন পূর্ণ ছয় রাকাত নফল হয়ে যায়। সর্বোপরি সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব। অন্যথায় পূর্ণ নামাজই বেকার হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَضَمَّ سَادِسَةً اِنْ شَاءَ : ষষ্ঠ রাকাত মিলানোর বিষয়টি যে-কোনো নামাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং এটি জোহর, আসর ও ইশার সাথে সম্পৃক্ত। এসব নামাজ চার রাকাতবিশিষ্ট। পক্ষান্তরে যদি ফজরের নামাজে এ অবস্থা হয়, যা দুই রাকাতবিশিষ্ট। তবে এর হুকুম হচ্ছে, এতে পঞ্চম রাকাত মিলাবে না। কেননা, পাঁচ রাকাতবিশিষ্ট কোনো নামাজ নেই; বরং তা চার রাকাতের মাথায়ই সিজদায়ে সাহু করে নামাজ সমাপ্ত করে দেবে এবং এগুলো নফল হয়ে যাবে। আর ফজরের দুই রাকাত আবার নতুন করে পড়বে। উল্লেখ্য যে, যেসব নামাজে প্রথম বৈঠক নেই তথা দুই রাকাতবিশিষ্ট, সে নামাজে দুই রাকাতের পর যে বৈঠক হয়, সেটিই قُعْدَةٌ اَخِيْرَةٌ [শেষ বৈঠক]।

মাসআলা : যদি কেউ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ে ভুলে দাঁড়িয়ে যায় তবে যদি বসার নিকটবর্তী থাকাবস্থায় তার স্মরণ হয় তবে সে দাঁড়াবে না; বরং বসে নামাজ পরিপূর্ণ করে নেবে। সিজদায়ে সাহুরও প্রয়োজন নেই। আর যদি দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয়ে যায়, কিংবা পুরাপুরি দাঁড়িয়ে যায়, কিংবা দাঁড়িয়ে কেরাত পরিপূর্ণ করে ফেলে, কিন্তু এখনো সিজদা করেনি, তবুও বসে যাবে এবং সিজদায়ে সাহু করে নামাজ সমাপ্ত করে ফেলবে। আর যদি সে পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে ফেলে অতঃপর স্মরণ হয় যে, না দাঁড়ানো উচিত ছিল, তবে তার নামাজের فَرْضِيَّةٌ আদায় হয়ে যাবে। কারণ, সে শেষ বৈঠক করেছে। এখন ষষ্ঠ রাকাত মিলিয়ে সিজদায়ে সাহু করে ফেলবে। কেননা, সালামকে বিলম্ব করার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। এ অতিরিক্ত দুই রাকাত নফল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَا قَضَاءَ لَوْ قَطَعَ : অর্থাৎ শেষ বৈঠকের পর ভুলে যে নামাজ পড়েছে তা যদি ইচ্ছাকৃতভাবেও ভেঙ্গে ফেলে তবুও তা কাজা করা ওয়াজিব নয়। কারণ, তা এমন নফল যা সে স্বেচ্ছায় শুরু করেনি। আর যা স্বেচ্ছায় শুরু করা হয় না, তা যদি ভেঙ্গে ফেলা হয় তবে এর কাজা আবশ্যক নয়।

قَوْلُهُ وَلَا تَنُوْبَانِ عَنْ سُنَّةٍ الخ : অর্থাৎ ফরজকে পরিপূর্ণরূপে আদায়ের পর যদি কেউ ভুলে দাঁড়িয়ে আবার দুই রাকাত অতিরিক্ত পড়ে ফেলে, তবে তা নফল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তা জোহর ও ইশার ফরজের পর হয়, তবে তা ফরজের পরের দুই রাকাতের স্থলাভিষিক্ত হবে না; বরং সেই দুই রাকাত সুন্নতকে নতুন করে পড়তে হবে।

قَوْلُهُ قُلْتُ ضَمَّ السَّادِسَةَ فِىْ الخ : جَوَابٌ-এর সারমর্ম হচ্ছে, উভয় সুরতের মাঝে যদিও এদিক থেকে মিল রয়েছে যে, উভয়ের মাঝে দুই দুই রাকাত অতিরিক্ত এবং যদি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তবে এর কাজা আবশ্যক হয় না। কিন্তু এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্যও আছে যে, যদি দ্বিতীয় সুরতে ষষ্ঠ রাকাত মিলানো হয়, তবে এটি প্রথম সুরতের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এতে নামাজের فَرْضِيَّةٌ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে প্রথম সুরতে স্বয়ং নামাজের فَرْضِيَّةٌ বাতিল হয়ে গেছে এবং সমস্ত নামাজ নফলে পরিণত হয়ে গেছে। এজন্য প্রথম সুরতে مَشِيْئَةٌ [ইচ্ছা]-এর শর্ত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে مَشِيْئَةٌ -এর শর্ত করা হয়নি।

فَلَوْ قَطَعَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بِأَنْ لَا يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ يَلْزَمُ تَرْكُ الْوَاجِبِ وَلَوْ جَلَسَ مِنَ الْقِيَامِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ لَمْ يُؤَدِّ سُجُوْدَ السَّهْوِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُوْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ اَنْ يَضُمَّ سَادِسَةً وَجَلَسَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَاِنَّ الْفَرْضِيَّةَ قَدْ بَطَلَتْ فَمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَدَارُكِ نُقْصَانِ الْفَرْضِ غَيْرُ مَوْجُوْدٍ هٰهُنَا عَلَا اَنَّ اَصْلَ الصَّلٰوةِ بَاطِلٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) فَعُلِمَ اَنَّ ضَمَّ السَّادِسَةِ صِيَانَةً عَنِ الْبُطْلَانِ اكد فِيْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلِهٰذَا لَمْ يَقُلْ اِنْ شَاءَ وَاِنَّمَا قَالَ لَا تَنُوْبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا بِتَحْرِيْمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ.

অনুবাদ : তাই যদি সিজদায়ে সাহূ না করার দ্বারা উভয় রাকাতকে ভেঙ্গে ফেলে তবে ওয়াজিব বর্জন করা আবশ্যক হয়। আর যদি দাঁড়ানো থেকে বসে যায় এবং ভুলের জন্য সিজদায়ে সাহূ করে তবে সিজদায়ে সাহূ সুন্নত তরিকায় আদায় হয় না। তাই ষষ্ঠ রাকাতকে মিলিয়ে পড়া জরুরি। দুই রাকাতের মাথায় বসবে এবং সিজদায়ে সাহূ করবে। এটি প্রথম মাসআলার পরিপন্থি। কেননা, প্রথম মাসআলায় নামাজের فَرْضِيَّةٌ বাতিল হয়ে গেছে। অতএব, ঐ জিনিস যা আমরা ফরজের ক্ষতিপূরণ হিসেবে উল্লেখ করেছি তা এখানে নেই। তাছাড়া ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট [প্রথম সুরতে] নামাজই বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, এ মাসআলায় নামাজকে বাতিল হওয়া থেকে হেফাজত করার জন্য এর সাথে ষষ্ঠ রাকাত মিলানো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই গ্রন্থকার এ মাসআলায় اِنْ شَاءَ বলেননি। গ্রন্থকার "উক্ত দুই রাকাত জোহরের [শেষ দুই রাকাত] সুন্নত হবে না" এজন্য বলেছেন যে, রাসূল ﷺ জোহরের [পরের দুই রাকাত] সুন্নতের নতুন তাহরীমার উপর সর্বদা আমল করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَلْزَمُ تَرْكُ الْوَاجِبِ وَلَوْ جَلَسَ الخ **:** এর সারমর্ম হচ্ছে, যদি এ দুই রাকাতকে এই ভেবে ভেঙ্গে দেয় যে, নফল পড়া আবশ্যক নয়, তবু ফরজের মাঝে এ সমস্যা বাকি থেকে যায় যে, সিজদায়ে সাহূ করে ঐ ভুলের সমাধান করা হয়নি। আর যদি দাঁড়িয়ে বসে যায় এবং সিজদায়ে সাহূ করে, তবে সুন্নত তরিকা ব্যতীত সিজদায়ে সাহূ করা আবশ্যক হয়। কেননা, সিজদায়ে সাহূ তো শেষ তাশাহহুদের পর হওয়ার কথা ছিল।

এ কারণেই এখানে তাকিদ করে দেওয়া হয়েছে যে, এর সাথে আরেক রাকাত মিলিয়ে নাও, যাতে করে নামাজের শেষে সিজদায়ে সাহূ করা হয় এবং ফরজ নামাজে যে ত্রুটি হয়েছে এর সমাধান হয়ে যায়।

قَوْلُهُ عَلَا اَنَّ اَصْلَ الصَّلٰوةِ الخ **:** এর সারকথা হচ্ছে, এখানে ফরজের ত্রুটির সমাধান নেই। কেননা, সর্বসম্মতিক্রমে নামাজের فَرْضِيَّةٌ বাতিল হয়ে গেছে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট তো পরিপূর্ণ নামাজই বাতিল হয়ে গেছে। কারণ, তাঁর মতে فَرْضِيَّةٌ বাতিল হওয়ার দ্বারা পূর্ণ নামাজই বাতিল হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا الخ **:** এতে মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, এ দুই রাকাত জোহর ও ইশার ফরজের পরের দুই রাকাত সুন্নতের স্থলাভিষিক্ত হবে। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে ইবনে সামায়াহ (র.) বর্ণনা করেছেন। যেরূপ শামসুল আইম্মাহ হালওয়ায়ী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি রাতের শেষভাগে এ নিয়তে দুই রাকাত সুন্নত পড়ে যে, এখনো সুবহে সাদেক উদয় হয়নি। পরবর্তীতে জানা গেল যে, সুবহে সাদেক উদয় হয়ে গিয়েছিল, তবে এ দুই রাকাত নফল। ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে ফখরুল ইসলাম কাজী খান (র.) ও অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, তা জোহর ও ইশার ফরজের পরের দুই রাকাতের স্থলাভিষিক্ত হবে না। হিদায়া গ্রন্থে একেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ জোহরের ফরজের পর এ দুই রাকাত সুন্নত সর্বদা পড়তেন। অন্য তাহরীমার উপর ভিত্তি করে কখনো পড়েননি; বরং সর্বদা নতুন তাহরীমার মাধ্যমেই পড়তেন। তাই একে অন্য নামাজের সাথে মিলিয়ে অসম্পূর্ণরূপে আদায় করা যাবে না।

وَمَنِ اقْتَدٰى بِهٖ فِيْهِمَا صَلَّاهُمَا وَلَوْ اَفْسَدَ قَضَاهُمَا لِاَنَّهٗ شَرَعَ قَصْدًا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) يُصَلِّىْ سِتًّا وَلَوْا فَسَدَ لَا يَقْضِىْ كَمَا اَنَّ الْاِمَامَ لَا يَقْضِىْ مَنْ تَنَفَّلَ رَكْعَتَيْنِ وَ سَهَا فَسَجَدَ لَا يَبْنِىْ لِاَنَّ سُجُوْدَ السَّهْوِ يَقَعُ فِىْ خِلَالِ الصَّلٰوةِ فَاِنْ بَنٰى صَحَّ اَىْ اِنْ صَلّٰى بِهٰذِهِ التَّحْرِيْمَةِ نَافِلَةً مِنْ غَيْرِ اَنْ يُجَدِّدَ التَّحْرِيْمَةَ يَجُوْزُ سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ يُخْرِجُهٗ عَنْهَا مَوْقُوْفًا حَتّٰى يَصِحَّ الْاِقْتِدَاءُ بِهٖ وَيَبْطُلُ وُضُوْءُهٗ بِالْقَهْقَهَةِ وَيَصِيْرُ فَرْضُهٗ اَرْبَعًا بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ اِنْ سَجَدَ بَعْدَهٗ وَاِلَّا فَلَا اَىِ الْمُصَلِّىْ الَّذِىْ عَلَيْهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ اِنْ سَلَّمَ فِىْ اٰخِرِ صَلَاتِهٖ قَبْلَ اَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ يُخْرِجُهٗ عَنِ الصَّلٰوةِ خُرُوْجًا مَوْقُوْفًا فَيُنْظَرُ اَنَّهٗ اِنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ ذٰلِكَ السَّلَامِ يُحْكَمُ بِاَنَّهٗ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الصَّلٰوةِ وَاِنْ لَمْ يَسْجُدْ بَلْ رَفَضَ الصَّلٰوةَ يُحْكَمُ بِاَنَّهٗ قَدْ كَانَ خَرَجَ عَنْهَا حَتّٰى اَنْ سَلِمَ ثُمَّ اقْتَدٰى بِهٖ اِنْسَانٌ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ يَكُوْنُ الْاِقْتِدَاءُ صَحِيْحًا وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ بَلْ رَفَضَ الصَّلٰوةَ لَمْ يَصِحَّ الْاِقْتِدَاءُ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি এ [অতিরিক্ত] দুই রাকাতে এসে ইমামের ইকতিদা করবে, সে এ দুই রাকাত পড়বে। আর যদি সে তা ফাসেদ করে দেয় তবে তা [অবশ্যই] কাজা করবে। কেননা, সে উভয় রাকাত স্বেচ্ছায় শুরু করেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট ছয় রাকাত পড়বে। আর যদি ফাসেদ করে দেয়, তবে তা কাজা করবে না। যেরূপ ইমাম কাজা করে না। যে ব্যক্তি দুই রাকাত নফল পড়বে এবং [এতে] ভুল করবে, তবে সে সিজদায়ে সাহু করবে; বেনা (بِنَاءٌ) করবে না। কেননা, [দ্বিতীয় شَفْع -এর উপর বেনা করার দ্বারা তার উপর] সিজদায়ে সাহু নামাজের মধ্যখানে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং যদি সে বেনা করে ফেলে তবে বেনা সহীহ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি নতুন করে তাহরীমা বাঁধা ব্যতীত ঐ তাহরীমা দ্বারাই নফল পড়ে তবে তা জায়েজ। যার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব, যদি সে নামাজের শেষে সালাম ফিরায়, তবে এ সালাম তাকে মওকুফের সাথে নামাজ থেকে বের করবে। এমনকি তার ইকতিদা করাও সহীহ। সালামের পরে যদি সিজদা করে, তবে সেখানে তার অট্টহাসির দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাবে এবং ইকামত (اِقَامَة) -এর নিয়তের মাধ্যমে তার উপর চার রাকাত ফরজ হয়ে যাবে; অন্যথায় নয়। অর্থাৎ যে মুসল্লির উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব– যদি সে সিজদায়ে সাহু করার পূর্বে নামাজের শেষে সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তবে এ সালাম তাকে মওকূফের সাথে নামাজ থেকে বের করবে। এখন দেখা হবে যে, যদি এ সালামের পরে সিজদায়ে সাহু করে থাকে তবে হুকুম দেওয়া হবে যে, সে নামাজ থেকে বের হয়নি। আর যদি সিজদায়ে সাহু না করে থাকে; বরং নামাজ ভেঙ্গে দেয় তবে হুকুম দেওয়া হবে যে, সে নামাজ থেকে বের হয়ে গেছে। এখন যদি সালাম ফিরিয়ে ফেলে, অতঃপর এক ব্যক্তি তার ইকতিদা করে, অতঃপর সে সিজদায়ে সাহু করে, তবে এ ইকতিদা সহীহ হবে। আর যদি সিজদায়ে সাহু না করে থাকে; বরং নামাজ ভেঙ্গে দিয়ে থাকে, তবে তার ইকতিদা সহীহ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ اِقْتَدٰى بِهٖ فِيْهِمَا الخ : অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি এ সময় ইমামের ইকতিদা করে, যখন সে পঞ্চম রাকাতে দাঁড়ানো এবং সে এ দুই রাকাতে বৈঠক করে ফেলে, তবে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে, সে এ দুই রাকাতকে শুধু আদায় করবে। কেননা, ইমামের নামাজের আরকান পরিপূর্ণ হওয়ার দরুন সে নামাজ থেকে বের হয়ে গেছে। এখন মুক্তাদীর উপর শুধু এ শুফা'র ইকতিদা করা আবশ্যক। আর যদি মুক্তাদী তা ভেঙ্গে দেয়, তবে তার উপর কাজা আবশ্যক। কেননা, সে স্বেচ্ছায় তা শুরু করেছে। আর যদি ইমাম তা ভেঙ্গে দেয়, তবে তার উপর তা কাজা করা আবশ্যক নয়। কেননা, সে অনিচ্ছায়

তা শুরু করেছিল। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট। 'খুলাসাহ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতও এমনই। ইমাম শেষ বৈঠক বর্জন করার সুরতে এ দুই রাকাতে ইকতিদাকারী ছয় রাকাত পড়বে। যেরূপ 'মুহীত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يُصَلِّي سِتًّا الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট সে ছয় রাকাত আদায় করবে। কারণ, ইমাম মুহাম্মদ (র.) অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তিনি বলেন, যেরূপ ইমাম ছয় রাকাত পড়ে। আর যদি শেষ দুই রাকাত ভেঙ্গে ফেলে, তবে কাজা করা আবশ্যক হয় না। অনুরূপ মুক্তাদীও ছয় রাকাত পড়বে, ভেঙ্গে ফেললে কাজা করা আবশ্যক হবে না। তবে ফতোয়া ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের উপর। যেরূপ ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ مَنْ تَنَفَّلَ رَكْعَتَيْنِ وَسَهَا الخ : এ স্থানে নফলকে اِتِّفَاقِىْ -ভাবে উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় ফরজের হুকুমও এমনই। এর সারমর্ম হচ্ছে, যখন সে দুই রাকাত পড়েছে [নফল হোক কিংবা ফরজ] এবং এতে তার ভুল হয়ে গেছে। এখন সে সালামের পূর্বে কিংবা পরে সিজদায়ে সাহু করেছে, অতঃপর নামাজ শেষ করার পূর্বেই নিয়ত করেছে যে, নতুন তাহরীমা ব্যতীত উক্ত তাহরীমার মাধ্যমে আরো দুই রাকাত পড়বে, তবে তার জন্য তা জায়েজ নেই। কেননা, এ সুরতে সিজদায়ে সাহু নামাজের মাঝখানে হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ সিজদায়ে সাহু নামাজের শেষে হয়। এতদসত্ত্বেও যদি সে অন্য দুই রাকাতের নিয়ত করে, তবে যেহেতু পিছনের তাহরীমা বাকি রয়েছে, তাই তার নামাজ সহীহ হবে। তবে এ সুরতে নামাজের শেষে দ্বিতীয়বার সিজদায়ে সাহু করতে হবে। কারণ, ইতঃপূর্বের সিজদায়ে সাহু নামাজের মাঝখানে হয়ে যাওয়ার দরুন তা বাতিল হয়ে গেছে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। পক্ষান্তরে অপর এক অভিমত অনুযায়ী– যদি দ্বিতীয়বার সিজদায়ে সাহু নাও করে, তবু নামাজ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ الخ : এটি একটি ভিন্ন মাসআলা। অর্থাৎ যার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব সে যদি নামাজের শেষে সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তবে এ সালাম তাকে মওকূফের সাথে নামাজ থেকে বের করে দেবে। অর্থাৎ এ সালাম দ্বারা সে নামাজ থেকে বের হতে পারবে কি পারবে না, এটি তার সিজদায়ে সাহু করা ও না করার উপর নির্ভরশীল হবে। সুতরাং যদি সে সালামের পর সাথে সাথে সিজদা করে, তবে বলা হবে যে, সালাম দ্বারা সে নামাজ থেকে বের হতে পারেনি। আর যদি সিজদায়ে সাহু না করে তবে বলা হবে যে, তখনই সে নামাজ থেকে বের হয়ে গেছে, যখন সে সালাম ফিরিয়েছিল। এক অভিমত অনুযায়ী মওকূফ-এর মর্ম হচ্ছে, যদিও সালাম সর্বদিক থেকে তাকে নামাজ হতে বের করে দেয়; কিন্তু এ সম্ভাবনা বাকি থেকে যায় যে, সে সিজদায়ে সাহু করে ঐ হারামের (حُرْمَةٌ) দিকে ফিরে আসবে। এখন যদি সিজদায়ে সাহু করে তবে হারামের (حُرْمَةٌ) দিকে ফিরে আসল; অন্যথায় নয়। কেননা, তাহরীমা তো একটিই। যখন তা বাতিল হয়ে গেছে, তখন সিজদায়ে সাহু দ্বিতীয়বার করার দ্বারা তা ফিরে আসবে না। উল্লিখিত সমস্ত আলোচনাই শায়খাইন (র.)-এর নিকট।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট সিজদায়ে সাহু করুক কিংবা না করুক সর্বাবস্থায় সে নামাজেই থাকবে। কেননা, যার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট উক্ত সালামের দ্বারাও সে নামাজ থেকে বের হবে না। কেননা, সিজদায়ে সাহু ভুলের সংশোধনের জন্য ওয়াজিব হয়। তাই অবশ্যই তা তাহরীমার ভিতরে হবে। শায়খাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলের খণ্ডন এভাবে করা হয় যে, স্বয়ং সালাম হালালকারী। আর এখানে একটি বিশেষ প্রয়োজনের দরুন এর উপর আমল করা হয়নি। কিন্তু যখন সে ফিরে আসেনি তখন তার প্রয়োজনও চলে গেছে। যেরূপ হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ : অর্থাৎ অনুরূপ অবস্থা যদি কোনো মুসাফিরের হয়, তবে যদি সে সালামের পর সিজদায়ে সাহুর পূর্বে ইকামতের নিয়ত করে, তবে তার নামাজ কসরের স্থলে চার রাকাতই পড়তে হবে। আর যদি [সিজদায়ে সাহুর] সালামের পূর্বে ইকামতের নিয়ত করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার চার রাকাত পড়তে হবে। কারণ, সর্বসম্মতিক্রমে তা নামাজের মাঝে হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট তা এজন্য যে, যার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব, তাকে ঐ সালাম নামাজ থেকে বের করে না। আর শায়খাইন (র.)-এর নিকট তা এজন্য যে, সে যখন সিজদায়ে সাহু করল, তখন সে নামাজের حُرْمَةٌ -এর দিকে ফিরে আসল।

قَوْلُهُ اِنْ سَجَدَ بَعْدَهُ وَاِلَّا فَلَا : অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে, 'গায়াতুল বয়ান' ও 'দুরার' নামক গ্রন্থে। আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) লেখেন, আশ্চর্যের বিষয় যে, শারেহ (র.)-এর এ খবর নেই যে, মতনের ইবারত ভুল। এজন্যই জামেউর রুমূয নামক গ্রন্থে কাহাস্তানী (র.) লেখেন, বিকায়া গ্রন্থের এ স্থলে প্রসিদ্ধ ভুল রয়েছে। যদি মানুষের ভুল হয়ে যায় তবে এটি তার দোষ নয়। অতএব, যে ব্যক্তি বলে যে, বিকায়া গ্রন্থের এ ইবারত হিদায়ার ইবারত-এর পরিপন্থি, তাতেও কোনো দোষ নেই। কেননা, শারেহ (র.) তাঁর ভাই; যার নাম ওমর ইবনে সদরুস শরীয়াহ।

'দুররুল মুখতার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, শেষ দুই রাকাত প্রসঙ্গে 'গায়াতুল বয়ান' ও 'দুরার' নামক গ্রন্থের বিবরণ ভুল। বরং সঠিক মাসআলা হচ্ছে, অট্টহাসি দ্বারা তার অজু ভাঙ্গবে না। চাই সে সিজদায়ে সাহু করুক কিংবা না করুক। তার ফরজ নামাজে কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না। কারণ, অট্টহাসির কারণে তার সিজদায়ে সাহু রহিত হয়ে গেছে। অনুরূপ ইকামতের নিয়তের হুকুম। কেননা, এ নিয়ত নামাজের মধ্যখানে পাওয়া গেছে।

وَإِذَا سَلَّمَ ثُمَّ قَهْقَهَ ثُمَّ سَجَدَ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ وَضُوْئِهِ إِذِ الْقَهْقَهَةُ وُجِدَتْ فِيْ خِلَالِ الصَّلٰوةِ وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ بَلْ رَفَضَ لَمْ يَبْطُلْ وَضُوْءُهُ وَلَمْ سَلَّمَ ثُمَّ نَوَى الْاِقَامَةَ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ صَارَ هٰذَا الْفَرْضُ اَرْبَعًا لِاَنَّ نِيَّةَ الْاِقَامَةِ كَانَتْ فِيْ خِلَالِ الصَّلٰوةِ وَلَمْ لَوْ يَسْجُدْ بَلْ رَفَضَ لَمْ يَصِرْ فَرْضُهُ اَرْبَعًا لِاَنَّ نِيَّةَ الْاِقَامَةِ وُجِدَتْ بَعْدَ الصَّلٰوةِ ـ

অনুবাদ : যখন ইমাম সালাম ফিরাবে, অতঃপর অট্টহাসি দেবে, অতঃপর ভুলের জন্য সিজদায়ে সাহু করবে– তখন তার অজু ভেঙ্গে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। কেননা, নামাজের মধ্যখানে অট্টহাসি পাওয়া গেছে। আর যদি সিজদায়ে সাহু না করে; বরং নামাজ ভেঙ্গে ফেলে, তবে তার অজু বাতিল হবে না। আর যদি সালাম ফিরিয়ে ফেলে, অতঃপর ইকামতের নিয়ত করে, তারপর সিজদায়ে সাহু করে তবে এ ফরজ চার রাকাত হয়ে যাবে। কেননা, নামাজের মধ্যখানে ইকামতের নিয়ত পাওয়া গেছে। আর যদি সিজদায়ে সাহু না করে; বরং নামাজ ভেঙ্গে ফেলে, তবে তার ফরজ চার রাকাত হবে না। কেননা, নামাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ইকামতের নিয়ত পাওয়া গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا سَلَّمَ ثُمَّ قَهْقَهَ الخ : বাহরুর রায়িক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট যার উপর সিজদায়ে সাহু আবশ্যক, তার সালাম তাকে নামাজ থেকে বের করে না। কেননা, তা ক্ষতিপূরণের জন্য আবশ্যক হয়েছে। আর এটিও আবশ্যক যে, এটি নামাজের মাঝে হবে। আর শায়খাইন (র.)-এর নিকট– এ সালাম তাকে তাওয়াক্কুফের [স্থগিত] সাথে নামাজ থেকে বের করবে। এখন ইমামের ইকতিদা করা সহীহ হওয়া ও না হওয়া, অট্টহাসির কারণে অজু ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গা এবং এ অবস্থায় ইকামতের নিয়ত করার কারণে ফরজের মাঝে পরিবর্তন হওয়া ও না হওয়ার মতানৈক্য রয়েছে। স্পষ্ট কথা হচ্ছে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট مُطْلَقًا অট্টহাসির কারেণে অজু ভেঙ্গে যায়। পক্ষান্তরে শায়খাইন (র.)-এর নিকট যদি সিজদা করে, তবে অজু ভেঙ্গে যাবে। অন্যথায় নয়। যেরূপ 'গায়াতুল বয়ান' নামক গ্রন্থে স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অথচ এটি ভুল। কারণ, শায়খাইন (র.)-এর নিকট এ মাসআলায় সিজদা করা ও না করার কথা উল্লেখ নেই। কেননা, সকলের নিকট অট্টহাসির দ্বারা সিজদাই বাদ হয়ে গেছে। কারণ নামাজের حُرْمَةٌ [নিষেধাজ্ঞা] শেষ হয়ে গেছে। কেননা, অট্টহাসি হচ্ছে কথা; বরং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট এ অবস্থায় অজু ভাঙ্গা এবং শায়খাইন (র.)-এর নিকট না ভাঙ্গার হুকুম রয়েছে।

এর প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি সে ইকামতের নিয়ত করে তবে শায়খাইন (র.)-এর নিকট তা মওকুফ [স্থগিত] থাকবে। আর যদি সিজদায়ে সাহু করে, তবে নামাজ পরিপূর্ণ করা আবশ্যক; অন্যথায় নয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট مُطْلَقًا নামাজকে পরিপূর্ণ করা আবশ্যক। 'গায়াতুল বয়ান' নামক গ্রন্থে তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা ভুল। কেননা, এতে হুকুম তখনই হবে, যখন সে সিজদার পূর্বে ইকামতের নিয়ত করবে। শায়খাইন (র.)-এর নিকট তার ফরজ কোনোরূপ পরিবর্তিত হবে না এবং তার সিজদায়ে সাহু বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, যদি সে সিজদায়ে সাহু করে, তবে নামাজের حُرْمَةٌ তথা নিষেধাজ্ঞা দ্বিতীয়বার ফিরে আসবে। এখন তার ফরজ পরিবর্তিত হয়ে চার রাকাতে পরিণত হবে। আর যেহেতু তার সিজদায়ে সাহু নামাজের মধ্যখানে হয়েছে, তাই তা অনর্থক হয়ে গেছে এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট চার রাকাত পরিপূর্ণ করে শেষে আবার সিজদায়ে সাহু করবে।

سَهَا وَسَلَّمَ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ بَطَلَ نِيَّتُهُ حَتّٰى تَكُوْنَ تَحْرِيْمَتُهُ بَاقِيَةً كَمَا مَرَّ شَكَّ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَنَّهُ كَمْ صَلّٰى اِسْتَانَفَ وَاِنْ كَثُرَ اَخَذَ مَا غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهٖ لِاَنَّهُ اِذَا كَثُرَ كَانَ فِى الْاِسْتِيْنَافِ حَرَجٌ وَاِنْ لَمْ يَغْلِبْ اَخَذَ الْاَقَلَّ وَقَعَدَ فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ ظَنَّهُ اٰخِرَ صَلَاتِهٖ يَعْنِىْ اِنْ شَكَّ اَنَّهُ صَلّٰى ثَلٰثَ رَكَعَاتٍ اَوْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلٰى ظَنِّهٖ اَحَدُهُمَا اَخَذَ بِالْاَقَلِّ وَهُوَ الثَّلٰثُ لٰكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَةً اُخْرٰى وَاِنَّمَا يَقْعُدُ لِاَنَّهُ يُمْكِنُ اَنْ يَكُوْنَ اٰخِرُ صَلَاتِهٖ وَالْقَعْدَةُ الْاَخِيْرَةُ فَرْضٌ وَقَوْلُهُ ظَنَّهُ اٰخِرَ صَلَاتِهٖ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالظَّنِّ رُجْحَانَ اَحَدِ الطَّرَفَيْنِ بَلِ الْمُرَادُ الْوَهْمُ لِاَنَّ الْمَفْرُوْضَ اِنَّهُ لَمْ يَغْلِبْ اَحَدُ الطَّرَفَيْنِ عَلَى الْاٰخِرِ۔

অনুবাদ : [মুসল্লি] ভুল করেছে এবং নামাজ ভেঙ্গে দেওয়ার নিয়তে সালাম ফিরিয়ে ফেলেছে, তবে তার নিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। তবে তার তাহরীমা বাকি থেকে যাবে, যেরূপ পিছনে গত হয়ে গেছে। [যদি] প্রথমবার সন্দেহ হয় যে, নামাজ কত রাকাত পড়েছে, তবে নামাজ নতুন করে পড়বে। আর যদি অধিকবার সন্দেহ হতে থাকে, তবে প্রবল ধারণাকে গ্রহণ করবে। কেননা, যখন অধিক পরিমাণে সন্দেহ হচ্ছে, তখন নতুন করে নামাজ পড়ার মাঝে সমস্যা রয়েছে। আর যদি [কোনো দিকে] প্রবল ধারণা না হয়, তবে সর্বনিম্ন রাকাতের ধারণাকে গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেক এমন রাকাতের মাথায় বসবে, যাতে নামাজ শেষ হওয়ার ধারণা হয়েছে। অর্থাৎ যদি সন্দেহ হয় যে, সে তিন রাকাত পড়েছে, না চার রাকাত পড়েছে। যদি তার কোনো দিকে ধারণা প্রবল না হয়, তবে কম রাকাতের ধারণাকে গ্রহণ করবে, যা তিন [রাকাত]। কিন্তু তিন রাকাতের মাথায় বসবে, অতঃপর দাঁড়িয়ে আর এক রাকাত পড়বে। তিন রাকাতের মাথায় এজন্য বসবে যে, সম্ভাবনা আছে তা শেষ রাকাত হওয়ার। আর শেষ বৈঠক করা ফরজ।
গ্রন্থকারের কথা– ظَنَّهُ اٰخِرَ صَلَاتِهٖ -এর ظَنّ দ্বারা দুই দিকের [ধারণার] একদিকের ধারণা অপর দিকের ধারণার উপর প্রাধান্য পায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ سَهَا وَسَلَّمَ بِنِيَّةِ الخ : অর্থাৎ কোনো ওয়াজিব আদায় করতে ভুলে গেছে এখন তার উপর সিজদায়ে সাহু আবশ্যক হয়েছে এবং সে নামাজ সমাপ্ত করার নিয়তে সালাম ফেরাল তবে তার নামাজ সমাপ্ত করার নিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। আর তাহরীমা যেহেতু এখনও বাকি আছে তাই তার উপর আবশ্যক– ফিরে এসে সিজদায়ে সাহু করা। কারণ, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট সালাম নামাজ সমাপ্তকারী নয়। আর যখন সে নামাজ সমাপ্ত করার নিয়ত করেছে, তখন সে আরম্ভকৃত নামাজকে পরিবর্তন করার ইচ্ছা করেছে। তাই তার নিয়ত অনর্থক হয়ে গেছে। আর শায়খাইন (র.)-এর নিকট তার সালাম তাওয়াককুফের সাথে নামাজকে সমাপ্তকারী। এখন যেহেতু সে দৃঢ়তার সাথে নামাজ সমাপ্ত করার জন্য সালাম ফিরাল, তাই এটিই তার জন্য ইচ্ছা হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ شَكَّ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنَّهُ الخ : অর্থাৎ যার বালেগ হওয়ার পর এই প্রথম সন্দেহ হয় যে, সে কত রাকাত পড়েছে– তিন রাকাত পড়েছে, না চার রাকাত। তবে তার উপর আবশ্যক নামাজকে বাতিল করে দিয়ে নতুন করে আবার নামাজ পড়া। এর কারণ, এ ব্যাপারে হাদীস রয়েছে– إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلّٰى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ অর্থাৎ "যখন তোমাদের কারো নামাজে সন্দেহ সৃষ্টি হবে এবং সে জানতে পারবে না যে, সে তিন রাকাত পড়েছে, না চার রাকাত তবে তার জন্য উচিত, সন্দেহকে উপক্ষো করে ইয়াকীন (يَقِيْن) -এর উপর ভিত্তি করা।"

–[মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ]

অর্থাৎ কোনো দিকেই তার ধারণ প্রবল হয় না, তবে সে কম রাকাতের ধারণা তথা ইয়াকীনকে সে গ্রহণ করবে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে– إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَرِّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ

অর্থাৎ "যখন তোমাদের কেউ [নামাজে] সন্দেহে পতিত হবে, তখন সে সঠিক দিকের চিন্তা করবে এবং এর ভিত্তিতে নামাজ সমাপ্ত করবে।" –[বুখারী ও মুসলিম]

قَوْلُهُ ظَنُّهُ اٰخِرَ صَلَاتِهٖ : এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হচ্ছে, বিকায়া গ্রন্থকারের কথা– قَعَدَ فِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ ظَنُّهُ اٰخِرَ صَلَاتِهٖ সহীহ নয়; বরং এ কথা ঐ সুরতে যখন ধারণা কোনো দিকে প্রবল না হয়। তা সহীহ না হওয়ার কারণ হচ্ছে, ظَنّ [ধারণা]-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে-কোনো একদিককে প্রাধান্য দেওয়া, আর এ সুরতে তা নেই। কারণ, এ সুরত হচ্ছে এমন, যাতে কোনো প্রবল ধারণা হয় না। অন্যথায় সে ظَنّ -এর মোতাবেক চলত; সবচেয়ে কম রাকাতের ধারণার মোতাবেক নয়। কেননা, ظَنّ বলা হয় প্রাধান্যপ্রাপ্ত দিককে এবং এর বিপরীতে وَهْم আসে, যা অপ্রাধান্য দিক। অতএব, উভয়ের মাঝে সমপর্যায়ের সন্দেহ রয়েছে। **উত্তর :** উত্তর হচ্ছে, ظَنّ শব্দটি কখনো وَهْم শব্দের অর্থেও ব্যবহার হয়। এখানে এটিই উদ্দেশ্য; একদিককে প্রাধান্য দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। আর وَهْم -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়– অপ্রাধান্য দিক। আর এ সুরত ظَنّ পাওয়া যওয়ার সুরতেই হয়। যেখানেই ظَنّ নেই সেখানেই وَهْم -ও হয় না। কেউ বলেন, শুধু خَيَال বা ধারণাকে وَهْم বলা হয়।

بَابُ صَلٰوةِ الْمَرِيْضِ

اِنْ تَعَذَّرَ الْقِيَامُ لِمَرَضٍ حَدَثَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ اَوْ فِيْهَا صَلّٰى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَاِنْ تَعَذَّرَا اَيِ الرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ اَوْمَأَ بِرَأْسِهِ قَاعِدًا وَجَعَلَ سُجُوْدَهُ اَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِهِ وَلَا يَرْفَعُ اِلَيْهِ شَيْئٌ لِلسُّجُوْدِ وَاِنْ تَعَذَّرَ الْقُعُوْدُ اَوْمَأَ مُسْتَلْقِيًا وَ رِجْلَاهُ اِلَى الْقِبْلَةِ اَوْ مُضْطَجِعًا وَ وَجْهُهُ اِلَيْهَا وَالْاَوَّلُ اَوْلٰى وَاِنْ تَعَذَّرَ الْاِيْمَاءُ اُخِّرَتْ وَلَا يُوْمِيْ بِعَيْنَيْهِ وَحَاجِبَيْهِ وَقَلْبِهِ وَاِنْ تَعَذَّرَ الرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ لَا الْقِيَامُ قَعَدَ وَاَوْمَأَ وَهُوَ اَفْضَلُ مِنَ الْاِيْمَاءِ قَائِمًا لِاَنَّ الْقُعُوْدَ اَقْرَبُ مِنَ السُّجُوْدِ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ لِاَنَّهُ غَايَةُ التَّعْظِيْمِ وَمُوْمِئٌ صَحَّ فِى الصَّلٰوةِ اِسْتَانَفَ اَىْ اِبْتَدَأَ وَقَاعِدٌ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ صَحَّ فِيْهَا بَنٰى قَائِمًا صَلّٰى قَاعِدًا فِىْ فُلْكٍ جَارٍ بِلَا عُذْرٍ صَحَّ وَفِى الْمَرْبُوْطَةِ لَا اِلَّا بِعُذْرٍ ـ

পরিচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ

অনুবাদ : নামাজের পূর্বে কিংবা নামাজের মধ্যে যে ব্যাধি সৃষ্টি হয়েছে, এর কারণে যদি [নামাজে] দাঁড়ানো কষ্ট হয়, তবে বসে বসে নামাজ পড়বে এবং রুকু-সিজদা করবে। আর যদি রুকু-সিজদা করতেও কষ্ট হয়, তবে বসে মাথা দ্বারা ইশারা করে [রুকু-সিজদা করবে]। রুকুর চেয়ে সিজদাকে অধিক নিচু করবে। সিজদার জন্য তার কপাল বরাবর কোনো কিছু উঠাবে না। আর যদি বসে [নামাজ পড়তে] কষ্ট হয়, তবে চিত হয়ে শুয়ে ইশারা করে নামাজ পড়বে এবং উভয় পা কিবলার দিকে রাখবে কিংবা কাত হয়ে শুয়ে মুখমণ্ডল কিবলা দিকে রাখবে। তবে প্রথম সুরত উত্তম। আর যদি ইশারা করতেও কষ্ট হয়, তবে নামাজকে বিলম্বিত করবে। উভয় চোখ, ভ্রু ও অন্তর দ্বারা ইশারা করে [নামাজ পড়বে] না। যদি রুকু সিজদা করতে কষ্ট হয়, দাঁড়ানো কষ্ট না হয়, তবে বসে ইশারার মাধ্যমে নামাজ পড়বে। দাঁড়িয়ে ইশারা করার চেয়ে বসে ইশারা করা উত্তম। কেননা, قُعُوْد [বসা] সিজদার অধিক নিকটবর্তী। আর সিজদাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। কারণ, এতে অত্যন্ত সম্মান রয়েছে। ইশারা করে নামাজ আদায়কারী যদি নামাজে সুস্থ হয়ে যায়, তবে সে নামাজকে নতুন করে পড়বে। বসে রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায়কারী যদি নামাজে সুস্থ হয়ে যায়, তবে [বাকি নামাজ] দাঁড়িয়ে পড়বে। যদি চলন্ত লঞ্চে বসে নামাজ আদায় করে তবে তা সহীহ হবে। তবে নোঙ্গর করা [স্থির] লঞ্চে বসে নামাজ পড়া বৈধ নয়; কিন্তু ওজরের কারণে বৈধ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : صَلَاة -এর اِضَافَة - مَرِيْض -এর اِضَافَةُ الْفِعْلِ اِلَى الْفَاعِلِ -এর অন্তর্ভুক্ত। سَهْو ও مَرِيْض উভয়টি আসমানি ব্যাধি। আর سَهْو যেহেতু সুস্থ ও অসুস্থ ব্যক্তি সকলকে শামিল রাখে, তাই বিকায়া গ্রন্থকার سُجُوْد سَهْو -এর পর مَرِيْض -এর নামাজের আলোচনা করেছেন।

قَوْلُهُ إِنْ تَعَذَّرَ الْقِيَامَ لِمَرَضٍ الخ :

মাসআলা : অসুস্থ ব্যক্তির যদি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে কষ্ট হয় অর্থাৎ দাঁড়ালে মাটিতে পড়ে যাবে কিংবা বিলম্বে সুস্থ হবে কিংবা অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে কিংবা দাঁড়ালে ব্যথা পায়, তবে এ ধরনের ব্যক্তির জন্য قِيَامٌ -কে তরক করা জায়েজ আছে এবং সে বসে রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করবে। আর যদি বসে রুকু-সিজদা করতেও অক্ষম হয়, তবে সে বসে মাথা দ্বারা ইশারা করে নামাজ আদায় করবে। তবে সিজদা করার জন্য কোনো কিছু উপরের দিকে উঠাবে না। আর যদি বসেও নামাজ পড়তে কষ্ট হয়, তবে সে চিত হয়ে শুয়ে কিবলার দিকে পা দিয়ে ইশারা করে নামাজ পড়বে কিংবা কাত হয়ে কিবলার দিকে মুখ করে ইশারা করে নামাজ আদায় করবে। দলিল হলো, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন–

كَانَتْ بِىْ بَوَاسِرُ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ .

অর্থাৎ "আমার অর্শ্ব রোগ ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ অবস্থায় নামাজ পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। যদি তা না পার, তবে বসে পড়বে। আর যদি তাও না পার, তবে পার্শ্বে শুয়ে আদায় করবে।" ইমাম নাসায়ী (র.) এ শব্দটি বৃদ্ধি করেন– فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "যে, যদি তাও না পার তবে চিত হয়ে শুয়ে আদায় করবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না।" –[নাসায়ী শরীফ]

মাসআলা : যদি অসুস্থ ব্যক্তি সামান্য দাঁড়াতে সক্ষম হয়, যেমন, এক আয়াত কিংবা তাকবীর বলা পরিমাণ, পুরো দাঁড়াতে পারে না, তবে তাকে এ পরিমাণই দাঁড়াতে হবে। যখন অপারগ হয়ে যাবে, তখন বসে যাবে। কেননা, ইবাদত সামর্থ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে। এমনিভাবে যদি সে কোনো জিনিসের উপর ঠেস দিয়ে বা কোনো লাঠির উপর ভর করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়, তবে তার জন্য দাঁড়ানো বর্জন করা জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا يُرْفَعُ إِلَيْهِ شَيْءٌ : এটি مَجْهُوْل -এর শব্দ। অর্থাৎ কোনো জিনিসকে সিজদা সহজভাবে দেওয়ার জন্য চেহারার দিকে উঠাবে না। এমনটি করা মাকরূহে তাহরীমা। কেননা, রাসূল ﷺ এর থেকে নিষেধ করেছেন। তবুও যদি কেউ এমনটি করে এবং সিজদাকে রুকুর চেয়ে নিচু করে, তবে মাকরূহের সাথে তার নামাজ হয়ে যাবে। 'যখীরা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি চেহারার দিকে কিছু না উঠায়; বরং জমিনের উপর কিছু রেখে দেয়। যেমন– বালিশ ইত্যাদি, আর এর উপর সিজদা করে তবে তা জায়েজ।

শুয়ে নামাজ পড়ার পদ্ধতি : শুয়ে নামাজ পড়ার পদ্ধতি দুটি–

১. চিত হয়ে শুয়ে কিবলার দিকে পা রাখবে এবং মাথার নীচে বালিশ রাখবে, যেন মাথা উঁচু হয়ে থাকে এবং চেহারাটা কিবলার দিকে হয়। অনুরূপ পায়ের নীচেও বালিশ দেবে, যেন পা সরাসরি কিবলা দিকে না হয়, যা বেআদবি মনে হয়। অতঃপর স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী মাথা দ্বারা ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করবে।

২. কাত হয়ে শুয়ে ইশারা করা। এরও দুটি সুরত রয়েছে। ক. ডান কাত হয়ে শোয়া। খ. বাম কাত হয়ে শোয়া। প্রথম সূরতে যেহেতু অসুস্থ ব্যক্তির চেহারা সরাসরি কিবলার দিকে হয়, তাই তা উত্তম। সর্বোপরি যে সুরতেই হোক না কেন চেহারাকে কিবলার দিকে রাখতে হবে।

মাসআলা : শুয়ে ইশারা করে নামাজ পড়তেও যদি অক্ষম হয়, তবে নামাজকে বিলম্বিত করবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ সে নামাজ আদায়ে কোনো একটি সুরত এর উপর সক্ষম হয়। একদিন একরাত তথা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি সক্ষম হয়, তবে এতক্ষণে যত ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়েছে, তা কাজা আদায় করবে। আর যদি চব্বিশ ঘণ্টার চেয়ে অধিক সময় এহেন অসুস্থ থাকে, তবে এতক্ষণে তার যত ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়েছে, তা কাজা আদায় করতে হবে না। তবে চক্ষু, ভ্রু ও অন্তর দ্বারা ইশারা করে নামাজ আদায় করতে পারবে না।

মাসআলা : যদি এমন অসুস্থ হয় যে, দাঁড়াতে পারে, কিন্তু রুকু সিজদা করতে পারে না। যেমন– কোমরে ব্যথা ইত্যাদি। তবে যদিও সে দাঁড়াতে পারে; কিন্তু সে বসে ইশারা করে নামাজ পড়বে। দাঁড়িয়ে ইশারা করে নামাজ পড়বে না। কেননা, দাঁড়ানোর তুলনায় বসে ইশারায় নামাজ আদায় করলে মুখমণ্ডল ভূমির অধিক নিকটবর্তী হয়। এর কারণ, সিজদাই হচ্ছে সবচেয়ে অধিক সম্মানের স্থল। আর সিজদা বলা হয় মুখমণ্ডল ভূমিতে রাখাকে। আর যেহেতু সে ইশারা করে নামাজ পড়বে, তাই দাঁড়ানোর চেয়ে বসাই হচ্ছে ভূমির অধিক নিকটবর্তী। এটাই আমাদের বক্তব্য। পক্ষান্তরে ইমামত্রয় ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে, এমন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ইশারা করে নামাজ আদায় করবে। কারণ, قِيَامْ [দাঁড়ানো] একটি রুকন। তার উপর সামর্থ্য থাকাবস্থায় তা বর্জন করা যাবে না। আমাদের দলিল হলো, قِيَامْ [দাঁড়ানো] মূলত রুকু ও সিজদার মাধ্যম বা অসিলা। আর সিজদা হচ্ছে মূল। শরিয়তে কিয়াম ব্যতীতও শুধু সিজদা ইবাদত হয়। যেমন– সিজদায়ে তেলাওয়াত। কিন্তু শুধু قِيَامْ [দাঁড়ানো] ইবাদত হওয়ার অনুমোদন নেই। আর যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে/ কিছুকে সিজদা করে কাফের হয়ে যাবে, কিন্তু غَيْرُ اللّٰهِ -এর সামনে দাঁড়ালে কাফের হয় না। এখন যেহেতু আসল [সিজদা] থেকে অক্ষম হয়ে গেছে তাই তার থেকে অসিলা বা মাধ্যমও রহিত হয়ে যাবে। যেরূপ নামাজের জন্য অজু এবং জুমার জন্য সা'য়ী হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَمُوْمِيٌ صَحَّ فِى الصَّلٰوةِ إِسْتَانَفَ : অর্থাৎ যদি ওজরের কারণে ইশারার মাধ্যমে নামাজ আদায় করে, নামাজের মধ্যখানে সুস্থ হয়ে যায় এবং রুকু-সিজদা করার উপর সামর্থ্য হয়ে যায়, তবে তার নামাজ আদায় করতে হবে। পূর্বের নামাজের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে যাবে না। কারণ, এভাবে শক্তিশালী ব্যক্তিকে দুর্বলের উপর নির্ভর করা আবশ্যক হয়। এটি আমাদের ইমামত্রয়ের অভিমত। এতে ইমাম যুফার (র.) দ্বিমত পোষণ করেন।

যদি কেউ বসে রুকু-সিজদার সাথে নামাজ পড়া শুরু করে, আর নামাজের মধ্যখানে দাঁড়ানোর উপর সক্ষম হয়ে যায়, তবে আমাদের মতে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে বাকি নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করা জায়েজ। নতুন করে নামাজ শুরু করার প্রয়োজন নেই। এতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। মতানৈক্যের ভিত্তি হচ্ছে– শায়খাইন (র.)-এর নিকট বসে নামাজ আদায়কারীর পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীর ইকতিদা করা সহীহ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট তা জায়েজ নেই। শায়খাইন (র.)-এর অভিমত-ই বিশুদ্ধ। কেননা, সুনানের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁর মৃত্যুরোগের সময়ে বসে নামাজ পড়াতেন এবং সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন।

قَوْلُهُ صَلّٰى قَاعِدًا فِىْ فُلْكٍ جَارٍ الخ : অর্থাৎ যদি চলন্ত নৌকায় কেউ ওজর ব্যতীতই বসে নামাজ পড়ে তবে তা জায়েজ; কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। তীরে বাঁধা নৌকায় বসে নামাজ পড়া জায়েজ নেই। কিন্তু যদি দাঁড়িয়ে নামাজ কষ্টকর হয়, তবে বসে পড়া জায়েজ আছে। সমুদ্রের মাঝে নোঙ্গর করা নৌকায় নামাজ পড়ার হুকুমও চলন্ত নৌকার অনুরূপ, যদি তা বাতাসে দোলতে থাকে। অন্যথায় তীরে নোঙ্গর করা নৌকার হুকুমে হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে চলন্ত নৌকায়ও ওজর ব্যতীত বসে নামাজ পড়া জায়েজ নেই। কিয়াসও অনুরূপই বলে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের কারণ হচ্ছে– সাধারণত চলন্ত নৌকায় মাথা চক্কর মারে, তাই হুকুমও এই ভিত্তিতেই হয়ে থাকে।

جَنَّ اَوْ اُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَضٰى مَا فَاتَ وَاِنْ زَادَ سَاعَةً لَا هٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَاَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) فَالْمُعْتَبَرُ الْاَوْقَاتُ اَيْ اِنِ اسْتَوْعَبَ وَقْتَ سِتِّ صَلَوَاتٍ تَسْقُطُ وَقَوْلُهٗ وَاِنْ زَادَ سَاعَةً اَيْ زَمَانًا لَا مَا تَعَارَفَهُ الْمُنَجِّمُوْنَ وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ هٰكَذَا وَاِنْ تَعَذَّرَا مَعَ الْقِيَامِ اَوْمَاَ بِرَأْسِهٖ قَاعِدًا اِنْ قَدَرَ وَلَا مَعَهٗ فَهُوَ اَحَبُّ وَجَعَلَ سُجُوْدَهٗ اَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِهٖ وَلَا يُرْفَعُ اِلَيْهِ شَيْءٌ لِيَسْجُدَ عَلَيْهِ وَاِلَّا فَعَلٰى جَنْبِهٖ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْقِبْلَةِ اَوْ ظَهْرِهٖ كَذَا وَ ذَا اَوْلٰى وَالْاِيْمَاءُ بِالرَّأْسِ فَاِنْ تَعَذَّرَ اُخِّرَتْ وَمُوْمِئٌ صَحَّ اِلٰى اٰخِرِهٖ اَيْ اِنْ تَعَذَّرَ الرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ مَعَ الْقِيَامِ اَوْمَاَ قَاعِدًا اِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُعُوْدِ وَلَا مَعَهٗ اَيْ لَا مَعَ الْقِيَامِ اَيْ اِنْ تَعَذَّرَ الرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ لَا الْقِيَامَ فَالْاِيْمَاءُ قَاعِدًا اَحَبُّ وَقَوْلُهٗ وَاِلَّا فَعَلٰى جَنْبِهٖ اَيْ وَاِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقُعُوْدِ اَوْمَاَ عَلٰى جَنْبِهٖ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْقِبْلَةِ اَوْ عَلٰى ظَهْرِهٖ مُتَوَجِّهًا بِاَنْ يَكُوْنَ رِجْلَاهُ اِلَى الْقِبْلَةِ وَقَوْلُهٗ وَالْاِيْمَاءُ مُبْتَدَأٌ وَبِالرَّأْسِ خَبَرُهٗ ـ

অনুবাদ : যদি একদিন একরাত পাগল থাকে কিংবা বেহুঁশ থাকে, তবে যে নামাজ ছুটে গেছে, তা কাজা করবে। আর যদি [একদিন একরাত]-এর চেয়ে এক মুহূর্ত সময়ও বেশি এমন থাকে, তবে ছুটে যাওয়া নামাজগুলোর কাজা করতে হবে না। এটি শায়খাইন (র.)-এর নিকট। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট ওয়াক্ত ধর্তব্য। অর্থাৎ যদি পাগলামি ও বেহুঁশ অবস্থা ছয় ওয়াক্ত নামাজকে পরিবেষ্টন করে নেয়, তবে ছুটে যাওয়া নামাজগুলোর কাজা তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। গ্রন্থকারের কথা وَاِنْ زَادَ سَاعَةً দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সামান্য সময়– তারকা বিশেষজ্ঞদের পরিভাষায় পরিচিত سَاعَة উদ্দেশ্য নয়।এ স্থানে মুখতাসারে কুদূরীর ইবারত নিম্নরূপ–

وَاِنْ تَعَذَّرَا مَعَ الْقِيَامِ اَوْمَاَ بِرَأْسِهٖ قَاعِدًا اِنْ قَدَرَ وَلَا مَعَهٗ فَهُوَ اَحَبُّ وَجَعَلَ سُجُوْدَهٗ اَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِهٖ وَلَا يُرْفَعُ اِلَيْهِ شَيْءٌ لِيَسْجُدَ عَلَيْهِ وَاِلَّا فَعَلٰى جَنْبِهٖ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْقِبْلَةِ اَوْ ظَهْرِهٖ كَذَا وَ ذَا اَوْلٰى وَالْاِيْمَاءُ بِالرَّأْسِ فَاِنْ تَعَذَّرَ اُخِّرَتْ وَمُوْمِئٌ صَحَّ اِلٰى اٰخِرِهٖ ـ

অর্থাৎ দাঁড়ানোর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি রুকু সিজদা করতে অক্ষম হয়, তবে যদি বসে নামাজ পড়ার সামর্থ্য থাকে তাহলে সে বসে মাথা দ্বারা ইশারা করে নামাজ আদায় করবে। দাঁড়িয়ে ইশারা করে নামাজ পড়বে না। এটিই উত্তম। [মাথা দ্বারা ইশারা করার সময়] সিজদায় রুকু থেকে অধিক ঝুঁকবে। কোনো জিনিসকে সিজদা করার জন্য উপরের দিকে উঠাবে না। আর যদি বসতেও সক্ষম না হয়, তবে পার্শ্বদেশের উপর শুয়ে কিবলার দিকে হয়ে নামাজ আদায় করবে। কিংবা পিঠের উপর [চিত হয়ে] শুয়ে মুখমণ্ডল কিবলার দিকে করে নামাজ আদায় করবে এবং এটিই উত্তম। মাথা দ্বারাই ইশারা করবে। যদি মাথা দ্বারা ইশারা করতেও সক্ষম না হয়, তবে নামাজকে বিলম্বিত করবে। ইশারা

করে নামাজ আদায়কারী যদি নামাজে সুস্থ হয়ে যায়। ...... [মতনে উল্লিখিত ইবারতের শেষ পর্যন্ত।] অর্থাৎ যদি দাঁড়াতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও রুকু-সিজদা করতে অক্ষম হয়, তবে বসে ইশারা করে নামাজ আদায় করবে, যদি বসে নামাজ আদায় করতে সক্ষম হয়; দাঁড়িয়ে ইশারা করে আদায় করবে না। তথা যদি রুকু-সিজদা করতে অক্ষম হয় কিন্তু দাঁড়াতে অক্ষম নয়, তবে বসে ইশারা করে নামাজ আদায় করাই হচ্ছে অধিক উত্তম। [কেননা, বসা সিজদার অধিক নিকটবর্তী। আর সিজদাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। কারণ সিজদা হলো চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন।] আর যদি বসতেও অক্ষম হয়, তবে কাত হয়ে শুয়ে কিবলার দিকে হয়ে ইশারা করে নামাজ আদায় করবে। কিংবা পা দুটি কিবলার দিকে রেখে চিত হয়ে শুয়ে [ইশারা করে] নামাজ আদায় করবে। ইমাম কুদূরী (র.)-এর কথা اَلْإِيْمَاءُ হচ্ছে মুবতাদা এবং بِالرَّأْسِ হচ্ছে খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمُنَجِّمُوْنَ : সৌরজগতের ভ্রমণ ও নক্ষত্র বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে مُنَجِّمٌ বলা হয়। তাদের পরিভাষায় সূর্য পনেরোটি স্তর ভেদ করার নাম سَاعَةٌ বলা হয়। শারেহ (র.) বলেন, গ্রন্থকারের কথা وَاِنْ زَادَ سَاعَةً দ্বারা ঐ নক্ষত্র বিশেষজ্ঞদের পরিভাষার سَاعَةٌ উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা সামান্য সময় উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَالْإِيْمَاءُ بِالرَّأْسِ : অর্থাৎ যেখানেই ইশারার দ্বারা নামাজ আদায়ের হুকুম রয়েছে, সেখানেই মাথা দ্বারাই ইশারা করবে। অন্য কোনো অঙ্গ যেমন– চক্ষু, ভ্রূ ও অন্তর ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করা বৈধ নয়। আর যদি কেউ এমনটি করে তবে তার নামাজ হবে না।

بَابُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

هُوَ سَجْدَةٌ بَيْنَ تَكْبِيْرَتَيْنِ بِشُرُوْطِ الصَّلٰوةِ بِلَا رَفْعِ يَدٍ وَتَشَهُّدٍ وَسَلَامٍ وَفِيْهَا سُبْحَةُ السُّجُوْدِ وَتَجِبُ عَلٰى مَنْ تَلَا اٰيَةً مِنْ اَرْبَعَ عَشَرَةَ الَّتِىْ فِىْ اٰخِرِ الْاَعْرَافِ وَالرَّعْدِ وَالنَّحْلِ وَبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَمَرْيَمَ وَاُوْلَى الْحَجِّ اِحْتِرَازٌ عَنِ الثَّانِيَةِ وَهِىَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا فَاِنَّهٗ لَا سَجْدَةَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فَفِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ قُرِنَ الرُّكُوْعُ بِالسُّجُوْدِ يُرَادُ بِهِ السَّجْدَةُ الصَّلَاتِيَّةُ وَالْفُرْقَانِ وَالنَّمْلِ وَالٓمّٓ السَّجْدَةِ وَصٓ وَحٰمٓ السَّجْدَةِ وَالنَّجْمِ وَانْشَقَّتْ وَاقْرَأْ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) فِىْ اَرْبَعَ عَشَرَةَ اَيْضًا فَفِىْ صٓ عِنْدَهٗ لَيْسَ سَجْدَةٌ وَفِى الْحَجِّ عِنْدَهٗ سَجْدَتَانِ وَاخْتُلِفَ فِىْ مَوْضِعِ السَّجْدَةِ فِىْ حٰمٓ السَّجْدَةِ فَعِنْدَ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ هُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ وَبِهٖ اَخَذَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ فَاَخَذْنَا بِهٰذَا اِحْتِيَاطًا فَاِنَّ تَأْخِيْرَ السَّجْدَةِ جَائِزٌ لَا تَقْدِيْمُهٗ ـ

পরিচ্ছেদ : সিজদায়ে তেলাওয়াতের বিবরণ

অনুবাদ : সিজদায়ে তেলাওয়াত হচ্ছে– নামাজের শর্তসহ দুই তাকবীরের মাঝে এক সিজদা। তবে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে হবে না, তাশাহহুদ ও সালাম ফিরাতে হবে না। সিজদায়ে তেলাওয়াতে সিজদার তাসবীহ আছে। যে ব্যক্তি [নির্ধারিত] চৌদ্দ আয়াতের কোনো একটি তেলাওয়াত করবে তার জন্য সিজদা করা আবশ্যক। চৌদ্দ আয়াত হচ্ছে সূরা আ'রাফের শেষে, সূরা রা'দ, সূরা নাহল, সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা মারইয়ামে এবং সূরা হজের প্রথম সিজদা গ্রন্থকার প্রথম সিজদা বলে দ্বিতীয় সিজদা অর্থাৎ وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا-এর সিজদা থেকে বিরত থেকেছেন। কারণ, আমাদের মতে এ স্থানে সিজদা নেই। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। অতএব, কুরআনের যেখানেই রুকুর সাথে সিজদাকে মিলানো হয়েছে, সেখানেই নামাজের সিজদা উদ্দেশ্য। সূরা ফুরকান, সূরা নামল, সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদাহ, সূরা সা-দ, হা-মীম সাজদাহ, সূরা নাজম, সূরা ইনশিক্বাক্ব এবং সূরা আলাকে; ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতেও সিজদা চৌদ্দটি। তবে তাঁর নিকট সূরা সা-দে কোনো সিজদা নেই। কিন্তু তাঁর মতে সূরা হজে দুটি সিজদা। সূরা হা-মীম সাজদার মাঝে সিজদার স্থল নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত আলী (রা.)-এর নিকট তা হচ্ছে আল্লাহর বাণী– اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ এটি ইমাম শাফেয়ী (র.) গ্রহণ করেছেন। আর হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর নিকট তা হচ্ছে আল্লাহর বাণী– وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ – আমরা সতর্কতা স্বরূপ তা গ্রহণ করেছি তেলাওয়াতে সিজদাকে বিলম্ব করা জায়েজ; কিন্তু অগ্রিম সিজদা করা বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : সিজদায় তেলাওয়াত সিজদায়ে সাহুর সাথে সাথেই উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল। কেননা, উভয়টিই হলো সিজদা সংক্রান্ত বিষয়। কিন্তু যেহেতু সিজদায়ে সাহুর সাথে صَلَاةُ الْمَرِيْضِ-এর সম্পর্ক এর চেয়েও অধিক অর্থাৎ সিজদায়ে সাহু عَوَارِض سَمَاوِيَّة-এর কারণে হয়, অনুরূপ صَلَاةُ الْمَرِيْضِ ও- عَوَارِض سَمَاوِيَّة-এর কারণে হয়। এ কারণেই সিজদায়ে সাহুর আলোচনার পর صَلَاةُ الْمَرِيْضِ-এর আলোচনা করেছেন। তাই স্বাভাবিক কারণেই তেলাওয়াতে সিজদার আলোচনা পরে এসে গেছে।

سُجُوْدُ التِّلَاوَةِ-এর اِضَافَة : এতে حُكْم-কে سَبَبْ-এর দিকে اِضَافَة করা হয়েছে। কারণ, সিজদার سَبَبْ হচ্ছে- তেলাওয়াত। **প্রশ্ন :** কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, তেলাওয়াত ছাড়া سَمَاع-ও তো সিজদার سَبَبْ তাহলে তো এভাবে বলা উচিত ছিল যে, بَابُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ وَالسَّمَاعِ **উত্তর :** এর জবাব হলো তেলাওয়াত যেমনিভাবে সিজদার سَبَبْ তেমনিভাবে سَمَاعْ-ও সিজদার سَبَبْ সুতরাং তেলাওয়াতের আলোচনা দ্বারা سَمَاعْ-এর আলোচনাও مِنْ وَجْهٍ হয়ে গেছে। এ কারণেই শুধু তেলাওয়াতের আলোচনার উপর নির্ভর করা হয়েছে।

চৌদ্দটি সিজদার আয়াত : সিজদার আয়াত চৌদ্দটি নিম্নরূপ-

১. সূরা আ'রাফের শেষে- اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ

২. সূরা রা'দে- وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ

৩. সূরা নাহলে- وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ . يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ .

৪. সূরা বনী ইসরাঈলে- وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا

৫. সূরা মারইয়ামে- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا

৬. সূরা হজে প্রথমটি وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ

৭. সূরা ফুরকানে- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوْرًا

৮. সূরা নামলে- اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ - اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ .

৯. সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদায়-

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ .

১০. সূরা সা-দে- فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ

১১. সূরা হা-মীম সাজদায়- وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ . فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْاَمُوْنَ .

১২. সূরা নাজমে- فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا

১৩. সূরা ইনশিক্বাক্বে- وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ

১৪. সূরা আলাকে- وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

সিজদার উপরিউক্ত চৌদ্দ স্থানের ক্ষেত্রে দলিল হলো, ওসমানী মুসহাফ। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ও ওসমানী মুসহাফের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন। কারণ, এ মুসহাফ নির্ভরযোগ্য।

قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا سَجْدَةَ عِنْدَنَا خِلَافًا الخ : এখানে মূলত ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহনাফের মাঝে মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ– আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) উভয়ের মতেই সিজদা চৌদ্দটি। তবে আমাদের মতে সূরা হজে প্রথমটি সিজদায়ে তেলাওয়াত, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নামাজের সিজদা। সূরা সা-দের মধ্যে আমাদের মতে একটি সিজদা আছে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সূরা সা-দে কোনো সিজদা নেই। তবে সূরা হজে দুটিই হচ্ছে তেলাওয়াতের সিজদা। সূরা হজে দুই সিজদার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, হযরত উকবা ইবনে আমির (র.) সূত্রে বর্ণিত–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُضِّلَتِ الْحَجُّ بِسَجْدَتَيْنِ مَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا لَمْ يَقْرَأْهُمَا ـ

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ বলেছেন, সূরা হজকে দুই সিজদা দ্বারা ফজিলত দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ দুই সিজদা আদায় করল না, সে যেন তা পড়লই না।" –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

আহনাফের দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত– قَالَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فِى الْحَجِّ هِىَ الْأُوْلٰى وَالثَّانِيَةُ سَجْدَةُ الصَّلَاةِ "তাঁরা বলেন, সূরা হজে প্রথমটি হলো– সিজদায়ে তেলাওয়াত আর দ্বিতীয়টি হলো– নামাজের সিজদা।" এর সমর্থন একথা দ্বারাও বুঝে আসে যে, দ্বিতীয় সিজদাকে রুকুর সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে– وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا "তোমরা রুকু ও সিজদা কর।" আর কায়দা আছে যে, যে সিজদা রুকুর সাথে মিলে আসে এর দ্বারা নামাজের সিজদা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন সূরা আল ইমরানে বলা হয়েছে– يَا مَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ এখানে সিজদা রুকুর সাথে মিলে আসার কারণে এর দ্বারা নামাজের সিজদা উদ্দেশ্য।

হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো রাসূল ﷺ -এর বাণী– فُضِّلَتِ الْحَجُّ بِسَجْدَتَيْنِ ; এর ব্যাখ্যা হচ্ছে– প্রথম সিজদা তেলাওয়াতের সিজদা আর দ্বিতীয় সিজদা হচ্ছে নামাজের সিজদা। এ দুই সিজদা দ্বারা সূরা হজকে ফজিলত দেওয়া হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সূরা সা-দে কোনো সিজদা নেই। ইনায়া গ্রন্থকার এর দলিল উল্লেখ করেন যে,

تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ خُطْبَةٍ سُوْرَةِ صٓ فَتَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ فَقَالَ عَلَامَ تَشَزَّنْتُمْ إِنَّهَا تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا ـ

অর্থাৎ "একদা রাসূল ﷺ খুতবার মধ্যে সূরা সা-দ (صٓ) তেলাওয়াত করলেন– [সিজদার আয়াত তেলাওয়াতের সময়] লোকেরা সিজদার জন্য তৈরি হয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমরা সিজদার জন্য কেন তৈরি হচ্ছো? এটা তো হলো নবীর তওবা। রাসূল ﷺ বললেন, এ স্থানে পৌঁছে হযরত দাউদ (আ.) সিজদা করেছিলেন তওবা হিসেবে, আমরা সিজদা করি শুকরিয়া হিসেবে।" এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এটি তেলাওয়াতের সিজদা নয়; বরং শুকরিয়ার সিজদা।

উক্ত হাদীসের জবাবে আহনাফ বলেন, শুকরিয়ার সিজদা তেলাওয়াতের সিজদার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। কেননা, কোনো ইবাদতই এমন নেই যে, যাতে শোকরের অর্থ নেই। তাছাড়া এটিও বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ খুতবার মাঝখানে তেলাওয়াতের সিজদা আদায় করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সূরা صٓ -এর সিজদাটিও তেলাওয়াতের সিজদা। আর যদি একথা মেনেও নেওয়া হয় যে, তিনি এস্থানে সাথে সাথে সিজদা করেননি। তখন বলা হবে যে, তিনি পরে সিজদা আদায় করেছেন। বিলম্ব করেছেন جَوَازِ تَاخِيْر -এর জন্য। এ কারণে নয় যে, এ স্থানে তেলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব নয়।

আহনাফের মাযহাবের সমর্থন এর দ্বারাও পাওয়া যায় যে, এক সাহাবী একবার বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি, একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে দেখছে যে, সে সূরা صٓ লেখছে। যখন সে সিজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছল তখন দেখল যে, দোয়াত ও কলম সিজদা করা আরম্ভ করল। এটা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, দোয়াত ও কলমের তুলনায় আমরা সিজদা করার অধিক হকদার। পরে তিনি নির্দেশ দিলে সিজদার আয়াত পড়া হলো এবং তিনিও সাহাবীর সাথে সিজদা করলেন।" –[আশরাফুল হিদায়া– ১ম খণ্ড]

ইমাম মালেক (র.) বলেন, সূরা নাজম, ইনশিক্বাক্ব ও আলাকের মধ্যে কোনো সিজদার আয়াত নেই। কিন্তু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাগুলোতে সিজদার আয়াত আছে।

সিজদায়ে তেলাওয়াতের শর্ত : দুই তাকবীরের মাঝে একটি সিজদা হচ্ছে– সিজদায়ে তেলাওয়াত। অর্থাৎ এক তাকবীর বলে সিজদায় যাওয়া এবং আরক তাকবীর বলে সিজদা থেকে উঠা। এতে সিজদার তাসবীহ পড়তে হবে। তবে এর জন্য দাঁড়ানো শর্ত নয়। তবে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে সিজদায় যাওয়া মোস্তাহাব। বসে তাকবীর বলে সিজদায় যাওয়া জায়েজ। তেলাওয়াতের সিজদার জন্য ঐ সমস্ত শর্ত– যেগুলো নামাজের জন্য শর্ত। যেমন– শরীর পাক হওয়া, কাপড় পাক হওয়া, জায়গা পাক হওয়া ইত্যাদি। তবে এতে হাত উঠাতে হবে না, তাশাহহুদ পড়তে হবে না এবং সালাম ফিরানোও নেই।

সিজদায়ে তেলাওয়াতের হুকুম : যে ব্যক্তি কুরআনের নির্ধারিত চৌদ্দ আয়াতের যে-কোনো একটি আয়াত পাঠ করবে, তার উপর সিজদা করা ওয়াজিব। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

إِذَا قَرَأَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ إِعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُوْلُ يَا وَيْلَةَ أُمِرَ ابْنُ اٰدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ .

অর্থাৎ "যখন বনী আদম সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদা করে তখন শয়তান সেখান থেকে সরে গিয়ে কাঁদতে থাকে এবং বলতে শুরু করে, দুর্ভোগ আমার! বনী আদম সিজদা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছে, তারা সিজদা করেছে, তাই তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে আমাকে সিজদা করার জন্য আদেশ করা হয়েছিল, আমি অস্বীকার করেছি, তাই আমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে।" –[মুসলিম শরীফ]

উক্ত হাদীস দ্বারা তেলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। তা ছাড়া আল্লাহর ঐ আয়াতও তা দৃঢ় করে, যা তিনি কাফেরদের নিন্দাবাদে বলেছেন। তা হলো– وَإِذَا قُرِأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ অর্থাৎ "যখন তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজদা করে না।"

ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে সিজদায়ে তেলাওয়াত সুন্নত। দলিল হলো, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) রাসূল ﷺ -এর সামনে সূরা নাজম তেলাওয়াত করেছিলেন। কিন্তু হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত ও রাসূল ﷺ কেউই সিজদা আদায় করেননি। এর দ্বারা বুঝা গেল সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। তাঁদের দলিলের খণ্ডন হচ্ছে, রাসূল ﷺ ও হযরত যায়েদ (রা.) তৎক্ষণাৎ সিজদা আদায় করেননি, কিন্তু পরে তা আদায় করে নিয়েছেন।

সিজদার আয়াতের পরিমাণ : সিজদার আয়াত পরিপূর্ণ পড়লে সিজদা ওয়াজিব হবে– না এর এক অংশ পড়লে ওয়াজিব হবে? এ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যথাক্রমে– ১. আয়াতের অধিক অংশ পড়ার দ্বারা সিজদা ওয়জিব হবে। ২. কেউ বলেন, পূর্ণ আয়াত পড়ার দ্বারা সিজদা ওয়াজিব হবে। ৩. কেউ বলেন, আয়াতের অধিক অংশ পড়ার দ্বারা সিজদা ওয়াজিব হবে বটে, তবে শর্ত হলো, এতে সিজদা শব্দ থাকতে হবে। ৪. কেউ বলেন, সিজদা শব্দের আগে ও পরে দুই একটি শব্দ পড়ার দ্বারাও সিজদা ওয়াজিব হবে।

শায়খ আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন যে, আমার অভিমত হচ্ছে– সিজদা শব্দ কিংবা এর সামর্থবোধক শব্দের পূর্বের কিংবা পরের কিছু শব্দ পড়ার দ্বারা সিজদা ওয়াজিব হয়। সিজদার সামর্থবোধক শব্দের কথা এজন্য বললাম যে, কোনো কোনো সিজদার আয়াত এমন আছে– যেগুলোতে "সিজদা" শব্দ নেই। যেমন– সূরা বনী ইসরাঈলের সিজদার আয়াতে। আবার কোনো কোনো আয়াতের একেবারে শেষে "সিজদা" শব্দ রয়েছে। যেমন– সূরা আ'রাফে।

সিজদায়ে তেলাওয়াতের তাসবীহ : সিজদায়ে তেলাওয়াতের সিজদার ভিন্ন কোনো তাসবীহ নেই; বরং নামাজের সিজদার তাসবীহের মতোই। তথা এতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى তিনবার বলা সুন্নত। কিন্তু যদি কেউ অন্য তাসবীহও পড়ে তবু জায়েজ। যেমন, মুজতবা নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি তেলাওয়াতের সিজদায় কখনো কখনো এই দোয়া পড়তেন–

سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ -(رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ)

أَوْ سَمِعَهَا وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ أَيِ السَّمَاعَ تَلَا الْإِمَامُ سَجَدَ الْمُؤْتَمُّ مَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ وَإِنْ تَلَا الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَسْجُدْ أَصْلًا أَيْ لَا فِي الصَّلٰوةِ وَلَا فِيْ بَعْدِهَا ـ

অনুবাদ : কিংবা সে কারো থেকে সিজদার আয়াত শুনেছে। যদিও সে তা শুনার ইচ্ছা করেনি। [তবে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হবে।] ইমাম যদি সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে তবে মুক্তাদীও ইমামের সাথে সিজদা করবে। যদিও মুক্তাদী সিজদার আয়াত শুনেনি। আর যদি মুক্তাদী সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে, তবে মোটেও সিজদা করবে না। নামাজেও না এবং নামাজের পরেও না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أَوْ سَمِعَهَا وَإِنْ لَمْ الخ **:** এ عِبَارَة-কে গ্রন্থকারের কথা تَلَا آيَةً-এর উপর عَطْف করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, সিজদার আয়াতসমূহের কোনো একটি আয়াত তেলাওয়াত করার দ্বারা যেমনিভাবে সিজদা ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে তা শ্রবণের দ্বারাও ওয়াজিব হয়। চাই সে তা শ্রবণের ইচ্ছা করুক কিংবা অনিচ্ছায় শুনে থাকুক। অনুরূপ মুসলমানের থেকে শুনে থাকুক কিংবা কোন কাফের থেকে শুনে থাকুক। কোনো বালেগ ব্যক্তির থেকে শুনুক কিংবা কোনো নাবালেগ থেকে শুনুক। সুস্থ মস্তিষ্ক অবস্থায় শুনুক কিংবা পাগলামি [মাতলামি] অবস্থায় শুনুক। পবিত্র অবস্থায় শুনুক কিংবা জুনুবী, হায়িজা কিংবা নিফাসগ্রস্ত অবস্থায় শুনুক। সর্বোপরি শ্রবণের দ্বারা সিজদা ওয়াজিব হবে। কারণ, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন–

اَلسَّجْدَةُ عَلٰى مَنْ سَمِعَهَا وَعَلٰى مَنْ تَلَاهَا ـ

সিজদার আয়াত শ্রবণকারী ও তেলাওয়াতকারী উভয়ের উপর সিজদা ওয়াজিব।" –[ইবনে আবী শাইবা]

মুক্তাদী ইমামের সাথে সিজদা করবে : যদি ইমাম সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে তবে মুক্তাদীর উপর সিজদা ওয়াজিব হবে। চাই মুক্তাদী ইমামকে তা পড়তে শুনুক কিংবা না শুনুক। না শুনার কারণ চাই মুক্তাদী বধির হোক কিংবা জামাত অনেক বড়, তাই ইমাম থেকে দূরে হওয়ার কারণে হোক। সর্বোপরি ইমামের অনুসরণ করত সকল মুক্তাদীর উপর সিজদা ওয়াজিব হবে।

মুক্তাদীর তেলাওয়াত দ্বারা কারো উপরই সিজদা ওয়াজিব নয় : মুক্তাদী যদি সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে তবে ইমাম মুক্তাদী কারো উপরই সিজদা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ তার সাথে নামাজে শরিক মুক্তাদীর উপরও ওয়াজিব হবে না, যদিও সে তা শুনে থাকে। কারণ, মুক্তাদীকে কেরাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তার জন্য কেরাত পড়া নিষেধ। তাই তার কেরাত لَا قِرَاءَةً হয়ে গেছে।

মাসআলা : যে ব্যক্তি নামাজের বাইরে থাকাবস্থায় কোনো নামাজি ব্যক্তি থেকে সিজদার আয়াত শুনে, তবে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হবে। চাই সে নামাজি ব্যক্তি ইমাম হোক কিংবা মুক্তাদী হোক কিংবা মুনফারিদ হোক। সর্বোপরি নামাজের বাইরের শ্রবণকারীর উপর সিজদা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা : কোনো নামাজি ব্যক্তি যদি এমন ব্যক্তি থেকে সিজদার আয়াত শুনে যে তার সাথে নামাজে শরিক নয়, তবে সে নামাজের পর সিজদা আদায় করবে। নামাজের মধ্যে আদায় করবে না। কিন্তু যদি সে নামাজে সিজদা আদায় করে, তাহলে তার নামাজ বিনষ্ট হবে না। তবে সিজদা আদায় হবে না। তাই নামাজের পর আবার সিজদা করতে হবে। কিন্তু নামাজ দোহরাতে হবে না। এ সিজদার আয়াত শ্রবণকারী নামাজি ব্যক্তি চাই ইমাম হোক কিংবা মুক্তাদী হোক কিংবা মুনফারিদ হোক। আর যার থেকে সিজদার আয়াত শোনা যাচ্ছে– চাই সে অন্য কোনো নামাজে হোক কিংবা নামাজের বাইরে হোক কিংবা অন্য কোনো মসজিদের ইমাম থেকে এ আওয়াজ আসুক, যেমন– মুকাব্বিরের উঁচু আওয়াজের মাধ্যমে কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি হয়েও থাকে– সর্বাবস্থায় হুকুম একই।

وَسَجَدَ السَّامِعُ الْخَارِجِيُّ سَمِعَ الْمُصَلِّيْ مِمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ سَجَدَ بَعْدَهَا وَلَوْ سَجَدَ فِيْهَا أَعَادَهَا لَا الصَّلٰوةَ سَمِعَهَا مِنْ إِمَامٍ وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ أَوْ دَخَلَ فِيْ رَكْعَةٍ أُخْرٰى سَجَدَ لَا فِيْهَا وَإِنْ دَخَلَ فِيْ تِلْكَ الرَّكْعَةِ إِنْ كَانَ أَيِ الدُّخُوْلُ قَبْلَ سُجُوْدِ إِمَامِهِ سَجَدَ مَعَهُ وَإِلَّا لَا يَسْجُدُ وَالسَّجْدَةُ الصَّلٰوتِيَّةُ لَا تُقْضٰى خَارِجَهَا أَيِ السَّجْدَةُ التِّلَاوَةُ وَالَّتِيْ مَحَلُّهَا الصَّلٰوةُ لَا تُقْضٰى خَارِجَ الصَّلٰوةِ وَإِنَّمَا قُلْتُ مَحَلُّهَا الصَّلٰوةُ وَلَمْ أَقُلِ الَّتِيْ وَجَبَتْ فِي الصَّلٰوةِ اِحْتِرَازًا عَمَّا وَجَبَتْ فِي الصَّلٰوةِ وَمَحَلُّ أَدَائِهَا خَارِجَ الصَّلٰوةِ كَمَا إِذَا سَمِعَ الْمُصَلِّيْ مِمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ أَوْ سَمِعَ مِنْ إِمَامِهِ وَاقْتَدٰى بِهِ فِيْ رَكْعَةٍ أُخْرٰى ـ

অনুবাদ : নামাজের বাইরে সিজদার আয়াত শ্রবণকারী সিজদা করবে। মুসল্লি ব্যক্তি এমন ব্যক্তি থেকে সিজদার আয়াত শুনেছে যে তার সাথে [নামাজে শরিক] নেই, তবে সে নামাজের পরে সিজদা করবে। আর যদি নামাজের মধ্যেই সিজদা করে ফেলে– তবে [নামাজের পরে] সিজদাকে দোহরাবে; নামাজকে নয়। সিজদার আয়াত যদি ইমাম থেকে শুনে, [কিন্তু তখন] ইমামের সাথে নামাজে শরিক না থাকে কিংবা নামাজে শরিক হয়েছে, কিন্তু অন্য রাকাতে, তবে সে নামাজের পরে সিজদা করবে; নামাজের মধ্যে নয়। আর যদি ঐ রাকাতেই শরিক হয় এবং তা যদি হয় ইমাম সিজদা আদায়ের পূর্বে, তবে সে ইমামের সাথে সিজদা আদায় করবে। অন্যথায় সিজদা আদায় করবে না। নামাজের সিজদাকে নামাজের বাইরে কাজা করবে না। অর্থাৎ ঐ তেলাওয়াতে সিজদা যার স্থান হলো নামাজ, তা নামাজের বাইরে আদায় করবে না। [শারেহ (র.) বলেন,] আমি বলেছি– "যার স্থান হলো নামাজ", আমি বলিনি যে, "যা নামাজে ওয়াজিব হয়েছে"– এর দ্বারা মূলত আমি ঐ সিজদাকে বাদ দিয়েছি, যা নামাজে ওয়াজিব হয়, আর তা আদায় করা হয় নামাজের বাইরে। যেরূপ মুসল্লি ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি থেকে সিজদার আয়াত শুনেছে, যে তার সাথে [নামাজে শরিক] নেই। কিংবা মুক্তাদী ইমাম থেকে সিজদার আয়াত শুনেছে, কিন্তু ইমামের ইকতিদা করেছে অন্য রাকাতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ سَمِعَهَا مِنْ إِمَامٍ وَلَمْ الخ : অর্থাৎ কোনো এমন ব্যক্তি ইমাম থেকে সিজদার আয়াত শুনেছে যে এখনো ইমামের ইকতিদা করেনি, তবে ইকতিদা করবে, তাহলে দেখা হবে যে, সে ইমামের কখন ইকতিদা করে– যদি ইমাম তেলাওয়াতের সিজদা আদায়ের পূর্বে ইকতিদা করে, তবে সে ইমামের সাথে সিজদা করবে। আর যদি ইমাম তেলাওয়াতের সিজদা আদায়ের পরে ঐ রাকাতে কিংবা এর পরের অন্য কোনো রাকাতে ইকতিদা করে, তবে সে নামাজ আদায়ের পর সিজদা আদায় করবে। কারণ, নামাজের বাইরের ওয়াজিব– নামাজের মধ্যে আদায় করা হবে না।

قَوْلُهُ وَالسَّجْدَةُ الصَّلٰوتِيَّةُ لَا تُقْضٰى خَارِجَهَا : অর্থাৎ ঐ সিজদায়ে তেলাওয়াত যা নামাজে ওয়াজিব হয়েছে অর্থাৎ নামাজে সিজদার আয়াত তেলাওয়াতের দ্বারা যে সিজদা ওয়াজিব হয়েছে তা নামাজেই আদায় করবে– নামাজের বাইরে নয়। কারণ, আমাদের মতে– যদি নামাজে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তবে যে রাকাতে তেলাওয়াত করে ঐ রাকাতের রুকু সিজদা আদায়ের মাধ্যমে তেলাওয়াতের সিজদা আদায় হয়ে যায়, তাই নামাজের বাইরে আদায়ের জন্য তার কোনো সিজদাই অবশিষ্ট থাকছে না। কিন্তু এ সুরতটি তখন, যখন সিজদার আয়াত তেলাওয়াতের পর সাথে সাথে রুকু সিজদায় চলে যাবে এবং মধ্যখানে ন্যূনতম তিন আয়াতের পার্থক্য করবে না। পক্ষান্তরে যদি সিজদার আয়াত ও রুকুর মাঝে তিন আয়াত পরিমাণ পার্থক্য করে ফেলে, তবে নামাজের রুকু সিজদা দ্বারা সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় হবে না। একান্ত যদি কেউ তা নামাজের বাইরে আদায় করে তবে তা আদায় হবে না; বরং তাকে নামাজের মধ্যেই আদায় করতে হবে। নামাজের বাইরে দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, চাই مُطْلَقًا নামাজের বাইরে হোক কিংবা অন্য কোনো নামাজে হোক।

قَوْلُهُ أَوْ سَمِعَ مِنْ إِمَامِهِ وَاقْتَدٰى بِهِ فِيْ رَكْعَةٍ أُخْرٰى : অর্থাৎ তেলাওয়াতকারী এখনো ইমাম হয়নি কিংবা এখনো সে ইমামের ইকতিদা করেনি এমতাবস্থায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইমাম থেকে শুনেছে। এটি মূলত مَا يَؤُلُ হিসেবে বলা হয়েছে যে, সে অচিরেই তার ইমাম হবে। এ প্রক্রিয়ায় তার উপর সিজদায়ে তেলাওয়াত নামাজের মধ্যে ওয়াজিব হয়নি। আর নামাজ এর স্থানও নয়।

تَلَاهَا ثُمَّ شَرَعَ فِى الصَّلٰوةِ وَاَعَادَهَا كَفَتْهُ سَجْدَةٌ وَاِنْ تَلَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ شَرَعَ فِيْهَا وَاَعَادَ سَجَدَ اُخْرٰى لِاَنَّ فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى غَيْرَ الصَّلٰوتِيَّةِ صَارَتْ تَبْعًا لِلصَّلٰوتِيَّةِ وَاِنْ لَمْ يَتَّحِدِ الْمَجْلِسُ وَفِى الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ لَمَّا سَجَدَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ لَا يَقَعُ عَمَّا وَجَبَتْ فِى الصَّلٰوةِ قَطُّ ـ

অনুবাদ : কেউ [নামাজের বাইরে] সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করেছে, অতঃপর নামাজ শুরু করেছে এবং সেই সিজদার আয়াতটি পুনরায় পড়েছে, তবে এক সিজদা আদায় করাই যথেষ্ট। আর যদি সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে এবং সিজদা করে ফেলেছে, অতঃপর নামাজ শুরু করেছে এবং নামাজে ঐ আয়াতকে পুনরায় পড়েছে, তাহলে দ্বিতীয় সিজদা করতে হবে। কেননা, প্রথম সুরতে নামাজের বাইরের সিজদা নামাজের ভিতরের সিজদার অনুগত হয়ে গেছে, যদিও মজলিস এক নয়। আর দ্বিতীয় সুরতে যখন সে প্রথম সিজদা করে ফেলেছে, তখন নামাজে যে সিজদা ওয়াজিব হয়েছে– অবশ্যই তা আগের সিজদার দ্বারা আদায় হবে না। [তাই দ্বিতীয়বার সিজদা করতে হবে।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَلَاهَا ثُمَّ شَرَعَ فِى الصَّلٰوةِ وَاَعَادَهَا الخ : এর সুরত হচ্ছে, কেউ নামাজের বাইরে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেছে অতঃপর নামাজ শুরু করেছে এবং এ নামাজে ঐ সিজদার আয়াতটি আবার পড়েছে, তবে এক সিজদা আদায় করাই তার জন্য যথেষ্ট– দুই সিজদার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর বিপরীত সুরতে তথা কেউ নামাজে কোনো সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করেছে এবং সিজদা করেছে, অতঃপর সালাম ফিরানোর পর ঐ আয়াত আবার পড়েছে, তবে এক অভিমত অনুযায়ী দ্বিতীয়বার সিজদা করতে হবে। কিন্তু অন্য অভিমত অনুযায়ী দ্বিতীয়বার সিজদা করতে হবে না। উভয় অভিমতের মাঝে তাতবীক [সমন্বয়] করা হয় এভাবে যে, দ্বিতীয়বার সিজদার আয়াত পড়ার পূর্বে যদি কথা বলে থাকে তবে দ্বিতীয়বার সিজদা করতে হবে, অন্যথায় নয়।

قَوْلُهُ لِاَنَّ فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى الخ : অর্থাৎ প্রথম সুরতে নামাজের বাইরের সিজদা নামাজের ভিতরের সিজদার অনুগামী হয়ে আদায় হয়ে যাবে। এখন যদি সে নামাজে সিজদা আদায় না করে তবে উভয় সিজদা রহিত হয়ে যাবে। কেননা, নামাজের বাইরের সিজদার হুকুম নামাজের ভিতরের সিজদার হুকুমে হয়ে গিয়েছিল। এখন নামাজের ভিতরের সিজদা রহিত হয়ে যাওয়ার দরুন নামাজের বাইরের সিজদাও রহিত হয়ে যাবে। এটি জাহিরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী। কিন্তু নাওয়াদিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী বাইরের তেলাওয়াতকৃত সিজদাটি রহিত হবে না।

قَوْلُهُ وَاِنْ لَمْ يَتَّحِدِ الْمَجْلِسُ : এ বাক্যে وَاوْ বর্ণটি وَصْلِيَّةٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এতে মতানৈক্য রয়েছে যে, নামাজের মাধ্যমে মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায় কিনা? নাওয়াদির গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী হুকমীভাবে মজলিসের হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায়। কেননা, তেলাওয়াতের মজলিস নামাজের মজলিসের মাধ্যমে অবশ্যই পৃথক হয়ে যায়। জাহিরী বর্ণনা অনুযায়ী নামাজের মজলিসের মাধ্যমে মজলিস তখন পরিবর্তন হবে না যখন حَقِيْقَةً এবং حُكْمًا উভয় দিক থেকে মজলিস এক হবে। কেননা, যদি এক না হয়, যদিও حُكْمًا এক না হয় তবে নামাজে সিজদায়ে তেলাওয়াত দ্বারা পূর্বের সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় হবে না।

وَلَفْظُ الْمُخْتَصَرِ وَاِنْ اَعَادَ فِى مَجْلِسٍ اَوْ فِى صَلٰوةٍ كَفٰى سَجْدَةً اَىْ قَرَأَ فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ اَعَادَهَا فِى الصَّلٰوةِ وَفُهِمَ مِنْ تَخْصِيْصِ الْمُعَادِ بِكَوْنِهٖ فِى الصَّلٰوةِ اَنَّ الْاُوْلٰى فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ كَرَّرَهَا فِىْ مَجْلِسٍ كَفَتْهُ سَجْدَةٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَرَأَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ اَوْ قَرَأَ وَسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَهَا فِىْ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ فَعَلٰى هٰذَا اِنْ كَرَّرَهَا فِىْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ تَكْفِىْ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ سَوَاءٌ سَجَدَ ثُمَّ اَعَادَ اَوْ اَعَادَ ثُمَّ سَجَدَ وَاِنْ كَرَّرَهَا فِىْ رَكْعَةٍ اُخْرٰى هٰكَذَا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رح) وَاِنْ بَدَّلَهَا اَىْ اٰيَةَ السَّجْدَةِ اَوِ الْمَجْلِسَ لَا اَىْ قَرَأَ اٰيَتَيْنِ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اَوْ اٰيَةً وَاحِدَةً فِىْ مَجْلِسَيْنِ لَا تَكْفِىْ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ وَاِسْدَاءُ الثَّوْبِ وَالْاِنْتِقَالُ مِنْ غُصْنٍ اِلٰى اٰخَرَ تَبْدِيْلٌ وَاِسْدَاءُ الثَّوْبِ اَنْ يَغْرِزَ الْحَائِكُ فِى الْاَرْضِ خَشَبَاتٍ لِيُسَوِّىَ فِيْهَا سَدَى الثَّوْبِ فِىْ ذَهَابِهٖ وَمَجِيْئَةٍ فَاِنَّ مَجْلِسَهٗ يَتَبَدَّلُ بِالْاِنْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ اِلٰى مَكَانٍ.

অনুবাদ : এখানে মুখতাসারে কুদূরীর ইবারত নিম্নরূপ- وَاِنْ أَعَادَ فِىْ مَجْلِسٍ أَوْ فِىْ صَلٰوةٍ كَفٰى سَجْدَةً অর্থাৎ 'সে সিজদার আয়াত নামাজের বাইরে পাঠ করেছে, অতঃপর ঐ মজলিসেই দ্বিতীয়বার পাঠ করেছে কিংবা নামাজে তা দ্বিতীয়বার পড়েছে তবে এক সিজদাই তার জন্য যথেষ্ট।' উদ্দেশ্য হচ্ছে- সে নামাজের বাইরে সিজদার আয়াত পড়েছে, অতঃপর নামাজে তা আবার পড়েছে। দ্বিতীয়বার পড়ার স্থান খাস করার দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বিতীয়বার পড়েছে নামাজে, আর প্রথমবার পড়েছে নামাজের বাইরে। এক মজলিসে [যদি] সিজদার আয়াত একাধিকবার পড়ে তবে [তার জন্য] এক সিজদা আদায় করাই যথেষ্ট। এতে কোনো পার্থক্য নেই যে, সিজদার আয়াতকে দুবার পড়ে সিজদা করেছে কিংবা একবার পড়ে সিজদা করেছে এবং ঐ মজলিসেই দ্বিতীয়বার ঐ সিজদার আয়াতকে পড়েছে। অতএব, এ মাসআলার ভিত্তিতে যদি এক রাকাতে [সিজদার] এক আয়াতকেই একাধিকবার পড়ে তবে এক সিজদা আদায় করাই যথেষ্ট। চাই সে একবার পড়ে সিজদা করুক অতঃপর দ্বিতীয়বার তা আবার পড়ুক কিংবা সিজদার আয়াত দ্বিতীয়বার পড়ে সিজদা করুক। আর যদি দ্বিতীয় রাকাতে ঐ আয়াতকে আবার পড়া হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট হুকুম অনুরূপ। এতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। যদি সিজদার আয়াতকে পরিবর্তন করা হয় কিংবা মজলিস পরিবর্তন করা হয়, তবে এক সিজদা আদায় করা যথেষ্ট হবে না। অর্থাৎ দুটি সিজদার আয়াত এক মজলিসে পড়েছে কিংবা এক আয়াতকে দুই মজলিসে পড়েছে তবে এক সিজদা আদায় করা যথেষ্ট হবে না। কাপড়ের সুতা তানা করার সময় আসা-যাওয়া করা এবং এক ডালা থেকে অপর ডালায় স্থানান্তরিত হওয়ার দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হয়। এ স্থানে اِسْدَاءُ الثَّوْبِ অর্থ হচ্ছে- কাপড় বুননকারী ব্যক্তি ভূমিতে কিছু লাকড়ি গাড়ে, যেন কাপড়ের সুতা তানা কব়ার জন্য এতে আসা যাওয়ায় বরাবর [সমতল] হয়। অতএব, এরূপ এক স্থান থেকে অপর স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَفْظُ الْمُخْتَصَرِ وَاِنْ الخ : এতে একথার ইশারা রয়েছে যে, কুদূরীর ইবারত বেকায়ার ইবারতের চেয়ে অধিক সংক্ষিপ্ত এবং এর মর্মার্থ অনেক। কেননা, এতে বিকায়ার বিগত মতন ও আগত মতনের মর্মার্থকে শামিল রাখে। অর্থাৎ যদি মজলিস এক হয়, তবে এক সিজদা আদায় করাই যথেষ্ট।

قَوْلُهُ أَىْ قَرَأَ فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ أَعَادَهَا الخ : এ ব্যাখ্যার দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাজে إِعَادَة করার দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, নামাজেই দুবার পড়া; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে– নামাজে দ্বিতীয়বার পড়বে এবং প্রথমবার পড়েছে নামাজের বাইরে। এ বিবরণ দ্বারা আল্লামা বুরজুনদী (র.)-এর ভুল স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তিনি স্বীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থে هٰذَا -কে تَكْرَارٌ فِى الصَّلٰاةِ -এর উপর প্রয়োগ করেছেন। এটি সুস্পষ্ট ভুল।

قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَرَأَ مَرَّتَيْنِ الخ : অর্থাৎ মূল মাসআলা ছিল, যদি কেউ একটি সিজদার আয়াতকে এক মজলিসে বারবার পড়ে, তবে এর জন্য এক সিজদা আদায় করাই যথেষ্ট। চাই সে প্রথমবার তেলাওয়াত করে সিজদা করে আবার তেলাওয়াত করুক কিংবা বারবার পড়ার পর সিজদা করুক। উভয় সুরতের হুকুম একই যে, এক সিজদা আদায় করাই যথেষ্ট। এ হুকুম ইস্তিহসান অনুযায়ী। অন্যথায় কিয়াস বলে, প্রত্যেকবার তেলাওয়াতের জন্য পৃথক পৃথক সিজদা ওয়াজিব হবে। ইস্তিহসানের কারণ, যদি প্রত্যেকবার তেলাওয়াতের জন্য পৃথক পৃথক সিজদা ওয়াজিব করা হয়, তবে অনেক বড় ক্ষতি আবশ্যক হয়। কেননা, মুসলমানদের কুরআন শিক্ষার অতীব প্রয়োজন রয়েছে। আর এজন্য সে সিজদার আয়াত বারবার পড়তে ও পড়াতে বাধ্য। এ সুরতে যদি বারবার সিজদা ওয়াজিব করা হয়, তবে অনেক বড় ক্ষতি আবশ্যক হয়। তাছাড়া আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় হিদায়া ও বিনায়া গ্রন্থের রেফারেন্সে লেখেন– "হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ -এর সামনে সিজদার আয়াত একই মজলিসে একাধিকবার তেলাওয়াত করতেন এবং রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের সামনে একাধিকবার পাঠ করতেন, কিন্তু রাসূল ﷺ এক সিজদা আদায় করতেন।"

قَوْلُهُ فَعَلٰى هٰذَا اِنْ كَرَّرَهَا فِىْ رَكْعَةٍ الخ : আল্লামা বুরজুনদী (র.) বলেন, যদি এক আয়াতই এক রাকাতে বারবার পড়ে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এক সিজদা আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি এক রাকাতে সিজদার আয়াত পড়ে এবং সিজদা করে ফেলে অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে ঐ আয়াতই দোহরায়, তবে কিয়াস হচ্ছে– দ্বিতীয় সিজদা ওয়াজিব না হওয়া। এটিই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দ্বিতীয়বার সিজদা আদায় করতে হবে। আর এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। ইস্তিহসানও এমনই। –[খুলাসাহ]

قَوْلُهُ وَاِنْ كَرَّرَهَا فِىْ رَكْعَةٍ أُخْرٰى : অর্থাৎ যদি এক আয়াতকে দ্বিতীয় রাকাতে আবার পড়ে তবে এক সিজদা করাই যথেষ্ট কিন্তু যদি এ দোহরানো দ্বিতীয় রাকাতে না হয়ে দ্বিতীয় শুফা'য় হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয়বার সিজদা করতে হবে।

وَتَجِبُ أُخْرٰى اَىْ عَلَى السَّامِعِ لَوْ تَبَدَّلَ مَجْلِسُ السَّامِعِ دُوْنَ التَّالِىْ لَا فِىْ عَكْسِهٖ اَىْ لَا تَجِبُ سَجْدَةٌ اُخْرٰى عَلَى السَّامِعِ اِنْ تَبَدَّلَ مَجْلِسُ التَّالِىْ دُوْنَ السَّامِعِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْمَجْلِسَ هٰهُنَا يَتَبَدَّلُ بِالشُّرُوْعِ فِىْ اَمْرٍ اٰخَرَ وَبِالْاِنْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ اِلٰى مَكَانٍ لَا يَتَّحِدَانِ حُكْمًا اَمَّا زَوَايَا الْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ فَفِىْ حُكْمِ مَكَانٍ وَاحِدٍ بِدَلَالَةِ صِحَّةِ الْاِقْتِدَاءِ وَاَغْصَانُ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ اَمْكِنَةٌ مُخْتَلِفَةٌ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِىْ رِوَايَةِ النَّوَادِرِ مَكَانٌ وَاحِدٌ وَبِالْقِيَامِ هٰهُنَا لَا يَتَبَدَّلُ الْمَجْلِسُ بِخِلَافِ الْمُخَيَّرَةِ فَاِنَّ الْقِيَامَ ثَمَّهٗ دَلِيْلُ الْاِعْرَاضِ وَكُرِهَ تَرْكُ السَّجْدَةِ اَىْ تَرْكُ اٰيَةِ السَّجْدَةِ وَقِرَاءَةُ بَاقِى السُّوْرَةِ لِاَنَّهٗ يُشْبِهُ الْاِسْتِنْكَافَ لَا عَكْسُهٗ اَىْ لَا يُكْرَهُ قِرَاءَةُ اٰيَةِ السَّجْدَةِ وَتَرْكُ بَاقِى السُّوْرَةِ وَنُدِبَ ضَمُّ اٰيَةٍ اَوْ اٰيَتَيْنِ قَبْلَهَا اِلَيْهَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ التَّفْضِيْلِ وَاسْتُحْسِنَ اِخْفَاؤُهَا عَنِ السَّامِعِ لِئَلَّا تَجِبَ عَلَى السَّامِعِ فَاِنَّهٗ رُبَّمَا يَكُوْنُ السَّامِعُ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ ـ

অনুবাদ : যদি শ্রবণকারীর মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায়, তেলাওয়াতকারীর মজলিস নয়– তবে শ্রবণকারীর উপর দ্বিতীয় সিজদা ওয়াজিব হবে। কিন্তু এর পরিপন্থি সুরতে ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ যদি তেলাওয়াতকারীর মজলিস পরিবর্তন হয়, শ্রবণকারীর মজলিস নয়– তবে শ্রবণকারীর উপর দ্বিতীয় সিজদা ওয়াজিব হবে না। জেনে রেখ, এ স্থলে [সিজদায়ে তেলাওয়াতের অধ্যায়ে] এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজ শুরু করা এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার দ্বারা حُكْمًا মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায়। কিন্তু ঘর ও মসজিদের আঙ্গিনা ইকতিদা সহীহ হওয়া বুঝানোর কারণে এক স্থানের হুকুমে হবে। জাহিরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী এক বৃক্ষের বিভিন্ন ডালা বিভিন্ন স্থানের হুকুমে। 'নাওয়াদিরে রেওয়ায়েত' অনুযায়ী এক স্থানের হুকুমে। এ অধ্যায়ে [বসা থেকে] দাঁড়ানো মজলিস পরিবর্তন হওয়ার কারণ নয়। তালাকের ইচ্ছাপ্রাপ্তা মহিলার বিষয়টি এর পরিপন্থি। কেননা, তালাকের ইচ্ছাপ্রাপ্তা মহিলা [বসা থেকে] দাঁড়ানো বিমুখের প্রমাণ। সিজদার আয়াতকে বর্জন করে বাকি সূরা তিলাওয়াত করা মাকরূহ। কেননা, এমন করা সিজদাকে অস্বীকার করার নামান্তর। এর বিপরীত সুরত মাকরূহ নয়। অর্থাৎ সিজদার আয়াত পাঠ করা এবং বাকি সূরা বর্জন করা মাকরূহ। মোস্তাহাব হচ্ছে– সিজদার আয়াতের পূর্বে এক/ দুই আয়াত মিলিয়ে পড়া, [শুধু সিজদার আয়াতকে] প্রাধান্য দেওয়ার সন্দেহকে দূর করার জন্য। শ্রবণকারী থেকে সিজদার আয়াতকে গোপন করা উত্তম। যেন শ্রবণকারীর উপর সিজদা ওয়াজিব না হয়। কারণ, কখনো কখনো শ্রবণকারী অজুহীন অবস্থায় থাকে। [তখন তার জন্য সিজদা কষ্টকর।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاعْلَمْ اَنَّ الْمَجْلِسَ هٰهُنَا الخ : 'হুলইয়াতুল মহল্লী' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, সিজদাকে দ্বিতীয়বার দিতে হবে তখন, যখন নিম্নের তিনটি সুরত পেশ আসবে। ১. ভিন্ন ভিন্ন আয়াত যদি তেলাওয়াত করা হয়। ২. ভিন্ন ভিন্ন আয়াত যদি শ্রবণ করে। ৩. একই আয়াত কিন্তু তেলাওয়াত কিংবা শ্রবণের মজলিস যদি ভিন্ন হয়। প্রথম দুই সুরতে যদি এক মজলিসে সমস্ত সিজদার আয়াতও পড়ে কিংবা সমস্ত সিজদার আয়াত শ্রবণ করে তবে সবগুলো সিজদাই আদায় করতে হবে। তৃতীয় সুরত তথা মজলিস ভিন্ন হওয়ার সুরত আবার দুভাবে হতে পারে–

১. হাকীকীভাবে জায়গা ভিন্ন হওয়া।

২. হুকমীভাবে জায়গা ভিন্ন হওয়া। হাকীকীভাবে জায়গা ভিন্ন হওয়া অর্থাৎ দুয়ের চেয়ে অধিক কদম হেঁটে অন্য জায়গায় যাওয়া : যেরূপ ফিকহের অধিকাংশ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। অথবা, 'আল-মুহীত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, তিন কদমের চেয়ে অধিক কদম হেঁটে অন্য জায়গায় যাওয়া। যখন উভয় স্থান এক স্থান হওয়ার হুকুম নয়। যেমন– মসজিদ, কামরা ও নৌকা সওয়ারিতে আরোহণকারী নামাজি ব্যক্তির জন্য পূর্ণ মরুভূমিই এক স্থানের হুকুমে। কারণ, সে চলন্ত সওয়ারিতে নামাজ পড়ছে। ফলত তা এক স্থানে স্থির নেই। সর্বোপরি যখন স্থান ভিন্ন হওয়ার হুকুম হবে তখন সিজদাও বিভিন্ন হওয়ার হুকুম হবে। হুকমীভাবে জায়গা ভিন্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে– এমন কোনো কাজ শুরু করে দেওয়া সমাজে যাকে মনে করা হয় যে, এটি প্রথম কাজকে খতম করে দেয়। এর দ্বারা ভিন্ন সিজদা দেওয়া আবশ্যক হবে। কিংবা তেলাওয়াতের পর খানা খেতে শুরু করেছে, কিংবা শুয়ে পড়েছে, কিংবা বাচ্চাকে দুধ পান করাতে শুরু করেছে, কিংবা বেচাকেনা শুরু করে দিয়েছে। উল্লিখিত সমস্ত সুরতে স্থান ভিন্ন পাওয়া গেছে, তাই তেলাওয়াত ভিন্ন হওয়ার দ্বারা সিজদাও ভিন্নভাবে দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি তেলাওয়াতের পর চুপ করে বসে থাকে যদিও দীর্ঘ সময় হয়, কিংবা কেরাত দীর্ঘ করে, কিংবা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তাসবীহ পড়তে শুরু করে, কিংবা এক/ আধ লুকমা খানা খায়, কিংবা এক/ আধ ঢোক পানি পান করে, কিংবা বসে বসে ঘুমায়, কিংবা বসা থেকে শুধু দাঁড়িয়েছে, কিংবা মতানৈক্যের কারণে সামান্য সরে বসে, কিংবা দাঁড়ানো থেকে বসে যায়, কিংবা হাঁটছিল এখন বাহনে আরোহণ করেছে– উল্লিখিত সমস্ত সুরতে ভিন্ন স্থানের হুকুম দেওয়া হবে না। তাই একই আয়াতের তেলাওয়াত বিভিন্ন হওয়ার দ্বারা সিজদা বিভিন্ন হবে না।

قَوْلُهُ فَفِيْ حُكْمِ مَكَانٍ وَاحِدٍ الخ : অর্থাৎ ঘর এবং মসজিদের বিভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন স্থানের হুকুমে হবে না। যদিও প্রকাশ্যভাবে ভিন্ন স্থান মনে হয়। কিন্তু হুকুমগত দিক থেকে পুরোটাই এক। কেননা, এক কোনা থেকে শুরু করে অন্য কোনা পর্যন্ত যে কোনো স্থানে ইমামের ইকতিদা করা সহীহ। তাই যদি হুকুমগত দিক থেকে এক স্থান না হতো, তবে তখন ইকতিদাও সহীহ হতো না।

قَوْلُهُ بِالْقِيَامِ هٰهُنَا لَا يَتَبَدَّلُ الخ : অর্থাৎ এ সিজদায়ে সাহুর অধ্যায়ে শুধু দাঁড়ানোর মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন বলে গণ্য হবে না। যেমন– এক ব্যক্তি বসাবস্থায় সিজদার আয়াত পড়েছে, অতঃপর সে স্থানেই দাঁড়িয়ে গেছে– সে কোনো দিকে যায়নি এবং সে অবস্থায় ঐ আয়াতকে দ্বিতীয়বার পড়েছে, তবে এক সিজদাই ওয়াজিব হবে। কারণ, দাঁড়ানোর দ্বারা স্থান পরিবর্তন হয় না। তবে শুধু দাঁড়ানোর মাধ্যমে মজলিস [স্থান] পরিবর্তন না হওয়ার হুকুম শুধুমাত্র সিজদায়ে তেলাওয়াতের অধ্যায়ই, কিন্তু مُخَيَّرَةٌ بِالطَّلَاقِ-এর অধ্যায়ে দাঁড়ানোর দ্বারা স্থান পরিবর্তনের হুকুম দেওয়া হবে। যেমন স্বীয় স্ত্রীর সাথে বলল– اِخْتَارِيْ نَفْسَكِ [তুমি তোমার নিজেকে গ্রহণ কর] কিংবা এ ধরনের এমন কোনো বাক্য বলেছে যার দ্বারা তালাক দেওয়া হয়, আর মহিলা তখন বসা ছিল, এখন স্বামী তাকে এখতিয়ার (اِخْتِيَارٌ) দেওয়ার পর যদি সে দাঁড়িয়ে যায়, তবে তার এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, সিজদায়ে তেলাওয়াতের অধ্যায়ে বসা থেকে দাঁড়ানোই বিমুখ (اِعْرَاضٌ) হওয়ার প্রমাণ।

قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَرْكُ السَّجْدَةِ الخ : অর্থাৎ পূর্ণ সূরা পড়ে শুধু সিজদার আয়াতকে রেখে দেওয়া মাকরূহে তাহরীমী। কারণ, এর দ্বারা সিজদা থেকে পলায়ন করা আবশ্যক হয়। আর সিজদা থেকে পলায়ন করা মুসলমানের চরিত্রের পরিপন্থি। তাছাড়া এতে কুরআনের তারতীব [বিন্যাস] ও ইবারতের মাঝেও পরিবর্তন করা আবশ্যক হয়। পক্ষান্তরে যদি এর বিপরীত সুরত হয়, তবে মাকরূহ হবে না। অর্থাৎ কেউ শুধু সিজদার আয়াত পড়েছে এবং অন্যান্য আয়াত পড়েনি তবে মাকরূহ হবে না। কারণ, এতে সিজদা থেকে পলায়ন প্রমাণিত হয় না এবং কুরআনের তারতীব ও ইবারতেও পরিবর্তন করা প্রমাণিত হয় না। কেননা, পূর্ণ সূরায় সিজদার আয়াত মাত্র একটি। আর এক/ আধ আয়াত তেলাওয়াত করে নেওয়া অভ্যাসের পরিপন্থি কিছু নয়। কিন্তু যদি এমন সুরত নামাজে সংঘটিত হয়, তবে মাকরূহ হবে। কেননা, কেরাতকে এক আয়াতে সীমাবদ্ধ করা মাকরূহ।

قَوْلُهُ وَنُدِبَ ضَمُّ اٰيَةٍ الخ : মোস্তাহাব হচ্ছে, শুধু সিজদার আয়াতকেই পাঠ না করা; বরং এর সাথে এক আয়াত কিংবা দুই আয়াত শুরু থেকে মিলিয়ে নেওয়া। কারণ, যদিও শুধু সিজদার আয়াতকে পড়া মাকরূহ নয়; কিন্তু এভাবে পড়ার দ্বারা ঐ আয়াতকে তার আশপাশের আয়াতের উপর প্রাধান্য দেওয়া বুঝা যায়। যদিও সে এ নিয়তে পড়েনি। উত্তম সুরত হচ্ছে– যদি উঁচু আওয়াজে তেলাওয়াত করতে থাকে, তবে সিজদার আয়াতকে আস্তে পড়বে, যেন কেউ না শুনে। কেননা, যদি কেউ শুনতে পায়, তবে তার উপরও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। এমনও হতে পারে যে, সম্ভবত শ্রবণকারী তৎক্ষণাৎ সিজদা করবে না এবং পরবর্তীতে তার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। প্রকৃতপক্ষে যদি সে ভুলে যায়, তবে তার জিম্মায় তা বাকি থাকবে তাই উত্তম হলো, সিজদার আয়াত আস্তে পড়া।

بَابُ صَلٰوةِ الْمُسَافِرِ

هُوَ مَنْ قَصَدَ سَيْرًا وَسَطًا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَفَارَقَ بُيُوْتَ بَلَدِهٖ وَاعْتُبِرَ فِى الْوَسَطِ لِلْبَرِّ سَيْرُ الْاِبِلِ وَالرَّاجِلِ وَلِلْبَحْرِ اِعْتِدَالُ الرِّيْحِ وَلِلْجَبَلِ مَا يَلِيْقُ بِهٖ وَلَهٗ رُخَصٌ تَدُوْمُ كَالْقَصْرِ فِى الصَّلٰوةِ وَالْاِفْطَارِ فِى الصَّوْمِ وَاِنْ كَانَ عَاصِيًا فِىْ سَفَرِهٖ حَتّٰى يَدْخُلَ بَلَدَهٗ حَتّٰى يَدْخُلَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ تَدُوْمُ اَوْ يَنْوِىَ اِقَامَةَ نِصْفِ شَهْرٍ بِبَلْدَةٍ اَوْ قَرْيَةٍ مِنْهَا اَىْ مِنَ الرُّخَصِ قَصْرُ فَرْضِهِ الرُّبَاعِىْ فَيَقْصُرُ اِنْ نَوٰى اَقَلَّ مِنْ نِصْفِ شَهْرٍ اَوْ نَوٰى مُدَّتَهَا اَىْ مُدَّةَ الْاِقَامَةِ وَهِىَ نِصْفُ شَهْرٍ بِمَوْضِعَيْنِ اَوْ دَخَلَ بَلَدًا عَازِمًا خُرُوْجَهٗ غَدًا اَوْ بَعْدَ غَدٍ وَطَالَ مُكْثُهٗ وَكَذَا عَسْكَرٌ دَخَلَ اَرْضَ حَرْبٍ اَوْ حَاصَرَ حِصْنًا فِيْهَا اَوْ اَهْلَ الْبَغْىِ فِىْ دَارِنَا فِىْ غَيْرِ مِصْرٍ وَاِنْ نَوَوْا اِقَامَةَ مُدَّتِهَا اَىْ يَقْصُرُ الْجَمَاعَةُ الْمَذْكُوْرُوْنَ وَاِنْ نَوَوْا اِقَامَةَ نِصْفِ شَهْرٍ لِاَنَّهُمْ لَمْ يَصِيْرُوْا مُقِيْمِيْنَ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ ۔

পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের নামাজ

অনুবাদ : মুসাফির ঐ ব্যক্তি যে মধ্যম গতিতে তিনদিন তিনরাত্র [পরিমাণ পথ] ভ্রমণ করার ইচ্ছা করেছে এবং আপন শহরের বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়েছে। মধ্যম গতির ক্ষেত্রে স্থলভাগে উট কিংবা পায়ে হেঁটে ভ্রমণ ধর্তব্য হবে। আর জলভাগে মধ্যম বাতাস ধর্তব্য এবং পাহাড়ি অঞ্চলে ঐ বাহন ধর্তব্য হবে যা পাহাড়ে চলার যোগ্য। মুসাফিরের জন্য কতিপয় অবকাশ আছে যা সর্বদা থাকে। যেমন– নামাজে কসর করা এবং [রমজান মাসে] রোজা না রাখা। যদিও মুসাফির স্বীয় ভ্রমণে গুনাহগার [অবাধ্য] হয়। [এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তার অবকাশ বহাল থাকবে] যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের শহরে প্রবেশ না করবে। গ্রন্থকারের কথা حَتّٰى يَدْخُلَ এটি তাঁর কথা تَدُوْمُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। কিংবা কোনো শহর বা গ্রামে অর্ধ মাস [পনেরো দিন] থাকার নিয়ত করে। মুসাফিরের অবকাশের মধ্য হতে চার রাকাত ফরজ নামাজ কসর করবে। অতএব, যদি পনেরো দিনের চেয়ে কম থাকার নিয়ত করে কিংবা ইকামতের সময় যা ন্যূনতম পনেরো দিন– দুই জায়গায় থাকার নিয়ত করে, কিংবা কোনো শহরে এ নিয়তে প্রবেশ করেছে যে, কাল পরশু ফিরে আসবে কিন্তু এভাবে তার সেখানে দীর্ঘ দিন থাকা হয়ে গেছে, তবে সে কসর পড়বে। অনুরূপ মুসলিম সৈনিক যারা দারুল হারবে প্রবেশ করে, কিংবা দারুল হারবের কোনো কেল্লা ঘেরাও করে থাকে, কিংবা দারুল ইসলামে কোনো শহরের বাহিরে রাষ্ট্রদ্রোহীদের বন্দী করে রাখে যদিও ঐ সকল সৈনিকেরা ইকামতের নিয়ত করে। অর্থাৎ উল্লিখিত মুসলিম সৈনিকগণ যদিও ইকামতের নিয়ত করে, তবু তারা কসর পড়বে। কারণ ইকামতের নিয়ত করার দ্বারা তারা মুকীম হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ صَلٰوةِ الْمُسَافِرِ :

সফর (سَفَرٌ) -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : 'সফর'-এর আভিধানিক অর্থ– দূরত্ব অতিক্রম করা। শরিয়তের পরিভাষায় সফর বলে– এমন ভ্রমণকে যার কারণে আহকাম তথা বিধিবিধান পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন– নামাজে কসর করা, রমজান মাসে রোজা ভাঙ্গার অনুমতি, পায়ের মোজার উপর মাসেহ করার মেয়াদ একদিনের পরিবর্তে তিনদিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হওয়া, জুমা, দুই ঈদের নামাজ এবং কুরবানি করার وُجُوْب রহিত হয়ে যাওয়া, মাহরাম ব্যতীত আজাদ মহিলাদের জন্য বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। প্রণিধানযোগ্য যে, শরয়ী দৃষ্টিতে কেবলমাত্র ঐ ভ্রমণই সফর বলে গণ্য হবে, যার জন্য সফরের নিয়ত করা হয়েছে এবং কার্যত সফরও করা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি তিনদিনের পথ অতিক্রম করার নিয়ত ব্যতীত সারা দুনিয়াও ঘুরে বেড়ায়, তবু সে শরিয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির বলে গণ্য হবে না। অনুরূপ শুধুমাত্র নিয়ত করে বসে থাকলেও মুসাফির বলে গণ্য হবে না।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ইকামতের জন্য শুধুমাত্র নিয়তই যথেষ্ট, অথচ সফরের জন্য শুধু নিয়ত যথেষ্ট নয়। এটা কেন?

উত্তর : এর উত্তর হলো, সফর হচ্ছে একটি কাজ। আর কাজের ক্ষেত্রে শুধু নিয়তই যথেষ্ট হয় না; বরং এর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপও প্রয়োজন হয়। যেমন– নামাজ একটি কর্মমূলক আমল, তাই এর জন্য শুধু নিয়তই যথেষ্ট হয় না; বরং এর সাথে সাথে দাঁড়ানো, রুকু করা, সিজদা করা ইত্যাদি কর্মমূলক আমলগুলোরও প্রয়োজন হয়; অন্যথায় নামাজ হয় না। পক্ষান্তরে ইকামত হচ্ছে– تَرْكُ الْفِعْلِ তথা কর্ম [সফরের কর্ম] বর্জনের নাম। আর تَرْكُ الْفِعْلِ শুধুমাত্র নিয়ত দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এর জন্য কোনো কর্মমূলক পদক্ষেপ নিতে হয় না।

মুসাফির কাকে বলে? মুসাফির বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে মধ্যম গতিতে চলে কমপক্ষে তিনদিন ও তিনরাত পরিমাণ দূরত্ব ভ্রমণের ইচ্ছায় বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজের শহর কিংবা গ্রাম অতিক্রম করে দূরে চলে যায়। এ অধ্যায়ে মুসাফির দ্বারা مُطْلَقًا মুসাফির উদ্দেশ্য নয়; বরং ঐ মুসাফির উদ্দেশ্য যার উপর শরিয়তের কিছু বিধান প্রয়োগ করা হয়। তিনদিন ও তিনরাতের পরিমাণ নির্ধারণ করার কারণ হচ্ছে– রাসূল ﷺ বলেছেন, "মুসাফির তিনদিন তিনরাত মোজার উপর মাসেহ করবে।"– এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সফরের সর্বনিম্ন সময়সীমা তিনদিন ও তিনরাত পরিমাণ দূরত্বের পথ। অতঃপর "মধ্যম গতির চলন" বলে এদিকে ইশারা করেছেন যে, মুসাফির দ্রুত গতিতেও চলবে না এবং ধীর গতিতেও চলবে না; বরং মধ্যম গতিতে চলবে। যাতে খাবারও খাবে, নামাজও পড়বে। জরুরি প্রয়োজনগুলো মিটানোর ক্ষেত্রেও মধ্যম গতিতে কাজ চালাবে। রাতে আরাম করবে [ঘুমাবে]। এভাবেই মূল গন্তব্যে পৌঁছবে। উল্লিখিত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করত আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন– দৈনিক ষোল মাইল পথ চলা এবং এ হিসেবে যদি কেউ আটচল্লিশ মাইল দূরত্বের নিয়তে নিজের বাড়ি কিংবা শহরের বসতি ছেড়ে দূরে চলে যায়, তবে সে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মুসাফির হবে। সফরের বিধান তার উপর প্রয়োগ হবে। যদিও সে ঐ দূরত্ব একদিন কিংবা এর চেয়েও কম সময়ে অতিক্রম করে যাক, তবু সে মুসাফির যতক্ষণ পর্যন্ত সে পথে কিংবা বাসা-বাড়িতে কিংবা কোনো স্থানে পৌঁছে ন্যূনতম পনেরো দিনের নিয়তে অবস্থান না করবে সে মুসাফির থাকবে।

قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ فِى الْوَسَطِ لِلْبَرِّ الخ : এটি মধ্যম গতিতে চলার পরিমাণ যে, স্থলভাগে উট কিংবা পায়ে হেঁটে চলা ধর্তব্য। আর জলভাগে নৌকা জাহাজ যখন চলে তখন বাতাস মধ্যম গতিতে থাকা ধর্তব্য হবে। পাহাড়ি অঞ্চলে– সেখানে চলার মতো উপযোগী সওয়ারির চলা ধর্তব্য। যেহেতু পায়ে হেঁটে চলার ক্ষেত্রে কেউ মধ্যম গতিতে চলে ঘণ্টায় তিন মাইল যায়, কেউ দুই মাইল যায়। আবার কেউ চার মাইল যায়। তাই আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম সমস্ত জরুরতের দিকে লক্ষ্য রেখে দৈনিক ষোল মাইল পথ চলার হিসাব করেছেন। আর এরই উপর ফতোয়া।

মুসাফিরের হুকুম : মুসাফির যখন শরয়ীভাবে মুসাফির হয়, তখন তার উপর শরয়ী কিছু হুকুম প্রয়োগ করা হয়। তাকে কিছু অবকাশ দেওয়া হয়। যেমন– চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজ দুই রাকাত পড়বে এবং বাকি দুই রাকাত নামাজ তার জিম্মা থেকে

রহিত হয়ে যাবে। যদি কেউ চার রাকাত পড়ে, তবে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু যদি ভুলে চার রাকাত পড়ে, তবে সে গুনাহগার হবে না। দুই কিংবা তিন রাকাতবিশিষ্ট নামাজ পুরোটাই পড়তে হবে। এতে কোনো কম হয় না। যেমন, ফজর ও মাগরিবের নামাজ। তবে রোজা রাখার অনুমতি আছে। এখন যদি কেউ রোজা রাখে তবে উত্তম। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুসাফিরের জন্য রোজা ও নামাজের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا فِيْ سَفَرِهِ الخ : অর্থাৎ মুসাফির যে সফর করছে– সে সফরে যদি সে গুনাহের কর্মকাণ্ডের নিয়তেও সফর করে তবুও সফরের সমস্ত সুবিধা ও রুখসাত সে গ্রহণ করতে পারবে। যেমন– সে চুরি করা, কিংবা ডাকাতি করা, কিংবা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের নিয়তে সফর করে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, রুখসাত একটি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত, যা নাফরমান ও গুনাহগারকে দেওয়া হয় না। আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব দেওয়া হয় যে, রুখসাত সম্পর্কিত نَصّ হচ্ছে مُطْلَقٌ আর সফরের সাথে রুখসাতের تَعَلُّقٌ সফর হিসেবে, অনুগত হওয়া কিংবা অবাধ্য হওয়া হিসেবে নয়; বরং অনুগত ও অবাধ্য হওয়া একটি অতিরিক্ত বিষয়।

قَوْلُهُ فَيَقْصُرُ إِنْ نَوٰى أَقَلَّ الخ : যখন সে মুসাফির হয়ে গেছে, তখন সে চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজকে কসর করে দুই রাকাত পড়বে। ততক্ষণ পর্যন্ত সে কসর করবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোথাও অর্ধ মাস অবস্থান করার নিয়ত না করবে, কিংবা অর্ধ মাস অবস্থান করার নিয়ত তো করেছে, তবে তা হচ্ছে দুই জায়গায় থাকার জন্য নিয়ত করেছে। যেমন, এক জায়গায় পাঁচদিন এবং অন্য জায়গায় দশদিন থাকার নিয়ত করেছে, তবে সে মুসাফিরই থাকবে এবং নামাজ কসর পড়বে, কিংবা কোনো শহরে এ নিয়তে অবস্থান করছে যে, দুই একদিন পর এখান থেকে চলে যাব, অতঃপর কোনো ওজরের কারণে যেতে পারেনি, অতঃপর আবার নিয়ত করেছে যে, দুই চার দিন পর চলে যাব, কিন্তু তখনও যায়নি, এভাবে তার থাকার সময় দীর্ঘ হয়ে গেছে। এমনকি পনেরো দিনের চেয়েও অধিক হয়ে গেছে, তবুও সে মুসাফির থাকবে। যদিও এভাবে তার ছয় মাস কিংবা এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। কিংবা সারা জীবন এভাবেই চলতে থাকে। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, "তিনি আযারবাইজানে এভাবে ছয়মাস পর্যন্ত ছিলেন এবং নামাজ পরিপূর্ণ পড়েননি।" –[মুসলিম শরীফ]

قَوْلُهُ وَكَذَا عَسْكَرٌ دَخَلَ الخ : অর্থাৎ ঐ মুসলিম সৈনিক যে দারুল হারবে যুদ্ধের জন্য প্রবেশ করেছে, কিংবা দারুল হারবে কোনো কিল্লা ঘেরাও করে রেখেছে, সে যদি অর্ধ মাস কিংবা এর চেয়েও বেশি সময় সেখানে থাকার নিয়ত করে, তবু সে মুসাফির থাকবে এবং নামাজ কসর পড়বে। কেননা, তখন তার অবস্থা থাকে অস্থির। কখন কোথায় যেতে হয় এর কোনো ঠিক নেই, তাই এ জায়গা তার জন্য অবস্থানস্থল হবে না। ফলত তার নিয়ত এতে ফলপ্রসূ হবে না। হ্যাঁ, যদি কোনো মুসলমান নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হারবের কোনো শহরে পনেরো দিন থাকার নিয়তে অবস্থান করে, তবে সে মুসাফির থাকবে না; বরং তাকে পূর্ণ নামাজই পড়তে হবে।

قَوْلُهُ أَوْ أَهْلَ الْبَغْيِ فِيْ دَارِنَا الخ : أَهْلُ الْبَغْيِ [রাষ্ট্রদ্রোহী] ঐ সকল লোক যারা দারুল ইসলামে মুসলিম আমীরে অনুসরণ না করে; বরং অবাধ্যতা করে। উদ্দেশ্য হচ্ছে– মুসলিম সৈনিকেরা যদি দারুল ইসলামে রাষ্ট্রদ্রোহীদের এক গ্রুপকে বন্দি করে রাখে, তবুও তারা মুসাফির থাকবে। তাদের পনেরো দিন কিংবা এর চেয়ে অধিক সময় থাকার নিয়ত সহীহ হবে না। কারণ তাদের অবস্থা فِرَارٌ [অস্থায়ী] ও قَرَارٌ [স্থায়ী]-এর মাঝামাঝি থাকে। কখন তাদের কোথায় যেতে হবে? এর কোনো খবর নেই। অনুরূপ ঐ লোকও সর্বদা মুসাফির থাকবে, যে জাহাজে চাকরি করে। সে সর্বদাই এ আশঙ্কায় থাকে যে, আজ কিংবা কাল কিংবা পরশু হয়তো সফরের হুকুম শুরু হয়ে যাবে এবং এখান থেকে রওয়ানা হয়ে চলে যেতে হবে। উল্লিখিত লোকসকল পনেরো কিংবা এর চেয়ে অধিক সময় থাকার নিয়ত করলেও তারা মুকীম হবে না; বরং মুসাফিরই থাকবে। তাই তারা কসরই পড়বে।

لَا أَهْلُ أَخْبِيَةٍ نَوَوْهَا فِي الْأَصَحِّ أَيْ لَا يَقْصُرُ أَهْلُ أَخْبِيَةٍ نَوَوْا إِقَامَةَ نِصْفِ شَهْرٍ فِي أَخْبِيَتِهِمْ لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ تَصِحُّ مِنْهُمْ فِي الصَّحْرَاءِ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ أَصْلٌ فَلَا تَبْطُلُ بِانْتِقَالِهِمْ مِنْ مَرْعًى إِلَى مَرْعًى هٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ وَقِيْلَ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ إِقَامَتِهِمْ فَإِنَّ الْإِقَامَةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا فِي الْأَمْصَارِ أَوِ الْقُرٰى وَلَفْظُ الْمُخْتَصَرِ وَبِصَحْرَاءِ دَارِنَا وَهُوَ خَبَائِيٌّ لَا بِدَارِ الْحَرْبِ أَوِ الْبَغْيِ مُحَاصِرًا كَمَنْ طَالَ مَكْثُهُ بِلَا نِيَّةٍ أَيْ يَقْصُرُ الرُّبَاعِيَّ إِلَى أَنْ يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ بِصَحْرَاءِ دَارِنَا وَالْحَالُ أَنَّهُ خَبَائِيٌّ أَيْ مِنْ أَهْلِ الْخِبَاءِ وَهُوَ الْخَيْمَةُ فَإِنَّهُ لَا يَقْصُرُ فَإِنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ مِنْهُمْ فِي صَحْرَاءِ دَارِنَا صَحِيْحَةٌ وَأَمَّا غَيْرُ أَهْلِ الْخِبَاءِ لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي صَحْرَاءِ دَارِنَا لَا تَصِحُّ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ حَاصَرَ أَهْلَ الْبَغْيِ فِي دَارِنَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ إِذَا كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ.

অনুবাদ : বিশুদ্ধ মাযহাব অনুযায়ী "আহলে খীমা" [তাঁবু কিংবা ক্যাম্প এর অধিবাসীগণ] নিজেরদের ক্যাম্পে যদি পনেরো দিন থাকার নিয়ত করে, তবে সে কসর পড়বে না। কেননা, ময়দানে তার অবস্থান (إِقَامَة) -এর নিয়ত সহীহ হয়। কারণ, ইকামত হচ্ছে মূল। সুতরাং এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে নিয়ত বাতিল হবে না। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কেউ বলেন, ক্যাম্পের অধিবাসীদের ইকামত করার নিয়তই সহীহ নয়। কেননা, শহরে কিংবা গ্রামে ব্যতীত ইকামতই সহীহ নয়। আর মুখতাসারুল কুদূরীর ইবারত হচ্ছে- وَبِصَحْرَاءِ دَارِنَا وَهُوَ خَبَائِيٌّ لَا بِدَارِ الْحَرْبِ أَوِ الْبَغْيِ مُحَاصِرًا لِمَنْ طَالَ مَكْثُهُ بِلَا نِيَّةٍ অর্থাৎ মুসাফির ব্যক্তি চার রাকাত নামাজকে কসর পড়বে এ পর্যন্ত যে, যদি দারুল ইসলামের মরুভূমিতে সে ইকামতের নিয়ত করে, তবে সে কসর করবে না। এমতাবস্থায় যদি সে ক্যাম্পের অধিবাসী হয়। কারণ, দারুল ইসলামে তার ইকামতের নিয়ত সহীহ হয়। কিন্তু যদি ক্যাম্পের অধিবাসী ভিন্ন কোনো লোক দারুল ইসলামের মরুভূমিতে ইকামতের নিয়ত করে, তবে তা সহীহ হবে না। অতএব, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা রাষ্ট্রদ্রোহীদেরকে দারুল ইসলামে আটক করে রেখেছে, তাদের ইকামতের নিয়ত সহীহ হবে না, যখন সে মরুভূমিতে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا أَهْلُ أَخْبِيَةٍ نَوَوْهَا : خَيْبَةٌ শব্দটি خَبَائِيٌّ -এর বহুবচন। অর্থ- তাঁবু। أَهْل خَيْبَة ঐ সমস্ত লোক- যারা মরুভূমিতে তাঁবু টানিয়ে অস্থায়ী ঘর বানিয়ে থাকে। যদি তারা ইকামতের নিয়ত করে, তবে তাদের নিয়ত সহীহ হবে এবং তারা কসর করবে না। কেননা, তাদের অভ্যাসই হচ্ছে মরুভূমিতে থাকা। তাই সেখানে তাদের ইকামত এমন হবে, যেমন পল্লীর অধিবাসী পল্লীতে বসবাস করে। গ্রন্থকার فِي الْأَصَحِّ বলে মূলত এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, أَهْل خَيْبَة ইকামতের নিয়ত করলে নিয়ত সহীহ হবে কি হবে না- এ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, শহর কিংবা গ্রাম ব্যতীত অন্য কোথাও ইকামতের নিয়ত করলে নিয়ত সহীহ হয় না।

قَوْلُهُ هٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ : মাবসূত নামক গ্রন্থের বরাত দিয়ে "কিফায়াহ" নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, أَهْل خَبْيَة জীবনে কখনো মুকীম হয় না; বরং সর্বদা সে মুসাফিরই থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হলো তারা মুকীম হবে। এর কারণ দুটি– ১. ইকামত হলো মূল, আর সফর হচ্ছে عَارِضِىٌّ [অস্থায়ী] বিষয়। তাদের এ অবস্থাকে ইকামতের উপর প্রয়োগ করা উত্তম। ২. সফরের উদ্দেশ্য হচ্ছে– মুসাফির সফরের নির্ধারিত সময়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে, তাহলে এমতাবস্থায় তাকে মুকীম বলাই উচিত। অন্যথায় সে কখনো সফরের সময়সীমার নিয়ত করবে না; বরং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সে ঘুরতেই থাকবে। তাই এমতাবস্থায় তাকে মুকীম-এর হুকুম দেওয়াই উত্তম।

قَوْلُهُ لَفْظُ الْمُخْتَصَرِ وَبِصَحْرَاءِ الخ : এর পূর্ণ ইবারত হলো–

اَلْمُسَافِرُ مَنْ فَارَقَ بُيُوْتَ بَلَدِهٖ قَاصِدًا مَسَافَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا بِسَيْرٍ وَسَطٍ وَهُوَ مَا سَارَ الْإِبَلُ وَالرَّاجِلُ وَالْفُلْكُ إِذَا اعْتَدَلَتِ الرِّيْحُ وَيَلِيْقُ بِالْخَيْلِ فَيَقْصُرُ الرُّبَاعِىَ إِلٰى اَنْ يَدْخُلَ بُيُوْتَ بَلَدِهٖ أَوْ يَنْوِىَ اِقَامَةَ نِصْفِ شَهْرٍ بِبَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ بِصَحْرَاءِ دَارِنَا وَهُوَالْخَبَائِىُّ الخ ـ

অর্থাৎ মুসাফির ঐ ব্যক্তি, যে তিনদিন ও তিনরাত পরিমাণ দূরত্ব সফর করার নিয়তে নিজের শহরের বসতি ছেড়ে বাইরে চলে যায়। উট কিংবা পায়ে হেঁটে চলার ক্ষেত্রে মধ্যম গতির তিনদিন ও তিনরাতের দূরত্ব, কিংবা মধ্যম গতির বাতাসে চলা নৌকার তিনদিন ও তিনরাতের দূরত্ব, কিংবা যে সওয়ারি এর উপযোগী হবে। মুসাফির চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজকে নিজের শহরের বাসস্থানে ফিরে আসা পর্যন্ত কসর করবে। কিংবা কোনো শহর অথবা কোনো গ্রামে কিংবা কোনো দারুল ইসলামের কোনো মরুভূমিতে অর্ধ মাস পর্যন্ত ইকামতের নিয়ত করা পর্যন্ত কসর করবে। মরুভূমিতে অর্ধ মাস থাকার নিয়তে কসর করবে না; পক্ষান্তরে এর কম সময় হলে কসর করবে।

قَوْلُهُ وَهُوَ خَبَائِىٌّ لَا بِدَارِ الخ : خَبَائِىٌّ অর্থাৎ যারা দারুল ইসলামের মরুভূমিতে তাঁবুতে জীবনযাপন করে। "জামেউর রুমূয" নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, خَبَائِىٌّ ঐ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত যারা মরুভূমিতে জীবনযাপন করে। যেমন– পল্লী অঞ্চলের লোক, তুর্কি ও কুর্দি গোত্রের লোক এবং চারণভূমিতে চারক লোক প্রমুখ। তারা কসর করবে না; বরং পূর্ণ নামাজ পড়বে। যেরূপ বলেছেন مُتَأَخِّرِيْن ওলামায়ে কেরামের মধ্য হতে কতিপয় ওলামায়ে কেরাম। কারণ, তারা এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমির দিকে স্থানান্তর হতে থাকে। আর অন্য একটি অভিমত হচ্ছে– তারাও কসর করবে। কারণ, সেটি ইকামত করার জায়গা নয়। আল্লামা কিরমানী (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী প্রথম অভিমতটি বিশুদ্ধ এবং এরই উপর ফতোয়া।

لَا بِدَارِ الْحَرْبِ বলার দ্বারা বুঝা যায় যে, উল্লিখিত হুকুমগুলো দারুল ইসলামের সংশ্লিষ্ট– দারুল হারবের সাথে নয়। আল্লামা বরজুন্দী (র.) বলেন, কসর করবে না। কিন্তু যদি দারুল হারবে ইকামতের নিয়ত করে, কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহীদের অবরোধ করে রাখে, তবে তারা কসর করবে। সেথায় কসর করার দ্বারা এটাও জানা যায় যে, অবরুদ্ধ রাষ্ট্রদ্রোহীদের জন্য কসর করা জায়েজ নেই। তাহাবী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে মূল হচ্ছে– যদি এমন জায়গায় ইকামতের নিয়ত করে– যেখানে স্বেচ্ছায় ইকামতের নিয়ত করা সম্ভব, তবে তাকে মুকীম মনে করা হবে; অন্যথায় নয়। এখন যদি দারুল হারবে মুসলমানগণ কোনো শহর অবরোধ করে রাখে এবং কোনো কোনো কাফিরের ঘরে প্রবেশ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে শুরু করে এবং সেখানে ইকামতের নিয়ত করে, তবে এ নিয়ত সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ كَمَنْ طَالَ مَكْثُهُ بِلَا نِيَّةِ الخ : এ ইবারতের সম্পর্ক পূর্বের ইবারতের মাফহুম (مَفْهُوم) -এর সাথে। অর্থাৎ অবরোধকারীর নিয়ত এই ছিল যে, পনেরো দিনের পূর্বে সেখান থেকে বের হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অবরোধ দীর্ঘ হয় এবং ইকামতের নিয়ত ব্যতীতই দীর্ঘ হয়, তবে কসর করতে থাকবে।

وَقَوْلُهُ لَا بِدَارِ الْحَرْبِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ بِصَحْرَاءِ دَارِنَا فَإِنَّهُ جَعَلَ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ فِىْ صَحْرَاءِ دَارِنَا غَايَةً لِلْقَصْرِ وَحُكْمُ الْغَايَةِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْمُغَيَّا فَيَكُوْنُ حُكْمُهُ عَدَمُ الْقَصْرِ ثُمَّ قَوْلُهُ لَا بِدَارِ الْحَرْبِ مُحَاصِرًا نَفْىٌ لِذٰلِكَ النَّفْىِ فَيَكُوْنُ حُكْمُهُ الْقَصْرُ اَىْ يَقْصُرُ اِنْ نَوٰى اِقَامَةَ نِصْفِ شَهْرٍ بِدَارِ الْحَرْبِ اَوِ الْبَغْىِ مُحَاصِرًا وَقَوْلُهُ كَمَنْ طَالَ مَكْثُهُ بِلَا نِيَّةٍ لِمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهٖ لَا بِدَارِ الْحَرْبِ حُكْمُ الْقَصْرِ قَالَ كَمَنْ طَالَ مَكْثُهُ اَىْ يَقْصُرُ مَنْ طَالَ مَكْثُهُ فِىْ بَلْدَةٍ اَوْ قَرْيَةٍ بِلَا نِيَّةِ الْمَكْثِ.

অনুবাদ : গ্রন্থকারের কথা لَا بِدَارِ الْحَرْبِ -এর عَطْف হয়েছে صَحْرَاءُ دَارِنَا -এর উপর। কেননা, نِيَّةُ الْاِقَامَةِ فِىْ صَحْرَاءِ دَارِنَا -কে কসরের غَايَة সাব্যস্ত করেছেন। আর غَايَة -এর হুকুম مُغَيَّا -এর হুকুমের পরিপন্থি হয়। তাই مُغَيَّا -এর হুকুম হচ্ছে কসর না করা। অতঃপর তার কথা لَا بِدَارِ الْحَرْبِ مُحَاصِرًا এই نَفْىْ -এর- نَفْىْ করা হয়েছে। সুতরাং এর হুকুম হবে কসর করা। অর্থাৎ যদি দারুল হারবে অর্ধ মাস ইকামত করার নিয়ত করে, কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহীদের আটক করে রাখে তবে কসর করবে। গ্রন্থকারের কথা لَا بِدَارِ الْحَرْبِ দ্বারা যখন কসরের হুকুম বুঝা গেছে, তখন গ্রন্থকার বললেন, كَمَنْ طَالَ مَكْثُهُ بِلَا نِيَّةٍ অর্থাৎ কোনো শহর কিংবা গ্রামে ইকামত করার নিয়ত ব্যতীত যার অবস্থান দীর্ঘ হয়ে গেছে, সে কসর করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنَّهُ جَعَلَ نِيَّةَ الْاِقَامَةِ الخ : অর্থাৎ প্রথমে একথা বলা হয়েছে– فَيَقْتَصِرُ الرُّبَاعِىْ اِلٰى اَنْ يَدْخُلَ الخ এভাবে কসরের শেষ সীমা এই বলা হয়েছে যে, নিজের শহরে প্রবেশ করবে, কিংবা কোনো শহর বা গ্রামে ইকামতের নিয়ত করবে, কিংবা আমাদের মরুভূমিতে ইকামতের নিয়ত করবে, যখন সে خَبَائِىْ হবে এবং এটি স্পষ্ট যে, غَايَة -এর হুকুম مُغَيَّا -এর হুকুমের বিপরীত হয়। এখন এর সারমর্ম হচ্ছে– শহরে প্রবেশকারী এবং কোনো গ্রামে কিংবা শহরে কিংবা আমাদের দারুল হারবের কোনো মরুভূমিতে ইকামতের নিয়ত করে, তবে সে কসর করবে না।

قَوْلُهُ نَفْىٌ لِذٰلِكَ النَّفْىِ الخ : এর সারসংক্ষেপ হচ্ছে– পূর্বোল্লিখিত আলোচনা সাপেক্ষে যদি কেউ ইকামতের নিয়ত করে, তবে তার জন্য কসর না করা সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের দারুল ইসলামে أَهْل خِيْمَة কসর করবে না। আর এখন لا بِدَارِ الْحَرْبِ বলে لَا يَقْصُرُ فِىْ صَحْرَاءِ دَارِنَا -এর উপর عَطْف করে পূর্বের نَفْىْ -কে نَفْىْ করা হয়েছে। কায়দা আছে যে, نَفْىْ -কে نَفْىْ করার দ্বারা اِثْبَاتْ প্রমাণিত হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে দারুল হারবে অবরোধকারী কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহীদের অবরোধকারী কসর করবে।

قَوْلُهُ فِىْ بَلْدَةٍ اَوْ قَرْيَةٍ الخ : শহর এবং গ্রামের কথা এজন্য উল্লেখ করেছেন যে, এ দুই জায়গায় অবস্থান করার দ্বারা মনে হয় যে, সম্ভবত এতে কসর করতে হবে না। এ সন্দেহকে দূর করার লক্ষ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইকামতের নিয়ত ব্যতীত যদি দীর্ঘ সময়ও অবস্থান করে তবু কসর করবে। আর মরুভূমিতে অবস্থানকালে কসর করার বিষয়টিতো একটি স্পষ্ট মাসআলা।

فَلَوْ اَتَمَّ مُسَافِرٌ وَقَعَدَ فِي الْأُوْلٰى تَمَّ فَرْضُهٗ وَاَسَاءَ لِتَاخِيْرِ السَّلَامِ وَشُبْهَةِ عَدَمِ قَبُوْلِ صَدَقَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا زَادَ نَفْلٌ وَاِنْ لَمْ يَقْعُدْ بَطَلَ فَرْضُهٗ لِتَرْكِ الْقَعْدَةِ وَهِيَ فَرْضٌ عَلَيْهِ مُسَافِرٌ اَمَّهٗ مُقِيْمٌ يُتِمُّ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهٗ لَا يَؤُمُّهٗ اِذْ فِي الْوَقْتِ يَصِيْرُ فَرْضُهٗ اَرْبَعًا بِالتَّبْعِيَّةِ وَبَعْدَ الْوَقْتِ لَا يَتَغَيَّرُ فَرْضُهٗ اَصْلًا وَفِيْ عَكْسِهٖ اَيْ فِيْ اِمَامَةِ الْمُسَافِرِ الْمُقِيْمَ قَصَرَ الْمُسَافِرُ وَاَتَمَّ الْمُقِيْمُ وَيَقُوْلُ نَدْبًا اَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ فَاِنِّيْ مُسَافِرٌ وَيُبْطِلُ الْوَطَنَ الْاَصْلِيْ مِثْلُهٗ لَا السَّفَرُ وَ وَطَنَ الْاِقَامَةِ مِثْلُهٗ وَالسَّفَرُ وَالْاَصْلِيْ اَلْوَطَنُ الْاَصْلِيْ هُوَ الْمَسْكَنُ وَ وَطَنُ الْاِقَامَةِ هُوَ مَوْضِعٌ نَوٰى اَنْ يَسْتَقِرَّ فِيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتَّخِذَهٗ مَسْكَنًا فَاِذَا كَانَ لِلْاِنْسَانِ وَطَنٌ اَصْلِيٌّ ثُمَّ اتَّخَذَ مَوْضِعًا اٰخَرَ وَطَنًا اَصْلِيًّا سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَهُمَا مُدَّةُ السَّفَرِ اَوْ لَمْ يَكُنْ يَبْطُلُ الْوَطَنُ الْاَصْلِيُّ الْاَوَّلُ حَتّٰى لَوْ دَخَلَهٗ لَا يَصِيْرُ مُقِيْمًا اِلَّا بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ ۔

অনুবাদ : মুসাফির যদি পূর্ণ নামাজ পড়ে এবং প্রথম বৈঠক করে, তবে তার ফরজ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সালামকে বিলম্বিত করা ও আল্লাহর সদকাকে কবুল না করার সন্দেহের কারণে সে গুনাহগার হবে। দুই রাকাতের অধিক যা হয়েছে তা নফলে পরিণত হয়ে যাবে। আর যদি প্রথম বৈঠক না করে থাকে তবে তার ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, সে প্রথম বৈঠক বর্জন করেছে। অথচ প্রথম বৈঠক তার জন্য ফরজ ছিল। মুসাফির ব্যক্তি যদি নামাজের ওয়াক্তে মুকীমের ইকতিদা করে, তবে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে। আর ওয়াক্তের পরে ইকতিদা করবে না। কেননা, নামাজের ওয়াক্তে মুসাফিরের নামাজ ইমামের অনুসরণ করার কারণে চার রাকাত হয়ে যায়। আর ওয়াক্তের পরে ফরজ নামাজ মোটেও পরিবর্তন হয় না। এর বিপরীত সূরতে তথা মুসাফির মুকীমের ইমামতি করা মুসাফির কসর করবে এবং মুকীম পূর্ণ নামাজ আদায় করবে। মোস্তাহাব হচ্ছে− মুসাফির [ইমাম] বলবে যে, আপনার নিজ নিজ নামাজ পরিপূর্ণ করে নিন। কারণ, আমি মুসাফির। ওয়াতনে আসলী (وَطَن أَصْلِيْ) -কে অনুরূপ وَطَن أَصْلِيْ বাতিল করে দেয়; সফর নয়। وَطَنُ الْاِقَامَةِ -কে অনুরূপ وَطَنُ الْاِقَامَةِ ও وَطَن أَصْلِيْ বাতিল করে দেয়। وَطَن أَصْلِيْ হচ্ছে− বাসস্থান। আর وَطَنُ الْاِقَامَةِ হচ্ছে− এমন জায়গা যা বাসস্থান বানানো ব্যতীতই সেখানে পনেরো দিন কিংবা এর চেয়ে বেশি সময় অবস্থান করার নিয়ত করেছে। যদি কোনো ব্যক্তির একটি وَطَن أَصْلِيْ থাকে, অতঃপর অন্য জায়গাকে সে وَطَن أَصْلِيْ বানিয়ে নেয়, তবে প্রথম وَطَن أَصْلِيْ বাতিল হয়ে যাবে, চাই উভয় জায়গার মাঝে সফরের দূরত্ব পরিমাণ হোক কিংবা না হোক। এমনকি যদি প্রথম وَطَن أَصْلِيْ -তে প্রবেশ করে, তবে ইকামতের নিয়ত করা ব্যতীত সে মুকীম হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَلَوْ اَتَمَّ مُسَافِرًا وَ قَعَدَ الخ : ফুকাহায়ে কেরামের এতে মতানৈক্য রয়েছে যে, নামাজে কসর করা عَزِيْمَة [বাধ্যতামূলক] না رُخْصَة [ইচ্ছাধীন]। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ−

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আহনাফ বলেন, মুসাফিরের জন্য চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের দুই রাকাত ফরজ। দুই রাকাত পড়াই জরুরি। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুসাফিরের জন্য চার রাকাত নামাজই ফরজ। তবে দুই রাকাত পড়া তার জন্য رُخْصَةٌ তথা পড়ার অনুমতি আছে, কিন্তু চার রাকাত পড়াই উত্তম। আমাদের মতে যদি সে চার রাকাত পড়ে তবে গুনাহগার হবে।

بَيَانُ الْأَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ .

অর্থাৎ "যখন তোমরা জমিনে সফরে বের হবে তখন নামাজকে কসর করতে তোমাদের জন্য কোনো অসুবিধা নেই।" وَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ এভাবে যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ جُنَاحٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ– অসুবিধা, সমস্যা। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিষয়টি مُبَاحٌ [মুবাহ], ওয়াজিব নয়।

আহনাফের দলিল–

১. হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ فِى السَّفَرِ وَ زِيدَتْ فِى الْحَضَرِ .

অর্থাৎ "নামাজ দুই রাকাত ফরজ হয়েছে। সফরে তা স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে। আর হযর (إِقَامَة) -এ তাতে বৃদ্ধি করা হয়েছে।" –[বুখারী ও মুসলিম]

২. অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে–

فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلَاةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِى الْحَضَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ .

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর ভাষ্যে ইকামত অবস্থায় চার রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন এবং সফর অবস্থায় দুই রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন।" –[মুসলিম]

৩. অপর এক হাদীস হযরত ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الضُّحٰى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

অর্থাৎ "সফরের নামাজ দুই রাকাত, চাশতের নামাজ দুই রাকাত, ঈদুল ফিতরের নামাজ দুই রাকাত এবং জুমার নামাজ দুই রাকাত। এগুলো পরিপূর্ণ নামাজ, অর্ধেক নামাজ নয়।" উল্লিখিত হাদীসসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসাফিরের জন্য দুই রাকাত নামাজই ফরজ। দুই রাকাত পড়াই তার জন্য আবশ্যক। চার রাকাত পড়া উত্তম নয়।

بَيَانُ الْأَجْوِبَةِ : আয়াতে جُنَاحٌ শব্দ ব্যবহার করার দ্বারা এ কথা বুঝায় না যে, সে দুই রাকাত পড়ার দ্বারা গুনাহগার হবে না। কেননা, সাফা-মারওয়া সা'য়ী করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ جُنَاحٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেখানে সাফা-মারওয়া সা'য়ী করা হজের رُكْن সা'য়ী না করলে হজ হবে না। যেরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا .

অতএব, جُنَاحٌ শব্দ দ্বারা যদি শুধু মুবাহ প্রমাণিত হতো তবে সাঈ হজের রুকুন প্রমাণিত হতো না।

–[এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– বাদায়িস সানায়ে' পৃ. ২৫৭, বাহরুর রায়িক– খ. ২, পৃ. ২২৯]

قَوْلُهُ وَشُبْهَةِ عَدَمِ قَبُولِ الخ : ইমাম মুসলিম ও আসহাবে সুনান-এর নিকট একটি হাদীস হযরত ইয়া'লা (রা.)-এর দিকে সম্পর্কিত করে উল্লেখ করা হয়, তিনি বলেন, আমি নামাজ কসর করার আয়াত পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে, وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا আয়াত দ্বারা কসরের হুকুম অনুমোদিত হয়েছে। অর্থাৎ "যদি তোমাদের কাফেরদের ভয় হয়, তবে তোমরা কসর করবে।" অথচ এখন তো তারা আমাদের সাথে আছে, তবে তারা এখন কেন কসর করবে? হযরত ওমর (রা.) বলেন– عَجِبْتَ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ

অর্থাৎ "তুমি আশ্চর্য ধরনের কথা বলছ! আমি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সদকা। আল্লাহ তোমাদের উপর সদকা করেছেন। তোমরা তাঁর সদকা কবুল কর।"

قَوْلُهُ مُسَافِرٌ اَمَّهُ مُقِيْمٌ يُتِمُّ الخ : অর্থাৎ যদি কোনো মুসাফির ব্যক্তি কোনো মুকীমের পিছনে ইকতিদা করে, তবে মুসাফির- ইমামের অনুসরণ করত পূর্ণ নামাজই পড়বে। চাই ইমাম পূর্ব থেকেই মুকীম থাকুক কিংবা মুসাফির ছিল, কিন্তু নামাজের মাঝে ইকামতের নিয়ত করেছে। আর মুসাফির চাই পূর্ণ নামাজেই শরিক হোক কিংবা নামাজের মধ্যখানে শরিক হোক। এমনকি যদি সে শেষ বৈঠকে গিয়ে ইমামের ইকতিদা করে, তবু তার ইমামের অনুসরণ করত নামাজ শেষ করতে হবে। অর্থাৎ নামাজ চার রাকাতই পড়তে হবে। তবে শর্ত হলো– উক্ত নামাজ ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে। যদি এমন হয় যে, ইমাম মুক্তাদী উভয়ের নামাজ কাজা হয়ে গেছে। তবে এমতাবস্থায় মুসাফির ইমামের ইকতিদা করতে পারবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, "নামাজের ওয়াক্তে মুসাফির নামাজে ইমামের ইকতিদার কারণে নামাজ চার রাকাত হয়ে যায়। কিন্তু যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তবে নামাজ দুই রাকাতই থেকে যায় এবং এতে কোনো প্রকার কোনো পরিবর্তন আসে না। তাই ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর কোনো মুসাফির কোনো মুকীম ইমামের ইকতিদা করবে না।

আর যদি ইমামের ক্ষেত্রে এমন হয় যে, সে আদা (أداء) নামাজ পড়ছে এবং মুক্তাদী কাজা পড়ছে, তবে তার ইকতিদা সহীহ হবে। এর সুরত এরূপ যে, একজন মুকীম ব্যক্তি জোহরের শেষ ওয়াক্তে নামাজ পড়তে শুরু করল এবং এক রাকাত পড়া মাত্রই ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেছে, এখন একজন মুসাফির এসে তার ইকতিদা করল, তবে এটি মুসাফিরের ক্ষেত্রে কাজা নামাজ হয়ে গেছে, কিন্তু মুকীমের ক্ষেত্রে এটি কাজা নামাজ হয়নি। তাই তার ইকতিদা করা সহীহ হবে।

قَوْلُهُ لَا يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ أَصْلًا : অর্থাৎ ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার দ্বারা মুসাফিরের নামাজের মাঝে কোনো পরিবর্তন আসে না। কারণ, নামাজের سَبَبْ [কারণ] হচ্ছে ওয়াক্ত। আর ওয়াক্তের মধ্যে হওয়ার কারণে ইমামের ইকতিদা করা তার জন্য সহীহ ছিল। ইমামের অনুসরণে মুসাফিরের নামাজ পরিবর্তন হয়ে দুই রাকাতের স্থলে চার রাকাত হয়ে গেছে। এখন যেহেতু ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে গেছে, সেহেতু নামাজ আর পরিবর্তন হবে না; বরং দুই রাকাতই থাকবে। এমতাবস্থায় যদি ইমামের পিছনে ইকতিদা করে, তবে ইমামের প্রথম বৈঠক ইমামের জন্য নফল হয়, আর মুসাফিরের জন্য হয় ফরজ। তাই এটি নফল আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে ফরজ আদায়কারীর ন্যায় হয়ে যাচ্ছে। ফলত উক্ত ইকতিদা জায়েজ হবে না।

وَطَن أَصْلِيٌ ও وَطَن إِقَامَة : "গানিয়্যাহ" নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, وَطَنْ তিন প্রকার– ১. وَطَن أَصْلِيٌ ২. وَطَن إِقَامَة ৩. وَطَن سَفَر । وَطَن أَصْلِيٌ হচ্ছে– যেখানে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং জীবনযাপন করে কিংবা অন্য কোনো জায়গা যেখানে সে বসবাস করার উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণরূপে নির্ধারণ করে নিয়েছে। এরূপ নয় যে, সে কিছুদিন সেখানে বসবাস করে পয়সা উপার্জন করে অতঃপর অন্য জায়গায় চলে যাবে। যদি কারো পিতামাতা তার জন্মস্থানে না থাকে; বরং অন্য কোনো জায়গা বা শহরে বসবাস করে এবং সে নিজে প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং সেখানে তার পরিবারবর্গ না থাকে, তবে সেটি তার জন্য وَطَن أَصْلِيٌ হবে না।

মাবসূত নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যেখানে জীবনযাপন করে, কিংবা বাসস্থান বানিয়ে নিয়েছে, কিংবা সেখানে পরিবারবর্গ বানিয়ে নিয়েছে– তবে সেটিই হবে তার জন্য وَطَن أَصْلِيٌ। সুতরাং যদি কেউ ঐ শহরে থাকার ইচ্ছা করে যেখানে তার পিতামাতা থাকে এবং নিজের প্রথম জন্মস্থান ছেড়ে দেয়, তবে এটিই তার জন্য وَطَن أَصْلِيٌ হয়ে যাবে। যদি কোনো মুসাফির কোনো শহরে বিয়ে করে, কিন্তু সেখানে থাকার (إِقَامَةٌ-এর) নিয়ত করেনি, তবে এক অভিমত অনুযায়ী সে মুকীম হবে না। অপর অভিমত অনুযায়ী সে মুকীম হয়ে যাবে। এ দ্বিতীয় অভিমতই বিশুদ্ধ ও অগ্রগণ্য। যদি দুই শহরে দুই স্ত্রী বসবাস করে, তবে সে যে শহরেই যাবে মুকীম থাকবে। যদি এক শহরের স্ত্রী মারা যায় এবং ঐ স্বামীর এ শহরে কোনো বাড়ি বা ভূমি থাকে, তবে এক অভিমত অনুযায়ী সেটি তার وَطَن থাকবে। অপর অভিমত অনুযায়ী তা তার জন্য وَطَن থাকবে না। কিন্তু وَطَنْ বাকি থাকাটাই বিশুদ্ধ বলে মনে হয়।

আর وَطَن إِقَامَةٌ হচ্ছে– মুসাফির সফর করে যেখানে যায় এবং ন্যূনতম পনেরো দিন সেখানে থাকার নিয়তে অবস্থান করে। সেটি তার জন্মস্থানও নয় এবং তার পরিবারবর্গের বসবাসস্থলও নয়। যদিও এটি তার প্রথম وَطَن أَصْلِيٌ ছিল, তবুও এটি তার জন্য وَطَن إِقَامَةٌ হিসেবে বিবেচিত হবে। وَطَن سَفَرْ হচ্ছে– যেখানে পনেরো দিনের কম সময়ের নিয়তে অবস্থান করবে। যদিও তা হয় এক ঘণ্টার জন্য, কিংবা এর চেয়েও কম হয়।

قَوْلُهُ وَيُبْطِلُ الْوَطَنَ الْأَصْلِيُّ الخ : ঐ ঘটনা এর উপর বুঝায়– যখন রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম মক্কা বিজয় ও বিদায় হজের সময় মক্কায় প্রবেশ করেছেন– তখন তারা কসর করেছেন। অথচ মক্কা তাঁদের জন্মস্থান। এটি তাঁদের বসবাসস্থলও ছিল। কিন্তু তাঁরা সেখান থেকে হিজরত করে মদীনাকে বাসস্থান বানিয়ে নিয়েছেন।

لٰكِنْ لَا يَبْطُلُ الْوَطَنُ الْاَصْلِىُّ بِالسَّفَرِ حَتّٰى لَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ الْوَطَنَ الْاَصْلِىَّ يَصِيْرُ مُقِيْمًا بِمُجَرَّدِ الدُّخُوْلِ وَاَمَّا وَطَنُ الْاِقَامَةِ فَاِنَّهُ يَبْطُلُ بِوَطَنِ الْاِقَامَةِ فَاِنَّهُ اِذَا كَانَ لَهُ وَطَنُ الْاِقَامَةِ ثُمَّ اتَّخَذَ مَوْضِعًا اٰخَرَ وَطَنَ الْاِقَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُدَّةُ سَفَرٍ لَمْ يَبْقَ الْمَوْضِعُ الْاَوَّلُ وَطَنَ الْاِقَامَةِ حَتّٰى لَوْ دَخَلَهُ لَا يَصِيْرُ مُقِيْمًا اِلَّا بِالنِّيَّةِ وَكَذَا اِنْ سَافَرَ عَنْهُ وَكَذَا اِنِ انْتَقَلَ اِلٰى وَطَنِهِ الْاَصْلِىِّ وَالسَّفَرُ وَضِدُّهُ لَا يُغَيِّرَانِ الْفَائِتَةَ اَىْ اِذَا قَضٰى فَائِتَةَ السَّفَرِ فِى الْحَضَرِ يَقْصُرُ وَاِنْ قَضٰى فَائِتَةَ الْحَضَرِ فِى السَّفَرِ يُتِمُّ ـ

অনুবাদ : কিন্তু সফরের কারণে وَطَن أَصْلِيْ বাতিল হয় না। এমনকি যদি সে সফর থেকে ফিরে এসে وَطَن أَصْلِيْ -তে প্রবেশ করে, তবে শুধু প্রবেশ করার দ্বারাই সে মুকীম হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে وَطَن اِقَامَة অন্য وَطَن اِقَامَة -এর মাধ্যমে বাতিল হয়ে যায়। কারণ, যখন তার একটি وَطَن اِقَامَة আছে, অতঃপর অন্য স্থানকে وَطَن اِقَامَة বানিয়েছে এবং উভয় وَطَنْ -এর মাঝে সফরের দূরত্ব না হয়, তবুও প্রথম وَطَن اِقَامَة বাকি থাকে না। এমনকি যদি প্রথম وَطَن اِقَامَة [এর মধ্যে আবার] প্রবেশ করেও তবুও ইকামতের নিয়ত করা ব্যতীত সে মুকীম হবে না। অনুরূপ যদি সেখান থেকেও সফর করে [তবুও বাকি থাকেব না]। অনুরূপ সেখান থেকে وَطَن أَصْلِيْ -এর দিকে রওয়ানা করার দ্বারাও وَطَن اِقَامَة বাতিল হয়ে যায়। সফর এবং এর বিপরীত বিষয় [তথা ইকামত] উভয়টি কাজা নামাজের মাঝে কোনো পরিবর্তন করে না। অর্থাৎ সফরের কাজা যদি হযর (حَضَرْ) -এ পড়ে, তবে কসরই পড়বে। আর যদি حَضَرْ -এর কাজা সফরে আদায় করে, তবে পূর্ণ পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنَّهُ يَبْطُلُ بِوَطَنِ الْاِقَامَةِ الخ : এর সুরত হচ্ছে, যেমন– কোনো ঢাকায় বসবাসকারী কুমিল্লা যায় এবং সেখানে পনেরো দিন কিংবা এর চেয়েও বেশি সময় অবস্থান করার নিয়ত করে, তবে সে পূর্ণ নামাজ পড়বে। অতঃপর কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম যায় এবং সেখানে পনেরো দিন কিংবা এর চেয়েও বেশি সময় থাকার নিয়ত করে তবে সেখানেও নামাজ পূর্ণ পড়বে। এখন সে নিজের বাসস্থল ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে এবং প্রথম وَطَن اِقَامَة কুমিল্লা পৌঁছেছে, কিন্তু এতে ইকামতের নিয়ত করেনি, তবে পূর্ণ নামাজ পড়বে না; বরং কসর পড়বে। কারণ, এটি তার وَطَن أَصْلِيْ নয়। তবে وَطَن اِقَامَة ছিল, যা এখন বাতিল হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُدَّةُ سَفَرٍ الخ : এটি قَيْد اِتِّفَاقِيْ কেননা, উভয় وَطَن اِقَامَة -এর মাঝে যদি সফরের দূরত্ব নাও হয়, তবুও প্রথম وَطَن اِقَامَة -কে ছেড়ে দ্বিতীয় وطن اقامة গ্রহণ করার দ্বারা প্রথমটি বাতিল হয়ে যায়। হ্যাঁ, যদি উভয় وَطَن -এর মাঝে সফরের দূরত্ব হয়, তবে শুধু সফরের মাধ্যমেই وَطَن اِقَامَة বাতিল হয়ে যাবে। চাই অন্য কোনো জায়গাকে وَطَن اِقَامَة বানানো হোক কিংবা না হোক। অনুরূপ যদি وَطَن أَصْلِيْ -এর দিকে রওয়ানা করে, তবুও وَطَن اِقَامَة বাতিল হয়ে যায়। এমনকি যদি ইকামতের নিয়ত ব্যতীত আবার ঐ وَطَن اِقَامَة -এর দিকে ফিরে যায়, তবুও সে মুসাফিরই থাকবে।

قَوْلُهُ اِذَا قَضٰى فَائِتَةَ السَّفَرِ الخ : অর্থাৎ যদি সফরে কোনো নামাজ কাজা হয়ে যায়, আর ইকামতের নিয়তের পর যদি সে তা কাজা করতে চায়, তবে দুই রাকাতই কাজা আদায় করবে। অনুরূপ যদি ইকামত অবস্থায় কাজা হওয়া নামাজ সফরে কাজা আদায় করতে চায়, তবে পূর্ণ চার রাকাতই আদায় করবে। কেননা, শুরু থেকেই তার উপর যত রাকাত নামাজ ফরজ হয়েছে, তত রাকাত নামাজই তাকে কাজা আদায় করতে হয়। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন, যখন অসুস্থ ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে নামাজে দাঁড়াতে পারে না, তখন সে বসে বসে আদায় করবে। কারণ, শুরু থেকেই তার উপর দাঁড়ানো, রুকু ও সিজদা ফরজ ছিল, যা অসুস্থতার কারণে তার থেকে রহিত হয়ে গেছে। এখন যেহেতু সে কারণ রহিত হয়ে গেছে, তাই পূর্ববর্তী বিধান আবার ফিরে আসবে। আর সুস্থ অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামাজকে যদি অসুস্থ অবস্থায় কাজা আদায় করতে চায়, তবে বর্তমানে সে যেভাবে আদায় করতে সক্ষম সেভাবে আদায় করবে।

بَابُ الْجُمُعَةِ

شَرْطُ لِوُجُوْبِهَا لَا لِأَدَائِهَا الْإِقَامَةُ بِمِصْرٍ وَالصِّحَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُوْرَةُ وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوْغُ وَسَلَامَةُ الْعَيْنِ وَالرِّجْلِ فَتَقَعُ فَرْضًا اِنْ صَلَّاهَا فَاقِدُهَا وَاِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَتَقَعُ فَرْضًا تَفْرِيْعٌ لِقَوْلِهِ لَا لِأَدَائِهَا ـ

পরিচ্ছেদ : জুমার নামাজ

অনুবাদ : জুমার নামাজ আদায়ের জন্য নয়; বরং ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে– মুকীম হওয়া, সুস্থ হওয়া, স্বাধীন হওয়া, পুরুষ হওয়া, জ্ঞানবান হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এবং চক্ষু ও পা সুস্থ থাকা। সুতরাং যার মাঝে উল্লিখিত সমস্ত শর্ত পাওয়া যাবে না– সে যদি জুমা পড়ে ফেলে, তবে তার ফরজ ওয়াক্ত আদায় হয়ে যাবে। যদিও তার উপর জুমার নামাজ ফরজ ছিল না। গ্রন্থকারের কথা– فَتَقَعُ فَرْضًا এটি তাঁর কথা لَا لِأَدَائِهَا -এর প্রাসঙ্গিক বিষয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : জুমার পরিচ্ছেদ ও মুসাফিরের পরিচ্ছেদের মাঝে মিল রয়েছে। কেননা, উভয়টির মধ্যে তানসীফ [সমানভাবে দুভাগে বিভক্তিকরণ] রয়েছে। তবে কসরের মধ্যে সফরের কারণে তানসীফ (تَنْصِيْف) করা হয়েছে, আর জুমার মধ্যে খুতবার কারণে তানসীফ করা হয়েছে। তবে সফর যেহেতু প্রত্যেক চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের জন্য ব্যাপক আর জুমার খুতবা শুধু জোহরের নামাজের তানসীফের জন্য খাস, আর খাসের আলোচনা যেহেতু عَامْ -এর পরে হয়, তাই সফরের নামাজের আলোচনা পূর্বে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ بَابُ الْجُمُعَةِ :

جُمُعَة শব্দের বিশ্লেষণ : جُمُعَةٌ শব্দটি اِجْتِمَاعٌ শব্দ থেকে নির্গত; যেমন– فِرْقَةٌ শব্দটি اِفْتِرَاقٌ শব্দ থেকে নির্গত। جُمُعَة শব্দের مِيْم অক্ষরে ضَمَّة [পেশ] এবং سُكُوْن [জযম]ও পড়া যায়। কেউ কেউ مِيْم -কে فَتْحَة [যবর] দিয়েও পড়েন। জুমাকে জুমা এ কারণে বলা হয় যে, সেদিন সমস্ত লোক জুমার নামাজ উপলক্ষে একত্রিত হয়। আর জুমা শব্দের অর্থও একত্রিত হওয়া।

জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার প্রমাণ : জুমার নামাজের فَرْضِيَّة কুরআন, হাদীস, ইজমা ও যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত।

❖ কুরআনে এসেছে– يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ

প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এ আয়াতে ذِكْرِ اللّٰهِ দ্বারা খুতবা উদ্দেশ্য। আর اِسْعَوْا আমরের সীগাহ, যা وُجُوْب -কে চায়। সুতরাং আয়াত দ্বারা খুতবার দিকে سَعِىْ ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। আর سَعْىٌ اِلَى الْخُطْبَةِ [জুমার দিকে সায়ী] জুমার নামাজের শর্তের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, যখন سَعْىٌ اِلَى الْجُمُعَةِ ওয়াজিব প্রমাণিত হলো– তখন মূল উদ্দেশ্য তথা জুমাতো অবশ্যই ওয়াজিব তথা ফরজ হবে। আর জুমার فَرْضِيَّة -কে আরো মজবুত করার জন্য ইরশাদ হয়েছে– وَ ذَرُوا الْبَيْعَ অর্থাৎ জুমার আজানের পর বেচাকেনাকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। অথচ বেচাকেনা একটি জায়েজ বস্তু। –[বাদায়িউস সানায়ে']

❖ হাদীস শরীফে রাসূল ﷺ বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا فِىْ يَوْمِىْ هٰذَا فِىْ شَهْرِىْ هٰذَا فِىْ سَنَتِىْ هٰذِهٖ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা জুমার নামাজ তোমাদের উপর ফরজ করেছেন– আমার এই দিবসে, আমার এই মাসে, আমার এই শহরে।" –[ইবনে মাজাহ]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে–

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةٌ مَمْلُوْكٌ اَوْ اِمْرَأَةٌ اَوْ صَبِىٌّ اَوْ مَرِيْضٌ ـ

অর্থাৎ "জুমার নামাজ প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামাতের সাথে আদায় করা হককে ওয়াজিব তথা ফরজ। তবে চার প্রকারের লোকের জন্য [ফরজ নয়] যথা– দাস, স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তি।" –[আবূ দাউদ শরীফ]

❖ জুমা ফরজ হওয়ার যৌক্তিক দলিল হলো, আমাদেরকে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য জোহরের নামাজকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে জোহরের নামাজ ফরজ। আর এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ফরজকে একমাত্র ফরজ দ্বারাই বাদ দেওয়া হয়; নফল দ্বারা নয়। সুতরাং এর দ্বারাও জুমার নামাজ ফরজ হওয়া প্রমাণিত হয়।

ইসলামে সর্বপ্রথম জামে মসজিদ : রাসূল ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তিনি কুবায় আমর ইবনে আউফের মহল্লায় চৌদ্দরাত অতিবাহিত করেছিলেন। ঐ সময় তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, যাকে ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। যাকে কুরআনে– لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। অতঃপর যখন তিনি কুবা থেকে মদিনার দিকে জুমার দিন রওয়ানা হলেন, তখন রাস্তায় সালিম ইবনে আতিকের মহল্লায় জুমার ওয়াক্ত হয়ে যায়। তখন তিনি সওয়ারি থেকে অবতরণ করে এ মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করেছেন, যা বতনে ওয়াদীতে অবস্থিত। এটি ইসলামে জুমা আদায়কারী সর্বপ্রথম মসজিদ ছিল। উক্ত জুমায় অনেক মুসলমান শরিক হয়েছিল।

জুমা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্তাবলি : সমস্ত নামাজ আদায়ের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, জুমার জন্যও সেসব শর্ত রয়েছে। যেমন– মুসলমান হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, পবিত্র হওয়া ইত্যাদি। তবে জুমা ওয়াজিব হওয়ার জন্য অতিরিক্ত কিছু শর্ত রয়েছে। যথা– ১. মুকীম হওয়া তথা মুসাফির না হওয়া, ২. শহর হওয়া, ৩. সুস্থ হওয়া, ৪. স্বাধীন হওয়া, ৫. পুরুষ হওয়া, ৬. চক্ষু ও পা ভালো থাকা ইত্যাদি। এ শর্তসমূহের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, উল্লিখিত শর্তাবলির বিপরীতে যারা আছে– তাদের উপর জুমা ওয়াজিব নয়। যেমন– ইকামতের শর্ত দ্বারা মুসাফির বাহির হয়ে গেছে। শহর হওয়ার শর্ত দ্বারা গ্রাম বাহির হয়ে গেছে যে, গ্রামে জুমা ওয়াজিব নয়। সুস্থ হওয়ার শর্ত দ্বারা অসুস্থ ব্যক্তি বাহির হয়ে গেছে। স্বাধীন হওয়ার শর্ত দ্বারা গোলাম ব্যক্তি বাহির হয়ে গেছে। পুরুষ হওয়ার শর্ত দ্বারা মহিলা বাহির হয়ে গেছে। বুদ্ধিমান হওয়ার শর্ত দ্বারা পাগল বাদ হয়ে গেছে। বালিগ হওয়ার শর্ত দ্বারা শিশু বালক বাহির হয়ে গেছে। চক্ষু সুস্থ হওয়ার শর্তের দ্বারা অন্ধ ব্যক্তি বাহির হয়ে গেছে। পা ভালো হওয়ার শর্তের দ্বারা লেংড়া বাহির হয়ে গেছে। কিন্তু গ্রাম্য, অসুস্থ, গোলাম, অন্ধ ও লেংড়া ব্যক্তির উপর যদিও জুমা ওয়াজিব নয়, তবুও জুমা পড়ার দ্বারা তাদের দায়িত্ব থেকে জোহর রহিত হয়ে যায়। অথচ তাদের উপর জোহর ফরজ ছিল. কিন্তু যদি জোহর পড়ে ফেলে, তবে এ জোহরই তাদের জোহরের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখা জরুরি যে, জুমার অধ্যায়ে শর্ত দুই ধরনের– ১. شَرْط وُجُوْب ২. شَرْط اَدَاء অতঃপর شَرْط وُجُوْب দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য এ শর্তাবলি পাওয়া যেতে হবে। উক্ত শর্তাবলি না পাওয়া গেলে জুমা ওয়াজিব হবে না। আর شَرْط اَدَاء দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– নামাজের আদায় সহীহ হওয়ার জন্য এ শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে অন্যথায় জুমার নামাজ আদায় করা হবে না। এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– شَرَائِط وُجُوْب যদি সবগুলো কিংবা কোনো একটি না পাওয়া যায়, তবে জুমার فَرْضِيَّة বাকি থাকবে না। কিন্তু যদি কেউ জুমা আদায় করে ফেলে, তবে সহীহ হয়ে যাবে পক্ষান্তরে شَرَائِط اَدَاء যদি না পাওয়া যায়, তবে কোনোভাবেই নামাজ সহীহ হবে না; বরং এ সুরতে জোহর পড়তে হবে।

مِصْر তথা শহর হওয়ার ব্যাখ্যা : যে সমস্ত শর্তের সাথে জুমা ফরজ, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে– ব্যক্তি শহরে হতে হবে। চাই সে শহরের অধিবাসী হোক কিংবা না হোক; বরং এমন গ্রামের বাসিন্দা হোক যেখানে জুমা ওয়াজিব নয়, সে যদি জুমার দিনে; বরং জুমার ওয়াক্তে শহরে উপস্থিত থাকে, তবে তার উপর জুমা ফরজ হবে। এর বিপরীত প্রক্রিয়ায় যদি কোনো শহরী ব্যক্তি গ্রামে যায়, তবে তখন তার উপর জুমা ওয়াজিব হবে না; বরং জোহরের নামাজ তার উপর আবশ্যক হবে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি শহরের ভিতরে তো নয়; বরং শহরের নিকটে থাকে, যেখানে জুমার আজান শুনা যায়, তবে তার উপরও জুমা ওয়াজিব হবে। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট এবং এরই উপর ফতোয়া। যখীরা ও তাতারখানিয়্যা নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি শহর ও তার মাঝে এক ফারসাখ (فَرْسَخْ) পরিমাণ দূরত্ব হয়, তবে তার উপর জুমা ফরজ হবে। 'মাওয়াহিবুর রহমান' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত অধিক সহীহ। তাঁর নিকট যদি এ পরিমাণ দূরত্ব হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি সফরের নিয়তে ঘর থেকে বের হয়, তবে যতটুকু দূর যাওয়ার পর তার উপর মুসাফিরের হুকুম দেওয়া হয় কিংবা সফর থেকে ফিরার পথে স্বীয় ঘরের যে পরিমাণ নিকটে পৌঁছলে তার উপর মুকীম হওয়ার হুকুম দেওয়া হয় শহর থেকে এতটুকু দূরত্বে যে হবে, তার উপর জুমা ওয়াজিব হবে; অন্যথায় নয়। 'মি'রাজুদ দিরায়াহ' নামক গ্রন্থে এ অভিমতকেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে।

صِحَّة বা সুস্থ হওয়ার মর্ম : জুমা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলির মাঝে একটি হচ্ছে সুস্থ হওয়া। অতএব, যদি অসুস্থ ব্যক্তি মসজিদ পর্যন্ত যেতে না পারে কিংবা যেতে পারে, তবে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে, তবে তার উপর জুমা ওয়াজিব হবে না। কারণ, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اِلَّا اَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَوْ اِمْرَأَةٌ اَوْ صَبِيٌّ اَوْ مَرِيْضٌ অর্থাৎ "জুমা প্রত্যেক মুসলমানের উপর একটি আবশ্যকীয় হক। তবে গোলাম, মহিলা, বাচ্চা ও অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতিক্রম।" –[আবূ দাউদ শরীফ]

অনুরূপ যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করে সে যদি নামাজে চলে যায়, তবে অসুস্থ ব্যক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় তবে এ সেবাকারীর উপরও জুমা ওয়াজিব নয়। অবশ্য এটি তখনই ধর্তব্য হবে, যখন অন্য কোনো সেবাকারী না থাকবে।

حُرِّيَة তথা আজাদ হওয়ার মর্ম : জুমা ওয়াজিব হওয়ার জন্য স্বাধীন হওয়াও শর্ত। তাই গোলাম-এর উপর জুমা ওয়াজিব নয়। আর যদি মালিক তাকে জুমা আদায়ের অনুমতি দেয়, তবে এক অভিমত অনুযায়ী তার উপর জুমা ওয়াজিব হবে। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, তখন তার اِخْتِيَارْ [ইচ্ছা] থাকবে। আর সে যদি مُكَاتَبْ হয় কিংবা তার কিছু অংশ আজাদ হয়, তবে তার উপর জুমা ওয়াজিব হবে।

চক্ষু সুস্থ হওয়ার মর্ম : জুমা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলির মাঝে "চক্ষু সুস্থ থাকা" অন্যতম। তাই অন্ধের উপর জুমা ওয়াজিব নয়। এমনকি যদি কেউ তাকে হাত ধরে সাথে করে নিয়েও যায়, কিংবা তাকে পয়সার বিনিময়ে নিয়ে যাওয়ার মতো লোক পাওয়া যায়, তবুও তার উপর জুমা ওয়াজিব নয়। কারণ, অন্যের শক্তি-সামর্থ্যকে সামর্থ্যই মনে করা হয় না। তবে উক্ত সুরতদ্বয়ের মাঝে সাহেবাইন (র.)-এর মতে তার উপর জুমা ওয়াজিব হবে। আর যার এক চক্ষু ভালো– পরিভাষায় যাকে "কানা" বলা হয়, তার উপর জুমা ওয়াজিব। অনুরূপ ঐ অন্ধ ব্যক্তির উপরও জুমা ওয়াজিব যে কিছু কিছু দেখে। সতর্কতার সাথে সে একা একা পথ চলতে পারে; কারো কোনো সহযোগিতা লাগে না। কারণ, সে ঐ অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় যার নিজে নিজে বের হওয়ার সামর্থ্য আছে।

পা সুস্থ হওয়ার মর্ম : জুমা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলির মাঝে পা ভালো থাকা অন্যতম। তাই যার পা ভালো নয়, তথা নিজে নিজে চলতে পারে না; বরং সে বসে বসে চলে, এমনকি যদি তাকে উঠিয়ে নেওয়ার মতো কোনো লোকও পাওয়া যায়, তবুও জুমা ওয়াজিব নয়। কারণ, তার পক্ষে سَعْىٌ اِلَى الْجُمُعَةِ করা সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ فَتَقَعُ فَرْضًا تَفْرِيْعٌ الخ : অর্থাৎ যদি উল্লিখিত শর্তাবলি না পাওয়া যায়, তবে তার উপর জুমা ওয়াজিব হবে না। এখন যদি কেউ জুমা আদায় করে ফেলে, তবে জোহরের ফরজ তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, যা তার উপর মূলত ওয়াজিব ছিল। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি মুসাফির কিংবা অসুস্থ ব্যক্তি জুমার ইমামতি করে তবে সহীহ হবে। আর জুমায় যদি শুধু এমন লোকই হয়, যাদের উপর জুমা ওয়াজিব নয়, অন্যরা উপস্থিত না থাকে তবুও জুমা হয়ে যাবে।

وَشَرْطٌ لِأَدَائِهَا الْمِصْرُ أَوْ فِنَاؤُهُ وَاخْتَلَفُوْا فِيْ تَفْسِيْرِ الْمِصْرِ فَعِنْدَ الْبَعْضِ هُوَ مَوْضِعٌ لَهُ أَمِيْرٌ وَ قَاضٍ يُنْفِذُ الْأَحْكَامَ وَيُقِيْمُ الْحُدُوْدَ وَعِنْدَ الْبَعْضِ هُوَ مَوْضِعٌ إِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُهُ فِيْ أَكْبَرِ مَسَاجِدِهِ لَمْ يَسَعْهُمْ فَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ (رح) هٰذَا الْقَوْلَ فَقَالَ وَمَا لَا يَسَعُ أَكْبَرَ مَسَاجِدِهِ أَهْلَهُ مِصْرٌ وَإِنَّمَا اِخْتَارَ هٰذَا الْقَوْلَ دُوْنَ التَّفْسِيْرِ الْأَوَّلِ لِظُهُوْرِ التَّوَانِيْ فِيْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ لَا سِيَّمَا فِيْ إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ فِي الْأَمْصَارِ وَمَا اتَّصَلَ بِهِ مَعَدًّا لِمُصَالَحَةٍ فِنَاؤُهُ مَصَالِحُ الْمِصْرِ كَرَكْضِ الْخَيْلِ وَ جَمْعِ الْعَسَاكِرِ وَالْخُرُوْجِ لِلرَّمْيِ وَ دَفْنِ الْمَوْتٰى وَصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ .

অনুবাদ : জুমা আদায়ের জন্য শহর কিংবা শহরতলী হওয়া শর্ত। ফুকাহায়ে কেরাম শহর (مِصْر) -এর ব্যাখ্যায় মতানৈক্য করেন। কারো মতে, শহর এমন স্থান যেখানকার আমির রয়েছে, বিধিবিধান প্রয়োগ করা ও হদ্দ কায়েম করার জন্য কাজি রয়েছে। কারো মতে, শহর এমন স্থান যেখানকার অধিবাসী সকলে সে এলাকার সবচেয়ে বড় মসজিদে জমায়েত হলে মসজিদে জায়গা হয় না। গ্রন্থকার এই শেষ অভিমতটি গ্রহণ করত বলেন, যে স্থানের অধিবাসীগণ সেখানকার সবচেয়ে বড় মসজিদে জমায়েত হলে মসজিদে জায়গা হয় না, সেটি শহর। গ্রন্থকারের এ শেষ অভিমতটি গ্রহণ করা ও প্রথম অভিমতটি গ্রহণ না করার কারণ হচ্ছে, শহরে শরিয়তের বিধিবিধান প্রয়োগ করা, বিশেষ করে হদ্দ কায়েম করার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রকাশ পায়। আর যে স্থান শহরের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং শহরের উপকারার্থে স্থাপন করা হয়েছে, সেটি শহরতলী। শহরের উপকার; যেমন– ঘোড়দৌড়ের ময়দান, সৈন্য জমায়েতের স্থান [সেনানিবাস], তীর মারা প্র্যাক্টিসের জন্য বের হওয়া, মৃত ব্যক্তিদের দাফন করা এবং জানাজার নামাজ পড়া ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَشَرْطٌ لِأَدَائِهَا الْمِصْرُ الخ :

জুমা আদায়ের জন্য শর্তাবলি : জুমা ওয়াজিব হওয়ার জন্য যেরূপ শর্ত রয়েছে, অনুরূপ জুমার আদায় (اداء) সহীহ হওয়ার জন্যও শর্ত রয়েছে। তা নিম্নরূপ– ১. শহর বা শহরতলী হওয়া, ২. জামাত হওয়া, ৩. বাদশাহ বা বাদশার প্রতিনিধি থাকা, ৪. ওয়াক্ত হওয়া তথা জোহরের ওয়াক্ত হওয়া, ৫. খুতবা পড়া এবং ৬. ইযনে আম তথা ব্যাপক অনুমতি থাকা।

শহর ও শহরতলী : مِصْر কিংবা শহরের ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে– اَلْمِصْرُ هُوَ مَا يَجْتَمِعُ فِيْهِ مَرَافِقُ أَهْلِهِ "শহর বলা হয় ঐ এলাকাকে যেখানে প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্র পাওয়া যায়।"

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত– هُوَ كُلُّ مَوْضِعٍ فِيْهِ أَمِيْرٌ وَقَاضٍ يُنْفِذُ الْأَحْكَامَ وَيُقِيْمُ الْحَدَّ

অর্থাৎ "প্রত্যেক এমন স্থান যেখানে আমির ও কাজি আছে, যে শরিয়তের হুকুম ও হদ্দ প্রয়োগ করবে সেটিই শহর।" ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও এমন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

নাওয়াদিরে ইবনে শুজা নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- إِذَا كَانَ فِى الْقَرْيَةِ عَشَرَةُ الاَفٍ فَهُوَ مِصْرٌ
অর্থাৎ "যখন কোনো গ্রামে দশ হাজার লোক থাকবে সে এলাকাকেই শহর বলা হবে।"

শহরের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন অভিমত থেকে বুঝা যায় যে, আমাদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে জুমার নামাজ সহীহ হবে। কারণ, শহরের ব্যাখ্যায় যে ইমামই যা বলেছেন তা কোনো না কোনোভাবে আমাদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে অবশ্যই আছে।

قَوْلُهُ فَعِنْدَ الْبَعْضِ هُوَ مَوْضِعٌ الخ : এ বাক্যের بَعْض শব্দ দ্বারা ইমাম কারখী (র.) উদ্দেশ্য। ইমাম কারখী (র.)-এর অভিমত ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত একই। এ অভিমতটিই হিদায়া গ্রন্থকারের নিকট পছন্দনীয়। তাঁদের সংজ্ঞায় উল্লিখিত أَمِيْر [আমির] শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যিনি এলাকাবাসীর হেফাজত, শান্তি ও নিরাপত্তাদানের দায়িত্বশীল, ফিতনা-ফাসাদ ও বিভ্রান্তি মিটানোর কাজে নিয়োজিত। অতএব, আমাদের দেশের ইউনিয়ন কাউন্সিল পর্যায়ের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ এ আমির (أَمِيْر) -এর ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়।

قَوْلُهُ وَمَا لاَيَسَعُ اَكْبَرَ مَسَاجِدِهِ الخ :

বিকায়া গ্রন্থকারের শহর সম্পর্কে অভিমত ও এর কারণ : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) শহর সম্পর্কে বলেন-

مَا لاَ يَسَعُ اَكْبَرُ مَسَاجِدِهِ أَهْلَهُ مِصْرٌ -

অর্থাৎ "যে মহল্লার অধিবাসী মহল্লার সবচেয়ে বড় মসজিদে জমায়েত হলে মসজিদে জায়গা হয় না সেটিই শহর।" বিকায়া গ্রন্থকার (র.) এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন এজন্য যে, অধিকাংশ শহরে শরিয়তের বিধিবিধান ও হদ্দ প্রয়োগ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আর প্রথম অভিমত তথা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ব্যাখ্যায় শরিয়তের বিধিবিধান ও হদ্দ কায়েম করার কথা রয়েছে।

শহরতলী প্রসঙ্গ : শহরতলীকে কিতাবে فِنَاءُ الْمِصْرِ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ- শহরের আঙ্গিনা। যেরূপ বলা হয়- فِنَاءُ الدَّارِ বাড়ির আঙ্গিনা। শহরতলী বলতে যা শহর থেকে অনেক দূরে গ্রাম নয়; বরং শহরের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন স্থান যা শহরের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার হয়। যেমন শারেহ (র.) বিশ্লেষণ করেছেন যে, ঘোড়দৌড়ের ময়দান, সেনানিবাস, কবরস্থান ও ঈদগাহ ইত্যাদি। এখানে শারেহ (র.) اَلْخُرُوْجُ لِلرَّمْيِ শব্দও ব্যবহার করেছেন। এর মর্ম হচ্ছে- যেখানে তীর মারা প্র্যাক্টিস করা হয়।

وَجَازَتْ بِمِنًى فِى الْمَوْسِمِ لِلْخَلِيْفَةِ اَوْ لِاَمِيْرِ الْحِجَازِ لَا لِاَمِيْرِ الْمَوْسِمِ وَلَا بِعَرَفَاتٍ وَالسُّلْطَانُ اَوْ نَائِبُهُ وَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْخُطْبَةُ نَحْوُ تَسْبِيْحَةٍ قَبْلَهَا فِىْ وَقْتِهَا هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَابُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيْلٍ يُسَمّٰى خُطْبَةً وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) لَابُدَّ مِنْ خُطْبَتَيْنِ يَشْتَمِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى التَّحْمِيْدِ وَالصَّلٰوةِ وَالْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوٰى وَالْاُوْلٰى عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالثَّانِيَةُ عَلَى الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْجَمَاعَةُ وَهُمْ ثَلٰثَةُ رِجَالٍ سِوَى الْاِمَامِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اِثْنَانِ سِوَى الْاِمَامِ فَاِنْ نَفَرُوْا قَبْلَ سُجُوْدِهٖ بَدَأَ بِالظُّهْرِ وَاِنْ بَقِىَ ثَلٰثَةُ رِجَالٍ وَنَفَرُوْا بَعْدَ سُجُوْدِهٖ اَتَمَّهَا وَالْاِذْنُ الْعَامُّ وَمَنْ صَلُحَ اِمَامًا فِىْ غَيْرِهَا صَلُحَ فِيْهَا اَىْ اِنْ اَمَّ الْمُسَافِرُ اَوِ الْمَرِيْضُ اَوِ الْعَبْدُ فِى الْجُمُعَةِ صَحَّتْ خِلَافًا لِزُفَرَ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَيْهِمْ قُلْنَا اِذَا حَضَرُوْا وَاَدَّوْا صَلٰوةَ الْجُمُعَةِ صَارَتْ فَرْضًا عَلَيْهِمْ ـ

অনুবাদ : হজের মৌসুমে মিনায় খলিফা কিংবা হিজাজের আমিরের জন্য জুমা আদায় করা জায়েজ; হজ মৌসুমের আমিরের জন্য জায়েজ নেই। আরাফার ময়দানে জায়েজ নেই। বাদশাহ কিংবা বাদশাহর প্রতিনিধি শর্ত, জোহরের ওয়াক্ত এবং নামাজের ওয়াক্তে নামাজের পূর্বে এক তাসবীহ পরিমাণ খুতবা শর্ত। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট এমন দীর্ঘ আলোচনা হওয়া চাই, যাকে খুতবা বলে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট দুই খুতবা জরুরি। তন্মধ্যে প্রত্যেকটিই [আল্লাহর] প্রশংসা, দরুদ, তাকওয়া আল্লাহভীতির অসিয়ত সংবলিত হবে। প্রথম খুতবা হবে কেরাত প্রসঙ্গে এবং দ্বিতীয় খুতবা হবে মু'মিনদের জন্য দোয়া সংবলিত। জামাত শর্ত এবং তা ইমাম ব্যতীত তিনজন ব্যক্তি হতে হবে। এটি তরফাইন (র.)-এর নিকট। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট, ইমাম ব্যতীত দুজন লোক হতে হবে। সুতরাং ইমাম সিজদা করার পূর্বে যদি তারা চলে যায়, তবে ইমাম জোহরের নামাজ শুরু করবে। আর যদি তিনজন ব্যক্তি থেকে যায়, কিংবা ইমাম সিজদা করার পর তারা চলে যায়, তবে ইমাম জুমার নামাজ পূর্ণ করবে। ইযনে আম [ব্যাপক অনুমতি] শর্ত। যে ব্যক্তি জুমা ব্যতীত অন্যান্য নামাজে ইমামতি করার যোগ্য, সে জুমাতেও ইমামতি করার যোগ্য। অর্থাৎ যদি মুসাফির কিংবা অসুস্থ কিংবা গোলাম জুমার নামাজে ইমাম হয়, তবে সহীহ হবে। এতে ইমাম যুফার (র.) মতানৈক্য করেন। কারণ, এ সকল লোকের উপর জুমা ওয়াজিব নয়। আমরা বলি, যখন এ সকল লোক জুমার নামাজে উপস্থিত হয়ে যায় এবং জুমার নামাজ আদায় করে, তবে তাদের উপর জুমা ফরজ হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجَازَتْ بِمِنًى فِى الْمَوْسِمِ :

হজের মৌসুমে মিনায় খলিফা কিংবা হিজাজের আমিরে জন্য জুমা জায়েজ : مِنٰى শব্দটির مِيْم অক্ষরে যের এবং نُوْن অক্ষরে যবর হবে এবং শেষে হবে يَاء مَقْصُوْرَه এটি মক্কার নিকটবর্তী একটি প্রসিদ্ধ স্থান। যেখানে হাজীরা তারবিয়ার দিনে অবস্থান করে এবং হজের মানাসিক বা কুরবানি আদায় করে। দশম তারিখ এবং এরপর তিনদিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে

ও কঙ্কর নিক্ষেপ করে, মাথা মুণ্ডায় ও কুরবানি ইত্যাদি কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তাই এসব দিবসে এটি শহর হয়ে যায়। ফলত অন্যান্য দিবসের তুলনায় সে মৌসুমে সেখানে জুমা পড়া জায়েজ। কারণ, হজের মৌসুমে সেখানে সুলতান, আমির, বাজার ইত্যাদি সবকিছু থাকে।

পক্ষান্তরে আরাফার ময়দানে জুমা পড়া জায়েজ নেই। যদিও সুলতান, আমির সবকিছু থাকে। তবে তা থাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য। তা ছাড়া রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সেখানে একদিন অবস্থান করেছেন এবং সেদিনটি ছিল জুমার দিন। কিন্তু তিনি জুমা পড়েননি; বরং জোহর পড়েছেন [সিহাহ সিত্তাহ]। অতএব, যদি আরাফার ময়দানে জুমা জায়েজ হতো, তবে অবশ্যই রাসূল ﷺ বর্জন করতেন না।

قَوْلُهُ لِلْخَلِيْفَةِ أَوْ لِأَمِيْرِ الْحِجَازِ الخ : এখানে খলিফা (خَلِيْفَة) দ্বারা উদ্দেশ্য রাষ্ট্রপ্রধান। শর্ত হলো, রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত থাকতে হবে। আর হিজাযের আমির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে নিযুক্ত গভর্নর কিংবা বিচারপতি। মক্কা, মদিনা ও আশপাশের এলাকাকে হিজায বলা হয়, যার মধ্যে তায়েফও অন্তর্ভুক্ত। উদ্দেশ্য হলো, রাষ্ট্রপতি কিংবা তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমিরের জন্য মিনায় জুমা পড়া জায়েজ। এ হুকুম শুধু তাদের জন্যই নয়; বরং তাদের সাথে যত হাজী থাকবে, প্রত্যেকের জন্যই মিনায় হজের মৌসুমে জুমার নামাজ আদায় করা জায়েজ। কিন্তু হাজীদের আমিরের জন্য জায়েজ নেই যে, তিনি মিনায় জুমা প্রতিষ্ঠা করবেন। হিজাযের আমিরদের অভ্যাস হলো, তারা প্রতি বছর হাজীদের এন্তেজামের জন্য একজন আমির নির্ধারণ করে পাঠান। যেহেতু তাকে শুধু হাজীদের দেখাশুনা করার জন্যই নির্ধারণ করা হয়, তাই অন্য কোনো কাজ; যেমন– জুমা কায়েম করা কিংবা হজের তারিখ নির্ধারণ করা ইত্যাদির দায়িত্ব তার নয়। অনুরূপ তার দায়িত্ব থাকে অসম্পূর্ণ, তাই জুমা কায়েম করার অধিকার তার নেই। অধিকার শুধু রাষ্ট্রপতি কিংবা রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে নিযুক্ত হিজাযের গভর্নরেরই।

قَوْلُهُ وَالسُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ :

রাষ্ট্রপতি কিংবা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি শর্ত : জুমার নামাজ আদায়ের শর্তাবলির মাঝে একটি হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি কিংবা তাঁর কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে হবে। হযরত হাসান বসরী (র.) সূত্রে বর্ণিত, চার কাজ বাদশাহর পক্ষ থেকে হয়। তন্মধ্যে জুমা ও দুই ঈদের নামাজ কায়েম করা। –[ইবনে আবী শায়বা]

হিদায়া ও অন্যান্য কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী, জুমার মধ্যে জনগণ অনেক জমায়েত হয়। কখনো কখনো আগে যাওয়ার জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতা করে। এর দ্বারা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। এজন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা তাঁর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা জরুরি যেন ঝগড়া-বিবাদ না হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ শর্ত উত্তম হওয়ার দিক থেকে। যেখানে এ ধরনের হট্টগোল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে থাকা জরুরি; অন্যথায় নয়। পূর্বযুগে জুমা এবং দুই ঈদের নামাজ রাষ্ট্রপতি কিংবা তাঁর প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত করা হতো। 'জামিউর রুমূয' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, সুলতান কিংবা রাষ্ট্রপতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সবচেয়ে বড় বিচারপতি। চাই সে ন্যায়বিচারক হোক কিংবা জালিম হোক। আর এখানে এর জন্য শুধু سُلْطَانٌ শব্দ ব্যবহার দ্বারা বুঝা যায় যে, সুলতান [রাষ্ট্রপতি]-এর জন্য মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। কিন্তু এটি তখন হবে যখন তাঁর থেকে অনুমতি পাওয়া সম্ভব হবে। অন্যথায় রাষ্ট্রপতিরও উপস্থিত থাকা শর্ত নয়; বরং যদি লোকেরা নিজেরাই জমায়েত হয়ে কাউকে ইমাম বানিয়ে জুমার নামাজ আদায় করে, তবে জায়েজ।

'মাবসূত' নামক গ্রন্থ থেকে নকল করে মি'রাজুদ দিরায়াহ নামক গ্রন্থকার বলেন, কখনো কখনো কাফেরদের এলাকাও দারুল ইসলাম হয়ে যায়। কারণ, সেখানে মুসলিম শাসক নেই; বরং নির্ধারিত কাজি আছে। মুসলমানদের কোনো কোনো প্রয়োজনে তিনি সুযোগ দিয়ে থাকেন। যদি এমন সুযোগ দিয়ে থাকে, তবে সেখানে জুমা, দুই ঈদের নামাজ ও হদ্দ কায়েম করতে পারবে। কাফের শাসক থাকার সুরতে মুসলমানদের মর্জি অনুযায়ী যদি বিচারক নির্ধারণ করা হয়, তবে সেখানে জুমা আদায় করা জায়েজ। তবে মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হলো, মুসলিম শাসক নির্ধারণ করার চেষ্টা করা।

فَتْحُ الْمَنَّانِ فِيْ تَائِيْدِ مَذْهَبِ النُّعْمَانِ নামক গ্রন্থে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) হিদায়া-এর ইবারতের সারমর্ম এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সুলতান কিংবা তাঁর প্রতিনিধির জন্যই একমাত্র জুমা কায়েম করা জায়েজ। কেননা, এতে অনেক লোক জমায়েত হয়। তাই একে গুরুত্ব দেওয়ার মতো একজন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। এর স্পষ্ট মর্মার্থ হচ্ছে– এমনটি করা উত্তম এবং যৌক্তিকভাবেও এটি সতর্কতা। কিন্তু শরিয়ত তাঁকে ব্যতীত জুমার নামাজ নাজায়েজ সাব্যস্ত করবে এবং একে শর্ত সাব্যস্ত করবে, এমন কিছু নয়।

মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) লেখেন, আমার অভিমত অনুযায়ী হিদায়ার ইবারতের মর্ম হলো, জুমা ওয়াজিব হওয়ার নস-এর মাঝে এটি শর্ত নয়। অতঃপর যখন একজন ব্যক্তি আগে বেড়ে যায়, তবে ঝগড়া বন্ধ হয়ে যায়। যেরূপ অন্যান্য নামাজের জামাতে হয়ে থাকে। অতঃপর এটিও দেখা গেছে যে, হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের দিবসগুলোতে সাহাবায়ে কেরাম জুমা পড়িয়েছেন। অথচ হযরত ওসমান (রা.) যোগ্য ইমাম ছিলেন এবং অবরুদ্ধ ছিলেন। এটিও জানা নেই যে, সাহাবায়ে কেরাম তাঁর থেকে অনুমতি নিয়েছেন কিনা। বরং প্রকাশ্যে এটাই বুঝা যায় যে, অনুমতি নেননি। কেননা, তাঁকে শহীদকারী বদবখ্‌তরা এতটুকু সুযোগ দেয়নি। এর দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর নিকট জুমা কায়েম করার ক্ষেত্রে খলিফার অনুমতি নেওয়া শর্ত নয়। সম্ভবত এ সুরতের প্রতি লক্ষ্য করেই ফতোয়া দিয়েছেন যে, যেখানে সুলতান থেকে অনুমতি নেওয়া অসাধ্য হয়ে পড়ে, সেখানে যদি লোকেরা জমায়েত হয়ে একজন ইমাম বানিয়ে জুমা আদায় করে, তবে তা জায়েজ।

قَوْلُهُ وَ وَقْتُ الظُّهْرِ :

জোহরের ওয়াক্ত হওয়া শর্ত : জুমা আদা (اداء) -এর শর্তাবলির মাঝে একটি হচ্ছে, জোহরের নামাজের ওয়াক্ত হওয়া। কেউ কেউ এরও পূর্বে হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। তবে এটি ভুল। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের মাঝে কোথাও এ কথা প্রমাণিত নেই। হুজুর ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের কেউ যাওয়ালের বা সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে জুমা পড়েননি; বরং সব রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ যাওয়ালের পরেই জুমা আদায় করতেন।

قَوْلُهُ وَالْخُطْبَةُ :

খুতবা [জুমা আদায়ের জন্য] শর্ত : নামাজের ওয়াক্তে নামাজ আদায়ের পূর্বে কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ খুতবা পড়া জুমার নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। কেননা, রাসূল ﷺ কোনো জুমাই খুতবা ছাড়া আদায় করেননি, তবে এই খুতবা ওয়াক্তের পূর্বে দেওয়া যাবে না। আর যেহেতু খুতবা নামাজের জন্য শর্ত, তাই একে নামাজের পূর্বেই দিতে হবে। মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) লেখেন, খুতবা আরবি ভাষায় হওয়া আবশ্যক নয়; বরং যদি অন্যান্য ভাষায় খুতবা পড়ে, তবে তা জায়েজ। জায়েজ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাজ হয়ে যাবে এবং খুতবাও হয়ে যাবে, কিন্তু হুজুর ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের ধারাবাহিক সুন্নতের পরিপন্থি হওয়ার কারণে মাকরূহ তাহরীমী হবে। খুতবার পরিমাণ প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে, একবার যদি কেউ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ কিংবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে এবং খুতবার নিয়ত করে, তবে তা খুতবার জন্য যথেষ্ট। কারণ, فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ আয়াতে ذِكْرِ اللّٰهِ দ্বারা এ খুতবা উদ্দেশ্য। আর সাধারণ জিকির এক তাসবীহ দ্বারাও আদায় হয়, কিন্তু দুররুল মুখতার গ্রন্থের বর্ণনা মোতাবেক এরূপ এক তাসবীহ-এর উপর اِكْتِفَاء করা মাকরূহ। কারণ, এটি সুন্নতের পরিপন্থি। কেননা, রাসূল ﷺ দুই খুতবা দিতেন এবং এ দুয়ের মাঝে স্বল্প সময় বসতেন। উভয় খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা, জিকির, ওয়াজ, প্রয়োজনীয় বিধান (أَحْكَام) এবং কুরআনের আয়াত থাকত। –[সিহাহ সিত্তাহ]

قَوْلُهُ نَحْوُ تَسْبِيْحَةٍ قَبْلَهَا فِىْ وَقْتِهَا :

খুতবার পরিমাণ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট এক তাসবীহ পরিমাণ খুতবা যথেষ্ট এবং তা ফরজ। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ আয়াতটি মুতলাক (مُطْلَق)। আর কায়দা আছে– اَلْمُطْلَقُ يُطْلَقُ عَلَى الْاَدْنٰى এ কায়দার ভিত্তিতে সর্বনিম্ন পরিমাণের উপর প্রয়োগ করার দ্বারা لِتَيَقُّنِهٖ فَرْضِيَّة আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর নিকট খুতবা দীর্ঘ হতে হবে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, দুই খুতবা হতে হবে এবং তন্মধ্যে প্রত্যেকটি আল্লাহর প্রশংসা, রাসূল ﷺ-এর উপর দরুদ শরীফ, নসিহত সংবলিত এবং প্রথমটিতে তেলাওয়াত, দ্বিতীয়টি সাধারণ মানুষের জন্য দোয়া সংবলিত হতে হবে। এগুলো আমাদের ইমামত্রয়ের নিকট সুন্নত। কারণ, রাসূল ﷺ -এর খুতবা ছিল দুটি এবং প্রতিটিই উল্লিখিত বিষয়গুলো সংবলিত ছিল।

قَوْلُهُ وَالْاِذْنُ الْعَامُّ :

ইযনে আম [ব্যাপক অনুমতি] শর্ত : জুমা আদায়ের শর্তসমূহের একটি হলো, ইযনে আম। অর্থাৎ যেখানে নামাজ অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে যে-কোনো ব্যক্তির নামাজ আদায়ের অনুমতি থাকতে হবে; কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারবে না। কোনো কোনো ফকীহ ইযনে আম -এর জন্য নামাজের জায়গা ওয়াকফকৃত হওয়ার শর্ত করেছেন।

وَكُرِهَ ظُهْرُ مَعْذُوْرٍ اَوْ مَسْجُوْنٍ بِجَمَاعَةٍ فِىْ مِصْرٍ يَوْمِهَا لِاَنَّ الْجُمُعَةَ جَامِعَةٌ لِلْجَمَاعَاتِ فَلَا يَجُوْزُ اِلَّا جَمَاعَةً وَاحِدَةً وَلِهٰذَا لَا تَجُوْزُ الْجُمُعَةُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) بِمَوْضِعَيْنِ اِلَّا اِذَا كَانَ مِصْرٌ لَهُ جَانِبَانِ فَيَصِيْرُ فِىْ حُكْمِ مِصْرَيْنِ كَبَغْدَادٍ فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ فِىْ مَوْضِعَيْنِ دُوْنَ الثَّلٰثَةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) لَا بَأْسَ بِاَنْ يُصَلِّىَ فِىْ مَوْضِعَيْنِ اَوْ ثَلٰثَةٍ سَوَاءٌ كَانَ لِلْمِصْرِ جَانِبَانِ اَوْ لَمْ يَكُنْ وَبِهِ يُفْتٰى وَلَمَّا ذُكِرَ حُكْمُ الْمَعْذُوْرِ عُلِمَ مِنْهُ كَرَاهَةُ ظُهْرِ غَيْرِ الْمَعْذُوْرِ بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى وَظُهْرُ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ فِيْهِ قَبْلَهَا قَوْلُهُ فِيْهِ اَىْ فِى الْمِصْرِ ثُمَّ سَعْيُهُ اِلَيْهَا وَالْاِمَامُ فِيْهَا يُبْطِلُهُ اَدْرَكَهَا اَوْ لَا هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا يَبْطُلُ ظُهْرُهُ اِلَّا اَنْ يَقْتَدِىَ وَمُدْرِكُهَا فِى التَّشَهُّدِ وَسُجُوْدِ السَّهْوِ يُتِمُّهَا وَاِذَا اُذِّنَ الْاَوَّلُ تَرَكُوا الْبَيْعَ وَسَعَوْا وَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَرُمَ الصَّلٰوةُ وَالْكَلَامُ حَتّٰى يُتِمَّ خُطْبَتَهُ وَاِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ اُذِّنَ ثَانِيًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلُوْهُ مُسْتَمِعِيْنَ وَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَعْدَةٌ قَائِمًا طَاهِرًا وَ اِذَا تَمَّتْ اُقِيْمَتْ وَصَلَّى الْاِمَامُ رَكْعَتَيْنِ ـ

অনুবাদ : জুমার দিনে শহরে অসুস্থ ও বন্দি ব্যক্তিদের জন্য জামাতের সাথে জোহর আদায় করা মাকরূহ। কেননা, জুমা সমস্ত জামাতকে সমন্বয়কারী। তাই এক জামাত ব্যতীত [দ্বিতীয় কোনো জামাত] জায়েজ নেই। এ কারণে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট এক শহরের দুই স্থানে জুমা জায়েজ নেই। কিন্তু এ সুরতে [তা জায়েজ] যে, শহরের যদি দু'টি প্রান্ত থাকে তবে তা দুই শহরের হুকুমে হয়ে যাবে। যেমন– বাগদাদ শহর। সুতরাং তখন দুই স্থানে জুমা জায়েজ হবে; তিন স্থানে নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট দুই কিংবা তিন জায়গায় পড়া যাবে। এতে কোনো সমস্যা নেই। চাই তা শহরের দুই প্রান্তে হোক কিংবা না হোক। ফতোয়া এরই উপর। যখন মাজুরের হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে, তখন এর দ্বারা ওজরবিহীন ব্যক্তির জোহরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা মাকরূহ হওয়া আরো উত্তমরূপে বুঝা যায়। ওজরবিহীন ব্যক্তি যদি জুমার দিনে জুমার নামাজের পূর্বে জোহর পড়ে, অতঃপর জুমার নামাজের জন্য سَعِىْ (সাঈ) করে, আর এমতাবস্থায় ইমাম জুমার নামাজে থাকে, তবে তার জোহর বাতিল হয়ে যাবে। চাই সে জুমা পাক বা না পাক। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। সাহেবাইন (র.)-এর নিকট ইমামের সাথে ইকতিদা করার দ্বারা জোহর বাতিল হয়ে যাবে; অন্যথায় নয়। [জুমা আদায়কারী] জুমাকে [ইমামের সাথে] তাশাহহুদ কিংবা সিজদায়ে সাহুতে যদি পায় তবে সে জুমা পূর্ণ করবে। যখন প্রথম আজান দেওয়া হবে তখন বেচাকেনা বর্জন করবে এবং জুমার দিকে সাঈ করবে। যখন ইমাম [কামরা থেকে কিংবা কাতার থেকে] বের হবে তখন ইমাম খুতবা সমাপ্ত করা পর্যন্ত [যে-কোনো] নামাজ ও কথা হারাম হয়ে যায়। ইমাম সাহেব যখন মিম্বরে বসবে, তখন তাঁর সামনে দ্বিতীয়বার আজান বলবে এবং সকল মুক্তাদী ইমামের দিকে মনোনিবেশ করে খুতবা শুনবে। ইমাম পবিত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে দুই খুতবা দেবে এবং এ দুয়ের মাঝে [কিছু সময়] বসবে। যখন খুতবা শেষ হয়ে যাবে, তখন ইকামত বলা হবে এবং ইমাম লোকদের নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ جَامِعَةٌ لِلْجَمَاعَاتِ الخ : মূল মাসআলা ছিল যে, জুমার দিনে শহরে মাজুর কিংবা বন্দিদের জন্য জোহরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা মাকরূহে তাহরীমা। এখানে ঐ মাকরূহের কারণ বর্ণনা করছে যে, জুমার জামাত আরো অনেক জামাতের সমন্বয়কারী। অর্থাৎ জুমার জামাতের কারণে আরো অনেক মসজিদে জোহরের জামাত হতো, তা এখন আর হচ্ছে না; বরং জামে মসজিদে একটি জামাতই হচ্ছে। আর সমস্ত লোক জামে মসজিদের দিকে সাঈ করছে। নবী করীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে কোথাও এ কথা বর্ণিত নেই যে, দুই কিংবা এর চেয়ে বেশি স্থানে জুমা পড়েছেন, যেরূপ হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) কোনো রিসালার মধ্যে বর্ণনা করেছেন। এজন্যই কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম বলে থাকেন, জুমা একটিই হবে। তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের নিকটই একাধিক জুমা জায়েজ। হানাফী ওলামায়ে কেরামের মতে, এক শহরে একাধিক জুমা জায়েজ। এখন যদি মাজুর ব্যক্তিরা মিলে জুমার দিনে জোহর আদায় করে, তবে অবশ্যই জুমার জামাতে লোক কমে যাবে। তাই উক্ত জোহরের জামাতটি মাকরূহ তাহরীমী হবে।

قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِي الخ : ইমাম শামুসল আইম্মাহ সারাখসী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, এক শহরে দুই কিংবা এর বেশি মসজিদে জুমা পড়া জায়েজ। কারণ, যদি সমগ্র শহরে এক জামাত কায়েম করা হয়, তবে অনেক লোককেই দীর্ঘ সফর করতে হবে, যা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ। তা ছাড়াও একাধিক জামাত কায়েম করার বিপক্ষেও কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। এটি বিশুদ্ধ কথা যে, নবী করীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে জুমার একটিই জামাত হতো, কিন্তু এর দ্বারা একাধিক জামাত কায়েম করা যাবে না, তা প্রমাণিত হয় না। তাই আহনাফের নিকট একাধিক জামাত জায়েজ।

قَوْلُهُ وَظُهْرُ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ فِيهِ قَبْلَهَا الخ : অর্থাৎ যদি ওজরবিহীন সুস্থ ব্যক্তি জুমার দিনে জুমার পূর্বে জোহর আদায় করে ফেলে [যদিও তা তার ক্ষেত্রে মাকরূহ তাহরীমী ছিল, জোহরের فَرْضِيَّتْ যদিও তার আদায় হয়ে যায়] কিন্তু জোহর আদায়ের পরে যদি সে আবার জুমার জন্য সাঈ করে, তবে দেখা হবে যে, সে জুমার ইমামকে নামাজে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না, যদি সে ইমামকে নামাজেই পেয়ে যায়, তবে সে যে জোহর আদায় করেছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। চাই সে ইমামের সাথে জুমার নামাজে ইকতিদা করুক কিংবা না করুক। যদি ইকতিদা করে, তবে তো জুমা আদায় হবে, অন্যথায় তাকে আবার জোহর আদায় করতে হবে। আর যদি সে ইমামকে নামাজে না পায়; বরং সে পৌঁছার পূর্বে ইমাম নামাজ থেকে অবসর হয়ে যায়, তবে তার জোহর বাতিল হবে না। কারণ, তার এই سَعِيْ সাঈই নয়। এতে সাহেবাইন (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, তার জোহর তখন বাতিল হবে, যখন সে ইমামের সাথে ইকতিদা করবে।

قَوْلُهُ وَمُدْرِكُهَا فِي التَّشَهُّدِ والخ : অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার নামাজে ইমামের সাথে শুরু থেকে শরিক না হয়; বরং তাশাহহুদ কিংবা সিজদায়ে সাহুতে শরিক হয়, তবে সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর বাকি নামাজ পূর্ণ করবে– জোহরের নামাজ পড়বে না। কারণ, হাদীসে এসেছে, যে পরিমাণ নামাজই ইমামের সাথে পাওয়া যায়, তাতে শরিক হয়ে যাবে এবং যা বাকি থাকবে তা পরবর্তীতে পূর্ণ করে নেবে।

قَوْلُهُ إِذَا أُذِّنَ الْأَوَّلُ تَرَكُوا الخ : এর সারসংক্ষেপ হচ্ছে, যখন জুমার জন্য প্রথম আজান দেওয়া হবে, তখন সাথে সাথে বেচাকেনা বন্ধ করে দাও এবং জুমা আদায়ের জন্য যাবে। যেন জুমার জন্য سَعِيْ করার মাঝে বেচাকেনা প্রতিবন্ধক না হয় যায়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ الخ "[হে মু'মিনগণ!] জুমার দিনে যখন তোমাদেরকে নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।" [সূরা জুমা'আ : ৯]

এ স্থানে মন্তব্য হয় যে, সিহাহ সিত্তার গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে একবারই আজান দেওয়া হতো। এটি ঐ আজান যা খুতবার সময় দেওয়া হয়। যখন হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগ আসে এবং

মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এ আজানই জুমার জন্য যথেষ্ট মনে হলো না, তখন প্রথম আজানকে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সকল মুসলমান তা অস্বীকার ব্যতীত গ্রহণ করে নেয়। এর উদ্দেশ্য হলো, আয়াতের মধ্যে نِدَاء দ্বারা অর্থ হলো, দ্বিতীয় আজান। তাই এ দ্বিতীয় আজানের পরেই سَعْيٌ করা আবশ্যক এবং বেচাকেনা বর্জন করা আবশ্যক হবে; প্রথম আজান উদ্দেশ্য নয়।

এর খণ্ডন হচ্ছে, কুরআনের মাঝে শুধু এতটুকু আছে যে, إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ "যখন নামাজের জন্য আহ্বান করা হবে" এতে প্রথম আজানের কথাও উল্লেখ নেই, দ্বিতীয় আজানের কথাও উল্লেখ নেই। তবে যেহেতু দ্বিতীয় আজানের উপর তা প্রয়োগ হয়, কিন্তু জরুরতের দরুন যখন প্রথম আজানের সংযোজন হলো, তাই হুকুমও প্রথম আজানের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। কেননা, نِدَاء -এর জন্য এ প্রথম আজান নির্ধারিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَرُمَ الصَّلٰوةُ الخ : যখন ইমাম খুতবার জন্য মিম্বরে উঠে, তখন থেকে খুতবা শেষ পর্যন্ত কোনো নামাজ বৈধ নয়। চাই সে নামাজ সুন্নত হোক কিংবা নফল হোক। আর কোনো কথাবার্তা বলাও জায়েজ নেই। চাই তা দুনিয়াবি হোক কিংবা উখরুবী হোক। ব্যাপকভাবে সবকিছু হারাম হয়ে যায়। ইমাম যুহরী (র.)-এর অভিমত হলো, ইমামের কামরা থেকে বের হওয়া নামাজকে সমাপ্ত করবে এবং ইমামের খুতবা শুরু করা কথাবার্তাকে সমাপ্ত করবে। –[মুয়াত্তা ইমাম মালিক] হযরত ইবনে আবী শায়বা (র.) হযরত আলী (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণনা নকল করেন যে, তাঁরা ইমাম আসার পর নামাজ ও কথাবার্তা বলা মাকরূহ জানতেন। হযরত ওরওয়া (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, যখন ইমাম মিম্বরের উপর বসবেন, তখন কোনো নামাজ নেই। সারকথা, এ ক্ষেত্রে এত অধিক বর্ণনা রয়েছে যে, যার দ্বারা বুঝা যায়, খুতবা চলাকালীন সময়ে চুপ থাকা ওয়াজিব। অনুরূপ প্রত্যেক ঐ কথা ও কাজ, যা খুতবা শ্রবণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে নামাজ এবং কথাবার্তার মাঝে পার্থক্য হলো, যখন ইমাম মিম্বরে বসবে তখন সব ধরনের নামাজ নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি কারো জিম্মায় ফজরের নামাজ থেকে যায়, তবে তারতীব ওয়াজিব হওয়ার কারণে বারান্দার কোনো এক কোণে দাঁড়িয়ে তা আদায় করতে পারবে। ইমাম মিম্বরে বসার পর খুতবা শুরু হওয়ার পূর্বে দুনিয়াবি কোনো কথা জায়েজ নেই। তবে আখিরাতের কথা যেমন– তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি খুতবা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জায়েজ। খুতবা শুরু হওয়ার পর দুনিয়াবি ও আখিরাতের সর্বপ্রকার কথাবার্তা হারাম। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কিন্তু খতিবের সামনে দেওয়া আজানের জবাব দেওয়া কোনো কোনো হানাফী ফকীহের নিকট মাকরূহ নয়। অনুরূপ আজানের শেষে দোয়া পড়াও মাকরূহ নয়। আমার অভিমত হচ্ছে, যদি এর উপর আমল করতে চায়, তবে তা মনে মনে পড়বে; উঁচু আওয়াজে নয়। অন্যথায় অসুবিধা থাকার সম্ভাবনা আছে।

قَوْلُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلُوْهُ الخ : অর্থাৎ মুয়াজ্জিন তাঁর সামনে ইমামের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে, চাই সে মসজিদে থাকুক কিংবা মসজিদের বাহিরে থাকুক। এটি সুন্নত। কারণ, নবী করীম ﷺ -এর যুগ থেকে শুরু করে হযরত ওমর (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত একই আজান ছিল। অতঃপর যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগে প্রথম আজানকে সম্পৃক্ত করা হয়। জামে মসজিদগুলোতে দেখা যায় যে, মুয়াজ্জিন ইমামের বরাবর একেবারে কাছে গিয়ে আজান দেয়। অথচ সামনে হওয়ার দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, একেবারে কাছে হতে হবে; বরং দু-চার কাতার পিছনে ইমামের বরাবর দাঁড়িয়ে আজান দেওয়া উত্তম। উপস্থিত শ্রোতাদের জন্য খুতবা শ্রবণ করা জরুরি। এমনকি খতিবের দিকে মুখ করে শ্রবণ করা উচিত। কিন্তু যদি ইমামের দিকে মুখ করে শোনার কারণে কোনোরূপ অসুবিধা দেখা দেয়; যেমন– খুতবার পরে কাতার বাঁধতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে ইত্যাদি, তবে প্রথম থেকেই কাতার বেঁধে বসে খুতবা শুনবে, তখন ইমামের দিকে মুখ করা আবশ্যক নয়।

قَوْلُهُ وَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا الخ : অর্থাৎ আজানের পর খুতবা শুরু করবে। দুটি খুতবা দেবে এবং উভয় খুতবার মাঝে সামান্য বৈঠক করবে। খুতবাদানকারী ইমামকে অবশ্যই পবিত্র তথা অজুসমেত হতে হবে এবং তিনি দাঁড়িয়ে মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে খুতবা দেবেন। কোনো ওজর ব্যতীত বসে খুতবা দেওয়া মাকরূহ। খুতবা দেওয়ার সময় নামাজের ন্যায় হাত বাঁধবে না। একটি লাঠি কিংবা কামান হাতে থাকা উত্তম, কিন্তু জরুরি নয়।

بَابُ الْعِيْدَيْنِ

حُبِّبَ يَوْمَ الْفِطْرِ اَنْ يَأْكُلَ قَبْلَ صَلَاتِهٖ وَيَسْتَاكُ وَيَغْتَسِلُ وَ يَتَطَيَّبُ وَيَلْبَسُ اَحْسَنَ ثِيَابِهٖ وَيُؤَدِّىْ فِطْرَتَهٗ وَيَخْرُجَ اِلَى الْمُصَلّٰى غَيْرَ مُكَبِّرٍ جَهْرًا فِىْ طَرِيْقِهٖ نُفِىَ التَّكْبِيْرُ بِالْجَهْرِ حَتّٰى لَوْ كَبَّرَ مِنْ غَيْرِ جَهْرٍ كَانَ حَسَنًا وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلٰوةِ الْعِيْدِ وَشَرْطُ لَهَا شُرُوْطُ الْجُمُعَةِ وُجُوْبًا وَاَدَاءً اِلَّا الْخُطْبَةَ اَفَادَ هٰذِهِ الْعِبَارَةُ اَنَّ صَلٰوةَ الْعِيْدِ وَاجِبَةٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَهُوَ الْاَصَحُّ وَ قَدْ قِيْلَ اَنَّهَا سُنَّةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا فَاِنَّ مُحَمَّدًا (رحـ) قَالَ عِيْدَانِ اجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَالْاَوَّلُ سُنَّةٌ وَالثَّانِىْ فَرِيْضَةٌ فَاُجِيْبَ بِاَنَّ مُحَمَّدًا (رحـ) اِنَّمَا سَمَّاهَا سُنَّةً لِاَنَّ وُجُوْبَهَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَ وَقْتُهَا مِنْ اِرْتِفَاعِ ذُكَاءٍ اِلٰى زَوَالِهَا وَيُصَلِّىْ بِهِمُ الْاِمَامُ رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ لِلْاِحْرَامِ وَيُثْنِىْ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلٰثًا وَيَقْرَءُ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً ثُمَّ يَرْكَعُ مُكَبِّرًا وَ فِى الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلٰثًا وَاُخْرٰى لِلرُّكُوْعِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الزَّوَائِدِ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ فِيْهِمَا اَحْكَامَ الْفِطْرَةِ ـ

দুই ঈদ [ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা] -এর বর্ণনা

অনুবাদ : [ঈদুল] ফিতর দিবসে মোস্তাহাব হলো, নামাজের পূর্বে খানা খাওয়া, মিসওয়াক করা, গোসল করা, খোশবু লাগানো, উত্তম পোশাক পরিধান করা, সদকায়ে ফিতর আদায় করা। ঈদগাহের দিকে যাবে, তবে উঁচু আওয়াজে তাকবীর বলবে না। গ্রন্থকার পথে উঁচু আওয়াজে তাকবীর বলা নিষেধ করেছেন। এমনকি যদি উঁচু আওয়াজে তাকবীর না বলে [বরং আস্তে বলে] তবে তা ভালো। ঈদের নামাজের পূর্বে কোনো নফল নামাজ পড়বে না। জুমা ওয়াজিব হওয়া ও আদা (اداء) -এর জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, সেসব শর্ত ঈদ [-এর নামাজ ওয়াজিব হওয়া ও আদা] -এর জন্য প্রযোজ্য। তবে খুতবা নয়। উক্ত ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈদের নামাজ ওয়াজিব। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট, আর এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। তবে বলা হয় যে, আমাদের ওলামায়ে কেরামের নিকট ঈদের নামাজ সুন্নত। কারণ, ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, দুই ঈদ একত্রে জমায়েত হয়েছে– প্রথমটি সুন্নত এবং দ্বিতীয়টি ফরজ। এর উত্তর হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.) একে সুন্নত বলে এজন্য ব্যক্ত করেছেন যে, ঈদের وُجُوْب সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত। ঈদের নামাজের ওয়াক্ত হচ্ছে, সূর্য উপরে উঠার পর থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমাকাশে তা হেলে যাওয়া পর্যন্ত মুসল্লিদের নিয়ে ইমাম দুই রাকাত নামাজ পড়বে। তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়বে, অতঃপর তিন তাকবীর বলবে, ফাতেহা ও একটি সূরা পাঠ করবে, অতঃপর তাকবীর বলে রুকুতে যাবে। আর দ্বিতীয় রাকাত– প্রথমে কেরাত দ্বারা শুরু করবে, অতঃপর তিন তাকবীর বলবে এবং রুকুর জন্য আরেকটি তাকবীর বলবে। অতিরিক্ত তাকবীরের ক্ষেত্রে হাত উঠাবে। নামাজের পর দুটি খুতবা পড়বে এবং উভয় খুতবার মাঝে সদকায়ে ফিতরের বিধান আলোচনা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : জুমা ও দুই ঈদের নামাজে সাথে সম্পর্ক হলো, উভয়টি দিনের নামাজ। উভয়টি অনেক লোকসহ জামাতের সাথে আদায় করা হয়। উভয়টির কেরাত আওয়াজ করে পড়া হয়। জুমার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, দুই ঈদের জন্যও একই শর্ত রয়েছে। তবে খুতবার বিধান ভিন্ন। কারণ, খুতবা জুমার জন্য শর্ত, কিন্তু দুই ঈদের জন্য শর্ত নয়। যার উপর জুমা ওয়াজিব, তার উপর দুই ঈদের নামাজও ওয়াজিব। কিন্তু যেহেতু জুমা ফরজ আর দুই ঈদের নামাজ ফরজ নয়; বরং ওয়াজিব– তাই জুমার বর্ণনাকে আগে আনা হয়েছে এবং দুই ঈদের বর্ণনাকে পরে আনা হয়েছে।

ঈদের নামকরণ : ঈদ -এর নামকরণের কারণ হলো, عَادَ ـ يَعُوْدُ অর্থ– প্রত্যাবর্তন করা, বারবার আসা। যেহেতু এ মহিমান্বিত দিবসটিও প্রত্যেক বছরান্তে প্রত্যাবর্তন করে এবং এ দিনে মহান আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের পুনরাবৃত্তি ঘটান, তাই একে ঈদ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার নামাজ প্রবর্তন হওয়া সম্পর্কে আবূ দাঊদ শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ .

অর্থাৎ "হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন মদিনায় আগমন করেন তখন মদিনাবাসীর খেল-তামাশা করার জন্য দুটি দিন ছিল। তিনি বললেন, এ দুটি দিন কি? তারা বলল, জাহিলি যুগে এ দুই দিনে আমরা খেল-তামাশা করতাম। রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এ দুই দিনকে অন্য দুই দিনে পরিবর্তন করে দিয়েছেন, যা এ দুই দিনের চেয়েও উত্তম। তা হলো– ১. ঈদুল ফিতর, ২. ঈদুল আজহা।

قَوْلُهُ حُبِّبَ يَوْمَ الْفِطْرِ يَأْكُلَ الخ : حُبِّبَ শব্দটি تَحْبِيْب মাসদার থেকে مَجْهُوْل-এর সীগাহ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ব্যাপক, চাই সুন্নত হোক কিংবা মোস্তাহাব হোক। কেননা, উল্লিখিত বিষয়গুলোর মাঝে কোনো কোনোটিকে কেউ কেউ সুন্নত বলেছেন। যেমন– গোসল করা।

ঈদের দিনের সুন্নতসমূহ :

১. ঈদের নামাজের পূর্বে কোনো কিছু খাওয়া। এটি ঈদুল ফিতরের সাথে খাস। এ ক্ষেত্রে বিজোড় সংখ্যার খেজুর খাওয়া রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে। -[বুখারী শরীফ]
   আর যদি খেজুর না থাকে– তবে মিষ্টি জাতীয় অন্যকিছু খাবে। যেমন– হালুয়া, সেমাই ইত্যাদি।

২. মিসওয়াক করা। এটি প্রত্যেক অজুর সময় সুন্নত। অতএব, ঈদের ক্ষেত্রে তো এটি আরো উত্তমরূপে মোস্তাহাব।

৩. গোসল করা। হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ দুই ঈদের দিনেই গোসল করতেন। -[ইবনে মাজাহ]

৪. সুগন্ধি লাগানো। সিহাহ সিত্তার অনেক হাদীসে এ কথা বর্ণিত আছে যে, জুমার দিনে সুগন্ধি লাগাও। আর যেহেতু ঈদের দিন জুমার দিনের চেয়ে উত্তম, তাই সেদিন সুগন্ধি লাগানো আরো উত্তমরূপে মোস্তাহাব।

৫. উত্তম-সুন্দর পোশাক পরিধান করা। অর্থাৎ নিজের কাছে যেসব পোশাক আছে, তন্মধ্যে উত্তম যেটি, সেটিই পরিধান করবে। এমন নয় যে, নিজের কাছে নেই, তাই অন্যের থেকে ধার এনে উত্তম পোশাক পরিধান করবে। রাসূল ﷺ -এর কাছে একটি ইয়েমেনের চাঁদর ছিল। তিনি ঈদের দিনে এটি পরিধান করতেন। -[বাইহাকী শরীফ]

৬. ঈদের নামাজের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করা। এটিও ঈদুল ফিতরের সাথে খাস। কেননা, ঈদুল আজহায় সদকায়ে ফিতর নেই। সদকায়ে ফিতর যদিও ওয়াজিব, কিন্তু ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে তা আদায় করা সুন্নত। হযরত ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ এ হুকুমই দিয়েছেন যে, ঈদের নামাজ পড়ার জন্য যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় কর। -[বুখারী ও মুসলিম]

قَوْلُهُ وَيَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلّٰى الخ : এখানে مُصَلّٰى শব্দ দ্বারা ঈদগাহ উদ্দেশ্য। সাধারণত এটি শহরের বাহিরে খোলা ময়দানে হয়, যেখানে দুই ঈদের নামাজ আদায় করা হয়। যদিও জামে মসজিদে অনেক বড় জায়গা থাকে, তবুও ঈদগাহের দিকে যাওয়া সুন্নত। আর যদি ওজর ব্যতীত জামে মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করে, তবে তা জায়েজ, কিন্তু সুন্নতের পরিপন্থি। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। খুলাসাহ ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম নিজে ঈদগাহে চলে যাবেন এবং জামে মসজিদে নিজের স্থলাভিষিক্ত অন্য কাউকে দিয়ে যাবেন। যেন তিনি দুর্বল লোকদের নিয়ে জামে মসজিদে ঈদের নামাজ আদায়

করতে পারেন। কেননা, এক শহরের দুই স্থানে ঈদের নামাজ আদায় করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। এক্ষেত্রে দলিল হলো নবীজী ﷺ বৃষ্টি ইত্যাদির ওজর ব্যতীত মসজিদে ঈদের নামাজ পড়তেন না; বরং বাহিরে খোলা ময়দানে আদায় করতেন এ ব্যাপারে রেওয়ায়েত অনেক। তাই ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য আছে যে, ঈদগাহে যাওয়া সুন্নত না মোস্তাহাব? অতএব, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া হলো, ঈদগাহের দিকে যাওয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা। জমহুরের মাযহাবও এটিই এবং উসূলের কিতাবসমূহে এটিই বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে অপর এক ফতোয়া হলো, ঈদগাহের দিকে যাওয়া মোস্তাহাব। তবে এটি ভুল। কারণ, এর কোনো দলিল নেই। কেউ কেউ আরো আগে বেড়ে একে ওয়াজিব বলেন। এটিও ভুল। বিশুদ্ধ অভিমত হলো, এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

তাকবীর জোরে ও আস্তে বলা : ঈদগাহের দিকে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে তাকবীর বলবে। তবে তাকবীর উভয় ঈদের নামাজে হবে, না এক ঈদের নামাজে হবে? এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ঈদুল ফিতরে তাকবীর নেই; বরং কুরবানির ঈদে তাকবীর বলবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে, উভয় ঈদেই তাকবীর বলবে কেউ বলেন, আস্তে আস্তে কিংবা উঁচু আওয়াজে বলার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে; কিন্তু জায়েজ হওয়া ও মাকরূহ না হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মতানৈক্য নেই। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনোরূপ বহিরাগত নিষেধাজ্ঞা না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর জিকির নিষিদ্ধ হয় না।

ঈদের নামাজের পূর্বে নফল নামাজ নেই : ফজরের নামাজের পর থেকে ঈদের নামাজের আগ পর্যন্ত কোনো নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। কেননা, নবী করীম ﷺ থেকে এমন কিছু প্রমাণিত নেই। অথচ নবীজী ﷺ নামাজের অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এতে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন যে, হাদীসের বর্ণনা দ্বারা মাকরূহ হওয়া প্রমাণিত হয় না তবে এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, ঈদের দিন ফজরের পরে ঈদের নামাজের পূর্বে কোনো নামাজ আদায় করা প্রমাণিত নেই।

ঈদের নামাজ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি : জুমা ওয়াজিব হওয়ার যেসব শর্ত রয়েছে, সেসব শর্ত ঈদের নামাজের ক্ষেত্রেও রয়েছে। যেমন– মুসাফির, অসুস্থ, মহিলা, নাবালেগ, মাতাল ও মাজুরের উপর ওয়াজিব নয়। অনুরূপ জুমার আদা (اداء) -এর ক্ষেত্রেও যেসব শর্ত রয়েছে, সেগুলো ঈদের নামাজের আদা (اداء) -এর ক্ষেত্রেও রয়েছে। এতে অতিরিক্ত শর্ত হলো, এটি ময়দানে আদায় করা হবে। ঈদের নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য খুতবা শর্ত নয়, কিন্তু যদি ইমাম খুতবা না দেয় তবে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু ঈদের নামাজ বাতিল হবে না; বরং তা খুতবা ব্যতীতও সহীহ হবে। অতএব, জুমা ও ঈদের খুতবার মাঝে এটিই পার্থক্য। আরেকটি পার্থক্য হলো, জুমার খুতবা নামাজের পূর্বে দিতে হয় পক্ষান্তরে ঈদের খুতবা নামাজের পরে দিতে হয়।

قَوْلُهُ عِيْدَانِ اجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ : অর্থাৎ যদি একদিনে দুই ঈদ একত্র হয়ে যায়, তবে প্রথমটি হবে সুন্নত এবং দ্বিতীয়টি হবে ফরজ। একদিনে দুই ঈদ একত্র হওয়ার অর্থ হলো, জুমার দিনে ঈদুল আজহা কিংবা ঈদুল ফিতর সংঘটিত হওয়া। তখন প্রথমটি তথা ঈদের নামাজ সুন্নত এবং দ্বিতীয়টি তথা জুমার নামাজ ফরজ। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈদের নামাজ সুন্নত– ওয়াজিব নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এ অভিমতের উত্তর শারেহ (র.) এভাবে দিচ্ছেন যে, যেহেতু ঈদের وُجُوْبُ সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত, তাই একে সুন্নত বলে দিয়েছেন। যে জিনিস অন্য কোনো জিনিসের কারণে প্রমাণিত হয়, তবে একে তার নামে বলা হয়। যেমন– مُسَبَّبٌ -কে سَبَبٌ এবং مَدْلُوْل -কে دَلَالَتٌ বলা হয়। অনুরূপ এখানেও বলা হয়েছে।

ঈদের নামাজের ওয়াক্ত বা সময় : জুমা ও ঈদের নামাজের মধ্যে পার্থক্যসমূহের একটি হলো, জুমার ওয়াক্ত শুরু দ্বিপ্রহরের পর থেকে, পক্ষান্তরে ঈদের নামাজের ওয়াক্ত সূর্যোদয়ের পর থেকে শুরু হয়ে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে, উভয় ঈদের নামাজে আজান ও ইকামত নেই।

ঈদের নামাজের পদ্ধতি : অন্যান্য নামাজের ন্যায় প্রথমে নিয়ত করবে যে, আমি কিবলামুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে ছয় তাকবীরের সাথে ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আজহার দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ পড়ছি– "আল্লাহু আকবার।" অতঃপর ছানা পড়বে। অতঃপর তিনটি তাকবীর বলবে। প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠাবে, কিন্তু হাত বাঁধবে না; বরং ছেড়ে দেবে যখন তৃতীয় তাকবীর বলবে, তখন হাত বাঁধবে এবং কেরাত পড়বে। প্রথমে সূরা ফাতেহা পড়বে। অতঃপর অন্য কোনো সূরা পড়বে। অতঃপর তাকবীর বলে রুকু করবে। অন্যান্য নামাজের মতোই প্রথম রাকাত পূর্ণ করে দ্বিতীয় রাকাত শুরু করবে এতেও অন্যান্য নামাজের মতো প্রথমে সূরা ফাতেহা, অতঃপর অন্য কোনো সূরা পড়ে তিনটি তাকবীর বলবে। এতেও হাত উঠাবে, কিন্তু হাত বাঁধবে না। চতুর্থ তাকবীরের সময় রুকুতে যাবে এবং প্রথম রাকাতের ন্যায় শেষ করবে। অতঃপর খুতবা দেবে। এ অতিরিক্ত তাকবীরের ক্ষেত্রে অনেক রেওয়ায়েত রয়েছে। কিন্তু সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের উল্লিখিত পদ্ধতির উপর ইজমা' রয়েছে।

وَمَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْاِمَامِ لَمْ يَقْضِ اَىْ اِنْ صَلَّى الْاِمَامُ وَلَمْ يُصَلِّ رَجُلٌ مَعَهٗ لَا يَقْضِىْ وَيُصَلِّىْ غَدًا بِعُذْرٍ لَا بَعْدَهٗ وَالْاَضْحٰى كَالْفِطْرِ اَحْكَامًا لٰكِنَّ هٰهُنَا نَدْبُ الْاِمْسَاكِ اِلٰى اَنْ يُصَلِّىَ وَلَا يَكْرَهُ الْاَكْلُ قَبْلَهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَيُكَبِّرُ جَهْرًا فِى الطَّرِيْقِ وَيُعَلِّمُ فِى الْخُطْبَةِ تَكْبِيْرَاتِ التَّشْرِيْقِ وَالْاُضْحِيَّةَ وَيُصَلِّىْ بِعُذْرٍ اَوْ بِغَيْرِهٖ اَيَّامَهَا لَا بَعْدَهَا وَالْاِجْتِمَاعُ يَوْمَ عَرَفَةَ تَشَبُّهًا بِالْوَاقِفِيْنَ لَيْسَ بِشَىْءٍ اَىْ لَيْسَ بِشَىْءٍ مُعْتَبَرٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الثَّوَابُ فَاِنَّ الْوُقُوْفَ فِىْ مَكَانٍ مَخْصُوْصٍ وَهُوَ عَرَفَاتٌ قَدْ عُرِفَ قُرْبَةً اَمَّا فِىْ غَيْرِهَا فَلَا وَتَجِبُ تَكْبِيْرَاتُ التَّشْرِيْقِ وَهُوَ قَوْلُهٗ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ عَقِيْبَ كُلِّ فَرْضٍ اُدِّىَ بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ اِحْتِرَازٌ عَنْ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى الْمُقِيْمِ بِالْمِصْرِ وَمُقْتَدِيَةٍ بِرَجُلٍ وَمُسَافِرٍ مُقْتَدٍ بِمُقِيْمٍ اِلٰى عَصْرِ الْعِيْدِ وَقَالَا اِلٰى عَصْرِ اٰخِرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَبِهٖ يُعْمَلُ وَلَا يَدَعُهُ الْمُؤْتَمُّ وَلَوْ تَرَكَ اِمَامُهٗ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ইমামের সাথে [ঈদের] নামাজ পায়নি সে তার কাজা আদায় করবে না, অর্থাৎ যদি ইমাম ঈদের নামাজ পড়ে, আর এক ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাজ পায়নি, তবে সে ঈদের নামাজ কাজা করবে না। ওজরের কারণে ঈদের নামাজ আগামীকাল [পরের দিন] সকলেই পড়বে; এর পরে নয়। ঈদুল আজহার বিধিবিধান ঈদুল ফিতরের বিধিবিধানের ন্যায়। কিন্তু ঈদুল আজহার মধ্যে নামাজের পূর্বে না খাওয়া মোস্তাহাব। তবে নামাজের পূর্বে খাওয়া মাকরূহ নয় এবং এটিই উত্তম অভিমত। পথে জোরে জোরে তাকবীর বলবে। খুতবার মাঝে তাশরীকের তাকবীরসমূহ এবং কুরবানির বিধিবিধান বর্ণনা করবে। ওজরের কারণে হোক কিংবা ওজরবিহীন হোক, কুরবানির দিবসগুলোতেই ঈদের নামাজ পড়বে; এর পরে নয়। আরাফার দিবসকে আরাফার ময়দানে অবস্থানকারীদের সাথে তুলনা করে এক জায়গায় জমা হওয়া কোনো বিশেষ ব্যাপার নয়। অর্থাৎ [এটি] এমন কোনো গ্রহণযোগ্য বিষয় নয়, যার সাথে ছওয়াব সম্পৃক্ত। কেননা, এটি জানা বিষয় যে, বিশেষ স্থান তথা আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ছওয়াবের কাজ এবং নৈকট্য লাভের কারণ। কিন্তু তা অন্য স্থানে নয়। তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব। তাকবীরে তাশরীক হচ্ছে– اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ আরাফার দিন [৯ তারিখ] ফজরের পর থেকে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে [পড়বে], যা মোস্তাহাব জামাতের মাধ্যমে আদায় করা হয়েছে। [মোস্তাহাব জামাত বলে] শুধু মহিলাদের জামাত থেকে বিরত থেকেছেন। শহরে মুকীমের উপর [তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব]। ঐ মহিলার উপরও [ওয়াজিব] যে কোনো পুরুষের ইকতিদা করেছে এবং ঐ মুসাফিরের [উপরও], যে কোনো মুকীমের ইকতিদা করেছে। [এটি] ঈদের দিনের আসর পর্যন্ত [ওয়াজিব]। সাহেবাইন (র.) বলেন, তাশরীক দিবসসমূহের শেষ দিবসের আসর পর্যন্ত [তা ওয়াজিব] এবং এর উপর আমল চলছে। মুক্তাদী তাকবীর ছাড়বে না, যদিও ইমাম ছেড়ে দেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْاِمَامِ الخ :

একাকী ঈদের নামাজের কাজা নেই : যদি ইমাম মুসল্লিদের নিয়ে ঈদের জামাত করে, আর কোনো ব্যক্তি জামাত না পায় তবে সে তার কাজা আদায় করবে না। وَمَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْاِمَامِ لَمْ يَقْضِ ইবারত দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য। কেননা, শহরে জামাত বিভিন্ন জায়গায় হয়। আর সব জায়গার জামাত এক সময়ে হয় না। সে এক স্থানে জামাত না পেলে অন্য জামাতে শরিক হওয়ার জন্য চেষ্টা করা তার জন্য ওয়াজিব। এরপরেও যদি সে না পায় তবে তার উপর তা কাজা করা ওয়াজিব নয়।

ইমামসহ মুক্তাদীদের ঈদের নামাজের কাজা : যদি কোনো ওজরের কারণে ইমামসহ মহল্লার সকল লোকের নামাজ কাজা হয়ে যায়, তবে সকলে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করবে। এর সুরত হলো যেমন– প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে কিংবা চাঁদ উঠার খবর দ্বিপ্রহরের পর জানা গেছে, কিংবা দ্বিপ্রহরের সামান্য পূর্বে জানল– যে সময়ে নামাজ আদায় করা সম্ভব নয়। দলিল হলো, নবী করীম ﷺ-এর যুগে শাওয়ালের চাঁদ দেখার দিবসে অর্থাৎ রমজানের ২৯ তারিখে সন্ধ্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। রাত শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু চাঁদ উঠার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। নবীজী ﷺ সহ সাহাবায়ে কেরাম ৩০ তারিখে রোজা রেখেছেন। কিন্তু দ্বিপ্রহরের পর চাঁদ উঠার সংবাদ পাওয়া গেছে। তখন রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে রোজা ভেঙ্গে ফেলার হুকুম দিয়েছেন এবং পরবর্তী দিন ঈদের নামাজ পড়ার জন্য হুকুম করেছেন। এ ঘটনা বিভিন্ন শব্দে আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বানে বর্ণিত হয়েছে।

ঈদুল আজহার নামাজ : কুরবানির নির্ধারিত তিনদিনের যে-কোনো একদিনে ঈদুল আজহার নামাজ পড়বে; এরপরে জায়েজ নেই। জিলহজের দশ, এগারো ও বারো তারিখ হলো কুরবানির দিবস। এরপরে আর কুরবানি করা জায়েজ নেই। কেননা, এ নামাজের ওয়াক্তই কুরবানির ওয়াক্ত। তবে দশম তারিখে ঈদের নামাজ পড়া সুন্নত। এরপর এগারো ও বারো তারিখে পড়ার জন্য ওজর ব্যতীত রেখে দেওয়া সুন্নতের পরিপন্থি হওয়ার কারণে গুনাহগার হবে। তাই দশম তারিখে পড়াই উত্তম।

قَوْلُهُ وَالْإِجْتِمَاعُ يَوْمَ عَرَفَةَ تَشَبُّهًا : জিলহজের দশম তারিখ তথা আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে হাজীরা যেভাবে অবস্থান করে তাদের মতো করে এখানেও অবস্থান করা উত্তম। কেউ কেউ বলেন, গ্রন্থকার এখানে لَيْسَ بِشَيْءٍ বলে এর খণ্ডন করেছেন। অর্থাৎ এমনটি করা ছওয়াবের কারণ নয়। কোথাও যদি কেউ এমনটি করেও তবে এর উপর ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে না। কারণ, শরিয়তে এটি না ওয়াজিব, না সুন্নত, না মোস্তাহাব। বেশির চেয়ে বেশি এতটুকু বলা যায় যে, এটি মুবাহ; বরং কেউ কেউ একে মাকরূহও বলেন। তবে তারা বলেন, মাকরূহ তখনই হবে, যখন হাজীদের মতো করার ইচ্ছা করবে।

তাকবীরে তাশরীকের হুকুম : ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব, না সুন্নত– এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশ ফকীহের অভিমত হলো, এটি ওয়াজিব। কারণ, রাসূল ﷺ এর উপর স্থায়ীভাবে আমল করেছেন। কেউ কেউ একে সুন্নত বলেন। তাঁর দলিলও এটিই যে, নবী ﷺ এর উপর স্থায়ীভাবে আমল করেছেন। أَيَّام تَشْرِيق শব্দটি شَرْقُ اللَّحْمِ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ– গোশতকে শুকানোর জন্য রৌদ্রে দেওয়া। একে تَشْرِيق এ কারণে বলা হয় যে, এ দিবসগুলোতে আরবের লোকেরা গোশত শুকাত। এসব দিবসের প্রতি লক্ষ্য করে তাকবীরগুলোকে তাকবীরে তাশরীক বলা হয়। এক অভিমত অনুযায়ী তাশরীকের অর্থ– উঁচু আওয়াজে তাকবীর বলা।

তাকবীরে তাশরীকের শব্দাবলি : তাকবীরে তাশরীকের শব্দ হচ্ছে– اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ নবী করীম ﷺ থেকে এমন اَلْفَاظ-ই প্রমাণিত আছে। নবী করীম ﷺ জিলহজ মাসের নবম তারিখের ফজরের নামাজ থেকে শুরু করে তাশরীক দিবসের শেষ দিনের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর উল্লিখিত শব্দেই তাকবীর বলতেন, যাকে অধিকাংশ সাহাবী বর্ণনা করেছেন। ইবারতের وَهُوَ قَوْلُهُ-এর "ہ" যমীর তাকবীর পাঠকারী ব্যক্তির দিকে ফিরবে।

قَوْلُهُ أُدِّيَ بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ : এটি مَجْهُوْل-এর সীগাহ এবং فَرْض শব্দের صِفَة এখানে جَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ বলার দ্বারা শুধু মহিলাদের জামাতকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ مُنْفَرِدْ-কেও বাদ দেওয়া হয়েছে, যদিও সে আদা (ادا) পড়ে অর্থাৎ তাশরীকের দিবসগুলোতে যদি কোনো নামাজ কাজা হয়ে যায়, তবে তা কাজা আদায়ের সময় এ তাকবীর ওয়াজিব নয়। অনুরূপ যদি কেউ উক্ত দিবসগুলোতে জামাত ব্যতীত একাকী নামাজ পড়ে, তবুও তার উপর এ তাকবীর ওয়াজিব নয়। অনুরূপ عَلَى الْمُقِيْمِ الْمِصْرِ বলে মুসাফিরকেও এর থেকে পৃথক করেছেন। অর্থাৎ মুসাফিরের উপর এ তাকবীর ওয়াজিব নয়। শর্ত হলো, সে মুনফারিদ হতে হবে। পক্ষান্তরে যদি কোনো মুসাফির কোনো মুকীমের ইকতিদা করে, তবে ইমামের অনুসরণ করত তার উপরও তাকবীর ওয়াজিব হবে। অনুরূপ যদি কোনো মহিলা কোনো পুরুষের ইকতিদা করে, তবে পুরুষ ইমামের অনুসরণ করত উক্ত মুক্তাদী মহিলার উপরও ওয়াজিব হবে। কিন্তু মহিলা তাকবীর জোরে বলবে না; বরং আস্তে আস্তে বলবে।

قَوْلُهُ وَمُسَافِرٌ مُقْتَدٍ بِمُقِيْمِ الخ : অর্থাৎ যদি কোনো মুসাফির কোনো মুকীমের অনুসরণ করে, তবে মুসাফিরের উপর তাকবীর ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি কোনো মুসাফির ব্যক্তি ইমাম হয়, তবে ইমামের উপর তাকবীর ওয়াজিব নয়; বরং মুক্তাদীদের উপর তাকবীর ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَدَعُهُ الْمُؤْتَمُّ الخ : যদি ইমাম ভুলে কিংবা স্বেচ্ছায় তাকবীর ছেড়ে দেয়, তবে মুক্তাদীরা তা ছাড়বে না; বরং তারা তাকবীর বলবে যেন ইমামের স্মরণ হয় এবং তিনিও তা পড়েন।

بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

إِذَا اشْتَدَّ خَوْفُ عَدُوٍّ جَعَلَ الْإِمَامُ أُمَّةً نَحْوَ الْعَدُوِّ وَصَلّٰى بِأُخْرٰى رَكْعَةً إِنْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ رَكْعَتَيْنِ إِنْ كَانَ مُقِيْمًا وَمَضَتْ هٰذِهِ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ وَصَلّٰى بِهِمْ مَا بَقِيَ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ وَ ذَهَبَتْ إِلَيْهِ أَيْ ذَهَبَتْ هٰذِهِ الطَّائِفَةُ إِلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الْأُوْلٰى وَأَتَمَّتْ بِلَا قِرَاءَةٍ ثُمَّ الْأُخْرٰى بِقِرَاءَةٍ وَفِي الْمَغْرِبِ يُصَلِّيْ بِالْأُوْلٰى رَكْعَتَيْنِ وَبِالْأُخْرٰى رَكْعَةً اِعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْفَجْرَ لٰكِنَّهُ يُفْهَمُ حُكْمُهُ مِنْ حُكْمِ الْمُسَافِرِ فَالْعِبَارَةُ الْحَسَنَةُ مَا حَرَّرْتُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلّٰى بِأُخْرٰى رَكْعَةً فِي الثُّنَائِيْ وَرَكْعَتَيْنِ فِيْ غَيْرِهِ فَالثُّنَائِيْ يَتَنَاوَلُ الْفَجْرَ وَظُهْرَ الْمُسَافِرِ وَعَصْرَهُ وَعِشَاءَهُ وَغَيْرُ الثُّنَائِيْ يَتَنَاوَلُ الثُّلَاثِيْ أَيِ الْمَغْرِبَ وَظُهْرَ الْمُقِيْمِ وَعَصْرَهُ وَعِشَاءَهُ وَإِنْ زَادَ الْخَوْفُ صَلُّوْا رُكْبَانًا فُرَادٰى بِإِيْمَاءٍ إِلٰى مَا شَاؤُوْا إِنْ عَجَزُوْا عَنِ التَّوَجُّهِ وَيُفْسِدُهَا الْقِتَالُ وَالْمَشْيُ وَالرُّكُوْبُ ۔

পরিচ্ছেদ : ভয়কালীন নামাজ

অনুবাদ : যখন দুশমনের ভয় তীব্র হবে, তখন ইমাম এক দলকে দুশমনের মোকাবিলায় পাঠাবেন এবং আরেক দলকে নিয়ে এক রাকাত পড়বেন, যদি মুসাফির হন। আর যদি মুকীম হন, তবে দুই রাকাত পড়বেন। অতঃপর এই দল দুশমনের মোকাবিলায় যাবে এবং ঐ দল জামাতে আসবে। [ইমাম] তাদের সাথে বাকি নামাজ আদায় করবেন এবং একাকী সালাম ফিরাবেন এবং এই দল দুশমনের মোকাবিলায় যাবে। আর প্রথম দল জামাতে আসবে এবং কেরাত ব্যতীত নামাজ পূর্ণ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় দল আসবে এবং কেরাতের সাথে বাকি নামাজ পূর্ণ করবে। মাগরিবের নামাজে প্রথম দলের সাথে দুই রাকাত এবং দ্বিতীয় দলের সাথে এক রাকাত পড়বেন। জেনে রেখ যে, গ্রন্থকার ফজরের নামাজের কথা উল্লেখ করেননি, কিন্তু এর হুকুম মুসাফিরের হুকুম দ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং উত্তম ইবারত ঐটিই যা আমি "মুখতাসারে বিকায়া"তে উল্লেখ করেছি। গ্রন্থকারের কথা– صَلّٰى بِأُخْرٰى رَكْعَةً فِي الثُّنَائِيْ الخ অর্থাৎ ইমাম দুই রাকাতবিশিষ্ট নামাজে প্রথম দলের সাথে এক রাকাত পড়বে এবং দুই রাকাতের অধিক রাকাতবিশিষ্ট নামাজে দুই রাকাত পড়বে। অতএব, দুই রাকাতবিশিষ্ট নামাজে ফজর, মুসাফিরের জোহর, আসর এবং ইশা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর দুই রাকাতের চেয়ে অধিক রাকাতবিশিষ্ট নামাজে তিন রাকাতবিশিষ্ট নামাজ তথা মাগরিব এবং মুকীমের জোহর, আসর ও ইশার নামাজ অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি ভয় অধিক তীব্র হয়, তবে সওয়ার হয়ে ইশারার মাধ্যমে একাকী নামাজ পড়বে। যদি কিবলার দিকে মুখ করতে অক্ষম হয় তবে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে পড়বে। লড়াই করা, পায়ে হাঁটা এবং সওয়ারিতে আরোহণ করার দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِذَا اشْتَدَّ خَوْفُ عَدُوٍّ الخ -এর ব্যাখ্যা : বিকায়া গ্রন্থকারের বাহ্যিক ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, ভয়কালীন নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য ভয় তীব্র হওয়া শর্ত। অথচ বেনায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, আমাদের আম মাশায়েখে কেরামের মতে, ভয় তীব্র হওয়া শর্ত নয়; বরং দুশমনের নিকটবর্তী এসে যাওয়ার দ্বারাই ভয়কালীন নামাজের جَوَازْ প্রমাণিত হয়ে যায়– যদিও ভয় তীব্র না হোক। মাশায়েখে কেরাম এ কথাও বলেছেন যে, উল্লিখিত পদ্ধতিতে নামাজ পড়ার হুকুম তখনই, যখন সকল মানুষ এক ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়ার আশাবাদী হবে। পক্ষান্তরে যদি বিভিন্ন ইমামের পিছনে বিভিন্ন জামাত পড়ার সুরত হয়ে যায়, তবে ভিন্ন ভিন্ন জামাতে পূর্ণ নামাজ পড়বে অর্থাৎ একদল প্রথমে এক ইমামের সাথে পূর্ণ নামাজ পড়বে, অতঃপর দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় ইমামের পিছনে পূর্ণ নামাজ পড়বে।

ভয়কালীন নামাজের পদ্ধতি : ইমাম সর্বপ্রথম সৈনিকদের দুই দলে বিভক্ত করবে। তন্মধ্যে একদলকে দুশমনের মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দেবে এবং অন্যদলের সাথে নামাজ শুরু করে দেবে। এখন যদি তারা সকলে মুসাফির হয়, তবে এক রাকাত পড়ে ইমামকে ছেড়ে দুশমনের মোকাবিলায় চলে যাবে। অতঃপর যারা প্রথমে দুশমনের মোকাবিলায় ছিল তারা এসে ইমামের পিছনে ইকতিদা করবে এবং ইমাম তাদেরকে নিয়ে বাকি নামাজ পূর্ণ করবে। যখন ইমাম সালাম ফিরিয়ে ফেলবে, তখন মুক্তাদীগণ সালাম ফিরানো ব্যতীত দুশমনের মোকাবিলায় চলে যাবে এবং প্রথম দলের লোকেরা এসে কেরাত ব্যতীত নিজেদের নামাজ পূর্ণ করবে এবং সাথে সাথে দুশমনের মোকাবিলায় চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দল ফিরে আসবে এবং কেরাতের সাথে নিজেদের নামাজকে পূর্ণ করবে। কিন্তু যদি মাগরিবের নামাজ হয়, তবে ইমাম প্রথম জামাতের সাথে দুই রাকাত পড়বে, যদিও তারা মুসাফির হয় এবং দ্বিতীয় জামাতের সাথে এক রাকাত পড়বে। এ পদ্ধতি নবী করীম ﷺ থেকে প্রমাণিত, যা সুনান গ্রন্থকারগণ নিজেদের কিতাবে রেওয়ায়েত করেছেন।

قَوْلُهُ وَأَتَمَّتْ بِلَا قِرَاءَةٍ الخ : বাকি নামাজ পূর্ণ করার মাঝে তাদের কেরাত পড়তে হবে না। কারণ, এ প্রথম দল لَاحِقْ কারণ, তারা নামাজের প্রথম অংশ পেয়েছে। তাই তারা কেরাত ব্যতীত নামাজ পূর্ণ করবে। যেরূপ লাহেকের হুকুম। দ্বিতীয় দল এর পরিপন্থি। কারণ, তারা নামাজের শেষ অংশ পেয়েছে, তাই সে হবে মাসবূক। আর মাসবূক ব্যক্তি তার ছুটে যাওয়া নামাজে কেরাত পড়ে।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْأُخْرٰى بِقِرَاءَةٍ الخ : এতে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথম দলের পরে দ্বিতীয় দল আদায় করবে। আর যদি প্রত্যেকে জামাত একসঙ্গে আদায় করে তবুও তা জায়েজ। আর তা মুতলাক (مُطْلَقْ) রাখার দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় দলের ইচ্ছা– তারা ইচ্ছা করলে এখানে ফিরে না এসে সেখানে থেকেই নামাজকে শেষ করে ফেলতে পারে কিংবা এখানে আসতেও পারে। তবে সেখানে শেষ করে ফেলাই উত্তম। কেননা, এতে হরকত (حَرَكَتْ) কম হয়।

قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلّٰى بِأُخْرٰى رَكْعَةً الخ : এ ইবারতে أُخْرٰى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রথম দল, যাদের সাথে ইমাম নামাজ শুরু করবে। আবার এর দ্বারা দ্বিতীয় দলও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, ইমাম প্রথম দলকে দুশমনের মোকাবিলায় রেখে এসেছেন এবং দ্বিতীয় দলের সাথে নামাজ শুরু করেছেন। এদিক থেকে তো প্রকৃতপক্ষেই তারা দ্বিতীয় দল, কিন্তু নামাজ পড়ার দিক থেকে এটি প্রথম দল।

قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ الْخَوْفُ صَلُّوْا الخ : অর্থাৎ যদি দুশমন হামলা করে দেয় কিংবা একেবারে সামনে থাকে যে-কোনো সময় হামলা করতে পারে, তবে জামাতে নামাজ পড়বে না; বরং সওয়ারির উপর একা একা ইশারার মাধ্যমে নামাজ পড়বে। যদি দুশমনের ভয়ে কিবলামুখী হওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে যেদিকে মুখ করা সম্ভব সেদিকে ফিরেই নামাজ পড়বে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا এবং তিনি আরো বলেন– أَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ এটি তখন, যখন কোনো কারণে এমনটি করতে বাধ্য হবে। আর যদি তারা নিজেরা দুশমনের উপর হামলা করে, তবে দুশমনদের সেই ভয় থাকবে না। তাই তখন সওয়ারিতে চলাবস্থায় নামাজ সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ وَيُفْسِدُهَا الْقِتَالُ وَالْمَشْيُ الخ : অর্থাৎ নামাজ পড়াবস্থায় যদি কেউ যুদ্ধ করে কিংবা হাঁটে কিংবা সওয়ারিতে আরোহণ করে, তবে তার নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

بَابُ الْجَنَائِزِ

سُنَّ لِلْمُحْتَضَرِ اَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلٰى يَمِيْنِهٖ وَاخْتِيْرَ الْاِسْتِلْقَاءُ وَيُلَقَّنُ الشَّهَادَةُ فَاِنْ مَاتَ يُشَدُّ لِحْيَاهُ وَيُغْمَضُ عَيْنَاهُ وَيُجَمَّرُ تَخْتُهٗ وَكَفَنُهٗ وِتْرًا وَ يُوْضَعُ عَلَى التَّخْتِ وَيُجَرَّدُ وَيُسْتَرُ عَوْرَتُهٗ وَيُوَضَّأُ بِلَا مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) وَيُفَاضُ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلًى بِسِدْرٍ اَوْ حَرْضٍ وَاِلَّا فَالْقَرَاحُ اَىْ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمَاءُ الْقَرَاحُ وَيُغْسَلُ رَأْسُهٗ وَلِحْيَتُهٗ بِالْخِطْمِيِّ ثُمَّ يُضْجَعُ عَلٰى يَسَارِهٖ وَيُغْسَلُ حَتّٰى يَصِلَ الْمَاءُ اِلَى التَّحْتِ ثُمَّ عَلٰى يَمِيْنِهٖ كَذٰلِكَ وَاِنَّمَا قُدِّمَ الْاِضْجَاعُ عَلَى الْيَسَارِ لِتَكُوْنَ الْبِدَايَةُ فِى الْغُسْلِ بِجَانِبِ يَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُجْلَسُ مُسْتَنِدًا وَ يُمْسَحُ بَطْنُهٗ بِرِفْقٍ وَمَا خَرَجَ يُغْسَلُ وَلَمْ يُعَدْ غُسْلُهٗ ثُمَّ يُنْشَفُ بِثَوْبٍ وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُهٗ وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُهٗ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) وَيُجْعَلُ الْحَنُوْطُ عَلٰى رَأْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ وَالْكَافُوْرُ عَلٰى مَسَاجِدِهٖ ـ

পরিচ্ছেদ : জানাজার নামাজ

অনুবাদ : মৃত্যু নিকটবর্তী ব্যক্তির জন্য সুন্নত হলো, তাকে ডান পার্শ্বের উপর কিবলামুখী করে রাখবে। মুতাআখখিরীন চিত করে শুয়ানোকে পছন্দ করেন এবং কালিমায়ে শাহাদাতের তালকীন করতে থাকবে। অতএব, যদি মরে যায়, তবে তার দাড়ি বেঁধে দেবে এবং তার চক্ষু বন্ধ করে দেবে। তার খাটকে ধুনা ও কাফন বিজোড় করে দেওয়া হবে। তাকে খাটে রাখা হবে। শরীরকে বিবস্ত্র করা হবে এবং মহিলাকে আবৃত্ত রাখা হবে। কুলি ও নাকে পানি দেওয়া ব্যতীত অজু করানো হবে। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। বরই পাতা কিংবা উশনান ঘাষ দিয়ে গরম করা পানি তার উপর ঢালবে। অন্যথায় পরিষ্কার পানি [ঢালবে]। অর্থাৎ যদি বরই পাতা কিংবা উশনান ঘাষ না হয়, তবে শুধু পানি [ঢালবে]। মৃত ব্যক্তির মাথা ও দাড়িকে খিতমী দ্বারা ধৌত করবে। অতঃপর বাম পার্শ্বে শুয়ানো হবে এবং গোসল করানো হবে, যেন পানি নীচ পর্যন্ত পৌঁছে। অতঃপর ডান পার্শ্বে অনুরূপ শুয়ানো হবে। বাম পার্শ্বে শুয়ানোকে এজন্য আগে পেশ করা হয়েছে যে, যেন ডান দিক থেকে গোসল শুরু করা যায়। অতঃপর ঠেস দিয়ে বসানো হবে, সহজভাবে তার পেট মাসেহ করবে এবং যা কিছু বের হবে তা ধৌত করবে। দ্বিতীয়বার গোসল দেবে না। অতঃপর কাপড় দ্বারা তার শরীর শুকানো হবে। মৃত ব্যক্তির নখ কাটা হবে না এবং তার চুল আঁচড়ানো হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। তার মাথা ও দাড়িতে হুনূত সুগন্ধি লাগানো হবে এবং তার সিজদার স্থানে কাফুর লাগানো হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ بَابُ الْجَنَائِزِ :

جَنَائِزُ শব্দের বিশ্লেষণ : جَنَائِزُ শব্দটি جَنَازَةٌ-এর বহুবচন। جَنَازَةٌ শব্দের جِيْم অক্ষরে যবরের সাথে পড়লে অর্থ হবে– মৃত ব্যক্তি। আর যেরের সাথে পড়লে অর্থ হবে– খাটিয়া যার উপর মুর্দাকে রাখা হয়। জানাজার পরিচ্ছেদকে শেষে পেশ করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়, মৃত্যু যেহেতু সর্বশেষ পর্যায়ে আসে এজন্য জানাজার নামাজকে সর্বশেষ বর্ণনা করা হয়েছে।

মৃত ব্যক্তির উপর জানাজা নামাজ পড়ার কারণ : আকল বা বুদ্ধির চাহিদা হলো, যখন কোনো ব্যক্তিকে অনেক লোক মিলে কোনো আলীশান বিচারকের দরবারে নিয়ে তার জন্য সুপারিশ করে, তার ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করে এবং তার জন্য অনুনয় বিনয় করে কাঁদে, তবে তার ক্ষমা হয়ে যায়। এটাই হলো জানাজা নামাজের দর্শন। অর্থাৎ জানাজা নামাজের প্রবর্তন এ কারণে করা হয়েছে যে, মু'মিনদের একটি দল যদি মুর্দারের জন্য সুপারিশে শরিক হয়, তবে তা মুর্দারের উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হওয়ার ব্যাপারে বিরাট প্রভাব রাখে। রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهٖ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ ـ

অর্থাৎ "কোনো মুসলমান মারা যাওয়ার পর যদি তার জানাজায় এমন চল্লিশজন ব্যক্তি উপস্থিত হয়, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেনি, তবে ঐ মুর্দারের ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবুল করা হয়। এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মানুষ তার জানাজায় শরিক হয়ে তার মাগফিরাত কামনা করে এবং তা তার উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব রাখে।

জানাজার নামাজের হুকুম : জানাজার নামাজ পড়া ফরজে কেফায়া, যা কিছু লোক আদায় করার দ্বারা সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। এর হিকমত হলো, যদি সকল লোক জানাজার নামাজের জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে তারা সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে তাদের উপকারী কর্মকাণ্ড বেকার হয়ে যাবে। সুতরাং এ ধরনের কাজে সব ধরনের লোক জমায়েত হওয়া আবশ্যক নয়।

قَوْلُهٗ سُنَّ لِلْمُحْتَضَرِ اَنْ يُوَجَّهَ الخ : এটি مَجْهُوْل-এর সীগাহ। উদ্দেশ্য হলো, যার মৃত্যু উপস্থিত হয় কিংবা যার কাছে আজরাঈল আসে, তাকে مُحْتَضَرْ [মুহতাযার] বলে। এমন ব্যক্তিকে ডান কাত করে শুয়ায়ে চেহারা কিবলামুখী করে রাখবে। মুতাআখখিরীন ওলামায়ে কেরাম "চিত হয়ে শুয়ে চেহারা কিবলামুখী করে রাখাকে গ্রহণ করেছেন।" সর্বোপরি উভয় সুরত জায়েজ। এর দলিল হলো–

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ سَأَلَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ فَقَالُوْا تُوُفِّيَ وَأَوْصٰى بِثُلُثِ مَالِهٖ لَكَ وَأَوْصٰى اَنْ يُوَجَّهَ اِلَى الْقِبْلَةِ لَمَّا احْتُضِرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَصَابَ الْفِطْرَةَ ـ

অর্থাৎ "যখন রাসূল ﷺ মদিনা শরীফে তাশরীফ আনেন তখন হযরত বারা ইবনে মা'রূর (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। মৃত্যুর সময় তাঁর সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ আপনার জন্য অসিয়ত করে গেছেন এবং এটিও অসিয়ত করে গেছেন যে, মৃত্যুর সময় যেন তাঁকে কিবলামুখী করে রাখা হয়। রাসূল ﷺ বললেন, সে ইসলামের ফিতরাতকে চিনেছে।" –[আবূ দাউদ, নাসাঈ ও বায়হাকী]

قَوْلُهٗ عَلٰى يَمِيْنِهٖ : অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে তার ডান পার্শ্বের উপর শুয়ায়ে কিবলামুখী করে রাখবে। যেমন– আমাদের দেশে কিবলা পশ্চিম দিকে, তাই মৃত ব্যক্তির মাথা উত্তর দিকে, পা দক্ষিণ দিকে করে দেবে এবং মুখমণ্ডল কিবলামুখী করে দেবে, যেন শরিয়তের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

হযরত বারা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে বলেছেন, যখন তুমি বিছানায় শুইতে যাও, তখন নামাজের অজুর ন্যায় অজু কর অতঃপর ডান পার্শ্বের উপর শুয়ে যাও এবং পড়–

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ اِلَيْكَ وَ اَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَتَهٗ وَ رَهْبَتَهٗ اِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ ـ

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ বলেছেন, এখন যদি তুমি মরে যাও, তবে ইসলামের উপরই তোমার মৃত্যু হবে।" –[বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ]

قَوْلُهٗ وَاخْتِيْرَ الْاِسْتِلْقَاءُ : অর্থাৎ মুতাআখ্খিরীন ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য হলো, মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে চিত করে শুইয়ে দেওয়া, তার মুখমণ্ডল আসমানের দিকে রাখা এবং তার পা কিবলার দিকে রাখা। এতে তার রূহ বের হতে সহজ হয়, আর মৃত্যুর পর তার চক্ষু বন্ধ করা ও দাড়ি বাঁধা সহজ হয়। তার মাথা কিছুটা উপরে উঠিয়ে দেবে যেন তার মুখমণ্ডল কিবলামুখী হয়ে যায়। এটি তখন করবে যখন তা করা কষ্ট না হবে; অন্যথায় তাকে সহজ অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

قَوْلُهٗ وَيُلَقَّنُ الشَّهَادَةُ : অর্থাৎ তার আশপাশের লোকেরা তাকে কালিমা শাহাদাতের তালকীন দেবে। 'নাহর' নামক গ্রন্থকার একে মোস্তাহাব বলেছেন, "কীনাহ" নামক গ্রন্থকার একে ওয়াজিব বলেছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিদের لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-এর তালকীন দাও।" –[মুসলিম শরীফ]

তালকীন করার পদ্ধতি হলো, লোকেরা এ পরিমাণ আওয়াজে কালিমা শরীফ পড়বে যেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি শুনে পড়তে পারে। কিন্তু তাকে এ কথা বলা হবে না যে, কালিমা পড়। কেননা, অত্যধিক কষ্টের কারণে হয়তো বা তা পড়তে অস্বীকার করে ফেলতে পারে। অতএব, তাকে তা নির্দেশ করা হবে না।

قَوْلُهُ يُشَدُّ لَحْيَاهُ : অর্থাৎ যখন তার রূহ বের হয়ে যাবে, তখন তার দাড়ি বেঁধে দেওয়া হবে এবং চক্ষু বন্ধ করে দেওয়া হবে, যেন তার আকৃতি স্বাভাবিক থাকে। অন্যথায় তার মুখ খুলে যাবে, চক্ষুগুলোও ভাসাভাসা হয়ে যাবে, যার দ্বারা আকৃতি অস্বাভাবিক হয়ে যায় এবং ভয়ঙ্কর মনে হয়।

قَوْلُهُ وَيُجَمَّرُ تَخْتُهُ : অর্থাৎ যে খাটে তাকে গোসল দেওয়া হবে তাকে সুগন্ধি দিয়ে তিন/ পাঁচ/ সাতবার ধুনা করা হবে। অনুরূপ মৃত ব্যক্তির কাফন ও যার উপর তাকে রাখা হবে তাকে ধুনা করা হবে।

قَوْلُهُ وَيُجَرَّدُ وَيُسْتَرُ الخ : অর্থাৎ তার কাপড় খুলে ফেলা হবে, সতর খোলা হবে না; বরং সতর ঢেকে রাখা হবে। এটিই সুন্নত তরিকা। আর যদি তার পরিধেয় কাপড়সহ গোসল দেওয়া হয় তবুও তা জায়েজ। তবে শর্ত হলো, পরিধেয় কাপড়গুলো পাক হতে হবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর হাদীস এ ক্ষেত্রে দলিল। হাদীসটি হচ্ছে– "যখন সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ -কে গোসল দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁরা বলতে শুরু করলেন, আমাদের জানা নেই যে, আমরা রাসূল ﷺ -এর কাপড় খুলব? যেরূপ আমরা অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের কাপড় খুলে ফেলি, নাকি তার পরিধেয় কাপড়সহ গোসল দেব? এখন কেউ খুলতে বলছেন, আবার কেউ নিষেধ করছেন। কেউ চুপও রয়েছেন। যখন তাঁদের মাঝে মতানৈক্য হলো; তখন আল্লাহ তাঁদের উপর ঘুম সওয়ার করে দিলেন। অতঃপর ঘরের এক প্রান্ত থেকে আওয়াজ হলো, তাঁর কাপড়সহ তাঁকে গোসল দাও। তাঁরা তাঁকে কাপড়সহ গোসল দিলেন।" –[আবূ দাউদ শরীফ]

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সময় কুলি ও নাকে পানি দেওয়া হবে না। কেননা, মৃত ব্যক্তির কানে ও নাকে পানি দিলে তা বের করা কষ্টকর হয়ে যাবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির উপর গোসল ফরজ হয়ে থাকে, তবে তাকে কষ্টসাধ্য হলেও কুলি ও নাকে পানি দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) সর্বাবস্থায় কুলি ও নাকে পানি দেওয়াকে আবশ্যক বলেন। তাঁর দলিল হলো, তিনি একে নামাজের অজুর উপর কিয়াস করেন। আমাদের দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেন–

اَلْمَيِّتُ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ وَلَا يُمَضْمِضُ وَلَا يَسْتَنْشِقُ .

অর্থাৎ "মৃত ব্যক্তিকে নামাজের অনুরূপ অজু করানো হবে। তবে কুলি করানো যাবে না এবং নাকেও পানি দেওয়া যাবে না।" তা ছাড়া মৃত ব্যক্তির নাকে পানি দিলে এবং কুলি করালে স্বাভাবিকভাবে তা আবার বের করা যায় না।

قَوْلُهُ ثُمَّ يُضْجَعُ عَلٰى يَسَارِهٖ : ইবারতের ভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, গোসলের বর্ণনা এখন শুরু হলো। ইতঃপূর্বে পানি প্রবাহিত করা ও খিতমী দিয়ে ধোয়ার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা মূলত ভালোভাবে পরিষ্কার করা উদ্দেশ্যে। আল্লামা শারাম্বুলালী (র.) এটিই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। 'বাহর' নামক গ্রন্থকার লেখেন, এ গোসলও "তিন গোসল" থেকে বাহিরে নয়। উদ্দেশ্য হলো, বরই পাতা দিয়ে গরমকৃত পানি দিয়ে গোসল দেবে; ঠাণ্ডা পানি দিয়ে নয় এবং শুধু গরম পানি দিয়েও নয়। আল-ফাতাহ্ নামক গ্রন্থের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়– গোসল তিন প্রকার– ১. শুধু গরম পানি দ্বারা, ২. বরই পাতা দিয়ে গরম করা পানি দ্বারা, ৩. কাফুর মিশ্রিত পানি দ্বারা। হযরত ইমাম আতিয়্যাহ্ (র.)-এর হাদীস হলো– "তিনি দুবার বরই পাতার গরম পানি দ্বারা গোসল দিতেন এবং তৃতীয়বার কাফুর মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দিতেন।" –[আবূ দাউদ শরীফ]

قَوْلُهُ وَمَا خَرَجَ يُغْسَلُ الخ : অর্থাৎ পেটকে স্বাভাবিক চাপ দেওয়ার পর যদি তার পায়খানা ও পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হয়, তবে তা শুধু ধুয়ে ফেলবে। পুনরায় তাকে অজু ও গোসল করানোর প্রয়োজন নেই। তার ধোয়া– শুধুমাত্র পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে। তাই তা শর্ত নয়; বরং এ ময়লাসহই যদি তার জানাজা পড়ে ফেলে, তবে তা জায়েজ।

قَوْلُهُ وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُهُ وَلَا يُسَرَّحُ الخ : অর্থাৎ যদি মৃত ব্যক্তির নখ লম্বা লম্বা হয় তবে তা কাটবে না; বরং এভাবেই রেখে দিতে হবে এবং তার চুলও আঁচড়াবে না। 'কীনাহ' নামক গ্রন্থে মৃত ব্যক্তির চুল আঁচড়ানোকে মাকরূহ তাহরীমী বলা হয়েছে। কেননা, এসব করা হয় সৌন্দর্যের জন্য। আর মৃত ব্যক্তির জন্য তা প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে মৃত ব্যক্তির চুল ও দাড়ি আঁচড়ানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– জবাবে তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের মত্ ব্যক্তিদের মাথা ধরে কেন টানছ? যেন তিনি মৃত ব্যক্তির চুল আঁচড়ানোর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আঁচড়ানোকে মাথা ধরে টানার দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট চুল দাড়ি আঁচড়ানো মোস্তাহাব। কারণ, হযরত উম্মে আতিয়্যাহ্ (র.) নবী করীম ﷺ -এর কন্যা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা তাঁর চুলকে তিনটি বেণি বেঁধে দিয়েছি।" –[বুখারী ও মুসলিম]

ইবনে আবী শায়বা (র.) বকর ইবনে আবদুল্লাহ মুযানী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি যখন মদিনায় আগমন করেছি, তখন লোকদেরকে মুর্দাদের গোসল করানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তখন কেউ কেউ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিদের সাথে ঐ ব্যবহার করবে– যা দুলাদের [বর] সাথে করা হয়। –[মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা]

قَوْلُهُ وَالْكَافُوْرُ عَلٰى مَسَاجِدِهٖ : সেজদাবস্থায় যে অঙ্গ ভূমিতে লাগে, তাতে কাফুর লাগানো হবে। সেসব অঙ্গ হলো– কপাল, নাক, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পা। সিজদার অঙ্গ হওয়ার কারণে এ অঙ্গগুলোর এ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যেন তা তাড়াতাড়ি খারাপ না হয়ে যায়।

وَسُنَّةُ الْكَفَنِ لَهُ إِزَارٌ وَقَمِيْصٌ وَلِفَافَةٌ وَاسْتَحْسَنَ الْمُتَأَخِّرُوْنَ الْعِمَامَةَ وَلَهَا دِرْعٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ يُرْبَطُ بِهَا ثَدْيَاهَا وَكِفَايَتُهُ لَهُ إِزَارٌ وَلِفَافَةٌ وَلَهَا ثَوْبَانِ وَخِمَارٌ اَلثَّوْبَانِ اللِّفَافَةُ وَالْإِزَارُ وَتَبْسُطُ اللِّفَافَةَ ثُمَّ الْإِزَارُ عَلَيْهَا ثُمَّ يُقَمَّصُ وَيُوْضَعُ عَلَى الْإِزَارِ ثُمَّ يُلَفُّ يَسَارُ إِزَارِهِ ثُمَّ يَمِيْنُهُ ثُمَّ اللِّفَافَةُ كَذٰلِكَ وَهِيَ تَلْبَسُ الدِّرْعَ وَيَجْعَلُ شَعْرَهَا ضَفِيْرَتَيْنِ عَلٰى صَدْرِهَا فَوْقَهُ ثُمَّ الْخِمَارُ فَوْقَهُ ثُمَّ الْإِزَارُ تَحْتَ اللِّفَافَةِ وَيَعْقِدُ الْكَفَنَ إِنْ خِيْفَ انْتِشَارُهُ وَصَلَاتُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ اَيْ اِنْ اَدَّى الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِيْنَ وَاِنْ لَمْ يُؤَدِّ اَحَدٌ يَأْثَمُ الْجَمِيْعُ وَهِيَ اَنْ يُكَبِّرَ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدَهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) وَيُثْنِيْ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُسَلِّمُ ـ

অনুবাদ : মৃত ব্যক্তির সুন্নতী কাফন হলো, ইজার, পিরহান ও লিফাফা। মুতাআখখিরীন ওলামায়ে কেরাম পাগড়িকে উত্তম মনে করেন। মহিলার সুন্নতী কাফন হলো, পিরহান, ইজার, উড়না, লিফাফা ও সিনাবন্দ, যা দ্বারা তার উভয় স্তন বাঁধা হবে। তবে পুরুষের যথেষ্ট পরিমাণ কাফন হলো– ইজার ও লিফাফা। আর মহিলার যথেষ্ট কাফন হলো– দুই কাপড় তথা লিফাফা ও ইযার এবং উড়না। প্রথমে লিফাফা বিছানো হবে, অতঃপর এর উপর ইজার বিছানো হবে. অতঃপর তাকে পিরহান [জামা] পরানো হবে এবং তাকে ইযারের উপর রাখা হবে। অতঃপর তার [প্রথমে] ডান পাশ ও বাম পাশ ভাঁজ করা হবে। অতঃপর অনুরূপ লিফাফাকে ভাঁজ করা হবে। মহিলাকে প্রথমে পিরহান পরানো হবে এবং তার মাথার চুলকে দুই ভাগ করে পিরহানের উপরে বক্ষের উপর রাখা হবে। অতঃপর উড়নাকে পিরহানের উপর অতঃপর ইযারকে লিফাফার নীচে রাখা হবে। আর যদি কাফন খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে তা বেঁধে দেবে। জানাজার নামাজ ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ যদি কেউ কেউ তা আদায় করে, তবে অন্যান্যদের পক্ষ থেকে [এর فَرْضِيَّتْ] রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কেউই আদায় না করে, সকলেই গুনাহগার হবে। জানাজার নামাজ হলো, [নিয়ত করার পর] তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত উঠিয়ে হাত বাঁধবে। অত:পর পরবর্তী তাকবীরগুলোতে হাত উঠাবে না। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। ছানা পড়বে, অত:পর তাকবীর বলবে এবং নবীজী ﷺ -এর উপর দরুদ শরীফ পড়বে। অতঃপর তাকবীর বলবে এবং দোয়া পড়বে। অতঃপর তাকবীর বলবে এবং সালাম ফিরাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَسُنَّةُ الْكَفَنِ لَهُ إِزَارٌ الخ :

পুরুষের সুন্নতী কাফন : এখানে সুন্নতী কাফন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কাফনের কাপড়ের মাসনূন সংখ্যা। অন্যথায় কাফন. দাফন ও জানাজার নামাজ ফরজে কেফায়া। পুরুষের সুন্নতী কাফন সংখ্যা হলো– ইজার, লিফাফা ও পিরহান। ইজার ও লিফাফা এ পরিমাণ লম্বা হবে যে, মৃত ব্যক্তির মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালোভাবে ঢেকে যাবে, এর মাঝে মৃত ব্যক্তিকে পেঁচানো যাবে এবং উপর ও নীচের দিক থেকে তাকে বাঁধাও যাবে। লিফাফা ইযারের চেয়ে একটু বড় হবে। পিরহান গর্দান থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হবে। তবে এতে হাতা হবে না। আর যেভাবে জীবিত লোকের পিরহান বক্ষ ও গলার দিক থেকে খোলা থাকে যাতে চলতে ফিরতে সহজ হয়– সেভাবে পিরহানেরও গলা ও বক্ষের দিক থেকে খোলা থাকবে। পিরহান সুন্নত হওয়ার ক্ষেত্রে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেছেন, তখন নবী ﷺ স্বীয় জামা তাঁকে দিয়েছেন এবং এরই মাঝে তাঁকে কাফন দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاسْتَحْسَنَ الْمُتَأَخِّرُوْنَ الْعِمَامَةَ : অর্থাৎ মুতাআখ্খিরীন হানাফীগণ পাগড়ি মোস্তাহাব হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। তবে শর্ত হলো, মৃত ব্যক্তি নামিদামি এবং মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হতে হবে। দলিল হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) স্বীয় সন্তান ওয়াকিদকে পিরহান, পাগড়ি এবং তিন লিফাফার মাঝে দাফন করেছেন। আল্লামা যাহেদী (র.) মুজতাবা নামক গ্রন্থে লেখেন, বিশুদ্ধ অভিমত হলো, মৃত ব্যক্তির জন্য পাগড়ি বাঁধা মাকরূহ। হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন–

فَلَوْ كَانَ لَفُّ الْعِمَامَةِ حَسَنًا لَعُمِّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ سَيِّدُ السَّادَاتِ .

অর্থাৎ "যদি পাগড়ি বাঁধা উত্তম হতো তবে সকল সর্দারের সর্দার রাসূল ﷺ -কেও পাগড়ি বাঁধা হতো।"

قَوْلُهُ وَلَهَا دِرْعٌ وَإِزَارٌ الخ **[মহিলার সুন্নতী কাফন সংখ্যা]** : মহিলাদের জন্য সুন্নত কাফন সংখ্যা হলো পাঁচটি। মহিলার পাঁচ কাপড়ের মাঝে তিনটি ঐ কাপড় যা পুরুষের জন্য সুন্নত বলা হয়েছে। অতিরিক্ত আরো দুটি হলো– ১. উড়না, যা দ্বারা মহিলার মাথা ঢাকা হয়। তা লম্বা হয় এবং মাথার উপর চেহারার দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তবে পেঁচানো হয় না। ২. সিনাবন্দ, যা দ্বারা মহিলার স্তন বাঁধা হয়। তবে উত্তম হলো, এ কাপড় স্তন থেকে শুরু করে রান পর্যন্ত হওয়া।

قَوْلُهُ وَكِفَايَتُهُ لَهُ إِزَارٌ الخ **[কাফনের যথেষ্ট সংখ্যা]** : কাফন মূলত তিন প্রকার–

১. مَسْنُوْنٌ كَفَنٌ তার হচ্ছে, পুরুষের জন্য তিন কাপড় এবং মহিলার জন্য পাঁচ কাপড়। ইতঃপূর্বে এর বর্ণনা করা হয়েছে।

২. كَفَنِ كِفَايَتٌ অর্থাৎ যদি মাসনূন কাফন না পাওয়া যায়, তবে পুরুষের জন্য দু কাপড় তথা ইজার ও লিফাফা এবং মহিলার জন্য তিন কাপড় তথা ইজার, লিফাফা ও উড়না যথেষ্ট।

৩. كَفَنِ ضَرُوْرَتٌ অর্থাৎ যদি পুরুষ ও মহিলার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কাফন না পাওয়া যায়, তবে অন্তত এক কাপড়ের মাঝে কাফন দেবে। এর দলিল হলো– "বিদায় হজে এক সাহাবী ইহরাম অবস্থায় আরাফার ময়দানে ইন্তেকাল করেন তখন নবীজী ﷺ বলেন, তাঁকে তাঁর কাপড়ের মাঝেই কাফন দাও।" –[বুখারী ও মুসলিম]

আরো বর্ণিত আছে যে, উহুদ প্রান্তরে হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) যখন শাহাদাত বরণ করেন, তখন তাঁর গায়ে মাত্র একটি লম্বা কাপড় ছিল। তাতেই তাঁকে কাফন দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَتَبْسُطُ اللِّفَافَةَ ثُمَّ الْإِزَارَ الخ **[কাফন পরানোর পদ্ধতি]** : কাফন পরানোর পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন, প্রথমে লিফাফা বিছাবে, যাতে করে পেঁচানোর সময় তা সবচেয়ে উপরে থাকে। অতঃপর ইজার বিছাবে। অতঃপর পিরহান বিছাবে। এখন মৃত ব্যক্তিকে এর উপর রাখবে এবং প্রথমে পিরহান পরাবে, অতঃপর চাদরের বাম দিক অতঃপর ডান দিক পেঁচাবে। যেন ডান অংশ উপরে থাকে। সবশেষে লিফাফাকে প্রথমে বাম পার্শ্ব, অতঃপর ডান পার্শ্ব পেঁচাবে। এটি পুরুষের কাফন পরানোর পদ্ধতি।

মহিলাদের কাফন পরানোর পদ্ধতি হলো– প্রথমে লিফাফা, তারপর ইজার, তারপর পিরহান, তারপর উড়না বিছাবে। অতঃপর প্রথমে উড়না, তারপর পিরহান, তারপর ইজার, তারপর লিফাফা পেঁচাবে– যেরূপ বর্ণনা ইতঃপূর্বে পেশ করা হয়েছে। মহিলাদের সিনাবন্দ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, তা কাফনের সম্পূর্ণ উপরে থাকবে। কেউ বলেন, এটি ইজার ও পিরহানের মাঝে থাকবে। আর এটিই হলো, জাহিরী রেওয়ায়েত।

قَوْلُهُ وَصَلَاتُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ **[জানাজার নামাজের হুকুম]** : জানাজার নামাজের হুকুম প্রসঙ্গে আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। তবুও এখানে ইবারতের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কথা আলোচনা করছি, যা না হলে নয়। জানাজার নামাজ, মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানো এবং দাফন করা ইত্যাদি সবই ফরজে কেফায়া। ফরজে কেফায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজ। কিন্তু যদি কেউ তা আদায় করে দেয়, তবে অন্যান্য লোকদের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কেউই তা আদায় না করে, তবে সকলে গুনাহগার হবে। কেননা, তারা ফরজকে ছেড়ে দিয়েছে। আর যদি তারা সকলেই তা আদায় করে, তবে সকলেই এর ছওয়াব পেয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَهِيَ اَنْ يُكَبِّرَ رَافِعًا الخ **[জানাজার নামাজের পদ্ধতি]** : জানাজার নামাজের পদ্ধতি হলো, জানাজার নামাজের নিয়ত করে হাত তুলে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাঁধবে। যেরূপ অন্যান্য নামাজে বাঁধা হয়। অতঃপর ছানা পড়বে এবং অতিরিক্ত একটি তাকবীর বলবে, কিন্তু হাত উঠাবে না। অতঃপর প্রিয়নবী ﷺ -এর উপর দরুদ শরীফ পড়বে। অতঃপর হাত উঠানো ব্যতীত তাকবীর বলবে। এরপর দোয়া পড়বে। দোয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আমরা সামনে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। অতঃপর হাত উঠানো ব্যতীত তাকবীর বলবে এবং সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে।

ওলামায়ে আহনাফ বলেন, প্রথম তাকবীরের পর আর হাত তুলবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম মালেক (র.) ও বলখের মাশায়েখে কেরাম বলেন, পরবর্তী তাকবীরের সময়ও হাত উঠানো হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও এমন একটি বর্ণনা রয়েছে। তবে ফতোয়া হাত না উঠানোর উপরই। উল্লেখ্য যে, তাকবীরসমূহ ও সালাম ব্যতীত ছানা, দরুদ শরীফ ও দোয়া جَهْرًا [আওয়াজ দিয়ে] পড়বে না।

وَلَا قِرَاءَةَ فِيْهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) وَلَا تَشَهُّدَ وَيَقُوْلُ فِى الصَّبِيِّ بَعْدَ الثَّالِثَةِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا اَىْ اَجْرًا يَتَقَدَّمُنَا وَاَصْلُ الْفَارِطِ وَالْفُرُطِ فِيْمَنْ يَتَقَدَّمُ الْوَارِدَةَ كَذَا فِى الْمَغْرِبِ الْمُشَفَّعِ الَّذِىْ يُعْطٰى لَهُ الشَّفَاعَةَ وَالدُّعَاءِ لِلْبَالِغِيْنَ هٰذَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ اِنَّمَا قَالَ فِى الْاَوَّلِ الْاِسْلَامِ وَفِى الثَّانِىْ الْاِيْمَانُ لِاَنَّ الْاِسْلَامَ وَالْاِيْمَانَ وَاِنْ كَانَا مُتَّحِدَيْنِ فَالْاِسْلَامُ يُنْبِئُ عَنِ الْاِنْقِيَادِ فَكَاَنَّهُ دُعَاءٌ فِىْ حَالِ الْحَيٰوةِ بِالْاِيْمَانِ وَالْاِنْقِيَادِ وَاَمَّا عِنْدَ الْوَفَاةِ فَقَدْ دُعِىَ بِالتَّوَفِّىْ عَلَى الْاِيْمَانِ وَهُوَ التَّصْدِيْقُ وَالْاِقْرَارُ وَاَمَّا الْاِنْتِقِيَادُ وَهُوَ الْعَمَلُ فَغَيْرُ مَوْجُوْدٍ فِىْ حَالِ الْوَفَاةِ وَبَعْدَهُ ـ

অনুবাদ : জানাজার নামাজে কেরাত নেই। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। তাশাহহুদও নেই। নাবালেগ বাচ্চার ক্ষেত্রে তৃতীয় তাকবীরের পর এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ـ

"হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী করুন, আমাদের জন্য তাকে ছওয়াব লাভের মাধ্যম, আখিরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন এবং তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকৃত বানিয়ে দিন।" অর্থাৎ فَرْط -এর অর্থ হলো, এমন প্রতিদান যা আমাদের অগ্রে, আখিরাতের দিকে যায়। فَارْط এবং فَرْط -এর মূল হলো– ঐ ব্যক্তি, যে কাফেলার অগ্রে চলে, যেরূপ "মাগরিব" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে। مُشَفَّعْ ঐ ব্যক্তি, যার সুপারিশ কবুল করা হয়। বালেগ পুরুষ ও মহিলার জন্য দোয়া হলো–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ ـ

এতে প্রথমে ইসলাম এবং দ্বিতীয়বার ঈমানের কথা বলেছেন– কারণ, ইসলাম ও ঈমান যদিও এক, কিন্তু ইসলাম আনুগত্যের দিকে ইঙ্গিত করে। অতএব, যেন এটি জীবদ্দশায় ঈমান ও আনুগত্যের জন্য দোয়া। কিন্তু মৃত্যুর সময় ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার জন্য দোয়া করা হয়েছে। তা হলো, অন্তর দ্বারা সত্যায়ন করা এবং জবান দ্বারা স্বীকার করা। আর اِنْقِيَادْ তথা আনুগত্য হচ্ছে– আমল, যা মৃত্যুর সময় এবং এর পরে আর পাওয়া যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَاقِرَاءَةَ فِيْهَا :

জানাজার নামাজে কেরাত নেই : আমাদের নিকট জানাজার নামাজে কেরাত নেই। দলিল হলো, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ ـ

অর্থাৎ "যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়বে তখন তার জন্য অর্ন্তস্থল থেকে দোয়া করবে।" –[আবূ দাউদ]

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পড়বে। কারণ, হযরত আবূ উমামা (র.) বলেছেন, জানাজা নামাজে সুন্নত হলো, তাকবীর বলে চুপ করে সূরা ফাতেহা পড়বে, অতঃপর রাসূল ﷺ-এর উপর দরুদ পড়বে। জানাজার নামাজে তাশাহহুদও নেই। তাই চতুর্থ তাকবীরের পরপরই সালাম ফিরিয়ে ফেলবে। কারণ, তাশাহহুদ সম্পর্কে কোনো রেওয়ায়েত বর্ণিত নেই।

জানাজার নামাজের দোয়া : বয়স্ক পুরুষ ও মহিলার জানাজার নামাজের দোয়া হলো–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَاُنْثٰنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ .

নাবালেগ ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে দোয়া হলো– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

আর নাবালেগ মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে দোয়া হলো–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً .

উল্লিখিত দোয়াসমূহ হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তা ছাড়া এ দোয়াও পড়া যায়–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَ وَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهٖ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهٖ وَ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ .

তা ছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে অন্যান্য দোয়াও বর্ণিত আছে।

قَوْلُهٗ لِاَنَّ الْاِسْلَامَ وَالْاِيْمَانَ : মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, শারেহ (র.) ঈমান ও ইসলামকে مُتَّحِدٌ [এক] বলেছেন, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো, সর্বদিক থেকে উভয়টি এক নয়; বরং উভয়টির মাঝে عَامٌ خَاصٌ مُطْلَقٌ-এর নিসবত। অর্থাৎ ইসলাম যেহেতু আনুগত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর ঈমান হলো تَصْدِيْقٌ قَلْبِيْ এবং এটি আবশ্যক যে, যেখানে আনুগত্য পাওয়া যাবে, সেখানে ঈমান পাওয়া যাওয়াও জরুরি। কেননা, ঈমান ব্যতীত আনুগত্য গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে আনুগত্য ব্যতীত ঈমান পাওয়া যায়। হাদীসে জিবরাঈল থেকেও এমনই বুঝা যায়। কেননা, হযরত জিবরাঈল (আ.) উক্ত হাদীসের মাঝে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। অতএব, যদি ঈমান ও ইসলাম এক হতো তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করা হতো না। এমনকি রাসূল ﷺ -ও ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়েছেন।

ঈমান ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে বুখারী শরীফের "কিতাবুল ঈমান"-এর অধীনে বুখারী শরীফের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থে। এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো না।

وَيَقُوْمُ الْمُصَلِّى بِحَذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ وَالْاَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ السُّلْطَانُ ثُمَّ الْقَاضِى ثُمَّ إِمَامُ الْحَيِّ ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلٰى تَرْتِيْبِ الْعَصَبَاتِ وَلَا بَأْسَ بِإِذْنِهِ فِى الْاِمَامَةِ فَإِنْ صَلّٰى غَيْرُهُمْ يُعِيْدُ الْوَلِيُّ إِنْ شَاءَ وَلَا يُصَلِّىْ غَيْرُهُ بَعْدَهُ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فَدُفِنَ صَلّٰى عَلٰى قَبْرِهِ مَا لَمْ يُظَنَّ أَنَّهُ تَفَسَّخَ وَقَدْ قُدِّرَ بِثَلٰثَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ تَجُزْ رَاكِبًا اِسْتِحْسَانًا اَلْاِسْتِحْسَانُ هُوَ الدَّلِيْلُ الَّذِىْ يَكُوْنُ فِىْ مُقَابَلَةِ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ الَّذِىْ يَسْبِقُ إِلَيْهِ الْاَفْهَامُ فَالْقِيَاسُ هٰهُنَا اَنْ يَّجُوْزَ رَاكِبًا لِاَنَّهُ لَيْسَ بِصَلٰوةٍ لِعَدَمِ الْاَرْكَانِ بَلْ هُوَ دُعَاءٌ وَالْاِسْتِحْسَانُ أَنَّهَا صَلٰوةٌ مِنْ وَجْهٍ لِوُجُوْدِ التَّحْرِيْمَةِ فَلَا يُتْرَكُ الْقِيَامُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ اِحْتِيَاطًا ـ

অনুবাদ : মুসল্লি মৃত ব্যক্তির বক্ষ বরাবর দাঁড়াবে। জানাজা নামাজের ইমামতির জন্য বাদশাহ অধিক উপযুক্ত। অতঃপর কাজি [বিচারপতি], অতঃপর মহল্লার মসজিদের ইমাম, অতঃপর আসাবাহ (عَصَبَةٌ) -এর ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে অলী তথা অভিভাবক। অলীর অনুমতি নিয়ে [জানাজার নামাজের] ইমামতি করাতে কোনো অসুবিধা নেই। অতএব, যদি অলী ব্যতীত কেউ জানাজার নামাজ পড়ে, তবে যদি অলী চায়, তবে সে পুনরায় জানাজার নামাজ পড়তে পারবে। পক্ষান্তরে অলী নামাজ পড়ার পর অন্য কেউ তা দোহরাতে পারবে না। যাকে জানাজার নামাজ ব্যতীত দাফন করা হয়ে গেছে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধারণা না হবে যে, লাশ পচে গেছে, তার কবরের উপর নামাজ পড়বে। পচার সময়কাল তিনদিন নির্ধারণ করা হয়েছে। اِسْتِحْسَانًا আরোহী অবস্থায় জানাজার নামাজ পড়া জায়েজ নেই। ইসতিহসান (اِسْتِحْسَانٌ) ঐ দলিল যা এমন কিয়াসে জলী (قِيَاسْ جَلِىْ) -এর বিপরীতে ব্যবহার হয়, যার দিকে মন যায়। এখানে কিয়াস হলো, আরোহী অবস্থায় জানাজার নামাজ জায়েজ হওয়া। কেননা, জানাজার নামাজ কোনো আরকান না থাকার ভিত্তিতে নামাজ নয়; বরং এটি দোয়া। আর ইসতিহসান (اِسْتِحْسَانٌ) হলো, এতে তাকবীরে তাহরীমা থাকার কারণে একদিক থেকে এটি নামাজ। অতএব, ওজর ব্যতীত সতর্কতাস্বরূপ কিয়াম (قِيَامْ) -কে বর্জন করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَقُوْمُ الْمُصَلِّىْ بِحَذَاءِ الخ : জানাজার নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, মৃত ব্যক্তির শরীরের কোনো অংশের বরাবর ইমামকে দাঁড়াতে হবে। তবে মোস্তাহাব হলো, মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক, তার বক্ষের বরাবর ইমাম দাঁড়াবে। কারণ, বক্ষ হচ্ছে ঈমানের স্থল। তাই এটিই উপযুক্ত যে, যে নামাজ মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য সুপারিশতুল্য হয়, তা এর বরাবর হয়ে পড়া। হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) পুরুষের মাথা বরাবর ~~এবং~~ মহিলার মাঝ বরাবর দাঁড়াতেন। হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি পুরুষের মাথা বরাবর এবং মহিলার খাটের মাঝ বরাবর দাঁড়াতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, রাসূল ﷺ এভাবেই দাঁড়াতেন। -[আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈ]

قَوْلُهُ وَالْاَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ الخ :

জানাজার নামাজে ইমামতির হকদার : জানাজার নামাজে সর্বপ্রথম ইমামতির হকদার বাদশাহ– যদি তিনি সেখানে উপস্থিত থাকেন। যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন, তবে বিচারপতি ইমামতির হকদার। আর যদি তিনিও অনুপস্থিত থাকেন, তবে মহল্লার মসজিদের ইমাম ইমামতির হকদার, যদি ইমাম অলীর চেয়ে অধিক যোগ্য হয়; অন্যথায় অলী ইমাম হওয়াই সবচেয়ে উত্তম। তবে এতেও যে যত নিকটবর্তী হবে, সে আগে হকদার হবে। অর্থাৎ اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ মহিলা, শিশু ও পাগল ব্যক্তিবর্গের এমন অধিকার সাব্যস্ত হবে না। ছেলের চেয়ে বাবা অধিক হকদার। কেননা, বাবার বয়স বেশি।

قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِإِذْنِهِ فِى الْإِمَامَةِ : অর্থাৎ অলী যদি কাউকে নামাজ পড়ানোর অধিকার দেয়, তবে সে নামাজ পড়াতে পারবে। কেননা, অলী নিজের অধিকার অন্যকে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যদি অলীর অনুমতি ব্যতীত কেউ নামাজ পড়িয়ে ফেলে এবং অলীও নামাজ না পড়ে থাকে তবে অলী আবার নামাজ পড়তে পারবে। কেননা, এটি তার অধিকার। আর যদি অলী নামাজ পড়ে ফেলে, তবে অন্য কেউ পুনরায় নামাজ আদায় করতে পারবে না। কেননা, যখন অলী আদায় করে ফেলেছে, তখন ফরজ আদায় হয়ে গেছে, এখন নফলের সুরতে পড়া শরিয়ত অনুমোদিত নয়।

قَوْلُهُ صَلّٰى عَلٰى قَبْرِهِ الخ : অর্থাৎ যদি কোনো মৃত ব্যক্তির উপর জানাজার নামাজ না পড়া হয়ে থাকে, আর এমতাবস্থায় তাকে দাফন করা হয়ে যায়, তবে মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে বের করা ব্যতীত তার কবরের উপর ঐ সময় পর্যন্ত নামাজ পড়া জায়েজ আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধারণা হবে যে, এখনও লাশ পচেনি। আর যদি ধারণা হয় যে, লাশ পচে গেছে তবে নামাজ পড়বে না। শারেহ (র.) তিনদিন সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, সাধারণত তিনদিন পর্যন্ত কবরে লাশ পচে না। এ পরিমাণ মূলত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট। আমাদের নিকট এর চেয়ে কমবেশি সময়েও পচতে পারে। অনুরূপ মৃত ব্যক্তি মোটা হওয়া, পাতলা হওয়া এবং মৌসুমের পরিবর্তনের কারণেও লাশ পচার সময়ের মাঝে তারতম্য থাকে। তাই অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকেরা এর অনুমান করবে এবং এরই উপর আমল করবে।

قَوْلُهُ وَالْاِسْتِحْسَانُ هُوَ الدَّلِيْلُ الخ : অর্থাৎ اِسْتِحْسَانٌ-ও শরিয়তের একটি দলিল। এটি قِيَاسٌ جَلِيٌّ-এর পরিপন্থি একটি বিষয়। قِيَاسٌ جَلِيٌّ বলা হয়, যার প্রতি مُجْتَهِد-এর মন খুব দ্রুত চলে যায়। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে اِسْتِحْسَانٌ দলিল চতুষ্টতের বাইরের বিষয় নয়।

وَكُرِهَتْ فِيْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ اِنْ كَانَ الْمَيِّتُ فِيْهِ وَاِنْ كَانَ خَارِجَهُ اِخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ اِخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ (رح) بِنَاءً عَلٰى اَنَّ عِلَّةَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْبَعْضِ تَوَهُّمُ تَلْوِيْثِ الْمَسْجِدِ فَاِنْ كَانَ الْمَيِّتُ خَارِجَهُ لَا تُكْرَهُ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ الْبَعْضِ اَنَّ الْمَسْجِدَ لَا يُبْنٰى اِلَّا لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَالْمَيِّتُ وَاِنْ كَانَ خَارِجًا تُكْرَهُ عِنْدَهُمْ اَيْضًا وَمَنْ وَلَدَ فَمَاتَ سُمِّيَ وَغُسِلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ اِنِ اسْتَهَلَّ وَاِلَّا اُدْرِجَ فِيْ خِرْقَةٍ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَغُسِلَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَفِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ اِنَّهُ لَا يُغْسَلُ لٰكِنَّ الْمُخْتَارَ هُوَ الْاَوَّلُ صَبِيٌّ سُبِيَ فَمَاتَ اِنْ سُبِيَ بِلَا اَحَدِ اَبَوَيْهِ اَوْ مَعَ اَحَدِهِمَا فَاَسْلَمَ عَاقِلًا اَوْ اَحَدُهُمَا صُلِّيَ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ اِنْ سُبِيَ بِلَا اَحَدِ اَبَوَيْهِ يَكُوْنُ مُسْلِمًا تَبْعًا لِلدَّارِ فَيُصَلّٰى عَلَيْهِ وَاِنْ سُبِيَ مَعَ اَحَدِ اَبَوَيْهِ فَحِيْنَئِذٍ لَا يَكُوْنُ تَبْعًا لِلدَّارِ فَاِنْ اَسْلَمَ هُوَ وَالْحَالُ اَنَّهُ عَاقِلٌ فَاِسْلَامُهُ صَحِيْحٌ فَيُصَلّٰى عَلَيْهِ وَاِنْ اَسْلَمَ اَحَدُهُمَا يَكُوْنُ مُسْلِمًا تَبْعًا لِاَحَدِهِمَا فَيُصَلّٰى عَلَيْهِ وَاِلَّا فَلَا اَيْ اِنْ سُبِيَ مَعَ اَحَدِ اَبَوَيْهِ وَلَمْ يُسْلِمْ اَحَدٌ مِنْ اَبَوَيْهِ وَلَا هُوَ عَاقِلٌ لَا يُصَلّٰى عَلَيْهِ فَهٰذَا يَشْمَلُ مَاذَا لَمْ يُسْلِمْ اَصْلًا اَوْ اَسْلَمَ وَهُوَ غَيْرُ عَاقِلٍ .

অনুবাদ : জামে মসজিদে জানাজার নামাজ পড়া মাকরূহ, যদি লাশ মসজিদে থাকে। পক্ষান্তরে লাশ যদি মসজিদের বাহিরে থাকে, তবে এতে মাশায়েখে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। মাশায়েখে কেরামের মতানৈক্যের ভিত্তি এ কথার উপর যে, কারো নিকট মসজিদ ময়লাযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা كَرَاهَتْ -এর কারণ। অতএব, যদি মৃত ব্যক্তিকে মসজিদের বাহিরে রাখা হয়, আর মুসল্লিরা মসজিদের ভিতরে হয় তবে তাঁদের নিকট মাকরূহ হবে না। কারো নিকট كَرَاهَتْ -এর কারণ হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্যই মসজিদ বানানো হয়েছে। তাই মৃত ব্যক্তি যদিও মসজিদের বাহিরে হয়, তবুও তাঁদের নিকট তা মাকরূহ। যে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মারা যায়, তার নাম রাখা হবে এবং গোসল করিয়ে তার জানাজার নামাজ পড়বে, যদি সে আওয়াজ দিয়ে থাকে। অন্যথায় তাকে একটি কাপড়ের টুকরায় পেঁচিয়ে [দাফন করা হবে] এবং জানাজার নামাজ পড়া হবে না। তবে তাকে গোসল দেবে। এটিই উত্তম অভিমত। জাহিরী বর্ণনা হলো, গোসল না দেওয়া, কিন্তু প্রথম অভিমতটিই উত্তম। [যদি] কাফেরের বাচ্চাকে গ্রেফতার করে দারুল ইসলামে আনা হয় অতঃপর মারা যায় তবে যদি তার পিতা ছাড়া গ্রেফতার করা হয়, কিংবা দুজনের যে-কোনো একজনকেসহ গ্রেফতার করে থাকে এবং জ্ঞান থাকাবস্থায় ঐ বাচ্চা মুসলমান হয়ে গেছে কিংবা পিতামাতার যে-কোনো একজন মুসলমান হয়ে গেছে তবে এ বাচ্চার উপর জানাজার নামাজ পড়া হবে। কেননা, যদি ঐ বাচ্চাকে পিতামাতা ব্যতীত গ্রেফতার করা হতো তবে দারুল ইসলামের অনুগত হয়ে সে মসলমান হয়ে যাবে। অতএব, তার উপর জানাজার নামাজ পড়া হবে। আর যদি তাকে পিতামাতার একজনসহ গ্রেফতার করা হয় তবে সে দারুল ইসলামের অনুগত হবে না। কিন্তু যদি ঐ বাচ্চা খুশি ও জ্ঞান থাকাবস্থায় মুসলমান হয়ে যায়, তবে তার ইসলাম গ্রহণ বিশুদ্ধ হবে এবং তার উপর জানাজার নামাজ পড়া হবে। আর যদি পিতামাতার একজন মুসলমান হয়, তবে সে তার অনুগত হয়ে মুসলমান হয়ে যাবে। অতএব, তার উপর জানাজা নামাজ পড়া হবে; অন্যথায় পড়া হবে না। অর্থাৎ যদি পিতামাতার একজনের সাথে গ্রেফতার করা হয়ে থাকে এমতাবস্থায় তার পিতামাতার একজনও মুসলমান নয় এবং বাচ্চাও জ্ঞানবান নয়, তবে তার উপর জানাজার নামাজ পড়া হবে না। সুতরাং এ [গ্রন্থকারের বক্তব্য وَاِلَّا فَلَا] দুই সুরতকে শামিল রাখে– ১. বাচ্চা মোটেই ইসলাম গ্রহণ করেনি। ২. বুদ্ধিহীন (غَيْرُ عَاقِلٍ) অবস্থায় সে ইসলাম গ্রহণ করেছে

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكُرِهَتْ فِىْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ اَلْخ :

জামে মসজিদে জানাজার নামাজের হুকুম : জামে মসজিদ কিংবা ঐ মসজিদ যাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা-কায়দা জামাতের সাথে আদায় করা হয়। এ ধরনের মসজিদের ভিতরে লাশ রেখে জানাজার নামাজ আদায় করা কারো নিকট মাকরূহ তাহরীমী। অধিকাংশ মুতাআখ্‌খিরীন ওলামায়ে কেরামের মাযহাবও এমনই। কেননা, লাশ যদি মসজিদের ভিতরে থাকে, তবে মসজিদ ময়লাযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতএব, তাঁদের নিকট যদি লাশকে মসজিদের বাহিরে রেখে সকল মুসল্লি ইমামসহ মসজিদের ভিতরে হয়, তবে তা মাকরূহ হবে না। পক্ষান্তরে অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের নিকট মাকরূহ তানযীহী। এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করা হয়– ঐ সব হাদীস দুর্বল। এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, কিন্তু মসজিদে জানাজা পড়া তাঁর অভ্যাস ছিল না; বরং জানাজার জন্য লাশকে মসজিদের বাহিরে নিয়ে যেতেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ হযরত সাহাল ও সুহাইল (রা.)-এর জানাজা মসজিদের ভিতরেই পড়েছেন। এখানে মাকরূহ হওয়াটাও ওজর না হওয়ার সুরতে হবে। কিন্তু যদি ওজর হয় যেমন– বৃষ্টি ইত্যাদি থাকে তবে মাকরূহ হবে না।

قَوْلُهُ اِخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ (رح) بِنَاءً اَلْخ : কোনো কোনো শায়খের নিকট মসজিদের মাঝে লাশ রেখে জানাজা পড়া এজন্য মাকরূহ যে, মসজিদে লাশ রাখলে মসজিদ ময়লাযুক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, মৃত ব্যক্তি থেকে নাপাক বের হওয়া এবং প্রবাহিত হওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে যদি এমন সম্ভাবনা না থাকে; যেমন– মৃত ব্যক্তিকে মসজিদের বাহিরে রেখে মুসল্লি মসজিদের ভিতরে দাঁড়ায়, তবে তা মাকরূহ নয়। কারো কারো মতে, মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, মসজিদকে নির্মাণ করা হয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের জন্য এবং অন্যান্য নফল নামাজ পড়ার জন্য। অতএব, সাধারণভাবে এতে জানাজার নামাজ পড়া মাকরূহ হবে।

قَوْلُهُ اِنْ اسْتَهَلَّ اَلْخ : এটি اِسْتِهْلَالٌ শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। اِسْتِهْلَالٌ বলা হয় নতুন চাঁদ দেখে উঁচু আওয়াজ করা যে, চাঁদ দেখা গেছে। অতঃপর যে-কোনো উঁচু আওয়াজের উপর তার ব্যবহার হতে শুরু হয়েছে। কিন্তু এখানে اِسْتِهْلَالٌ দ্বারা শুধু উঁচু আওয়াজ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এমন কোনো নিদর্শন, যার দ্বারা সে জীবিত ছিল বলে বুঝা যায়। যেমন– নড়াচড়া করা। সারকথা হলো, যে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মারা যায়, তবে দেখা হবে যে, সে জীবিত ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মারা গেছে, না মরাই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। যদি জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়– এভাবে যে, সে কান্না করেছে কিংবা নড়াচড়া করে, যার দ্বারা তার প্রাণ ছিল বলে বুঝা যায়, তবে তার নাম রাখা হবে, গোসল দেওয়া হবে এবং জানাজার নামাজও পড়া হবে। পক্ষান্তরে যদি তার প্রাণ ছিল বলে বুঝা না যায়; বরং সে মৃত ভূমিষ্ঠ হয়, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং এক টুকরা কাপড়ে পেঁচিয়ে জানাজার নামাজ ব্যতীত তাকে দাফন করে দেওয়া হবে। তবে তার নাম রাখা হবে। কেননা, কিয়ামত দিবসে তাকে এই নামে ডাকা হবে। এমনকি যদি কারো গর্ভপাত হয়ে যায় এবং বাচ্চার শরীর বা কোনো অঙ্গ হয়ে যায় তারও নাম রাখা হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "তোমরা গর্ভপাত হওয়া সন্তানেরও নাম রাখ। কেননা, সে তোমাদের পুঁজি হবে।"

قَوْلُهُ صَبِيٌّ سُبِيَ فَمَاتَ اَلْخ : স্মরণ রাখতে হবে যে, যখন কোনো বাচ্চা গ্রেফতার হয়ে দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে আসে, তবে দেখা হবে যে; তার সঙ্গে তার কোনো পিতামাতা গ্রেফতার হয়েছে কিনা? যদি পিতামাতা উভয়ে কিংবা একজন তার সঙ্গে গ্রেফতার হয়ে আসে, তবে সে পিতামাতার অনুসারী হয়ে কাফেরই থেকে যাবে। অতএব, তার উপর জানাজা নামাজ পড়া হবে না। হ্যাঁ, যদি বাচ্চা জ্ঞানবান হয়, ইসলামকে বুঝে এবং খুশিতে ইসলাম কবুল করে, তবে সে মুসলমান। কেননা, জ্ঞানবান বাচ্চার ইসলাম গ্রহণযোগ্য। যদি সে মারা যায়, তবে তার উপর জানাজার নামাজ পড়বে। পিতামাতার কোনো একজন মুসলমান হওয়ার দ্বারাও সন্তান তার অনুসরণে মুসলমান হয়ে যাবে এবং তার উপর জানাজা পড়া হবে। আর যদি সে একা গ্রেফতার হয় এবং দারুল ইসলামে আসার পর মারা যায়, তবুও নামাজ পড়া হবে। কেননা, সে দারুল ইসলামের অনুসরণে মুসলমান হয়ে যাবে।

كَافِرٌ مَاتَ يُغَسِّلُهُ وَلِيُّهُ الْمُسْلِمُ غَسْلَ النَّجَسِ أَيْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُغْسَلُ النَّجَاسَاتُ لَا كَمَا يُغْسَلُ الْمُسْلِمُ بِالْبِدَايَةِ بِالْوُضُوْءِ وَبِالْمَيَامِنِ وَيُلَفُّهُ فِي خِرْقَةٍ وَيُحْفَرُ حُفْرَةً وَيُلْقِيْهِ فِيْهَا وَسُنَّ فِيْ حَمْلِ الْجَنَازَةِ أَرْبَعَةٌ وَأَنْ تَضَعَ مُقَدَّمَهَا ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا عَلَى يَمِيْنِكَ ثُمَّ مُقَدَّمَهَا ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا عَلَى يَسَارِكَ وَيُسْرِعُوْنَ بِهَا لَا خَبَبًا وَكُرِهَ الْجُلُوْسُ قَبْلَ وَضْعِهَا وَالْمَشْيُ خَلْفَهَا أَحَبُّ وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ وَيُدْخَلُ فِيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَيَقُوْلُ وَاضِعُهُ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَيُوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيُحَلُّ الْعُقْدَةُ أَيِ الْعُقْدَةُ الَّتِيْ عَلَى الْكَفَنِ خِيْفَةَ الْاِنْتِشَارِ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ وَالْقَصَبُ وَيُسَجَّى قَبْرُهَا بِثَوْبٍ لَا قَبْرُهُ أَيْ يُغَطَّى قَبْرُهَا بِثَوْبٍ عِنْدَ دَفْنِهَا وَيُكْرَهُ الْآجُرُّ وَالْخَشَبُ وَيُهَالُ التُّرَابُ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُسَطَّحُ .

অনুবাদ : কোনো কাফের [যদি] মারা যায়, [তবে] তার কোনো মুসলমান অলী এমনভাবে গোসল করাবে যেভাবে নাপাকী ধোয়া হয়। অর্থাৎ তার উপর এমনভাবে পানি ঢালা হবে যেভাবে নাপাকী পরিষ্কার করা হয়। এভাবে নয় যেভাবে কাফেরদের গোসল দেওয়া হয়। [তথা] অজুর সাথে, ডানদিক শুরু করার সাথে। তাকে একটি কাপড়ে পেঁচাবে এবং একটি গর্ত খনন করে তাকে তাতে নিক্ষেপ করবে। সুন্নত হলো, জানাজাকে চার ব্যক্তি উঠাবে এবং জানাজার সামনের অংশ অতঃপর পিছনের অংশ ডান কাঁধে রাখবে, অতঃপর সামনের অংশ, তারপর পিছনের অংশ বাম কাঁধে রাখবে। জানাজা নিয়ে দ্রুত চলবে, তবে দৌড়াবে না। জানাজাকে কাঁধ থেকে নামানোর পূর্বে বসা মাকরূহ। জানাজার পিছনে চলা মোস্তাহাব। কবর খনন করা হবে এবং লাহদ কবর করা হবে। কিবলার দিক থেকে মৃত ব্যক্তিকে কবরে প্রবেশ করানো হবে। যারা মৃত ব্যক্তি কবরে রাখবে, তারা بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ বলবে। মৃত ব্যক্তিকে কিবলামুখী করে দেবে এবং বন্ধন খুলে দেবে। অর্থাৎ কাফন খুলে যাওয়ার ভয়ে কাফনের যে বন্ধন দেওয়া হয়ে ছিল, তা খুলে দেওয়া হবে। কিছু কাঁচা ইট এবং বাঁশ বরাবরি করে বিছিয়ে দেবে। দাফনের সময় মহিলাকে কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে। কিন্তু পুরুষের কবরকে ঢাকা হবে না। পাকা ইট এবং লাকড়ি [কবরের উপর দেওয়া] মাকরূহ। কবরে মাটি ঢালবে এবং উটের পিঠের ন্যায় উঁচু করবে; সমতল রাখবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَافِرٌ مَاتَ يُغَسِّلُهُ وَلِيُّهُ الخ : অর্থাৎ যদি মুসলমান ব্যক্তির কোনো কাফের আত্মীয় মারা যায় এবং মৃতকে দারুল হারবে নেওয়ার মতো কোনো কাফের ব্যক্তি না থাকে কিংবা ভাড়া না থাকে; বরং সবই তার মুসলিম অলীকে করতে হয়, তবে সেই মুসলিম অলীই তাকে গোসল দেবে এবং মুসলিম লাশের ন্যায় তাকে অজু, ডানদিক থেকে শুরু করা ইত্যাদি কোনো বিষয়ের আনুগত্য করবে না; বরং এমনভাবে গোসল দেবে যেরূপ সাধারণত নাপাকী পরিষ্কার করা হয়। দলিল হলো, হযরত আলী (রা.)-এর হাদীস- إِنَّهُ لَمَّا مَاتَ أَبُوْهُ طَالِبٌ كَافِرًا فَأَخْبَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِذْهَبْ فَغَسِّلْهُ وَكَفِّنْهُ

অর্থাৎ "যখন হযরত আলী (রা.) -এর পিতা আবূ তালিব মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনি রাসূল ﷺ -কে অবগত করেন যে, এখন কি করা হবে? প্রিয়নবী ﷺ বললেন, যাও, তাকে গোসল দাও এবং মাটিতে দাফন করে দাও।" -[আবূ দাঊদ, নাসাঈ]
যদি সেই মৃত কাফেরের কোনো কাফের আত্মীয় থাকে, তাহলে সে তাকে যা ইচ্ছা তা-ই করবে। এতে আমাদের কোনো কিছু করার নেই।

قَوْلُهُ وَيَلُفُّهُ فِيْ خِرْقَةٍ : অর্থাৎ তাকে একটি কাপড়ের টুকরায় পেঁচিয়ে একটি গর্ত খনন করে তাতে রেখে উপরে মাটি ঢেলে দেবে। কিন্তু কাপড়ে পেঁচানোর সময়ও কাফনের অনুসরণ করবে না। আর দাফনের সময় মুসলমানদের দাফনের ন্যায় দাফন করবে না; বরং অলী হিসেবে সে অগ্রাহ্য করে মাথা থেকে বোঝা সরানোর মতো করে ফেলে দেবে।

قَوْلُهُ وَسَنَّ فِيْ حَمْلِ الْجِنَازَةِ اَرْبَعَةً : অর্থাৎ চার ব্যক্তি একসঙ্গে জানাজাকে উঠানো সুন্নত, যেন সর্বদিক থেকে একসঙ্গে উঠে। পক্ষান্তরে যদি দুই ব্যক্তি উঠায়, তবে তা মাকরূহ হবে।

قَوْلُهُ وَاَنْ تَضَعَ مُقَدَّمَهَا ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا الخ : এ বাক্যে عَلٰى يَمِيْنِكَ ও عَلٰى يَسَارِكَ বলে এক ব্যক্তিকে مُخَاطَبٌ বানানো হয়েছে। অথচ এইমাত্র বলেছেন, চার ব্যক্তি মিলে জানাজাকে উঠাবে। যেখানে চার ব্যক্তি একত্রে উঠাবে সেখানে একজনকে مُخَاطَبٌ বানানো কিভাবে সহীহ হলো? এর উত্তর হলো, জানাজার সামনের ব্যক্তি তার পিছনের ব্যক্তির চেয়ে উত্তম এবং ডান দিকের ব্যক্তি বাম দিকের ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। এখন যে ব্যক্তি মাথার দিকে এবং ডান দিকে আছেন তিনিই উত্তম ব্যক্তি। কেননা, তিনি লাশকে উত্তম দিক থেকে উঠাচ্ছেন। অতএব, তাকে বলা হচ্ছে, তুমি তাকে ডান কাঁধে উঠা এবং মাথার বাম দিকের ব্যক্তি নিজের বাম কাঁধে উঠাবে। অনুরূপ পিছনের ডান দিকের ব্যক্তি নিজের ডান কাঁধে এবং বাম দিকের ব্যক্তি নিজের বাম কাঁধে উঠাবে। এখন দশ কদম গিয়ে মাথার ডান দিকের ব্যক্তি পিছনে ডান দিকে চলে যাবে এবং নিজের ডান কাঁধে উঠাবে। এখানে যে ব্যক্তি ছিল সে তোমার প্রথম স্থানে চলে যাবে। অতঃপর দশ কদম যাবে এবং মাথার বাম দিকের ব্যক্তি বাম কাঁধে উঠাবে। এখানে যে ব্যক্তি ছিল সে তোমার ইতঃপূর্বের জায়গায় চলে যাবে। অতঃপর দশ কদম চলবে এবং তুমি পিছনের বাম দিক বাম কাঁধে উঠাবে। এভাবে প্রত্যেকের দশ কদম করে চলা হয়ে যাবে।

জানাজা নিয়ে দ্রুত চলবে, কিন্তু দৌড়াবে না : জানাজা নিয়ে দ্রুত চলবে, কিন্তু দৌড়াবে না। দ্রুত করার কারণ হলো, যদি এ মৃত ব্যক্তি নেককার হয়ে থাকে তবে তো তোমরা তাকে ভালোর দিকে নিয়ে যাচ্ছ। ভালো কাজে তাড়াতাড়িই ভালো, পক্ষান্তরে যদি সে বদকার, পাপী হয়, তবে তোমরা তার থেকে জলদি মুক্তি পাচ্ছ। হাদীস শরীফে এসেছে– "কবর জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান কিংবা দোজখের ঘরসমূহের একটি ঘর। মৃত ব্যক্তি তার পূর্বে থেকেই দেখতে থাকে। যদি সে নেককার হয়, তবে সে কবরকে জান্নাতের বাগানরূপে দেখতে পায় এবং খাটিয়া বহনকারীদের বলতে থাকে– "আমাকে জলদি নিয়ে যাও"। কিন্তু জলদি বলার দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, দৌড়াবে; বরং স্বাভাবিক চলার চেয়ে একটু দ্রুত চলবে।

কবরস্থানে লাশ রাখার পূর্বে বসা মাকরূহ : যারা জানাজা বহন করে তারা জানাজাকে মাটিতে রাখার পূর্বে অন্যান্য লোকেরা বসা মাকরূহ। "আল-মুহীত" নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে– উত্তম হলো, মৃত ব্যক্তিকে কবরে রেখে মাটি ঢালা পর্যন্ত না বসা।

قَوْلُهُ وَالْمَشْىُ خَلْفَهَا اَحَبُّ الخ : অর্থাৎ জানাজার পিছনে পিছনে যাওয়া উত্তম। যদিও জানাজার আগে কিংবা ডানে চলা জায়েজ। হাদীসে এসেছে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবযী (র.) বলেন– আমি এক জানাজায় উপস্থিত ছিলাম, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.) সামনে চলছিলেন এবং হযরত আলী (রা.) পিছনে পিছনে চলছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর আগে আগে চলছেন আপনি কেন পিছনে পিছনে চলছেন? তিনি উত্তরে বললেন, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর জানেন যে, জানাজার আগে আগে চলার স্থলে পিছনে পিছনে চলার মাঝে এত অধিক ছওয়াব– যত অধিক ছওয়াব হয় একা নামাজ পড়ার তুলনায় জামাতে নামাজ পড়ার মাঝে। কিন্তু তারা সহজতার জন্য আগে আগে চলছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, কোনো কোনো সময় প্রিয়নবী ﷺ -কেও জানাজার আগে আগে চলতে দেখা গেছে।

قَوْلُهُ وَيُوَجِّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ الخ : অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির চেহারাকে কবরে কিবলামুখী করে দেবে, কিন্তু ডান পার্শ্বের উপর রাখা উত্তম। দুররুল মুখতার নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তিকে ডান পার্শ্বের উপর শুয়ানো অধিক উপযুক্ত; বরং কোনো কোনো ফকীহ একথাও বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে ডান পার্শ্বের উপর শুয়ানোর পর যদি চিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তার পিঠের নীচে কোনো ইট বা অন্য কিছু রেখে দেবে, যেন চিত হয়ে না যায়।

কবরকে উটের পিঠের ন্যায় করবে : কবরকে উটের পিঠের ন্যায় করবে; বরাবর [সমতল] রাখবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট কবরকে ভূমির সমতল রেখে দেওয়া সুন্নত। দলিল হলো, হযরত আলী (রা)-এর হাদীস। তিনি বলেন, "রাসূল ﷺ আমাকে সমস্ত উঁচু কবরকে সমতল করার জন্য পাঠিয়েছেন। আমি একটি উঁচু কবরকেও ছাড়িনি।"–[তিরমিযী শরীফ]

আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তর হলো, যে সমস্ত কবর শরিয়তের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অধিক উঁচু, সেগুলোকে সমতল করার জন্য রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের দলিল হলো, প্রিয়নবী ﷺ -এর কবরকে সর্বসম্মতিক্রমে সাহাবায়ে কেরাম উটের পিঠের ন্যায় করেছেন। –[বুখারী শরীফ]

بَابُ الشَّهِيْدِ

هُوَ كُلُّ طَاهِرٍ بَالِغٍ قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ اَوْ وُجِدَ مَيِّتًا جَرِيْحًا فِى الْمَعْرِكَةِ فَالطَّاهِرُ اِحْتِرَازٌ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ كَالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْبَالِغُ اِحْتِرَازٌ عَنِ الصَّبِىِّ وَبِالْحَدِيْدِ اِحْتِرَازٌ عَنِ الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ وَظُلْمًا اِحْتِرَازٌ عَنِ الْقَتْلِ حَدًّا اَوْ قِصَاصًا وَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ اِحْتِرَازٌ عَنْ قَتْلٍ وَجَبَ بِهِ مَالٌ وَالْمُرَادُ اَنَّ الْمَالَ لَا يَجِبُ بِنَفْسِ هٰذَا الْقَتْلِ فَاِنَّ الْاَبَ اِذَا قَتَلَ اِبْنَهٗ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا يَكُوْنُ الْاِبْنُ شَهِيْدًا لِاَنَّ الْمَالَ وَاِنْ وَجَبَ فَاِنَّهٗ لَمْ يَجِبْ بِنَفْسِ هٰذَا الْقَتْلِ وَقَوْلُهٗ اَوْ وُجِدَ مَيِّتًا فَاِنَّ مَنْ وُجِدَ مَيِّتًا جَرِيْحًا فِى الْمَعْرِكَةِ فَهُوَ شَهِيْدٌ لِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ اَهْلَ الْحَرْبِ قَتَلُوْهُ ـ

পরিচ্ছেদ : শহীদের বিবরণ

অনুবাদ : শহীদ প্রত্যেক বালেগ পবিত্র ব্যক্তি যাকে অন্যায়ভাবে লোহা দ্বারা হত্যা করা হয়েছে এবং এ হত্যার বিনিময়ে মাল ওয়াজিব হয় না। কিংবা যাকে লড়াইয়ের ময়দানে ক্ষত অবস্থায় মৃত পাওয়া গেছে। অতএব, طَاهِرٌ কয়েদ দ্বারা ঐ ব্যক্তি থেকে اِحْتِرَازٌ করেছেন যার উপর [জীবদ্দশায়] গোসল ওয়াজিব ছিল। যেমন– জুনূবী ব্যক্তি, হায়েজা মহিলা ও নিফাসগ্রস্ত মহিলা। بَالِغٌ শব্দের قَيْد দ্বারা صَبِىٌّ থেকে اِحْتِرَازٌ করা হয়েছে। حَدِيْدَةٌ -এর কয়েদ দ্বারা ভারী জিনিস দ্বারা মারা থেকে اِحْتِرَازٌ করেছেন। ظُلْمًا বলে ঐ ব্যক্তি থেকে اِحْتِرَازٌ করেছেন, যাকে হদ্দ (حَدٌّ) কিংবা কিসাসের ভিত্তিতে হত্যা করা হয়েছে। وَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ বলার দ্বারা ঐ হত্যা থেকে اِحْتِرَازٌ করেছেন যার মাল ওয়াজিব হয় [যেমন– দিয়ত-মুক্তিপণ]। মাল ওয়াজিব হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শুধু হত্যার দ্বারা মাল ওয়াজিব নয়। কারণ, পিতা যখন অন্যায়ভাবে সন্তানকে লোহা দ্বারা হত্যা করবে, তখন সন্তান শহীদ হয়ে যায়। কেননা, এ সুরতে যদিও মাল ওয়াজিব হয়, কিন্তু তা শুধু হত্যার কারণে ওয়াজিব হয়নি। গ্রন্থকারের কথা– اَوْ وُجِدَ مَيِّتًا [তাকে এ কারণে শহীদ বলা হয় যে,] যাকে লড়াইয়ের ময়দানে ক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, সে শহীদ। কারণ, জাহির হলো, কাফেররা তাকে হত্যা করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ بَابُ الشَّهِيْدِ :

শহীদের বর্ণনা ভিন্নভাবে করার কারণ : ইতঃপূর্বে সাধারণ মৃত ব্যক্তিদের বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু শহীদের বর্ণনা এর থেকে ব্যতিক্রম করে উল্লেখ করার কারণ হলো, শহীদের মৃত্যু অন্যান্য মৃত্যু থেকে অনেক দিক থেকে উত্তম। এমনকি আল্লাহর রাস্তার শহীদকে মৃত বলতেও নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ "যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত তবে তা তোমরা জান না।"

شَهِيْد -এর সংজ্ঞা ও নামকরণ : শহীদের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমাদের বিকায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন– اَلشَّهِيْدُ هُوَ كُلُّ طَاهِرٍ بَالِغٍ قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ اَوْ وُجِدَ مَيِّتًا جَرِيْحًا فِى الْمَعْرِكَةِ অর্থাৎ "শহীদ বলা হয়, প্রত্যেক বালেগ

পবিত্র ব্যক্তিকে যাকে অন্যায়ভাবে লোহা দ্বারা হত্যা করা হয়েছে এবং এ হত্যার কারণে মাল ওয়াজিব হয় না। কিংবা যাকে লড়াইয়ের ময়দানে ক্ষত এবং মৃত পাওয়া যায়।"

শারেহ (র.) মুখতাসারে বিকায়ার মধ্যে লেখেন– وَهُوَ مُسْلِمٌ طَاهِرٌ بَالِغٌ قُتِلَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ وَلَمْ يَرْتَثَّ অর্থাৎ "শহীদ বলা হয়, ঐ পাক এবং বালেগ মুসলমানকে, যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। যে হত্যার কারণ মাল ওয়াজিব হয়নি এবং [ক্ষত হওয়ার পর মরার পূর্বে] জীবন বাঁচানোর কোনো উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেনি।"

পূর্বের সংজ্ঞার সাথে এ সংজ্ঞার পার্থক্য হলো– এতে লোহা দ্বারা মারা ও লড়াইয়ের ময়দানে পাওয়ার কথা উল্লেখ নেই। অতএব, এ সংজ্ঞা মুশরিক, বিদ্রোহী ও ডাকাত কর্তৃক নিহতদেরও শামিল রাখবে এবং জিহাদের ময়দানে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় মৃত পাওয়া যাওয়া ব্যক্তিকেও শামিল রাখবে।

শহীদকে শহীদ বলার কারণ হলো, شَهِيْد অর্থ مَشْهُوْد - ফেরেশতারা তার জন্য জান্নাতের সুপারিশ করেন। দ্বিতীয় কারণ, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি যেহেতু জান্নাতের ওয়াদাপ্রাপ্ত, তাই তাকে শহীদ বলা হয়।

শহীদের প্রকারভেদ : শহীদ দু প্রকার– ১. আখিরাতের আহকামের দিক থেকে শহীদ। যদিও দুনিয়াবি আহকামের দিক থেকে তাকে গোসল ইত্যাদি দেওয়া হয়। ২. দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দিক থেকে শহীদ। এমনকি তাকে গোসলও দেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ هُوَ كُلُّ طَاهِرٍ بَالِغٍ الخ : বিকায়া গ্রন্থকার (র.) শহীদের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, এর জন্য যে সমস্ত قَيْد উল্লেখ করেছেন সেগুলোর সঙ্গে মুসলিম قَيْد টি উল্লেখ করলে সম্ভবত ভালো হতো। কেননা, কাফের ব্যক্তি শহীদ হয় না, যদিও উল্লিখিত সমস্ত শর্ত পাওয়া যায়। কিন্তু যদি এখানে طَاهِرٌ দ্বারা جَنَابَةٌ شَرْعِيَّةٌ - جَنَابَةٌ شِرْكِيَّةٌ ও جَنَابَةٌ اِعْتِقَادِيَّةٌ থেকে পবিত্র হওয়া উদ্দেশ্য হয়, তবে সহীহ হবে। তবে এতে লৌকিকতা রয়েছে। আর بَالِغٌ শব্দের স্থলে যদি مُكَلَّفٌ শব্দটি ব্যবহার করতেন, তবে হয়তো ভালো হতো। যেন পাগল এবং নাবালেগ উভয়ে এ সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যেত।

قَوْلُهُ جَرِيْحًا فِى الْمَعْرَكَةِ : جَرِيْحٌ অর্থ مَجْرُوْحٌ - ক্ষতবিক্ষত হওয়া। উদ্দেশ্য হলো, তার মাঝে নিহত হওয়ার চিহ্ন পাওয়া যাওয়া। অতএব, যদি তার মাঝে নিহত হওয়ার কোনো চিহ্ন না পাওয়া যায়, তবে সে শহীদ হবে না। কেননা, প্রকাশ্যরূপে বুঝা যায় যে, সে লড়াইয়ের ময়দানে ভয়ে মারা গেছে কিংবা সে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে সে মারা গেছে।

قَوْلُهُ عَمَّنْ وُجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ الخ : অর্থাৎ طَاهِرٌ বলে গ্রন্থকার ঐ ব্যক্তি থেকে اِحْتِرَازٌ করেছেন যার উপর জীবদ্দশায়ই গোসল ওয়াজিব ছিল। সুতরাং যদি এমন কেউ হয়, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) বলেন, তাকেও গোসল দেওয়া হবে না। দলিল হলো, মৃত্যুর কারণে তার থেকে جَنَابَةٌ -এর গোসল রহিত হয়ে যায়। আর শাহাদাতের কারণে তো তার উপর দ্বিতীয় গোসলও ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, শাহাদাতের দরুন গোসল রহিত হয় না। তবে তা গোসলের জন্য প্রতিবন্ধক। এর স্বপক্ষে দলিল হলো হযরত হানযালা (রা.)-এর ঘটনা। উহুদ যুদ্ধে হযরত হানযালা (রা.) শহীদ হলে ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিতে দেখা যায়। পরবর্তীতে যাচাই করে দেখা গেল যে, হানযালা (রা.) জুনূবী ছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জুনূবী শহীদকে গোসল দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ عَنِ الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ : অর্থাৎ যদি কোনো ভারী জিনিস পতিত হয়, আর এ কারণে কেউ মারা যায় [যেমন– বড় পাথর পতিত হয়] তবে একে বলা হয় قَتْلِ شِبْهِ عَمْدٍ -এর কারণে কিসাস ওয়াজিব হয় না; বরং দিয়ত ওয়াজিব হয়। এ পদ্ধতিতে মারা যাওয়ার দ্বারা সে শহীদ হবে না।

قَوْلُهُ عَنْ قَتْلٍ وَجَبَ بِهِ مَالٌ : অর্থাৎ যদি এভাবে হত্যা করে যার দ্বারা হত্যাকারীর উপর মাল ওয়াজিব হয়। যেমন– কোনো ছোট পাথর মেরে হত্যা করে ফেলেছে কিংবা এমন কোনো জিনিস দ্বারা হত্যা করেছে, যা দ্বারা সাধারণত মারা হয় না কিংবা قَتْلُ خَطَأٌ হলো। যেমন– কোনো শিকারের দিকে তীর মারল আর তা কোনো মানুষের উপর লেগে সে মারা গেল, তাহলে এসব সুরতে কিসাস ওয়াজিব হবে না; বরং দিয়ত [মাল] ওয়াজিব হবে। তাই এমন নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলা হবে না।

قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِبْ بِنَفْسِ الخ : কেননা, স্বেচ্ছায় অন্যায়ভাবে লোহা দ্বারা হত্যা করার কারণে কিসাস ওয়াজিব হয়; কিন্তু যদি বাবা ছেলেকে হত্যা করে ফেলে, তবে পিতার সম্মানার্থে তার কিসাস রহিত হয়ে যাবে। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন– اَلْوَالِدُ لَا يُقْتَلُ لِوَلَدِهٖ অর্থাৎ "ছেলের কিসাসে পিতাকে হত্যা করা হবে না।" কিন্তু নিহত ব্যক্তির রক্তকে বেফায়দা ও অনর্থক থেকে বাঁচানোর জন্য দিয়ত আবশ্যক হবে।

وَمَقْتُولُهُمْ شَهِيْدٌ بِاَيِّ شَيْءٍ قَتَلُوْهُ وَاِنَّمَا شَرَطَ الْجِرَاحَةَ فِيْمَنْ وُجِدَ فِى الْمَعْرَكَةِ لِيَدُلَّ عَلٰى اَنَّهُ قَتِيْلٌ لَا مَيِّتٌ حَتْفَ اَنْفِهِ فَالْحَاصِلُ اَنَّ الشَّهِيْدَ مَنْ قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ اَوْ مَنْ وُجِدَ مَيِّتًا جَرِيْحًا فِى الْمَعْرَكَةِ سَوَاءٌ قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ اَوْ لَا لٰكِنَّ فِىْ هٰذَا التَّعْرِيْفِ نَظْرٌ وَهُوَ اَنَّهُ لَا يَشْمَلُ مَا اِذَا قَتَلَهُ الْمُشْرِكُوْنَ اَوْ اَهْلُ الْبَغْيِ اَوْ قُطَّاعُ الطَّرِيْقِ بِغَيْرِ الْحَدِيْدَةِ فَاِنَّ قَتِيْلَهُمْ شَهِيْدٌ بِاَيِّ اٰلَةٍ قَتَلُوْهُ فَالتَّعْرِيْفُ الْحَسَنُ الْمُوْجَزُ مَا قُلْتُ فِى الْمُخْتَصَرِ -

অনুবাদ : কাফের ব্যক্তিরা যে জিনিস দ্বারাই হত্যা করুক না কেন, নিহত ব্যক্তি শহীদ হয়। লড়াইয়ের ময়দানে মৃত ব্যক্তিকে ক্ষত অবস্থায় পাওয়া যাওয়ার শর্ত এ কারণে করেছেন যে, যেন বুঝা যায় যে, সে নিহত ব্যক্তি; সাধারণ মৃত নয়। অতএব, সারকথা হলো– শহীদ ঐ ব্যক্তি যাকে অন্যায়ভাবে লোহা দ্বারা হত্যা করা হয়েছে। আর এ হত্যার কারণে মাল ওয়াজিব হয় না। কিংবা [শহীদ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে] যাকে লড়াইয়ের ময়দানে ক্ষত অবস্থায় মৃত পাওয়া যায়– চাই লোহা দ্বারা মারা হোক কিংবা না হোক। কিন্তু এ সংজ্ঞার মাঝে نَظْر [মন্তব্য] রয়েছে। তা হলো, ঐ শহীদ ব্যক্তি এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয় না, যাকে মুশরিকরা কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহীরা কিংবা ডাকাতরা লোহা ছাড়া হত্যা করেছে। অথচ তাদের হত্যাকৃত ব্যক্তি শহীদ। চাই যে যন্ত্র দ্বারাই হত্যা করুক। সুতরাং উত্তম এবং সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হলো, যা আমি "মুখতাসারে বিকায়া"-এর মধ্যে উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَقْتُولُهُمْ شَهِيْدٌ بِاَيِّ شَيْءٍ قَتَلُوْهُ : অর্থাৎ লড়াইয়ের ময়দানে পাওয়া যাওয়া ক্ষতবিক্ষত মুসলিম মৃত ব্যক্তি সর্বাবস্থায় শহীদ। কারণ, এতে ক্ষত [জখম] দেখা গেছে। তাই নিশ্চিতরূপে বলা যাবে যে, তাকে অবশ্যই কাফেররা শহীদ করেছে। এখন চাই যে জিনিস দ্বারাই তাকে শহীদ করুক। চাই ছোট পাথর কিংবা কোনো লাকড়ি দ্বারা মারা হোক। এখানে লোহা, তলোয়ার ইত্যাদির মাধ্যমে মারার শর্ত করা হবে না। কারণ, এ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, শহীদদের জখম ও খুনকে হেফাজত কর। –[মুসনাদে আহমাদ]

রাসূলুল্লাহ ﷺ শুহাদায়ে কেরামকে রক্তসহ দাফন করেছেন এবং তাঁদেরকে গোসলও দেননি। –[বুখারী ও সুনানে আরবা'আ] আর এটি স্পষ্ট কথা যে, তাঁরা সকলে তলোয়ার কিংবা ধারালো হাতিয়ারের আঘাতে মারা যান নি; বরং কেউ কেউ পাথর লাগার দ্বারাও শহীদ হয়েছেন।

قَوْلُهُ لِيَدُلَّ عَلٰى اَنَّهُ قَتِيْلٌ لَا مَيِّتٌ الخ : লড়াইয়ের ময়দানে মৃত ব্যক্তিকে জখম হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, সে সাধারণভাবে মারা যায়নি; বরং অন্য কেউ তাকে মারার কারণে সে মারা গেছে। উক্ত বাক্যে "حَتْفَ اَنْفِ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তবঈ [সাধারণ] মৃত্যু। জাহিলি যুগে এ প্রথা ছিল যে, সাধারণ মৃত্যুর সময় রূহ নাক দিয়ে বের হয়। যদি কারণ ছাড়া স্বাভাবিকভাবে কারো মৃত্যু হতো তবে তারা বলত, তার নাকের মৃত্যু হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوْ مَنْ وُجِدَ مَيِّتًا جَرِيْحًا فِى الْمَعْرَكَةِ : অর্থাৎ যাকে লড়াইয়ের ময়দানে ক্ষতবিক্ষত পাওয়া যায় সে শহীদ হবে। তাই তাকে গোসল দেওয়া হবে না; বরং রক্তসহ তাকে দাফন করা হবে, যেরূপ উহুদ প্রান্তরের শুহাদা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ مَا اِذَا مَا قَتَلَهُ الْمُشْرِكُوْنَ الخ : অর্থাৎ লড়াই ব্যতীত মুশরিকরা যাকে মেরে ফেলেছে– যেরূপ হিন্দুস্তানে হিন্দুরা অন্যায়ভাবে মুসলমানদের উপর হামলা করেছে এবং মুসলমানদের হত্যা করছে, তারা সকলেই শহীদ হবে। কিংবা যদি রাষ্ট্রদ্রোহী কাউকে হত্যা করে সেও শহীদ হবে। রাষ্ট্রদ্রোহী ঐ ব্যক্তি, যে রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিরোধিতার ঘোষণা করে। যদিও তার কাছে লোহা বা এ জাতীয় কোনো যন্ত্র না থাকে। আর যদি তার কাছে লোহা বা এ জাতীয় কোনো যন্ত্র থাকে এবং তা দ্বারা সে হত্যা করে, তবে এ পদ্ধতি গ্রন্থকারের قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا -এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আরো উত্তমরূপে সে শহীদ হবে।

وَهُوَ مُسْلِمٌ طَاهِرٌ بَالِغٌ قُتِلَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ وَلَمْ يَرْتَثَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْحَدِيْدَةِ وَالْوِجْدَانُ فِى الْمَعْرِكَةِ فَيَشْمَلُ قَتِيْلَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَهْلُ الْبَغْىِ وَقُطَّاعُ الطَّرِيْقِ بِاَىِّ اٰلَةٍ قَتَلُوْهُ وَيَشْمَلُ الْمَيِّتَ الْجَرِيْحَ فِى الْمَعْرِكَةِ لِاَنَّهُ مُسْلِمٌ مَقْتُوْلٌ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ مَالٌ وَاَمَّا مَقْتُوْلٌ غَيْرِ هٰؤُلَاءِ وَهُوَ مُسْلِمٌ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ غَيْرُ بَاغٍ وَغَيْرُ قُطَّاعِ الطَّرِيْقِ وَمُسْلِمٌ قَتَلَهُ ذِمِّىٌّ فَاِنَّهُ اِنَّمَا يَكُوْنُ شَهِيْدًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِذَا قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا .

অনুবাদ : [মুখতাসারে বিকায়াতে উল্লিখিত শহীদের সংজ্ঞা নিম্নরূপ] শহীদ বলা হয় ঐ পাক ও বালেগ মুসলমানকে, যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, আর এ হত্যা দ্বারা মাল ওয়াজিব হয়নি এবং [সে ক্ষত হওয়ার পর মারা যাওয়ার পূর্বে] বাঁচার জন্য কোনো উপায় অবলম্বন করেনি। এতে লোহা ও লড়াইয়ের ময়দানে পাওয়া যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি। অতএব, মুশরিক, রাষ্ট্রদ্রোহী ও ডাকাত কর্তৃক নিহত ব্যক্তিও এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। চাই সে যে-কোনো অস্ত্রের মাধ্যমে আঘাত করুক। লড়াইয়ের ময়দানে পাওয়া যাওয়া ক্ষতবিক্ষত মৃত ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, সে মুসলমান এবং তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যার মাঝে কোনো মাল ওয়াজিব হয়নি। কিন্তু এ হত্যাকারীদের ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিহত ব্যক্তি; যেমন– কোনো মুসলমানকে অন্য কোনো মুসলমান হত্যা করা, যে রাষ্ট্রদ্রোহী নয়, ডাকাতও নয় কিংবা মুসলমানকে কোনো জিম্মি হত্যা করা। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নিকট সে শহীদ হবে। তবে শর্ত হলো, তাকে অন্যায়ভাবে লোহা দ্বারা হত্যা করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُتِلَ ظُلْمًا الخ : এতে ظُلْمًا -এর শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, রজম, কিসাস, বিদ্রোহ কিংবা ডাকাতির অপরাধে যদি কাউকে হত্যা করা হয়, তবে সে শহীদ হবে না। তাকে গোসল দেওয়া হবে। যদি কোনো প্রাণী তাকে ছিঁড়ে ফেলে কিংবা দালান তার উপর ভেঙ্গে পড়ে কিংবা সে পানিতে ডুবে মারা যায়, তবুও তাকে গোসল দেওয়া হবে। উদ্দেশ্য হলো, এ হত্যার কারণে কারো উপর মাল ওয়াজিব হবে না। সুতরাং قَتْلُ خَطَأٍ কিংবা قَتْلُ شِبْهُ عَمَدٍ কিংবা এ জাতীয় কোনো প্রক্রিয়ায় নিহত ব্যক্তি এ হুকুম থেকে বহির্ভূত এবং তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা, প্রত্যেক ঐ নিহত ব্যক্তি যার কারণে হত্যাকারীর উপর কিসাস আবশ্যক হয় সেই নিহত ব্যক্তিই শহীদ হয়। যদিও সে ছোট অস্ত্রের মাধ্যমে নিহত হয়, কিংবা তাকে আগুনে ভস্মীভূত করা হয় কিংবা এমন কোনো জিনিস দ্বারা মেরেছে যা দ্বারা সাধারণত মারা হয়, তবুও হুকুম এমনই হবে। আর যদি কোনো ভারী জিনিস দ্বারা হত্যা করা হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তার উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। তাই তাকে গোসল দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট কিসাস ওয়াজিব হবে। তাই তাকে গোসল দেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْتَثَّ الخ : অর্থাৎ জখমি হওয়ার পর, মৃত্যুর পূর্বে সে বাঁচার কোনো উপায় অবলম্বন করেনি। পক্ষান্তরে যদি সে কোনো উপায় অবলম্বন করে থাকে কিংবা চিকিৎসা করে, তবে তা এ হুকুমে হবে না। "মাগরিব" নামক গ্রন্থে اِرْتَثَّ الْجَرِيْحُ -এর অর্থ লেখা হয়েছে যে, ক্ষত ব্যক্তিকে লড়াইয়ের ময়দান থেকে উঠানো এবং তাতে তখনও রূহ থাকে।

قَوْلُهُ وَقُطَّاعُ الطَّرِيْقِ بِاَىِّ الخ : ডাকাত কর্তৃক নিহত ব্যক্তিও শহীদ হবে। চাই সে যে জিনিস দ্বারাই হত্যা করুক না কেন।

فَلَمَّا قَالَ وَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ عُلِمَ اَنَّهُ مَقْتُوْلٌ بِحَدِيْدَةٍ لِاَنَّهُ لَوْ قُتِلَ بِغَيْرِ حَدِيْدَةٍ لَوَجَبَ الْمَالُ عِنْدَهُ لِاَنَّ الدِّيَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَهُ فِى الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ وَاَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا اِحْتِيَاجَ اِلَى ذِكْرِ الْحَدِيْدَةِ لِاَنَّ الْمَقْتُوْلَ بِالْمُثَقَّلِ عِنْدَهُمَا شَهِيْدٌ وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ مَالٌ بَلِ الْوَاجِبُ قِصَاصٌ عِنْدَهُمَا وَاَمَّا قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْتَثَّ فَسَيَجِئُ فَائِدَتُهُ فَيُنْزَعُ عَنْهُ غَيْرُ ثَوْبِهِ اَىْ غَيْرُ ثَوْبٍ يَخْتَصُّ بِالْمَيِّتِ كَالْفَرْوِ وَالْحَشْوِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالسِّلَاحِ وَالْخُفِّ وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ لِيَتِمَّ كَفْنُهُ اَىْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَكُوْنُ مِنْ جِنْسِ الْكَفْنِ كَاِزَارٍ وَنَحْوِهِ يُزَادُ وَلَوْ كَانَ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ يَنْقُصُ وَلَا يُغْسَلُ وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ بِدَمِهِ وَغُسِلَ صَبِىٌّ وَجُنُبٌ وَحَائِضٌ وَنُفَسَاءُ وَمَنْ وُجِدَ قَتِيْلاً فِىْ مِصْرَ لَا يُعْلَمُ قَاتِلُهُ فَاِنَّهُ اِذَا لَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهُ غُسِلَ سَوَاءٌ عُلِمَ اَنَّ قَتْلَهُ وَقَعَ بِالْحَدِيْدَةِ اَوْ بِالْعَصَا الْكَبِيْرِ اَوِ الصَّغِيْرِ لِاَنَّ الْوَاجِبَ فِيْهِ الدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ هٰكَذَا ذُكِرَ فِى الذَّخِيْرَةِ وَلَمْ يُذْكَرْ اَنَّهُ وُجِدَ فِىْ مَوْضَعٍ تَجِبُ الْقَسَامَةُ اَوْلَا ـ

অনুবাদ : সুতরাং মুখতাসারে বিকায়া যখন বলা হয়েছে যে- وَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ [এর দ্বারা মাল ওয়াজিব হয়নি] তখন বুঝা গেছে যে, সে লোহা দ্বারা নিহত। কারণ, যদি সে লোহা ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস দ্বারা নিহত হতো তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নিকট মাল ওয়াজিব হতো। কেননা, তাঁর নিকট ভারী জিনিস দ্বারা হত্যা করার ক্ষেত্রে দিয়ত ওয়াজিব হয়। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট حَدِيْدَةٌ [লোহা] উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, তাঁদের নিকট ভারী জিনিস দ্বারা নিহত ব্যক্তি শহীদ। এ হত্যার কারণে তাঁদের নিকট মাল ওয়াজিব হয় না; বরং কিসাস ওয়াজিব হয়। গ্রন্থকারের কথা- وَلَمْ يَرْتَثَّ-এর ফায়দার বর্ণনা অচিরেই করা হবে। শহীদের কাপড় ব্যতীত অন্যান্য কাপড় খুলে ফেলা হবে। অর্থাৎ ঐ কাপড় খোলা হবে না যা মৃত ব্যক্তির সাথে খাস। যেমন- চর্মের পোশাক, আলখেল্লা, টুপি, অস্ত্রশস্ত্র ও মোজা। কাফন পূর্ণ করার জন্য কমবেশি করা হবে। অর্থাৎ যদি তার পরনে ঐ কাপড় না থাকে যা দ্বারা কাফন পরানো হয়। যেমন- ইজার ইত্যাদি। তবে [কাফনের কাপড়] বৃদ্ধি করা হবে। আর যদি এমন কাপড় থাকে যা দ্বারা কাফন পরানো হয় না, তবে তা কম করে দেওয়া হবে [অর্থাৎ খুলে ফেলা হবে]। শহীদকে গোসল দেওয়া হবে না, তবে জানাজার নামাজ পড়া হবে। তাকে তার রক্তসহ দাফন করা হবে। বালক, জুনুবী ও হায়েজ-নিফাসগ্রস্ত মহিলাকে গোসল দেওয়া হবে। ঐ ব্যক্তি যাকে শহরে মৃত পাওয়া গেছে এবং তার হত্যাকারী কে জানা যায় না- [তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে]। কেননা, যখন তার হত্যাকারী কে জানা যায় না, তখন তাকে গোসল দেওয়া হবে। চাই জানা যাক যে, তাকে লোহা দ্বারা কিংবা বড় লাঠি দ্বারা কিংবা ছোট লাঠি দ্বারা মারা হয়েছে। কারণ, এতে দিয়ত কিংবা কাসামাহ ওয়াজিব। "যখীরাহ" নামক গ্রন্থে এমনই উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এ কথা উল্লেখ নেই যে, নিহত ব্যক্তিকে এমন জায়গায় পাওয়া গেছে, যেখানে কাসামাহ ওয়াজিব হয় কিংবা হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَوَجَبَ الْمَالُ عِنْدَهُ الخ : কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট ধারালো কোনো জিনিস দ্বারা স্বেচ্ছায় মারার কারণে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যদি স্বেচ্ছায় না মারে; বরং ভুলবশত মেরে থাকে কিংবা ধারালো লোহা ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস দ্বারা মেরে থাকে, যা দ্বারা সাধারণত মারা হয় বা হয় না সর্বাবস্থায় দিয়ত ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ فَيُنْزَعُ عَنْهُ غَيْرُ ثَوْبِهِ :

শহীদের পরিহিত পোশাকের হুকুম : শহীদের শরীরে যদি এমন কোনো পোশাক থাকে, যা দ্বারা সাধারণত কাফন পরানো হয় না। যেমন– বর্মের পোশাক, লৌহবর্ম, টুপি ইত্যাদি খুলে ফেলা হবে। আর যদি এমন পোশাক থাকে, যা দ্বারা কাফন পরানো হয়, তবে তা রেখে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি কাফনের যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় তার গায়ে না থাকে তবে আরো কাপড় পরিধান করানো হবে। এটি হানাফী আলেমগণের মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শহীদের শরীর থেকে কোনো জিনিস সরানো যাবে না। দলিল হলো রাসূল ﷺ বলেছেন– زَمِّلُوْهُمْ الخ অর্থাৎ "শহীদগণকে তাদের কাপড়ে দাফন কর।" এতে কোনো ব্যাখ্যা নেই যে, কোন ধরনের কাপড়ে দাফন করা হবে, বা কোন ধরনের কাপড়ে দাফন করা হবে না এবং কোন ধরনের কাপড় খুলে নেওয়া হবে না। আহনাফের দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস– قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ بِقَتْلٰى اُحُدٍ اَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيْدُ وَاَنْ يُدْفَنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ অর্থাৎ "তিনি বলেন, রাসূল ﷺ উহুদের শহীদদের ব্যাপারে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তাঁদের শরীর থেকে লৌহ ও বর্মের পোশাক খুলে ফেলা হয় এবং যেন রক্ত ও পোশাকসহ তাদেরকে দাফন করা হয়।" উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত হাদীসদ্বয় একটি অপরটির বিপরীত। এজন্য উভয়টি রেখে কিয়াসের শরণাপন্ন হলাম। কিয়াস বলে যে, তাঁদের বর্মের পোশাক ইত্যাদি খুলে ফেলা হবে। কারণ, এগুলো কাফন জাতীয় নয়।

قَوْلُهُ غَيْرُ ثَوْبِهِ اَىْ غَيْرُ : ثَوْبِه- এর যমীরের مَرْجِعْ শহীদ। তবে তা এদিক থেকে নয় যে, সে শহীদ; বরং এদিক থেকে যে, সে একজন মৃত ব্যক্তি এবং اِضَافَةٌ -এর মাধ্যমে تَخْصِيْص বুঝা যায়। উদ্দেশ্য হলো, ঐ সমস্ত কাপড় যেগুলো মূলত কাফন জাতীয় নয় তা খুলে ফেলবে। যেমন– লৌহ, চর্মের পোশাক, মোজা, টুপি ইত্যাদি।

قَوْلُهُ يُزَادُ وَ يُنْقَصُ لِيُتِمَّ كَفْنَهُ : এ ইবারতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সুন্নত কাফন। সুন্নত কাফন করার জন্য কমবেশি করা যায়।

শহীদকে গোসল দেওয়া হবে না : শহীদকে গোসল দেওয়া হবে না; বরং তাকে তার রক্তসহ জানাজা পড়ে দাফন করে ফেলবে। প্রিয়নবী ﷺ উহুদের শহীদদেরকে গোসল ছাড়াই দাফন করেছেন। জানাজার নামাজ তিনি নিজেই পড়েছেন। কিন্তু বুখারী শরীফে আছে, তা জানাজা পড়া হবে না। এটিই ইমাম শাফেয়ী (র.) দলিল হিসেবের গ্রহণ করেছেন যে, শহীদের জানাজার নামাজও পড়তে হবে না। তবে কায়দা আছে যে, مُثْبِتْ টা مُنْفِىْ -এর উপর مُقَدَّمْ হয়। অতএব, তার জানাজা পড়া হবে।

قَوْلُهُ وَغُسِلَ صَبِىٌّ وَجُنُبٌ وَحَائِضٌ الخ : অর্থাৎ বালক, জুনুবী, হায়েজ কিংবা নিফাসগ্রস্ত মহিলাদেরকে যদি কেউ ধারালো লোহা দ্বারা অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাকে গোসল দেওয়া হবে। বাচ্চাকে এজন্য যে, সে শরিয়তের مُكَلَّفْ নয়। তাই সে শহীদের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। জুনুবী, হায়েজ কিংবা নিফাসগ্রস্তকে এজন্য গোসল দেওয়া হবে যে, জীবদ্দশায়ই তাদের উপর গোসল ওয়াজিব ছিল।

قَوْلُهُ وَمَنْ وُجِدَ قَتِيْلًا فِىْ مِصْرَ الخ : অর্থাৎ যাকে শহরে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং তার হত্যাকারী জানা না থাকে তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে। مِصْر শব্দ দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য। অন্যথায় গ্রামের হুকুমও এমনই। যদি বিরানভূমিতে কাউকে নিহত পাওয়া যায়, যার আশপাশে কোনো বসতি নেই, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা, এতে দিয়ত ও قَسَامَةْ কোনোটাই আবশ্যক নয়। তবে শর্ত হলো, সে ব্যক্তি বিদ্রোহী কিংবা ডাকাত না হতে হবে।

দিয়ত ও কাসামাহ-এর সংজ্ঞা : দিয়ত বলা হয়, নিহত ব্যক্তির রক্তের বিনিময়ে যা আবশ্যক হয়, তার শরয়ী পরিমাণ হলো একশত উট কিংবা এক হাজার দিনার কিংবা দশ হাজার দিরহাম। আর নিহত ব্যক্তির পক্ষ ও বিপক্ষ যদি অন্য কিছুর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তবুও জায়েজ। যদি এর পরিমাণ কম হয়, তবুও একে দিয়ত বলা হবে। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণের দিয়ত মাফ করে দেওয়ার অধিকারও আছে।

قَسَامَةْ শব্দের قَافْ অব্যয়টি যবরযুক্ত হবে। قَسَامَةْ বলা হয় ঐ শপথকে যা মহল্লা কিংবা এলাবাসী খেয়ে থাকে। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি; বরং তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং এর নিদর্শনও রয়েছে, কিন্তু তার হত্যাকারী কে জানা যায় না। তখন মহল্লার পঞ্চাশজন ব্যক্তি শপথ করে। তারা প্রত্যেকেই বলে যে, "আল্লাহর কসম আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করিনি এবং তার হত্যাকারী কে তাও জানি না।" মহল্লাবাসী এভাবে শপথ করার পর সকল মহল্লাবাসী মিলে এ দিয়ত আদায় করে দেবে।

اَقُوْلُ اَنَّ الْمُرَادَ بِهٖ اَنَّهٗ وُجِدَ فِىْ مَوْضَعٍ تَجِبُ الْقَسَامَةُ اَمَّا اِذَا وُجِدَ فِىْ مَوْضَعٍ لَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ كَالشَّارِعِ وَالْجَامِعِ فَاِنْ عُلِمَ اَنَّهٗ قُتِلَ بِالْحَدِيْدَةِ لَا يُغْسَلُ لِاَنَّهٗ شَهِيْدٌ وَاِنْ عُلِمَ اَنَّهٗ قُتِلَ بِالْعَصَا الْكَبِيْرِ يَنْبَغِىْ اَنْ يُغْسَلَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اِذْ لَيْسَ شَهِيْدًا عِنْدَهٗ خِلَافًا لَهُمَا وَاِنْ عُلِمَ اَنَّهٗ قُتِلَ بِالْعَصَا الصَّغِيْرِ يَنْبَغِىْ اَنْ يُغْسَلَ اِتِّفَاقًا لِاَنَّ نَفْسَ الْقَتْلِ اَوْجَبَ الدِّيَةَ فَعَدَمُ وُجُوْبِهَا بِعَارِضٍ جَهْلُ الْقَاتِلِ لَا يَجْعَلُهٗ شَهِيْدًا ـ

[শারেহ (র.) বলেন,] আমি বলি, এর উদ্দেশ্য হলো, নিহত ব্যক্তিকে এমন জায়গায় পাওয়া গেছে, যেখানে কাসামাহ ওয়াজিব হয়। কিন্তু যখন এমন জায়গায় পাওয়া যাবে যেখানে কাসামাহ ওয়াজিব হয় না। যেমন– মহাসড়ক ও জামে মসজিদ। তখন যদি বুঝা যায় যে, তাকে লোহা দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট সে শহীদ নয়। এতে সাহেবাইন (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। যদি জানা যায় যে, ছোট লাঠি দ্বারা তাকে হত্যা করা হয়েছে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা, শুধু হত্যা দিয়তকে ওয়াজিব করেছে। সুতরাং অনির্দিষ্ট হত্যাকারীর কারণে যে হত্যায় দিয়ত ওয়াজিব হয় না, সেই নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বানানো হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّ الْمُرَادَ بِهٖ اَنَّهٗ وُجِدَ الخ : শারেহ (র.) বলেন, قَسَامَةٌ সর্বস্থানে আবশ্যক হয় না; বরং মহল্লা কিংবা বাড়ি-ঘরে পাওয়া গেলে ওয়াজিব হয়। যদি মহাসড়ক, জামে মসজিদ কিংবা কোনো স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ইত্যাদিতে পাওয়া যায়, তবে এতে قَسَامَةٌ ওয়াজিব হয় না; বরং দিয়ত ওয়াজিব হয়। আর, যেহেতু হত্যাকারী কে জানা যায়নি, তাই বাইতুল মাল থেকে দিয়ত আদায় করে দেবে।

قَوْلُهٗ اِذْ لَيْسَ شَهِيْدًا عِنْدَهٗ خِلَافًا الخ : অর্থাৎ যদি জানা যায় যে, তাকে বড় লাঠি দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, তবে সে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট শহীদ হবে না। তাই তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা, তাঁর নিকট ভারী জিনিস দ্বারা হত্যা করার কারণে কিসাস ওয়াজিব হয় না; বরং দিয়ত ওয়াজিব হয়। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র)-এর নিকট বড় লাঠি, ভারী জিনিস, ধারালো জিনিস দ্বারা হত্যা করা বরাবর।

قَوْلُهٗ اَنْ يُغْسَلَ اِتِّفَاقًا الخ : অর্থাৎ যদি জানা যায় যে, তাকে ছোট লাঠি দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সে শহীদ হবে না। কারণ, এ সুরতে সাহেবাইন (র.)-এর নিকটও দিয়ত ওয়াজিব হয়। তাই তাকে শহীদ বলা হবে না। প্রশ্ন হয় যে, হত্যাকারী অজ্ঞাত, তাই দিয়তও ওয়াজিব হবে না। এজন্য শারেহ (র.) বলেন, শুধু হত্যাই দিয়তকে ওয়াজিব করে, তাই এ দিয়ত শাহাদাতের আহকাম-এর প্রতিবন্ধক।

اَمَّا اِذَا عُلِمَ الْقَاتِلُ فَاِنْ عُلِمَ اَنَّ الْقَتْلَ بِالْحَدِيْدَةِ لَمْ يُغْسَلْ لِاَنَّهٗ شَهِيْدٌ وَاِنْ عُلِمَ اَنَّهٗ قُتِلَ بِالْعَصَا الْكَبِيْرِ يَنْبَغِىْ اَنْ يُغْسَلَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) خِلَافًا لَهُمَا وَاِنْ عُلِمَ اَنَّهٗ قُتِلَ بِالْعَصَا الصَّغِيْرِ يُغْسَلُ اِتِّفَاقًا وَقَدْ قَالَ فِى الْهِدَايَةِ وَمَنْ وُجِدَ قَتِيْلًا فِى الْمِصْرِ غُسِلَ لِاَنَّ الْوَاجِبَ فِيْهِ الدِّيَّةُ وَالْقَسَامَةُ فَخَفَّ اَثَرُ الظُّلْمِ اِلَّا اِذَا عُلِمَ اَنَّهٗ قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا اَقُوْلُ هٰذِهِ الرِّوَايَةُ مُخَالِفَةٌ لِمَا ذُكِرَ فِى الذَّخِيْرَةِ لِاَنَّ رِوَايَةَ الْهِدَايَةِ فِيْمَا اِذَا لَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهٗ لِاَنَّهٗ عَلَّلَ بِوُجُوْبِ الْقَسَامَةِ وَلَا قَسَامَةَ اِلَّا اِذَا لَمْ يُعْلَمِ الْقَاتِلُ فَفِىْ صُوْرَةِ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْقَاتِلِ اِذَا عُلِمَ اَنَّ الْقَتْلَ بِالْحَدِيْدَةِ فَفِىْ رِوَايَةِ الْهِدَايَةِ لَا يُغْسَلُ لِاَنَّ نَفْسَ هٰذَا الْقَتْلِ اَوْجَبَ الْقِصَاصَ وَاَمَّا وُجُوْبُ الدِّيَّةِ وَالْقَسَامَةِ فَلِعَارِضِ الْعِجْزِ عَنْ اِقَامَةِ الْقِصَاصِ فَلَا يَخْرُجُهٗ هٰذَا الْعَارِضُ عَنْ اَنْ يَّكُوْنَ شَهِيْدًا وَاَمَّا عَلٰى رِوَايَةِ الذَّخِيْرَةِ فَيُغْسَلُ وَعِبَارَةُ الذَّخِيْرَةِ هٰذِهٖ وَاِنْ حَصَلَ الْقَتْلُ بِحَدِيْدَةٍ فَاِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَاتِلَهٗ تَجِبُ الدِّيَّةُ وَالْقَسَامَةُ عَلٰى اَهْلِ الْمَحَلَّةِ فَيُغْسَلُ وَاِنْ عُلِمَ الْقَاتِلُ لَمْ يُغْسَلْ عِنْدَنَا ـ

অনুবাদ : কিন্তু যখন হত্যাকারী কে জানা যায় তখন যদি জানা যায় যে, তাকে লোহা দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা, সে শহীদ। আর যদি জানা যায় যে, তাকে বড় লাঠি দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তাকে গোসল দেওয়া উচিত। সাহেবাইন (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। যদি জানা যায় যে, তাকে ছোট লাঠি দ্বারা হত্যা করা হয়েছে তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে গোসল দেওয়া হবে। হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে– وَمَنْ وُجِدَ قَتِيْلًا (اِلٰى قَوْلِهٖ) اِنَّهٗ قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا "যাকে শহরে নিহত পাওয়া গেছে তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা, এ হত্যার মাঝে দিয়ত ও قَسَامَةٌ ওয়াজিব হয়। তাই এর দ্বারা জুলুমের প্রভাবটা হালকা হয়। তবে যদি জানা যায় যে, তাকে লোহা দ্বারা অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, [তবে গোসল দেওয়া হবে না]। আমি বলি, হিদায়া-এর এ বর্ণনা ঐ বর্ণনার বিপরীত যা "যখীরা" নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। কেননা, হিদায়া গ্রন্থের বর্ণনা ঐ সুরতে যখন হত্যাকারী কে জানা যায় না। কারণ, হিদায়া গ্রন্থকার [গোসলের সাথে] কাসামাহ ওয়াজিব হওয়াকেও علت সাব্যস্ত করেন। কাসামাহ ওয়াজিব নয়। তবে হত্যাকারী কে না জানার সুরতে ওয়াজিব। অতএব, হত্যাকারী কে না জানার সুরতে যখন জানা যাবে যে, লোহা দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, তখন হিদায়ার বর্ণনায় গোসল ওয়াজিব নয়। কেননা, এ হত্যা কিসাসকে ওয়াজিব করে। আর দিয়ত ও কাসামাহ ওয়াজিব হওয়া তো মূলত কিসাস কায়েম করতে না পারার আরেজী কারণে। অতএব, ঐ আরেজী কারণ তাকে শহীদ হওয়া থেকে বহিষ্কার করবে না। কিন্তু যখীরা নামক গ্রন্থের বর্ণনায়– গোসল দেওয়া হবে। যখীরা নামক গ্রন্থে আছে, যদি লোহা দ্বারা হত্যা করা হয় এবং হত্যাকারী জানা না থাকে, তবে মহল্লাবাসীর উপর দিয়ত ও কাসামাহ ওয়াজিব হবে এবং গোসল দেওয়া হবে। আর যদি হত্যাকারী কে জানা যায়, তবে আমাদের নিকট তাকে গোসল দেওয়া হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أَمَّا إِذَا عُلِمَ الْقَاتِلُ الخ : এ পর্যন্ত পাওয়া যাওয়া নিহত ব্যক্তির যেসব সুরতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মাঝে হত্যাকারী অজ্ঞাত ছিল। এখন বলছেন যে, যদি হত্যাকারী অজ্ঞাত না হয়; বরং জানা থাকে, তবে দেখা হবে যে, সে কোন জিনিস দ্বারা হত্যা করেছে? যদি সে লোহা দ্বারা হত্যা করে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা, সে শহীদ। হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যদি তাকে ছোট লাঠি দ্বারা হত্যা করে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা, এ হত্যার দিয়ত আবশ্যক হয়; কিসাস নয়। আর যদি সে বড় লাঠি দ্বারা হত্যা করে থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা, এ অবস্থায় তাঁর নিকট কিসাস ওয়াজিব নয়; বরং দিয়ত ওয়াজিব হয়। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা, এ ধরনের হত্যার মাঝে তাঁদের নিকট কিসাস ওয়াজিব হয়; দিয়ত নয়। সর্বোপরি হত্যাকারী অজ্ঞাত থাকা কিংবা জানা থাকার দ্বারা নিহত ব্যক্তির হুকুমের মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য হয় না।

قَوْلُهُ فَخَفَّ اَثَرُ الظُّلْمِ الخ : অর্থাৎ যখন দিয়ত ও কাসামাহ ওয়াজিব হয়েছে, তখন সেটি জুলুমের বদলা হবে। এর উদ্দেশ্য হলো, যে জুলুম তার উপর করা হয়েছিল তা এখন নেই কিংবা অন্তত কমেছে। কেননা, শহীদ তো তখন হয়, যখন অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করা হয় এবং তার উপর কোনো মাল ওয়াজিব হয় না। আর যখন মাল ওয়াজিব হয়, তখন এ বিনিময়ের কারণে জুলুমের চিহ্ন রহিত হয়ে যায় কিংবা বিষয়টি হালকা হয়ে যায়। তাই তাকে শহীদের হুকুম দেওয়া হবে না। এমনকি যদি মহাসড়কে [রাজপথে] কিংবা জামে মসজিদে কোনো ব্যক্তিকে নিহত পাওয়া যায় এবং তার হত্যাকারী কে জানা না যায়, তবে তাকেও শহীদ বলা হবে না। কারণ, এ সুরতে বাইতুল মালের উপর এর দিয়ত আবশ্যক হয়। ফলে জুলুমের প্রভাব কমে যায়। এ আলোচনার দ্বারা শারেহ (র.)-এর পূর্বের আলোচনাও দুর্বল হয়ে যায়। কেননা, এ সুরতসমূহে শাহাদাতের জন্য শুধু এক সুরতই বাকি থাকে। তা হলো, হত্যাকারী জানা থাকা এবং তার উপর কিসাস ওয়াজিব হওয়া। তা ছাড়া কোনো নিহত ব্যক্তিকেই শহীদ বলা হবে না।

قَوْلُهُ اَقُوْلُ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ الخ : শারেহ (র.) বলেন, আমি বলি, হিদায়া গ্রন্থকারের বক্তব্য প্রযোজ্য হবে– যখন হত্যাকারী জানা না থাকবে। কেননা, হিদায়া গ্রন্থকার (র.) হত্যাকারী জানা না থাকা অবস্থায় কাসামাহ আবশ্যক করেন। যখন হত্যাকারী জানা হয়ে যায়, তখন দিয়ত আবশ্যক হয় না, কাসামাহ ও আবশ্যক হয় না।

قَوْلُهُ فَلَا يُخْرِجُهُ هٰذَا الْعَارِضُ الخ : অর্থাৎ যাকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং তার হত্যাকারী জানা থাকে, তখন কাসামাহ কিংবা দিয়াত কোনোটাই আবশ্যক হবে না; বরং হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে এবং নিহত শহীদ হবে। তাকে গোসল দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে যদি হত্যাকারী জানা না যায়, তবে যেহেতু সুরতটি কিসাস ওয়াজিব হওয়ার সুরত, তাই যদিও হত্যাকারী জানা নেই বলে দিয়ত কিংবা কাসামাহ আবশ্যক হচ্ছে, কিন্তু নিহত ব্যক্তিকে শহীদ হওয়া থেকে বের করবে না।

فَفِى الذَّخِيْرَةِ لَمْ يُعْتَبَرْ نَفْسُ الْقَتْلِ فَوُجُوْبُ الدِّيَةِ وَاِنْ كَانَ بِالْعَارِضِ اَخْرَجَهُ عَنِ الشَّهَادَةِ وَفِى الْمَتَنِ اُخِذَ بِهٰذِهِ الرِّوَايَةِ هٰذَا اِذَا عُلِمَ اَنَّهُ بِاَىِّ اٰلَةٍ قُتِلَ اَمَّا اِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَاَقُوْلُ يَجِبُ اَنْ يُغْسَلَ لِاَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ اَنَّ مُوْجِبَ نَفْسِ هٰذَا الْقَتْلِ مَا هُوَ فَلَمْ يُمْكِنْ اِعْتِبَارُهُ فَلَابُدَّ اَنْ يُعْتَبَرَ مَا هُوَ الْوَاجِبُ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْقَتْلِ سَوَاءٌ كَانَ اَصْلِيًّا اَوْ عَارِضِيًّا فَالْوَاجِبُ الدِّيَةُ فَلَا يَكُوْنُ شَهِيْدًا اَوْ قُتِلَ بِحَدٍّ اَوْ قِصَاصٍ لِاَنَّ هٰذَا الْقَتْلَ لَيْسَ بِظُلْمٍ اَوْ جُرِحَ وَ ارْتُثَّ بِاَنْ نَامَ اَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ اَوْ عُوْلِجَ اَوْ اٰوَاهُ خَيْمَةٌ اَوْ نُقِلَ عَنِ الْمَعْرَكَةِ حَيًّا اَوْ بَقِىَ عَاقِلًا وَقْتَ صَلٰوةٍ اَوْ اَوْصٰى بِشَيْءٍ غُسِلَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِمْ اِرْتُثَّ الْجَرِيْحُ اَىْ حُمِلَ مِنَ الْمَعْرَكَةِ وَبِهٖ رَمَقٌ وَالْاِرْتِثَاثُ فِى الشَّرْعِ اَنْ يَرْتَفِقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَرَافِقِ الْحَيٰوةِ اَوْ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمٌ مِنْ اَحْكَامِ الْاَحْيَاءِ فَاِذَا بَقِىَ عَاقِلًا وَقْتَ صَلٰوةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَهٰذَا مِنْ اَحْكَامِ الْاَحْيَاءِ وَالْاِيْصَاءُ اِرْتِثَاثٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رح) وَاِنْ قُتِلَ لِبَغْىٍ اَوْ قَطْعِ طَرِيْقٍ يُغْسَلُ وَلَا يُصَلّٰى عَلَيْهِ .

অনুবাদ : যখীরা নামক গ্রন্থে শুধু হত্যার বিবেচনা করা হয়নি। তাই যদিও আরজী কোনো কারণে দিয়ত ওয়াজিব হচ্ছে, কিন্তু তাকে শহীদ হওয়া থেকে বের করে দেবে। এ বর্ণনাকেই মতনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিশ্লেষণ তখনই, যখন জানা যাবে যে, কোন অস্ত্র দ্বারা তাকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু যদি হত্যাকারী জানা না যায়, তবে আমি বলি, তাকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব। কেননা, এ কথা জানা নেই যে, তার এ হত্যার কারণ কি? অতএব, শুধু হত্যার বিবেচনা সম্ভব নয়। সুতরাং ঐ জিনিসের বিবেচনা করা আবশ্যক, যা এ হত্যার مِثْل -এর মাঝে ওয়াজিব হয়। চাই সে ওয়াজিব اَصْلِىْ হোক কিংবা عَارِضِى হোক। তা হলো দিয়ত। অতএব, সে শহীদ হবে না। কিংবা তাকে কোনো হদ্দ বা কিসাসে হত্যা করা হয়েছে। কারণ, এ হত্যা জুলুম নয়। কিংবা সে ক্ষত হয়েছে এবং নিজের জীবন থেকে উপকার গ্রহণ করেছে। এভাবে যে, সে ঘুমিয়েছে কিংবা খানা খেয়েছে কিংবা পানি পান করেছে কিংবা চিকিৎসা করিয়েছে কিংবা তাকে তাঁবুতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে কিংবা লড়াইয়ের ময়দান থেকে জীবিত স্থানান্তরিত করা হয়েছে কিংবা এক ওয়াক্ত নামাজ পর্যন্ত সজ্ঞানে ছিল কিংবা সে কোনো জিনিসের অসিয়ত করেছে, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং তাদের উপর নামাজ পড়া হবে। اِرْتُثَّ الْجَرِيْحُ অর্থাৎ ক্ষত ব্যক্তিকে লড়াইয়ের ময়দান থেকে এ অবস্থায় উঠিয়ে নেওয়া যে, এখনও তার মাঝে রূহ বাকি আছে। শরিয়তে اِرْتِثَاثْ শব্দের অর্থ– জীবনের উপকারী বিষয়াবলির কোনো এক উপকার হাসিল করা কিংবা জীবিতদের বিধানসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি বিধান তার জন্য সাব্যস্ত হওয়া। অতএব, যখন সে এক ওয়াক্ত নামাজ পর্যন্ত হুঁশ অবস্থায়

থাকে, তখন তার উপর নামাজ ওয়াজিব হবে। আর নামাজ ওয়াজিব হওয়া জীবিতদের বিধান। শায়খাইন (র.)-এর নিকট অসিয়ত করাও اِرْتِثَاثٌ - এতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। যদি বিদ্রোহ কিংবা ডাকাতির কারণে হত্যা করা হয়, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং তার উপর নামাজ পড়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِالْعَارِضِ الخ : অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে হত্যাকারী হিসেবে পাওয়া যায়নি। তবে এটিও একটি عَارِضْ যার ভিত্তিতে দিয়ত ওয়াজিব হয়। যখনই দিয়ত ওয়াজিব হবে, তখনই নিহত ব্যক্তি শহীদ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক দেখা দেবে

قَوْلُهُ اَوْ اٰوَاهُ خَيْمَةً الخ : هَمْزَهْ অব্যয়টি টেনে কিংবা না টেনে পড়া যায়। অর্থ– আশ্রয় দেওয়া। এখানে উদ্দেশ্য হলো সেখানে তার জন্য তাঁবু টানানো। এটি মূলত রণাঙ্গন থেকে লোক স্থানান্তর করার মাসআলা। অর্থাৎ ময়দান থেকে যদি তাকে হুঁশ অবস্থায় তুলে আনা হয়, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি বেহুঁশ অবস্থায় ময়দান থেকে তুলে আনা হয়, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে না। যদিও সে ঐ বেহুঁশ অবস্থায় একদিন ও একরাতের চেয়েও অধিক সময় বেঁচে থাকে।

قَوْلُهُ وَصَلّٰى عَلَيْهِمْ الخ : এতে عَلَيْهِمْ যমীরের مَرْجِعْ হলো, গোসলের আওতায় উল্লিখিত সকল ব্যক্তি। অর্থাৎ বাচ্চা, জুনূবী, হায়েজগ্রস্ত, যার হত্যার দিয়ত কিংবা কাসামা ওয়াজিব, হদ্দ কিংবা কিসাসে নিহত ব্যক্তি এবং আঘাতপ্রাপ্তির পর মৃত্যুর পূর্বে জীবন থেকে কোনো উপকার গ্রহণকারী। উদ্দেশ্য হলো, তাদের সকলকে গোসল দেওয়া হবে এবং জানাজার নামাজ পড়া হবে।

قَوْلُهُ مُرَافِقُ الْحَيٰوةِ اَوْ يَثْبُتُ الخ : অর্থাৎ জীবনের কোনো একটি উপকার সে গ্রহণ করেছে এবং তার উপর জীবিতদের বিধান জারি হয়েছে। তবে তার উপর উহুদের শুহাদা -এর হুকুম জারি হবে না। কারণ, এতে সেই অর্থ নেই। এ কারণেই হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী (রা.) ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী ও শহীদ হয়েছেন, কিন্তু তাঁদেরকে গোসল দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رح) : মূল মাসআলা হলো অসিয়ত ইরতিছাছ (اِرْتِثَاثٌ) অর্থাৎ আঘাতপ্রাপ্তির পর যদি কেউ কোনো অসিয়ত করে, তবে তার এ অসিয়ত শায়খাইন (র.)-এর মতে اِرْتِثَاثٌ হবে। তাই তাকে গোসল দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট তা اِرْتِثَاثٌ নয়। তবে শর্ত হলো, অসিয়তটি দুনিয়াবি না হতে হবে। আর যদি দুনিয়াবি কোনো বিষয়ে অসিয়ত হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা اِرْتِثَاثٌ হবে এবং তাকে গোসল দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ قُتِلَ لِبَغْيٍ الخ : অর্থাৎ যদি কোনো বিদ্রোহী কিংবা ডাকাতকে হত্যা করা হয়, যদিও এর কারণ হয় বিদ্রোহ কিংবা ডাকাতি, তবুও তাকে গোসল দেওয়া হবে। কারণ, সে শহীদ নয়। আর তার উপর জানাজার নামাজ পড়া হবে না রাজনৈতিক কৌশলের কারণে।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الْكَعْبَةِ

صَحَّ فِيْهَا الْفَرْضُ وَالنَّفْلُ الْمَذْكُوْرُ فِى الْهِدَايَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) فِيْهِمَا وَالْمَذْكُوْرُ فِىْ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ (رح) اَلْجَوَازُ اِذَا تَوَجَّهَ اِلٰى جِدَارِ الْكَعْبَةِ حَتّٰى اِذَا تَوَجَّهَ اِلَى الْبَابِ وَهُوَ مَفْتُوْحٌ وَلَا يَكُوْنُ اِرْتِفَاعُ الْعَتَبَةِ بِقَدْرِ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ لَا يَجُوْزُ وَفِىْ كُتُبِهٖ اَيْضًا اَنَّهٗ اِنِ انْهَدَمَتِ الْكَعْبَةُ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ يَجُوْزُ الصَّلٰوةُ خَارِجَهَا مُتَوَجِّهًا اِلَيْهَا وَلَا يَجُوْزُ فِيْهَا اِلَّا اِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ اَوْ بَقِيَّةُ جِدَارٍ وَهٰذَا حُكْمٌ عَجِيْبٌ لِاَنَّ جَوَازَ الصَّلٰوةِ خَارِجَهَا عَلٰى تَقْدِيْرِ الْاِنْهِدَامِ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْقِبْلَةَ اِمَّا اَرْضُ الْكَعْبَةِ اَوْ هَوَاؤُهَا فَيَجِبُ اَنْ يَجُوْزَ فِيْهَا مِنْ غَيْرِ اِشْتِرَاطِ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مُرْتَفِعٌ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ وَلَوْ ظَهْرَهٗ اِلٰى ظَهْرِ اَمَامَهٗ لَا لِمَنْ ظَهْرَهٗ اِلٰى وَجْهِهٖ لِاَنَّ هٰذَا تَقَدَّمَ ـ

পরিচ্ছেদ : কাবার অভ্যন্তরে নামাজ আদায় করা

অনুবাদ : কাবার অভ্যন্তরে ফরজ কিংবা নফল নামাজ আদায় করা সহীহ। হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, উক্ত ফরজ ও নফল নামাজের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) মতানৈক্য করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখ আছে যে, যদি কাবা ঘরের দেওয়ালের দিকে ফিরে [দাঁড়ায়] তবে তা জায়েজ। তবে যদি কাবা ঘরের দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়, এমতাবস্থায় দরজা খোলা থাকে এবং কাবার চৌকাঠ উটের হাওদা পরিমাণ উঁচু না হয়, তবে নামাজ জায়েজ হবে না। তাঁর কিতাবে এটাও আছে যে, নাউযুবিল্লাহ যদি কাবা শরীফ ভেঙ্গেও যায়, তবে কাবার বাহিরে কাবার দিকে হয়ে নামাজ জায়েজ। কিন্তু তখন কাবার ভিতরে নামাজ জায়েজ নেই। তবে যখন কাবা ঘরের ভিতরে মুসল্লির সামনে কোনো সুতরা কিংবা দেওয়াল থাকবে [তখন তা জায়েজ হবে]। এটি বিস্ময়কর এক হুকুম। কেননা, কাবা ঘর ভেঙ্গে যাওয়ার সুরাতে কাবা ঘরের বাহিরে নামাজ জায়েজ হওয়া এ কথা বুঝায় যে, কাবার ভূমি [চত্বর] কিবলা কিংবা এর ফাঁকা অংশ কিবলা। সুতরাং তা মুসল্লির সামনে উটের পিঠের ন্যায় কোনো কিছু থাকার শর্ত ব্যতীতই কাবার অভ্যন্তরে নামাজ জায়েজ হওয়াকে আবশ্যক করে। যদিও মুক্তাদীর পিঠ ইমামের পিঠের দিকে হয় [তবু কাবার অভ্যন্তরে নামাজ জায়েজ। কিন্তু] ঐ ব্যক্তির নামাজ জায়েজ নেই, যার পিঠ ইমামের পিঠের দিকে থাকে। কেননা, এ সুরতে সে ইমামের আগে হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : كِتَابُ الصَّلٰوةِ-এর সমস্ত بَابٌ সম্পর্কে আলোচনা করার পর এ একটি সম্ভাবনাময়ী সুরত রয়েছে যে, কাবা শরীফের অভ্যন্তরে কিভাবে নামাজ আদায় করে? তাই এ পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হবে।

একে সমস্ত পরিচ্ছেদের শেষে এজন্য এনেছেন যে, যেন সালাত অধ্যায়টি একটি বরকতময় জিনিস দ্বারা সমাপ্ত হয়। কাবা শরীফ চৌকোণা বিশিষ্ট হওয়ার কারণে একে কাবা বলা হয়।

قَوْلُهٗ صَحَّ فِيْهَا الْفَرْضُ الخ :

কাবার অভ্যন্তরে নামাজ আদায়ের হুকুম : আহনাফের মতে, কা'বার অভ্যন্তরে ফরজ ও নফল উভয় নামাজ আদায় করা জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, উভয়টিই নাজায়েজ। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, নফল নামাজ জায়েজ এবং ফরজ নামাজ জায়েজ নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবটি একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। তা হলো, যদি কাবার

অভ্যন্তরে দরজার দিকে হয়ে দাঁড়ায় এবং দরজা খোলা থাকে কিংবা কোনো সুতরা না থাকে, তবে নাজায়েজ। আর যদি দরজা বন্ধ থাকে কিংবা কোনো সুতরা থাকে, তবে তা জায়েজ।

ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল হলো, কাবার অভ্যন্তরে নামাজি ব্যক্তি নামাজের মধ্যে কাবার এক অংশকে কিবলা এবং এক অংশকে পিঠের দিক করছে। আর إِسْتِدْبَارٌ-এর চাহিদা হলো নামাজ ফাসেদ হয়ে যাওয়া এবং إِسْتِقْبَالٌ-এর চাহিদা হলো নামাজ সহীহ হয়ে যাওয়া। তাই সতর্কতামূলক ফরজ নামাজকে নাজায়েজ বলি এবং নফল নামাজকে জায়েজ বলি। কারণ, নফলের ভিত্তি কিছুটা দুর্বল এবং সহজ। তাইতো শক্তি থাকা সত্ত্বেও বসে নফল পড়া জায়েজ।

আহনাফের দলিল হলো–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ مَكَثَ فِيْهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَالْتُ بِلَالًا حِيْنَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَمُوْدَيْنِ عَنْ يَسَارِهٖ وَعَمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهٖ وَثَلَاثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهٗ ثُمَّ صَلّٰى وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ وَكَانَ هٰذَا يَوْمَ الْفَتْحِ ـ

অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ, উসামা, বেলাল ও ওসমান ইবনে তালহা কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর তাঁরা কাবার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাতে তাঁরা অবস্থান করলেন। হযরত ইবনে ওমর বলেন, আমি বেলালকে জিজ্ঞাসা করলাম, যখন বেলাল বাহিরে বের হয়ে আসলেন– রাসূল ﷺ কি কি আমল করেছেন? দুটি খুঁটি তিনি বাম দিকে রাখলেন, একটি ডান দিকে আর তিনটি পিছনের দিকে রাখলেন। তারপর তিনি নামাজ আদায় করলেন। তখন বায়তুল্লাহর ছয়টি খুঁটি ছিল। আর ঘটনাটি ছিল মক্কা বিজয়ের দিন।"– যদি কাবার অভ্যন্তরে নামাজ পড়া নাজায়েজ হতো, তবে রাসূল ﷺ কখনো কাবার ভিতরে নামাজ পড়তেন না। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তা নফল ছিল। তখন আমরা উত্তরে বলব– জায়েজ হওয়ার যে সমস্ত শর্ত নফলের জন্য রয়েছে, সে সমস্ত শর্ত ফরজের জন্যও রয়েছে। সুতরাং ফরজ ও নফল একই শ্রেণীভুক্ত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল আমাদের দলিলের মতোই। তবে তাঁর মতে দরজা খোলা থাকা অবস্থায় এবং সামনে কোনো সুতরা না থাকাবস্থায় নামাজ জায়েজ হবে না। কারণ, তখন কাবার কোনো অংশ তার কিবলা হচ্ছে না; বরং তার কিবলা বাহিরে চলে যাচ্ছে। এজন্যই আলোচ্য ইবারতে কাবার চৌকাঠ উঁচু থাকার কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَهٰذَا حُكْمٌ عَجِيْبٌ الخ : এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপর একটি মন্তব্য। কেননা, তিনি বলেছেন, [নাউযুবিল্লাহ] যদি কাবাঘর ধ্বংস হয়ে যায়, তবে কাবার বাহিরে নামাজ পড়া জায়েজ। অথচ তার সামনে ঐ নির্ধারিত দালান নেই। তবে শুধু কাবার চত্বর [ভূমি] টি আছে, যা কাবার চার দেওয়ালের বেষ্টনিতে ছিল। কিংবা আছে ঐ ফাঁকা অংশ যা ভূমি থেকে শুরু করে আসমান পর্যন্ত মুক্ত। তাই যদি নির্ধারিত দালানটিই কিবলা হয়, তবে শুধু কাবার ভূমির দিকে মুখ করে নামাজ পড়া বৈধ হবে না। আর যদি ঐ ফাঁকা অংশ কিবলা হয়, তবে কাবার ভিতরে খোলা দরজার দিকে ফিরেও নামাজ বৈধ হবে। কারণ, ফাঁকা অংশ এখনও তার সামনে আছে। দ্বিতীয় কথা হলো, তিনি মুসল্লির সামনে সুতরা থাকার শর্ত করেছেন। যার দ্বারা মুসল্লির সামনে দেওয়াল না থাকা প্রমাণিত হয়, যা অযৌক্তিক মনে হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পক্ষ থেকে এর উত্তর হলো, যদি অসুবিধাজনক অবস্থা না হয়, তবে ঐ নির্ধারিত দালানই কিবলা। আর যদি অসুবিধাজনক অবস্থা হয়, তবে কাবার ভূমির দিকে মুখ করে নামাজ পড়াই যথেষ্ট হবে। আর সুতরার শর্ত এজন্য করেছেন যে, যেন বাহিরের দিকে ফিরে না দাঁড়ানো হয় এবং তাও ঐ সময়, যখন দরজা খোলা থাকে এবং দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়।

قَوْلُهٗ وَلَوْ ظَهْرَ اِلٰى ظَهْرِ اَمَامَهٗ الخ : এটি মাতেন (র.)-এর ইবারত– صَحَّ فِيْهَا الْفَرْضُ وَالنَّفْلُ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ যেহেতু কাবার অভ্যন্তরে ফরজ ও নফল সমস্ত নামাজ আদায় করা সহীহ, তাই তাতে জামাতও সহীহ। এখন যদি কাবার অভ্যন্তরে জামাতের নামাজ আদায় করে, তবে যেহেতু এর ভিতরে সব দিকই কিবলা এবং এর যে-কোনো দিকে মুখ করে দাঁড়ানো যায়, তাই ইমামের ইকতিদা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে মুখ করে দাঁড়ানো সহীহ হবে। এর সম্ভাবনাময়ী সুরত মোট চারটি–

১. ইমামের পিছনে, তার পিঠের দিকে চেহারা করে, যেভাবে আমরা পড়ে থাকি।
২. ইমামের পিছনে, কিন্তু নিজের পিঠ ইমামের পিঠের দিকে করে,
৩. ইমামের সামনে, কিন্তু ইমামের সামনের দিকে মুখ করে,
৪. ইমামের সামনে, কিন্তু ইমামের সামনের দিকে নিজের পিঠ করে। এ শেষ সুরতটি জায়েজ নেই। কেননা, এতে ইমামের আগে যাওয়া আবশ্যক হয়, যা কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নেই। বাকি তিন সুরত জায়েজ। কারণ, এতে تَقَدُّم পাওয়া যায় না। তবে ইমামের ডান দিককে সামনে রেখে কিংবা ইমামের ডান দিকে পিঠ করে দাঁড়ানো, অনুরূপ ইমামের বাম দিককে সামনে রেখে কিংবা তাঁর বাম দিকে পিঠ করে দাঁড়ানোরও মোট চার সুরত রয়েছে। যদিও এগুলো উল্লেখ করা হয়নি, তবে এর চার সুরতই জায়েজ।

وَكُرِهَ فَوْقَهَا تَعْظِيْمًا لِلْكَعْبَةِ وَفِى الْهِدَايَةِ اَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) وَفِىْ كُتُبِهِ اَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَىْءٌ مُرْتَفِعٌ اِقْتَدَوْا مُتَحَلِّقِيْنَ حَوْلَهَا وَبَعْضُهُمْ اَقْرَبُ مِنْ اِمَامِهِ اِلَيْهَا جَازَ لِمَنْ لَيْسَ فِىْ جَانِبِهِ اِعْلَمْ اَنَّ لِلْكَعْبَةِ اَرْبَعَةُ جَوَانِبَ بِحَسْبِ جُدْرَانِهَا الْاَرْبَعَةِ فَالْوَاقِفُ فِى الْجَانِبِ الَّذِىْ يَكُوْنُ الْاِمَامُ فِيْهِ اِذَا كَانَ اَقْرَبُ اِلَيْهَا مِنَ الْاِمَامِ يَكُوْنُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْاِمَامِ بِخِلَافِ الْوَاقِفِ فِى الْجَوَانِبِ الثَّلٰثَةِ الْاُخَرِ فَاِنَّ مَنْ هُوَ اَقْرَبُ اِلَيْهَا مِنَ الْاِمَامِ لاَ يَكُوْنُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْاِمَامِ ـ

অনুবাদ : কাবার উপরে [ছাদে] নামাজ পড়া মাকরূহ। কাবার সম্মানার্থে। হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট তা জায়েজ নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে, কাবার ছাদে নামাজ জায়েজ নেই। কিন্তু যদি তার সামনে কোনো উঁচু জিনিস থাকে, তবে তা জায়েজ। যদি কাবার চতুষ্পার্শ্বে গোল হয়ে [ইমামের] ইকতিদা করে এবং তাদের কেউ যদি ইমামের চেয়ে কাবার অধিক নিকটবর্তীও হয়, তবে ঐ মুক্তাদীদের নামাজ জায়েজ হবে, যারা ইমামের দিকে নয়। জেনে রেখ যে, কাবার চার দেওয়ালের দিক থেকে এর চারটি দিক রয়েছে। তো যেদিকে ইমাম রয়েছে, সেদিকে দাঁড়ানো মুক্তাদী যখন ইমামের চেয়ে কাবার অধিক নিকটবর্তী হয়, তখন সে ইমামের অগ্রে চলে যায়। পক্ষান্তরে অন্যান্য দিকে দাঁড়ানো মুক্তাদীরা [ইমামের অগ্রে যায় না]। কারণ, যে মুক্তাদী ঐ সব দিকে ইমামের চেয়ে কাবার অধিক নিকটবর্তী হয়, সে ইমামের অগ্রে হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكُرِهَ فَوْقَهَا الخ :

কাবার ছাদে নামাজ পড়া মাকরূহ : কাবার ছাদে নামাজ আদায় করা মাকরূহ, চাই তা ফরজ নামাজ হোক কিংবা নফল নামাজ হোক। মাকরূহ হবে কাবার সম্মানার্থে। কারণ, তখন কাবাঘর মুসল্লির পায়ের নীচে হয়, যা মূলত কাবাঘরের সাথে বেআদবি। এ নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে মারফূ' হাদীস বর্ণিত আছে। যেরূপ কাবাঘরের ভিতরে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে কিবলার দিক পাওয়া যায়। অনুরূপ কাবার ছাদে নামাজ আদায়ের মধ্যেও কিবলার দিক পাওয়া যায়, তাই যদি উক্ত কারাহাত সত্ত্বেও কেউ কাবার ছাদে নামাজ আদায় করে, তবে তার নামাজ হয়ে যাবে। কেননা, কাবা শুধু ঐ দালানের নামই নয়; বরং ভূমি থেকে শুরু করে আসমান পর্যন্ত পূর্ণ শূন্য অংশই কাবা। এজন্যই তো উঁচু দালানে নামাজ আদায় করলেও নামাজ হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলেন, কাবার ভূমি থেকে শুরু করে শুধু আসমান পর্যন্তই কা'বা নয়; বরং مَا تَحْتَ الثَّرٰى -ও কাবা। তাইতো যদি কেউ মাটির নীচে কামরা [যদি অনেক নীচে হয়] বানিয়ে সেখানে নামাজ পড়ে, তার নামাজ জায়েজ হয়।

قَوْلُهُ اِقْتَدَوْا مُتَحَلِّقِيْنَ حَوْلَهَا الخ :

কাবার চতুর্দিকে এক জামাতে নামাজ পড়া : এক জামাতে যদি কা'বার চতুষ্পার্শ্বে নামাজ আদায় করে, তবে যেদিকে ইমাম দাঁড়িয়েছেন সেদিকের কোনো মুসল্লি যদি ইমামের অগ্রে তথা কাবার অধিক নিকটবর্তী না হয়, তবে সকলের নামাজ হয়ে যাবে– যদিও ইমামের অন্যান্য তিন পার্শ্বের মুসল্লিরা ইমামের চেয়ে কাবার অধিক নিকটবর্তী হয়। কারণ তাদের ইমামের অগ্রে যাওয়া হচ্ছে না। হ্যাঁ, যদি ইমামের দিকের কোনো মুসল্লি ইমামের চেয়ে কাবার অধিক নিকটবর্তী হয়, তবে তার নামাজ ভেঙ্গে যাবে। কারণ, সে তার ইমামের অগ্রে চলে গেছে।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

١. قَوْلُهُ "بَابُ الْاَذَانِ" هُوَ سُنَّةٌ لِلْفَرَائِضِ فَحَسْبُ فِيْ وَقْتِهَا" اُكْتُبْ مَعْنَى الْاَذَانِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا .

٢. مَا مَعْنَى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ وَمَا حُكْمُهُمَا لِلْمُقِيْمِ وَالْمُسَافِرِ؟ اُكْتُبْ مُفَصَّلًا .

٣. مَا مَعْنَى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ وَالتَّرْجِيْعِ وَالتَّثْوِيْبِ وَمَا حُكْمُهَا وَمَا حُكْمُ اِذَانِ الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ وَاِقَامَتِهِمَا. حَرِّرْ مُفَصَّلاً .

٤. مَا حُكْمُ الْاَذَانِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ الْكِرَامِ؟

٥. قَوْلُهُ "فَرْضُهَا التَّحْرِيْمَةُ وَلِقِيَامِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .... وَتَعْدِيْلُ الْاَرْكَانِ" . مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالشَّرْطِ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْ حُكْمِ التَّحْرِيْمَةِ وَمَا حُكْمُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ؟

٦. مَا الْمُرَادُ بِتَعْدِيْلِ الْاَرْكَانِ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْ حُكْمِهِ؟ بَيِّنْ .

٧. قَوْلُهُ "مَنْ صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ شَرَعَ صَلَّى كَملاً اِنْ شَرَعَ فِيْ اُخْرٰى وَاِلَّا اَتَمَّ الْاُوْلٰى" اِشْرَحِ الْقَوْلَ الْمَذْكُوْرَ حَقَّ الشَّرْحِ؟

٨. قَوْلُهُ "وَمُرُوْرُ اَحَدٍ وَاِنْ مَرَّ فِيْ مَسْجِدِهٖ عَلَى الْاَرْضِ بِلَا حَائِلٍ" . اُكْتُبْ حُكْمَ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدِي الْمُصَلِّىْ مُفَصَّلًا .

٩. مَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْاَحْنَافِ فِيْ اَدَاءِ السُّجُوْدِ بِالْاَنْفِ وَمَا عَلَيْهِ الْفَتْوٰى؟

١٠. اِشْرَحْ قَوْلَهُ وَرِعَايَةُ التَّرْتِيْبِ فِيْمَا تَكَرَّرَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ الْعَلَّامِ .

١١. ما الْمُرَادُ بِثِيَابِ الْبَذْلَه وَمَا حُكْمُ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ بِهَا وَبِثَوْبٍ فِيْهِ صُوَرٌ؟

١٢. مَا هُوَ الْوَطَنُ الْاَصْلِيْ وَمَا وَطَنُ الْاِقَامَةِ؟

١٣. مَا هِيَ الطَّرِيْقَةُ الْمَسْنُوْنَةُ لِلسَّجْدَةِ؟

١٤. اُكْتُبْ مَعْنَى التَّبَسُّمِ وَالضِّحْكِ وَالْقَهْقَهَةِ ثُمَّ بَيِّنْ حُكْمَهَا فِي الصَّلٰوةِ مَعَ بَيَانِ الْاِخْتِلَافِ فِيْهِ .

١٥. مَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَهْقَهَةِ الصَّبِيِّ وَالْبَالِغِ فِي الصَّلٰوةِ .

١٦. اُكْتُبْ حُكْمَ اِقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّيْ بِالْمُتَيَمِّمِ وَالْغَاسِلِ بِالْمَاسِحِ .

١٧. مَا الْاِخْتِلَافُ فِيْ حَدِّ الْمِصْرِ وَالْخُطْبَةِ وَفِيْ عَدَدِ الرِّجَالِ لِلْجَمَاعَةِ؟

١٨. كَمْ شَرْطًا لِوُجُوْبِ الْجُمُعَةِ وَكَمْ شَرْطًا لِاَدَائِهَا وَمَا هِيَ؟

١٩. مَا حُكْمُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي الْمِصْرِ ثُمَّ سَعٰى اِلَى الْجُمُعَةِ؟ اُكْتُبْ مَعَ بَيَانِ الْاِخْتِلَافِ .

٢٠. اُذْكُرْ سُنَّةَ الْكَفَنِ وَكِفَايَتِهٖ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ ثُمَّ بَيِّنْ كَيْفِيَّةَ تَكْفِيْنِهِمَا .

٢١. قَوْلُهُ "لَا يَجُوْزُ صَلٰوةٌ وَسَجْدَةُ تِلَاوَةٍ وَصَلٰوةُ جَنَازَةٍ عِنْدَ طُلُوْعِهَا وَقِيَامِهَا وَغُرُوْبِهَا اِلَّا عَصْرَ يَوْمِهٖ" . اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ الْعَلَّامِ .

٢٢. قَوْلُهُ "ثُمَّ يُثْنِيْ وَلَا يُوَجِّهُ .... وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ وَيُسَمِّيْ لَا بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّوْرَةِ وَيُسِرُّهُنَّ" . اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ .

٢٣. مَنْ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ اُذْكُرْ مُرَتَّبًا ؟

٢٤. مَا مَعْنَى الشَّهِيْدِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا .

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

اِعْلَمْ اَنَّ الزَّكٰوةَ لَا تَجِبُ اِلَّا فِىْ نِصَابٍ حَوْلِىٍّ فَاضِلٍ عَنْ حَاجَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ هِىَ لَا تَجِبُ اِلَّا فِىْ نِصَابٍ نَامٍ وَالْحَوْلُ هُوَ الْمُمْكِنُ مِنَ الْاِسْتِنْمَاءِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْفُصُوْلِ الْاَرْبَعَةِ وَالْغَالِبُ فِيْهَا تَفَاوُتُ الْاَسْعَارِ فَاُقِيْمَ مَقَامَ النُّمَاءِ فَاُدِيْرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ هٰذَا هُوَ الْمَذْكُوْرُ فِى الْهِدَايَةِ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ هٰذَا يَقْتَضِىْ اَنَّهُ اِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى النِّصَابِ تَجِبُ الزَّكٰوةُ سَوَاءٌ وُجِدَ النُّمَاءُ اَوْ لَمْ يُوْجَدْ كَمَا فِى السَّفَرِ فَاِنَّهُ اُقِيْمَ مَقَامَ الْمَشَقَّةِ فَيُدَارُ الرُّخْصَةُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ وُجِدَتِ الْمَشَقَّةُ اَمْ لَا ـ

অধ্যায় : জাকাত

অনুবাদ : মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত, এক বছর অতিবাহিত নিসাবের ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব [ফরজ] হয়। জেনে রেখ যে, শুধু বর্ধনশীল নিসাবেই জাকাত ওয়াজিব [ফরজ] হয় এবং মাল বৃদ্ধি করত এক বছর অতিবাহিত করতে হবে। কেননা, বছর চার ঋতুবিশিষ্ট। উক্ত চার ঋতুতে [মালের] মূল্য কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। তাই বছরকে نُمَا [বৃদ্ধি] -এর স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে, বছর অতিবাহিত করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এটি হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। এতে মন্তব্য রয়েছে। কেননা, এ কথার চাহিদা হলো, নেসাবের উপর এক বছর অতিবাহিত হলেই তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। চাই এতে نُمَا [বৃদ্ধি] পাওয়া যাক কিংবা না যাক। যেরূপ সফরে থাকে। কেননা, সফরকে কষ্টের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। তাই তার উপর রুখসত [অবকাশ] -এর হুকুম দেওয়া হয়। চাই এতে কষ্ট (مُشَقَّتْ) পাওয়া যাক কিংবা না পাওয়া যাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামাজ অধ্যায়ের পর জাকাত অধ্যায় আনার কারণ : ইবাদত তিন প্রকার–

১. শারীরিক ইবাদত; যেমন– নামাজ ও রোজা।
২. আর্থিক ইবাদত; যেমন– জাকাত।
৩. শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত; যেমন– হজ। কিয়াস [যুক্তি]-এর দাবি হলো, নামাজ অধ্যায়ের পর জাকাত অধ্যায়ের আলোচনা করা। যেন শারীরিক ইবাদতদ্বয়ের আলোচনা একত্রে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু এরূপ করা হয়নি; বরং নামাজের অধ্যায়ের পর জাকাত অধ্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে। এর কারণ দুটি–

১. এ তারতীবের ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণী ও রাসূল ﷺ -এর হাদীসের উপর আমল করা হয়েছে। যেমন– আল্লাহ কুরআনে নামাজের পর জাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে– وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ অর্থাৎ "তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং জাকাত প্রদান কর। [সূরা বাকারা : ৪৩] রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ ـ

২. সাধারণত এ কথা প্রসিদ্ধ যে, জাকাত এবং রোজা দ্বিতীয় হিজরিতে ফরজ হয়েছে। তবে নেকায়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে– জাকাত রোজার পূর্বে ফরজ হয়েছে। এ জাকাতের আলোচনা রোজার পূর্বে করা হয়েছে।

জাকাতের আভিধানিক অর্থ : জাকাত (زَكٰوة) -এর আভিধানিক অর্থ– পবিত্রতা। যেমন আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ "যে আত্মশুদ্ধি করল সে অবশ্যই সফল হলো।" –[সূরা আ'লা : ১৪] জাকাত শব্দের অর্থ– اَلْبَرَكَةُ ও اَلنَّمَاءُ -ও হতে পারে।

জাকাত (زَكٰوة) -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় জাকাত বলা হয়–

هِيَ تَمْلِيْكُ الْمَالِ مِنْ فَقِيْرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ بِشَرْطِ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى .

অর্থাৎ "সার্বিকভাবে ঐ মাল থেকে উপকার হাসিল না করার শর্তে হাশেমী নয় এমন মুসলিম ফকির ব্যক্তিকে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া।" –[কানযুদ্দাকায়িক্]

কেউ কেউ বলেন– تَمْلِيْكُ الْمَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ عَلٰى فَقِيْرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ অর্থাৎ "হাশেমী বংশের নয় এরূপ কোনো ফকির মুসলিম ব্যক্তিকে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়াকে পরিভাষায় জাকাত বলা হয়।"

জাকাতের নামকরণ : জাকাতকে زَكٰوة বলে নামকরণ করার কারণ অনেক। যেমন–

১. জাকাত দ্বারা পাপ ও কার্পণ্যের আবিলতা থেকে পবিত্র হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন– خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا অর্থাৎ 'আপনি তাদের সম্পদ থেকে জাকাত গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদের পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন। –[সূরা তাওবা : ১০৩]

২. زَكٰوة -এর অর্থ– বর্ধিত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন বলা হয়– زَكَا الزَّرْعُ "শস্য বড় হয়েছে।" এ অর্থের প্রেক্ষিতে জাকাতকে জাকাত বলা হয় যে, জাকাত দ্বারাও মাল বৃদ্ধি পায়।

৩. জাকাত প্রদান করার দ্বারা তার নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই জাকাতকে জাকাত বলা হয়।

জাকাত ফরজ হওয়ার দলিল : زَكَاة -এর فَرْضِيَّة কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

১. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ অর্থাৎ "তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং জাকাত প্রদান কর।" [সূরা বাকারা : ৪৩]

২. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

৩. وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ - اَلْحَقُّ الْمَعْلُوْمُ هُوَ الزَّكٰوةُ

* হাদীস দ্বারাও জাকাতের فَرْضِيَّة প্রমাণিত। যেমন–

১. بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ . الخ (رواهُ الْبُخَارِيْ)

২. اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَحُجُّوْا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَاَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا اَنْفُسُكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ . (بَدَائِعْ : جـ٢ ، صـ ٧٦)

৩. كُلُّ مَالٍ اَدَّيْتَ الزَّكَاةَ عَنْهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَاِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ اَرْضِيْنَ وَكُلُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدِّ الزَّكَاةَ عَنْهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالدَّارَقُطْنِيْ بِاَلْفَاظٍ اُخْرٰى)

* ইজমা -এর আলোকে জাকাতের فَرْضِيَّة প্রমাণিত এভাবে যে, زَكٰوة ফরজ হওয়ার উপর সমগ্র উম্মত একমত। ত অস্বীকারকারী কেউ নেই। –[বাদায়ে' ২ : ৭৭]

* যুক্তির আলোকেও জাকাতের فَرْضِيَّة প্রমাণিত হয়। তা এভাবে যে, জাকাত জাকাতদাতাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে. বদান্যতার গুণে গুণান্বিত করে এবং দরিদ্রতা বিমোচন করে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, জাকাত আদায় করা সমাজের অপরিহার্য বিষয়।

অন্যকথায় বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ধনী লোকদেরকে ধন-সম্পদ দেন এবং তাদের প্রয়োজনের চেয়েও অধিক দেন তারা তা নিজেরা ভোগ করে। তাই তাদের উপর এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আবশ্যক। আর জাকাত প্রদান করাও কৃতজ্ঞত আদায়েরই একটি প্রকার। [বাদায়ে' ২ : ৭৭]

জাকাতের سَبَبٌ : জাকাত ফরজ হওয়ার سَبَبٌ হচ্ছে نِصَابٌ نَامِيٌ তথা বর্ধনশীল নেসাবের মালিক হওয়া।

জাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত : জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো–

اَلْاِسْلَامُ وَالْعِلْمُ بِالسَّبَبِ الْمُوْصِلِ اِلَيْهِ وَالْبُلُوْغُ عِنْدَنَا وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْخُلُوُّ مِنْ دَيْنٍ مُطَالَبٍ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ وَكَوْنُهُ صَاحِبَ النِّصَابِ وَحَوَلَانُ الْحَوْلِ.

জাকাতের হুকুম : যে ব্যক্তি জাকাত আদায় করবে সে দুনিয়াতে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে, আখিরাতে আজাব থেকে মুক্তি পাবে এবং ছওয়াব হাসিল হবে।

জাকাত ফরজ হওয়ার হিকমত :

১. যে মালের উপর মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল, যা কষ্ট ও পরিশ্রম করে এবং ঘাম ঝরিয়ে সে অর্জন করে সে প্রিয় মাল যখন মানুষ আল্লাহর জন্য নিজ হাতে প্রদান করে, তখন কার্পণ্য আর আবিলতা তার হৃদয় থেকে দূর হয়ে যায় এবং ঈমানের মাঝে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়।

২. সমাজের দরিদ্রতা ও অভাব দূরীকরণে জাকাত কল্যাণকর একটি অপরিহার্য বিধান।

৩. জাকাত পাপ মোচন করা এবং বরকত বৃদ্ধি করার বড় ধরনের মাধ্যম।

قَوْلُهُ هِيَ لَا تَجِبُ الخ : এখানে وُجُوْبٌ শব্দ দ্বারা فَرْض উদ্দেশ্য وُجُوْبُ اِصْلَاحِيْ উদ্দেশ্য নয়, যা دَلِيْل ظَنِّيْ দ্বারা প্রমাণিত।

قَوْلُهُ حَوْلِيْ فَاضِل : অর্থাৎ মালের ঐ নেসাব, যার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যে নিসাবের উপর এক বছর অতিবাহিত হয়নি; তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন–

لَيْسَ فِى الْمَالِ زَكٰوةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

অর্থাৎ "ততক্ষণ পর্যন্ত মালের জাকাত ওয়াজিব হয় না, যতক্ষণ তাতে এক বছর অতিবাহিত না হয়।"

–[আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ]

قَوْلُهُ عَنْ حَاجَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ : অর্থাৎ ঐ সমস্ত জরুরি বিষয়াদি যেগুলো না হলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। এর দুটি সুরত হতে পারে–

১. প্রকৃতপক্ষেই ধ্বংস হয়ে যাবে,

২. কিংবা حُكْمِيْ ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস হয়ে যাওয়া। যেমন– খাওয়ার বস্তু, বাসস্থান, গরম ও ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য পোশাক, যুদ্ধের হাতিয়ার ইত্যাদি। উল্লিখিত সবকিছুই মানুষের জরুরি সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত। আর حُكْمِيْ ভাবে ধ্বংস হওয়া; যেমন– ঋণ, নিসাব থেকে মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করার ইচ্ছা– অপমান কিংবা বন্দি হওয়া থেকে বাঁচার জন্য। এগুলো সবই حُكْمِيْ হালাকাত [ধ্বংস হওয়া]। এখন যদি তার কাছে নিসাব থাকে এবং এর থেকে সে উল্লিখিত প্রয়োজন পূর্ণ করতে থাকে, তবে যেন তার কাছে মালই নেই। তাই তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না। এর দৃষ্টান্ত যেমন– কোনো মুসাফিরের কাছে সামান্য পানি আছে, আর তার পিপাসার ভয়ও রয়েছে, তবে সে পানি দ্বারা অজু করবে না; বরং তায়াম্মুম করবে।

قَوْلُهُ اِلَّا فِيْ نِصَابٍ نَامٍ الخ : যে মাল নিসাব পরিমাণ হয়, এর উপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ঐ মাল বর্ধনশীল হওয়া শর্ত। চাই প্রকৃতপক্ষে বর্ধনশীল হোক কিংবা تَقْدِيْرِيْ ভাবে বর্ধনশীল হোক। কেননা, যদি অবর্ধনশীল মালের উপর জাকাত ওয়াজিব হয় তবে সমস্ত মাল শেষ হয়ে যাবে এবং অনেক ক্ষতিসাধন হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ الْمُمَكِّنُ مِنَ الْاِسْتِنْمَاءِ الخ : এটি تَمْكِيْن থেকে اِسْمُ فَاعِلْ-এর শব্দ। অর্থাৎ যার দ্বারা মাল বর্ধনের শক্তি সৃষ্টি হয়। সেটিই হলো বছর। চার মৌসুমসহ এক বছর পূর্ণ হয়। এসব মৌসুমে জিনিসপত্রের দাম উঠানামা করে। তাই বছরকে نُمَا [বর্ধন] -এর স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং এরই উপর হুকুমকে প্রয়োগ করে দিয়েছেন। এখন যদি প্রকৃতপক্ষেই কেউ মালকে না বাড়ায়, তবে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার ভিত্তিতে তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ هٰذَا الخ : এখানে একটি মন্তব্য হয় যে, হিদায়ার ইবারত দ্বারা বুঝা যায়, এক বছর অতিবাহিত হওয়াকে نُمَا [বর্ধন]-এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে এবং এক বছর অতিবাহিত হলে জাকাত ওয়াজিব হয়। অথচ বিষয়টি এমন নয়; বরং এক বছর অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য শর্তও পাওয়া যাওয়া জরুরি। যেমন– মূল্যমান হওয়া কিংবা চতুষ্পদ জন্তু হওয়া কিংবা মালের ক্ষেত্রে ব্যবসার নিয়ত থাকা। কিন্তু যদি কোনো বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি গভীরভাবে চিন্তা করে, তবে এ মন্তব্যের নিরসন হয়ে যায়। কারণ, উল্লিখিত ইবারত দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য শুধু এ বর্ণনা দেওয়া যে, এক বছর মূলত نُمَا -এর স্থলাভিষিক্ত। প্রকৃত نُمَا -এর কথা এখানে লক্ষ্য করা হবে না। বাকি থাকছে ঐ কথা যে, জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য অন্যান্য শর্তের প্রয়োজন আছে কিনা? এটি একটি ভিন্ন মাসআলা। এ কিতাবের ইবারত এবং হিদায়ার ইবারত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অন্যান্য শর্তেরও প্রয়োজন, যা শারেহ (র.) উল্লেখ করেছেন।

لٰكِنْ لَيْسَ كَذٰلِكَ بَلْ لَابُدَّ مَعَ الْحَوْلِ مِنْ شَيْءٍ اٰخَرَ وَهُوَ الثَّمَنِيَّةُ كَمَا فِي الثَّمَنَيْنِ اَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالسَّوْمِ كَمَا فِي الْاَنْعَامِ اَوْ نِيَّةِ التِّجَارَةِ فِيْ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا حَتّٰى لَوْ كَانَ لَهٗ عَبْدٌ لَا لِلْخِدْمَةِ اَوْ دَارٌ لَا لِلسُّكْنٰى وَلَمْ يَنْوِ التِّجَارَةَ لَا تَجِبُ فِيْهِمَا الزَّكٰوةُ وَاِنْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ كَالْاَطْعِمَةِ وَالثِّيَابِ وَاَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَ دَوَابِّ الرُّكُوْبِ وَعَبِيْدِ الْخِدْمَةِ وَ دُوْرِ السُّكْنٰى وَسِلَاحٍ يَسْتَعْمِلُهَا وَاٰلَاتِ الْمُحْتَرِفَةِ وَالْكُتُبِ لِاَهْلِهَا مَمْلُوْكٌ مِلْكًا تَامًّا اَيْ رَقَبَةً وَيَدًا عَلٰى حُرٍّ مُكَلَّفٍ اَيْ عَاقِلٍ بَالِغٍ مُسْلِمٍ ـ

অনুবাদ : অথচ বিষয়টি এমন নয়; বরং এক বছর অতিবাহিত হওয়ার সাথে অন্যান্য জরুরি বিষয়ও রয়েছে। তা হলো, ثَمَنِيَّةٌ [মূল্য জাতীয়] হওয়া। যেরূপ দুই মূল্যমান বস্তু স্বর্ণ ও রুপার মাঝে জাকাত ওয়াজিব হয়। কিংবা গবাদি পশু। যেরূপ চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব হয়। কিংবা আমরা যা উল্লেখ করেছি− এর ভিন্ন কিছুর ক্ষেত্রে বাণিজ্যের নিয়ত করা। এমনকি যদি তার গোলাম থাকে যে খেদমতের জন্য নয়; কিংবা এমন বাড়ি হয়, যা বসবাসের জন্য নয় এবং বাণিজ্যের নিয়তও করেনি, তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। যদিও এগুলোর উপর এক বছর গত হয়ে যায়। মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল হওয়া আবশ্যক। যেমন− খাওয়ার জিনিস, বস্ত্র, ঘরের আসবাব-সামগ্রী, যানবাহন, খেদমতের গোলাম, বসবাসের বাড়ি, ব্যবহারের অস্ত্র, কারিগরি যন্ত্রপাতি এবং নিজে পড়ার কিতাবাদি। [ঐ নিসাব] পরিপূর্ণ মালিকানাধীন হবে। অর্থাৎ رَقَبَةً [মূল মালিক] হতে হবে এবং তার আয়ত্তাধীন হতে হবে। স্বাধীন, আকেল, বালেগ মুসলিম ব্যক্তির উপর [জাকাত ওয়াজিব হয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلثَّمَنِيَّةُ الخ : মাল যদিও নিসাব পরিমাণ হয়, এর উপর এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে তিনটি বিষয় না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত জাকাত ওয়াজিব হবে না। যথা−

১. সৃষ্টিগতভাবেই তা মূল্যমান হতে হবে। অর্থাৎ লেনদেনের ক্ষেত্রে তা মূল্য হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। যেমন− টাকা, স্বর্ণ ও রুপা ইত্যাদি।
২. চতুষ্পদ জন্তু, যা বছরের অধিক সময়ই ঘাস ও উদ্ভিদ খেয়ে জীবন ধারণ করে। যেমন− গাভী, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।
৩. ব্যবসার নিয়ত থাকতে হবে।

فَلَا تَجِبُ عَلٰى مُكَاتَبٍ لِعَدَمِ الْمِلْكِ التَّامِّ فَإِنَّ لَهُ مِلْكُ الْيَدِ لَا مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَمَدْيُوْنٌ مُطَالَبٌ مِنْ عَبْدٍ بِقَدْرِ دَيْنِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ فَاضِلٍ عَنِ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَهِيَ قَضَاءُ الدَّيْنِ وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِكَوْنِهِ مُطَالَبًا مِنْ عَبْدٍ حَتّٰى لَوْ كَانَ مُطَالَبًا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يَمْنَعُ وُجُوْبَ الزَّكٰوةِ كَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا بَعْضُهُ مَشْغُوْلٌ بِدَيْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَالنَّذْرِ أَوِ الْكَفَّارَةِ أَوِ الزَّكٰوةِ تَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ وَلَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوْبِ الزَّكٰوةِ فَرَاغُهُ عَنْ هٰذَا الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ بِقَدْرِ دَيْنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَلَا تَجِبُ أَيْ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَدْيُوْنِ بِقَدْرِ مَا يَكُوْنُ مَالُهُ مَشْغُوْلًا بِالدَّيْنِ وَلَا فِيْ مَالٍ مَفْقُوْدٍ وَسَاقِطٍ فِيْ بَحْرٍ وَمَغْصُوْبٍ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَمَدْفُوْنٍ فِيْ بَرِيَّةٍ نَسِيَ مَكَانَهُ وَدَيْنٍ جَحَدَهُ الْمَدْيُوْنُ سِنِيْنَ ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَهَا عِنْدَ قَوْمٍ وَمَا أُخِذَ مُصَادَرَةً ثُمَّ وَصَلَ إِلَيْهِ بَعْدَ سِنِيْنَ هٰذِهِ الْأَمْثِلَةُ أَمْثِلَةُ الْمَالِ الضِّمَارِ وَعِنْدَنَا لَا تَجِبُ الزَّكٰوةُ فِي الْمَالِ الضِّمَارِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) بِنَاءً عَلٰى إِشْتِرَاطِ الْمِلْكِ التَّامِّ فَهُوَ مَمْلُوْكٌ رَقَبَةً لَا يَدًا وَالْخِلَافُ فِيْمَا إِذَا وَصَلَ الْمَالُ الضِّمَارُ إِلٰى مَالِكِهِ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكٰوةُ السِّنِيْنَ الَّتِيْ كَانَ الْمَالُ فِيْهَا ضِمَارًا أَمْ لَا .

অনুবাদ : অতএব মুকাতাব গোলামের উপর জাকাত ওয়াজিব নয়– পরিপূর্ণ মালিকানা না থাকার কারণে। কেননা, মুকাতাবের ব্যবহারের অধিকার আছে, কিন্তু তার رَقَبَةٌ -এর মালিকানা নেই। [অনুরূপ] مَدْيُوْن -এর উপর [জাকাত ওয়াজিব নয়] বান্দার পক্ষ থেকে যে ঋণের কামনা রয়েছে মাল পরিমাণ ঋণ হওয়ার কারণে। তার মালিকানা প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। তা হলো, ঋণ পরিশোধকরণ। গ্রন্থকার বান্দার পক্ষ থেকে কামনার শর্ত এজন্য করেছেন যে, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কামনা থাকে, তবে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। যেমন– কোনো ব্যক্তি এমন নিসাবের মালিক হলো, যার কিছু আল্লাহর دَيْن -এর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– মানত কিংবা কাফফারা কিংবা জাকাত, তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে। জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য মাল উল্লিখিত ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। গ্রন্থকারের কথা– بِقَدْرِ دَيْنِهِ - فَلَا تَجِبُ -এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ مَدْيُوْن [ঋণগ্রস্ত] -এর উপর তার মাল পরিমাণ, যা ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট, জাকাত ওয়াজিব হবে না। ঐ মালের উপর জাকাত ওয়াজিব নয়, যা হারিয়ে গেছে কিংবা সমুদ্রে পড়ে গেছে কিংবা এমন চুরিকৃত মাল যার উপর কোনো প্রমাণ নেই কিংবা জঙ্গলে দাফনকৃত, কিন্তু দাফনের স্থান ভুলে গেছে, কিংবা এমন পাওনা যে مَدْيُوْن [ঋণগ্রস্ত] কয়েক বছর পর্যন্ত তা অস্বীকার করে আসছে। অতঃপর এক সম্প্রদায়ের নিকট সে তা স্বীকার করেছে কিংবা ঐ মাল যা সরকার তার থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে গেছে, অতঃপর কয়েক বছর পর তার নিকট ফিরে এসেছে। এ সমস্ত উদাহরণ জরিমানায় মালের উদাহরণ। আমাদের নিকট জরিমানার মালের উপর জাকাত ওয়াজিব হয় না। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। এর ভিত্তি হলো, পরিপূর্ণ মালিকানা শর্ত করার উপর। অতএব, জরিমানার মাল رَقَبَةٌ তো মালিকানাধীন; কিন্তু يَدًا মালিকানাধীন নয়। মতানৈক্য ঐ সুরত যখন জরিমানার মাল মালিকের নিকট পৌঁছে যায়। তো এখন কি মালিকের উপর ঐ বছরগুলোর জাকাত ওয়াজিব হবে– যেগুলোতে মাল ضِمَار জরিমানার ছিল, নাকি হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ عَلٰى مُكَاتَبٍ لِعَدَمِ الخ : মুকাতাব বলা হয় ঐ গোলামকে যাকে তার মনিব বলেছে যে, যদি তুমি আমাকে এ পরিমাণ মাল দিতে পার তবে তুমি আজাদ। এ ধরনের গোলামের ব্যবসার অনুমতি থাকে, যেন মাল উপার্জন করতে পারে। এখন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মনিব কর্তৃক নির্ধারিত মাল পরিশোধ করতে না পারবে, ততক্ষণ সে গোলামই থাকবে। আর সে যে পরিমাণ মালের মালিক হবে, তা তো সে নিজেকে মুক্ত করার কাজে ব্যয় করবে। অতএব, তার জন্য مِلْكُ رَقَبَةٍ প্রমাণিত হয় না।

قَوْلُهُ مُطَالِبٌ الخ : অর্থাৎ যদি বিক্রি কিংবা ঋণ কিংবা ভাড়া কিংবা ধ্বংস করার জরিমানা বাবদ সে আবদ্ধ হয় এবং পাওনাদার এর কামনা করে, তবে ঋণের পরিমাণ মালের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না। এখন এর থেকে একটি মাসআলা বের হয় যে, স্ত্রীর মহরের ঋণ জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক কিনা? এক অভিমত হলো, মহর مُؤَجَّلٌ হোক কিংবা مُعَجَّلٌ হোক উভয় সুরতেই জাকাত ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় অভিমত হলো, مَهْر مُؤَجَّلٌ জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক। তৃতীয় অভিমত হলো, যদি স্বামীর মহর আদায়ের ইচ্ছা না থাকে, তবে তা প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা, সে তার অনুযায়ী এটাকে ঋণই মনে করছে না।

قَوْلُهُ كَالنَّذْرِ : এটি নেসাবের কিছু অংশ আল্লাহর دَيْن -এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত। এর সারমর্ম হচ্ছে, যেমন– কারো নিকট দুশত দিরহাম আছে; কিন্তু সে মানত করেছে যে, একশত দান করে দেবে। এখন বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সে একশত দিরহাম দান করেনি, তবে তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ اَوِ الْكَفَّارَةِ : এর দ্বারা কাফফারার সমস্ত প্রকার উদ্দেশ্য। যেমন– শপথের কাফফারা, যিহার (ظِهَارْ) -এর কাফফারা, রমজানের রোজা ভঙ্গের কাফফারা ইত্যাদি। অনুরূপ সদকায়ে ফিতর, কুরবানির প্রাণী। এসব প্রাণী যদি বান্দার জিম্মায় ওয়াজিব হয়, তবে তা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا فِيْ مَالٍ مَفْقُوْدٍ الخ : অর্থাৎ যদি কয়েক বছর মাল নিখোঁজ হয়ে থাকে, অতঃপর আবার পেয়ে যায়, তবে হারানো বছরগুলোর জাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ, হুকমীভাবে উক্ত মাল مَعْدُوْمٌ ছিল। অনুরূপ যদি সমুদ্রে মাল পড়ে যায়, আর কয়েক বছর পর পায়, তবে বিগত বছরের জাকাত ওয়াজিব হবে না। কিংবা যদি কেউ মাল চুরি করে নিয়ে যায়, আর এর উপর কোনো প্রমাণাদি নেই যে, অমুকে আমার এ মালগুলো চুরি করেছে এবং পরে তা প্রমাণাদির ভিত্তিতে পেয়ে যায়। তবে বিগত বছরগুলোর জাকাত ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি মালিকের নিকট মাল চুরির কোনো প্রমাণ থেকে থাকে, তবে চোরের থেকে মাল গ্রহণের পর বিগত বছরের জাকাতও ওয়াজিব হবে। অনুরূপ যে মাল মরুভূমিতে দাফন করে রেখেছে, আর সেই জায়গা ভুলে যায় এবং কয়েক বছর পর সেই মাল পেয়ে যায়, তবে বিগত বছরের জাকাত ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে বাড়িতে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো বাগানে মাল দাফন করে যদি ভুলে যায় তবে পরবর্তীতে কয়েক বছর পর পেয়ে যাওয়ার পর বিগত বছরের জাকাত ওয়াজিব হবে। যদি কেউ অপরকে নিসাব পরিমাণ পয়সা কর্জ দেয় আর ঋণ গ্রহণকারী তা অস্বীকার করে এবং ঋণদাতার কোনো প্রমাণাদিও নেই তবে পরবর্তীতে সেই মাল ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা বিগত বছরের জাকাত ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণদাতার নিকট প্রমাণাদি থাকে, তবে মাল ফেরত পাওয়ার পর বিগত বছরের জাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপ যে মাল সরকার জুলুম করে নিয়ে গেছে এবং তা পাওয়ার কোনো আশা নেই, কিন্তু পরবর্তীতে তা পেয়ে যায়, তবে বিগত বছরের জাকাত ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ اَمْثِلَةُ الْمَالِ الضِّمَارِ الخ : ঐ মাল যা অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং তা পাওয়ার আশা না থাকে তাকে مَالْ ضِمَارْ বলে আর যদি ফিরে পাওয়ার আশা থাকে, তবে সেই সুরতে তাকে مَالْ ضِمَارْ বলা হবে না। ضِمَارْ মূলত اِضْمَارْ থেকে উদ্‌গত, যার অর্থ– গোপন করা। কেউ বলেন, مَالْ ضِمَارْ হলো ঐ মাল যা উপস্থিত আছে, কিন্তু এর দ্বারা উপকার হাসিল করা যায় না। যেমন– হালকা পাতলা দুর্বল ঘোড়া।

قَوْلُهُ بِنَاءً عَلٰى اِشْتِرَاطِ الخ : এটি لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ থেকে عِلَّتْ হয়েছে। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল নয় সারকথা হলো, জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো, নেসাব পর্যন্ত মাল নিজের মালিকানায় থাকা এবং নিজের আয়ত্তাধীন থাকা। আর مَالْ ضِمَارْ -এর উপর নিজের কর্তৃত্ব থাকে না।

قَوْلُهُ اِذَا وَصَلَ الْمَالُ الضِّمَارُ الخ : যদি সে মাল না পায় তবে তার উপর জাকাত ওয়াজিব না হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মতানৈক্য নেই। অনুরূপ যেদিন মাল পায় সেদিন থেকে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার মাঝেও কোনো মতানৈক্য নেই মতানৈক্য ঐ দিবসগুলোর ক্ষেত্রে যে দিবসগুলোতে মাল না পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং مَالْ ضِمَارْ ছিল।

بِخِلَافِ دَيْنٍ عَلٰى مُقِرٍّ مَلِيْءٍ اَوْ مُعْسِرٍ اَوْ مُفْلِسٍ اَوْ جَاحِدٍ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ اَوْ عَلِمَ بِهِ قَاضٍ فَاِنَّهُ اِذَا وَصَلَ هٰذِهِ الْاَمْوَالُ اِلٰى مَالِكِهَا تَجِبُ زَكٰوةُ الْاَيَّامِ الْمَاضِيَةِ وَلَا يَبْقٰى لِلتِّجَارَةِ مَا اشْتَرَاهُ لَهَا فَنَوٰى خِدْمَتَهُ ثُمَّ لَا يَصِيْرُ لِلتِّجَارَةِ وَاِنْ نَوَاهُ لَهَا مَا لَمْ يَبِعْهُ وَمَا اشْتَرَاهُ لَهَا كَانَ لَهَا لَا مَا وَرِثَهُ وَنَوٰى لَهَا وَمَا مَلَكَهُ بِهِبَةٍ اَوْ وَصِيَّةٍ اَوْ نِكَاحٍ اَوْ خُلْعٍ اَوْ صُلْحٍ عَنْ قَوْدٍ وَنَوَاهُ لَهَا كَانَ لَهَا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) لَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَقِيْلَ اَلْخِلَافُ عَلٰى عَكْسِهِ فَالْحَاصِلُ اَنَّ مَا عَدَا الْحَجَرَيْنِ وَالسَّوَائِمِ اِنَّمَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ ثُمَّ هٰذِهِ النِّيَّةُ اِنَّمَا تُعْتَبَرُ اِذَا وُجِدَتْ زَمَانَ حُدُوْثِ سَبَبِ الْمِلْكِ حَتّٰى لَوْ نَوَى التِّجَارَةَ بَعْدَ حُدُوْثِ سَبَبِ الْمِلْكِ لَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ بِنِيَّتِهِ وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهِ ثُمَّ لَا يَصِيْرُ لِلتِّجَارَةِ وَاِنْ نَوَاهُ لَهَا ثُمَّ لَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ سَبَبُ الْمِلْكِ سَبَبًا اِخْتِيَارِيًّا حَتّٰى لَوْ نَوَى التِّجَارَةَ زَمَانَ تَمَلُّكِهِ بِالْاِرْثِ لَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ ثُمَّ ذٰلِكَ السَّبَبُ الْاِخْتِيَارِىُّ هَلْ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ شِرَاءً اَمْ لَا فَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) لَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) تَجِبُ وَقِيْلَ الْخِلَافُ عَلَى الْعَكْسِ فَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) لَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ شِرَاءً وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) لَا ـ

অনুবাদ : ঐ ঋণ (دَيْن) -এর পরিপন্থি যা সে স্বীকার করে এবং সে ধনী কিংবা গরিব কিংবা দেউলিয়া। কিংবা ঋণ অস্বীকারকারীর উপর দলিল আছে কিংবা বিচারকের এ ঋণ সম্পর্কে জ্ঞান আছে। কেননা, এ মাল যখন মালিকের নিকট পৌঁছবে, তখন মালিকের উপর বিগত দিনের জাকাত ওয়াজিব হবে। যে বস্তু ব্যবসার জন্য ক্রয় করেছে তা দ্বারা যদি খেদমত গ্রহণের নিয়ত করে ফেলে, তবে তা আর ব্যবসার জন্য থাকবে না। অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত তা বিক্রি না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ব্যবসার জন্য হবে না, যদিও ব্যবসার নিয়ত করে। আর যা ব্যবসার জন্য ক্রয় করেছে, তা ব্যবসার জন্যই থাকবে। ঐ মাল যা উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া গেছে, পরবর্তীতে ব্যবসা করার নিয়ত করেছে কিংবা হিবা (هِبَة) -এর মাধ্যমে মালিক হয়েছে কিংবা অসিয়তের মাধ্যমে পেয়েছে, কিংবা বিবাহ কিংবা খুলা (خُلْع) কিংবা কিসাসের সন্ধির ভিত্তিতে কিংবা ভিন্ন ব্যবসার নিয়ত করেছে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তা ব্যবসার জন্য হবে; ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, ব্যবসার জন্য হবে না। বলা হয় যে, মতানৈক্য এর বিপরীত। অতএব, সারাংশ হলো– স্বর্ণ, রুপা ও চতুষ্পদ জন্তু ব্যতীত অন্যান্য মালামালের উপর ব্যবসার নিয়তের মাধ্যমে জাকাত ওয়াজিব হয়। অতঃপর এ নিয়ত শুধু ঐ সময় গৃহীত, যখন মালিক হওয়ার

কারণ (سَبَبْ) সৃষ্টিকালে তা পাওয়া যাবে। এমনকি যদি মালিক হওয়ার কারণ সৃষ্টি হওয়ার পর ব্যবসার নিয়ত করে, তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। ثُمَّ لَا يَصِيْرُ لِلتِّجَارَةِ وَاِنْ نَوَاهُ لَهَا -এর অর্থ এটিই। অতঃপর আবশ্যক হলো, মালিক হওয়ার سَبَبْ - سَبَبْ اِخْتِيَارِىْ হওয়া। এমনকি যদি উত্তরাধিকারী সূত্রে মালিক হওয়ার কালে ব্যবসার নিয়ত করে, তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। অতঃপর ঐ سَبَبْ اِخْتِيَارِىْ ক্রয়ের দিক থেকে (شِرَاءْ) হবে কিনা? ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর নিকট سَبَبْ اِخْتِيَارِىْ শুধু ক্রয়ের দিক থেকে (شِرَاءْ) হওয়া আবশ্যক নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট ওয়াজিব। বলা হয় যে, এর বিপরীতের ক্ষেত্রে মতানৈক্য। অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট জরুরি হলো, سَبَبْ اِخْتِيَارِىْ ক্রয়ের দিক থেকে হওয়া। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট শুধু ঐ নিয়তের মাধ্যমেই জাকাত আদায় হবে, যা আদা (اَدَاءْ) -এর সাথে সম্পৃক্ত। কিংবা ওয়াজিব পরিমাণ নিয়ত পৃথককরণের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِخِلَافِ دَيْنٍ مُقِرٍّ مَلِيٍّ الخ : এখান থেকে ঐ মালের বর্ণনা দিচ্ছেন, যা مَالْ ضِمَارْ -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। গ্রন্থকার বলছেন যে, যদি ধনী ব্যক্তির নিকট পাওনা থাকে, আর সে তা স্বীকারও করছে, তবে পাওনাদারের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপ যদি কোনো নিঃস্ব ব্যক্তির নিকট পাওনা থাকে, আর সে তা স্বীকারও করে, তাহলে ঐ পাওনাদারের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। নিঃস্ব ও দেওলিয়া ব্যক্তি যদিও মালের দিক থেকে বরাবর, কিন্তু দেওলিয়া ঐ ব্যক্তি, যাকে সরকার দেওলিয়া ঘোষণা করে দিয়েছে। সে দেওলিয়া হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে আর তার থেকে কোনো কিছু আদায় করা হবে না। অনুরূপ যদি কেউ ঋণকে অস্বীকার করে বসে, কিন্তু ঋণদাতার নিকট যদি দলিল-প্রমাণ থাকে কিংবা এ সম্পর্কে কাজি [বিচারক] জানে যে, তার উপর ঋণ আছে, তবে উক্ত সুরতে বিগত বছরগুলোর জাকাত ওয়াজিব হবে। চাই ঋণগ্রহিতা নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দিক কিংবা প্রশাসনের আশ্রয়ে মাল পাক, সর্বাবস্থায় যখনই মাল উসুল হয়েছে, তখনই বিগত সমস্ত বছরের জাকাত ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَبْقَى لِلتِّجَارَةِ الخ : এখান থেকে ব্যবসার মালে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার সুরত বর্ণনা করা শুরু করেছেন। অর্থাৎ যদি কেউ কোনো গোলাম কিংবা দাসী ক্রয় করে ব্যবসার নিয়তে, অতঃপর একে ব্যবসার নিয়ত থেকে পরিবর্তন করে খেদমতের নিয়ত করে, তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -এর আলোকে মানুষের জন্য ঐ জিনিসই হয় যা সে নিয়ত করে। এখন যখন সে গোলাম ও দাস-দাসী ইত্যাদিকে ব্যবসা থেকে বের করে ভিন্ন নিয়ত করেছে, তখন তা কখনো আর ব্যবসার জন্য হবে না। যদিও দ্বিতীয়বার আবার ব্যবসার নিয়ত করে। হ্যাঁ, যদি তা বিক্রি করে ফেলে কিংবা ভাড়া দেয়, তবে অবশ্যই ব্যবসার জন্য হবে।

قَوْلُهُ وَمَا اشْتَرَاهُ لَهَا كَانَ لَهَا الخ : অর্থাৎ, যাকে ব্যবসার জন্য ক্রয় করেছে তা ব্যবসার জন্যই থাকবে এবং এর উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। তবে غَيْرِ اِخْتِيَارِىْ কারণে (سَبَبْ) যে মালের মালিক হয়েছে। যেমন- উত্তরাধিকারী সূত্রে কোনো মালের মালিক হলো, তবে তা ব্যবসার মাল হবে না। যদিও সে মালিক হওয়ার সময় ব্যবসার নিয়ত করে, তবুও ব্যবসার মাল হবে না। কিংবা হিবা (هِبَةْ) -এর মাঝে কোনো মাল পাওয়া যায় এবং তা হস্তগত করে নেয়, কিংবা অসিয়তের মাঝে কোনো মাল পাওয়া যায়, কিংবা বিবাহের মাঝে স্ত্রীর স্বামীর পক্ষ থেকে মাল পাওয়া যায় কিংবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে খুলা [خُلْع] -এর ভিত্তিতে মাল পায় কিংবা قَتْلِ عَمَدْ -এর কিসাসের বিনিময়ে কিছু মালের উপর সন্ধি হয় এবং সন্ধিতে নির্ধারিত মাল পেয়ে যায়। উল্লিখিত সমস্ত প্রক্রিয়ায় মাল পাওয়া ব্যক্তির জন্য মালগুলো ব্যবসার জন্য হবে না। যদিও মাল হস্তগত করার

সময় ব্যবসার নিয়তও করে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট মাল হস্তগত করার সময় যদি ব্যবসার নিয়ত করে তবে তা ব্যবসার মাল হিসেবে বিবেচিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট হবে না। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট হবে না; ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট হবে।

قَوْلُهُ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ : জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, ব্যবসার নিয়ত করা। এতে مُتَقَدِّمِيْن ও مُتَأَخِّرِيْن সকলে একমত। মতানৈক্যের অভিমত এতে প্রত্যাখ্যাত। দলিল হলো, হযরত সামুরাহ (রা.)-এর হাদীস- كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا نُعِدُّ لِلْبَيْعِ "রাসূল ﷺ আমাদেরকে ঐ মাল থেকে জাকাত বের করার হুকুম দিতেন, যা আমরা বিক্রি করার জন্য রাখতাম।" -[আবূ দাঊদ শরীফ]

قَوْلُهُ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ إِذَا وُجِدَتْ : কেননা, যখন নিয়ত আমলের সাথে সম্পৃক্ত হবে, তখন তা গ্রহণযোগ্য হওয়া আবশ্যক। কারণ, নিয়ত পার্থক্যকরণের জন্য আসে।

قَوْلُهُ بَعْدَ حُدُوْثِ سَبَبٍ الخ : এর সুরত যেমন- খেদমতের জন্য গোলাম ক্রয় করেছে, অতঃপর এতে ব্যবসার নিয়ত করেছে; কিংবা এর বিপরীত সুরত যে, ব্যবসার জন্য গোলাম ক্রয় করেছে, অতঃপর তার মাধ্যমে খেদমত গ্রহণের নিয়ত করে ব্যবসার নিয়ত বাতিল করে দিয়েছে, অতঃপর আবার ব্যবসার নিয়ত করেছে, তবে জাকাত ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ سَبَبُ الْمِلْكِ سَبَبًا إِخْتِيَارِيًّا الخ : মালিকানার سَبَبْ দু প্রকার-

১. যা إِيْجَابْ ও قَبُوْل -এর উপর নির্ভরশীর এবং ক্রেতা-বিক্রেতার বাতিলকরণের মাধ্যমে বাতিল হয়ে যাবে। যেমন- ক্রয়, হিবা, অসিয়ত, সদকা, খুলা' ও সন্ধি ইত্যাদি মালিক হওয়ার سَبَبْ -এর কোনো একটি হওয়া।

২. এতে ক্রেতা-বিক্রেতার কোনো ইচ্ছা নেই। যেমন- উত্তরাধিকারী সূত্র। কারণ, তা ঐ সূত্রে নিজের কোনোরূপ সাধনা ছাড়া দখলে চলে আসে। এমনকি পেটের ভিতরে বাচ্চাও ওয়ারিশ হয়ে যায়। কিন্তু এর জন্য চেষ্টা-তদবীর লাগে না এবং তা বাতিল করার দ্বারা বাতিল হয় না। উল্লেখ্য যে, ব্যবসার নিয়ত তখন কার্যকর হবে, যখন নিজের প্রচেষ্টায় এর মালিক হবে।

قَوْلُهُ فَعِنْدَ أَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا : অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট আবশ্যক নয় যে, মালিকানার (سَبَبْ) কারণ ক্রয়ই হতে হবে; বরং প্রত্যেক ঐ আমল [কাজ] যা মালিক হওয়ার সবব হয়, যদি এর সাথে নিয়ত যুক্ত হয় তবে যথেষ্ট। কেননা, ব্যবসা মূলত মাল অর্জন করার عَقْد [চুক্তি]। সুতরাং যে মালই তার কথার দরুন তার মালিকানায় দাখিল হয় তা তার উপার্জন। এখন এর সাথে নিয়ত সম্পৃক্ত হবে।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) تَجِبُ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট سَبَب إِخْتِيَارِىْ শুধু شِرَاء [ক্রয়] হওয়া আবশ্যক। কেননা, ক্রয় (شِرَاء) ব্যতীত সমস্ত লেনদেন যেমন- হিবা, অসিয়ত এবং সন্ধি ইত্যাদি ব্যবসায়ী বিষয় নয়। তাই এগুলোর সাথে নিয়ত সম্পৃক্ত হওয়া ধর্তব্য নয়।

وَلَا اَدَاءَ اِلَّا بِنِيَّةٍ قَرَنَتْ بِهِ اَوْ بِعَزْلِ قَدْرِ مَا وَجَبَ وَتَصَدُّقُهُ بِكُلِّ مَالِهِ بِلَا نِيَّةٍ مُسْقِطٌ وَبِبَعْضِهِ لَا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَىْ اِذَا تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَالِهِ بِلَا نِيَّةِ الزَّكٰوةِ تَسْقُطُ الزَّكٰوةُ وَاِنْ تَصَدَّقَ بِبَعْضِ مَالِهِ تَسْقُطُ زَكٰوةُ الْمُؤَدّٰى عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) حَتّٰى لَوْ كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَسْقُطُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) زَكٰوةُ الْمِائَةِ الْمُؤَدَّاةِ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا تَسْقُطُ عَنْهُ زَكٰوةُ شَيْءٍ اَصْلًا ـ

অনুবাদ : নিয়ত ব্যতীত সমস্ত মাল দান করে দেওয়া– জাকাতকে রহিত করে দেয়। আর কিছু মাল সদকা করা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট জাকাত রহিত করে না। অর্থাৎ যদি জাকাতের নিয়ত ব্যতীত সমস্ত মাল দান করে দেয়, তবে জাকাত রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কিছু মাল দান করে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট ঐ অংশের জাকাত রহিত হয়ে যাবে, যা দান করে দিয়েছে। এতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। এমনকি যদি তার নিকট দুইশত দিরহাম থাকে, তন্মধ্যে এক দিরহাম দান করে দেয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট একশত দিরহামের জাকাত রহিত হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট মোটেই জাকাত রহিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا اَدَاءَ اِلَّا بِنِيَّةٍ الخ : অর্থাৎ জাকাত আদায়ের সময় কিংবা অন্যান্য মালের থেকে এ জাকাতের মালকে পৃথক করার সময় নিয়ত না পাওয়া গেলে জাকাত আদায় হবে না। এর কারণ হলো, জাকাত عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এর জন্য নিয়ত শর্ত হবে। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, জাকাত আদায়ের সময় নিয়ত সম্পৃক্ত থাকা। তবে যখন বিভিন্ন লোকদের কিছু কিছু জাকাত দেবে, তবে প্রত্যেকবার নিয়ত করা অসম্ভব। তাই জাকাতের মাল অন্যান্য মাল থেকে পৃথক করার সময় নিয়ত করাই যথেষ্ট। আর এ নিয়ত যদি হুকমী (حُكْمِىْ) ভাবেও পাওয়া যায় তবে যথেষ্ট। অর্থাৎ যেমন– সে জাকাত দেওয়ার সময় নিয়ত করেনি; কিন্তু জাকাত আদায়ের পর ফকিরের হাতে জাকাবস্থায় নিয়ত করেছে, তবে তা জায়েজ হবে। কিংবা উকিলকে দেওয়ার সময় নিয়ত করেছে, আর উকিল নিয়ত ব্যতীত ফকিরকে দিয়ে দেয় তবুও সহীহ হবে।

قَوْلُهُ مُسْقِطٌ الخ : অর্থাৎ যদি নিয়ত ব্যতীত সমস্ত মাল দান করে দেয়, তবে তার জাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু কিয়াস হলো, জাকাত আদায় হবে না। ইমাম যুফার (র.) ও আইম্মায়ে ছালাছাহ -এর অভিমতও এমনই। কেননা, ফরজ ও নফল উভয়টিই শরিয়ত অনুমোদিত। তাই নির্দিষ্ট করার জন্য নিয়ত জরুরি। আর আমাদের অভিমত হলো اِسْتِحْسَانٌ -এর ভিত্তিতে। তা হলো, সমস্ত মালের একটি অংশ আবশ্যক। এখন তা নির্ধারণ করা ছাড়াই নির্ধারিত হয়ে গেছে। কেননা, যদি সমস্ত অংশ ভিড় করে তখন নির্ধারণ করা শর্ত করা হয়। যখন সে সমস্ত মাল দান করে দিল, তখন ভিড় চলে গেছে। তাই ফরজও তার থেকে রহিত হয়ে গেছে। আমাদের নিকট তা রমজানের রোজার ন্যায় যে, মুতলাক নিয়ত দ্বারাও আদায় হয়ে যায়।

قَوْلُهُ بِلَا نِيَّةِ الزَّكَاةِ تَسْقُطُ : এ قَيْد -এর মাঝে তাসামূহ [স্খলন] রয়েছে। কেননা, যদি সে মানত কিংবা কাফফারার ক্ষেত্রে মাল দান করার নিয়ত করে, তবে সে যে নিয়ত করবে তা-ই আদায় হবে। জাকাত তার জিম্মায় থেকেই যাবে। অথচ তার উপর তা প্রয়োগ হয় যে, সে জাকাতের নিয়ত ব্যতীত দান করেছে। গ্রন্থকার بِلَا نِيَّةٍ -কে মুতলাক রেখে বলেছেন কিন্তু শারেহ (র.) তা লক্ষ্য করেননি, ফলে তিনি তা مُقَيَّدٌ করে দিয়েছেন।

بَابُ زَكَاةِ الْاَمْوَالِ

نِصَابُ الْاِبِلِ خَمْسٌ وَالْبَقَرِ ثَلٰثُوْنَ وَالْغَنَمِ اَرْبَعُوْنَ سَائِمَةً فَفِىْ كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ بُخْتٍ اَوْ عِرَابٍ شَاةٌ ثُمَّ فِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ ثُمَّ فِىْ سِتٍّ وَّثَلٰثِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ ثُمَّ فِىْ سِتٍّ وَّاَرْبَعِيْنَ حِقَّةٌ ثُمَّ فِىْ اِحْدٰى وَسِتِّيْنَ جَذْعَةٌ ثُمَّ فِىْ سِتٍّ وَّسَبْعِيْنَ بِنْتَا لَبُوْنٍ ثُمَّ فِىْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ حِقَّتَانِ اِلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ فِىْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ثُمَّ فِىْ مِائَةٍ وَّخَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَحِقَّتَانِ ثُمَّ فِىْ مِائَةٍ وَّخَمْسِيْنَ ثَلٰثُ حِقَاقٍ ثُمَّ تُسْتَانَفُ فَفِىْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ثُمَّ فِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ ثُمَّ فِىْ سِتٍّ وَّثَلٰثِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ ثُمَّ فِىْ مِائَةٍ وَّسِتٍّ وَّتِسْعِيْنَ اَرْبَعُ حِقَاقٍ اِلٰى مِئَتَيْنِ ثُمَّ تُسْتَانَفُ اَبَدًا كَمَا فِى الْخَمْسِيْنَ الَّتِىْ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِيْنَ اِعْلَمْ اَنَّهٗ قَدْ ذَكَرَ اِسْتِيْنَافَيْنِ اَحَدُهُمَا بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِيْنَ وَالْاٰخَرُ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِيْنَ فَبَعْدَ الْمِئَتَيْنِ يُسْتَانَفُ اِسْتِيْنَافًا مِثْلَ مَا ذُكِرَ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِيْنَ حَتّٰى تَجِبَ فِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ ـ

পরিচ্ছেদ : মালের জাকাত

অনুবাদ : উটের নেসাব পাঁচ [উট], গরুর নেসাব ত্রিশ, বকরির নেসাব চল্লিশ, যদি এগুলো গবাদি পশু হয়। অতএব পাঁচ উটের মাঝে একটি বকরি ওয়াজিব, চাই সে উট বুখতী হোক কিংবা আরবি হোক। অতঃপর পঁচিশ উটের মাঝে একটি বিনতে মাখায (بِنْت مَخَاض) ওয়াজিব। অতঃপর ছত্রিশ উটের মাঝে একটি বিনতে লাবূন (بِنْت لَبُوْن) ওয়াজিব। অতঃপর ছেচল্লিশটি উটের মধ্যে একটি হিককা (حِقَّة) ওয়াজিব। অতঃপর একষট্টিটি উটের মাঝে একটি জাযআহ (جِذْعَة) ওয়াজিব। অতঃপর ছিয়াত্তরটি উটের মাঝে দুটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব। অতঃপর একানব্বই থেকে একশত বিশ পর্যন্ত উটের মাঝে দুই হিককা ওয়াজিব। এরপর প্রত্যেক পাঁচ উটের মাঝে একটি বকরির হিসাব হবে। অতঃপর একশত পঁয়তাল্লিশ উটের মাঝে একটি বিনতে মাখায ও দুটি হিককা ওয়াজিব। অতঃপর একশত পঞ্চাশ উটের মাঝে তিন হিক্কা ওয়াজিব। অতঃপর নতুন করে হিসাব শুরু হবে। প্রত্যেক পাঁচ উটের মাঝে একটি বকরি ওয়াজিব হবে। অতঃপর পঁচিশ উটের মাঝে একটি বিনতে মাখাজ। অতঃপর ছত্রিশ উটের মাঝে একটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব। অতঃপর একশত ছিয়ানব্বই থেকে দুইশত পর্যন্ত উটের মাঝে চারটি হিককা ওয়াজিব। অতঃপর অনুরূপ সর্বদা নতুন করে হিসাব করবে, যেরূপ ১৫০ -এর পরে পঞ্চাশের মাঝে হয়েছে। জেনে রাখুন যে, গ্রন্থকার দুই اِسْتِيْنَافْ -কে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি ১২০ -এর পরে হবে এবং একটি ১৫০ -এর পরে হবে। সুতরাং ২০০ -এর পরে যে اِسْتِيْنَافْ হচ্ছে, তা ঐ اِسْتِيْنَافْ-এর ন্যায়, যা ১৫০ -এর পরে হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ৫০-এর মাঝে একটি হিককা (حِقَّة) আবশ্যক হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : গ্রন্থকার মালের জাকাতের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ গবাদি পশুর দ্বারা আরম্ভ করেছেন এবং গবাদি পশুর মধ্যেও উটের দ্বারা শুরু করেছেন। কেননা, রাসূল ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে জাকাত সম্পর্কে যে পত্র দিয়েছিলেন, তাতে উটের জাকাতের বর্ণনা সর্বাগ্রে ছিল। গ্রন্থকার মূলত রাসূল ﷺ-এর উক্ত পত্রেরই অনুসরণ করেছেন। অন্য কথায় বলা হয়, আরবদের নিকট সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ হলো উট। এজন্যই উটের জাকাতের আলোচনা প্রথমে আনা হয়েছে।

سَائِمَة-এর পরিচয় : سَائِمَة শব্দটি سَامَتِ الْمَاشِيَةُ থেকে গৃহীত। এর অর্থ– 'চতুষ্পদ জন্তু চরেছে।' سَائِمَة-এর বহুবচন سَائِمَة - سَوَائِمُ বলা হয়, এমন জন্তুকে যা অনুমোদিত মাঠে বিচরণ করে আহার গ্রহণ করে। এরূপ জন্তুর নর মাদি এবং একত্রিতভাবে যা মিলেমিশে থাকে সবগুলোর উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। তবে শর্ত হলো, এর দ্বারা দুধ পাওয়া এবং বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য থাকতে হবে। পক্ষান্তরে এর দ্বারা যদি আরোহণ এবং গোশত অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়, তবে জাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি এর দ্বারা ব্যবসা উদ্দেশ্য হয়, তবে এর উপর পালিত পশু হিসেবে জাকাত ওয়াজিব হবে না; বরং ব্যবসার মাল হিসেবে জাকাত ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ নেসাব এবং হিসাব অনুযায়ী জাকাত ওয়াজিব হবে।

বিনতে মাখায (بِنْت مَخَاضْ) : বিনতে মাখাজ বলা হয় উটের ঐ বাচ্চাকে, যা এক বছর পূর্ণ করে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। একে এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো, মাখায (مَخَاضْ) অর্থ– গর্ভবতী। আর সাধারণত উষ্ট্রী একটি বাচ্চা প্রসব করার পর দ্বিতীয় বছরে গর্ভবতী হয়ে যায়। এ কারণে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাচ্চাকে বিনতে মাখায (بِنْت مَخَاضْ) বলে। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা مَخَاضْ শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ.

অর্থাৎ "প্রসব বেদনা তাকে [মারয়ামকে] এক খর্জুর বৃক্ষের তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল" –[মারয়াম : ২৩]

বিনতে লাবূন (بِنْت لَبُوْن) : উটের ঐ মাদি বাচ্চা, যা দ্বিতীয় বছর পেরিয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। একে এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো, এ বাচ্চার মা দুগ্ধবতী এবং এর থেকে এর ছোট বাচ্চা দুধ পান করে। এ বাচ্চা প্রথম দিকে দুধ পান করে বড় হয়েছে। আর لَبُوْن শব্দটি لَبَنٌ থেকে উদ্গত। এর অর্থ– দুধ। এজন্যই একে বিনতে লাবূন বলা হয়।

হিককা (حِقَّة) : উটের ঐ মাদি বাচ্চাকে বলে, যার বয়স তৃতীয় বছর অতিক্রম করে চতুর্থ বছরে পড়েছে। একে হিককা এজন্য বলা হয় যে, এটি আরোহণ ও বোঝা বহনের উপযুক্ত হয়েছে।

জাযআহ (جَذْعَة) : উটের ঐ মাদি বাচ্চা, যা চতুর্থ বছর অতিক্রম করে পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে। একে এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো, এর অর্থ– মূল থেকে উচ্ছেদ করা। এ বয়সে উটের বাচ্চার দুধদাঁত মূল থেকে পড়ে যায় এবং অন্য দাঁত বের হয়। এজন্য একে جَذْعَة বলে। উল্লেখ্য, جَذْعَة সবচেয়ে বড় বাচ্চা যেটাকে জাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। উটের বাচ্চা جَذْعَة থেকে বড় ছানী (ثَنِيْ) , আর এর থেকে বড় সাদীস (سَدِيْس) এবং এর থেকে বড় বাযিল (بَازِلْ)। শেষোক্ত এ তিনটির কোনোটিই জাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।

নেসাবের পরিমাণ : উটের নেসাব হলো, পাঁচ। অর্থাৎ পাঁচ-এর কম উটের মধ্যে জাকাত ওয়াজিব হবে না। গরুর নেসাব হলো– ত্রিশ, মহিষের নেসাবও ত্রিশ। এর চেয়ে একটিও যদি কম হয়, তবে জাকাত ওয়াজিব হবে না। বকরির নেসাব চল্লিশ, ভেড়া ও দুম্বার নেসাবও চল্লিশ। উল্লিখিত প্রাণীগুলো যখন নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে– জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো, এগুলো سَائِمَة হতে হবে। অর্থাৎ বছরের অধিকাংশ সময়ই মুফত চারণভূমিতে চরাতে হবে। যদি এমনটি না হয়; বরং ঘাস ইত্যাদি কিনে খাওয়াতে হয়, তবে এর উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ بُخْتٍ اَوْ عِرَابٍ : بُخْت শব্দটির بَاء অক্ষরে পেশ হবে। এটি بُخْتِىْ -এর বহুবচন। بُخْت বলা হয় ঐ উটকে যার কুহানী দুটি থাকে। মূলত তা بُخْت نَصَّر -এর দিকে সম্পর্ক করে বলা হয়। কেননা, তিনিই সর্বপ্রথম আরবি ও অনারবি উটকে জমায়েত করেছেন। عِرَابٌ শব্দের عَيْن অক্ষরে যের হবে। এটি عَرَبِىْ -এর বহুবচন এবং একে بُخْتِىْ -এর বিপরীতে ব্যবহার করা হয়। بُخْتِىْ এবং عَرَبِىْ উভয়টিই উটের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ফলত এ উভয়টিকে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সমস্ত উট। এ হুকুম কোনো বিশেষ প্রকারের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং ব্যাপক। কেননা, এখানে اِبِلْ শব্দ বলা হয়েছে যা সবধরনে উটের বেলায় বলা হয়। এতে আরবি ও অনারবি সব ধরনের উট অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ : অর্থাৎ দেড়শ'র পর নতুন করে আবার হিসাব করা হবে। যেরূপ শুরুতে করা হয়েছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক পাঁচ উটের মধ্যে একটি বকরি। এমনকি যদি দেড়শোর পর যদি পঁচিশ উট অতিরিক্ত হয়, তবে একটি বিনতে মাখায এবং তিনটি হিককা ওয়াজিব হবে। অতঃপর যদি ছত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছে, তবে একটি বিনতে লাবূন ও তিন হিককা ওয়াজিব হবে। এ পর্যন্ত যে, ১৯৬ থেকে দুশো পর্যন্ত চার হিককা ওয়াজিব হবে। এরপর নতুন করে হিসাব করা হবে, যেরূপ দেড়শ'র পর দুশোর মাঝে করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ كَمَا فِى الْخَمْسِيْنَ الخ : এ বর্ণনার সারসংক্ষেপ হলো, পাঁচ উটের মধ্যে এক বকরি, দশ উটের মধ্যে দুই বকরি, পনেরো উটের মধ্যে তিন বকরি এবং বিশ উটের মধ্যে চার বকরি, পনেরো উটের মধ্যে তিন বকরি এবং বিশ উটের মধ্যে চার বকরি। এরপর যখন একটি বাচ্চা অতিরিক্ত হবে, তখন আর বকরি নয়; বরং উট ওয়াজিব হবে, যাকে বিনতে মাখায বলে। ছত্রিশ উটের মধ্যে একটি বিনতে লাবূন, ৪৬ -এর মধ্যে একটি হিককা, ৬১ -এর মাঝে একটি جَذْعَة, ৭৬ -এর মধ্যে দুটি বিনতে লাবূন এবং ৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত দুই হিককা ওয়াজিব। এ পর্যন্ত নেসাব ও জাকাতের কোনো মতানৈক্য নেই। বুখারী, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসাঈ শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের রেওয়ায়েত মোতাবেক রাসূল ﷺ থেকেই তা প্রমাণিত। ১২০-এর পরের সংখ্যার মধ্যে অবশ্যই মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ১২০ -এর পর জাকাতের হিসাব আবার নতুন করে হবে না; বরং ১২০ -এর পর প্রত্যেক চল্লিশ উটের মধ্যে একটি বিনতে লাবূন, সাথে ১২০ -এর দুই হিককাও আছে। প্রত্যেক ৫০ -এর মধ্যে এক হিককা, সাথে ১২০ -এর দুই হিককা আছে। বুখারী শরীফে এটিই স্পষ্টভাবে আছে। আমাদের ইমামগণ হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর অভিমতকে গ্রহণ করে বলেন, ১২০ -এর পর নতুন করে হিসাব হবে। প্রত্যেক পাঁচ উটের মাঝে একটি বকরি ওয়াজিব হবে। ২৫ পর্যন্ত পৌঁছলে একটি বিনতে মাখায ওয়াজিব হবে। ইমাম ত্বাহাবী (র.) স্বীয় কিতাব তাহাবী শরীফে উক্ত রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন।

وَفِىْ ثَلٰثِيْنَ بَقَرًا اَوْ جَامُوْسًا تَبِيْعٌ اَوْ تَبِيْعَةٌ ثُمَّ فِىْ اَرْبَعِيْنَ مُسِنٌّ اَوْ مُسِنَّةٌ اَلتَّبِيْعُ الَّذِىْ تَمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَالتَّبِيْعَةُ اُنْثَاهُ وَالْمُسِنُّ الَّذِىْ تَمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ وَالْمُسِنَّةُ اُنْثَاهُ وَفِيْمَا زَادَ يُحْسَبُ اِلٰى سِتِّيْنَ وَفِيْهَا ضِعْفُ مَا فِىْ ثَلٰثِيْنَ ثُمَّ فِىْ كُلِّ ثَلٰثِيْنَ تَبِيْعٌ وَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ اَىْ فِىْ سِتِّيْنَ تَبِيْعَانِ اِلٰى تِسْعٍ وَّسِتِّيْنَ ثُمَّ فِىْ سَبْعِيْنَ تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ ثُمَّ فِىْ ثَمَانِيْنَ مُسِنَّتَانِ ثُمَّ فِىْ تِسْعِيْنَ ثَلٰثَةُ اَتْبِعَةٍ ثُمَّ فِىْ مِائَةٍ تَبِيْعَانِ وَمُسِنَّةٌ ثُمَّ فِىْ مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ تَبِيْعٌ وَمُسِنَّتَانِ ثُمَّ فِىْ مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ اَرْبَعَةُ اَتْبِعَةٍ اَوْ ثَلٰثُ مُسِنَّاتٍ وَهٰكَذَا اِلٰى غَيْرِ النِّهَايَةِ وَفِىْ اَرْبَعِيْنَ ضَانًا اَوْ مَعْزًا شَاةٌ ثُمَّ فِىْ مِائَةٍ وَاِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ شَاتَانِ ثُمَّ فِىْ مِئَتَيْنِ وَ وَاحِدَةٍ ثَلٰثُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِىْ اَرْبَعِمِائَةٍ اَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِىْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا شَىْءَ فِىْ بَغْلٍ وَحِمَارٍ لَيْسَا لِلتِّجَارَةِ وَلَا فِىْ عَوَامِلَ وَحَوَامِلَ وَعَلُوْفَةٍ اَلْعَوَامِلُ الَّتِىْ اُعِدَّتْ لِلْعَمَلِ كَاِثَارَةِ الْاَرْضِ وَالْحَوَامِلُ الَّتِىْ اُعِدَّتْ لِحَمْلِ الْاَثْقَالِ وَالْعَلُوْفَةُ الَّتِىْ تُعْطَى الْعَلَفَ وَهِىَ ضِدُّ السَّائِمَةِ ـ

অনুবাদ : ত্রিশ গরু কিংবা মহিষের মধ্যে এক তাবী' কিংবা তাবী'আহ ওয়াজিব। অতঃপর চল্লিশ [গরু কিংবা মহিষ] -এর মধ্যে একটি মুসিন কিংবা মুসিন্নাহ ওয়াজিব। তাবী' (تَبِيْع) বলা হয় গাভীর ঐ বাচ্চাকে, যার বয়স পরিপূর্ণ এক বছর হয়েছে। আর তাবী'আহ হলো এর মাদি। মুসিন্ হলো ঐ বাচ্চা যার বয়স পরিপূর্ণ দুই বছর হয়েছে। আর মুসিন্নাহ হলো এর মাদি। ৪০ -এর চেয়ে যা অতিরিক্ত হবে এর মধ্যে ষাট [৬০] পর্যন্ত হিসাব হবে। এতে [৬০ -এর মধ্যে] ত্রিশের দ্বিগুণ হবে। অতঃপর প্রত্যেক ত্রিশের মধ্যে একটি তাবী' এবং প্রত্যেক ৪০ -এর মধ্যে একটি করে মুসিন্নাহ ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ ৬০ থেকে ৬৯ পর্যন্ত দুই তাবী'। অতঃপর সত্তরের মধ্যে এক তাবী'ও এক মুস্নিন্নাহ। অতঃপর ৮০ -এর মধ্যে দুই মুসিন্নাহ। অতঃপর ৯০ -এর মধ্যে তিন তাবীআ'। অতঃপর ১০০ -এর মধ্যে দুই তাবী' ও এক মুসিন্নাহ। অতঃপর ১১০ -এর মধ্যে এক তাবী' ও দুই মুসিন্নাহ। অতঃপর ১২০ -এর মধ্যে চার তাবী'আহ কিংবা তিন মুসিন্নাহ ওয়াজিব। এভাবে শেষ পর্যন্ত। চল্লিশ বকরির মধ্যে এক বকরি। অতঃপর ১২১ বকরির মধ্যে দুই বকরি। অতঃপর দুশো এক বকরির মাঝে তিন বকরি। অতঃপর চারশ'র মধ্যে চার বকরি। অতঃপর প্রত্যেক একশ'র মধ্যে এক বকরি। খচ্চর এবং গাধা যা ব্যবসার জন্য নয়, এতে কোনো জাকাত নেই। কোনো কাজের বোঝা বহনের জন্য নির্ধারিত ও গৃহপালিত পশুর মধ্যে জাকাত নেই। عَوَامِلْ ঐ প্রাণী যা কাজের জন্য নির্ধারিত। যেমন– হালচাষের জন্য [নির্ধারিত]। حَوَامِلْ ঐ প্রাণী যা বোঝা বহনের জন্য নির্ধারিত। عَلُوْفَة ঐ প্রাণী, যাকে ঘাস খাওয়ানো হয় এবং তা গবাদি পশু হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلتَّبِيْعُ الَّذِىْ تَمَّ عَلَيْهِ الخ :

تَبِيْعٌ ও مُسِنٌّ-এর নামকরণ : تَبِيْع বলা হয় পূর্ণ এক বছরের গাভীর বাচ্চাকে। একে এজন্য تَبِيْع বলা হয় যে, এ বয়সে পদার্পণ করতে করতে বাচ্চা হালচাষ ও কাজের যোগ্য হয়ে যায় এবং এদিক-সেদিক ভেগে যায় না। আর مُسِنّ বলা হয় পরিপূর্ণ দু বছরের গাভীর বাচ্চাকে। এ বয়সে উপনীত হওয়ার পর সাধারণত বাচ্চার দাঁত উঠে, যার দ্বারা এর বয়সের অনুমান করা যায়।

قَوْلُهُ وَفِيْمَا زَادَ يُحْسَبُ الخ : অর্থাৎ ৪০ -এর থেকে যা বৃদ্ধি পাবে এরও হিসাব করে জাকাত দেবে। অর্থাৎ যদি একটি বৃদ্ধি পায়, তবে এক মুসিন্নার মূল্যের ৪০ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। অনুরূপ যা-ই বৃদ্ধি পাবে এর ৪০ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। ৬০ পর্যন্ত এভাবে চলবে। যখনই ৬০ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন ৪০ -এর পরের অংশের ৪০ ভাগের এক ভাগ নয়; বরং ৬০ হলো ৩০ -এর দ্বিগুণ। অতএব, ৩০ -এর মধ্যে যেরূপ এক তাবী'আহ ওয়াজিব হয়, সেরূপ ৬০ -এর মধ্যে দুই তাবী'আহ ওয়াজিব হবে। এরপর প্রত্যেক দশ-এর হিসাব করা হবে– এর কমে নয়। অর্থাৎ ৬০ থেকে ৬৯ পর্যন্ত দুই তাবী'আহ হবে। অনুরূপ প্রত্যেক ৩০ -এর মধ্যে এক তাবী'আহ হবে এবং প্রত্যেক ৪০ -এর মধ্যে এক মুসিন্নাহ ওয়াজিব হবে। যেরূপ শারেহ (র.) বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ৪০ থেকে অতিরিক্ত ৬০ পর্যন্ত অংশে জাকাত নেই। এটিই সাহেবাইন (র.)-এর মাযহাব এবং এরই উপর ফতোয়া।

قَوْلُهُ وَلَا فِىْ عَوَامِلِ وَحَوَامِلِ وَعَلُوْفَةٍ : عَوَامِلْ - حَوَامِلْ ও عَلُوْفَة-এর মধ্যে কোনো জাকাত নেই। রাসূল ﷺ থেকে এমন বর্ণনাই রয়েছে। عَوَامِلْ ঐ পশুকে বলা হয়, যার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করা হয়। যেমন– জমি হালচাষের কাজ ইত্যাদি। অতএব, যদি তা নেসাব পর্যন্তও পৌঁছে তবুও এর মধ্যে জাকাত ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ حَوَامِلْ -এর মাঝেও জাকাত নেই। حَوَامِلْ শব্দটি حَامِلْ শব্দের বহুবচন। حَوَامِلْ বলা হয় ঐ পশুকে যাকে বোঝা বহনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। عَلُوْفَة ঐ পশুকে বলা হয়, যাকে ঘাস খাওয়ানো হয়, তবে তা سَائِمَة নয়। عَوَامِلْ ও حَوَامِلْ-এর মধ্যে জাকাত ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো, এর মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করা হয়, তাই এগুলো حَوَائِج ضَرُوْرِيَّة -এর অন্তর্ভুক্ত। হ্যাঁ, عَلُوْفَة -এর মাঝে যদি ব্যবসার নিয়ত থাকে, তবে এতে জাকাত ওয়াজিব হবে।

وَلَا فِىْ حَمْلٍ وَفَصِيْلٍ وَعَجِيْلٍ اِلَّا تَبْعًا لِلْكَبِيْرِ وَلَا فِىْ ذُكُوْرِ الْخَيْلِ مُنْفَرِدَةً وَكَذَا فِىْ اِنَاثِهَا فِىْ رِوَايَةٍ وَفِىْ كُلِّ فَرَسٍ مِنَ الْمُخْتَلَطِ بِهِ الذُّكُوْرُ وَالْاِنَاثُ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ اَوْ رُبْعُ عُشْرٍ قِيْمَتُهٗ نِصَابًا وَجَازَ دَفْعُ الْقِيَمِ فِى الزَّكٰوةِ وَالْكَفَّارَةِ وَالْعُشْرِ وَالنَّذْرِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ اِلَّا الْوَسَطَ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمُسِنَّ الْوَاجِبَ يَأْخُذُ الْاَدْنٰى مَعَ الْفَضْلِ اَوِ الْاَعْلٰى وَيَرُدُّ الْفَضْلَ وَيَضُمُّ الْمُسْتَفَادَ وَسَطَ الْحَوْلِ فِىْ حُكْمِهٖ اِلٰى نِصَابٍ مِنْ جِنْسِهٖ اَىْ اِذَا كَانَ لَهٗ مِئَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَقَدْ حَصَلَ فِىْ وَسَطِ الْحَوْلِ مِائَةُ دِرْهَمٍ يَضُمُّ الْمِائَةَ اِلَى الْمِئَتَيْنِ وَقَوْلُهٗ فِىْ حُكْمِهٖ اَىْ فِىْ حُكْمِ الْمُسْتَفَادِ وَهُوَ وُجُوْبُ الزَّكٰوةِ يَعْنِىْ يُعْتَبَرُ فِى الْمُسْتَفَادِ الْحَوْلُ الَّذِىْ مَرَّ عَلَى الْاَصْلِ وَيُمْكِنُ اَنْ يَرْجِعَ ضَمِيْرُ حُكْمِهٖ اِلَى الْحَوْلِ وَالزَّكٰوةُ فِى النِّصَابِ لَا الْعَفْوِ فَاِنَّهٗ اِذَا مَلَكَ خَمْسًا وَثَلٰثِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فَالْوَاجِبُ وَهُوَ بِنْتُ مَخَاضٍ اِنَّمَا هُوَ فِىْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ لَا فِى الْمَجْمُوْعِ حَتّٰى لَوْ هَلَكَ عَشَرَةٌ بَعْدَ الْحَوْلِ كَانَ الْوَاجِبُ عَلٰى حَالِهٖ ـ

অনুবাদ : হামল (حَمْل), ফাসীল এবং আজীল-এর মধ্যে জাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে বড়-এর অনুসরণ করে ওয়াজিব হবে। শুধু একাকী নর ঘোড়ার মধ্যে জাকাত নেই। অনুরূপ এক বর্ণনা অনুযায়ী শুধু একাকী মাদি ঘোড়ার মধ্যেও জাকাত নেই। নর ও মাদি মিলিত ঘোড়ার প্রত্যেক ঘোড়ায় এক দিনার কিংবা এর মূল্য। যদি তা নেসাব পরিমাণ হয়, তবে দশের এক-চতুর্থাংশ তথা ৪০ তম অংশ ওয়াজিব। জাকাত, কাফফারা, ওশর ও মানতের ক্ষেত্রে মূল্য আদায় করা জায়েজ। জাকাত আদায়কারী শুধু মধ্যম পর্যায়ের প্রাণী গ্রহণ করবে। আর যদি ঐ মুসিন না পায় যা ওয়াজিব, তবে নরমাল প্রাণীকে অধিকসহ গ্রহণ করবে কিংবা উন্নত প্রাণী গ্রহণ করবে। তবে অতিরিক্ত অংশ ফেরত দেবে। বছরের মধ্যখানে অর্জিত মালকে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে অনুরূপ মালের নেসাবের সঙ্গে মিলাবে। অর্থাৎ যখন তার নিকট দুশো দিরহাম হবে এবং এর উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। বছরের মাঝে তার আরো ১০০ দিরহাম হাসিল হয়, তখন এ ১০০ -কে ঐ দুশোর সাথে মিলাবে। গ্রন্থকারের কথা فِىْ حُكْمِهٖ তথা فِىْ حُكْمِ الْمُسْتَفَادِ এবং তা হলো জাকাত ওয়াজিব হওয়ার হুকুম। অর্থাৎ [বছরের মাঝে] অর্জিত মালের ক্ষেত্রে ঐ বছর ধর্তব্য, যা তার মূল [মাল] -এর উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং حُكْمِهٖ -এর ضَمِيْر - حَوْل -এর দিকে ফিরার সম্ভাবনাও রয়েছে। জাকাত নেসাবের মধ্যে ওয়াজিব হবে; অতিরিক্ত অংশে নয় কেননা, যদি কোনো ব্যক্তি ৩৫ উটের মালিক হয়, তবে একটি বিনতে মাখায ওয়াজিব হবে। আর বিনতে মাখায ওয়াজিব হয় পঁচিশ উটের মধ্যে– সবগুলো [৩৫] -এর মধ্যে নয়। এমনকি যদি এক বছর পর দশটি মরেও যায়, তবুও ওয়াজিব বহাল থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا فِىْ حَمْلٍ وَفَصِيْلٍ الخ : حَمْل শব্দের অর্থ– বকরির ঐ বাচ্চা যা এক বছরের চেয়ে কম বয়সী। فَصِيْل বলা হয় উটের ঐ বাচ্চাকে যা এখনো পর্যন্ত বিনতে মাখায পর্যন্ত পৌঁছেনি। عَجِيْل বলা হয় গাভীর ঐ বাচ্চা যা এক মাসের চেয়ে

কম বয়সী। উল্লিখিত তিন ধরনের বাচ্চার মধ্যে কোনো জাকাত নেই। হ্যাঁ, যদি এ বাচ্চাগুলো বড় বড় পশুর সাথে হয়। যেমন– ৩৯টি বকরি আছে এবং একটি বকরির বাচ্চা আছে, তবে এর মধ্যে ঐ জাকাতই হবে, যা পূর্ণ ৪০ এর মধ্যে হয়ে থাকে। আর যদি এ বাচ্চা না হতো তবে ৩৯ বকরির মধ্যে জাকাত ওয়াজিব হতো না। অনুরূপ গাভী ও উটের মধ্যেও। আর যদি বড় বড় সমস্ত প্রাণী মারা যায় এবং এ ছোট ছোট বাচ্চাগুলো থাকে, যা নেসাব পরিমাণ তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শেষ অভিমত হলো, এর মধ্যে জাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, কিয়াসের মাধ্যমে বয়সের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। বড় বয়সী প্রাণীর উপর শরিয়তের হুকুম এসেছে। কিন্তু শুধু ছোট প্রাণীর ক্ষেত্রে শরিয়তের হুকুম আসেনি।

قَوْلُهُ وَلَا فِىْ ذُكُوْرِ الْخَيْلِ الخ : অর্থাৎ যদি শুধু নর ঘোড়া হয়। মাদি ঘোড়া না থাকে, তবে উত্তম অভিমত হলো– এর মধ্যে জাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে এক বর্ণনা অনুযায়ী জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কথাও বর্ণিত আছে। আর যদি মাদি ঘোড়া হয়, তবে এক বর্ণনা অনুযায়ী জাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, মাদি কিংবা নর ঘোড়া একাকী হওয়ার কারণে এতে نَمْو [বর্ধন] পাওয়া যায় না। আর এক বর্ণনা অনুযায়ী শুধু মাদি ঘোড়ার মধ্যে জাকাত ওয়াজিব হবে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা, নর ঘোড়া ধার এনেও কাজ চালানো যায়। আর যদি নর ও মাদি ঘোড়া একত্রে হয়, তবে এতে জাকাত ওয়াজিব। জাকাত আদায়ের সুরত দুটি–

১. প্রত্যেক ঘোড়ায় এক দিনারের হিসাবে দেওয়া হবে।
২. ঘোড়ার মূল্য নির্ধারণ করে পূর্ণ মূল্যের ৪০ তম অংশ জাকাত দেওয়া। তবে শর্ত হলো, পূর্ণ মূল্য নেসাব পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে হবে। এ অভিমত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) থেকে বর্ণিত। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিতাবুল আছার (كِتَابُ الْاٰثَارِ) -এর মধ্যে বর্ণনা করেন। এ সমস্ত বিষয় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব মোতাবেক। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট ঘোড়ার মধ্যে مُطْلَقًا জাকাত নেই। কেননা, হাদীসে এসেছে– মুসলমানদের উপর তাদের গোলাম ও ঘোড়ার ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব নয়। সিহাহ সিত্তার ইমামগণ উক্ত হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, "আমি মুসলমানদের থেকে ঘোড়া ও গোলামের জাকাত মাফ করে দিয়েছি।" –[আবূ দাউদ, তিরমিযী] ইমাম তাহাবী (র.) সাহেবাইন-এর অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এরই উপর ফতোয়া।

قَوْلُهُ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمُسِنَّ الخ : অর্থাৎ যদি কারো কাছে ঐ পশু না পাওয়া যায়, যার বয়স শরিয়ত নির্ধারণ করেছে, তবে তার থেকে উত্তম প্রাণী কিংবা আরো নরমাল প্রাণী নিয়ে নেবে। উত্তম প্রাণী গ্রহণ করার পদ্ধতি হলো, কিছু মাল ফেরত দেবে, যা শরিয়তের নির্ধারিত প্রাণীর অতিরিক্ত হবে। আর নরমাল ও খারাপ প্রাণী গ্রহণ করার পদ্ধতি হলো, কিছু অতিরিক্ত মালও নিয়ে নেবে, যা শরিয়তের নির্ধারিত মালের থেকে কম হবে। যেমন– কারো উপর বিনতে লাবূন ওয়াজিব, আর তার নিকট বিনতে লাবূন নেই, তবে একটি বিনতে মাখায ও কিছু মাল নিয়ে নেবে যাতে করে বিনতে মাখায ও ঐ মাল মিলে বিনতে লাবূন-এর সমপরিমাণ হয়। কিংবা হিককা গ্রহণ করবে এবং কিছু মাল ফেরত দেবে, যাতে করে যা বিনতে লাবূনের চেয়ে অধিক নেওয়া হয় তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ فِى الْمُسْتَفَادِ الْحَوْلِ الخ : مُسْتَفَادْ শব্দের অর্থ হলো, বছরের মাঝে অর্জিত মাল। বছরের মাঝে অর্জিত মাল আবার দু প্রকার–

১. মালিকের কাছে যে মাল ছিল, সেই মালই তার নিকট আরো অতিরিক্ত হলো। যেমন– তার নিকট নেসাব পরিমাণ উট আছে, বছরের মাঝে তার উট আরো বৃদ্ধি পেল। তবে তার এ মালকে একত্রে মিলিয়ে হিসাব করে জাকাত দিতে হবে।
২. মালিকের কাছে যে মাল নেসাব পরিমাণ আছে, বছরের মাঝে সেই মালই বৃদ্ধি পায়নি; বরং অন্য মাল অর্জিত হয়েছে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে ঐ মালকে এ মালের সাথে মিলাবে না; বরং উভয় মালের নেসাব ভিন্ন ভিন্ন হিসাব করবে। প্রথম সুরত আবার দু প্রকার–

১. মালিকের কাছে নেসাব পরিমাণ যে মাল আছে, সে মাল থেকেই মাল বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ বাচ্চা দিয়েছে। তবে একে সর্বসম্মতিক্রমে মূল মালের সাথে মিলিয়ে হিসাব করে জাকাত দেবে।
২. ঐ ধরনের মাল ক্রয় করা কিংবা উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছে, তবে এ সুরতে মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের নিকট এতেও এ মালকে মূল মালের সাথে মিলাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট মিলাবে না। কেননা, হাদীসে এসেছে– যে মাল অতিরিক্ত এসে মিলেছে, তাতে জাকাত নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাতে এক বছর অতিবাহিত হয়। উক্ত হাদীস আমাদের মালের প্রকার ভিন্ন হওয়ার উপর প্রযোজ্য।

وَهَلَاكُ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ يُسْقِطُ الْوَاجِبَ وَهَلَاكُ الْبَعْضِ حِصَّتَهُ وَيُصْرَفُ الْهَلَاكُ إِلَى الْعَفْوِ اَوَّلًا ثُمَّ إِلَى نِصَابٍ يَلِيْهِ ثُمَّ وَثُمَّ إِلَى اَنْ يَنْتَهِيَ فَبَقِيَ شَاةٌ لَوْ هَلَكَ بَعْدَ الْحَوْلِ عِشْرُوْنَ مِنْ سِتِّيْنَ شَاةً اَوْ وَاحِدَةٌ مِنْ سِتٍّ مِنَ الْاِبِلِ وَتَجِبُ بِنْتُ مَخَاضٍ لَوْ هَلَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ بَعِيْرًا اَىْ يُصْرَفُ الْهَلَاكُ إِلَى الْعَفْوِ اَوَّلًا فَاِنْ لَمْ يُجَاوِزِ الْهَلَاكُ الْعَفْوَ فَالْوَاجِبُ عَلَى حَالِهِ كَالْمِثَالَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ وَهُمَا هَلَاكُ عِشْرِيْنَ مِنْ سِتِّيْنَ شَاةً اَوْ وَاحِدٌ مِنْ سِتٍّ مِنَ الْاِبِلِ وَاِنْ جَاوَزَ الْهَلَاكُ الْعَفْوَ يُصْرَفُ الْهَلَاكُ إِلَى النِّصَابِ الَّذِىْ يَلِى الْعَفْوَ كَمَا اِذَا هَلَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ بَعِيْرًا فَالْاَرْبَعَةُ تُصْرَفُ إِلَى الْعَفْوِ ثُمَّ اَحَدَ عَشَرَ يُصْرَفُ إِلَى النِّصَابِ الَّذِىْ يَلِى الْعَفْوَ وَهُوَ مَا بَيْنَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ إِلَى سِتٍّ وَّثَلٰثِيْنَ حَتّٰى تَجِبَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَا نَقُوْلُ اَلْهَلَاكُ يُصْرَفُ إِلَى النِّصَابِ وَالْعَفْوِ حَتّٰى نَقُوْلَ اَلْوَاجِبُ فِىْ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَّقَدْ هَلَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ وَبَقِىَ خَمْسَةٌ وَّعِشْرُوْنَ فَيَجِبُ نِصْفٌ وَّثُمُنٌ مِنْ بَنْتِ لَبُوْنٍ ـ

অনুবাদ : বছর অতিবাহিত হওয়ার পর নেসাব ধ্বংস হয়ে যাওয়া ওয়াজিব [জাকাত]-কে রহিত করে দেয় এবং কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাকাতের এ পরিমাণ অংশকে রহিত করে দেয়। ধ্বংসকে প্রথমে ক্ষমার দিকে ফিরানো হবে, অতঃপর ক্ষমার সাথে সংশ্লিষ্ট নেসাবের দিকে ফিরানো হবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত যাবে। সুতরাং ৬০ বকরির মধ্যে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যদি ২০ বকরি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে এক বকরি ওয়াজিব থাকবে কিংবা যদি ছয় উটের মাঝে একটি মরে যায়– [তবুও এক বকরি ওয়াজিব থাকবে]। ৪০ উটের মধ্যে যদি ১৫টি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে একটি বিনতে মাখায ওয়াজিব থাকবে। অর্থাৎ প্রথমত ধ্বংসকে ক্ষমার দিকে ফিরানো হবে। অতএব, যদি ধ্বংস ক্ষমাকে অতিক্রম না করে, তবে ওয়াজিব [জাকাত] বহাল থাকবে। যেরূপ প্রথম দুটি উদাহরণ হয়েছে। অর্থাৎ ৬০ বকরির মধ্যে ২০ বকরি ধ্বংস হওয়া কিংবা ৬ উটের মধ্যে একটি ধ্বংস হওয়া। আর যদি ধ্বংস ক্ষমাকে অতিক্রম করে, তবে ধ্বংস এ নেসাবের দিকে ফিরবে যা ক্ষমার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন– ৪০টি উটের মধ্যে ১৫ টি ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে ৪টি ক্ষমার দিকে ফিরবে। আর ১১টি এ নেসাবের দিকে ফিরবে, যা ক্ষমার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ২৫ ও ৩৬-এর মাঝামাঝি। এমনকি বিনতে মাখায ওয়াজিব হবে। আমরা তা বলি না যে, ধ্বংস হওয়া অংশ নেসাব ও ক্ষমার দিকে ফিরবে। যেন আমরা বলতে পারি, ৪০ এর মধ্যে বিনতে লাবুন ওয়াজিব। এখন ৪০ -এর থেকে ১৫টি ধ্বংস হয়ে গেছে, ২৫টি বাকি রয়ে গেছে তবে এক বিনতে লাবূনের অর্ধাংশ ও অষ্টমাংশ ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهَلَاكُ النِّصَابِ الخ : অর্থাৎ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যদি নেসাব নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে এর জাকাতও রহিত হয়ে যাবে। তবে ধ্বংস করার সুরতে জাকাত বহাল থাকবে। কেননা, আমাদের নিকট জাকাতের সম্পর্ক মূল মালের সাথে এবং হাদীসের ভাষ্যও এমনই। তাই যখন মূল মাল ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন জাকাতও রহিত হয়ে যাবে। কারণ, মাল হলো মহল, আর ঐ মহল থেকে জাকাত গ্রহণ করার হুকুম ছিল। আর ঐ মহলের অস্তিত্ব ব্যতীত জাকাত বের করার কল্পনাও করা যায় না। মহল মূলত নেসাবেরই নাম। অনুরূপ যদি কিছু ধ্বংস হয়ে যায়, তবে সেই ধ্বংস হওয়া অংশের জাকাতও রহিত হয়ে যাবে।

وَلَا نَقُوْلُ اَيْضًا اِنَّ الْهَلَاكَ الَّذِىْ جَاوَزَ الْعَفْوَ يُصْرَفُ اِلٰى مَجْمُوْعِ النُّصُبِ حَتّٰى نَقُوْلَ تَصْرِفُ اَرْبَعَةً اِلَى الْعَفْوِ ثُمَّ يَصْرِفُ اَحَدَ عَشَرَ اِلٰى مَجْمُوْعِ سِتَّةٍ وَّثَلٰثِيْنَ اَىْ كَانَ الْوَاجِبُ فِىْ سِتَّةٍ وَّثَلٰثِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَقَدْ هَلَكَ اَحَدَ عَشَرَ وَبَقِىَ خَمْسَةٌ وَّعِشْرُوْنَ فَالْوَاجِبُ ثُلُثَا بِنْتِ لَبُوْنٍ وَ رُبُعُ تِسْعِ بِنْتِ لَبُوْنٍ وَاَمَّا قَوْلُهٗ ثُمَّ وَثُمَّ اِلٰى اَنْ يَنْتَهِىَ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهٗ فِى الْمَتْنِ مِثَالًا فَنَقُوْلُ لَوْ هَلَكَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ بَعِيْرًا عِشْرُوْنَ فَاَرْبَعَةٌ تَصْرِفُ اِلَى الْعَفْوِ وَ اَحَدَ عَشَرَ اِلٰى نِصَابٍ يَلِى الْعَفْوَ وَخَمْسَةٌ اِلٰى نِصَابٍ يَلِىْ هٰذَا النِّصَابَ حَتّٰى يَبْقٰى اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَقِسْ عَلٰى هٰذَا اِذَا هَلَكَ خَمْسَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اَوْ ثَلٰثُوْنَ اَوْ خَمْسَةٌ وَّثَلٰثُوْنَ .

অনুবাদ : আমরা তাও বলি না যে, ঐ ধ্বংস হওয়া অংশ যা ক্ষমার অংশকে অতিক্রম করেছে, তা সমস্ত নেসাবের দিকে ফিরবে। যেন আমরা বলতে পারি যে, চার ক্ষমার অংশের দিকে ফিরবে। অতঃপর ১১ – ৩৬ -এর সমষ্টির দিকে ফিরবে। অর্থাৎ ৩৬ -এর মধ্যে বিনতে লাবূন ওয়াজিব ছিল। তন্মধ্যে ১১টি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ২৫ টি বাকি রয়ে গেছে। তবে এক বিনতে লাবূনের দুই-তৃতীয়াংশ এবং ৯ বিনতে লাবূনের এক-চতুর্থাংশ ওয়াজিব। গ্রন্থকারের কথা– ثُمَّ وَثُمَّ اِلٰى اَنْ يَنْتَهِىَ -এর উদাহরণ গ্রন্থকার উল্লেখ করেননি। অতএব, আমরা এর উদাহরণ প্রসঙ্গে বলব, যদি ৪০ উটের মধ্যে ২০টি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে ৪টি ক্ষমার অংশের দিকে ফিরবে এবং ১১টি নেসাবের দিকে ফিরবে, যা ক্ষমার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর ৫টি ঐ নেসাবের দিকে ফিরবে যা এ নেসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট। শেষ পর্যন্ত ৪টি বকরি ওয়াজিব থাকবে। এরই উপর অনুমান করতে হবে যে, যদি ২৫ কিংবা ৩০ কিংবা ৩৫ টি ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اِلَى الْعَفْوِ اَوَّلًا الخ **:** অর্থাৎ ধ্বংস হওয়া অংশ মাফ হওয়া অংশের মধ্যে ধরা হবে। যদি ধ্বংস হওয়া অংশ মাফ হওয়া অংশের চেয়ে বেশি হয়, তবে একে মাফ হওয়া অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট নেসাবের সাথে মিলাবে। আর যদি এর চেয়েও বেশি হয়, তবে আরো নীচের দিকে চলে আসবে। এভাবে চলতে থাকবে। যেমন– কারো নিকট ৪ নেসাব পরিমাণ উট আছে এবং এর চেয়ে কিছু বেশিও আছে, যা পূর্ণ পাঁচ নেসাবও হয় না। তবে ৪ নেসাবের জাকাতই ওয়াজিব হবে। এখন যদি ৪ নেসাবের অতিরিক্ত অংশ ধ্বংস হয়ে যায়, তবুও ৪ নেসাবের জাকাতই ওয়াজিব হবে। যদি এর চেয়ে অধিক ধ্বংস হয়, তবে তিন নেসাবের জাকাত ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهٗ وَهُوَ مَا بَيْنَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ الخ **:** এ ইবারতের মধ্যে তাসামুহ বা ভুল রয়েছে। কেননা, ২৫ থেকে ৩৬-এর মাঝে কোনো কিছু ওয়াজিব নয়। অথচ একেই مَا يَلِى الْعَفْوَ বলে সাব্যস্ত করেছে। তাই এ কথা বলা উত্তম হতো যে, তা হলো ৩৬। কারণ, তা হচ্ছে ঐ নেসাব যাতে বিনতে লাবূন ওয়াজিব হয়।

وَالسَّائِمَةُ هِيَ الْمُكْتَفِيَةُ بِالرَّعْيِ فِيْ اَكْثَرِ الْحَوْلِ اَلرِّعْى بِالْكَسْرِ اَلْكَلأُ اَخَذَ الْبُغَاةُ

زَكٰوةَ السَّوَائِمِ وَالْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ يُفْتٰى اَنْ يُعِيْدُوْا خُفْيَةً اِنْ لَمْ تَصْرِفْ فِىْ حَقِّهٖ لَا الْخَرَاجَ

اِعْلَمْ اَنَّ وِلَايَةَ اَخْذِ الْخَرَاجِ لِلْاِمَامِ وَكَذَا اَخْذُ الزَّكٰوةِ فِى الْاَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَهِيَ عُشْرُ الْخَارِجِ وَ زَكٰوةُ السَّوَائِمِ وَ زَكٰوةُ اَمْوَالِ التِّجَارَةِ مَا دَامَتْ تَحْتَ حِمَايَةِ الْعَاشِرِ فَاِنْ اَخَذَ الْبُغَاةُ اَوْ سَلَاطِيْنُ زَمَانِنَا الْخَرَاجَ فَلَا اِعَادَةَ عَلَى الْمِلَاكِ لِاَنَّ مَصْرَفَ الْخَرَاجِ الْمُقَاتِلَةُ وَهُمْ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ لِاَنَّهُمْ يُحَارِبُوْنَ الْكُفَّارَ وَاِنْ اَخَذُوا الزَّكٰوةَ الْمَذْكُوْرَةَ فَاِنْ صَرَفُوْا اِلٰى مَصَارِفِهَا وَهِيَ مَصَارِفُ الزَّكٰوةِ فَلَا اِعَادَةَ عَلَى الْمِلَاكِ وَاِنْ لَمْ يَصْرِفُوْا اِلٰى مَصَارِفِهَا فَعَلَيْهِمُ الْاِعَادَةُ خُفْيَةً اَىْ يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى مُسْتَحِقِّيْهَا فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِنَّمَا قَالَ يُفْتٰى اَنْ يُعِيْدُوْا خُفْيَةً اِحْتِرَازًا عَنْ قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَائِخِ (رح) اِنَّهٗ لَا اِعَادَةَ عَلَيْهِمْ لِاَنَّهُمْ لَمَّا تَسَلَّطُوْا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْاِمَامِ ضَرُوْرَةً وَلِهٰذَا يَصِحُّ مِنْهُمْ تَفْوِيْضُ الْقَضَاءِ وَاِقَامَةُ الْجُمَعِ وَالْاَعْيَادِ وَنَحْوُ ذٰلِكَ .

অনুবাদ : سَائِمَة ঐ পশুকে বলা হয় বছরের অধিকাংশ সময়ই যে পশু চারণভূমিতে চরানো যথেষ্ট হয়। رِعْى শব্দের راء অক্ষরে যের হবে। অর্থ ঘাস। [অর্থাৎ ঐ মাঠ যেখানে পশু নিজে নিজে চরে ঘাস খেতে পারে।] যদি রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তি গবাদি পশুর জাকাত, ওশর ও টেক্স আদায় করে নিয়ে চলে যায়, তবে যদি সে তা প্রকৃত মাসরাফে [খাতে] ব্যয় না করে, তবে গোপনভাবে জাকাত পুনরায় আদায় করার ফতোয়া দেওয়া হয়। টেক্স পুনরায় আদায় করতে হবে না। জেনে রেখ যে, টেক্স আদায় করার অধিকার ইমাম ও খলিফার। অনুরূপ [তাদের অধিকার] জাহিরী মালের জাকাত উসুল করা। আর তা হলো– উদ্ভিদের ওশর, গবাদি পশুর জাকাত, ব্যবসায়ী মালের জাকাত যতক্ষণ পর্যন্ত তা আশির (عَاشِرْ) -এর হাতে সংরক্ষিত থাকবে। যদি রাষ্ট্রদ্রোহী কিংবা আমাদের যুগের বাদশাহ টেক্স উসুল করে নেয়, তবে তা পুনরায় আদায় করা মালিকদের জন্য ওয়াজিব নয়। কেননা, টেক্সের মাসরাফ [ব্যয়ক্ষেত্র] হচ্ছে মুজাহিদগণ। আর তারা মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তারা কাফেরদের সাথে লড়াই করে। আর যদি তারা উল্লিখিত জাকাত উসুল করে নেয় এবং এর মাসরাফে তা ব্যয় করে যা জাকাতের মাসরাফ, তবে মালিকদের উপর তা পুনরায় দেওয়া আবশ্যক নয়। আর যদি জাকাতের মাসরাফে তা ব্যয় না করে তবে মালিকদের উপর তা গোপনে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। অর্থাৎ মালিক ও আল্লাহর নিকট যারা হকদার তাদের মাঝে আদায় করবে। গ্রন্থকার يُفْتٰى اَنْ يُعِيْدُوْا خُفْيَةً বলেছেন কোনো কোনো ফকীহের ঐ অভিমত

থেকে বাঁচার জন্য– যারা বলেন, মালিকের উপর তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব নয়। কেননা, রাষ্ট্রদ্রোহী যখন মুসলমানদের উপর বিজয়ী হয়, তখন অবশ্যই তার হুকুম ইমামের হুকুমের মতো হয়ে থাকে। এ কারণেই রাষ্ট্রদ্রোহীদের থেকে তাফবীযুল কাযা [কাজি নির্ধারণ করা], জুমা ও ঈদ ইত্যাদি নামাজ কায়েম করে সহীহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالسَّائِمَةُ هِيَ الْمُكْتَفِيَةُ الخ :

سَائِمَة-তে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত : গবাদি পশুর মধ্যে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো, এগুলো দুধ এবং বাচ্চা দেওয়ার যোগ্য হতে হবে। কিংবা এগুলোর মাধ্যমে মালে উপকার হাসিলের ভিন্ন কোনো সুরত থাকতে হবে। যেমন– মূল্যের উপকার ইত্যাদি। কারণ, ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঐ মালই জাকাতের মাল হয়, যার মধ্যে نَمَا [বর্ধন] রয়েছে।

قَوْلُهُ اَخَذَ الْبُغَاةُ زَكٰوةَ الخ : بُغَاةٌ শব্দের بَاء অক্ষরে পেশ হবে। এটি بَاغِىْ শব্দের বহুবচন। তারা মুসলমানদের ঐ দল যারা এক ইমামের আনুগত্য করে না। যখন তারা হামলা করে কোনো এলাকা দখল করে নেয় এবং মালিকের থেকে জাকাতের মাল গ্রহণ করে নেয়, তখন দেখতে হবে যে, তারা জাকাতকে সহীহ ক্ষেত্রে ব্যয় করছে কিনা? যদি তারা সহীহ ক্ষেত্রে এগুলোকে ব্যয় না করে, তবে দ্বিতীয়বার জাকাত দেওয়া উচিত। এরই উপর ফতোয়া। আর যদি তারা জাকাতকে সহীহ ক্ষেত্রে ব্যয় করে থাকে, তবে দ্বিতীয়বার জাকাত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর দ্বিতীয়বার দেওয়ার সময় প্রকাশ্যে দেবে না; বরং গোপনে আদায় করে দেবে; অন্যথায় রাষ্ট্রদ্রোহীরা আবার জুলুম করার আশঙ্কা আছে।

قَوْلُهُ اَلْعَاشِرِ : عَاشِرٌ ঐ ব্যক্তি, যাকে রাষ্ট্রপ্রধান জাকাত ও ওশর আদায়ের জন্য রাস্তায় নিয়োগ করেছে।

قَوْلُهُ اِحْتِرَازًا عَنْ قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَائِخِ (رح) : অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহীরা যদি জাকাত উসুল করে জাকাতের খাতে ব্যয় না করে, তবে গোপনে জাকাত আদায়ের ফতোয়া দেওয়া হয়েছে কোনো কোনো ফকীহের অভিমত থেকে বাঁচার জন্য– যারা বলেন, দ্বিতীয়বার জাকাত দিতে হবে না। এ মাসআলায় তিনটি অভিমত রয়েছে–

১. যখন জাহিরী মালের জাকাত নিয়ে নেবে তখন মালিকের উপর জাকাত দ্বিতীয়বার দেওয়া আবশ্যক নয়। চাই সেই জাকাত মাসরাফে খরচ করার বিষয় জানা থাকুক কিংবা না থাকুক।

২. তাদেরকে মাল প্রদানের সময় সদকার নিয়ত করলে তার থেকে জাকাত রহিত হয়ে যায়। তাই দ্বিতীয়বার দেওয়া আবশ্যক নয়, কিন্তু এ উভয় অভিমতই দুর্বল।

৩. গোপনে দ্বিতীয়বার আদায় করবে। এটি আমাদের গ্রন্থকারের নিকট পছন্দনীয়। সর্বোপরি যখন রাষ্ট্রপতি দ্বিতীয়বার ঐ এলাকার উপর বিজয়ী হবে, তখন ঐ মালিকদের কাছে দ্বিতীয়বার জাকাত চাইবে না। কেননা, তাদের থেকে রাষ্ট্রদ্রোহীরা জাকাত গ্রহণ করে নিয়ে গেছে। তখন সরকার তাদের বাধা দিতে পারেনি।

وَالْجَوَابُ عَنْ هٰذَا اَنَّ مَا ثَبَتَ بِالضَّرُوْرَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا يَعْنِىْ نَصْبَ الْقُضَاةِ وَاِقَامَةَ مَا هُوَ مِنْ شَعَائِرِ الْاِسْلَامِ ضَرُوْرَةً بِخِلَافِ الزَّكٰوةِ فَاِنَّ الْاَصْلَ فِيْهِ الْاَدَاءُ خُفْيَةً قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَنْ قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَائِخِ اَنَّهُ اِذَا نَوٰى بِالدَّفْعِ اِلَيْهِمُ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِمْ سَقَطَ عَنْهُمْ لِاَنَّهُمْ بِمَا عَلَيْهِمُ التَّبِعَاتُ فُقَرَاءُ ـ

অনুবাদ : এর উত্তর হলো, যে জিনিস জরুরতের কারণে প্রমাণিত হয় তা সেই জরুরত অনুপাতেই নির্ধারিত থাকে। অর্থাৎ কাজি নির্ধারণ করা এবং ঐ জিনিস কায়েম করা যা ইসলামের শি'আর [নিদর্শন] এগুলো জরুরত। জাকাত এর পরিপন্থি। কারণ, এতে মূল হলো, গোপনে আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থ– যদি তোমরা গোপনে ফকিরদেরকে জাকাত ও সদকা দাও তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর কোনো কোনো ফকীহের কথা থেকেও বিরত থেকেছেন, যারা বলেন, রাষ্ট্রদ্রোহীদের দেওয়ার সময় যদি তাদের উপর সদকা করার নিয়ত করে তবে মালিকদের থেকে জাকাত রহিত হয়ে যাবে। কেননা, সে সকল বিদ্রোহীরা তাদের নিকট পাওনা ঋণের দরুন তারা দরিদ্র [ফকির]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْجَوَابُ عَنْ هٰذَا الخ **:** অর্থাৎ কোনো কোনো ফকীহ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এর উত্তর হলো– যে হুকুম কিংবা অনুমতি জরুরতের কারণে হয়ে থাকে, তা সেই জরুরত পর্যন্তই সীমিত থাকে। এর চেয়ে সামনে এগিয়ে যায় না। এখন বিচারক নির্ধারণ করা, ইসলামের অন্যান্য শিআর কায়েম করা ইত্যাদি জরুরতের কারণে হয়ে থাকে। কেননা, যদি এগুলো জায়েজ না হতো তবে দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক বিষয়েই সমস্যা দেখা দিত।

قَوْلُهُ فَاِنَّ الْاَصْلَ فِيْهِ الْاَدَاءُ الخ **:** শারেহ (র.)-এর এ অভিমতের মধ্যে অনেক মন্তব্য করা হয়–

১. এটি মূলত ফুকাহায়ে কেরামের স্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থি। কেননা, জাকাত গ্রহণ করার অধিকার হলো রাষ্ট্রপ্রধানের অতএব, যদি জাকাত আদায়ের উত্তম পন্থা গোপনে হয়, তবে তা স্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থি হবে।

২. জাকাত একটি প্রকাশ্য বিষয়, আর নফল দানের ক্ষেত্রে উত্তম হলো গোপনে দেওয়া।

৩. যে আয়াত দ্বারা জাকাতকে গোপনে আদায় করা উত্তমের উপর দলিল পেশ করা হয়, তা মূলত নফল সদকার উপর প্রয়োগ হবে। কেননা, এ আয়াতের পূর্বে হলো– اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا الخ তা ছাড়া রাসূল ﷺ -এর আমল দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তিনি জাকাত আদায়ের জন্য নিজের কর্মচারীদেরকে প্রেরণ করতেন। এতে জাকাত গোপনে আদায় না করাই প্রমাণিত হয়।

وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ اَبُوْ مَنْصُوْرِ الْمَاتُرِيْدِيُّ زَيَّفَ هٰذَا فَإِنَّهُ قَالَ لَابُدَّ مِنْ إِعْلَامِ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ وَاَيْضًا لَا خَفَاءَ فِيْ اَنَّ الزَّكٰوةَ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ كَالصَّلٰوةِ فَلَا يَتَادّٰى اِلَّا بِالنِّيَّةِ الْخَالِصَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَلَمْ تُوْجَدْ ثُمَّ اعْلَمْ اَنَّ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ فِى الْهِدَايَةِ هٰذِهِ وَالزَّكٰوةُ مَصْرَفُهَا الْفُقَرَاءُ وَلَا يَصْرِفُوْنَهَا اِلَيْهِمْ وَقِيْلَ اِذَا نَوٰى بِالدَّفْعِ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِمْ سَقَطَ عَنْهُ وَكَذَا الدَّفْعُ اِلٰى كُلِّ سُلْطَانٍ جَائِرٍ لِاَنَّهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبِعَاتِ فُقَرَاءُ وَالْاَوَّلُ اَحْوَطُ فَعَلَيْكَ اَنْ تَتَامَلَ فِيْ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ اَنَّهُ هَلْ يُفْهَمُ مِنْهَا اِلَّا سُقُوْطُ الزَّكٰوةِ عَنِ الْمَظْلُوْمِ نَظَرًا لَهُ وَ دَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنْهُ وَهَلْ لِهٰذِهِ الرِّوَايَةِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّهُ يَجُوْزُ لِلْخَوَارِجِ وَاَهْلِ الْجَوْرِ اَنْ يَاخُذُوا الزَّكٰوةَ وَيَصْرِفُوْنَهَا اِلٰى حَوَائِجِهِمْ وَلَا يَصْرِفُوْنَهَا اِلَى الْفُقَرَاءِ بِتَاوِيْلِ اَنَّهُمْ فُقَرَاءُ.

অনুবাদ : শায়খ আবূ মনসূর মাতুরীদী (র.) এ অভিমতকে অবান্তর সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন, যাকে জাকাত দেওয়া হচ্ছে, তাকে জানানো আবশ্যক যে, এটা জাকাতের মাল। এতে কোনো অস্পষ্টতাও নেই যে, জাকাত عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ – যেরূপ নামাজ। তাই খালেস আল্লাহর ওয়াস্তে নিয়ত ব্যতীত তা আদায় হবে না। আর এ নিয়ত পাওয়া যায়নি। অতঃপর জেনে রেখ, উল্লিখিত ইবারত হিদায়াতে এই যে, وَالزَّكٰوةُ مَصْرَفُهَا الْفُقَرَاءُ (اِلٰى قَوْلِهٖ) وَالْاَوَّلُ اَحْوَطُ অর্থাৎ জাকাতের মাসরাফ ফকিরগণ। আর রাষ্ট্রদ্রোহীরা ফকিরদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং বলা হয় যে, দেওয়ার সময় যদি জাকাতের নিয়ত করে, তবে জাকাত রহিত হয়ে যায়। অনুরূপ জালিম বাদশাহকে দেওয়ার সময় নিয়ত করার দ্বারা জাকাত রহিত হয়ে যায়। কেননা, ঐ জালিম বাদশাহদের উপর পাওনা ঋণের কারণে তারা ফকির। প্রথম অভিমতটি অধিক সতর্কতামূলক। অতএব, তোমার জন্য আবশ্যক হলো, এ বর্ণনার সম্পর্কে চিন্তা করা। অবশ্যই জাকাত রহিত হয়ে যাওয়া এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় না। কিন্তু জাকাত রহিত হয়ে যায় এজন্য যে, মজলুম মালিকের প্রতি রহম করত এবং তার থেকে ক্ষতিকে দূরীভূত করত। এ বর্ণনা এ কথা বুঝায় না যে, খারিজী ও অত্যাচারীদের জন্য জাকাত উসুল করা এবং তা নিজেদের প্রয়োজনে খরচ করা, ফকিরদেরকে না দেওয়া জায়েজ, এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে, ঐ অত্যাচারীরা ফকির।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ اعْلَمْ اَنَّ الْعِبَارَةَ الخ : এ স্থানে হিদায়া গ্রন্থের ইবারত নকল করার উদ্দেশ্য হলো, হিদায়া গ্রন্থকারের সমবয়সী শায়খ নিযামুদ্দীন (র.)-কে রদ করা। অর্থাৎ তাঁর ঐ কথার রদ করা যা তিনি বলেন যে, জালিম রাষ্ট্রপ্রধানরা দরিদ্র হওয়ার কারণে তারা ওশর ও জাকাতের মালকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করা অর্থ মাসরাফের মধ্যেই ব্যয় করা। হিদায়া গ্রন্থের ইবারতের সারমর্ম হলো, যখন জালিম রাষ্ট্রদ্রোহীরা জোরপূর্বক জাকাত গ্রহণ করে নেয়, তখন মালিকদের থেকে দ্বিতীয়বার আর জাকাত গ্রহণ করা হবে না। কেননা, বৈধ ইমাম তাদের হেফাজত করতে পারেনি। সরকার টেক্স নেয় মূলত মালের হেফাজতের জন্য। ফুকাহায়ে কেরাম টেক্স ব্যতীত অন্যান্য বিষয় তথা জাকাত ইত্যাদি দ্বিতীয়বার গোপনে আদায়ের ফতোয়া দেন এজন্য যে, তারা জাকাতের মালকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করেছে। অথচ তারা জাকাতের মাসরাফ নয়। জাকাতের মাসরাফ হলো ফকির মিসকিনরা। আর তারা হলো যোদ্ধা।

فَانْظُرْ اِلٰى هٰذَا الَّذِىْ اَدْرَجَ فِى الْاِيْمَانِ رُكْنًا اٰخَرَ اَنَّهٗ كَيْفَ يَتَمَسَّكُ بِهٰذِهِ الرِّوَايَةِ فَسَوَّغَ لِوُلَاةِ هِرَاةٍ اَخْذَ الْعُشُوْرِ وَ الزَّكٰوةِ بِالصِّفَةِ الْمَعْلُوْمَةِ بَلْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ذٰلِكَ وَحَكَمَ بِكُفْرِ مَنْ اَنْكَرَهٗ وَالصِّفَةُ الْمَعْلُوْمَةُ اَنْ يُحَرِّضَ الْاَعْوِنَةَ فِىْ اَخْذِ الْخَارِجِ عَنِ الْاَرْضِ اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فَيَضَعُوْا عَلَى الْمِلَاكِ الْقِيَمَ وَيَأْخُذُوْنَهَا جَبْرًا وَقَهْرًا وَ يَصْرِفُوْنَهَا كَمَا هُوَ عَادَةُ اَهْلِ الْاِسْرَافِ وَالْاَتْرَافِ ـ

অনুবাদ : অতএব, তুমি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর, যে ঈমানের মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি রোকনকে প্রবেশ করিয়েছে যে সে কিভাবে এ রেওয়ায়েত দ্বারা দলিল পেশ করেছে। অতএব, হিরাতের আমিরদের জন্য ওশর ও জাকাত গ্রহণ করা صِفَة مَعْلُوْمَة -এর সাথে জায়েজ করে দিয়েছে; বরং তাদের উপর তা ফরজ। আর যে ব্যক্তি এর বৈধতাকে অস্বীকার করে, তাকে কাফের হওয়ার ফতোয়া দিয়েছে। আর صِفَة مَعْلُوْمَة হলো, কর্মচারীদেরকে জমির উৎপন্ন ফসল থেকে ওয়াজিব পরিমাণের চেয়ে দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ অধিক গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা। সুতরাং কর্মচারীরা মালিকদের উপর জাকাতের মূল্য নির্ধারণ করে দেয় এবং তা বল প্রয়োগে উসুল করে নেয় আর অপচয়কারী ও বিলাসী সম্প্রদায়ের অভ্যাস মতো তা ব্যয় করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَانْظُرْ اِلٰى هٰذَا الَّذِىْ الخ : এখানে শারেহ (র.) ঐ বক্তার উপর [শায়খুত তাসলীম] মন্তব্য করেছেন যে, তিনি اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ এবং تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ -এর সাথে ঈমানের জন্য অপর একটি রোকন বৃদ্ধি করেছেন, যা ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থি।

وَلَا شَيْءَ فِيْ مَالِ الصَّبِيِّ التَّغْلِبِيِّ وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ تَغْلِبُ بِكَسْرِ اللَّامِ اَبُوْ قَبِيْلَةٍ وَالنِّسْبَةُ اِلَيْهَا تَغْلَبِيٌّ بِفَتْحِ اللَّامِ اِسْتِيْحَاشًا لِتَوَالِي الْكَسْرَتَيْنِ وَ رُبَمَا قَالُوْا بِالْكَسْرِ هٰكَذَا فِى الصِّحَاحِ وَبَنُوْ تَغْلِبٍ قَوْمٌ مِنْ مُشْرِكِى الْعَرَبِ طَالَبَهُمْ عُمَرُ (رض) بِالْجِزْيَةِ فَاَبَوْا وَقَالُوْا نُعْطِى الصَّدَقَةَ مُضَاعَفَةً فَصُوْلِحُوْا عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالَ عُمَرُ هٰذِهٖ جِزْيَتُكُمْ فَسَمُّوْهَا مَا شِئْتُمْ فَلَمَّا جَرَى الصُّلْحُ عَلٰى ضِعْفِ زَكٰوةِ الْمُسْلِمِيْنَ لَا تُؤْخَذُ مِنْ صِبْيَانِهِمْ وَلٰكِنْ تُؤْخَذُ مِنْ نِسْوَانِهِمْ كَالْمُسْلِمِيْنَ مَعَ اَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُوْضَعُ عَلَى النِّسَاءِ وَجَازَ تَقْدِيْمُهَا لِحَوْلٍ وَلِاَكْثَرَ مِنْهُ وَلِنُصُبٍ لِذِىْ نِصَابٍ اَلْاَصْلُ فِىْ هٰذَا اَنَّ الْمَالَ النَّامِىَ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ الزَّكٰوةِ وَالْحَوْلُ شَرْطٌ لِوُجُوْبِ الْاَدَاءِ فَاِذَا وُجِدَ السَّبَبُ يَصِحُّ الْاَدَاءُ مَعَ اَنَّهٗ لَمْ يَجِبْ فَاِذَا وُجِدَ النِّصَابُ يَصِحُّ الْاَدَاءُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَكَذَا اِذَا كَانَ لَهٗ نِصَابٌ وَاحِدٌ كَمِائَتَىْ دِرْهَمٍ مَثَلًا فَيُؤَدِّىْ لِلْاَكْثَرِ مِنْ نِصَابٍ وَاحِدٍ حَتّٰى اِذَا مَلَكَ الْاَكْثَرَ بَعْدَ الْاَدَاءِ اَجْزَاهُ مَا اَدّٰى مِنْ قَبْلُ اَمَّا اِنْ لَمْ يَمْلِكْ نِصَابًا أَصْلًا لَمْ يَصِحُّ الْاَدَاءُ .

অনুবাদ : তাগলাবী বালকের মালের উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হয় না। তাগলাবী পুরুষের উপর যে জিনিস ওয়াজিব হয়, সেই জিনিস তাগলাবী মহিলার উপর ওয়াজিব হয়। تَغْلِبْ শব্দটির لَامْ বর্ণটি যেরবিশিষ্ট। এক সম্প্রদায়ের বাবা। সেই সম্প্রদায়ের প্রতি নিসবত করে যবরবিশিষ্ট تَغْلَبِيُّ বলা হয়। ধারাবাহিক দুটি যের একত্রে আসার কারণে। কখনো কখনো যের দ্বারাও বলা হয়। সিহাহে [লুগাতে] এমনিই আছে। বনূ তাগলাব আরবের একটি মুশরিক সম্প্রদায়। হযরত ওমর (র.) তাদের কাছে টেক্স চেয়েছিলেন। তারা টেক্স দিতে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, আমরা দ্বিগুণ জাকাত দেব। অতএব, এর উপর তাদের সন্ধি হয়ে গেছে। হযরত ওমর (রা.) বলেন, এটিই তোমাদের টেক্স। এখন তোমরা যা ইচ্ছা এর নাম রাখ। যেহেতু মুসলমানদের জাকাতের দ্বিগুণের উপর সন্ধি হয়েছে, তাই তাদের বাচ্চাদের থেকে জাকাত গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু তাদের মহিলাদের থেকে গ্রহণ করা হবে। যেরূপ মুসলমানদের মহিলাদের থেকে গ্রহণ করা হয়। এতদসত্ত্বেও যে, মহিলাদের থেকে টেক্স গ্রহণ করা হয় না। এক বা ততোধিক বছরের জাকাত এবং এক নেসাবের অধিকারী বিভিন্ন নেসাবের জাকাত অগ্রিম প্রদান করা জায়েজ। এ ক্ষেত্রে মূল হলো, জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ হলো বর্ধনশীল মাল। আদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো, এক বছর অতিবাহিত হওয়া। যখন سَبَبْ পাওয়া যাবে, তখন আদায় সহীহ হবে। অথচ আদায় (اداء) ওয়াজিব হয়নি। অতএব, যখন নেসাব পাওয়া যাবে, তখন এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে

আদায় সহীহ হবে। অনুরূপ যখন তার কাছে এক নেসাব থাকে; যেমন– ২০০ দিরহাম, উদাহরণস্বরূপ– সে এক থেকে অধিক নেসাবের জাকাত আদায় করে দিয়েছে, আদায়ের পর যদি ঐ মালের মালিক হয়ে যায় তবে প্রথমে যে জাকাত আদায় করেছে, তা-ই তার জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যখন মূলত নেসাবের মালিকই না হবে তখন তার আদায় সহীহ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَنُوْ تَغْلَبٍ قَوْمٌ مِنْ مُشْرِكِى الخ : শারেহ (র.)-এর এখানে তাসামূহ হয়ে গেছে। তিনি বনূ তাগলাবকে আরবের মুশরিক সম্প্রদায় বলেছেন। অথচ তারা হলো খ্রিস্টান সম্প্রদায়। ঘটনা এরূপ যে, বনূ তাগলাব ইবনে ওয়ায়েল ইবনে কাসেত। জাহিলি যুগে সে খ্রিস্টধর্মের অনুসরণ করে।

قَوْلُهُ لَا تُوْضَعُ عَلَى النِّسَاءِ الخ : টেক্স দুই প্রকার–

১. সন্তুষ্টি ও সন্ধির ভিত্তিতে টেক্স। এর কোনো নির্ধারিত পরিমাণ নেই।

২. ঐ টেক্স মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কাফেরদের উপর বিজয় লাভ করলে, তখন কাফেরদের থেকে গ্রহণ করা হয়। প্রতি বছর ধনীদের জন্য ৪৮ দিরহাম এবং প্রতি মাসে ৪ দিরহাম। মধ্যবিত্তদের জন্য ২৪ দিরহাম এবং প্রতি মাসে ২ দেরহাম। দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য প্রতি বছর ১২ দিরহাম এবং প্রতি মাসে ১ দিরহাম। আহলে কিতাবী, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক ও মুরতাদদের উপর কোনো টেক্স নেই। কারণ, তাদের জন্য দু'টি পথ–

১. ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাওয়া।

২. ইসলাম গ্রহণ না করলে কতল [হত্যা] করে ফেলা। সন্ন্যাসীর বাচ্চা, মহিলা, গোলাম, অন্ধ, মুকাতাব গোলাম, মুদাব্বার গোলাম, উম্মে ওয়ালাদ এবং ঐ ফকির যে উপার্জন করে না– তাদের উপর কোনো টেক্স নেই।

وَهُوَ لِلذَّهَبِ عِشْرُوْنَ مِثْقَالًا وَلِلْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ كُلُّ عَشَرَةٍ مِنْهَا سَبْعَةُ مَثَاقِيْلَ اِعْلَمْ اَنَّ هٰذَا الْوَزْنَ يُسَمّٰى وَزْنَ سَبْعَةٍ وَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ الدِّرْهَمُ سَبْعَةَ اَجْزَاءٍ مِنَ الْاَجْزَاءِ الَّتِىْ يَكُوْنُ الْمِثْقَالُ عَشَرَةً مِنْهَا اَىْ يَكُوْنُ الدِّرْهَمُ نِصْفَ مِثْقَالٍ وَخُمُسَ مِثْقَالٍ فَيَكُوْنُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِوَزْنِ سَبْعَةِ مَثَاقِيْلَ وَالْمِثْقَالُ عِشْرُوْنَ قِيْرَاطًا وَالدِّرْهَمُ اَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيْرَاطًا وَالْقِيْرَاطُ خَمْسُ شَعِيْرَاتٍ وَفِىْ مَعْمُوْلِهٖ وَتِبْرِهٖ وَعَرَضِ تِجَارَةٍ قِيْمَتُهٗ نِصَابٌ مِنْ اَحَدِهِمَا مُقَوَّمًا بِالْاَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ رُبُعُ عُشْرٍ اَىْ اِنْ كَانَ التَّقْوِيْمُ بِالدَّرَاهِمِ اَنْفَعُ لِلْفَقِيْرِ قُوِّمَ عُرُوْضُ التِّجَارَةِ بِالدَّرَاهِمِ وَاِنْ كَانَ بِالدَّنَانِيْرِ اَنْفَعُ قُوِّمَتْ بِهَا ثُمَّ فِىْ كُلِّ خُمُسٍ زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهٖ اِعْلَمْ اَنَّ الزَّكٰوةَ لَا تَجِبُ فِى الْكُسُوْرِ عِنْدَنَا اِلَّا اِذَا بَلَغَ خُمُسَ النِّصَابِ فَاِذَا زَادَ عَلٰى مِئَتَىْ دِرْهَمٍ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا زَادَ فِى الزَّكٰوةِ دِرْهَمٌ وَاِذَا زَادَ ثَمَانُوْنَ دِرْهَمًا زَادَ دِرْهَمَانِ وَلَا شَىْءَ فِى الْاَقَلِّ ـ

অনুবাদ : স্বর্ণের নেসাব হলো বিশ মিছকাল এবং রুপার নেসাব হলো ২০০ দিরহাম। তন্মধ্যে প্রত্যেক দশ দিরহাম ৭ মিছকাল। জেনে রেখ যে, এ ওযনের নাম ওজনে সাব'আ (وَزْنِ سَبْعَةِ) রাখা হয়। তা হলো– দশ দিরহাম বরাবর ৭ মিছকাল। অর্থাৎ এক মিছকাল-এর অর্ধাংশ ও পঞ্চমাংশ মিলে এক দিরহাম হয়। অতএব, দশ দিরহামে ৭ মিছকাল হবে। আর এক মিসকাল ২০ কীরাত (قِيْرَاط) আর এক দিরহাম ১৪ কীরাত। পাঁচটি গম এক কীরাত। আর [স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্বারা] বানানো জিনিস, স্বর্ণ ও রৌপ্যের টুকরা এবং ব্যবসায়ী পণ্যের মধ্যে যার মূল্য দুয়ের যে-কোনো একটির নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে– যা দরিদ্রের জন্য অধিক উপকার হবে, এর ৪০ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যদি ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্যকে দিরহাম বানানের মাঝে দরিদ্রদের অধিক উপকার হয় তবে দিরহাম দ্বারা মূল্য ধরা হবে। আর যদি দিনার দ্বারা মূল্য ধরার মাধ্যমে দরিদ্রদের উপকার বেশি হয় তবে দিনার দ্বারা মূল্য ধরা হবে। অতঃপর নেসাবের পঞ্চম অংশে যা নেসাব থেকে অতিরিক্ত এর নিসাব অনুযায়ী জাকাত ওয়াজিব হবে। জেনে রেখ যে, আমাদের নিকট [দুই নেসাবের মাঝে] ভগ্নাংশের মধ্যে জাকাত ওয়াজিব নয়। কিন্তু যখন ভগ্নাংশ নেসাবের পঞ্চমাংশ পর্যন্ত পৌঁছে। যেমন– যখন ২০০ দিরহামের মধ্যে ৪০ দেরহাম অতিরিক্ত হবে [যা ২০০ -এর পঞ্চমাংশ] তখন জাকাত এক দেরহাম অতিরিক্ত হবে এবং যখন ৮০ দেরহাম অতিরিক্ত হবে, তখন দুই দিরহাম জাকাতও অতিরিক্ত হবে। আর পঞ্চমাংশের কমের মধ্যে জাকাত নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ زَادَ عَلٰى مِئَتَىْ دِرْهَمٍ الخ : এটি উল্লিখিত মাসআলার উদাহরণ। মাসআলা হলো, দুই নেসাবের মধ্যবর্তী ভগ্নাংশের মধ্যে জাকাত নেই, কিন্তু যদি এক নেসাবের পঞ্চমাংশ পর্যন্ত পৌঁছে, তবে এতে এর হিসাব অনুযায়ী জাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন– কারো কাছে যদি ২৪০ দিরহাম থাকে তবে ২০০ দিরহাম পূর্ণ নিসাব, আর অতিরিক্ত ৪০ দিরহাম ২০০ -এর পঞ্চমাংশ। তাই ৪০ -এর মধ্যে এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি ৪০ -এর চেয়ে একও কম হয়, তবে তা মাফ হয়ে যাবে। কেননা, রাসূল ﷺ যখন হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠান তখন যেসব মাসআলা বলে দিয়েছিলেন তন্মধ্যে একটি হলো, নেসাবের অতিরিক্ত ভগ্নাংশের মধ্যে কোনো জাকাত নেই।

وَ وَرَقٌ غَلَبَ فِضَّتُهُ فِضَّةٌ وَمَا غَلَبَ غَشُّهُ يُقَوَّمُ وَنُقْصَانُ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ هَدَرٌ اَىْ لَوْ كَانَ لَهُ فِيْ اَوَّلِ الْحَوْلِ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا ثُمَّ نَقَصَ فِيْ اَثْنَاءِ الْحَوْلِ ثُمَّ تَمَّ فِيْ اٰخِرِ الْحَوْلِ تَجِبُ الزَّكٰوةُ وَيُضَمُّ الذَّهَبُ اِلَى الْفِضَّةِ وَالْعُرُوْضُ اِلَيْهِمَا بِالْقِيْمَةِ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَمَّا عِنْدَهُمَا فَيُضَمُّ الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ بِالْاَجْزَاءِ حَتّٰى لَوْ كَانَ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيْرَ وَتِسْعُوْنَ دِرْهَمًا قِيْمَتُهَا عَشَرَةُ دَنَانِيْرَ تَجِبُ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا اَمَّا اِذَا كَانَ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيْرَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ تَجِبُ بِاتِّفَاقِهِمْ اَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِلضَّمِّ بِالْاَجْزَاءِ وَاَمَّا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) فَمِائَةُ دِرْهَمٍ اِنْ كَانَ قِيْمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيْرَ فَظَاهِرٌ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ فَكَذَا الْوُجُوْدُ نِصَابُ الذَّهَبِ مِنْ حَيْثُ الْقِيْمَةِ فَتَجِبُ الزَّكٰوةُ وَاِنْ كَانَتْ اَقَلَّ يَكُوْنُ قِيْمَةُ عَشَرَةِ دَنَانِيْرَ اَكْثَرُ مِنْ قِيْمَةِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ضَرُوْرَةً فَتَجِبُ بِاعْتِبَارِ وُجُوْدِ نِصَابِ الْفِضَّةِ مِنْ حَيْثُ الْقِيْمَةِ.

অনুবাদ : এমন মুদ্রা যার মধ্যে রুপাই প্রবল তা খাঁটি রুপার হুকুমে হবে। আর যার খাইট [ভেজাল] প্রবল, তখন ঐ খাইটের মূল্য ধরা হবে। বছরের মধ্যখানে নেসাব হ্রাস পাওয়া ধর্তব্য নয়। অর্থাৎ যদি কারো কাছে বছরের শুরুতে ২০ দিনার থাকে এবং বছরের মধ্যখানে এর চেয়ে কমে গেছে [যেমন– ১২ দিনার হয়ে গেছে] কিন্তু বছরের শেষে আবার ২০ দিনার পূর্ণ হয়ে গেছে, তবে জাকাত ওয়াজিব হবে। স্বর্ণকে রুপার সঙ্গে এবং আসবাব-সামগ্রীকে উভয়টির সঙ্গে মূল্য হিসেবে মিলানো হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট স্বর্ণকে রুপার সাথে অংশ হিসেবে মিলানো হবে। এমনকি যদি তার নিকট দশ দিনার এবং ৯ দিরহাম থাকে, যার মূল্য দশ দিনার, তবে ইমাম আ'যম (র.)-এর নিকট জাকাত ওয়াজিব হবে, কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর নিকট জাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে যদি ১০ দিনার হয় এবং ১০০ দেরহাম হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে জাকাত ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন (র.)-এর নিকট জাকাত ওয়াজিব হবে এ কারণে যে, অংশ হিসেবে উভয়টিকে মিলানো হয়েছে [যে, উভয়টি অর্ধেক অর্ধেক মিলে এক নেসাব হয়েছে]। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট এ কারণে যে, যদি ১০০ দিরহামের মূল্য ১০ দিনার হয়, তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, দশ এবং দশ মিলে ২০ দিনার হয়। আর যদি এর মূল্য ১০ দিনারের চেয়ে অধিক হয়, তবে মূল্য হিসেবে স্বর্ণের নেসাব এমনই পাওয়া গেছে। তাই জাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি দিরহামের মূল্য দশ দিনারের চেয়ে কম হয়, তবে দশ দিনারের মূল্য ১০০ দিরহামের চেয়ে অবশ্যই বেশি। তাই মূল্যের দিক থেকে রুপার নেসাব বিদ্যমান হিসেবে জাকাত ওয়াজিব হবে।

بَابُ الْعَاشِرِ

هُوَ مَنْ نُصِبَ عَلَى الطَّرِيْقِ لِاَخْذِ صَدَقَةِ التُّجَّارِ وَصُدِّقَ مَعَ الْيَمِيْنِ مَنْ اَنْكَرَ مِنْهُمْ تَمَامَ الْحَوْلِ اَوِ الْفَرَاغَ عَنِ الدَّيْنِ اَوْ اِدَّعَى اَدَاءَهُ اِلَى فَقِيْرٍ فِيْ مِصْرٍ فِيْ غَيْرِ السَّوَائِمِ حَتّٰى اِذَا ادَّعَى الْاَدَاءَ اِلَى فَقِيْرٍ فِيْ مِصْرٍ فِى السَّوَائِمِ لَا يُصَدَّقُ اِذْ لَيْسَ لَهُ فِى السَّوَائِمِ الْاَدَاءُ اِلَى الْفَقِيْرِ بَلْ يَاْخُذُ مِنْهُ السُّلْطَانُ وَيَصْرِفُهُ اِلٰى مَصْرَفِهِ اَوْ عَاشِرَ اٰخَرَ اِنْ وُجِدَ فِى السَّنَةِ اَىْ اِذَا ادَّعَى اَدَاءَهُ اِلٰى عَاشِرٍ اٰخَرَ وَالْحَالُ اَنَّ عَاشِرًا اٰخَرَ مَوْجُوْدٌ فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ بِلَا اِخْرَاجِ الْبَرَاءَةِ اَىْ لَا يُشْتَرَطُ اَنْ يُخْرِجَ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْاٰخَرِ بَلْ يُصَدَّقُ مَعَ الْيَمِيْنِ ۔

পরিচ্ছেদ : ওশর উসুলকারী প্রসঙ্গ

অনুবাদ : عَاشِرٌ ঐ ব্যক্তি যাকে ব্যবসায়ীদের থেকে জাকাত উসুল করার জন্য রাস্তায় নিয়োগ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীদের যে ব্যক্তি বছর পূর্ণ হওয়াকে অস্বীকার করে কিংবা ঋণমুক্ত হওয়াকে অস্বীকার করে কিংবা গবাদি পশু ব্যতীত [অন্যান্য] মালের জাকাত শহরের দরিদ্রদের দেওয়ার দাবি করে, তবে এসবের ক্ষেত্রে তাকে কসমের সাথে সত্যায়ন করা হবে। এমনকি যদি সে গবাদি পশুর জাকাত দরিদ্রদের দেওয়ার দাবি করে, তবে তাকে সত্যায়ন করা হবে না। কারণ, গবাদি পশুর জাকাত দরিদ্রদের দেওয়ার তার কোনো অধিকার নেই; বরং রাষ্ট্রপ্রধানই তা উসুল করে এর মাসরাফে [খাতে] ব্যয় করবে। কিংবা যদি অন্য ওশর আদায়কারীকে দেওয়ার দাবি করে এবং যদি সে বছর অন্য ওশর আদায়কারী পাওয়া যায়। অর্থাৎ যদি এ দাবি করে যে, সে অন্য ওশর আদায়কারীকে আদায় করে দিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষেও সেই কাজের জন্য অন্য একজন ওশর আদায়কারী বিদ্যমান থাকে, তবে তার সত্যতা যাচাই ব্যতীত কসমসহ তাকে সত্যায়ন করা হবে। অর্থাৎ সত্যায়ন করার মধ্যে এ শর্ত নেই যে, অন্য যে ওশর আদায়কারীকে ওশর দিয়েছে তার থেকে সাক্ষ্য নিতে হবে; বরং কসমের সাথে সত্যায়ন করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ هُوَ مَنْ نُصِبَ عَلَى الطَّرِيْقِ الخ :

ওশর আদায়কারী প্রসঙ্গ : ব্যবসায়ীদের জাকাত গ্রহণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যাকে রাস্তায় নিযুক্ত করা হয়, তাকে عَاشِرٌ [ওশর আদায়কারী] বলা হয়। عَاشِرٌ-এর জন্য শর্ত হলো, عَاشِرٌ আজাদ হতে হবে; দাস হতে পারবে না এবং মুসলমান হতে হবে; কাফের হতে পারবে না। কারণ, কসম হলো একটি অধিকার, আর সেই অধিকার গোলামের নেই। কাফের ব্যক্তি যদিও চোর-ডাকাতদের প্রতিহত করতে পারে; কিন্তু মুসলমানদের উপর তার কোনো অধিকার নেই।

وَمَا صُدِّقَ فِيْهِ الْمُسْلِمُ صُدِّقَ فِيْهِ الذِّمِّيُّ لَا الْحَرْبِيُّ اِلَّا فِيْ قَوْلِهِ لِاَمَتِهِ هِيَ اُمُّ وَلَدِيْ اَيْ اِذَا ادَّعَى الْحَرْبِيُّ اَنَّ هٰذِهِ الْاَمَةَ اُمُّ وَلَدِيْ يُصَدَّقُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَاُخِذَ مِنَ الْمُسْلِمِ رُبُعُ عُشْرٍ وَمِنَ الذِّمِّيِّ ضِعْفُهُ وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرُ اِنْ بَلَغَ مَالُهُ نِصَابًا وَلَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ مَا اُخِذَ مِنَّا اَيْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ مَا اُخِذَ مِنَّا اَهْلُ الْحَرْبِ اِذَا مَرَّ تَاجِرُنَا عَلَيْهِمْ وَاِنْ عُلِمَ اُخِذَ مِثْلُهُ اِنْ كَانَ بَعْضًا لَا كُلًّا اَيْ اِنْ عُلِمَ قَدْرُ مَا اَخَذَ مِنَّا اَهْلُ الْحَرْبِ فَعَاشِرُنَا يَاْخُذُ مِنَ الْحَرْبِيِّ مِثْلَ ذٰلِكَ اِنْ كَانَ بَعْضًا حَتّٰى اَنَّهُمْ لَوْ اَخَذُوْا كُلَّ اَمْوَالِنَا فَعَاشِرُنَا لَا يَاْخُذُ كُلَّ اَمْوَالِ الْحَرْبِيِّ الْمَارِّ وَلَا مِنْ قَلِيْلِهِ وَاِنْ اَقَرَّ بِبَاقِي النِّصَابِ فِيْ بَيْتِهِ اَلْقَلِيْلُ مَا لَا يَبْلُغُ النِّصَابَ وَلَا يَاْخُذُ شَيْئًا مِنْهُ اِنْ لَمْ يَأْخُذُوْا شَيْئًا مِنَّا اَلضَّمِيْرُ فِيْ لَمْ يَأْخُذُوْا يَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِ الْحَرْبِ وَاِنْ لَمْ يُذْكَرْ هٰذَا اللَّفْظُ وَلَوْ عُشِرَ ثُمَّ مَرَّ قَبْلَ الْحَوْلِ اِنْ جَاءَ مِنْ دَارِهِ عُشِرَ ثَانِيًا وَاِلَّا فَلَا اَيْ اِنْ اُخِذَ مِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرُ ثُمَّ مَرَّ قَبْلَ الْحَوْلِ اِنْ كَانَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ جَاءَ مِنْ دَارِهِ عُشِرَ ثَانِيًا وَاِنْ كَانَ رَاجِعًا مِنْ دَارِنَا اِلٰى دَارِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ .

অনুবাদ : যে ক্ষেত্রে মুসলমানকে সত্যায়ন করা হয়, সে ক্ষেত্রে জিম্মিকেও সত্যায়ন করা হবে। পক্ষান্তরে হারবীকে সত্যায়ন করা হবে না। কিন্তু যদি হারবী নিজের কোনো দাসীর ব্যাপারে দাবি করে যে, সে আমার উম্মে ওয়ালাদ অর্থাৎ যদি হারবী দাবি করে যে, এ দাসী আমার উম্মে ওয়ালাদ, তবে তাকে সত্যায়ন করা হবে এবং তার থেকে ওশর আদায়কারী কিছুই নেবে না। মুসলমান থেকে ৪০ ভাগের এক ভাগ নেওয়া হবে। জিম্মি থেকে এর দ্বিগুণ এবং হারবী থেকে দশমাংশ [নেওয়া হবে], যদি তার মাল নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে এবং তা জানা না হয় যে, আমাদের মুসলমান থেকে কি পরিমাণ নেওয়া হয়েছে– অর্থাৎ যখন তা জানা না হবে যে, আমাদের ব্যবসায়ী যখন হারবীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন হারবী এ মুসলিম ব্যবসায়ী থেকে কি পরিমাণ উসুল করেছে? আর যদি জানা যায় তবে ঐ পরিমাণই নেওয়া হবে। যদি গৃহীত মাল আংশিক হয়, পুরোপুরি না হয়। অর্থাৎ যদি জানা যায় যে, আহলে হারব আমাদের ব্যবসায়ীদের থেকে কি পরিমাণ উসুল করেছে, তবে আমাদের ওশর আদায়কারীও ঐ পরিমাণ মাল উসুল করবে। তবে শর্ত হলো, উসুলকৃত মাল ব্যবসায়ীর সমস্ত মালের অংশিক হয়। কিন্তু যদি আহলে হারব আমাদের ব্যবসায়ীদের থেকে সমস্ত মাল নিয়ে নেয়, তবে আমাদের ওশর আদায়কারী হারবী থেকে সমস্ত মাল গ্রহণ করবে না। হারবীর সামান্য মাল থেকে কিছুই নেওয়া হবে না। যদি সে তার বাড়িতে বাকি নেসাব থাকাকে স্বীকার করে। সামান্য মাল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছেনি। আর যদি আহলে হারব আমাদের মুসলমান ব্যবসায়ী থেকে কিছুই না নেয়, তবে আমাদের ওশর আদায়কারীও ঐ হারবী থেকে কিছুই গ্রহণ করবে না। এখানে لَمْ يَأْخُذُوْا -এর যমীরের মারজি' (مَرْجِعْ) আহলে হারব, যদিও এ শব্দের উল্লেখ হয়নি। আর যদি হারবী ব্যবসায়ী থেকে একবার ওশর নেয়, অতঃপর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয়বার আসে তবে যদি দারুল হারব থেকে আসে তবে দ্বিতীয়বার ওশর নেবে; অন্যথায় নয়। অর্থাৎ যদি কোনো হারবী ব্যবসায়ী থেকে একবার ওশর নেয়, অতঃপর ঐ ব্যবসায়ীই বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয়বার আসে, তবে যদি সে এই দ্বিতীয়বার দারুল হারব থেকে আসে, তবে সে দ্বিতীয়বার ওশর নেবে। পক্ষান্তরে যদি সে আমাদের দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারবে দ্বিতীয়বার যায়, তবে দ্বিতীয়বার আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না।

وَعُشِرَ خَمْرُ ذِمِّيٍّ لَا خِنْزِيْرُهُ مَرَّ بِهِمَا اَوْ بِاَحَدِهِمَا هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) لَا يُعْشَرُهُمَا وَعِنْدَ زُفَرَ (رح) يُعْشَرُ كُلُّ وَاحِدٍ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اِنْ مَرَّ بِهِمَا يُعْشَرُهُمَا فَجُعِلَ الْخِنْزِيْرُ تَبْعًا لِلْخَمْرِ وَاِنْ مَرَّ بِالْخَمْرِ مُنْفَرِدًا يُعْشَرُهَا وَاِنْ مَرَّ بِالْخِنْزِيْرِ مُنْفَرِدًا لَا وَالْفَرْقُ عِنْدَنَا اَنَّ الْخِنْزِيْرَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ فَاَخْذُ قِيْمَتِهٖ كَاَخْذِهٖ وَالْخَمْرُ مِنْ ذَوَاتِ الْاَمْثَالِ فَاَخْذُ الْقِيْمَةِ لَا يَكُوْنُ كَاَخْذِ الْعَيْنِ وَلَا بُضَاعَةَ وَلَا مُضَارَبَةَ اَىْ اِنَّ مَرَّ الْمُضَارِبُ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْئٌ وَكَسْبَ مَاذُوْنٍ اِلَّا غَيْرَ مَدْيُوْنٍ مَعَهُ مَوْلَاهُ اَىْ اِنْ مَرَّ عَبْدٌ مَاذُوْنٌ فَاِنْ كَانَا مَدْيُوْنًا لَا يُوْخَذُ مِنْهُ شَيْئٌ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْيُوْنًا فَكَسْبُهُ مِلْكٌ لِمَوْلَاهُ فَاِنْ كَانَ الْمَوْلٰى مَعَهُ تُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكٰوةُ وَاِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَوْلٰى مَعَهُ لَا تُوْخَذُ .

অনুবাদ : জিম্মির মদ থেকে ওশর গ্রহণ করা হবে; শূকর থেকে নয়। চাই সে ঐ উভয়টিকে নিয়ে অতিক্রম করে কিংবা দুয়ের কোনো একটিকে নিয়ে অতিক্রম করে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট এ দুয়ের কোনো একটি থেকেও ওশর নেওয়া হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর নিকট ঐ উভয়টি থেকে ওশর নেওয়া হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট যদি উভয়টি একত্রে নিয়ে অতিক্রম করে তবে শূকরকে মদের অনুগামী করে উভয়টি থেকে নেওয়া হবে। আর যদি শুধু মদ নিয়ে অতিক্রম করে, তবে ওশর নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি শুধু শূকর নিয়ে অতিক্রম করে তবে ওশর নেওয়া হবে না। আমাদের নিকট পার্থক্য হলো, শূকর ذَوَاتُ الْقِيَمَةِ -এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এর মূল্য নেওয়া প্রকৃত শূকর নেওয়ার মতো। পক্ষান্তরে মদ ذَوَاتُ الْاَمْثَالِ -এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এর মূল্য নেওয়া স্বয়ং মদ নেওয়ার মতো নয়। মালে بُضَاعَة ও মালে مُضَارَبَة -এর মধ্যে ওশর নেই। অর্থাৎ যদি মুযারিব (مُضَارِبْ) মালে مُضَارَبَة নিয়ে অতিক্রম করে, তবে এর থেকে কোনো কিছুই নেওয়া হবে না। মাযূন (مَاذُوْن) গোলামের উপার্জিত মালেও ওশর নেই। কিন্তু যদি مَاذُوْن ঋণমুক্ত হয় এবং তার সাথে তার মালিক থাকে [তবে ওশর নেওয়া হবে]। অর্থাৎ যদি ব্যবসার ক্ষেত্রে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম ওশর আদায়কারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তবে যদি সে ঋণযুক্ত হয়, তবে তার থেকে কিছুই গ্রহণ করা হবে না। আর যদি ঋণমুক্ত হয়, তবে তার উপার্জনের মালিক স্বয়ং তার মনিব। এখন যদি তার মনিব তার সাথে থাকে, তবে মনিব থেকে ওশর নেওয়া হবে। আর যদি মনিব তার সাথে না থাকে, তবে গোলাম থেকে কিছুই গ্রহণ করা হবে না।

بَابُ الرِّكَازِ

اَلرِّكَازُ هُوَ الْمَالُ الْمَرْكُوْزُ فِى الْاَرْضِ مَخْلُوْقًا كَانَ اَوْ مَوْضُوْعًا وَالْمَعْدِنُ مَا كَانَ مَخْلُوْقًا وَالْكَنْزُ مَا كَانَ مَوْضُوْعًا مَعْدِنُ ذَهَبٍ اَوْ نَحْوِهٖ وُجِدَ فِىْ اَرْضِ خَرَاجٍ اَوْ عُشْرٍ خُمُسٌ وَبَاقِيْهِ لِلْوَاجِدِ اِنْ لَمْ تُمَلَّكْ اَرْضُهٗ وَاِلَّا فَلِمَالِكِهَا وَلَا شَئَ فِيْهِ اِنْ وُجِدَ فِىْ دَارِهٖ وَفِىْ اَرْضِهٖ رِوَايَتَانِ وَلَا فِىْ لُؤْلُؤٍ وَعَنْبَرٍ وَفِيْرُوْزَجٍ وُجِدَ فِىْ جَبَلٍ وَكَنْزٍ فِيْهِ سَمَّةُ الْاِسْلَامِ كَاللُّقْطَةِ وَمَا فِيْهِ سَمَّةُ الْكُفْرِ خُمُسٌ بَاقِيْهِ لِلْوَاجِدِ اِنْ لَمْ تُمَلَّكْ اَرْضُهٗ وَاِلَّا فَلِمُخْتَطِّ لَهٗ اَىْ لِلْمَالِكِ اَوَّلِ الْفَتْحِ وَ رِكَازُ صَحْرَاءِ دَارِ الْحَرْبِ كُلُّهٗ لِمُسْتَامِنٍ وَجَدَهٗ اَىْ اِذَا دَخَلَ تَاجِرُنَا دَارَ الْحَرْبِ بِاَمَانٍ فَوَجَدَ فِىْ صَحْرَائِهَا رِكَازًا فَكُلُّهٗ لَهٗ وَاِنْ وَجَدَ فِىْ دَارٍ مِنْهَا رَدَّهٗ اِلٰى مَالِكِهَا وَاِنْ وُجِدَ رِكَازُ مَتَاعِهِمْ فِىْ اَرْضٍ مِنْهَا لَمْ تُمَلَّكْ خُمُسٌ وَبَاقِيْهِ لَهٗ -

---

পরিচ্ছেদ : রিকায [প্রোথিত সম্পদ]

অনুবাদ : রিকায ঐ মালকে বলে, যা ভূমিতে প্রোথিত। চাই তা সৃষ্টিগতভাবে হোক কিংবা প্রোথিতকরণের মাধ্যমে হোক। মা'দিন (مَعْدِنٌ) ঐ মালকে বলে, যা সৃষ্টিগতভাবে ভূমিতে প্রোথিত। আর কান্‌য (كَنْز) বলা হয় ঐ মালকে, যা ভূমিতে প্রোথিত করে রাখা হয়েছে। স্বর্ণ কিংবা এ জাতীয় খনিজ সম্পদ, যা খেরাজী কিংবা ওশরী ভূমিতে পাওয়া যায়, তবে এর থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা হবে। বাকি অংশ যে ব্যক্তি পেয়েছে সে পাবে। শর্ত হলো, ঐ ভূমির কোনো মালিক থাকবে না। অন্যথায় বাকি অংশ মালিক পাবে। যে জিনিস তার ঘরে পাওয়া গেছে, তাতে কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি নিজের মালিকানাধীন ভূমিতে কিছু পায়, তবে তাতে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। মুক্তা, আম্বর ও ফিরোজা পাথরের মধ্যে যা পাহাড়ে পাওয়া গেছে তাতে এক-পঞ্চমাংশ আবশ্যক নয়। যে কান্‌য [প্রোথিত মাল]-এর মধ্যে ইসলামের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়, তা লুকতা [পথে পাওয়া মালের] ন্যায় হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে কুফরের চিহ্ন আছে তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। আর বাকি অংশ যে ব্যক্তি পেয়েছে সে পাবে। তবে শর্ত হলো, ভূমি মালিকানাধীন হবে না। অন্যথায় প্রথম বিজয়ের সময় সরকার যাকে দিয়েছে সে পাবে। দারুল হারব-এ পাওয়া যাওয়া রিকায ঐ আমানপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য হবে যে তা পেয়েছে অর্থাৎ আমাদের ব্যবসায়ী যখন আমান নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করে এবং সে দেশের মরুভূমিতে রিকায পায়, তবে সবই তার জন্য হবে। আর যদি দারুল হারবের কোনো ঘরে পায়, তবে ঘরের মালিককে তা ফিরিয়ে দেবে দারুল হারবের অধিবাসীদের সম্পদের রিকায যদি কোনো এমন ভূমিতে পাওয়া যায়, যার কোনো মালিক নেই, তবে এর এক-পঞ্চমাংশ নেওয়া হবে। আর বাকি অংশ যে পেয়েছে সে পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ الرِّكَازِ :

رِكَازْ-এর পরিচয় : رِكَازْ - كَنْز ও مَعْدِنْ-এর পরিচয় শারেহ (র.) উল্লেখ করেছেন। অতএব, কিতাবে অধ্যয়ন করে নেওয়াই ভালো।

اَرْض خَرَاجِىْ এবং اَرْض عُشْرِىْ-এর পরিচয় : اَرْض خَرَاجِىْ হলো যে ভূমির উপর টেক্স ওয়াজিব হয়। আর যে ভূমির উপর ওশর ওয়াজিব হয়, তা اَرْض عُشْرِىْ -

قَوْلُهُ مَعْدِنُ ذَهَبٍ اَوْ نَحْوِهِ الخ :

رِكَازْ - كَنْز ও مَعْدِنْ-এর হুকুম : এ পরিচ্ছেদের মাসআলাগুলো ১৫ ভাগে বিভক্ত। কেননা, মাটির নীচে প্রাপ্ত সম্পদ হয়তো مَعْدِنْ হবে কিংবা كَنْز হবে। এর প্রত্যকটিই আবার দু প্রকার। কেননা, তা হয়তো মুসলিম অধ্যুষিত কোনো ভূমিতে পাওয়া হবে কিংবা অমুসলিম অধ্যুষিত ভূমিতে পাওয়া হবে। এর প্রত্যেকটিই আবার তিন ধরনের হতে পারে। হয়তো তা মালিকানাহীন কোনো ভূমিতে পাওয়া যাবে, কিংবা মালিকানাধীন ভূমিতে পায়া যাবে, কিংবা কারো বাড়িতে পাওয়া যাবে। كَنْز যে বাড়িতে পাওয়া গেছে, তাতে মুসলমানদের কোনো মুদ্রার ছাপ থাকবে, কিংবা জাহিলদের মুদ্রার ছাপ থাকবে, কিংবা বিষয়টি অস্পষ্ট থাকবে। এগুলো যদি ওশরী কিংবা খেরাজী ভূমিতে পাওয়া যায়, তবে তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। −[বিস্তারিত জানার জন্য ফাতহুল কাদীর, বাদায়িউস সানায়ে' ও বাহরুর রায়িক অধ্যয়ন করুন]

بَابُ زِكٰوةِ الْخَارِجِ

فِىْ عَسَلِ اَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ اَوْ جَبَلٍ وَثَمَرِهٖ وَمَا خَرَجَ مِنَ الْاَرْضِ وَاِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ اَوْسَقٍ وَلَمْ يَبْقَ سَنَةً وَسَقَاهُ سَيْحٌ اَوْ مَطَرٌ عُشْرٌ عُشْرٌ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهٗ فِىْ عَسَلِ اَرْضٍ خَبْرُهٗ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَمَّا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَقٍ صَدَقَةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ وَاَيْضًا لَيْسَ عِنْدَهُمْ فِى الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْمَا لَمْ يَبْقَ سَنَةً صَدَقَةٌ وَاعْلَمْ اَنَّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَجِبُ فِى الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ يُؤَدِّيْهَا الْمَالِكُ اِلَى الْفَقِيْرِ لَا اَنَّهٗ يَاْخُذُهَا السُّلْطَانُ هٰكَذَا فِى الْاَسْرَارِ لِلْقَاضِى الْاِمَامِ اَبِىْ زَيْدِ نِ الدَّبُوْسِىْ (رحـ) اِلَّا فِىْ نَحْوِ حَطَبٍ كَالْقَصَبِ وَالْحَشِيْشِ وَفِيْمَا سُقِىَ بِغَرْبٍ اَوْ دَالِيَةٍ نِصْفُ عُشْرٍ بِلَا رَفْعِ مُؤَنِ الزَّرْعِ اَىْ تَجِبُ الْوَظِيْفَةُ وَهِىَ عُشْرُ الْكُلِّ اَوْ نِصْفُهٗ لَا اَنَّهٗ يُرْفَعُ مُؤَنُ الزَّرْعِ كَاَجْرِ الْحَصَادِ وَنَحْوِهٖ ثُمَّ يُعْطَى الْوَظِيْفَةُ وَهِىَ عُشْرُ الْبَاقِىْ اَوْ نِصْفُهٗ ـ

পরিচ্ছেদ : ফসলাদির জাকাত

অনুবাদ : ওশরী ভূমি কিংবা পাহাড়ি ভূমির মধুতে কিংবা পাহাড়ি ফলে, ভূমির উদ্ভিদে যদিও পাঁচ ওয়াসক পর্যন্ত না পৌঁছে এবং এক বছর পর্যন্ত বাকি না থাকে এবং এতে জারি পানি কিংবা বৃষ্টির পানি সিঞ্চন করেছে– তবে এ সবগুলোর মধ্যে ওশর ওয়াজিব হবে। [শারেহ (র.) বলেন, এ বাক্যে] عُشْرٌ শব্দটি مُبْتَدَأٌ হয়েছে। আর فِىْ عَسَلِ اَرْضٍ খবর (خَبْرٌ) হয়েছে। এ হুকুম ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট ৫ ওয়াসক থেকে কম মালের মধ্যে সদকা ওয়াজিব নয়। এক ওয়াসক বরাবর ৬০ সা' এক সা' বরাবর ৮ রিতিল। তাঁদের নিকট শাক-সবজির মধ্যেও সদকা ওয়াজিব নয় এবং ঐ সমস্ত জিনিসের মধ্যেও সদকা ওয়াজিব নয়, যেগুলোর উপর এক বছর অতিবাহিত হয়নি। জেনে রেখ, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট শাক-সবজির মধ্যে সদকা ওয়াজিব হয়। মালিক এ সদকা নিজে ফকিরদেরকে দেবে। সরকার তা গ্রহণ করবে না। কাজি আবূ যায়েদ দাবূসী (র.)-এর "আসরার" নামক গ্রন্থে এমনই উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু লাকড়ি জাতীয় জিনিসের মধ্যে [সদকা ওয়াজিব হবে না] যেমন– বাঁশ ও ঘাস। যে ভূমিতে ডোল কিংবা পানি উত্তোলনের চরকি দ্বারা সেচ করা হয়, তাতে এর কর্তন ইত্যাদি খরচ ব্যতীত অর্ধেক ওশর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সদকা যা ওয়াজিব তা পূর্ণ সম্পদের ওশর কিংবা অর্ধেক ওশর। শস্যাদির অন্যান্য খরচ। যেমন– কর্তন [ইত্যাদি] এর উপর ধরে তারপর নির্দিষ্ট সদকা দেওয়া হবে না, যা অবশিষ্ট সম্পদের ওশর কিংবা অর্ধেক ওশর। তাগলাবীর ওশরী ভূমি থেকে এক-পঞ্চমাংশ নেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ زَكٰوةِ الْخَارِجِ :

خَارِجْ-এর পরিচয় : خَارِجْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– مَا يَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ অর্থাৎ ভূমির উদ্ভিদ। চাই তা কারো চেষ্টা-সাধনা ব্যতীত নিজে নিজেই উৎপন্ন হোক কিংবা কৃষি কাজের পর উৎপন্ন হোক।

قَوْلُهُ فِىْ عَسَلِ اَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ : عَسَلْ-কে مُطْلَقْ রাখার কারণে বুঝা যাচ্ছে যে, মধু যদিও কম হয়, তবুও এর থেকে ওশর নেওয়া হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ মধুর মূল্য দশ ওয়াসক পর্যন্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর থেকে ওশর গ্রহণ করা হবে না। কিয়াস হলো, এর থেকে مُطْلَقًا ওশর গ্রহণ করা হবে না। কেননা, এটি ভূমির উদ্ভিদ নয়; বরং এটি এক ধরনের প্রাণী মৌমাছি থেকে সৃষ্টি হয়। কিন্তু আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ মধু থেকে ওশর গ্রহণ করেছেন এবং গ্রহণ করার জন্য হুকুমও করেছেন। তাই আমরা কিয়াসকে বর্জন করেছি।

قَوْلُهُ وَثَمَرِهِ : একে عَطْف করা হয়েছে عَسَل-এর উপর। আর ضَمِيْر-এর مَرْجِعْ হচ্ছে جَبَل অনুরূপ এর পরবর্তী শব্দের عَطْف-ও عَسَل-এর উপর হয়েছে। মধু ও পাহাড়ি ফল-ফলাদির মধ্যে ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো, এতে সরকারের পূর্ণ হেফাজত থাকতে হবে, যেন বিদ্রোহী, ডাকাত ও আহলে হারবরা এগুলোর উপর হামলা না করে। কেননা, পাহাড়ি ফল মুবাহ হয়। মুসলমানদেরকে এর থেকে বারণ করা যায় না। আর টেক্স মূলত হেফাজতের ভিত্তিতে ওয়াজিব হয়। তাই যদি হেফাজত না থাকে, তবে এটি শিকারের ন্যায় হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَاَمَّا عِنْدَهُمَا والخ : অর্থাৎ সাহেবাইন (র.) ও ইমাম শাফেয়ী -এর নিকট ৫ ওয়াসক-এর কমের মধ্যে সদকা ওয়াজিব হয় না। তাঁদের দলিল হলো, রাসূল ﷺ বলেছেন– لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

অর্থাৎ "পাঁচ ওয়াসকের কম সম্পদের মধ্যে সদকা ওয়াজিব নয়।" –[বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো এই হাদীস– "যে ভূমি বৃষ্টির পানি কিংবা ঝরনার পানি দ্বারা সেচ করা হয়, কিংবা যদি ঐ ভূমি ওশরী হয়, তবে এতে ওশর ওয়াজিব হবে। আর যে ভূমিতে কৃষকদের শ্রম দ্বারা পানি সেচ করা হয়, তাতে ওশরের অর্ধেক ওয়াজিব হবে।" –[বুখারী শরীফ]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ হাদীসের ভিত্তিতে সবজির মধ্যেও সদকা ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেন। কিন্তু যুক্তির নিরিখে বুঝা যায় যে, সাহেবাইন (র.)-এর অভিমতই উত্তম।

قَوْلُهُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ فِى الْخَضْرَاوَاتِ الخ : অর্থাৎ সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নিকট শাক-সবজির মধ্যে সদকা ওয়াজিব নয়। হাদীসেও এমনই এসেছে। ইমাম তিরমিযী (র.) একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, "হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) রাসূল ﷺ -কে সবজির কথা জিজ্ঞাসা করে চিঠি লিখেন। রাসূল ﷺ উত্তরে বলেন, সবজিতে কোনো কিছু ওয়াজিব হয় না।"

وَخُمُسُ تَغْلَبِيٍّ لَهُ اَرْضُ عُشْرٍ رَجُلُهُ وَطِفْلُهُ وَاُنْثَاهُ سَوَاءٌ وَاِنْ اَسْلَمَ اَوْ شِرَاهَا مُسْلِمٌ اَوْ ذِمِّيٌّ اِعْلَمْ اَنَّ الْعُشْرَ يُؤْخَذُ مِنْ اَرَاضِيْ اَطْفَالِنَا فَيُؤْخَذُ ضِعْفُ ذٰلِكَ مِنْ اَرَاضِيْ اَطْفَالِهِمْ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمُ الْعُشْرُ الْمُضَاعَفُ بِالْاِسْلَامِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَكَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَاَمَّا عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) فَيُؤْخَذُ عُشْرٌ وَاحِدٌ .

অনুবাদ : তাগলাবী পুরুষ, শিশু ও মহিলা সব বরাবর। যদিও তাগলাবী মুসলমান হয়ে যায়; কিংবা তার ভূমি কোনো মুসলমান কিংবা কোনো জিম্মি ক্রয় করে নেয়। জেনে রেখ যে, মুসলমানদের শিশুদের ভূমি থেকে ওশর নেওয়া হবে। তবে তাগলাবী শিশুদের ভূমি থেকে এর দ্বিগুণ নেওয়া হবে। তারা [তাগলাবী শিশুরা] ইসলাম গ্রহণ করার কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট দ্বিগুণ ওশর গ্রহণ করা রহিত হবে না। অনুরূপ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকটও। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট এক ওশর নেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَخُمُسُ تَغْلَبِيٍّ لَهُ اَرْضُ عُشْرٍ الخ : অর্থাৎ মুসলমানদের তুলনায় তাগলাবী আরবের নাসারা সম্প্রদায়। তারা টেক্স দিতে অস্বীকার করেছে, কিন্তু মুসলমানদেরকে দ্বিগুণ দেওয়ার উপর রাজি হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) তাদের সঙ্গে দ্বিগুণ দেওয়ার উপর সন্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন, এটিই তোমাদের টেক্স। চাই তোমরা একে ভিন্ন নামে স্মরণ কর। যদি কোনো تَغْلَبِىْ মুসলমান হয়ে যায় কিংবা যদি সে কোনো ওশরী ভূমিকে কোনো মুসলমানের কাছে বিক্রি করে দেয় কিংবা কোনো জিম্মির কাছে বিক্রি করে দেয়, তবুও ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর নিকট সে মুসলমান হওয়া কিংবা কোনো মুসলমান জিম্মির নিকট বিক্রি করার দ্বারা خُمُسْ -এর মধ্যে কমবে না। কারণ, এ ভূমির উপর خُمُسْ নির্ধারণ করা হয়ে গেছে, এখন মালিক পরিবর্তন হওয়ার কারণে خُمُسْ -এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে না। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যখন সে ইসলাম কবুল করেছে, তখন তার ভূমি মুসলমানদের ভূমির হুকুমে হয়ে গেছে। এখন মুসলমানদের ভূমি থেকে যেমন ওশর নেওয়া হয়, তার থেকেও ওশর নেওয়া হবে।

وَاُخِذَ الْخَرَاجُ مِنْ ذِمِّيٍّ اِشْتَرٰى عُشْرِيَّةَ مُسْلِمٍ وَعُشْرَ مُسْلِمٍ اَخَذَهَا مِنْهُ شُفْعَةً اَوْ رُدَّتْ عَلَيْهِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ اَىْ اِنْ اَخَذَهَا مِنْ ذِمِّيٍّ شُفْعَةً اَوْ اِشْتَرَى الذِّمِّيُّ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرِيَّةَ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَى الْمُسْلِمِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ عَادَتْ عُشْرِيَّةً كَمَا كَانَتْ وَفِىْ دَارٍ جُعِلَتْ بُسْتَانًا خَرَاجٌ اِنْ كَانَتْ لِذِمِّيٍّ اَوْ لِمُسْلِمٍ سَقَاهَا بِمَائِهٖ اَىْ بِمَاءِ الْخَرَاجِ وَاِنْ سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ عُشْرٌ وَمَاءُ السَّمَاءِ وَالْبِيْرِ وَالْعَيْنِ عُشْرِيٌّ وَمَاءُ اَنْهَارٍ حَفَرَهَا الْاَعَاجِمُ خَرَاجِيٌّ كَنَهْرِ يَزْدَجَرْدَ وَنَحْوِهٖ وَكَذَا سَيْحُوْنُ وَجَيْحُوْنُ وَ دَجْلَةُ وَالْفُرَاتُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَعُشْرِيٌّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَلَا شَىْءَ فِىْ عَيْنِ قِيْرٍ وَنَفْطٍ فِىْ اَرْضِ عُشْرٍ وَفِىْ اَرْضِ خَرَاجٍ فِىْ حَرِيْمِهَا الصَّالِحِ لِلزِّرَاعَةِ خَرَاجٌ لَا فِيْهَا اَىْ اِنْ كَانَ حَرِيْمُ الْعَيْنِ صَالِحًا لِلزِّرَاعَةِ يَجِبُ فِيْهِ الْخَرَاجُ لَا فِى الْعَيْنِ ـ

অনুবাদ : যে জিম্মি কোনো মুসলমান থেকে ওশরী জমি ক্রয় করে, তার থেকে টেক্স গ্রহণ করা হবে। যদি কোনো মুসলমান ঐ জিম্মি থেকে ঐ জমিকে শু'ফার ভিত্তিতে নিয়ে নেয়, কিংবা ফাসেদ বিক্রি হওয়ার কারণে মুসলমান বিক্রেতার কাছে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তবে মুসলমান থেকে ওশর গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ যদি জিম্মি থেকে শুফার মাধ্যমে কোনো মুসলমান জমিটি নিয়ে নেয় কিংবা জিম্মি মুসলমান থেকে ওশরী জমি ক্রয় করে, অতঃপর ফাসেদ বিক্রি হওয়ার কারণে ঐ মুসলমানকে সে ঐ জমি ফিরিয়ে দেয়, তবে ঐ জমি [উভয় প্রক্রিয়ায়] যেমন প্রথমে ওশরী ছিল এখনও ওশরী অবস্থায় ফিরে আসবে। যে বাড়িকে বাগান বানানো হয়েছে, তা যদি জিম্মি কিংবা কোনো মুসলমানের হয় এবং মুসলমান একে খেরাজের পানি দ্বারা সেচ করেছে, তবে এতে টেক্স আসবে। আর যদি ওশরের পানি দ্বারা সেচ করে থাকে, তবে এতে ওশর ওয়াজিব হবে। আসমান, কূপ এবং ঝর্নার পানি ওশরী। যে ড্রেন অনারবি লোকেরা খনন করে এর পানি খেরাজী। যেমন– يَزْدَ جَرْد খাল [নালা] ইত্যাদি। অনুরূপ সাইহূন, জাইহূন, দাজলা এবং ফুরাত নদীর পানি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিট খেরাজী। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট তা ওশরী। যে ওশরী জমির মধ্যে আলকাতরা কিংবা কেরোসিন তেলের খনি পাওয়া যায়, তাতে কোনো কিছুই ওয়াজিব হয় না। সেই খনির আশপাশে ঐ খেরাজী জমি যা চাষাবাদ করার উপযোগী তাতে টেক্স ওয়াজিব; খনিতে নয়। অর্থাৎ খনির আশপাশের জমি যদি চাষাবাদর উপযুক্ত হয়, তবে তাতে টেক্স ওয়াজিব হবে, কিন্তু খনিতে টেক্স ওয়াজিব নয়।

بَابُ الْمَصَارِفِ

مِنْهُمُ الْفَقِيْرُ وَهُوَ مَنْ لَهُ اَدْنٰى شَيْءٍ وَالْمِسْكِيْنُ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ وَعَامِلُ الصَّدَقَةِ فَيُعْطٰى بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَالْمُكَاتَبُ فَيُعَانُ فِيْ فَكِّ رَقَبَتِهِ وَمَدْيُوْنٌ لَا يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَمُنْقَطِعُ الْحَاجِّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَابْنُ السَّبِيْلِ وَهُوَ مَنْ لَهُ مَالٌ لَا مَعَهُ وَلِلْمُزَكِّيْ صَرْفُهَا اِلٰى كُلِّهِمْ اَوْ اِلٰى بَعْضِهِمْ ـ

পরিচ্ছেদ : জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ [মাসারিফ]

অনুবাদ : জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রসমূহের একজন হলো, ফকির। ফকির ঐ ব্যক্তি, যার নিকট সামান্য মাল আছে। আর মিসকিন ঐ ব্যক্তি, যার নিকট কোনো মাল নেই। জাকাত আদায়কারী [عَامِلٌ] -কে তার আমল [কাজ] অনুযায়ী বিনিময় প্রদান করা হবে। মুকাতাব গোলামকে তার আজাদের জন্য সাহায্য করা হবে। ঋণগ্রস্ত, যে ঋণের চেয়ে অধিক মালের মালিক নয়, যে আল্লাহর রাস্তায় আছে– সে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট ঐ ব্যক্তি যে গাজীদের থেকে পৃথক হয়ে [হারিয়ে] গেছে। সে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট ঐ ব্যক্তি যে হাজীদের থেকে পৃথক হয়ে [হারিয়ে] গেছে। মুসাফির, যার ঘরে মাল [সম্পদ] আছে, তবে তার সঙ্গে নেই। জাকাতদাতার জন্য অনুমতি আছে যে, তিনি ঐ সকল লোককে জাকাত দেবেন কিংবা একজন [কতক] -কে দেবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ الْمَصَارِفِ : مَصَارِف زَكَاة দ্বারা শুধু জাকাতের মাসরাফ উদ্দেশ্য নয়; বরং সমস্ত ওয়াজিব সদকা যেমন– সাদাকাতুল ফিতর, কাফফারা, মানত, কুরবানির পশুর চামড়ার মূল্য এবং রোজার ফিদিয়া ইত্যাদি। এ সমস্ত মাসরাফও এখানে উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ

আয়াতে উল্লিখিত ৮ প্রকারের মাসরাফ থেকে مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ প্রকারটি রহিত হয়ে গেছে। তারা কাফের। রাসূল ﷺ তাদেরকে সদকা দিতেন যেন তারা এর লোভে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের দেখাদেখি অন্যান্য লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করবে। এ পদ্ধতিতে অনেক লোক মুসলমান হয়েছেন। আবার কাউকে এ কারণে সদকা দিতেন যে, যেন খারাবি থেকে বাঁচা যায়। এভাবে তাদের অন্তরে ইসলামের মোহব্বত দৃঢ় হয়ে যায়।

যখন রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকাল হয় এবং সদকা বণ্টন করার সময় আসছে, তখন তারা নিজেদের অংশ নেওয়ার জন্য আসছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, রাসূল ﷺ তোমাদের চিত্তকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তোমাদেরকে সদকা দিয়েছেন। এখন আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে বিজয় দান করেছেন এবং তোমাদের থেকে ইসলামকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যদি ইসলামের উপর অবিচল থাক তবে ভালো। অন্যথায় তলোয়ারই আমাদের এবং তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবে। এ কথা শুনে তারা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট গিয়ে বলল, খলিফা কি আপনি, না ওমর? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আল্লাহ চাহে তো সে-ই খলিফা। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্তকে সঠিক মনে করলেন। এ সময় থেকেই مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ -এর শ্রেণীটি বাদ পড়ে যায়। এ ব্যাপারে আর কোনো সাহাবী মন্তব্য করেননি। এতে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা হয়ে গেছে। এখানে প্রশ্ন করা যাবে না যে, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা কিভাবে কুরআনের উক্ত বিধানটি রহিত হয়ে যায়? কেননা, এখানে কুরআনের বিধানকে রহিত করা হয়নি; বরং এর سَبَبْ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে مَوْقُوْفُ الْعَمَلِ হয়েছে।

مِسْكِيْن ও فَقِيْر-এর পরিচয় : مِسْكِيْن ও فَقِيْر -এর সংজ্ঞায় ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন– ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ফকির (فَقِيْر) ঐ ব্যক্তি যার সামান্য পরিমাণ জিনিস রয়েছে কি, তবে তা নেসাবের কম। কিংবা নেসাব পরিমাণ রয়েছে বটে, তবে তা বৃদ্ধিযোগ্য নয় এবং বিভিন্ন চাহিদার মধ্যে তা আবদ্ধ। পক্ষান্তরে مِسْكِيْن ঐ ব্যক্তি, যার নিকট কিছুই নেই। আহার্য দ্রব্য, পরিধানের বস্ত্র কিছুই নেই। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ফকিরের তুলনায় মিসকিনের অবস্থা গুরুতর।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত এর সম্পূর্ণ উল্টো। অর্থাৎ মিসকিনের তুলনায় ফকিরের অবস্থা গুরুতর। তাঁর দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ "হযরত খিজির (আ.) যে নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করেছিলেন, তা ছিল মিসকিনের।" এ আয়াতে নৌকার মালিকদেরকে মিসকিন বলা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মিসকিনের নিকট কিছু না কিছু থাকে। আর ফকিরের নিকট কিছুই থাকে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো– اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ "কিংবা দরিদ্র নিষ্পেষিত মিসকিনকে।" এর মর্মার্থ হলো, মিসকিন ক্ষুধার জ্বালায় স্বীয় পেট মাটিতে লাগায়। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মিসকিনের নিকট ক্ষুধা নিবারণের মতো খাবার থাকে না এবং শরীর ঢাকার মতো কাপড়ও থাকে না। দ্বিতীয় দলিল হলো–

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ . تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا .

আয়াতে এমন ব্যক্তিকে ফকির বলা হয়েছে, যাচনা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা যাকে ধনী মনে করে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন তার বাহ্যিক অবস্থা ভালো হবে। আর বাহ্যিক অবস্থা ভালো হওয়ার জন্য ফকিরের নিকট সামান্য কিছু হলেও থাকা দরকার।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ -এর উত্তর হলো, নৌকার মালিকদের আল্লাহ অনুগ্রহ ও দয়ার দৃষ্টিতে মিসকিন বলেছেন। যেমন দোয়ার মধ্যে একবার রাসূল ﷺ বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ .

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ মিসকিন হওয়ার জন্য দোয়া করেছেন। অন্য কথায় উত্তর হলো, ঐ নৌকা মিসকিনদের ছিল না; বরং তারা ভাড়া খাটত। কিংবা এটা ছিল তাদের ধার করা নৌকা।

قَوْلُهٗ وَعَامِلُ الصَّدَقَةِ : যে ওয়াজিব সদকা আদায় করে তার বেতন এ সদকা থেকেই দেওয়া হবে। তবে তাকে এ পরিমাণ দেওয়া হবে যেন তার আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া এবং যতদিন সে এ চাকরি করবে ততদিন যেন তার বিবি বাচ্চারা খেতে পারে।

قَوْلُهٗ وَهُوَ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ : উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, কিন্তু সওয়ারি ও অন্যান্য সামান না থাকার কারণে মুসলিম যোদ্ধাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে অক্ষম, তাকে مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ বলে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) مُنْقَطِعُ الْحَجَّاجِ -এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, যে ব্যক্তি হজের সফরে বের হয়েছে। তার বাড়িতে সম্পদও রয়েছে, কিন্তু হজের সফরে সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

মুজাহিদ জাকাত গ্রহণ করতে পারবে কিনা? দরিদ্র মুজাহিদ সর্মসম্মতিক্রমে জাকাত গ্রহণ করতে পারবে। তবে ধনী মুজাহিদ জাকাত গ্রহণ করতে পারবে কিনা? এ নিয়ে মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ধনী মুজাহিদ জাকাত গ্রহণ করতে পারে। দলিল হলো, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ اِلَّا لِخَمْسَةٍ اَلْغَازِيْ وَالْعَوَامِلِ عَلَيْهَا وَالْغَارِمِ وَ رَجُلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهٖ وَ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَاَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ اِلَيْهِ .

এ হাদীসে اَلْغَازِيْ বলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীকে বুঝানো হয়েছে। এতে ধনী ও গরিব মুজাহিদ পার্থক্য করা হয়নি। পক্ষান্তরে আহনাফ বলেন, ধনী মুজাহিদ জাকাত গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা, জাকাতের মাসরাফ [ক্ষেত্র] হলো দরিদ্র ব্যক্তি। যেমন হাদীসে এসেছে– خُذْهَا مِنْ اَغْنِيَاءِ هِمْ وَرُدَّهَا فِيْ فُقَرَاءِ هِمْ

এ হাদীস বুঝায় যে, ধনী মুজাহিদ জাকাত গ্রহণ করতে পারবে না এবং তাকে জাকাত দিলেও জাকাত আদায় হবে না।

মুসাফিরকে জাকাত প্রদান : মুসাফির দ্বারা ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যার নিজের আবাসস্থলে ধনসম্পদ রয়েছে, কিন্তু সফরকালীন তার হাতে কিছুই নেই। কাজেই সে যেন ঐ সময়ে ফকির-দরিদ্র। আর দরিদ্রের জন্য জাকাত গ্রহণ করা বৈধ। তবে মুসাফির প্রয়োজনের অতিরিক্ত জাকাত গ্রহণ করতে পারবে না। আলেমগণ বলেন, উত্তম হলো, সেখানে ঋণ নেওয়া এবং বাড়িতে ফিরে এসে তা পরিশোধ করে দেওয়া।

اِحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) اِذْ عِنْدَهُ لَابُدَّ اَنْ يَصْرِفَ اِلٰى جَمِيْعِ الْاَصْنَافِ فَيُعْطٰى مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ثَلٰثَةٌ لِاَنَّ اَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلٰثَةٌ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ اللَّامُ عَلَى الْجَمْعِ وَلَايُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْمَعْهُوْدِ وَلَا عَلَى الْاِسْتِغْرَاقِ يُرَادُ بِهَا الْجِنْسُ وَتَبْطُلُ الْجَمْعِيَّةُ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ فَهٰهُنَا لَا يُرَادُ الْعَهْدُ وَلَا الْاِسْتِغْرَاقُ لِاَنَّهٗ اِنْ اُرِيْدَ هٰذَا فَلَابُدَّ اَنْ يُرَادَ اَنَّ جَمِيْعَ الصَّدَقَاتِ الَّتِىْ فِى الدُّنْيَا لِجَمِيْعِ الْفُقَرَاءِ اِلٰى اٰخِرِهٖ فَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَحْرُمَ وَاحِدٌ وَلَيْسَ هٰذَا فِىْ وَسْعِ وَاحِدٍ عَلَا اَنَّهٗ اِنْ اُرِيْدَ جَمِيْعُ الصَّدَقَاتِ لِجَمِيْعِ هٰؤُلَاءِ لَا يَجِبُ اَنْ يُعْطٰى كُلُّ صَدَقَةٍ جَمِيْعَ الْاَصْنَافِ وَلَا اَنْ يُعْطٰى ثَلٰثَةٌ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ فَصَارَ كَقَوْلِهِ الصَّدَقَةُ لِلْفَقِيْرِ وَالْمِسْكِيْنِ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَلَا يُرَادُ اَنَّ الصَّدَقَةَ مَقْسُوْمَةٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ لِاَنَّهَا اِنْ قُسِمَتْ عَلَى الْاَصْنَافِ فَمَا اَصَابَ الْفَقِيْرُ لَا شَكَّ اَنَّهٗ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ الصَّدَقَةِ فَيَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ مَقْسُوْمًا اَيْضًا بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ ثُلُثُ مَالِىْ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ فَعُلِمَ اَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ الْمَصْرَفِ لَا الْقِسْمَةُ ـ

অনুবাদ : এখানে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত থেকে اِحْتِرَازٌ করেছেন। কেননা, তাঁর নিকট উল্লিখিত সকল ব্যক্তিদের দেওয়া জরুরি। সুতরাং প্রত্যেক শ্রেণীর তিন তিনজনকে দেওয়া হবে। কারণ جَمْع -এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো তিন। আর আমরা বলি, যখন جَمْع শব্দের শুরুতে اَلِفْ لَامْ আসে এবং একে مَعْهُوْد কিংবা اِسْتِغْرَاقْ -এর উপর প্রয়োগ করা না যায়, তখন এর দ্বারা جِنْس উদ্দেশ্য হয় এবং এর جَمْعِيَّتْ বাতিল হয়ে যায়। যেমনটি হয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ -এর মধ্যে। অতএব, জাকাতের আয়াতে عهد কিংবা اِسْتِغْرَاقْ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, যদি اِسْتِغْرَاقْ উদ্দেশ্য হয়, তবে আবশ্যক হয়ে যাবে যে, দুনিয়ার সমস্ত সদকা দুনিয়ার সমস্ত ফকির ও মিসকিনের জন্য। তখন এক ব্যক্তি বঞ্চিত হওয়াও জায়েজ হবে না। আর তা কারো সাধ্যে নেই। অন্যথায় যদি উদ্দেশ্য করা হয় যে, সমস্ত সদকা সমস্ত প্রকারের জন্য তবে তা আবশ্যক হয় না যে, সর্বপ্রকার সদকা সমস্ত প্রকারকে দেওয়া হবে এবং এটাও ওয়াজিব হয় না যে, প্রত্যেক প্রকার থেকে তিন তিনজনকে দেওয়া হবে। সুতরাং মাসরাফ (مَصْرَفْ) -এর আয়াতের ভাষ্য হবে– اَلصَّدَقَةُ لِلْفَقِيْرِ وَالْمِسْكِيْنِ الخ এটা উদ্দেশ্য করা হবে না যে, আয়াতে উল্লিখিত এ সকল ব্যক্তির মধ্যে সদকা বণ্টিত। কেননা, যদি কয়েক প্রকারের মাঝে সদকা বণ্টন করে দেওয়া হয়, তবে ফকির যা পেল, নিঃসন্দেহে এর উপর সদকাকে প্রয়োগ করা যাবে। সুতরাং তখন ওয়াজিব হয় তাও বণ্টিত হওয়া। [এভাবে تَسَلْسُلْ আবশ্যক হবে।] এর বিপরীত ঐ প্রক্রিয়া যে, যখন কোনো ব্যক্তি বলে, ফকির-মিসকিনদের জন্য আমার মালের এক-তৃতীয়াংশ। সুতরাং বুঝা গেল, মাসরাফ [ক্ষেত্র] -এর বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য; অংশের বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

لَا اِلٰى بِنَاءِ مَسْجِدٍ وَكَفَنِ مَيِّتٍ وَقَضَاءِ دَيْنِهٖ وَثَمَنِ مَا يُعْتَقُ لِاَنَّهٗ لَابُدَّ اَنْ يَمْلِكَ اَحَدُ الْمُسْتَحِقِّيْنَ فَلِهٰذَا قَالَ فِى الْمُخْتَصَرِ فَيَصْرِفُ اِلَى الْكُلِّ اَوِ الْبَعْضِ تَمْلِيْكًا وَلَا اِلٰى مَنْ بَيْنَهُمَا وِلَادَةٌ اَوْ زَوْجِيَّةٌ اَىْ لَا يُعْطِىْ اَصْلَهٗ وَاِنْ عَلَا وَفَرْعَهٗ وَاِنْ سَفَلَ وَلَا يُعْطِى الزَّوْجُ زَوْجَتَهٗ وَلَا الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا وَمَمْلُوْكَهٗ اَىْ مَمْلُوْكُ الْمُزَكِّىْ وَعَبْدٌ اَعْتَقَ بَعْضَهٗ وَغَنِىٌّ وَمَمْلُوْكُهٗ اَىْ مَمْلُوْكُ الْغَنِيِّ وَالْمُرَادُ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ اِذْ يَجُوْزُ اَنْ يُؤَدِّىَ اِلٰى مُكَاتَبِ الْغَنِيِّ وَطِفْلِهٖ اَىْ طِفْلِ الرَّجُلِ الْغَنِيِّ وَبَنِىْ هَاشِمٍ وَهُمْ اٰلُ عَلِيٍّ (رضـ) وَعَبَّاسٍ (رضـ) وَجَعْفَرٍ (رضـ) وَعَقِيْلٍ (رضـ) وَالْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رضـ) وَمَوَالِيْهِمْ اَىْ مُعْتِقِىْ هٰؤُلَاءِ وَلَا اِلٰى ذِمِّيٍّ وَجَازَ غَيْرُهَا اِلَيْهِ اَىْ جَازَ اَنْ يَصْرِفَ اِلَى الذِّمِّيِّ صَدَقَةً غَيْرَ الزَّكٰوةِ دُفِعَ اِلٰى مَنْ ظَنَّ اَنَّهٗ مَصْرَفٌ فَبَانَ اَنَّهٗ عَبْدُهٗ اَوْ مُكَاتَبُهٗ يُعِيْدُهَا وَاِنْ بَانَ غِنَاهُ اَوْ كُفْرُهٗ اَوْ اَنَّهٗ اَبُوْهُ اَوْ اِبْنُهٗ اَوْ هَاشِمِىٌّ لَمْ يُعِدْ خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَحُبِّبَ دَفْعُ مَا يُغْنِيْهِ عَنِ السُّؤَالِ لِيَوْمٍ وَكُرِهَ دَفْعُ مِئَتَىْ دِرْهَمٍ اِلٰى فَقِيْرٍ غَيْرِ مَدْيُوْنٍ وَنَقْلُهَا اِلٰى بَلَدٍ اٰخَرَ اِلَّا اِلٰى قَرِيْبِهٖ اَوْ اِلٰى اَحْوَجَ مِنْ اَهْلِ بَلَدِهٖ ـ

অনুবাদ : জাকাতের মাল মসজিদ নির্মাণ, মৃত ব্যক্তির কাফন [দাফন], স্বীয় ঋণ পরিশোধ এবং গোলাম আজাদ করার এর মূল্যের ক্ষেত্রে ব্যয় করা জায়েজ নেই। কেননা, হকদারদের থেকে কাউকে মালিক বানানো জরুরি। তাই মুখতাসারুল বিকায়ার মধ্যে বলেন, সকল হকদার কিংবা কতক হকদারকে মালিক বানিয়ে দেবে। ঐ ব্যক্তিকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই, যাদের মাঝে পিতৃত্ব কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ নিজের পিতাকে জাকাত দেওয়া যাবে না যদিও তা উপরের দিকে যায়। নিজের ছেলেমেয়েকে জাকাত দিতে পারবে না, যদিও তা নীচের দিকে যায়। স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে জাকাত দিতে পারবে না। জাকাতদাতার গোলামকে জাকাত দিতে পারবে না। ঐ গোলামকেও জাকাত দিতে পারবে না যার কিছু অংশ আজাদ হয়ে গেছে। ধনী ব্যক্তি কিংবা ধনী ব্যক্তির গোলামকেও জাকাত দেওয়া যাবে না। ধনী ব্যক্তির গোলাম দ্বারা غَيْرُ مُكَاتَبْ উদ্দেশ্য। কেননা, ধনী ব্যক্তির مُكَاتَبْ-কে জাকাত দেওয়া জায়েজ। ধনী ব্যক্তির নাবালেগ বাচ্চা এবং বনূ হাশিমকে জাকাত দেওয়া যাবে না। বনূ হাশিম হলেন- হযরত আলী, আব্বাস, জাফর, আকীল এবং হারিছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর সন্তানগণ। বনূ হাশিমের গোলামকেও জাকাত দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ বনূ হাশিমের আজাদকৃত গোলামকে। জিম্মিকে জাকাত দেওয়া যাবে না। জাকাত ব্যতীত অন্যান্য দান জিম্মিকে দেওয়া যাবে। অর্থাৎ জাকাত ব্যতীত অন্যান্য অনুদান জিম্মিকে দেওয়া জায়েজ। জাকাত ঐ ব্যক্তিকে দিয়েছে যাকে ধারণা করেছে যে, সে জাকাতের মাসরাফ, অতঃপর জাহির হলো সে তার গোলাম কিংবা মুকাতাব, তবে জাকাত দোহরাবে। আর যদি প্রকাশ পায় যে, সে ধনী কিংবা কাফের কিংবা জাকাতদাতার পিতা কিংবা ছেলে কিংবা হাশিমী, তবে জাকাত দোহরাবে না। এতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানৈক্য রয়েছে। একজনকে [অন্তত] এ পরিমাণ জাকাত দিতে হবে, যেন তার আর কারো কাছে চাইতে না হয়। ঋণমুক্ত ফকিরকে ২০০ দিরহাম দেওয়া মাকরূহ। অন্য শহরে জাকাত পাঠিয়ে দেওয়াও মাকরূহ। কিন্তু যদি আপন আত্মীয়স্বজন ভিন্ন শহরে থাকে কিংবা নিজের শহর থেকে অন্য শহরের লোকেরা অধিক মুখাপেক্ষী থাকে, তবে তাদেরকে জাকাত দেওয়া মাকরূহ নয়।

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

وَهِىَ مِنْ بُرٍّ اَوْ دَقِيْقِهٖ اَوْ سَوِيْقِهٖ اَوْ زَبِيْبٍ نِصْفُ صَاعٍ وَمِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ صَاعٌ مِمَّا يَسَعُ فِيْهِ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ مِنْ مَجٍّ اَوْ عَدَسٍ اَلصَّاعُ كَيْلٌ يَسَعُ فِيْهِ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ فَقُدِّرَ بِثَمَانِيَةِ اَرْطَالٍ مِنَ الْمَجِّ وَهُوَ الْمَاشُ اَوْ مِنَ الْعَدَسِ وَاِنَّمَا قُدِّرَ بِهِمَا لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ حَبَّاتِهِمَا عِظَمًا وَصِغَرًا وَتَخَلْخُلًا وَاكْتِنَازًا بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنَ الْحُبُوْبِ فَاِنَّ التَّفَاوُتَ فِيْهَا كَثِيْرٌ غَايَةَ الْكَثْرَةِ وَاِنِّىْ قَدْ وَزَنْتُ الْمَاشَ وَالْحِنْطَةَ الْجَيِّدَةَ الْمُكْتَنِزَةَ وَالشَّعِيْرَ وَجَعَلْتُهَا فِى الْمِكْيَالِ فَالْمَاشُ اَثْقَلُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالْحِنْطَةُ مِنَ الشَّعِيْرِ فَالْمِكْيَالُ الَّذِىْ يَمْلَأُ بِثَمَانِيَةِ اَرْطَالٍ مِنَ الْمَجِّ يَمْلَأُ بِاَقَلَّ مِنْ ثَمَانِيَةِ اَرْطَالٍ مِنَ الْحِنْطَةِ الْجَيِّدَةِ الْمُكْتَنِزَةِ فَالْاَحْوَطُ فِيْهِ اَنْ يُقَدَّرَ الصَّاعُ بِثَمَانِيَةِ اَرْطَالٍ مِنَ الْحِنْطَةِ الْجَيِّدَةِ لِاَنَّهٗ اِنْ قُدِّرَ بِالْحِنْطَةِ الْجَيِّدَةِ الْمُكْتَنِزَةِ فَكُلَّمَا يَجْعَلُ فِيْهِ ثَمَانِيَةَ اَرْطَالٍ مِنْ مِثْلِ تِلْكَ الْحِنْطَةِ يَمْلَأُ بِهَا وَاِنْ كَانَ يَمْلَأُ بِاَقَلَّ مِنْ تِلْكَ الْحِنْطَةِ اِذَا كَانَتِ الْحِنْطَةُ مُتَخَلْخِلَةً لٰكِنْ اَوْ قُدِّرَ بِالْمَجِّ يَكُوْنُ اَصْغَرُ مِنَ الْاَوَّلِ وَلَا يَسَعُ فِيْهِ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ مِنْ اَنْوَاعِ الْحِنْطَةِ فَيَكُوْنُ الْاَوَّلُ اَحْوَطَ ـ

অনুবাদ : সদকায়ে ফিতরের [পরিমাণ হলো] অর্ধ সা' গম কিংবা আটা কিংবা ছাতু কিংবা কিশমিশ। খেজুর কিংবা যব থেকে এক সা'। সা' হলো যার মধ্যে ৮ রিতিল মাষ কিংবা মসুর ডাল হয়। সা' একটি পরিমাপ যন্ত্র, যাতে ৮ রিতিল পরিমাণ ধরে। ৮ রিতিলের এ পরিমাণ মাষ কিংবা মসুর ডালের ৮ রিতিল ধর্তব্য। এ দুই জিনিসের দ্বারা এজন্য পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে যে, এ দুটির মাঝে ছোট বড়-এর ক্ষেত্রে পার্থক্য কম হয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য বিচির মাঝে অনেক পার্থক্য হয়ে থাকে। [শারেহ (র.) বলেন,] আমি মাষ, ভালো ওজনী গম এবং যবকে ওজন করেছি এবং একে মাপযন্ত্রে ফেলেছি। তখন [দেখেছি] মাষ গম থেকে বেশি ভারী এবং ওজনী, আর গম যব থেকে বেশি ভারী। অতএব, ঐ পরিমাপ যা ৮ রিতিল মাষ দ্বারা পূর্ণ হয়, তা ওজনী উত্তম গমের ৮ রিতিলের কমে পূর্ণ হয়। সুতরাং পরিমাপ যন্ত্র দ্বারা ওজন করার ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা হলো, গমের ৮ রিতিলের সঙ্গে সা'-এর অনুমান করা। কেননা, যদি ওজনী উত্তম গম দ্বারা সা'কে অনুমান করা হয়, তবে যখনই এ ধরনের ৮ রিতিল গম তাতে রাখা হবে তখন সা' পূর্ণ হয়ে যাবে। যদিও এর কমেও পূর্ণ হয়। যখন গম অন্তরায় সৃষ্টিকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি মাষের সাথে অনুমান করা হয়, তবে প্রথমটি থেকে ছোট হবে এবং তাতে এ ধরনের ৮ রিতিল গম ধরবে না। তাই প্রথমটিতে অধিক সতর্কতা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : সদকাতুল ফিতর এবং জাকাতের মাঝে সম্পর্ক হলো, উভয়টি আর্থিক ইবাদত। তবে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব, আর জাকাত ফরজ। এজন্য জাকাতের তুলনায় সদকাতুল ফিতর এক স্তর নিম্নে অবস্থিত।

قَوْلُهُ بَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ :

সদকাতুল ফিতরের বিশ্লেষণ : صَدَقَةٌ অর্থ– এমন দান যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা করা হয়। صَدَقَةٌ নামকরণের কারণ হলো, যেহেতু এর দ্বারা ছওয়াব অর্জনের প্রতি আকর্ষণের সত্যতা প্রকাশ পায়। যেমন– صِدَاقٌ [মহর] দ্বারা স্ত্রীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণের সত্যতা প্রকাশ পায়। فِطْر শব্দটি فِطْرَةٌ মূলধাতু থেকে গৃহীত। অর্থ– সত্তা, প্রকৃতি। কেননা, সদকা প্রতিটি সত্তার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়।

শরিয়তের পরিভাষায় সদকাতুল ফিতর এমন সদকাকে বলা হয়, যা ইবাদত হিসেবে এবং দয়াপরবশতার বন্ধন হিসেবে দেওয়া হয়। হাদীসের গ্রন্থগুলোতে সদকাতুল ফিতরকে বিভিন্ন পরিভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– ১. সদকাতুল ফিতর। ২. যাকাতুল ফিতর। ৩. যাকাতু রামাযান। ৪. যাকাতুস সাওম। ৫. সদকাতুস সাওম। ৬. সদকাতু রামাযান। ৭. সদকাতুর রুউস। ৮. যাকাতুল আবদান।

সদকাতুল ফিতরের বিধান প্রবর্তনের সময় : জাকাতের পূর্বে সদকাতুল ফিতরের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর হাদীস। হযরত কায়স ইবনে সা'দী ইবনে উবাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে–

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ تُنَزَّلَ الزَّكٰوةُ .

অর্থাৎ রাসূল ﷺ জাকাতের বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে সদকাতুল ফিতরের নির্দেশ দিয়েছেন।"

–[নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ]

সদকাতুল ফিতর প্রবর্তনের কারণ : সদকাতুল ফিতর প্রবর্তনের কারণ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে–

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ مَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكٰوةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ .

অর্থাৎ রাসূল ﷺ সদকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন, যা রোজাদারদেরকে অনর্থক ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্রকারী এবং মিসকিনদের জন্য খাদ্যসামগ্রী। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে তা আদায় করল, সে ক্ষেত্রে তা গ্রহণীয় সদকারূপে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নামাজের পরে আদায় করল সে ক্ষেত্রে তা সাধারণ সদকাগুলোর একটি বলে গণ্য হবে।

সদকাতুল ফিতরের আদায়কাল : সদকাতুল ফিতরের সম্পর্ক রোজার সাথে। রোজা পালন শেষে ঈদের খুশিতে নেসাবের মালিক মুসলমানের পরিবারের প্রতিটি সদস্য এমন কি ঈদের দিন সুবহে সাদেকের পূর্বে যে সন্তানটি হয়েছে তার পক্ষ থেকেও তা আদায় করতে হবে। ঈদের নামাজের পূর্বেই তা আদায় করতে হবে, যা পূর্বোল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝা যায়।

قَوْلُهُ وَهِيَ مِنْ بُرٍّ اَوْ دَقِيْقَةٍ الخ :

সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ : সদকাতুল ফিতর বিভিন্ন জিনিস দ্বারা আদায় করা যায়। যেমন– গম, আটা, ছাতু ও কিশমিশ দ্বারা যদি আদায় করা হয় তবে অর্ধ সা' আদায় করতে হবে। আর যদি খেজুর কিংবা যব দ্বারা আদায় করতে হয়, তবে এক সা'। এক সা' বরাবর ৮ রিতিল। আমাদের দেশে সা' এবং রিতিল দুটির একটিও পরিচিত নয়। আমাদের দেশে ইংরেজি কেজির হিসাব চলে। এক কেজি হয় ৮০ তোলায়। এ হিসাবে ৩৫ তোলায় হয় এক রিতিল। উক্ত হিসাব অনুযায়ী এক সা'তে প্রায় সাড়ে তিন কেজি হয়। একে সাড়ে তিন কেজি পূর্ণ ধরে এর অর্ধেক হিসাব করে পৌনে দুই কেজি হয়।

ثُمَّ اِعْلَمْ اَنَّ هٰذَا الصَّاعَ هُوَ الصَّاعُ الْعِرَاقِيُّ وَاَمَّا الْحِجَازِيُّ فَهُوَ خَمْسَةُ اَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ فَالْوَاجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفُ صَاعٍ مِنَ الْحِجَازِيِّ وَعِنْدَنَا نِصْفُ صَاعٍ مِنَ الْعِرَاقِيِّ وَهُوَ مَنْوَانِ عَلٰى اَنَّ الْمَنَّ اَرْبَعُوْنَ اَسْتَارًا وَالْاَسْتَارُ اَرْبَعَةُ مَثَاقِيْلَ وَنِصْفُ مِثْقَالٍ فَالْمَنُّ مِائَةٌ وَثَمَانُوْنَ مِثْقَالاً ـ

পরিচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর

অনুবাদ : অতঃপর জেনে রাখুন যে, গ্রন্থকার যে সা'-এর কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো ইরাকী সা'। আর হিজাযী সা' পাঁচ রিতিল এবং আরেক রিতিলের এক-তৃতীয়াংশ হয়। অতএব, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট হিজাযী সা'র অর্ধাংশ ওয়াজিব। আর আমাদের নিকট ইরাকী সা'র অর্ধাংশ ওয়াজিব। তা হলো দুই সের। অনুরূপ এক সেরে ৪০ আসতার এবং এক আসতার সারে চার মিছকাল। ১৮০ মিছকালে এক সের হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ هُوَ الصَّاعُ الْعِرَاقِيُّ الخ :

হিজাযী ও ইরাকী সা' : গ্রন্থকার যে সা' উল্লেখ করেছেন তা ইরাকী সা' যা ৮ রিতিল সমপরিমাণ, এটি ইরাক এবং এর আশপাশের এলাকায় প্রচলিত। পক্ষান্তরে হিজাযী সা' যা ৫ রিতিল এবং এক রিতিলের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ। এটি হিজায এলাকায় প্রচলিত।

পরিমাপে আরবি-ইংরেজি পরিভাষার মিল : মুফতি মুহাম্মদ শফী' (র.) স্বীয় গ্রন্থ جَوَاهِرُ الْفِقْهِ-এর মধ্যে আরবি أَوْزَانْ তথা دِيْنَارْ ـ دِرْهَمْ ـ مِثْقَالْ ـ صَاعْ ـ رِطْل ـ أَسْتَارْ ـ وَسَقْ ـ قِيْرَاطْ ـ أُوْقِيَةْ ইত্যাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। এর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ– এক দিরহাম বরাবর তিন মাশা এক রত্তি। এক দিনার বরাবর এক মিছকাল স্বর্ণ। এর শরয়ী ওজন সাড়ে চার মাশা। সুতরাং ১২ মাশায় এক তোলা এবং ৮ রত্তিতে এক মাশা। এক দিরহামে ৭০ যব। এক মিছকালে [ব' দিনারে] ১০০ যব এবং এক কেরাতে ৫ যব। ইরাকী সা'তে ৮ রিতিল। দিরহামের হিসাবে এক রিতিলে ১৩০ দিরহাম মিছকালের হিসাবে এক রিতিলে ৯০ মিছকাল। أَسْتَارْ-এর হিসাবে এক রিতিলে ২০ أَسْتَارْ, আর أَسْتَارْ দিরহামের হিসাবে সাড়ে ছয় দিরহাম। أَسْتَارْ মিছকালের হিসাবে সাড়ে চার মিছকাল। সা' দিরহামের হিসাবে এক হাজার ৪০ দিরহাম। সা' মিছকালের হিসাবে ৭২০ মিছকাল। সা' মুদ্দ-এর হিসাবে ৪ মুদ্দ এবং সা' أَسْتَارْ-এর হিসাবে ১১৮ أَسْتَارْ অতএব, এ হিসাবে চাঁদির নেসাব ২০০ দিরহাম অর্থাৎ ৫২ তোলা ৬ মাশাহ। স্বর্ণের নেসাব ২০ মিছকাল অর্থাৎ ৭ তোলা ৬ মাশা। এক সা'তে ৮০ তোলার কেজি হিসাবে মিছকালের [হিসাবে] দুইশত তোলা। সুতরাং অর্ধ সা'তে ১৩৫ তোলা হয়। একে ৮০ তোলার ইংরেজি কেজির সাথে তুলনা করা হবে। তবে দেড় কেজি তিন ছটাক কিংবা ১ কেজি ১১ ছটাক দেড় তোলা হয় এখানে সতর্কতাস্বরূপ পৌনে দুই কেজি হিসাব করা হবে। সর্বোপরি এক সা'তে যদিও সাড়ে তিন কেজির কিছু কম হয় কিন্তু সতর্কতাস্বরূপ সাড়ে তিন কেজিই হিসাব করা চাই।

وَمَنْوَانِ بُرًّا جَازَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رحـ) فَإِنَّ عِنْدَهُ لَابُدَّ اَنْ يُقَدَّرَ بِالْكَيْلِ وَاَدَاءُ الْبُرِّ فِيْ مَوْضِعٍ يُشْتَرٰى بِهِ الْاَشْيَاءُ اَحَبُّ وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَدَاءُ الدَّرَاهِمِ اَحَبُّ وَتَجِبُ عَلٰى حُرٍّ مُسْلِمٍ لَهُ نِصَابُ الزَّكٰوةِ وَاِنْ لَمْ يَنْمُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيْ اَوَّلِ كِتَابِ الزَّكٰوةِ اَنَّ النَّمَاءَ بِالْحَوْلِ مَعَ الثَّمَنِيَّةِ اَوِ السَّوْمِ اَوْ نِيَّةِ التِّجَارَةِ فَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابُ الزَّكٰوةِ اَيْ نِصَابٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَحَدِ الثَّمَنَيْنِ اَوِ السَّوَائِمِ اَوْ مَالِ التِّجَارَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَاِنْ لَمْ يَحِلَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَاِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ هٰذِهِ الْاَمْوَالِ كَدَارٍ لَا يَكُوْنُ لِلسُّكْنٰى وَلَا لِلتِّجَارَةِ وَقِيْمَتُهَا تَبْلُغُ النِّصَابَ تَجِبُ بِهَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ مَعَ اَنَّهُ لَا تَجِبُ بِهَا الزَّكٰوةُ وَبِهِ تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ فَهٰذَا النِّصَابُ نِصَابُ حِرْمَانِ الزَّكٰوةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ النَّمَاءُ بِخِلَافِ نِصَابِ وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ لِنَفْسِهِ وَطِفْلِهِ فَقِيْرًا وَخَادِمِهِ مِلْكًا وَلَوْ مُدَبَّرًا وَاُمَّ وَلَدٍ اَوْ كَافِرٍ اِلَّا لِزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الْكَبِيْرِ وَطِفْلِهِ الْغَنِيِّ بَلْ مِنْ مَالِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ لِلتِّجَارَةِ وَعَبْدٌ لَهُ اَبِقٌ اِلَّا بَعْدَ عَوْدِهِ وَلَا لِعَبْدٍ اَوْ عَبِيْدٍ بَيْنَ اِثْنَيْنِ عَلٰى اَحَدِهِمَا هٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَمَّا عِنْدَهُمَا فَتَجِبُ عَلَيْهِمَا وَلَوْ بِيْعَ بِخِيَارِ اَحَدِهِمَا فَعَلٰى مَنْ يَصِيْرُ لَهُ .

অনুবাদ : [সদকাতুল ফিতরে] দুই কেজি গম দেওয়া জায়েজ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। কারণ, তাঁর নিকট পরিমাপ দ্বারা নির্ধারণ করা ওয়াজিব। যেসব এলাকায় গম দ্বারা অন্যান্য জিনিসপত্র বেচাকেনা চলে সেসব এলাকায় গম দেওয়া মোস্তাহাব। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট দিরহাম দেওয়া মোস্তাহাব। সদকাতুল ফিতর ঐ আজাদ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যার নিকট জাকাতের নিসাব আছে। যদিও তা বর্ধমান না হয়। আমরা জাকাত অধ্যায়ের শুরুতে এ কথা উল্লেখ করেছি যে, মূল্যবান হওয়া, গবাধি পশু হওয়া কিংবা ব্যবসার নিয়তের সাথে সাথে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার কারণে নেসাবে [মাল] বৃদ্ধি পায়। তো যার কাছে জাকাতের নেসাব আছে অর্থাৎ এমন নেসাব যা মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। সুতরাং যদি ঐ নেসাব পণ্য কিংবা মূল্যের একটি হয় কিংবা গবাদি পশু হয় কিংবা ব্যবসার মাল হয়, তবে এর উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। যদিও এর উপর বছর অতিক্রম করেনি। আর যদি এ মাল ব্যতীত অন্য মাল থাকে। যেমন– এমন ঘর যা বসবাস কিংবা ব্যবসার জন্য নয় এবং এর মূল্য নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে, তবে এই ঘরের কারণে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। যদিও তার উপর জাকাত ওয়াজিব হয় না। এর কারণে জাকাত বাদ হয়ে যায়। এ নেসাব জাকাত বাদ হওয়ার নেসাব। এতে বর্ধন শর্ত নয়। পক্ষান্তরে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার নেসাবে [বর্ধন শর্ত]।

সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব নিজের পক্ষ থেকে, নিজের ছোট দরিদ্র বাচ্চার পক্ষ থেকে, নিজরে অধীনস্থ গোলামের পক্ষ থেকে, চাই সে মুদাব্বার হোক কিংবা উম্মে ওয়ালাদ হোক কিংবা কাফের। স্বীয় স্ত্রী, নিজের বড় ছেলে এবং নিজের ছোট ধনী ছেলের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করবে না; বরং তার মাল থেকে আদায় করবে। মুকাতাব গোলাম, ব্যবসায় অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম এবং পলাতক গোলামের পক্ষ থেকে জাকাত আদায় করবে না। তবে পলাতক গোলাম ফিরে আসার পর তার পক্ষ থেকে আদায় করবে। একজন কিংবা কয়েকজন গোলামের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করবে না যে, [যারা] দুই মালিকের মাঝে مُشْتَرَكْ দুজনের একজনের উপর। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট উভয় মাওলা [মনিব]-এর উপর ওয়াজিব। ক্রেতা ও বিক্রেতার একজন যদি خِيَارْ -এর সাথে বিক্রি করে, তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তা যার হবে তার উপর [সদকাতুল ফিতর] ওয়াজিব হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَطِفْلُهُ فَقِيْرًا : নাবালেগ বাচ্চাকে طِفْل বলে। যদি ঐ বাচ্চার পৃথক মাল না থাকে, তবে পিতা তার পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করে দেবে। কিন্তু যদি ঐ বাচ্চা নিজে মালের মালিক হয়, তবে তার মাল থেকে সদকা আদায় করে দেবে। যে বাচ্চা এখনো পেটে আছে, ভূমিষ্ঠ হয়নি, তবে তার পক্ষ থেকে কিছুই আদায় করতে হবে না। বালেগ বাচ্চা যদি পাগল হয়, বেহুঁশ হয়, কিংবা মাতাল হয়, তবে সেও শিশু বাচ্চার হুকুমে হবে। তার পক্ষ থেকেও সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে।

قَوْلُهُ لَا لِزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الْكَبِيْرِ : অর্থাৎ স্ত্রীর পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়; বরং স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে নিজে আদায় করবে। তবে শর্ত হলো, তার মাল থাকতে হবে। কারণ, তার উপর স্বামীর কর্তৃত্ব نَاقِصْ কেননা, زَوْجِيَّةْ [বৈবাহিক সম্পর্ক] ব্যতীত অন্য কোনো হক নেই। অনুরূপ عَاقِلْ بَالِغْ ছেলের পক্ষ থেকেও সদকাতুল ফিতর আদায় করা পিতার উপর ওয়াজিব নয়। কারণ, তার উপর পিতার وِلَايَتْ কম।

قَوْلُهُ وَلَوْ بِيْعَ بِخِيَارِ اَحَدِهِمَا والخ : অর্থাৎ যদি কোনো গোলামকে خِيَارُ الشَّرْطِ -এর ভিত্তিতে বিক্রি করা হয়, এমতাবস্থায় خِيَارُ الشَّرْطِ -এর مُدَّةْ -ও শেষ হয়নি, সদকাতুল ফিতর আদায়ের সময়ও এসে গেছে, তবে সদকাতুল ফিতর مَوْقُوْفْ থাকবে। অতঃপর ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্য থেকে যার মালিকানা মজবুত হবে, তার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে।

بِطُلُوْعِ فَجْرِ الْفِطْرِ فَتَجِبُ لِمَنْ اَسْلَمَ اَوْ وُلِدَ قَبْلَهُ اَىْ قَبْلَ الطُّلُوْعِ هٰذَا عِنْدَنَا وَاَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) فَتَجِبُ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ فَمَنْ اَسْلَمَ فِى اللَّيْلَةِ اَوْ وُلِدَ فِيْهَا لَا تَجِبُ عِنْدَهُ لَا لِمَنْ مَاتَ فِىْ لَيْلَةٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رحـ) فَاِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ اَدْرَكَ وَقْتَ الْغُرُوْبِ اَوْ اَسْلَمَ اَوْ وُلِدَ بَعْدَهُ اَىْ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَاِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا اِجْمَاعًا اَمَّا عِنْدَنَا فَلِاَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ وَقْتَ الطُّلُوْعِ وَاَمَّا عِنْدَهُ فَلِاَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ وَقْتَ الْغُرُوْبِ وَلَوْ قُدِّمَتْ جَازَ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ مُدَّةٍ وَمُدَّةٍ وَنُدِبَ تَعْجِيْلُهَا وَلَوْ اُخِّرَتْ لَا تَسْقُطُ .

অনুবাদ : [সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়] ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদেক উদিত হওয়ার সময় থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি সুবহে সাদেক উদিত হওয়ার পূর্বে মুসলমান হয়, কিংবা কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তবে তার পক্ষ থেকেও সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। এটি আমাদের নিকট। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট ঈদের রাতে সূর্যাস্ত থেকে ওয়াজিব হয়। সুতরাং যে ঈদের রাতে মুসলমান হয় কিংবা ভূমিষ্ঠ হয়, তার উপর সদকাতুল ফিতর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট ওয়াজিব নয়। ঐ ব্যক্তির জন্য সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয় যে ঈদের রাতে মরে গেছে। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা, সে সূর্যাস্তের সময় পেয়েছে, তাই তার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। কিংবা সুবহে সাদেকের পর মুসলমান হয়েছে কিংবা বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয়। আমাদের নিকট তো এজন্য নয় যে, সে সুবহে সাদেক উদয়ের সময় পায়নি। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট এজন্য নয় যে, সে সূর্যাস্তের সময় পায়নি। যদি সদকাতুল ফিতরকে মূল সময়ের উপর مُقَدَّمْ করা হয়, তবে تَقْدِيْم -এর সময়ের মাঝে কমবেশি করার পার্থক্য ব্যতীত তা জায়েজ। সদকাতুল ফিতর জলদি আদায় করা মোস্তাহাব। যদি বিলম্ব করা হয়, তবে তা রহিত হবে না।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

١. مَا قَدْرُ نِصَابِ وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ؟ بَيِّنْ بِحَيْثُ يَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا .

٢. قَوْلُهُ "يَضُمُّ الْمُسْتَفَادُ وَسْطَ الْحَوْلِ فِىْ حُكْمِهِ اِلَى نِصَابٍ مِنْ جِنْسِهِ" . اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ حَقَّ الْاِيْضَاحِ .

٣. قَوْلُهُ "وَهِىَ (اَىْ اَلزَّكٰوةُ) لَا تَجِبُ اِلَّا فِىْ نِصَابٍ حَوْلِىٍّ فَاضِلٍ عَنْ حَاجَتِهِ" . مَا الْمُرَادُ بِالنِّصَابِ وَمَا مَعْنَى النَّمَاءِ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ وَمَا مَعْنَى الْحَوْلِ وَمَا الْحَاجَةُ الْاَصْلِيَّةُ؟

٤. حَرِّرِ الْفَرْقَ بَيْنَ نِصَابِىْ وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ وَحِرْمَانِ الزَّكٰوةِ ثُمَّ اكْتُبْ مَصَارِفَ الزَّكٰوةِ۔

٥. اُكْتُبْ حُكْمَ رَفْعِ الزَّكٰوةِ اِلٰى مَنْ ظَنَّ اَنَّهٗ مَصْرِفٌ فَبَانَ اَنَّهٗ عَبْدٌ اَوْ مُكَاتِبٌ اَوْ بَانَ غِنَاهُ اَوْ كُفْرُهٗ اَوْ اَنَّهٗ اَبُوْهُ اَوْ اِبْنُهٗ اَوْ هَاشِمِىٌّ۔

٦. مَا مَعْنَى الصَّاعِ وَمَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ فِىْ قَدْرِ مَا يَسَعُ فِيْهِ؟

٧. مَا مَعْنَى الْعَوَامِلِ وَالْعَلُوْفَةِ وَالْحَوَامِلِ وَالْفَصِيْلِ وَالْعَجِيْلِ وَمَا حُكْمُهَا ؟

٨. بِنْتُ الْمَخَاضِ وَالْحِقَّة وَالتَّبِيْعَة وَالْمُسِنّ مَا هِىَ؟

٩. مَا مَعْنَى السَّائِمَةِ وَالْحِقَّةِ وَالْجِذْعَةِ وَالتَّبِيْعَةِ؟

١٠. مَا مَعْنَى الْحِقَّةِ وَ بِنْتِ الْمَخَاضِ؟

١١. مَا مَعْنَى الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ وَالْكَنْزِ؟

كِتَابُ الصَّوْمِ

هُوَ تَرْكُ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْوَطْيِ مِنَ الصُّبْحِ اِلَى الْغُرُوْبِ مَعَ النِّيَّةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ اَدَاءً وَقَضَاءً وَصَوْمُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَاجِبٌ وَغَيْرُهُمَا نَفْلٌ ذُكِرَ فِى الْهِدَايَةِ اَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ وَعَلٰى فَرْضِيَّتِهٖ اِنْعَقَدَ الْاِجْمَاعُ وَلِهٰذَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهٗ وَالْمَنْذُوْرُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَقَدْ قِيْلَ فِى الْحَوَاشِىْ اَنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ عَامٌّ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ وَهُوَ النَّذْرُ بِالْمَعْصِيَةِ وَالطَّهَارَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَلَا يَكُوْنُ قَطْعِيًّا فَيَكُوْنُ وَاجِبًا ـ

অধ্যায় : রোজা

অনুবাদ : [শরিয়তের পরিভাষায়] রোজা বলা হয় "সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজার নিয়তে খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা থেকে বিরত থাকাকে।" রমজান মাসের রোজা প্রত্যেক মুকাল্লাফ মুসলমানের উপর اَدَاءً এবং قَضَاءً ফরজ। মানত ও কাফফারার রোজা ওয়াজিব। এ দুটি ব্যতীত অন্যান্য রোজা নফল। হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, রমজানের রোজা ফরজ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ "তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে।" রোজার فَرْضِيَّةٌ-এর উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তাই রোজার অস্বীকারকারী কাফের। মানতের রোজা ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ "তারা যেন তাদের মানত পূর্ণ করে।" হিদায়া গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ আয়াতটি عَامٌّ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ ঐ খাস করা কিছু মানত হচ্ছে– গুনাহের মানত, পবিত্রতা, রোগীর সেবা এবং জানাজা নামাজের মানত। সুতরাং এসব মানত আবশ্যকীয় নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : গ্রন্থকার জাকাতের আহকাম বর্ণনা শেষে ইসলামের চতুর্থ রোকন সাওমের আলোচনা শুরু করেছেন। সাওম শারীরিক ইবাদত, নামাজও শারীরিক ইবাদত। তাই সংগত ছিল নামাজ অধ্যায়ের পর সাওমের আলোচনা করা। কিন্তু সাওমের আলোচনাকে শেষে এনে মধ্যখানে জাকাতের আলোচনা করেছেন কুরআনের উপর আমল করার জন্য। কেননা, কুরআনের অনেক স্থানে সালাতের সঙ্গে জাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ হাদীসেও সাওমকে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে– بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ عَنْ بَيْتِ اللّٰهِ ـ
উক্ত হাদীসের উপর আমল করত সাওমকে জাকাতের পর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ هُوَ تَرْكُ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ الخ :

রোজার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা : صَوْم-এর আভিধানিক অর্থ– اَلْاِمْسَاكُ الْمُطْلَقُ শরিয়তের পরিভাষায় صَوْم বলা হয়– هُوَ تَرْكُ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْوَطْيِ مِنَ الصُّبْحِ اِلَى الْغُرُوْبِ مَعَ النِّيَّةِ

অর্থাৎ "রোজার নিয়তে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা থেকে বিরত থাকাকে"।

রোজা ফরজ হওয়ার সময়কাল : রমজানের রোজা হিজরতের দ্বিতীয় বছর শাবান মাসে ফরজ হয়েছে। অর্থাৎ হিজরতের ১৮ মাস পর শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের পর রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছে।

রমজানের রোজার পূর্বে কোনো রোজা ফরজ ছিল কিনা? রমজানের পূর্বে কোনো রোজা ফরজ ছিল কিনা, এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আহনাফ বলেন, রমজানের রোজার পূর্বে আশুরা ও আইয়ামে বীয-এর রোজা ফরজ ছিল। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, রমজানের পূর্বে কোনো রোজা ফরজ ছিল না; বরং আশুরা ইত্যাদির রোজা পূর্বেও সুন্নত ছিল এবং এখনো সুন্নত আছে। আহনাফের দলিল হলো–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهٖ اَنَّ اَسْلَمَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هٰذَا قَالُوْا لَا قَالَ فَاَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِيْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ.

অর্থাৎ "আব্দুর রহমান ইবনে মাসলামাহ তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আসলাম গোত্রের লোকেরা রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসেছিল। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এ দিনের অর্থাৎ আশুরার দিনের রোজা রেখেছ? তারা বলল, না। তিনি বললেন, যে পরিমাণ দিন অবশিষ্ট আছে তা পূর্ণ কর। অতঃপর তার কাজা আদায় কর। ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন, এর দ্বারা আশুরার দিন উদ্দেশ্য।" –[আবূ দাউদ শরীফ]

উক্ত হাদীসে আশুরার রোজাকে কাজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর কাজা ফরজ এবং ওয়াজিব রোজারই হয়ে থাকে। সুতরাং বুঝা গেল, রমজানের রোজার পূর্বে আশুরার রোজা ফরজ ছিল। আইয়ামে বীয সম্পর্কে হাদীস হলো, ইবনে মালিহান কায়সী তাঁর পিতা কাতাদা সূত্রে বর্ণনা করেন–

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا اَنْ نَصُوْمَ الْبِيْضَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وَاَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ قَالَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْاَةِ الدَّهْرِ.

অর্থাৎ "ইবনে মালিহান-এর পিতা কাতাদা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন আইয়ামে বীয-এর রোজা রাখতে অর্থাৎ ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজা রাখতে। তিনি বলতেন, এটি সবসময় রোজা রাখার তুল্য।" –[আবূ দাউদ শরীফ]

রোজার فَرْضِيَّةٌ-এর প্রমাণ : রোজার فَرْضِيَّةٌ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

١. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

٢. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

١. بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا.

٢. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : اَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَحُجُّوْا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَاَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا اَنْفُسُكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.

সকল উম্মতে মুহাম্মদী রোজার فَرْضِيَّةٌ-এর উপর একমত। একে অস্বীকারকারী কাফের।

যুক্তির নিরিখে রোজার فَرْضِيَّةٌ এভাবে প্রমাণিত হয় যে, রোজা হলো তাকওয়ার মাধ্যম। কেননা, রোজা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হালাল জিনিস থেকেও বিরত থাকার দ্বারা নফসকে নত করে দেয়। –[বাদায়িউস সানায়ে' খ. ২, পৃ. ২০৯-২১০]

قَوْلُهٗ وَصَوْمُ رَمَضَانَ فَرْضٌ الخ :

রোজার প্রকারভেদ : রোজা মোট তিন প্রকার– ১. ফরজ রোজা। যেমন– রমজানের রোজা। যদি তা কাজা হয়ে যায়, তবে তার উপর তা কাজা করাও ফরজ। ২. ওয়াজিব রোজা। যেমন– মানত ও কাফফারার রোজা। যেমন– কোনো ব্যক্তি মানত করল, যদি আমার এ কাজটি হয়ে যায়, তবে আমি তিনটি রোজা রাখব। তা আবার দু প্রকার– ১. নির্দিষ্ট ও ২. অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো, মানতের রোজা রাখার যদি দিনও নির্ধারণ করে তবে তা নির্দিষ্ট মানত। পক্ষান্তরে যদি দিন নির্ধারণ না করা হয় তা হবে অনির্দিষ্ট মানত। কাফফারার রোজা যেমন– কসমের কাফফারা, যিহারের কাফফারা, হজে জেনায়েত ইত্যাদির কাফফারা। ৩. নফল রোজা। যেমন– আইয়ামে বীয, আশুরা ইত্যাদির রোজা।

اَقُوْلُ الْمَنْذُوْرُ إِذَا كَانَ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُوْدَةِ كَالصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِ ذٰلِكَ فَلُزُوْمُهُ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ فَيَكُوْنُ قَطْعِيُّ الثُّبُوْتِ وَإِنْ كَانَ سَنَدُ الْإِجْمَاعِ ظَنِّيًّا وَهُوَ الْعَامُّ الْمَخْصُوْصُ الْبَعْضُ فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَّكُوْنَ فَرْضًا وَكَذَا صَوْمُ الْكَفَّارَةِ لِاَنَّ ثُبُوْتَهُ بِنَصٍّ قَطْعِيٍّ مُؤَيَّدٌ بِالْإِجْمَاعِ فَقَوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ اَنَّ الْمَنْذُوْرَ وَاجِبٌ يُمْكِنُ اَنَّهُ اَرَادَ بِالْوَاجِبِ الْفَرْضَ كَمَا قَالَ فِيْ اِفْتِتَاحِ كِتَابِ الصَّوْمِ اَلصَّوْمُ ضَرْبَانِ وَاجِبٌ وَنَفْلٌ ـ

অনুবাদ : তাই ওয়াজিব হলো, [শারেহ (র.) বলেন,] আমি বলি মানতকৃত বিষয় যখন عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ থেকে হবে যেমন– নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি তখন এর আবশ্যকতা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। তাই এটি قَطْعِيُّ الثُّبُوْتِ হবে। যদিও ইজমার সনদ ظَنِّيْ হয়। তা হলো عَامٌ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ তাই ফরজ [আবশ্যক] হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অনুরূপ কাফফারার রোজা। কেননা, তা نَصّ قَطْعِيْ দ্বারা প্রমাণিত, যা ইজমা দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে। অতএব, হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন– মানত [পূর্ণ করা] ওয়াজিব। সম্ভাবনা আছে যে, তিনি ওয়াজিব দ্বারা ফরজ উদ্দেশ্য করেছেন। যেরূপ তিনি সাওম অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছেন। সাওম দু প্রকার– ১. ওয়াজিব ২. নফল।

وَيَصِحُّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ اِلَى الضَّحْوَةِ الْكُبْرٰى لَا عِنْدَهَا فِى الْاَصَحِّ اِعْلَمْ اَنَّ النَّهَارَ الشَّرْعِىَّ مِنَ الصُّبْحِ اِلَى الْغُرُوْبِ فَالْمُرَادُ بِالضَّحْوَةِ الْكُبْرٰى مُنْتَصِفُهُ ثُمَّ لَابُدَّ اَنْ تَكُوْنَ النِّيَّةُ مَوْجُوْدَةً فِىْ اَكْثَرِ النَّهَارِ فَيُشْتَرَطُ اَنْ تَكُوْنَ قَبْلَ الضَّحْوَةِ الْكُبْرٰى وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ بِنِيَّةٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ اَىْ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ الشَّرْعِىِّ وَفِىْ مُخْتَصَرِ الْقُدُوْرِىِّ اِلَى الزَّوَالِ وَالْاَوَّلُ اَصَحُّ ـ

অনুবাদ : রমজানের রোজা এবং নির্দিষ্ট মানতের রোজার নিয়ত রাত থেকে বড় চাশত পর্যন্ত। বিশুদ্ধ মতে, হুবহু বড় চাশত নয়। জেনে রেখ যে, শরিয়তে দিন বলা হয়– সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে। সুতরাং اَلضَّحْوَةُ الْكُبْرٰى দ্বারা ঐ সময়ের অর্ধাংশ উদ্দেশ্য। অতঃপর দিনের অধিকাংশ সময়ে নিয়ত পাওয়া যাওয়া জরুরি, তাই اَلضَّحْوَةُ الْكُبْرٰى-এর পূর্বেই নিয়ত পাওয়া যাওয়া শর্ত। জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এমন নিয়তের সাথে [রোজা রাখ] যা শরিয়তের অর্ধ দিবসের পূর্বে হয়। মুখতাসারে কুদূরীতে উল্লেখ আছে যে, যাওয়াল (زَوَالْ) পর্যন্ত নিয়ত করবে, কিন্তু প্রথম অভিমতটি অধিক বিশুদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَصِحُّ صَوْمُ رَمَضَانَ الخ :

রোজার নিয়ত করার সময় : ফরজ ও নির্দিষ্ট মানতের রোজার নিয়ত করার সময় সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। আহনাফ বলেন, ফরজ রোজা ও নির্দিষ্ট মানতের রোজার নিয়ত রাত্র থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত করতে পারবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সুবহে সাদেকের পূর্বেই নিয়ত করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি রাতে রোজার নিয়ম করেনি, তার রোজাই হলো না।"

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যৌক্তিক দলিল হলো– যদি রাতে নিয়ত না করা হয়, তবে সুবহে সাদেকের পর زَوَالْ-এর পূর্বে যখনই নিয়ত করা হোক, নিয়ত করার আগের দিনের অংশটুকু নিয়ত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, যার দ্বারা রোজা مُتَجَزِّى হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ রোজা تَجَزِّىْ-কে কবুল করে না। পক্ষান্তরে নফল রোজা تَجَزِّىْ-কে কবুল করে, তাই নফল রোজার ক্ষেত্রে দ্বিপ্রহরের পূর্বে নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।

আহনাফের দলিল হলো, হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস–

اِنَّهُ ﷺ اَمَرَ رَجُلًا مِنْ اَسْلَمَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ اَنَّ مَنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ فَاِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ ـ

অর্থাৎ "রাসূল ﷺ আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছেন, সে যেন লোকদের মাঝে এই মর্মে ঘোষণা করে যে, যে ব্যক্তি কিছু পানাহার করেছে, সে যেন অবশিষ্ট দিন রোজা রাখে। আর যে ব্যক্তি পানাহার করেনি সেও যেন রোজা রাখে। অর্থাৎ রোজা রাখার নিয়ত করে। কেননা, এ দিনটি হলো আশুরার দিন।" –[বুখারী ও মুসলিম]

এ ঘটনাটি তখনকার যখন আশুরার রোজা ফরজ ছিল এবং রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার দ্বারা তা এদিকে চলে এসেছে। অর্থাৎ যেহেতু সে রোজাটি ছিল ফরজ রোজা, আর তখন রাসূল ﷺ দিনে এর নিয়ত করার নির্দেশ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, রমজানের রোজার নিয়তও দিনে করা যাবে। অন্য এক হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় এভাবে যে–

جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهِ يَعْنِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ اَذِّنْ فِى النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا ـ (رَوَاهُ اَصْحَابُ السُّنَنِ)

তবে এ হাদীসটি আমাদের পক্ষে তখনই দলিল হবে যখন প্রমাণিত হবে যে, ঘটনাটি সুবহে সাদেকের পরে ঘটেছে।

উল্লেখ্য যে, যেহেতু দিনের নিয়তবিশিষ্ট অংশ অধিক হওয়া জরুরি, তাই দ্বিপ্রহরের পূর্বে অবশ্যই নিয়ত করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর হাদীসের উত্তর হলো, এটি ফজিলতের উপর প্রযোজ্য। তাঁর যৌক্তিক দলিলের উত্তর হলো, এতে দিন مُتَجَزِّى হওয়া আবশ্যক হয় না; বরং সে যখন নিয়ত করে এবং নিয়তবিশিষ্ট অংশটি অধিক হয়, তখন তার বিগত সময়ের ইমসাক [বিরত থাকা]-ও রোজা ধরে নেওয়া হবে

وَبِنِيَّةِ مُطْلَقَةٍ اَوْ بِنِيَّةِ نَفْلٍ وَاَدَاءُ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ اٰخَرَ اِلَّا فِىْ مَرَضٍ اَوْ سَفَرٍ بَلْ عَمَّا نَوٰى وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ عَنْ وَاجِبٍ اٰخَرَ نَوَاهُ اَىْ اَدَاءُ رَمَضَانَ يَصِحُّ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ اٰخَرَ اِلَّا فِىْ الْمَرَضِ اَوِ السَّفَرِ فَاِنَّهُ يَقَعُ عَنْ ذٰلِكَ الْوَاجِبِ وَاِذَا نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَنَوٰى فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَاجِبًا اٰخَرَ يَقَعُ عَنْ ذٰلِكَ الْوَاجِبِ سَوَاءٌ كَانَ مُسَافِرًا اَوْ مُقِيْمًا صَحِيْحًا اَوْ مَرِيْضًا وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ هٰذَا وَيَصِحُّ اَدَاءُ رَمَضَانَ بِنِيَّةٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ وَبِنِيَّةِ نَفْلٍ وَبِنِيَّةِ مُطْلَقَةٍ وَبِنِيَّةِ وَاجِبٍ اٰخَرَ اِلَّا فِىْ سَفَرٍ اَوْ مَرَضٍ وَكَذَا النَّفْلُ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ اِلَّا فِىْ الْاَخِيْرِ اَىْ حُكْمُ النَّفْلِ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ حُكْمُ اَدَاءِ رَمَضَانَ اِلَّا فِىْ الْاَخِيْرِ وَهُوَ الْوَاجِبُ الْاٰخَرُ

وَالنَّفْلُ بِنِيَّتِهِ وَبِنِيَّةِ مُطْلَقَةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ وَشُرِطَ لِلْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ التَّبْيِيْتُ وَالتَّعْيِيْنُ اَلْمُرَادُ بِالتَّبْيِيْتِ اَنْ يَنْوِىَ مِنَ اللَّيْلِ .

অনুবাদ : মুতলাক রোজার নিয়তে কিংবা নফল রোজার নিয়তে কিংবা রমজানের আদায় অন্য ওয়াজিব রোজার নিয়তে [রমজানের রোজা রাখা সহীহ]। কিন্তু অসুস্থতা কিংবা সফরকালে [ঐ সব নিয়তে রমজানের রোজা সহীহ নয়]; বরং যে রোজার নিয়ত করবে তা-ই আদায় হবে। নির্দিষ্ট মানতের রোজা অন্য ওয়াজিব রোজার নিয়তে সহীহ হবে। অর্থাৎ রমজানের আদা রোজা অন্য ওয়াজিব রোজার নিয়ত করার দ্বারা সহীহ হয়। কিন্তু অসুস্থতা কিংবা সফরকালে সহীহ হয় না। কেননা, তখন ঐ ওয়াজিব থেকেই হবে, যার নিয়ত করবে। যদি কেউ নির্দিষ্ট দিনে রোজা রাখার মানত করে এবং সেদিন অন্য ওয়াজিব রোজার নিয়ত করে, তবে দ্বিতীয় ওয়াজিব রোজাটিই আদায় হবে। চাই সেই মানতকারী মুসাফির হোক কিংবা মুকীম হোক, সুস্থ হোক কিংবা অসুস্থ হোক। মুখতাসারুল বিকায়ার ইবারত হলো– وَيَصِحُّ اَدَاءُ رَمَضَانَ الخ অর্থাৎ রমজানের আদা রোজা শরিয়তের অর্ধ দিবসের পূর্বে নিয়ত করার দ্বারা সহীহ হয়। নফল রোজা, মুতলাক রোজা কিংবা অন্য ওয়াজিব রোজার নিয়তেও [রমজানের রোজা] সহীহ, কিন্তু সফর কিংবা অসুস্থতার কালে। অনুরূপ নফল এবং নির্দিষ্ট মানতের রোজা। কিন্তু নফল এবং নির্দিষ্ট মানতের রোজার হুকুম আদা রোজার হুকুমের মতো। কিন্তু নির্দিষ্ট মানতের রোজার ক্ষেত্রে ওয়াজিব রোজার নিয়ত করার দ্বারা অন্য ওয়াজিব রোজাটিই আদায় হয়। দ্বিপ্রহরের (زَوَالْ) পূর্বে নফল রোজা নফল রোজার কিংবা মুতলাক রোজার নিয়ত করার দ্বারা সহীহ। দ্বিপ্রহরের পরে নয়। কাজা, কাফফারা এবং মুতলাক মানতের রোজার জন্য শর্ত হলো, রাতে নিয়ত করা এবং নির্ধারণ করা। تَبْيِيْت দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাতে নিয়ত করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَبِنِيَّةِ مُطْلَقَةٍ اَوْ بِنِيَّةِ الخ : রমজানের আদা রোজাকে যদি মুতলাক রোজা, নফল রোজা কিংবা অন্য কোনো ওয়াজিব রোজার নিয়ত করে রাখে তবে রমজানের রোজাই পালিত হবে। তবে যদি সফর কিংবা অসুস্থতার কালে অন্য রোজার নিয়ত করে, তবে ঐ রোজাই পালিত হবে, সে যেই রোজার নিয়ত করেছে। কেননা, রমজানে মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোজা না রাখার অধিকার আছে। পক্ষান্তরে যদি نَذْرِ مُعَيَّنْ-এর ক্ষেত্রে অন্য কোনো ওয়াজিব রোজার নিয়ত করে, তবে যে রোজার নিয়ত করবে তা-ই আদায় হবে। কেননা, এখানে উভয়টিই ওয়াজিব। আর ওয়াজিবকে ওয়াজিব দ্বারা পরিবর্তন করা যায়।

قَوْلُهُ وَالنَّفْلُ بِنِيَّتِهِ وَبِنِيَّةِ الخ : নফল রোজার নিয়ত দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত করতে পারবে। কাজা, কাফফারা ও মুতলাক মানতের রোজার নিয়ত রাতে করতে হবে এবং রাতেই একে নির্ধারণ করতে হবে। কেননা, যেদিন উক্ত রোজাগুলো রাখছে, সেদিনটি আল্লাহর পক্ষ থকে নির্ধারিত নয় এবং বান্দার পক্ষ থেকেও নির্ধারিত নয়। তাই সেদিন সে যে কোনো রোজা রাখতে পারে। ফলত একে রাতেই নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে হবে।

وَاِنْ غُمَّ لَيْلَةُ الشَّكِّ اَىْ لَيْلَةُ الثَّلٰثِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ لَا يُصَامُ اِلَّا نَفْلًا وَلَوْ صَامَهُ لِوَاجِبٍ اٰخَرَ كُرِهَ وَيَقَعُ عَنْهُ فِى الْاَصَحِّ اَىْ يَقَعُ عَنِ الْوَاجِبِ الْاٰخَرِ فِى الْاَصَحِّ وَقِيْلَ يَقَعُ تَطَوُّعًا لِاَنَّ غَيْرَهُ مَنْهِىٌّ عَنْهُ فَلَا يَتَأَدّٰى بِهِ الْوَاجِبُ اِنْ لَمْ يَظْهَرْ رَمَضَانِيَّتُه وَاِلَّا فَعَنْهُ اَىْ عَنْ رَمَضَانَ فَاِنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ يَتَأَدّٰى بِنِيَّةِ وَاجِبٍ اٰخَرَ وَالتَّنَفُّلُ فِيْهِ اَىْ فِىْ يَوْمِ الشَّكِّ اَحَبُّ اِجْمَاعًا اِنْ وَافَقَ صَوْمًا يَعْتَادُهُ وَاِلَّا يَصُوْمُ الْخَوَاصُّ كَالْمُفْتِىْ وَالْقَاضِىْ وَيُفْطِرُ غَيْرُهُمْ بَعْدَ الزَّوَالِ وَلَا صَوْمَ لَوْ نَوٰى اِنْ كَانَ الْغَدُ مِنْ رَمَضَانَ فَاَنَا صَائِمٌ عَنْهُ وَاِلَّا فَلَا وَكُرِهَ لَوْ نَوٰى اِنْ كَانَ الْغَدُ مِنْ رَمَضَانَ فَاَنَا صَائِمٌ عَنْهُ وَاِلَّا فَعَنْ وَاجِبٍ اٰخَرَ وَاِلَّا فَعَنْ نَفْلٍ اَىْ لَوْ نَوٰى اِنْ كَانَ الْغَدُ مِنْ رَمَضَانَ فَاَنَا صَائِمٌ عَنْهُ وَاِلَّا فَعَنْ نَفْلٍ فَاِنْ ظَهَرَ رَمَضَانِيَّتُهُ كَانَ عَنْهُ لِوُجُوْدِ مُطْلَقِ النِّيَّةِ وَاِلَّا فَنَفْلٌ فِيْهِمَا اَىْ فِيْمَا قَالَ وَاِلَّا فَعَنْ وَاجِبٍ اٰخَرَ وَفِيْمَا قَالَ وَاِلَّا فَعَنْ نَفْلٍ اَمَّا فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى فَلِاَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ فِى الْوَاجِبِ الْاٰخَرِ فَلَا يَقَعُ عَنْهُ فَبَقِىَ مُطْلَقُ النِّيَّةِ فَيَقَعُ عَنِ النَّفْلِ وَفِى الثَّانِيَةِ لِوُجُوْدِ مُطْلَقِ النِّيَّةِ اَيْضًا ـ

অনুবাদ : যদি সংশয়ের রাত আবরণযুক্ত হয়– অর্থাৎ শাবানের ত্রিশতম রাত তবে রোজা রাখতে হবে না। হ্যাঁ, নফল রোজা রাখতে পারে। যদি সেদিন অন্য কোনো ওয়াজিব রোজা রাখে তবে তা মাকরূহ হবে এবং বিশুদ্ধ অভিমত হলো, সেই ওয়াজিব রোজাই পালিত হবে। কেউ কেউ বলেন, সেটি নফল হিসেবে পালিত হবে। কেননা, অন্য রোজা সেদিন নিষিদ্ধ। অতএব, এর দ্বারা ওয়াজিব আদায় হবে না, যদি সেদিনের রমযানিয়্যাত [রমজান হওয়া] প্রকাশ না পায়। অন্যথায় রমজানের রোজাই আদায় হবে। কেননা, রমজানের রোজা অন্য ওয়াজিব রোজার নিয়তেও আদায় হয়। সংশয় দিবসে যদি নফল রোজা রাখা কারো অভ্যাসের অনুযায়ী হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা মোস্তাহাব। অন্যথায় বিশেষ ব্যক্তিবর্গ রোজা রাখবে। যেমন– মুফতি ও বিচারকগণ। এবং ঐ সকল বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত যারা রোজা রাখছে, তারা দ্বিপ্রহরের পর রোজা ভেঙ্গে ফেলবে। যদি এভাবে নিয়ত করে যে, যদি আগামীকাল রমজান হয়, তবে এ রমজানের রোজাই রাখছি; অন্যথায় নয়, তাহলে তার এ রোজা হবে না। আর যদি এভাবে নিয়ত করে যে, যদি আগামীকাল রমজান হয়, তবে সেই রমজানের রোজা রাখছি; অন্যথায় অন্য ওয়াজিব কিংবা নফল রোজা রাখছি– তবে তা হবে মাকরূহ। সুতরাং যদি রমযানিয়্যাত প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে রমজানের রোজাই পালিত হবে। মুতলাক নিয়ত বিদ্যমান থাকার দরুন; অন্যথায় উভয় সুরতেই নফল হবে। অর্থাৎ যে সুরতে وَاِلَّا فَعَنْ وَاجِبٍ اٰخَرَ বলা হয়েছে এবং যে সুরতে وَاِلَّا فَعَنْ نَفْلٍ বলা হয়েছে। প্রথম সুরত নফল হবে– এ কারণে যে, সে অন্য ওয়াজিব রোজা সম্পর্কে সংশয়ের মাঝে ছিল, তাই ঐ ওয়াজিব রোজা আদায় হবে না। এখন বাকি রয়ে গেছে মুতলাক নিয়ত। তাই নফল রোজা আদায় হবে। দ্বিতীয় সুরতেও মুতলাক নিয়ত পাওয়া যাওয়ার কারণে নফল রোজা আদায় হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ غُمَّ لَيْلَةَ الشَّكِّ الخ :

يَوْمُ الشَّكِّ [সংশয় দিবস] : শা'বান মাসের ৩০ তারিখে যদি বৃষ্টি-বাদল কিংবা অধিক ধুলাবালির কারণে সূর্য দেখা না যায় এবং সন্দেহ [সংশয়] হয় যে, এটি রমজানের প্রথম রাত, না শাবান মাসের ৩০ তম রাত– একেই يَوْمُ الشَّكِّ বলা হয়।

يَوْمُ الشَّكِّ -এর **হুকুম :** يَوْمُ الشَّكِّ -এ নফল রোজা ব্যতীত অন্য রোজা রাখবে না। এতে রমজানের রোজার নিয়ত করবে না এবং অন্য কোনো নফল রোজারও নিয়ত করবে না। এতে রমজানের রোজার নিয়ত করা মাকরূহ তাহরীমী। অনুরূপ অন্য কোনো ওয়াজিব রোজার নিয়ত করাও মাকরূহ। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تَصُوْمُوْا قَبْلَ رَمَضَانَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ فَاِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ سَحَابٌ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوْا الشَّهْرَ اِسْتِقْبَالًا .

অর্থাৎ "তোমরা রমজানের পূর্বে রোজা রেখো না; [বরং] চাঁদ দেখে রোজা রাখবে এবং চাঁদ দেখেই রোজা ভাঙ্গবে। তোমাদের চাঁদের মাঝে যদি বৃষ্টি-বাদল প্রতিবন্ধক হয়ে যায়, তবে তোমরা [শাবান মাসের] ৩০ দিন পূর্ণ করবে। [রমজান] মাসকে [রোজা রাখার দ্বারা] ইসতিকবাল করো না।" –[তিরমিযী শরীফ]

অন্য এক হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا يُصَامُ الْيَوْمَ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ اَنَّهٗ مِنْ رَمَضَانَ اِلَّا تَطَوُّعًا

অর্থাৎ "যেদিনটি সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে, তা রমজান কিনা, সেদিন নফল ছাড়া অন্য কোনো রোজা রাখা যাবে না।" এ সম্পর্কে এর চেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা মতন ও তাশরীহের মাঝেই ভালো করা হয়েছে।

وَمَنْ رَأَى هِلَالَ صَوْمٍ أَوْ فِطْرٍ وَحْدَهُ يَصُوْمُ وَإِنْ رُدَّ قَوْلُهُ وَإِنْ أَفْطَرَ قَضَى ذَكَرَ الْقَضَاءَ فَقَطْ لِبَيَانِ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) وَقُبِلَ بِلَا دَعْوَى وَلَفْظِ أَشْهَدُ لِلصَّوْمِ مَعَ غَيْمٍ خَبَرُ فَرْدٍ بِشَرْطِ أَنَّهُ عَدْلٌ وَلَوْ قِنًّا أَوْ اِمْرَأَةً أَوْ مَحْدُوْدًا فِي قَذْفٍ تَائِبًا وَشُرِطَ لِلْفِطْرِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَلَفْظُ أَشْهَدُ لَا الدَّعْوَى وَبِلَا غَيْمٍ شُرِطَ جَمْعٌ عَظِيْمٌ فِيْهِمَا اَلْجَمْعُ الْعَظِيْمُ جَمْعٌ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ وَيَحْكُمُ الْعَقْلُ بِعَدَمِ تَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْكِذْبِ وَبَعْدَ صَوْمِ ثَلْثِيْنَ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ حَلَّ الْفِطْرُ وَبِقَوْلِ عَدْلٍ لَا أَيْ إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ بِهِلَالِ رَمَضَانَ وَفِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ فَصَامُوْا ثَلْثِيْنَ يَوْمًا لَا يَحِلُّ الْفِطْرُ لِأَنَّ الْفِطْرَ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ وَاحِدٍ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ فَإِنَّ الْفِطْرَ عِنْدَهُ يَثْبُتُ بِتَبْعِيَّةِ الصَّوْمِ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ ضِمْنًا وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا وَالْأَضْحَى كَالْفِطْرِ أَيْ فِي الْأَحْكَامِ الْمَذْكُوْرَةِ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি রোজা কিংবা ঈদুল ফিতরের চাঁদ একা দেখেছে সে রোজা রাখবে। যদিও তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। যদি সে রোজা ভেঙ্গে ফেলে, তবে তা কাজা করবে। গ্রন্থকার শুধু কাজার কথা উল্লেখ করেছেন, যেন ضِمْنًا এ কথাও বর্ণনা করা হয়ে যায় যে, এর কোনো কাফফারা নেই। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। বর্ষার দিনে কোনো দাবিদাওয়া ও اَشْهَدُ শব্দ ছাড়া রমজানের চাঁদ দেখা সম্পর্কে এক ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণযোগ্য। শর্ত হলো, তাকে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হতে হবে। যদিও সে গোলাম হয় কিংবা মহিলা হয় কিংবা مَحْدُوْدٌ فِى الْقَذْفِ-এর তাওবাকারী হয়। ঈদুল ফিতরের চাঁদ সম্পর্কে দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষী দেওয়া এবং اَشْهَدُ শব্দ শর্ত। দাবিদাওয়া করা শর্ত নয়। বর্ষা ব্যতীত অন্য দিবসে [রোজা ও ঈদুল ফিতর] উভয়ের ক্ষেত্রে একটি বড় জামাতের দেখা শর্ত। বড় জামাত বলতে এমন জামাত উদ্দেশ্য, যাদের সংবাদ দ্বারা একিন [নিশ্চিত হওয়া] হাসিল হয় এবং [তাদের আধিক্যের কারণে] বিবেক তাদেরকে মিথ্যুক বলতেও একমত নয়। ৩০ রোজা পূর্ণ করার পর দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে রোজা ভেঙ্গে ফেলা জায়েজ; এক ব্যক্তির কথায় নয়। অর্থাৎ যদি একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি রমজানের চাঁদ দেখা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, এমতাবস্থায় আকাশে মেঘ থাকে, তবে লোকেরা ৩০ রোজা পূর্ণ করবে। তাদের জন্য রোজা ভেঙ্গে ফেলা জায়েজ নয়। কেননা, এক ব্যক্তির কথা দ্বারা রোজা ভেঙ্গে ফেলা প্রমাণিত নয়। এতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা, তাঁর নিকট রোজার তাবে হয়ে اِفْطَارٌ [রোজা ভেঙ্গে ফেলা]-ও প্রমাণিত হয়। অনেক জিনিসই ضِمْنًا প্রমাণিত হয়। কিন্তু قَصْدًا প্রমাণিত হয় না। উল্লিখিত আহকামের ক্ষেত্রে ঈদুল আজহার চাঁদ ঈদুল ফিতরের ন্যায়।

بَابُ مُوْجِبِ الْاِفْسَادِ

بِفَتْحِ الْجِيْمِ مَا يُوْجِبُهُ الْاِفْسَادَ كَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ مَنْ جَامَعَ اَوْ جُوْمِعَ فِىْ اَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ اَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ غِذَاءً اَوْ دَوَاءً عَمْدًا اَوِ احْتَجَمَ فَظَنَّ اَنَّهُ فِطْرُهُ فَاَكَلَ عَمْدًا قَضٰى وَكَفَّرَ كَالْمُظَاهِرِ اَىْ كَفَّارَتُهُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَهُوَ اَىِ التَّكْفِيْرُ بِاِفْسَادِ صَوْمِ رَمَضَانَ لَا غَيْرَ اَىْ بِاِفْسَادِ اَدَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَمْدًا وَ اِنْ اَفْطَرَ خَطَأً وَهُوَ اَنْ يَّكُوْنَ ذَاكِرًا لِلصَّوْمِ فَاَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ كَمَا اِذَا مَضْمَضَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِىْ حَلْقِهٖ اَوْ مُكْرَهًا اَوِ احْتَقَنَ اَوْ اِسْتَعَطَ اَىْ صَبَّ الدَّوَاءَ فِى الْاَنْفِ فَوَصَلَ اِلَى قَصَبَةِ الْاَنْفِ اَوْ اَقْطَرَ فِىْ اُذُنِهٖ اَوْ دَاوٰى جَائِفَةً اَوْ اٰمَّةً فَوَصَلَ اِلٰى جَوْفِهٖ اَوْ دِمَاغِهِ الْجَائِفَةِ الْجِرَاحَةِ الَّتِىْ بَلَغَتِ الْجَوْفَ وَالْاٰمَّةُ الشَّجَّةُ الَّتِىْ بَلَغَتْ اُمَّ الدِّمَاغِ اَوْ اِبْتَلَعَ حَصَاةً اَوْ اِسْتَقَاءَ مِلْءَ فَمِهٖ اَوْ تَسَحَّرَ اَوْ اَفْطَرَ بِظَنِّهٖ لَيْلًا وَهُوَ يَوْمٌ اَوْ اَكَلَ نَاسِيًا وَظَنَّ اَنَّهُ فَطَّرَهُ فَاَكَلَ عَمْدًا اَوْ جُوْمِعَتْ نَائِمَةً اَوْ لَمْ يَنْوِ فِىْ رَمَضَانَ كُلِّهٖ لَا صَوْمًا وَلَا فِطْرًا اَوْ اَصْبَحَ غَيْرَنَا وَ لِلصَّوْمِ فَاَكَلَ قَضٰى فَقَطْ ـ

পরিচ্ছেদ : রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ

অনুবাদ : مُوْجَبْ শব্দের جِيْم বর্ণে যবরযুক্ত। অর্থ– ঐ জিনিস যাকে اِفْسَادْ [রোজা ভঙ্গ] ওয়াজিব করে। যেমন– কাজা, কাফফারা। যে ব্যক্তি [রোজাবস্থায়] সহবাস করেছে; কিংবা سَبِيْلَيْنْ -এর যে-কোনো একটিতে সঙ্গম করা হয়েছে, কিংবা সেচ্ছায় খেয়েছে কিংবা পান করেছে– প্রাণ বাঁচানোর জন্য হোক কিংবা ঔষধ হিসেবে হোক; কিংবা সিঙ্গা লাগিয়েছে এবং ধারণা করেছে যে, এর কারণে রোজা ভেঙ্গে গেছে, তাই স্বেচ্ছায় খেয়ে ফেলেছে, তবে কাজা করবে এবং যিহারকারীর ন্যায় কাফফারা দেবে। অর্থাৎ এর কাফফারা যিহারের কাফফারার মতো। রমজানের রোজা ভেঙ্গে ফেলার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হয়; অন্য কোনো কারণে নয়। অর্থাৎ রমজানের রোজা স্বেচ্ছায় ভেঙ্গে ফেলার দ্বারা। যদি ভুলক্রমে রোজা ভেঙ্গে ফেলে– তা এভাবে যে, তার রোজার কথা স্মরণ আছে, কিন্তু অনিচ্ছায় রোজা ভেঙ্গে ফেলেছে। যেমন– কুলি করার সময় [বে-খেয়ালে] পানি গলার ভিতরে চলে গেছে; কিংবা জোরপূর্বক রোজা ভাঙ্গিয়েছে কিংবা হুকনা করেছে [অর্থাৎ পিছনের রাস্তা দিয়ে ঔষধ ভিতরে পৌঁছিয়েছে] কিংবা সঊত (سُعُوْطْ) করেছে, অর্থাৎ নাকে ঔষধ ঢেলেছে আর তা হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে কিংবা কর্ণে ঔষধের ফোঁটা ফেলেছে কিংবা জায়েফা বা আম্মা-এর উপর ঔষধ দিয়েছে, আর তা তার পেট কিংবা দেমাগ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। جَائِفَةٌ ঐ জখম যা

পেট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং آمَّةٌ মাথার ঐ জখম যা মগজ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিংবা কঙ্কর গিলে ফেলেছে কিংবা মুখ ভরে বমি এসেছে কিংবা রাত মনে করে সেহরী খেয়েছে কিংবা রোজা ভেঙ্গে ফেলেছে অথচ তা দিনে, কিংবা ভুলে খানা খেয়ে ফেলেছে এবং মনে করেছে যে, তার রোজা ভেঙ্গে গেছে– তাই স্বেচ্ছায় খানা খেয়ে ফেলেছে; কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হয়েছে; কিংবা পূর্ণ রমজানে রোজার নিয়ত করেনি– রোজারও না, রোজা ভাঙ্গারও না কিংবা নিয়ত ছাড়া সকাল হয়ে গেছে, তাই সে খানা খেয়ে ফেলেছে– তবে এ সমস্ত সুরতে শুধু রোজা কাজা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ جَامَعَ اَوْ جُوْمِعَ الخ :

কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব : কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হওয়ার সুরত নিম্নরূপ– ১. সহবাসকারী, ২. সামনের কিংবা পিছনের যে-কোনো রাস্তা দিয়ে যার সাথে সহবাস করা হয়েছে, ৩. স্বেচ্ছায় খেয়েছে যে, চাই তা জীবন ধারণের জন্য হোক কিংবা ঔষধ হিসেবে হোক, ৪. স্বেচ্ছায় যে পান করেছে, চাই জীবন ধারণের জন্য হোক কিংবা ঔষধ হিসেবে হোক, ৫. যে সিঙ্গা লাগানোর পর মনে করেছে যে, তার রোজা ভেঙ্গে গেছে, তাই স্বেচ্ছায় খেয়ে ফেলেছে। উল্লেখ্য যে, একমাত্র রমজানের আদা রোজাই ভেঙ্গে ফেলার দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব হয়; অন্য কোনো রোজায় কাফফারা আসে না। যেমন– নফল, ওয়াজিব রোজা কিংবা রমজানের কাজা রোজা স্বেচ্ছায় ভেঙ্গে ফেলার দ্বারা কাফফারা আসে না।

শুধু কাজা ওয়াজিব : গ্রন্থকার وَاِنْ اَفْطَرَ خَطَأً থেকে শুরু করে فَاَكَلَ قَضٰى فَقَطْ পর্যন্ত ইবারতে ঐ সমস্ত সুরতের বর্ণনাই উল্লেখ করেছেন, যেগুলোতে শুধু কাজা ওয়াজিব হয় কাফফারা নয়। সুরতগুলো গ্রন্থকার কিতাবেই সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন– সেখানেই দেখে নেওয়া ভালো। কাজা ওয়াজিব হবে এ কারণে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– اِنَّ الْفِطْرَ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ

অর্থাৎ "ভিতরে যা প্রবেশ করে এর কারণে রোজা ভেঙ্গে যায়, আর ভিতর থেকে যা বের হয়ে আসে তার কারণে রোজা ভাঙ্গে না।" –[বাইহাকী শরীফ]

উক্ত সুরতগুলোতে কাফফারা ওয়াজিব হবে না এ কারণে যে, কাফফারা ওয়াজিব হয় জেনায়েত (جِنَايَتْ) -এর কারণে। এখানে তা নেই।

وَلَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ اَوْ جَامَعَ نَاسِيًا اَىْ غَيْرَ ذَاكِرٍ لِلصَّوْمِ اَوْ نَامَ فَاحْتَلَمَ اَوْ نَظَرَ فَاَنْزَلَ اَوْ اِدَّهَنَ اَوْ اِكْتَحَلَ اَوْ اِغْتَابَ اَوْ غَلَبَهُ الْقَىْءُ اَوْ تَقَيَّأَ قَلِيْلًا اَوْ اَصْبَحَ جُنُبًا اَوْ صَبَّ فِىْ اِحْلِيْلِهِ دُهْنًا اَوْ فِىْ اُذُنِهِ مَاءً اَوْ دَخَلَ غُبَارٌ اَوْ دُخَانٌ اَوْ ذُبَابٌ فِىْ حَلْقِهِ لَمْ يُفْطِرْ .

অনুবাদ : যদি ভুলে খেয়ে ফেলে কিংবা পান করে ফেলে কিংবা সহবাস করে ফেলে– অর্থাৎ এ অবস্থায় যে, রোজার কথা তার মনে নেই, কিংবা ঘুমে স্বপ্নদোষ হয়েছে কিংবা [কামনার সাথে কোনো মহিলাকে] দেখেছে, তাই ইনযাল [বীর্যপাত] হয়ে গেছে, কিংবা তেল লাগিয়েছে কিংবা সুরমা লাগিয়েছে; কিংবা গিবত করেছে; কিংবা অনেক বমি হয়েছে কিংবা স্বেচ্ছায় সামান্য বমি করেছে, কিংবা জানাবাতের অবস্থায় সকাল করেছে কিংবা লিঙ্গের মাথায় তেল প্রবাহিত করেছে, কিংবা কানে পানি দিয়েছে; কিংবা ধুলোবালি বা ধোঁয়া বা মাছি তার কণ্ঠদেশে প্রবেশ করেছে, তবে এ সমস্ত সুরতে রোজা ভাঙ্গবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ الخ :

যেসব সুরতে রোজা ভাঙ্গবে না : গ্রন্থকার وَلَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ اَوْ جَامَعَ نَاسِيًا اَوْ ذُبَابٌ فِىْ حَلْقِهِ لَمْ يُفْطِرْ পর্যন্ত ইবারতে রোজা না ভাঙ্গার সুরতগুলো বর্ণনা করেছেন। ভুলে পানাহারের কারণে যদিও কিয়াস বলে রোজা ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু কিয়াসকে বর্জন করা হয়েছে। কেননা, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ رَجُلًا اَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًا فِى الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِمَّ عَلٰى صَوْمِكَ فَاِنَّمَا اَطْعَمَكَ اللّٰهُ وَسَقَاكَ . (رَوَاهُ الْاَئِمَّةُ السِّتَّةُ)

অনুরূপ সহবাসও। কেননা, সহবাস হলো খাওয়া ও পান করার মতোই। ঘুমে স্বপ্নদোষ হওয়ার সুরতে রোজা ভাঙ্গবে না। কারণ, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَىْءُ وَالْاِحْتِلَامُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

কোনো মহিলার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকানোর দ্বারা اِنْزَالٌ হলে রোজা ভাঙ্গবে না। কেননা, এতে রোজা ভাঙ্গকারী সহবাস حَقِيْقَةً -ও নেই। مَعْنًى -ও নেই। পক্ষান্তরে যদি তার মহিলাকে চুমু খাওয়া কিংবা স্পর্শ করার দ্বারা اِنْزَالٌ হতো, তবে তার রোজা ভেঙ্গে যেত। কেননা, এখানে مَعْنًى জেমা' [সহবাস] আছে।

তেল এবং সুমরা লাগানোর দ্বারা রোজা ভাঙ্গবে না। কেননা, এর কারণে চামড়ার অভ্যন্তরে কোনো কিছু পৌঁছে না। গিবত করার দ্বারাও রোজা ভাঙ্গে না। কেননা, এটি জবানের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি গুনাহ। এর দ্বারা রোজার উপর কোনোরূপ প্রভাব পড়ে না। বমি করার কারণেও রোজা ভাঙ্গে না। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . (اَخْرَجَهُ اَصْحَابُ السُّنَنِ)

জানাবত অবস্থায় সকাল করার দ্বারা রোজা ভাঙ্গবে না। কারণ, এখানে রোজা ভঙ্গকারী কোনো কিছু পাওয়া যায় না। লিঙ্গে তেল ঢালার দ্বারা রোজা ভাঙ্গে না। কেননা, মূত্রথলি এবং পেটের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই, যে কারণে তেল পেট পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কানে পানি ঢালার দ্বারা রোজা ভাঙ্গে না। কেননা, এটি اِصْلَاحُ الْبَدَنِ -এর জন্য নয়।

ধুলোবালি, ধোঁয়া ও মাছি গলায় অনিচ্ছায় প্রবেশ করার দ্বারা রোজা ভাঙ্গবে না। কেননা, এর থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু যদি এগুলোকে গলায় ঢুকানো হয় তবে রোজা ভেঙ্গে যাবে।

وَالْمَطَرُ وَالثَّلْجُ يَفْسُدُ اِنَّ فِى الْاَصَحِّ وَلَوْ وَطِئَ مَيْتَةً اَوْ بَهِيْمَةً اَوْ فِىْ غَيْرِ فَرْجٍ وَهُوَ التَّفْخِيْذُ اَوْ قَبَّلَ اَوْ لَمَسَ اِنْ اَنْزَلَ قَضٰى وَاِلَّا فَلَا وَلَوْ اَكَلَ لَحْمًا بَيْنَ اَسْنَانِهٖ مِثْلَ حِمْصَةٍ قَضٰى فَقَطْ وَفِىْ اَقَلِّ مِنْهَا لَا اِلَّا اِذَا اَخْرَجَهُ وَاَخَذَهُ بِيَدِهٖ ثُمَّ اَكَلَ التَّقْيِيْدُ بِالْاَخْذِ بِالْيَدِ وَقَعَ اِتِّفَاقًا وَلَوْ بَدَأَ بِاَكْلِ سِمْسِمَةٍ فَسَدَ اِلَّا اِذَا مَضَغَ فَاِنَّهٗ يَتَلَاشٰى فِىْ فَمِهٖ بِالْمَضْغِ وَقَيْئٌ كَثِيْرٌ عَادَ اَوْ اُعِيْدَ يَفْسُدُ لَا الْقَلِيْلُ فِى الْحَالَيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يَفْسُدُ بِاِعَادَةِ الْقَلِيْلِ لَا عَوْدِ الْكَثِيْرِ اِذَا عَادَ الْقَيْئُ فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) الْكَثْرَةُ اَىْ مِلْءُ الْفَمِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يُعْتَبَرُ الصُّنْعُ اَىِ الْاِعَادَةُ فَفِىْ اِعَادَةِ الْكَثِيْرِ يُفْسِدُ اِتِّفَاقًا وَفِىْ عَوْدِ الْقَلِيْلِ لَا يُفْسِدُ اِتِّفَاقًا وَفِىْ اِعَادَةِ الْقَلِيْلِ لَا يُفْسِدُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رحـ) وَفِىْ عَوْدِ الْكَثِيْرِ يُفْسِدُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لَاعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) ـ

অনুবাদ : [গলদেশে] বৃষ্টি [পানি] ও বরফ প্রবেশ করার কারণে বিশুদ্ধ মতে, রোজা ভেঙ্গে যাবে। যদি মৃত নারী কিংবা চতুষ্পদ জন্তু কিংবা যোনি ভিন্ন রাস্তায় [দুই রানে] সহবাস করে কিংবা চুমু খায় কিংবা [স্ত্রীকে] স্পর্শ করে– তখন তার اِنْزَالْ হয়, তবে রোজা কাজা করবে; অন্যথায় নয়। যদি ঐ গোশত খায় যা দাঁতে লেগেছিল– তা যদি চানাবুট বরাবর হয়, তবে শুধু কাজা করবে। আর যদি চানাবুট থেকে ছোট হয়, তবে কাজাও করতে হবে না। কিন্তু যদি চানাবুট থেকে ছোট গোশতের টুকরা মুখ থেকে বের করে হাতে নিয়ে আবার খায় [তবে তার রোজা ভেঙ্গে যাবে]। হাতে নেওয়ার শর্তটি ইত্তিফাকী (اِتِّفَاقِىْ)। যদি তিল খাওয়া শুরু করে, তবে রোজা ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু যখন শুধু চাবাবে [গিলবে না, তখন রোজা ভাঙ্গবে না]। কেননা, তা চাবানোর দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অধিক বমি যদি পেটে ফিরে যায় কিংবা ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে রোজা ভেঙ্গে যাবে। উভয় অবস্থায় সামান্য বমি দ্বারা রোজা ভাঙ্গবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট স্বল্প বমিকে পেটে ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যাবে, তবে ফিরে যাওয়ার দ্বারা ভাঙ্গবে না। বমি যখন পেটে ফিরে যায় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট অধিক বমি ধর্তব্য। অর্থাৎ মুখ ভরে হওয়া। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট নিজের কাজ [তথা ফিরানো] ধর্তব্য সুতরাং অধিক বমি ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে রোজা ভেঙ্গে যাবে, আর স্বল্প বমি ফিরে যাওয়া দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে রোজা ভাঙ্গবে না। স্বল্প বমিকে ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট রোজা ভাঙ্গবে না, পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট ভেঙ্গে যাবে। আর অধিক বমি ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট রোজা ভেঙ্গে যাবে, পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ভাঙ্গবে না।

وَكُرِهَ لَهُ الذَّوْقُ وَمَضْغُ شَيْءٍ لَا طَعَامِ الصَّبِيِّ ضَرُورَةً وَالْقُبْلَةُ إِنْ لَمْ يَأْمَنْ لَا الْكُحْلُ وَ دُهْنُ الشَّارِبِ وَالسِّوَاكِ وَلَوْ عَشِيًّا اِحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) إِذْ عِنْدَهُ يُكْرَهُ عَشِيًّا لِاَنَّهُ يُزِيلُ الْخُلُوفَ وَشَيْخٌ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا كَالْفِطْرَةِ وَيَقْضِيْ إِنْ قَدَّرَ وَحَامِلٌ اَوْ مُرْضِعٌ خَافَتْ عَلٰى نَفْسِهَا اَوْ وَلَدِهَا اَوْ مَرِيْضٌ خَافَ زِيَادَةَ مَرَضِهِ اَوِ الْمُسَافِرُ اَفْطَرُوْا وَقَضَوْا بِلاَ فِدْيَةٍ قِيْلَ حَلُّ الْاِفْطَارِ مُخْتَصٌّ بِمُرْضِعَةٍ اُجِرَتْ نَفْسَهَا لِلْاِرْضَاعِ وَلاَ يَحِلُّ لِلْوَالِدَةِ اِذْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْاِرْضَاعُ اَقُوْلُ لَوْ كَانَ حَلُّ الْاِفْطَارُ بِنَاءً عَلٰى وُجُوْبِ الْاِرْضَاعِ فَعَقْدُ الْاِجَارَةِ لَوْ كَانَ قَبْلَ رَمَضَانَ يَحِلُّ لَهَا الْاِفْطَارُ لٰكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ رَمَضَانَ بَلْ تُوْجِرُ نَفْسَهَا فِيْ رَمَضَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ لاَ يَحِلَّ لَهَا الْاِفْطَارُ اِذْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا الْاِجَارَةُ اِلاَّ اِذَا دَعَتِ الضَّرُوْرَةُ اِلَيْهَا اَمَّا الْوَالِدَةُ فَلاَ يَحِلُّ لَهَا الْاِفْطَارُ اِلاَّ اِذَا تَعَيَّنَتْ فَحِيْنَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الْاِرْضَاعُ فَيَحِلُّ لَهَا الْاِفْطَارُ ـ

অনুবাদ : কোনো জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করা এবং চাবানো রোজাদারের জন্য মাকরূহ। তবে বাচ্চাকে খাওয়ানোর প্রয়োজনের চাবানো মাকরূহ নয়। انزال -এর ভয় ইত্যাদি থেকে নিরাপদ না হওয়ার সুরতে চুমু খাওয়া মাকরূহ। সুরমা লাগানো, গোঁফে তেল ব্যবহার করা, মিসওয়াক করা– যদিও তা দিনের শেষাংশে হয়, মাকরূহ নয়। এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত থেকে বিরত থেকেছেন। কেননা, তাঁর নিকট বিকেলে মিসওয়াক করা রোজাদারের জন্য মাকরূহ। কেননা, মিসওয়াক মুখের গন্ধকে দূর করে দেয়। অধিক বয়স্ক বৃদ্ধ লোক, যিনি রোজা রাখতে অক্ষম, তিনি রোজা রাখবেন না। প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খানা খাইয়ে দেবে। সদকাতুল ফিতরের ন্যায়। যদি শক্তি ফিরে পায় তবে কাজা করবে। যেসব গর্ভবতী মহিলা কিংবা ধাত্রী মহিলা বাচ্চার প্রাণনাশের আশঙ্কা করে, তারা রোজা রাখবে না এবং ফিদিয়া দেওয়া ব্যতীত তা শুধু কাজা করবে। বলা হয়, রোজা না রাখা বৈধ হওয়ার বিষয়টি ঐ ধাত্রী মহিলার সাথে সম্পৃক্ত, যে পয়সার বিনিময়ে দুধ পান করায়। মায়ের জন্য রোজা না রাখা বৈধ নয়। কেননা, মায়ের উপর বাচ্চাকে দুধ পান করানো ওয়াজিব নয়। [শারেহ (র.) বলেন,] আমি বলি, যদি রোজা না রাখার বৈধতা দুধপান করানোর আবশ্যকতার উপর নির্ভরশীল হয়, তবে ইজারা (اجاره) -এর চুক্তি যদি রমজানের পূর্বে হয়, তবে রোজা না রাখা বৈধ হবে। পক্ষান্তরে যদি রমজানের পূর্বে ইজারার চুক্তি না হয়; বরং ধাত্রী মহিলা রমজান মাসে নিজেকে ইজারায় দিয়েছে, তবে যুক্তিসঙ্গত এটাই যে, তার জন্য রোজা না রাখা হালাল না হওয়া। কেননা, তার উপর ইজারা ওয়াজিব নয়। কিন্তু যখন প্রয়োজনের কারণে ইজারার দিকে যায়, মায়ের জন্য রোজা না রাখা হালাল নয়। কিন্তু যদি মা দুধ পান করানোর জন্য [বাপের পক্ষ থেকে] নির্ধারিত হন, তখন তার উপর দুধ পান করানো ওয়াজিব হবে এবং তার জন্য রোজা না রাখাও বৈধ হবে।

وَصَوْمُ مُسَافِرٍ لَا يَضُرُّهُ أَحَبُّ وَلَا قَضَاءَ إِنْ مَاتَ فِيْ سَفَرِهِ أَوْ مَرَضِهِ أَيْ لَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ وَإِنْ صَحَّ أَوْ أَقَامَ ثُمَّ مَاتَ فَدٰى عَنْهُ وَلِيُّهُ بِقَدْرِ مَا فَاتَ عَنْهُ إِنْ عَاشَ بَعْدَهُ بِقَدْرِهِ وَإِلَّا فَبِقَدْرِهِمَا أَيْ بِقَدْرِ الصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَاتَتْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَأَقَامَ بَعْدَ رَمَضَانَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ مَاتَ أَوْ صَحَّ بَعْدَ رَمَضَانَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ فِدْيَةُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَشُرِطَ لَهَا الْإِيْصَاءُ وَيَصِحُّ مِنَ الثُّلُثِ وَفِدْيَةُ كُلِّ صَلٰوةٍ كَصَوْمِ يَوْمٍ هُوَ الصَّحِيْحُ وَعِنْدَ الْبَعْضِ فِدْيَةُ صَلَوَاتِ يَوْمٍ وَاحِدٍ كَفِدْيَةِ صَوْمِ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَيَقْضِيْ رَمَضَانَ وَصْلًا وَفَصْلًا فَإِنْ جَاءَ آخَرُ صَامَهُ ثُمَّ قَضَى الْأَوَّلَ بِلَا فِدْيَةٍ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) تَجِبُ الْفِدْيَةُ وَلَا يَصُوْمُ وَلَا يُصَلِّيْ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَيَلْزَمُ صَوْمُ نَفْلٍ شُرِعَ فِيْهِ أَدَاءً وَقَضَاءً أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُهُ فَإِنْ أَفْسَدَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِلَّا فِي الْأَيَّامِ الْمَنْهِيَّةِ وَهِيَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ عِيْدِ الْفِطْرِ وَعِيْدِ الْأَضْحٰى مَعَ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَلَا يُفْطِرُ بِلَا عُذْرٍ فِيْ رِوَايَةٍ أَيْ إِذَا شَرَعَ فِيْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ لَا يَجُوْزُ لَهُ الْإِفْطَارُ بِلَا عُذْرٍ لِأَنَّهُ إِبْطَالُ الْعَمَلِ وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرٰى يَجُوْزُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ خَلَفُهُ ـ

অনুবাদ : যে মুসাফিরকে রোজা কোনো ক্ষতি করে না, তার জন্য রোজা রাখা অধিক উত্তম। যদি সফরে কিংবা অসুস্থতার মাঝে সে মারা যায়, তবে এর কাজা অবশ্যক নয়। অর্থাৎ এর ফিদিয়া ওয়াজিব নয়। যদি অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয় কিংবা মুসাফির মুকীম হয়, অতঃপর মারা যায়, তবে অলী তার পক্ষ থেকে ঐ সব দিনের ফিদিয়া দেবে যে ক'দিনের রোজা কাজা হয়েছে। যদি সুস্থ কিংবা মুকীম হওয়ার পর সে একদিন বেঁচে থাকে। অন্যথায় যে ক'দিন সুস্থ ছিল কিংবা ইকামত করছিল সে ক'দিনের ফিদিয়া দেবে। কেননা, যখন [যেমন] দশ দিনের কাজা হয়েছে এবং রমজানের পর পাঁচ দিন ইকামত করেছে, অতঃপর মারা গেছে; কিংবা রমজানের পর পাঁচ দিন সুস্থ ছিল, অতঃপর মারা গেছে, তবে তার উপর পাঁচ রোজার ফিদিয়া ওয়াজিব।

ফিদিয়ার জন্য অসিয়ত করা শর্ত। আর অসিয়ত মৃত ব্যক্তির সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে সহীহ। প্রত্যেক নামাজের ফিদিয়া একদিনের রোজার ফিদিয়ার মতো। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কারো নিকট পূর্ণ একদিনের নামাজের ফিদিয়া একদিনের রোজার ফিদিয়ার মতো। রমজানের কাজা রোজা وَصْلًا [একসঙ্গে সবগুলো] কিংবা فَصْلًا [ভেঙ্গে ভেঙ্গে] রাখা জায়েজ। যদি দ্বিতীয় রমজান চলে আসে, তবে সেই রমজানের রোজাই রাখবে। অতঃপর প্রথম রমজানের রোজার কাজা করবে। এর কোনো ফিদিয়ার প্রয়োজন নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নিকট ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। মৃত ব্যক্তির অলী মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোজা রাখবে না এবং নামাজও পড়বে না। যে নফল রোজা পালন করতে শুরু করেছে তা أداء এবং قَضَاءً পূর্ণ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ ঐ রোজা পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব। আর যদি ভেঙ্গে ফেলে তবে তার উপর কাজা ওয়াজিব। কিন্তু নিষিদ্ধ দিনগুলোতে [পালন করতে শুরু করা রোজা ভেঙ্গে ফেলার দ্বারা এর কাজা তার উপর ওয়াজিব নয়]। নিষিদ্ধ দিবস পাঁচটি– ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা এবং ঈদুল আজহার পর তিনদিন। এক বর্ণনানুযায়ী ওজর ব্যতীত নফল রোজা ভাঙ্গবে না। অর্থাৎ যখন নফল রোজা পালন করা শুরু করবে, তখন তার জন্য ওজর ব্যতীত ঐ নফল রোজাটি ভেঙ্গে ফেলা জায়েজ নেই। কেননা, এতে إِبْطَالُ الْعَمَلِ [তথা আমল বাতিলকরণ] হচ্ছে। অন্য এক বর্ণনানুযায়ী [ওজর ব্যতীত] নফল রোজা ভাঙ্গা জায়েজ। কেননা, এর স্থলাভিষিক্ত কাজা রয়ে গেছে।

وَيُبَاحُ بِعُذْرِ ضِيَافَةٍ هٰذَا الْحُكْمُ يَشْمُلُ مُضِيْفَ وَالضَّيْفَ وَيُمْسِكُ بَقِيَّةَ يَوْمِهٖ صَبِيٌّ بَلَغَ وَكَافِرٌ اَسْلَمَ وَحَائِضٌ طَهُرَتْ وَمُسَافِرٌ قَدِمَ وَلَا يَقْضِىْ اَلْاَوَّلَانِ يَوْمَهُمَا وَاِنْ اَكَلَا فِيْهِ بَعْدَ النِّيَّةِ اَىْ اِذَا اَحْدَثَ هٰذِهِ الْاُمُوْرَ فِىْ نَهَارِ رَمَضَانَ يَجِبُ اِمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لِحُرْمَةِ رَمَضَانَ لٰكِنْ لَا قَضَاءَ عَلَى الصَّبِىِّ الَّذِىْ بَلَغَ وَالْكَافِرُ الَّذِىْ اَسْلَمَ لِعَدَمِ الْاَهْلِيَّةِ فِىْ اَوَّلِ الْيَوْمِ فَلَمْ يَجِبْ الْاَدَاءُ فَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ وَاِنْ كَانَ الْبُلُوْغُ وَالْاِسْلَامُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ فَنَوَيَا الصَّوْمَ ثُمَّ اَكَلَا ـ

অনুবাদ : মেহমানদারির জন্য [নফল] রোজা ভাঙ্গা মুবাহ। এ হুকুম মেজবান ও মেহমান উভয়কে শামিল রাখবে। দিনের বাকি অংশ [পানাহার ও সহবাস থেকে] বিরত থাকবে, যখন বাচ্চা রমজান দিবসে বালেগ হয়, কাফের মুসলমান হয়, হায়েজা পবিত্র হয় এবং মুসাফির নিজের বাসস্থানে পৌঁছে। প্রথম দুই ব্যক্তি তাদের রোজাকে কাজা করবে, যদিও তাতে নিয়ত করার পর কিছু খেয়ে ফেলে। অর্থাৎ যখন এসব বিষয় রমজান দিবসে সংঘটিত হবে, তখন রমজান মাসের মর্যাদার কারণে দিনের বাকি অংশে [পানাহার ও সহবাস থেকে] বিরত থাকা ওয়াজিব। কিন্তু ঐ বালক যে বালেগ হয়েছে এবং ঐ কাফের যে মুসলমান হয়েছে দিনের প্রথম অংশে তারা রোজা রাখার মুকাল্লাফ হয়নি বলে তাদের উপর তা কাজা করা ওয়াজিব নয়। যদিও তাদের বালেগ হওয়া ও ইসলাম গ্রহণ করা অর্ধ দিবসের পূর্বে হয় এবং তারা রোজার নিয়ত করে থাকে, অতঃপর খেয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَنَوَيَا الصَّوْمَ ثُمَّ اَكَلَا : অর্থাৎ বালক এবং কাফেরের বালেগ হওয়া এবং ইসলাম গ্রহণ করা যদিও শরয়ী দিবসের অর্ধাংশের পূর্বে হয় এবং বালেগ হওয়া ও ইসলাম গ্রহণ করার পর রোজার নিয়ত করে, আবার খানা খেয়ে ফেলে, তবুও তাদের উপর ঐ দিনের কাজা ওয়াজিব নয়। কেননা, তারা এতে রোজার উপযুক্ত ছিল না। আর যদি তারা রোজার নিয়তে কোনো কিছু না খায় এবং বালেগ হওয়া ও ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে ও সুবহে সাদেকের পর থেকে কিছু না খায় এবং রোজা রেখে ফেলে, তবে ঐ বালকের রোজাটি নফল রোজা হয়ে যাবে এবং নওমুসলিমের রোজা হবে না। এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, বালক রোজা আদায়ের যোগ্য ছিল– যদিও فَرْضِيَّةٌ -এর যোগ্য ছিল না। সময়ের মধ্যে রোজার নিয়ত করত পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকাটা রোজা হওয়ার উপর মওকূফ থাকবে। পক্ষান্তরে কাফের এমন নয়। সে রোজা আদায়ের উপযুক্তও নয়, فَرْضِيَّةٌ -এর উপযুক্তও নয়।

نَوَى الْمُسَافِرُ الْفِطْرَ ثُمَّ قَدِمَ فَنَوَى الصَّوْمَ فِيْ وَقْتِهَا صَحَّ وَفِيْ رَمَضَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمِيْرُ فِيْ وَقْتِهَا يَرْجِعُ اِلَى النِّيَّةِ وَفِيْ صَحَّ يَرْجِعُ اِلَى الصَّوْمِ كَمَا يَجِبُ الْاِتْمَامُ عَلٰى مُقِيْمٍ سَافَرَ فِيْ يَوْمٍ مِنْهُ لٰكِنْ لَوْ اَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ فِيْهِمَا اَىْ فِيْ قُدُوْمِ الْمُسَافِرِ وَسَفَرِ الْمُقِيْمِ وَقَضٰى اَيَّامًا اُغْمِىَ عَلَيْهِ فِيْهَا اِلَّا يَوْمًا حَدَثَ فِيْهِ اَوْ فِيْ لَيْلَتِهِ لِاَنَّهٗ اِذَا اُغْمِىَ اَيَّامًا لَمْ يُوْجَدْ مِنْهُ النِّيَّةُ فِيْمَا عَدَا الْيَوْمِ الْاَوَّلِ وَاَمَّا الْيَوْمُ الْاَوَّلُ فَالظَّاهِرُ اَنَّهٗ قَدْ نَوَى الصَّوْمَ فِيْهِ اَقُوْلُ هٰذَا اِذَا لَمْ يَذْكُرْ اَنَّهٗ نَوٰى اَمْ لَا اَمَّا اِذَا عَلِمَ اَنَّهٗ نَوٰى فَلَا شَكَّ فِى الصِّحَّةِ وَاِنْ عَلِمَ اَنَّهٗ لَمْ يَنْوِ فَلَا شَكَّ فِيْ عَدَمِ الصِّحَّةِ ـ

অনুবাদ : মুসাফির রোজা ভেঙ্গে ফেলার নিয়ত করেছে, অতঃপর বাসস্থানে পৌঁছে গেছে এবং [রোজা ভাঙ্গার] নিয়তের সময়ে রোজা রাখার নিয়ত করে ফেলেছে, তবে তার রোজা সহীহ হবে। যদি রমজান মাসে এমন হয়, তবে এ দিনের রোজা তার উপর ওয়াজিব। এ ইবারতে وَقْتُهَا-এর যমীর নিয়ত (نِيَّةٌ)-এর দিকে এবং صَحَّ-এর ضَمِيْر - صَوْم-এর দিকে ফিরেছে। যেমনটি এমন মুকীমের উপর রোজা পূর্ণ করা ওয়াজিব, যে রমজানের কোনো একদিনে সফর [শুরু] করেছে। কিন্তু যদি সে রোজা ভেঙ্গে ফেলে, তবে উভয় সুরতে কাফফারা নেই। অর্থাৎ মুসাফির বাসস্থানে পৌঁছা এবং মুকীম সফর করার ক্ষেত্রে। যতদিন বেহুঁশ [অচেতন] থাকবে, ততদিনের রোজা কাজা করবে, কিন্তু ঐ দিনের রোজা কাজা করবে না– যেদিনে কিংবা রাতে অচেতনের ঘটনা ঘটেছে। কেননা, যখন কিছুদিন বেহুঁশ থেকেছে, তন্মধ্যে প্রথম দিন ব্যতীত নিয়ত পাওয়া যায়নি। আর প্রথম দিনের ব্যাপারে তো স্পষ্ট হলো– সে ঐদিনের রোজার নিয়ত করেছিল। [শারেহ (র.) বলেন,] আমি বলি, এটি তখন, যখন তার স্মরণ না থাকবে যে, সে নিয়ত করেছিল কিনা? কিন্তু যখন জানা থাকবে যে, সে নিয়ত করেছিল, তবে নিঃসন্দেহে রোজা সহীহ। আর যদি জানা থাকে যে, সে নিয়ত করেনি, তবে রোজা সহীহ না হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।

وَلَوْ جَنَّ كُلَّهُ لَمْ يَقْضِ وَ إِنْ أَفَاقَ بَعْضَهُ قَضَى مَا مَضَى سَوَاءٌ بَلَغَ مَجْنُوْنًا أَوْ عَاقِلًا ثُمَّ جَنَّ فِى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الْجُنُوْنُ إِذَا اسْتَغْرَقَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَقَطَ الصَّوْمُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ لَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا فَرْقَ فِى هٰذَا بَيْنَ مَا إِذَا بَلَغَ مَجْنُوْنًا أَوْ بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جَنَّ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) إِذَا بَلَغَ مَجْنُوْنًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَكُوْنُ مُسْتَغْرِقًا فَإِنَّ الْجُنُوْنَ إِذَا اتَّصَلَ بِالصِّبَا لَمْ يَجِبِ الصَّوْمُ فَهٰذَا الْجُنُوْنُ يَكُوْنُ مَانِعًا فَيَكْفِى لِلْمَنْعِ الْجُنُوْنُ الضَّعِيْفُ وَهُوَ غَيْرُ الْمُسْتَغْرِقِ أَمَّا إِذَا جَنَّ الْبَالِغُ فَإِنَّهُ رَافِعٌ لِلصَّوْمِ الْوَاجِبِ فَلَابُدَّ أَنْ يَكُوْنَ جُنُوْنًا قَوِيًّا وَهُوَ الْمُسْتَغْرِقُ نَذَرَ بِصَوْمِ يَوْمَيِ الْعِيْدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَوْ بِصَوْمِ السَّنَةِ صَحَّ وَأَفْطَرَ هٰذِهِ الْأَيَّامَ وَقَضَاهَا وَلَا عُهْدَةَ إِنْ صَامَهَا فَرَّقُوْا بَيْنَ النَّذْرِ وَالشُّرُوْعِ فِى هٰذِهِ الْأَيَّامِ فَلَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوْعِ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَيَلْزَمُ بِالنَّذْرِ إِذْ لَا مَعْصِيَةَ فِى النَّذْرِ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَوْ نَوَى النَّذْرَ لَا غَيْرَ أَوْ نَوَى النَّذْرَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُوْنَ يَمِيْنًا كَانَ نَذْرًا فَقَطْ .

অনুবাদ : যদি পূর্ণ রমজান পাগল থাকে তবে [কোনো রোজা] কাজা করতে হবে না। রমজানের কিছু অংশে যদি হুঁশ ফিরে পায়, তবে বিগত দিনগুলোর রোজা কাজা করবে। চাই পাগল অবস্থায় বালেগ হোক কিংবা সুস্থাবস্থায় বালেগ হয়ে পাগল হোক জাহিরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী। পাগলামি যখন পূর্ণ রমজানকে ঢেকে নেবে, তখন রোজা রহিত হয়ে যায়। আর যদি পূর্ণ রমজানকে ঢেকে না নেয়, তবে রহিত হয় না; বরং তার উপর কাজা ওয়াজিব হয়। এতে কোনোরূপ পার্থক্য নেই যে, পাগল অবস্থায় বালেগ হওয়া কিংবা সুস্থাবস্থায় বালেগ হয়ে অতঃপর পাগল হওয়া। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট যখন পাগল অবস্থায় বালেগ হয়, তখন তার উপর রোজা ওয়াজিব নয়। যদি পাগলামি পূর্ণ রমজানকে ঢেকে না নেয়। কেননা, যখন বালক বয়সে পাগল হয়, তখন তার উপর রোজা ওয়াজিব হয় না। অতএব, তার এ পাগলামি প্রতিবন্ধক হবে। সুতরাং বারণ করার জন্য যঈফ [দুর্বল] পাগলামি যথেষ্ট। আর তা হলো, পূর্ণ রমজানকে পাগলামি ঢেকে না নেওয়া। কিন্তু যখন বালেগ ব্যক্তি পাগল হয়, তখন এ পাগলামি নফল রোজার রহিতকারী। তাই মজবুত جُنُوْنْ [পাগলামি] হওয়া জরুরি। তা হলো, পূর্ণ রমজানকে পাগলামি ঢেকে নেওয়া।

কেউ দুই ঈদ এবং আইয়ামে তাশরীকের দিনে রোজা রাখার মানত করেছে, কিংবা পুরা বছর রোজা রাখার জন্য মানত করেছে, তবে তার এ মানত সহীহ এবং এসব দিবসে সে রোজা রাখবে না; বরং কাজা করবে। আর যদি এসব দিবসে রোজা রেখে ফেলে, তবে তার জিম্মা রহিত হয়ে যাবে। ফুকাহায়ে কেরাম মানত এবং এসব দিবসে রোজা শুরু করার মাঝে পার্থক্য করেন যে, এসব দিবসে রোজা শুরু করার দ্বারা রোজা আবশ্যক হয় না। কেননা, এটি একটি গুনাহ। আর মানত করার দ্বারা আবশ্যক হয়। কারণ, শুধু মানতের মাঝে গুনাহ নেই। অতঃপর যদি কোনো জিনিসের নিয়ত না করেন; কিংবা মানতের নিয়ত করে– অন্য কিছুর নয়; কিংবা মানতের নিয়ত করার সাথে সাথে এটারও নিয়ত করেছে যে, এটি কসম নয়, তবে এ উভয় সুরতে শুধু মানতই হবে।

وَاِنْ نَوَى الْيَمِيْنَ وَنَوٰى اَنْ لَا يَكُوْنَ نَذْرًا كَانَ يَمِيْنًا وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ اِنْ اَفْطَرَ وَاِنْ نَوَاهُمَا اَوْ نَوَى الْيَمِيْنَ اَىْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْفِىَ النَّذْرَ كَانَ نَذْرًا وَ يَمِيْنًا حَتّٰى لَوْ اَفْطَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِلنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةُ لِلْيَمِيْنِ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) نَذْرٌ فِى الْاَوَّلِ وَيَمِيْنٌ فِى الثَّانِىْ اَلْمُرَادُ بِالْاَوَّلِ مَا اِذَا نَوَاهُمَا وَبِالثَّانِىْ مَا اِذَا نَوَى الْيَمِيْنَ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاَقْسَامَ سِتَّةٌ مَا اِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا اَوْ نَوٰى كِلَيْهِمَا اَوْ نَوَى النَّذْرَ بِلَا نَفْىِ الْيَمِيْنِ اَوْ مَعَ نَفْيِهٖ اَوْ نَوَى الْيَمِيْنَ بِلَا نَفْىِ النَّذْرِ اَوْ مَعَ نَفْيِهٖ فَفِى الْهِدَايَةِ جَعَلَ الْيَمِيْنَ مَعْنًى مَجَازِيًّا وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْيَمِيْنِ اَنَّ النَّذْرَ اِيْجَابُ الْمُبَاحِ فَيَدُلُّ عَلٰى تَحْرِيْمِ ضِدِّهٖ وَتَحْرِيْمُ الْحَلَالِ يَمِيْنٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ اِلٰى قَوْلِهٖ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ فَاِذَا كَانَ الْيَمِيْنُ مَعْنًى مَجَازِيًّا يَرِدُ عَلَيْهِ اَنَّهٗ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ ـ

অনুবাদ : যদি কসমের নিয়ত করে এবং এর সাথে সাথে এও নিয়ত করেছে যে, যদি মানত না হয়, তবে কসম হবে। যদি রোজা ভেঙ্গে ফেলে, তবে তার উপর কসমের কাফফারা আসবে। যদি উভয়টির নিয়ত করে কিংবা মানতকে বাদ দেওয়া ব্যতীত কসমের নিয়ত করেছে, তবে মানত ও কসম উভয়টি হবে। এমনকি যদি সে রোজা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার উপর মানতের জন্য কাজা এবং কসমের জন্য কাফফারা ওয়াজিব হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট প্রথম সুরতে মানত এবং দ্বিতীয় সুরতে কসম হবে। প্রথম সুরত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সুরত- যার মাঝে মানত ও কসম উভয়টির নিয়ত করেছিল। আর দ্বিতীয় সুরত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সুরত যার মাঝে কসমের নিয়ত করেছিল।

জেনে রাখা ভালো যে, এখানে [মোট] ৬ প্রকার– ১. যখন কোনো জিনিসের নিয়ত করেনি, ২. মানত ও কসম উভয়টির নিয়ত করেছে, ৩. কসমকে নফি করা ব্যতীত মানতের নিয়ত করেছে, ৪. কসমকে নফি করার সাথে সাথে মানতের নিয়ত করেছে, ৫. মানতকে নফি করা ব্যতীত কসমের নিয়ত করেছ, ৬. মানতকে নফি করার সাথে সাথে কসমের নিয়ত করেছে। হিদায়া গ্রন্থে يَمِيْن [কসম] -কে مَعْنٰى مَجَازِىْ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কসম ও মানতের মাঝে সম্পর্ক হলো, মানত মুবাহ জিনিসকে ওয়াজিব করে দেয়। তাই তা তার বিপরীত বিষয়কে হারাম করাকে বুঝাবে। আর কসম হলো, হালালকে হারাম করা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِىْ مَرْضَاةَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ـ

অর্থাৎ "হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশি করার নিমিত্তে তা নিজের জন্য কেন হারাম করছেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়। আল্লাহ তোমাদের জন্য কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" অতএব, যখন يَمِيْن - مَعْنٰى مَجَازِىْ-তে হবে তখন এর উপর মন্তব্য আসে যে, এর দ্বারা حَقِيْقَةٌ ও مَجَازٌ একত্রিত করা আবশ্যক হয়।

فَلِدَفْعِ هٰذَا قِيْلَ فِى كُتُبِ اُصُوْلِنَا لَيْسَ الْيَمِيْنُ مَعْنًى مَجَازِيًّا بَلْ هٰذَا الْكَلَامُ نَذْرٌ بِصِيْغَتِهٖ يَمِيْنٌ بِمُوْجَبِهٖ وَالْمُرَادُ بِالْمُوْجَبِ اللَّازِمُ كَمَا اَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيْبِ شِرَاءٌ بِصِيْغَتِهٖ اِعْتَاقٌ بِمُوْجَبِهٖ فَيَخْطُرُ بِبَالِىْ اَنَّ الْيَمِيْنَ لَوْ كَانَتْ مُوْجَبَةً لَثَبَتَ بِلَانِيَّةٍ كَشِرَاءِ الْقَرِيْبِ بَلْ هِىَ مَعْنًى مَجَازِىٌّ فَالْجَوَابُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ اَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِى الْاِرَادَةِ لَا يَجُوْزُ وَهٰهُنَا لَيْسَ كَذٰلِكَ فَاِنَّ النَّذْرَ لَا يَثْبُتُ بِاِرَادَتِهٖ بَلْ بِصِيْغَتِهٖ فَاِنَّ صِيْغَتَهٗ اِنْشَاءٌ لِلنَّذْرِ فَيَثْبُتُ النَّذْرُ سَوَاءٌ اَرَادَ اَوْ لَمْ يُرِدْ مَا لَمْ يَنْوِ اَنَّهٗ لَيْسَ بِنَذْرٍ اَمَّا اِذَا نَوٰى اَنَّهٗ لَيْسَ بِنَذْرٍ يَصْدُقُ فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنَّ هٰذَا اَمْرٌ لَا مَدْخَلَ فِيْهِ لِقَضَاءِ الْقَاضِىْ وَالْمَعْنَى الْمَجَازِىْ يَثْبُتُ بِاِرَادَتِهٖ فَلَا جَمْعَ بَيْنَهُمَا فِى الْاِرَادَةِ وَتَفْرِيْقُ صَوْمِ السِّتَّةِ فِىْ شَوَّالٍ بَعُدَ عَنِ الْكَرَاهَةِ وَالتَّشَبُّهِ بِالنَّصَارٰى ـ

অনুবাদ : উক্ত মন্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য আমাদের উসূলের কিতাবগুলোতে উল্লেখ করা হয় যে, يَمِيْن - مَعْنًى مَجَازِىْ অর্থে নয়; বরং এই কালাম সীগার দিক থেকে نَذْر [মানত] এবং مُوْجَبْ-এর দিক থেকে يَمِيْن আর مُوْجَبْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো لَازِمْ । যেমন– নিকটাত্মীয় কোনো গোলামকে ক্রয় করা– সীগাহ [ভাষা]-এর দিক থেকে شِرَاءْ কিন্তু مُوْجَبْ-এর দিক থেকে তা اِعْتَاقْ [স্বাধীনতা]। শারেহ (র.) বলেন] আমার অন্তরে এটা জাগছে যে, يَمِيْن যদি مُوْجَبْ হয়, তবে অবশ্যই তা নিয়ত ব্যতীত প্রমাণিত হবে। যেমনটি নিকটাত্মীয় গোলামকে ক্রয় করার ক্ষেত্রে হয় [যে, নিয়ত ব্যতীতই আজাদ হয়ে যায়]; বরং এটি مَعْنًى مَجَازِىْ , তখন حَقِيْقَةْ এবং مَجَازْ জমায়েত হওয়ার উত্তর হলো حَقِيْقَةْ এবং مَجَازْ জমায়েত হওয়া اِرَادَهْ-এর ক্ষেত্রে নাজায়েজ, আর এখানে এমনটি নয়। কেননা, মানত তার ইরাদায় সাবেত হয়নি; বরং তার ভাষায় সাবেত হয়েছে। কারণ, তার [ভাষ্যে তার] সীগাহ মানতের জন্য اِنْشَاءْ অতএব, মানত সাবেত হয়ে যাবে। চাই সে اِرَادَهْ করুক কিংবা না করুক। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিয়ত না করবে যে, এটা মানত নয়।

কিন্তু যখন এ নিয়ত করবে যে, এটা মানত নয়; তখন فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ সত্যায়ন করা হবে। কেননা, এটি এমন একটি বিষয় যার মধ্যে কাজির ফয়সালার কোনো দখল নেই। مَعْنًى مَجَازِىْ তার اِرَادَهْ-এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। সুতরাং اِرَادَهْ-এর মধ্যে উভয়টি জমায়েত হতে পারে না। শাওয়াল মাসের ৬ রোজার মাঝে পৃথক করা মাকরূহ এবং নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য থেকে অনেক দূরে।

بَابُ الْاِعْتِكَافِ

هُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهُوَ لَبْثُ صَائِمٍ فِىْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ بِنِيَّةٍ وَاَقَلُّهُ يَوْمٌ فَيَقْضِىْ مَنْ قَطَعَهُ فِيْهِ اَىْ إِذَا شَرَعَ فِى الْاِعْتِكَافِ فَقَطَعَهُ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رح) فَاِنَّ اَقَلَّهُ سَاعَةٌ عِنْدَهُ وَقَدْ حَصَلَتْ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ اَوْ لِجُمُعَةٍ وَقْتَ الزَّوَالِ وَمَنْ بَعُدَ مَنْزِلُهُ عَنْهُ فَوَقْتًا يُدْرِكُهَا وَيُصَلِّى السُّنَنَ عَلَى الْخِلَافِ وَهُوَ اَنْ يُصَلِّىَ قَبْلَهَا اَرْبَعًا وَفِىْ رِوَايَةٍ سِتًّا رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةً وَاَرْبَعًا سُنَّةً وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَسِتًّا عِنْدَهُمَا وَلَا يَفْسُدُ بِمَكْثِهِ اَكْثَرَ مِنْهُ فَلَوْ خَرَجَ سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ فَسَدَ وَيَاْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَنَامُ وَيَبِيْعُ وَيَشْتَرِىْ فِيْهِ بِلَا اِحْضَارِ مَبِيْعٍ لَا غَيْرُهُ اَىْ لَا يَفْعَلُ غَيْرُ الْمُعْتَكِفِ هٰذِهِ الْاَفْعَالَ فِى الْمَسْجِدِ وَلَا يَصْمُتُ وَلَا يَتَكَلَّمُ اِلَّا بِخَيْرٍ وَيَبْطُلُهُ الْوَطْئُ وَلَوْ لَيْلًا اَوْ نَاسِيًا وَ وَطْيُهُ فِىْ غَيْرِ فَرْجٍ اَوْ قُبْلَةٍ اَوْ لَمْسٍ اِنْ اَنْزَلَ وَاِلَّا فَلَا وَاِنْ حَرُمَ وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِيْ بَيْتِهَا نَذَرَ اِعْتِكَافَ اَيَّامٍ لَزِمَهُ بِلَيَالِيْهَا وَلَاءً بِلَا شَرْطِهِ وَفِىْ يَوْمَيْنِ بِلَيْلَتِهِمَا وَصَحَّ نِيَّةُ النَّهَرِ خَاصَّةً.

পরিচ্ছেদ : ই'তিকাফ

অনুবাদ : ই'তিকাফ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। তা হলো, রোজাদার ই'তিকাফের নিয়তে এমন মসজিদে অবস্থান করা– যাতে জামাতে নামাজ হয়। এর সর্বনিম্ন মুদ্দত হলো, একদিন [একরাত]। অতএব, যদি একদিনের মধ্যে কেউ ই'তিকাফ ভেঙ্গে দেয় সে তা কাজা করবে। অর্থাৎ যখন ই'তিকাফ শুরু করেছে তবে একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি ভেঙ্গে ফেলে, তবে তার উপর তা কাজা করা ওয়াজিব। এতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা, তাঁর নিকট ই'তিকাফের সর্বনিম্ন মুদ্দত হলো এক ঘণ্টা। আর অবশ্যই তার এক ঘণ্টা হাসিল হয়ে গেছে। ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হবে না। তবে মানবিক প্রয়োজন পূরণের জন্য [বের হতে পারবে] কিংবা দ্বিপ্রহরের সময় জুমার জন্য [বের হতে পারবে]। যার ঘর জামে মসজিদ থেকে দূরে তবে ঐ সময় যাবে যে, সেখানে পৌঁছে ইখতিলাফের ভিত্তিতে সুন্নত নামাজগুলো আদায় করে জামাতে শরিক হতে পারে। সুন্নত পড়ার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ হলো, জুমার পূর্বে চার রাকাত পড়বে– এক বর্ণনানুযায়ী ৬ রাকাত পড়বে– দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং ৪ রাকাত সুন্নত। জুমার পরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট ৪ রাকাত এবং সাহেবাইন (র.) -এর নিকট ৬ রাকাত পড়বে।

এর চেয়ে বেশি অবস্থান করার দ্বারা ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। যদি কোনো ওজর ব্যতীত মুহূর্তের জন্যও মসজিদ থেকে বাহিরে আসে, তবে তার ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। ই'তিকাফকারী মসজিদেই পানাহার করবে, ঘুমাবে এবং পণ্য উপস্থিত করা ব্যতীত বেচাকেনা করতে পারবে। যে ই'তিকাফ করে না সে নয়। অর্থাৎ ই'তিকাফকারী নয় এমন ব্যক্তি মসজিদে এসব কাজ করবে না। ই'তিকাফকারী চুপ থাকবে না, ভালো কথা ছাড়াও আবার কথা বলবে না। স্ত্রীসহবাস ই'তিকাফকে বাতিল করে দেয়। চাই তা রাতে হোক কিংবা ভুলে হোক। যোনি ব্যতীত অন্য রাস্তায় সহবাস কিংবা চুমু খাওয়া কিংবা [স্ত্রীকে] স্পর্শ করার দ্বারা যদি اِنْزَالٌ হয়ে যায়, [তবে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে]; অন্যথায় বাতিল হবে না। যদিও এমনটি করা হারাম। মহিলারা স্বীয় ঘরেই ই'তিকাফ করবে। যে ব্যক্তি কয়েক দিন ই'তিকাফ করার মানত করে, তবে রাতসহ ঐ সব দিবসগুলো ধারাবাহিকভাবে আবশ্যক। তবে এতে ধারাবাহিকতার শর্ত নেই। দুদিনের মানতে রাতসহ ওয়াজিব হবে। আর খাস করে দিনের নিয়ত করা সহীহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : ই'তিকাফের আলোচনা রোজার পরে এ কারণে করা হয়েছে যে, রোজা হলো ই'তিকাফের জন্য শর্ত। আর শর্ত مَشْرُوْط-এর পূর্বে আসে, তাই রোজাকে ই'তিকাফের পূর্বে আনা হয়েছে।

اِعْتِكَافٌ শব্দের বিশ্লেষণ : اِعْتِكَافٌ শব্দটি بَابْ اِفْتِعَالٌ-এর মাসদার। এটি عَكْف শব্দ থেকে নির্গত। عَكْف হলো مُتَعَدِّىْ [সংক্রমিত] এবং عُكُوْف হলো لَازِمْ [অসংক্রমিত]।

শরিয়তের পরিভাষায়– هُوَ لَبْثُ صَائِمٍ فِىْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ بِنِيَّتِه

অর্থাৎ ই'তিকাফের নিয়তে রোজাদার ব্যক্তি জামাত হয় এমন মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে।

ই'তিকাফ করার সময়কাল : ই'তিকাফের সময়কাল হলো রমজানের শেষ দশ দিন। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে–

قَالَتْ عَائِشَةُ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الْاَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اِلٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অর্থাৎ "হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ যখন থেকে মদিনায় তাশরীফ নিলেন, তখন থেকে ওফাত পর্যন্ত রমজানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন।"

قَوْلُهُ هُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ الخ :

ই'তিকাফের হুকুম : রমজানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। দলিল হলো, পূর্বোল্লিখিত হাদীস।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, রাসূল ﷺ সর্বদা ই'তিকাফের আমল করেছেন। এর দ্বারা তো ই'তিকাফ ওয়াজিব হওয়ার কথা; সুন্নত নয়।

উত্তর : এর জবাব হলো, রাসূল ﷺ যে জিনিসকে ওয়াজিব নির্ধারণ করতে চাইতেন তা সর্বদা করতেন, সর্বদা করার পর তা করার নির্দেশ দিতেন এবং তা বর্জন করতে বারণ করতেন। সুতরাং যদি রমজানের শেষ দশকের ই'তিকাফ ওয়াজিব হতো, তবে তিনি তা করার জন্য লোকদেরকে নির্দেশ দিতেন এবং ছেড়ে দিলে অসন্তোষ জ্ঞাপন করতেন। অথচ তিনি এমনটি করেননি।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

١. مَا مَعْنَى الصَّوْمِ وَكَمْ قِسْمًا لَهٗ وَمَا هِىَ؟ وَهَلْ صَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ اَمْ فَرْضٌ وَمَا تَحْقِيْقُ الشَّارِحِ فِيْهِ؟ اَجِبْ مُوْضِحًا.

٢. مَا مَعْنَى الصَّوْمِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا وَكَمْ قِسْمًا لَهٗ وَمَا هِىَ؟ بَيِّنْ مُوْضِحًا.

٣. اَىُّ صَوْمٍ يَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ. وَاَىُّ صَوْمٍ لَابُدَّ فِيْهِ مِنَ التَّعْيِيْنِ؟

٤. صَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ اَمْ فَرْضٌ وَمَا رَاىُ الشَّارِحِ فِيْهِ؟

٥. "وَيَصِحُّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ اِلَى الضَّحْوَةِ الْكُبْرٰى لَا غَيْرَهَا فِى الْاَصَحِّ". اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ حَقَّ الْاِيْضَاحِ.

٦. مَا الْمُرَادُ بِلَيْلَةِ الشَّكِّ وَمَا حُكْمُ صَوْمِ النَّفْلِ فِىْ يَوْمِ الشَّكِّ؟

٧. قَوْلُهٗ وَقَىْءٌ كَثِيْرٌ عَادَ اَوْ اُعِيْدَ يُفْسِدُ لَا الْقَلِيْلُ فِى الْحَالَيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الخ اَوْضِحِ الصُّوَرَ فِىْ الْمَسْئَلَةِ مَعَ بَيَانِ الْاِخْتِلَافِ فِىْ حُكْمِهَا.

كِتَابُ الْحَجِّ

اِعْلَمْ اَنَّ الْحَجَّ فَرِيْضَةٌ يُكَفَّرُ جَاحِدُهٗ لٰكِنْ اُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الْوُجُوْبِ وَ اَرَادَ بِهِ الْفَرِيْضَةَ حَيْثُ قَالَ يَجِبُ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ صَحِيْحٍ بَصِيْرٍ لَهٗ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَضْلاً عَمَّا لَابُدَّ مِنْهُ وَعَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهٖ اِلٰى حِيْنِ عَوْدِهٖ مَعَ اَمْنِ الطَّرِيْقِ وَالزَّوْجِ اَوِ الْمَحْرَمِ لِلْمَرْأَةِ اِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسِيْرَةُ سَفَرٍ فِى الْعُمْرِ مَرَّةً عَلَى الْفَوْرِ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَاَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) فَعَلَى التَّرَاخِىْ وَ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَاَخِّرِيْنَ اَنَّ هٰذَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا مَبْنِيٌّ عَلٰى اَنَّ الْاَمْرَ الْمُطْلَقَ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لِلْفَوْرِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) لَا وَهٰذَا غَيْرُ صَحِيْحٍ لِاَنَّ الْاَمْرَ الْمُطْلَقَ لَا يُوْجِبُ الْفَوْرَ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَهُمَا ـ

অধ্যায় : হজ

অনুবাদ : জেনে রেখ যে, হজব্রত পালন করা ফরজ, তা অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে। কিন্তু বিকায়া গ্রন্থকার হজের ব্যাপারে 'ওয়াজিব' শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং তার দ্বারা ফরজ উদ্দেশ্য করেছেন। যেমন– তিনি বলেন, হজ ওয়াজিব [ফরজ] প্রত্যেক স্বাধীন, মুসলমান, মুকাল্লাফ [শরিয়তের বিধান প্রয়োগযোগ্য], সুস্থ, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উপর ; যার নিজের প্রয়োজনের ও হজের সফর হতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের খরচের অতিরিক্ত খাদ্য ও সফরের প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা রয়েছে। তৎসঙ্গে যাতায়াতের পথও নিরাপদ হতে হবে। মহিলার জন্য স্বামী অথবা অপর কোনো মুহাররাম ব্যক্তি [যেমন– পিতা, ভাই, ছেলে প্রমুখ] সঙ্গে থাকতে হবে, যদি মহিলার বাড়ি এবং মক্কার মধ্যকার দূরত্ব সফরের পথ [৪৮ মাইল বা ততোধিক] হয়। আর হজ জীবনে একবার তাৎক্ষণিকভাবে ফরজ। তা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, তাৎক্ষণিক ফরজ নয় ; বরং বিলম্বের অবকাশ রয়েছে। কোনো কোনো মুতাআখ্‌খিরীন ধারণা করেছেন যে, সাহেবাইনের মধ্যকার উপরিউক্ত মতভেদের ভিত্তি এ কথার উপর যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট আমরে মুতলাক [সাধারণ আজ্ঞা] তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয়, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট আমরে মুতলাক তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয় নয়। প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা, সাহেবাইনের নিকট আমরে মুতলাক [সাধারণ আজ্ঞা] ঐকমত্যে তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয় নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ كِتَابُ الْحَجِّ : এখানে ইসলামে হজের মর্যাদার কথা বলা হচ্ছে। হজ ইসলামের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। গ্রন্থকার নামাজ, রোজা এবং জাকাতের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার পর এখানে হজ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন। নামাজের নির্দেশ যেহেতু সর্বাধিক ব্যাপক, সেহেতু সর্বপ্রথম নামাজের আলোচনা করেছেন। তারপর ব্যাপকতায় দ্বিতীয় স্তরের রোকন রোজার আলোচনা করেছেন। অতঃপর সম্পদের ইবাদতের মধ্যে প্রথমত জাকাত, তারপর হজের আলোচনা করেছেন। জাকাত হজ উভয়টি সম্পদের ইবাদত হলেও জাকাতের বিধানের ব্যাপকতা হজের তুলনায় অধিক।

কেননা, জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মালের পরিমাণের তুলনায় হজ ফরজ হওয়ার জন্য অধিক মালের প্রয়োজন। সুতরাং হজের বিধান প্রয়োগযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা ও ব্যাপকতা অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় হজের আলোচনাকে জাকাতের আলোচনার পরে করা হয়েছে।

হজের অর্থ : اَلْحَجُّ শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়। যথা– ১. اَلْحِجُّ (بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدِيْدِ الْجِيْمِ)
২. اَلْحَجُّ (بِفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيْدِ الْجِيْمِ)

এর আভিধানিক অর্থ– ইচ্ছা করা, সংকল্প করা। এর পারিভাষিক অর্থ–

اَلْحَجُّ هُوَ زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوْصٍ فِيْ وَقْتٍ مَخْصُوْصٍ بِطَرِيْقٍ مَخْصُوْصٍ ـ

অর্থাৎ "নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পন্থায়, নির্দিষ্ট স্থানের জিয়ারত করাকে হজ বলা হয়।"

قَوْلُهُ أُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الْوُجُوْبِ الخ : এখানে হজকে ওয়াজিব বলে ফরজ উদ্দেশ্য করার কারণ দর্শানো হয়েছে। ওয়াজিব ও ফরজ উভয় দ্বারাই কোনো বিষয় আবশ্যক হওয়া বা গুরুত্বারোপ করা বুঝায়। অতএব একই উদ্দেশ্য প্রযোজ্য বিধায় এ শব্দদ্বয়ের একটি অন্যটির স্থলে ব্যবহৃত হয়, তাই গ্রন্থকার وُجُوْب বলে فَرْض উদ্দেশ্য করেছেন।

قَوْلُهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ الخ : অর্থাৎ হজ জীবনে একবার ফরজ। একবারের বেশি হজ করা নফল। যেমন– মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ফিক্হবিদগণ বলেছেন– হজের সবব হলো বায়তুল্লাহ শরীফ, আর তা হলো একটি, ফলে হজ জীবনে একবার ফরজ। لِاَنَّ عَدَمَ التَّكْرَارِ فِي السَّبَبِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّكْرَارِ فِي الْمُسَبَّبِ

❖ **হজ ফরজ হওয়ার শর্তাবলি :** হজ ফরজ হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি অপরিহার্য–

১. حُرٌّ **[স্বাধীন হওয়া] :** সুতরাং গোলাম বা ক্রীতদাসির উপর হজ ফরজ নয়। চাই নিখুঁত গোলাম হোক বা মুকাতাব হোক বা মুদাব্বার হোক বা উম্মে ওয়ালাদ হোক।

মুকাতাব ঐ গোলামকে বলে যার মনিব তাকে এ কথা বলে দিয়েছে যে, তুমি এত দিনের মধ্যে আমাকে এত টাকা দিলে আজাদ হয়ে যাবে।

মুদাব্বার ঐ গোলামকে বলে যার মনিব তাকে এ কথা বলে দিয়েছে যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আজাদ হয়ে যাবে।

আর যদি গোলাম হজ আদায় করার পর স্বাধীন হয়, তার জিম্মায় দ্বিতীয়বার হজ করা ফরজ হবে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– اَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ وَلَوْ عَشَرَ حُجَجٍ ثُمَّ اُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْاِسْلَامِ (اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ)

অর্থাৎ "যে গোলাম হজ করেছে, চাই সে দশ হজ করুক না কেন, অতঃপর সে আজাদ হওয়ার পর পুনরায় তার উপর ইসলামের হজ ফরজ হবে।"

তবে শায়খাইনের মতে, এ জাতীয় স্বাধীন ব্যক্তির জিম্মায় পুনরায় হজ ফরজ হবে না ; বরং তার প্রথমবারের হজই তার ফরজ আদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে।

গোলাম ও বাঁদির জিম্মায় হজ ফরজ না হওয়ার কারণ এই যে, قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا -এর বিধান অনুসারে হজ ফরজ হওয়ার জন্য اِسْتِطَاعَةٌ তথা সামর্থ্য থাকা শর্ত। আর গোলাম-বাঁদি মনিবের অধীনে এবং তার খেদমতে কর্মরত থাকার কারণে তাদের اِسْتِطَاعَةٌ নেই, তাই তাদের জিম্মায় হজ ফরজ হবে না।

২. مُسْلِمٌ **[মুসলমান হওয়া] :** সুতরাং কাফেরের জিম্মায় হজ ফরজ হবে না। কেননা, কাফেরের উপর ইসলামি বিধান আরোপিত নয়। আর কাফেরগণ যদি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হজব্রত পালন করে থাকে, [যেমন– প্রাক-ইসলামি যুগে কাফেরগণ হজব্রত পালন করত,] তবে তাদের মুসলমান হওয়ার পর দ্বিতীয়বার হজ আদায় করতে হবে।

৩. مُكَلَّفٌ **[প্রাপ্তবয়স্ক ও স্থিরমস্তিষ্ক হওয়া] :** সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং বিকৃত মস্তিষ্কের জিম্মায় হজ ফরজ হবে না। কেননা, তারা মুকাল্লাফ বা শরিয়তের বিধান আরোপযোগ্য নয়।

৪. صَحِيْحٌ **[সুস্থ হওয়া] :** সুতরাং এমন অসুস্থ ব্যক্তির জিম্মায় হজ ফরজ হবে না, যে হজের সফরে আগত সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে না। অতএব খোঁড়া, অবশ এবং দুর্বল ব্যক্তি, যে নিজেও চলতে পারে না এবং যানবাহনেও আরোহণ করতে পারে না, এমন ব্যক্তির জিম্মায় হজ ফরজ হবে না।

৫. بَصِيْرٌ [দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়া] : সুতরাং অন্ধ ব্যক্তির জিম্মায় হজ ফরজ হবে না, যদিও তার সাথে পথপ্রদর্শক থাকে।

৬. **কয়েদি না হওয়া :** সুতরাং কারাবাসীর উপর হজ ফরজ নয় এবং আটক করা ব্যক্তির উপর হজ ফরজ হবে না। এমনকি তাদের পক্ষ হতে হজের প্রতিনিধি প্রেরণ করাও ফরজ নয়। অবশ্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের পক্ষ হতে প্রতিনিধির মাধ্যমে হজব্রত পালন করা ওয়াজিব।

৭. زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ [**পথ খরচের পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া**] : এর পরিমাণ হলো, বাড়ি হতে যাত্রা করে মক্কা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছার এবং সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে আসার খরচ ও হজের সফরকালে পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে পারে এরূপ সম্পদের মালিক হতে হবে।

৮. اَمْنُ الطَّرِيْقِ [**হজে যাওয়ার পথ নিরাপদ হওয়া**] : সুতরাং যদি কারো নিকট হজের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সরঞ্জামাদি থাকে এবং হজের সমস্ত শর্ত তার মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু হজের পথ নিরাপদ নয়। যেমন– ডাকাতের ভয়, শত্রুর প্রবলতা অথবা যুদ্ধের কাল ইত্যাদি ক্ষেত্রে হজ ফরজ হবে না।

৯. اَلزَّوْجُ اَوِ الْمَحْرَمُ [**স্বামী বা মুহাররাম থাকা**] : হজের সফরে মহিলার সাথে স্বামী কিংবা কোনো মুহাররাম ব্যক্তি যেমন– পিতা, ভাই, ছেলে প্রমুখ থাকা শর্ত।

১০. **ইদ্দত অবস্থায় না হওয়া :** ইদ্দত স্বামীর মৃত্যুর পর হোক বা তালাকের পর হোক, ইদ্দতের সময় হজ ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهٗ صَحِيْحٌ الخ : উক্ত ইবারতে সুস্থতা وُجُوْبٌ-এর জন্য শর্ত না اَدَاءٌ-এর জন্য শর্ত– সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাহেবাইনের মতে, পূর্ণ সুস্থ হওয়া اَدَاءٌ-এর জন্য শর্ত। সুতরাং যদি কেউ পূর্ণ সুস্থ হওয়া ব্যতীতও হজ পালন করে, তার হজ আদায় হবে। কারণ, ওয়াজিব না হওয়া আর জায়েজ না হওয়া এক কথা নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এ সুস্থতা মূল ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত– আদায়ের জন্য শর্ত নয়। উল্লেখ্য যে, ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে সাহেবাইনের অভিমতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ : অর্থাৎ পারিবারিক খরচ ও তার সফরের পাথেয় তথা পথখরচ ইত্যাদি তার জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োগ ও ব্যবহারের অনুরূপ হবে। যেমন– সে পরিবারে পূর্বে খরচের যে পরিমাণ ও নিয়ম ছিল এবং যে ধরনের আরোহীর উপর সে আরোহণ করত তা-ই হজ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত। তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করে খরচের হিসাব করা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব যদি কেউ বেশি পরিমাণে হিসাব করা অবস্থায় প্রয়োজনীয় সম্পদ আছে বলে সাব্যস্ত না হয়, তা হজ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ওজর নয় ; বরং অভ্যাসগতভাবে মূল চাহিদা পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ সম্পদ হলেই হজ ফরজ হবে।

قَوْلُهٗ فَضْلًا عَمَّا لَابُدَّ مِنْهُ الخ : এটি বিকায়া গ্রন্থকার মাহমূদ ইবনে আহমদ (র.)-এর উক্তি। এ উক্তি দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো, হজ ফরজ হওয়ার শর্তাবলির মাঝে একটি শর্ত হলো حَوَائِجُ اَصْلِيَّةٌ তথা মূল প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে কারো নিকট হজে গমনের পাথেয় ও যাতায়াত খরচ অতিরিক্ত থাকা। حَوَائِجُ اَصْلِيَّةٌ বা মূল প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ নিম্নরূপ–

১. থাকার ঘর, যদিও ঘরের কিছু অংশ খালি পড়ে থাকে। ২. চাকর, যদিও সে সময় কাজে লিপ্ত থাকে। ৩. থালা-বাটি ইত্যাদি, যদিও সে সর্বদা তা ব্যবহার না করে থাকে। ৪. পোশাক, যদিও তা ঈদ বা অন্য কোনো বিশেষ উপলক্ষে পরিধান করা হয়। ৫. ঐ সব জিনিস যা কেবল সৌন্দর্য ও প্রভাবের জন্য ব্যবহার করা হয়, বাহ্যিকভাবে তা প্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য হয় না। অনুরূপ কারিগরি ও চাষাবাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, যদিও সে ব্যক্তি ঐসব কার্যাদি করে কিংবা ঐসব কার্যাদির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অনুরূপ ব্যবসার সামগ্রী। অনুরূপ ঐ সম্পত্তি যার সে মালিক এবং যার আয়, উৎপাদন দিয়ে সে জীবনযাপন করে।

উপরিউক্ত জিনিসসমূহ حَوَائِجُ اَصْلِيَّةٌ তথা মূল প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া অন্যান্য জিনিস زَائِدَةٌ তথা মূল প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

قَوْلُهٗ مَعَ اَمْنِ الطَّرِيْقِ : এখানে রাস্তা নিরাপদ হওয়ার আলোচনা করা হয়েছে। হজ ফরজ হওয়ার জন্য পথখরচ ও যানবাহন বিদ্যমান থাকা শর্ত এবং সাথে সাথে ব্যক্তির বাড়ি হতে মক্কা শরীফ পর্যন্ত পথ নিরাপদ হতে হবে। আর পথ নিরাপদ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পথ নিরাপদ আছে বলে প্রবল ধারণা হওয়া, অর্থাৎ এমন পথ যার মাধ্যমে অধিকাংশ

লোক নিরাপদে চলে থাকে এ অবস্থায় প্রবল ধারণাই গ্রহণীয়। অতএব যদি মক্কায় পৌঁছার পথ এমন হয় যে, স্বভাবত সেখানে বিপদাপদ তথা যুদ্ধবিগ্রহের প্রবল আশঙ্কা থাকে, তখন হজ ফরজ হবে না। অনুরূপ যদি পথে শত্রুর ভয় বা চুরি ডাকাতির প্রবল আশঙ্কা থাকে, তাহলেও হজ ফরজ হবে না।

قَوْلُهُ وَالزَّوْجُ وَالْمَحْرَمُ الخ : এখানে মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত শর্ত আলোচনা করা হয়েছে। মহিলা যখন হজ করতে চান, তখন তার হজের ব্যাপারে পুরুষের জন্য আরোপিত শর্তাবলির সাথে এটাও শর্ত যে, তার স্বামী কিংবা মুহাররাম অর্থাৎ এমন কোনো ব্যক্তি থাকতে হবে যার সাথে তার বিবাহ হারাম। যেমন– তার ছেলে, পিতা, ভাই, চাচা প্রমুখ। কেননা, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– أَلَا لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ অর্থাৎ "যতক্ষণ পর্যন্ত মহিলার সাথে তার মুহাররাম না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন সে হজ না করে।" বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, মহিলা যেন মুহাররাম ব্যতীত সফর [এর দূরত্ব কমপক্ষে ৪৮ মাইল] না করে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, মহিলা যেন তার স্বামী বা কোনো মুহাররাম ব্যতীত সফর না করে। তবে স্বামী ও মুহাররাম জ্ঞানী হতে হবে। তারা ফাসিক বা অগ্নিপূজক হলে চলবে না। আর মহিলার সাথে তার যে মুহাররাম সফরে যাবে সে মুহাররামের সফরের খরচ মহিলার দায়িত্বে থাকবে।

قَوْلُهُ عَلَى الْفَوْرِ : গ্রন্থকার (র.) তাঁর এ উক্তি দ্বারা হজ পালনের ব্যাপারে একটি বিতর্কিত মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মাসআলাটি হলো– কারো উপর এ বছর হজ ফরজ হলো, এখন সে কি এ বছরই হজ পালন করবে, না ইচ্ছে করলে পরের বছর করতে পারবে? এর উত্তরে ইমামগণ দু ভাগ হয়ে গেছেন–

ক. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও তাঁর মত সমর্থনকারীদের অভিমত হলো, হজ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ওয়াজিব। অর্থাৎ যে বছর হজ ফরজ হবে সেই বছরই হজ আদায় করতে হবে। কারণ–

১. বিলম্ব করলে পরের বছর সে বেঁচে নাও থাকতে পারে,

২. অথবা তার সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে,

৩. অথবা হজ পালনে কোনো বাধা দেখা দিতে পারে যার ফলে ঐ ব্যক্তির উপর হজের ফরজ অনাদায়ী থেকে যাবে এবং এজন্য সে গুনাহগার হবে। তা ছাড়া পরবর্তীতে হজ করার অর্থ হজের أَدَاءٌ নয়, কাজা করা। আর ইচ্ছে করে ফরজ হজকে এভাবে فَوْت করা বৈধ নয়, কাজেই হজ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা আবশ্যক।

খ. ইমাম মুহাম্মদ ও তাঁর মতানুসারীদের অভিমত হলো, হজ বিলম্বে আদায়সহ ফরজ। এ কথার অর্থ হলো, কারো উপর যদি এ বছর হজ ফরজ হয়, তাহলে সে ইচ্ছে করলে তাৎক্ষণিকভাবে এ বছরই হজ পালন করবে কিংবা ইচ্ছে করলে পরের যে-কোনো মৌসুমে সুবিধে মতো তা পালন করলেও চলবে। কাজেই হজ তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয় ফরজ নয়; বরং বিলম্বে পালনীয় ফরজ।

তিনি দলিল হিসেবে রাসূল ﷺ -এর কর্মজীবন উল্লেখ করে বলেন, হজ ফরজ হয়েছে ষষ্ঠ হিজরি মতান্তরে নবম হিজরিতে, অথচ মহানবী ﷺ তা আদায় করেছেন দশম হিজরিতে। হজ যদি তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয় ফরজ হতো তাহলে রাসূল ﷺ আদৌ দেরি করতেন না। কাজেই হজ বিলম্বে পালনীয় ফরজ এবং তা যে-কোনো বছর পালন করলেই আদায় হয়ে যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, বিলম্ব করতে গিয়ে যদি কেউ ঐ ফরজ হজ জীবনে আর পালন করতে না পারে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে ঐ ব্যক্তি গুনাহগার হবে।

قَوْلُهُ إِنَّ هٰذَا الْخِلَافَ بَيْنَهُمَا مَبْنِيٌّ الخ : কোনো কোনো মুতাআখখিরীনের ধারণা হলো, সাহেবাইনের মতপার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে أَمْر مُطْلَقْ -এর বিধান তাৎক্ষণিকভাবে বা বিলম্বের জন্য হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের মতপার্থক্য থাকা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, أَمْر مُطْلَقْ তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব হওয়ার জন্য আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে أَمْر مُطْلَقْ বিলম্বে ওয়াজিব হওয়ার জন্য। আর أَمْر بِالْحَجِّ যেহেতু أَمْر مُطْلَقْ তাই ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে হজ তাৎক্ষণিকভাবে ফরজ, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে হজ বিলম্বে ফরজ।

অতএব أَمْر مُطْلَقْ -এর ব্যাপারে মতপার্থক্যের কারণে أَمْر بِالْحَجِّ -এর ব্যাপারেও মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার ধারণাটি ভুল।

قَوْلُهُ اَمْرٌ مُطْلَقٌ : উসূলুল ফিক্‌হ-এর ভাষায় مُطْلَقٌ-এর বিপরীত হচ্ছে مُقَيَّدٌ , কাজেই مُطْلَقٌ অর্থ– শর্তহীন Common ইত্যাদি। اَمْرٌ مُطْلَقٌ অর্থ হলো– শর্তহীন আজ্ঞা, আদেশ। যেমন আল্লাহর বাণী–

اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ / وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

এখানে اَتِمُّوْا ফে'লটি আমরে মুতলাক। কতিপয় মুতাআখখিরীন ফুকাহা মনে করেন, এ اَمْرٌ مُطْلَقٌ নিয়েই সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে দ্বন্দ্ব হয়েছে। তাঁদের মতে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) মনে করেন, اَمْرٌ مُطْلَقٌ [শর্তহীন আজ্ঞা] اَلْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ এ কথার উপর দলিল এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) মনে করেন, اَمْرٌ مُطْلَقٌ [শর্তহীন আজ্ঞা] اَلْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى التَّرَاخِيْ এ কথার উপর দলিল। এটা ছিল সাহেবাইন সম্পর্কে মুতাআখখিরীন ওলামার ধারণা, যা শরহে বিকায়া প্রণেতা এই বলে উড়িয়ে দিয়েছেন যে, وَهٰذَا غَيْرُ صَحِيْحٍ لِاَنَّ الْاَمْرَ الْمُطْلَقَ لَا يُوْجِبُ الْفَوْرَ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَهُمَا অর্থাৎ "তাদের এ কথা বিশুদ্ধ নয়; কারণ اَمْرٌ مُطْلَقٌ কোনো কিছুকে তাৎক্ষণিক পালনীয় ফরজ করে না– এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) উভয়ই একমত।"

وَقْتُ فَرْضِيَّةِ الْحَجِّ : হজ ফরজ হওয়ার সময় সম্পর্কে মনীষীগণ বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেছেন। যেমন–

১. কতিপয় আলেমের মতে, হিজরতের পূর্বেই হজ ফরজ হয়েছে। তবে সুযোগ-সুবিধা না থাকার কারণে মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম হিজরতের পূর্বে হজ পালন করতে পারেননি।

২. হযরত ওয়াকেদীর মতে, হজ ৫ম হিজরিতে ফরজ হয়েছে। তিনি দলিল পেশ করেন যে, হযরত ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ ৫ম হিজরিতে নবী করীম ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে হজ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, হজ ৫ম হিজরিতে ফরজ হয়েছে।

৩. আল্লামা রাফেয়ী (র.) বলেন, حَجّ ষষ্ঠ হিজরিতে ফরজ হয়েছে।

৪. কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস বলেন, হজ ৭ম হিজরিতে ফরজ হয়েছে।

৫. আল্লামা মারেদীর মতে, হজ ৮ম হিজরিতে ফরজ হয়েছে।

৬. ইমামুল হারামাইনের মতে, হজ ৯ম হিজরিতে ফরজ হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا -

এ আয়াত দ্বারা হজ ফরজ হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হয়েছে। আর এ আয়াত ৯ম হিজরিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই বিশুদ্ধ মত অনুসারে হজ ৯ম হিজরিতে ফরজ হয়েছে।

উল্লেখ্য, নবম হিজরিতে হজ ফরজ হওয়ার পর নবী ﷺ দশম হিজরিতে তথা একবৎসর পরে ফরজ হজ আদায় করার কারণ হলো, সাহাবায়ে কেরামকে হজের বিধিবিধান শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনে নবী করীম ﷺ হজ ফরজ হওয়ার পরবর্তী বছর তথা দশম হিজরিতে হজ পালন করেন।

❖ **যেসব কারণে হজে যাওয়া ঠিক নয় :** নিম্নবর্ণিত কারণে হজে যাওয়া ঠিক নয়–

১. মহিলার সাথে হজব্রত পালনকালীন সময়ে তার স্বামী বা মুহাররাম না থাকলে।

২. যদি কোনো ব্যক্তি এরূপ হয় যে, সে তার পিতামাতার পাশে না থাকলে তাদের কষ্ট হয় বা ক্ষতি হয়, তাহলে সে পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত হজে যাওয়া মাকরূহ।

৩. সন্তানাদি বা স্ত্রী বা যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত তাদের খোঁজখবর নেওয়ার মতো যদি কোনো লোক না থাকে, যে কারণে তাদের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তখন তার সফর করা উচিত নয়।

৪. পাওনাদারের অনুমতি ব্যতীতও সফরে যাওয়া উচিত নয়।

فَمَسْأَلَةُ الْحَجِّ مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ فَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) وُجُوْبُهُ بِالْفَوْرِ اِحْتِرَازًا عَنِ الْفَوْتِ حَتّٰى اِذَا اَتٰى بِهِ بَعْدَ الْعَامِ الْاَوَّلِ كَانَ اَدَاءً عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وُجُوْبُهُ عَلَى التَّرَاخِيْ بِشَرْطِ اَنْ لَا يَفُوْتَ حَتّٰى لَوْ لَمْ يُؤَدِّ فِى الْعَامِ الْاَوَّلِ وَاَدّٰى فِى الثَّانِىْ وَالثَّالِثِ يَكُوْنُ اَدَاءً اِتِّفَاقًا وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ وَمَاتَ يَكُوْنُ اٰثِمًا اِتِّفَاقًا اَمَّا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) فَظَاهِرٌ وَاَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) فَلِاَنَّهُ فَاتَ عَنِ الْعَامِ الْاَوَّلِ وَعَدَمُ فَوْتِهِ فِى الْعُمُرِ مَشْكُوْكٌ فَيَكُوْنُ اٰثِمًا مَوْقُوْفًا فَاِنْ اَدّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ يَرْتَفِعُ الْاِثْمُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لَا يَرْتَفِعُ الْاِثْمُ لِلتَّاخِيْرِ فَثَمَرَةُ الْخِلَافِ اَنَّهُ اِنْ اَدَاهُ بَعْدَ الْعَامِ الْاَوَّلِ يَأْثِمُ بِالتَّاخِيْرِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رحـ) ـ

অনুবাদ : সুতরাং হজের মাসআলাটি একটি স্বতন্ত্র মাসআলা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব এজন্য যেন হজ অনাদায় থেকে না যায়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে হজ পালন না করে যদি পরবর্তী কোনো বৎসর পালন করে, তাহলে তাঁর মতে কাজা হবে না; বরং আদা হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অনাদায়ী থেকে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলে বিলম্বে পালন করাতে কোনো বাধা নেই। এমনকি যদি প্রথম বৎসর আদায় না করে থাকে বরং দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসর আদায় করে, তবে সকলের ঐকমত্যে আদায় হয়ে যাবে। প্রথম বৎসর আদায় না করে যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে সে গুনাহগার হবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে গুনাহগার হওয়া সুস্পষ্ট। [কেননা, তাঁর মতে হজ বিলম্বের অবকাশ ব্যতীত তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ফরজ।] কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট গুনাহগার এজন্য হবে যে, হজ প্রথম বৎসর হতেই আদায়বিহীন রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সারা জীবনে যে ফাওত হবে না এ কথা নিঃসন্দেহ নয়। এজন্য সাময়িকভাবে গুনাহগার হবে। আর পরে যদি আদায় করে দেয়, তাহলে হজ তো আদায় হয়ে যাবেই, বিলম্বের গুনাহও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দূরীভূত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, বিলম্বের গুনাহ দূরীভূত হবে না। এখন উভয় ইমামের মধ্যে মতবিরোধের ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, প্রথম বৎসরের পরে যদি আদায় করে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, বিলম্বের কারণে গুনাহগার হবে, কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে গুনাহগার হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ الخ **:** এখানে কতিপয় মুতাআখখিরীনের ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। কোনো কোনো মুতাআখখিরীনের ধারণা এই যে, اَمْر مُطْلَقْ দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে বা বিলম্বের অবকাশের সাথে ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সাহেবাইনের মতভেদ রয়েছে বিধায় সাহেবাইনের মধ্যে اَمْر بِالْحَجّ -এর ব্যাপারেও মতভেদ দেখা দিয়েছে। কাজেই ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে হজ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে وَاجِبٌ عَلَى التَّرَاخِىْ কিন্তু কোনো কোনো মুতাআখখিরীনের এরূপ ধারণা বৈধ নয়। কেননা, সাহেবাইনের সর্বসম্মত মতে اَمْر مُطْلَقْ সাথে সাথে وَاجِبْ হওয়ার জন্য নয়। অতএব হজব্রত আদায়ের বিষয়টির নির্ভর اَمْر مُطْلَقْ -এর وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ হওয়ার জন্য নয় : বরং তা একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক মাসআলা, বাকি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এজন্য হজকে وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ বলেছেন, যেন হজ জীবনে আদায়বিহীন থেকে না যায়।

قَوْلُهُ اِخْتِرَازًا عَنِ الْفَوْتِ : এখানে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের স্বপক্ষে দলিল পেশ করা হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হজ তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব হওয়ার মতামত ব্যক্ত করেছেন مُكَلَّفْ ব্যক্তি হজ অনাদায় হতে বেঁচে থাকার জন্য। কারণ, হজ করা বিলম্বে ওয়াজিব হলে হজের দায়িত্ব আরোপিত ব্যক্তি বিলম্বে হজ করা যাবে, এ ভেবে হজব্রত পালনে অলসতা করবে। বস্তুত পরের বছর সে বেঁচে থাকবে কিনা বা সুস্থতা ও হজের শর্তাবলি তার মধ্যে পাওয়া যাবে কিনা এর নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং পরের বছরের অপেক্ষায় থাকা অনুচিত।

قَوْلُهُ يَكُوْنُ اَدَاءً اِتِّفَاقًا : যার উপর হজ ফরজ হয়েছে সে যদি হজ ফরজ হওয়ার বছর আদায় না করে পরবর্তীতে হজ আদায় করে, তাহলে হজ পালনে দেরি করার কারণে সে ব্যক্তি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে গুনাহগার হবে, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে গুনাহগার হবে না। তবে উভয় ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, তার পরে আদায় করার কারণে তা কাজা হবে না ; বরং আদায়ই হবে। ব্যাখ্যাকারের উক্তি اِتِّفَاقًا দ্বারা উভয়ের এ ঐকমত্যই বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ فَيَكُوْنُ اٰثِمًا مَوْقُوْفًا : হজের ফরজ আরোপিত ব্যক্তি ফরজ হওয়ার বছর হজ আদায় না করে যদি বিলম্ব করে এবং হজ আদায় ব্যতীতই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতভাবে গুনাহগার হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার গুনাহগার হওয়া প্রকাশ্য ব্যাপার। কারণ, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যেখানে হজের ব্যাপারে বিলম্ব বৈধ নয়, সে ক্ষেত্রে ফাওত বা বাদ যাওয়া কিছুতেই বৈধ হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে গুনাহগার এজন্য যে, হজ যদিও বিলম্ব করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু আদায়বিহীন থেকে না যাওয়া শর্ত। এখানে বিলম্বের দ্বারা আদায়বিহীন রয়ে গেছে, তাই সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে।

قَوْلُهُ فَاِنْ اَدّٰى بَعْدَ الخ : ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রথম বছর আদায় না করলে গুনাহগার হবে। কিন্তু যদি পরে কোনো বছর আদায় করে, তাহলে সে গুনাহ রহিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَثَمَرَةُ الْخِلَافِ اَنَّهُ الخ : প্রথম বছর বলতে ঐ বছর বুঝায় যাতে হজ ফরজ হয়েছে। তখন যদি কেউ প্রথম বছর হজ পালন না করে; বরং দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বছর হজ পালন করে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে তা اَدَاءٌ হবে قَضَاءٌ হবে না। এজন্য যে, হজের সময়ের মধ্যে অবকাশ রয়েছে। সারা জীবনে একবার হজ পালন করা দায়িত্ব। যদি কেউ একবারের অধিক হজ পালন করে তবে তা নফল হবে, এটা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু সাথে সাথে পালন করার বিধানের ব্যাখ্যা এই যে, বিলম্ব করলে অপরাধ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে হজব্রত বিলম্বে পালন করলেও গুনাহ হবে না, যদি পরে হজব্রত পালন করে থাকে। হ্যাঁ পরেও যদি হজব্রত পালন না করে এবং হজ আদায়বিহীন রয়ে যায়, তাহলে ফরজ আদায় না করার দরুন সে গুনাহগার হবে। এ মর্মে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর প্রমাণ এই যে, নবী করীম ﷺ -এর উপর নবম হিজরিতে অথবা মতান্তরে ষষ্ঠ হিজরিতে হজ ফরজ হয়েছিল, কিন্তু তিনি বিলম্ব করে দশম হিজরিতে হজব্রত আদায় করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হজ বিলম্বে পালন করা জায়েজ আছে, নতুবা মহানবী ﷺ হজব্রত পালনে বিলম্ব করতেন না।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. مَحْرَمْ : এমন ব্যক্তি যার সাথে মহিলার বিবাহ হারাম। যেমন– ছেলে, ভাই, পিতা, চাচা প্রমুখ।

২. مَسِيْرَةُ سَفَرٍ : তিনদিন তিনরাতের পথ। আমাদের দেশীয় হিসাব মতে, ৪৮ মাইল বা তদূর্ধ্ব পথ।

৩. اَلْمُتَاَخِّرِيْنَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ফিকহ সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ ও তাঁদের সমসাময়িক অন্যান্য ফিক্হবিদগণকে مُتَقَدِّمِيْن বলা হয়। তাঁরা হলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম যুফার (র.) ও তাঁদের অন্যান্য সমসাময়িকগণ, আর তাঁদের পরবর্তীগণকে مُتَاَخِّرِيْنَ বলা হয়।

৪. اَلْاَمْرُ الْمُطْلَقُ : اَمْر مُطْلَق ঐ আমর বা আজ্ঞাসূচক ক্রিয়াকে বলা হয় যা কোনো সময়ের সাথে নির্ধারিত নয় এবং তাতে وُجُوْب বা عَدَمِ وُجُوْب বুঝায় এমন কোনো قَرِيْنَةٌ বা ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না।

৫. صَاحِبَيْنِ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে একত্রে صَاحِبَيْنِ বলা হয়।

فَلَوْ اَحْرَمَ صَبِيٌّ فَبَلَغَ اَوْ عَبْدٌ فَعَتَقَ فَمَضٰى لَمْ يُؤَدِّ فَرْضَهٗ فَلَوْ جَدَّدَ الصَّبِيُّ اِحْرَامَهٗ لِلْفَرْضِ ثُمَّ وَقَفَ جَازَ عَنْهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ لِاَنَّ اِحْرَامَ الصَّبِيِّ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا لِعَدَمِ الْاَهْلِيَّةِ وَاِحْرَامُ الْعَبْدِ لَازِمٌ فَلَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوْجُ عَنْهُ بِالشُّرُوْعِ فِيْ غَيْرِهٖ وَفَرْضُهُ الْاِحْرَامُ وَالْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ وَاجِبُهٗ وُقُوْفُ جَمْعٍ وَهُوَ الْمُزْدَلِفَةُ وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَ رَمْىُ الْجِمَارِ وَطَوَافُ الصَّدْرِ لِلْاٰفَاقِىْ وَالْحَلْقُ وَغَيْرُهَا سُنَنٌ وَاٰدَابٌ وَاَشْهُرُهٗ شَوَّالٌ وَ ذُوالْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِى الْحِجَّةِ وَكُرِهَ اِحْرَامُهٗ لَهٗ قَبْلَهَا وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَهِىَ طَوَافٌ وَسَعْىٌ وَلَا وُقُوْفَ لَهَا وَجَازَتْ فِىْ كُلِّ السَّنَةِ وَكُرِهَتْ فِىْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ اَرْبَعَةٍ بَعْدَهَا ـ

অনুবাদ : আর যদি কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ইহরাম বাঁধে এবং ইহরাম অবস্থায় বালেগ হয়, অথবা গোলাম ইহরাম বাঁধে এবং ইহরাম অবস্থায় স্বাধীন হয় এবং হজের আরকান [কার্যক্রম] আদায় করে এমতাবস্থায় তার হজের ফরজ আদায় হবে না। আর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান যদি ইহরাম অবস্থায় বালেগ হওয়ার পর ফরজ হজের জন্য পুনঃ ইহরাম বাঁধে এবং তারপর আরাফায় অবস্থান করে তবে তার ফরজ হজের জন্য তা বৈধ হবে। আর গোলামের অবস্থা এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ এরূপ করায় গোলামের পক্ষ হতে ফরজ হজ আদায় হবে না। কেননা, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের উপর তার অযোগ্যতার কারণে ইহরাম আবশ্যক ছিল না। কিন্তু গোলামের ইহরাম আবশ্যক ছিল এবং তার বাঁধা ইহরাম আবশ্যকীয় হিসেবেই হয়েছে। সুতরাং গোলামের জন্য তা সম্ভব নয় যে, সে অন্য কাজ আরম্ভ করার মাধ্যমে পূর্বের ইহরাম হতে বের হয়ে যাবে। হজের ফরজ হচ্ছে– ইহরাম বাঁধা, আরাফায় অবস্থান করা এবং তাওয়াফে যিয়ারত করা। হজের ওয়াজিব হচ্ছে– জাম' তথা মুযদালিফায় অবস্থান করা, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে দৌড়ানো, পাথর নিক্ষেপ করা, মক্কার বাহিরের মানুষের জন্য তাওয়াফে সদর বা বিদায়কালীন তওয়াফ এবং ইহরাম ভঙ্গ করার জন্য মাথা মুণ্ডানো। এ সমস্ত ফরজ এবং ওয়াজিব ব্যতীত অপরাপর সমুদয় কাজ সুন্নত ও মোস্তাহাব। হজের মাস হলো শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহজের প্রথম দশদিন। এ মাসসমূহের পূর্বে হজের জন্য ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। ওমরা হলো সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর তা হলো, তওয়াফ এবং সায়ী অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ায় দৌড়ানো। ওমরার জন্য আরাফায় অবস্থান নেই। বছরের যে-কোনো দিন তা আদায় করা বৈধ, তবে আরাফায় অবস্থানের দিন এবং এর পরে চারদিন [ওমরা করা] মাকরূহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَلَوْ اَحْرَمَ صَبِيٌّ الخ **:** এখানে অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং ক্রীতদাসের হজের হুকুম তথা তাদের উপর হজ ফরজ না হওয়ার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মোটকথা, তারা হজ করলে নফল হজ আদায় হবে; ফরজ হজ আদায় হবে না। কেননা, তাদের মধ্যে ফরজ হওয়ার যোগ্যতা নেই, তবে হজ পালন করার যোগ্যতা অবশ্যই আছে। তাই বালেগ হওয়ার বা আজাদ হওয়ার পর শর্তানুসারে হজ ফরজ হলে পুনরায় হজ আদায় করতে হবে। নাবালেগ অথবা গোলাম যদি হজের ইহরাম বাঁধে এবং ইহরাম অবস্থায় বালেগ হয় বা গোলাম আজাদ হয় এবং একই ইহরামে হজের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে তবে তা ফরজ হজ হবে না। কেননা, তারা নফল হজের জন্য ইহরাম বেঁধেছিল। কিন্তু নাবালেগ যদি বালেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

নফল হজের ইহরাম ভঙ্গ করে ফরজ হজের নিয়তে পুনরায় ইহরাম বাঁধে অবশ্যই তা ফরজ হজ হবে। কিন্তু শর্ত হলো, তা আরাফায় অবস্থানের পূর্বে হতে হবে। কারণ, আরাফায় অবস্থান হলো হজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন। কিন্তু গোলাম মুহরিম অবস্থায় আজাদ হয়ে সে ইহরাম ভঙ্গ করে ফরজ হজের ইহরাম বাঁধতে পারে না। কারণ সে মুকাল্লাফ, তাই তার ইহরাম আবশ্যক। এ ইহরাম ভঙ্গ করে অন্য কোনো ইহরাম তার জন্য বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ وَقَفَ جَازَ عَنْهُ الخ : এখানে উকূফে আরাফার পূর্বে বা পরে পুনরায় ইহরাম বাঁধার বিধান আলোচনা করা হয়েছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের বালেগ হওয়ার পর পুনরায় ইহরাম বাঁধা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- ثُمَّ وَقَفَ جَازَ عَنْهُ এতে প্রমাণিত হলো যে, এরূপ পুনরায় ইহরামের পরে যদি وُقُوْفُ بِعَرَفَةَ হয়, তাহলে এরূপ পুনরায় ইহরাম দ্বারা তার হজ ফরজ হজ হিসেবে পরিগণিত হবে। আর وُقُوْفُ بِعَرَفَةَ যদি তার পুনরায় ইহরামের পূর্বে হয়, তাহলে হজ ফরজ হিসেবে পরিগণিত হবে না। কেননা, তার হজের বড় অংশ তার মুকাল্লাফ হওয়া অবস্থায় ইহরামের দ্বারা হয়নি। আর মুকাল্লাফ অবস্থায় হজের ইহরাম ব্যতীত অন্য ইহরাম করা ফরজ হজের জন্য যথেষ্ট নয়।

قَوْلُهُ وَفَرْضُهُ الْاِحْرَامُ الخ **হজের শর্ত ও রোকন :** হজের ফরজ তিনটি। যথা- ১. ইহরাম বাঁধা, ২. আরাফার ময়দানে অবস্থান করা এবং ৩. তাওয়াফে যিয়ারত করা। প্রথমোক্ত ফরজ হলো শর্ত এবং অবশিষ্ট দুটি ফরজ। মূলত মনে মনে হজের নিয়ত করে হজের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হওয়া এবং এমন সব কার্যাবলি নিজের জন্য হারাম করে নেওয়া যা প্রকৃতপক্ষে মুবাহ; কিন্তু হজের মর্যাদা রক্ষার্থে আপাতত নিজের উপর হারাম করা হয়েছে। আর তাওয়াফে যিয়ারত অর্থ হলো সে তওয়াফ, যা কুরবানির তিন দিনের যে-কোনো একদিন করা যায়। অর্থাৎ জিলহজের ১০, ১১ বা ১২ তারিখের যে-কোনো একদিন।

قَوْلُهُ وَ وَاجِبُهُ وُقُوْفُ الخ : হজের ওয়াজিব পাঁচটি। যথা- ১. মুযদালিফায় অবস্থান করা, ২. সাফা-মারওয়া নামক পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাতবার দৌড়ানো, ৩. মিনায় নির্দিষ্ট এক স্থানে জিলহজের ১০ তারিখে সাতটি পাথর এবং ১১ ও ১২ তারিখে প্রতিদিন একুশটি করে পাথর নিক্ষেপ করা, ৪. বহিরাগতদের জন্য অর্থাৎ মক্কার বাহির হতে আগত লোকদের জন্য তাওয়াফে সদর করা। অর্থাৎ হজের কার্যাদি সমাপ্ত করে দেশে ফেরার সময় শেষবার তথা বিদায় হওয়ার সময় তওয়াফ করা। মক্কার অধিবাসীগণ যেহেতু কোনো দিকে প্রত্যাবর্তন করে না, তাই এ তওয়াফ তাদের জন্য অপরিহার্য নয় এবং ৫. ইহরাম ভঙ্গ করার জন্য মাথার চুল মুণ্ডাতে বা কাটতে হবে।

قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا سُنَنٌ الخ : আলোচ্য উক্তি দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো, হজের মধ্যে উল্লিখিত ফরজ ও ওয়াজিব কার্যাদি ব্যতীত অন্যান্য সকল কাজ মাসনূন বা শিষ্টাচারসুলভ। এ সকল কার্য করলে ছওয়াব অর্জিত হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে এ সকল কাজ তরক করা অনুচিত। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে ছুটে গেলে কোনো গুনাহ হবে না।

قَوْلُهُ وَاَشْهُرُهُ شَوَّالُ الخ : হজের মাসসমূহকে নির্ধারিত মাস বলা হয়েছে। আর মাসসমূহ হলো- ১. শাওয়াল, ২. জিলকাদ, ৩. জিলহজের প্রথম দশদিন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ الخ

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. اِثْمٌ مَوْقُوْفٌ : এমন অপরাধকে বলা হয় যার অস্তিত্ব অন্য কোনো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন- এখানে কোনো ব্যক্তি যদি যে বছর তার জিম্মায় হজ ফরজ হয়েছে সে বছর হজ না করে, তবে সে اِثْمٌ مَوْقُوْفٌ সম্পন্ন করল। অর্থাৎ যদি পরবর্তী কোনো বছর হজব্রত আদায় করে, তাহলে তার গুনাহ দূরীভূত হয়ে যাবে। আর যদি পরে সে হজ পালন না করে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে গুনাহগার হয়ে মৃত্যুবরণ করল। তার অপরাধী হওয়া তার কোনো কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই এ অপরাধকে اِثْمٌ مَوْقُوْفٌ বলা হয়।

২. اِحْرَامٌ : অভিধানে اِحْرَامٌ অর্থ- হারাম করা, নিষিদ্ধ করা। আর পরিভাষায় ইহরাম বলে অন্তর সহকারে তালবিয়া অথবা তার পরিবর্তে অন্য কোনো দোয়া পাঠ করার মাধ্যমে হজের নিয়ত করা। কেননা, হজব্রত পালনকারী যখন হজ অথবা উমরার অথবা উভয়ের দৃঢ় নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করে, তখন তার উপর নির্দিষ্ট কিছু মুবাহ ও হালাল বিষয় ইহরামের দরুন হারাম হয়ে যায়। এজন্য একে ইহরাম বলা হয়। আর রূপক অর্থে সে দুটি চাদরকে ইহরাম বলা হয়, যা ইহরাম অবস্থায় হাজীগণ পরিধান করে থাকেন।

৩. عَدَمُ الْاَهْلِيَّةِ : এর দ্বারা এখানে غَيْرُ مُكَلَّفٌ হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, مُكَلَّفٌ হওয়ার জন্য مُسْلِمٌ ، عَاقِلٌ ، بَالِغٌ হওয়া অপরিহার্য। আর এখানে صَبِىٌّ বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় সে مُكَلَّفٌ নয় বলে তাকে عَدَمُ الْاَهْلِيَّةِ বলা হয়েছে।

৪. وُقُوْف عَرَفَةْ : আরাফাহ এমন এক স্থানের নাম যা মক্কা শরীফ হতে নয় মাইল দূরে অবস্থিত। আরাফায় وُقُوْف-এর অর্থ হলো জিলহজ মাসের নবম তারিখে আরাফাহ নামক স্থানে অল্প সময়ের জন্য হলেও অবস্থান করা। আরাফায় এ অবস্থান হজের সর্ববৃহৎ অঙ্গ বা রোকন।

৫. طَوَافُ زِيَارَتْ : এর দ্বারা ঐ তওয়াফকে বুঝায় যা জিলহজ মাসের দশ, এগারো ও বারো তারিখের কোনো এক তারিখে করা হয়।

৬. وُقُوْف جَمْع : এখানে جَمْع শব্দের অর্থ– مُزْدَلِفَهْ আর وُقُوْف جَمْع দ্বারা মুযদালিফায় অবস্থান করাকে বুঝানো হয়েছে। আর মুযদালিফাটি আরাফাহ এবং মিনার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। এখানে হাজীগণ আরাফাহ হতে ফেরার পথে অবস্থান করেন এবং মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করেন।

৭. صَفَا وَ مَرْوَهْ : এটা বায়তুল্লাহ শরীফের নিকটবর্তী দুটি পাহাড়ের নাম। হাজীগণ সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাতবার দৌড়ান।

৮. مِنٰى : মিনা তা মক্কা হতে তিন মাইল পূর্বে একটি পল্লীর নাম, যেখানে কুরবানি করা হয় এবং নির্দিষ্ট স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয়। এ স্থানটি হেরেম শরীফের অন্তর্ভুক্ত।

৯. رَمْىُ جِمَارْ : মিনার এক নির্দিষ্ট স্থানে জিলহজের ১০ তারিখে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করা। তারপর এগারো এবং বারো তারিখের প্রতিদিনে তিনটি নির্দিষ্ট স্থানে একুশটি কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

১০. طَوَافُ صَدْر : হজের কার্যাদি হতে অবসর হওয়ার পর বাড়ির দিকে ফেরার সময় শেষবার তওয়াফ করার নাম তাওয়াফে সদর। মক্কাবাসীর জন্য এ তওয়াফ করার দায়িত্ব নেই। কেননা, তারা হজব্রত পালন শেষ করার পর প্রত্যাবর্তন করার প্রশ্ন নেই।

১১. اَفَاقِىْ : তা বলতে ঐ সকল লোকদেরকে বুঝায় যারা মক্কার বাইরের লোক, তাদের উপর তাওয়াফে সদর ওয়াজিব।

১২. عُمْرَهْ : ইহরাম বেঁধে তওয়াফ করা এবং সায়ী করা, তারপর হলক অথবা কসরের মাধ্যমে ইহরাম ভঙ্গ করা। আরাফার দিন এবং তার পরের চারদিন ব্যতীত বছরের যে-কোনো সময় উমরা করা বৈধ। উমরার জন্য হজের ন্যায় وُقُوْف مِنٰى ـ وُقُوْفْ عَرَفَهْ ও وُقُوْفْ مُزْدَلِفَةْ এবং رَمْىُ جِمَارْ ইত্যাদি কিছুই নেই।

وَمِيْقَاتُ الْمَدَنِىْ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَالْعِرَاقِىْ ذَاتُ عِرْقٍ وَالشَّامِىْ جُحْفَةُ وَالنَّجْدِىْ قَرْنٌ وَالْيَمَنِىْ يَلَمْلَمْ وَ حُرِّمَ تَاخِيْرُ الْاِحْرَامِ عَنْهَا لِمَنْ قَصَدَ دُخُوْلَ مَكَّةَ لاَ التَّقْدِيْمُ وَحَلَّ لِاَهْلِ دَاخِلِهَا دُخُوْلُ مَكَّةَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَمِيْقَاتُهُ الْحِلُّ اَىْ مَنْ هُوَ دَاخِلَ الْمَوَاقِيْتِ لٰكِنَّهُ خَارِجُ مَكَّةَ فَمِيْقَاتُهُ الْحِلُّ اَىْ خَارِجُ الْحَرَمِ وَلِمَنْ سَكَنَ بِمَكَّةَ لِلْحَجِّ الْحَرَمُ وَ لِلْعُمْرَةِ اَلْحِلُّ لِاَنَّ الْحَجَّ فِىْ عَرَفَاتٍ وَهِىَ فِى الْحِلِّ فَاِحْرَامُهُ مِنَ الْحَرَمِ وَالْعُمْرَةُ فِى الْحَرَمِ فَاِحْرَامُهُ مِنَ الْحِلِّ لِيَتَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَرٍ ـ

অনুবাদ : মদিনাবাসী তথা মদিনার দিক হতে আগমনকারী লোকদের ইহরামের মীকাত যুলহুলাইফা নামক স্থান, ইরাকবাসীদের জন্য যাতে ইরক, শাম দেশীয়দের বর্তমান সিরিয়াবাসীদের জন্য মীকাত জুহ্‌ফা, নজদবাসীদের মীকাত কারন, আর ইয়েমেনবাসীদের জন্য মীকাত ইয়ালামলাম। [তা ছাড়া সামুদ্রিক পথে যারা হজ করতে যায় তাদের জন্যও মীকাত ইয়ালামলাম। যে ব্যক্তি মক্কায় প্রবেশের ইচ্ছা করে তার জন্য ইহরামবিহীন অবস্থায় এ স্থানসমূহ অতিক্রম করা হারাম। তবে এ স্থানে পৌঁছার পূর্বে ইহরাম বাঁধা হারাম নয় [বরং তা বৈধ]। মীকাতের অভ্যন্তরে অথচ মক্কার বাহিরে যারা বসবাস করে তাদের জন্য ইহরামবিহীন মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ। তাদের ইহরামের জন্য মীকাত হলো হিল। অর্থাৎ যারা মীকাতের অভ্যন্তরে অথচ মক্কা শরীফের বাইরে বাস করে তাদের মীকাত হলো হিল তথা হেরেমের বাহির। আর যে ব্যক্তি মক্কার অভ্যন্তরে বসবাস করে তার হজের ইহরামের মীকাত হলো হেরেম এবং ওমরার ব্যাপারে হিল। এ কারণে যে, হজ আরাফায় হয়ে থাকে। আর সে আরাফাহ এলাকা হিল -এ অবস্থিত। সুতরাং তার হজের ইহরাম হেরেমে হতে হবে, আর উমরা হবে হেরেমের মধ্যে। সুতরাং তার উমরার ইহরাম হিল-এ হবে, যাতে তার একপ্রকার ভ্রমণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِيْقَاتُ الْمَدَنِىْ الخ : এখানে মীকাতের বর্ণনা করা হয়েছে। মীকাত ঐ নির্দিষ্ট স্থানকে বলা হয় যেখানে পৌঁছে মক্কায় প্রবেশে ইচ্ছুকগণ ইহরাম বাঁধে। এখানে মীকাত হিসেবে পাঁচটি স্থানের আলোচনা করা হয়েছে। اَفَاقِىْ তথা মক্কার বাহির হতে আগত লোকেরা এ সকল স্থানের কোনো এক স্থান হয়ে আসার সময় এখানে পৌঁছে ইহরাম বাঁধে। মহানবী ﷺ হতে বর্ণিত সহীহ বুখারী, মুসলিম ও সুনানের কিতাবসমূহে উল্লিখিত পাঁচটি মীকাতের কথা সাব্যস্ত হয়েছে। যথা–

১. ذُو الْحُلَيْفَةِ : এটি মদিনাবাসীদের মীকাত এবং ঐ সকল লোকের জন্যও মীকাত যারা মদিনার পথে মক্কা মুকাররমায় আসেন। এটি মদিনা থেকে মক্কায় আসার পথে প্রায় আট নয় কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।

২. ذَاتُ عِرْقٍ : এটি ইরাক এবং ইরাকের পথে আগত লোকদের মীকাত। তা মক্কা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কারো মতে ৪২ মাইল দূরে অবস্থিত।

৩. جُحْفَةُ : এটি সিরিয়া ও সিরিয়ার দিক থেকে আগমনকারী লোকদের মীকাত। মক্কা থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় একশত আশি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

৪. قَرْنٌ : মক্কা মুকাররমা থেকে পূর্ব দিকে পথের উপর এক পর্বতময় স্থান, যা মক্কা থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তা নজদবাসীদের মীকাত এবং ঐ সব লোকের মীকাত যারা এ পথে আসেন।

৫. يَلَمْلَمُ : মক্কা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইয়েমেন থেকে এসেছে এমন পথের উপর একটি পাহাড়ি স্থান, যা মক্কা থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। এটি ইয়েমেন এবং এ পথে আগমনকারী লোকদের মীকাত। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লোকের মীকাত এটাই।

قَوْلُهُ حُرِّمَ تَاخِيْرُ الْاِحْرَامِ عَنْهَا : মক্কার বাহিরের অধিবাসীগণের ইহরামের জন্য মীকাতই শেষ সীমানা। এর আগে মক্কাভিমুখে ইহরামবিহীন অবস্থায় অগ্রসর হওয়া হারাম। অবশ্য যদি কেউ মীকাত পর্যন্ত পৌঁছার আগেই ইহরাম বেঁধে নেয়, তবে অসুবিধার কিছুই নেই; বরং তা উত্তম।

قَوْلُهُ وَحَلَّ لِاَهْلِ دَاخِلِهَا الخ : মীকাতের ভিতরে অথচ মক্কার বাহিরের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা জায়েজ আছে। তাদের ইহরামের স্থান হলো হিল্ল ও হেরেম বহির্ভূত এলাকা। মক্কাবাসীদের উমরার জন্য ইহরাম বাঁধতে হিল্ল পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। তবে হজের জন্য তারা হেরেমের সীমানায় ইহরাম বাঁধতে পারবে। এর কারণ এই যে, হজ আরাফায় হয় এবং আরাফাহ হিল-এ অবস্থিত, যেখানে ইহরাম না বেঁধে থাকা যায়। তাই মক্কাবাসীগণ ওমরার জন্য হিল-এ গিয়ে ইহরাম বাঁধবে। কেননা, উমরা হেরেমেই হয়। আর উমরা হলো তওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানো। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.) এবং অপরাপর সাহাবীগণকে এ রকম শিক্ষা দান করেছেন। বুখারী, মুসলিম ও অপরাপর হাদীস গ্রন্থের আলোকে এটাই প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ وَلِمَنْ سَكَنَ بِمَكَّةَ لِلْحَجِّ الخ : মক্কায় অবস্থানকারী ব্যক্তি যদি হজের জন্য ইহরাম বাঁধে তাহলে সে মক্কাতেই ইহরাম বাঁধবে। আর তাদের মক্কাতে ইহরাম বাঁধার কারণ এই যে, হজ আরাফায় হয়। কেননা, আরাফায় অবস্থান হজের বৃহৎ রোকন, আর আরাফাহ হিলে অবস্থিত। এজন্য হেরেমে ইহরাম বাঁধার মধ্যে একপ্রকারের সফর প্রতিষ্ঠিত হবে। আর মক্কাবাসী যদি উমরার ইহরাম বাঁধে, তাহলে হিলে গিয়ে বাঁধবে। কেননা, তাতে হিলে পর্যন্ত যাওয়া দ্বারা একটি সফর প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা, উমরা হেরেমেই হয়। যেহেতু উমরা বলতে বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ীকে বুঝায়, আর এসব কাজের স্থান হলো হেরেম। কেননা, মহানবী ﷺ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীদেরকে উমরা করার এ নিয়মই শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন– সহীহ বুখারী, মুসলিম ও সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করার সময় ইহরাম বাঁধা ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করার হুকুম : পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করার সময় ইহরাম বাঁধা ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করার হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. **ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত :** ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যে ব্যক্তি হজ এবং উমরা পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করবে তার জন্য ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা বৈধ হবে না। আর যে ব্যক্তি হজ ও উমরা আদায় ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করবে তার জন্য ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ হবে। তাঁর দলিল হলো–

١. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ . (بُخَارِيْ)

অর্থাৎ "মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, উল্লিখিত মীকাত ঐ সমস্ত স্থানের অধিবাসী এবং তাদেরকে ব্যতীত যারা ঐ সকল পথে হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন তাদের জন্য।" –[বুখারী]

٢. اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ فَتْحٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ . (نَسَائِيْ)

অর্থাৎ "মহানবী ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় কালো পাগড়িবিশিষ্ট অবস্থায় ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করেন।" –[নাসাঈ]

২. **হানাফী, হাম্বলী ও মালিকীদের অভিমত :** ইমাম আবূ হানীফা (র.), সাহেবাইন (র.), ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে কোনো অবস্থাতেই إِحْرَامٌ ব্যতীত مِيْقَاتٌ অতিক্রম করা জায়েজ হবে না। চাই সে হজ ও উমরা আদায় করার নিয়ত করুক অথবা না করুক। মক্কাভূমির সম্মানার্থে মীকাত অতিক্রম করার সময় অবশ্যই ইহরাম বাঁধতে হবে। তাঁদের দলিল হলো–

١. رَوَى ابْنُ شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهٖ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهٗ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُجَاوِزُ الْمِيْقَاتَ اِلَّا بِاِحْرَامٍ .

অর্থাৎ "হযরত ইবনে শায়বাহ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করবে না।"

٢. رُوِيَ عَنِ ابْنِ الشَّعْثَاءِ اَنَّهٗ رَاٰى ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيْقَاتَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ .

অর্থাৎ "হযরত আবূ শা'ছা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রমকারীকে ফিরিয়ে দিতে দেখেছেন।"

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الشَّافِعِيِّ (رح) [ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের উত্তর] :

১. مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা নয়; বরং সাহাবীর বর্ধিত অংশ। অতএব তা مَوْقُوْفٌ যা مَرْفُوْعٌ -এর মোকাবিলায় حُجَّةٌ হতে পারে না।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.) مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ -এর مَفْهُوْمٌ مُخَالِفٌ -এর মাধ্যমে দলিল গ্রহণ করেছেন, যা আমাদের নিকট حُجَّةٌ নয়।

৩. দ্বিতীয় হাদীসের জবাব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রদান করা যায়–

اِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَا بَعْدِيْ اِنَّمَا حُلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حَرَامًا يَعْنِى الدُّخُوْلَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ .

অর্থাৎ "মক্কা শরীফ পবিত্র, আমার পূর্বে ও পরে তা আর কারো জন্য হালাল হয়নি। তবে তা আমার ব্যাপারে দিনের একাংশের জন্য হালাল হয়েছিল। অতঃপর তা হারামে পরিণত হয়েছে তথা ইহরামবিহীন তাতে প্রবেশ করা হারাম হয়েছে।" সুতরাং ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা নবী করীম ﷺ -এর বিশেষ ব্যাপার। এর দ্বারা দলিল উপস্থাপন করা যায় না।

وَمَنْ شَاءَ اِحْرَامَهُ تَوَضَّأَ وَغُسْلُهُ اَحَبُّ وَلَبِسَ اِزَارًا وَ رِدَاءً طَاهِرَيْنِ وَتَطَيَّبَ وَصَلَّى شَفْعًا وَقَالَ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ ثُمَّ لَبّٰى يَنْوِىْ بِهَا الْحَجَّ وَهِىَ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهَا وَاِنْ زَادَ جَازَ وَ اِذَا لَبّٰى نَاوِيًا فَقَدْ اَحْرَمَ فَيَتَّقِى الرَّفَثَ وَالْفُسُوْقَ وَالْجِدَالَ اَلرَّفَثُ اَلْجِمَاعُ اَوِ الْكَلَامُ الْفَاحِشُ اَوْ ذِكْرُ الْجِمَاعِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ .

অনুবাদ : ইহরাম বাঁধার নিয়ম হলো, যে ব্যক্তি হজের ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করে সে [প্রথমে] অজু করবে, গোসল করা উত্তম এবং পবিত্র সিলাইবিহীন একটি লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করবে। সুগন্ধি লাগাবে এবং দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে। সে ব্যক্তি যদি শুধু হজ করার ইচ্ছা রাখে, তবে এ দোয়া পাঠ করবে– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ "হে আল্লাহ ! আমি হজ করার সঙ্কল্প করছি। অতএব তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার তরফ থেকে তা কবুল করুন।" অতঃপর হজের নিয়তে তালবিয়া পাঠ করবে। তালবিয়া এই– لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ তালবিয়া এর চেয়ে হ্রাস করবে না, তবে যদি কিছু বৃদ্ধি করা হয় তা বৈধ হবে। নিয়ত সহকারে তালবিয়া পাঠের পর সে মুহরিম হয়ে গেল। সুতরাং এখন স্ত্রীসহবাস, পাপাচার, কামাচার, ঝগড়া-ফ্যাসাদ বা মারামারি সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলবে। আর রফাছ হলো সহবাস অথবা অশ্লীল কথাবার্তা কিংবা মহিলাদের উপস্থিতিতে সহবাসের কথাবার্তা বলাবলি করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ شَاءَ اِحْرَامَهُ الخ : উক্ত ইবারতে ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। পদ্ধতিটি হলো–

১. যে ব্যক্তি হজের ইহরাম বাঁধতে চায় তাকে প্রথমত অজু করে নিতে হবে। তবে তার জন্য গোসল করে নেওয়া উত্তম। আর এ গোসল হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য। কেননা, পবিত্রতা তো অজু দ্বারা অর্জিত হয়েছে। হ্যাঁ, যদি কারো উপর গোসল ওয়াজিব হয়ে থাকে, তবে তা আলাদা ব্যাপার।

২. তারপর সে লুঙ্গি এবং চাদর পরিধান করবে, যা নতুন বা ধৌত করা এবং পবিত্র হওয়া আবশ্যক। আর যদি কেউ উল্লিখিত দুটির স্থলে একটির উপর নির্ভর করে অথবা দুটির বেশি পরিধান করে, তাও জায়েজ। তবে সর্বাবস্থায় কাপড় সেলাইবিহীন হতে হবে।

৩. তারপর সুগন্ধি ব্যবহার করবে। কেননা, নবী করীম ﷺ ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করেছিলেন। ইমাম মালেক (র.) তা বর্ণনা করেছেন।

৪. অতঃপর দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে। কেননা, নবী করীম ﷺ যুলহুলাইফা নামক স্থানে ইহরাম বাঁধার সময় দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করেছেন।

৫. অতঃপর যদি শুধু হজের ইচ্ছা করে তাহলে এ দোয়া পাঠ করবে– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ অথবা এ জাতীয় অন্য কোনো দোয়া পাঠ করবে।

৬. অতঃপর হজের নিয়তে তালবিয়া পাঠ করবে– لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ الخ

মুহরিমের প্রকারভেদ : উল্লেখ্য, মুহরিম চার ধরনের। যথা–

১. শুধু উমরা পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম পরিধানকারী।

২. শুধু হজ্জে ইফরাদ আদায়ের উদ্দেশ্যে ইহরাম পরিধানকারী।

৩. হজ্জে কেরান অর্থাৎ উমরা ও হজ একত্রে পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম পরিধানকারী।

৪. হজ্জে তামাত্তু' তথা প্রথমে উমরা ও পরবর্তীতে হজের উদ্দেশ্যে ইহরাম পরিধানকারী।

উত্তম ইহরাম পরিধানকারী কে ? আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতে, যেহেতু হজ্জে কেরান উত্তম, তাই হজ্জে কেরানের উদ্দেশ্যে ইহরাম পরিধানকারীই সবচেয়ে উত্তম। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে হজ্জে ইফরাদ উত্তম, তাই তাঁর মতে, হজ্জে ইফরাদের জন্য ইহরাম পরিধানকারী সবচেয়ে উত্তম। আর ইমাম আহমদ-এর মতে হজ্জে তামাত্তু' উত্তম বিধায় তামাত্তু'-এর জন্য ইহরাম পরিধানকারী সবচেয়ে উত্তম।

قَوْلُهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهَا الخ : পূর্ণ তালবিয়া হলো–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ .

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ ! আমি হাজির হয়েছি। তোমার দ্বারে আমি হাজির হয়েছি। হে আল্লাহ! তোমার কোনো শরিক নেই। আমি পুনরায় উপস্থিত হয়েছি। নিশ্চয় সকল প্রশংসা এবং সকল নিয়ামত একমাত্র তোমারই জন্য। আর রাজত্ব ও অধিকার তোমারই জন্য। তোমার কোনো শরিক নেই।' তালবিয়ায় বর্ণিত শব্দ হতে কোনো কিছু হ্রাস করবে না। কেননা, নবী করীম ﷺ হতে এর চেয়ে কম বলার কোনো প্রমাণ নেই। তবে উল্লিখিত তালবিয়ার সাথে মিল ও সামঞ্জস্য আছে এমন কোনো শব্দ বৃদ্ধি করা জায়েজ আছে। যেমন– এরূপ বৃদ্ধিকরণ সাহাবীদের একদলের আমল হতে প্রমাণিত রয়েছে।

উল্লেখ্য, لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ -এর অর্থ হলো– اَقَمْتُ بِبَابِكَ اِقَامَةً بَعْدَ اُخْرٰى وَاَجَبْتُ نِدَائَكَ مَرَّةً بَعْدَ اُخْرٰى

অর্থাৎ 'আমি আপনার দ্বারে পুনর্বার উপস্থিত হয়েছি এবং পুনর্বার আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি।' আর اَللّٰهُمَّ বাক্যটি এখানে স্বতন্ত্র বাক্য। এটি মূলে ছিল يَا اَللّٰهُ . حَرْفُ نِدَاءٍ -কে বিলোপ করে তার পরিবর্তে শেষে مِيْم مُشَدَّدْ নেওয়া হয়েছে, ফলে اَللّٰهُمَّ হয়েছে। ইহরাম বাঁধার পর একবার তালবিয়া পাঠ করা ফরজ– বেশি পাঠ করা সুন্নত।

قَوْلُهُ فَيَتَّقِى الرَّفَثَ الخ : ইহরাম অবস্থায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি নিষিদ্ধ–

১. যৌনকার্যে লিপ্ত হওয়া বা যৌন সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা করা। এমনকি স্বীয় স্ত্রীর সাথেও এ ধরনের কথাবার্তায় আনন্দ উপভোগ করা নিষিদ্ধ।

২. লড়াই, ঝগড়া, গালমন্দ করা ও কর্কশ ভাষায় কথা বলা। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ الخ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার হজের নিয়ত করেছে, সে رَفَثْ [সহবাস], فُسُوْقٌ [পাপকর্ম] ও جِدَالٌ [ঝগড়া-বিবাদ] থেকে বিরত থাকবে।

৩. আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহ করা। ৪. বন্য পশু শিকার করা এবং শিকারের কাজে সহযোগিতা করা। ৫. সেলাইকৃত জামা পরিধান করা। ৬. রঙ্গিন ও সুগন্ধিযুক্ত রঙ্গে রঞ্জিত জামা পরিধান করা। মেয়েরা রেশমি ও রঙ্গিন জামা পরিধান করতে পারে। ৭. মাথা ও মুখমণ্ডল ঢাকা। মেয়েরা মাথার চুল ঢেকে রাখবে। ৮. মাথা ও দাড়ি সাবান প্রভৃতি দিয়ে ধৌত করা। ৯. শরীরের কোনো স্থানের চুল কামানো বা উঠানো। ১০. নক কাটা বা পাথর প্রভৃতিতে ঘষে সাফ করা। ১১. সুগন্ধি ব্যবহার করা। ১২. তৈল ব্যবহার করা।

ইহরাম অবস্থায় জায়েজ কাজসমূহ : উপরিউক্ত কার্যাবলি ব্যতীত অন্যসব কাজ বৈধ। যেমন–

১. কোনো ছায়ায় আরাম করা।
২. গোসল করা, মাথা ধৌত করা।
৩. শরীর বা মাথা চুলকানো।
৪. টাকা-পয়সা, অস্ত্র প্রভৃতি সাথে রাখা।
৫. অবসর সময়ে ব্যবসা করা।
৬. ইহরামের কাপড় বদলানো ও ধৌত করা।
৭. আংটি, ঘড়ি প্রভৃতি ব্যবহার করা।
৮. সুরমা লাগানো।
৯. খতনা করা।
১০. নিকাহ করা।
১১. অনিষ্টকর জীব হত্যা করা।
১২. সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করা।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. تَلْبِيَةٌ : তা হলো– لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ الخ পাঠ করা।

২. اِزَارٌ : ঐ জামাকে বলা হয় যা নাভি হতে নিম্নদেহে পরিধান করা হয়।

৩. رِدَاءٌ : ঐ কাপড়কে বলা হয় যা দেহের উপরিভাগে জড়ানো হয়।

৪. اَلْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ : ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে মীকাত হতে কেবল হজের ইহরাম বাঁধে; উমরার নয়।

فَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) لَمَّا اَنْشَدَ قَوْلُهُ شِعْرٌ وَهُنَّ يَمْشِيْنَ بِنَا هَمِيْسَا * اِنْ يَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيْسَا ـ قِيْلَ لَهُ أَتَرْفُثُ وَاَنْتَ مُحْرِمٌ فَقَالَ اِنَّمَا الرَّفَثُ مَا خُوْطِبَ بِهِ النِّسَاءُ وَالضَّمِيْرُ فِىْ هُنَّ يَرْجِعُ اِلَى الْاِبِلِ وَالْهَمِيْسُ صَوْتُ نَعْلِ اِخْفَافِهَا وَاللَّمِيْسُ اِسْمُ جَارِيَةٍ وَالْمَعْنٰى نَفْعَلُ بِهَا مَا نُرِيْدُ اِنْ يَصْدُقِ الْفَالُ وَالْفُسُوْقُ هِىَ الْمَعَاصِىْ وَالْجِدَالُ اَنْ يُجَادِلَ رَفِيْقَهُ وَقِيْلَ مُجَادَلَةُ الْمُشْرِكِيْنَ فِىْ تَقْدِيْمِ وَقْتِ الْحَجِّ وَتَاخِيْرِهِ ـ

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি আবৃত্তি করলেন– وَهُنَّ يَمْشِيْنَ بِنَا الخ "উট আমাদেরকে নিয়ে সহজে দ্রুতগতিতে চলল [যার ফলে আমরা তাড়াতাড়ি শান্তি ও নিরাপদে নিজ বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার আশা পোষণ করি] যদি এ ফাল সঠিক হয়, তাহলে আমরা লামিসের সাথে সহবাস করব।" এ কথার উপর কেউ তাঁকে বলল, আপনি ইহরাম অবস্থায় রফাছ তথা অশ্লীল কথা বলছেন? এর উত্তরে তিনি বললেন, রফাছ তো নারীদের সম্বোধন করে অশ্লীল কথা বলা। আলোচ্য কবিতায় هُنَّ যমীর اِبِلْ-এর দিকে ধাবিত হয়েছে। আর هَمِيْس অর্থ– উটের পায়ের নালের [জুতার] আওয়াজ। لَمِيْس [হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর] দাসীর নাম। পূর্ণ কবিতার অর্থ হলো, যদি ফাল বা অনুমান সঠিক হয়, তাহলে আমরা লামীস দাসীর সাথে তা-ই করব যা আমরা করার ইচ্ছা করি। আর فُسُوْق অর্থ– পাপের কাজ করা। جِدَالْ অর্থ– সাথিদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা। কেউ কেউ বলেন, হজের সময় আগে কিংবা পরে নির্ধারণ করার ব্যাপারে মুশরিকদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করাই জিদাল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُنَّ يَمْشِيْنَ الخ : আলোচ্য কবিতার বিশ্লেষণ হচ্ছে, উট আমাদেরকে নিয়ে সহজে এবং দ্রুতগতিতে চলে, যাতে আমরা নিরাপদে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছার আশা রাখি। উটের গতির প্রতি আমার ধারণা যদি বাস্তবে রূপ লাভ করে তথা ফাল সঠিক হয়, তাহলে আমরা লামীসের সাথে সহবাস করব। উটের চলার সময় তার পায়ের আওয়াজকে হামীস বলে, যখন উট সহজে তথা মধ্যম গতিতে চলে। এখানে اِنْ يَصْدُقْ-এর اِنْ অব্যয়টি شَرْطِيَّةٌ আর يَصْدُقْ পদটি শর্ত। يَصْدُقْ পদের ফায়েল তথা কর্তা হলো طَيْر যার অর্থ– ফাল। এর جَزَاءْ হলো نَنِكْ ; উল্লেখ্য যে, نَنِكْ টি مُضَارِعْ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ। বলা হয়– نَاكَ الْمَرْأَةَ অর্থাৎ সে মহিলার সাথে সহবাস করে সুখ ভোগ করেছে। কবিতার সারকথা হচ্ছে, উট আমাদেরকে নরম গতির সাথে নিয়ে চলছে যাতে আমরা উটের এ গতিকে সুলক্ষণ এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছার মাধ্যম ধারণা করছি। আর لَمِيْس হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দাসীর নাম।

قَوْلُهُ اِنَّمَا الرَّفَثُ مَا خُوْطِبَ الخ :

رَفَثْ শব্দের বিশ্লেষণ : মহিলাদের সম্মুখে যদি সহবাস সম্পর্কীয় কথাবার্তা বলা হয়, তাহলে তা رَفَثْ হবে। আর যদি মহিলাদের অনুপস্থিতিতে সহবাস সম্পর্কীয় কথাবার্তা বলা হয়, তা رَفَثْ বা অশ্লীলতা হবে না। কেননা, মহিলাদের অনুপস্থিতিতে এরূপ আলোচনা করা সহবাসের আহ্বায়ক হবে না। তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মহিলা তথা তাঁর দাসী লামীসার অনুপস্থিতিতে সহবাস সম্পর্কীয় কবিতা পড়ায় তা رَفَثْ বা অশ্লীলতা হয়নি।

قَوْلُهُ مُجَادَلَةُ الْمُشْرِكِيْنَ الخ : এখানে جِدَالٌ -এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মুশরিকগণ হজকে জিলহজ মাসের পূর্বে অথবা পরে নিয়ে যেত। এর কারণ হচ্ছে, নিষিদ্ধ মাস চারটি– ১. রজব, ২. জিলকাদ, ৩. জিলহজ ও ৪. মহররম। এসব মাসে যুদ্ধ করা হারাম এবং মুশরিকগণ এসব মাসের সম্মান করত এবং এতে যুদ্ধবিগ্রহ হতে বিরত থাকত। আর এ মাসগুলো পরস্পর কয়েক মাস হওয়ার কারণে যে তারা যুদ্ধবিগ্রহ ও ফিতনা-ফ্যাসাদ হতে বিরত থাকতে হতো, তা তাদের জন্য কঠিন হয়ে উঠল। এতে এক বছর তারা মহররমকে সফর সাব্যস্ত করত এবং বলত যে, এ বছরে জিলহজ মাসের পরে সফর চলে এসেছে, আর মহররম মাসকে পরে নিয়ে যেত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এরূপ করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করে এরশাদ করেন–

إِنَّمَا النَّسِيْئُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ . (اَلْاٰيَةُ)

অবশেষে দশম হিজরি সালে নবী করীম ﷺ -এর হজ্জাতুল বিদা-এর যুগে মুশরিকদের তথাকথিত হিসাব চিরতের শেষ হয়ে যায়।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. اَخْفَافٌ - এটা خُفٌّ -এর বহুবচন। অর্থ– মোজা। এখানে উটের পায়ে যে জুতা পরানো হয় তা বুঝানো হয়েছে।

২. اَلْفَالُ : এর অর্থ– লক্ষণ। এখানে কোথাও বা কোনো কাজে যাত্রাকালে কোনো অবস্থার উপর পরবর্তী সফলতা ও নিষ্ফলতার অনুমানকে 'ফাল' বলা হয়।

৩. هَمِيْس : উট হাঁটার সময় পায়ের পদধ্বনিকে হামীস বলা হয়, যদি উট মধ্যম গতিতে চলে।

وَقَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ لاَ الْبَحْرِ وَالْاِشَارَةُ اِلَيْهِ وَالدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ وَالتَّطَيُّبُ وَقَلْمُ الْاَظْفَارِ وَسَتْرُ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَغَسْلُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِالْخِطْمِيْ وَقَصُّهَا وَحَلْقُ رَأْسِهِ وَشَعْرُ بَدَنِهِ وَلُبْسُ قَمِيْصٍ وَسَرَاوِيْلَ وَقُبَاءٍ وَعِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ وَخُفَّيْنِ وَثَوْبٍ صُبِغَ بِمَا لَهُ طِيْبٌ اِلاَّ بَعْدَ زَوَالِ طِيْبِهِ ـ

অনুবাদ : স্থলজ প্রাণী শিকার করা হতে বিরত থাকবে। অবশ্য জলজ প্রাণী শিকার করতে পারবে। আরও বিরত থাকবে শিকার কোন দিক গিয়েছে কোন দিকে পাওয়া যাবে তার পথ শিকারিকে দেখিয়ে দেওয়া হতে। [ইহরামের অবস্থায়] সুগন্ধি লাগানো, নখ কাটা, চেহারা এবং মাথা ঢেকে রাখা, চুল দাড়ি খিতমী [এক জাতীয় সুগন্ধি ঘাস যা সাবানের কাজ দেয়] দিয়ে ধৌত করা, দাড়ি কাটা, দেহের এবং মাথার চুল কাটা বা মুড়ানো, জামা-পায়জামা, কাবা, পাগড়ি, টুপি এবং মোজা পরিধান করা। সুগন্ধিযুক্ত জিনিস দ্বারা রং করা কাপড় পরিধান করা, এসব হতে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। অবশ্য ধৌত করার পর যদি সুগন্ধি চলে যায়, তখন সে কাপড় পরিধান করা জায়েজ আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَتْلُ الصَّيْدِ الْبَرِّ الخ : এখানে স্থলভাগের প্রাণী শিকারের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইহরামের অবস্থায় স্থলজ প্রাণী যেমন– হরিণ, বন্য গরু, পাখি ইত্যাদি শিকার করা হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ– لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ এখানে ইহরামের অবস্থার কথা বলা হয়েছে। তবে ইহরাম অবস্থায় জলজ প্রাণী যেমন– মাছ শিকার করার বৈধতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ـ

قَوْلُهُ وَالْاِشَارَةُ الخ : এখানে 'শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা নিষেধ' প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় শিকারের দিকে ইঙ্গিত করাও জায়েজ নেই। ইঙ্গিত এরূপ হতে পারে যে, এমন এক ব্যক্তি যে নিজে মুহরিম নয় এবং শিকার অনুসন্ধান করছে সে শিকার দেখেনি, তবে মুহরিম ব্যক্তি তা দেখিয়ে বলে যে, ঐ যে শিকার। শিকার উপস্থিত নেই, কিন্তু মুহরিম ব্যক্তি শিকারের পদচিহ্ন দেখেছে, তবে শিকারিকে সে পদচিহ্নও দেখাবে না। পদচিহ্ন দেখানো হলো শিকারের প্রতি দিকনির্দেশ করা। হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি একটি বন্য গাধা শিকার করেছিলেন। তখন তিনি মুহরিম ছিলেন না, কিন্তু তাঁর সঙ্গী-সাথিগণ মুহরিম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা কি শিকারের দিকে ইশারা করেছিলে? তোমরা কি এই শিকারে শিকারির কোনো প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলে ? তারা সকলেই উত্তর দিলেন, জী না; আমরা কোনো রকম সাহায্য-সহযোগিতা করিনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তা হতে ভক্ষণ করতে পার। তাই প্রতীয়মান হয় যে, মুহরিম নয় এমন ব্যক্তি শিকার করলে মুহরিম ব্যক্তি তা খেতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে– মুহরিম সেই শিকারে শিকারির কোনো রকমের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَالتَّطَيُّبُ الخ : এখানে ইহরাম অবস্থায় সাজসজ্জার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সুগন্ধি লাগানো, এরপর যেসব মা'তূফ আলাইহি-এর বর্ণনা রয়েছে সব ক'টিরই বিধান এক অর্থাৎ জায়েজ নেই। কেননা, ইহরামের অবস্থায় দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী সবধরনের উপকরণ ব্যবহার নিষিদ্ধ। সুতরাং এখানে বর্ণিত সব ক'টি বস্তুই দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই ব্যবহৃত হয়। যেমন– চুল-দাড়ি কাটা, সেলাই করা কাপড় পরিধান করা, সুগন্ধি মাখা ইত্যাদি।

قَوْلُهُ وَسَتْرُ الْوَجْهِ الخ : এখানে ইহরাম অবস্থায় মাথা ও চেহারা ঢেকে রাখার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় চেহারা এবং মাথা ঢাকা নিষিদ্ধ। হাদীসে আছে চেহারা ও মাথা যেন ঢাকা না হয়। কেননা, রোজ কিয়ামতে তাকে এ পোশাকে ওঠানো হবে। অবশ্যই তা পুরুষের জন্য, মহিলার জন্য তার মাথা ঢেকে রাখতে হবে।

قَوْلُهُ وَقَصُّهَا الخ : এখানে ইহরাম অবস্থায় দাড়ি কাটার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লিখিত ইবারতে قَصُّهَا -এর هَا যমীর তার পূর্বে বর্ণিত لِحْيَةٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, অর্থাৎ দাড়ি কাটাও ইহরাম অবস্থায় নিষেধ। চাই পূর্ণ হোক বা আংশিক হোক। যদিও এক মুষ্টির উপর দাড়ি কাটা হোক যা ইহরামবিহীন অবস্থায় কাটা বৈধ।

لَا الْاِسْتِحْمَامُ وَالْاِسْتِظْلَالُ بِبَيْتٍ وَمَحْمَلٍ بِفَتْحِ الْمِيْمِ الْاَوَّلِ وَكَسْرِ الثَّانِىْ وَعَلَى الْعَكْسِ الْهَوْدَجُ الْكَبِيْرُ وَشَدُّ هِمْيَانٍ فِىْ وَسَطِهٖ يَعْنِىْ الْهِمْيَانَ مَعَ اَنَّهٗ مُخِيْطٌ لَا بَأْسَ بِشَدِّهٖ عَلٰى حَقْوِهٖ وَاَكْثَرُ التَّلْبِيَةِ مَتٰى صَلّٰى اَوْ عَلَا شَرَفًا اَوْ هَبَطَ وَادِيًا اَوْ لَقِىَ رُكْبَانًا اَوْ اَسْحَرَ ـ

অনুবাদ : গোসলখানায় প্রবেশ, ঘর অথবা উটের হাওদার ছায়ায় আশ্রয় নিতে বাধা নেই। আর مَحْمَلٌ শব্দের প্রথম মীমে যবর এবং দ্বিতীয় মীমে যের হবে। আর এর বিপরীত [অর্থাৎ প্রথম মীমে যের এবং দ্বিতীয় মীমে যবর] অর্থ– বড় হাওদা [যা মানুষ উটের পিঠে বসার জন্য তৈরি করে]। কোমরে [টাকার] থলে বেঁধে রাখতেও বাধা নেই, যদিও তা সেলাইযুক্ত হয়। যখন নামাজ আদায় করবে কিংবা কোনো উচ্চস্থানে চড়বে বা নিম্নে অবতরণ করবে অথবা কোনো কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করবে বা সকালে জাগ্রত হবে, তখন অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْاِسْتِحْمَامُ الخ : এখানে গোসলখানায় প্রবেশ এবং থলে কোমরে বাঁধার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় গোসলখানায় যেতে কোনো বাধা নেই। অনুরূপ গরম হতে বাঁচার জন্য কোনো বাড়ি বা হাওদার ছায়ায় আসতে আপত্তি নেই। যেমন– হযরত ওসমান (রা.)-এর জন্য ইহরাম অবস্থায় তাঁবু লটকানো হতো। তদ্রূপ কোমরে থলে বাঁধাও বৈধ। কেননা, টাকা-পয়সার হেফাজতের জন্য তা অপরিহার্য বিধায় থলে সেলাই করা হওয়া সত্ত্বেও তা কোমরে বাঁধার অনুমতি রয়েছে। আর তা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রচলিত রয়েছে।

قَوْلُهٗ وَاَكْثَرُ التَّلْبِيَةِ الخ : এখানে তালবিয়া পাঠ করার মোস্তাহাব সময় সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করা ঐ সকল স্থানে মোস্তাহাব যখন নামাজ আদায় করবে, নামাজ নফল হোক বা ফরজ হোক, অথবা চাই কোনো উঁচু স্থানে আরোহণ করুক বা কোনো নিচু স্থানে অবতরণ করুক, অথবা কোনো কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করুক, অথবা শেষ রাতে জাগ্রত হোক এ সকল সময় ও স্থানে তালবিয়া পাঠ করা উচিত। সালাফে সালেহীন এসব ক্ষেত্রে তালবিয়া পাঠ করাকে মোস্তাহাব হিসেবে জানতেন।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. مَحْمِلٌ : উটের পিঠে বসার বড় গদি বা কাঠের ঝুল কিংবা হাওদা।

২. اَلْخِطْمِىْ : এক জাতীয় সুগন্ধি ঘাস, যা কাপড় পরিষ্কার করার ব্যাপারে সাবানের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৩. هِمْيَانٌ : সেলাই করা থলে। বর্তমানে সে দোয়াল পরিধান করা যাতে প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা রাখা হয়।

وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ وَحِيْنَ رَأَى الْبَيْتَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَالصَّلٰوةِ وَاسْتَلَمَهُ أَيْ تَنَاوَلَهُ بِالْيَدِ أَوْ بِالْقُبْلَةِ أَوْ مَسَحَهُ بِالْكَفِّ مِنَ السَّلِمَةِ بِفَتْحِ السِّيْنِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَهِيَ الْحَجَرُ إِنْ قَدَرَ غَيْرَ مُؤْذٍ أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ مُسْلِمًا وَيُزَاحِمَهُ وَإِلَّا يَمَسُّ شَيْئًا فِيْ يَدِهٖ ثُمَّ قَبَّلَهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا اِسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَطَافَ طَوَافَ الْقُدُوْمِ وَسُنَّ لِلْآفَاقِيْ وَاَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهٖ فَيَبْتَدِئُ مِمَّا يَلِى الْبَابَ .

অনুবাদ : আর যখন [হজব্রত পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি] মক্কায় প্রবেশ করবে, তখন মসজিদে হারাম হতে আরম্ভ করবে। অর্থাৎ, প্রথমে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে। আর যখন কাবা ঘর দেখবে তখন তাকবীর ও তাহলীল তথা اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الخ বলবে। অতঃপর হাজরে আসওয়াদকে সম্মুখে নিয়ে তাকবীর ও তাহলীল বলবে এবং নামাজের মতো দুই হাত উঠিয়ে হাজরে আসওয়াদের ইসতিলাম তথা সম্মান প্রদর্শন করবে তথা হাতে স্পর্শ করবে অথবা চুম্বন করবে অথবা হাত দ্বারা মাসেহ করবে। اِسْتَلَمَ টি س-এ যবরবিশিষ্ট ل-এ যেরবিশিষ্ট سَلِمَةٌ শব্দ হতে নির্গত, অর্থ–পাথর। আর এ হাজরে আসওয়াদকে ইসতিলাম তথা সম্মান প্রদর্শন তখন করবে যখন কাউকে তথা কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া ও বেশি ভিড় করা ব্যতীত করতে সক্ষম হবে। নতুবা কোনো কিছুকে হাতে নিয়ে তা দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে তাতে চুম্বন করবে। আর যদি এতদুভয় [হাতে স্পর্শ বা লাঠি দ্বারা স্পর্শ করা] অসম্ভব হয়, তাহলে কেবল তাকে [হাজরে আসওয়াদকে] সামনে করে তাকবীর ও তাহলীল বলবে, আল্লাহর প্রশংসা করবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে এবং তাওয়াফে কুদূম করবে। এ তাওয়াফে কুদূম বহিরাগতদের জন্য সুন্নত। তওয়াফ নিজের ডান দিক কাবা ঘরের দরজা হতে শুরু করবে। অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদকে সামনে করলে কাবা ঘরের দরজা তার ডান দিকে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ : এখানে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করার পর কর্তব্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যখন মক্কা শরীফ পৌছবে, তখন প্রথমে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ এরূপই করেছেন। কিন্তু এ বিধান তখনকার জন্য প্রযোজ্য যখন সাথিদের ব্যাপারে নিশ্চিত হয় এবং আসবাবপত্র নিরাপদ হয়। মসজিদে হারামে প্রবেশ করে প্রথমে হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করবে– اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলবে। –[বুখারী, মুসনাদে আহমাদ] হাজরে আসওয়াদ হতে শুরু করাও আবূ দাউদের বর্ণনা হতে প্রমাণিত আছে।

قَوْلُهُ وَحِيْنَ رَأَى الْبَيْتَ كَبَّرَ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, হজের উদ্দেশ্যে আগমনকারী ব্যক্তিগণ মক্কায় প্রবেশের পর হারাম শরীফ হতে হজের কাজ আরম্ভ করবে। যখনই কাবাঘর চোখে পড়বে তার দিকে এগিয়ে যাবে এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ ও لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ বলতে থাকবে। এটা করা সুন্নত।

قَوْلُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ الخ : এখানে কোন কোন জায়গায় হস্ত উত্তোলন করবে তার কথা বলা হয়েছে। হাজরে আসওয়াদের তাকবীর ও তাহলীল সহকারে হুবহু সেভাবে উভয় হাত কান পর্যন্ত [মতান্তরে কাঁধ পর্যন্ত] উঠাবে, যেভাবে নামাজের তাকবীরে তাহরীমার জন্য উঠাতে হয়। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) বলেন, সাত স্থানে হাত উঠাতে হয়। যথা–

১. নামাজ শুরু করার সময়,
২. বিতর নামাজে দোয়া কুনূতের তাকবীরের সময়,
৩. দুই ঈদের নামাজে অতিরিক্ত তাক্‌বীর বলার সময়,
৪. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সময়,
৫. সাফা ও মারওয়ায়,
৬. আরাফাহ ও মুযদালিফায় ও
৭. মিনায় এবং উভয় জামরায় [কঙ্কর নিক্ষেপ করার স্থানে]। ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র.) শরহে মাআনিল আছার গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ اِنْ قَدَرَ غَيْرُ الخ : এখানে اِسْتِلَامْ-এর আদবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কাউকে কষ্ট না দিয়ে অনায়াসে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা সম্ভব হয় তবে এভাবে করবে, তা না হলে ইস্তিলাম জরুরি নয়। নিজে ইস্তিলাম করার জন্য অন্যান্য মানুষকে ধাক্কা মেরে হটিয়ে দিয়ে ইস্তিলাম করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে ইরশাদ করেছেন, দেখ! তুমি একজন শক্তিশালী মানুষ দুর্বলদেরকে কষ্ট দেবে? তাই হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সময় কারো সাথে ঠেলাঠেলি কর না। সুযোগ পেলে চুম্বন করিও, অন্যথায় তাকে সামনে রেখে তাকবীর ও তাহলীল বলবে। –[মুসনাদে আহমাদ]

قَوْلُهُ وَاِلَّا يَمَسُّ شَيْئًا فِيْ يَدِهٖ الخ : এখানে হাজরে আসওয়াদে পৌঁছার বিকল্প ব্যবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যদি হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত অনায়াসে পৌঁছতে না পারে, তবে সে পর্যন্ত পৌঁছার জন্য কাউকে কষ্ট দেবে না। হাতে যদি লাঠি ইত্যাদি কিছু থাকে, তাহলে তা দ্বারা ইস্তিলাম করবে এবং সে লাঠিকেই চুমু দেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি লাঠির মাধ্যমে ইস্তিলাম করেছিলেন। –[বুখারী শরীফ] আর লাঠির মাধ্যমে যদি ইস্তিলাম সম্ভবপর না হয়, তাহলে শুধু হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে তাকবীর ও তাহলীল বলবে, আল্লাহর প্রশংসা করবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি দরুদ পাঠ করবে এবং তাওয়াফে কুদূম করবে।

قَوْلُهُ وَسَنَّ لِلْاٰفَاقِيْ : এখানে তাওয়াফে কুদূমের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছে প্রথমে যে তওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াফে কুদূম বলে। আফাকী তথা বহিরাগতদের জন্য এ তাওয়াফে কুদূম সুন্নত; মক্কাবাসীদের জন্য সুন্নত নয়। আর এ তাওয়াফে কুদূম ইফরাদ হজকারীদের জন্য। কিন্তু যে ব্যক্তি তামাত্তু' অথবা কেরান হজ করবে তাকে উমরার তওয়াফ করতে হবে, আর কেরান হজকারীদের জন্য উমরার তওয়াফের পরে তাওয়াফে কুদূম করার অনুমতি আছে। (كَذَا فِى اللُّبَابِ)

قَوْلُهُ وَاَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهٖ الخ : এখানে তওয়াফ শুরু করার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি হাজরে আসওয়াদকে সামনে রাখবে কাবা শরীফের দরজা তার ডান দিকে হবে। সুতরাং সে যখন হাজরে আসওয়াদ হতে তওয়াফ আরম্ভ করবে তখন ডান দিকে তথা কাবার দ্বারের দিকে চলবে এবং হাজরে আসওয়াদ এবং কাবার মাঝামাঝি স্থানকে মুলতাযাম বলা হয়। এ স্থানকে মুলতাযাম এজন্য বলা হয়, যেহেতু তা মানুষের اِلْتِزَامْ তথা আবশ্যকভাবে থাকার স্থান। কেননা, তওয়াফ সমাপ্ত করার পর এখানে অবস্থান করা মোস্তাহাব। এখানে এসে তওয়াফকারী কান্নাকাটি ও কাকুতিমিনতি সহকারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে মুনাজাত করে। কেননা, এটি দোয়া কবুলের স্থান।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. اَلْحَجَرُ : ঐ পাথরকে বলে, যা কাবা শরীফের মুলতাযামের নিকটবর্তী কোণের খুঁটির মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে, যার প্রতি اِسْتِلَامْ অপরিহার্য। এ পাথরটি বেহেশ্‌ত হতে সংগৃহীত।
২. اِسْتِلَامْ : অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে তাকে স্পর্শ করা বা চুম্বন করা। অপরাপর লোকের ভিড়ের কারণে স্পর্শ বা চুম্বন করতে অক্ষম হলে অন্তত তার প্রতি হাত উঠিয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করাও اِسْتِلَامْ-এর অন্তর্ভুক্ত।
৩. اَلْاٰفَاقِيْ : মক্কা শরীফের বাহির হতে যারা মক্কায় আসেন, তাদেরকে اٰفَاقِيْ বলা হয়।
৪. اَلْمُلْتَزَمْ : কাবা গৃহের কোণে সংরক্ষিত হাজরে আসওয়াদ ও কাবা শরীফের দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে اَلْمُلْتَزَمْ বলা হয়।

اَلضَّمِيْرُ فِىْ يَمِيْنِهٖ يَرْجِعُ اِلَى الطَّائِفِ فَالطَّائِفُ الْمُسْتَقْبِلُ لِلْحَجَرِ يَكُوْنُ يَمِيْنُهٗ اِلٰى جَانِبِ الْبَابِ فَيَبْتَدِئُ مِنَ الْحَجَرِ ذَاهِبًا اِلٰى هٰذَا الْجَانِبِ وَهُوَ الْمُلْتَزَمُ اَىْ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ اِلَى الْبَابِ جَاعِلاً رِدَاءَهٗ تَحْتَ اِبِطِهِ الْيُمْنٰى مُلْقِيًا طَرْفَهٗ عَلٰى كَتِفِهِ الْيُسْرٰى وَفِى الْمُخْتَصَرِ قُلْتُ مُضْطَبِعًا وَمَعْنَى الْاِضْطِبَاعِ هٰذَا وَرَاءَ الْحَطِيْمِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ اَلْحَطِيْمُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَطْمِ وَهُوَ الْكَسْرُ وَهُوَ مَوْضِعٌ فِيْهِ الْمِيْزَابُ سُمِّىَ بِهٰذَا لِاَنَّهٗ حُطِمَ مِنَ الْبَيْتِ اَىْ كُسِرَ .

অনুবাদ : يَمِيْنِهٖ-এর ضَمِيْر তওয়াফকারীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সুতরাং তওয়াফকারী হাজরে আসওয়াদকে সামনে করলে বাইতুল্লাহ শরীফের দরজা তার ডান পার্শ্বে থাকবে। অতএব হাজরে আসওয়াদ হতে দরজার দিকে যাবে, তা হলো মুলতাযাম অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ এবং দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে মুলতাযাম বলা হয়। আর তওয়াফ এ অবস্থায় করবে যে, সে তার চাদরকে ডান বগলের নীচে নিয়ে তার মাথাকে বাম কাঁধের উপর রাখবে। শারেহ (র.) বলেন, আমি এটাকে মুখতাসারে বিকায়ার মধ্যে مُضْطَبِعًا বলেছি। আর اَلْاِضْطِبَاعُ অর্থ তা-ই। হাতীমের বাহির হতে সাতবার তওয়াফ করবে। حَطِيْم শব্দ حَطْم হতে নির্গত। এর অর্থ– চূর্ণবিচূর্ণ করা, কেটে ফেলা, বিচ্ছিন্ন করা। হাতীম ঐ স্থান যার মধ্যে মীযাব আছে। ঐ স্থানের নাম হাতীম এজন্য রাখা হয়েছে যে, তা বায়তুল্লাহ শরীফের অংশ হওয়া সত্ত্বেও তাকে পৃথক রাখা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ جَاعِلاً رِدَاءَهٗ تَحْتَ اِبِطِهِ الخ : এখানে তওয়াফ করার আদব বর্ণনা করা হয়েছে। তওয়াফকারী তার চাদরকে ডান বগলের নীচে নিয়ে অবশিষ্টাংশ ঘুরিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখবে। আবূ দাউদ শরীফের মধ্যে নবী করীম ﷺ হতে এরূপই বর্ণিত আছে। তওয়াফ আরম্ভ হতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এভাবে চাদর পরিধান করা সুন্নত। বাকি তওয়াফ হতে অবসর হওয়ার পর এভাবে চাদর পরিধান করা বর্জন করবে। যদি কেউ উল্লিখিত অবস্থায় চাদর রেখে তওয়াফের দু রাকাত নামাজ আদায় করে তবে তা মাকরূহ হবে। (كَذَا فِىْ شَرْحِ لُبَابِ الْمَنَاسِكِ)

قَوْلُهٗ وَرَاءَ الْحَطِيْمِ الخ : এখানে তওয়াফ করার ব্যাপারে হাতীমের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তওয়াফ করার সময় হাতীমকেও কাবা শরীফের অংশ মনে করে তাকে তওয়াফের ভিতরে রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ অর্থাৎ "তারা পুরাতন ঘরের তওয়াফ করবে।" আর এ হাতীম পুরাতন কাবা ঘরেরই একাংশ। বর্তমানে এ অংশটি অর্ধবৃত্ত হিসেবে প্রাচীর ঘেরা অবস্থায় আছে এবং মীযাবে রহমতের সংলগ্ন কাবা ঘরের সাথে জড়িত। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, তা কাবা শরীফ হতে ছয় গজ দূরে অবস্থিত। মুসতাদরাকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতীমের বাহিরে তওয়াফ করেছেন। অতএব যদি কেউ হাতীমকে বাদ দিয়ে শুধু কাবা ঘর তওয়াফ করে, তাহলে তার তওয়াফ বৈধ হবে না। কিন্তু যদি কেউ কেবল হাতীমকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করে তবে তার নামাজ শুদ্ধ হবে না। তওয়াফ সাত شَوْط বা চক্কর করবে। হাজরে আসওয়াদ হতে হাতীমসহ কাবার চতুর্দিক একবার ঘুরে পুনরায় হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত আসলে এক شَوْط বা চক্কর হবে।

قَوْلُهُ الْحَطِيْم مُشْتَقٌّ مِنَ الخ : এখানে সম্মানিত ব্যাখ্যাকার 'হাতীম' -এর পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন- اَلْحَطِيْمُ শব্দটি اَلْحَطْمُ মাসদার থেকে নির্গত। আর حَطْم -এর অর্থ হচ্ছে- ভেঙ্গে ফেলা, নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ইত্যাদি। কাজেই اَلْحَطِيْم শব্দটি এখানে مَوْضِعُ مَحْطُوْمٌ তথা ভাঙ্গা অঞ্চল হিসেবে গণ্য।

ব্যাখ্যাকারের মতে, এটা এমন স্থান যাতে বৃষ্টি হলে কাবার ছাদ থেকে পানি পড়ে। বলা বাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আ.) কাবা ঘরকে যে ভিত্তির উপর নির্মাণ করেছিলেন মক্কার কুরাইশগণ তা ৫৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে পুনরায় সংস্কারের লক্ষ্যে ভেঙ্গে ফেলে; কিন্তু অর্থাভাবে তারা কাবা ঘরকে পূর্ব ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে না পেরে ছোট করে নির্মাণ করে। ফলে কাবা ঘরের কিছু অংশ দেয়ালের বাহিরে থেকে যায়। এ অংশটিও কাবার অংশ বলে তা চারদিক থেকে চিহ্নিত করে রাখা হয়। এ চিহ্নিত অংশের নাম হাতীম। যেহেতু কাবার দেয়াল ভেঙ্গে তা করা হয়েছে, তাই এটাকে اَلْحَطِيْمُ [হাতীম] বলা হয়। অবশ্য শেষ দিকে মহানবী ﷺ কাবা ঘরকে ভেঙ্গে পুনরায় ইবরাহীমী ভিত্তির উপর তাকে স্থাপন করার ইচ্ছে পোষণ করলেও তাঁর পক্ষে এ কাজ করা হয়ে উঠেনি।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. اِضْطِبَاعٌ : ইহরামের চাদর ডান বগলের নীচ দিয়ে কাঁধে রাখার নাম ইযতিবা।

২. حَطِيْم : বায়তুল্লাহ শরীফের উত্তর পার্শ্বে বায়তুল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু অংশ জমি বেষ্টিত, তাকে হাতীম বলা হয়। এ হাতীম কাবা শরীফের অংশ, যা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভিত্তির অভ্যন্তরে ছিল। পরে এ অংশকে কাবা হতে পৃথক করা হয়েছে।

৩. شَوْط : হাজরে আসওয়াদ হতে তওয়াফ আরম্ভ করে কাবা শরীফের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করত পুনরায় হাজরে আসওয়াদে পৌঁছার নাম شَوْط এরূপ সাত চক্কর দেওয়াকে سَبْعَةُ اَشْوَاطٍ বলা হয়।

৪. اَلْمِيْزَابُ : বায়তুল্লাহ শরীফের ছাদ হতে পানি অবতরণের স্থানের নাম মীযাব।

رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا نَذَرَتْ اِنْ فُتِحَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَكَّةَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ تُصَلِّىَ فِى الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِهَا وَاَدْخَلَهَا الْحَطِيْمَ وَقَالَ صَلِّىْ هٰهُنَا فَاِنَّ الْحَطِيْمَ مِنَ الْبَيْتِ اِلَّا اَنَّ قَوْمَكَ قَدْ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفْقَةُ فَاَخْرَجُوْهُ مِنَ الْبَيْتِ ـ

অনুবাদ : উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি মানত করেছিলেন যে, আল্লাহ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে মক্কা বিজয় দান করেন, তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করবেন। অতঃপর মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাত ধরে হাতীমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বললেন, [তোমার মানতের] নামাজ এখানে আদায় কর। কেননা, হাতীম বাইতুল্লাহরই অংশবিশেষ। আসল কথা হচ্ছে– [এর নির্মাণের সময়] তোমার জাতির টাকা-পয়সা শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই এ অংশটুকুকে তারা বায়তুল্লাহর বাহিরে রেখেছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا نَذَرَتْ الخ **:** এখানে বায়তুল্লাহ শরীফের ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হতে বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে সমার্থক শব্দে বর্ণিত আছে যে, খতীবে মক্কা ও মক্কার মসজিদের পেশ ইমাম আবদুল করীম ইবনে মুজীবুদ্দীন (র.) তাঁর নিজের রচিত اِعْلَامُ الْاِعْلَامِ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ কিতাবে লিখেছেন যে, সর্বপ্রথম ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশে বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেন। এ বায়তুল্লাহ সপ্তম আসমানে অবস্থিত বায়তুল মামূরের সোজা নীচে নির্মিত হয়। আদিকাল হতে ফেরেশতাগণ বায়তুল মামূরের তওয়াফ করতেন। যুগ-যুগান্তরে বায়তুল্লাহ ভেঙ্গে গেল। তারপর হযরত আদম (আ.) তা পুনরায় নির্মাণ করেন। অতঃপর হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানে কাবা ঘর একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর আদেশে তা পুনরায় নির্মাণ করেন। এক দরজা দিয়ে প্রবেশ ও অপর দরজা দিয়ে বের হওয়ার জন্য এর পূর্বে ও পশ্চিমে দুটি দরজা রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সে ঘরও ভেঙ্গে যায় এবং বিভিন্ন লোক এর পুনঃ নির্মাণ ও মেরামত করে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এক দুর্ঘটনায় এর একাংশ জ্বলে যায়। তখন মক্কাবাসীরা তা পুনঃ নিমার্ণের মনোভাব স্থির করল যে, এ কাজে হালাল টাকা খরচ করা হবে। অতঃপর নির্মাণ কাজ শুরু হলো এবং পূর্বের দরজা দুটির পরিবর্তে একটি দরজা রাখা হলো। এক দরজা রাখার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তারা যাকে এ ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবেন শুধু সেই প্রবেশ করতে পারবে। এ ব্যবস্থার জন্য এক দরজা সহায়ক। অতঃপর ঘর নির্মাণের কাজে জমাকৃত টাকা প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ায় পুরাতন ঘরের যে মাপের উপর তারা ঘর করার পরিকল্পনা করেছিল তা পরিবর্তন করতে হলো, ফলে ছয় গজের মতো জায়গা পুরাতন কাবা হতে বাদ রেখে ঘর নির্মাণ করল। এ ছয় গজ জায়গাকেই হাতীমে কাবা বলে, যা পৃথক থাকার একমাত্র কারণ এটাই।

আর তাই নবী করীম ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন যে, যদি কুরাইশদের ভুল বুঝাবুঝির আশঙ্কা না হতো, তাহলে আমি কাবা ঘরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভিত্তি মোতাবেক নির্মাণ করতাম এবং নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন যে, যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে بِنَاءُ اِبْرَاهِيْمِىْ মোতাবেক এ ঘর নির্মাণ করব; কিন্তু তিনি পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিভিন্ন ফিতনা-ফ্যাসাদ দমনের ব্যস্ততার দরুন কাবা ঘরের পূর্ববর্তী আকার রক্ষার দায়িত্ব পালিত হয়নি তারপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর যুগে তিনি তাঁর খালা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাবা ঘর সম্পর্কীয় হাদীস শুনে কাবা ঘর পুনঃ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা করলেন। তাই তিনি কাবা ঘর ভেঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভিত্তি মোতাবেক পুনঃ নির্মাণ করলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে– হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর নির্মাণ ভেঙ্গে পুনরায় কুরাইশদের ভিত্তি মোতাবেক কাবা ঘর নির্মাণ করেন। অদ্যাবধি বায়তুল্লাহ শরীফ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আছে।

وَلَوْلَا حَدَثَانُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْجَاهِلِيَّةِ لَنَقَضْتُ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ وَاَظْهَرْتُ قَوَاعِدَ الْخَلِيْلِ (ع) وَاَدْخَلْتُ الْحَطِيْمَ فِى الْبَيْتِ وَاَلْصَقْتُ الْعَتَبَةَ عَلَى الْاَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَلَئِنْ عِشْتُ اِلَى قَابِلٍ لَاَفْعَلَنَّ ذٰلِكَ فَلَمْ يَعِشْ وَلَمْ يَتَفَرَّغْ لِذٰلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ حَتّٰى كَانَ زَمَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (رض) وَكَانَ سَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْهَا فَفَعَلَ ذٰلِكَ وَاَظْهَرَ قَوَاعِدَ الْخَلِيْلِ (ع) وَبَنَى الْبَيْتَ عَلٰى قَوَاعِدِ الْخَلِيْلِ (ع) بِمَحْضَرٍ مِنَ النَّاسِ وَاَدْخَلَ الْحَطِيْمَ فِى الْبَيْتِ ۔

অনুবাদ : যদি তোমার জাতির যুগ জাহিলিয়া যুগের নিকটবর্তী না হতো, তবে নিশ্চয়ই আমি [বর্তমান] কাবা ঘর ভেঙ্গে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর ভিত্তির উপর পুনঃ নির্মাণ করতাম এবং হাতীমকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম। এতদ্ব্যতীত বায়তুল্লাহর চৌকাঠ মাটির সমান রাখতাম এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি দরজা রাখতাম। যদি আগামী বছর পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি, তবে নিশ্চয়ই এ রকম করব। কিন্তু তিনি পরবর্তী বছর জীবিত ছিলেন না। খোলাফায়ে রাশেদীন এ কাজের জন্য সময়ই পাননি। শেষ পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর যুগ আসল। তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট এ হাদীস শ্রবণ করেছিলেন, তাই তিনিই [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আকাঙ্ক্ষিত] সে কাজ করলেন– হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভিত্তি খুঁজে বের করলেন এবং জনগণের সামনেই বায়তুল্লাহকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভিত্তির উপর নির্মাণ করলেন, আর হাতীমকে বায়তুল্লাহর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْلَا حَدَثَانُ عَهْدِ قَوْمِكَ الخ : এখানে মহানবী ﷺ -এর কাবা শরীফ না ভাঙ্গার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট কাবা ঘরের প্রাচীন আয়তন রক্ষার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তা না করার কারণ বলেন যে, হে আয়েশা ! তোমার সম্প্রদায় তথা কুরাইশগণ নতুন মুসলমান, তাদের ঈমানী শক্তি এখনও প্রবল নয় বলে তারা আমার কাবা ঘর ভেঙ্গে পুনঃ নির্মাণ করার বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে না, ফলে তারা তা নিয়ে বলাবলি ও তিরস্কার করবে; অন্যথা আমি কাবা ঘরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভিত্তির উপর পুনঃ নির্মাণ করতাম, তখন হাতীম কাবা ঘরের ভিতর থাকত।

عَدَدُ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ [কা'বা শরীফ নির্মাণের পরিসংখ্যা] : তাফসীরে জালালাইন শরীফের বর্ণনা মতে প্রথম হতে আজ পর্যন্ত কাবা শরীফ দশবার নির্মিত হয়েছে। যেমন–

১. আল্লাহ তা'আলার হুকুমে ফেরেশতাগণ কাবা ঘর প্রথম নির্মাণ করেন। ২. হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তদীয় সন্তানগণ। ৩. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। ৪. আমালেকা গোত্র। ৫. যুরহাম গোত্র। ৬. কুসাই ইবনে কিলাব। ৭. কুরাইশগণ। ৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)। ৯. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। ১০. ১৪০ হিজরিতে তুরস্কের বাদশাহ চতুর্থ মুরাদ।

জ্ঞাতব্য : কোনো কোনো বর্ণনা মতে কাবা শরীফ দুবার নির্মাণ করা হয়েছে এবং নয়বার সংস্কার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَفَرَّغْ لِذٰلِكَ الْخُلَفَاءُ الخ : উক্ত ইবারতে খোলাফায়ে রাশেদীন হতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত কাবা শরীফের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ হলো হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফত যুগ, চল্লিশ হিজরিতে গিয়ে যার পরিসমাপ্তি হয়েছে। এ দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর্যন্ত তাঁদের সকলেই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তার মোকাবিলা করে কাটিয়েছেন; বায়তুল্লাহর দিকে কেউ ফিরে তাকাবার সুযোগ পাননি। চল্লিশ হিজরি হতে চৌষট্টি হিজরি পর্যন্ত অনেক উত্থান ও পতনের পর এক পর্যায়ে হিজায, ইয়েমেন, ইরাক ও খোরাসানের বাসিন্দারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি ৬৪ হিজরি সনে কা'বা ঘর ভেঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইচ্ছা অনুযায়ী কাবা ঘর পুনঃ নির্মাণ করেন এবং হাতীমে কাবাকে আল্লাহর ঘরের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে ৪০ হাজার সৈন্যসহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর মোকাবিলায় প্রেরণ করেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কয়েক মাস ধরে মক্কা অবরোধ করে রাখে এবং দূর পাল্লার কামান দ্বারা বায়তুল্লাহর প্রতি পাথর বর্ষণ অব্যাহত রাখে। এ যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) হেরেম শরীফেই ৬৫ হিজরির ১৭ জমাদিউল উলা মঙ্গলবারে শাহাদাত বরণ করেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, হাতীম কাবা ঘরেরই অংশবিশেষ এবং তা ছয় কিংবা সাড়ে ছয় গজের সমান একটি ভূখণ্ড মাত্র। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) শহীদ হওয়ার পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কাবা শরীফকে পুনঃ জাহিলিয়া যুগের চিত্রে ফিরিয়ে নেয়।

قَوْلُهُ وَاَدْخَلَ الْحَطِيْمَ فِى الْبَيْتِ : এখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর কাবা ঘর নির্মাণ ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) নবী করীম ﷺ -এর অভিপ্রায় অনুসারে হাতীমকে কাবার ভিতরে প্রবেশ করান। এ ঘটনা ৬৪ হিজরি সনের। আর ইতিহাস হতে প্রতীয়মান হয় যে, খলিফা আবদুল মালিকের গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কাবা ঘরের হাজরে আসওয়াদের পার্শ্বটি ভেঙ্গে তা কুরাইশদের ভিত্তি অনুযায়ী নির্মাণ করে। আর কাবার পশ্চিম দরজাকে বন্ধ করে দেয় এবং পূর্ব দরজা এভাবেই রাখে যেভাবে বর্তমানে আছে এবং সে হাতীমকে কাবা ঘরের বাহিরে রেখে দেয়। বস্তুত হাতীম কাবা শরীফেরই অংশবিশেষ যা ছয় গজ অথবা সাড়ে পাঁচ গজের একটি স্থান মাত্র।

فَلَمَّا قُتِلَ كَرِهَ الْحَجَّاجُ اَنْ يَّكُوْنَ بِنَاءَ الْبَيْتِ عَلٰى مَا فَعَلَهُ اِبْنُ الزُّبَيْرِ (رض) فَنَقَضَ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ وَاَعَادَهُ عَلٰى مَا كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْحَطِيْمُ مِنَ الْبَيْتِ يُطَافُ وَرَاءَ الْحَطِيْمِ حَتّٰى لَوْ دَخَلَ الْفُرْجَةَ لَا يَجُوْزُ لٰكِنْ اِنِ اسْتَقْبَلَ الْمُصَلِّى الْحَطِيْمَ وَحْدَهُ لَا يَجُوْزُ لِاَنَّ فَرْضِيَّةَ التَّوَجُّهِ ثَبَتَ بِنَصِّ الْكِتَابِ فَلَا يَتَادّٰى بِمَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ اِحْتِيَاطًا وَالْاِحْتِيَاطُ فِى الطَّوَافِ اَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْحَطِيْمِ ـ

অনুবাদ : অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) শহীদ হন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তা অপছন্দ করল যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) যেভাবে বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেছেন, সেভাবেই থাকুক। তাই সে তাকে আবার ভেঙ্গে সেভাবে নির্মাণ করে দিল যেভাবে জাহিলিয়া যুগে ছিল। হাতীম যখন বায়তুল্লাহর অংশ বলে সাব্যস্ত হলো, তখন হাতীমের বাহির হতে তওয়াফ করতে হবে। কেউ হাতীম এবং বায়তুল্লাহর মধ্যবর্তী সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে তওয়াফ করলে তওয়াফ হবে না। [যদিও হাতীম কাবারই অংশ] নামাজের সময় যদি কেউ শুধু হাতীমকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করে, তাহলে নামাজ হবে না। কারণ, কুরআন মাজীদে আল্লাহর ঘর সামনে রেখে নামাজ আদায় করা ফরজ করা হয়েছে। সুতরাং সতর্কতাবশত খবরে ওয়াহেদরূপে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বস্তু দ্বারা সে ফরজ পরিবর্তন করা যায় না। সুতরাং হাতীমসহ তওয়াফ করার মধ্যেই সতর্কতা নিহিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ عَلٰى مَا كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ : ব্যাখ্যাকার আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে বর্তমান কাবার ভিত্তির উপর মন্তব্য করেছেন। বলাই বাহুল্য যে, ইসলাম পূর্বকালে কুরাইশগণ কাবা ঘর সংস্কার করে। তখন কাবার নির্মাণ কাজে স্বয়ং মুহাম্মদ ﷺ অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তখনো তিনি ছিলেন বয়সে ছোট। অর্থাভাবে কুরাইশগণ কাবা ঘর নির্মাণে বিপাকে পড়ে। ফলে তারা ইবরাহীমী ভিত্তির কিছু অংশ [প্রায় ছয় গজ প্রশস্ত অংশ] বাদ দিয়ে কাবা ঘর নির্মাণ করে। ঐ সময় হযরত মুহাম্মদ ﷺ নবুয়ত না পেলেও তাঁর নেতৃত্বেই হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করা হয়েছিল।

রাসূল ﷺ -এর নবুয়তপ্রাপ্তির পরও কাবা ঐ ভিত্তির উপর অটুট থাকে। দশম হিজরিতে রাসূল ﷺ বিদায় হজ পালন করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর বর্ণনা মতে, তখন রাসূল ﷺ কাবা ঘর ভেঙ্গে পুনরায় তা ইবরাহীমী ভিত্তির উপর স্থাপনের আশা প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে তাঁর পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। খোলাফায়ে রাশেদীনও তা করেননি। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে মক্কার গভর্নর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) তা ভেঙ্গে রাসূল ﷺ -এর ইচ্ছামতো ইবরাহীমী ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। কিন্তু খলিফা আবদুল মালিক সেটাকে ভালো চোখে দেখেননি। তিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নেতৃত্বে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-কে আত্মসমর্পণের অনুরোধ করলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মক্কা অভিযান করে এবং এতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের শহীদ হন। তখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কাবা ঘর ভেঙ্গে পুনরায় তা পূর্বের ভিত্তির উপর স্থাপন করে। যদিও

প্রাক-ইসলামি কুরাইশগণ এর ভিত্তি স্থাপন করেছিল, এতে তাদের নিয়ত ও কর্মপদ্ধতি ছিল সুন্দর। যার কারণে রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণ এ ভিত্তিতে কোনো পরিবর্তন আনেননি। কাজেই বর্তমান কাবা রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের পছন্দের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এটাকে 'জাহেলিয়াতের ভিত্তি' বলা সঙ্গত নয়, যদিও ব্যাখ্যাকার হাজ্জাজের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করার মানসে বলেছেন– وَأَعَادَهُ عَلَى مَا كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ

قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ دَخَلَ الخ : এখানে হাতীম কাবা শরীফের অংশ হওয়ার দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কোনো তওয়াফকারী হাতীম এবং কাবা শরীফের মাঝখান দিয়ে তওয়াফের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে, তখন তার তওয়াফ হবে না। কেননা, কুরআন মাজীদে রয়েছে– وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ অর্থাৎ তাদের পুরাতন বায়তুল্লাহ তথা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভিত্তির উপর বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা উচিত। আর হাতীম পুরাতন বায়তুল্লাহরই অংশ। কাজেই হাতীমকে তওয়াফের সময় বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত রাখা একান্ত কর্তব্য, নতুবা তওয়াফ আদায় হবে না।

قَوْلُهُ لٰكِنَّ اِنِ اسْتَقْبَلَ الخ : এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে। **প্রশ্ন :** প্রশ্নটি হচ্ছে– হাতীম যখন কাবা শরীফের অংশ তখন সেদিক হয়ে নামাজ পড়লে নামাজ শুদ্ধ হবে না কেন? **উত্তর :** এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, কাবা শরীফের দিক হয়ে নামাজ পড়া অকাট্য নস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর হাতীম কাবা শরীফের অংশ হওয়া অকাট্য নস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি ; বরং তা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা প্রমাণিত, যা যন্নী বা সন্দেহজনক। সুতরাং যখন হাতীম কাবা শরীফের অংশ হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়নি, তখন সতর্কতা হচ্ছে, শুধু হাতীমের দিক হয়ে নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হবে না। অতএব হাতীম নামাজের জন্য বায়তুল্লাহর বাহিরে, আর তওয়াফের জন্য বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত।

وَ رَمَلَ فِى الثَّلٰثَةِ الْاَوَّلِ فَقَطْ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ وَهُوَ اَنْ يَمْشِىَ سَرِيْعًا وَيَهُزُّ فِى مَشْيِهٖ الْكَتِفَيْنِ كَالْمُبَارِزِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ وَ ذٰلِكَ مَعَ الْاِضْطِبَاعِ وَكَانَ سَبَبُهٗ اِظْهَارُ الْجَلَادَةِ لِلْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ قَالُوْا اَضْنَاهُمْ حُمّٰى يَثْرِبَ ثُمَّ بَقِىَ الْحُكْمُ بَعْدَ زَوَالِ السَّبَبِ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَعْدَهٗ وَكُلَّمَا مَرَّ بِالْحَجَرِ فَعَلَ مَا ذُكِرَ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ وَهُوَ حَسَنٌ وَخَتَمَ الطَّوَافَ بِاِسْتِلَامِ الْحَجَرِ ثُمَّ صَلّٰى شَفْعًا يَجِبُ بَعْدَ كُلِّ اُسْبُوْعٍ عِنْدَ الْمَقَامِ اَوْ غَيْرِهٖ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَادَ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَخَرَجَ فَصَعِدَ الصَّفَا وَ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ دَعَا بِمَا شَاءَ ثُمَّ مَشٰى نَحْوَ الْمَرْوَةِ سَاعِيًا بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْاَخْضَرَيْنِ وَصَعِدَ عَلَيْهَا وَفَعَلَ مَا فَعَلَهٗ عَلَى الصَّفَا يَفْعَلُ هٰكَذَا سَبْعًا ـ

অনুবাদ : আর তওয়াফে শুধু প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। প্রতি চক্কর হাজরে আসওয়াদ হতে ঘুরে পুনরায় হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত আসাকে বলে। রমল অর্থ– এমন দ্রুত চলা যার মধ্যে উভয় কাঁধ এমনভাবে নাড়াচাড়া করে যেভাবে দু'দলের মধ্যে মোকাবিলাকারী মোকাবিলা করে থাকে। আর এ রমল ইযতিবার সাথে হতে হবে। রমলের উদ্দেশ্য হলো মুশরিকীনদের দৃষ্টিতে যেন নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ পায়। কারণ, তারা বলত যে, মুসলমানদেরকে ইয়াসরিবের জ্বরে দুর্বল করে দিয়েছে। তারপর নবী করীম ﷺ -এর যুগে এবং এর পরেও এ রমলের কারণ বিদূরিত হওয়া সত্ত্বেও রমলের বিধান বিদ্যমান রয়ে গিয়েছে। আর যখনই তওয়াফ কালে হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌঁছে, তখনই তা [ইসতিলাম] করবে ; যা উল্লেখ করা হয়েছে এবং রোকনে ইয়ামানীর ইসতিলাম করবে। তা মোস্তাহাব। আর হাজরে আসওয়াদের ইসতিলামের সাথে তওয়াফ সমাপ্ত করবে। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমীতে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে। প্রত্যেক সাত তওয়াফের পর এ দুই রাকাত নামাজ মাকামে ইবরাহীমীতে অথবা মসজিদে হারামের যে-কোনো স্থানে আদায় করা ওয়াজিব। নামাজ হতে ফিরে [অবসর হয়ে] হাজরে আসওয়াদের ইসতিলাম করবে। তারপর মাসজিদে হারাম হতে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করবে এবং নবী করীম ﷺ -এর উপর দরুদ পাঠ করবে। আর উভয় হাত উঠিয়ে দোয়া করবে এবং দোয়ায় মনের আবেগ ব্যক্ত করবে। তারপর মারওয়া পাহাড়ের দিকে চলবে এরূপে যে, মীলাইনে আখযারাইনের [উভয় নীলাকৃত খামের] মাঝখানে দৌড়াবে। অতঃপর মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করবে। আর সাফা পাহাড়ের উপর যা [তাকবীর, তাহলীল, দরুদ, দোয়া] করেছে তা মারওয়া পাহাড়ের উপরও করবে, এভাবে সাতবার করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَ رَمَلَ فِى الثَّلٰثَةِ الْاَوَّلِ الخ : এখানে রমলের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ হতে যাত্রা করে হাতীমকে ভিতরে রেখে কাবা ঘরকে একবার প্রদক্ষিণ করে পুনরায় হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত আসাকে তওয়াফের এক চক্কর বলে। এরূপ সাত চক্কর প্রদক্ষিণ হলে এক তওয়াফ হবে। তওয়াফের সাত চক্করের প্রথম তিন চক্করে রমল করতে হবে।

আর রমল বলা হয়, মুশরিকদের দৃষ্টিতে বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে বুক উঁচিয়ে কাঁধ কাঁপিয়ে এরূপ বীরদর্পের সাথে চলা যেমন দু'দলের মধ্যে মোকাবিলার জন্য প্রদর্শনকারীরা চলে।

وَكَانَ سَبَبُهُ إِظْهَارُ الْجَلَادَةِ الخ : এখানে রমলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মহানবী ﷺ ষষ্ঠ হিজরিতে সাহাবীদের এক জামাত সহকারে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কাবাসী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। অবশেষে অনেক কথাবার্তার পর উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধি সংঘটিত হয়। এ সন্ধি মোতাবেক রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় ফিরে আসেন এবং পরবর্তী বছর উমরার জন্য মক্কায় পৌঁছান। সন্ধি অনুসারে মক্কাবাসীগণ তিনদিনের জন্য পরিবার-পরিজন সহকারে নিকটবর্তী পাহাড়সমূহে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তা তখনকার কথা, যখন মদিনায় জ্বর-পীড়া মহামারি আকারে দেখা দিয়েছিল। তাই কাফেরগণ বলাবলি করতে লাগল যে, মদিনার জ্বর মুসলমানদেরকে খুবই দুর্বল করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এ ধরনের কটূক্তি শুনে সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কাফেরদের সামনে নিজেদের শৌর্যবীর্য, শক্তি ও বাহাদুরির পরিচায়ক তওয়াফে রমল কর, যেন তারা তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে অনুমান করতে পারে এবং তাদের ধারণা ভুল সাব্যস্ত হয়। যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগেই তাদের সকল ভুল ধারণা দূরীভূত হয়েছিল, তথাপি সে সুন্নত 'রমল' বর্তমানেও বলবৎ রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ بَقِيَ الْحُكْمُ بَعْدَ زَوَالِ السَّبَبِ الخ : এখানে রমলের হুকুম বলবৎ থাকার কারণ বর্ণিত হয়েছে। যদি কোনো হুকুম কোনো কারণের অধীনে হয়, সে কারণ রহিত হলে উক্ত হুকুমও রহিত হয়ে যায়, এটাই নিয়ম। কিন্তু কারণ যদি এ রকম হয় যা হুকুম পর্যন্ত পৌঁছে বটে কিন্তু ক্রিয়াশীল হয় না, তবে তা রহিত হয়ে গেলেও হুকুম পূর্ববৎ বহাল থাকে। যেমন– শুক্রবারে জুমার গোসল করা এজন্য সুন্নত হয়েছিল যে, সাহাবীগণ [প্রথমাবস্থায়] শ্রমজীবী ছিলেন। তাঁরা পরিশ্রম করতেন এবং সেই বিদ্যমান কাপড় নিয়ে জুমার নামাজে উপস্থিত হতেন। অতঃপর গরমের কারণে ঘর্মাক্ত হলে দুর্গন্ধ লাগত, অন্যরা কষ্ট অনুভব করতেন, তাই গোসল সুন্নত করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীকালে মুসলমানদেরকে তাদের জীবনের মনোন্নয়ন প্রদান করেন। ফলে তাঁরা সে পরিশ্রম বাদ দিলেন, ভালো পোশাক পরিধান করতে লাগলেন। তাঁদের আর সে পরিশ্রমের প্রয়োজন রইল না। তাই গোসল সুন্নত হওয়ার কারণ আর পরিশ্রম নেই। কিন্তু জুমার গোসল এখনও সুন্নত হিসেবে বলবৎ আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

قَوْلُهُ وَكُلَّمَا مَرَّ بِالْحَجَرِ فَعَلَ مَا ذَكَرَ الخ : আলোচ্য উদ্ধৃতিতে মুসান্নিফ (র.) তওয়াফকারীর জন্যে কয়েকটি কার্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তওয়াফকারী যতবার হাজরে আসওয়াদের নিকট দিয়ে গমন করবে ততবারই তাকে সম্মুখে রেখে তাকবীর ও তাহলীল বলবে, চুম্বন করবে। তা সম্ভব না হলে হাতে স্পর্শ করবে। তাও সম্ভব না হলে তাকে সম্মুখে রেখে তাকবীর ও তাহলীল শেষে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে এবং রাসূল ﷺ -এর উপর সালাত পাঠ করবে। সর্বশেষ তওয়াফে হাজরে আসওয়াদে ইসতিলামের মাধ্যমে তা শেষ করবে।

قَوْلُهُ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ الخ : এখানে বিভিন্ন রোকন ও রোকনে ইসতিলামের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তওয়াফের প্রতি চক্করে যখন হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছবে তখন পূর্বের বর্ণনা অনুসারে তাকবীর, তাহলীল, দোয়া, দরূদ ইত্যাদি করবে এবং এর সাথে সাথে রোকনে ইয়ামানীর ইসতিলামও করবে। অর্থাৎ রোকনে ইয়ামানীকে হাতে স্পর্শ করবে এবং তা মোস্তাহাব। তওয়াফকারী যখন হাজরে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে দাঁড়ায়, তখন তার বাম পার্শ্বের হাজরে আসওয়াদের সংশ্লিষ্ট কাবার দিককে রোকনে ইয়ামানী বলে। তাকে হাতে স্পর্শ করবে, চুম্বন করবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে চুম্বন করা মোস্তাহাব। মুয়াত্তা এবং সহীহাইনের বর্ণনা মতে নবী করীম ﷺ রোকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের ইসতিলাম করতেন। কাবা শরীফের উল্লিখিত দুটি রোকন ব্যতীত অপর দুটি রোকনের একটির নাম রোকনে ইরাকী অপরটি হলো রোকনে শামী।

قَوْلُهُ ثُمَّ صَلَّى شَفْعًا الخ : তওয়াফ শেষ করে হাজী সাহেব 'মাকামে ইবরাহীম'-এর কাছে অথবা মসজিদে হারামের কোনো অংশে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবেন। এটা করা ওয়াজিব। উল্লেখ্য, মাকামে ইবরাহীম হচ্ছে ছোট্ট একটি পাথর মাত্র, যাতে একজন লোক দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে না। মাকামে ইবরাহীম বলে যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্নিত পাথর রাখা হয়েছে তার আশপাশের জায়গা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ يَجِبُ بَعْدَ كُلِّ أُسْبُوْعٍ الخ : উল্লিখিত ইবারতে তওয়াফের পরে নামাজের স্থান ও বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তওয়াফের পর হাজরে আসওয়াদের ইসতিলাম হতে অবসর হয়ে মাকামে ইবরাহীমে অথবা মসজিদে হারামের কোনো স্থানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। এ তওয়াফ বলতে প্রত্যেক সাত চক্করকে বুঝানো হয়েছে। তবে এ নামাজ সরাসরি মাকামে ইবরাহীমে আদায় করা বেআদবি হবে। মাকামে ইবরাহীম ঐ পাথরকে বলে যার মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন আছে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ সাত চক্কর তওয়াফের পর দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ এ আয়াত তেলাওয়াত করেছেন- وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى এ আয়াত দ্বারা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَيَصْعَدُ الصَّفَا الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর্বতদ্বয়ের মাঝখানে 'সায়ী' করার মাসনূন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তওয়াফ শেষ করে হজ পালনকারী 'সাফা' পর্বতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ এবং لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ উচ্চৈঃস্বরে পড়তে থাকবে। রাসূল ﷺ -এর উপর সালাত পাঠ করবে একই সাথে দু হাত উত্তোলন করে আকাশের দিকে লক্ষ্য করে ইচ্ছামতো আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করবে। এরূপ করা সুন্নত। তারপর 'সাফা' থেকে মারওয়ার দিকে দৌড়ে যাবে। পর্বতদ্বয়ের পাদদেশে দূরত্ব নির্দেশক সবুজ রঙের দুটো পাথর রয়েছে। এ পাথর দুটোর মাঝখান দিয়ে দৌড়াতে হয়। 'সাফা' থেকে দৌড়ে এসে মারওয়ায় আরোহণ করবে। মারওয়ায় দাঁড়িয়ে 'সাফা' পর্বতে যা করেছিল তা-ই করবে। এরূপ কার্য শেষ করে পুনরায় 'সাফা' পর্বতের দিকে দৌড়ে যাবে। এভাবে 'সাফা' থেকে 'মারওয়া' এবং 'মারওয়া' থেকে পুনরায় 'সাফা' পর্যন্ত এলে এক চক্কর ধরা হবে। এভাবে সাতবার দৌড়াতে হয়। এটাকে 'সায়ী' বলা হয়। সায়ী করা ওয়াজিব। তবে অনেকের মতে, 'সাফা' থেকে 'মারওয়া' পর্যন্ত দৌড়ালেই এক চক্কর ধরা হবে। এভাবে সাতবার করলে মারওয়াতে এসে সায়ী শেষ হবে।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. صَفَا : এটা কাবা শরীফের দক্ষিণে আবূ কুবাইস পাহাড়ের নিকট একটি ক্ষুদ্র পাহাড়, যে স্থান হতে সায়ী শুরু করা হয়।

২. مَرْوَةٌ : এটা একটি ছোট্ট পাহাড়, সাফা হতে সায়ীর জন্য গিয়ে সেখানে পৌছতে হয়।

৩. اَلْمِيْلَيْنِ الْاَخْضَرَيْنِ : সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী একটি স্থানের দু'দিকে দুটি নীল নিদর্শন ও স্তম্ভ রয়েছে। এ উভয় স্তম্ভকে مِيْلَيْنِ اَخْضَرَيْنِ বলা হয়। সায়ীর সময় এ স্থানটি দ্রুত গতিতে অতিক্রম করতে হয়।

৪. مَقَامُ إِبْرَاهِيْمَ : এটা একটি বেহেশতী পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেছেন। তা মাতাফের পূর্ব দিকে মিম্বর ও জমজমের মধ্যবর্তী একটি জালিদার গুম্বুজে রক্ষিত আছে, তাতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্নও রয়েছে।

৫. طَوَافٌ : বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকে বিশেষ নিয়মে চক্কর দেওয়াকে তওয়াফ বলা হয়। হাতীম এ চক্করের অভ্যন্তরে থাকতে হবে। কারণ, তা কাবারই একটি অংশ।

৬. سَعْىٌ : সাফা ও মারওয়ার মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার চক্কর দেওয়াকে সায়ী বলা হয়।

৭. رُكْنٌ يَمَانِيٌّ : বায়তুল্লাহ শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণকে রোকনে ইয়ামানী বলে। কারণ, তা ইয়েমেনের দিকে অবস্থিত।

৮. رُكْنٌ عِرَاقِيٌّ : বায়তুল্লাহ শরীফের উত্তর-পূর্ব দিককে রোকনে ইরাকী বলে। কারণ, তা ইরাকের দিকে অবস্থিত।

৯. رُكْنٌ شَامِيٌّ : বায়তুল্লাহ শরীফের উত্তর-পশ্চিম দিককে রোকনে শামী বলে। কেননা, তা শামের দিকে অবস্থিত।

১০. هَلَّلَ : অর্থাৎ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলা।

১১. كَبَّرَ : অর্থাৎ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা।

يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ أَيْ اَلسَّعْيُ مِنَ الصَّفَا اِلَى الْمَرْوَةِ شَوْطٌ ثُمَّ مِنَ الْمَرْوَةِ اِلَى الصَّفَا شَوْطٌ اٰخَرُ فَيَكُوْنُ بِدَايَةُ السَّعْيِ مِنَ الصَّفَا وَخَتْمُهُ وَهُوَ السَّابِعُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَفِيْ رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ (رح) اَلسَّعْيُ مِنَ الصَّفَا اِلَى الْمَرْوَةِ ثُمَّ مِنْهَا اِلَى الصَّفَا شَوْطٌ وَاحِدٌ فَيَكُوْنُ اَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطًا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَيَقَعُ الْخَتْمُ عَلَى الصَّفَا وَالصَّحِيْحُ هُوَ الْاَوَّلُ ثُمَّ سَكَنَ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا وَطَافَ بِالْبَيْتِ نَفْلًا مَا شَاءَ وَخَطَبَ الْاِمَامُ سَابِعَ ذِى الْحِجَّةِ وَعَلَّمَ فِيْهَا الْمَنَاسِكَ وَهِيَ الْخُرُوْجُ اِلٰى مِنًى وَالصَّلٰوةُ وَالْوُقُوْفُ بِعَرَفَاتٍ وَالْاِفَاضَةُ ثُمَّ التَّاسِعُ بِعَرَفَاتٍ ثُمَّ الْحَادِىْ عَشَرَ بِمِنًى يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ ثُمَّ خَرَجَ غَدَاةَ التَّرْوِيَةِ وَهِيَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ سُمِّىَ بِذٰلِكَ لِاَنَّهُمْ يَرْوُوْنَ الْاِبِلَ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ اِلٰى مِنًى ـ

অনুবাদ : সায়ী সাফা হতে আরম্ভ করে মারওয়ায় শেষ করবে। অর্থাৎ সাফা হতে মারওয়া পর্যন্ত এক প্রদক্ষিণ এবং মারওয়া হতে সাফা পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রদক্ষিণ। এভাবেই সাত প্রদক্ষিণ সাফা হতে আরম্ভ করে মারওয়ায় শেষ হবে। ইমাম ত্বাহাবী (র.)-এর রেওয়ায়েত মোতাবেক সায়ী সাফা হতে মারওয়া পর্যন্ত এবং মারওয়া হতে সাফা পর্যন্ত এক প্রদক্ষিণ। এ রেওয়ায়েত মোতাবেক সায়ী চৌদ্দ প্রদক্ষিণ হয় এবং সাফা হতে আরম্ভ করে সাফাতেই শেষ হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতই বিশুদ্ধ। অতঃপর মক্কা শরীফে ইহরাম অবস্থায় অবস্থান করবে এবং যতবার ইচ্ছা বায়তুল্লাহ শরীফের নফল তওয়াফ করবে। জিলহজের সাত তারিখে ইমাম খুতবা দেবেন, যার মধ্যে তিনি হজের আহকামের শিক্ষা দেবেন। হজের আহকাম বলতে বুঝায় মিনার দিকে বের হওয়া, নামাজ আদায় করা, আরাফায় অবস্থান এবং তথা হতে ফিরে আসা। অতঃপর ইমাম নয় তারিখে আরাফায় এবং এগারো তারিখে মিনায় খুতবা দেবেন। আর উভয় খুতবার মধ্যে একদিনের পার্থক্য করবেন। অতঃপর তারবিয়ার দিন ফজরের নামাজের পর বের হবে। তারবিয়ার দিন বলতে জিলহজের আট তারিখকে বুঝায়। এ তারিখকে তারবিয়ার দিন এজন্য বলা হয় যে, আরবের লোকেরা এ তারিখে উটকে পানি পান করানোর জন্য মিনার দিকে নিয়ে যেত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا الخ **:** উক্ত ইবারতে সায়ী সাফা হতে শুরু করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। সায়ী সাফা হতে শুরু করতে হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– 'আল্লাহ তা'আলা যেখান থেকে শুরু করেছেন, তোমরাও সেখান থেকে শুরু কর।' অতএব দেখা গেছে যে, আল্লাহ তা'আলা সাফা হতে শুরু করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী— اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ তাই আমাদের জন্যও সে হুকুম যে, সাফা হতে সায়ী শুরু করতে হবে।

قَوْلُهُ وَالصَّحِيْحُ الْاَوَّلُ **:** আলোচ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে ব্যাখ্যাকার 'সায়ী' সংক্রান্ত দু'টি বর্ণনার মধ্য হতে একটি বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বর্ণনা দুটি নিম্নরূপ–

১. এক বর্ণনা মতে, 'সাফা' পর্বত থেকে 'সায়ী' শুরু করে 'মারওয়া' পর্বত পর্যন্ত পৌছলেই এক চক্কর হবে। এভাবে সাত চক্ক দৌড়ালে মারওয়া পর্বতে 'সায়ী' শেষ হবে।

২. তাহাবী শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, 'সাফা' পর্বত থেকে দৌড় শুরু করে মারওয়া পর্যন্ত এসে পুনরায় 'সাফা' পর্যন্ত দৌড়ালে এক চক্কর বিবেচিত হবে। এ হিসেবে 'সায়ী' সমাপ্ত হবে 'সাফা' পর্বতের উপর। ব্যাখ্যাকার ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (র.)-এর ভাষায় প্রথম অভিমতটিই বিশুদ্ধ।

قَوْلُهُ ثُمَّ سَكَنَ بِمَكَّةَ الخ : এখানে তওয়াফ ও সায়ীর পরের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইফরাদ হজকারী তওয়াফ এবং সায়ীর পর মক্কায় অবস্থান করবে। এ অবস্থান বলতে স্থায়ী অবস্থান নয় ; বরং হজের দিনের অপেক্ষায় থাকবে এবং এ অবস্থান ইহরাম অবস্থায় হতে হবে। কেননা, ইফরাদ হজে ইচ্ছুক শুধু হজের জন্য ইহরাম বেঁধেছে। সুতরাং হজ পালনের পূর্বে সে ইহরাম ভঙ্গ করতে পারবে না। হ্যাঁ, এ অপেক্ষামূলক অবস্থানকালে যত ইচ্ছা নফল তওয়াফ করতে পারবে। এ নফল তওয়াফের পর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা আবশ্যক নয়। কেননা, ইফরাদ হজ আদায়কারীর উপর একবার সায়ী করা ওয়াজিব হয়, যা সে কাবা শরীফে পৌঁছেই আদায় করে ফেলেছে।

قَوْلُهُ وَطَافَ بِالْبَيْتِ نَفْلًا الخ : হজ পালনকারী সায়ী শেষ করে মক্কায় অবস্থানকালে যত ইচ্ছা তওয়াফ করতে পারবে। এ তওয়াফ তার জন্য নফল হিসেবে হবে। না করলে কোনো গুনাহ হবে না। তবে ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করতে হবে। হজের সকল কার্য শেষ না করে ইহরাম ভঙ্গ করা যাবে না।

قَوْلُهُ وَخَطَبَ الْإِمَامُ الخ : এখানে মসজিদে হারামের খুতবা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যিনি ইমামুল হুজ্জাজ হবেন তিনি জিলহজের সাত তারিখে জোহরের নামাজের পর হজের আহকামের শিক্ষা সংবলিত ভাষণ দেবেন, যাতে থাকবে জিলহজের আট তারিখে ফজরের নামাজের পর মিনার দিকে রওয়ানা এবং মিনায় পূর্ণ একদিন একরাত অবস্থানের পর নয় তারিখে ফজরের পর আরাফার দিকে রওয়ানা ও আরাফায় অবস্থান। দুই নামাজের মধ্যে একত্রিকরণ, তারপর আরাফাহ হতে মুযদালিফার দিকে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি আহকামের বর্ণনা। আল্লামা আইনী বর্ণনা করেছেন যে, তা একই খুতবা হয়ে থাকে, যার মাঝখানে কোনো বৈঠক বা বিরতি থাকবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ التَّاسِعِ بِعَرَفَاتٍ الخ : এখানে আরাফার খুতবার বর্ণনা করা হয়েছে। জিলহজের নয় তারিখে ইমামুল হুজ্জাজ আরাফার মাঠে জোহরের নামাজের পূর্বে এক খুতবা [ভাষণ] দেবেন। যার মধ্যে আরাফায় অবস্থান, আরাফাহ হতে মুযদালিফার দিকে প্রত্যাবর্তন, মুযদালিফায় অবস্থান, অতঃপর মুযদালিফা হতে মিনা অভিমুখে রওয়ানা, তারপর মিনার মধ্যে 'রমিয়ে জেমার' ইত্যাদির আহকাম বর্ণিত হবে। অতঃপর এগারো তারিখে মিনায় অপর এক ভাষণ দেবেন, যার মধ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ, তাওয়াফে যিয়ারত, কুরবানি, হলক ইত্যাদির আহকাম বর্ণিত হবে। 'লুবাবুল মানাসিক' গ্রন্থে রয়েছে যে, উল্লিখিত তিনটি খুতবাই সুন্নত।

قَوْلُهُ ثُمَّ خَرَجَ غَدَاةَ التَّرْوِيَةِ الخ : এ ইবারতের মাধ্যমে তারবিয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। জিলহজের অষ্টম তারিখকে তারবিয়ার দিন বলা হয়। এ দিনটিকে তারবিয়ার দিন এজন্য বলা হয় যে, যারা নিজেদের উটে করে হাজীদেরকে বহন করে মিনা, আরাফার দিকে নিয়ে যায়, তারা এ তারিখে উটটিকে খুব ভালো করে পানি পান করাত; যেন সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পিপাসায় কাতর না হয়। প্রবাদ আছে যে, উটের কণ্ঠনালীতে পানি জমা রাখার থলি রয়েছে। এ থলিতে উট বেশ কয়েকদিনের পানি জমা রাখতে পারে। উটকে যেহেতু মরুভূমির জাহাজ বলা হয়; মরুভূমি অতিক্রম করতে কয়েকদিন পর্যন্ত পানি পাওয়া যায় না, আল্লাহ তা'আলা তাই তাদেরকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা এক একবার বেশ কয়েকদিনের পানি জমা রাখতে পারে। আরাফায় যেহেতু পানির বিশেষ কোনো সুব্যবস্থা ছিল না, তাই তারা নিজেদের উটকে অধিক পরিমাণে পানি পান করাত বলে এ দিনটিকে তারবিয়ার দিন বলা হয়। বর্তমানে কিন্তু সেখানে পানির কোনো অসুবিধা নেই; বরং সুব্যবস্থা রয়েছে।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. **شَوْط :** সাফা হতে মারওয়া পর্যন্ত একবার প্রদক্ষিণ করাকে এক شَوْط বলে। মূলত شَوْط শব্দের অর্থ– বার।

২. **عَرَفَاتٌ :** এটি পবিত্র মক্কা শরীফ হতে প্রায় নয় মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি বিরাট ময়দান, যেখানে জিলহজ মাসের নয় তারিখে হাজীগণ সমবেত হয়ে হজের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব وُقُوْفٌ بِعَرَفَةَ পালন করেন।

৩. **مِنًى :** এটি মক্কা হতে তিন মাইল পূর্বে একটি এলাকার নাম। সেখানে কুরবানি করা হয় এবং একটি জায়গায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয়।

وَمَكَثَ فِيهَا اِلَى فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ ثُمَّ مِنْهَا اِلَى عَرَفَاتٍ وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ اِلاَّ بَطْنَ عُرَنَةَ وَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْهُ خَطَبَ الْاِمَامُ خُطْبَتَيْنِ كَالْجُمُعَةِ وَعَلَّمَ فِيهَا الْمَنَاسِكَ وَهِيَ الْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالنَّحْرُ وَالْحَلْقُ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَصَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ اَىْ فِىْ وَقْتِ الظُّهْرِ بِاَذَانٍ وَاِقَامَتَيْنِ وَشُرِطَ الْاِمَامُ وَالْاِحْرَامُ فِيهِمَا فَلَايَجُوْزُ الْعَصْرُ لِلْمُنْفَرِدِ فِىْ اَحَدِهِمَا وَلَا لِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ ثُمَّ اَحْرَمَ اِلاَّ فِىْ وَقْتِهِ ـ

অনুবাদ : মিনায় আরাফার দিনের ফজর পর্যন্ত অবস্থান করবে। ফজরের পর আরাফার দিকে গমন করবে। আরাফায় বতনে ওরনা ছাড়া সবটাই অবস্থানের স্থান। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লে ইমাম জুমার ন্যায় দুটি খুতবা দান করবেন। এ খুতবায় মানাসিকে হজ শিক্ষাদান করবেন। আর মানাসিক হলো আরাফাহ এবং মুযদালিফায় অবস্থান, কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানি করা, মাথা মুণ্ডানো এবং তাওয়াফে যিয়ারত। জনসাধারণকে সাথে নিয়ে [জামাত সহকারে] জোহরের সময় জোহর এবং আসরের নামাজ এক আজান এবং দুই ইকামত সহকারে আদায় করবে। جَمْعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ-এর জন্য ইমামের সাথে জামাত সহকারে নামাজ আদায় করা এবং ইহরামের অবস্থায় থাকা শর্ত। সুতরাং যে জোহর কিংবা আসরে মুনফারিদ হবে তার জন্য আসরের নামাজ জোহরের সময় জায়েজ হবে না। যে জোহরের নামাজ জামাত সহকারে আদায় করার পর ইহরাম বেঁধেছে, সে ব্যক্তির আসরের নামাজও আসরের সময় ব্যতীত জায়েজ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَكَثَ فِيهَا الخ : এখানে মিনায় অবস্থান করার সময় করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারবিয়ার দিন মক্কা হতে মিনায় পৌঁছে সেখানে পূর্ণ একদিন অবস্থান করবে। মিনা হেরেম সীমানার ভিতরে মক্কা হতে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একদিন একরাত অবস্থান করে পরের দিন জিলহজের নবম তারিখ ফজরের পর আরাফার দিকে যাবে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ তারবিয়ার দিন [আট তারিখে] মক্কা শরীফে ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। তারপর সূর্য উদিত হওয়ার পর তিনি মিনার দিকে যান। মিনায় তিনি জোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং আরাফার দিনের ফজরের নামাজ আদায় করেন। অতঃপর তিনি আরাফার মাঠের দিকে যাত্রা করেন।

قَوْلُهُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ الخ : এখানে আরাফাহ ও মুযদালিফার অবস্থানস্থল সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আরাফার সমস্ত মাঠই অবস্থানস্থল তথা হাজীগণ আরাফার মাঠের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারবে, তবে بَطْنُ عُرَنَةَ হতে বিরত থাকবে। কেননা, بَطْنُ عُرَنَةَ নিষিদ্ধ এলাকা। হাদীসে আছে, আরাফার সমস্ত এলাকা অবস্থানস্থল, কিন্তু بَطْنُ عُرَنَةَ নামক স্থানে অবস্থান করবে না। আর মুযদালিফার সমস্ত এলাকা অবস্থানস্থল, কিন্তু وَادِىْ مُحَسِّرْ তথায় অবস্থান করবে না।

قَوْلُهُ خَطَبَ الْاِمَامُ الخ : এখানে আরাফায় অবস্থান করার সময়ের কার্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। হাজীগণ যখন আরাফায় পৌঁছবে তখন সেখানে অবস্থান করবে এবং সেখানে নামাজ আদায় করবে, দোয়া করবে, আল্লাহর জিকির করবে, কুরআন তেলাওয়াত করবে। আর যখন সূর্য ঢলে যাবে, তখন গোসল করবে অথবা অজু করবে, তবে গোসল করা উত্তম। তারপর যথাশীঘ্র মসজিদে নামিরায় পৌঁছবে। অতঃপর বড় ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি মিম্বরের উপর বসার পর মোয়াজ্জিন তাঁর সম্মুখে

আজান দেবেন। আজানের পর ইমাম সাহেব জুমার খুতবার ন্যায় দুটি খুতবা দেবেন। খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা, তালবিয়া, তাকবীর, তাহলীল, দরূদ এবং লোকদের প্রতি উপদেশ থাকবে। বিশেষ করে হজের আহকামের বর্ণনা তথা আরাফায় অবস্থান করা, মুযদালিফায় অবস্থান করা, কঙ্কর নিক্ষেপ করা, কুরবানি, হলক [মাথা মুণ্ডানো], তাওয়াফে যিয়ারত ইত্যাদির বর্ণনা থাকবে। অবশেষে আল্লাহর দরবারে দোয়া করে মিম্বর হতে অবতরণ করবেন। (كَذَا فِىْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الْوِقَايَةِ)

قَوْلُهُ وَصَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ الخ : এখানে দুওয়াক্ত নামাজকে একত্রিকরণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আরাফায় অবস্থান করার সময় জোহর এবং আসরের নামাজ একই সাথে এক আজান এবং দু ইকামতের সাথে জোহরের ওয়াক্তে আদায় করবে। এরূপ দুওয়াক্তের নামাজকে একত্রে আদায় করাকে جَمْعٌ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ বলে। তবে এ ক্ষেত্রে আসরের নামাজ জোহরের সময় আদায় করা হয়, বিধায় একে جَمْعُ تَقْدِيْمٍ বলে। এরূপ একত্রিকরণের ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে এবং নবী করীম ﷺ হতে অনুরূপই বর্ণিত আছে। আর মুযদালিফায় অবস্থান করার সময় মাগরিব এবং এশার নামাজ একই সাথে একই আজানে এশার নামাজের ওয়াক্তে আদায় করা হয়। একেও جَمْعٌ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ বলে। তবে এ ক্ষেত্রে মাগরিবের নামাজ এশার সময় আদায় করা হয় এজন্য এটাকে جَمْعُ تَاخِيْرٍ বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, এখানে ظُهْر বলে এ বিষয়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, যদি আরাফার দিন জুমার দিন হয় তাহলে সেদিন জুমার নামাজ আদায় করতে হবে না; বরং জোহরের নামাজ আদায় করতে হবে।

قَوْلُهُ فَلَا يَجُوْزُ الْعَصْرَ لِلْمُنْفَرِدِ الخ : জোহর বা আসরের নামাজে যদি কেউ একাকী হয় অর্থাৎ নামাজ জামাতে না আদায় করে, তখন দুই নামাজকে একত্রে আদায় করতে পারবে না ; বরং উভয় নামাজকে নিজ নিজ সময়ে একাকী আদায় করবে। অনুরূপ যদি কেউ ইহরাম অবস্থায় না হয় এবং ইমামের সাথে জামাতের সঙ্গে জোহরের নামাজ আদায় করার পর ইহরাম বাঁধে, তখন তাকে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রিকরণ করা জায়েজ হবে না; বরং আসরের নামাজকে যথা সময়ে আদায় করতে হবে। এখানে جَمْع -এর অর্থ হলো আসরের নামাজকে জোহরের সময় আদায় করা, নতুবা একত্রিকরণের অন্য কোনো পথ নেই।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. بَطْنُ عُرَنَةَ : এটা পূর্বে আরাফার নিকট একটি জঙ্গল ছিল। বর্তমানে সে জায়গা ময়দানে পরিণত হয়েছে। এ স্থানে অবস্থান করা বৈধ নয়। কারণ, তা আরাফার সীমার বহির্ভূত স্থান।

২. اَلْمُنْفَرِدُ : একাকী নামাজ আদায়কারীকে مُنْفَرِدْ বলে।

هٰذَا اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهٖ فَلَا يَجُوْزُ الْعَصْرُ وَاِنَّمَا خُصَّ الْعَصْرُ بِهٰذَا الْحُكْمِ لِاَنَّ الظُّهْرَ جَائِزٌ لِوُقُوْعِهٖ فِىْ وَقْتِهٖ اَمَّا الْعَصْرُ فَلَا يَجُوْزُ قَبْلَ الْوَقْتِ اِلَّا بِشَرْطِ الْجَمَاعَةِ فِىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَكَوْنُهٗ مُحْرِمًا فِىْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّلٰوتَيْنِ ثُمَّ ذَهَبَ اِلَى الْمَوْقِفِ بِغُسْلٍ سُنَّ وَ وَقَفَ الْاِمَامُ عَلٰى نَاقَتِهٖ بِقُرْبِ جَبَلِ الرَّحْمَةِ مُسْتَقْبِلًا وَ دَعَا بِجُهْدٍ وَعَلَّمَ الْمَنَاسِكَ وَ وَقَفَ النَّاسُ خَلْفَهٗ بِقُرْبِهٖ مُسْتَقْبِلِيْنَ سَامِعِيْنَ مَقُوْلَهٗ وَاِذَا غَرَبَتْ اَتٰى مُزْدَلِفَةَ وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ اِلَّا وَادِىْ مُحَسِّرٍ وَنَزَلَ عِنْدَ جَبَلِ قُزَحٍ وَصَلَّى الْعِشَائَيْنِ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ هٰهُنَا جَمْعُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِىْ وَقْتِ الْعِشَاءِ۔

অনুবাদ : তা (اِلَّا فِىْ وَقْتِهٖ)-কে فَلَا يَجُوْزُ الْعَصْرُ উক্তি হতে اِسْتِثْنَاءٌ করা হয়েছে। আর জায়েজ না হওয়ার হুকুমের সাথে আসরকে এজন্য নির্ধারিত করা হয়েছে যে, জোহর তার নিজস্ব ওয়াক্তে হওয়ার দরুন জায়েজ হবে ; কিন্তু আসর তার ওয়াক্তের পূর্বে জায়েজ হবে না। তবে এ শর্তের সাথে জায়েজ হবে যে, জোহর ও আসর উভয় নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবে এবং মুসল্লির জোহর ও আসর উভয় নামাজ ইহরামের সাথে হবে। অতঃপর ইমাম সুন্নত গোসল করে মাওকেফের দিকে যাবেন এবং জাবালে রহমতের নিকট স্বীয় উটের উপর কেবলামুখি হয়ে অবস্থান করবেন এবং কান্নাকাটি সহকারে দোয়া করবেন। আর হজের আহকামের তালিম দেবেন। লোকজন তাঁর পিছনে কেবলামুখি হয়ে দাঁড়াবে এবং ইমামের কথাবার্তা শুনবে। আর যখন সূর্য অস্ত যাবে, তখন হাজীগণ মুযদালিফায় পৌঁছবে। মুযদালিফার وَادِىْ مُحَسِّرٌ ব্যতীত পূর্ণ এলাকা مَوْقِفٌ [অবস্থানস্থল] এবং জাবালে কুযাহ-এর নিকটে অবতরণ করবে। তথায় মাগরিব ও এশা উভয় নামাজকে এক আজান ও এক ইকামতে আদায় করবে। এখানে মাগরিব ও এশার নামাজ এশার ওয়াক্তে একত্রিত করে আদায় করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ ذَهَبَ اِلَى الْمَوْقِفِ : এখানে মাওয়াকিফের কার্যাবলি আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম জোহর ও আসরের নামাজ সমাপ্ত করে মাওয়াকিফের দিকে যাবেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ করে মাওয়াকিফের দিকে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কেবলামুখি হয়ে দোয়া এবং জিকিরে লিপ্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি নিজের উষ্ট্রীর উপর বসাছিলেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এ অবস্থায়ই ছিলেন। বর্তমানে সওয়ারিতে আরোহণ ব্যতীত ভূমিতে অবস্থান করে দোয়া করা হয়। এ দোয়া আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত দাঁড়িয়ে করা মোস্তাহাব।

قَوْلُهٗ بِغُسْلٍ سُنَّ الخ : মাওয়াকিফে যাওয়ার সময়ের গোসলের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। سُنَّ সীগাহটি فِعْل مَجْهُوْل য -এর সিফাত। এর প্রকাশ্য অর্থ এই যে, নামাজ হতে অবসর হওয়ার পর মাওয়াকিফের দিকে যাওয়ার পূর্বে গোসল করা সুন্নত। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নামাজের পূর্বেই গোসল করা সুন্নত, যাতে নামাজ ও মাওয়াকিফে যাত্রার মধ্যে কোনো পৃথককারী না থাকে। এ মতই গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ بِقُرْبِ جَبَلِ الرَّحْمَةِ الخ : 'জাবালে রহমত' আরাফার মাঠে একটি পাহাড়ের নাম। মহানবী ﷺ -এর অবস্থানস্থল ছিল এ পাহাড়ের সন্নিকটে, যেখানে কালো পাথর পাওয়া যায়। মহানবী ﷺ এ পাহাড়ে দাঁড়িয়ে বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ وَ دَعَا بِجُهْدٍ الخ : এখানে আরাফায় দোয়া করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। جَهْدٌ তা (بِفَتْحِ الْجِيْمِ وَضَمِّهَا) অর্থ–খুব চেষ্টা ও কান্নাকাটি করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন–

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُوْ بِعَرَفَةَ يَدَاهُ اِلٰى صَدْرِهٖ كَالْمُسْتَطْعِمِ الْمِسْكِيْنِ.

অর্থাৎ "আমি হযরত নবী করীম ﷺ -কে আরাফার মাঠে এভাবে দোয়া করতে দেখেছি যে, তাঁর উভয় হাত খাদ্য প্রার্থনাকারী মিসকিনের ন্যায় বুক পর্যন্ত উঠানো।" –[বায়হাকী]

ইবনে মাজার এক বর্ণনা রয়েছে যে, মহানবী ﷺ একান্ত কাকুতিমিনতি সহকারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে উম্মতের জন্য দোয়া করেছেন, যা কবুল হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذَا غَرَبَتْ الخ : এখানে মুযদালিফার দিকে রওয়ানার সময় সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। হাজীগণ সূর্যাস্তের পরে মুযদালিফার দিকে যাবে। যদি কেউ সূর্যাস্তের পূর্বেই রওয়ানা করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। কেননা, তা সুন্নতের পরিপন্থি হাদীস শরীফে রয়েছে, হযরত নবী করীম ﷺ সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার দিকে রওয়ানা করেছিলেন। –[তিরমিযী]

قَوْلُهُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ : এখানে মুযদালিফায় অবস্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। وَادِيْ مُحَسِّرْ ব্যতীত সমস্ত মুযদালিফাই অবস্থানস্থল। এ وَادِيْ مُحَسِّرْ মিনার দিকে মুযদালিফার সংলগ্ন একটি স্থান। এটা মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী একটি স্থান। মুজদালিফাতে অবস্থান করা ওয়াজিব।

قَوْلُهُ عِنْدَ جَبَلِ قُزَحَ : এখানে মুযদালিফায় হাজীদের অবতরণস্থল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। قَزَحْ একটি পাহাড়ের নাম, যা مَشْعَرْ حَرَامْ-এ অবস্থিত। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম ﷺ সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

قَوْلُهُ وَصَلَّى الْعِشَائَيْنِ : এখানে মুযদালিফায় দুই নামাজকে একত্রিকরণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশার নামাজ এক আজান ও এক ইকামতে একত্রিত করে আদায় করবে। এ ক্ষেত্রে মাগরিবের নামাজ এশার সময় আদায় করতে হবে। যদি কেউ এশার ওয়াক্তের পূর্বেই মুযদালিফায় পৌঁছে যায়, তখন এশার নামাজের অপেক্ষা করবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এশার সময় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এশার নামাজ আদায় করবে না। এ একত্রিকরণের জন্য জামাত শর্ত নয়, তবে ইহরাম শর্ত এবং এটাও শর্ত যে, এর পূর্বে আরাফায় অবস্থান করেছে। আমাদের হানাফীদের মতে আরাফাহ এবং মুযদালিফায় جَمْعٌ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ হজের আহকামের অন্তর্ভুক্ত। (كَذَا فِيْ شَرْحِ لُبَابِ الْمَنَاسِكِ)

قَوْلُهُ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ الخ : এখানে একত্রিকৃত নামাজের আজান ও ইকামতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এক আজান ও এক ইকামতের সাথে উভয় নামাজকে একত্রিত করবে। এক আজান এজন্য যে, তা নামাজের সময় হওয়ার ঘোষণা, সুতরাং এক আজানই যথেষ্ট। আর ইকামত এক হওয়ার কারণ এই যে, এশার নামাজ তার নির্ধারিত সময়ে হচ্ছে। অতএব তার জন্য সময়ের ঘোষণার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে আরাফায় যেহেতু অপর নামাজ তথা আসরের নামাজের সময় আসার পূর্বে আদায় করা হচ্ছিল এজন্য তাতে ইকামতের প্রয়োজন ছিল। এটা আমাদের আহনাফের অভিমত। আর এ অভিমতের দিকে ইঙ্গিত করে মহানবী ﷺ -এর হাদীস যে, তিনি মুযদালিফার ময়দানে এক আজান ও এক একামতের দ্বারা দুই নামাজকে একত্রিত করেছেন। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুটি ইকামতই হতে হবে। কারণ, এ অভিমতটি সবল। কেননা, বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাবসমূহে একাধিক ইকামতের কথা উল্লেখ রয়েছে।

وَاَعَادَ مَغْرِبًا مَنْ اَدَّاهُ فِى الطَّرِيْقِ اَوْ بِعَرَفَاتٍ مَا لَمْ يَطْلِعِ الْفَجْرُ لَا بَعْدَهُ فَاِنَّهُ اِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ لَا يَجُوْزُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) فَيَجِبُ الْاِعَادَةُ مَا لَمْ يَطْلِعِ الْفَجْرُ فَاِنَّ الْحُكْمَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ لِاِدْرَاكِ فَضِيْلَةِ الْجَمْعِ وَ ذَا اِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَاِذَا فَاتَ اِمْكَانُ الْجَمْعِ سَقَطَ الْقَضَاءُ لِاَنَّهُ اِنْ وَجَبَ الْقَضَاءُ فَاَمَّا اِنْ وَجَبَ قَضَاءُ فَضِيْلَةِ الْجَمْعِ وَ ذَا لَا يُمْكِنُ اِذْ لَا مِثْلَ لَهُ وَاِنْ وَجَبَ قَضَاءُ نَفْسِ الصَّلٰوةِ فَقَدْ اَدَّاهَا فِى الْوَقْتِ فَكَيْفَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا ـ

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজ রাস্তায় অথবা আরাফায় আদায় করে, তার ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে মাগরিবের নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে, ফজরের সময়ের পরে নয়। কেননা, মাগরিবের নামাজ যদি এশার সময়ের পূর্বে আদায় করে, তাহলে তা তরফাইন [ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)]-এর মতে জায়েজ হবে না। সুতরাং ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে মাগরিব পুনরায় পড়া ওয়াজিব। কেননা, রাস্তায় বা আরাফায় মাগরিব আদায় করা নাজায়েজ হওয়ার বিধান একত্রিকরণের ফজিলত অর্জনের জন্য। আর একত্রিকরণের ফজিলত ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত থাকে। অতএব, যখন একত্রিকরণের সুযোগ চলে গেল তখন কাজার হুকুম রহিত হয়ে গেল। কেননা, কাজা ওয়াজিব হলে হয়তো দু নামাজ একত্রে আদায় করার ফজিলতের কাজা ওয়াজিব হবে, অথচ তা সম্ভব নয়। এর কোনো বিকল্প নেই। নতুবা শুধু নামাজের কাজা ওয়াজিব হবে, অথচ সে সময় মতো নামাজ আদায় করেছে; অতএব কাজা ওয়াজিব কিরূপে হবে?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَعَادَ مَغْرِبًا الخ : এখানে মুযদালিফায় পৌঁছার পূর্বে মাগরিব বা এশার নামাজ আদায় করার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কেউ মুযদালিফায় পৌঁছার পূর্বেই রাস্তায় কিংবা আরাফায় মাগরিবের নামাজ আদায় করে নেয়, সে রাত্রেই ফজরের সময়ের আগেই মাগরিবের নামাজ তাকে পুনরায় আদায় করতে হবে। কেননা, তার জন্য সে রাত্রের এশার সময় মাগরিবের নামাজ নির্ধারিত এবং মুযদালিফায় হওয়াও বাঞ্ছনীয় ছিল। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, আরাফাহ হতে মুযদালিফা গমনের পথে এক ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাগরিবের নামাজ আরও অগ্রসর হয়ে মুযদালিফায় আদায় করতে হবে। এতে প্রতীয়মান হলো যে, মুযদালিফায় পৌঁছার আগে যদি কেউ পথে এশার নামাজও আদায় করে, তবে তাকে সে নামাজও পুনরায় আদায় করতে হবে। তা তরফাইন [ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ হানীফা (র.)]-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যেহেতু সে এশার সময়ে এশার নামাজ আদায় করেছে, সুতরাং তাকে পুনরায় আদায় করতে হবে না। অবশ্য সুন্নতের বিপরীত হওয়ার কারণে গুনাহগার হবে।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ اِنْ وَجَبَ الْقَضَاءُ الخ : এখানে মাগরিবের নামাজ কাজা না হওয়ার কারণ আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনার সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি মুযদালিফার পথে কিংবা আরাফার ময়দানে মাগরিবের নামাজ আদায় করে তার উপর ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে ঐ নামাজ পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। যদি সে মাগরিবের নামাজের কাজা সূর্যোদয়ের পরে হয়, যা সে তার নির্ধারিত সময়ের ভিতর আদায় করেছিল, তাহলে তা দুই নামাজের একত্রিকরণের উত্তমতার কাজা হবে, যা অসম্ভব। কেননা, কাজা অনুরূপ বা উদাহরণের হয়ে থাকে, আর এখানে উত্তমতার কোনো উদাহরণ নেই। এজন্য তার কাজাও অসম্ভব। অথবা মূল নামাজের কাজা করবে, আর তা অযৌক্তিক এজন্য যে, সে সময়ের ভিতরেই নামাজ আদায় করেছে। কাজা তো তখন হবে যখন নামাজ সময়ের ভিতরে আদায় করা যায় না।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. مُزْدَلِفَةٌ : মিনা ও আরাফার মধ্যস্থিত একটি ময়দান, যা মিনা হতে তিন মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত। এখানে হাজী আরাফাহ হতে প্রত্যাবর্তন করার পথে মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করেন।

২. جَبَلُ قُزَحٍ : মুযদালিফায় অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম।

৩. وَادِىْ مُحَسِّرٍ : ঐ মাঠকে বলা হয়, যা মুযদালিফার সাথে সংযুক্ত। এ স্থানে আসহাবে ফীলের উপর আজাব অবতীর্ণ হয় এ মাঠ আজাব অবতীর্ণ হওয়ার স্থান বিধায় এ স্থান অতিক্রম করার সময় দৌড়ে অতিক্রম করার শরয়ী বিধান রয়েছে।

وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ وَقَفَ وَ دَعَا وَهُوَ وَاجِبٌ لَا رُكْنٌ وَ اِذَا اَسْفَرَ اَتَى بِمِنًى وَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ سَبْعًا خَذْفًا وَكَبَّرَ بِكُلٍّ مِنْهَا وَقَطَعَ تَلْبِيَتَهُ بِاَوَّلِهَا ثُمَّ ذَبَحَ اِنْ شَاءَ ثُمَّ قَصَرَ وَ حَلْقُهُ اَفْضَلُ وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا النِّسَاءُ ثُمَّ طَافَ لِلزِّيَارَةِ يَوْمًا مِنْ اَيَّامِ النَّحْرِ سَبْعَةً بِلَا رَمَلٍ وَسَعْيٍ اِنْ كَانَ سَعَى قَبْلُ وَاِلَّا فَمَعَهَا .

অনুবাদ : আর ফজরের নামাজ (غَلَسْ) অন্ধকারে পড়বে, তারপর অবস্থান করত দোয়া করবে। মুযদালিফার এ অবস্থান ওয়াজিব; রোকন নয়। অতঃপর যখন اِسْفَارْ তথা আলোকিত হবে, তখন মিনার দিকে আসবে এবং بَطْنِ وَادِىْ হতে জামরায়ে আকাবার মধ্যে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় তাকবীর বলবে। প্রথমবারে কঙ্কর নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ করা ছেড়ে দেবে। তারপর ইচ্ছা করলে ইহরাম ভঙ্গের পূর্বেই জবাই তথা কুরবানি করতে পারবে। অতঃপর মাথার চুল কাটবে, তবে মাথা মুণ্ডানোই উত্তম। এভাবে [ইহরাম ভঙ্গের পর তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে] স্ত্রীসহবাস ব্যতীত সব কিছুই তার জন্য হালাল হবে। অতঃপর কুরবানির দিনসমূহের মধ্যে কোনো একদিন সাতবার তথা সাত চক্কর তাওয়াফে যিয়ারত করবে, যার মধ্যে রমল ও সায়ী থাকবে না, যদি প্রথমে তথা তাওয়াফে কুদূমের সাথে সায়ী করে থাকে। আর যদি তাওয়াফে কুদূমে সায়ী না করে থাকে, তাহলে তাওয়াফে যিয়ারতের সাথে সায়ী করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ : জিলহজ মাসের ৯ তারিখ দিবাগত রাতে হাজীগণ মুযদালিফায় অবস্থান করবে। ঐ রাতের শেষাংশে ভোরের শুভ্রতা ফুটার পূর্বে অন্ধকার থাকা অবস্থায়ই ফজর পড়তে হবে। এটা সুন্নত। কেউ যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তবে তার উপর কোনো জরিমানা আরোপিত হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ وَقَفَ وَ دَعَا الخ : এখানে মুযদালিফায় অবস্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মুযদালিফার এ অবস্থান ওয়াজিব; রোকন নয়। কুরবানির দিনের প্রভাতের উদয় হতে এ অবস্থানের আরম্ভ হবে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত এর সময় থাকবে। কিন্তু এ অবস্থানের আবশ্যকীয় পরিমাণ অতি সামান্য। এ ক্ষেত্রে মোস্তাহাব হলো جَبَلِ قُزَحْ-এর উপর অবস্থান করা। আর যদি তথায় সংকুলান না হয় তাহলে আশেপাশে কোথাও অবস্থান করবে। এ অবস্থান করার সময় পূর্ণ আলোকিত হওয়া পর্যন্ত দোয়া-দরুদ, তালবিয়া, জিকির ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকবে। তারপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই তথা হতে মিনার দিকে রওয়ানা করবে। সহীহ হাদীস দ্বারা হযরত নবী করীম ﷺ হতে তা-ই বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ وَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ الخ : এখানে কঙ্কর নিক্ষেপের পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মিনায় পৌঁছে জামরায়ে আকাবায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলবে এবং প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময়েই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে। জিলহজের দশ তারিখে শুধু এক জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। পরের দু'দিন তিন জামরায় সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। এ কঙ্কর بَطْنِ وَادِىْ-এর দিক হতে নিক্ষেপ করবে। বুখারী শরীফের বর্ণনা মতে, হযরত নবী করীম ﷺ হতে অনুরূপ প্রমাণিত হয়েছে। আর যদি بَطْنِ وَادِىْ-এর দিক ব্যতীত অন্য কোনো দিক হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করে তাও জায়েজ হবে। সাতটি কঙ্করকে এক এক করে নিক্ষেপ করবে। যদি সাতটি কঙ্করকে এক মুঠে নিক্ষেপ করে তা এক কঙ্কর নিক্ষেপের স্থলে সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهٗ ثُمَّ ذَبَحَ اِنْ شَاءَ : এখানে জবাই করাকে ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে জবাই করবে। ইচ্ছা করার প্রশ্ন এজন্য যে, এখানে ইফরাদ হজকারী সম্পর্কে কথা চলছে, যার উপর দম ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ, সে ব্যক্তির কুরবানি করা উত্তম, কিরান ও তামাত্তু' হজকারীর উপর দম ওয়াজিব হবে। ব্যক্তি মুসাফির হলে তার উপর কুরবানি আবশ্যক হবে না; মুকীমের উপর ওয়াজিব। যেমন– মক্কাবাসীর উপর। (كَذَا فِى الْبَحْرِ)

قَوْلُهٗ ثُمَّ قَصَرَ وَحَلْقُهٗ اَفْضَلُ : কুরবানি করার পর হজ পালনকারী তার মাথার চুল খাটো করার মাধ্যমে ইহরাম থেকে মুক্ত হবে। তবে চুল খাটো করার চেয়ে মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। উল্লেখ্য, এ বিধান শুধুমাত্র পুরুষের জন্য; মেয়েরা মাথা মুণ্ডন করবে না। তবে কোনো মহিলা যদি চুলের কিছু অংশ ছাঁটাতে চায়, তাহলে সেটা তার ইচ্ছাধীন।

قَوْلُهٗ وَحَلَّ لَهٗ كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا النِّسَاءُ الخ : এখানে ইহরাম ভঙ্গের পর কি কি কাজ করা হালাল এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চুল খাটো করার বা মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে ইহরাম ভঙ্গের পর তার জন্য সকল বিষয় হালাল হবে যা তার জন্য ইহরাম অবস্থায় হারাম ছিল। যেমন– শিকার করা, শিকারের প্রতি কাউকেও ইঙ্গিত করা, সেলাইকৃত কাপড় ব্যবহার করা ইত্যাদি। কিন্তু স্ত্রীসহবাস করা বা স্ত্রীসহবাসের প্রতি উৎসাহদানকারী সমস্ত কার্যাবলি হারাম হবে। এ বিধান তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্ব পর্যন্ত থাকবে। তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রীসহবাসও হালাল হবে। তাওয়াফে যিয়ারত কুরবানির দিনসমূহের যে-কোনো দিন করলেই চলবে। তবে এ তওয়াফে রমল এবং সায়ী নেই। আর যদি কেউ তাওয়াফে কুদূমের সায়ী না করে থাকে, তবে এখন তাওয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী করতে হবে।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. غَلَس : ফজর উদিত হওয়ার প্রথম দিককে গাল্‌স বলা হয়, যাতে অন্ধকার থেকে যায়।

২. بَطْنِ وَادِىْ : মাঠের নিম্ন ভাগকে بَطْنِ وَادِىْ বলা হয়।

৩. قَصْر : অর্থাৎ চুল খাটো করা, আঙুলের মাথা পরিমাণ কেটে ফেলা।

৪. حَلْق : অর্থাৎ মাথার চুল মুণ্ডানো। যেমন আল্লাহর বাণী– (الاية) مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ

وَاَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوْعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَهُوَ فِيْهِ اَفْضَلُ اَىْ فِىْ يَوْمِ النَّحْرِ وَحَلَّ لَهُ النِّسَاءُ فَاِنْ اَخَّرَهُ عَنْهَا كُرِهَ اَىْ عَنْ اَيَّامِ النَّحْرِ وَ وَجَبَ دَمٌ ثُمَّ اَتٰى بِمِنًى وَبَعْدَ زَوَالِ ثَانِى النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ يَبْدَأُ بِمَا يَلِى الْمَسْجِدَ اَىْ مَسْجِدَ الْخَيْفِ ثُمَّ مِمَّا يَلِيْهِ ثُمَّ بِالْعَقَبَةِ سَبْعًا سَبْعًا وَكَبَّرَ بِكُلِّ حَصَاةٍ وَ وَقَفَ بَعْدَ رَمْىٍ بَعْدَهُ رَمْىٌ فَقَطْ اَىْ يَقِفُ بَعْدَ الرَّمْىِ الْاَوَّلِ وَبَعْدَ الثَّانِىْ لَا بَعْدَ الثَّالِثِ وَلَا بَعْدَ رَمْىِ يَوْمِ النَّحْرِ وَ دَعَا ثُمَّ غَدًا كَذٰلِكَ ثُمَّ بَعْدَهُ كَذٰلِكَ اِنْ مَكَثَ وَهُوَ اَحَبُّ وَاِنْ قَدَّمَ الرَّمْىَ فِيْهِ اَىْ فِى الْيَوْمِ الرَّابِعِ عَلَى الزَّوَالِ جَازَ وَلَهُ النَّفْرُ قَبْلَ طُلُوْعِ فَجْرِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ .

অনুবাদ : তাওয়াফে যিয়ারতের প্রথম ওয়াক্ত কুরবানির তারিখের সুবহে সাদেক হতে আরম্ভ হয়। এ তাওয়াফে যিয়ারত কুরবানির তারিখেই করা উত্তম। এ তাওয়াফের পর স্ত্রীসহবাস হালাল হয়ে যায়। তাওয়াফে যিয়ারত বিলম্বিত করা অর্থাৎ কুরবানির তারিখসমূহের পরে করা মাকরূহ। এতে দম ওয়াজিব হয়। অতঃপর আবার মিনায় আগমন করবে এবং কুরবানির দ্বিতীয় তারিখে অর্ধ দিনের পর জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। এ কঙ্কর নিক্ষেপ করা সে জামরা হতে আরম্ভ করবে যা মাসজিদে খাইফের সংলগ্ন। অতঃপর এর সংলগ্ন জামরায় নিক্ষেপ করবে। সর্বশেষে জামরায়ে আকাবায় নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক জামরায় সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে এবং প্রত্যেক কঙ্করের সাথে তাকবীর বলবে। যে কঙ্কর নিক্ষেপের পর আরো কঙ্কর নিক্ষেপ করা আছে সে কঙ্কর নিক্ষেপের পর বিলম্ব করবে। অর্থাৎ প্রথম এবং দ্বিতীয় নিক্ষেপের পর কিছুক্ষণ বিলম্ব করবে; তৃতীয় এবং দশম তারিখের নিক্ষেপের পরে নয়। আর দোয়া করবে। পরদিনও সে রকম করবে এবং এরপর দিনও সে রকম করবে। যদি মিনায় অবস্থান করে এটা মোস্তাহাব। যদি চতুর্থ দিনে অর্ধ দিনের আগেই কঙ্কর নিক্ষেপ করে, তবে দুরস্ত হবে। চতুর্থ দিনের সুবহে সাদেকের পূর্বে প্রস্থান করাও জায়েজ আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ فِيْهِ اَفْضَلُ : বলা বাহুল্য যে, ১০, ১১, ও ১২ জিলহজ এ তিনদিনকে اَيَّامُ النَّحْرِ [কুরবানির দিবস] বলা হয়। এ তিনদিনের যে-কোনো সময়ে তাওয়াফে যিয়ারত করা যাবে; তবে ১০ তারিখই হচ্ছে তওয়াফের প্রারম্ভিক সময়। তাই এ দিনটাতে তথা ১০ জিলহজে তাওয়াফে যিয়ারত করাটাই اَفْضَلُ [উত্তম]। এখানে فِيْهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে فِىْ يَوْمِ النَّحْرِ প্রকাশ থাকে যে, يَوْمُ النَّحْرِ বলে কেবল ১০ জিলহজ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ فَاِنْ اَخَّرَهُ عَنْهَا الخ : এখানে কুরবানির দিবসসমূহে তাওয়াফে যিয়ারত না করার বিধান আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কুরবানির দিনসমূহের কোনো দিন তওয়াফ না করে পরে তওয়াফ করে, তবে তা মাকরূহ তাহরীমী হবে। হ্যাঁ, যদি কোনো নির্ভরযোগ্য ওজরের কারণে বিলম্ব করে, তাহলে মাকরূহ হবে না। যেমন– যদি এসব দিনে কোনো মহিলা ঋতুমতী হয়ে পড়ে। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, বিদায় হজ উপলক্ষে মহানবী ﷺ -এর এক স্ত্রী ঋতুমতী হয়েছিলেন। তখন তিনি বলেন যে, সম্ভবত হায়েজ আমাদেরকে তাওয়াফে যিয়ারত হতে বিরত রেখেছে।

قَوْلُهُ وَ وَجَبَ دَمٌ الخ : এখানে দম ওয়াজিব হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কুরবানির দিনসমূহের মধ্যে যে-কোনো দিনে তাওয়াফে যিয়ারত করা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু তা নির্ধারিত সময়ে পালন করেনি, ফলে একটি দম ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ কুরবানির পশুর মতো একটি পশু জবাই করতে হবে। কেননা, হজে যে সমস্ত কাজ ওয়াজিব তা ছেড়ে দিলে দম দিতে হয়। আর সর্বনিম্ন স্তরের দম হলো একটি ছাগল। মুয়াত্তা মালিক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কেউ হজের ওয়াজিব কার্যাবলির কিছু ভুলে যায় কিংবা বাদ দেয়, তবে সে যেন একটি পশু জবাই করে রক্ত প্রবাহিত করে, তা-ই দম।

قَوْلُهُ ثُمَّ غَدًا كَذٰلِكَ الخ : এখানে মিনা হতে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কুরবানির দিনের তৃতীয় দিন তথা ১২ তারিখেও তিনটি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। তা হজ করে চলে যাওয়ার প্রথম দিন। এ তারিখে মক্কায় চলে গেলেও হজের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল, আর যদি ১২ তারিখ না গিয়ে মিনায় আইয়ামে তাশরীক পূর্ণ করে তথা তেরো তারিখও মিনায় রয়ে যায়, তাহলে ১৩ তারিখেও ১২ তারিখের মতো তিনটি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। আর তেরো তারিখ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা মোস্তাহাব।

قَوْلُهُ عَلَى الزَّوَالِ جَازَ : যদি কেউ আইয়ামে তাশরীকের শেষ তারিখ তথা তেরো তারিখ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে এবং সে তেরো তারিখের কঙ্কর নিক্ষেপ زَوَالٌ-এর পূর্বেই করুক তাহলে তা জায়েজ হবে, তবে মাকরূহ তানযীহী হবে। কেননা, ফজর উদিত হওয়া হতে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কঙ্কর নিক্ষেপের সময়। তবে زَوَالٌ-এর পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা মাকরূহ এবং زَوَالٌ-এর পরে কঙ্কর নিক্ষেপ করা সুন্নত। (كَذَا فِىْ شَرْحِ اللُّبَابِ)

قَوْلُهُ وَلَهُ النَّفْرُ قَبْلَ طُلُوْعِ فَجْرِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ : এখানে বারো তারিখের পর মিনায় অবস্থান করা না করার বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ ইচ্ছা করলে চলে যেতে পারে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ অর্থাৎ বারো তারিখে যদি কেউ মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করে তার জন্য তা জায়েজ হবে। আর যদি ১২ তারিখেও সে মিনায় অবস্থান করে, তখন তার জন্য ১৩ তারিখের ফজরের পূর্বে মিনা হতে রওয়ানা করার অনুমতি আছে। কিন্তু তেরো তারিখের সূর্যোদয়ের মুহূর্ত পর্যন্ত যদি সে মিনায় রয়ে যায়, তাহলে কঙ্কর নিক্ষেপ করা ব্যতীত তার মিনা ত্যাগ করা জায়েজ হবে না।

উল্লেখ্য যে, দশ তারিখে মুযদালিফা হতে মিনায় পৌছার পর সর্বপ্রথম কাজ হলো জামরায়ে আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ ছেড়ে দেবে। আর প্রত্যেকবার কঙ্কর নিক্ষেপের সময় নিম্নের দোয়া পাঠ করবে- بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَ رِضًا لِلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَ ذَنْبًا مَغْفُوْرًا

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. اَيَّامُ نَحْرٍ : জিলহজ মাসের ১০ তারিখ হতে ১২ তারিখ পর্যন্ত তিনদিনকে اَيَّامُ نَحْرٍ বলা হয়। যে সকল দিনে কুরবানি করা হয়।

২. دَمٌ : ইহরামের অবস্থায় কোনো নিষিদ্ধ কাজ করার স্থলে বকরি ইত্যাদি জবাই করা ওয়াজিব হয়, একে দম বলা হয়।

৩. مَسْجِدُ خَيْفٍ : মিনার একটি মসজিদের নাম, যা মিনার উপর দিকে পাহাড়ের সাথে সংযুক্ত।

اَلنَّفْرُ خُرُوْجُ الْحَاجِّ مِنْ مِنًى لَا بَعْدَهُ فَاِنَّهُ اِنْ تَوَقَّفَ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَمْىُ الْجِمَارِ وَجَازَ الرَّمْىُ رَاكِبًا وَفِى الْاَوَّلَيْنِ مَاشِيًا اَحَبُّ لَا الْعَقَبَةَ اَلْاَوَّلَانِ مَا يَلِى مَسْجِدَ الْخَيْفِ ثُمَّ مَا يَلِيْهِ وَلَوْ قَدَّمَ ثِقْلَهُ اِلٰى مَكَّةَ وَاَقَامَ بِمِنًى لِلرَّمْىِ كُرِهَ وَاِذَا نَفَرَ اِلٰى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ طَافَ لِلصَّدْرِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ بِلَا رَمَلٍ وَسَعْىٍ وَهُوَ وَاجِبٌ اِلَّا عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَقَبَّلَ الْعَتَبَةَ وَ وَضَعَ صَدْرَهُ وَ وَجْهَهُ عَلَى الْمُلْتَزِمِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ .

অনুবাদ : নফর শব্দের অর্থ– হাজীদের মিনা হতে বের হওয়া। ফজর উদিত হওয়ার পর মিনা হতে প্রত্যাবর্তন জায়েজ নেই। কেননা, যদি সে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে, তবে তার উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর আরোহণ অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েজ, তবে প্রথম জামরায় পায়ে হেঁটে কঙ্কর নিক্ষেপ করা মোস্তাহাব; জামরায়ে আকাবার কঙ্কর নিক্ষেপ নয়। প্রথম দুই জামরার অর্থ ঐ সকল জামরাহ যা মসজিদে খায়ফের সংলগ্ন। অতঃপর যা তার সংলগ্ন। আর যদি মাল-আসবাব মক্কায় পাঠিয়ে দিয়ে শুধু কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য মিনায় রয়ে যায়, তা মাকরূহ হবে। মিনা হতে যখন মক্কায় পৌঁছে তখন وَادِىْ مُحَصَّبْ এ- অবতরণ করবে। তারপর রমল ও সায়ী ব্যতীত সাত চক্কর তাওয়াফে সদর করবে। এ তওয়াফ ওয়াজিব, তবে মক্কাবাসীদের জন্য নয়। অতঃপর জমজমের পানি পান করবে এবং কাবা শরীফের চৌকাঠ চুম্বন করবে এবং স্বীয় চেহারা ও বুক মুলতাযামে লাগাবে। আর মুলতাযাম হাজরে আসওয়াদ ও দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে বলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجَازَ الرَّمْىُ رَاكِبًا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ১৩ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপকালে মাটিতে অবস্থান না করলেও চলবে। সেদিন যেহেতু মিনা ত্যাগ করার সময়, সেহেতু সবাই তাদের যানবাহনে আরোহণ করবে। এরূপ আরোহী অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপ জায়েজ হবে। তবে মসজিদে খায়ফের নিকটবর্তী জামরায় এবং তার সংলগ্নটিতে মাটিতে হেঁটে হেঁটে কঙ্কর নিক্ষেপ উত্তম হবে। তবে তৃতীয় জামরাহ যাকে জামরায়ে আকাবা বলা হয় তাতে আরোহী অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপ করাই ভালো। কারণ, এর পরে হাজী মিনা ত্যাগ করবে। তবে ইমাম ইবনে হুমাম (র.)-এর মতে, তিনটি জামরার প্রত্যেকটিতে মাটিতে দাঁড়িয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করা উত্তম।

قَوْلُهُ مَاشِيًا اَحَبُّ الخ : এখানে আরোহণ অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। যানবাহনে আরোহণ অবস্থায় প্রথম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা যদিও বৈধ, তথাপি জমিনে দাঁড়িয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করা মোস্তাহাব। কেননা, প্রথম ও দ্বিতীয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর কিছুক্ষণ বিলম্ব করা মোস্তাহাব, কিন্তু জামরায়ে আকাবার পরে নয়। কেননা, তখন রওয়ানা করবে। আর রওয়ানা করার সময় সওয়ারি অধিক সহায়ক। ফলে জামরায়ে আকাবার কঙ্কর মাটিতে দাঁড়িয়ে নিক্ষেপ করা মোস্তাহাব নয়। ইবনে হুমাম প্রত্যেক জামরায় মাটিতে দাঁড়িয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এজন্য যে, আরোহণ অবস্থায় মন মাল-আসবাবের সাথে লিপ্ত থাকে এবং তা বিনয়ের বিরোধী ও প্রভাবশালীদের আচরণ। এজন্য হযরত ওমর (রা.) বলেন, যারা মাল-আসবাব নিজেদের পূর্বে মক্কায় পাঠিয়ে দেয় তাদের হজ হবে না। তা ইবনে আবী শাইবা হতে বর্ণনা করেন।

জামরার সংখ্যা ও জামরাহ সম্পর্কীয় আমল : جَمَرَاتٌ মোট ৩টি– ১. جَمْرَةٌ اُوْلٰى বা প্রথম জামরাহ। একে جَمْرَةٌ صُغْرٰى -ও বলা হয়। ২. جَمْرَةٌ ثَانِيَةٌ বা দ্বিতীয় জামরাহ। একে جَمْرَةٌ وُسْطٰى বলা হয়। ৩. جَمْرَةٌ ثَالِثَةٌ বা তৃতীয় জামরাহ। একে جَمْرَةٌ كُبْرٰى বা جَمْرَةٌ عَقَبَةٌ -ও বলা হয়। জিলহজের ১০ তারিখ শুধু جَمْرَةٌ عَقَبَةٌ-তে ৭ টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

১১ ও ১২ তারিখে তিনটি جَمْرَة-এর প্রত্যেকটিতে ৭ টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। এ কঙ্কর নিক্ষেপ শরিয়তের বিধান মতে শয়তানকে অপমান করার উদ্দেশ্যে করা হয়। যেমন দোয়ায় রয়েছে– رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ আর হাদীসে বর্ণিত আছে, শয়তান তখন جَمَرَاتْ-এর উভয় পার্শ্বের جَبَلْ ثَبِيْر ও جَبَل ضَبّ-এর উপর গিয়ে অপমান ও ভর্ৎসনায় আর্তনাদ ও অনুতাপ করতে থাকে।

قَوْلُهُ وَاَقَامَ بِمِنًى لِلرَّمْيِ كُرِهَ الخ : মিনাতে কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ শেষ হলে হজের আর কোনো দায়িত্ব থাকে না। তখন বহিরাগত হাজীগণ তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তওয়াফ করার জন্য মক্কায় ছুটে যান। অপর দিকে মক্কার অধিবাসীরাও তল্পি-তল্পাসহ মক্কাভিমুখি হন। এ দিন সকলের মাঝেই একটু ব্যস্ততা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ শেষ তারিখের কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই তাদের মালামাল মক্কায় প্রেরণ করে দেয় এবং নিজে মিনায় থেকে যায়।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এরূপ করা মাকরূহ বা নিন্দনীয়। কেননা, হযরত ওমর (রা.) বলেন, 'যারা নিজেদের পূর্বে মাল-সামান মক্কায় পাঠিয়ে দেবে তাদের হজ যথার্থ হবে না।' ইবনে আবী শায়বা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

প্রকৃক কথা হলো, رَمْيُ الْجِمَارِ একটি ইবাদত, যাতে اِخْلَاصْ থাকা আবশ্যক। অথচ মালামাল মক্কায় এবং মালিক কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য যদি মিনায় থাকে, তাহলে স্বভাবতই তার মন-মানসিকতায় اِخْلَاصْ থাকবে না। কঙ্কর নিক্ষেপে আন্তরিকতার স্থলে দায়সারা ভাবই ফুটে উঠবে; যা নিন্দনীয় তথা মাকরূহ।

قَوْلُهُ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ الخ : এখানে মুহাস্‌সাবে অবতরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। مُحَصَّبْ শব্দটি تَحْصِيْبْ হতে اِسْمِ مَفْعُوْل-এর সীগাহ। এটা মিনা ও মক্কার মধ্যবর্তী গোরস্থান জান্নাতুল মুআল্লার নিকটবর্তী একটি মাঠের নাম, যাকে আবতাহও বলা হয়। এখানে অবতরণ করা সুন্নতে কেফায়া। মোল্লা আলী কারী (র.) এরূপই বর্ণনা করেছেন। সহীহ হাদীসের কিতাবে আছে যে, নবী করীম ﷺ জিলহজের তেরো তারিখে মিনা হতে রওয়ানা করে মুহাস্‌সাবে অবতরণ করে সেখানে তিনি জোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাজ পড়েন এবং সেখানে কিছুক্ষণ নিদ্রা যান, অতঃপর তিনি রাত্রে মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফে বিদা করেন।

قَوْلُهُ وَهُوَ وَاجِبٌ اِلَّا عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ الخ : এখানে তাওয়াফে বিদার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। তাওয়াফে সদরকে তাওয়াফে বিদাও বলা হয়। এটা বহিরাগত লোকদের উপর ওয়াজিব, কিন্তু মক্কাবাসীদের উপর ওয়াজিব নয়। কেননা, বহিরাগতগণ মক্কা ছেড়ে নিজ নিজ বাড়িতে যাবে, তাই তাদের উপর তাওয়াফে বিদা আবশ্যক। আর মক্কাবাসীগণ যেহেতু আশেপাশে থাকবে, তাই তাদের উপর বিদায়ী তওয়াফের প্রশ্ন উঠে না। নবী করীম ﷺ এরূপ ইরশাদ করেছেন।

قَوْلُهُ وَقَبَّلَ الْعَتَبَةَ الخ : এখানে তাওয়াফে সদরের পর করণীয় কাজের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ জমিন হতে ঊর্ধ্বে দরজার চৌকাঠে চুম্বন করবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তওয়াফের পর বায়তুল্লাহ শরীফের দরজার চৌকাঠ চুম্বন করবে। এরপর মুলতাযামে চেহারা এবং বুক লাগাবে এবং কাবা শরীফের গিলাফ ধরবে। যেমন– কোনো অতিবাধ্য ক্রীতদাস স্বীয় অতি মর্যাদাশীল মনিবের পায়ে পড়ে থাকে। কান্নাকাটি সহকারে প্রার্থনা করবে। রাসূল ﷺ -এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করবে এবং এসব বরকতপূর্ণ স্থানসমূহ ছেড়ে চলে যাওয়ার এবং বিচ্ছেদের জন্য কান্নাকাটি করবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দোয়া করবে, যেন তিনি তাকে এ পবিত্র স্থানসমূহ পুনরায় জেয়ারত করার তৌফিক দান করেন।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. مُحَصَّبْ : মিনা ও মক্কার মধ্যবর্তী জান্নাতুল মুআল্লার নিকটবর্তী একটি মাঠের নাম। মিনা হতে এসে এখানে অবতরণ করতে হয়।

২. طَوَافْ صَدَرْ : বিদায়ী তওয়াফকে তাওয়াফে সদর বলে।

৩. زَمْزَمْ : মসজিদে হারামে বায়তুল্লাহর নিকট প্রসিদ্ধ ঝরনা বিদ্যমান, যা এখন কূপের রূপ ধারণ করেছে। তা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে হযরত ইসমাঈল (আ.) এবং তাঁর মাতার জন্য প্রবাহিত করেছেন।

৪. اَلْعَتَبَةُ : এটা ভূমি হতে উপরে কাবা শরীফের দরজার চৌকাঠ। হাজীগণ তাতে চুম্বন করেন।

৫. مُلْتَزَمْ : হাজরে আসওয়াদ ও বায়তুল্লাহ শরীফের দরজার মধ্যবর্তী একটি প্রাচীর, যা জড়িয়ে ধরে দোয়া করা সুন্নত

وَتَشَبَّثَ بِالْأَسْتَارِ سَاعَةً وَ دَعَا مُجْتَهِدًا وَيَبْكِيْ وَيَرْجِعُ قَهْقَرٰى حَتّٰى يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَيَسْقُطُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ عَمَّنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ دُخُوْلِ مَكَّةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ اِذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِتَرْكِ السُّنَّةِ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ زَوَالِ يَوْمِهَا اِلٰى طُلُوْعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ اَوْ اِجْتَازَ نَائِمًا اَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ اَوْ اَهَلَّ عَنْهُ رَفِيْقُهُ بِهِ اَوْ جَهِلَ اَنَّهَا عَرَفَةُ صَحَّ وَمَنْ لَمْ يَقِفْ فِيْهَا فَاتَ حَجُّهُ فَطَافَ وَسَعٰى وَتَحَلَّلَ وَقَضٰى مِنْ قَابِلٍ هٰذَا لِمَنْ اَحْرَمَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْحَجَّ وَالْمَرْاَةُ كَالرَّجُلِ لٰكِنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا بَلْ وَجْهَهَا وَلَوْ اَسْدَلَتْ شَيْئًا عَلَيْهِ وَجَافَتْهُ عَنْهُ صَحَّ وَلَا تُلَبِّيْ جَهْرًا وَلَا تَسْعٰى بَيْنَ الْمَيْلَيْنِ وَلَاتَحْلِقُ بَلْ تَقْصُرُ وَتَلْبَسُ الْمَخِيْطَ وَلَا تَقْرَبُ الْحَجَرَ فِى الزِّحَامِ ـ

অনুবাদ : বায়তুল্লাহ শরীফের গিলাফ কিছুক্ষণ ধরে রাখবে এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে ক্রন্দন করতে করতে দোয়া করবে এবং পিছপা হয়ে সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে মসজিদে হারাম হতে বের হয়ে আসবে। যে ব্যক্তি মক্কায় প্রবেশ করার আগে আরাফার ময়দানে অবস্থান করেছে, তার জন্য তাওয়াফে কুদূম নেই। এ তাওয়াফে কুদূম না করার কারণে তার উপর কোনো প্রকারের দম ইত্যাদি কিছুই ওয়াজিব হবে না। কারণ, [তাওয়াফে কুদূম সুন্নত আর] সুন্নত ছেড়ে দিলে কিছুই ওয়াজিব হয় না। যে ব্যক্তি আরাফার দিন দুপুরের পর হতে কুরবানির দিন সুবহে সাদেক উদয় হওয়া পর্যন্ত আরাফার ময়দানে মাত্র কিছুক্ষণ ছিল বা ঘুমন্ত অবস্থায় [সওয়ারিতে করে] আরাফার ময়দানের উপর দিয়ে চলে গেল বা তখন সে অজ্ঞান ছিল বা তার পক্ষ হতে তার সঙ্গী ইহরাম বেঁধেছে, কিংবা সে জানেনি যে তা আরাফাহ, তবে তার হজ দুরস্ত হবে। যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করেনি তার হজ হয়নি। সুতরাং সে তওয়াফ এবং সায়ী করে হালাল হয়ে যাবে এবং আগামী বৎসর কাজা করবে। তা সে ব্যক্তির জন্য যে ইহরাম বেঁধে হজ পায়নি। হজের বেলায় নারী-পুরুষ সমান। অবশ্য নারী মাথা খোলা রাখবে না ; বরং চেহারা খোলা রাখবে। তবে কোনো পর্দা যদি চেহারার সাথে না লাগিয়ে পৃথক ঝুলিয়ে নেয়, তবে সিদ্ধ হবে। নারী উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে না, [সায়ী করার সময়] মীলাইন আখযারাইনে দৌড়াবে না, [ইহরাম খুলবার সময়] মাথা মুণ্ডাবে না ; বরং চুল [কিছু পরিমাণ] খাটো করবে এবং সেলাই করা কাপড় ব্যবহার করবে। ভিড়ের মধ্যে হাজরে আসওয়াদের নিকটে যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَ دَعَا مُجْتَهِدًا الخ : আলোচ্য ইবারতে مُجْتَهِد শব্দটি اِسْمُ فَاعِلٍ-এর সীগাহ। এটি اِجْتِهَادٌ মাসদার থেকে এসেছে। ইজতিহাদ শব্দের অর্থ হলো– শ্রম ব্যয় করা, চেষ্টা-তদবির করা, চিন্তা-গবেষণা করা। দোয়ার ক্ষেত্রে اِجْتِهَادٌ অর্থ হলো– কাকুতিমিনতি করে নাছোড় হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনো কিছু চাওয়া। অতএব, এ দোয়া হবে গম্ভীর, আন্তরিক, দীর্ঘ ও অশ্রুসিক্ত।

قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ قَهْقَرٰى الخ : এখানে قَهْقَرٰى-এর অর্থ ও হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। قَهْقَرٰى তা উভয় ক্বাফে যবর এবং মাঝের هَاءٌ টি সাকিনবিশিষ্ট। এর অর্থ হলো– পিছপা হওয়া। অর্থাৎ কাবা ঘরের গিলাফ ধরে কাঁদতে কাঁদতে দোয়া করে

এমনভাবে সেখান হতে মসজিদে হারামের বাহিরে আসবে যে, বায়তুল্লাহ তার সম্মুখে থাকবে, কেবলার দিকে পিঠ করবে না, তাতে বেআদবি দেখায়। এ রকম করার পক্ষে কোনো সহীহ রেওয়ায়েত যদিও নেই, ওলামায়ে কেরাম বলেন, বায়তুল্লাহর সম্মান প্রদর্শনের জন্য এ পদ্ধতিই উত্তম।

قَوْلُهُ وَيَسْقُطُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ الخ : এখানে তাওয়াফে কুদূম রহিত হওয়ার অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তাওয়াফে কুদূম ছাড়াই প্রথমে আরাফায় অবস্থান করেছে মক্কায় প্রবেশই করেনি, তাহলে বলতে হবে যে, সে একটি সুন্নত কাজ ছেড়ে দিয়েছে। কারণ, তা প্রাথমিক কার্যাবলি হিসেবে সুন্নত ছিল। কিন্তু সে যখন আসল হজের কাজ আরম্ভ করেছে, তখন তা তার জন্য সুন্নত রইল না। আর সুন্নত ছেড়ে দিলে তার উপর দম ইত্যাদি কিছু ওয়াজিব হয় না।

قَوْلُهُ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ الخ : এখানে উকূফে আরাফার সময় ও হুকুমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সুন্নত হিসেবে আরাফায় অবস্থানের সময় হলো দুপুরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে সূর্যাস্ত হতে পরদিন সুবহে সাদেক উদয় হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করা জায়েজ। হাদীস শরীফে বর্ণিত, যে ব্যক্তি দশম তারিখে সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার পূর্বে মুযদালিফায় পৌঁছেছে, আর সে আরাফায় অবস্থান করেছে, তবে সে হজ পেয়েছে।

قَوْلُهُ اَوْ اِجْتَازَ نَائِمًا الخ : এখানে আরাফায় অবস্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ ঘুমন্ত অবস্থায় আরাফার মাঠ অতিক্রম করে, তারপর সে জাগ্রত হয়, অথবা বেহুঁশ অবস্থায় আরাফার মাঠ অতিক্রম করে এবং তার সাথি তার পক্ষ হতে ইহরাম বাঁধে, অথবা কোনো ঋণী ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করে বা হায়েজ বা নেফাস অবস্থায় অথবা পলায়ন করা অবস্থায় আরাফার মাঠ অতিক্রম করে, এ সকল অবস্থায় তার আরাফায় অবস্থান পালিত হবে। কেননা, আরাফায় অবস্থানের জন্য নিয়ত শর্ত নয়। কারণ, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নিয়তের প্রশ্ন উঠে না। (كَذَا فِى الْبِنَايَةِ)

قَوْلُهُ اَوْ اَهَلَّ عَنْهُ رَفِيْقُهُ الخ : এখানে সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির ইহরামের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির পক্ষ হতে তার অনুমতিতে তার কোনো সাথি ইহরাম বাঁধবে। আর যদি সংজ্ঞহীন ব্যক্তি অন্যকে অনুমতি না দেওয়া সত্ত্বেও কেউ তার পক্ষ হতে ইহরাম বাঁধে, তবুও ইমাম সাহেবের মতে জায়েজ হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে যেহেতু সে নিজেও ইহরাম বাঁধেনি এবং না অন্য কাউকেও অনুমতি দিয়েছে, এমতাবস্থায় তার পক্ষ হতে কেউ ইহরাম বাঁধলেও ইহরাম অবস্থায় আরাফায় তার অবস্থান গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তার সাথি যখন তার সাথে সম্পর্ক করেছে, তখন যে কাজে সক্ষম নয় সে কাজে সে তার সাথীকে অনুমতি প্রদান করেছে বলে মনে করতে হবে। তবে তার সাথি ব্যতীত অন্য কেউ তার পক্ষ হতে এরূপ ইহরাম বাঁধলে তা বৈধ হবে না। (كَذَا فِى الْهِدَايَةِ وَالْبِنَايَةِ)

قَوْلُهُ فَاتَ حَجُّهُ الخ : এখানে আরাফায় অবস্থান না করার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থার করেনি তার হজ বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তাকে পরের বৎসর এ হজের কাজা করতে হবে। তার বাতিল হজ ফরজ হোক বা মানতের হোক, কিংবা নফল হোক, তাকে কাজা করতে হবে। তবে যেহেতু হজ বাতিল হয়েছে তাই তাকে কমপক্ষে উমরা করতে হবে। অতএব, তওয়াফ ও সায়ী করে চুল কাটিয়ে বা মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম ভঙ্গ করে নেবে।

قَوْلُهُ "صَحَّ" : উদ্ধৃত لَفْظ فِعْل টি একটি শর্তযুক্ত প্রশ্নের জবাব, আর তা হলো আরাফায় অবস্থান প্রসঙ্গে। মুসান্নিফ (র.) বলেন–

১. কোনো মুহরিম যদি ৯ জিলহজের দুপুর থেকে ১০ জিলহজ ভোরবেলা নাগাদ সময়ের মাঝে যে-কোনো সময় অন্তত এক মুহূর্ত অবস্থান করে,
২. কিংবা, কেউ তার বাহনের উপর ঘুমন্ত অবস্থায় আরাফাহ অতিক্রম করে,
৩. অথবা, অজ্ঞান অবস্থায় যদি কোনো হাজীকে আরাফাহ অতিক্রম করানো হয়,
৪. অথবা, কেউ যদি আরাফায় অবস্থানের পূর্ব মুহূর্তে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার সহযাত্রী কোনো বন্ধু তার পক্ষ থেকে ইহরাম বেঁধে তালবিয়াহ পাঠ করে।

৫. কিংবা, কোনো হাজী আরাফায় অবস্থান করেছে, কিন্তু সে জানে না যে, এটাই আরাফার ময়দান, এরূপ ক্ষেত্রে বর্ণিত পাঁচ ব্যক্তির হজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। মুসান্নিফ (র.) صَحَّ [বিশুদ্ধ হবে] বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ وَقَضَى مِنْ قَابِلٍ : কোনো ব্যক্তি হজের নিয়তে ইহরাম বাঁধল, কিন্তু ৯ তারিখের দুপুর থেকে ১০ তারিখ ভোর পর্যন্ত সময়ের মাঝে এক মুহূর্তের জন্য কোনোভাবেই সে আরাফায় অবস্থান করতে পারল না, তার হজ ছুটে গেল। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন– اَلْحَجُّ عَرَفَةُ 'আরাফায় অবস্থানই হজ'। সুতরাং এ ব্যক্তিকে পরবর্তী কোনো এক বছর তা 'কাজা' করতে হবে।

قَوْلُهُ "هٰذَا لِمَنْ اَحْرَمَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْحَجَّ" : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যার হজ ছুটে গেছে সে তওয়াফ ও সায়ী শেষ করে চুল কেটে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছর হজ কাজা করবে। তিনি বলেন, এ নিয়মনীতি ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি হজের জন্য ইহরাম বেঁধেছে, কিন্তু হজ পায়নি। এখানে وَلَمْ يُدْرِكِ الْحَجَّ বলা হয়েছে। মূলত এর মর্ম হচ্ছে وَلَمْ يُدْرِكِ الْعَرَفَةَ অর্থাৎ "যথাসময়ে আরাফায় উকূফ করতে পারেনি।" মহানবী ﷺ বলেন, اَلْحَجُّ عَرَفَةُ "হজ হচ্ছে আরাফায় অবস্থান"। তাই মুসান্নিফ (র.) عَرَفَةُ শব্দ ব্যবহার না করে حَجّ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهُ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে বলতে চান যে, ইতোমধ্যে হজ পালনকারীর জন্য যে পদ্ধতি ও নিয়মনীতি বর্ণিত হয়েছে, সে সকল পদ্ধতি ও নিয়মনীতি পালনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ অভিন্ন দায়িত্ব পালন করবে, কোনো পার্থক্য করবে না। তবে কয়েকটি কাজে কিছুটা পার্থক্য হবে, আর তা হলো–

১. নারী মাথা ঢেকে রাখতে পারবে, তবে মুখ খোলা থাকবে।

২. উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে না।

৩. সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করবে না।

৪. সেলাই কারা কাপড় পরবে।

৫. ভিড় ঠেলে হাজরে আসওয়াদ 'ইলতিমাস' করতে যাবে না। এ কতিপয় ব্যবধান ছাড়া হজ পালনে নারী ও পুরুষের মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই।

قَوْلُهُ وَجْهَهَا الخ : এখানে ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের কর্তব্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মহিলা ইহরাম অবস্থায় তার মাথা খুলবে না; বরং চেহারা খুলবে। কেননা, তার মাথা সতরের অন্তর্ভুক্ত চেহারা নয়। তা ঐ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, পুরুষের ইহরাম মাথায়, আর মহিলার ইহরাম হলো তার চেহারায়। –[বায়হাকী]

قَوْلُهُ وَلَا تَقْرَبُ الْحَجَرَ الخ : এখানে মহিলার জন্য বিশেষ হুকুমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। হাজরে আসওয়াদের নিকট যখন অধিক ভিড় থাকে তখন মহিলাগণ হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে না এবং তাকে স্পর্শও করবে না। কেননা, মহিলাগণ পুরুষের স্পর্শে আসা ঠিক নয়। সুতরাং তারা যথাসম্ভব আলাদা থেকে তওয়াফ করবে এবং হাজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে ইশারা করবে। তা-ই মহিলাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

وَحَيْضُهَا لَا يَمْنَعُ نُسُكًا اِلَّا الطَّوَافَ فَاِنَّهُ فِى الْمَسْجِدِ وَلَا يَجُوْزُ لِلْحَائِضِ دُخُوْلُهُ وَهُوَ بَعْدَ رُكْنَيْهِ يُسْقِطُ طَوَافَ الصَّدْرِ اَىْ اَلْحَيْضُ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ يُسْقِطُ طَوَافَ الْوَدَاعِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاِحْرَامَ قَدْ يَكُوْنُ بِسَوْقِ الْهَدْيِ فَاَرَادَ اَنْ يُبَيِّنَهُ فَقَالَ مَنْ قَلَّدَ بَدَنَةَ نَفْلٍ اَوْ نَذْرٍ اَوْ جَزَاءِ صَيْدٍ اَوْ نَحْوِهِ كَالدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ فِى السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ يُرِيْدُ الْحَجَّ اَوْ بَعَثَ بِهَا لِمُتْعَةٍ اَىْ بَعَثَ بِالْبَدَنَةِ لِلتَّمَتُّعِ .

অনুবাদ : মহিলাদের হায়েজ হজের আহকাম পালনে বাধা দেয় না, তবে তওয়াফ করাকে বাধা দেয়। কেননা, তওয়াফ মসজিদে হয়। আর হায়েজসম্পন্ন মহিলাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর হজের দুই রোকনের পর হায়েজ তাওয়াফে সদরকে রহিত করে দেয়। অর্থাৎ আরাফায় অবস্থান ও তাওয়াফে যিয়ারতের পর হায়েজ তাওয়াফে বিদাকে রহিত করে দেয়। জেনে রেখ যে, ইহরাম কখনো হাদী প্রেরণ করার দ্বারা হয়। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) এখানে হাদী প্রেরণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, যে ব্যক্তি নফল কুরবানির জন্তুর গলায় অথবা মানতের কুরবানির জন্তুর গলায় অথবা শিকারের কাফ্ফারার জন্তু ইত্যাদির গলায় হার পরাল, যেমন– গত বৎসরের কোনো অপরাধের দরুন ওয়াজিব হওয়া দমের গলায় হার পরাল। হার পরানোর সময় হজের নিয়ত করল কিংবা তামাত্তু'র উদ্দেশ্যে জানোয়ার প্রেরণ করল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَحَيْضُهَا لَا يَمْنَعُ نُسُكًا الخ : এখানে ইহরামের অবস্থায় হায়েজের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মহিলার ঋতুস্রাব হজের অনুষ্ঠানাদি পালনে কোনো বাধা প্রদান করবে না, কেবল তওয়াফ করা তার জন্য নিষিদ্ধ। কেননা, মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, বিদায় হজের সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঋতুস্রাব হয়, তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, তওয়াফ ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠানাদি সেভাবে আদায় কর যেমন অন্যান্য হাজীগণ করছেন। তওয়াফ এজন্য করতে পারবে না যে, তা মসজিদে হারামে করা হয়, অথচ ঋতুমতীকে মসজিদে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া যায় না।

قَوْلُهُ يُسْقِطُ طَوَافَ الخ : এখানে ঋতুস্রাব যে তাওয়াফে সদরকে রহিত করে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আর ঋতুস্রাব যদি দুটি প্রধান অনুষ্ঠান তথা আরাফায় অবস্থান এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পর দেখা দেয়, তবে তার আর তাওয়াফে সদর করতে হয় না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হজের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক স্ত্রীর ঋতুস্রাব হতে লাগল; রাসূলুল্লাহ ﷺ ধারণা করেছিলেন যে, তিনি সম্ভবত প্রথমে তওয়াফ করেননি, তাই তিনি বললেন যে, সম্ভবত আমাদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখন বলা হলো যে, তিনি পূর্বেই আমাদের সাথে তওয়াফ করেছেন; তখন বললেন, তবে কোনো অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ مَنْ قَلَّدَ بَدَنَةَ نَفْلٍ الخ : এখানে মুহরিম হওয়ার একটি নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। বুদনা বলতে উট এবং গরুকে বুঝায়, আর হাদী বলতে এগুলোর সাথে ছাগল অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে উদ্দেশ্যে এই যে, একে হেরেম শরীফে জবাই করার নিয়ত করবে। মোদ্দাকথা, যে ব্যক্তি নফল নিয়তে বা মানতের উদ্দেশ্যে কিংবা শিকারের কাফ্ফারা হিসেবে উট এবং

গরুর গলায় মালা পরিয়ে হজের ইচ্ছা করে কিংবা তামাত্তু'র নিয়তে পশু পাঠায় এবং সঙ্গে নিজেও যাত্রা করে, তবে সে ব্যক্তি মুহরিম হয়ে যাবে। কুরবানির পশুগুলো হচ্ছে–

১. নফল কুরবানির জন্য নির্বাচিত পশু।

২. মানতের কুরবানির জন্য নির্বাচিত পশু।

৩. মুহরিম অবস্থায় শিকার করার কারণে জরিমানা স্বরূপ দেয় পশু।

৪. অপরাধের কারণে বিগত বছরের আবশ্যকীয় কুরবানির পশু।

৫. কিংবা তামাত্তু' হজের জন্য প্রেরিত পশু ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, ইহরামের নিয়তে এসব পশুর কোনো একটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে বায়তুল্লাহর দিকে যেতে হবে। নতুবা শুধু পশু পাঠালে মুহরিম হবে না। তবে তামাত্তু'কারী সাথে না গেলেও চলবে। –[হেদায়া]

"قَوْلُهُ "بَدَنَةً : মুসান্নিফ (র.) কখনো هَدِى কখনো بَدَنَة বলে কুরবানির পশু বুঝিয়েছেন। উল্লেখ্য, هَدِى এবং بَدَنَة -এর মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন– "هَدِى" বললে কুরবানি দেওয়া যায় এমন সকল পশুকে বুঝায়। যেমন– উট, দুম্বা, গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি। কিন্তু بَدَنَة বলতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, শুধু উট এবং গরু বুঝায়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, بَدَنَة বলতে শুধু উট বুঝায়।

"قَوْلُهُ "قَلَّدَ : মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি مَنْ قَلَّدَ -এর মাঝে قَلَّدَ শব্দটি تَقْلِيْد মাসদার থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ– অনুগামী করা, চিহ্নিত করা। তাই মাযহাবের অনুসারীদের মুকাল্লিদ (مُقَلِّدْ) বলা হয়। কুরবানির পশুকে تَقْلِيْد করার অর্থ হলো, পশুর গলায় ছেঁড়া চামড়ার মালা ঝুলিয়ে দেওয়া যা দেখলেই ঐ পশুটাকে কুরবানির পশু হিসেবে ধরে নেবে। তবে চামড়া ছাড়া অন্য কিছু দিয়েও তাকলীদ করা যায়।

وَتَوَجَّهَ مَعَهَا بِنِيَّةِ الْاِحْرَامِ فَقَدْ اَحْرَمَ اَلْمُرَادُ بِالتَّقْلِيْدِ اَنْ يَرْبِطَ قَلَادَةً عَلٰى عُنُقِ الْبَدَنَةِ فَيَصِيْرُ بِهٖ مُحْرِمًا كَمَا بِالتَّلْبِيَةِ وَلَوْ اَشْعَرَهَا اَىْ شَقَّ سَنَامَهَا لِيُعْلَمَ اَنَّهَا هَدْىٌ اَوْ جَلَّلَهَا اَىْ اَلْقَى الْجُلَّ عَلٰى ظَهْرِهَا اَوْ قَلَّدَ شَاةً لَا وَكَذَا لَوْ بَعَثَ بَدَنَةً وَتَوَجَّهَ حَتّٰى يَلْحَقَهَا اَىْ اِنْ لَمْ يَتَوَجَّهْ مَعَ الْبَدَنَةِ وَلَمْ يَسُقْهَا بَلْ بَعَثَهَا لَا يَصِيْرُ مُحْرِمًا حَتّٰى يَلْحَقَهَا فَاِذَا لَحِقَهَا يَصِيْرُ مُحْرِمًا وَالْبُدْنُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ هٰذَا عِنْدَنَا وَاَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) فَالْبَدَنَةُ مِنَ الْاِبِلِ فَقَطْ ـ

অনুবাদ : আর ইহরামের নিয়তে তার সাথে রওয়ানা দিল, তবে সে মুহরিম হয়ে গেল। তাকলীদ অর্থ– জন্তুর গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া। এভাবে মালা পরিয়ে দিলেও ইহরাম হয়ে যায়, যেমন তালবিয়া দ্বারা হয়। আর যদি বুদনার ইশ'আর করে অর্থাৎ কুরবানির জন্তুর উটের পিঠে এমন চিহ্ন দেয়, যাতে বুঝা যায় যে, তা হাদী বা কুরবানির জন্তু কিংবা [কুরবানির জন্তু হিসেবে] চিহ্নস্বরূপ তার পিঠের উপর ছালা বিছিয়ে নেয় বা ঝুলিয়ে দেয় অথবা ছাগলের গলায় মালা পরিয়ে দেয়, তবে সে মুহরিম হবে না। অনুরূপভাবে জন্তু পাঠিয়ে দিয়ে নিজে পরে রওয়ানা হয়ে জন্তুর সাথে গিয়ে মিলিত হলেও সে মুহরিম হবে না। অর্থাৎ বুদনা প্রেরণ করার সময় নিজে এর সাথে রওয়ানা হয়নি এবং নিজে জন্তু তাড়িয়ে নেয়নি; বরং অপর কারো মারফত তা পাঠিয়েছে, তবে নিজে যতক্ষণ না দ্রুত বেগে চলে তার সাথে মিলিত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুহরিম হবে না ; মিলিত হলে অবশ্য মুহরিম হবে। আর বুদনা উট এবং গরু দ্বারা দুরস্ত হয়। তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ; কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বুদনা শুধু উট দ্বারাই হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَتَوَجَّهَ مَعَهَا بِنِيَّةِ الْاِحْرَامِ : এখানে তামাত্তু', মানত ও নফল বুদনার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। তামাত্তু', মানত ও নফল বুদনার মধ্যে পার্থক্য এই যে, তামাত্তু'র বুদনা হজের আহকামের মতো প্রথম হতেই আবশ্যক করে দেওয়া হয়েছে। একই সফরে আল্লাহ তা'আলা দুটি ইবাদতের তৌফিক দান করেছেন বিধায় এর শোকরিয়া স্বরূপ কুরবানির গুরুত্ব অত্যধিক। এ ক্ষেত্রে বুদনার সাথে না গেলেও ইহরামের নিয়তের সাথে বুদনার নিয়ত অন্তর্ভুক্ত থাকলেই ইহরাম যথেষ্ট হবে। মানত ও নফল বুদনার ব্যাপারে এরূপ নয়। এতে বুদনা প্রেরণ করে নিজে তার সাথে না গেলে মুহরিম হবে না। অবশ্য স্বয়ং বুদনার সাথে মিলিত হলে তখন মুহরিম হবে। ইহরামের জন্য আবশ্যকীয় নিয়ত এবং কাজে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। (كَذَا فِى الْهِدَايَةِ)

قَوْلُهٗ اَلْمُرَادُ بِالتَّقْلِيْدِ الخ : বুদনার গলায় হার পরানোর নিয়ম এই যে, পশম অথবা চুলের রশি পাকিয়ে তাতে জুতা, চামড়া এবং গাছের ছাল ইত্যাদি বেঁধে বুদনার গলায় পরিয়ে দেওয়া, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তা হাদীর জানোয়ার। সুতরাং কেউ যেন একে বিরক্ত না করে, আর জবাই করার পর ধনী ব্যক্তিগণ এর গোশ্‌ত খাওয়া হতে বিরত থাকবে।

قَوْلُهٗ "لَا" : মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি "لا" তার পূর্ববর্তী জুমলায়ে শর্তিয়ার জাযা হয়েছে। মূল বক্তব্য হবে এরূপ– কেউ যদি বুদনার গলায় তাকলীদ না করে তার কুঁজ চিরে রক্ত বের করে দেয়, কিংবা তার পিঠে ছালা বিছিয়ে দেয়, যাতে এ কথা বুঝা যায় যে, এগুলো কুরবানির উট, তাহলে সে মুহরিম হবে না। কারণ, এরূপ চিহ্নিতকরণ শরিয়তসম্মত নয়।

এমনিভাবে কেউ যদি উটকে তাকলীদ না করে কোনো ছাগলকে তাকলীদ করে সেও মুহরিম হবে না। কারণ, ছাগল بَدَنَة -এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

"قَوْلُهُ "وَلَوْ اَشْعَرَهَا : প্রকাশ থাকে যে, ইসলাম-পূর্বকালে আরবরা উটের কুঁজ বর্শা বা তরবারির আঘাতে চিরে রক্তাক্ত করে ছেড়ে দিত। এরূপ উট দেখলেই লোকেরা বুঝতে পারত যে, এটা কুরবানির উট। ইসলামের প্রথম দিকেও তা প্রচলিত ছিল। আরবিতে এরূপ কাজকে اِشْعَارْ [ইশ'আর] বলে। নবী ﷺ নিজেও বিদায় হজের সময় এরূপ ইশ'আর করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এ কাজ অনেকটা নিষ্ঠুর বিধায় এরূপ আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূল ﷺ তাকলীদের অনুমোদন প্রদান করেন। তাই اِشْعَارْ করা অপেক্ষা তাকলীদ করাই উত্তম।

"قَوْلُهُ "هٰذَا عِنْدَنَا : ব্যাখ্যাকার ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (র.) عِنْدَنَا বলে عِنْدَ الْاَحْنَافِ উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ, তিনি স্বয়ং হানাফী ছিলেন এবং 'বিকায়া' প্রণেতা ও তাঁর দাদা হানাফী মাযহাবের নীতির ভিত্তিতে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাই তিনি عِنْدَ الْاَحْنَافِ না বলে عِنْدَنَا বলেছেন। তিনি বলেন, হানাফী মাযহাবে বুদনা (بَدَنَة) বলতে উট এবং গরুকে বুঝায়। যদিও শাফেয়ী মাযহাবে بَدَنَة বলতে শুধু উটকে মনে করা হয়।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. اِشْعَارْ : জানোয়ারটি কুরবানির জন্য নির্ধারিত হওয়া বুঝানোর উদ্দেশ্যে এর ঝুঁটি বাম দিক হতে ছিঁড়ে দেওয়াকে اِشْعَارْ বলা হয়।

২. اَلْبَدَنَةُ : কুরবানির জানোয়ার। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, উট এবং গরু উভয়টিই اَلْبَدَنَةُ -এর অন্তর্ভুক্ত। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, শুধু উটকেই اَلْبَدَنَةُ বলে; গরু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

بَابُ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ

اَلْقِرَانُ اَفْضَلُ مُطْلَقًا اَىْ اَفْضَلُ مِنَ التَّمَتُّعِ وَالْاِفْرَادِ وَهُوَ اَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مِنَ الْمِيْقَاتِ مَعًا اَلْاِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَيَقُوْلُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ اَىْ بَعْدَ الشَّفْعِ الَّذِىْ يُصَلِّىْ مُرِيْدًا لِلْاِحْرَامِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ وَطَافَ لِلْعُمْرَةِ سَبْعَةً يَرْمُلُ فِى الثَّلٰثَةِ الْاَوَّلِ وَيَسْعٰى بِلَا حَلْقٍ ثُمَّ يَحُجُّ كَمَا مَرَّ فَاِنْ اَتٰى بِطَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ لَهُمَا كُرِهَ ـ

পরিচ্ছেদ : হজ্জে কিরান ও তামাত্তু‘

অনুবাদ : সাধারণত হজ্জে কিরান উত্তম অর্থাৎ হজ্জে তামাত্তু‘ এবং হজ্জে ইফরাদ হতে উত্তম। আর হজ্জে কিরান হচ্ছে– মীকাত হতে হজ এবং উমরার নিয়তে উভয়ের জন্য একসাথে ইহরাম বাঁধা। اِهْلَالْ হলো উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করা। [এর নিয়ম হলো,] নামাজের পরে বলবে তথা সে ইহরামের উদ্দেশ্যে দুই রাকাত নামাজ আদায় করার পর এ দোয়া পাঠ করবে– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ [অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি হজ এবং উমরার নিয়ত করেছি, আপনি আমার জন্য উভয়কে সহজ করে দিন এবং উভয়টিকে আমার পক্ষ হতে কবুল করুন]। আর উমরার জন্য সাত চক্কর তওয়াফ করবে। প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। হলক করা ব্যতীত সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করবে। তারপর বর্ণিত নিয়মে হজ করবে। অতঃপর যদি উভয়ের জন্য একত্রে দুই তওয়াফ এবং দুই সায়ী করে, তবে তা মাকরূহ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ : এ পরিচ্ছেদে কিরান ও তামাত্তু‘ হজের আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। হজ তিন প্রকার। যথা– ১. ইফরাদ, ২. কিরান ও ৩. হজ্জে তামাত্তু‘। ইতঃপূর্বে ইফরাদ হজের বর্ণনা আলোচিত হয়েছে। এখন অবশিষ্ট দুটি তথা কিরান ও তামাত্তু‘ হজের আলোচনা করা হচ্ছে।

اَلتَّمَتُّعُ-এর পরিচয় : تَمَتُّعْ শব্দটি বাবে تَفَعُّلْ-এর মাসদার। এটা مَتْعٌ থেকে নিঃসৃত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– উপকার লাভ করা বা ফায়দা হাসিল করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

শরিয়তের পরিভাষায়– هُوَ اَنْ يَنْوِىَ الْعُمْرَةَ اَوَّلًا ثُمَّ يَنْوِىَ لِلْحَجِّ فِىْ يَوْمِ التَّلْبِيَةِ بَعْدَ تَحْلِيْلٍ عَنِ الْعُمْرَةِ

অর্থাৎ "প্রথমত উমরার নিয়ত করে উমরার কাজগুলো সম্পাদন করে يَوْمُ التَّلْبِيَةِ-এর মাঝেই আবার হজ আদায়ের নিয়তে ইহরাম বাঁধা। এভাবে উমরার পর ভিন্ন ইহরামের হজ করাকে তামাত্তু‘ বলে।"

ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন– هُوَ اَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيْقَاتِ لِلْعُمْرَةِ اَوَّلًا ثُمَّ اَنْ يُحِلَّ ثُمَّ اَنْ يُحْرِمَ لِلْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

অর্থাৎ "মীকাত হতে প্রথমে উমরার নিয়ত করে উমরার কাজ সমাপ্ত করা। অতঃপর হালাল হয়ে যাওয়া এবং জিলহজের ৮ম তারিখ হজের ইহরাম বেঁধে হজের কাজ করাকে হজ্জে তামাত্তু‘ বলে।" একে এজন্য تَمَتُّعْ বলে যেহেতু হাজী হজ ও উমরার মধ্যবর্তী সময়ে مَمْنُوْعَاتْ গুলো উপভোগ করতে পারেন। এরূপ হজের ইহরাম বাঁধার সময় বলতে হবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ ـ

উমরা শেষ করে পনুরায় ইহরাম বাঁধার সময় বলতে হবে– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

اَلْقِرَانُ -এর পরিচয় : قِرَانٌ শব্দটি قِتَالٌ -এর ওযনে مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ– اَلْجَمْعُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ অর্থাৎ "একটা বস্তুর সাথে অন্য একটা বস্তু মিলিত ও একত্রিত করা, মিলিত হওয়া ও সাথি হওয়া।"

শরিয়তের পরিভাষায়– اَلْقِرَانُ اَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مِنَ الْمِيْقَاتِ مَعًا

অর্থাৎ, "হজ ও উমরা একই ইহরামে সম্পাদন করাকে কিরান বলে।"

কেউ কেউ বলেন, মীকাত হতে হজ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধে মাঝখানে হালাল হওয়া ব্যতীত উভয়ের কাজ সমাধা করাকে حَجِّ قِرَانٌ বলে। যে এ পদ্ধতিতে হজ আদায় করবে, তাকে قَارِنٌ বলা হয়। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে ইহরাম বাঁধতে হবে– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ

উল্লেখ্য, হজ্জে কিরান এবং তামাত্তু' উভয়ের কাজ প্রায় এক জাতীয় বিধায় উভয়কে একই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে সাধারণ যে পার্থক্য রয়েছে নিম্নে তার বিবরণ তুলে ধরা হলো, হজ এবং উমরা উভয়ের জন্য মীকাত হতে একসাথে ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করত প্রথমে উমরা করবে, তারপর ইহরাম না ভেঙ্গে উক্ত ইহরামের দ্বারা হজ করবে, একে হজ্জে কিরান বলে। আর হজ ও ওমরা উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক ইহরাম বেঁধে উভয়কে পালন করলে তাকে হজ্জে তামাত্তু' বলে।

❖ **উত্তম হজ কোনটি?** হজের প্রকারসমূহের মধ্যে উত্তমতার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হজ্জে কিরান উত্তম। আর এ মতপার্থক্যের মূলভিত্তি হচ্ছে মহানবী ﷺ -এর হজের ব্যাপারে মতান্তর। কেননা, মহানবী ﷺ -এর বিদায় হজ কি কিরান ছিল না তামাত্তু' না ইফরাদ এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ রয়েছে। এটা প্রকাশ্য যে, তিনি সর্বোত্তম হজ করেছেন। এ মর্মে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, নবী করীম ﷺ কিরান হজ পালন করেছেন। সহীহাইন ও সুনানে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। যেমন زَادُ الْمَعَادِ কিতাবে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ اَلْقِرَانُ اَفْضَلُ الخ : কোন প্রকারের হজ উত্তম, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে হজ্জে ইফরাদ সর্বোত্তম, তারপর হজ্জে তামাত্তু', তারপর হজ্জে কিরান। তাঁদের দলিল হলো–

١. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ.

٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ وَاَفْرَدَ اَبُوْ بَكْرٍ الخ

২. ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে হজ্জে তামাত্তু' সর্বোত্তম, অতঃপর হজ্জে ইফরাদ, অতঃপর হজ্জে কিরান। তাঁর দলিল হলো–

١. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ.

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ.

٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ.

৩. ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবাইন ও সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে হজ্জে কিরান সর্বোত্তম, অতঃপর হজ্জে তামাত্তু', অতঃপর হজ্জে ইফরাদ। তাঁদের দলিল নিম্নরূপ–

١. عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَفِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ ثُمَّ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

٢. عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كُنْتُ اٰخُذُ زِمَامَ نَاقَةِ النَّبِىِّ ﷺ سَمِعْتُ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

٣. عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ اَهَلَّ النَّبِىُّ ﷺ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ.

٤. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَرَنَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর পেশকৃত দলিলের উত্তর : আহনাফ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর পেশকৃত দলিলসমূহের নিম্নবর্ণিত উত্তর দিয়েছেন–

১. হাফেজ ইবনুল কাইয়িম (র.) বলেন, أَفْرَدَ بِالْحَجِّ দ্বারা উদ্দেশ্য أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مُسْتَقِلًّا মূলত তিনি قَارِنٌ ছিলেন।

২. অথবা, أَفْرَدَ بِالْحَجِّ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হজ ফরজ হওয়ার পর মহানবী ﷺ একবার হজ করেছেন।

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, أَفْرَدَ بِالْحَجِّ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাসূল ﷺ عُمْرَةٌ ও حَجّ-এর মাঝে حَلَالٌ না হয়ে একই إِحْرَامٌ-এ হজ আদায় করেছেন। সুতরাং হজ্জে ইফরাদ সর্বোত্তম এ কথা সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম আহমদ (র.) উপস্থাপিত দলিলসমূহের উত্তর :

১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, تَمَتُّعٌ দ্বারা تَمَتُّعٌ لُغَوِيٌّ উদ্দেশ্য যার অর্থ হলো, রাসূল ﷺ একই সফরে حَجّ এবং عُمْرَةٌ করে نَفْع অর্জন করেছেন।

২. অথবা বলা যায় যে, رَاوِيٌّ রাসূল ﷺ-কে لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ বলতে শুনে ধারণা করেছেন যে, তিনি مُتَمَتِّعٌ ছিলেন। অথচ এটা قِرَانٌ-এরও تَلْبِيَة ।

৩. যাঁরা تَمَتُّعٌ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরাই قِرَانٌ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাই তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহে تَمَتُّعٌ দ্বারা কিরানই উদ্দেশ্য।

অতএব, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর উপস্থাপিত দলিলসমূহ দ্বারা হজ্জে তামাত্তু' সর্বোত্তম বলে প্রমাণিত হয় না।

قَوْلُهُ وَهُوَ اَنْ يُهِلَّ الخ হজ্জে কিরানের বর্ণনা : আভিধানিক দৃষ্টিতে দুটি বিষয় একত্রিকরণকে কিরান বলে। আর শরিয়তের পরিভাষায় মীকাত হতে একই সাথে হজ এবং উমরার ইহরাম বাঁধাকে কিরান বলে। এখানে মীকাতের উল্লেখ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিরান এবং তামাত্তু' হজকারী বহিরাগত হতে হবে। কেননা, মক্কাবাসীদের জন্য তামাত্তু' ও কিরান হজ নেই।

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ الخ : উল্লেখ্য যে, وَيَقُوْلُ স্বতন্ত্র বাক্য يُهِلَّ-এর উপর তার আতফ হবে না। কেননা, কিরান হজকারী উল্লিখিত উক্তি দ্বারা কিরানের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং কিরানের জন্য বর্ণিত শব্দে দোয়া করতে হবে। অনুরূপ ইফরাদ এবং তামাত্তু'র ব্যাপারেও নবী করীম ﷺ ও সাহাবীদের থেকে কোনো উক্তি বর্ণিত নেই; বরং অন্তরে নিয়ত করা এবং মুখে তালবিয়া পাঠ করাই যথেষ্ট। শুধু নিয়ত করবে যে, আমি ইফরাদ কিংবা তামাত্তু' বা কিরান হজের নিয়ত করলাম। নিয়ত মুখে উচ্চারণকে ফিকহবিদগণ এজন্য উত্তম বলেছেন যাতে মুখ এবং অন্তরের মিল হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَيَسْعٰى بِلَا حَلْقٍ الخ : হজ্জে কিরান পালনকারী যেহেতু হজ ও উমরার জন্য একই সময় ইহরাম বেঁধেছে, তাই সে শুধু উমরা হতে অবসর হওয়ার পর হলক বা কসর অথবা অন্য কোনো ইহরাম বিরোধী কাজ করতে পারবে না। কেননা, এখনও তার হজের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। আর সে ব্যক্তি উমরা ও হজ উভয়েরই জন্য ইহরাম বেঁধেছে। সুতরাং তার ইহরামের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে।

قَوْلُهُ فَاِنْ اَتٰى بِطَوَافَيْنِ الخ : যদি হজ ও ওমরার জন্য একত্রে দুই তওয়াফ অর্থাৎ কাবা ঘর ১৪ বার প্রদক্ষিণ করে। অনুরূপ দুই সায়ী তথা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে ১৪ বার দৌড়ায় বা সায়ী করে। অথবা, উমরা এবং হজের জন্য ইজমালীভাবে দু-একটি তওয়াফ করে, প্রথমে উমরার এবং পরে হজের নিয়ত করেনি। অথবা, নিয়ত করলেও বিপরীতভাবে করেছে তথা প্রথমে তাওয়াফে কুদূমের এবং পরে ওমরার নিয়ত করেছে। অথবা, উভয়ের জন্য সাধারণভাবে তওয়াফ করে কোনটি হজের আর কোনটি উমরার নির্ধারণ করেনি। এ সকল পদ্ধতি সুন্নতের পরিপন্থি হওয়ার কারণে মাকরূহ হবে।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. اَلْقِرَانُ : اَلْقِرَانُ শব্দের আভিধানিক অর্থ– দুটি বিষয়কে একত্রিত করা। শরিয়তের পরিভাষায়, মীকাত হতে একই সাথে হজ ও উমরার ইহরাম বাঁধাকে কিরান বলা হয়।

২. اَلشَّفْعُ : অর্থ– জোড়, যা اَلْوِتْرُ-এর বিপরীত। এখানে ইহরামের দুই রাকাত নামাজকে বুঝানো হয়েছে।

৩. اَلرَّمَلُ : তওয়াফকারী তার উভয় কাঁধ বীরের ন্যায় হেলিয়ে দ্রুত চলাকে রমল বলে।

৪. اَلتَّمَتُّعُ : تَمَتُّعٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– উপকৃত হওয়া বা ফায়দা অর্জন করা। শরিয়তের পরিভাষায়, প্রথমে উমরা অতঃপর হজের নিয়ত করাকে হজ্জে তামাত্তু' বলে।

اَىْ يَطُوْفُ اَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطًا سَبْعَةً لِلْعُمْرَةِ وَسَبْعَةً لِطَوَافِ الْقُدُوْمِ لِلْحَجِّ ثُمَّ يَسْعٰى لَهُمَا وَاِنَّمَا كُرِهَ لِاَنَّهُ اَخَّرَ سَعْىَ الْعُمْرَةِ وَقَدَّمَ طَوَافَ الْقُدُوْمِ وَ ذَبَحَ لِلْقِرَانِ بَعْدَ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ وَاِنْ عَجَزَ صَامَ ثَلٰثَةً اٰخِرُهَا عَرَفَةُ وَسَبْعَةً بَعْدَ حَجَّةٍ اَيْنَ شَاءَ اَىْ بَعْدَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ فَاِنْ فَاتَتِ الثَّلٰثَةُ تَعَيَّنَ الدَّمُ فَاِنْ وَقَفَ قَبْلَ الْعُمْرَةِ بَطَلَتْ اَيِ الْعُمْرَةَ وَقُضِيَتْ وَ وَجَبَ دَمُ الرَّفْضِ وَسَقَطَ دَمُ الْقِرَانِ ـ

অনুবাদ : অর্থাৎ সাত চক্কর উমরার জন্য, আর সাত চক্কর হজের তাওয়াফে কুদূমের জন্য; মোট ১৪ চক্কর একসাথে করা এরপর অনুরূপ হজ এবং উমরার জন্য দুই সায়ী একত্রে করা মাকরূহ। এরূপ করা মাকরূহ এজন্য যে, সে উমরার সায়ীকে পিছিয়ে দিয়েছে এবং তাওয়াফে কুদূমকে এগিয়ে নিয়েছে। যেমন– কিরান হজকারীর জন্য এরূপ করা মাকরূহ। আর কুরবানির দিনের কঙ্কর নিক্ষেপের পর হজ্জে কিরানের জন্য জবাই করবে। আর যদি জবাই করতে অক্ষম হয়, তাহলে তিনটি রোজা এমনভাবে রাখবে যাতে শেষ রোজা আরাফার দিনে হয়, আর সাতটি রোজা হজের তথা আইয়ামে তাশরীকের পর যেখানে ইচ্ছা রাখবে। অতঃপর যদি তিনটি রোজা ভঙ্গ হয়, তাহলে দম নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর যদি উমরার পূর্বে আরাফায় অবস্থান করল, তাহলে উমরা বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তা কাজা করতে হবে। তখন دَمِ رَفْض তথা উমরা ছেড়ে দেওয়ার দম ওয়াজিব হবে এবং কিরানের দম রহিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَ ذَبَحَ لِلْقِرَانِ الخ : উক্ত ইবারতে হজ্জে কিরান পালনকারীর জন্য কুরবানির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। হজ ও উমরা উভয়ের জন্য ছাগল, দুম্বা, গরু অথবা উট কুরবানির দিন তথা জিলহজের দশ তারিখে কুরবানি করবে। অথবা কুরবানি করতে অক্ষম হলে ১০টি রোজা রাখবে। যেহেতু একই সফরে আল্লাহ তা'আলা হজ এবং উমরা দুটি ইবাদত পালনের সুযোগ দিয়েছেন, তাই শোকরিয়া হিসেবে কুরবানি ওয়াজিব হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কিরান হজ করবে তার প্রথমেই চিন্তা করা উচিত যে, সে কুরবানি করতে পারবে কিনা ? যদি কুরবানি করতে সক্ষম হয়, কুরবানি করবে। আর যদি সে কুরবানি করতে অক্ষম হয়, তাহলে সে হজের দিনসমূহের মধ্যে তিনটি রোজা এভাবে রাখবে যাতে শেষ রোজা আরাফার দিন হয় তথা জিলহজের ৭, ৮ ও ৯ তারিখে রোজা রাখবে। তিন রোজার শেষটি আরাফার দিন হওয়া মোস্তাহাব। তবে এ তারিখের পূর্ব হতেও একত্রিতভাবে বা পৃথকভাবে রোজা রাখা জায়েজ আছে। কিন্তু কুরবানির দিন রোজা রাখতে পারবে না। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۔

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি উমরাকে হজের সাথে একত্রিত করে লাভবান হয়, তবে কুরবানির যে জন্তু সহজলভ্য হয় জবাই করবে। অনন্তর যার জন্য কুরবানির জন্তু সহজলভ্য না হয় বা সে অক্ষম হয়, সে তিনদিন হজের সময় রোজা রাখবে। আর সাতদিন রোজা রাখবে যখন হজ হতে তোমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় আসবে। অতঃপর পূর্ণ দশ হলো।"

فَاِنْ فَاتَتِ الثَّلٰثَةُ الخ : অর্থাৎ কুরবানি হতে অক্ষম হওয়ার দরুন যে তিন রোজা রাখার কথা ছিল, যদি কুরবানির দিন আসার কারণে তার সুযোগ বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন দম দেওয়া অবশ্যক হয়ে যাবে। কেননা, রোজা মূলত কুরবানির

স্থলাভিষিক্ত এবং তার সময় ছিল কুরবানির দিনের পূর্ব পর্যন্ত। এখন যখন بَدْل -এর সময় রইল না তখন بَدْل তথা রোজার সুযোগ বিনষ্ট হয়ে গেল। আর যখন بَدْل -এর সুযোগ বিনষ্ট হয়ে গেল, তখন কুরবানি ওয়াজিব হওয়া বহাল রয়ে গেল।

قَوْلُهُ فَإِنْ وَقَفَ قَبْلَ الْعُمْرَةِ الخ : কিরান হজকারী উমরার কাজ হতে অবসর হওয়ার পূর্বে যদি আরাফায় অবস্থান করল, তখন উমরা বাতিল হয়ে গেল। এর কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা, সে উমরার কাজ আরম্ভ করার কারণে তা ওয়াজিব হয়েছিল, অতঃপর বাতিল হয়ে যাওয়ায় কাজা ওয়াজিব হবে। আর এ বিধান তখন কার্যকর হবে যখন সে উমরার তওয়াফের অধিকাংশ অংশের পূর্বে আরাফায় অবস্থান করেছে। আর যদি উমরার তওয়াফের অধিকাংশের পর যেমন– চার চক্করের পরে আরাফায় অবস্থান করল, তাহলে তার উমরা বাতিল হবে না ; বরং কুরবানির দিন তা পূর্ণ করে নিতে হবে।

قَوْلُهُ قُضِيَتْ : অর্থাৎ শুরু করার ফলে যেহেতু উমরা ওয়াজিব হয়ে গেছে, সেহেতু তা কাজা করা ওয়াজিব।

قَوْلُهُ وَ وَجَبَ دَمُ الرَّفْضِ الخ : উমরা বর্জন করার কারণে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে, সাথে সাথে তার উপর হতে কিরানের দম রহিত হয়ে যাবে। কেননা, যখন তার উমরা হলো না তখন তার হজ আর কিরান রইল না ; বরং ইফরাদে পরিণত হয়ে গেল। আর হজ্জে ইফরাদে দম দিতে হয় না। তাই শুধু উমরা ছেড়ে দেওয়ার দম তথা دَمْ رَفْض দিতে হবে।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ : জিলহজ মাসের ৯ তারিখ হতে ১২ তারিখ পর্যন্ত দিনগুলোতে তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা হয়। এ দিনগুলোকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়।

২. دَمُ الرَّفْضِ : হজ্জে কিরান পালনকারী উমরা ছেড়ে দেওয়ার কারণে যে দম দেওয়া ওয়াজিব হয়, তাকে دَم رَفْض বলে। কেননা, رَفْض শব্দের অর্থ হলো– ছেড়ে দেওয়া। আর এখানে উমরা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

وَالتَّمَتُّعُ اَفْضَلُ مِنَ الْاِفْرَادِ وَهُوَ اَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ الْمِيْقَاتِ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَيَطُوْفَ وَيَسْعٰى وَيَحْلِقَ اَوْ يَقْصِرَ وَيَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ فِىْ اَوَّلِ طَوَافِهٖ اَىْ فِىْ اَوَّلِ طَوَافِهٖ لِلْعُمْرَةِ ثُمَّ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَبْلَهٗ اَفْضَلُ وَحَجَّ كَالْمُفْرِدِ اِلَّا اَنَّهٗ يَرْمُلُ فِىْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَيَسْعٰى بَعْدَهٗ لِاَنَّهٗ اَوَّلُ طَوَافِهٖ لِلْحَجِّ بِخِلَافِ الْمُفْرِدِ لِاَنَّهٗ قَدْ سَعٰى مَرَّةً وَلَوْ كَانَ هٰذَا الْمُتَمَتِّعُ بَعْدَ مَا اَحْرَمَ لِلْحَجِّ طَافَ وَسَعٰى قَبْلَ اَنْ يَرُوْحَ اِلٰى مِنٰى لَمْ يَرْمُلْ فِىْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَلَا يَسْعٰى بَعْدَهٗ لِاَنَّهٗ قَدْ اَتٰى بِذٰلِكَ مَرَّةً ـ

অনুবাদ : হজ্জে তামাত্তু' হজ্জে ইফরাদ হতে উত্তম। আর হজ্জে তামাত্তু' এই যে, হজের মাসে মীকাত হতে উমরার ইহরাম বেঁধে তওয়াফ ও সায়ী করবে এবং হলক অথবা কসর করবে। আর উমরার প্রথম তওয়াফেই তালবিয়া ছেড়ে দেবে। অতঃপর তালবিয়ার দিন হজের ইহরাম বাঁধবে। তবে তালবিয়ার দিনের পূর্বে ইহরাম বাঁধা উত্তম এবং ইফরাদ হজকারীর ন্যায় হজ করবে। তবে তামাত্তু' হজকারী তাওয়াফে যিয়ারতের মধ্যে রমল করবে এবং অতঃপর সায়ী করবে। কেননা, তা হজের জন্য প্রথম তওয়াফ; কিন্তু মুফরিদ তার ব্যতিক্রম অর্থাৎ সে সায়ী করবে না। কেননা, মুফরিদ একবার সায়ী করে। যদি হজ্জে তামাত্তু'কারী হজের ইহরাম বেঁধে মিনার দিকে গমনের পূর্বে তওয়াফ ও সায়ী করে নেয়, তবে তাওয়াফে যিয়ারতের সময় রমল করবে না এবং এরপর সায়ীও করবে না। কেননা, সে একবার রমল ও সায়ী করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالتَّمَتُّعُ اَفْضَلُ مِنَ الْاِفْرَادِ : অভিধানের দৃষ্টিতে تَمَتُّعٌ অর্থ– উপকৃত হওয়া, ফায়দা অর্জন করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় তামাত্তু' বলা হয় হজের মাসে তথা শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ মাসে মীকাত হতে শুধু উমরার জন্য ইহরাম বাঁধাকে। উমরার কাজ সমাধা করে ইহরাম ভেঙ্গে ফেলবে। অতঃপর তালবিয়ার দিন অথবা তার পূর্বে হজের ইহরাম বেঁধে ইফরাদ হজ করবে। এ তামাত্তু' হজ হজ্জে ইফরাদ হতে উত্তম। কেননা, ইফরাদ হজে এক সফরে এক ইবাদত তথা হজ হয়, আর তামাত্তু' হজে দুই ইবাদত তথা হজ ও উমরা হয়। কিন্তু তামাত্তু'র মধ্যে উমরার কাজের পরে ইহরাম ভঙ্গের অনুমতি আছে, এজন্য তা কিরান হতে সহজ।

হজের মাসের উল্লেখ দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি কেউ রমজানে উমরা করল এবং অতঃপর ঐ বছরই হজ করল তা তামাত্তু' হবে না। আর যদি রমজানে ইহরাম বাঁধে এবং দু-এক চক্কর তওয়াফ রমজানেই করে ; অবশিষ্ট তওয়াফ শাওয়াল মাসে করে, পরে সে বছরই হজ করে, তবে এ হজ তামাত্তু' হবে।

হজ্জে তামাত্তু'র ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি : হজ্জে তামাত্তু' পালনকারী উমরার কাজ হতে অবসর হয়ে ইহরাম ভঙ্গ করে ইহরামবিহীন অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবে। অতঃপর যখন হজের সময় আসে তখন হজের ইহরাম বাঁধবে। এ ইহরাম তালবিয়ার দিন অথবা তার পূর্বেও বাঁধতে পারে। তবে তালবিয়ার দিনের পূর্বে ইহরাম বাঁধা উত্তম। কেননা, তাতে কষ্ট বেশি হয়। যে ইবাদতে অধিক কষ্ট সে ইবাদতে ছওয়াবও অধিক হবে। মুয়াত্তা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) মক্কাবাসীদেরকে অষ্টম তারিখের পূর্বে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ করতেন।

হজের মাসসমূহ : হজের মাস হলো তিনটি। যথা– ১. শাওয়াল, ২. জিলকদ ও ৩. জিলহজ।

قَوْلُهُ "وَهُوَ اَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ" الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে তামাত্তু' হজ-এর সংজ্ঞা প্রদান করেন। তিনি বলেন, তামাত্তু'কারী প্রথমে নির্ধারিত মীকাত হতে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করবে। এটা হবে হজের মাসসমূহের মধ্যে কোনো একদিন। তবে ৯ জিলহজের পূর্বেই তাকে উমরার কাজ শেষ করতে হবে। তওয়াফের পর সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করত মাথার চুল মুণ্ডাবে কিংবা চুল খাটো করবে; এরই মধ্য দিয়ে উমরার কাজ শেষ হলে মুতামাত্তি' হিল এলাকা থেকে হজের জন্য ইহরাম বাঁধবে। তারপর ইফরাদকারীর মতোই হজ পালন করবে।

قَوْلُهُ "يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَبْلَهُ اَفْضَلُ" : তামাত্তু'কারী ৮ জিলহজের মধ্যে তার উমরার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে ইহরাম থেকে মুক্ত হতে হবে। ৮ তারিখেই তাকে হজের নিয়তে পুনরায় ইহরাম বাঁধতে হবে। ৮ জিলহজকে يَوْمُ التَّرْوِيَةِ বলা হয়। মুসান্নিফ (র.) বলেন, তারবিয়া দিবসের পূর্বে ইহরাম বাঁধা উত্তম। কারণ, প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থের এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ওমর (রা.) মক্কাবাসীদের ৮ জিলহজের পূর্বে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিতেন।

قَوْلُهُ "فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ" : প্রকাশ থাকে যে, হজের মাস ৩টি। শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ। এ ৩ মাসের বাহিরে উমরা করাই উত্তম। অথচ মুসান্নিফ (র.) এখানে উমরার ইহরাম বাঁধার ক্ষেত্রে فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ বলে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন।

এর কারণ হলো, এটা নিছক উমরা নয়; বরং তামাত্তু'কারীর উমরা। তামাত্তু' হজ করতে হলে উমরা ও হজ পৃথক ইহরামের মাধ্যমে পরপর সম্পাদন করতে হয়। কিন্তু কেউ যদি রমজান মাসে উমরা করে এবং পরে জিলহজে হজ করে, তাহলে তার হজ তামাত্তু' হবে না, এটা হজ্জে ইফরাদ হয়ে যাবে।

একইভাবে প্রথমে হজের কার্য সম্পাদন করে পরে উমরা করলেও সেটা তামাত্তু' হবে না। তাই মুসান্নিফ (র.) তামাত্তু'র সংজ্ঞায় فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ-এর শর্ত জুড়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ "وَحَجَّ كَالْمُفْرِدِ" : এখানে হজ্জে তামাত্তু' পালনকারীর কার্যাবলি আলোচিত হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, উমরা শেষ করার পর হজ্জে তামাত্তু' পালনকারী ইফরাদ পালনকারীর অনুরূপ হজ করবে। ইতঃপূর্বে যেহেতু ইফরাদ হজ পালনের নিয়ম-পদ্ধতি সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে, তাই এখানে তা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

তবে হজ্জে ইফরাদ পালনকারীর কার্যাবলি ও মুতামাত্তি'-এর কার্যাবলিতে একটু ভিন্নতা লক্ষণীয়, যা ব্যাখ্যাকার ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (র.) সংক্ষেপে উদ্ধৃত করেছেন। পার্থক্য হলো নিম্নরূপ–

১. ইফরাদকারী তাওয়াফে কুদূম করে এবং তাতে রমল করে। ফলে তাওয়াফে যিয়ারতে তাকে রমল করতে হয় না। কিন্তু তামাত্তু'কারী তাওয়াফে কুদূমের সুযোগ পায় না। তাওয়াফে যিয়ারতই তার প্রথম তওয়াফ। এ কারণে তাওয়াফে যিয়ারতে মুতামাত্তি'কে রমল করতে হয়।

২. ইফরাদকারী যেহেতু তাওয়াফে কুদূমের পরে সায়ী করে নেয়, তাই তাওয়াফে যিয়ারতের পরে তার জন্য আর তওয়াফ করা লাগে না। কিন্তু তামাত্তু'কারী যেহেতু ইতঃপূর্বে সায়ী করতে পারেনি, তাই সে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী করে নেবে।

وَ ذَبَحَ وَلَمْ تَنُبِ الْأُضْحِيَّةُ عَنْهُ وَإِنْ عَجَزَ صَامَ كَالْقِرَانِ وَجَازَ صَوْمُ الثَّلٰثَةِ بَعْدَ إِحْرَامِهَا لَاقَبْلَهُ وَتَاخِيْرُهُ اَحَبُّ إِعْلَمْ اَنَّ اَشْهُرَ الْحَجِّ وَقْتٌ لِصَوْمِ الثَّلٰثَةِ لٰكِنْ بَعْدَ تَحَقُّقِ السَّبَبِ وَهُوَ الْإِحْرَامُ وَكَذَا فِي الْقِرَانِ لٰكِنَّ التَّاخِيْرَ اَفْضَلُ وَهُوَ اَنْ يَصُوْمَ ثَلٰثَةً مُتَتَابِعَةً اٰخِرُهَا عَرَفَةُ وَإِنْ شَاءَ السَّوْقَ وَهُوَ اَفْضَلُ اَحْرَمَ وَسَاقَ هَدْيَهُ وَهُوَ اَوْلٰى مِنْ قَوْدِهِ وَقَلَّدَ الْبَدَنَةَ وَهُوَ اَوْلٰى مِنَ التَّجْلِيْلِ اَيِ التَّجْلِيْلُ جَائِزٌ لٰكِنَّ التَّقْلِيْدَ اَوْلٰى مِنْهُ وَلَا يَدُلُّ هٰذَا عَلٰى اَنَّهُ يَصِيْرُ بِالتَّجْلِيْلِ مُحْرِمًا فَإِنَّهُ قَدْ مَرَّ قُبَيْلَ هٰذَا الْبَابِ اَنَّهُ لَا يَصِيْرُ بِالتَّجْلِيْلِ مُحْرِمًا بَلْ لَابُدَّ مِنَ التَّلْبِيَةِ اَوْ فِعْلٍ يَقُوْمُ مَقَامَهَا وَهُوَ التَّقْلِيْدُ ـ

অনুবাদ : আর সে পশু জবাই করবে। তার কুরবানি জবাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হবে না। আর যখন জবাই হতে অক্ষম হয়, তখন কিরান হজের ন্যায় রোজা রাখবে। যখন তিনদিনের রোজা ইহরামের পরে জায়েজ হবে; ইহরামের পূর্বে হবে না এবং বিলম্বে রোজা রাখা মোস্তাহাব। জেনে রেখ যে, তিন রোজার সময় হলো হজের মাস, তবে সবব প্রতিষ্ঠিত হবার পর। আর সবব হলো ইহরাম। অনুরূপভাবে কিরানেও, তবে বিলম্ব করা উত্তম। তা এভাবে যে, পরস্পর তিনটি রোজা এভাবে রাখবে যে, তৃতীয় রোজা আরাফার দিন তথা জিলহজের নবম তারিখে হবে। আর যদি سَوْق অর্থাৎ পশু পাঠানোর ইচ্ছা করে, যা উত্তম, তা হলো ইহরাম বেঁধে তার হাদীকে ধাওয়া করবে। তবে ধাওয়া করা টেনে নেওয়া হতে উত্তম। আর বুদনা অর্থাৎ পশুর গলার মালা পরাবে। আর এটা ছালা ঝুলানো হতে উত্তম অর্থাৎ ছালা ঝুলানো জায়েজ, তবে মালা পরানো তা হতে উত্তম। তা এ কথা বুঝায় না যে, ছালা ঝুলানো দ্বারা সে মুহরিম হয়ে যাবে। এজন্য যে, এ পরিচ্ছেদের পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে যে, হাদীসে ছালা পরানো দ্বারা ব্যক্তি মুহরিম হবে না ; বরং তালবিয়া বা এমন কোনো কাজ আবশ্যক যা তালবিয়ার স্থলাভিষিক্ত। আর তালবিয়ার স্থলাভিষিক্ত কাজ হলো মালা পরানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَ ذَبَحَ وَلَمْ تَنُبِ الْأُضْحِيَّةُ عَنْهُ : অর্থাৎ তামাত্তু'র জানোয়ার জবাই করবে যেমন কিরানের জানোয়ার জবাই করবে। এটা শোকরিয়ার দম যাকে কুরবানির দিন জবাই করা হয়। কিন্তু কুরবানির জানোয়ার তামাত্তু' এবং কিরানের দমের স্থলাভিষিক্ত হবে না। কেননা, দম ওয়াজিব, আর কুরবানির জানোয়ার ওয়াজিব ছিল না। কেননা, মুসাফিরের উপর কুরবানি ওয়াজিব নয়। আর যদি মুসাফিরের উপর কুরবানি ওয়াজিব বলে মেনেও নেওয়া হয় তবুও তা দমের স্থলাভিষিক্ত হবে না। কেননা, উভয়টি পৃথক পৃথক ওয়াজিব। সুতরাং একটির নিয়ত করার দ্বারা অপরটি আদায় হবে না।

قَوْلُهُ وَإِنْ عَجَزَ صَامَ كَالْقِرَانِ : হজ্জে তামাত্তু'কারী যদি কোনো কারণে পশু জবাই করতে অপারগ হয়, তাহলে সে ঐ কিরান হজ আদায়কারীর মতোই ১০টি রোজা রাখবে, যে কিরানের জন্য পশু জবাই করতে অক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ ইহরাম বাঁধার পর থেকে ৯ জিলহজের মধ্যে ৩টি এবং হজ সমাপনান্তে অবশিষ্ট ৭টি রোজা রাখবে।

قَوْلُهُ وَجَازَ صَوْمُ الثَّلْثَةِ الخ : যে তিন রোজা হজের দিনে রাখার বিধান রয়েছে তা ইহরাম বাঁধার পরে রাখা জায়েজ হবে; ইহরামের পূর্বে রাখা জায়েজ হবে না, যদিও হজের দিনসমূহে হয়। কেননা, এ রোজার সবব যে ইহরাম তা পাওয়া যায়নি, তবে মোস্তাহাব হলো এ রোজা বিলম্বে এরূপে রাখবে যে, তৃতীয় রোজা আরাফার দিন হবে। আর এটাই হজ্জে কিরানের হুকুম।

হজ্জে তামাত্তু'র পদ্ধতি : হজ্জে তামাত্তু' আদায়ের পদ্ধতি দুটি। প্রথমত কুরবানির পশুবিহীন, দ্বিতীয়ত কুরবানির পশুসহ। অর্থাৎ সে যদি ইচ্ছা করে, তবে ইহরামের সাথে হাদীও সঙ্গে হাঁকিয়ে আনবে। তা-ই সর্বোত্তম ইহরাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জাতুল বিদার সময় হাদী সঙ্গে এনেছিলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

قَوْلُهُ "وَتَاخِيْرُهُ أَحَبُّ" : হজ্জে তামাত্তু'কারী ইচ্ছে করলে শাওয়াল মাসের প্রথমেই উমরা পালন করে হজের অপেক্ষায় থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে উমরার ইহরাম বাঁধার পরই তার জন্যে জবাই-এর বিকল্প হিসেবে রোজা রাখা জায়েজ হবে। তবে তা যদি আরো বিলম্বে অর্থাৎ জিলহজের ৭, ৮ ও ৯ তারিখে করা হয় এটাই হবে উত্তম পন্থা। কারণ, ৩টি রোজার শেষটি যেন আরাফাহ দিবসে পড়ে।

قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْلَى الخ : উল্লেখ্য যে, হাদী সঙ্গে আনার দুটি নিয়ম। প্রথমত জন্তু আগে থাকবে, আর মালিক পিছন দিক হতে তাকে হাঁকিয়ে চলবে। দ্বিতীয়ত জন্তু পিছনে থাকবে, আর মালিক আগে থেকে তাকে টানবে। টানার চেয়ে হাঁকানো উত্তম।

قَوْلُهُ وَقَلَّدَ الْبَدَنَةَ لخ : এখানে হাদীকে চিহ্নিত করার পদ্ধতি ও উত্তম পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যে সমস্ত জন্তু মক্কায় জবাই করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তাকে অন্যান্য জন্তু হতে পৃথক রাখার জন্য, অপরাপর জন্তুর সাথে মিশে না যাওয়ার জন্য, কিংবা হারানো গেলেও সহজে চিনতে পারার জন্য, কিংবা হাদী বলে চিহ্নিতকরণের জন্য, তাকে দু প্রকারের চিহ্ন দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে। প্রথমত তার গলায় মালা পরানো হয়, পশম কিংবা চুলের রশি পাকিয়ে তাতে জুতা, চামড়া বা গাছের ছাল বেঁধে সেসব পশুর গলায় পরানো হয়। যাতে জানা যায় যে, তা কুরবানির জন্তু। কেউ যেন তা ছিনতাই না করে কিংবা পথে জবাই করার প্রয়োজন দেখা দিলে সম্পদশালী মানুষ যেন এর গোশ্ত না খায়। দ্বিতীয়ত উটের جُلّ বানিয়ে সেসব পশুর পিঠে ঝুলানো হয়। এটা দ্বারাও সে একই বিধান বুঝা যায়। তবে ঝুল ঝুলানোর চেয়ে মালা পরানোই উত্তম পন্থা। কেননা, মালা পরানোর দ্বারা প্রচার বা জানাজানি বেশি হয়। আর ঝুলের মধ্যে সৌন্দর্য আছে, তদুপরি শীত-গ্রীষ্ম হতে আত্মরক্ষা করা যায়, যা কুরবানির পশু ছাড়া অন্যান্য জন্তুর মাঝেও পাওয়া যায়। মালা পরানোর মধ্যে সে সৌন্দর্য কিংবা শীত-গ্রীষ্ম হতে আত্মরক্ষার কোনোটিই হয় না, তবুও মালা পরানোই উত্তম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এ স্থলে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হাদীর গায়ে ছালা পরানো হতে যখন মালা পরানো উত্তম, তখন বুঝা গেল যে, উভয়ই জায়েজ এবং সমান। সুতরাং হার পরানো দ্বারা যেভাবে মুহরিম হবে, অনুরূপ ছালা পরানো দ্বারাও মুহরিম হবে। বস্তুত তাতে মুহরিম হবে না।

এ প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যাকার বলেন যে, ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে যে, শুধু ছালা পরানো দ্বারা মুহরিম হবে না। কেননা, ছালা পরানো হজের আহকামের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু হার পরানো যা তালবিয়ার স্থলাভিষিক্ত, তা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মুহরিম হবে।

وَكَرِهَ الْإِشْعَارُ وَهُوَ شَقُّ سَنَامِهَا مِنَ الْاَيْسَرِ وَهُوَ الْاَشْبَهُ اَىِ الْاَشْبَهُ بِالصَّوَابِ فَاِنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ طَعَنَ فِىْ جَانِبِ الْيَسَارِ قَصْدًا وَفِىْ جَانِبِ الْاَيْمَنِ اِتِّفَاقًا وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) اِنَّمَا كَرِهَ هٰذَا الصُّنْعَ لِاَنَّهُ مُثْلَةٌ وَاِنَّمَا فَعَلَهُ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لَا يَمْتَنِعُوْنَ عَنْ تَعَرُّضِهِ اِلَّا بِهٰذَا وَقِيْلَ اِنَّمَا كَرِهَ اِشْعَارَ اَهْلِ زَمَانِهِ لِمُبَالَغَتِهِمْ فِيْهِ حَتّٰى يَخَافَ مِنْهُ السِّرَايَةُ وَقِيْلَ اِنَّمَا كَرِهَ اِيْثَارَهُ عَلَى التَّقْلِيْدِ ـ

অনুবাদ : আর اِشْعَارْ করা মাকরূহ। اِشْعَارْ বলা হয়, উটের চুটের বাম পার্শ্বে ফেঁড়ে দেওয়া। তা-ই সঠিক পন্থার নিকটবর্তী। কেননা, মহানবী ﷺ ইচ্ছাকৃতভাবে উটের ঝুঁটির বাম পার্শ্ব ফেঁড়েছেন। আর ঝুঁটির ডান পার্শ্ব আকস্মিকভাবে ফেঁড়েছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ কর্ম (اِشْعَارْ)-কে এজন্য মাকরূহ মনে করেছেন যে, তা একপ্রকার বিকৃতিকরণ। তবে মহানবী ﷺ اِشْعَارْ এজন্য করেছেন যে, এরূপ করা ব্যতীত মুশরিকগণ কুরবানির পশুর উপর আক্রমণ করা হতে বিরত হতো না। কতিপয় ফিকহবিদ বলেছেন, ইমাম সাহেব নিজের যুগের اِشْعَارْ-কে মাকরূহ বলতেন। কেননা, তৎকালীন লোকেরা ইশ'আরের মধ্যে বাড়াবাড়ি করত। এমনকি ক্ষত ভিতরের দিকে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা হতো। কেউ কেউ বলেছেন যে, ইমাম সাহেব মালা পরানোর উপর اِشْعَارْ-কে প্রাধান্য দেওয়াকে মাকরূহ বলেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَرِهَ الْاِشْعَارُ وَ هُوَ الخ : اِشْعَارْ-এর আভিধানিক অর্থ– اِعْلَامْ তথা কোনো প্রাণীর রক্ত জবাই কিংবা অন্য কোনো নিয়মে প্রবাহিত করা। শরিয়তের পরিভাষায়, হাদীর জানোয়ার প্রমাণ করানোর জন্য উটের ঝুঁটির ডান বা বাম দিক হতে রক্ত প্রবাহিত করাকে اِشْعَارْ বলা হয়। ইহরামের সময় اِشْعَارْ-এর প্রচলন ছিল। যেমন– মহানবী ﷺ যুলহুলাইফা নামক স্থানে ইহরাম বাঁধার সময় ইশ'আর করেন। আলেমদের ঐকমত্যে ইশ'আর মোস্তাহাব। কারো কারো মতে সুন্নত। তবে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ইশ'আর মাকরূহ। কেননা, তাতে পশুর কষ্ট হয় এবং তা অঙ্গ বিকৃতিকরণের শামিল। সহীহ হাদীস অনুযায়ী মুছলা নিষিদ্ধ।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের প্রতিবাদ করা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ এবং সাহাবীগণ যা করেছেন বলে বর্ণিত আছে, তার বিরোধিতা কিভাবে করা যায় ? এর উত্তর এই যে, মহানবী ﷺ তাঁর হাদীকে মুশরিকদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য اِشْعَارْ করেন। কেননা, মুশরিকগণ হাদীকে ধরে জবাই করে দিত। বর্তমানে আমাদের দেশে সে কারণ বিদ্যমান নেই, তাই বর্তমানে اِشْعَارْ বৈধ নয়। তা ছাড়া ইশ'আরের হাদীস মুছলার হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে এ উত্তরের উপর মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) আপত্তি করে বলেন যে, একজন বিজ্ঞ লোক অবশ্যই এ কথা বুঝেন যে, হজের সময় যখন মহানবী ﷺ ইশ'আর করেছেন তখন মুশরিকদের প্রভাব ছিল না। তা ছাড়া মুছলার নিষিদ্ধতা বিদায় হজের পূর্বেই হয়েছে। সুতরাং ইশ'আরকে মাকরূহ বলার কোনো কারণ নেই। তা ছাড়া এমন একটি কাজ যখন মহানবী ﷺ এবং সাহাবীদের থেকে প্রমাণিত আছে, তখন এর বিপরীত উক্তি হতে দলিল গ্রহণের কোনো যৌক্তিকতা নেই।

মহানবী ﷺ -এর ইশ'আর করার নিয়ম : হিদায়া গ্রন্থে রয়েছে যে, ইশ'আর করার নিয়ম হলো, উটের ঝুঁটির নীচের অংশের ডান দিকে বর্শা নিক্ষেপ করে ফেঁড়ে দেওয়া। মহানবী ﷺ স্বেচ্ছায় বাম দিকে এবং আকস্মিকভাবে ডান দিকে বর্শা মেরেছিলেন। বেনায়া কিতাবের বর্ণনা মতে, উটের মাথা তাঁর সামনে থাকত, আর বর্শা তাঁর ডান হাতে থাকত। এমতাবস্থায় ডান হাতে বর্শা মারলে নিশ্চয়ই তা উটের বাম দিকে লাগত।'

قَوْلُهُ إِنَّمَا كَرِهَ إِشْعَارَ الخ : এখানে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইমাম আ'যম (র.) ইশ'আর মাকরূহ হওয়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা তাঁর যুগের সাধারণ লোকের ইশ'আর ছিল। যেমন– সে যুগের লোকেরা উটের ঝুঁটি এমন শক্তভাবে জখম করত যে, জখম ভিতরের দিকে পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা হতো। ইমাম আ'যম (র.) এভাবে ইশ'আর করাকে মাকরূহ বলেন। কেউ কেউ এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, ইমাম সাহেব ইশ'আরকে মাকরূহ বলেননি ; বরং তাঁর কথা এই ছিল যে, এ ইহরামের ব্যাপারে হার পরানো উত্তম। সুতরাং উত্তমতার বিপরীতে ইশ'আরকে অগ্রাধিকার দেওয়া মাকরূহ। ইমাম আবূ মনসূর মাতুরীদী এবং ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. مُثْلَةٌ : জন্তুর কোনো অঙ্গ কর্তন করাকে مُثْلَةٌ বলা হয়। যেমন বলা হয়েছে— هُوَ قَطْعُ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ

২. إِيْثَارٌ : নিজের প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

৩. إِشْعَارٌ : এর আভিধানিক অর্থ– কোনো পশুর রক্তপাত করা। পরিভাষায়, উটের কুঁজের ডান বা বাম দিকে বর্শা দ্বারা জখম করে রক্ত বের করে কুরবানির পশু বলে চিহ্নিত করাকে إِشْعَارٌ বলা হয়।

وَاعْتَمَرَ وَلَا يَتَحَلَّلُ مِنْهَا اَىْ مِنَ الْعُمْرَةِ وَهٰذَا عِنْدَ سَوْقِ الْهَدْيِ اَمَّا اِذَا لَمْ يَكُنْ بِسَوْقِ الْهَدْيِ يَتَحَلَّلُ مِنْ اِحْرَامِ الْعُمْرَةِ كَمَا مَرَّ ثُمَّ اَحْرَمَ لِلْحَجِّ كَمَا مَرَّ اَىْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَبْلَهُ اَفْضَلُ وَحَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَّ مِنْ اِحْرَامَيْهِ وَالْمَكِّىُّ يُفْرِدُ فَقَطْ اَىْ لَا قِرَانَ لَهُ وَلَا تَمَتُّعَ وَمَنِ اعْتَمَرَ بِلَا سَوْقٍ ثُمَّ عَادَ اِلٰى بَلَدِهٖ فَقَدْ اَلَمَّ وَمَعَ سَوْقٍ تَمَتَّعَ ـ

অনুবাদ : আর উমরা করবে, উমরা হতে হালাল হবে না। এ হুকুম হাদী ধাওয়া করার সময়। কিন্তু যখন হাদী ধাওয়াকরণ ব্যতীত তামাত্তু' হয়, তখন উমরার ইহরাম হতে হালাল হয়ে যাবে। যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অতঃপর হজের জন্য ইহরাম বাঁধবে অর্থাৎ তালবিয়ার দিন। তবে এর পূর্বে হালাল হওয়া উত্তম। আর কুরবানির দিন মাথা মুণ্ডাবে এবং উভয় ইহরাম হতে হালাল হয়ে যাবে। মক্কাবাসীগণ শুধু ইফরাদ হজ করবে। অর্থাৎ, মক্কাবাসীদের জন্য কিরান ও তামাত্তু' কোনোটিই নেই। আর যে ব্যক্তি হাদী ধাওয়া করা ব্যতীত উমরার ইহরাম বাঁধবে, তারপর সে বাড়িতে ফিরে গেছে, সে অপরাধ করেছে। আর যদি হাদী ধাওয়াকরণের সাথে ইহরাম বাঁধে, তাহলে সে তামাত্তু' করল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاعْتَمَرَ : অর্থাৎ যখন মক্কা শরীফে প্রবেশ করবে তখন তওয়াফ করবে এবং উমরার সায়ী করবে।

قَوْلُهُ لَا يَتَحَلَّلُ الخ : অর্থাৎ, হাদী ইত্যাদির দ্বারা উমরা হতে হালাল হবে না ; বরং সে মুহরিম অবস্থায়ই অবশিষ্ট থাকবে। কেননা, মহানবী ﷺ বলেছেন– لَوْلَا اَنَّ مَعِىَ الْهَدْىُ لَاَحْلَلْتُ

قَوْلُهُ وَحَلَّ مِنْ اِحْرَامَيْهِ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে اِحْرَامَيْهِ বলে উমরা ও হজের ইহরামকে বুঝিয়েছেন। কারণ, তামাত্তু'কারী যদি পশু হাঁকিয়ে নেয় এবং উমরার ইহরাম বহাল রাখে, তারপরও তারবিয়ার দিন তাকে হজের জন্যে ইহরাম বাঁধতে হয়। ফলে ১০ তারিখে কুরবানি ও হলকের মধ্য দিয়ে সে এ উভয় ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যায়। মুসান্নিফ (র.) وَحَلَّ مِنْ اِحْرَامَيْهِ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ وَمَنِ اعْتَمَرَ بِلَا سَوْقٍ الخ : এখানে হজ্জে তামাত্তু'-এর শর্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। হজ্জে তামাত্তু'র শর্ত এই যে, হজ এবং উমরা উভয়টি হজের মাসে আদায় করা হবে। এখন যদি সে হজের মাসে উমরা করল তারপর সে নিজ বাড়িতে ফিরে গেল, তাতে তার প্রথম সফর বাতিল হয়ে গেল। তারপর যদি সে বছরই দ্বিতীয়বার সফর করে হজ পালন করে, তখন হজ এবং উমরা উভয়টি একই সফরে আদায় না হওয়ার কারণে তা হজ্জে তামাত্তু' হবে না। কিন্তু এ হুকুম তখন যখন সে ইহরামকালে হাদী না চালিয়ে থাকে। আর যদি সে উমরার ইহরামে হাদী চালিয়ে থাকে, তখন তার প্রথম সফর শেষ হবে না। সুতরাং তার তামাত্তু' বাকি থাকবে। এজন্য তার উপর কর্তব্য হবে দ্বিতীয়বার মক্কায় ফিরে আসা। কেননা, সে হাদী চালানোর কারণে ইহরাম হতে হালাল হয়নি।

قَوْلُهُ فَقَدْ اَلَمَّ الخ : এখানে اَلَمَّ-এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, উমরা করে যদি কেউ দেশে প্রত্যাবর্তন করে, তবে সে ইলমাম করল। ইলমাম অর্থ– ছোট গুনাহ বা সগীরা গুনাহ। উদ্দেশ্য এই যে, তার দেশে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে অশোভনীয় হয়েছে; এতে তার সগীরা গুনাহ হবে।

اِعْلَمْ اَنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ التَّرَفُّقُ بِاَدَاءِ النُّسُكَيْنِ الصَّحِيْحَيْنِ فِىْ سَفَرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُلِمَّ بِاَهْلِهٖ اِلْمَامًا صَحِيْحًا بَيْنَهُمَا فَالَّذِىْ اِعْتَمَرَ بِلَا سَوْقِ الْهَدْيِ لَمَّا عَادَ اِلٰى بَلَدِهٖ صَحَّ اِلْمَامُهٗ فَبَطَلَ تَمَتُّعُهٗ فَقَوْلُهٗ فَقَدْ اَلَمَّ ذِكْرُ الْمَلْزُوْمِ وَقَصْدُ اللَّازِمِ وَهُوَ بُطْلَانُ التَّمَتُّعِ اَمَّا اِذَا سَاقَ الْهَدْىَ لَا يَكُوْنُ اِلْمَامُهٗ صَحِيْحًا لِاَنَّهٗ لَا يَجُوْزُ لَهُ التَّحَلُّلُ فَيَكُوْنُ عَوْدُهٗ وَاجِبًا فَلَا يَكُوْنُ اِلْمَامُهٗ صَحِيْحًا فَاِذَا عَادَ وَاَحْرَمَ بِالْحَجِّ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَاِنْ طَافَ لَهَا اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعَةٍ قَبْلَ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَاَتَمَّهَا فِيْهَا وَحَجَّ فَقَدْ تَمَتَّعَ وَلَوْ طَافَ اَرْبَعَةً هُنَا لَا اَىْ لَوْ طَافَ اَرْبَعَةً قَبْلَ اَشْهُرِ الْحَجِّ لَا يَكُوْنُ مُتَمَتِّعًا .

অনুবাদ : তুমি জেনে রেখ! তামাত্তু‘-এর অর্থ হলো– এক সফরে দুটি সহীহ্ নুসুক আদায় করার সাথে লাভবান হওয়া; এ শর্তের সাথে যে উভয় নুসুকের মধ্যে যেন পরিবারের সাথে প্রকৃত ইলমাম তথা সাক্ষাৎ না হয়। অতএব, যে ব্যক্তি কুরবানির পশু সঙ্গে না নিয়ে উমরার ইহরাম বাঁধল এবং যখন সে তার বাড়ির দিকে প্রত্যাবর্তন করল তখন তার ইলমাম সহীহ্ হলো আর তার তামাত্তু‘ বাতিল হলো। এখানে فَقَدْ اَلَمَّ উক্তিকে مَلْزُوْم হিসেবে উল্লেখ করে لَازِمْ [বাতিল হওয়া] উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর লাযেম হলো তামাত্তু‘ বাতিল হওয়া। কিন্তু যখন হাদী চালিয়ে ইহরাম বাঁধল, তখন ইলমাম সহীহ্ হবে না। কেননা, তার জন্য হালাল হওয়া জায়েজ নেই। সুতরাং তার জন্য মক্কায় ফিরে যাওয়া ওয়াজিব। অতএব তার ইলমাম সহীহ্ হবে না। তারপর যখন সে মক্কায় ফিরে গিয়ে হজের ইহরাম বেঁধেছে, তখন সে তামাত্তু‘ হজকারী হবে। অতঃপর যদি হজের মাসের পূর্বে উমরার জন্য ৪ চক্করের কম তওয়াফ করল এবং হজের মাসে তওয়াফকে পরিপূর্ণ করল এবং হজ করল, তখন সে তামাত্তু‘কারী হলো। আর যদি সেখানে ৪ চক্কর তওয়াফ করল তখন সে তামাত্তু‘ হজকারী হবে না। অর্থাৎ যদি সে হজের মাসের পূর্বে ৪ বার তওয়াফ করল তখন সে তামাত্তু‘কারী হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُلِمَّ بِاَهْلِهٖ الخ : মুসান্নিফ (র.) তামাত্তু‘ হজের সংজ্ঞায় আলোচ্য উক্তির দ্বারা একটি শর্ত আরোপ করেছেন, আর তা হলো উমরা ও হজ। এ দুটি ইবাদতের মাঝখানে বিরতির সময় তামাত্তু‘কারী উমরা হতে হালাল হয়ে পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হতে পারবে না। কারণ, উমরা থেকে হালাল হয়ে যে ব্যক্তি বাড়ি ফিরে যায় এবং পরে হজের উদ্দেশ্যে পুনরায় সফর করে মক্কায় এসে হজ পালন করে তার তো উমরা ও হজের মাঝে কোনো যোগসূত্র থাকল না; দু'টি ইবাদত একই সফরে হলো না। ফলে তার হজ ইফরাদ হয়ে যাবে।

এভাবে উমরা থেকে হালাল হয়ে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় পরিবারের সাথে মিলিত হওয়াকে ব্যাখ্যাকার اِلْمَامًا صَحِيْحًا বলেছেন। আর اِلْمَامًا صَحِيْحًا-এর দ্বারা হজ্জে তামাত্তু‘ বাতিল হয়ে যায় এবং তা ইফরাদ হজ -এ পরিণত হয়।

قَوْلُهٗ بَيْنَهُمَا : এখানে هُمَا যমীর পূর্ববর্তী اَلنُّسُكَيْنِ-এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। نُسُكَيْنِ দ্বারা ব্যাখ্যাকার উমরা ও হজকে বুঝিয়েছেন।

قَوْلُهٗ فَلَا يَكُوْنُ اِلْمَامُهٗ صَحِيْحًا : ব্যাখ্যাকার ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলতে চান যে, কোনো তামাত্তু‘কারী উমরা করার পর যদি হালাল না হয়ে মুহরিম অবস্থায় পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যায় এবং পুনরায় ফিরে এসে হজ আদায় করে, তাহলে তার এ পরিজনের নিকট গমনকে সত্যিকারের গমন ধরা হবে না। কারণ, সে এখানে হজের কর্তব্যের

অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরূপ মুহরিম অবস্থায় যদি কেউ উমরা ও হজের মধ্যবর্তী সময়ে বাড়িতে ঘুরে আসে, তাহলে এটাকে পৃথক সফর ধরা হয় না, ফলে তার হজ তামাত্তু' হবে।

এর দৃষ্টান্ত হলো এরূপ– কোনো তামাত্তু'কারী উমরার ইহরাম বেঁধে কুরবানির পশু হাঁকিয়ে নিয়ে বায়তুল্লায় গিয়ে উমরার কাজ শেষ করল। কিন্তু ১০ তারিখের পূর্বে তার জন্য কুরবানি করা হালাল নেই। তাই সে উমরার ইহরাম থেকেও হালাল হতে পারছে না। অথচ হজের সময় আরো ১০ দিন বাকি। এ অবস্থায় সে তার বাড়িতে গিয়ে পরিজনের সাথে দেখা করল। তার হজ তামাত্তু' হবে। উমরা ও হজের মধ্যবর্তী সফর সত্যিকার অর্থে সফর হয়নি। কারণ, সে মুহরিম থাকায় সাধারণ জীবনযাপন করতে পারেনি, এটাকেই ব্যাখ্যাকার لَا يَكُوْنُ اِلْمَامُهُ صَحِيْحًا বলেছেন।

قَوْلُهُ كَانَ مُتَمَتِّعًا : উক্ত ইবারতে হজ্জে তামাত্তু' পালনকারীর হাদীর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি হাদী জবাই করার জন্য কুরবানির দিন পর্যন্ত রেখে দেয় যা তার জন্য ওয়াজিব, তখন সে তামাত্তু'কারী হবে। আর যদি উমরার সময় কুরবানির দিনের পূর্বেই জবাই করে এবং পরে বাড়ি চলে যায়, তখন তার উপর কিছুই আবশ্যক হবে না। চাই সে বছর হজ করুক বা না করুক। আর যদি হজও করল না এবং বাড়ি ও পৌছল না, তাহলেও কোনো কিছু আবশ্যক হবে না। আর যদি বাড়ি না যায় এবং হজ করে, তাহলে তার উপর দুটি দম দেওয়া আবশ্যক হবে– একটি তামাত্তু'র দম আর অপরটি এজন্য যে, সে হাদীর জানোয়ারকে যথা সময়ের পরিবর্তে অন্য সময়ে জবাই করেছে।

قَوْلُهُ فَاِنْ طَافَ لَهَا اَقَلَّ الخ : এখানে উমরার তওয়াফ একত্রে করার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যদি কেউ হজের মাসের পূর্বে উমরার তওয়াফের সাত চক্করের তিন চক্কর বা আরো কম চক্কর তওয়াফ করে এবং হজের মাসে বাদ-বাকি চক্কর তওয়াফ করে [এবং হজ করে] তবে হজ্জে তামাত্তু' হবে। এর সূত্র এই যে, হজ্জে তামাত্তু' তখনই আদায় হয় যদি হজের মাস তথা শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজের মাসসমূহের ভিতরে [একই সফরে] হজ ও উমরা আদায় করা হয়। এবার যদি কেউ রমজানে উমরা করে জিলহজে হজ করে তার হজ তামাত্তু' হবে না। রমজানে ইহরাম বেঁধে মাসের শেষ ভাগে মক্কায় প্রবেশ করল এবং শাওয়াল মাস আরম্ভ হবার পূর্বেই যদি অধিকাংশ চক্কর তওয়াফ করে, তবুও তামাত্তু' হবে না। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠতার পূর্ণতা শেষ ভাগে হয়। অবশ্য যদি চার চক্করের কম তওয়াফ করে এবং শাওয়াল মাসে অবশিষ্ট চক্কর তওয়াফ করে, তবে তা হজ্জে তামাত্তু' হবে।

قَوْلُهُ فَقَوْلُهُ فَقَدْ اَلَمَّ ذِكْرُ الْمَلْزُوْمِ الخ : ব্যাখ্যাকার এখানে মুসান্নিফ (র.)-এর একটি সংক্ষিপ্ত উক্তির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, তামাত্তু'কারী যদি উমরা করার সময় কুরবানির পশু হাঁকিয়ে নিয়ে না যায় এবং উমরা শেষে হালাল হয়ে পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হয়, তাহলে তার হুকুম কি হবে? এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন– فَقَدْ اَلَمَّ অর্থাৎ সে তার পরিজনের সাথে সত্যিকার অর্থেই মিলিত হয়েছে। কিন্তু মুসান্নিফ (র.) তাঁর এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন– فَبَطَلَ تَمَتُّعُهُ অর্থাৎ 'ঐ ব্যক্তির তামাত্তু' বাতিল হয়ে গেছে।' কারণ, উমরা ও হজের মাঝে ইলমাম হলে তামাত্তু' হয় না। এটাকে ব্যাখ্যাকার এভাবে বলেছেন– فَقَوْلُهُ فَقَدْ اَلَمَّ ذِكْرُ الْمَلْزُوْمِ وَقَصْدُ اللَّازِمِ وَهُوَ بُطْلَانُ التَّمَتُّعِ

অর্থাৎ মুসান্নিফের উক্তি 'সত্যিকার অর্থেই সে পরিজনের সাথে মিলিত হয়েছে' দ্বারা এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, তার তামাত্তু' বাতিল হয়ে গেছে।

اِلْمَام صَحِيْح-এর স্বরূপ : তামাত্তু'কারী যদি কুরবানির পশু হাঁকিয়ে না নেয় এবং উমরা থেকে হালাল হয়ে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যায়, তবে এটাকে اِلْمَام صَحِيْح বলে। এর দ্বারা তামাত্তু' বাতিল হয় এবং উক্ত হজ ইফরাদ হিসেবে গণ্য হয়।

اِلْمَام غَيْر صَحِيْح-এর স্বরূপ : তামাত্তু'কারী যদি উমরার সময় কুরবানির পশু হাঁকিয়ে নেয় এবং উমরা শেষ করে পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হয়, তবে এটাকে اِلْمَام غَيْر صَحِيْح বলে। কারণ, সে তখনও মুহরিম থাকে। এর দ্বারা তামাত্তু' নষ্ট হয় না।

كُوفِيٌّ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهٖ فِيْهَا اَىْ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَسَكَنَ بِمَكَّةَ اَوْ بَصْرَةَ وَحَجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ لِاَنَّ السَّفَرَ الْاَوَّلَ لَمْ يَنْتَهِ بِرُجُوْعِهٖ اِلٰى بَصْرَةَ فَصَارَ كَاَنَّهٗ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمِيْقَاتِ وَلَوْ اَفْسَدَهَا وَ رَجَعَ عَنِ الْبَصْرَةِ وَقَضَاهَا وَحَجَّ لَا لِاَنَّ حُكْمَ السَّفَرِ الْاَوَّلِ لَمَّا بَقِىَ بِالرُّجُوْعِ اِلَى الْبَصْرَةِ فَصَارَ كَاَنَّهٗ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ وَلَا تَمَتُّعَ لِلسَّاكِنِ بِمَكَّةَ اِلَّا اِذَا اَلَمَّ بِاَهْلِهٖ ثُمَّ اَتٰى بِهِمَا لِاَنَّهٗ لَمَّا اَلَمَّ بِاَهْلِهٖ ثُمَّ رَجَعَ وَاَتٰى بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ كَانَ هٰذَا اِنْشَاءُ سَفَرٍ لِاِنْتِهَاءِ السَّفَرِ الْاَوَّلِ بِالْاِلْمَامِ فَاجْتَمَعَ نُسُكَانِ فِىْ سَفَرٍ وَاحِدٍ فَيَكُوْنُ مُتَمَتِّعًا وَاَىَّ اَفْسَدَ اَتَمَّهٗ بِلَا دَمٍ اَىْ مَنِ اعْتَمَرَ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامِهٖ فَاَيُّهُمَا اَفْسَدَ مَضٰى فِيْهِ لِاَنَّهٗ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوْجُ مِنْ عُهْدَةِ الْاِحْرَامِ اِلَّا بِالْاَفْعَالِ وَسَقَطَ دَمُ التَّمَتُّعِ لِاَنَّهٗ لَمْ يَتَرَفَّقْ بِاَدَاءِ النُّسُكَيْنِ الصَّحِيْحَيْنِ فِىْ سَفَرٍ وَاحِدٍ .

অনুবাদ : যেমন– জনৈক কূফাবাসী হজের মাসসমূহের ইহরাম বাঁধল, অতঃপর উমরা করে হালাল হয়ে গেল, অতঃপর মক্কায় অথবা বসরায় গিয়ে অবস্থান করল এবং [সময় মতো] হজ করল, তবে সে তামাত্তু'কারী হবে। কারণ, বসরা গমন করার কারণে তার প্রথম সফর শেষ হয়নি সে যেন মীকাতের বাহিরে যায়নি। কিন্তু যদি উমরা ভঙ্গ করে [বসরায় গিয়ে কিছুদিন অবস্থান করে এবং] আবার বসরা হতে আগমন করে উমরার কাজা করে এবং হজ করে, তাহলে সে তামাত্তু'কারী হবে না। কারণ, বসরা গমন করার কারণে যেহেতু তার প্রথম সফর বাতিল হয়নি, তবে সে যেন মক্কার বাইরে যায়নি, অথচ মক্কাবাসীদের জন্য তামাত্তু' নেই। অবশ্য সে যদি পরিবারের সাথে ইলমাম করে এবং পরে উমরা ও হজ করে [তবে তামাত্তু'কারী হবে]। কেননা, সে যখন তার পরিবারের সাথে ইলমাম করেছে এবং দেশ হতে মক্কার দিকে গমন করেছে এবং হজ ও ওমরা করেছে, তখন তা তার জন্য নতুন সফর হলো। কেননা, ইলমামের কারণে তার প্রথম সফর সমাপ্ত হয়েছে, এখন আবার এক সফরে দুই নুসুক জমা হয়েছে। অতএব, সে তামাত্তু'কারী বলে গণ্য হবে। হজ ও উমরার মধ্যে যেটাই বাতিল করবে তাকে দমবিহীন পূর্ণ করবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজের মাসে উমরা করল এবং সে বছরই হজ করল, এ দুটি হতে যেটাই [কোনো কারণে] ভঙ্গ হয়, তার অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করে যাবে। কারণ, অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করা ব্যতিরেকে হালাল হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন তামাত্তু'-এর দম ওয়াজিব হবে না। কারণ, একই সফরে দুটি সহীহ নুসুক সে আদায় করেনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ كُوْفِيٌّ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهٖ الخ : উক্ত ইবারতে হজ্জে তামাত্তু'র ব্যাপারে মতভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ কূফাবাসী বলে মক্কার বাহিরের লোক বুঝানো হয়েছে, সে যে-কোনো দেশের লোক হোক না কেন। অনুরূপ

বসরা বলতে শুধু বসরাই সীমিত নয় ; বরং তার নিজ শহর ব্যতীত অন্য যে-কোনো শহর চাই মদিনা হোক অথবা রিয়াদ যেখানেই সে পৌছুক না কেন। মূল বিষয় এই যে, মক্কা ব্যতীত অন্য কোনো দেশের যেমন কূফা বা বাংলাদেশী কোনো ব্যক্তি উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করল এবং উমরা করল, এরপর হলক করে হালাল হয়ে গেল এবং তা হজের মাসেই করেছে। অতঃপর সে হজের সময় পর্যন্ত মক্কাতেই অবস্থান করেছে অথবা বাংলাদেশ বা ভারতে চলে গেছে যা তার দেশ নয়, তাহলে তার তামাত্তু' বাতিল হবে না। তবে তাতে মতপার্থক্য রয়েছে যে, বহিরাগত লোক যদি বাহিরে চলে যায় তাহলে এক রেওয়ায়েত মতে সর্বসম্মতভাবে সে তামাত্তু'কারী হবে না, আর অপর বর্ণনানুসারে সে ইমাম সাহেবের মতে তামাত্তু'কারী হবে। সাহেবাইনের মতে তামাত্তু'কারী হবে না। সাহেবাইনের দলিল হচ্ছে, যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম মীকাত হতে বাঁধবে আর হজের ইহরাম মক্কা হতে বাঁধবে, তখন সে তামাত্তু'কারী হবে। আর যার হজ ও উমরা উভয়ের ইহরাম মীকাত হতে হবে, সে তামাত্তু'কারী হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বাড়িতে ফিরে না যাবে তার প্রথম সফর রহিত হবে না। সুতরাং যখন একই সফরে দু'টি ইবাদত তথা হজ ও ওমরা পাওয়া যায় তখন তা হজ্জে তামাত্তু' হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ اَفْسَدَهَا وَ رَجَعَ الخ : এখানে হজ্জে তামাত্তু' না হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। মনে করুন কোনো কূফাবাসী হজের মাসে উমরার ইহরাম বাঁধল। উমরার কাজ সমাপ্ত করার পূর্বেই সে স্ত্রীসহবাস বা শিকার করার মাধ্যমেই ইহরাম ভঙ্গ করল এবং ইরাকে গিয়ে অবস্থান করল। অতঃপর মক্কায় পৌছে তার ভঙ্গ করা উমরার কাজা করল, অতঃপর হজ করল, তাহলে সে তামাত্তু'কারী হবে না। এর কারণ এই যে, তার ইরাকের দিকে যাওয়ার কারণে তার সফর বাতিল হয়নি ; যেন সে মক্কা হতে বের হয়নি। আর এটা সুস্পষ্ট যে, মক্কাবাসীর জন্য তামাত্তু' নেই।

قَوْلُهُ اِلَّا اِذَا اَلَمَّ بِاَهْلِهِ الخ : এখানে তামাত্তু' হজের একটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কোনো বাংলাদেশি উমরা ভঙ্গ করে পাকিস্তান না গিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসে এবং পুনরায় সে মক্কায় পৌছে ভঙ্গ করা উমরা কাজা করে এবং হজ করে, তবে সে তামাত্তু'কারী হবে। এর কারণ এই যে, সে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করার কারণে তার প্রথম সফর বাতিল হয়ে গেছে। অতঃপর সে নতুনভাবে সফর আরম্ভ করে সে একই সফরে ভঙ্গ করা উমরার কাজা করল এবং সে বছর হজ করল। অর্থাৎ একই সফরে দুই নুসুক আদায় করল, তাহলে অবশ্যই সে তামাত্তু'কারী হবে।

قَوْلُهُ وَاَىُّ اَفْسَدَ الخ : এখানে হজ্জে তামাত্তু'র দম রহিত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি হজ অথবা উমরা কিংবা উভয়ই ভঙ্গ করে, তবে যা ভঙ্গ করছে তার অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ করেই হালাল হতে পারবে, এজন্য তার প্রতি কোনো দম দেওয়া আবশ্যক হবে না। কারণ, সে দু নুসুক এক সফরে আদায় করেনি। অবশ্য ভঙ্গ করার অপরাধের জন্য জরিমানাস্বরূপ একটি দম দিতে হবে, যাতে সে ভবিষ্যতে এ রকম আর না করে।

بَابُ الْجِنَايَاتِ

إِنْ تَطَيَّبَ مُحْرِمٌ عُضْوًا اَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ اَوِ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ اَىْ اِسْتَعْمَلَ الدُّهْنَ فِى عُضْوٍ ثُمَّ الْاِدِّهَانُ اِنْ كَانَ بِزَيْتٍ خَالِصٍ اَوْ بِخَلٍّ خَالِصٍ يَجِبُ الدَّمُ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ) وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) اِنْ اِسْتَعْمَلَهُ فِى الشَّعْرِ يَجِبُ الدَّمُ وَاِنْ اِسْتَعْمَلَهُ فِىْ غَيْرِهٖ فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ اَمَّا الدُّهْنُ الْمُتَطَيِّبُ كَدُهْنِ الْبِنَفْسَجِ وَنَحْوِهٖ فَيَجِبُ الدَّمُ اِتِّفَاقًا لِلتَّطَيُّبِ ـ

পরিচ্ছেদ : [হজের ব্যাপারে] নিষিদ্ধ কার্যাবলি

অনুবাদ : মুহরিম [ইহরামকারী] যদি পূর্ণ একটি অঙ্গে সুগন্ধি লাগায় বা মাথায় খেজাব অথবা মেহেদি লাগায় অথবা যাইতুনের তেল লাগায় তথা পূর্ণ একটি অঙ্গে তেল মালিশ করে। আবার তেল যদি খাঁটি যাইতুনের অথবা খাঁটি তিলের হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তেল যদি চুলে লাগানো হয়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। সাহেবাইনের মতে সদকা ওয়াজিব হবে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তেল যদি চুলে লাগানো হয়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য চুল ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে লাগালে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সুবাসযুক্ত বনফসজ ইত্যাদি ধরনের তেল লাগালে সুবাসের কারণে সকলের মতেই দম ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ الْجِنَايَاتِ : এখানে جِنَايَاتٌ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার এ পরিচ্ছেদে ঐ সকল আহকামের বর্ণনা করেছেন যা মুহরিম নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার দরুন হয়ে থাকে। جِنَايَاتٌ যা جِنَايَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– নাফরমানিতে জড়িত হওয়া। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার যখন মুহরিমের প্রকার এবং তার আহকামের বর্ণনা হতে অবসর গ্রহণ করলেন, তখন ঐ সকল আহকামের বর্ণনা আরম্ভ করলেন যা মুহরিম ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। جِنَايَةٌ বা নিষিদ্ধ কর্মের প্রকার ও প্রক্রিয়া অনেক বিধায় বহুবচন তথা جِنَايَاتٌ নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنْ تَطَيَّبَ مُحْرِمٌ : শরহে বিকায়া কিতাবের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে طَيَّبَ مُحْرِمٌ-এর শব্দ আছে এবং এটাই উত্তম বলে মনে হয়। কেননা– تَطَيَّبَ শব্দ لَازِمٌ ; এজন্য قَوْلُهُ عُضْوًا-এর عُضْوًا তা مَفْعُوْل নয় ; বরং تَمْيِيْز এভাবে যে, সুগন্ধি লাগানোর সম্পর্ক মুহরিমের দিকে করা হবে। আর طَيَّبَ দ্বারা প্রত্যেক ঐ জিনিস বুঝানো হয়েছে যার সুগন্ধি আছে। যেমন– গোলাপ, বনফসজ, রায়হান, চামেলি ইত্যাদি।

قَوْلُهُ عُضْوًا الخ : এ ইবারতের মাধ্যমে গ্রন্থকার সুগন্ধি ব্যবহারের সেই পরিমাণ বর্ণনা করেছেন, যাতে দম ওয়াজিব হয় একটি পূর্ণ অঙ্গ বলতে হাত, মাথা অনুরূপকে বুঝায়। ইমাম মাযনী 'মানাসিকে হজ' নামক কিতাবে বলেছেন, যদি মুহরিম তার সমস্ত অঙ্গে সুগন্ধি লাগায়, তখন সমস্ত দেহ এক জাতীয় হিসেবে একই দম আবশ্যক হবে। আর যদি দেহের বিভিন্ন

অঙ্গে সুগন্ধি লাগানো হয়, তাহলে বিভিন্ন অঙ্গ মিলিয়ে যদি এক পূর্ণ অঙ্গের সমান হয়, তাহলেও একটি দমই ওয়াজিব হবে, নতুবা সদকা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ "يَجِبُ الدَّمُ" : মুসান্নিফ (র.) -এর উক্তি يَجِبُ الدَّمُ পূর্ববর্তী একটি শর্তের জাযা হয়েছে। শর্তের মধ্যে মুসান্নিফ (র.) ৩টি جِنَايَة -এর কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে সংশ্লিষ্ট মুহরিমের উপর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি পশু জবাই করা ওয়াজিব হয়। জিনায়াত ৩টি হলো–

১. মুহরিম যদি তার কোনো পূর্ণ অঙ্গে সুগন্ধি লাগায়।

২. মেহেদি দ্বারা যদি মাথার চুল রঙিন করে।

৩. খাঁটি যাইতুন বা খাঁটি তিলের তেল যদি পূর্ণ একটি অঙ্গে ব্যবহার করে– ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ঐ ব্যক্তির উপর একটি পশু জবাই করা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, সদকাও ওয়াজিব হবে।

এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য করে বলেন, তেল যদি সে তার চুলে ব্যবহার করে, তবে তার উপর 'দম' ওয়াজিব হবে। কিন্তু চুল ছাড়া সে যদি অন্য যে-কোনো অঙ্গে তেল ব্যবহার করে, তাতে তার উপর কিছুই আবশ্যক হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, সুগন্ধিযুক্ত তেল ব্যবহার করলে সকলের ঐকমত্যে দম ওয়াজিব হবে। কারণ, সুগন্ধি ব্যবহারে যে দম ওয়াজিব হয় এতে কারো দ্বিমত নেই।

قَوْلُهُ بِالْحِنَّاءِ الخ : اَلْحِنَّاءُ শব্দের حَا -এর নীচে যের এবং উপরে যবর উভয়ই সহীহ হবে এবং نُوْن -এর উপর তাশদীদযুক্ত ও তাশদীদবিহীন উভয়ই সহীহ। অর্থ– মেহেদি। তা গাছবিশেষ, যার পাতা সবুজ, একে পিষে মেয়েরা তাদের হাত-পা রঙিন করে। ইমাম বায়হাকী (র.) দুর্বল সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন যে, মেহেদি সুগন্ধিযুক্ত জিনিস। কিন্তু তাকে সুগন্ধিযুক্ত মেনে নিলে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যদি তা সুগন্ধি হয় তাহলে তাকে সুগন্ধির বর্ণনায় উল্লেখ করার কথা ছিল, তাকে পৃথক করে বর্ণনা করার কারণ কি? এর জবাবে বলা যায় যে, মেহেদি সুগন্ধি কিনা তাতে মতভেদ রয়েছে, এজন্য তাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যায়তুন ও তিলের তেল ব্যবহার করার বিধান : কোনো মুহরিম যদি খাঁটি যায়তুনের তেল বা খাঁটি তিলের তেল ব্যবহার করে, তবে উভয়ের প্রকৃতিতেই সুগন্ধ রয়েছে বিধায় ইমাম সাহেবের মতে দম ওয়াজিব হবে। এজন্য এর সাথে বনফসজ ও গোলাপ মিশিয়ে সুবাসিত তেল তৈরি করা হয়। যদি যায়তুন ও তিলের তেলের সাথে অন্য সুগন্ধি নাও মিশানো হয়, তথাপি এগুলোতে একপ্রকার ঘ্রাণ থাকায় এদের ব্যবহারে মলিনতা দূর হয় এবং চুলের সজীবতা বাড়ে, অন্য কোনো তেলে এগুলো নেই।

সাহেবাইন (র.)-এর মতে, এ সকল জিনিস ব্যবহারে দম ওয়াজিব হয় না ; বরং সদকা ওয়াজিব হয়। কেননা, এগুলো সুগন্ধি নয়, যদিও সুগন্ধির মৌলিক জিনিস হোক না কেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, এ তেল চুল ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গে লাগালে কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর আম্বর ইত্যাদি সুগন্ধি জাতীয় তেল ব্যবহারে অবশ্যই দম ওয়াজিব হবে, যদিও ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হোক না কেন। অনুরূপভাবে এগুলো চুলে লাগালেও দম ওয়াজিব হবে। কেননা, তা দ্বারা চুলের পরিচর্যা বাড়ে এবং মলিনতা দূরীভূত হয়।

اَوْ لَبِسَ مَخِيْطًا اَوْ سَتَرَ رَأْسَهُ يَوْمًا اَوْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ اَوْ مَحَاجَمَهُ اَوْ اِحْدٰى اِبِطَيْهِ اَوْ عَانَتَهُ اَوْ رَقَبَتَهُ اَوْ قَصَّ اَظْفَارَ يَدَيْهِ اَوْ رِجْلَيْهِ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اَوْ يَدٍ اَوْ رِجْلٍ اَوْ طَافَ لِلْقُدُوْمِ اَوْ لِلصَّدْرِ جُنُبًا اَوْ لِلْفَرْضِ مُحْدِثًا اَوْ اَفَاضَ عَنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْاِمَامِ اَوْ تَرَكَ اَقَلَّ سَبْعِ الْفَرْضِ اَىْ تَرَكَ ثَلٰثَةَ اَشْوَاطٍ اَوْ اَقَلَّ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَيَتْرُكُ اَكْثَرَهُ بَقِىَ مُحْرِمًا حَتّٰى يَطُوْفَ اَىْ اِنْ تَرَكَ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ اَوْ اَكْثَرَ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ بَقِىَ مُحْرِمًا حَتّٰى يَطُوْفَ ـ

অনুবাদ : অথবা সেলাই করা কাপড় পরিধান করে বা পূর্ণ একদিন মাথা ঢেকে রাখে, বা মাথার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ মুণ্ডিয়ে, কিংবা শিঙ্গা লাগাবার জায়গা মুণ্ডিয়ে, অথবা দু বগলের এক বগল মুণ্ডিয়ে, বা নাভির নীচের পশম মুণ্ডিয়ে, বা ঘাড়ের পশম মুণ্ডিয়ে, বা একই স্থানে বসে দু হাতের নখ কেটে, কিংবা দু পায়ের নখ কেটে, অথবা এক হাত এবং এক পায়ের নখ কেটে, কিংবা [গোসল ওয়াজিব ছিল অথচ] গোসল না করে অপবিত্র অবস্থায়ই তাওয়াফে কুদূম বা তাওয়াফে সদর করল, অথবা অজুবিহীন অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করল, কিংবা ইমামের আগেই আরাফাহ হতে প্রস্থান করল, অথবা ফরজ সাত তওয়াফের [তাওয়াফে যিয়ারতের] কিছু অংশ ছেড়ে দেয় অর্থাৎ তিন প্রদক্ষিণ বা তার কম তাওয়াফে যিয়ারত ছেড়ে দেয়, [তাহলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে] আর যদি সে তিনের অধিক সংখ্যক তওয়াফ ছেড়ে দেয়, তাহলে সে ছেড়ে দেওয়া তওয়াফসমূহ পূর্ণ করা পর্যন্ত মুহরিম থেকে যাবে। অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারতের ৪টি তওয়াফ কিংবা তার চেয়েও বেশি সংখ্যক ছেড়ে দেয়, তাহলে ছেড়ে দেওয়া তওয়াফ পূর্ণ করা পর্যন্ত সে মুহরিম থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْ لَبِسَ مَخِيْطًا الخ : উক্ত ইবারতে সেলাইকৃত জামা পরিধান করা এবং মাথা ঢেকে রাখার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কোনো মুহরিম তার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী সেলাই করা কাপড় পরিধান করে, তাহলে তার দম ওয়াজিব হবে। তবে আস্তিনে হাত না ঢুকিয়ে সেলাইকৃত জামা যদি কাঁধের উপর রাখে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু প্রয়োজন ব্যতীত তাও মাকরূহ। তেমনিভাবে যদি পূর্ণ একদিন বা একরাত্র বা অর্ধদিন বা অর্ধরাত্র মাথা ঢেকে রাখে, তবে দম ওয়াজিব হবে। আর মাথা ঢাকা টুপি দ্বারা হোক বা অন্য কোনো সেলাইবিহীন কাপড় দ্বারা হোক একই হুকুম হবে। অর্থাৎ দম দেওয়া ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ اَوْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ الخ : ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডানো ক্ষতিকর। মাথা মুণ্ডানোর ব্যাপারে মাথার এক-চতুর্থাংশ গ্রহণযোগ্য। তবে যে সকল অঙ্গ মুণ্ডানোর ব্যাপারে আংশিক মুণ্ডানোর রীতিনীতি নেই, যেমন– বগল মুণ্ডানো অথবা নাভির নীচ মুণ্ডানো অথবা শিঙ্গা লাগানোর স্থান বা ঘাড়ের পশম মুণ্ডানো ইত্যাদি যাতে আংশিক মুণ্ডানোর নিয়ম নেই, এ সকল স্থানে এক-চতুর্থাংশ মুণ্ডানো গ্রহণযোগ্য হবে না ; বরং পূর্ণ বগল, পূর্ণ নাভির নীচ, পূর্ণ ঘাড় মুণ্ডানোই ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ الخ : উল্লেখ্য যে, একই মজলিসে যদি দু হাত বা দু পায়ের নখ অথবা এক হাতের বা এক পায়ের নখ কর্তন করে, তবে দম ওয়াজিব হবে। আর উল্লিখিত নখ কর্তন করার মজলিস বিভিন্ন হলেও একই হুকুম হবে। তবে এক মজলিসে এক হাতের নখ কর্তন করার পর কাফফারা আদায় করে দেওয়া স্বতন্ত্র ব্যাপার, তা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। শায়খাইনের মতে, হাত পা চারটির নখ চার মজলিসে কাটলে চারটি দম ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ مُحْدِثًا : ফরজ তওয়াফ ওয়াজিব তওয়াফ হতে শক্তিশালী। সুন্নত তওয়াফ এবং নফল তওয়াফও ওয়াজিব তওয়াফের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, নফল ও সুন্নত আরম্ভ করার দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং অজুবিহীন ফরজ তওয়াফ করাও অপরাধ, যার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু দেহে অথবা-কাপড়ে নাপাক থাকা অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করলে তা মাকরূহ হবে। আর তাওয়াফে কুদূম বা তাওয়াফে সদর যদি অজুবিহীন করে, তবে দম ওয়াজিব হবে না। অবশ্য এ সকল তওয়াফ جَنَابَتٌ অবস্থায় করলে দম ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ اَوْ اَفَاضَ عَنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْاِمَامِ : অত্র বর্ণনায় قَبْلَ الْاِمَامِ বলতে সূর্যাস্তের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করা বুঝানো হয়েছে। মূলকথা এই যে, ইমামের জন্য সূর্যাস্তের পর আরাফাহ হতে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা করা উচিত। আর অন্যান্য লোকগণ ইমামের পরে রওয়ানা করবে, তাতে কারো উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। এ নিয়মের বিপরীত ইমাম যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফাহ হতে প্রস্থান করে, আর লোকেরাও যদি ইমামের অনুসরণে সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফাহ হতে মুযদালিফার দিকে প্রস্থান করে, তাহলে প্রত্যেকেরই উপর দম ওয়াজিব হবে। আর ইমাম সূর্যাস্তের পূর্বে প্রস্থান করল আর অন্যান্য লোকগণ ইমামের অনুসরণ করল না তখন তাদের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, তারা অন্যায়ের অনুসরণ হতে বিরত রয়েছে, তা তাদের অপরাধ নয়।

قَوْلُهُ اَوْ تَرَكَ اَقَلَّ سَبْعٍ الخ : তাওয়াফে যিয়ারত যা ফরজ। এর সাত চক্করের কিছু অংশ তথা তিন চক্কর বা তার কম ছেড়ে দিলে দম ওয়াজিব হবে। আর অধিকাংশ তাওয়াফে যিয়ারত তথা চার চক্কর অথবা ততোধিক ছেড়ে দিলে তা পূর্ণ করার পূর্ব পর্যন্ত সে মুহরিম থাকবে। যদি আংশিক তওয়াফ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যায়, তবে সে বাড়ি হতে ফিরে এসে অবশিষ্ট তওয়াফ পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব। অন্যথা সে ব্যক্তি আজীবন মুহরিম থেকে যাবে। কেননা, তাওয়াফে যিয়ারতের বিকল্প কোনো জিনিস নেই।

اَوْ طَوَافَ الصَّدْرِ اَوْ اَرْبَعَةً مِنْهُ اَوِ السَّعْىَ اَوِ الْوُقُوْفَ بِجَمْعٍ اَوِ الرَّمْىَ كُلَّهُ اَوْ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ اَوِ الرَّمْىَ الْاَوَّلَ اَوْ اَكْثَرَهُ وَهُوَ رَمْىُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ اَوْ حَلَقَ فِىْ حِلٍّ لِحَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ فَاِنَّ الْحَلْقَ اِخْتَصَّ بِمِنًى وَهُوَ مِنَ الْحَرَمِ لَا فِىْ مُعْتَمِرٍ رَجَعَ مِنْ حِلٍّ ثُمَّ قَصَرَ اَىْ اِنْ خَرَجَ الْمُعْتَمِرُ مِنَ الْحَرَمِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ ثُمَّ عَادَ اِلَيْهِ وَقَصَرَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَاِنَّمَا خُصَّ بِالْمُعْتَمِرِ لِاَنَّ الْحَاجَّ اِنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ ثُمَّ عَادَ اِلَى الْحَرَمِ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ اَوْ قَبَّلَ اَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ اَنْزَلَ اَوْ لَا اِعْلَمْ اَنَّ قَوْلَهُ اَوْ قَبَّلَ لَيْسَ مَعْطُوْفًا عَلٰى قَوْلِهٖ ثُمَّ قَصَرَ بَلْ هُوَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ اَوْ حَلَقَ فِىْ حِلٍّ ـ

অনুবাদ : অথবা তাওয়াফে সদর ছেড়ে দিল, বা তাওয়াফে সদরের চার চক্কর ছেড়ে দিল, বা সায়ী ছেড়ে দিল, বা মুযদালিফায় অবস্থান ছেড়ে দিল, বা পূর্ণ কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দিল, অথবা একদিনের কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দিল, অথবা প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দিল, বা তার অধিকাংশ ছেড়ে দিল। আর জামরায়ে আকাবার কঙ্কর নিক্ষেপকে প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপ বলে, যা কুরবানির দিন করা হয়। অথবা হিল-এর মধ্যে হজ বা উমরার ইহরাম হতে হালাল হওয়ার জন্য হলক করল। কেননা, হলক মিনার সাথে নির্ধারিত, আর মিনা হেরেমের অন্তর্ভুক্ত। ঐ উমরাকারীর উপর দম ওয়াজিব হবে না, যিনি হিল হতে ফিরে এসে হেরেমে চুল কাটিয়েছেন। অর্থাৎ যদি উমরাকারী উমরার কাজ হতে অবসর হয়ে হালাল হওয়ার পূর্বে হেরেম হতে বের হয় অতঃপর হিল হতে হেরেমে ফিরে এসে হলক বা কসর করে, তখন তার উপর [দম বা সদকা] কিছুই ওয়াজিব হবে না। দম ওয়াজিব হওয়ার সাথে উমরাকারীকে এজন্য খাস করা হয়েছে যে, হাজী যদি হালাল হওয়ার পূর্বে হেরেম হতে বের হয়ে যায় এবং পরে হেরেমের দিকে ফিরে আসে, তখন তার উপর দম ওয়াজিব হবে। অথবা [দম ওয়াজিব হবে] আসক্তির সাথে স্ত্রীকে চুম্বন করলে বা স্পর্শ করলে, বীর্যপাত হোক বা না হোক। জেনে রেখ যে, গ্রন্থকারের উক্তি اَوْ قَبَّلَ তা ثُمَّ قَصَرَ -এর উপর আতফ হয়নি ; বরং اَوْ حَلَقَ فِىْ حِلٍّ -এর উপর আতফ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْ طَوَافَ الصَّدْرِ الخ **:** এখানে তাওয়াফে সদর, সায়ী ও মুযদালিফায় অবস্থান ও কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেওয়া এবং হিল অঞ্চলে হলক করার বিধান সংবলিত ৫টি জিনায়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এগুলোর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হলো।

১. **তাওয়াফে সদর ছেড়ে দেওয়া :** তাওয়াফে সদরকে 'তাওয়াফে বিদা' বা 'বিদায়ী তওয়াফ'ও বলা হয়। এ প্রকার তওয়াফ মক্কার বাহিরের হাজীদের জন্য ওয়াজিব। কোনো হাজী যদি এ তওয়াফ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে, কিংবা ৭ চক্করের মাঝে ৪ চক্কর ত্যাগ করে, তবে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু সে যদি ৪ চক্করের কম যেমন- ৩ বা দু-এক চক্কর ছেড়ে দেয়, তবে তার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। ফলে তার উপর কোনো দম ওয়াজিব হবে না

২. সায়ী ত্যাগ করা : সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী জায়গায় ৭ বার দৌড়ানোকে সায়ী বলে। সায়ী করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। সুতরাং কেউ যদি সায়ী ত্যাগ করে তবে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। হ্যাঁ, ২ কিংবা ৩ চক্কর ছেড়ে দিলে দম ওয়াজিব হয় না। তবে এটা অনুচিত।

৩. মুযদালিফায় অবস্থান ত্যাগ করা : মুসান্নিফ (র.) اَلْوُقُوْفُ بِجَمْعٍ দ্বারা اَلْوُقُوْفُ بِمُزْدَلِفَةٍ বুঝিয়েছেন। যেহেতু হাজীগণ মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা'র নামাজ جَمْع করে অর্থাৎ একত্রে এক আজানে আদায় করে, তাই মুযদালিফাকে جَمْع বলা হয়েছে। এটা করা ওয়াজিব, ছেড়ে দিলে দম ওয়াজিব হবে।

৪. কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেওয়া : হাজীদের জন্য ১০ জিলহজে জামরায়ে আকাবায় ৭টি ও ১১ তারিখে ৩ জামরায় ৭টি করে ২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেওয়ার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন–

ক. সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা।

খ. যে-কোনো একদিনের কঙ্কর নিক্ষেপ ত্যাগ করা।

গ. প্রথম দিন তথা ১০ তারিখের কঙ্কর নিক্ষেপ সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ ত্যাগ করা। তবে 'হিদায়া' প্রণেতার মতে, ১০ তারিখের পরে যদি কেউ জামরায়ে আকাবার কঙ্কর নিক্ষেপ ত্যাগ করে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কারণ, ২১টির মধ্যে কেবল ৭টি ত্যাগ করেছে। কাজেই তার উপর সদকা আবশ্যক হবে। কিন্তু প্রথম দিন যেহেতু ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়, তাই এ দিন ৩টির বেশি ত্যাগ করলে দম দিতে হবে।

৫. হিল অঞ্চলে হলক করা : প্রকাশ থাকে যে, হেরেম-এর সীমানার বাহিরের সংলগ্ন এলাকাকে হিল বলা হয়। এখানে 'হিল অঞ্চল' বলে মূলত 'হেরেম শরীফের বাহিরের অঞ্চল' বুঝানো উদ্দেশ্য। উমরাকারী হোক কিংবা হজ; নিয়ম হলো হেরেমের অভ্যন্তরে 'মিনা' নামক স্থানে হলক তথা মাথার চুল কামানো; এখন তাদের কেউ যদি হিল-এর মধ্যে হলক বা কসর করে, তবে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ لَا فِيْ مُعْتَمِرٍ الخ : এখানে হজ ও উমরা পালনকারীর হেরেম হতে বের হওয়ার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। উমরাকারী যদি উমরার কার্যক্রম হতে অবসর হয়ে হালাল হওয়ার পূর্বে হেরেম হতে বাহিরে চলে যায়, অতঃপর হেরেমে ফিরে এসে হলক অথবা কসর করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি হজ পালনকারী অনুরূপ করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর এ দম ওয়াজিব হওয়া তখনই যখন ঈদের দিনসমূহের পরে হিল হতে হেরেমে ফিরে আসে। কেননা, হলক বা কসর যথা সময় হতে পিছিয়ে গেছে। এজন্য দম ওয়াজিব হবে। আর যদি ঈদের দিনসমূহে ফিরে এসে হলক করে, তবে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ اَوْ قَبَّلَ اَوْ لَمَسَ الخ : এখানে ইহরাম অবস্থায় চুম্বন ও নারী স্পর্শ করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আসক্তির সাথে চুম্বন করা এবং স্পর্শ করা হচ্ছে সহবাসের উপকরণ। এজন্য দম দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে, চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। আর যদি আসক্তিবিহীন অবস্থায় স্পর্শ করে অথবা কোনো চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সহবাস করে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত বীর্যপাত না হবে, দম ওয়াজিব হবে না।

أَوْ أَخَّرَ الْحَلْقَ أَوْ طَوَافَ الْفَرْضِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ أَوْ قَدَّمَ نُسُكًا عَلٰى أٰخَرَ كَالْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْيِ أَوْ نَحَرَ الْقَارِنُ قَبْلَ الرَّمْيِ أَوِ الْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ فَعَلَيْهِ دَمٌ هٰذَا جَوَابُ الشَّرْطِ وَهُوَ قَوْلُهُ إِنْ تَطَيَّبَ مُحْرِمٌ عُضْوًا ـ

অনুবাদ : অথবা হলক বা তাওয়াফে যিয়ারতকে কুরবানির দিন হতে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা এক নুসুককে অন্য নুসুকের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন– কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে হলক করা, কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে কিরান অথবা তামাত্তু' হজকারীর কুরবানি করা, অথবা জবাইয়ের পূর্বে হলক করা ইত্যাদি অবস্থায় তার উপর দম ওয়াজিব হবে। তা جَوَاب شَرْط আর শর্ত হলো তাঁর উক্তি– إِنْ تَطَيَّبَ مُحْرِمٌ عُضْوًا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أَوْ أَخَّرَ الْحَلْقَ الخ **:** এখানে এক নুসুক অপর নুসুকের উপর এগিয়ে বা পিছিয়ে দেওয়ার হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হাজী যদি তাওয়াফে যিয়ারত কুরবানির দিনসমূহের পরে করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু উমরাকারী যদি সেরূপ করে তবে যেহেতু তার জন্য কোনো নির্ধারিত সময়সীমা নেই, তাই তার জিম্মায় কিছুই আবশ্যক হবে না। হাজী যদি কোনো পূর্বের কাজ পরে বা পরের কাজ পূর্বে করে; যেমন– রমীর পূর্বে হলক করল বা মাথা মুণ্ডাল কিংবা জবাই করার পূর্বে হলক করল, তাহলে তার জিম্মায় দম ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ كَالْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْيِ الخ **:** এখানে হজের কাজে অগ্রপশ্চাৎ রক্ষা করার বিধান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, কুরবানির দিন তথা জিলহজের দশম তারিখে চারটি কাজ ওয়াজিব। যথা– ১. কঙ্কর নিক্ষেপ করা, ২. জবাই করা, ৩. মাথা মুণ্ডানো এবং ৪. তাওয়াফে যিয়ারত করা। এ কার্যাদির মধ্যে প্রথম তিনটিতে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা অত্যাবশ্যক। আর এ ধারাবাহিকতা ওয়াজিব। এ কার্যাদির মধ্যে যদি পূর্বেরটা পরে এবং পরেরটা পূর্বে করে বসে, তবে দম ওয়াজিব হবে। এটা কিন্তু হজ্জে কিরান এবং হজ্জে তামাত্তু'-এর বিধান। কিন্তু হজ্জে ইফরাদ হলে তাতে পাথর নিক্ষেপ এবং হলকে ধারাবাহিকতা আবশ্যক। কেননা, হজ্জে ইফরাদ পালনকারীর উপর জন্তু জবাই করা ওয়াজিব নয়। তা ছাড়া হজ্জে ইফরাদ পালনকারী যদি পাথর নিক্ষেপ এবং হলকের আগে তাওয়াফে যিয়ারত করে, তবুও তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কারণ, বর্ণিত ধারাবাহিকতা দুটি কাজে তথা পাথর নিক্ষেপ এবং হলকে, আর তাওয়াফে যিয়ারতের কোনো ধারাবাহিকতা নেই। তারতীব কেবল রমী এবং হলকেই আছে।

قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ الخ **:**

সকল جِنَايَة **-এর হুকুম প্রসঙ্গে :** অত্র পরিচ্ছেদের প্রথম হতে এ পর্যন্ত যত প্রকারের জিনায়াতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে মুহরিম অবস্থায় যদি সর্বপ্রকার জিনায়াতের যে-কোনো একটি অপরাধ করে, তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ, তাকে ক্ষতিপূরণের জন্য একটি বকরি বা দুম্বা জবাই করতে হবে। তবে এ একটি বকরি বা দুম্বা কুরবানির মোকাবিলায় একটি উটের এক-সপ্তামাংশ দেওয়া জায়েজ কিনা? এ ব্যাপারে ফিকহশাস্ত্র বিশারদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে তা বৈধ।

اَللُّبَابُ গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে جِنَايَة ইচ্ছাকৃত করুক অথবা ভুলবশত করুক, প্রথমবার করুক বা দ্বিতীয়বার করুক, স্মরণ থাকা অবস্থায় করুক বা স্মরণ না থাকা অবস্থায় করুক, জেনে-শুনে করুক অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় করুক, বেহুঁশ অবস্থায় করুক অথবা হুঁশে করুক, অভাব অবস্থায় করুক অথবা সচ্ছল অবস্থায় করুক, নিজে করুক অথবা তার নির্দেশে অন্য কেউ করুক, এ সকল অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। جِنَايَة প্রকাশিত হলেই دَمٌ ওয়াজিব হবে।

فَيَجِبُ دَمَانِ عَلٰى قَارِنٍ اِنْ حَلَقَ قَبْلَ ذَبْحِهٖ دَمٌ لِلْحَلْقِ قَبْلَ اَوَانِهٖ وَ دَمٌ لِتَاخِيْرِ الذَّبْحِ عَنِ الْحَلْقِ وَعِنْدَهُمَا دَمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْاَوَّلُ فَقَطْ وَاِنْ تَطَيَّبَ اَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ اَوْ سَتَرَ رَأْسَهٗ اَوْ لَبِسَ مَخِيْطًا اَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ اَوْ حَلَقَ اَقَلَّ مِنْ رُبُعِ رَأْسِهٖ اَوْ قَصَّ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَظْفَارٍ اَوْ خَمْسَةً مُتَفَرِّقَةً اَوْ طَافَ لِلْقُدُوْمِ اَوْ لِلصَّدْرِ مُحْدِثًا اَوْ تَرَكَ ثَلٰثَةً مِنْ سَبْعِ الصَّدْرِ اَوْ اِحْدٰى جِمَارِ الثَّلَاثِ وَهِيَ مَا يَلِيْ مَسْجِدَ الْخَيْفِ اَوْ مَا يَلِيْهِ اَوِ الْعَقَبَةِ فِيْ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ اَوْ حَلَقَ رَأْسَ غَيْرِهٖ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ـ

অনুবাদ : অতঃপর কিরান হজকারীর উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে, যদি সে জানোয়ার জবাই করার পূর্বে হলক করে। একটি দম সময়ের পূর্বে হলক করানোর কারণে, আর দ্বিতীয় দম জবাইকে হলক হতে পিছিয়ে দেওয়ার কারণে। আর সাহেবাইনের নিকট শুধু একটি দম ওয়াজিব হবে, তা প্রথম দম। আর যদি এক অঙ্গ হতে কমের মধ্যে সুগন্ধি লাগানো হয়, বা একদিনের কম মাথা ঢেকে রাখল, বা একদিনের কম সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করল, বা মাথার এক-চতুর্থাংশের কম হলক করল, অথবা পাঁচ নখের কম কাটল, অথবা ভিন্ন ভিন্নভাবে পাঁচ নখ কাটল, অথবা অজুবিহীন অবস্থায় তাওয়াফে কুদূম বা তাওয়াফে সদর করল, অথবা তাওয়াফে সদরের সাত চক্করের তিন চক্কর ছেড়ে দিল, অথবা তিন জামরার এক জামরার কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দিল, যা মসজিদে খাইফের নিকবর্তী বা তার নিকটবর্তী, অথবা কুরবানির দিনের পর কোনো দিন জামরায়ে আকাবার কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দিল, অথবা অন্য কারো মাথা মুণ্ডাল, তাহলে এ সকল অবস্থায় অর্ধ সা' গম সদকা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَعِنْدَهُمَا دَمٌ وَاحِدٌ الخ : উক্ত ইবারতে হজের নুসুক পূর্বাপর করার বিধানের ব্যাপারে মতানৈক্য বর্ণনা করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সাহেবাইনের মতে শুধু تَقْدِيْم তথা পূর্বে নেওয়ার উপর দম ওয়াজিব হবে। হিদায়ার মুসান্নিফ এবং তাঁর অনুসারীগণও এ অর্থ করেছেন। কিন্তু এ অর্থটি ঠিক নয় ; বরং সহীহ ভাবার্থ এই যে, ইমাম সাহেবের নিকট পূর্বাপর করার মধ্যেও শুধু একটি দম ওয়াজিব হবে, আর দ্বিতীয় দম কিরান বা তামাত্তু' হজের কারণে পূর্বেই ওয়াজিব হয়েছে। কাজেই উভয়টি جِنَايَة-এর দম নয় ; বরং একটি দম جِنَايَة-এর আর একটি দম শোকরের। আর সাহেবাইনের মতে যেহেতু কোনো কিছুর পূর্বাপর হওয়ার কারণে ইবাদত ওয়াজিব হয় না, এজন্য তাদের নিকট শুধু একটি দম অর্থাৎ কিরান হজের দম অথবা শোকরের দম দায়িত্বে আসবে।

قَوْلُهٗ وَاِنْ تَطَيَّبَ اَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ الخ : এখানে মুসান্নিফ (র.) এমন সব জিনায়েতের কথা উল্লেখ করেছেন যার কোনোটিতে জড়িয়ে পড়লে মুহরিমকে অর্ধ সা' অর্থাৎ পৌনে দু সের গম বা তার সমমূল্যের অর্থ সদকা করা আবশ্যক হবে। তবে দম ওয়াজিব হবে না। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, হজের কোনো ওয়াজিব কাজ যদি ছুটে যায় তবেই কেবল দম ওয়াজিব হয়, আর সুন্নত কাজ ছুটে গেলে কিংবা ওয়াজিব কাজ ত্রুটিপূর্ণভাবে আদায় করলে সদকা ওয়াজিব হয়। বলাই বাহুল্য, এরূপ মাসআলায় কোনো কোনো ইমামের দ্বিমত থাকতেই পারে।

১. কোনো অঙ্গের তুলনামূলক কম জায়গা জুড়ে সুগন্ধি লাগাবে। যেমন– কেউ হাতের তালুতে একটু সুগন্ধি লাগাল। হাত বলতে আমরা অঙ্গুলি থেকে কনুই পর্যন্ত অংশকে বুঝি। এটা একটি অঙ্গ। আর তালু, এর এক-চতুর্থাংশের সমান। এমতাবস্থায় তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে।

২. ১ দিনের চেয়ে কম সময় ধরে মাথা ঢেকে রাখলে কিংবা সেলাই করা কাপড় পরে থাকলে সদকা ওয়াজিব হবে। যেমন– কেউ ৪ ঘণ্টা কি ৫ ঘণ্টা মাথা ঢেকে রাখল, কিংবা এ পরিমাণ সময় সেলাইকৃত কাপড় পরে থাকল।

৩. মাথার এক-চতুর্থাংশের কম মুণ্ডালে সদকা ওয়াজিব হবে।

৪. ৫ আঙ্গুলের চেয়ে কম তথা ১, ২, ৩ কিংবা ৪ আঙ্গুলের নখ কাটলে সদকা ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে কেউ যদি ভিন্ন হাত-পায়ের বিক্ষিপ্ত ৫ আঙ্গুলের নখ কাটে। যেমন– কেউ ডান হাতের ২টি, বাম হাতের ১টি ও দু পা থেকে ১টি করে মোট ৫টি নখ কাটল, তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। বিক্ষিপ্তভাবে যদি ৫টির কম নখ কাটে, তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

৫. কোনো মুহরিম অজুবিহীন তাওয়াফে কুদূম কিংবা তাওয়াফে সদর করলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে অজুসহই তওয়াফ করল, তবে তাওয়াফে সদর-এর ৭ চক্করের মাঝে ৩টি বা তিনের কম তওয়াফ ছেড়ে দিল তার উপরও সদকা ওয়াজিব হবে।

৬. কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য ৩টি জামরাহ রয়েছে। ১টি মসজিদে খায়েফের সন্নিকটে, আরেকটি এরই সংলগ্ন, অন্যটি দ্বিতীয়টির পরবর্তীতে অবস্থিত, যাকে 'জামরায়ে আকাবা' বলে। ১০ তারিখে কেবল জামরায়ে আকাবায় ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়। কাজেই ১০ তারিখের পূর্ণ রমী ছেড়ে দিলে দম ওয়াজিব হয়ে যাবে।

কিন্তু ১১ কিংবা ১২ তারিখে কেউ যদি যে-কোনো ১টি জামরায় রমী ত্যাগ করে, তবে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। কারণ, ১০ তারিখের পরে প্রতিদিন ৩ জামরায় ৭টি করে মোট ২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়; এর মাঝে কোনো এক জামরায় ৭টি কঙ্কর ত্যাগ করলেও অর্ধেকের বেশি আদায় হয়, যার দ্বারা ওয়াজিব পূর্ণ হয়ে যায়। ওয়াজিব যেহেতু নষ্ট হয় না, তাই দম ওয়াজিব হবে না।

৭. কোনো মুহরিম অন্য কারো মাথার চুল মুণ্ডিয়ে দিলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। চাই মুণ্ডিত ব্যক্তি মুহরিম হোক বা গাইরে মুহরিম হোক।

قَوْلُهُ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ : মুসান্নিফ (র.) -এর ভাষায় উল্লিখিত জিনায়াতের কোনো একটি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় করলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। সদকার পরিমাণ হবে অর্ধ সা' গম। দেশী ওজনে পৌনে দু সেরের সমান গম কিংবা পৌনে দু সের গমের মূল্যও পরিশোধ করা যাবে। বলাই বাহুল্য, জিনায়াতের সদকার বিধান সদকাতুল ফিতরের বিধানের অনুরূপ।

وَاِنْ تَطَيَّبَ اَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ اَىْ تَطَيَّبَ عُضْوًا اَوْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهٖ ذَبَحَ اَوْ تَصَدَّقَ بِثَلٰثَةِ اَصْوُعٍ طَعَامٍ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ اَوْ صَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَ وَطْئُهٗ وَلَوْ نَاسِيًا قَبْلَ وُقُوْفِ فَرْضٍ يُفْسِدُ حَجَّهٗ وَيَمْضِىْ وَيَذْبَحُ وَيَقْضِىْ وَلَمْ يَفْتَرِقَا اَىْ لَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُفَارِقَهَا فِىْ قَضَاءِ مَا اَفْسَدَاهُ وَعِنْدَ مَالِكٍ (رحـ) يُفَارِقُهَا اِذَا خَرَجَا مِنْ بَيْتِهَا وَعِنْدَ زُفَرَ (رحـ) اِذَا اَحْرَمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) اِذَا بَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِىْ وَاقَعَهَا فِيْهِ.

অনুবাদ : যদি কোনো ওজরের কারণে দেহের এক পূর্ণ অঙ্গে সুগন্ধি লাগাল অথবা মাথার এক-চতুর্থাংশ মুণ্ডাল, তাহলে জবাই করবে অথবা তিন সা' খাদ্য ছয় মিসকিনের মধ্যে সদকা করবে, অথবা তিনদিন রোজা রাখবে। আর আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীসহবাস করা হজকে নষ্ট করে দেবে, যদিও ভুলবশত সহবাস করুক না কেন। এমতাবস্থায় হজের কাজ পালন করে যাবে এবং জবাই করবে। আর পরে হজের কাজা করবে এবং কাজার সময় উভয়ে পৃথক হবে না। অর্থাৎ তার উপর নষ্ট হওয়া হজের কাজা করার সময় স্বীয় স্ত্রী হতে পৃথক থাকা ওয়াজিব নয়। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, যখন স্বামী-স্ত্রী হজের কাজা করার জন্য ঘর হতে বের হবে, তখন স্বামী স্ত্রী হতে পৃথক থাকবে। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে, যখন স্বামী-স্ত্রী হজের কাজার জন্য ইহরাম বাঁধে তখন তারা পৃথক হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ঐ স্থানে পৌঁছে স্ত্রী হতে পৃথক হয়ে যাবে যেখানে পূর্বে [গতবার] স্ত্রীসহবাস করেছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنْ تَطَيَّبَ اَوْ حَلَقَ الخ : উক্ত ইবারতে বিশেষ কোনো ওজরের কারণে সুগন্ধি ব্যবহার ও মাথা মুণ্ডানোর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যদি বিশেষ কোনো ওজরের কারণে পূর্ণ এক অঙ্গে সুগন্ধি লাগাল অথবা মাথার এক-চতুর্থাংশ মুণ্ডাল, যেমন– মাথায় বেশি উকুন হলে বা মাথাব্যথা করলে বা জখম হলে বা ফোঁড়া হলে অথবা জ্বর হলে অর্থাৎ কোনো মুহরিম যদি এমন ধরনের কোনো ওজরবশত সুগন্ধি লাগায় বা মাথা মুণ্ডায়, তবে এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনটি কাজের যে-কোনো একটি কাজ করতেই হবে। যেমন– একটি জন্তু জবাই করতে হবে বা তিন সা' অর্থাৎ দশ সের গমের খাদ্য ছয়জন মিসকিনের মধ্যে বিতরণ করতে হবে, অথবা তিনটি রোজা রাখবে। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ.

অর্থাৎ "হাদী যথাস্থানে পৌছার পূর্বে তোমরা হলক করবে না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা তার মাথায় কোনো অসুবিধা আছে [যাতে সে সুগন্ধি লাগায় বা মাথা মুণ্ডায়] তখন সে ফিদিয়া হিসেবে রোজা রাখবে, অথবা সদকা করবে, অথবা কুরবানি করবে।"

এ আয়াত হযরত কা'ব ইবনে আজরা (রা.)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন তাঁর মাথায় অধিক পরিমাণে উকুন হলো এবং তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। এটি হুদায়বিয়ার বছরের ঘটনা। মহানবী ﷺ তাঁকে মাথা হলক করার অনুমতি দিলেন এবং তাঁকে

এখতিয়ার দিলেন যে, চাই তিনি একটি বকরি জবাই করেন বা ছয়জন মিসকিনকে খাবার দেবেন। প্রত্যেক মিসকিনের জন্য অর্ধ সা' হবে। অথবা তিনি তিনটি রোজা রাখবেন। সিহাহ সিত্তাহ প্রণেতাগণ এভাবেই বর্ণনা করেছেন। তবে যদি কেউ ওজর ব্যতীত ইচ্ছাকৃত কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়, তবে খাবার দেওয়া বা রোজা রাখা ওয়াজিব হবে না ; বরং তার উপর দম অথবা সদকা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَ وَطْئُهُ وَلَوْ نَاسِيًا الخ : অত্র ইবারতে বলা হচ্ছে যে, কোনো মুহরিম যদি আরাফায় অবস্থান করার পূর্বে স্ত্রীসহবাস করে, তবে তার হজ ভঙ্গ হয়ে যাবে, যার কোনো বিকল্প নেই। তা সে ইচ্ছাকৃতভাবে করুক বা ভুলবশত করুক হজ ভঙ্গ হবেই। আগামীতে এর কাজা ছাড়া কোনো উপায় নেই। তবে আপাতত হজ ভঙ্গ হলেও তার জন্য নির্দেশ এই যে, সে হজের অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি অন্যান্য হাজীদের ন্যায় পালন করে যাবে এবং পশু জবাই করবে, আর আগামী বছর এ হজ পুনরায় কাজা করবে।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَفْتَرِقَا الخ : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, পূর্বের বছর স্বামী-স্ত্রী সহবাস করার কারণে যে হজকে নষ্ট করে দিয়েছে, এ বছর তা কাজার সময় স্বামী-স্ত্রী পৃথক থাকা কর্তব্য, যাতে তাদের মধ্যে পূর্ববর্তী সহবাসের ঘটনা পুনরায় না ঘটে। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তাদের পরস্পরে পৃথক হতে হবে না। এজন্য যে, পূর্বের বছর তাদের হজ নষ্ট হওয়ার কারণে তারা এমনিতেই সতর্ক থাকবে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে যখন তারা হজের কাজার জন্য ঘর হতে বের হয় তখন হতে পৃথক থাকা আবশ্যক বলে ব্যক্ত করেন। ইমাম যুফার (র.)-ও স্বামী-স্ত্রী পৃথক থাকার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে তাদের ইহরামের সময় পৃথক হওয়া আবশ্যক; তার পূর্বে নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত এই যে, তারা পূর্বের বছর যে স্থানে সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল, সে স্থানে পৌঁছে উভয়ে পৃথক হয়ে যাবে; তার পূর্বে নয়। কিন্তু তা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পূর্ব অভিমত। পরে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা :

১. صَاعٌ : এটি একটি আরবি পরিমাপ। আমাদের দেশের পরিমাপে সাড়ে তিন সের ওজনে এক صَاعٌ হয়।

২. مِسْكِيْن : মিসকিন ঐ ব্যক্তিকে বলে, যার সামান্য পরিমাণ সম্পদও নেই।

وَبَعْدَ وُقُوْفِهِ لَمْ يَفْسُدْ وَتَجِبُ بَدَنَةٌ وَبَعْدَ الْحَلْقِ شَاةٌ وَفِى عُمْرَتِهِ قَبْلَ طَوَافِهِ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ مُفْسِدٌ لَهَا فَمَضَى وَ ذَبَحَ وَقَضَى وَبَعْدَ اَرْبَعَةٍ ذَبَحَ وَلَمْ تَفْسُدْ اَىْ وَطْئُهُ فِى عُمْرَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ مُفْسِدٌ لِلْعُمْرَةِ فَيَجِبُ الْمَضِىُّ فِيْهَا وَالذَّبْحُ وَالْقَضَاءُ وَبَعْدَ اَرْبَعَةِ اَشْوَاطٍ يَجِبُ بِهِ الذَّبْحُ وَلَا تَفْسُدُ بِهِ الْعُمْرَةُ فَاِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدًا اَوْ دَلَّ عَلَيْهِ قَاتِلَهُ بَدْءًا اَوْ عَوْدًا اَىْ سَوَاءٌ كَانَ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَوْ لَا سَهْوًا اَوْ عَمْدًا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَلَوْ سَبُعًا اَىْ وَلَوْ كَانَ الصَّيْدُ سَبُعًا اَوْ مُسْتَانِسًا اَوْ حَمَامًا مُسَرْوَلًا اَوْ هُوَ مُضْطَرٌّ اِلَى اَكْلِهِ وَجَزَاؤُهُ مَا قَوَّمَهُ عَدْلَانِ فِى مَقْتَلِهِ اَوْ اَقْرَبَ مَكَانٍ مِنْهُ اَىْ اِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيْمَةٌ فِى مَقْتَلِهِ يُقَوَّمُ فِى اَقْرَبِ مَكَانٍ مِنْ مَقْتَلِهِ تَكُوْنُ لَهُ فِيْهِ قِيْمَةٌ ـ

অনুবাদ : আর আরাফায় অবস্থানের পরে সহবাস করলে হজ নষ্ট হবে না, কিন্তু উট কুরবানি ওয়াজিব হবে। হলকের পর তাওয়াফে সদরের পূর্বে সহবাস করলে বকরি ওয়াজিব হবে। উমরার মধ্যে চার চক্কর তওয়াফ করার পূর্বে সহবাস করলে উমরা ফাসেদ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি উমরার অবশিষ্ট কাজ পালন করবে এবং জবাই করবে, পরবর্তী বছর উমরার কাজা করবে। আর উমরার তওয়াফের চার চক্করের পরে সহবাস করার দ্বারা উমরা বিনষ্ট হবে না। অর্থাৎ উমরার মধ্যে চার চক্কর তওয়াফের পূর্বে স্ত্রীসহবাস করলে তা উমরাকে বিনষ্ট করে দেবে। অতঃপর উমরার বাকি কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং জবাই করা ও পরে কাজা করা ওয়াজিব হবে। আর চার চক্কর তওয়াফের পরে সহবাস করলে জবাই ওয়াজিব হবে, তবে উমরা বিনষ্ট হবে না। অতঃপর মুহরিম যদি শিকারকে মেরে ফেলে অথবা শিকারিকে শিকারের সন্ধান অবগত করিয়ে দেয়; চাই তা প্রথমবার হোক বা দ্বিতীয়বার হোক, ভুলবশত হোক বা ইচ্ছাকৃত হোক, সর্বাবস্থায় তার প্রতিকার ওয়াজিব হবে। যদিও শিকার বন্য হোক বা গৃহপালিত হোক বা পায়ে পালকবিশিষ্ট কবুতর হোক অথবা মুহরিম তা খাওয়ার ব্যাপারে বাধ্য হোক, তাহলে তার বিনিময় তা হবে, যা দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তার জবাইকৃত স্থানে বা তার নিকটবর্তী স্থানের মূল্য নির্ধারণ করবে। অর্থাৎ তার জবাই করার স্থানে যদি তার মূল্য না থাকে, তাহলে তার নিকটবর্তী এমন স্থানের মূল্য নির্ধারণ হবে যেখানে তার মূল্য আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَبَعْدَ وُقُوْفِهِ لَمْ يَفْسُدْ الخ : এ ইবারতের মাধ্যমে মুহরিম আরাফায় অবস্থান করার পর যদি সহবাস করে, তবে তার কি বিধান হবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যদি মুহরিম আরাফায় অবস্থান করার পর সহবাস করে, তাহলে তার হজ বিনষ্ট হবে না। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করে তার হজ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কেননা, তা হজের বড় রোকন। এখন যদি মুযদালিফায় অবস্থানের পূর্বে সহবাস করে, তাহলে একটি উট জবাই করবে। আর যদি হলকের পরে তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সহবাস করে, তাহলে একটি বকরি ওয়াজিব হবে। মোটকথা হচ্ছে, সঠিকভাবে আরাফায় অবস্থান করার পরের অপরাধের বিনিময় প্রদান সম্ভব। আর সহবাসের পর হজের কাজ যত কম অবশিষ্ট থাকবে অপরাধও তত কম হবে, তার বিনিময়ও তত কম হবে।

قَوْلُهُ مُفْسِدٌ لِلْعُمْرَةِ الخ : মুহরিম যদি সাত চক্কর তওয়াফের মধ্যে চার চক্কর তওয়াফ করার পূর্বে স্ত্রীসহবাস করে, তাহলে তার উমরা বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা, এ সময় তার তওয়াফের اَكْثَرِيَّتْ তথা আধিক্য পাওয়া যায়নি। অতএব, لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ কায়দা অনুসারে তার উমরা বাতিল হওয়ার কথা।

قَوْلُهُ اَوْ دَلَّ عَلَيْهِ قَاتِلَهُ : উক্ত ইবারতে جَزَاء ওয়াজিব হওয়ার একটি নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। মুহরিম যদি কোনো শিকারিকে শিকার দেখিয়ে দেয়, যাতে শিকারি শিকার মেরে ফেলে, তখন মুহরিমের উপর جَزَاء বা প্রতিদান ওয়াজিব হবে। ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতে সমস্ত সাহাবী এরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হুকুম তখন হতে পারে, যদি মুহরিম শিকারিকে শিকার দেখিয়ে দিয়েছে এবং শিকারি তাকে শিকার করে জবাই করেছে আর তখন মুহরিম ইহরাম অবস্থায় আছে। আর যদি মুহরিম শিকারিকে শিকার দেখিয়ে দিয়ে শিকার করার পূর্বেই হালাল হয়ে যায় অথবা শিকার দেখিয়ে দেওয়ার পর শিকারি যদি তাকে না মারে, তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ بَدْءًا اَوْ عَوْدًا الخ : এখানে মুহরিম হতে যে-কোনো অপরাধ হলে তার বিনিময় আবশ্যক হবে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ উপরোল্লিখিত অপরাধ মুহরিম হতে প্রথমবার প্রকাশ হোক বা দ্বিতীয়বার সে তাতে লিপ্ত হোক, তা এজন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, পুনরায় অপরাধকারীর উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ অর্থাৎ 'যে দ্বিতীয়বার এরূপ করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিশোধ নেবেন।' এর উত্তরে বলা হয় যে, প্রথমবার অপরাধ করার মোকাবিলায় দ্বিতীয়বার অপরাধ করা অধিক অপরাধ। এজন্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার প্রতিশোধ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন।

قَوْلُهُ سَهْوًا اَوْ عَمْدًا الخ : এখানে মুহরিম যে-কোনো অবস্থায় অপরাধ করলে বিনিময় আবশ্যক হবে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মুহরিম যে-কোনো অবস্থায় جِنَايَة তথা অপরাধ করলে তাকে جَزَاء বা প্রতিদান দিতে হবে, চাই তার অপরাধ ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক, ভুলে হোক বা অমনোযোগ অবস্থায় হোক বা বাধ্য হয়ে হোক। তবে ইচ্ছাকৃত হলে গুনাহ হবে, আর অনিচ্ছাকৃত হলে আল্লাহ মাফ করে দেবেন।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الصَّيْدُ سَبُعًا الخ : এখানে নখ দ্বারা শিকারকারী প্রাণীর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। নখ দ্বারা শিকারকারী প্রাণী হত্যা করলেও جَزَاء ওয়াজিব হবে। তবে তার جَزَاء এক বকরির অধিক হবে না। মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.)-এর মতে, এরূপ প্রাণী হত্যার কারণে মুহরিমের উপর কিছু কর্তব্য হবে না। অথচ মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.)-এর অভিমত হিংস্র প্রাণীর ব্যাপারে।

قَوْلُهُ اَوْ مُسْتَانِسًا । لخ : যে সকল পশুকে পোষ মানানো হয়েছে, যেমন– পালা হরিণ। সুতরাং যা জন্মগতভাবে বন্য একে লালনপালন করে পোষ মানালেও তা শিকার করলে বিনিময় দিতে হবে।

قَوْلُهُ اَوْ هُوَ مُضْطَرٌّ اِلٰى اَكْلِهِ الخ : এখানে মুহরিম যদি শিকার করতে বাধ্য হয় এবং শিকার করে তবে তার বিধান কি সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যদি কোনো মুহরিম খাদ্য-পানীয়ের অভাবে ক্ষুধার তাড়নায় শিকার হত্যা করে খেয়ে ফেলে, তবে এমতাবস্থায় সে যেহেতু বাধ্য, তাই গুনাহ হবে না সত্য, তবে বিনিময় প্রদান কিন্তু বাতিল হবে না। সুতরাং বাধ্য হয়ে শিকার করলেও বিনিময় দিতে হবে।

قَوْلُهُ فِيْ مَقْتَلِهِ الخ : শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুসান্নিফ (র.) একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। আর তা হলো, দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যেখানে শিকার বধ করা হয়েছে ঠিক সেখানেই মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

এর কারণ হলো, স্থানভেদে একই শিকারের দাম কমবেশ হয়ে থাকে। তাই যেখানে শিকার বধ করা হয়েছে ঐ স্থানের দামই জায়া হিসেবে ধার্য করা হবে। কিন্তু তা সম্ভব না হলে ঐ স্থানের নিকটবর্তী কোনো স্থান বেছে নিতে হবে, যেখানে ঐ শিকারের মূল্য নির্ধারণ সম্ভব।

لٰكِنَّ فِى السَّبُعِ لَا يَزِيْدُ عَلٰى شَاةٍ ثُمَّ لَهٗ اَنْ يَشْتَرِىَ بِهٖ هَدْيًا وَيَذْبَحَهٗ بِمَكَّةَ اَوْ طَعَامًا وَيَتَصَدَّقُ عَلٰى كُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ لَا اَقَلَّ مِنْهُ اَوْ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِيْنٍ يَوْمًا وَاِنْ فَضُلَ عَنْ طَعَامِ مِسْكِيْنٍ تَصَدَّقَ بِهٖ اَوْ صَامَ يَوْمًا هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَاَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَالشَّافِعِىِّ (رحـ) فَاِنْ كَانَ لِلصَّيْدِ مِثْلٌ صُوْرَةً يَجِبُ ذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : কিন্তু বন্য হিংস্র পশুর جزاء একটি বকরির দামের অধিক ধরা হবে না। অতঃপর মুহরিমের এখতিয়ার রয়েছে যে, এর দামে একটি হাদী ক্রয় করে তাকে মক্কা শরীফে জবাই করবে। অথবা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে মিসকিনদের মধ্যে এভাবে সদকা করবে যে, প্রতি মিসকিনকে অর্ধ সা' করে দেবে, অথবা পূর্ণ এক সা' খেজুর বা যব সদকা করবে, তার কম যেন না হয়। অথবা প্রত্যেক মিসকিনের খাদ্যের পরিবর্তে একটি করে রোজা রাখবে। আর যদি খাদ্যদ্রব্যের কিছু অবশিষ্ট থাকে তা সদকা করে দেবে বা একদিন রোজা রাখবে। এটা শায়খাইনের অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে যদি শিকারের আকৃতিগত তুল্য থাকে, তাহলে তা ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ لَا يَزِيْدُ عَلٰى شَاةٍ : ইবারতে হিংস্র বন্য জন্তু শিকার করার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কোনো হিংস্র বন্য জন্তু তথা বাঘ, ভল্লুক ইত্যাদি শিকার করে, তবে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক এর মূল্য ঠিক করবে। আর তারা যে মূল্য স্থির করবে তা যেন একটি বকরির মূল্যের অধিক না হয় সেদিকে তাদেরকে খেয়াল রাখা আবশ্যক। আর যদি তাদের নির্ধারণকৃত মূল্য একটি বকরির মূল্যের চেয়ে অধিক হয়, তবে শুধুমাত্র সে পরিমাণ মূল্যই আবশ্যক হবে যা দ্বারা একটি কুরবানির পশু ক্রয় করা যায়।

قَوْلُهٗ ثُمَّ لَهٗ اَنْ يَشْتَرِىَ الخ : দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কর্তৃক শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য নির্ধারণের পর তাদের দায়িত্ব শেষ। এবার মুহরিম নিজে জাযা আদায় করবে। এ ক্ষেত্রে কতগুলো বিকল্প কার্য সম্পাদন করে জাযা অধিকার তার থাকবে। যেমন–

১. স্থিরকৃত মূল্যের বিনিময়ে মুহরিম কুরবানির পশু ক্রয় করে মক্কায় গিয়ে তা জবাই করবে।

২. অথবা, বিকল্প হিসেবে সেই মূল্যমানের খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করবে। যেমন– গম, খেজুর, যব ইত্যাদি। এসব খরিদ করে দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তির মাঝে নিম্নবর্ণিত পরিমাণে দান করে দেবে। গম হলে মাথাপিছু পৌনে ২ সের। খেজুর বা যব হলে সাড়ে ৩ সের। নতুবা সমপরিমাণ টাকা প্রদান করবে।

৩. কিংবা বিকল্প হিসেবে রোজা রাখবে। আর রোজা রাখার নিয়ম হলো, একজন মিসকিনকে প্রদেয় খাদ্যের বিপরীতে একটি করে রোজা রাখবে। যেমন– শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য দ্বারা ৮ সের গম কেনা যায়। বিধি মোতাবেক প্রত্যেক মিসকিনকে পৌনে ২ সের করে দিলে চারজনকে ৭ সের দেওয়ার পর আরো ১ সের উদ্বৃত্ত থেকে যায়। কাজেই মুহরিম যদি রোজা রাখতে চায়, তবে তাকে ৫টি রোজা রাখতে হবে। ৪ জন মিসকিনের খাদ্যের বিপরীতে ৪টি আর উদ্বৃত্ত ১ সেরের জন্যে ১টি। উল্লেখ্য, উদ্বৃত্ত খাদ্য যদি সে দান করে দেয়, তাহলে সে ১ টি রোজা থেকে মুক্তি পাবে। অর্থাৎ সে ৪টি রোজা রাখবে।

قَوْلُهُ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) الـخ : মুহরিম কর্তৃক শিকারকৃত প্রাণীর জাযা [বদলা] প্রদানের যে পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হলো এর প্রবক্তা হলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)।

কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুহরিম কর্তৃক বধকৃত প্রাণীর সম আকৃতির প্রাণী পাওয়া গেলে ঐ তুল্য প্রাণী জাযা হিসেবে প্রদান করতে হবে, নতুবা জাযা আদায় হবে না। যেমন– কেউ হরিণ শিকার করল, তার কর্তব্য হবে জাযা হিসেবে গরু কুরবানি করা। সে যদি হরিণের মূল্য বা সম মূল্যের খাদ্য সদকা করে দেয়, তাদের মতে তা শুদ্ধ হবে না।

قَوْلُهُ وَاَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) الـخ : এখানে জন্তু শিকারের বিনিময় প্রদানের ব্যাপারে ইমামদের মতবিরোধ বর্ণনা করা হয়েছে–

১. শিকারি মুহরিম হলে শিকারের সে মূল্য ওয়াজিব হবে যা শিকারের স্থানে ছিল। এটাই শায়খাইনের অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, শিকারের আকৃতির সমান প্রতিদান দিতে হবে, হুবহু তার দাম দেওয়া অত্যাবশ্যক নয়।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মুহরিমকে এখতিয়ার দিতে হবে যে, সে কুরবানির পশু ক্রয় করার বা মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়াবার সামর্থ্য থাকলেও রোজা রাখতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا অর্থাৎ "আর্থিক প্রতিদান প্রদানের সাধ্য থাকা সত্ত্বেও সে তার বিকল্প হিসেবে রোজা রাখতে পারে।" কিন্তু ইমাম যুফার (র.) কসমের কাফ্ফারার উপর কিয়াস করে আর্থিক সামর্থ্য থাকলে রোজা রাখা জায়েজ হবে না বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

৩. খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিকারের মূল্য হতে কম না হয়। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এর সমান অন্য কোনো পশু যা সচরাচর পাওয়া যায় তার মূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪. রোজা রাখলে প্রতি মিসকিনের খাবার তথা অর্ধ সা' -এর জন্য একটি রোজা রাখবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, প্রতি মুদের জন্য এক একটি রোজা রাখবে। প্রতি মুদ আটষট্টি তোলা এবং প্রতি সা'-এ একশত পঁয়ত্রিশ তোলা। ইরাকীদের মতে দু' রতলে এক মুদ হয়, আর হেজাযীদের মতে ১.৭৫ রতলে এক মুদ হয়।

৫. দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি নিহত জানোয়ারের দাম স্থির করবে। তখন মুহরিমকে এখতিয়ার দেওয়া হবে যে, সে স্থিরকৃত দামে কুরবানির পশু ক্রয় করে জবাই করবে, অথবা তার দ্বারা খাবার ক্রয় করে মিসকিনকে খাওয়াবে, অথবা রোজা রাখবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক যখন মূল্য স্থির করবে তখন তা-ই আদায় করা বাঞ্ছনীয় হবে।

قَوْلُهُ فَاِنْ كَانَ لِلصَّيْدِ الـخ : এখানে একই আকৃতিগত প্রাণীর বিনিময় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কুরবানির যে-কোনো প্রাণী নিহত প্রাণীর তুল্য হবে কার্যত তা-ই ওয়াজিব হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আমল যা হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি বাজু নামক বন্য প্রাণীর বিনিময়ে একটি ভেড়া, হরিণের বিনিময়ে একটি বকরি, খরগোশের বিনিময়ে এক বছরের কম একটি বকরির বাচ্চা, বন্য ইঁদুরের বিনিময়ে বকরির চার মাসের বাচ্চা দিয়েছেন। হযরত জাবের (রা.) মহানবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূল ﷺ হতে বাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন, তা কি শিকারি? উত্তরে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন, হ্যাঁ আর এর বিনিময়ে একটি ভেড়া দিতে হবে। তবে মূল্য দিয়ে যদি এসব বিনিময় ক্রয় করা যায়, তখন হানাফী মাযহাব মতে এ সকল রেওয়ায়েত কার্যকর হবে; নতুবা নয়।

فَفِى الظَّبْيِ وَالضَّبْعِ شَاةٌ وَفِى الْاَرْنَبِ عِنَاقٌ وَفِى الْيَرْبُوْعِ جَفْرَةٌ وَفِى النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِى الْحِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَفِى الْحَمَامِ شَاةٌ وَالْمُتَمَسَّكُ فِىْ هٰذَا الْبَابِ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ فَمُحَمَّدٌ (رحـ) وَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) يَحْمِلَانِ الْمِثْلَ عَلَى الْمِثْلِ صُوْرَةً بِدَلِيْلِ تَفْسِيْرِ الْمِثْلِ بِالنَّعَمِ ـ

অনুবাদ : অতএব হরিণ ও গুই সাপের জন্য একটি বকরি, খরগোশের জন্য এক বছর বয়সের একটি বকরির বাচ্চা, বন্য ইঁদুরের জন্য চার মাসের বকরির বাচ্চা, উটপাখির জন্য একটি উট, বন্য গাধার জন্য একটি গরু, কবুতরের জন্য একটি বকরি। এ প্রসঙ্গে দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا .... لِيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ـ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ [কোনো মুহরিম] ইচ্ছাকৃতভাবে শিকারকে হত্যা করে তবে এর বদলা হলো, যে জন্তু হত্যা করেছে তার সদৃশ একটি জীব। এ ব্যাপারে তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক তা স্থির করবে। এ সদৃশ প্রাণী কুরবানির পশুস্বরূপ মক্কায় পাঠাবে বা তার কাফ্ফারাস্বরূপ মিসকিনদের মধ্যে খাবার বিতরণ করবে বা তার পরিবর্তে রোজা রাখবে; যেন সে স্বীয় কৃতকর্মের স্বাদ ভোগ করে। এখানে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) 'মিছাল' শব্দকে আকৃতিগত মিছাল-এর উপর প্রয়োগ করেছেন। কেননা, কুরআন মাজীদে مِثْلُ -এর তাফসীর نَعَمْ দ্বারা করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَفِى الظَّبْيِ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে শিকারকৃত কোন প্রকার প্রাণীর বিপরীতে কোন প্রাণী জাযা বা বদলা হিসেবে প্রদান করতে হবে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করেছেন। যেমন-

১. হরিণ কিংবা 'দ্বব' [গুই সাপ] -এর জাযা হবে একটি বকরি,
২. খরগোশের জাযা হবে একটি এক বছর বয়সী বকরির বাচ্চা,
৩. ইঁদুরের জাযা হবে একটি ৪ মাস বয়সী বকরির বাচ্চা,
৪. উটপাখির জাযা হবে একটি উট,
৫. বন্য গাধার জাযা হবে একটি গরু,
৬. একটি কবুতরের জাযা হবে একটি বকরি।

ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানুসারে মুহরিম ব্যক্তি বর্ণিত পন্থায় শিকারের জাযা বা বদলা আদায় করবে। এ ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ করলে যথেষ্ট হবে না। তাঁদের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার এ বাণী-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ـ

আলোচ্য আয়াতে مِثْل শব্দের তাফসীর করা হয়েছে اَلنَّعَمُ শব্দ দ্বারা। কাজেই জাযা হবে শিকারকৃত প্রাণীর আকৃতির অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণী প্রদান করা; তার মূল্যের অনুরূপ মূল্য প্রদান উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهٗ وَالْمُتَمَسَّكُ فِىْ هٰذَا الْبَابِ الخ : উক্ত ইবারতে ইহরাম অবস্থায় শিকার হত্যা করার শরয়ী বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইহরাম অবস্থায় শিকার হত্যার বিনিময়ের দলিল হিসেবে সূরা আন'আমের আয়াত পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ .... وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ

অর্থাৎ হে বিশ্বাসী সম্প্রদায়! তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকাকালে শিকার হত্যা করো না। যদি কেউ একে স্ব-ইচ্ছায় হত্যা করে, তবে হত্যাকৃত প্রাণীর তুল্য ঐ প্রাণীর বিনিময়ে দিতে হবে। কোন প্রাণী হত্যাকৃত প্রাণীর তুল্য তা স্থির করবে তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক। আর বিনিময়ে প্রাণীটি কুরবানির জন্য নির্ধারিত হিসেবে মক্কায় নিয়ে জবাই করবে, অথবা প্রতি মিসকিনের খাদ্যের পরিবর্তে এক একটি রোজা রাখবে, যাতে মুহরিম তার কৃতকর্মের স্বাদ উপভোগ করে। এ হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আলোচ্য বিষয়ে যে যা অপরাধ করেছে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে যদি সে পুনরায় একই অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রবল প্রতিশোধ গ্রহণকারী। এখানে আল্লাহ তা'আলা যেহেতু হত্যাকৃত প্রাণীর তুলনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন- مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ তাই ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র.) আকৃতিতে তুল্য হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

قَوْلُهُ "يَحْمِلَانِ الْمِثْلَ عَلَى الْمِثْلِ صُوْرَةً" : এখানে মুসান্নিফ (র.) সূরা আন'আমে فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ আয়াতের مِثْل শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র.)-এর তাফসীর উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, مِثْل দ্বারা অনুরূপ আকৃতির প্রাণী উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর কর্মজীবন সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ضَبُع [এক প্রকার বন্যপ্রাণী]-এর জাযা হিসেবে একটি ভেড়া, হরিণের জাযা হিসেবে একটি বকরি, খরগোশের জাযা হিসেবে একটি এক বছরের কিছু কম বয়সী বকরি এবং ইঁদুরের জাযা হিসেবে ৪ মাস বয়সী একটি বকরির বাচ্চা দিয়েছেন।

হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইমাম মালেক (র.) তাঁর মুয়াত্তায় লিখেছেন যে, তাঁরা উটপাখির বদলে একটি উট দেওয়ার কথা বলতেন, একটি ضَبُع -এর বদলে একটি ভেড়া দেওয়ার কথা রাসূল ﷺ বলেছেন, এ মর্মে হযরত জাবের (রা.)-এর বর্ণনা রয়েছে।

প্রশ্ন : এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, একেকটি শিকারের বিপরীতে এক এক রকম প্রাণী নির্ধারণের ভিত্তিটা কি? আকৃতিগত مِثْل থাকার কারণে? না মূল্যের দিক থেকে অনুরূপ হওয়ার কারণে? **উত্তর :** এর উত্তরে ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র.) বলেন, এটা করা হয়েছে مِثْل صُوْرَةً তথা আকৃতিগতভাবে অনুরূপ হওয়ার কারণে। কিন্তু ইমাম আ'যম (র.) বলেন, শিকারকৃত প্রাণীর মূল্যের বিনিময়ে যদি এরূপ সম আকৃতির পশু ক্রয় করা যায়, তাহলে তাদের দাবি মানতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু দাম কাছাকাছি না হলে তাঁদের মত গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَنَحْنُ نَقُولُ اَلْمِثْلُ فِي الضَّمَانَاتِ لَمْ يُعْهَدْ فِي الشَّرْعِ اِلَّا وَاَنْ يُرَادَ بِهِ الْمِثْلُ صُوْرَةً وَمَعْنًى فِي الْمِثْلِيَّاتِ اَوْ مَعْنًى وَهُوَ الْقِيْمَةُ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ اَمَّا الْبَقَرَةُ فَلَمْ تُعْهَدْ مِثْلَ حِمَارِ الْوَحْشِ وَكَذَا الْبَدَنَةُ لِلنَّعَامَةِ وَكَذَا الْبَوَاقِيْ فَقَوْلُهُ مِنَ النَّعَمِ اَيْ كَائِنٌ مِنَ النَّعَمِ فَالْمَعْنٰى اَنَّ الْوَاجِبَ جَزَاءٌ مُمَاثِلٌ لِمَا قَتَلَهُ وَهُوَ الْقِيْمَةُ كَائِنٌ مِنَ النَّعَمِ بِاَنْ يَشْتَرِيَ بِتِلْكَ الْقِيْمَةِ بَعْضَ النَّعَمِ ثُمَّ قَوْلُهُ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ يُؤَيِّدُ هٰذَا الْمَعْنٰى فَاِنَّ التَّقْوِيْمَ يَحْتَاجُ اِلَى رَأْيِ الْعُدُوْلِ وَلَوْلَا التَّقْوِيْمُ اَوَّلًا كَيْفَ يَثْبُتُ الْاِخْتِيَارُ بَيْنَ النَّعَمِ وَالْكَفَّارَةِ وَالصِّيَامِ وَاَيْضًا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيْرٌ مِنَ النَّعَمِ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) وَالشَّافِعِيِّ (رح) يَجِبُ مَا يَجِبُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) اَوَّلًا فَيُحْمَلُ الْمِثْلُ عَلَى الْقِيْمَةِ وَلَا دَلَالَةَ لِلْاٰيَةِ عَلٰى هٰذَا الْمَعْنٰى .

অনুবাদ : আর আমরা বলি যে, শরিয়তে ক্ষতিপূরণ ও জরিমানার তুল্য পাওয়া যায়নি। তবে مِثْل বা তুল্য দ্বারা তুলনাপূর্ণ বস্তুর আকৃতিগত এবং মূল্যগত তুলনা বুঝায়। আর তুলনাবিহীন বস্তুর মধ্যে রূপক তুল্য তথা তুল্য বুঝানো হয়। কিন্তু গাভী বন্য গাধার তুল্য হয় না। অনুরূপ উট উটপাখির তুল্য হয় না। তা ছাড়া অন্যান্য বিষয়েরও একই বিধান। অতএব আল্লাহ তা'আলার বাণী– مِنَ النَّعَمِ তথা كَائِنٌ مِنَ النَّعَمِ অর্থাৎ এরূপ جَزَاء পশুর ওয়াজিব হওয়া যা হত্যাকৃত শিকারের অনুরূপ হবে। আর তা হলো হত্যাকৃত পশুর মূল্য এভাবে যে, তার মূল্য দ্বারা কোনো পশু ক্রয় করা যাবে এবং يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ উপরিউক্ত বক্তব্যকেই সমর্থন করে। যেহেতু মূল্য স্থির করা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী হবে। আর প্রথমে যদি মূল্য সিদ্ধান্ত না হয়, তাহলে পশু, কাফ্ফারা ও রোজার মধ্যে কিভাবে এখতিয়ার [অধিকার] সাব্যস্ত হবে। আর তাও সে শিকারকৃত পশুর সমতুল্য না থাকে তখন ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতেও তা-ই ওয়াজিব হবে, যা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রথম হতে ওয়াজিব। সুতরাং مِثْل শব্দ দ্বারা মূল্যই বুঝানো হবে, তবে আয়াত এ অর্থ বুঝায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اَلْمِثْلُ الخ : এখানে ক্ষতিপূরণের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শরিয়তের দৃষ্টিতে ক্ষতিপূরণ দু প্রকার। যেমন–

১. مِثْلُ ذَوَاتِ الْاَمْثَالِ বা বস্তুর সমজাতীয় বস্তু দ্বারা ক্ষতিপূরণ। তা ঐ সমস্ত বস্তুর মধ্যে সম্ভব যার সমজাতীয় বস্তু পাওয়া যায়। যথা– পরিমাপযোগ্য বস্তু সামগ্রী, আর কাছাকাছি আকৃতিগত বস্তু এবং পরিমাপের যোগ্য গণনীয় বস্তু।

২. ذَوَاتُ الْقِيَمِ বা মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় করা। এ ক্ষতিপূরণ মূল্যযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। প্রাণী মূল্যযোগ্য বস্তুর অন্তর্গত। সুতরাং প্রাণী হত্যার ক্ষেত্রে مِثْل [সাদৃশ্য] দ্বারা আকৃতিগত সাদৃশ্য গ্রহণ করা শরিয়তের ক্ষেত্রে প্রচলিত নেই। অথচ তার অনুরূপও পাওয়া যায় না।

"قَوْلُهُ "يُؤَيِّدُ هٰذَا الْمَعْنٰى : হানাফী আলেমগণ مِثْل দ্বারা مِثْلُ الْقِيْمَةِ অর্থ করেন। তাঁদের এরূপ ব্যাখ্যার সমর্থনে তাঁরা দুটি যুক্তি পেশ করেছেন। যেমন–

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী– "يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ" অর্থাৎ 'নিহত পশুর ব্যাপারে তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক সিদ্ধান্ত দেবে।' مِثْل দ্বারা যে مِثْل مَعْنَوِىْ তথা মূল্য উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার বাণী তা-ই জোরালোভাবে প্রমাণিত করে। কারণ, কোনো কিছুর সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্য ন্যায়পরায়ণ লোকের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া প্রাণীর অনুরূপ প্রাণী নির্ধারণের জন্য ন্যায়পরায়ণ লোকের আবশ্যকতা নেই। অথচ আল্লাহ তা'আলা নিহত প্রাণীর জাযা নির্ধারণের জন্যে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির আবশ্যকতার শর্ত আরোপ করেছেন। কাজেই مِثْل দ্বারা اَلْمِثْلُ صُوْرَةً উদ্দেশ্য নয়; বরং مِثْل مَعْنَوِىْ তথা মূল্য উদ্দেশ্য।

২. আয়াতে জাযা আদায়ের ক্ষেত্রে মুহরিমকে ৩টি বিষয়ে এখতিয়ার বা স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

ক. পশুর বদলে পশু জবাই করবে।

খ. তা না হলে কাফ্‌ফারা স্বরূপ মিসকিনদের খাদ্য দান করবে।

গ. নতুবা একজন মিসকিনের খাদ্যের বিপরীতে একটি করে রোজা রাখবে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়– প্রথমেই যদি নিহত পশুর মূল্য নির্ধারণ করা না হয়, তাহলে এ স্বাধীনতার উপর আমল করবে কিভাবে? কাজেই প্রথমেই নিহত পশুর মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। তারপর সেই মূল্য দ্বারা মুহরিম ইচ্ছামতো তিন পদ্ধতির যে-কোনো এক পদ্ধতিতে জাযা আদায় করবে।

قَوْلُهُ مِنَ النَّعَمِ : এ ইবারতের মাধ্যমে সাহেবাইনের দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। তা ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের অনুরূপ। এর সারমর্ম হচ্ছে– فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, যা ওয়াজিব হয়েছে নিহত পশুর আকৃতির সাথে তার সদৃশ থাকতে হবে। আসলে তা مَا قَتَلَ -এরই বয়ান مِثْل -এর বয়ান নয়। আর نَعَمْ শব্দটি হিংস্র জন্তুর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ফলে এখানে মূল্যের দিক দিয়ে সাদৃশ্য বলে ধরে নিতে হবে।

قَوْلُهُ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ الخ : এখানে مِثْل দ্বারা মূল্যগত তুল্যের একটি উপমা দেওয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা مِثْل নির্ধারণের জন্য দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মাধ্যমে নিরূপণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে মূল্যগত তুলনা দেওয়া হয়েছে। নতুবা আকৃতিগত তুলনা নিরূপণের জন্য যে-কোনো এক ব্যক্তিই যথেষ্ট ছিল।

قَوْلُهُ وَلَوْلَا التَّقْوِيْمُ الخ : এ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, হত্যাকৃত প্রাণীর যে মূল্য স্থির করা হয়েছে, তা দ্বারা খাবার ক্রয় করে মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে তুলনা মূল্যগতভাবে হবে। যদি মূল্যগতভাবে তুলনা না হয়, তাহলে মিসকিনদের খাদ্য দেওয়া বা রোজা রাখার কল্পনা করা যেতে পারে। কেননা, এগুলো আকৃতিগত তুলনা নয়।

قَوْلُهُ وَاَيْضًا لَمْ يَكُنْ لَهٗ نَظِيْرٌ الخ : ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, যেখানে আকৃতিগত তুল্য জন্তু পাওয়া যায় সেখানে আকৃতিগত তুল্য জন্তু আবশ্যক হবে, আর যেখানে আকৃতিগত তুল্য জন্তু পাওয়া যায় না সেখানে মূল্যগত তুল্য জন্তু আবশ্যক হবে। বস্তুত আয়াতে এরূপ হওয়ার কোনোই ইঙ্গিত নেই; বরং এমন অর্থ নিলে আয়াতে হাকীকত ও মাজায একত্রিত হয়ে পড়বে, যা বৈধ নয়। সুতরাং আপত্তিমুক্ত হওয়ার জন্য তুলনাকে রূপক তুলনার অর্থই নিতে হবে তথা মূল্যগত তুলনা ধরা হবে।

وَيَجِبُ بِجُرْحِهِ وَنَتْفِ شَعْرِهِ وَقَطْعِ عُضْوِهِ مَا نَقَصَ وَبِنَتْفِ رِيْشِهِ وَقَطْعِ قَوَائِمِهِ وَكَسْرِ بَيْضِهِ وَكَسْرِهِ وَ خُرُوْجِ فَرْخٍ مَيِّتٍ وَ ذَبْحِ الْحَلَالِ صَيْدَ الْحَرَمِ وَحَلْبِهِ وَقَطْعِ حَشِيْشِهِ وَشَجَرِهِ غَيْرَ مَمْلُوْكٍ وَلَا مُنْبَتٍ قِيْمَتُهُ اِلَّا مَا جَفَّ اَىْ يَجِبُ بِنَتْفِ رِيْشِهِ اِلٰى اٰخِرِهِ قِيْمَتُهُ فَفِىْ نَتْفِ الرِّيْشِ وَقَطْعِ الْقَوَائِمِ يَجِبُ قِيْمَةُ الصَّيْدِ لِاِخْرَاجِهِ عَنْ حَيِّزِ الْاِمْتِنَاعِ وَفِىْ كَسْرِ الْبَيْضِ تَجِبُ قِيْمَةُ الْبَيْضِ وَفِىْ كَسْرِهِ مَعَ خُرُوْجِ فَرْخٍ مَيِّتٍ تَجِبُ قِيْمَةُ الْفَرْخِ حَيًّا وَفِى الْحَلَبِ قِيْمَةُ اللَّبَنِ .

অনুবাদ : আর শিকারকে আঘাত করার কারণে এবং তার পশম উঠানোর কারণে, আর তার অঙ্গ কাটার কারণে ঐ পরিমাণ মূল্যের জিনিস ওয়াজিব হবে, যে পরিমাণ তার মূল্য হতে কমেছে। আর শিকারের পালক উপড়ালে, তার পা কেটে ফেললে, ডিম ভাঙ্গলে এবং ভাঙ্গা ডিম হতে মৃত বাচ্চা বের হয়ে আসলে এবং ইহরামবিহীন ব্যক্তি হেরেমের শিকার জবাই করলে, আর শিকারের দুধ দোহন করলে। হেরেমের মালিকানাবিহীন এবং রোপণবিহীন ঘাস এবং গাছ কাটার কারণে এর মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হয়। তবে যে ঘাস শুকিয়ে গেছে তা কর্তন করলে কিছুই দেওয়া ওয়াজিব হবে না, অর্থাৎ এর পালক উপড়ানো হতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত [বর্ণিত] কাজের দ্বারা এদের মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব। অতঃপর পালক উপড়ালে এবং পা কেটে ফেললে তার মূল্য প্রদান করা এজন্য ওয়াজিব হবে যে, এমতাবস্থায় প্রাণীটি আত্মরক্ষার সক্ষমতা হতে বের হয়ে পড়ে। আর ডিম ভাঙ্গলে ডিমের মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে এবং ডিম ভাঙ্গলে এবং ভাঙ্গা ডিম হতে মৃত বাচ্চা বের হলে জীবিত বাচ্চার মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে। শিকারের দুধ দোহন করলে দুধের মূল্য ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَا نَقَصَ وَبِنَتْفِ رِيْشِهِ الخ : এখানে অপরাধের ক্ষতিপূরণের ধরনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুহরিম যদি শিকারের পশম উপড়ে ফেলে বা শিকারকে জখম করে অথবা তার পালক উপড়ে ফেলে তখন এরূপ করার কারণে শিকারের মূল্য হতে যা কমেছে অপরাধীর উপর শুধু তা-ই ওয়াজিব হবে। যেমন− পশম উপড়ানো এবং না উপড়ানো উভয় প্রাণীর মধ্যে মূল্যের ব্যবধান দু টাকা। তাই অপরাধীর উপর দু টাকা দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি এ দু টাকা প্রদান করার পূর্বেই প্রাণীটি হত্যা করে ফেলে, তাহলে তার পূর্ণ মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে। এরূপ অবস্থায় জখম বা পশম উপড়ানোর জরিমানা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে দু টাকা আদায় করার পর হত্যা করে, তাহলে হত্যাকৃত জীবের প্রকৃত মূল্য হতে সে টাকা বাদ পড়বে না ; বরং পূর্ণ মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ "اِلَّا مَا جَفَّ" : মুসান্নিফ (র.) এখানে এমন কতিপয় জিনায়াতের বিবরণ দিয়েছেন যাতে শিকার জখম করার কারণে শিকার হত্যার সমান ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। যেমন−

১. শিকারের পালক উপড়ে ফেললে। যেমন− পাখির সমগ্র পালক তুলে ফেললে তার পালকের মূল্য দিলে ক্ষতিপূরণ হবে না; বরং পাখির মূল্য দিতে হবে। কারণ, পালকহীন পাখি মৃত পাখির মতো।
২. শিকারে সকল পা কেটে ফেললে। যেমন− হরিণের দুটি পা কেউ কেটে ফেলল। এখন ক্ষতিপূরণ হিসেবে পুরো হরিণের মূল্য দিতে হবে। কারণ, দু পা-হীন হরিণ আত্মরক্ষায় অক্ষম।
৩. ডিম ভাঙ্গলে একটি ডিমের মূল্য আবশ্যক হয়।
৪. ডিম ভাঙ্গার সাথে যদি মৃত বাচ্চা বের হয়ে আসে, তাহলে একটি জীবত বাচ্চার মূল্য আবশ্যক হবে।
৫. মুহরিম নয় এমন কেউ হেরেম শরীফের শিকার জবাই করলে, কিংবা তার দুধ দোহন করলে তার উপর শিকারের মূল্য কিংবা দুধের মূল্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আবশ্যক হবে। মুহরিম যদি এমনটি করে একই হুকুম।

৬. হেরেম শরীফের সীমানায় ঘাস কাটলে ঘাসের মূল্য আবশ্যক হবে।

৭. হেরেমের মধ্যে যে বৃক্ষের কোনো মালিক নেই এবং যা কেউ রোপণও করেনি এমন বৃক্ষ কর্তন করলে ঐ বৃক্ষের মূল্য আবশ্যক হবে। তবে বৃক্ষটি যদি শুকনা হয়, তবে কিছুই আবশ্যক হবে না। মুসান্নিফ (র.) إِلَّا مَا جَفَّ বলে এখানে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন।

قَوْلُهُ ذَبْحِ الْحَلَالِ صَيْدَ الْحَرَمِ الخ : এখানে হেরেমের অভ্যন্তরে শিকারের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মুহরিমের জন্য হেরেমের ভিতরে-বাহিরে কোথায়ও শিকার করা জায়েজ নেই। আর হেরেমের ভিতরের শিকার ইহরামবিহীন ব্যক্তির জন্যও জায়েজ নেই, তবে তার জন্য হেরেমের বাহিরে শিকার করার অনুমতি রয়েছে। কেননা, হেরেমের সম্মান রক্ষার্থে কিয়ামত পর্যন্ত এখানে শিকার করা নিষিদ্ধ। এখানে শিকারকে তাড়াতেও পারবে না, এমনকি কোনো খুনী ব্যক্তিও সেখানে আশ্রয় নিলে তাকেও গ্রেফতার করতে পারবে না।

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, আলোচনা হচ্ছে মুহরিম ব্যক্তির জিনায়াত নিয়ে অথচ বলা হচ্ছে মুহরিম নয় এমন ব্যক্তির জিনায়াতের কথা, কারণ কি?

এর উত্তরে বলা যায় যে, ইহরাম অবস্থায় শিকার করা সর্বত্র নিষিদ্ধ হলেও হালাল ব্যক্তির জন্য সর্বত্র নিষিদ্ধ নয়। কাজেই যার জন্য শিকার করা কিংবা তা জবাই করা হালাল সেও যদি হেরেম শরীফে শিকার হত্যা বা জবাই করে তার উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয়। সুতরাং মুহরিম ব্যক্তি এরূপ কাজ করলে তার উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে সর্বাগ্রে।

প্রশ্ন : মুসান্নিফ (র.) ذَبْحُ الْحَلَالِ বলে মূলত একটি উহ্য সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো– হেরেম শরীফের সীমানায় শিকার করা, শিকার বা কোনো কিছু হত্যা বা জবাই করা সর্বস্তরের মানুষের জন্যই নিষিদ্ধ, অথচ মুসান্নিফ (র.) ذَبْحُ الْمُحْرِمِ বলে এরূপ নিষিদ্ধ কাজকে কেবল মুহরিমের সাথে খাস করে দিয়েছেন; কাজেই কোনো হালাল ব্যক্তি যদি এরূপ কিছু করে তবে তার হুকুম কি হবে?

উত্তর : এরূপ সম্ভাব্য প্রশ্নের আশঙ্কায় মুসান্নিফ (র.) ذَبْحُ الْمُحْرِمِ না বলে ذَبْحُ الْحَلَالِ বলেছেন। ফলে ব্যাপারটি প্রশ্নাতীত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَحَلْبِهِ : এখানে হেরেমের অভ্যন্তরে দুধ দোহনের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। হেরেমের ভিতরের শিকারের দুধ দোহন করলে তার মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে। দুধ দোহনকারী মুহরিম হোক বা হালাল হোক। আর মুহরিম হেরেমের বাহিরের প্রাণীর দুধ দোহন করার হুকুমও তা-ই। তবে হালাল ব্যক্তি হেরেমের বাহিরের প্রাণীর দুধ দোহন করাতে কোনো আপত্তি নেই।

قَوْلُهُ وَقَطْعِ حَشِيْشِهِ الخ : মালিকবিহীন ঘাস কাটলে তার মূল্য ওয়াজিব হবে কর্তনকারী মুহরিম হোক বা হালাল হোক। আর গাছ বলতে জীবিত, দণ্ডায়মান এবং বর্ধনশীল গাছকেই বুঝাবে। আর যা মরে গিয়েছে তা জ্বালানি মাত্র। এখানে গাছ এবং ঘাস বলতে মালিকবিহীন গাছ এবং ঘাসকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু যা মালিকবিহীন এবং রোপণ ব্যতীত জন্মেছে তার জন্য এর মূল্য ওয়াজিব হবে। আর যার মালিক রয়েছে তার মূল্যের দ্বিগুণ ওয়াজিব হবে। এক গুণ হলো কর্তনকারী ইহরাম অবস্থায় হওয়ার দরুন, আর এক গুণ হলো মালিকের জন্য।

قَوْلُهُ قِيْمَتُهُ الخ : এখানে শিকারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিনষ্ট করার বিধান প্রসঙ্গে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মুহরিম যদি শিকারের পা কেটে ফেলে কিংবা পালক উপড়িয়ে ফেলে যাতে শিকার আত্মরক্ষা করতে অক্ষম হয়, তখন অপরাধীর উপর শিকারের পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা, শিকার আত্মরক্ষায় অক্ষম হওয়ার কারণে তাকে মৃতের সাথে তুলনা করা হবে। অতঃপর সে মরে গেলে যেরূপ পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হবে, তদ্রূপ এখনও পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ عَنْ حَيِّزِ الخ : এখানে পাখির পালক উপড়িয়ে ফেলার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। حَيِّزٌ শব্দের অর্থ– দিক। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে– যদি পাখির পালক উপড়িয়ে ফেলে বা পা কেটে দেয়, ফলে সে আত্মরক্ষার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এখন সে এমতাবস্থায় রয়েছে যেন তার সর্বস্ব ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং এরূপ করলে তা-ই ওয়াজিব হবে যা পূর্ণ শিকারটিকে মেরে ফেললে ওয়াজিব হয়।

قَوْلُهُ تَجِبُ قِيْمَةُ الْبَيْضِ الخ : এখানে ডিম ভাঙ্গার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাঈসুল মুফাস্‌সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ফারূক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, ডিম ভাঙ্গলে ডিমের মূল্য জরিমানা দিতে হবে। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে রয়েছে যে, একটি ডিম ভাঙ্গলে ডিমটি দ্বারা যে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল জরিমানা সে বাচ্চার মূল্য দিতে হবে। তবে জরিমানার সর্বাবস্থায় ডিমটি পচা হতে পারবে না। যদি সে পচা ডিম ভাঙ্গে তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, পচা ডিম কোনো সম্পদ নয় এবং তা কিছু সৃষ্টি করার যোগ্যতাও রাখে না

قَوْلُهٗ وَلَا مُنْبَتٍ اَىْ لَيْسَ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ وَلَمْ يُنْبِتْهُ اَحَدٌ بَلْ نَبَتَ بِنَفْسِهٖ فَحِيْنَئِذٍ اِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوْكًا فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهٗ اِلَّا مَا جَفَّ وَاِنْ كَانَ مَمْلُوْكًا وَقَدْ قَطَعَهٗ غَيْرُ الْمَالِكِ فَعَلَيْهِ مَعَ وُجُوْبِ تِلْكَ الْقِيْمَةِ قِيْمَةٌ اُخْرٰى لِلْمَالِكِ سَوَاءٌ جَفَّ اَوْ لَا وَاِنَّمَا قُلْنَا اِنَّهٗ لَيْسَ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ وَلَمْ يُنْبِتْهُ اَحَدٌ حَتّٰى لَوْ كَانَ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً فَلَا شَيْءَ فِيْهِ سَوَاءٌ اَنْبَتَهٗ اِنْسَانٌ اَوْ لَا لِاَنَّ كَوْنَهٗ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ اُقِيْمَ مَقَامَ الْاِنْبَاتِ تَيْسِيْرًا لِاَنَّ مُرَاعَاتَهٗ فِىْ كُلِّ شَجَرَةٍ مُتَعَذِّرَةٌ فَاِذَا اُقِيْمَ مَقَامَ الْاِنْبَاتِ وَالْاِنْبَاتُ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهٖ حُرْمَةُ الْحَرَمِ وَاِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً فَاِنْ اَنْبَتَهٗ اِنْسَانٌ فَلَا شَيْءَ فِيْهِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَاِنْ لَمْ يُنْبِتْهُ اِنْسَانٌ فَفِيْهِ الْقِيْمَةُ فَعُلِمَ مِنْ هٰذَا اَنَّ الْاَقْسَامَ اَرْبَعَةٌ وَلَا قِيْمَةَ اِلَّا فِىْ قِسْمٍ وَاحِدٍ ـ

অনুবাদ : গ্রন্থকারের উক্তি وَلَا مُنْبَتٍ-এর অর্থ হলো, এমন ঘাস যা কোনো মানুষ রোপণ করেনি। আর একে কেউ রোপণ করেনি; বরং তা নিজে নিজেই গজিয়েছে। তখন যদি তা কারো মালিকানাধীন না হয়, তবে কর্তনকারীর উপর এর মূল্য ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি তা শুকিয়ে যায়, তখন এর জন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি তা মালিকানাধীন হয় আর মালিক ছাড়া অন্য কেউ তা কাটে, তাহলে ইহরাম অবস্থায় কাটার কারণে মূল্য ছাড়াও অন্য একটি মূল্যও মালিককে দেওয়ার জন্য ওয়াজিব হবে। তা শুকিয়ে থাকুক বা না থাকুক। গ্রন্থকার (র.) বলেন, আমরা বলেছি যে, لَيْسَ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ وَلَمْ يُنْبِتْهُ اَحَدٌ এমনকি যদি এমন হয় যে, সম্ভবত মানুষ তা রোপণ করে থাকে, তবে তা কর্তন করলে কোনো কিছু এর উপর ওয়াজিব হবে না। চাই কোনো মানুষ তা রোপণ করুক বা না করুক। কেননা, স্বভাবত মানুষ রোপণ করে থাকে এমন হওয়াকে রোপণকৃত হওয়ার স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়েছে। গাছ রোপণকৃত হওয়া না হওয়া নির্ণয়ের ব্যাপার সহজ হওয়ার জন্য। কেননা, প্রত্যেক গাছের ব্যাপারে রোপণকৃত হওয়া না হওয়া নির্ণয় করা অসম্ভব। অতঃপর [মানুষ রোপণ করে এমন হওয়া] বপন করার স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়েছে, যা মালিকানা প্রতিষ্ঠার কারণ। সুতরাং এর সাথে হেরেমের সম্মান প্রদর্শন সম্পৃক্ত হয়নি। আর যদি এমন হয় যে, মানুষ স্বভাবত তা বপন করে না, যদি কেউ এমন গাছ রোপণ করে তবে তা কর্তনকারীর উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, আমরা পূর্বেই এরূপ উল্লেখ করেছি। আর যদি এরূপ হয় যে, কোনো মানুষ একে রোপণ করনি, তবে এর মূল্য ওয়াজিব হবে। তাতে বুঝা গেছে যে, আলোচ্য বিষয়টি চার ভাগে বিভক্ত এবং শুধু এক প্রকারেরই মূল্য ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا مُنْبَتٍ الخ : মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি وَلَا مُنْبَتٍ-এর ব্যাখ্যায় শরহে বিকায়া প্রণেতা যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা নিম্নরূপ– মুসান্নিফ (র.) وَلَا مُنْبَتٍ বলে ঐসব বৃক্ষকে উদ্দেশ্য করেছেন, যা সাধারণত মানুষ উৎপাদন বা রোপণ করে না এবং অতীতে কখনো করেনি। যেমন বন্য কাঁটাবৃক্ষ। এসব বৃক্ষ নিজে নিজেই গজিয়ে থাকে। হেরেম শরীফের সীমানায় এ

জাতীয় বৃক্ষের যদি কোনো মালিক না থাকে, তাহলে কর্তনকারীর উপর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঐ বৃক্ষের মূল্য আবশ্যক হবে। আর এটা হবে হেরেম শরীফের সম্মান হননের কারণে। কিন্তু এরূপ বৃক্ষ শুকনো হলে কোনো কিছুই আবশ্যক হবে না; কারণ, হারামের সীমানায় শুকনো বা জড়পদার্থ নষ্টের ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

কিন্তু এরূপ বন্যগাছ যদি কারো মালিকানাধীন হয় আর মালিক ছাড়া অন্য কেউ তা কর্তন করে, তাহলে কর্তনকারীর উপর দ্বিগুণ মূল্য আবশ্যক হবে। বৃক্ষটি শুকনো হোক আর সজীব হোক।

قَوْلُهُ وَلَمْ يُنْبِتْهُ أَحَدٌ الخ : এখানে হেরেম শরীফে প্রাপ্ত বৃক্ষের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হেরেম শরীফে যেসব গাছ পাওয়া যায় তা সাধারণত তিন প্রকার। যথা– ১. যা দ্বারা উপকার নেওয়া জরিমানা ব্যতীতই বৈধ। ২. যা কর্তন করলে জরিমানা দিতে হয়। ৩. ঐ গাছ যা মানুষ রোপণ করে থাকে, চাই তা কেউ রোপণ করুক বা রোপণ না করুক।

قَوْلُهُ لِأَنَّ مُرَاعَاتَهُ فِي كُلِّ شَجَرَةٍ الخ : এ ইবারতের মাধ্যমে হেরেম শরীফের গাছের ব্যাপারে নীতি এবং নীতির কারণ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। গাছ নিজে নিজে গজানো এবং কারো রোপণ দ্বারা গজানো এসব বিষয় নির্ণয়ের জটিলতার কারণে এ ব্যাপারে নীতি নির্ধারিত হয়েছে যে, যেসব গাছ সাধারণত মানুষ রোপণ করে থাকে, সেগুলোকে কেউ রোপণ করুক বা না করুক, রোপণ করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। ফলে এর মূল্য ওয়াজিব হবে। অতঃপর রোপণ করা মালিক হওয়ার কারণ, সে হিসেবে হেরেম শরীফের সম্মানের সাথে এর সম্পর্ক রইল না। অতএব, মালিক কাটলে মূল্য ওয়াজিব হবে না। হ্যাঁ, মালিক ছাড়া অন্য কেউ কাটলে হেরেম শরীফের অপমানের কারণে মূল্য ওয়াজিব হবে এবং মালিকের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।

قَوْلُهُ فَفِيهِ الْقِيْمَةُ الخ : যে গাছ কেউ রোপণ করেনি তা হেরেম শরীফের গাছ ও এর সাথে হেরেমের সম্মান জড়িত আছে বলে তা কাটলে তার মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ الْاَقْسَامُ الْاَرْبَعَةُ الخ : এ আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হেরেম শরীফের গাছ চার প্রকার। যেমন–

১. এমন গাছ যা সাধারণত লাগানো হয় এবং এ কর্তিত গাছটিও কেউ রোপণ করেছে, যেমন– ফলের গাছ ইত্যাদি।

২. এমন গাছ যা সাধারণত লাগানো হয়, কিন্তু এ কর্তিত গাছটি কেউ রোপণ করেনি।

৩. এমন গাছ যা সাধারণত লাগানো হয় না, কিন্তু একে কেউ শখ করে রোপণ করেছে, যেমন– কোনো কাটার গাছ।

৪. এমন গাছ যা সাধারণত লাগানো হয় না, কিন্তু একে কেউ শখ করেও রোপণ করেনি; বরং এমনিই জন্মেছে। উল্লিখিত চার প্রকারের মধ্যে চতুর্থ প্রকারের গাছ যদি কেউ কর্তন করে, তবে এর জরিমানা দিতে হবে। অবশিষ্ট তিন প্রকারের গাছ কাটলে জরিমানা হিসেবে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

وَعُلِمَ اَيْضًا اَنَّ التَّقْيِيْدَ بِعَدَمِ الْاِنْبَاتِ ذُكِرَ لِاِفَادَةِ نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ كَمَا ذَكَرْنَا لٰكِنَّ التَّقْيِيْدَ بِعَدَمِ الْمَمْلُوْكِيَّةِ لَمْ يُذْكَرْ لِاِفَادَةِ هٰذَا الْمَعْنٰى اِذْ فِىْ صُوْرَةِ وُجُوْبِ الْقِيْمَةِ لَوْ كَانَ مَمْلُوْكًا فَتِلْكَ الْقِيْمَةُ وَاجِبَةٌ مَعَ اَنَّهُ تَجِبُ قِيْمَةٌ اُخْرٰى بَلْ لِيُفِيْدَ اَنَّ هٰذَا الضَّمَانَ وَاجِبٌ لَا غَيْرَ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ حُرْمَةِ الْحَرَمِ ـ

অনুবাদ : আর এটাও বুঝা গেছে যে, রোপণ না করার শর্তটি আরোপ করা হয়েছে অপর সকল প্রকার হতে হুকুমটি প্রত্যাহারের কথা বুঝানোর জন্য। তবে মালিকানাবিহীন হওয়ার শর্ত– এ অর্থ বুঝানোর জন্য নয়। যেহেতু মূল্য ওয়াজিব হওয়ার অবস্থায় যদি তা মালিকানাধীন হয় তখন ঐ মূল্য ওয়াজিব হওয়ার সাথে সাথে অপর একটি মূল্যও মালিকের ক্ষতিপূরণ বাবত ওয়াজিব হবে ; বরং মালিকানাবিহীন হওয়ার শর্ত এ কথা বুঝানোর জন্য যে, এ জরিমানাটি হেরেম শরীফের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত থাকার ফলেই ওয়াজিব হয়েছে, অন্য কোনো কারণে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعُلِمَ اَيْضًا اَنَّ التَّقْيِيْدَ الخ : হেরেম শরীফের বৃক্ষ কর্তনের কারণে জরিমানাস্বরূপ কর্তনকারীর উপর তার মূল্য আবশ্যক হওয়ার জন্য মুসান্নিফ (র.) عَدَمُ الْاِنْبَاتِ -এর শর্ত আরোপ করেছেন। অর্থাৎ কর্তিত বৃক্ষটি এমন হতে হবে যে কেউ তা রোপণ করেনি, আপনাতেই তা গজিয়েছে এবং এরূপ বৃক্ষ সাধারণত মানুষ রোপণ করে না। এরূপ শর্তারোপের উদ্দেশ্য বর্ণনায় ব্যাখ্যাকার বলেন, মানুষের রোপণকৃত উৎপাদিত বৃক্ষ কর্তনের হুকুম থেকে যা মানুষের রোপণকৃত ও উৎপাদিত নয় এর হুকুমকে পৃথক করার জন্যই মুসান্নিফ (র.) তা করেছেন। আর তা হলো এই যে, মানুষের রোপিত বৃক্ষ কর্তনের ফলে কর্তনকারীর উপর কিছুই আবশ্যক হয় না; অথচ যা মানুষর রোপিত নয় এমন বৃক্ষ কর্তন করলে কর্তনকারীর উপর মূল্য পরিমাণ জরিমানা আবশ্যক হয়।

قَوْلُهُ لٰكِنَّ التَّقْيِيْدَ بِعَدَمِ الْمَمْلُوْكِيَّةِ : আলোচ্য উক্তিতে ব্যাখ্যাকার ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) মুসান্নিফের উক্তি "غَيْر مَمْلُوْك" -এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, غَيْر مَمْلُوْك তথা মালিকানাহীন শর্ত আরোপের কারণ এই নয় যে, বৃক্ষটি কারো মালিকানায় থাকলে কর্তনকারীর উপর কিছুই আবশ্যক হবে না; বরং যে বৃক্ষ কর্তনের কারণে মূল্য আবশ্যক হয় তা যদি মালিকানাধীন হয়, তাহলে দ্বিগুণ মূল্য আবশ্যক হয়। একটি মূল্য হেরেমের সম্মান ক্ষুণ্ন করার কারণে আর একটি বৃক্ষের মালিকের জন্য।

'জরিমানাস্বরূপ মূল্য আবশ্যক হওয়ার জন্যে বৃক্ষটি মালিকানাবিহীন হতে হবে' এ শর্তারোপের মূল উদ্দেশ্য হলো একথা বুঝানো যে, মালিকানাবিহীন হওয়া সত্ত্বেও বৃক্ষ কর্তনের জন্য যে মূল্য আবশ্যক হয়, তা কেবল হেরেমের সম্মান ক্ষুণ্ন করার কারণেই, অন্য কোনো কারণে নয়।

وَلَا صَوْمَ فِي الْأَرْبَعَةِ اَيْ لَا صَوْمَ فِيْ ذَبْحِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَحَلْبِهِ وَقَطْعِ حَشِيْشِهِ وَشَجَرِهِ وَلَا يُرْعَى الْحَشِيْشُ وَلَا يُقْطَعُ اِلَّا الْاِذْخِرَ وَبِقَتْلِ قَمْلَةٍ اَوْ جَرَادَةٍ صَدَقَةٌ وَاِنْ قَلَّتْ وَلَا شَيْءَ بِقَتْلِ غُرَابٍ وَحِدَأَةٍ وَعَقْرَبٍ وَحَيَّةٍ وَفَارَةٍ وَكَلْبٍ عَقُوْرٍ وَبَعُوْضٍ وَبَرْغُوْثٍ وَقُرَادٍ وَسُلَحْفَاةٍ وَسَبُعٍ صَائِلٍ وَلَهُ ذَبْحُ الشَّاةِ وَالْبَقَرِ وَالْبَعِيْرِ وَالدَّجَاجِ وَالْبَطِّ الْاَهْلِيِّ وَاَكْلُ مَا صَادَهُ حَلَالٌ وَ ذَبَحَهُ بِلَا دَلَالَةِ مُحْرِمٍ اَوْ اَمْرِهِ بِهِ .

অনুবাদ : [এখানে উপরিউক্ত চারটি মাসআলার উপর আলোচনা করা হলো,] চারটি মাসআলায় রোজা দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা যাবে না। অর্থাৎ ১. হেরেমের শিকার জবাই করলে, ২. সে শিকারের দুধ দোহন করলে, ৩. হেরেমের ঘাস কাটলে এবং ৪. হেরেমের গাছ কাটলে রোজা দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ করা যাবে না। হেরেমের ঘাসে কোনো পশু চরানো যাবে না, কাটাও যাবে না। কিন্তু ইযখির ঘাস কর্তন করা যাবে। উকুন এবং ফড়িং মারলে অল্প পরিমাণ হলেও সদকা করতে হবে। কাক, চিল, বিচ্ছু, সাপ, ইঁদুর, পাগলা কুকুর, মশা, বিচ্ছু [এক জাতীয় ছোট আকারের বিষাক্ত পোকা], আটালি [এক জাতীয় পোকা যা সাধারণত গরুকে বেশি ধরে। এগুলোর কামড় বড় শক্ত, একবার কামড় দিলে সহজে ছাড়ে না], কচ্ছপ, আক্রমণকারী জন্তু ইত্যাদি হত্যা করলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। মুহরিমের জন্য বকরি, গরু, উট, মুরগি, পালিত হাঁস জবাই করা বৈধ। আর হালাল ব্যক্তির শিকার করা ও জবাই করা, প্রাণীর গোশ্ত ভক্ষণ করা বৈধ, তবে শর্ত হলো– কোনো মুহরিম এর দিকে ইঙ্গিত করতে পারবে না। আর তা শিকার করার আদেশও করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا صَوْمَ فِي الْأَرْبَعَةِ :

চারটি মাসআলায় রোজা দ্বারা প্রতিকার না হওয়ার বিবরণ : বর্ণিত চারটি মাসআলায় রোজা দ্বারা বদল করা চলে না। হেরেম শরীফের শিকার জবাই করলে এর মূল্য ওয়াজিব হবে। এখন তাকে এখতিয়ার দেওয়া হবে যে, সে ইচ্ছা করলে এর মূল্য দিয়ে মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়াবে কিংবা একটি জন্তু ক্রয় করে জবাই করবে। কিন্তু রোজা রেখে এর বদল করা যাবে না। কেননা, এখানে তা দণ্ডস্বরূপ বদল করতে হবে, কাফফারাস্বরূপ নয়। এখানে স্থানের সম্মানে বদল করতে হবে। তা ছাড়া অপরাপর ক্ষেত্রে যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তা কাজের ক্ষতিপূরণ ছিল। অনুরূপভাবে অবশিষ্ট তিনটি মাসআলাও ঠিক একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَلَا يُرْعَى الْحَشِيْشُ الخ : এখানে হেরেম শরীফের ঘাসে জন্তু চরানোর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। হেরেম শরীফের ঘাসে পশু চরানো, তা কর্তন করা বৈধ নয়। তবে তরফাইন (র.)-এর মতে ঐসব ঘাস যা ঘরের কাজে ব্যবহৃত হয় তথা ইযখির ঘাস কর্তন করা বৈধ। কেননা, হাদীস শরীফে রয়েছে যে, কোনো কোনো সাহাবী আরজ করলেন যে, তা আমাদের ঘরের এবং কবরের জন্য ব্যবহৃত হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ তা কাটার অনুমতি প্রদান করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, হেরেম শরীফের ঘাসে পশু চরানো বৈধ। কেননা, রাখালদের প্রত্যহ হেরেমের বের থেকে ঘাস সংগ্রহ করে আনা খুবই কষ্টকর।

قَوْلُهُ اَلْاِذْخِرَ : উল্লেখ্য যে, ইযখির হলো আরবের সুগন্ধময় একপ্রকার ঘাস। আরবের লোকেরা একে ঘরের ছাদ বাঁধার কাজে ব্যবহার করে কিংবা কবরের বাঁশ ইত্যাদি বাঁধার কাজে ব্যবহার করে।

قَوْلُهُ وَبِقَتْلِ قَمْلَةٍ الخ : এখানে ইহরাম অবস্থায় উকুন বা ফড়িং মারার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। قَمْلَه একপ্রকার পোকা যা অপরিচ্ছন্নতার কারণে কাপড়ে বা চুলে সৃষ্টি হয়। আর جَرَادَةٌ অর্থ– ফড়িং। সারকথা হচ্ছে– যদি মুহরিম উকুন কিংবা ফড়িং হত্যা করে, তাহলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। যদিও সদকার পরিমাণ কম হোক না কেন, যেমন এক মুঠো খাবার। হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি ফড়িং পরিবর্তে একটি খেজুর উত্তম। আর যদি তিনটির অধিক উকুন মারে, তাহলে অর্ধ সা' সদকা করা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ بِقَتْلِ غُرَابٍ الخ : মুহরিম শিকার করলে বা কোনো প্রাণী হত্যা করলে তার উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয়। মুসান্নিফ (র.) এখানে এমন কতিপয় প্রাণীর নাম উদ্ধৃত করেছেন যেগুলো হত্যা করলে কোনো কিছুই আবশ্যক হবে না। প্রাণীগুলো হলো– কাক, চিল, বিচ্ছু, সাপ, ইঁদুর, পাগলা কুকুর, বিষাক্ত পোকা, এঁটুলি, কচ্ছপ ও আক্রমণকারী প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী।

قَوْلُهُ وَسَبُعٍ صَائِلٍ الخ : এখানে ইহরাম অবস্থায় কষ্টদায়ক প্রাণী হত্যা করার বিধান কি ? তা বর্ণনা করা হচ্ছে। যে সকল প্রাণী মানুষের উপর আক্রমণ করে যেমন– চিতাবাঘ, সিংহ প্রভৃতি, এদের আঘাত হতে বাঁচার জন্য এদেরকে হত্যা করা বৈধ। হাদীস শরীফে রয়েছে– اُقْتُلِ الْمُؤْذِىَ قَبْلَ الْاِيْذَاءِ অর্থাৎ 'কষ্টদায়ক প্রাণীকে কষ্ট দেওয়ার পূর্বে হত্যা করে দাও।' তবে যদি এদের কোনো অনিষ্টের ভয় না থাকে, তবে এদের হত্যা করা মুহরিমের জন্য জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ وَالْبَطِّ الْاَهْلِيِّ الخ : এখানে اَهْلِىْ বা গৃহপালিত বলতে শুধু হাঁসের সাথে খাস নয়; বরং গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, উট ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ এ সকল প্রাণী যদি পোষা হয়, তাহলে এদেরকে জবাই করলে কোনো কিছুই আবশ্যক হবে না ; কিন্তু বন্য প্রাণী জবাই করলে এর মূল্য ওয়াজিব হবে।

وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ اَرْسَلَهُ وَ رَدَّ بَيْعَهُ اِنْ بَقِيَ اَيْ رَدَّ الْبَيْعَ الَّذِيْ اَتٰى بِهٖ بَعْدَ دُخُوْلِهٖ فِي الْحَرَمِ اِنْ بَقِيَ الصَّيْدُ فِيْ يَدِ الْمُشْتَرِيْ وَاِلَّا جَزٰى كَبَيْعِ الْمُحْرِمِ صَيْدَهُ اَيْ رَدَّ بَيْعَهُ اِنْ بَقِيَ وَاِلَّا جَزٰى سَوَاءٌ بَاعَهُ مِنْ مُحْرِمٍ اَوْ حَلَالٍ لَا صَيْدًا فِيْ بَيْتِهٖ اَوْ فِيْ قَفَصٍ مَعَهُ اِنْ اَحْرَمَ اَيْ اِنْ اَحْرَمَ وَفِيْ بَيْتِهٖ اَوْ قَفَصِهٖ صَيْدٌ لَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُرْسِلَهُ لِاَنَّ الْاِحْرَامَ لَا يُنَافِيْ مَالِكِيَّةَ الصَّيْدِ وَمُحَافَظَتَهُ بِخِلَافِ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ فَاِنَّ الصَّيْدَ صَارَ صَيْدَ الْحَرَمِ فَيَجِبُ تَرْكُ التَّعَرُّضِ لَهُ وَمَنْ اَرْسَلَ صَيْدًا فِيْ يَدِ مُحْرِمٍ اٰخَرَ اِنْ اَخَذَهُ حَلَالًا ضَمِنَ وَاِلَّا فَلَا فَاِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدَ مِثْلِهٖ فَكُلٌّ يَجْزِيْ وَ رَجَعَ اٰخِذُهُ عَلٰى قَاتِلِهٖ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি শিকার নিয়ে হেরেম শরীফে প্রবেশ করবে, সে শিকার ছেড়ে দেবে। আর তার ক্রয়-বিক্রয় রহিত করে দেবে, যদি শিকার বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ হেরেমে প্রবেশ করার পর সে যে শিকার বিক্রয় করেছে সে শিকার যদি ক্রেতার হাতে বিদ্যমান থাকে, তাহলে বিক্রয় বাতিল করে দেবে। আর যদি শিকার ক্রেতার হাতে বিদ্যমান না থাকে, তাহলে এর প্রতিদান দেবে। যেমন– মুহরিম তার শিকারকে বিক্রয়ের অবস্থায় অর্থাৎ মুহরিম তার বিক্রয় বাতিল করবে যদি তা ক্রেতার হাতে বিদ্যমান থাকে, নতুবা এর প্রতিদান দেবে। চাই সে শিকার অপর মুহরিমের নিকট বিক্রি করুক বা হালাল ব্যক্তির নিকট বিক্রি করুক। তবে ঐ শিকার ছেড়ে দিতে হবে না ; যা তার ঘরে বা পিঞ্জিরায় আবদ্ধ আছে। অর্থাৎ যদি সে এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধে যে, তার ঘরে বা পিঞ্জিরায় শিকার আছে, তবে তা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা, ইহরাম মুহরিমের শিকারের মালিক হওয়ার বা শিকারের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে বাধা প্রদান করে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম যে ব্যক্তি শিকার সঙ্গে নিয়ে হেরেমে প্রবেশ করেছে। কেননা, তখন তা হেরেমের শিকার বলে গণ্য হবে। সুতরাং শিকারের ব্যাপারে পদক্ষেপ হতে বিরত থাকা ওয়াজিব হবে। আর যদি কোনো মুহরিম অপর মুহরিমের হাত হতে শিকার নিয়ে ছেড়ে দেয় এবং সে মুহরিম যদি ইহরামের পূর্বে শিকার করে থাকে, তাহলে সে উক্ত শিকারের জরিমানা দিতে হবে, অন্যথায় নয়। আর যদি কোনো মুহরিম অন্য কোনো মুহরিমের শিকারকে হত্যা করে, তাহলে উভয়ের উপর প্রতিদান আবশ্যক হবে এবং শিকারি হত্যাকারীর নিকট হতে প্রতিদান ফেরত নেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ الخ : এখানে শিকার নিয়ে হেরেমে প্রবেশকারী এবং শিকার বিক্রয়কারীর বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে। কেউ যদি শিকার সাথে নিয়ে হেরেম শরীফে প্রবেশ করে, তবে হেরেম শরীফের সম্মানার্থে শিকার ছেড়ে দিতে হবে। তবে যদি হেরেমে প্রবেশ করার পূর্বেই তা বিক্রি করে দেয় এবং তার হেরেমে প্রবেশ করার সময় পর্যন্ত ক্রেতার নিকট তা থাকে, তবে উক্ত বিক্রয়-চুক্তি রহিত করতে হবে। আর যদি ক্রেতার নিকট তা বিদ্যমান না থাকে. যেমন– সে জবাই করে থাকে, তবে এর বদলা ওয়াজিব হবে। তা ঠিক এ রকম হবে যেমন– কোনো মুহরিম স্বীয় শিকারকৃত জন্তু বিক্রয় করলে এর বদলা ওয়াজিব হয়।

قَوْلُهُ لَا صَيْدًا فِىْ بَيْتِهِ الخ : এখানে মুহরিমের ঘরে বা খাঁচার শিকারের বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে। মুহরিমের ঘরে যে শিকার রক্ষিত থাকে, বা তার সাথে খাঁচায় থাকে তবে তা ছেড়ে দেওয়া জরুরি নয়। কেননা, শিকারের মালিক হওয়া ইহরামের পরিপন্থি নয়। অপর এক বর্ণনা মোতাবেক খাঁচায় হলে তার হাতে থাকুক বা তার চাকরের হাতে থাকুক, সর্ব অবস্থাতেই তা ছেড়ে দিতে হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ اَرْسَلَ صَيْدًا الخ : এখানে মুহরিমের শিকার ছেড়ে দেওয়ার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। হেদায়া গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, যদি কোনো হালাল ব্যক্তি শিকার করে একে জবাই করার পূর্বেই ইহরাম বাঁধে আর অপর এক ব্যক্তি ঐ শিকার নিয়ে ছেড়ে দেয়, তবে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মুক্তিদাতা এর জরিমানা দেবে। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে, জরিমানা দিতে হবে না। কারণ, মুক্তিদাতা যেন সৎকাজে নির্দেশ করল ও অসৎকাজে বাধা দিল। অতএব, জরিমানা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে– শিকারি শিকার করেছে এবং সংরক্ষণ করে এর মালিক হয়েছে। কাজেই তার ইহরাম শিকারের মালিক হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক হবে না। অথবা তা দ্বারা হেরেমের অসম্মানও হবে না। আর মুক্তিদাতা তার মালের ক্ষতি করল ; কাজেই তাকে ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে। অবশ্য যদি সে ইহরামের অবস্থায় শিকার করে থাকে, তবে মালিক হবে না, ফলে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না।

قَوْلُهُ ضَمِنَ وَاِلَّا فَلَا : কোনো মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পূর্বেই একটি শিকার ধরল। ইহরাম বাঁধার পর ঐ শিকারটি তার সাথে দেখে অন্য একজন মুহরিম এসে তা ছেড়ে দিল। কারণ, সে জানে মুহরিমের জন্য শিকার আটক রাখা নিষিদ্ধ। তার উপর জরিমানা আবশ্যক হবে। কারণ, শিকারের মালিক উক্ত শিকার ইহরামের পূর্বেই ধরেছে। আর এটা বৈধ। তবে ব্যাপারটি যদি এমন হয় যে, ঐ ব্যক্তি ইহরামের পরেই এটা শিকার করেছিল, তাহলে তা ছেড়ে দেওয়াতে কোনো দোষ নেই।

قَوْلُهُ فَاِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ الخ : কোনো মুহরিম যদি অপর মুহরিমের শিকার মেরে ফেলে, তবে উভয়ের উপর তার প্রতিদান বাঞ্ছনীয় হবে। শিকারি যে পরিমাণ প্রতিদান দেবে সে পরিমাণ সে তার হত্যাকারী হতে আদায় করবে। কেননা, তার শিকরের কারণে যদিও সে দণ্ডনীয় হয়েছে, কিন্তু তা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যেমন– তার ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা। কিন্তু হত্যাকারী হত্যা করার দ্বারা সে সুযোগ ও সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছে এবং শিকারির উপর প্রতিদান আবশ্যক হয়ে গেছে।

وَمَا بِهٖ دَمٌ عَلَى الْمُفْرِدِ فَعَلَى الْقَارِنِ بِهٖ دَمَانِ دَمٌ لِحَجَّتِهٖ وَ دَمٌ لِعُمْرَتِهٖ اِلَّا بِجَوَازِ الْوَقْتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ اَلْمُرَادُ بِالْوَقْتِ الْمِيْقَاتُ لِاَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِيْقَاتِ اِحْرَامٌ وَاحِدٌ وَيُثَنّٰى جَزَاءُ صَيْدٍ قَتَلَهٗ مُحْرِمَانِ وَاتَّحَدَ لَوْ قَتَلَ صَيْدَ الْحَرَمِ حَلَالَانِ فَاِنَّ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْفِعْلِ وَالْفِعْلُ مُتَعَدِّدٌ وَجَزَاءُ صَيْدِ الْحَرَمِ جَزَاءُ الْمَحَلِّ وَالْمَحَلُّ وَاحِدٌ بَاعَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا اَوْ شَرَاهُ بَطَلَ وَلَوْ ذَبَحَهٗ حَرُمَ وَلَوْ اَكَلَ مِنْهُ غَرِمَ قِيْمَةَ مَا اَكَلَ لَا مُحْرِمٌ لَمْ يَذْبَحْهُ اَىْ لَوْ اَكَلَ مُحْرِمٌ اٰخَرُ لَمْ يَغْرَمْ ـ

অনুবাদ : যে অপরাধের কারণে ইফরাদ হজকারীর উপর একটি দম ওয়াজিব হবে, সে অপরাধের কারণে কিরান হজকারীর উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। একটি দম তার হজের জন্য, আর অপর দম উমরার জন্য। কিন্তু ইহরামবিহীন অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করার কারণে কিরান হজকারীর উপরেও একটি মাত্র দম ওয়াজিব হয়। গ্রন্থকার اَلْوَقْتُ দ্বারা মীকাত অর্থ করেছেন। কেননা, কিরান হজকারীর উপর মীকাত অতিক্রমকালে একটি ইহরামই ওয়াজিব হবে। সুতরাং একটি দমই ওয়াজিব হবে। আর যে শিকারকে দুজন মুহরিম হত্যা করেছে তার দুটি প্রতিদান ওয়াজিব হবে এবং যদি হেরেমের একটি শিকারকে দুজন ইহরামবিহীন ব্যক্তি হত্যা করে, তবে একটি প্রতিদান ওয়াজিব হবে। কেননা, মুহরিমের হত্যা করার অবস্থায় কাজের প্রতিদান দেবে। আর কাজ বিভিন্ন হওয়ার কারণে প্রতিদানও বিভিন্ন হবে। পক্ষান্তরে হেরেমের শিকারের বিনিময় মূলত স্থানের সম্মানহানির বিনিময়। আর স্থান একটিই, তাই বিনিময়ও একটিই হবে। কোনো মুহরিম একটি শিকার বিক্রয় করল কিংবা ক্রয় করল তখন এ বেচাকেনা বাতিল হবে। আর যদি মুহরিম শিকারকে জবাই করে, তবে তা সকলের জন্য হারাম হবে। আর যদি মুহরিম তা ভক্ষণ করে, তাহলে খাওয়ার পরিমাণের মূল্য জরিমানা দিতে হবে। তবে সেই মুহরিম নয়; যে তা জবাই করেনি। অর্থাৎ জবাইকারী মুহরিম ব্যতীত যদি অন্য কোনো মুহরিম তা ভক্ষণ করে, তাহলে তাকে তার জরিমানা দিতে হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَا بِهٖ دَمٌ عَلَى الْمُفْرِدِ الخ : এখানে ইফরাদ হজ পালনকারীর অপরাধ কিরান হজ পালনকারী করলে তার হুকুম সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। ইফরাদ হজকারী যে অপরাধ করার দ্বারা অপরটি দম ওয়াজিব হবে, সে অপরাধ কিরান হজকারী করলে তাকে দুটি দম দিতে হবে। একটি দম হজের জন্য, আর একটি দম উমরার জন্য। তবে যদি সায়ী অথবা রমীর মতো ওয়াজিব দায়িত্বে শৈথল্য প্রদর্শন করে ; তাতে কিরান হজকারীর উপরও একটি দম আবশ্যক হবে।

قَوْلُهٗ اِلَّا بِجَوَازِ الْوَقْتِ الخ : এখানে ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রম করার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা ব্যতীত মক্কার দিকে রওয়ানা করে পুনরায় মীকাতে এসে ইহরাম বাঁধার দু'টি অবস্থা; একটি হলো সে পুনরায় ইফরাদ হজের ইহরাম বাঁধবে বা কিরান হজের ইহরাম বাঁধবে। ইফরাদ হজের ইহরাম বাঁধলে তার উপর দুটি দম

ওয়াজিব হবে– একটি মীকাত হতে ইহরামবিহীন অগ্রসর হওয়ার জন্য, আর অপরটি উমরার ইহরাম মীকাত ছাড়া করার জন্য। আর যদি কিরানের ইহরাম বাঁধে, তাহলে অপরাধ একটি তথা ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রম করার কারণে একটি মাত্র দম আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ وَيُثَنَّى جَزَاءُ صَيْدٍ الخ : এখানে দুজন মুহরিম মিলে একটি শিকার হত্যা করলে হুকুম কি হবে ? সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। দুজন মুহরিম একটি শিকার হত্যা করলে প্রত্যেককে পূর্ণ হত্যাকারী ধরে পৃথক পৃথক দুটি পূর্ণ বিনিময় প্রদান করা ওয়াজিব হবে। যদিও তারা মাত্র একটি পশু হত্যা করেছে।

আর যদি দুজন ইহরামবিহীন মানুষ হেরেমের একটি পশু হত্যা করে তখন মাত্র একটিরই বিনিময় দিতে হবে। উভয় অবস্থার পার্থক্য হচ্ছে– প্রথম অবস্থায় হত্যা করার বিনিময় দিতে হবে। তবে হত্যাকারী দুজন হিসেবে হত্যার কারণও দুটি, তাই বিনিময়ও দুটি হবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় হত্যাকৃতের বিনিময় হত্যাকৃত পশু অপরটি, ফলে বিনিময়ও একটিরই হবে। اَلْاَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ নামক কিতাবে আলোচ্য আলোচনার একটি নীতিমালা রয়েছে যে, ضَمَانُ الْفِعْلِ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْفَاعِلِ وَضَمَانُ الْمَحَلِّ لَا অর্থাৎ 'কর্তার বিভিন্নতার কারণে কার্যের শাস্তি বিভিন্ন হয়, মহলের কারণে শাস্তি বিভিন্ন হয় না।'

قَوْلُهُ بَاعَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا الخ : এখানে ইহরাম অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। যদি কোনো মুহরিম ইহরামের অবস্থায় শিকার করা প্রাণী বিক্রয় করে বা সে অবস্থায় ক্রয় করে, চাই মুহরিম হতে ক্রয় করুক বা হালাল ব্যক্তি হতে ক্রয় করুক– এ বেচাকেনা বাতিল হবে। কারণ, এ বেচাকেনা হারাম। আর যদি ইহরামের অবস্থায় শিকার করে, হালাল অবস্থায় বিক্রয় করে, তবে সে বেচাকেনা বৈধ হবে এবং হালাল অবস্থায় শিকার করে যদি ইহরামের অবস্থায় বিক্রি করে, তাহলে এ বিক্রি বাতিল নয় তবে ফাসেদ হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ ذَبَحَهُ الخ : এখানে মুহরিমের জবাইয়ের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। মুহরিম শিকারকে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী জবাই করলেও তা খাওয়া সকলের জন্য হারাম হবে। কারণ, মুহরিমের জবাই হারাম হওয়ার কারণে তা মৃতকে জবাই করার সমতুল্য হয়েছে।

وَلَدَتْ ظَبْيَةٌ اُخْرِجَتْ مِنَ الْحَرَمِ وَمَاتَا غَرِمَهُمَا اَىْ الظَّبْيَةَ وَالْوَلَدَ وَاِنْ اَدّٰى جَزَاءَ هَا ثُمَّ وَلَدَتْ لَمْ يَجْزِهٖ اَفَاقِيٌّ يُرِيْدُ الْحَجَّ اَوِ الْعُمْرَةَ وَجَاوَزَ وَقْتَهٗ اَىْ مِيْقَاتَهٗ ثُمَّ اَحْرَمَ لَزِمَهٗ دَمٌ فَاِنْ عَادَ فَاَحْرَمَ وَاِنَّمَا قَالَ يُرِيْدُ الْحَجَّ اَوِ الْعُمْرَةَ حَتّٰى اَنَّهٗ لَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا مِنْهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِمُجَاوَزَةِ الْمِيْقَاتِ وَقَوْلُهٗ ثُمَّ اَحْرَمَ لَا اِحْتِيَاجَ اِلٰى هٰذَا الْقَيْدِ فَاِنَّهٗ لَوْ لَمْ يُحْرِمْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ اَيْضًا ـ

অনুবাদ : হেরেম হতে বহিষ্কৃত হরিণী বাচ্চা প্রসব করল। অতঃপর হরিণী ও বাচ্চা উভয়ই মারা গেল। তখন উভয়েরই জরিমানা ওয়াজিব হবে। আর যদি হরিণীর বিনিময় আদায় করার পর তা বাচ্চা প্রসব করে, তখন এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। বহিরাগত ব্যক্তি হজ বা উমরা আদায়ের নিয়ত করে মীকাত অতিক্রম করল। অতঃপর ইহরাম বাঁধল, তখন তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি সে মীকাতের দিকে ফিরে এসে ইহরাম বাঁধে। [তখন তাঁর দম দিতে হবে না।] গ্রন্থকার يُرِيْدُ الْحَجَّ اَوِ الْعُمْرَةَ বলে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, যদি হজ বা উমরার কোনোটিরই নিয়ত না করে এবং মীকাত অতিক্রম করে, তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। গ্রন্থকার বলেন, ثُمَّ اَحْرَمَ-এর শর্তারোপের আবশ্যকতা নেই। কেননা, যদি সে ইহরাম না বেঁধে থাকে, তাহলেও তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَدَتْ ظَبْيَةٌ الخ : হেরেম শরীফে শিকার হত্যা করলে, কিংবা আটক করে রাখলে, অথবা তাড়িয়ে হারামের বাইরে নিয়ে এলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর ঐ শিকারটির বদলা আদায় করা আবশ্যক হয়। হ্যাঁ, আটককৃত শিকার ছেড়ে দিলে জরিমানা দিতে হবে না।

মুসান্নিফ (র.) এখানে এরূপ একটি মাসআলার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তিনি বলেন, কেউ যদি হেরেম শরীফের কোনো হরিণীকে হেরেমের বাইরে বের করে আনে এবং হেরেমের বাইরে এসে যদি হরিণীটি বাচ্চা প্রসবকালে বাচ্চা ও মা হরিণী উভয়েই মারা যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর হরিণী এবং বাচ্চা উভয়টির জরিমানা আবশ্যক হবে। কারণ, আটককৃত হরিণীকে ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক ছিল। ফলে, তার গর্ভস্থ বাচ্চাও মুক্তি পাওয়ার অধিকারী ছিল। কিন্তু বাচ্চা প্রসবের পূর্বে তার গর্ভস্থ বাচ্চাও তার মালিকানায় চলে আসে। যার কারণে বাচ্চার ক্ষতিপূরণ দেওয়া তার উপর আবশ্যক হবে না।

قَوْلُهٗ اَفَاقِيٌّ يُرِيْدُ الْحَجَّ الخ : নির্ধারিত মীকাতের বাইরের হাজীদের اَفَاقِیْ বলা হয়। বাংলায় বলা হয় 'বহিরাগত হাজী'। বহিরাগত কোনো হাজী হজ কিংবা উমরা পালনের ইচ্ছায় যদি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে, তাহলে তার উপর জরিমানাস্বরূপ একটি কুরবানির পশু জবাই করা আবশ্যক হবে। মীকাত অতিক্রমের পর সে ইহরাম বাঁধুক আর না-ই বাঁধুক, তাতে কিছু যায় আসে না।

হ্যাঁ, কোনো বহিরাগত ব্যক্তি যদি হজ কিংবা উমরার ইচ্ছে ব্যতিরেকে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রম করে, তাহলে তার উপর কোনো জরিমানা আবশ্যক হয় না। আর এ কারণেই মুসান্নিফ (র.) أَفَاقِيٌّ শব্দের পরে يُرِيْدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ বলে শর্তারোপ করেছেন।

قَوْلُهُ ثُمَّ أَحْرَمَ لَا إِحْتِيَاجَ الخ : ব্যাখ্যাকার ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) এখানে মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি "ثُمَّ أَحْرَمَ" -এর উল্লেখের অপ্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, কোনো বহিরাগত ব্যক্তি হজ কিংবা উমরার নিয়তে ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রম করলেই তার উপর একটি 'দম' ওয়াজিব হয়। এখানে "ثُمَّ أَحْرَمَ" বলে শর্তারোপের কোনো প্রয়োজন নেই। ব্যাপারটি এমন নয় যে, মীকাত অতিক্রম করার পর ইহরাম বাঁধলে 'দম' ওয়াজিব হবে, আর ইহরাম না বাঁধলে 'দম' ওয়াজিব হবে না। 'দম' ওয়াজিব হওয়ার সাথে ইহরাম বাঁধার কোনো সম্পর্ক নেই। এর সম্পর্ক হচ্ছে মীকাত অতিক্রম করার সাথে।

উল্লেখ যে, হানাফী মাযহাব মতে, বহিরাগত যে-কোনো ব্যক্তির জন্য ইহরাম বেঁধে মীকাত অতিক্রম করা আবশ্যক। চাই সে হজের উদ্দেশ্যে গমন করুক কিংবা ব্যবসা বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গমন করুক। সুতরাং ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রমকারী প্রত্যেক ব্যক্তির উপর 'দম' আবশ্যক হবে। কিন্তু বর্তমানে এ অভিমতের উপর আমল নেই; বরং মুসান্নিফ (র.) যে অভিমত দিয়েছেন, তা-ই অধিকাংশ মুসলিম মেনে চলছে।

قَوْلُهُ فَإِنْ عَادَ فَأَحْرَمَ الخ : বহিরাগত হজ পালনেচ্ছুক ব্যক্তি ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রম করার পর সে যদি পুনরায় মীকাতের বাইরে ফিরে এসে ইহরাম বেঁধে হজের কাজ শুরু করে, তাহলে তার উপর কোনো 'দম' ওয়াজিব হবে না। কারণ, সে যে কাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার উপর 'দম' ওয়াজিব হয়েছিল তা যথাসময়ে করে নেওয়াতে 'দম' রহিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে যে-কোনো মীকাতে ফিরে এলেই চলবে; নিজের মীকাতে ফিরে আসা আবশ্যক নয়।

উল্লেখ যে, মীকাত অতিক্রমের পর হজ কিংবা উমরার কাজ শুরু করার পূর্বেই ফিরে আসতে হবে। হজের কাজ শুরু করার পর ফিরে এসে পুনরায় ইহরাম বাঁধলেও তার উপর থেকে 'দম' রহিত হবে না।

فَحَقُّ الْكَلَامِ اَنْ يَقُوْلَ جَاوَزَ وَقْتَهُ لَزِمَهُ دَمٌ وَيُمْكِنُ اَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِاَنَّهُ اِنَّمَا ذَكَرَ قَوْلَهُ ثُمَّ اَحْرَمَ لِيُعْلَمَ اَنَّ هٰذَا الدَّمَ لَا يَسْقُطُ بِهٰذَا الْاِحْرَامِ بِخِلَافِ مَا اِذَا عَادَ اِلَى الْمِيْقَاتِ فَاَحْرَمَ فَاِنَّهُ يَسْقُطُ الدَّمُ حِيْنَئِذٍ لِاَنَّهُ تَدَارَكَ حَقَّ الْمِيْقَاتِ ثُمَّ قَوْلُهُ فَاِنْ عَادَ فَاَحْرَمَ مَعْنَاهُ اَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْرِمْ مِنَ الْمِيْقَاتِ فَعَادَ اِلَى الْمِيْقَاتِ فَاَحْرَمَ فَاِنَّهُ يَسْقُطُ الدَّمُ اِتِّفَاقًا اَوْ مُحْرِمًا لَمْ يَشْرَعْ فِيْ نُسُكٍ وَلَبّٰى سَقَطَ دَمُهُ وَ اِلَّا فَلَا اَىْ اِنْ اَحْرَمَ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ ثُمَّ عَادَ اِلَى الْمِيْقَاتِ قَبْلَ اَنْ يَشْرَعَ فِىْ نُسُكٍ مُلَبِّيًا سَقَطَ الدَّمُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ (رح) فَاِنَّهُ لَا يَسْقُطُ الدَّمُ عِنْدَهُ وَاِنَّمَا قَالَ لَمْ يَشْرَعْ فِىْ نُسُكٍ حَتّٰى لَوْ اَحْرَمَ وَشَرَعَ فِىْ نُسُكٍ ثُمَّ عَادَ اِلَى الْمِيْقَاتِ مُلَبِّيًا لَا يَسْقُطُ الدَّمُ اِجْمَاعًا .

অনুবাদ : অতঃপর বাক্যের চাহিদা হচ্ছে– মীকাত অতিক্রম করলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর সম্ভবত গ্রন্থকারের পক্ষ হতে এর এ উত্তর দেওয়া যাবে যে, গ্রন্থকার ثُمَّ اَحْرَمَ -এ অবগতির জন্য বলেছেন যে, দম এ ইহরাম দ্বারা রহিত হবে না। তা ঐ মাসআলার বিপরীত যে, যখন সে মীকাতের দিকে ফিরল এবং ইহরাম বাঁধল। কেননা, তখন দম রহিত হয়ে যাবে। কেননা, সে মীকাতের অধিকার আদায় করেছে। অতঃপর গ্রন্থকারের উক্তি فَاِنْ عَادَ فَاَحْرَمَ -এর অর্থ হলো যদি সে মীকাত হতে ইহরাম না বাঁধে, অতঃপর মীকাতের দিকে ফিরে এবং ইহরাম বাঁধে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে দম রহিত হয়ে যাবে। অথবা ইহরাম বেঁধে ঐ অবস্থার দিকে ফিরে, যে অবস্থায় ইহরামের কাজ আরম্ভ করেনি এবং তালবিয়া পাঠ করে, তখন তার দম রহিত হয়ে যাবে, নতুবা নয়। অর্থাৎ মীকাত হতে অতিক্রম করার পর ইহরাম বাঁধে, অতঃপর তালবিয়ার পর ইহরামের কাজ আরম্ভ করার পূর্বে মীকাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তখন আমাদের [হানাফীদের] মতে দম রহিত হয়ে যাবে। তাতে ইমাম যুফার (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তাঁর মতে দম রহিত হবে না। এখানে গ্রন্থকার لَمْ يَشْرَعْ فِىْ نُسُكٍ এজন্য বলেছেন যে, যদি ইহরাম বেঁধে হজের অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ করে, অতঃপর তালবিয়া পাঠ করে মীকাতের দিকে ফিরে আসে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে দম রহিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَحَقُّ الْكَلَامِ اَنْ يَقُوْلَ الخ جَاوَزَ وَقْتَهُ : এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের উচিত ছিল যে, বাক্যে ثُمَّ اَحْرَمَ কয়েদকে বাদ দিয়ে শুধু لَزِمَهُ دَمٌ বলা। কারণ, উল্লিখিত কয়েদ দ্বারা ধারণা হয় যে, ইহরাম না বাঁধলে দম ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ اَنْ يُجَابَ عَنْهُ الخ : মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি– "اَفَاقِىٌّ يُرِيْدُ الْحَجَّ اَوِ الْعُمْرَةَ وَجَاوَزَ وَقْتَهُ ثُمَّ اَحْرَمَ لَزِمَهُ دَمٌ" -এর মধ্যে "ثُمَّ اَحْرَمَ" শর্তটি আরোপ করার কোনো প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করে ব্যাখ্যাকার ওবায়দুল্লাহ (র.) বলেন, قَوْلُهُ ثُمَّ اَحْرَمَ لَا اِحْتِيَاجَ اِلٰى هٰذَا الْقَيْدِ ব্যাখ্যাকারের এরূপ মন্তব্যের পর প্রশ্ন জাগে যে, কোনো প্রয়োজনীয়তা না থাকলে বিজ্ঞ মুসান্নিফ (র.)-এর এরূপ শর্তারোপের কারণ কি?

এর উত্তরে ব্যাখ্যাকার বলেন, মীকাত অতিক্রম করে ইহরাম বাঁধলে এ ইহরামের কারণে অতিক্রমকারীর উপর থেকে 'দম' রহিত হবে না, এ কথা বুঝানোর জন্যই মুসান্নিফ (র.) "ثُمَّ أَحْرَمَ" শর্তের উল্লেখ করেছেন। কারণ, তিনি যদি বলতেন- آفَاقِيٌّ يُرِيْدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ وَجَاوَزَ وَقْتَهُ لَزِمَهُ دَمٌ তাহলে হয়তোবা প্রশ্ন উঠত, অতিক্রমের পরে সে যদি ইহরাম বাঁধে তারপরও 'দম' ওয়াজিব হবে কি? এরূপ প্রশ্নের অবকাশ দূর করার জন্যই তিনি "ثُمَّ أَحْرَمَ" শর্তের উল্লেখ করেছেন। ফলে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইহরাম বাঁধলেও 'দম' ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الدَّمُ الخ : এ ইবারতে ইহরামবিহীন অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করার পর দম রহিত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। কোনো ব্যক্তি যদি ইহরাম বাঁধা ব্যতীত মীকাত পার হয়ে যায়, এতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। তবে সে পুনঃ ফিরে এসে যদি মীকাতে ইহরাম বাঁধে, তবে তার উপর অর্পিত দম রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথমে ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রমের গুনাহ তার উপর বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ "وَإِلَّا فَلَا" : এখানে إِلَّا দ্বারা 'দম' ওয়াজিব না হওয়ার বিধানকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রমকারীর উপর থেকে 'দম' রহিত হওয়ার শর্ত দুটি। যথা-

১. পুনরায় মীকাতে ফিরে এসে ইহরাম বাঁধা।

২. মীকাত অতিক্রম করার পর কোনো ব্যক্তি যদি ইহরাম বেঁধে ফেলে, তাহলে হজের কার্যাবলি শুরু করার পূর্বেই তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় মীকাত পর্যন্ত ফিরে এসে পুনরায় মক্কায় গমন করা।

إِلَّا দ্বারা মুসান্নিফ বলতে চেয়েছেন, এ শর্ত দুটি যদি পাওয়া না যায়, তাহলে তার উপর 'দম' ওয়াজিব থেকে যাবে। অর্থাৎ তার উপর থেকে 'দম' রহিত হওয়ার আর কোনো পথ খোলা নেই।

قَوْلُهُ أَوْ مُحْرِمًا لَمْ يَشْرَعْ الخ : ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রমের পর ইহরাম বাঁধলে এবং হজের কার্যাবলি আরম্ভ করার পূর্বে তালবিয়া পাঠ করে মীকাতের দিকে ফিরে আসলে তার প্রতি আরোপিত দম রহিত হয়ে যাবে। আর যদি হজ বা উমরার কাজ আরম্ভের পরে সে মীকাতের দিকে ফিরে আসে, তবে তার দম রহিত হবে না।

قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ الدَّمُ عِنْدَهُ : এখানে ইহরামবিহীন অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করার হুকুম প্রসঙ্গে ইমামদের মতভেদ আলোচনা করা হচ্ছে। ইহরামবিহীন অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করলে দম রহিত হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে, দম রহিত হবে না। কারণ, দম ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রম করার অপরাধের কারণে ওয়াজিব হয়েছে। আর পরে মীকাতে ফিরে আসলেও সে অপরাধ রহিত হবে না, ফলে দমও রহিত হবে না।

আর ইমাম আ'যম (র.)-এর মতে, দম এজন্য রহিত হবে যে, সে হজ ও উমরার কাজ আরম্ভ করার পূর্বে মীকাতের দিকে ফিরে এসেছে। তাতে সময়ের মধ্যে ফিরে এসেছে বিধায় তার উপর অর্পিত দম রহিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَالَ لَمْ يَشْرَعْ الخ : ব্যাখ্যাকার ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) আলোচ্য বয়ানের অধীনে মুসান্নিফ (র.)-এর দুটি উক্তির মর্ম বর্ণনা করেছেন। যথা-

১. ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রমকারীর উপর থেকে 'দম' রহিত হতে হলে তাকে ইহরাম করত তালবিয়া পাঠ করতে করতে মীকাতে ফিরে আসতে হবে। এখানে মুসান্নেফ (র.) একটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো "لَمْ يَشْرَعْ فِيْ نُسُكٍ" অর্থাৎ হজের কার্যাবলি আরম্ভ করার পূর্বেই ফিরে আসতে হবে। কারণ, হজের কার্যাবলি শুরু করার পর তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় মীকাতে ফিরে এলেও সর্বসম্মতিক্রমে 'দম' রহিত হবে না।

২. 'দম' রহিত হওয়ার জন্য মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় শর্ত হিসেবে "وَلَبّٰى" অংশ উল্লেখ করেন, অর্থাৎ তালবিয়া পাঠ করতে করতে ফিরে আসতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট 'দম' রহিত হওয়ার জন্য তালবিয়া পাঠ অত্যাবশ্যক। অথচ সাহেবাইনের মতে, তালবিয়া পাঠের প্রয়োজন নেই, কেবল ইহরামের সাথে মীকাতে ফিরে এলেই 'দম' রহিত হয়ে যাবে। তাঁদের এরূপ অভিমত থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতকে পৃথক করার জন্যই মুসান্নিফ (র.) "وَلَبّٰى" বলেছেন।

وَاِنَّمَا قَالَ وَلَبّٰى اِحْتِرَازًا عَنْ قَوْلِهِمَا فَاِنَّ الْعَوْدَ اِلَى الْمِيْقَاتِ مُحْرِمًا كَافٍ لِسُقُوْطِ الدَّمِ عِنْدَهُمَا وَاَمَّا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) فَلَابُدَّ مِنْ اَنْ يَعُوْدَ مُحْرِمًا مُلَبِّيًا كَمَكِّيٍّ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَمُتَمَتِّعٌ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهٖ وَخَرَجَا مِنَ الْحَرَمِ وَاَحْرَمَا تَشْبِيْهٌ بِالْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِىْ لُزُوْمِ الدَّمِ فَاِنَّ اِحْرَامَ الْمَكِّيِّ مِنَ الْحَرَمِ وَالْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ وَاَتٰى بِالْعُمْرَةِ صَارَ مَكِّيًّا وَاِحْرَامُهٗ مِنَ الْحَرَمِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا دَمٌ لِمُجَاوَزَةِ الْمِيْقَاتِ بِلَا اِحْرَامٍ ـ

অনুবাদ : আর গ্রন্থকার لَبّٰى এজন্য বলেছেন, যাতে সাহেবাইনের মত ভিন্নতর হওয়া প্রতিভাত হয়। কেননা, তাঁদের নিকট ইহরাম বেঁধে মীকাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা দম রহিতকরণের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তালবিয়া পাঠপূর্বক প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। গ্রন্থকার বলেন, যেমন– কোনো মক্কাবাসী হজের সংকল্প করল, আর একজন তামাত্তু'কারী যে উমরার অনুষ্ঠানাদি সমাপন করল ; তারা উভয়েই হেরেম হতে বের হলো এবং ইহরাম বাঁধল। তা উপরে বর্ণিত মাসআলার সঙ্গে দম ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সাদৃশ্যমূলক। কেননা, মক্কাবাসীর ইহরাম হেরেম হতে আরম্ভ হয়, তামাত্তু'কারী মক্কা শরীফে প্রবেশ করে উমরা আদায় করার ফলে সেও মক্কাবাসীর অন্তর্ভুক্ত হলো। এখন তার ইহরামও হেরেম হতে শুরু হবে। সুতরাং ইহরাম ব্যতিরেকে মীকাত অতিক্রম করার কারণে তাদের উভয়ের উপর দম প্রদান ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ كَافٍ لِسُقُوْطِ الدَّمِ الخ : এখানে ইহরামবিহীন অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করার পর দম রহিত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, দম রহিত হওয়ার জন্য ইহরামের মীকাতে ফিরে যাওয়াই যথেষ্ট। কেননা, এটা তার করণীয় ছিল না যে, মীকাত হতে অগ্রসর হওয়ার সময় সে মুহরিম হবে। তা অবশ্য করণীয় ছিল না যে, মীকাত পার হওয়ার সময়ই ইহরাম বাঁধবে। কেননা, সে মীকাতে পৌঁছার পূর্বেই যদি ইহরাম বাঁধে এবং ইহরাম অবস্থায় মীকাত পার হয়ে যায়, অথচ তালবিয়া পাঠ করেনি, তবে তার উপর কিছুই আবশ্যক হবে না। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তখন ইহরামের অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করতে করতে মীকাতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কারণ, সে যখন হালাল অবস্থায় মীকাতে গমন করেছিল তখন তার উপর ইহরাম ও তালবিয়া আবশ্যক ছিল। এখন যদি অতিক্রম করে তা পরিহার করে, অতঃপর ইহরাম বেঁধে ফিরে আসে এবং তালবিয়া পাঠ করে, তাহলে ওয়াজিব কার্যসমূহ আদায় করার কারণে দম বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তালবিয়া পাঠ না করে, তাহলে তার উপর যা ওয়াজিব ছিল তা আদায় করেনি বলে গণ্য হবে। কাজেই তালবিয়া পাঠ না করা পর্যন্ত দম রহিত হবে না।

قَوْلُهٗ كَمَكِّيٍّ يُرِيْدُ الْحَجَّ الخ : এখানে দম ওয়াজিব হওয়ার সাদৃশ্যপূর্ণ মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। তা একটি সাদৃশ্যপূর্ণ মাসআলা যাতে দম আবশ্যক হয়। যথা– একজন মক্কাবাসী যাকে হেরেম হতে ইহরাম বাঁধতে হয়, সে যদি হজের ইহরাম বাঁধার জন্য হেরেমের বাইরে গিয়ে ইহরাম বাঁধে এবং মক্কায় প্রবেশ করে উমরা পালন করে ইহরাম ভঙ্গ করে, এখন সে ব্যক্তি হজের দিনের অপেক্ষায় মক্কায় থাকে, অতঃপর হজের জন্য হেরেমের বাইরে গিয়ে ইহরাম বাঁধে. এমতাবস্থায় ঐ মক্কাবাসী এবং তামাত্তু'কারী উভয়ের উপরই ইহরাম ব্যতিরেকে মীকাত অতিক্রম করার কারণে দম দেওয়া আবশ্যক হবে।

فَـاِنْ دَخَلَ كُوْفِيٌّ اَلْبُسْتَانَ لِحَاجَةٍ فَلَهُ دُخُوْلُ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَ وَقْتُهُ الْبُسْتَانُ كَالْبُسْتَانِيِّ بُسْتَانُ بَنِىْ عَامِرٍ مَوْضِعٌ دَاخِلَ الْمِيْقَاتِ خَارِجَ الْحَرَمِ فَاِذَا دَخَلَهُ لِحَاجَةٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْاِحْرَامُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ وَاجِبِ التَّعْظِيْمِ فَاِذَا دَخَلَهُ اِلْتَحَقَ بِاَهْلِهِ وَيَجُوْزُ لِاَهْلِهِ دُخُوْلُ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ لٰكِنْ اِنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ اَىْ جَمِيْعُ الْحِلِّ الَّذِىْ بَيْنَ الْبُسْتَانِ وَالْحَرَمِ كَالْبُسْتَانِيِّ وَلَا شَئَ عَلَيْهِمَا اَىْ لَا شَئَ عَلَى الْبُسْتَانِيِّ وَ عَلٰى مَنْ دَخَلَهُ اِنْ اَحْرَمَا مِنَ الْحِلِّ وَ وَقَفَا بِعَرَفَةَ لِاَنَّهُمَا اَحْرَمَا مِنْ مِيْقَاتِهِمَا ـ

অনুবাদ : যদি কূফাবাসী এক ব্যক্তি কোনো প্রয়োজনে বনী আমেরের বাগানে প্রবেশ করে, তখন তার জন্য ইহ্রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা জায়েজ। আর তখন তার মীকাত হলো সে বাগান, যেরূপ সেই বাগানবাসীদের মীকাত হলো বাগান। বনূ আমিরের বাগান হেরেমের বাইরে মীকাতের ভিতরে একটি স্থান। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো প্রয়োজনে সে বাগানে প্রবেশ করে, তখন তার ইহরাম ওয়াজিব নয়। কেননা, সে বাগান সম্মানের আবশ্যক স্থান নয়। সুতরাং সে বাগানে যে ব্যক্তি প্রবেশ করল, সে উক্ত বাগানের অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট হয়ে গেল। আর বাগানবাসীদের জন্য ইহরামবিহীন মক্কায় প্রবেশ বৈধ। কিন্তু যখন হজের ইচ্ছা করে, তখন তার মীকাত হবে সে বাগান। অর্থাৎ হিল-এর সম্পূর্ণ এলাকা যা বাগান এবং হেরেমের মধ্যে অবস্থিত, যেমন বাগানবাসী। আর যে ব্যক্তি বাগানে প্রবেশ করল যদি তারা উভয়ে হিল হতে ইহরাম বাঁধল এবং আরাফায় অবস্থান করল, তখন তাদের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, তারা উভয়ই স্বীয় মীকাত হতে ইহরাম বেঁধেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنْ دَخَلَ كُوْفِيٌّ الخ : এখানে কূফী বলতে আফাকী তথা মক্কার বহিরাগত লোক বুঝানো হয়েছে। তবে কূফার উল্লেখ উদাহরণমূলক ও আকস্মিকভাবে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ বনূ আমিরের বাগানের উল্লেখ ও আকস্মিক করা হয়েছে এর অর্থ হলো হেরেম এবং মীকাতের মধ্যবর্তী স্থান।

মূলকথা হলো, কোনো বহিরাগত লোক যদি মক্কা এবং মীকাতের মধ্যস্থিত স্থানে যায় তার মক্কায় আসতে ইহরামের আবশ্যকতা নেই। আর যদি হজের জন্য ইহরাম বাঁধতে চায়, তাহলে কোনো বাগান হতে ইহরাম বাঁধবে। যেমন– বাগানবাসীগণ ইহরাম বাঁধে। এজন্য যে, যখন তারা বাগানে প্রবেশ করে তখন তারা বাগানবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং বাগানবাসীদের মীকাতই তাদের জন্য মীকাত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بُسْتَانُ بَنِىْ عَامِرٍ الخ : বনূ আমেরের বাগান, এমন একটি স্থান যা মীকাতের ভিতরে এবং হেরেমের বাইরে। আজকাল যাকে نَخْلَه مَحْمُوْد বলা হয়। কারো কারো মতে, তা এমন একটি স্থান যা মক্কা হতে চব্বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। ইমাম নববী (র.) বলেন, মানুষ যখন আরাফার মাঠে কেবলামুখি হয়ে দাঁড়ায়, তখন এ স্থানটি মানুষের বাম পার্শ্বে থাকে। সারুজী বলেন– তা ইরাক এবং কূফা হতে মক্কায় আগমনকারীদের পথে আরাফাহ পর্বতের নিকটে অবস্থিত।

قَوْلُهُ فَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ الخ : এখানে বহিরাগত বনূ আমেরের বাগানে প্রবেশকারীদের মীকাত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কূফাবাসী যদি ইহরামবিহীন মক্কায় আসে, তবে সে বাগান হতেই ইহরাম বাঁধবে– মীকাতে যেতে হবে না, যা বাগানবাসীদেরও হুকুম।

وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِلَا اِحْرَامٍ لَزِمَهُ حَجٌّ اَوْ عُمْرَةٌ وَصَحَّ مِنْهُ لَوْ حَجَّ عَمَّا عَلَيْهِ فِىْ عَامِهٖ ذٰلِكَ لَا بَعْدَهُ جَاوَزَ وَقْتَهُ فَاَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَاَفْسَدَهَا مَضٰى وَقَضٰى وَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِتَرْكِ الْوَقْتِ فَاِنَّهُ يَصِيْرُ قَاضِيًا حَقَّ الْمِيْقَاتِ بِالْاِحْرَامِ مِنْهُ فِى الْقَضَاءِ مَكِّيٌّ طَافَ لِعُمْرَتِهٖ شَوْطًا فَاَحْرَمَ بِالْحَجِّ رَفَضَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَحَجٌّ وَعُمْرَةٌ اَلدَّمُ لِاَجْلِ الرَّفْضِ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِاَنَّهُ فَائِتُ الْحَجِّ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَمَّا عِنْدَهُمَا يَرْفُضُ الْعُمْرَةَ وَاِنَّمَا قَالَ طَافَ شَوْطًا لِاَنَّهُ لَوْ طَافَ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ يَرْفُضُ اِحْرَامَ الْحَجِّ اِتِّفَاقًا فَلَوْ اَتَمَّهُمَا صَحَّ وَ ذَبَحَ لِاَنَّهُ اَتٰى بِاَفْعَالِهِمَا لٰكِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَالنَّهْىُ عَنِ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ يُحَقِّقُ الْمَشْرُوْعِيَّةَ لٰكِنَّهُ يَجِبُ دَمٌ لِلنُّقْصَانِ ـ

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি ইহরামবিহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করে, তার উপর হজ বা উমরা ওয়াজিব হবে। তবে সে যদি সেই বছর তার ফরজ হজ পালন করে থাকে, তবে এ হজ দ্বারা ঐ হজ রহিত হয়ে যাবে, যা ইহরামবিহীন মক্কায় প্রবেশ করার কারণে ওয়াজিব হয়েছিল। এ বছরের পরে হলে চলবে না। কেউ ইহরামবিহীন মীকাত পার হয়ে গিয়ে উমরার ইহরাম বাঁধে এবং উমরা ভঙ্গ করে, তবে উমরার অনুষ্ঠানাদি পালন করে যাবে এবং এ উমরার কাজা করবে। কিন্তু মীকাতে ইহরাম বাঁধেনি বলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কেননা, উমরার কাজা করার সময় মীকাত হতে ইহরাম বাঁধার কারণে এমন হয়েছে যে, সে যেন মীকাতের হক আদায় করে দিল। একজন মক্কাবাসী নিজের উমরার জন্য এক চক্কর তওয়াফ করল, অতঃপর হজের ইহরাম বাঁধল, তখন হজের ইহরাম ভঙ্গ করবে। তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে এবং এক হজ ও এক উমরা ওয়াজিব হবে। ইহরাম ভঙ্গের জন্য দম ওয়াজিব হবে। হজ ও উমরা এজন্য ওয়াজিব হবে যে, সে হজ ছেড়ে দিয়েছে। তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে। আর সাহেবাইনের মতে উমরা ছেড়ে দেবে। গ্রন্থকারের طَافَ شَوْطًا বলার কারণ হচ্ছে– যদি চার চক্কর তওয়াফ করে, তবে সর্বসম্মতভাবে হজের ইহরাম ভঙ্গ করবে। সে যদি হজ এবং উমরা উভয়টি করে, তাহলে বৈধ হবে এবং পশু জবাই করবে। কেননা, দুটি নুসুক একই সফরে আদায় করেছে ; কিন্তু তা নিষিদ্ধ نَهْىٌ عَنْ اَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ কাজ করার অনুমোদন করে, কিন্তু ক্ষতির কারণে দম প্রদান ওয়াজিব হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ دَخَلَ الخ : এখানে ইহরামবিহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। ইহরামবিহীন যে ব্যক্তি মক্কায় প্রবেশ করেছে, তার উপর হজ বা উমরা ওয়াজিব হবে। কারণ, এ জায়গার সম্মানার্থে হজ বা উমরার কোনো একটির ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করা প্রয়োজন ছিল। যখন সে তা বর্জন করেছে, তখন দুটির মধ্যে একটি আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ وَصَحَّ مِنْهُ الخ : এখানে ইহরামবিহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশের কারণে ওয়াজিব হওয়া হজের প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। কোনো ব্যক্তি যখন ইহরামবিহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করল, তখন তার উপর হজ বা উমরা ওয়াজিব হলো। তারপর সে মীকাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে ফরজ বা মানতের হজের ইহরাম বাঁধল এবং তা যথারীতি পালন

করল। তাতে তার এ হজ তার সে ওয়াজিব হওয়া হজের জন্য যথেষ্ট হবে, তবে শর্ত হচ্ছে– ফরজ বা মানতের হজ এ বছরই পালন করতে হবে। পরের কোনো বছর পালন করলে তা ইহরামবিহীন মক্কায় প্রবেশের কারণে ওয়াজিব হওয়া হজের জন্য যথেষ্ট হবে না।

قَوْلُهُ جَاوَزَ وَقْتَهُ الخ : এখানে উমরা ভঙ্গ করার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। মীকাত হতে ইহরাম ব্যতীত অগ্রসর হয়ে উমরার ইহরাম বেঁধে তা ভেঙ্গে ফেলল, তখন সে উমরার কার্যক্রম পূর্ণ করবে এবং তা কাজা করবে। সে ব্যক্তি কাজা করার সময় মীকাতের হক আদায় করছে বলে মীকাত ছেড়ে দিয়েছে তার উপর কোনো দম ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِتَرْكِ الخ : বলাই বাহুল্য, হজ কিংবা উমরা পালনের নিয়তে কেউ যদি ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রম করে, তার উপর একটি 'দম' আবশ্যক হয়। অথচ মুসান্নিফ (র.) এখানে বলেন, وَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِتَرْكِ الْوَقْتِ অর্থাৎ ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রমের কারণে তার উপর কোনো 'দম' আবশ্যক হবে না, এর কারণ কি?

উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর হলো– উমরা পালনকারী মীকাত অতিক্রম করে ইহরাম বেঁধে উমরার কাজ শুরু করেই যখন তা নষ্ট করে দিল, তখন তার উপর দুটি বিষয় আবশ্যক হয়ে পড়ল। যথা–

১. ওমরার অবশিষ্ট কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং যথানিয়মে তা শেষ করা।

২. পুনরায় তার কাজা করা। আর কাজা করার সময় সে যেহেতু মীকাত হতে ইহরাম বেঁধেই তা কাজা করবে, সেহেতু মীকাতের হক আদায় হয়ে যাবে। আর মিকাতের হক হলো সেখান থেকে ইহরাম বাঁধা। কাজেই তার উপর কোনো 'দম' ওয়াজিব হবে না।

হ্যাঁ কাজা করার সময় সে যদি মীকাত হতে ইহরাম না বেঁধে পূর্বের মতো মীকাতের অভ্যন্তরে এসে ইহরাম বাঁধে, তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কারণ, সে মীকাতের হক আদায় করেনি।

قَوْلُهُ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) الخ : 'কোনো মক্কাবাসী উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে এক চক্কর কিংবা তিন চক্কর তওয়াফ করে হজের নিয়তে আবার ইহরাম বাঁধল' এমতবস্থায় তার হজ বা উমরা পালনের বিধান কি হবে? এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তার কর্তব্য হবে হজের ইহরাম ত্যাগ করে উমরার কাজ চালিয়ে যাওয়া। কারণ, সে মক্কাবাসী হিসেবে দুটি নুসুক একই সাথে পালন করা নিষিদ্ধ। ফলে হজ কিংবা উমরা দুটোর যে-কোনো একটি তাকে ছাড়তে হবে। আর সে যেহেতু উমরার কাজ শুরু করেছে সেহেতু তা শেষ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। কাজেই তার কর্তব্য হবে হজের ইহরাম ছেড়ে দিয়ে উমরার কাজ সমাপ্ত করা।

এরূপে কার্য সম্পদান করতে হলে তার উপর দুটি কাজ আবশ্যক হবে। যথা–

১. হজের ইহরাম ভঙ্গের কারণে একটি কুরবানির পশু জবাই করা।

২. হজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে পরবর্তী বছর হজ পালন করা।

সাহেবাইনের মতে, ঐ মক্কাবাসীর কর্তব্য হবে উমরা ত্যাগ করা এবং হজের কার্যাবলি সম্পাদন করা। কারণ, সে মাত্র তওয়াফ করেছে। আর ১, ২ বা ৩ তওয়াফ করাতে উমরা আবশ্যক হয় না।

হ্যাঁ, ঐ মক্কাবাসী যদি উমরার জন্য ৪ চক্কর তওয়াফ করার পর হজের ইহরাম বাঁধে, তাহলে তার কর্তব্য হবে হজের ইহরাম ত্যাগ করা এবং উমরা পূর্ণ করা। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ فَائِتُ الْحَجِّ الخ : এখানে হজের ইহরাম ভঙ্গ করার কারণ ও হুকুম বর্ণনা করা হচ্ছে। হজের ইহরাম ভঙ্গ করার কারণে তার হজ নষ্ট হয়ে গেছে, তাই তাকে হজ পুনরায় কাজা করতে হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাকে কেন হজের ইহরাম ভঙ্গ করতে হবে? এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমে সে উমরা শুরু করে তা শেষ করার পূর্বে অপর একটি কাজের

দায়িত্ব নেওয়ায় এমন হয়ে গেল যে, তাকে যে-কোনো একটি ভঙ্গ করতে হবে। কেননা, মক্কাবাসী একই ইহরামে হজ ও উমরা একসাথে পালন করতে পারে না। ফলে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট, উমরা আরম্ভ করে ভেঙ্গে ফেলার ফলে তা সমাপ্ত করা অপরিহার্য বিধায় হজ ভঙ্গ করে উমরা সম্পন্ন করতে হবে। আর সাহেবাইনের নিকট, উমরা কাযা করা সহজ বিধায় তা-ই ভঙ্গ করবে। কেননা, যে-কোনো সময় উমরার কাজা করতে পারবে।

قَوْلُهُ لَوْ طَافَ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ الخ : এখানে এক চক্কর তওয়াফ করার বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলোকপাত হচ্ছে। এখানে এক চক্কর বলার দ্বারা অর্থ হলো পূর্ণ চক্করের অর্ধেকের চেয়ে কম চক্কর। আর যদি অর্ধেকের চেয়ে অধিক হয় তথা চার চক্কর বা পাঁচ চক্কর বা ততোধিক চক্কর তাওয়াফ করে, তাহলে সাহেবাইনের মতে, হজের ইহরামই ভঙ্গ করবে।

قَوْلُهُ فَلَوْ اَتَمَّهُمَا صَحَّ وَ ذَبَحَ : মক্কাবাসীদের জন্য কিরান হজ করা নিষিদ্ধ। তাদের জন্য তামাত্তু' করাও নিষিদ্ধ। কাজেই কোনো মক্কাবাসী একই সাথে উমরা ও হজ দুটি পালন করতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটি যদি এরূপ হয় যে, কোনো মক্কাবাসী হজ এবং উমরা দুটোই একসাথে আদায় করে ফেলল, এখন তার হুকুম কি হবে?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, "صَحَّ وَ ذَبَحَ" অর্থাৎ তার হজ শুদ্ধ হবে। তবে অপরাধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি কুরবানির পশু জবাই করতে হবে। এরূপ উত্তরের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে যে, শরিয়তে যা নিষিদ্ধ মুসান্নিফ (র.) তাকে 'শুদ্ধ হবে' বললেন কিসের ভিত্তিতে? এর জবাবে ব্যাখ্যাকার ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (র.) বলেন, শরিয়তে বৈধ– এমন কাজের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা মূলত এ কথাই প্রমাণ করে যে, ঐ কাজ করাটা নাজায়েজ নয়; বরং শরিয়তসম্মত। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য যেহেতু তা নিষেধ তাই এরূপ কাজ করে ফেললে তা শুদ্ধ হবে এবং অপরাধের জন্যে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি 'দম' দিতে হবে।

قَوْلُهُ وَالنَّهْىُ عَنِ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ الخ : এটা ঐ নাহী, যা প্রকৃতপক্ষে ভালো, কিন্তু অন্য কোনো কারণে শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে। যেমন– ঈদের দিনে রোজা রাখা। উল্লিখিত اَلنَّهْىُ عَنِ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ তথা শরয়ী কার্যাবলি হতে নিষিদ্ধতা একটি অনুত্থাপিত প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হলো– মক্কাবাসীর জন্য হজ্জে কিরান নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও কিভাবে হজ ও উমরা পালন একত্রে জায়েজ হতে পারে? উত্তর এই যে, উসূলুল ফিকহের সূত্র মোতাবেক শরয়ী কাজের উপর নাহী আগমনের পরও তার বিধান ও বৈধতা মূলত থেকে যায়। এজন্য মক্কাবাসী হজ ও উমরা পালন করলে তা শুদ্ধ হবে, তবে গুনাহগার হবে। আর এর প্রতিকারের জন্য কুরবানি করা ওয়াজিব হবে।

وَمَنْ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَحَجَّ ثُمَّ اَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِاٰخَرَ فَاِنْ حَلَقَ لِلْاَوَّلِ لَزِمَهُ الْاٰخَرُ بِلَا دَمٍ وَاِلَّا فَمَعَ دَمٍ قَصَّرَ اَوْ لَا اَىْ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَحَجَّ ثُمَّ اَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِحَجَّةٍ اُخْرٰى فِى الْعَامِ الْقَابِلِ فَاِنْ حَلَقَ لِلْاَوَّلِ قَبْلَ هٰذَا الْاِحْرَامِ لَزِمَهُ الْاٰخَرُ بِلَا دَمٍ وَاِنْ لَمْ يَحْلِقْ لَزِمَهُ الْاٰخَرُ مَعَ دَمٍ وَمَنْ اَتٰى بِعُمْرَةٍ اِلَّا الْحَلْقَ فَاَحْرَمَ بِاُخْرٰى ذَبَحَ لِاَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ اِحْرَامَيِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ مَكْرُوْهٌ فَلَزِمَهُ الدَّمُ اٰفَاقِىٌّ اَحْرَمَ بِهٖ ثُمَّ بِهَا لَزِمَاهُ لِاَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَشْرُوْعٌ لِلْاٰفَاقِىِّ كَالْقِرَانِ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি হজের ইহরাম বাঁধল এবং হজ করল, অতঃপর কুরবানির দিন অপর এক হজের ইহরাম বাঁধল, তবে যদি প্রথম হজের ইহরাম ভঙ্গ করার জন্য মাথা মুণ্ডায়, তাহলে দমবিহীন দ্বিতীয় হজ ওয়াজিব হবে, অন্যথায় দমসহ ওয়াজিব হবে। চুল খাটো করেছে বা করায়নি। অর্থাৎ কেউ হজের ইহরাম বেঁধে হজ করল, অতঃপর আগামী বছর হজ করার জন্য কুরবানির দিন ইহরাম বাঁধল, তবে আগামী বছরের হজের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে সে যদি মাথা মুড়িয়ে থাকে, তাহলে আগামী বছরের হজ দমবিহীন ওয়াজিব হবে। মাথা না মুড়ালে আগামী বছর দমসহ হজ ওয়াজিব হবে। যদি কেউ উমরার ইহরাম বেঁধে উমরা আদায় করে, কিন্তু মাথা মুণ্ডানোর আগে দ্বিতীয় উমরার ইহরাম বাঁধে, তবে পশু জবাই করতে হবে। কেননা, সে দুই উমরার ইহরাম একত্র করেছে, অথচ এ রকম করা মাকরূহ তাহরীমী। সুতরাং দম ওয়াজিব হবে। বহিরাগত ব্যক্তি হজের জন্য ইহরাম বাঁধে আবার উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে, তবে উভয়টিই ওয়াজিব হবে। কেননা, বহিরাগতের জন্য উভয়ই একত্র করা জায়েজ আছে, যেমন– হজ্জে কিরান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ اَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ الخ : এখানে কুরবানির দিন পুনঃ ইহরাম বাঁধার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। কোনো ব্যক্তি যদি হজের ইহরাম বেঁধে নিয়ম মাফিক হজ পালন করে, অতঃপর সে ব্যক্তি কুরবানির দিনেই আগামী বছর হজ করার মানসে ইহরাম বাঁধে, তাহলে আগামী বছর তার উপর হজ আবশ্যক হবে। এখন লক্ষ্য করতে হবে যে, সে বর্তমান ইহরাম হতে হালাল হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডিয়েছে কিনা? মাথা মুণ্ডানোর পর যদি আগামী বছরের হজের জন্য ইহরাম বেঁধে থাকে, তবে আগামী বছর হজ করবে, তবে তাকে কোনো দম দিতে হবে না। আর যদি বর্তমান ইহরাম হতে হালাল হওয়ার জন্য মাথা না মুণ্ডিয়ে আগামী বছরের হজের ইহরাম বেঁধে থাকে, তাহলে আগামী বছর হজ করবে; কিন্তু তাকে একটি দমও দিতে হবে। এখন এ দ্বিতীয় ইহরামের পর মাথা মুণ্ডন করুক বা না করুক, আগামী হজ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডানো স্থগিত রাখবে। দ্বিতীয় ইহরামের চুল খাটো করার কারণে এবং প্রথম ইহরাম বিলম্ব করার কারণে যে অপরাধ হয়েছে, এর জন্য দম ওয়াজিব হবে। তা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইনের মতে মাথা না মুণ্ডানো অবস্থায় বিলম্ব জনিত কারণে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ اَتٰى بِعُمْرَةٍ الخ : এখানে এক উমরার ইহরামের সাথে অন্য উমরার ইহরাম একত্রিকরণের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। চুল খাটো করা ছাড়া উমরার অবশিষ্ট সকল অনুষ্ঠানাদি সুসম্পন্ন করেছে, এখন দ্বিতীয় ইহরাম এর সাথে যোগ করল। যেহেতু এ রকম করা মাকরূহ তাহরীমী, তাই তার উপর একটি দম আবশ্যক হবে। কেননা, প্রথম ইহরামের কসরের পরেই দ্বিতীয় ইহরামের সময় ছিল; কিন্তু সে আগেই ইহরাম বেঁধেছে এবং এভাবে দুই ইহরাম একত্র করেছে, যা মাকরূহ।

قَوْلُهُ اٰفَاقِىٌّ اَحْرَمَ بِهٖ الخ : এখানে বহিরাগত ব্যক্তি হজ ও উমরার ইহরাম একত্রে বাঁধার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। কোনো বহিরাগত প্রথমে হজের ইহরাম বাঁধল এবং হজের অনুষ্ঠানাদি শুরু করার পূর্বেই উমরার ইহরাম বাঁধল; তাহলে তা তার জন্য বৈধ, যেমন– তার জন্য কিরান বৈধ আছে। তবে তার উপর দুটিই আবশ্যক হবে। এমতাবস্থায় আরাফায় অবস্থানের পূর্বেই তাকে উমরার অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করতে হবে। অন্যথায় আরাফায় অবস্থানের পর তার উমরা বাতিল হয়ে যাবে।

وَتَبْطُلُ هِيَ بِالْوُقُوْفِ قَبْلَ اَفْعَالِهَا لَا بِالتَّوَجُّهِ اَىْ بِالتَّوَجُّهِ اِلَى عَرَفَاتٍ فَاِنْ طَافَ لَهُ ثُمَّ اَحْرَمَ بِهَا فَمَضَى عَلَيْهِمَا ذَبَحَ لِاَنَّهُ اَتَى بِاَفْعَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى اَفْعَالِ الْحَجِّ وَنُدِبَ رَفْضُهَا فَاِنْ رَفَضَ قَضَى وَ اَرَاقَ وَاِنْ حَجَّ فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَوْ فِىْ ثَلٰثَةٍ تَلِيْهِ لَزِمَتْهُ وَ رُفِضَتْ وَقُضِيَتْ مَعَ دَمٍ وَاِنَّمَا لَزِمَتْهُ لِاَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ اِحْرَامَيِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ صَحِيْحٌ وَاِنْ مَضَى عَلَيْهِمَا صَحَّ وَيَجِبُ دَمٌ فَائِتُ الْحَجِّ اَهَلَّ بِهٖ اَوْ بِهَا رَفَضَ وَقَضَى وَ ذَبَحَ اَىْ فَائِتُ الْحَجِّ اِذَا اَحْرَمَ بِحَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ يَجِبُ اَنْ يَرْفُضَ الْاِحْرَامَ وَيَتَحَلَّلَ بِاَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لِاَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَجِبُ عَلَيْهِ هٰذَا ثُمَّ يَقْضِىْ مَا اَحْرَمَ بِهٖ لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ وَيَذْبَحُ وَاِنَّمَا يَرْفُضُ اِحْرَامَ الْحَجِّ لِاَنَّهُ يَصِيْرُ جَامِعًا بَيْنَ اِحْرَامَيِ الْحَجِّ فَيَرْفُضُ الثَّانِىْ وَاِنَّمَا يَرْفُضُ اِحْرَامَ الْعُمْرَةِ لِاَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ لِفَوَاتِ الْحَجِّ فَيَصِيْرُ بِالْاِحْرَامِ جَامِعًا بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ فَيَرْفُضُ الثَّانِيَةَ وَاِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ لِلتَّحَلُّلِ قَبْلَ اَوَانِهٖ بِالرَّفْضِ ـ

অনুবাদ : উমরার কার্যক্রম সম্পাদনের পূর্বে আরাফায় অবস্থান করলে উমরা বাতিল হয়ে যাবে, শুধু মনোযোগী হওয়ার দ্বারা নয়, অর্থাৎ আরাফার দিকে মনোযোগী হওয়ার দ্বারা উমরা বাতিল হবে না। আর হজের জন্য তাওয়াফে কুদূম করে পরে উমরার ইহরাম বেঁধে উভয়টি সম্পন্ন করলে জবাই করতে হবে। কেননা, সে হজের ইহরামের উপর উমরা পালন করেছে। এমতাবস্থায় তার উমরা ছেড়ে দেওয়া মোস্তাহাব। আর ছেড়ে দিলে উমরা কাজা করবে এবং দম আদায় করবে। আর যদি হজ সম্পন্ন করে এবং কুরবানির দিন বা এর পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে উমরার ইহরাম বাঁধে, তবে উমরা ওয়াজিব হবে। কিন্তু উমরা ছেড়ে দেবে এবং দম সহকারে উমরা কাজা করবে। উমরা এজন্য ওয়াজিব হবে যে, হজ ও উমরার ইহরাম একত্র করা জায়েজ আছে। আর যদি উভয় অনুষ্ঠানের কার্যক্রম পালন করে থাকে, তবে সহীহ হবে এবং দম ওয়াজিব হবে। হজ ফওতকারী অথচ সে হজ ও উমরার ইহরাম বেঁধেছিল, তবে সে ছেড়ে দেবে এবং কাজা করবে এবং জবাই করবে। অর্থাৎ হজ ফওতকারী হজ ও উমরার ইহরাম বাঁধলে তা ছেড়ে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব। আর উমরার কার্যাদি পালন করে হালাল হয়ে যাবে। কেননা, হজ ফওতকারীর উপর উমরা ওয়াজিব। তারপর যার ইহরাম বেঁধে ছিল সেটির কাজা করবে. যেহেতু আরম্ভ করা সহীহ হয়েছে এবং জানোয়ার জবাই করবে। আর হজের ইহরাম এজন্য ছেড়ে দেবে, যেহেতু সে হজের দুই ইহরাম একত্রকারী হয়েছে, ফলে সে দ্বিতীয়টি ছেড়ে দেবে। আর উমরার ইহরাম এজন্য ছেড়ে দেবে যে. হজ ফওত হওয়ার কারণে তার উপর একটি উমরা ওয়াজিব হয়। অতঃপর দ্বিতীয় ইহরামের কারণে সে দুই ইহরাম একত্রকারী হয়ে যায়, তাই দ্বিতীয়টি ছেড়ে দেবে। আর দম এজন্য ওয়াজিব হয় যে, ছেড়ে দেওয়ার কারণে হালাল হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই হালাল হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا بِالتَّوَجُّهِ الخ : কোনো ব্যক্তি যদি উমরার কার্যাবলি শেষ না করেই ৯ তারিখে আরাফায় অবস্থান করে, তাহলে তার উমরা বাতিল হয়ে যাবে। হজের পরে কোনো এক সময় তা কাজা করতে হবে। হ্যাঁ, কেউ যদি উমরার কার্যক্রম শেষ না হতেই আরাফার দিকে মনোনিবেশ করে, তাহলে তার উমরা বাতিল হবে না। যেমন– আরাফায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।

قَوْلُهُ فَإِنْ طَافَ لَهُ الخ : এখানে বহিরাগত ব্যক্তির হজ ও উমরার ইহরাম একত্রিত করার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। বহিরাগত ব্যক্তি যদি হজের ইহরাম বেঁধে হজের কাজ যেমন– তাওয়াফে কুদূম ইত্যাদি পালন করার পর উমরার ইহরাম বেঁধে উভয়টি একত্রে পালন করে, যা করার জন্য তার পক্ষে শরয়ী অনুমতি রয়েছে, তাহলে তাকে একটি দম দিতে হবে। কিন্তু ফিকহবিদগণের মতে এমতাবস্থায় উমরাটি ছেড়ে দেওয়া মোস্তাহাব এবং পরে কাজা করবে ও দম দেবে।

قَوْلُهُ وَنُدِبَ رَفْضُهَا : কোনো ব্যক্তি হজের ইহরাম বেঁধে তাওয়াফে কুদূম করল। তারপর উমরার ইহরাম বাঁধল এবং উমরা ও হজ দুটিই আদায় করল। তার হজ এবং উমরা দুটোই শুদ্ধ হবে এবং হজের কার্যাবলির মাঝে উমরার কার্যাবলিকে প্রবেশ করানোর কারণে একটি 'দম' দিতে হবে। তবে মুসান্নিফ (র.)-এর মতে, তার জন্য উমরা ত্যাগ করাই উত্তম।

قَوْلُهُ فَإِنْ رَفَضَ قَضَى الخ : হজের কার্যাবলি শুরু করার পর কেউ যদি উমরার ইহরাম বাঁধে, তবে উমরা ছেড়ে দেওয়াই তার জন্য উত্তম। এখন সে যদি তা ছেড়ে দেয়, তাহলে পরে তা কাজা করতে হবে এবং একটি কুরবানির পশু জবাই করতে হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ حَجَّ فَأَهَلَّ الخ : এখানে হজের কাজ শেষ না হওয়ার পূর্বে উমরার ইহরাম বাঁধা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। ব্যাপরটি এরূপ যে, কেউ হজ করল কিন্তু হজের কাজ এখনো শেষ না হতেই কুরবানির দিন বা কুরবানির পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে ইহরাম বাঁধল, তখন তার উমরা ওয়াজিব হয়ে গেছে। তবে যদি এ উমরার ইহরাম তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে বাঁধে, তবে দুই ইহরাম এবং হজ ও উমরার কাজ একত্র হয়ে গেল, যা মাকরূহ। কারণ, এ দিন হজের দিন। কাজেই তার কর্তব্য হলো আপতত উমরা ছেড়ে দেওয়া এবং একটি দম দেওয়া বা পশু জবাই করা আর পরে উমরা কাজা করা। যদি উমরা ছেড়ে দেওয়া ব্যতীত হজ ও উমরা উভয়টির কাজ করে যায় তা-ও শুদ্ধ হবে, তবে একটি দম ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ صَحَّ وَيَجِبُ دَمٌ : হজের শেষে ১০ জিলহজ কুরবানির দিন কিংবা এর পরবর্তী ৩ দিনের কোনো একদিন যদি কেউ উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে, তাহলে তার উপর উমরা পালন আবশ্যক হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে তার জন্য দুটি পথ খোলা–

১. উমরা ত্যাগ করবে এবং পরে তা কাজা করবে। এজন্য তাকে একটি 'দম' দিতে হবে।
২. সে যদি উমরা ত্যাগ না করে উভয়টি আদায় করে ফেলে শুদ্ধ হবে। তবে তার উপর জরিমানাস্বরূপ একটি 'দম' দেওয়া আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ فَائِتُ الْحَجِّ الخ : এখানে হজ বিনষ্টকারীর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। যে ব্যক্তির হজ কোনো কারণে বিনষ্ট হয়ে গেছে। যথা– তারিখের হিসাব ভুল করে আরাফায় ঠিক সময়ে অবস্থান করতে পারেনি বা অন্য কোনো কারণে হজ বিনষ্ট হয়ে যায়। অথচ মীকাত হতেই সে হজ বা উমরার ইহরাম বেঁধেছিল, তবে সে তা ছেড়ে দেবে। আর পরবর্তীতে তা কাজা করবে এবং ১টি দম দেবে।

قَوْلُهُ وَيَتَحَلَّلُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ الخ : এখানে হজ বিনষ্টকারীর উপর উমরা করার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। যখন তার হজ বিনষ্ট হলো, তখন উমরা করা তার উপর আবশ্যক হলো। কেননা, তার হজ যখন বিনষ্ট হলো অথচ সে ইহরাম অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছে। আর এ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে, যে মক্কায় প্রবেশ করে তার উপর হজ বা উমরা

ওয়াজিব হয়। এখন তার হজ বিনষ্ট হয়েছে, তবে উমরা পালন এখনো সম্ভব। কাজেই তাকে উমরা করতে হবে। কেননা, হজ বিনষ্ট হলে উমরা ওয়াজিব হয়। [كَذَا فِى الْمُوطَّا لِلْاِمَامِ مَالِكٍ]

قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ الخ : তা কাজা করার হুকুমের কারণস্বরূপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ কাজা এজন্য ওয়াজিব হবে যে, ইহরামের মাধ্যমে হজ ও উমরা আরম্ভ করা বৈধ হয়েছিল, কাজেই তা ওয়াজিব হয়েছে। যখন তা ছেড়ে দিল তখন এর কাজা ওয়াজিব হলো এবং ছেড়ে দেওয়ার কারণে একটি দম আবশ্যক হলো।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ يَصِيْرُ جَامِعًا بَيْنَ الخ : অর্থাৎ এভাবে দুই হজের ইহরাম সে একত্র করেছে। কেননা, প্রথম হজের ইহরাম এখনো শেষ হয়নি, উমরা করার মাধ্যমে তা হতে হালাল হতে পারে। তা না করে দ্বিতীয়বার হজের ইহরাম বেঁধে সে দুই হজের ইহরামকে একত্রিত করেছে। শরিয়ত অনুযায়ী তা অবৈধ। অতএব দ্বিতীয়টিকে ছেড়ে দেবে।

قَوْلُهُ جَامِعًا بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ الخ : এখানে হজ বিনষ্ট হওয়ার সময় উমরার ইহরাম বাঁধার ব্যাপারে ইমামদের মতানৈক্য বর্ণনা করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি হজের ইহরাম বাঁধল; কিন্তু আরাফায় অবস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্জন করায় তার হজ বিনষ্ট হয়ে গেল। এমতাবস্থায় তার উপর অপরিহার্য হলো সে হজের ইহরামের উপর উমরা পালন করে হালাল হওয়া। অবশ্য যে ইহরামের উপর সে উমরা করবে তা মূলত হজের ইহরাম। অতঃপর সে যদি অপর একটি উমরার ইহরাম বাঁধে, তাহলে তার সর্বমোট দুটি উমরা হলো এবং ইহরাম হলো একটি, অর্থাৎ একটি ইহরামে দুটি উমরা। এটাই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, হজের ইহরাম পরিবর্তন হয়ে উমরার ইহরাম হয়ে গেছে, যাতে দুই ইহরামের মাধ্যমেই দুই উমরা হওয়া প্রমাণিত হলো।

بَابُ الْاِحْصَارِ

اِنْ اُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُوٍّ اَوْ مَرَضٍ بَعَثَ الْمُفْرِدُ دَمًا وَالْقَارِنُ دَمَيْنِ وَعَيَّنَ يَوْمًا يُذْبَحُ فِيْهِ وَلَوْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) .

পরিচ্ছেদ : বাধা দেওয়া

অনুবাদ : মুহরিম যদি শত্রু কিংবা অসুস্থতার কারণে [মক্কা গমনে] বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন হজ্জে ইফরাদ আদায়কারী একটি দম এবং হজ্জে কিরান আদায়কারী দুটি দম মক্কায় প্রেরণ করবে। আর একটি দিন নির্দিষ্ট করে দেবে, যেন সেদিন তা জবাই করা হয়। যদিও সেদিনটি কুরবানির দিনের পূর্বে হয়। তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ الْاِحْصَارِ : اِحْصَارٌ-এর সংজ্ঞা : اِحْصَارٌ শব্দটি حَصْرٌ ধাতু হতে নিষ্পন্ন, বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ– বাঁধা দেওয়া, নিষেধ করা, বিরত রাখা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, মুহরিম ব্যক্তি হজ ও উমরা পালন করা থেকে বাধাপ্রাপ্ত হওয়াকে اِحْصَارٌ বলা হয়। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থা মুহরিমের জন্য সাধারণত কমই হয়ে থাকে, এজন্য এর বিধানের বর্ণনা শেষাংশে প্রদান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنْ اُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُوٍّ الخ : এখানে মুহরিম অবরুদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। যদি মুহরিম কোনো শত্রু অথবা অসুস্থতার কারণে অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং হজ করতে অক্ষম হয়ে যায়। কিন্তু তাতে মতভেদ রয়েছে যে, এ অবরুদ্ধ ঐ অবস্থার সাথে নির্ধারিত যখন অবরুদ্ধকারী কাফের হয়। এ মতামত পোষণকারীদের দলিল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ যখন ষষ্ঠ হিজরি সালে মহানবী ﷺ তাঁর সাথিদের নিয়ে উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কা হতে বের হন এবং মক্কার পথে হোদায়বিয়া নামক স্থানে কাফেরদের হাতে অবরুদ্ধ হন– উক্ত আয়াত তখন অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এ অবরুদ্ধতা কাফেরদের সাথে নির্ধারিত হবে। আমাদের হানাফীদের মতে 'ইহসার' -এর অর্থ ব্যাপক, অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ বিষয় যা হজকে বাধা প্রদান করে, চাই তা অসুস্থতার কারণে হোক বা শত্রুর কারণে হোক বা আর্থিক অভাবে বা অন্য কোনো কারণে হোক। এ মতের স্বপক্ষে হাদীস প্রমাণ করে যে, যার কোনো অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে বা সে লেংড়া হয়ে গেছে, তখন সে হালাল হয়ে যাবে এবং তার উপর অন্য হজ ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ بَعَثَ الْمُفْرِدُ دَمًا الخ : এখানে অবরুদ্ধ মুহরিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। হজ হতে কোনো মুহরিম যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে দেখতে হবে যে, সে কোন উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছিল– হজের জন্য নাকি উমরার জন্য? হজ্জে ইফরাদের জন্য নাকি হজ্জে কিরানের জন্য? আর এটাও দেখতে হবে যে, কোন স্থানে অবরুদ্ধ হয়েছে– কি হেরেমের বাইরে না হেরেমের ভিতরে? যদি ইফরাদ হজকারী অবরুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে সে উক্ত স্থান হতেই একটি দম মক্কার দিকে প্রেরণ করবে এবং একটি তারিখ নির্ধারণ করবে, যে তারিখে তা মক্কায় জবাই করা হবে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট এ তারিখটি কুরবানির দিনের পূর্বেও হতে পারে। অতএব মুহরিম সে নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে হলক করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছর সে হজের কাজা করবে। আর বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি কিরান হজকারী হয়, তাহলে দুটি দম প্রেরণ করবে এবং উমরার ইহরামকারী হলে একটি প্রেরণ করবে।

উপরিউক্ত হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য যে হেরেমের বাইরে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আর যদি হেরেমের অভ্যন্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে সে যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেখানে জবাই করে হালাল হয়ে যাবে।

وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَإِنْ كَانَ مُحْصَرًا بِالْعُمْرَةِ فَكَذَا وَإِنْ كَانَ مُحْصَرًا بِالْحَجِّ لَا يَجُوْزُ الذَّبْحُ إِلَّا فِيْ يَوْمِ النَّحْرِ وَفِيْ حِلٍّ لَا وَبِذَبْحِهِ يَحِلُّ قَبْلَ حَلْقٍ وَتَقْصِيْرٍ وَعَلَيْهِ إِنْ حَلَّ مِنْ حَجٍّ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ وَمِنْ عُمْرَةٍ عُمْرَةٌ وَمِنْ قِرَانٍ حَجٌّ وَعُمْرَتَانِ وَإِذَا زَالَ إِحْصَارُهُ وَأَمْكَنَهُ إِدْرَاكُ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ تَوَجَّهَ وَمَعَ أَحَدِهِمَا فَقَطْ لَهُ أَنْ يَحِلَّ هٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) ـ

অনুবাদ : কিন্তু সাহেবাইনের মতে, উমরা পালনকারী যদি অনুরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি হজ পালনকারী বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে কুরবানির দিন ছাড়া পশু জবাই করা বৈধ হবে না। হিল্ল-এর মধ্যে তার দম জবাই করা জায়েজ নেই এবং এ জবাইয়ের মাধ্যমে হলক ও কসরের পূর্বেই মুহরিম হালাল হয়ে যাবে। যদি মুহরিম হজের ইহরাম হতে হালাল হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর একটি হজ ও একটি ওমরা ওয়াজিব হবে। আর যদি কিরান হজ হতে হালাল হয়, তাহলে একটি হজ ও দু'টি ওমরা ওয়াজিব হবে। যদি তার অবরুদ্ধতার অবসান হয় এবং কুরবানি ও হজ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মক্কার দিকে গমন করবে। তবে একটি পাওয়ার সম্ভাবনার অবস্থায় তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ, এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا الخ **:** এখানে হাদী কুরবানির দিনের পূর্বে জবাই করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। সাহেবাইনের মাযহাব অনুযায়ী উমরার হাদী কুরবানির দিনের আগে জবাই করা বৈধ, কিন্তু হজের হাদী কুরবানির দিনের আগে জবাই করা বৈধ নয়। কেননা, তা যেহেতু বিশেষ স্থানে জবাই করতে হবে। অতএব, নির্দিষ্ট তারিখের প্রয়োজন রয়েছে, আর তা হলো কুরবানির দিন।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর যুক্তি হলো, তা কাফ্ফারার দম। সুতরাং তা কোনো সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না; যেমন অন্যান্য কাফ্ফারার দম সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না।

قَوْلُهُ وَفِيْ حِلٍّ لَا **:** হিল-এর সীমানায় উক্ত কুরবানির জন্তু জবাই করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন- لَا تَحْلِقُوْا رُؤُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ অর্থাৎ 'কুরবানির জন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জবাইয়ের স্থানে না পৌঁছে, তোমরা মাথা মুণ্ডাবে না।' অতঃপর জবাইয়ের নির্দিষ্ট স্থানের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ কেননা, তা-ই জবাইয়ের নির্দিষ্ট স্থান।

قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إِنْ حَلَّ الخ **:** এখানে নিয়তের ব্যবধানের কারণে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলা হচ্ছে। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হজের ইহরাম বেঁধেছিল বা উমরার ইহরাম বেঁধেছিল। আবার হজের ইহরাম বেঁধে থাকলে হজ্জে ইফরাদের বা হজ্জে কিরানের ইহরাম বেঁধেছিল। যদি ইফরাদ হজের ইহরাম করে থাকে, তবে আগামী বছর তার উপর এক হজ এবং এক উমরা কাজা করতে হবে। অনুরূপভাবে কিরান হজকারী যার উপর এক হজ এবং উমরা তো আছেই উপরন্তু আরো এক উমরা তার উপর ওয়াজিব হবে, অর্থাৎ এক হজ দুই উমরা পালন করবে। আর উমরার ইহরাম বাঁধলে শুধু এক উমরাই কাজা করতে হবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا زَالَ إِحْصَارُهُ الخ **:** এখানে অবরোধ দূরীভূত হওয়ার পরের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে বাধা চলে যাওয়ার পর তাদের হজের দিকে রওয়ানা করা আবশ্যক। তবে বিবেচনা করতে হবে যে, তার প্রেরিত হাদী জবাইয়ের পূর্বে সে স্থানে পৌঁছবে কিনা এবং সময় মতো হজ পাবে কিনা। যদি হজ পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাব্যতা থাকে, তবে নিশ্চয়ই যেতে হবে। আর যদি সেরূপ সময় না থাকে, তবে হজের দিকে যাওয়া আবশ্যক নয় ; বরং কুরবানির পশু জবাইয়ের নির্ধারিত তারিখে মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হয়ে যাবে। তাছাড়া যদি দুটির একটি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে বাধাপ্রাপ্ত স্থানে নির্দিষ্ট সময় হালাল হওয়া বৈধ। এটাই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইনের মতে উভয়টি পাওয়াই শর্ত। কারণ, জবাইয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের মতে কুরবানির দিনের পূর্বে কুরবানির পশু জবাই করা বৈধ নয়

فَإِنَّهُ يُمْكِنُ إِدْرَاكُ الْحَجِّ بِدُوْنِ إِدْرَاكِ الْهَدْيِ إِذْ عِنْدَهُ يَجُوْزُ الذَّبْحُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَيُعْتَبَرُ إِدْرَاكُ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ لِأَنَّ الذَّبْحَ لَايَجُوْزُ إِلَّا فِيْ يَوْمِ النَّحْرِ فَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَدْرَكَ الْهَدْيَ وَمَنْعُهُ عَنْ رُكْنَيِ الْحَجِّ بِمَكَّةَ إِحْصَارٌ وَعَنْ أَحَدِهِمَا لَا وَمَنْ عَجَزَ فَأَحَجَّ صَحَّ وَيَقَعُ عَنْهُ إِنْ دَامَ عَجْزُهُ إِلَى مَوْتِهِ وَنَوَى الْحَجَّ عَنْهُ وَمَنْ حَجَّ عَنْ آمِرَيْهِ وَقَعَ عَنْهُ وَضَمِنَ مَالَهُمَا وَلَا يَجْعَلُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا وَلَهُ ذٰلِكَ إِنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَيْ مُتَبَرِّعٌ يَجْعَلُ ثَوَابَهُ عَنْهُمَا وَدَمُ الْإِحْصَارِ عَلَى الْآمِرِ وَفِيْ مَالِهِ مَيْتًا وَدَمُ الْقِرَانِ وَالْجِنَايَةِ عَلَى الْحَاجِّ أَيْ إِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يَقْرِنَ عَنْهُ فَدَمُ الْقِرَانِ عَلَى الْمَأْمُوْرِ ـ

অনুবাদ : কারণ তাঁর নিকট কুরবানির পশু প্রাপ্তি ছাড়া হজ প্রাপ্তি সম্ভব। কেননা, তাঁর মতে কুরবানির দিনের পূর্বে জবাই করা বৈধ। কিন্তু সাহেবাইনের মতে হজ ও কুরবানির পশু উভয়ই পেতে হবে। কেননা, তাঁদের মতে কুরবানির দিন ছাড়া জবাই করা জায়েজ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ পেল, সে কুরবানির পশুও পেল। আর মক্কা শরীফে মুহরিমকে হজের দুই রোকন হতে বাধা দান করাই ইহসার। একটি মাত্র রোকন হতে বাধা দান করা ইহসার নয়। আর যে ব্যক্তি হজ হতে অসমর্থ হয়ে গেছে এবং অন্যের দ্বারা হজ করিয়েছে, তবে শুদ্ধ হবে। আর এ হজ সে অক্ষমের পক্ষ হতে হবে– এ শর্তে যে, তার অক্ষমতা তার মৃত্যু পর্যন্ত বলবৎ থাকে এবং প্রতিনিধি অক্ষমের পক্ষ হতে হজের নিয়ত করে। আর যে ব্যক্তি দুই নির্দেশকারীর পক্ষ হতে হজ করে সে হজ তার পক্ষ হতে হবে এবং হজকারী উভয়ের প্রদত্ত মালের জিম্মাদার হবে। আর এ হজ একজনের জন্য নির্ধারণ করতে পারবে না। যদি সে ব্যক্তি নিজ পিতামাতার জন্য নফল হজ করে, তবে বৈধ হবে। অর্থাৎ নফল হিসেবে সে হজের ছওয়াব নিজ পিতামাতার জন্য নির্ধারণ করতে পারে। আর অপরাধের দম দায়িত্ব অর্পণকারীর উপর বর্তাবে। আর দায়িত্ব অর্পণকারীর মৃত্যুর পর তার মাল হতে দম প্রদান করা ওয়াজিব হবে। কিরানের দম এবং অপরাধের দম হাজী তথা নির্দেশিত ব্যক্তির উপর অর্থাৎ যদি কেউ অন্য কাউকে তার পক্ষ হতে কিরান হজ করার হুকুম করে, তবে কিরানের দম আদিষ্ট ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْعُهُ عَنْ رُكْنَيِ الْحَجِّ الخ : এখানে অবরোধ হওয়ার হুকুম বর্ণনা করা হচ্ছে। যদি কেউ হজের দুই রোকন অর্থাৎ আরাফায় অবস্থান এবং তাওয়াফে যিয়ারত হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সত্যিই সে বাধাপ্রাপ্ত হলো। কেননা, হজের ইহরামের পর এ দুটি রোকনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি একটি রোকন হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে সে প্রকৃতপক্ষে বাধাপ্রাপ্ত হিসেবে পরিগণিত নয়। কারণ, তখন সে রোকন নিশ্চয়ই তাওয়াফে যিয়ারতই হবে এবং নিশ্চয়ই সে আরাফায় অবস্থানের পর বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আর مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ الْحَجُّ -এর সূত্রে তাকে বাধাপ্রাপ্ত বলা যাবে না। কারণ, বাধা প্রদান সম্পৃক্ত রোকনের প্রতিকার হলো দম। কিন্তু আরাফায় অবস্থানের কোনো প্রতিকার নেই।

قَوْلُهُ وَمَنْ عَجَزَ الخ : এখানে বদলী হজের হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বদলী হজের নিয়ম হচ্ছে– সকল ইবাদত দৈহিক, তাতে মালের কিছুই নেই। যেমন– নামাজ, রোজা ইত্যাদি। এগুলোতে প্রতিনিধিত্ব করা বৈধ নয়। আর যে সকল ইবাদত শুধু মালী যথা– জাকাত, ফিতরা ইত্যাদি– তাতে শর্তহীনভাবে প্রতিনিধিত্ব করা চলে। কিন্তু যে ইবাদত মাল ও দেহের সমন্বয়ে সম্পাদন হয়, যেমন– হজ। এ ক্ষেত্রে যদি মুকাল্লাফ নিজে অক্ষম হয়, তবে অপর কাউকে তার প্রতিনিধি বানিয়ে হজে পাঠাতে পারে। তখন উক্ত হজ প্রেরণকারীর পক্ষ হতে আদায় হবে। আর প্রতিনিধি ইহরাম বাঁধার সময় বলবে– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ مِنْ جَانِبِ فُلَانٍ 'হে আল্লাহ! আমি অমুকের পক্ষ হতে হজের নিয়ত করছি।' অনুরূপ তালবিয়া পাঠেও বলবে– لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ 'অমুক ব্যক্তির পক্ষ হতে আমি হাজির।' তাতে অক্ষম ব্যক্তির হজ আদায় হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো যে, অক্ষম ব্যক্তির এ অক্ষমতা তার মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকতে হবে, নতুবা তাকে পুনরায় হজ করতে হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ حَجَّ عَنْ اٰمِرَيْهِ الخ : দুজন অক্ষম ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে কিংবা পৃথক পৃথকভাবে একই ব্যক্তিকে যদি হজের প্রতিনিধি নিয়োগ করে এবং প্রতিনিধি যদি তাদের পক্ষে হজ আদায় করে, তাহলে এ হজ ঐ দুই ব্যক্তির কারো পক্ষে আদায় হবে না; অধিকন্তু এ হজ প্রতিনিধির পক্ষে আদায় হবে।

তবে প্রেরণকারীদ্বয় যে টাকা তাকে দিয়েছে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু প্রতিনিধি যদি এ হজকে ঐ দুই জনের কোনো একজনের জন্য ধার্য করে তা জায়েজ হবে না। প্রতিনিধিত্বমূলক হজ যাকে বদলী হজ বলে তার বেলায় এরূপ করা শরিয়তে বৈধ নয়। হ্যাঁ, সে যদি তার মা-বাবার উভয়ের পক্ষে নিয়ত করে নফল হজ পালন করে, তা জায়েজ হবে এবং এর ছওয়াব মা-বাবার নামে উৎসর্গ করা যাবে। এরূপ হজ মা-বাবা বলে কথা নয়, যে-কোনো ব্যক্তিদ্বয়ের পক্ষে করা যাবে।

قَوْلُهُ وَلَهُ ذٰلِكَ اِنْ حَجَّ الخ : এখানে পিতামাতার জন্য নফল হজের হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। যদি কোনো ব্যক্তি পিতামাতার পক্ষ হতে তাদের নির্দেশ ছাড়া হজ করে এবং পরে পিতা বা মাতা হতে কারো জন্য তা নির্দিষ্ট করে দেয়, তবে তা জায়েজ হবে। কেননা, তা প্রতিনিধিত্বমূলক হজ নয়; তা নফল হজ। আর নফল কাজের ছওয়াব অন্য কাউকে দান করা বৈধ ; বরং তার অধিকার রয়েছে যে, সে তার পুণ্য অন্য কাউকে দান করতে পারবে। তা শুধু পিতামাতার জন্য নয়; বরং যাকে ইচ্ছা দান করতে পারে।

قَوْلُهُ وَدَمُ الْقِرَانِ وَالْجِنَايَةِ الخ : অপারগ বা অক্ষম ব্যক্তি যাকে তার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে, সে যদি অবরুদ্ধ হয়, তবে তাকে অবরুদ্ধতার কারণে যে কুরবানির পশু মক্কায় পাঠাতে হবে তা ঐ অক্ষম ব্যক্তির উপর বর্তাবে। সে মারা গেলে তার পরিত্যক্ত মাল হতে এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কেননা, কেউ কাউকে কোনো কাজে পাঠালে সে কাজে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হলে সে বিঘ্ন কাটিয়ে দেওয়াও প্রেরকের উপর অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) মতানৈক্য করেছেন। জিনায়াতের দম তো প্রতিনিধির অপরাধের কারণে ওয়াজিব হবে, এর জন্য প্রেরক দায়ী হবে কেন ? আর কিরানের দম এজন্য ওয়াজিব হয় যে, প্রেরক তাকে হজের জন্য পাঠিয়েছিল; সে এর সাথে উমরা যোগ করে দম আবশ্যক করেছে। অতএব, তাও প্রতিনিধির উপর বর্তাবে। তবে বাধা প্রাপ্তির দমের ক্ষেত্রে প্রতিনিধির কোনো ত্রুটি নেই, ফলে তা প্রেরণকারীর উপর বর্তাবে।

وَضَمِنَ النَّفَقَةَ إِنْ جَامَعَ قَبْلَ وُقُوْفِهِ لَا بَعْدَهُ فَإِنْ مَاتَ فِى الطَّرِيْقِ يَحُجُّ مِنْ مَنْزِلِ اٰمِرِهٖ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ لَا مِنْ حَيْثُ مَاتَ اَىْ إِذَا اَوْصٰى اَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَاَحَجُّوْا عَنْهُ فَمَاتَ فِى الطَّرِيْقِ فَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَحُجُّ عَنْهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ فَإِنَّ قِسْمَةَ الْوَصِيِّ وَعَزْلَهُ الْمَالَ لَا يَصِحُّ اِلَّا بِالتَّسْلِيْمِ اِلَى الْوَجْهِ الَّذِىْ عَيَّنَهُ الْمُوْصِىْ وَلَمْ يُسْلِمْ اِلٰى ذٰلِكَ الْوَجْهِ لِاَنَّ ذٰلِكَ الْمَالَ قَدْ ضَاعَ فَيُنْفَذُ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) يُنْفَذُ مِنْ ثُلُثِ الْكُلِّ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) اِنْ بَقِيَ شَىْءٌ مِمَّا دَفَعَ اِلَى الْاَوَّلِ يُحَجُّ بِهٖ وَاِنْ لَمْ يَبْقَ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ ـ

অনুবাদ : হজের দায়িত্ব প্রদানকারীকে দায়িত্ব গ্রহণকারী খরচপত্র [যা সে পেয়েছে] ফেরত দেবে, যদি সে আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীসহবাস করে। আরাফায় অবস্থানের পরে সহবাস করলে ফেরত দিতে হবে না। যদি হজের জন্য প্রেরিত ব্যক্তি পথে মৃত্যুবরণ করে, তবে আদেশদাতার বাড়ি হতে আদেশদাতার অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ হতে হজ করাতে হবে। আদিষ্ট ব্যক্তি যেখানে মারা গেছে, সেখান হতে নয়। অর্থাৎ যখন কেউ তার পক্ষ হতে হজ করার জন্য অসিয়ত করে, অতঃপর তার পরবর্তীগণ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে তার অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা তার পক্ষ হতে হজ করাবে। কেননা, ওয়ারিশ কর্তৃক মাল বণ্টন করা এবং মাল পৃথক করা ঠিক হবে না ; তবে সে পদ্ধতিতে যে পদ্ধতিতে অসিয়তকারী নির্দিষ্ট করেছেন। অর্থাৎ তার পক্ষ হতে হজ সম্পাদন করা অথচ সেভাবে ওয়ারিশগণ সম্পাদন করেনি। কেননা, প্রতিনিধির হাতে অর্পণ করা সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে, অতএব অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ হতে অসিয়ত পূর্ণ করতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মৃতের সমস্ত মালের এক-তৃতীয়াংশ হতে হজের খরচ দিতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রথমবারের হজের খরচ হতে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তা দ্বারা হজ করাবে। আর যদি অবশিষ্ট কিছু না থাকে, তাহলে অসিয়ত বাতিল হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَضَمِنَ النَّفَقَةَ الخ : এখানে আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীসঙ্গম করার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। হজের জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি যদি আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীসহবাস করে, তাহলে তার হজ নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং আদেশকারী ব্যক্তি হজের জন্য যে খরচ করেছে, তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং আদিষ্ট ব্যক্তির ভঙ্গ করা হজ কাজা করা আর আদেশকারীর জন্য পুনঃ হজ করা ওয়াজিব হবে। আর যদি আরাফায় অবস্থানের পরে স্ত্রীসহবাস করে, তাহলে খরচ ফিরিয়ে দিতে হবে না। কেননা, আরাফায় অবস্থানের পর স্ত্রীসহবাস করলে হজ নষ্ট হবে না; বরং বুদনা কুরবানি করলে হজ বৈধ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَمَاتَ فِى الطَّرِيْقِ الخ : এখানে হজের আদিষ্ট ব্যক্তি পথে মারা গেলে তার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি হজের জন্য আদিষ্ট ও প্রেরিত হয়েছে ; সে ব্যক্তি যদি পথে মারা যায় বা পথের মধ্যে তাকে প্রদত্ত মাল চুরি হয়ে যায়, তখন সে হজের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রেরকের অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ ($\frac{১}{৩}$) হতে পুনঃ হজ করাতে হবে। আর পুনঃ হজ প্রেরকের বাড়ি হতে প্রয়োজনীয় খরচাদি দিয়ে করাতে হবে। সাহেবাইনের মতে প্রেরিত ব্যক্তি যেখানে মারা গেছে বা যেখানে চুরি হয়েছে সেখান হতে পুনঃ হজ করালে চলবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, সমস্ত মালের এক-তৃতীয়াংশ ($\frac{১}{৩}$) দ্বারা পুনঃ হজ করাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পথে মারা যাওয়ার সময় বা পথে চুরি হওয়ার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তা দ্বারা হজ করাবে। আর যদি তা হতে হাতে অবশিষ্ট কিছুই না থাকে, তাহলে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

بَابُ الْهَدْيِ

اَلْهَدْىُ مِنْ اِبِلٍ وَغَنَمٍ وَبَقَرٍ وَلَا يَجِبُ تَعْرِيْفُهُ اَىْ اَلذَّهَابُ بِهِ اِلٰى عَرَفَاتٍ وَقِيْلَ الْمُرَادُ اَلْاِعْلَامُ كَالتَّقْلِيْدِ وَلَمْ يَجُزْ فِيْهِ اِلَّا جَائِزَ الْاُضْحِيَّةِ وَجَازَ الْغَنَمُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ اِلَّا فِىْ طَوَافِ فَرْضٍ جُنُبًا وَ وَطْيُهُ بَعْدَ الْوُقُوْفِ وَاَكَلَ مِنْ هَدْيِ تَطَوُّعٍ وَمُتْعَةٍ وَقِرَانٍ فَحَسْبُ وَتَعَيَّنَ يَوْمُ النَّحْرِ لِذَبْحِ الْاَخِيْرَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مَتٰى شَاءَ كَمَا تَعَيَّنَ الْحَرَمُ لِلْكُلِّ لَا فَقِيْرُهُ لِصَدَقَتِهِ اَىْ لَا يَتَعَيَّنُ فَقِيْرُ الْحَرَمِ لِصَدَقَتِهِ ـ

পরিচ্ছেদ : [হজের] কুরবানির পশু

অনুবাদ : হাদী [হজের ক্ষেত্রে প্রেরিত জন্তু] উট, বকরি ও গরু হলেই চলে, আর একে আরাফায় নিয়ে যাওয়া আবশ্যক নয়। অর্থাৎ কেউ কেউ বলেন, تَعْرِيْف -এর অর্থ অবগতকরণ বা প্রচার। যেমন– তাকলীদ [গলায় হার পরানো]-এর মাধ্যমে প্রচার করা। হাদী [হজের ক্ষেত্রে প্রেরিত পশু]-এর জন্য ঐসব পশু প্রেরণ করা বৈধ যা দ্বারা কুরবানি সিদ্ধ হয়। যে-কোনো প্রকার দম প্রদান বকরি দ্বারা বৈধ, তবে অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করলে কিংবা আরাফায় অবস্থানের পর স্ত্রীসহবাস করলে– এ দু অবস্থায় বকরি দ্বারা দম প্রদান সিদ্ধ হবে না ; বরং গরু কিংবা উট জবাই করতে হবে। হাদী নফল হলে তার গোশ্‌ত ভক্ষণ করা যাবে, [এমনিভাবে] তামাত্তু' ও কিরান হজের হাদীর গোশ্‌ত ভক্ষণ করা যাবে। হজ্জে তামাত্তু' ও হজ্জে কিরানের হাদী জবাই করার নির্দিষ্ট তারিখ হলো কুরবানির দিন। এ দু প্রকার হাদী ব্যতীত অন্যান্য হাদীর পশু যেদিন ইচ্ছা জবাই করতে পারে। সকল প্রকার হাদী জবাই করার নির্দিষ্ট স্থান হলো হেরেম শরীফ। হেরেমের গরিব ও দুঃস্থ ব্যক্তিরাই সদকার জন্য নির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ হাদীর পশুর গোশত বণ্টনের ক্ষেত্রে কেবল হেরেমের ফকির ও দুঃস্থদের নির্দিষ্ট করলে চলবে না, সকল প্রকার দরিদ্র ও নিঃস্বকে দিতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْهَدْىُ مِنْ اِبِلٍ الخ : هَدْىٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– উপঢৌকন, হাদিয়া, তোহফা। শরিয়তের পরিভাষায় হাদী বলতে সে পশুকে বুঝায় যা হেরেম জেয়ারতকারী কুরবানির জন্য সাথে করে নিয়ে যায় বা কোনো উপায়ে সেখানে পৌঁছিয়ে দেয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ تَعْرِيْفُهُ الخ : এখানে হাদী সঙ্গে করে নিয়ে আরাফায় যাওয়ার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। হাদী সঙ্গে নিয়ে আরাফার ময়দানে যাওয়া ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ যদি কেউ তাকে আরাফায় নিয়ে গেল তা উত্তম হবে, এটাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন। কারো কারো মতে تَعْرِيْف -এর অর্থ– প্রচার করা। যেমন– হাদীর পশুর গলায় হার পরিয়ে প্রচার করা হয়।

قَوْلُهُ إِلَّا جَائِزَ الْأُضْحِيَّةِ الخ : এখানে হাদীর পশুর জন্য কি কি বিষয় শর্ত করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। যে সকল পশু যে সকল শর্তের সাথে কুরবানির জন্য উপযুক্ত ঐ সকল পশুই সকল শর্তের সাথে হাদীর জন্যও যোগ্য। যেমন– কুরবানির জন্য বকরির বয়স এক বছর, গরুর বয়স দু বছর এবং উটের বয়স পাঁচ বছর হওয়া শর্ত। কিন্তু ছয় মাসের বকরি যদি মোটাতাজায় এক বছরের বকরির ন্যায় দেখা যায়, তবে তা দ্বারা কুরবানি করা বৈধ হবে। সুতরাং এ সকল পশু দ্বারা হাদীও বৈধ হবে।

قَوْلُهُ وَجَازَ الْغَنَمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ الخ : প্রত্যেক ঐ দম হজের সাথে যার সম্পর্কযুক্ত যেমন– জেনায়াতের দম, শুকরিয়ার দম, ইহসারের দম। এ সকলের দমে বকরি দিতে হবে। তবে দুটি জেনায়াতের দমে উট দিতে হবে। দু'ট বিষয়ের একটি হলো অজুবিহীন অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করায়, অপরটি হলো আরাফায় অবস্থানের পরে এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সহবাস করায়। আলোচ্য বিষয়টি হজের ব্যাপারে। আর ওমরার তওয়াফের পূর্বে সহবাসের দ্বারা উট দেওয়া আবশ্যক হবে না।

قَوْلُهُ وَاَكَلَ مِنْ هَدْيِ الخ : হাদীর মালিক হাদীর গোশ্‌ত খেতে পারে। মূল কথা হচ্ছে, নফল দম, তামাত্তু'র দম, কিরানের দম ইত্যাদি কুরবানি স্থলে, অর্থাৎ কুরবানির গোশ্‌ত যেরূপ কুরবানিদাতা খেতে পারে সেরূপ দমের মালিকও দমের গোশত খেতে পারবে। মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী ﷺ স্বীয় হাদীর গোশ্‌ত খেয়েছেন। তবে উল্লিখিত দম ব্যতীত অন্যান্য জেনায়াতের দমের গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ নয়। আর কাফফারার প্রাণীর গোশ্‌ত মালিকের জন্য খাওয়া অবৈধ।

قَوْلُهُ وَتَعَيَّنَ يَوْمُ النَّحْرِ لخ : এখানে হজ্জে তামাত্তু' ও হজ্জে কিরানের কুরবানির সময় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। হজ্জে তামাত্তু' এবং কিরানের কুরবানির জন্য কুরবানির দিনসমূহের মধ্যে হওয়া আবশ্যক। কেননা, তা নুসুকের কুরবানি এজন্য তা কুরবানির অনুরূপই হয়েছে এবং তার ছওয়াব নির্ধারিত দিনেই মিলবে। তবে এ দুটি দম ব্যতীত আর যত দম রয়েছে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কুরবানি করতে পারবে। তবে এতটুকু আবশ্যক যে, এদেরকে হেরেমের মধ্যে জবাই করতে হবে। কেননা, এ প্রাণীটি হেরেমে পৌঁছার পরে তা হাদী হবে।

قَوْلُهُ لَا فَقِيْرُهُ لِصَدَقَتِهِ : আর হাদীর সদকার জন্য হেরেম শরীফে দরিদ্র হওয়া আবশ্যক নয় ; বরং তা হেরেম এবং হিল-এর দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করা যাবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ এ ব্যাপারে ব্যাপক।

وَتَصَدَّقَ بِجُلِّهِ وَخِطَامِهِ وَلَمْ يُعْطَ اُجْرَةُ الْجَزَّارِ مِنْهُ وَلَا يَرْكَبُ اِلَّا ضَرُوْرَةً وَلَا يَحْلِبُ لَبَنَهُ وَيَقْطَعُهُ بِنَضْحِ ضَرْعِهِ بِمَاءٍ بَرْدٍ وَمَا عَطَبَ اَوْ تَعَيَّبَ بِفَاحِشٍ اَىْ ذَهَبَ اَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ ذَنْبِهِ اَوْ اُذُنِهِ اَوْ عَيْنِهِ فَفِىْ وَاجِبِهِ اِبْدَالُهُ وَالْمُعَيَّبُ لَهُ وَفِىْ نَفْلِهِ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ : হাদীর জন্তুর ঝুল এবং তার লাগাম সদকা করে দেবে। উক্ত হাদীর গোশ্ত হতে কসাইয়ের মজুরি দেওয়া যাবে না, প্রয়োজন ব্যতীত তাতে আরোহণও করা যাবে না, এর দুধ দোহন করা যাবে না। তার স্তনে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দিয়ে দুধ বন্ধ করিয়ে দিতে হবে। আর যে প্রাণী ধ্বংস প্রায় বা অধিক দোষযুক্ত হয়, অর্থাৎ লেজের এক-তৃতীয়াংশ কেটে গেছে বা কান কেটে গেছে বা চক্ষু চলে গেছে, তাহলে ওয়াজিব হাদীর ক্ষেত্রে তা বদলিয়ে ফেলা ওয়াজিব এবং দোষী প্রাণীটি মালিকের জন্য হবে। আর নফল হাদীর ব্যাপারে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَصَدَّقَ بِجُلِّهِ وَخِطَامِهِ الخ : যে ঝুল উটের পিঠের উপর বসার জন্যে তৈরি করা হয়, তা এবং লাগামের রশি ইত্যাদি সকল কিছু দান করে দিতে হবে। কেননা, মহানবী ﷺ এ কাজের জন্য আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-কে যখন আদেশ প্রদান করেন, তখন এটা-ও বলেছিলেন যে, এর ঝুল ও লাগাম দান করে দেবে এবং কসাইয়ের মজুরি তা হতে দেবে না।

قَوْلُهُ وَلَا يَرْكَبُ اِلَّا ضَرُوْرَةً : অর্থাৎ অতি প্রয়োজন ছাড়া বুদনার উপর আরোহণ করবে না। অবশ্য প্রয়োজনের কারণে আরোহণ করতে পারে। শায়খাইনের বর্ণনাতে রয়েছে যে, মহানবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বুদনা তাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন, এর উপর আরোহণ কর। [সম্ভবত লোকটির পায়ে হেঁটে চলতে কষ্ট হচ্ছিল এবং মহানবী ﷺ তার কষ্ট অনুভব করতে পেরেছিলেন, ফলে লোকটিকে সেরকম বলেন।] লোকটি বলল, তা যে বুদনা! মহানবী ﷺ পুনরায় বলেন, সওয়ার হও। এটা তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক বলেছেন।

قَوْلُهُ وَلَا يَحْلِبُ لَبَنَهُ الخ : এখানে বুদনার দুধ দোহনের বিধান আলোচিত হয়েছে। বুদনার দুধ দোহন করা বৈধ নয় ; কিন্তু যদি কেউ দোহন করে ফেলে তাহলে তা সদকা করে দেবে, আর যদি দুধের কারণে তার কষ্ট হয় তবে দুধ দোহন করে সদকা করে দেবে যদি জবাই করতে বিলম্ব হয়। নতুবা স্তনে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দুধকে জমাট করিয়ে রাখবে।

قَوْلُهُ وَمَا عَطَبَ اَوْ تَعَيَّبَ الخ : এখানে হাদীর পশুর গ্রহণযোগ্য ক্ষতির পরিমাণের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। যে জন্তুর মৃত্যু অত্যাসন্ন, অথবা বিশেষ দোষে দোষী হয়ে গেছে। যেমন– লেজ কেটে গেছে বা কান কেটে গেছে, তাহলে এরূপ জন্তু হাদীর জন্তু হিসেবে জবাই করা বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ فَفِىْ وَاجِبِهِ اِبْدَالُهُ الخ : দোষী জন্তু যদি ওয়াজিব দম হয়, তাহলে একে জবাই করা বৈধ হবে না ; বরং নির্দোষ জন্তু তার পরিবর্তে জবাই করবে। পক্ষান্তরে যদি নফল দম হয়, তাহলে দোষী জন্তু দম হিসেবে জবাই করলে তার উপর কিছুই আবশ্যক হবে না।

وَنَحَرَ بَدَنَةَ النَّفْلِ اِنْ عَطِبَتْ فِى الطَّرِيْقِ وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا وَضَرَبَ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهَا لِيَأْكُلَ مِنْهُ الْفَقِيْرُ لَا الْغَنِيُّ وَاِنْ شَهِدُوْا بِوُقُوْفِهِمْ بَعْدَ وَقْتِهِ لَا تُقْبَلُ اَىْ اِذَا وَقَفَ النَّاسُ وَشَهِدَ قَوْمٌ اَنَّهُمْ وَقَفُوْا بَعْدَ يَوْمِ عَرَفَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِاَنَّ التَّدَارُكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَيَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ فِتْنَةٌ كَمَا اِذَا شَهِدُوْا عَشِيَّةَ يَوْمٍ يَعْتَقِدُ النَّاسُ اَنَّهُ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِىْ لَيْلَةٍ يَصِيْرُ هٰذَا الْيَوْمُ بِاِعْتِبَارِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَاِنَّهُ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ لِاَنَّ اِجْتِمَاعَ النَّاسِ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ مُتَعَذِّرٌ فَفِىْ قَبُوْلِ الشَّهَادَةِ وُقُوْعُ الْفِتْنَةِ ـ

অনুবাদ : যদি নফল বুদনা রাস্তায় ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়, তখন এটাকে নহর করে তার রক্ত দ্বারা তার ক্ষুর রাঙ্গিয়ে দেবে এবং তার সে ক্ষুর ঝুঁটির এক পার্শ্বে মারবে, যাতে দরিদ্র ব্যক্তিরাই তা ভক্ষণ করে, ধনীরা না খায়। যদি একদল লোক অপর একদলের যথাসময়ের পরে আরাফায় অবস্থানের সাক্ষ্য দেয়, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। অর্থাৎ যখন লোকজন আরাফায় অবস্থান করতে থাকে, তখন এক সম্প্রদায় এসে সাক্ষ্য দিল যে, এরা আরাফার দিনের পরে আরাফায় অবস্থান করেছে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, এখন এর প্রতিকার অসম্ভব এবং মানুষের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি হবে। যেমন– এক সম্প্রদায় ঐ দিন সন্ধ্যায় যে দিনটি সম্পর্কে মানুষ তারবিয়ার দিন মনে করে– এমন এক রাতে চাঁদ দেখেছে বলে সাক্ষ্য দিল যে, সে হিসেবে বর্তমান দিনটি আরাফার দিবস হয়, তবে সে অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কেননা, এ রাত্রেই সকলের আরাফায় জমায়েত হওয়া কষ্টসাধ্য। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা মাত্র।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِيَأْكُلَ مِنْهُ الْفَقِيْرُ الخ : এখানে হাদীর মালাকে রঞ্জিত ও কুঁজে দাগ লাগানোর কারণ দর্শানো হচ্ছে। হাদীর মালাকে এভাবে রঞ্জিত করা এবং এর কুঁজে দাগ লাগানো দ্বারা জনগণ বুঝতে পারে যে, এটা হচ্ছে– হাদীর প্রাণী, তা দ্বারা হেরেমের নৈকট্য অর্জন করা হয়। সুতরাং কোনো ধনী ব্যক্তি এর গোশ্‌ত ভক্ষণ করবে না ; বরং ফকির-মিসকিনই এর গোশ্‌ত ভক্ষণ করবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ شَهِدُوْا الخ : এখানে সাক্ষ্য গ্রহণ করা না করা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হচ্ছে। যদি একদল লোক এমন সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আরাফার অবস্থান নির্দিষ্ট তারিখে হয়নি, তবে তাদের এ সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে। কেননা, এখন তা পূরণ করা অসম্ভব। এমতাবস্থায় ইমাম যদি আরাফায় অবস্থান হয়নি বলে ঘোষণা প্রদান করেন, তবে হাজীদের মধ্যে বিরাট হট্টগোল সৃষ্টি হবে।

হেদায়া গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন মরগেনানী (র) উল্লেখ করেছেন যে, আরাফায় অবস্থানকারীদেরকে একদল লোক বলল যে, আপনাদের এ অবস্থান নয় তারিখে হয়নি– কুরবানির দিনে হয়েছে, তাহলে তাদের অবস্থান বৈধ হবে। কেননা, এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। অবশ্য এ সাক্ষ্য যদি কুরবানির দিনে না হয়ে আট তারিখে অবস্থান হয়েছে বলে সাক্ষ্য দিত, তবে নয় তারিখে অবস্থান করা যেত, ইমাম তখন আরাফায় অবস্থান সহীহ হয়নি বলে ঘোষণা করলে এর ব্যবস্থা করা যেত যে, নবম তারিখে পুনরায় অবস্থান করে তা পূরণ করা হবে। কিন্তু কুরবানির দিন হলে তা অসম্ভব হবে। তাই ফকীহগণ বলেন, এমতাবস্থায় এ রকম সাক্ষ্য গ্রহণ না করা ইমামের কর্তব্য ; বরং সকলের হজ পরিপূর্ণ হয়েছে বলে ঘোষণা করা তার দায়িত্ব। অন্যথায় একদল লোকের সাক্ষ্য গ্রাহ্য করে লক্ষ লক্ষ লোকের হজ হয়নি বলে ঘোষণা করলে এক বিরাট ফিতনার সম্মুখীন হতে হবে এবং আগামী বছর সকলকে পুনরায় হজ করার জন্য এ দুঃসহ কষ্ট দেওয়া কোনো মতেই উচিত হবে না।

وَقَبْلَ وَقْتِهِ قُبِلَتْ لَفْظُ الْهِدَايَةِ اِعْتِبَارًا بِمَا اِذَا وَقَفُوْا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَدْ كُتِبَ فِى الْحَوَاشِىْ شَهِدَ قَوْمٌ اَنَّ النَّاسَ وَقَفُوْا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ اَقُوْلُ صُوْرَةُ هٰذِهِ الْمَسْاَلَةِ مُشْكِلَةٌ لِاَنَّ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ لَا تَكُوْنُ اِلَّا بِاَنَّ الْهِلَالَ لَمْ يَرَ لَيْلَةَ كَذَا وَهُوَ لَيْلَةُ يَوْمِ الثَّلٰثِيْنَ بَلْ رُئِىَ لَيْلَةً بَعْدَهٗ وَكَانَ شَهْرُ ذِى الْقَعْدَةِ تَامًّا وَمِثْلُ هٰذِهِ الشَّهَادَةِ لَا تُقْبَلُ لِاِحْتِمَالِ كَوْنِ ذِى الْقَعْدَةِ تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ وَصُوْرَةُ الْمَسْاَلَةِ اَنَّ النَّاسَ وَقَفُوْا ثُمَّ عَلِمُوْا بَعْدَ الْوُقُوْفِ اَنَّهُمْ غَلَطُوْا فِى الْحِسَابِ وَكَانَ الْوُقُوْفُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاِنْ عُلِمَ هٰذَا الْمَعْنٰى قَبْلَ الْوَقْتِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ التَّدَارُكُ فَالْاِمَامُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْوُقُوْفِ وَاِنْ عُلِمَ ذٰلِكَ فِىْ وَقْتٍ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهٗ فَبِنَاءً عَلَى الدَّلِيْلِ الْاَوَّلِ وَهُوَ تَعَذُّرُ اِمْكَانِ التَّدَارُكِ يَنْبَغِىْ اَنْ لَا يُعْتَبَرَ هٰذَا الْمَعْنٰى وَيُقَالُ قَدْ تَمَّ حَجُّ النَّاسِ وَاَمَّا بِنَاءً عَلَى الدَّلِيْلِ الثَّانِىْ وَهُوَ اَنَّ جَوَازَ الْمُقَدَّمِ لَا نَظِيْرَ لَهٗ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ ـ

অনুবাদ : আরাফায় অবস্থানের দিনের পূর্বে সাক্ষ্য দিলে উক্ত সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণযোগ্য হবে। হিদায়া গ্রন্থকারের ভাষ্য– اِعْتِبَارًا بِمَا اِذَا وَقَفُوْا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ [অর্থাৎ এ কথার উপর অনুমান করে যে, যখন তারা তারবিয়ার দিন আরাফায় অবস্থান করল]। আর হেদায়া গ্রন্থের পার্শ্বটীকায় লেখা আছে– شَهِدَ قَوْمٌ اَنَّ النَّاسَ وَقَفُوْا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ অর্থাৎ একদল লোক সাক্ষ্য প্রদান করল যে, হজ আদায়কারীগণ তারবিয়ার দিনে আরাফায় অবস্থান করেছে। বিকায়ার ব্যাখ্যাকারী বলেন, এ মাসআলার প্রকৃতি নির্ণয় করা কঠিন। কেননা, এ সাক্ষ্য গ্রহণ তখনই ঠিক হবে যখন জিলহজ মাসের চাঁদ জিলকদ মাসের ত্রিশতম রাত্রিতে পরিদৃষ্ট হয়নি ; বরং এর পরে পরিদৃষ্ট হয়েছে। আর জিলকদ মাস পূর্ণ ত্রিশ দিনের হয়। আর এরূপ সাক্ষ্য জিলকদ মাস উনত্রিশ দিনে হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে গৃহীত হবে না। মাসআলার ধরন এরূপ হবে যে, হজ আদায়কারী ব্যক্তিরা আরাফায় অবস্থান করেছে, অতঃপর অবস্থানের পরে জানতে পেরেছে যে, তারিখের হিসাবে ভুল হয়ে গেছে এবং আরাফায় অবস্থানের দিন ৮ই জিলহজ ছিল। যদি এ তথ্য [আরাফায় অবস্থানের নির্ধারিত] সময়ের পূর্বে এভাবে জানা যায় যে, তা সংশোধন করা সম্ভবপর, তাহলে ইমাম হজ আদায়কারীদেরকে আরাফায় অবস্থানের নির্দেশ দেবেন। আর যদি তা এমন সময় জানা যায় যে, এর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর নয়, তাহলে প্রথম দলিলের উপর ভিত্তি করে [বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ অসম্ভব] এ তথ্য গ্রহণযোগ্য বলে ধরা যাবে না। এমতাবস্থায় ঘোষণা করে দিতে হবে যে, সকল হজকারীর হজ পূর্ণ হয়েছে। আর দ্বিতীয় দলিল [নির্দিষ্ট সময়ে পালিত অনুষ্ঠান উক্ত সময়সীমার পূর্বে পালিত হওয়ার দৃষ্টান্ত নেই]-এর ভিত্তিতে হজ সিদ্ধ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقَبْلَ وَقْتِهِ الخ : এখানে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কাজ সম্পন্ন করার বিধান আলোচিত হচ্ছে। যদি জনতা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আপনি আজ আরাফায় অবস্থান করছেন, বস্তুত আজ আরাফার দিন নয় এবং আজ তারবিয়ার দিন অর্থাৎ জিলহজের আট তারিখ, তখন এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এ সাক্ষ্য আরাফায় অবস্থান ফওত হওয়ার ফলে নয়, বরং

সময়ের পূর্বে হওয়ার ফলে এর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে এবং নয় তারিখে পুনরায় আরাফায় অবস্থান করার নির্দেশ দেওয়া হবে। আর তাতে যেহেতু দ্বিতীয়বার হজের হুকুম দেওয়া হয়নি, তাই কোনো অসুবিধা নেই এবং মানুষের মধ্যে ফিতনারও সম্ভাবনা থাকবে না।

قَوْلُهُ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةُ مُشْكِلَةٌ الخ : এখানে তারবিয়ার তারিখে অবস্থানের সম্ভাবনা না হওয়ার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। তারবিয়ার তারিখে অবস্থানের সম্ভাবনা না থাকার কারণ হচ্ছে– তারা যখন জিলকদের ত্রিশ তারিখে চাঁদ দৃষ্ট হওয়ার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে অবস্থান করল, আর একদল লোক এসে সে তারিখকে জিলহজের আট তারিখ বলে দিল; তাদের সাক্ষ্য বাতিল হবে। কেননা, এতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা ত্রিশ তারিখে চাঁদ দেখেনি। কারণ, তাদের এ হিসেবে জিলকদ মাস আটাশ তারিখে হয়। এখন এ সাক্ষ্য না-বাচকের উপর হবে। তাই তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এখন গ্রন্থকার এবং তার পূর্বেকার পার্শ্বটীকা লেখকদের বর্ণনা [তাদের সাক্ষ্য এমতাবস্থায় গ্রহণ করা যাবে] কিভাবে ধর্তব্য হবে? আল্লামা ইবনে হুমাম ফতহুল কাদীর গ্রন্থে লিখেছেন যে, যদি সে তারবিয়ার দিনকে আরাফার দিন ধারণা করে অবস্থান করে, তাহলে যে ব্যক্তি তার আট তারিখ হওয়ার সাক্ষ্য দেবে, সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না। আট তারিখ হওয়ার ধারণা এজন্য হয়েছে যে, জিলকদ মাস পূর্ণ ত্রিশ দিনের হলেও আজ আট তারিখ হবে। আজ নবম তারিখের ধারণা এ হিসেবে হবে যে, জিলকদ মাস উনত্রিশ দিনের ছিল। সুতরাং এ সাক্ষ্য হ্যাঁ-বাচক ছিল বলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَصُوْرَةُ الْمَسْأَلَةِ الخ : এখানে বিভ্রান্তিজনক মাসআলার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। তারা তাদের ধারণাপ্রসূত একটি দিনকে নয় তারিখ মনে করে আরাফায় অবস্থান করেছে, অথচ পরে জানা গেল যে, তা নয় তারিখ ছিল না ; বরং আট তারিখ হিসাব করে নিশ্চিতভাবে বুঝা গেল যে, তা তারবিয়ার দিন। সুতরাং পরদিন নয় তারিখ সে তারিখে পুনরায় আরাফায় অবস্থান সম্ভব। কিন্তু সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে এরূপ করা সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ وَهُوَ اَنَّ جَوَازَ الْمُقَدَّمِ الخ : এখানে একটি সমস্যার নিরসন সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। কারণ শরিয়তের এমন কোনো ইবাদত এ রকম পাওয়া যায় না, যা বিশেষ কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট এবং সময়ের পূর্বে করা যায়। অবশ্য সময়ের পরে করা যেতে পারে। যথা– কাজা করা। এখানে একটি প্রশ্ন করা যায় যে, সময়ের আগে করারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন– ফিতরা সময়ের আগে দিয়ে দিলেও আদায় হয়ে যায় এবং আরাফার দিন হাজীদের জন্য আসরের নামাজ জোহরের সময় পড়া। এসব মাসআলার উত্তর হচ্ছে, তা কিয়াস বহির্ভূত, ফলে এর উপর অন্য কিছু কিয়াস করা যাবে না।

رَمٰى فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ لَا الْاُوْلٰى فَاِنْ رَمَى الْكُلَّ فَحَسَنٌ وَجَازَ الْاُوْلٰى وَحْدَهَا اَىْ اِنْ رَمٰى فِى الْيَوْمِ الثَّانِى الْجَمْرَةَ الْوُسْطٰى وَالثَّالِثَةَ وَلَمْ يَرْمِ الْاُوْلٰى فَعِنْدَ الْقَضَاءِ اِنْ رَمَى الْكُلَّ فَحَسَنٌ وَاِنْ قَضَى الْاُوْلٰى وَحْدَهَا جَازَ نَذَرَ حَجًّا مَشْيًا مَشٰى حَتّٰى يَطُوْفَ الْفَرْضَ اَىْ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ جَازَ لَهٗ اَنْ يَرْكَبَ اِشْتَرٰى جَارِيَةً مُحْرِمَةً بِالْاِذْنِ لَهٗ اَنْ يُحَلِّلَهَا بِقَصِّ شَعْرٍ اَوْ بِقَلْمِ ظُفْرٍ ثُمَّ يُجَامِعُ وَهُوَ اَوْلٰى مِنْ اَنْ يُحَلِّلَ بِجِمَاعٍ فَقَوْلُهٗ بِالْاِذْنِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ مُحْرِمَةً اَىْ اَحْرَمَتْ بِاِذْنِ الْمَالِكِ حَتّٰى لَوْ اَحْرَمَتْ بِلَا اِذْنِهٖ فَلَا اِعْتِبَارَ لَهٗ ـ

অনুবাদ : কেউ জিলহজের এগারো তারিখের জামরায়ে উলা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট জামরার প্রস্তর নিক্ষেপণ কার্য সমাধান করল। অতঃপর কাজার সময় যদি তিনটি জামরায়ই প্রস্তর নিক্ষেপণ কার্য সম্পন্ন করে, তবে তা উত্তম। আর যদি কেবলমাত্র প্রথম জামরার প্রস্তর নিক্ষেপণ কার্য সম্পন্ন করে তাও বৈধ। অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন যদি মধ্যম ও তৃতীয় জামরার প্রস্তর নিক্ষেপণ কার্য সমাপন করে এবং প্রথম জামরার প্রস্তর নিক্ষেপণ কার্য না করে থাকে, তাহলে কাজার সময় যদি সকল জামরার প্রস্তর নিক্ষেপণ কার্য সম্পন্ন করে তবে উত্তম। আর যদি শুধুমাত্র প্রথমটির কাজা করে তাও বৈধ। কেউ পায়ে হেঁটে হজব্রত পালন করবে বলে মানত করলে, সে তাওয়াফে যিয়ারত পর্যন্ত পদব্রজে গমন করবে। অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারতের পর সওয়ারির উপর আরোহণ করা তার জন্য বৈধ। কেউ যদি এমন একটি দাসী ক্রয় করে, যে তার মনিবের অনুমতিক্রমে ইহরাম বেঁধেছে, তাহলে ক্রেতার পক্ষে তার ইহরাম ভঙ্গ করানো বৈধ। তা এভাবে যে, তার কেশ কর্তন করবে, কিংবা নখ কেটে দেবে, অতঃপর তার সাথে সহবাস করবে। কেবলমাত্র সহবাস দ্বারা হালাল করার চেয়ে তা উত্তম। বিকায়া গ্রন্থকারের উক্তি بِالْاِذْنِ তার অন্য উক্তি مُحْرِمَةً-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ মনিবের অনুমতি নিয়ে ইহরাম বেঁধেছে। আর মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে যদি ইহরাম বাঁধে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ رَمٰى فِى الْيَوْمِ الخ : বলাই বাহুল্য, ১০ জিলহজ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ শুরু হয়। এ দিনে কেবল তৃতীয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়। দ্বিতীয় দিন তথা ১১ জিলহজ তারিখে তিনটি জামরাতেই ৯টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়। এখন কেউ যদি দ্বিতীয় দিনে প্রথম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেয় এবং শুধু ২য় ও ৩য় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে, তাহলে প্রথম জামরার ৯টি কঙ্কর কাজা করতে হবে। কাজা করার সময় পালনকারী যদি পুনরায় তিনটি জামরাতে ২৭টি কঙ্কর নিক্ষে করেন, তবে তাই উত্তম। তবে সে যেহেতু প্রথম জামরার 'রমী' ত্যাগ করেছে তাই প্রথম জামরার 'রমী' কাজা করলেই চলবে।

قَوْلُهٗ وَجَازَ الْاُوْلٰى وَحْدَهَا الخ : এখানে বর্জন করা কঙ্কর নিক্ষেপের হুকুম বর্ণনা করা হচ্ছে। যদি কেউ প্রথম জামরার কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেয় এবং পরে শুধু ছেড়ে দেওয়া জামরার কঙ্করই নিক্ষেপ করে, তাহলে তার জন্য তা বৈধ হবে। কেননা, সে যা ছেড়ে দিয়েছে তা কাজা করা তার জন্য কর্তব্য। তা ছাড়া প্রত্যেক জামরার কঙ্কর নিক্ষেপ করা একটি পৃথক ইবাদত, তাই ছেড়ে দেওয়া জামরার কাজা করতে অন্য জামরার কোনো ব্যাপার নেই।

قَوْلُهُ مَشْى حَتّٰى يَطُوْفَ الْفَرْضَ الخ : কেউ যদি পায়ে হেঁটে হজ করার মানত করে, তবে বায়তুল্লায় গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করা পর্যন্ত পায়ে হাঁটা আবশ্যক। তাওয়াফে যিয়ারতের পর ইচ্ছে করলে বাহনে চড়া যাবে, ইচ্ছে করলে পায়ে হেঁটেও বাকি কাজ সমাধা করতে পারবে।

قَوْلُهُ اَنْ يُحَلِّلَ الخ : কোনো দাসী তার মনিবের অনুমতিক্রমে ইহরাম বাঁধল পরে তাকে অন্যের নিকট বিক্রয় করল, তখন ক্রেতার জন্য অধিকার আছে যে, দাসীর চুল বা নখ কাটানোর দ্বারা তার ইহরাম ভঙ্গ করাতে পারবে এবং ক্রেতা সঙ্গমের মাধ্যমে তার ইহরাম ভঙ্গ করানোর অধিকারও রাখে। তবে সঙ্গমের মাধ্যমে তার ইহরাম ভঙ্গ করানোর তুলনায় চুল, নখ কেটে ইহরাম ভঙ্গ করানো উত্তম। (كَذَا فِىْ عُمْدَةِ الرِّعَايَةِ فِىْ حَلِّ شَرْحِ الْوِقَايَةِ)

فَلَا اِعْتِبَارَ لَهُ : বিকায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেন, দাসী যদি তার মনিবের অনুমতি সাপেক্ষে হজের ইহরাম বাঁধে, তাহলে তার ইহরাম গ্রহণযোগ্য হবে। কাজেই তাকে কেউ ক্রয় করলে নিয়মানুযায়ী চুল বা নখ কর্তন করে, তাকে ইহরাম থেকে হালাল করতে হবে।

আর যদি মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে সে ইহরাম বেঁধে থাকে, তবে তার ইহরাম গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, দাসীর ব্যক্তি মালিকানা নেই। কাজেই এরূপ দাসী ক্রয় করলে তার ইহরাম ভাঙ্গার কোনো প্রয়োজন নেই। সরাসরি তার সাথে সঙ্গম করা জায়েজ হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

١. "كِتَابُ الْحَجِّ : يَجِبُ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ صَحِيْحٍ بَصِيْرٍ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَضْلًا عَمَّا لَابُدَّ مِنْهُ وَ عَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ اِلٰى حِيْنِ عَوْدِهٖ مَعَ اَمْنِ الطَّرِيْقِ وَالزَّوْجُ اَوِ الْمُحْرِمُ لِلْمَرْأَةِ اِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسِيْرَةُ سَفَرٍ فِى الْعُمُرِ مَرَّةً عَلَى الْفَوْرِ" ـ اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ مَعَ بَيَانِ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ بِحَيْثُ يَتَّضِحُ مَبْنٰى اِخْتِلَافٍ وَثَمْرَتَهُ ـ

٢. مَا مَعْنَى الْحَجِّ لُغَةً وَشَرْعًا وَكَمْ قِسْمًا لَهُ وَمَا هِىَ وَمَا الْاَفْضَلُ مِنْهَا؟

٣. اُذْكُرْ اَرْكَانَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مُرَتَّبًا ـ

٤. مَا مَعْنَى الْحَجِّ لُغَةً وَاِصْطِلَاحًا؟ ثُمَّ بَيِّنْ عَلٰى مَنْ يَجِبُ الْحَجُّ؟

٥. مَا مَعْنَى الْمِيْقَاتِ وَكَمْ مِيْقَاتًا لِلْحَجِّ وَمَا هِىَ؟

٦. اُذْكُرِ الْاِخْتِلَافَ فِىْ وُجُوْبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ مَعَ بَيَانِ ثَمْرَةِ الْاِخْتِلَافِ ـ

٧. مَا الْفَرْقُ بَيْنَ حَجِّ الْقِرَانِ وَحَجِّ التَّمَتُّعِ؟

٨. بَيِّنْ وُجُوْهَ اَفْضَلِيَّةِ حَجِّ الْقِرَانِ؟

٩. مَا مَعْنَى الْاِشْعَارِ وَمَا حُكْمُهُ؟

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত